









# ପରିଚାରିକା ।

( ନବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ )

ସଚ୍ଚିଦ୍ର ସାମିକ ପତ୍ରିକା ।

---

ରାଣୀ ଶ୍ରୀନିରୁପମା ଦେବୀ ସମ୍ପାଦିତ ।

---

ସହ: ସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ବିଷ୍ଣାୟ ।

ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ।

୧୭୨୫ ଅଗ୍ରହାୟଣ—୧୭୨୬ କାର୍ତ୍ତିକ ।

କୋଚବିହାର ।

କୋଚବିହାର ସାହିତ୍ୟ-ସଭା କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ

୩

କୋଚବିହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସେ

ଶ୍ରୀମନ୍ମଥନାଥ ଚଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ଟାକା, ବାର ଆନା ।



# পরিচালিকা ।

তৃতীয় বর্ষ ।

১৩২৫ অগ্রহায়ণ—১৩২৬ কা্তিক ।

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ।

—:~:—

বিষয় ।

লেখক ও লেখিকা ।

পৃষ্ঠা ।

অনুতাপ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কেদারলাল সাহা এম-এ,	৭৫০
অনুরোধ ( ঐ )	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫১২
অদ্বীক কাহাকে করে ( সন্দর্ভ )	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিজ্ঞান	৩৫৮
অদ্বীকে দেবায়ের যুদ্ধ ( সন্দর্ভ )	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিজ্ঞান	৪৮৫
অঙ্ক ( গাথা )	সম্পাদিকা	৭৯৭
অপজ্ঞত ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কেদারলাল সাহা এম-এ,	১১৮
অন্তর ( ঐ )	শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ	৩৪৩
অভিসার ( ঐ )	শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র	৫৮২
অক্ষর আকর্ষণ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বোষ এম-এ,	২১২
অক্ষম ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	২৩২

আ

আত্মকর্ষণ ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৫৭
আত্মদান ( কবিতা )	সম্পাদিকা	২
আমাদের কথা	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশ শুভ	৬৬১
আমাদের প্রবণ ও তাহার বহুকৌশল	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি,	৭৭০
আমাদের হিন্দুর নারীপূজা ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব	১০০, ৪০৩
আশ্বাস ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ	৩৪২

ই

ইতিহাস ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ✓	২০৭
------------------	------------------------------------	-----

উ

উৎসৃষ্টি ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, ✓	৪৫৫
--------------------	-------------------------------------	-----

উত্তর ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বোষ	৬৭২
-----------------	--------------------------	-----

উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র	শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু	৮১৪
-----------------------------	-----------------------	-----

এ

একঘরে ( কবিতা )	বেতালভট্ট	৩২৮
-----------------	-----------	-----

একস্র ( ঐ )	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি	৪৭৩
-------------	---------------------------------------	-----

এ যে তোমার ধরা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর	৩৪
--------------------------	--------------------------------------	----

## পরিচয়িকা—সূচী।

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
ক		
কবি ও ব্যাধ (কবিতা) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	✓	৮
কবিতার ভাষা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ		১০৮
কবি বসন্তকুমারের প্রতি (কবিতা) শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ		৫১
কাদে গো পরাণ কাদে (ঐ) শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ		৬৪৯
৮ কামাখ্যাধাম দর্শন (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল বিদ্যাবিনোদ		৬১৭
কালো ছেলে (কবিতা) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	✓	৭০৫
কোচবিহারের প্রাচীনভাষা (আলোচনা) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ		৫৬৪, ৬৩৯
ক্যামেরার সামনে রাজশূবর্ণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী		৭৭৫
খ		
খেয়ালী (কবিতা) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সান্না এম-এ		৫৪৭
গ		
গান শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ		১০০
ঐ ঐ		২১৩
ঐ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৪১
গারে হলুদের গান শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়		৬০২
গুরুদেব (চিত্র) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ,		৫৮০
গ্রন্থ সনালোচনা		২৮০, ৪২৭, ৫৫৪, ৬৮৯
(ঘ)		
ঘটকর্পের (আলোচনা) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, ভারতী,		
সরস্বতী, বিভাভূষণ ইত্যাদি		৭৪
ঘুমন্ত খোকা (কবিতা) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়		৮৪
(চ)		
চন্দ্রমণির জন্মকথা (কবিতা) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ		৪৬১
চিত্তি ঐ শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র		৪৮২
চিত্র ও চিত্তবৃত্তি (সন্দর্ভ) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার		৫৮৬
চিত্রশিল্পী (গল্প) সম্পাদিকা		৪১৬
(ছ)		
চিত্রে-ফোটা শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার		১৮৫, ৩৪৩
ছোটবড় (আলোচনা) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ		৪২৫
(জ)		
জন্ম-মঙ্গল (কবিতা) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়		২৩
জাতিদ্রষ্টা (গল্প) শ্রীযুক্ত জ্ঞানকৌবল্য বিদ্যাস		১১৯
জুলেখার রূপ (কবিতা) শ্রীযুক্ত কাঞ্চিন্দাস রাই বি-এ, কবিশেখর		৫৮৯
জ্ঞানভ্রমণী ঐ ঐ		৬৯১
(ভ)		
ভাজমংল (কবিতা) শ্রীযুক্ত উমিচাঁদ ভট্ট		৬১৬
ভীষ্মদিল ঐ শ্রীযুক্তা শকুন্তলা দেবী		৭৪৭
ভ্রাতা ঐ সম্পাদিকা		৭৩
ভিখারা ঐ শ্রীযুক্ত হুমুয়ার দাস শুভ বি-এ,		৬০৮

# পরিচরিকা—সূচী ।

১০

বিষয় ।	লেখক ও লেখিকা ।	পাতা ।
	( খ )	
খিষ্টার বেধা ( চিত্র )	শ্রীযুক্ত শৈলমালা ঘোষাঝারী সন্থকী	৭৮৩
	( ঘ )	
দরবেশ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৪২৩
মিহি ( আলোচনা )	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি,	৬০২
দিন যায়, মাস যায় ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ,	৬০২
দিন যায়, যাক্ দিন চলে ( কাব্যতা )	শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ,	৭৪৫
দীপালী ( কবিতা )	"বনকুল"	৭৬২
দুঃখের একজন	ঐ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৩৬৮
দুঃখ	ঐ শ্রীযুক্ত হিতচরণ মিত্র	৪৮২
দুঃখের রাজ্য	ঐ শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৫৭৩
দেবতা ( গল্প )	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী	৬৩৩
দেবতার সম্মুখে	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৮১০
	( ঙ )	
দর্শনসম্বন্ধে আকবর বাদসাহ	শ্রীযুক্ত মুনোজ্জনাথ রায় বি-এ,	২৪
	( ন )	
নাবুধ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শনা দেবী বি-এ,	৫৫৫
ন্যা ( ঐ )	শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ সরকার	৫৫২
নিবেদন	সম্পাদিকা	১
নৃত্যন বেপেশ নবীন প্রভাত ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৪৬০
	( প )	
পতিতা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেষর	৪৪৩
পত্র ঐ	শ্রীযুক্ত বৈজনাথ কাব্যপূর্ণাচার্য	১৮৪
পদ ঐ	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেষর	৩৮৮
পয়লা এপ্রিল ( গল্প )	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	৪৪৪
পরম্পর ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সান্না এম-এ,	৬৬৩
পরিশিষ্ট কোচবিহার সচিত্রা-সভার বার্ষিক কার্য-বিবরণী—৪৮২ পৃষ্ঠার পর		
পরিষদের জাতীয় বাঙ্গলা পুঁথি	শ্রীযুক্ত রাখালনাথ রায় বি-এ,	৪৭৪
পল্লীর পক্ষ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৬২৭
পাগল ( গল্প )	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৯
পাগলী ( গল্প )	সম্পাদিকা	৭৪০
পার্বত্য ( গল্প )	ঐ	১০৮
পুস্তিকা ৮৩৬ ( গল্প )	শ্রীযুক্ত হেমন্তলিনী দেবী	১৮৮
পুস্তনীয়া ৬৮৬ভাষ্যনীর পুস্ত ৩৭৭ক ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি	৫৮০
পুস্তারিণী ( কবিতা )	সম্পাদিকা	১৬৭
পূর্ণ এবং পশ্চিমের সমান কত	কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমন্ত ঠাকুর	২০৮
প্রতিবাদ ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	৫২৭
প্রদীপ ঐ	"বনকুল"	২৭১
প্রভাতী ঐ	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৬৬

# পরিচায়িকা—দৃষ্ট

বিবরণ	লেখক ও লেখিকা।	পৃষ্ঠা
অভিযো ( কবিতা )	ঐ—	৬৩৩
অষ্টম ভারতে বিবাহ প্রথা ( সন্দর্ভ )	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিহার্য	৬০৩
ঐ ( প্রতিবাদ )	শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ বেনাধ্যক্ষ	৬৬৭
অষ্টম ভারতে সনান প্রথার অকাটা প্রমাণ ( বাঙ্গ সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি.,	৭৪৪
প্রারম্ভিক ( গল্প )	সম্পাদিকা	৬১৩
প্রীতিগীতি ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ	১৮৬
প্রেমোন্মাদ ঐ	শ্রীযুক্ত বজ্রহৃদয় ঘোষ	৩৩৬
প্রেম-ভব ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত বী রঞ্জন সেন	৬৮৭
( ফ )		
ফুলের স্বপন ( গল্প )	সম্পাদিকা	১৪২
( ব )		
বক্রকীট ব্যাপি	'অজবনী'	৭২
বধু ( গল্প )	শ্রীমতী নীলমণি দেবী	১৯
বজ্রা	ঐ	৬৭৪
বনী ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ	১০৭
বরণ ঐ	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৬৬
বসন্তমঙ্গল ঐ	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৮৫
বরণ ঐ	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেষজ্ঞ	১৭৩
বর্ষ মঙ্গল ঐ	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৬৫
বর্ষা-বরণ ঐ	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদত্তাল বসু	৫৮৫
বসন্ত ঐ	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেষজ্ঞ	৪০৩
বঁচা ঐ	ঐ	৫৯৩
বাঙাল বন্ধু ( গল্প )	শ্রীযুক্ত দ্বিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ	৪৬২
বাঙ্গাল্য দর্শিক	'নারায়ণ'	৬২৩
বাঙ্গালী ভাষার উদ্ভাস্তক বিচার	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ,	৫১৯
বাঙ্গালী মাসিক পত্রিকার আর্টে নারীচিত্র	শ্রীযুক্তা নীলমণি দেবী	৮০০
বাসন্তী ( গল্প )	সম্পাদিকা	৫৫৬
বিত্তি সংগ্রহ	সম্পাদিকা	৭৫১, ৮০৪
বিবাহ ( গল্প )	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এম-এ, বি-এল, ভারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ, ইত্যাদি	৪৯৪
বিবাহ ও বিবাহের পন	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	৫৫
ঐ ( প্রতিবাদ )	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ,	১৭৩
বিবাহ-সম্রাট ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি,	৩২৯
বিবাহের দান ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেষজ্ঞ,	১২৬
বিরহ-লোক ঐ	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৭০
বিরহী ঐ	শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শী দেবী বি-এ,	৫০৪
বিশ্বরাম ঐ	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৬৭
বিশ্বাসে ঐ	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী	১১৫
বীরবলের হালধাতা ( সমালোচনা )	শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ রায় বি-এ,	২৭৬

পরিচায়িকা—সূচী ।

বিষয় ।	লেখক ও লেখিকা ।	পত্রাঙ্ক ।
বুধা বাজা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু	২৪১
বেদনার স্মৃতি ( গল্প )	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি,	৩৩৮
বৈরাগীতালার মেলা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, ✓	৩৫০
বৈশাখী ( কবিতা )	সম্পাদিকা	৩৫৭
বোকা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত ইন্দির গুপ্ত	৭৮৩
বুদ্ধতারতে শিক্ষাগৌরব	শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় বি-এ,	৬২৯
বুদ্ধ নরক ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	১০১

( ভ )

ভট্টাচার্যের পত্র	--নিভানন্দ ভট্টাচার্য	৪০৯
ভবানীপুর তীর্থে	শ্রীযুক্ত মলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ,	৬৩
ভাওয়ালের কবি ও গোবিন্দ দাস	শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ রায় চৌধুরী	৫২
ভাগালিপি ( গল্প )	শ্রীমতী শরদিন্দু দাসী	২৫৭
ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য শিল্পপ্রদর্শনীর দশম আবেশন	শ্রীযুক্ত উমিচাঁদ গুপ্ত	২৬৭
ভারতে ভারতীয় শিক্ষা সমাজ	শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস	২৪৭, ৪৩১
ভানুসিং ( গান )	শ্রীযুক্ত বনশ্চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮০৭
ভাষা শিক্ষা	শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বাব-রাট-ল.	১৩৬
ভ্রম সংশোধন	...	৬৯০

( ম )

মণিপুর চিত্র	কর্ণণ শ্রীযুক্ত মহিমেন্দ্র ঠাকুর	৩৮১, ৭২৬, ৭২৮
মহিলা ( গল্প )	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী	৭০০
মহীশূর শিখার স্মরণ	...	৩৫১
মহেন্দ্রগিরি ( আলোচনা )	শ্রীযুক্ত বিনয়কান্তি মুখোপাধ্যায়	৫৫২
মাতা মমু ( সন্দর্ভ )	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪৫১
মাতৃপূজা ( গান )	শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০
মানব সাধনার চরম বাণী	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	২৭১
মানব সাধনার ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সান্না এম-এ,	৩৯৮
মানসিক দৃঢ়তা এবং উৎসাহ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪২১
মানস ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যপুত্রাণী	৪২০
মাঝাট্টা ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ,	২৭
মিলন-সন্ধ্যায় ঐ	শ্রীযুক্ত বনশ্চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫৩
মিষ্টি সপ্নবৎ ( উপভাস )	শ্রীযুক্ত শৈলবালা বোষায়া সরস্বতী ১০, ৮৫, ১৫৫, ২২১, ৩৮৭, ৩৬৯	
মুক্ত ( গল্প )	শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস	২
মুড়ি ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, ✓	৫১৮
মেঘমুক্ত ( গল্প )	শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস	১৭৯
মেঘের দিনে ঐ	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,	৫২০
মেঘে ঐ	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী	৩২৩
মোহাক্ষয়নদেবানন্দ গিরি	শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু	৪২



# পরিচায়িকা—সূচী।

বিষয়।	লেখক ও লেখিকা।	পাতাঙ্ক।
( র )		
রামমোহন স্মৃতিমণ্ড ( সভাপতির অভিভাষণ )	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৫৬
রাধা রামমোহন রায় ( সন্দর্ভ )	রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই, এন্ড ও, এম্. বি, এফ, সি, এন্ড	৭৫৮
ঐ ( কবিতা )	সম্পাদিকা	৭৬৩
রামীর প্রতি ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত আভ্যুতাব মুখোপাধ্যায় বি-এ,	২৭৬
রিক্ত ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৭৭৪
রূপের পরণ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন ( কবিতা )	শ্রীযুক্তা শিরদ্বা দেবী বি এ,	৬৯৯
( - ল )		
লক্ষহারী ( কবিতা )	কুমারী লক্ষ্মীলা চন্দ	৬৭৮
লাহোর ভ্রমণ ( ভ্রমণ-বৃত্তান্ত )	শ্রীযুক্তা স্রু: দে:	৪৬
( ল )		
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত কুমুদরত্ন মল্লিক বি-এ,		৬৭৮
শুণু রে পাখি ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৬৭
শেষ ( কবিতা )	'সদিক' রচয়িতা	৬৮
অমলীলতা ( সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৬৮৫
শ্রীযুক্ত রেমেন রোণাও ও রবীন্দ্রনাথের পত্র	শ্রীযুক্ত জনকীবল্লভ বিবাস	৬২৪
শ্রীক্রেত ( ভ্রমণ বৃত্তান্ত )	সম্পাদিকা	৬৪৯
শ্রেষ্ঠ-সম্রাট ( গাথা )	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১৭
( ম )		
সত্যনিষ্ঠা ( সন্দর্ভ )	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল বিশ্বাসিনোদ	৫০৫
সর্পদংশন	শ্রীযুক্ত মাদুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	৮০৮
সমাকল্পটা ( গাথা )	সম্পাদিকা	৬১৮
সম্মিলন ব্যক্তির ডায়েরী	শ্রীযুক্ত রাখালরায় রায় বি-এ,	৫২০
সাড়	বুদ্ধ	৭০
সাহিত্য আহার ( বাঙ্গ সন্দর্ভ )	শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি,	২৩৬
সাবুতাষা ( আলোচনা )	শ্রীযুক্ত রুমকবিহারী ওপ্ত এম-এ	৫৩৮
সাক্ষী ( কবিতা )	শ্রীমতী মন্মথ মৈত্র	৩৪৩
সামা ঐ	শ্রীযুক্ত পুনকটক সিংহ	২৪৬
সামা ( সন্দর্ভ )	বুদ্ধ	১২৩
সুন্দর ঐ	শ্রীযুক্ত রাখালরায় রায় বি-এ,	১১৫
সে কোথায় ? ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত দ্বিজচরণ মিত্র	৪৮২
সেকালেণ্ড বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য	শ্রীযুক্ত রাখালরায় রায় বি-এ,	৩৪২
সেবারত ( সন্দর্ভ )	সম্পাদিকা	৬৯২
সৌন্দর্য্যবোধ ঐ	ঐ	২১৪
স্পর্শমণ ( কবিতা )	সম্পাদিকা	৬৬৯
সুন্দরী সত্যতা	শ্রীযুক্ত অক্ষয়ান দাশ ওপ্ত এম-এ,	৫
সুপ্রভাত ( কবিতা )	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	
স্বপ্নমি	{ কথা ও স্রু শ্রীযুক্ত কিতোরনাথ ঠাকুর } { বরলিপি শ্রীমতী মোহিনী সেন ওপ্তা }	

## পরিচরিকা—সূচী ।

বিষয়	লেখক, লেখিকা ।	পাতাঙ্ক ।
স্বরলিপি { কথা—শ্রীযুক্ত শৈলবালা ঘোষজায়া	}	১১২
গুর ও স্বরলিপি শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা		
ঐ { গান ও স্বর শ্রীযুক্ত উমিচাঁদ গুপ্ত	}	৪৪
স্বরলিপি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী		
ঐ { গান ও স্বর শ্রীযুক্ত উমিচাঁদ গুপ্ত	}	৫২২
স্বরলিপি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী		
স্বরূপ (সন্দর্ভ) বুদ্ধ		১৩২
স্বতির ভরা (গান) শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এন-এ,		২২২
	( হ )	
ৱরিতকী (কবিতা) শ্রীযুক্ত কুমদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,		৪০২
হিম্মার টান (কবিতা) শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ		৮০৩
দুদয়ের পূজা ঐ শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ		৪৫

## লেখক লেখিকার নামানুক্রমিক সূচী ।

লেখক ও লেখিকা ।	বিষয় ।	পাতাঙ্ক ।
	অ	
শ্রীযুক্ত অনন্তলাল সাত্তাল—বক্তা	( গল্প )	৬৭৪
শ্রীযুক্ত অনাথকুমার দেব—		
আমাদের হিন্দুর নারী পূজা	( সন্দর্ভ )	৩০০, ৪০৩
ভট্টাচার্য্যের পত্র		৪০৩
শ্রীযুক্ত অক্ষমান দাশ গুপ্ত এম-এ,—		
স্বদেশী সাহিত্য	( আলোচনা )	৫
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার—		
ছিটে ফোঁটা		১৮৫, ৩৪৩
চিত্র ও চিত্তবৃত্তি	( আলোচনা )	৫৮৬
	আ	
বাঁ চৌধুরী অমানতউল্লা আহম্মদ—		
কোচবিহার প্রাচীন ভাষা	( আলোচনা )	৫৬৪, ৬৩৩
শ্রীযুক্ত আভতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ,		
রানীর প্রতি	( কবিতা )	২৭৬
	ই	
শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি-এ		
স্বরলিপি		৭৮২
শ্রীযুক্ত উমিচাঁদ গুপ্ত		
ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য শিল্পপ্রদর্শনীর দশম অধিবেশন		২৬৭
তাজমহল	( কবিতা )	৬১৬
স্বরলিপি		৪১৪, ৭৮২

পরিচায়িকা—সূচী ।

লেখক ও লেখিকা ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
	উ	
বোকা	( কবিতা )	৭৮৩
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন		
অন্তরীক্ষ কাহাকে কহে	( আলোচনা )	৩৫৮
মাতা মল্ল	ঐ	৪৫১
অন্তরীক্ষে দেবাসুরের যুদ্ধ	ঐ	৪৮৫
প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথা	( সন্দর্ভ )	৬০৩
	ক	
শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল,		
বৌদ্ধ নরক	( সন্দর্ভ )	১০১
পরমা এপ্রিল	( গল্প )	৪৪৪
মেঘের দিনে	ঐ	৫২০
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর,		
এ যে তোমার ধরা	( কবিতা )	৩৪
বিরহের দান	ঐ	১২৬
বরুণ	ঐ	১৭৬
অক্ষম	ঐ	২৩৫
বসন্ত	ঐ	৪০৯
পতিতা	ঐ	৪৪৯
বাঁচা	ঐ	৪৯৩
জুলেথার রূপ	ঐ	৫৮৯
পণ	ঐ	৬৫৮
জ্ঞানজননী	ঐ	৬৯১
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,		
কবি ও ব্যাধ	( কবিতা )	৮
ঔত্তিতাস	ঐ	২০৭
বৈরাগীতলার মেলা	ঐ	৩৫০
হরিতকী	ঐ	৪০২
উল্লুপ্তি	ঐ	৪৫৫
মুড়ি	ঐ	৫১৮
হুঃখের রাজ্য	ঐ	৫৭৯
পল্লীর গর্ভ	ঐ	৬২৭
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ		৬৭৮
কালোছেলে	( কবিতা )	৭৩৫
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন বসু		
বর্ষা বরণ	( কবিতা )	৫৮৫
প্রভাতী	ঐ	২৬৬
শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী গুপ্ত এম-এ,		
বিবাহ ও বিবাহের পণ	( প্রতিবাদ )	১৭৩

দ্রষ্টব্য নম্বর  
৫-১০

# পরিচয়িকা—সূচী।

লেখক ও লেখিকা।	বিষয়।	পাতাঙ্ক।
বাঙ্গলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার		৫১৯
সাধুভাষা	( আলোচনা )	৫২৮
শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু		
বুধা বাত্রা	( কবিতা )	২৪১
মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরি	( জীবনী )	৪২
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
মাতৃপূজা	( গান )	৪০
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ		
অপরূপত	( কবিতা )	১১৮
মানস সরোবর	ঐ	৩২৮
খেয়ালী	ঐ	৫৫৭
পরম্পর	ঐ	৬৮৩
অমৃতাপ	ঐ	৭৫৩
	গ	
শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দর রায় চৌধুরী		
ভাওয়ালের কবি ৬গোবিন্দ দাস		৪২
	চ	
রায় শ্রীযুক্ত চুলীলাল বসু বাহাদুর আই, এন্ড, এম, বি,এফ. সি, এন্ড		
রাজা রামমোহন রায়		৭৫৮
শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস		
মুক্ত	( গল্প )	২
জাতিভ্রষ্টা	ঐ	১১৯
মেঘমুক্ত	ঐ	১৭৯
ভারতে জাতীয় শিক্ষা সমস্যা	( আলোচনা )	২৪৭, ৫৩১
প্রভৃতি—		
শ্রীযুক্ত ক্ষিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ,		
মারহাট্টা	( কবিতা )	
গুরুদেব	( চিত্র )	
বাঙাল বসু	( গল্প )	
শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		
আত্মকর্ষণ	( সন্দর্ভ )	৫৪৭
শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—প্রমণীলতা	( সন্দর্ভ )	৬৮৫
মানসিক দৃঢ়তা এবং উৎসাহ	ঐ	৪২১
ক্যামেরার সাম্নে রাজকুমার		
	( ত )	
শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস-সি,—একমুহুর কবিতা		৪৭৩
দ্বিদি ( আলোচনা )		৬০৯
পূজনীয়া ৬কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু উপলক্ষে ( কবিতা )		৬৮০

## পরিচায়িকা—সূচী।

লেখক ও লেখিকা।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক
	( দ )	
শ্রীযুক্ত বিজয়চরণ মিত্র—সে কোথায় ?	( কবিতা )	৪৮২
দুঃস্বপ্ন	ঐ	৪৮২
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—পাগল	( গল্প )	৩৯৯
	( ন )	
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ,—ভবানীপুর তীরে		৬৩
‘নারায়ণ’—	বাল্যলাগ্ন্য ছবি	৬২৬
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিশ্বাবিনোদ সত্যনিষ্ঠা ( সন্দর্ভ )		৫০৫
	৮ কামাখ্যাধাম দর্শন ( ভ্রমণ-বৃত্তান্ত )	৬. ৭
শ্রীমতী নীহারবালা দেবী—বধু	( গল্প )	২৯
মেয়ে	ঐ	৩২৩
দেবতা	ঐ	৬৩২
মতিয়া	ঐ	৭০০
	( প )	
শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার বোষ এম-এ,—কবি বসন্তকুমারের প্রতি ( কবিতা )		৫১
গান		১০০
অশ্রুর আকর্ষণ	( কবিতা )	২১২
স্মৃতির ভরা	ঐ	২২৯
দরবেশ	ঐ	৪২৯
কঁাদে গো পরাণ কঁাদে	ঐ	৬৪৯
রিক্ত	ঐ	৭৭৪
শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ—জুদয়ের পূজা	( কবিতা )	৪৫
বন্দী	ঐ	১০৭
প্রীতিগীতি	ঐ	১৮৬
সামা	ঐ	২৪৬
আশ্রাস	ঐ	৩৫২
অভয়	ঐ	৩৪৩
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-ম্যাট-ল,—ভাষা শিক্ষা		১৩৬
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী—বিশ্বাসে	( কবিতা )	১৩৫
শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ সরকার—নারী	ঐ	৫৫২
শ্রীযুক্তা প্রিয়বদা দেবী বি-এ,—বিরহী	ঐ	৫০৪
নাবুঝ	ঐ	৫৫৫
দিন যায়, মাস যায়	ঐ	৬৩২
দিন যায়, যাক্ দিন চলে	ঐ	৭৫৫
রূপের পরণ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন	ঐ	৬৯৯
	( ব )	
‘বনফুল’—প্রদীপ	( কবিতা )	২৭১
দ্বীপালী	ঐ	

## পরিচায়িকা সূচী ।

লেখক ও লেখিকা ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি,—সাহিত্যিক-আহার ( বাঙ্গ সন্দর্ভ )		২৩৬
	বিবাহ-সমস্তা ( সন্দর্ভ )	৩২২
	প্রাচীন ভারতে সমাধিপ্রথার অকাটা প্রমাণ ( বাঙ্গ সন্দর্ভ )	৭৪৪
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জন্ম-মঙ্গল	( কবিতা )	২৬
	দুঃসন্ত খোকা ঐ	৪৮
	মিলন-সঙ্কায় ঐ	১৫৩
	শ্রেষ্ঠ-সন্ন্যাস ( গাথা )	২১৭
	বরমঙ্গল ( কবিতা )	২৮৫
	বর্ষমঙ্গল ঐ	৩৮৫
	বিরহ-লোক ঐ	৪৪৩
	অমুরোধ ঐ	৫১২
	গায়ে হলুদের গান ঐ	৬০২
	বিশ্বরাজ ঐ	৬৬৭
	ভালবাসি ( গান )	৮০৭
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—স্বপ্নভঙ্গ	( কবিতা )	৬১
	কবিতার ভাষা	১৩৮
	মানব-সাধনার চরম বাণী	২৭১
	প্রেমোন্মাদ ( কবিতা )	৩৩৬
	ছ'জনের একজন ঐ	৩৬৮
	ছোটবড় ( আলোচনা )	৪২৫
	চন্দ্রমণির জন্মকথা ( কবিতা )	৪৬১
	নূতন দেশের নবীন প্রভাত ঐ	৪৮৩
	প্রতিবাদ ঐ	৫২৭
	উত্তর ঐ	৬৭২
শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—মহেন্দ্রগিরি		৫৫২
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন—বিবাহ ও বিবাহের পণ		৩৫
	প্রেম-তত্ত্ব ( সন্দর্ভ )	৩৮৭
বৃদ্ধ—সাড়	( সন্দর্ভ )	৭০
	সাম্য ঐ	১২৬
	স্বরূপ ঐ	১৪২
শ্রীযুক্ত বৈষ্ণনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—পত্র	( কবিতা )	১৮৪
	মাহুষ ঐ	৪২০
বেতালভট্ট—একঘরে	( কবিতা )	৩২৮
	( ম )	
কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর—মণিপুর চিত্র		৬৮১, ৭৩৬, ৭৬৫
	পূর্ব এবং পশ্চিমের সামাজিকতা	২০৮
শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় বি-এ,—ধর্মসম্বন্ধে আকবর বাদসাহ		২৪
	বৌদ্ধভারতে শিক্ষাগৌরব	৬২২

লেখক ও লেখিকা।	বিষয়।	পত্রিক।
শ্রীযুক্ত মাদুরীমোহন মুখোপাধ্যায়—সর্পদংশন		৮০৮
শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা—স্বরলিপি		৪১, ১১২

( র )

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান		১৪১
শ্রীযুক্ত রাধালরাজ রায় বি-এ.—সুন্দর	( কবিতা )	১১৫
	পরিশদের প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি	১৪৪
	বীরবলের হালখাতা ( সমালোচনা )	২৭৬
	সেকালের বাঙ্গালীর বেশভূষা	৩৪৫
	সম্মিলন যাত্রীর ডায়েরী	৫২৩
শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী—প্রাচীন ভারতে বিবাহ ক্রিয়া ( প্রতিবাদ )		৬৬৭

( শ )

শ্রীযুক্তা শকুন্তলা দেবী—তীর্থ সলিল	( কবিতা )	৭৪৭
শ্রীযুক্ত পরচন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, ভারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ, ইত্যাদি—		
	বিবাহ ( গল্প )	৪২৪
	ষটকর্পর ( আলোচনা )	৭৪
শ্রীমতী শরদিন্দু দাসী—ভাগালিপি	( গল্প )	২৫৭
শ্রীমতী শৈলবালা বোমজায়া সরস্বতী—মিষ্টি-সরস্বতী ( উপহাস )		১০, ৮৫, ১৫৫, ২২১, ২৮৭, ৩৬২
	থিয়েটার দেখা ( চিত্র )	৭৮৩
	স্বরলিপি	১১২
শ্রী -প্রভাতী	( কবিতা )	৫৬৩

( স )

'সঞ্জীবনী'—বক্রকীট বাধি		৭২
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রামমোহন স্মৃতিসভা ( সভাপতির অভিভাষণ )		৭৫৬
শ্রীযুক্তা সম্পাদিকা—নিবেদন		১
	আশ্বদান ( কবিতা )	২
	ক্রান্তা	৭৬
	পার্বতী ( গল্প )	১০৮
	পূজারিণী ( কবিতা )	১৬৭
	সৌন্দর্য্যাবোধ ( সন্দর্ভ )	২১৫
	ফুলের স্বপন ( গল্প )	২৫২
	সমাকল্পিত ( গাথা )	৩২৮
	বৈশাখী ( কবিতা )	৩৫৭
	চিত্রা শিল্পী ( গল্প )	৪১৫
	চাঁচিচি ( গল্প )	৫১৩
	বাসন্তী ( গল্প )	৫৫৬
	স্পর্শমণি ( কবিতা )	৬৩৭
	ক্রীড়াক্ষেত্র ( ভ্রমণ বৃত্তান্ত )	৬৪৯
	সেবাশ্রিত ( সন্দর্ভ )	৬৯২

## পরিচায়িকা সূচী ।

লেখক ও লেখিকা ।

বিষয় ।

পত্রাঙ্ক ।

বিচিত্র সংগ্রহ		৭৫১, ৮০৪
রাজা রামমোহন রায়		৭৬৩
পাগলী	( কথা )	৭৪০
শ্রীমতী সরস্বতীমৈত্র—সাক্ষ্য	( কবিতা )	৩৪৪
‘সিন্ধি’ রচয়িতা—শেষ	( কবিতা )	৬৮
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শৃগুরে পাহা	( সন্দর্ভ )	৪৫৭
শ্রীযুক্তা স্রঃ দেঃ—লাহোর ভ্রমণ	( ভ্রমণ-বৃত্তান্ত )	৪৬
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-বি,—বেদনার স্মৃতি ( গল্প )		৩৩৮
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বরণ	( কবিতা )	২৫৬
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশগুপ্ত—আমাদের কথা		৬৬১
শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত—ত্রিধারা	( কবিতা )	৬৮৮
কুমারী মেহলতা—চন্দলঘহারা	( কবিতা )	৬৭৮
	( হ )	
শ্রীযুক্তা হেমললিতা দেবী—পুতলিকা চতুষ্টয়	( গল্প )	১৮৮

—:~:—

## চিত্র-সূচী

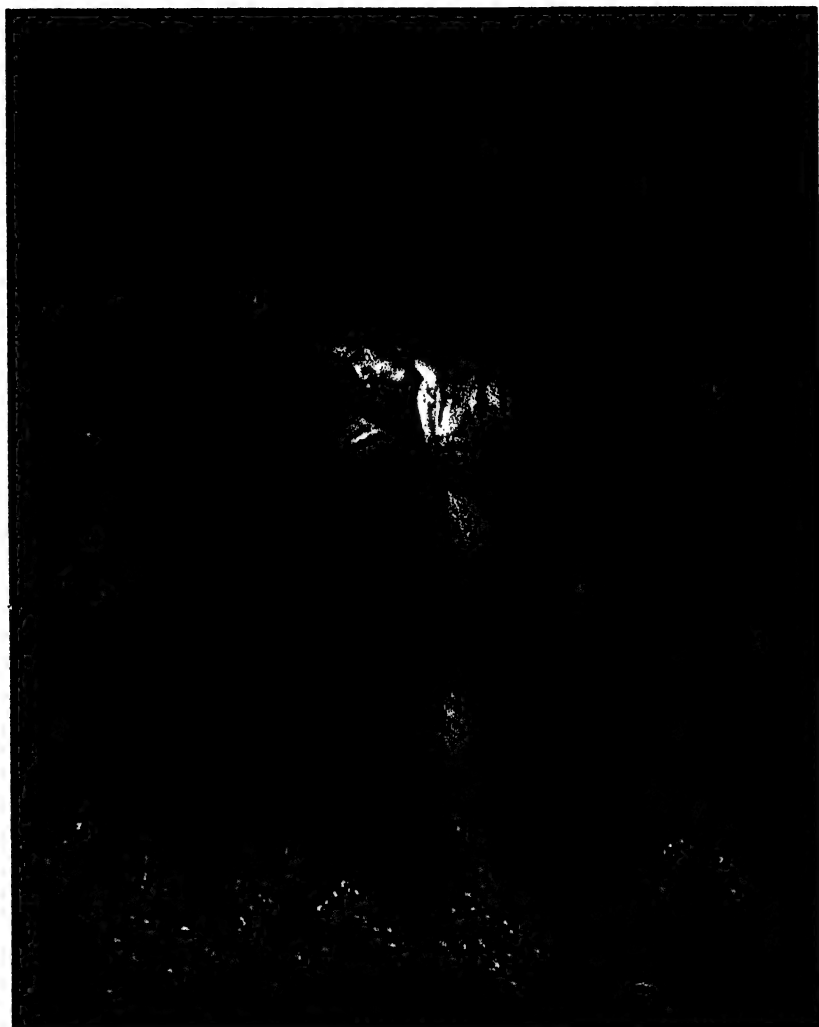
—\*—

বিষয়	চিত্র শিল্পী	পৃষ্ঠার পূর্বে
বঙ্কায় সাঙ্ক্য-প্রদীপ	শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সান্যাল	১
অবলম্বন	শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার	৭৩
হুঃশাসনের রক্ত পান	প্রাচীন চিত্র	১৪১
ভীষ্মের শরণার্থী	ঐ	১৪১
কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত প্রাচীন “চণ্ডীকাব্রত” পুথির ২য় পাটার ১পৃষ্ঠা		২৮৫
ঐ	ঐ ১ম পাটার ১পৃষ্ঠা	২৮৫
বিরভিণী রাধা	প্রাচীন চিত্র	৩৫৭
দরবেশ	শ্রীযুক্ত জেঃ বিশ্বাস	৪২৯
কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত প্রাচীন “চণ্ডীকাব্রত” পুথির ১ম পাটার ১পৃষ্ঠা		৪৮৩
ঐ	ঐ ২য় পাটার ১পৃষ্ঠা	৪৮৩
জ্যোৎস্নালোকে		৬২৭
মৃত্যুর আলোকে		৬৯১
মানবতা	শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার	৭৫৫

—\*—







‘বাক্সায় সাক্ষ্য-প্রদীপ’

চিত্রশিল্পী—শ্রী অনাদিনাথ সাহু।

চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর সৌজ্যে।



# পরিচারিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“নে প্রাপ্তবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতৈ কনাঃ।”

৩য় বর্ষ।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সাল।

১ম সংখ্যা।

## নিবেদন।

—ঃঃ—

যিনি দিনকে মাসের মধ্যে, মাসকে বৎসরের মধ্যে ও আবার বৎসরকে যুগের মধ্যে চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছেন আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরিচারিকা-ব্রতের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ করি! যে মানব-দেবতা সৰ্বসম্মানবের মধ্যে থাকিয়া এই দুই বৎসর সেবার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আজও আবার এই নূতন বৎসরের প্রাবল্যে এই তরুণ উষার স্নিগ্ধালোকে পূজার প্রার্থনায় জদয়-মন্দির-দ্বারে উপস্থিত! তিনি যে জদয়ের সেবারূপ পূজা গ্রহণ করিয়াছেন সে যে তাঁহার ঐ বরাভয় হাস্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! আয় তবে দীনা দীনা পূজারতা পূজারিণী, তোর পূজা দে, তোর সেবা দে, তোর স্তূপে-দুঃপথে আন্দোলিত, নিষ্কাম-প্রশংসায় সম্পীড়িত, হাসি-অশ্রুতে বিমথিত জদয়খানি এই জীবন-দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দে আর তাঁহার ঐ দক্ষণ চতুর কলাগ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নূতন উৎসাহে নিষ্কাম সেবারতে আজ দীক্ষা গ্রহণ কর! এত শুধু জ্ঞানের পূজা নয়, এ যে ভক্তির পূজা তাই আজ সেবাই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিল, পরিচারিকা সেবা করিবে—আর বিশ্বদেব তাহা গ্রহণ করিবেন, ইহার চেয়ে সহজ আর কি হইতে পারে? এই বিশ্ব—যাহার ভিতরে বাস করিতেছি, যাহাকে চক্ষুচক্ষে দেখিতেছি, শ্রবণ দিয়া শুনিতেছি, হস্ত দিয়া স্পর্শ করিতেছি, সেখানেই সেবা দান করা এ যে বড় সহজ বড় সুন্দর, এই যেখানে নরে-নরে নারায়ণ, নারীতে-নারীতে নারায়ণী! যিনি আপনার আত্মার কণা-কণা অংশ দিয়া এত বড় জীবাশ্মার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি—এক রূপকে যিনি বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে পূজা দেওয়ার মত সহজ সুন্দর সাধনা আর কি আছে?

বড় দুঃখের এই সেবা, বড় আঘাত সংঘাতের, বড় ক্ষতি অপমানের তবু দিতেই হইবে, কারণ ইহাতে আনন্দ আছে, এই সেবার গোড়ার কথা আনন্দ,—কিনা আনন্দ হইতে এই সেবার আরম্ভ, আবার শেষের কথা আনন্দ—কিনা আনন্দেই ইহার লয়! আর মাঝের কথাও আনন্দ কিনা—অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয় এই সেবার জন্য, ভক্তের ইহা হইতে অধিক আনন্দের কথা আর কি আছে? যে সেবা আনন্দের ভিতর জন্ম লইয়া দুঃখের সঙ্কটময় পথে আনন্দের তীর্থে গীন চইয়াছে সেই সেবা দিবার সাধন-যজ্ঞ আজ আরম্ভ হইল,—কাহাকে? না যিনি প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যাত্ম্যৎসর্বত্ম্যৎ অন্তরতরং যদময়াত্মা—পূজ হইতে প্রিয়, তি হইতে প্রিয় এবং আর সকল হইতে প্রিয়—অন্তরতর এই পরমাত্মা, এবং যিনি মহান্ প্রভুকৈপুরুষঃ এই মহান পুরুষ সকলের প্রভু।

## আত্মদান ।

—:~:—

সুখের হাসি দুখের ঘন	অশ্রু-ধারে
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব	আপনারে ।
একহাতে দান ক'রে আবার	রাখ্ব না ক আশা পাবার ;
টিক্তে এবার দিব না আর	অহঙ্কারে,
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব	আপনারে ।
অনেক পেলাম হর্ষব্যথা	এই জীবনে.
ভারের বোঝা বাড়িয়েছি যে	আপন মনে ।
আমার ভাল-মন্দ-মেশা	কেবল পাবার নেবার নেশা,
তোমার পায়ে ঢাল্ব প্রভু	দেওয়ার ভারে ;
নিঃশেষে আজ চুকিয়ে দেব	আপনারে ।

## মুক্ত ?

—:~:—

সত্যি আজ আমি মুক্ত,—কারাগার হ'তে ছুটি পেরে পথে এসে দাঁড়িয়েছি ; সংসারে আমার এমন একটু কিছু নেই, যাতে আমার বাধতে পারে, যাতে আমি প্রাণ থলে বলতে পারি—এখানে আমার আকর্ষণ ! মুমুকু না হয়েও মুক্তি আমার আজীবনের সঙ্গী হতে উঠেপড়ে লেগেছে,—সেই ভ্রমভিথি হ'তেই ! মার জঠর থেকে মুক্ত হ'তে না হ'তেই বিধাতা মাতৃস্নেহ হ'তে মুক্তি দান করেছিলেন, সেই সঙ্গে দেহ হ'তে প্রাণপাথি মুক্তি পেল না কোন্ অপল্যাখে ! পিতাও পরপারে চলে গিয়েছিলেন, কয়েক মাস পূর্বে,—সুতরাং সংসারে আমার বাধবার নিজের কেউ আর ছিল না । এক বৃদ্ধা,—প্রতিবেশিনী,—সে একে একে সব হারিয়ে, মুণ্ডিতশীর্ণ কদম বৃক্ষের মত সংসারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল ; শুন্তে পাই, মায়ার বন্ধন ছিন্ন হ'লেই নাকি মোক্ষলাভ,—বৃদ্ধা জীবনের খেওয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েও মোক্ষলাভের মহাসুযোগ উপেক্ষা করেছিল—মায়ার বাধনে আবার ধরা দিয়াছিল—মারাবন্ধনহীন আমার বাধতে ! গ্রামের সকলেই বলেছিল, শুনেছি,—“ও-ছেলে কি বাচে—জন্মমাত্রই যে মাতৃ-হার”—তবু আমি বৃদ্ধার, মায়ের অধিক ষত্রে বেঁচেছিলাম ; অনেক দিন বুঝতে পারি নাই, জান্তাম না আমার মা নাই ; সে কথা শুনেও আমার তা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'ত না । বৃদ্ধা ছিল আমার পিতামাতা সর্কষ !

দিন ত কাটছিল বেশ ! সুখও ছিল না,—দুঃখও ছিল না,—অভাব আমাদের সামান্য—অল্পেই আমরা সুখী ছিলাম, দিন ত কাটছিল বেশ ! সে এক কনকনে শীতের রাতে বৃদ্ধার প্রবল বেগে অর এল—সাত দিনেও তার

বিরাম হ'ল না—একজরী বৃক্ষের বাণী । কবরেজ বলেন—“এ যাত্রা বৃষ্টি বৃষ্টি বাঁচে না।” সে কথা শুনে প্রাণমন আমার হাঠাকার করে উঠল,—চোখের জল ধরে রাখতে পারলেম না । প্রাণপণে সেবা শুদ্ধ করাছিলাম,—তার মাত্রা আবেগ বাড়িয়ে দিলাম—আমার কেবল মনে হ'ত—বৃষ্টি এবার বৃড়িনাকে আমার হারাই ! অশ্রু গোপন করতে চেতাম—পারতাম কৈ ? বৃদ্ধা তা বুঝতে পেরেছিল—সে তার ক্ষীণ হস্তে আমাকে বৃক্ষের মধ্যে টেনে নিয়ে বলত, “কাদিস্ কেন বাছা, আমি ভাল হয়ে উঠবো।” হায় ! আশা !

তিন সপ্তাহ সেই ভাবে কেটে গেল ! দরিদ্রের সংসার, কিই বা ছিল—আর কিই থাকবে ! যা ছিল, তা বেচে এতদিন ঔষধপথা চলে ছিল—সে দিন সব তার শেষ হয়ে গেছে,—বন্ধু বলতে ছিল যারা—তাদের সে অবস্থা বুঝতে বাকী ছিল না,—ধার দিবার ভয়ে তারা সরে পড়েছিল,—আমার তখন চারদিকে আঁধার ! সেই অনটনের সংসারে কবরেজ পর্যাঙ্ক বিরূপ হলেন—স্পষ্টই বলে গেলেন—‘চেঁটা আর বৃথা—বৃদ্ধা আর কিছুতেই বাঁচবে না !’ শুনে প্রাণ ভুকিয়ে গেল, কবরেজের পায়ে লুটিয়ে পড়লেম, তিনি তখন কথা দ্বারয়ে নিয়ে বলেন “যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—চেঁটা চলুক ; বলকর পথের চেঁটা দেখ ।—যে অবস্থা—আমার ভিজিটটা না হয় পরেই দিও।”

বলকর পণ্য পাই কোথা,—আড়াই টাকা সের বেদানা—ক'দিন চালাতে পারি,—তখন এক কপর্দকও চাতে নাই যে !

বৃদ্ধার প্রাণ বৃষ্টি বেদানায়,—তাকে একা ফেলে তারই চেঁটায় চল্লেম । বাজারের সামনে বাবুরা “কোন ছবিঙ্কের সাহায্যের জন্য” বক্তৃতা করছিলেন—দাঁড়িয়ে একটু শুনলেম,—ভাবলেম আমিও যে সেই ছবিঙ্ক-পীড়িত এঁদের কাছে চাইলে কিছু পাওয়া যেতে পারে ! আশায় বুক বেঁধে কিছু প্রার্থী হতে চেলেম,—মুখে কথা ফুটল না,—দরিদ্র হই, ভিক্ষা সেই প্রথম ! অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁদের একজনের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানালেম—বিমুখ হতে হ'ল—ও-অর্থ ওখানে ব্যয়ের জন্য নয় ! বেদানা,—ফলের দোকানে থাকে থাকে সাজান রয়েছে,—কত কাকুতি মিনতি করে তার একটা ধারে চেলেম,—আমায় বিশ্বাস করে কে ধার দেবে !—অবশেষে ভিক্ষা চাইলাম—তাতেও “না” । খেটে খেটে—উপার্জন ক'রে বেদানা—রসের মাধুর্য উপভোগ করতে একজন বাবু আমার উপদেশ দিলেন । আমার বেদনা বুঝবার কেহই ছিল না !

অবশেষে বলতে লজ্জা হয়,—নিজের উপর—মানুষের উপর, সকল আস্থা হারিয়ে যে কার্যে মতি হ'ল তা জগতের চক্ষে—সমাজের চক্ষে অতি হীন । আমি সত্যসত্যি তাই করে বস্লেম,—মুখ ফুটে বলতে জিভে আটকে আস্ছে,—আমি ফলের দোকান হতে চুরি কর্লেম বেদানা !—আমার বুড়িমার প্রাণ !

বেদানার রসে সত্যি যেন বৃদ্ধার দেহে বল দিল—সে দিন সে বেশ কথাবার্তা বলতে লাগলো—সবই প্রায় আশার কথা । অসদ্রপারে ফল এনে প্রাণে কেমন একটা অশোয়াস্তি অনুভব করছিলাম—বুড়ীর আশার কথায় আমার সে ভাব কেটে গেল !

বেদানা শেষ হয়ে গেল । আবার বাজারে বেড়িয়ে পস্লেম—বেদানা চুরি করতে ! সে আশঙ্কার কথা, প্রবৃত্তির নিবৃত্তির, বিবেকের দ্বন্দ্বকলহের কথা আজ আর কাজ কি ! চুরি করব বলেই সে রাতে বেড়িয়েছিলাম চুরিই কর্লেম ! হা হরি !

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন চুরি চল্লেম,—চার দিনের অপরাধ বিধি বৃষ্টি সহিতে পার্লেম না ; প্রবৃত্তিই বা কে দিল নিবৃত্তির ব্যবস্থাই বা কর্লে কে ! দোকানী পুঙ্কের চুরি লক্ষ্য করে সাবধান হয়েছিল ; বমাল

আমাকে পাকড়াও করলে। গালি মন্দ কিল চড়ের অবধি থাকল না,—একটি কথাও বলতে পারলেম না,—কাতরতার একটি নিশ্বাস পড়ল না—প্রাণটা পাষণ হয়ে গিয়েছিল। মনে কেবল হচ্ছিল—“হায়! হ’ল কি—এ কি করে ফেললাম!”

“পুলিস এসে হাতে হাতকড়া দিতেই প্রাণটা চমকে উঠল,—তাট ত,—কি করতে এ কি হয়ে গেল! হায়! বুড়ীমাকে আমার দেখবে কে! তার যে আর কেউ নাই! এত দূরে নেমেও তাকে রক্ষা করতে পারলেম না! স্বরণে এল না তখন—রক্ষা করবার আমি কে; ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলেম। মনে হচ্ছিল কেবল বুড়ীর দশা। বুক ফেটে কান্না এল; আর ঠিক থাকতে পারলেম না। মেয়েদের মত কেঁদে লুটিয়ে পড়লেম,—কারো তাতে দয়ার উদ্বেগ হ’ল না, বরং বিজ্ঞপের তীক্ষ্ণ বাণে ভয়হৃদয় আরো চূর্ণ করে গেল।

বাস্তবিকভাবে দৃঢ় হলেম বটে; মন কিছুতেই প্রবোধ মানুলো না। হাজতের জনহীন কক্ষে, রক্তনীর স্তব্ধতায় আমার কানে কেবলি ধ্বনিত হ’ত বৃদ্ধার কণ্ঠ: চোখের সামনে হুভসে উঠতো—তার রোগক্লিষ্ট বদনখানি, মনে পড়তো তার সে দিনের কথা!—“কাঁদা দৃষ্টি কেন বাছা! আমি ভাল হয়ে উঠব।” আর ভাল হয়েছ, কে তোমায় দেখছে! আয়ু থাকতেই মৃত্যু লেখা ছিল তোমার। এ দু’দিন কি করে কাটছে মা!

বিচারের দিন হাকিমকে সব খুলে বল্লেম। দয়া ভিক্ষা চেলেম। অপরাধ করেছি, শাস্তি দিন, দু’দিন কেবল অপেক্ষা করুন, বুড়ি একটু সেরে উঠুক, আমি আপনি এসে যে শাস্তি হয় গ্রহণ করবো।

সে কথা কেউ বিশ্বাস করল কিনা জানি না; তবে হাকিম বুড়ির খোঁজে লোক পাঠালেন, বোধহয় আমার কথার সত্যতা নির্ধারণের জন্যে। লোক ফিরে এসে যে সংবাদ শুনাগ,—সে কথা যে আজও মুখে আনতে প্রাণ ফেটে যায়, বুড়ীর নাকি সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেছে। তবে আর কিসের জন্যে কোন্ আশায় মুক্তি প্রার্থনা! হাকিমকে বল্লেম “হুজুর দয়া করুন! আমার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করুন—চোর আমি,—বুড়ীর প্রাণহস্তা আমি—যদি বেদানা চুরি না করতেম—তা হলে কি আজ এমন ভাবে—একা না জানি কি হত্যাশার মধ্যে—কি কষ্টে তার প্রাণ বেড়িয়েছে রে—বেদানায় না হ’ক অন্য উপায়ে হয় ত তার প্রাণ বাঁচাতে পারতাম।”

দেখলাম হাকিমের চক্ষু অনার্দ্র থাকল না। কিন্তু ন্যায়ের বিধান কি কঠোর,—কিরূপ অলম্ব্য। চোর আমি, আমার শাস্তি না হওয়াই যে প্রতাবায়—পাপ—আমি ত তাই চাই! সেই আমার শাস্তি! জেল হ’ল দু’মাসের! জেলের কঠোরতা, মাছুষের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার, আমাকে আর কি কাতর করবে—আমি চাই আরো কঠোরতা,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

সে প্রায়শ্চিত্তের আজ শেষ হয়ে গেছে—আজ আমি কন্দুহীন,—অবলম্বনহীন,—আমার আজকার এ মুক্তিতে যে কি তীব্র বিষ—কি বিপদ কে বুঝবে? তার শূন্য পাতত গৃহ,—আমার স্মৃতির স্বর্গে, খালাস পেয়েই ছুটে গিয়ে যে শূন্য হৃদয়পূর্ণ করে এসেছি—তারপরও কি আমার বলতে হবে—আজ আমি মুক্ত! গৃহহীন, সঙ্গীহীন, মুক্ত আমি—আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখে আমার সমগ্র পৃথিবী পড়ে আছে,—সেই এ গৃহহীনের গৃহ! তবু বারবার মনে হচ্ছে—সত্যি কি আজ আমি মুক্ত!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

## ‘স্বদেশী সাহিত্য।’

অধিকাংশ নদীই সাগরে পতিত হয়,—সে জনা একরূপ বলা চলে না যে, যে সকল নদী সাগরে পতিত হয় তাহার একটি অপরটি হইতে বিভিন্ন নয়। গঙ্গা চিরকালই গঙ্গা ; সাহিত্যক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা খাটে। প্রত্যেক বড় সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যের অংশ—মানবের অনন্ত চিন্তাধারার একটা স্রোত, অসীম ভাবরাশির একটা প্রবাহমাত্র। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য উহা বিশিষ্ট ভাবে কেবলমাত্র ঐ দেশেরই সাহিত্য, অন্য কোন দেশের নয়। বিশ্বসাহিত্যও আছে। স্বদেশী সাহিত্যের কথাও ভুলিলে চলবে না। সূর্যের আলোতে সাতটি বর্ণ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে এই একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের খেলা দেখাইয়া থাকে ; আমরা ভগৎ জুড়িয়া সকলে যে আলোক ভোগ করি তাহার রং সাদা, কিন্তু মেঘের উপর যখন সেই আলোক রামধনুর সৃষ্টি করে তাহার রং নীল পীত লোহিত প্রভৃতি। এই প্রকারে ‘জগতের চিরকালের সত্যগুলি, ধারণাগুলি যাহা সকল দেশের সাহিত্যের বিশেষ উপাদান, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল দেশের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক দেশেরই ‘স্বদেশী সাহিত্য’ বলিয়া একটা নিজের সম্পত্তি আছে। এইটী ইংরাজী সাহিত্য, এইটী বাঙালী সাহিত্য এই শ্রেণীবিভাগ শুধু ভাষাগত বৈষম্যের উপর নির্ভর করে না, একটা জাতির সভ্যতা, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা সেই জাতির সাহিত্যের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

কতকগুলি স্বদেশভক্ত, যাহারা বাঙ্গালার প্রাণের ধারার একটা সুর তুলিয়া ধরিয়াছেন ও বলিয়াছেন ‘এহে বাঙ্গালার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাখ্যা, বিদেশীর সাহিত্যের সুরে এই দেশী সুরটা হারাইয়া ফেলিও না, ‘তাছাড়া কি বস্তুতঃই ‘দেশাত্মক গুচিবাদিগ্রন্থ’ সে কথাই বস্তুমান প্রবন্ধ আমাদের বিচারের বিষয়। ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে যাহারা ‘সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি ( Policy of protection ) অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাদের কথার প্রকৃত অর্থ কি ?

আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে একটা মনুষ্য অপর একজন মনুষ্য হইতে ভিন্ন, একজনের জীবনের আদর্শের সঙ্গে অন্য আর একজনের জীবনের আদর্শ ঠিক মিলে না। সেইরূপ জাতীয় জীবনের দিক হইতে দেখিলে একজাতি আর একজাতি হইতে বিভিন্ন,—একজাতির সভ্যতার গতি, অপর একজাতির সভ্যতার গতি হইতে ভিন্ন পথগামী। মিশরীয় সভ্যতা রোমক কিম্বা গ্রীসীয় সভ্যতার প্রবাহে যে খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ভারতীয় সভ্যতার স্রোত সেই খাত দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। আধ্যাত্মিকতা যাহা ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহা আর কোনও দেশের সভ্যতায় স্থান পায় নাই এবং অন্যান্য দেশের পার্শ্ববস্তুর প্রতিঅভ্যাক্তি ভারতের জাতীয় জীবনের জন্য কোনই অমূল্য আধরণ করে নাই।—প্রত্যেক দেশেরই প্রত্যেক জাতিরই এই ভাবে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি কখনই নষ্ট হয় না কিন্তু জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া উঠে। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িতেছে, যে চিন্তাস্রোত ভারতসাগরে জন্ম লাভ করে, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরে ও অতলান্তিক মহাসাগরে আলোড়ন তুলিয়া থাকে। সেই জন্য একটা জাতি ‘ওচলারচনের’ বন্ধনের মধ্যে



থাকিয়া আপনাকে বিকশিত করিবে, মুক্ত আলোক ও মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসিবে না, অথচ পূর্ণতার দিকে চলিতে থাকিবে ইহা ধারণা করাই ভুল। সাহিত্যে যাহারা “সংরক্ষণ নীতি” ( Policy of protection ) অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহারা কোন দিনই বৈদেশিক সাহিত্যের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলেন না কিম্বা তাহারা সাহিত্যের একটা গতবৃগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী নহেন, তাহাদের কথাটা কিছু অন্য প্রকারের। তাহারা ইহাই বিশেষ করিয়া বলিতে চান যে বৈদেশিক প্রভাব থাকে থাকুক আপত্তি নাই কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব যাহা, যে বিশেষত্ব এতকাল পর্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা যেন বৈদেশিক প্রভাবে চাপা পড়িয়া না যায় ইহাই “প্রকৃত সংরক্ষণ নীতি”।

কোনও দেশের সাহিত্য—সেই দেশবাসীর জাতীয়তাকে অভিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, সেই দেশের সভ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সাহিত্যের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে, সাহিত্যের ধারার সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা মিলাইয়া দেখিলে এই সত্যই আমরা দেখিতে পাই। বিখ্যাত সমালোচক Hudson সাহেব বলিয়াছেন যে ‘Literature is the progressive revelation age by age of a nation’s mind and character।’ একটা জাতির চরিত্র ও মনের ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তি হইল সেই জাতির সাহিত্য। কোনও একজন লেখক সেই দেশের অন্যান্য লেখক হইতে বিভিন্ন হইতে পারেন সন্দেহ নাই, একটু তলাইয়া দেখিলে একটা কথা ধরিতে পারা যায় যে নানা প্রকার বৈষম্য থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে তিনি সেই দেশের অন্যান্য লেখকদের সহিত এক পংক্তিতে বাসিয়া আছেন। তাহার জীবনের আদর্শ, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ধ্যান ধারণা সেই দেশের অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধারণার সঙ্গিত তীর্থ সলিলে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অনেকেই Greek spirit এবং Hebrew spirit এই দুইটা কথা শুনিয়াছি। Greek spirit বলিতে এই বুঝায় না যে সকল গ্রীকই একই চিন্তা করিত, অমুভব করিবার মাত্রা তাহাদের একই প্রকারের ছিল। Greek spirit এবং Hebrew spirit এই কথা দুইটির দ্বারা ইহাই নির্দেশ করা যাইতেছে যে একজন মনুষ্যের সহিত অপর একজন মনুষ্যের ব্যক্তিগত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বার দিলে প্রত্যেক গ্রীকের মধ্যেই এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলি গ্রীক-চরিত্রের আছে। এই ভাবে জাতীয় চরিত্রের একটা সাধারণ স্তর ব্যক্তিনির্দেশে সেই জাতির সকল ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা সকল সময়েই Grecian Cut এবং Mongolian Cut প্রভৃতি কথা মনুষ্যের মুখাকৃতি সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়া থাকি। মনুষ্যের আকৃতি সম্বন্ধে এই জাতীয়ত্বের কথাটা যেমন সত্য, সাহিত্যের সম্বন্ধেও তেমন সত্য।

ইংরাজি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা আলোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবে ইংরাজি সাহিত্য গঠনে কাজ করিয়াছে—কিন্তু কোন দিনই ইংরাজি সাহিত্য বিদেশী সাহিত্য হইয়া পড়ে নাই। ইংরাজ জাতির সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে আধ্যাত্মিক নৈতিক রাজনৈতিক উন্নতির ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্তমান রহিয়াছে। ইংরাজ জাতির জীবন, জীবনের আদর্শ, ইংরাজ জাতির আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া কোন দিনই ইংরাজি সাহিত্য আপনাকে গড়িতে পারে নাই। আদিকবি চশারের যুগ হইতে কবি টেনিসনের যুগ অবধি ইংরাজি সাহিত্য ইংলণ্ডের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। চশার ফ্রেঞ্চ সাহিত্য ও ইতালীয় সাহিত্য দ্বারা প্রভূত পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু চশারের কৃতিত্ব সেইখানেই—যেখানে তিনি দেশের খাঁটি ভাবগুলির ও দেশের চরিত্র-গুলির ধাবণ আকার প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কীর্তি Canterbury Tales ও Prologue এর

মত কবিতা রচনায়; Book of Duchess এর মত বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে। দ্বিতীয়তঃ এলিজাবেথের যুগ। এলিজাবেথের যুগ যে ইংরাজ সাহিত্যের সভ্য যুগ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তখন চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সমাজের প্রত্যেক শিরা উপশিরায় নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল। এই যুগের সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল Shakespeare এর নাট্যাবলীতে। Shakespeare এর সর্বতোমুখী প্রতিভা ইংলণ্ডের ইতিহাস কিম্বা ইংরাজ জাতির তৎকালীন জীবনের আদর্শকে কি ভাগ্য করিতে পারিয়াছিল? তাহার প্রায় প্রত্যেকখানা নাটকেই দেশের এবং জাতীয়ত্বের এমন একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে—যে ছাপটা সকলেরই চোখে পড়ে এবং আমাদের সামনে তুলিয়া ধরে। এলিজাবেথের যুগের যথার্থ ইতিহাস—এলিজাবেথের যুগের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস জাতীয় জীবনের অননু-ভবনীয়—ক্ষুণ্ণ ইতিহাস। এই ভাবে আমরা দেখি ইংরাজ সাহিত্যের প্রত্যেক যুগের ইতিহাসের সঙ্গে তখনকার লোকের জীবনের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও ধারণার একটা প্রকাণ্ড যোগ রহিয়াছে। ভারতের সাহিত্যের ও ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা ছোটকাল হইতেই একটা গল্প শুনিয়া থাকি যে কোন একজন সাহেব বলিয়াছিলেন যে “Indians are born Philosophers” অর্থাৎ কিনা ভারতের লোক জন্ম হইতেই দার্শনিক হইয়া উঠে। কথাটা সাহেবপ্রবর যে ভাবেই বলিয়া থাকুন ইহা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতার জাতীয়ত্বের মূলমন্ত্র। এই কথাটার সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে। ভারতের সভ্যতা কি চিরদিনই জগতের নখরতা ও পার্থিব বস্তুর অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে! শঙ্করের “মায়াবাদের” ব্রাহ্ম ব্যাখ্যা কি ভারতের আধ্যাত্মিকতার নামাস্তর মাত্র? ভারতের জীবনের আদর্শ কোনও দিনই ইন্দ্রিয়কে উড়াইয়া দেয় নাই, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়াছে মাত্র—যেন উহা আত্মার পূর্ণ পরিণতির বিষয় হইয়া না দাঁড়ায়। “কার্যাতঃ সকল ক্ষেত্রেই সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, তাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধি-স্থাপন ইহাই ভারতের সনাতন সাধনা।” ভারতের সাহিত্য ও চিত্রকলা চিরকালই এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। এই আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখাই সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য এবং তথাকথিত “দেশাত্মক গুণিব্যাধিগুণ” সাহিত্যিক-গণের চেষ্টার স্থল।

আমাদের দ্বিতীয় কথা হইল যে বাহ্যিক সংরক্ষণ-নীতি-পন্থী তাহার কি গত বৈষ্ণবযুগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী? বৈষ্ণবধর্মের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সম্বন্ধ কি? বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম ক্ষুণ্ণতার সময় দেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য ছিল। বৈষ্ণবধর্মের প্রেমবন্যা বাংলাদেশ প্রাবিত করিয়াছিল সেই জন্য সে সময়ে যে সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল তাহাতে উক্ত ধর্মের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম যে তত্ত্ব দেশে প্রচার করিয়াছে সেই তত্ত্ব এই দেশবাসীর কানে নূতন শুনায় নাই। সাময়িক পরিবর্তনের প্রভাবে তাহার এই তত্ত্বগুলি কুলিতে বসিয়াছিল আবার সময়ের অচিন্তনীয় প্রভাবে তাহার আবার এই ধর্মের আদর্শকে প্রাপণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ভারতের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এই বৈষ্ণবধর্মের উপদেশাবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে জীবন-দেবতার আবাহনে পূজনে আমরা বৈষ্ণবধর্মের ছায়াপরিস্ফুট দেখিতে পাই। মানবাত্মার সঙ্গে পরমপিতার সম্বন্ধটা বৈষ্ণবদের চোখে অনেকটা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সম্বন্ধের মত। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার সঙ্গে “আমার” সম্বন্ধটা অনেকটা বন্ধুত্বের মত। বৈষ্ণবকবিগণ ও রবীন্দ্রনাথ একই প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন মাত্র। একটা কথা এইখানে বলিতে হইবে রসের দিক হইতে বৈষ্ণবকবিগণের

যে ভাষাবোধ রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। যাহাটাই হউক আমাদের বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথই বলি আর বৈষ্ণবকবিদের কথাই বলি, তাঁহাদের কাব্যে যে সুর ঝঙ্কত হইয়াছে সে সুর ভারতের চিরন্তন সুর, এই সুর যে শুধু বসুনাতেই উন্নত বহিয়াছে তাহা নহে—সমস্ত বাংলার জ্বরে যে ভাবের গঙ্গা অগ্ৰে তাহাতেও প্লাবন আনিয়াছে। তাই এই বাহারী বৈষ্ণব যুগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাহাদের উদ্দেশ্য একটা গন্তব্যকে ফিরাইয়া অনা নহে, বৈষ্ণব কবিতার প্রাণহীন অমুকরণ নহে, যে আদর্শ যে ভাব বৈষ্ণবকবিগণকে অমুপ্রাণিত করিয়াছিল সেই আদর্শের সেই ভাবের সাধনা।

এই বাংলাদেশের উপর দিয়া কত পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে ২০০ শত বৎসর অবধি একটা বিদেশীয় জাতি তাহাদের অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তথাপি আজ আমরা উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালী আপনায় বাঙ্গালী হারায় নাই বাংলা সাহিত্য নিজের আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই। আমাদের সাহিত্য দেশবিদেশে পরিচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভিমানী পাশ্চাত্য জাতিকে যে কথা শুনাইয়াছেন তাহাতে ভারতের সনাতন কথাই বেশী—। ভারতবর্ষের বাণী জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনার মধ্য দিয়া বিংশশতাব্দীর নবসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বিশ্বমানব-পরিষদের প্রথম সভায় ব্রজেন্দ্রনাথের আস্থানে বাঙ্গালী চিন্তাবীরের চিন্তার কথা শুনবার জন্য পাশ্চাত্য জগতের ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। “বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একই ভাবের ভাবুক, একই মস্তের ডগ্গা, একই বাণীর প্রচারক।” তাহার প্রচার করিয়াছেন ভারতের সনাতন বাণী আর তাহার গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন—আমাদের “স্বদেশী সাহিত্যের” দেহ।

শ্রী অশ্রমান দাশ গুপ্ত।

## কবি ও ব্যাধ।

—(—\*)—

কবি। হে নিষাদ, প্রাণ লয়ে কর তুমি খেলা  
কি দুরন্ত বাবসায়। কবি তাপসের  
অভিশপ্ত জীব তুমি।

ব্যাধ। অভিশাপ আনে প্রেমধারা, অভিশাপে  
নেমে আসে স্বরগের প্রীতি-মন্দাকিনী।  
অভিশপ্ত আমি, তাই এসেছে ধরায়  
ক্যাবের অমৃতনদী পুণ্য ভাগীরথি।  
তুমি কি বুঝিবে কবি ওগো চিত্রকর  
মৃগয়ার আনন্দ অপার? কেশরীর

গর্বিত গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার ভীম,  
বন্য ঘোটকের হেঁষা, হস্তীর বৃংহণ,  
বিচিত্র প্রলয় ছন্দ ! বুঝিবে কি করি ?  
কথার কন্দুক ক্রীড়া লয়ে থাক তুমি  
গাবে কিসে বন্ধকোর আনন্দের ভাগ !  
প্রাণের অব্যবসায়ী, মরা প্রাণ লয়ে,  
কর খেলা, কি কৃতিত্ব কি আনন্দ তাহে !

কবি । চপল নিষাদ কেমনে বুঝিবে বল  
কৃতিত্ব আমার । আনন্দের সৃষ্টি করি,  
সৌন্দর্যের বৃষ্টি করি আমি, তুমি তোল  
ক্রন্দনের ধ্বনি । মোহিনী তুলিকা মোর  
মুতেরে জিয়ায়, তব শর হরে প্রাণ ।  
অশ্রুত-বাসতা আনন্দ সন্দেশ আনি  
পূর্ণ করি ধরার ভাণ্ডার, তুমি শুধু  
দীনা কর প্রকৃতির রমা বনস্থলী ।

নিষাদ । ক্ষম চপলতা, সত্য তুমি সৃষ্টিকর  
সৃষ্টি কয়ে আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ কারাগার ;  
ধরায় অতলস্পর্শ দুঃখ সরোবরে  
বেঁধে রাখ নয়নের জলে । অশ্রুতেই  
আনন্দ তোমার, বিষাদ তোমার খাদ্য ।  
নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! সদয় হৃদয়হীন !  
মরমের কাতরতা পরাণের ক্ষত  
শুকাতে দাও না তুমি । কর নিত্য  
কলঙ্কে অমর । তুমিই বর্জিত কর  
স্মৃতি পুরুষজ্ঞে । কে কোথায় কোন দিন  
প্রেমের আস্থানে কর্তব্য করেছে হেলা,  
কোন যুগে কেবা চলেছে বিপথ পথে,  
তুমি শেখ নাই ক্ষমা, বন্দী কর তারে  
ধরণীর কলঙ্কের প্রদর্শনী গৃহে ।

কবি । আমার বাঁধন, ফুলের বন্ধন সে যে  
সোহাগের আনন্দের অমৃতের বাঁধ ।  
বাধা হীন ব্যথা হীন সৌন্দর্য্যের কারা ।  
তুমি বধ, সারস শাবকে সারসীর  
স্নেহ-ক্রোড়ে, কপোতীর শান্ত প্রেমনোড়ে  
বধ কপোতেরে । স্নেহহীন প্রেমহীন  
হৃদিহীন তুমি ।

নিষাদ । তুমি কবি আরও ক্রুর অধিক নিশ্চয়  
সতীকে বিধবা কর, পুত্র শোকাতুরা  
কর জননীকে, শুধু আনন্দের লাগি ।  
কি বিকট নিষ্ঠুর পুলক । তুমি শুধু  
সৌন্দর্য্যের দেবতার পায় দয়ামায়া  
দাও বিসর্জন । আদর্শের যুগকাষ্ঠে  
নিত্য তুমি দাও নরবলি । দেশভক্তি  
পতিভক্তি ঈশ্বরের নামে তুমি কবি  
প্রাণ চাও শুধু । করাল চামুণ্ডা সম  
শোণিতের ভূখা তুমি, প্রাণের পিয়াসী ।  
প্রচণ্ড কৌশিক সম চাও দিবানিশি  
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা । তুমি কবি দিবানিশি  
প্রাণ নিয়ে কর হেলা ফেলা ।

শ্রীকুমারজন মল্লিক ।

## মিষ্টি সরবৎ ।

—:~:—

( ১ )

রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত তুফানী বাদীকে লইয়া তাস খেলিয়া, ছই নন্দ ভাজে মনের উল্লাসে খোস গল্প  
করিতে করিতে এ ঘরে এক বিছানার গুইয়াই হুজনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল । আমিনার স্বামী—আহম্মদ সাহেব  
ভাঁহার দাওয়াইখানার কাজ লইয়া রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাহির মহলে বাস্ত ছিলেন, তারপর তিনি কখন অন্তরে  
আমিনা ভাঁহার দক্ষিণ মহলে শয়ন কর্কে গিয়াছেন, আমিনা কিছুই জানে না । সে পশ্চিম মহলেই আত্মজাগ

ইনেব বিবির শয়ন কক্ষে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। ইনেব আসিয়া অবধি আজকাল আমিনার অধিকাংশ সময় এইখানেই কাটে। আমিনার বয়স বছর ষোল, ইনেব তার চেয়ে বছর থানেকের ছোট।

হঠাৎ ছড়্‌ ছড়্‌ শব্দে বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তুফানী বাঁদী আমিনাকে সজোরে ঠেলিয়া ব্যস্ত ভাবে ডাকিল “আমিনা বিবি, আমিনা বিবি,—ওঠো ওঠো, ও মহলে চল—ছোট মিক্রা বাড়ী এসেছেন!”

ধড়্‌ মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঘুম চোখ রগড়াইয়া আমিনা সবিস্ময়ে বলিল “কে এসেছে,—দাদা?”

তুফানী বলিল “হ্যাঁ গো—মিক্রা এ ঘরে আসছেন, তুমি শীগ্ৰী ও-মহলে চল—”

এই,—“ও-মহলে” আমিনাকে পাঠাইবার জন্য তুফানী প্রতিদিন রাতেই এমনি করিয়া আচম্কা আমিনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া শশব্যস্তে তাড়াহুড়া লাগাইয়া দেয়!—তুফানীর এই নিদারুণ বদ্‌ অভ্যাসটার জন্য নিদ্রালস আমিনা তাহার উপর আন্তরিক চটিয়া যায়,—কিন্তু তা বলিলে কি হয়? দাওয়াইখানার কাজ সারিয়া আহম্মদ সাহেব ঘরে আসিলেই, তুফানীর টনক্‌ নড়িয়া যায়,—কোন একটা আশ্চর্য্য ঐক্সকালিক ক্ষমতা প্রভাবে তুফানী তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করিয়া বসে—ভাতার সাহেবের আলমারীর চাবির প্রয়োজন, অথবা অন্য কিছু প্রয়োজন,—অতএব আমিনা বিবির ও-মহলে যাওয়া চাই!—এমনি করিয়া প্রতিদিন, রুমাল হারানো, পানের ডিবা হারানো,—নিদেন পক্ষে নসোর কোটা খুঁজিয়া না পাওয়ার সংবাদটা তো তুফানী বহিয়া আনিবেই!—এবং আমিনাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া তো,—ও মহলে রাখিয়া আসিবেই! আমিনার স্বথময় নিদ্রাটুকু না ভাঙ্গাইলে যে তুফানী-শকুনীর কিছুতেই স্বস্তি হয় না!

কাজেই—দাদার আগমন সংবাদ সহ,—‘ও মহলে’ বাইবার তাড়াটা এক্ষেপে তুফানীর নিকট পাঠিয়া, আমিনা একটু সংশয়ান্বিত হইল, ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া বলিল “দাদা সত্যি এসেছে? কই কোথা?”

তুফানী ব্যস্ত হইয়া বলিল “ঐ বারেওয়া জুতার আওয়াজ, তুমি ওঠো ওঠো—পালাও জল্দা—” কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই তুফানী নিজেই মাথায় কাপড় টানিয়া অন্য দিকের দ্বার দিয়া পলাইল! সম্ভ্রান্ত গৃহের আদব-কারদা ছরস্ত প্রথাহুসারে, প্রভু-পরিবারের পুরুষগণকে বাঁদীরা যথেষ্ট সম্মানের সহিত সমীহা করিয়া চলে। বিনা প্রয়োজনে সচরাচর সামনে বাহির হয় না।

বারেওয়া সতাই জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। এ মহলে এত রাতে দাদা ছাড়া আর কেহই যে জুতার শব্দ করিতে পারেন না,—সে সম্বন্ধে আমিনার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, কাজেই ব্যস্তভাবে গায়ের কাপড় টানিয়া আধ-জাগস্ত ইনেব বিবিকে একঠেলার পুরা-জাগস্ত করিয়া, দাদা আসার সংবাদ জানাইয়া, তাড়াতাড়ি আমিনা খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িল। ইনেব মাথায় কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া খাটের একপাশে উঠিয়া বসিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুন্সী আবুল সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। দৃষ্ট পৃষ্ট সুদীর্ঘ আকৃতির সুপুরুষ বৃদ্ধ তিনি,—স্বভাব পুষ শান্ত নিরীহ ধরণের। সংসারের ভালমন্দ কিছুতেই বিশেষ আসক্ত নন,—আটশষ নিজের পড়াশুনা, শিকার-খেলা ও কুস্তি লড়াইয়া দিন কাটাইতেছেন। সংসারের অন্য কোন বিষয়ে বড় একটা চোখ কান দেন না, সকল বিষয়েই প্রসন্ন অথচ সকল বিষয়েই একটু নির্লিপ্ত গোছের মানুষ!—সেই জন্য অনেকেই,—বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ-স্বজন্‌ ছোট ভগ্নিপতি মহাশয়—অর্থাৎ আহম্মদ সাহেব তাঁহাকে নিরেট আহাম্মক্‌ বলিয়া সম্মান অভিনন্দন জানাইয়া থাকেন। অবশ্য আবুল সাহেব তাহাতে বিদ্‌মাত্রও কাতর নন, বিশেষতঃ ও সকল বিষয়ে খেলা

রাখিবার এতদিন তাঁহার অবসর ছিল না—বি-এল, পরীক্ষা লইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন ! সম্প্রতি পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ।

আমিনাকে ব্যস্তভাবে খাটের উপর হইতে নামিতে দেখিয়া অগ্রজ সোনার চশমার ভিতর হইতে প্রসন্ন মেহম্মদ দৃষ্টি তুলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন “কিরে আমিন্,—”

একটা ছোট খাটো কুর্নিশ করিয়া আমিনা স্মিতমুখে বলিল “তুমি কখন এলে, জী ?—”

হাতের ছড়িটা যথা স্থানে রাখিয়া জামা খুলিতে খুলিতে—আব্দুল উত্তর দিলেন “প্রায় আধ ঘণ্টা থানেক হবে—”

‘আমিনা সবিস্ময়ে বলিল “আধ ঘণ্টা !—দেখলে, কেউ এতক্ষণ আমাদের উঠিয়ে দেয় নি—”

আব্দুল বলিলেন “আমি আহম্মুর ঘরে বসে কথা কইছিলুম—হ্যাঁ, আহম্মু বলে বটে, যে ওরা রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে তাস খেলে ঘুমিয়ে গেছে—”

আমিনার মুখ স্নান হইয়া গেল ! হায়, তাহার এই ভক্তিজাজন অগ্রজটির কাছে তাহার নামে এরই মধ্যে এত বড় দোষাবহ অভিযোগ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে !—দাড়া তাস খেলাটা অত্যন্ত অপছন্দ করেন, আহম্মদ সাহেব তাহা খুব ভাল করিয়াই জানেন,—তবুও এ কথাটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া—এ ত নিছক-দুস্মনী করা ছাড়া আর কিছুই নয় ! আমিনা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রাণপণে মুখ চোখ ঝগড়াইয়া পরিস্কার করিতে ব্যস্ত হইল ।

আব্দুল তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটু স্নেহাদর-মিশ্রিত আগ্রহের স্বরে বলিলেন “আহা, তোর ভারী ঘুম পেয়েছে, না ?—তা তুই এইখানেই ঘুমো না আমিন্, আমি ও-ঘরে আহম্মুর বিছানায় গিয়ে শুচ্ছি—”

সলজ্জ স্মিতমুখে চোখ মুছিতে মুছিতে আমিনা বলিল “না না, তুমি এইখানেই শোও—” বলিয়াই দ্বিতীয় বাক্যের প্রতীক্ষা না করিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল । আব্দুল বলিলেন “ওরে কে আছে ওখানে, এক গেলান খাবার-জল দিয়ে যেতে বল তো—”

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “বরেই জল রয়েছে, আমি দিচ্ছি—”

কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া আনিয়া দাঁদার হাতে দিয়া, আমিনা বলিল “পান চাই ? সেজে এনে দেব ?—”

আব্দুল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন “না না ; আমার কাছে কেনা পান আছে, বেশ ভাল মিঠে পান,—তুই বয়ং নিয়ে যা,—” বা হাতে জামার পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া আমিনার সামনে খুলিয়া ধরিয়া আব্দুল বলিলেন “অনেকগুলো আছে, তোর য’টা খুসী নে ।”

আমিনা হাসিমুখে একটা পান তুলিয়া লইয়া, পুনশ্চ আর একটা লইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে ভাজের হাতে শুঁজিয়া দিয়া ক্রত প্রস্থানোদ্যত হইল,—আব্দুল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “ওরে ওরে আমিন দাঁড়া, আমি আহম্মুকে পান দিয়ে আস্তে ভুলে গেছি, তুই দুটো নিয়ে যা—”

আমিনা দাঁড়াইয়া পড়িয়া, কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু একপস্থলে সঙ্কোচ প্রকাশ করা অধিক-তর সঙ্কোচের কাজ !—আব্দুল বুঝিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া ডিবা হইতে পান তুলিয়া, নিঃশব্দে ভগিনীর হাতে দিয়া ফিঙ্গিয়া আসিয়া জলের গ্রাশটা মুখে তুলিলেন ; আমিনা চোখ কান বুজিয়া, লজ্জারক্ত মুখে পলায়ন করিল !

বনিয়াদী মুসলী পরিবারের এই সুবহৎ অট্টালিকাটি প্রায় নবাবী আমলের কেতায় নিখিত । এক সময় ইহার বিপুল ধনশালী ছিলেন, এখন সরকারগণের সহিত ভাগাভাগি করিয়া পৃথক হইয়াছেন । ব্যালেক্সিয়ার উপক্রমে পল্লী

ছাড়িয়া, হালিসতরে গঙ্গার ধারে আবলু সাহেবের পিতা এই অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া—শেষ জীবনটা এইখানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। মফঃস্বলে নান্যস্থানে ইহাদের জামদারী আছে, তাহার আয় প্রায় পঞ্চাশ, ষাট হাজার টাকা; আবলু সাহেব পিতার একমাত্র পুত্র,—ভগিনী দুইটির মধ্যে আমিনা তাঁহার ছোট, আয়েসা বিধি বড়। তাঁহার স্বামী রহমান সাহেব ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, স্তত্রাং ভববুরে বৃত্তি লইয়া পরিবারবর্গসহ তিনি প্রায়ই দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। মরমের ছুটি উপলক্ষে শীত্ৰহ তাঁহারা দেশে আসিবেন—এইরূপ কথা আছে।

( ২ )

আমিনার স্বামী আহমদ সাহেব—ইহাদের কোন মৃত আত্মীয়ের সন্তান। আবলুর পিতা, ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তারপর নোডকেল কলেজ হইতে শাস করিয়া বাহির হইয়া আসিলে,—তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, এইখানেই বাটীসংলগ্ন যথাপযুক্ত নূতন মহল নির্মাণ করাইয়া কন্যা জামাতাকে বাসের জন্য দান করিলেন। দুই বছর হইল আহমদ সাহেব এখানে ব্যবসা করিতেছেন। শ্বশুর বহুর থানেক হইল আবলুর বিবাহ দিয়া সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।

পাশাপাশি পাঁচখানা ঘর ও স্নানাগারের পাশ দিয়া সুপ্রশস্ত লম্বা বারেণ্ডা পার হইয়া, আমিনা নূতন মহলে—অর্থাৎ দক্ষিণ মহলের বারেণ্ডায় আসিয়া পৌছিল। ভূফানী বাদী দুধারের সামনে দাঁড়াইয়াছিল। আমিনাকে ঘরে বাহ্যে ইঙ্গিত করিয়া সে নিঃশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বারেণ্ডার অন্যদিকে, সদরে নামিবার সিঁড়ির দুয়ারটা তত্পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবু শয়নকক্ষে ঢুকিবার পূর্বে আমিনা একবার সেদিকটায় চাহিয়া দেখিতে ভুলিল না,—তারপর ক্ষিপ্ৰলম্বচরণে নিঃশব্দে ঢুকিয়া পড়িল।

স্বামী তখন টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া আলোর সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া, একটা টাটকা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমিনা ঘরে ঢুকিতেই অনামনস্বভাবে কাগজ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহলেন,—তারপর তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। আমিনা তাহার দিকে আজ দৃকপাত করিল না,—তবে পান দুটা ত্রো দিতে হইবে, তাই গম্ভীর মুখে ডিবাটার সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু টেবিলের উপর ডিবাটা পাওয়া গেল না, অগচ মুখ ফুটিয়া সে কথটা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না, যেহেতু—আজ সেই ‘তাসখেলার’ কথা লইয়া মনটা তাহার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উফ হইয়া আছে। কাজেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে, সশব্দে ছটপাট্ করিয়া চারিদিকের জিনিসপত্র সরাইয়া নড়াইয়া অন্তর্হিত ডিবাটার প্রচুর খোঁজ করিয়া শেষে বিছানার উপর হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। অন্য কেহ হইলে পান দুটা দিবার জন্য সে কখনই ডিবাটার এত খোঁজ করিত না, টেবিলেই নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিত,—কিন্তু ঐ স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ নান্দুটির ‘করুণা’ যে অনেক! যেখানে সেখানে খাবার জিনিস দিতে দেখিলেই,—উনি তৎক্ষণাত্ আতঙ্কেই অস্থির হইয়া পড়িবেন কি না!—কাজেই দায়ে পড়িয়া আমিনা সদা সতর্ক হইয়া চলে।

ডিবাটা আনিয়া অনাবশ্যক শব্দসহকারে সজোরে ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিয়া—বিনাপ্রশ্নেই আমিনা সংবাদ জ্ঞাপন করিল—“দাদা পান খেতে দিলে, কল্‌কাতা থেকে এনেছে,—মিঠা পান—”

কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া, স্মিতমুখে স্বামী বলিলেন “মিঠা পান? ও, কিস্মতের জোর খুব,—দাঁড়াও আমিনা, শোন—”

আমিনা চলিয়া যাইতেছিল, আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত গাভীরোঁয়ের সহিত বলিল “কি?—”

আহমদ একটু বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া, বলিলেন—“বল্ছি কি,—দাদা যখন ভালবাসা জানিয়ে পান দুটা দিয়েছে-ই,—তখন দাদার বোনের ডাচত—”



সজোরে মাথা নাড়িয়া প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতার সহিত আমিনা উত্তর দিল, “আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না !—কেন নিজের হাত ছাড়া তো রয়েছে—”

“রয়েছে বটে, কিন্তু নিজের স্বপক্ষে,—ও যে অকর্মণ্য হয়ে আছে !—ডাক্তারী কেতাবগুলো এখন ঘাঁট্‌ছিলুম,—জান তো ও-গুলোয় নাই হেন জিনিসই দুনিয়ায় নাই,—অতএব—”

স্বামীর কথা শেষ হইতে না হইতে, আমিনা কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া আনিয়া, পিক্‌দানিটা পায়ে করিয়া ঠেলিয়া ছয়ারের কাছে সরাইয়া দিয়া, খুব গম্ভীরভাবেই বলিল “গত ধোও—”

ইহার উপর আর তো তর্ক চলে না ! অগত্যা ভাল মাতৃবের মত তাও ধুইয়া,—পান চইটা মুখে পুরিয়া আহমদ একটু মোলায়েম স্বরে বলিলেন “আজ, কার গোলাম চোর হোল আমিনা বিব, তোনার না আলুর বিবির ?”

“জানি না—” বলিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া আমিনা আগার ফিরিয়া দাঁড়াইল,—“জানি না” বলিয়া সাফ জবাব কাড়িয়া দিলেও, স্বামীকে যৎকিঞ্চিৎ ‘জানাইয়া’ না দিতে পারিলে আজও বেচারার ঘুমান্না স্বস্তি হইবে না !—কিন্তু কেমন করিয়া সে কি বলিবে,—মনের ভাঙারে তাহার বিশেষ কিছু গোচ-গাছ পাওয়া গেল না ! রাগের গোটে সেখানে আজ সবই ছড়ুল !—ক্ষণিকের জন্য গুম্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিমানসঙ্কল দৃষ্টি তুলিয়া একটানা ছন্দে ক্রতঘরে বলিয়া ফেলিল “তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কয়ো না, কাল থেকে আমার আমিনা বলে ডেকো না, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ?—”

ভিতরের উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে আহমদ সাহেবের ফুসফুস ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল ! কিন্তু জাঁর রাগের সময় স্বামীর পক্ষে হাসাটা যে একান্ত সহ্যত্বাত্মক হইবার লক্ষণ, আমিনা ইতিপূর্বে সেটা তাঁহাকে বারবার স্বরণ করাইয়া দিয়াছে, কাজেই চক্ষু লজ্জার দায়ে হাস চাপিবার জন্য,—চেয়ারের পাশে মুখ ফিরাইয়া খুব খানক-ক্ষণ ধরিয়া থক্‌ থক্‌ করিয়া কাশিয়া লইয়া শেষে রুমালে মুখ মুছিয়া, গম্ভীর ভাবে গৌকে তা দিতে দিতে বালিলেন “তা বেশ,—সম্পর্ক না থাকে, নেই, নেই, কিন্তু কথাটা—” থপ্‌ করিয়া উঠিয়া গিয়া চক্ষের নিম্নে আমিনার হাত দুইটা ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে বালিলেন “কথাটা কি বন্ধ করে থাকা যায় ?—বিশেষ,—এক ঘরে যখন ঘর করতে হচ্ছে—”

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানটানি করিতে করিতে আমিনা গৌজ গৌজ করিয়া অক্ষুট স্বরে বলিল “বেশ, বেশ, কাল থেকে আমি অন্য ঘরে ঘর করতে যাব,—ঐ পাশের ঘরটা তো পড়ে আছে, কাল থেকে ঐ ঘরে তুফানীকে নিয়ে—হাত ছাড়—”

হা—হা শব্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া, আহমদ সাহেব সকেতু ক বলিলেন “তোবা, তোবা, তোবা !—আমার সঙ্গে তফাৎ হয়ে অন্য ঘরে ঘর করতে যাবে—শেষে তুফানীকে নিয়ে !”

আমিনা কথাটার মতামত অর্থ বিশেষ কিছু তলাইয়া বুঝে নাই, বুঝিলও না !—চল্ চল্‌ দৃষ্টিতে চাটিয়া কহু কঠে বলিল “তা কি করব ? তোমার মত লোকের সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখ্‌ছি না, তা বলে ! তুমি কি না দাদার কাছে আমার নামে চুক্‌লি কাটতে গেলে ! আচ্ছা—” প্রায়টা ঝিঝাঝা করিতে গিয়া দারুণ অভিমানের বাথায় আমিনার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল !—টোক গিকিয়া আবেগ দমন করিয়া—বলিল “আচ্ছা আমরা যে রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে তাস গেলাছি,—তুমি সে নিজের চোখে দেখেছ ? না, আমরা যখন তাস খেল্‌ছিলুম, তখন যে টং টং করে বারোটা বেজে গিয়েছিল, সে তুমি নিজের কানে শুনেছ ?”

এতক্ষণের পর এই চিকিৎসা ব্যবসায়-ত্রস্ত ভদ্র লোকটির ঠাহর হইল,—বর্তমান বিদ্রোহ ব্যাধির মূল কি ? বিপন্ন হইয়া দাড়ি চুলকাইয়া, একটু ইতস্ততঃ কারিয়া তান উত্তর দিলেন—“না, নিজের চোখ কান, তখন ডাক্তার-খানার রোগীগুলিকে নিয়ে জখম হয়েছিল, ওগুলোর ভরসা কি করতে পারি—”

“তবে দাদার কাছে চুক্‌লি কাটতে গেলে কেন ? আমি তোমার নামে কারুর কাছে কিছু বলতে যাই ? না তোমার ঐ দাওয়াইখানার নামে কারুকে কিছু বলতে যাই ? তুমি কিসের জন্যে এমন দুস্মনী স্বরু করেছ বলতো—”

স্বামী একটু অদরের সহিত তাহার কটিবেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন “আহা অত চটে কেন আমিনা, শোন না বলছি, বসো,—”

আমিনা তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “না আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে, তোমায় কিছু বলতে হবে না,—তুমি এবার থেকে আর আমার সঙ্গে কোন কথা কোয়ো না বুঝলে—” আমিনার চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিইয়া বিছানার গিয়া আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া সে গুইয়া পড়িল।

আর তো ঘটান চলে না ?—আহমদ সাহেব নিতান্ত উদাসীনোর সহিত একটু হাসিয়া “বেশ—বহুৎ আচ্ছা—” বলিয়া খবরের কাগজখানা তুলিয়া তাগাতে পুনরায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলেন।—কিন্তু জগৎপরেই শয্যাশায়িতা আমিনার দিকে চাহিয়া, তাঁহার অধরপ্রান্তে নিঃশব্দে একটু নষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল,—কাগজে আর মন লাগিল না !

( ৩ )

পরদিন বেলা সাড়ে সাতটার সময় বালক ভূতা রস্তমের ডাকাডাকি শুনিয়া আহমদ সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল ; আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোপ মেলিয়া ঘাড়ের দিকে চাহিয়া খড়্‌মড়্‌ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—কি মুশ্বল ! এতখানি বেলা হইয়া গিয়াছে আমিনা তাঁহাকে উঠাইয়া দেয় নাই, এতক্ষণে রস্তম আসিল ঘুম ভাঙ্গাইতে !

বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—আমিনার চিহ্ন নাই ! ভোর ছ’টায় ঘুম ভাঙ্গা তাহার অভ্যাস। প্রতিদিন বিছানা ছাড়িয়া যাহবার পূর্বে সে স্বামীকে জাগাইয়া দিয়া যায়,—আজ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে নিঃশব্দে পালাইয়াছে !

মনে পড়িল,—কাল রাত্রে আমিনা রাগ করিয়া কথা বন্ধ করিয়াছে এবং তিনিও সেইজন্য একটু রাগ দেখাইবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ অবধি জাগিয়া কাগজ ও কেতাব ঘাঁটিয়া তবে সন্ধ্যার চিত্তে ঘুমাইতে গিয়াছিলেন !—কিন্তু সব ব্যর্থ ! হায়রে কিসমৎ ! আমিনা অক্ষত চিত্তে ঘুমাইয়া, নির্দোষে প্রত্যাষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে,—আর তিনি কি না জরুরী কাজ কর্ম ফেলিয়া, পড়িয়া পাড়িয়া অকাতরে সকালবেলা ঘুমাইতেছেন ! হস্তোত্তর,—আমিনাকে জঙ্গ করিতে গিয়া, শেষে জঙ্গ হইলেন কি না তিনি নিজেই ! হায়, এ লজ্জার কথা যে কাহাকেও বলিবার নয় !

নিঃশব্দেই চিকিৎসক মহাশয়ের ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ভূতাকে বলিলেন “বেমারীলোগ্ কেই আয়া রে ?—”

ভূতা বলিল “নেই জ্বর, ফংজুসে পাণ বন্ধ থাকে যো—”

আহমদ সাহেব জানালা দিয়া বাহিরে দিকে চাহিলেন, তাইত বটে, কিম্ কিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সারা আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন!—এই বৃষ্টিতে-রোগীরা কেহ যে আসিয়া, ফিরিয়া যায় নাই, ইহাতে তিনি মনে মনে যথেষ্ট আশ্রম অনুভব করিলেন। ভৃত্যকে আদেশ দিলেন “কোচম্যান্কে বোল দেও,—তিনঠো ‘কল’ হ্যায়, সারে আট বাজ্‌নে গাড়ী জোৎনা চাহিএ—”

“যো জুকুম খোদাবন্দ—” বলিয়া সে সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—আহমদ পুনশ্চ ডাকিয়া বলিলেন “এ রস্তম, খোড়া ঠাহ্‌রো বাচ্চা,—বিবিসা’ব্ কাঁহা রে ?—”

“পছিম্ মহল পর,—জনাব, বোলাবেজে ?—”

“নে হি—নেহি,” আহমদ হাসি মুখে বলিলেন, “তোম্ আপ্নে কাম্পন্‌ বাও—”

কৃত্য চলিয়া গেল। আহমদ সাহেব স্নানাগারে গিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান প্রভৃতি সারিয়া বাহিরে আসিয়া,—চারিদিক চাহিলেন, কোন মুস্তুকে আমিনার ছায়া মস্ত্র দেখিতে পাইলেন না! সে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রূপেই গা ঢাকা দিয়াছে।

যাহাই হউক, আমিনাকে উত্তমরূপে জল করিবার একটা অকাটা সত্বপায় মনে মনে উদ্ভাবন করিতে করিতে তিনি আসিয়া পোষাক কানরায় ঢুকিলেন। তারপর স্বচ্ছন্দ মুখে শীস্‌ দিয়া একটা উদ্‌ গান গাহিতে গাহিতে পোষাক পরিতে সুরু করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়ারের পর্দার পাশে পরিচিত হস্তের অলঙ্কার শিঞ্জন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল,—আহমদ সাহেবের কান দুইটা দস্তরমতই ‘উৎকর্ণ’ হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি যে, সেদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, সে ওখা পাছে অন্য কেহ টের পায়,—সেই ভয়ে তাঁহার শীসের গান,—তাল মান হারাইয়া বিষম বেতালে বেমানান সুরে অস্বাভাবিক উচ্চ শব্দে ধ্বনিত হইয়া,—সাহানা স্থলে ছায়ানট রাগের আবির্ভাব কারাইয়া বসিল! নিজের আবিবেচনা দোষে, তাঁহার সদ্যস্নাত সুন্দর সদাপ্রকৃষ্ট মুখখানা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল!—আয়নার সামনে কুঁকিয়া পড়িয়া মুখ আড়াল করিয়া, অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে গলায় ‘টাঠ’ বাঁধিতে বাঁধিতে—বিপন্ন ভক্ত-লোকটি, হঠাৎ শীসের গান ছাড়িয়া গুণ্‌ গুণ্‌ শব্দে গলার গান সুরু করিয়া দিলেন!—সে গানটা অবশ্য কোন হতাশ-প্রণয়ী কবির নিদারুণ ‘চাত-তোড়’ ব্যাপারের শোচনীয় সংবাদ লইয়া রচিত!

পর্দার বাহিরে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে উস্‌ থুস্‌ করিয়া আমিনা মুহূর্তে বলিল “চা এনেছি—ঘরে যাব ?”

সঙ্গীত ব্যস্ত আহমদ সাহেব সে কণায় কর্ণপাত করিলেন না, আমিনা আর একটু উঁচু গলায় ডাকিল—“জন্তে পাচ্ছ—আমি ঘরে যাব।—পর্দাটা সরিয়া দাও—”

এবার আহমদ সাহেবের সঙ্গীত সমের মাথায় ঘা খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল!—আমিনা গলা খাটো করিয়া বলিল “চা এনেছি—”

আহমদ নিরুত্তর!—আমিনা রাগিয়া বলিল “বেশ, থাক্‌ আমি চলুম!—”

‘এ্যা—হ্যা’ শব্দে কাশিয়া, যথাসাধ্য গ্রাস্তারী চালে গোঁফে তা দিতে দিতে, ধীরে-সুস্থে আসিয়া পর্দা সরাইয়া আহমদ সাহেব কি বলিতে গেলেন,—কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! আমিনা তৎপূর্বেই ক্ষিপ্তলম্বুচরণে বারেশা পার হইয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্বার করিয়াছে। আহমদ সাহেব অবাক্‌ হইয়া গেলেন,—কিন্তু আর তো চেঁচাইয়া উঠি গলায় ডাকাডাকি করা চলে না, হইলেই তো ‘খেলো’ হইয়া পড়িতে হইবে! অগত্যা হতাশ সুর চিত্তে করিয়া

আসিয়া, গায়ে ওয়েষ্টকোট চড়াইয়া বোতাম আঁটিতে লাগিলেন, শীসের গান, গলার গান, সমস্তই এবার সম্পূর্ণ নীরব !

মিনিট তিনেক পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আবলু সাহেব চা'য়ের কাপ ও প্লেট হাতে লইয়া 'ব'র ঢুকিয়া বলিলেন "চা—নে,"

আহমদ চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া সজ্ঞাতে বলিলেন "ইয়া আল্লা শেষে তুই চা আন'লি রে !"

তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সরল চিত্র আবলু সাহেব হঠাৎ থতমত খাইয়া গেলেন !—ক্ষণকাল—তাহার বাক্যস্মৃতিই হইল না ! মুঢ়ের মত চাহিয়া বলিলেন "আমি কি করব ? আমিন্ যে বল্লে !"

নিজের ব্যবহারে আহমদ নিজেই একটু অপ্রতিভ গম্ভীর ভাবে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার সরাইয়া দিয়া, "Thanks" বলিয়া চায়ের পাত্রটা টানিয়া লইয়া, ব্যস্ত ভাবে পান শুরু করিয়া দিলেন ।

আবলু চেয়ারটা দখল করিয়া—আহমদের মুখ পানে চাহিয়া একটু সন্দ্বিগ্ন-বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন "কি হয়েছে রে ?"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, আহমদ সজ্ঞারে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "কিছু না—"

আবলু একটু অমুরোধের স্বরে বলিলেন "বল না,—চাপস কেন, ঝগড়া করেছিস বুঝি ?"

আহমদ যেন সে কথা শুনেই পান নাই,—এমনি ভাবে, সহসা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন "কি বল্লেন জী ? আপনার বিবি সাহেবা পীড়িত ? ওহ, ডাক্তার চাই, বহুৎ আচ্ছা,—কিন্তু ফিএর টাকাটা যেন অগ্রিম পাই মশাই—" তিনি চায়ের পাত্র নানাইয়া কনালে মুখ মুছিয়া, আবলুর দিকে হাত বাড়াইলেন ।

আবলু তৎক্ষণাৎ হাসি মুখে উঠিয়া গিয়া,—বাঁ হাতে তাহার ঘাড় ধরিয়া নীচু করিয়া ডান হাতে,—পিঠের উপর এক মুষ্টিঘাত বসাইলেন ! আহমদ চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "Oh ! Dear me !—বাড়ী চড়াও হয়ে আক্রমণ ! উকিল মহাশয়, আপনার আইন দেবতার কসম্ খেয়ে সাচ্চা বলুন, কত নম্বর ধারা অনুসারে মানলা রুজু হবে ?—"

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া বসিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া গোঁফে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে, মুহম্মদ হাস্য সহকারে আবলু উত্তর দিলেন—"এক শো সাড়ে বারো থেকে পাচ শো সাড়ে ছাপ্পান্নর মধ্যে যেটা হোক একটা বটে, কিঞ্চৎ এদিক ওদিকও হতে পারে, ঠিক স্মরণ নাই—"

"ধন্যবাদ উকিল সাহেব, এবার আপনার পরামর্শের পারিশ্রমিকটা গ্রহণ করুন,"—আহমদ জামার আস্তিন গুটাইয়া ঘুঁষি বাগাইয়া, আবলুর দিকে অগ্রসর হইলেন ।

এই উৎকট-রহস্যপ্রিয়, দ্রুত দৃষ্ট ভগিনীপতির সহিত আবলু সাহেবের পরিচয়টা অনেক দিনের ! কাষেই তিনিও, প্রত্নতত্ত্বপন্থিত্ব প্রভাবে তৎক্ষণাৎ লাকাইয়া উঠিয়া, সজ্ঞারে আহমদ সাহেবের হুঁহাত মুঠাইয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে সেকছাণ্ড ওরফে ভদ্র দস্তুর 'নড়া ছেড়া' ব্যাপারের নির্দিষ্ট অভিনয় সমাধা করিয়া—অত্যন্ত স্প্রতিভ ভাবে সলজ্জ বিনয়সূচক ভঙ্গিতে বলিলেন "আরে, আরে তাও কি হয় ! তুমি হচ্ছে বন্ধু লোক, তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যবহার—"

আহমদ বলিলেন "অমুগ্ধীত হলুম, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে বন্ধুত্বটা শিকের তুলে রাখাই প্রশস্ত বিধি—অতএব—" তিনি হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে লাগিলেন ।

আবলু সতর্কতার সহিত প্রাণপণ বলে মুঠা শক্ত করিয়া,—অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত সমর্থনসূচক ভাবে ঘাড় বাড়িয়া বলিলেন “অবশ্য, অবশ্য,—কিন্তু এই মুন্সী বংশের একটা চিরচরিত অভ্যাস আছে,—নিঃস্বার্থ মাননীলতা—”

আহমদ হাসিয়া বলিলেন “বিলক্ষণ! কিন্তু স্বপ্নগ্রস্ত হয়ে থাকাটাও যে মুন্সীবংশের জামাইদের পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সেটা অমুগ্রহ করে স্মরণ রাখিবেন,—”

বিপন্ন আবলুর মাথায় হঠাৎ এক নূতন কোণাল আবিস্কৃত হইল!—বাস্তবসমস্ত হইয়া বলিলেন “আহা-তা বন্ধু তোমার চা-টা যে জাহান্নামে চল,—” বলিতে বলিতে ডান হাতের বজ্রমুষ্টি নিষ্পেষণে আহমদের ডটা হাত এক-বোগে চাপিয়া ধরিয়া নিজেই বা হাতে করিয়া চায়ের কাপটা তুলিয়া তাহার মুখে ধরিয়া,—স্নেহবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন “আহা, থাও থাও এটা খেয়ে নাও আগে—”

আহমদ বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন সাড়ে আটটা বাজিতে আর বেশী দেবী নাই! ..... আর তো এই ছেলেমানুষী কোতুক লইয়া দস্তাধস্তি করিয়া সময় কাটান যায় না, অগত্যা বিনাবাক্যে নিঃশব্দে চাটুক গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর পিছনে টেবলের দিকে চাহিয়া রুমাল লইবার ভাণ করিয়া, সবিনয়ে হাত ছাড়াইয়া লইয়া,—অকস্মাৎ ফিপ্রাবোগে ফিরিয়া, অসতর্ক আবলুর কান দুইটা কমিয়া মলিয়া দিয়া,—এক লক্ষ পিছু হাটিয়া গম্ভীরভাবে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন “আজ এখানেই সন্ধি! তিনটে ‘কল’ আছে, এখনি বেরুতে হবে,—কমা কর বন্ধু, adieu! তোমার মঙ্গল হোক—”

“উজ্জ-হু”—বলিয়া কানের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আবলু চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া,—আহমদের উদ্দেশে ঞ্জটিকতক স্মৃষ্টি সম্ভাষণপূর্ণ কটু-কাটবা বর্ষণ করিলেন। আহমদ ক্রক্ষেপণ করিলেন না, কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে,—এমনি তাচ্ছল্যসূচক ভাবে, আপন মনেই, পাম্পমেটার, ষ্ট্যাথোসকোপ, পকেট কেস, তত্যানি ঞ্জটাইয়া লইয়া টুপিটা টানিয়া মাথায় দিয়া সসজ্জ বেশে প্রস্থানোদাত হইলেন।—কিন্তু সহসা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল,—তিনিও থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন!

আবলু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন “হু, হু, কেমন জন্ম! বেশ হয়েছে! লঘু-গুরু না মানার ফল ঐ!—খাম্কা আনার কান দুটোকে এমন নিষ্করণ শাস্তি দেওয়া মশায়,—ভেবেছি কি মাথার ওপর, ‘একজন’ নাই!—কেমন? লক্ষ লক্ষ করে যেমন বেরুচ্ছিলে, আর আশ্রয় মাথার ওপর আকাশটি ভেঙ্গে পড়ল! এবার?”

আহমদ অন্য চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া ক্রকৃকিত করিয়া বাহিরের আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন “এবার আপনার উচিত আর এক কাপ্ গরম-চা আনিয়া দেওয়া!—যেহেতু আপনার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার চা-টা—”

বাস্ত হইয়া আবলু বলিলেন, “দোহাই তোমার আহম, তোর মুখে ভদ্রভাষা শুন্লে আমার ভয়ানক হৃদকম্প উপস্থিত হয় ভাই,—সোজা করে বল, আর এক কাপ চা চাই?”

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিয়া আহমদ বলিলেন “সত্যি ভাই, বড় উপকার হয় তা হলে,—দেখ্‌ছিস আজ কেমন বাদলের দিন—”

আবলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “আচ্ছ: আচ্ছা, তুই বস, আমি ষ্টিক দশ মিনিটের মধ্যে চা করিয়ে আনিছি—”

একটু উস্খুস্ করিয়া আহমদ বলিলেন “ওরে আবলু,—তা তুই আর কষ্ট করে আসিস নি ভাই. চা-টা অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দে ভাই—”

আবলু বোকা বনিয়া গেলেন! সবিস্ময়ে বলিলেন “কেন, হলেই বা—”

মাথা চুলকাইয়া আহমদ বলিলেন “আরে না, না, বসে, বুঝিস না কেন? আঃ. তুই একটা নিরেট আহাম্মক!”

আবলুর দৃষ্টি পরিষ্কার হইল! একটু নষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা আমি আসব না. রক্তমকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে তো হবে—”

আহমদ সাহেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন “আরে না, না, টেনেব বিবিকে, টেনেব বিবিকে—”

“বহুৎ আচ্ছা—,” বলিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া আবলু পুনশ্চ ফিরিয়া চাহিলেন; একটা অর্থস্থচক কটাক্ষপাত করিয়া সতাসো বলিলেন “ঝগড়া হয়ে গেছে, না?—তুই ভারী পেয়াদব লোক,—আমিনাকে অত রাগাস্ কেন বল দেখি?”

আহমদ সাহেব দাড়ি চুলকাইয়া সক্রম মুখে বলিলেন—“সত্যি—দেখ ভাই, আমি মনে করি যে বেশ ঋণ্ডারী চালে ভারি কমেজাজে সোজাসুজি ঘরকন্ন সুরু করে দিই,—কিন্তু কি জানি ভাই, ওকে দেখলেই, আমার কেমন ঝগড়া করতে ইচ্ছা হয়.—আমি কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি না! বড় মুন্সিল হয়েছে দাদা!”

আবলু ইহার উপর আর কোন টিকাটিপ্পন না কাটিয়া শুধু নিঃশব্দে একটু হাসিয়া প্রহানোদ্যত হইলেন।—আহমদ সাহেব পরক্ষণেই সহসা উদ্বিগ্ন ভাবে তাহাকে ডাকিয়া ফিরিইয়া, অনির্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিলেন “দেখিস ভাই,—আমিনাকে যেন বলে দিস না যে আমি তাকে দিয়েই চা পাঠাতে বলেছি,—দেখিস, খবরদার,—”

আবলু সতাসো বলিলেন তাঁর বাহিরে দীর্ঘ রাথ! ঝগড়া করতেও ছাড়বি না,—অগচ রাখতেও পারবি না, আবার ইজ্জতের কান্না! তুই ভয়স্কর পেয়াদব! ”

কপালে হাত ঠেকাইয়া আহমদ সাহেব হতাশ ভাবে বলিলেন “নসীব!”

( ৪ )

পশ্চিম মহলে আসিয়া রক্তমকে ঠোঁড়ে চায়ের জল চড়াইতে বসিয়া, আবলু এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া আমিনার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমিনা বা টেনেব কাধকেও দেখিতে পাইলেন না, শেষে রক্তমের কাছে সংবাদ জানিলেন,—তাহারা দুইজনে তেতালার কেতাবের ঘরে গিয়াছে। আবলু নৈকেই বারেরবার ভিতরের সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দ পদে তেতালার চলিলেন,—অভিপ্রায়, ঠাণ্ড গিয়া দেখিয়া লইবেন দুজনে কি করিতেছে!

নির্দিষ্ট ঘরের কাছাকাছি হইতেই—ঘরের ভিতরকার অনর্গল উচ্চারিত বাক্যশ্রোত কানে পৌছিল, ধীরে ধীরে গমনে তিনি দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন দুইজনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া—হুন্ দিয়া কাঁচা আম চর্ষণ করিতে করিতে মনের সুখে মাথামুণ্ড গল্প জুড়িয়াছে।

টেনেব দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, আবলু দুয়ারের কাছে ঘাটবামাত্র আগেই তাহার সহিত চপে-চোখি হইয়া গেল!—সে থপ্ করিয়া আঁচলটা আঁমের উপর ঢাকা দিয়া ঘোমটা টানিয়া বাড় হেঁট করিয়া বসিল,

আমিনা পিছন ফিরিয়া দাদাকে দেখিয়া, কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমগুলার দিকে চাহিয়া সলজ্জ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না !

রসায়ন-বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে, কাঁচা আমের অপকারিতা শুণ যতই প্রবল হউক,—কিন্তু এখন সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই লজ্জিত-অপরোধী-যুগলকে আর পীড়া দিতে আবলুর এতটুকুও প্রবৃত্তি হইল না !—বিশেষতঃ, দুইজনের অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় আবলু নিজেও কিঞ্চিৎ সঙ্কল্পভূতি-বিশ্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইলেন ! ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া, সামনে শেল্ফের উপর ওয়েবষ্টার ডিক্সনারীখানা দেখিতে পাঠয়া, হাঁফ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি তাহার পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে,—যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে আবলু বলিলেন “ওরে আমিন, একটা কাজ কর, না, লক্ষ্য দিদি আমার,”

আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল “বল—কি করব ?”

আবলু ডিক্সনারীর দিকে চাহিয়াই বলিলেন “রসমটা কি যে ছাই-ভস্ম চা করে খাওয়ালে, কিছু টেই পাওয়া গেল না, একটু ভাল রকম চা করে দিস তো বড় ভাল হয়,—আমি জল চড়াতে বলে এসেছি—”

আমিনা সাগ্রহে বলিল “বহুৎ খুব, আমি এখনি বাচ্ছি,—এক পেয়ালা তো ?—”

“না না, আমার এক বন্ধু আছে, দু পেয়ালা চাই—”

“আচ্ছা—” আমিনা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল ।

বেচারা ইনেব অত্যন্ত বিপদে পড়িল, তাহার ইচ্ছা—আবলু দৃষ্টিপথাতীত হইলে সে বমাল গুটাইয়া লইয়া চম্পট দিবে, কিন্তু আবলুর নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না,—মিছামিছা অভিধান খুলিয়া সত্য সত্যই তিনি তাহার ভিতর নানাদ্রব্য অন্বেষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন ! ইনেব আড় চোখে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে—সম্পূর্ণে বমাল সরাইবার আয়োজন করিতে লাগিল,—ইতিমধ্যে কি মনে পড়ায়, আবলুর চমক ভাঙ্গিল, ডিক্সনারী বন্ধ রাখিয়া ফিরিয়া চাহিয়া মুহূর্ত্তে ডাকিলেন “ইনেব—”

লজ্জা-চকিত নয়নে চাহিয়া ইনেব উত্তর দিল “জী—”

আবলু বলিলেন “আহমুর সঙ্গে আমিনার কি ঝগড়া কাঁটি হয়েছে জানো ? আমিনা তোমায় কিছু বলেছে—”

মৃদু-হাস্য-রঞ্জিত মুখে, সলজ্জ-সঙ্কোচে ইনেব উত্তর দিল “বলেছে,”

কোতুহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া আবলু বলিলেন “কি হয়েছে ?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ইনেব নিজের আঙুলের আংটিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লজ্জারক্ত মুখে বলিল “তাস খেলার কথা কালরাত্রে উনি আপনাকে বলে দিয়েছেন, না—! আমিনা দিল্লি তাই রাগ করেছে।”

আবলু স্মিত-হাস্যে বলিলেন “তাই রাগ ! আচ্ছা ছেলে মানুষ বটে !..... ইনেব—”

“জী—”

“আমিনা সব কথাই তোমায় বলে ?—”

সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ইনেব স্বীকার করিল—সব !

অভিধান ফেলিয়া, আবলু ইনেবের দিকে অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে বলিলেন “আচ্ছা বলতো সত্যি করে—তুমিও আমিনার কাছে তা হলে সব কথা বল—?”

ইনেবের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল! চকিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলিল—না, না সব বলি না—”

আবলু নিকটে বসিয়া ইনেবের মুখের দিকে চাহিয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন “সব বলি না?—তা হলে কিছু কিছু বল, কেমন? ছিঃ, ছোট বোন সে আমার, তার কাছে তুমি—” বাকী কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া আবলু নিজেই হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িলেন।

ইনেব কুণ্ঠিত ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরব রহিল।

ইনেবকে আরও অনেক কথা কিস্তাসা করিতে আবলুর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তো সময় নাই! নীচে চা-পর্বটা এখন পূর্ব-নির্দিষ্ট কৌশল মতে সুস্থ-অলে সম্পন্ন করিতে হইবে তো! আবলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “একলাটি এখানে থাক্বে? নীচে চল—”

ইনেব মনে মনে পরম আশ্বস্ত হইয়া বলিল “আপনি আগে যান—”

তাহার কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিয়া আবলু স্নেহে ভৎসনার স্বরে বলিলেন “আবার আমার আপনি বল্বে?—বল ‘তুমি’,—বল, বল্বে না? যাক তবে, ছাড়ছি নে আমি,—বল ‘তুমি’—”

চুহাতে মুখ ঢাকিয়া ইনেব সলজ্জ হাস্যে বলিল “বলব, বলব—এখন নয়, এর পর—”

হাসিতে হাসিতে দ্বিতলে নামিয়া আসিয়া আবলু দেখিলেন আমিনা ঘোরতর ব্যস্ততার সহিত চা ছাঁকিতে বসিয়াছে। আবলু একটা চৌকী টানিয়া লইয়া নিকটে বসিয়া,—গোঁকে তা দিতে দিতে, চা’ এর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভালরূপ চা করিতে পারে নাই বলিয়া, আমিনার কাছে খুব এক চোট বকুনী খাইয়া বালক ভৃত্য রত্নম সসঙ্কোচে একপাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া একান্ত মনোযোগে নয়নযুগল প্রাণপণে বিক্ষারিত করিয়া, একাগ্র অধাবসার সহকারে—ভালরূপ চা প্রস্তুতের প্রণালীটা শিক্ষা করিতেছিল, আবলু হঠাৎ তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিলেন “ওরে বাচ্চা, ওঠ ওঠ,—চট্ করে দাওয়াইখনার ছুটে গিয়ে দেখে আর তো আমার দোস্ত ভদ্রলোকটি এসেছেন কি না?—”

রত্নম উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—‘না কোন ভদ্রলোক আসেন নাই।’

অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে আবলু বলিলেন “যাঃ বেচারী এসে পৌছতে পারলে না?—কি আর করব, তাঁর কপালে নাই!—তা এটা নষ্ট হয় কেন, আহু-ও তো সকালে ভাল চা খেতে পায় নি,—যা, এটা আহু-কে দিয়ে আর—” নিজে একটা পাত্র টানিয়া লইয়া দ্বিতীয়টা রত্নমের দিকে সরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়া, তাহার কাপড়ের দিকে চাহিয়া,—অবশ্যই বিশ্বয় মিশ্রিত বিরক্তির সহিত বলিলেন “বেয়াদব কাঁহাকা!—এত ময়লা কাপড় মাথুখে পরে? কাপড়ের চেঁহারা দেখলে যে তোর হাতে খেতে যুগা হয়! যা তোকে চা নিয়ে যেতে হবে না,—পালা”—আমিনার দিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন “যাও তো আমিন, আহু-ঘরে বসে আছে, এ কাপটা তাকে দিয়ে এস তো—”

আমিনা গলা চুলকাইয়া—অসহিষ্ণুভাবে বারেরদোর এদিক ওদিক চাহিল, কিন্তু কোন খি চাকরকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। অগত্যা ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজেই বিনা প্রতিবাদে চা লইয়া উঠিল, চাহিতে চলিতে বারবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, যদি দৈবাৎ কাহাকেও দেখিতে পায়!



পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার শেষ প্রান্তে আসিয়াছে,—এমন সময় সৰুসতাপহারিণী দুর্গভিনাশিনীর মতই,—সামনে তুফানী বাদীর শুভ আবির্ভাব ঘটিল ! হাঁফছাড়িয়া আমিনা বলিল “যা তো ভাই তুফানি, চা-টা ও ঘরে টেবিলে রেখে আয় তো—”

সর্বাবস্থা-অভিজ্ঞা তুফানী বলিল “সাতের ঘরে আছেন, তুমি যাও”

আমিনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল “আমরু তা কি আমি জানিনে ? সেই জনোই বলছি,—যা ভাই লস্কিটি—”

তুফানী হাসিয়া বলিল “আহা, তোমার কাছে এম্মি করে ‘লস্কিটি’ হয়ে শেষে মনীবের বিয়নজের পড়ে—আখের মাটা করি আর কি ! বেশ মজা !—সে হবে না, আমিনা বিবি,—তুমি যাও, তুমি যাও—”

আমিনা বাধা দিয়া সৰুপে বলিল “দাখো চা জুড়িয়ে যাচ্ছে,—ভাল চাও তো যাও বলছি”—

বিপন্ন হইয়া তুফানী বলিল “আমার দায়দোষ নেই বাপু, রাজর রাজার লড়াই,—মাঝখান থেকে উলু খড়গুলা—”

আমিনা তাড়া দিয়া বলিল “বকিস না থাম, আগে চা দিয়ে আয়,—আমি এতখানে দাঁড়াচ্ছি—যা ভালদি—”

তুফানী মাথায় কাপড় টানিয়া, চা লইয়া অদূরে ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া একটু কাশিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়া চায়ের কাপটা টেবিলে নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল।

আমিনা সাগ্রহে বলিল “কি বললে ?”

তুফানী গম্ভীর হইয়া বলিল “কি আর বলবেন, মাটার দেহতাটির মত চুপ করে চেয়ারে বসে যেমন বই পড়ছিলেন তেমনি পড়তে লাগলেন,—একবার শুধু চেয়ে দেখলেন।”

আমিনা একটু চিন্তিত হইয়া বলিল থাকে তো—” তুফানী অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল “তা কি করে জানব,—তোমার উচিত একবার যাওয়া ;—যাও না বিবি—” আমিনা সাজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল “উহঁ ! তা হবে না,—সকাল বেলা কিনা আমার,—নাঃ, আমি কক্ষণে যাচ্চিনে—”

কিন্তু কক্ষণে’ যাইবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিলেও বর্তমানে, গরম চা-টা পাছে জুড়াইয় যায় সেই আশঙ্কার আমিনার মনটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল ! কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই ! রাগটার মর্যাদা জানি ভ করা চলে না !—প্রস্থানোদ্যত হইয়া ইতস্ততঃপরায়ণ চিন্তে অনামনস্ক ভাবে একবার দুয়ারের দিকে চাহিল,—দেখিল আহমদ দুয়ারের সামনে আসিয়া পশ্চাঘট হস্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন !

বৃহত্তের জন্য আমিনার মনটা একটু বিচলিত হইল। কিন্তু তখনই মনে পড়িল সকালবেলার কথা !—উৎকণ্ঠাৎ মাথায় সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পশ্চিম মহলের দিকে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

## জন্ম মঙ্গল ।

—:~:—

( ১ )

বার্থ এ জনম মোর, অভিশ্রায়হীন  
 সৃষ্টি, সৃষ্টিনাথ তব, আমারে সৃজন  
 কেমনে কাঁহব প্রভু ? এই রাত্রি দিন  
 অহরহ মুহূর্ত্ত করিছ রচন  
 আমারে তুষিতে এই মতা আয়োজন  
 অগণিত উপাচার বর্ণগন্ধগীতে  
 অবাচিত উপহার বরণ্য মোহন  
 স্নেহপ্রেমকরুণার পর্যাপ্ত অমৃতে ।  
 একি সব মিথ্যা কথা ? মিথ্যা অভিনয় ?  
 বিশ্বব্যাপী আমরণ চিরন্তন কাজ  
 মানবের, যদি খেলা—সত্য নাহি হয়,  
 থাক মোরে ঠাই চির এই খেলা মাঝ ।  
 স্রষ্টার এ সৃষ্টি আমি—মোর প্রয়োজন,  
 তাঁহার ইচ্ছায় এক দানিতে জীবন ।

( ২ )

বিশ্বরাজ, তোমা হ'তে দূরে কোথা তবে  
 র'ব আমি ? ধরণীর বক্ষতল জুড়ি  
 যত কিছু আবর্জনা গ্লানি ক্লেদ র'বে  
 পাপ মোহ মিথ্যা ক্ষতি ক্ষয় ক্ষোভে পুরি  
 সে সবারে উপাড়িয়া উন্মূল্য নাশি  
 বহাতে হইবে মোরে সৌন্দর্যের হাসি ।  
 হবে মোর সব কাজ তোমার ইঙ্গিতে  
 হবে মোর সব বাণী তোমারি সঙ্গিতে ।  
 আমার প্রশংসা গানে শুনিব তোমার  
 মঙ্গল আরাত-গাথা কান্তি বলিহারী ।

রাজা তুমি যাবে পথে, পথ-শোভা যথা,  
বিছাইব আপনার কাগা-চিস্তা কথা  
আমি র'ব ধ্বজাধারী নকাব তোমার  
করিব করাব' তব গৌরব প্রচার ।

( ৩ )

সত্য হয়ে দৃঢ় হয়ে প্রতিজ্ঞার বলে  
অপমান অবজ্ঞারে রুধিব দু'করে  
আপনারে ছিন্ন করি ভিন্ন করি জলে  
রহিব না দীন নেত্রে অসাদের তরে ।  
ছাঁটিয়া তোমারে, ক্ষুদ্র গৃহ কোণে রাখি  
স্পর্শ শুচি জাতি বর্ণ বিচারের বাধা  
নির্ব্বিচারে বিরচিয়া তোমারেই ঢাকি  
উচ্চারিব উচ্চ স্বরে শুধু মন্ত্র সাধা ?  
প্রলোভনে, ভয়ে ভুলি, যদি অবিচার  
বরণ করিয়া লই—তা' হলে তোমারে  
করিব গো অপমান, যেন অনিবার  
এ প্রতিজ্ঞা থাকে মনে আলোকে আঁধারে ।  
নর সেবা নরপ্রীতি করিতে সাধনা  
স্বার্থে দিয়া দর্ভাসন না করি বঞ্চনা ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## ধর্ম্মনমস্বয়ে আকবর বাদশাহ ।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মনমস্বরের ভাব বহুকাল হইতে আগত । কালাতীত ঋষিধর্ম্মেও সংগ্রহস্থলীকে এক ব্রহ্ম হইতে উদ্ধৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়া শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও জীবজগতকে এক প্রাণস্বত্রে গাঁথিয়াছে । বুদ্ধদেবও জীব-জগতের দুঃখনিরারণের নিমিত্ত যে নিবৃত্তির পথ অনুসরণ করিলেন তাহাতে বিশ্বমৈত্রীই প্রচারিত হইয়াছিল, জাতিবর্ণের বিচার, নরনারীর অধিকার ভেদ তিরোহিত হইয়াছিল ।

মুসলমান শাসন ও সভ্যতা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে যে কেবল নব জাতি সংঘাত মাত্র ঘটিল তাহাই নহে, এক নব ধর্ম্মান্বেষণেরও স্রষ্টি হইল । ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বহুকাল গিরিজহারী বা আশ্রমে শিষ্য প্রশিষ্যের

মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ধর্মকে লোকচক্ষু ও সাধারণে গোচর করিবার ভার মধ্যযুগের ভারতীয় সম্রাটসমূহ প্রচারকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কালেই কুমারিল ভট্ট, দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি ধর্মপ্রবক্তকগণ ভারতের চতুর্দিকে বহির্গত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে এই সম্রাটসমূহের আন্দোলনফলে বৌদ্ধধর্ম এদেশে বিলুপ্ত পায় হইয়া উঠে এবং বাগবদ্ধ ও মূর্তিপূজার সম্ভার বিস্তৃতিলাভ করে। ষড়দর্শনের জটিলত্ব ভয়ানকভাবে হইয়া রহিল, ত্রিমূর্তির পূজার আড়ম্বর বাড়িয়া উঠিল, সম্রাটসমূহ-প্রচারকগণের মধ্যে রামানুজাচার্য্য প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকরূপে সকলকে আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ভারতে সম্বন্ধ-বাদের ভিত্তিকে এইযুগে তিন দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে শিখগুরু নানক এক অভিনব সম্বন্ধের ধর্ম হিন্দু ও মুসলমানকে অবাধে বাঁধিতে লাগিলেন।

সম্বন্ধবাদ চিরদিন সেইখানে উদ্ভূত যেখানে ধর্মসংঘাত ও বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শ ঘটে। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে মোগলভারতে একাধারে হিন্দু, মুসলমান, পারশীক, বৌদ্ধ, যেসুইট, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী বাস করিতেছিল। যে হৃদয় স্বাধীনচিন্তায় আনন্দানুভব করে, ধর্মকে বহিরাবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, তাহাকে প্রহেলিকার আবরণে আবৃত, ভয় ও সংস্কারের মধ্যে অচিস্ত ও অব্যক্ত রাখিতে চাহে না তেমনি হৃদয়ে ধর্মসম্বন্ধের ভাব জাগ্রত হইতে পারে। আকবর শাহ স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি সকল ধর্মের তত্ত্বের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বাধীন চিন্তা ও সত্যান্বেষণ ভিন্ন নূতনের প্রতি আকৃষ্ট হইবার ভাব কোনও কোনও হৃদয়ে এত প্রবল যে স্বয়ং ধর্মের বিধিনিগড়ও সেরূপ মনকে আবদ্ধ করিতে পারে না। ইতিহাস আকবর শাহের ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মের প্রতি অমুরাগের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিয়াছে। ১ম কারণ, হিন্দুদিগের সংস্পর্শ। সাহসী ও সুদক্ষ হিন্দু সেনাপতি ও কর্মচারিগণের সহায়তায় রাজ্যশাসনের প্রয়োজনীয়তা আকবর শাহ সুস্পষ্ট দেখিলেন। টোডরমল্লের ন্যায় কেহই বাদশাহের রাজ্যশাসনে সাহায্য প্রদান করিতে পারে নাই। প্রথম হিন্দু সেনাপতি টোডরমল্ল। আকবরের রাজ্যবিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থার সহিত টোডরমল্লের নাম জড়িত। তাঁহারই নির্দেশে মানসিংহের ন্যায় হিন্দু সেনাপতি “সাতহাজারি” পদে বৃত্ত হন। ২য় কারণ, বাদশাহের হিন্দুমহিষী গ্রহণ। অম্বরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ মোগল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভগবান দাস সেই উপলক্ষে “পাঁচহাজারী” সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু ভিন্ন আকবরের অন্য ধর্মাবলম্বিনী পত্নীও অনেক ছিলেন। হিন্দুপত্নী গ্রহণের এক ফল “জিজিয়া” প্রভৃতি বিধর্মীর উপর স্থাপিত কর নিবারণ।

আকবরের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমানের এমন কোনও প্রভেদ ছিল না, যে জন্য এক হিন্দু তীর্থযাত্রীর উপর কর স্থাপন করা তাঁহার চক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। অন্য পক্ষে আকবর শাহ হিন্দুর সহমরণ, বাল্যবিবাহ, বালিকার চিরবৈধব্য অস্বাভাবিক ও নৃশংস বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তৃতীয় ও প্রধান কারণ সুফিদিগের প্রভাব। যে দুই সুফিব্রাতার নাম আকবরের জীবনবৃত্তান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা আকবরের সভার অভরণস্বরূপ ছিলেন। গুণে, জ্ঞানে ইহাদিগের তুলনা সেকালে মিলিত না। কৈজী কবি, আবুল ফজল ঐতিহাসিক। বাদশাহের উপর কৈজী ও আবুল ফজলের প্রভাব অপরিমিত; এই দুই ভ্রাতাভায়া বাদশাহ সুফী-ধর্মে অমুরাগিত হন। আবুল ফজলের ন্যায় চিন্তাশীল ও বহু জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাবে আকবর ধর্ম ও দর্শনের প্রশ্নগুলির প্রকাশ্য আলোচনার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ফতেপুরের ইবাদত-খানায় এই সকল তর্ক চলিতে লাগিল। এই সময়ে ফতেপুর এক সুরম্য নগরে ও সম্রাটের প্রিয় বিহারস্থানে

পরিণত হইয়াছে। এই নগরের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীসম্পদের সংহিত সাধু সালিম চিস্তি ও সম্রাট পুত্র সলিমের জন্মকথা জড়িত  
রহিয়াছে। এক্ষণে ফতেপুর জনশূন্য, পরিত্যক্ত। কোনও ঐতিহাসিক বলেন “আজ ফতেপুরের ভগ্নাবশেষ  
মায় বিবাদ ও সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্য ভারতে আর নাট—ইহা অতীত স্বপ্নের নীরব কাহিনী। ইহা আজও উহার সাত  
মাইল বেষ্টিত নগর সাম। উহার প্রাকারযুক্ত সাতটা বৃহৎ দরওয়াজা, বিস্ময়কর প্রাসাদরাজি, সলিম চিস্তির মন্দিরকবর,  
বিচিত্র চিত্রাবলী ও কারুকার্য বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণহীন দেহের ন্যায় দণ্ডায়মান।” ঐতিহাসিক ইহাকে  
ভারতের পম্পিগ্রাট ও চত্বঃসৌন্দর্যের সমাবেশ স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সৌন্দর্যের এমনি লীলাভূমিতে আকবরের সমন্বয়ধর্ম্য কুটিয়া টিয়াছিল। ইবাদতখানায় ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বকলচে  
বাদশাহর মন সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। গোঁড়া মোসলমান ও উদারমতাবলম্বীর মধ্যে বিদ্রোহ জাগরিত  
হইল। বাদশাহ সকল ধর্ম্মই সত্য দেখিতে পাইলেন এবং কোনও এক ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দেশ করিতে  
পারিলেন না। আবুল ফজল এই উদারতাবাজক কতকগুলি কাণ্ডের রচনা করিয়াছিলেন, যাহার সহিত আধুনিক  
কালের টেনিসন্ প্রভৃতি কবির রচনাসাদৃশ্য স্পষ্ট। যথায় বাচ সকল লোকের ভিতরে তোমাকেই দেখি, হে  
ঈশ্বর; বহু ঈশ্বরবাদী বা মোসলেম কেহই তোমার একমাত্র প্রিয়পাত্র নহে; আমি খ্রীষ্টানের ভজনালয়ে যাউ, কখনবা  
মসজিদে, সর্বত্রই দেখি তোমাকে।” এই প্রকার সমন্বয়বাদ দিনে দিনে বাদশাহের মন অধিকার করিতে  
লাগিল। তিনি প্রায়ই উষাব আলোকের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া প্রাসাদপ্রাঙ্গণে একটা প্রস্তরপু ও উপবেশন  
করিতেন; বালার্ককে ধীরে ধীরে উদিত হইতে দেখিতেন এবং জীবনের রহস্যচিন্তার নিমগ্ন হইতেন। এই সময়ে  
নানা সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। একদিকে তান সাগ্রহে খ্রীষ্টধর্ম্মকে বাকা শ্রবণ  
করিতেছেন অনাদিকে হিন্দু-বাগীর যুগ্ম বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিবাদ ও তাঁহার অজ্ঞাত  
ছিল না। এমন অবস্থায় মোসলমান ধর্ম্মের সীমাব মধ্যে তাঁহার মন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিত  
না। তিনি সর্বপ্রথম অভিবাদন “জান্নাতো আকবর” এইরূপ বাকা প্রয়োগ প্রবর্তন করেন। ইহার অর্থ  
“ঈশ্বরই মহান”, এবং প্রাচীন নমস্কারে—“জান্না জান্নালু” অর্থাৎ “তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হউক” ব্যবহৃত হইতে  
লাগিল।

তৎকালে রাজ্য অষ্টম হেনরী যেমন পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া আপনাকে ধর্ম্মনেতা বলিয়া ঘোষিত  
করেন, মোগলভারতে সেইরূপ বাদশাহ আকবর আপনাকে মোসলেম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিলেন। পুরোহিত  
সম্রাট একাদিন ফতেপুরের প্রশস্ত মসজিদে সর্বসমক্ষে পূজা (প্রার্থনা) পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন কিন্তু ভাবে  
অভিভূত এবং জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ইহার পরে এক অভিনব ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সম্রাট  
ধর্ম্মের সকল প্রস্তাব মীমাংসার ভার আপনি গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল মধ্যে বাদশাহ তাঁহার “দিন-ইলাহি” অর্থাৎ স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রকাশো প্রচার করিলেন। ইহা সকল  
ধর্ম্মের সংগ্ৰহ ও অমিশ্রবাদ। এত উদারমত ও স্বাধীন চিন্তাপ্রিয় হইয়াও বাদশাহ সামান্য কুসংস্কারবদ্ধিত ছিলেন  
না। পীর ফকির, সাধুদিগের কবর প্রায়ই দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহাদের অভ্যন্তর বিশ্বাস করিতেন। ইহা  
লুইয়া ঐতহা সত্বে বেদোদী, সম্রাট-চরিত্রকে যথেষ্ট উপহাস করিয়াছেন। কারণ বেদোদী গোঁড়া মোসলেম ছিলেন,  
সম্রাটের উদারতা পছন্দ করিতেন না। আবুল ফজল ও ফৈয়ী ছিল সম্রাটের নবধর্ম্মের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষক বহু  
কেহ ছিল না। কারণ বাদশাহ নানা মত ও নানা ভাবে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করতে পারেন নাই  
ইহা ভাবুকতা ও অজ্ঞতা দুইয়ের মধ্যেই ডুবিয়া গেল। একদিকে সম্রাট স্বর্গীয় স্তব করিতেন, বিশেষ দিনে

কপালে হিন্দুর নায় তিলক করিতেন, হাতে যজ্ঞসূত্র বাধিতেন, আবার পারশিকদিগের নায় অগ্নির উপাসনা করিতেন। প্রাসাদে তিনি হিন্দুর হোম ও পারশিকের অগ্নি উপাসনা উভয়ই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। একরূপ ভিত্তিহীন নবধর্ম কাহারও হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিল না; তদার মত সশ্রম চেষ্টা, ইহার গভীরতাও অল্প। বাদশাহের তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে এই ধর্মের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে বঞ্চিত হইয়াছে। তবে একরূপ সমস্বয় চেষ্টার পরোক্ষ ফল তুচ্ছ করিবার নয়, কারণ ইহা দ্বারা পুরুত সমস্বয় ধর্মের প্রাচীন মানবসমাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হয়।

বাদশাহের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে উলিয়ম ফিঞ্চ (William Finch) নামে ভ্রমণকারী ধর্মসোমুখ কতেপুরে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই খোদাবাসা (স্বপ্নের ঘর) যাত্রার মর্ম্মর পর্দার মধ্যে বাদশাহ খ্রীষ্টের শাস্তিময় দিবস কাটাইতেন, গৃহস্থারে সেই পার্শী বয়ান, আবুল ফজল ও ফৈজীর সুবমা গৃহ. দেওয়ানাখাস্ (যেখানে মোসলমান পণ্ডিতবর্গ, কের্থলিক পাদ্রী, অগ্নিউপাসক, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণ সুভীত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, আর যেখানে বহিরা অদূরে নীতিবান্ বেদোনী ক্রকুটি করিতেন), এবং সৌন্দর্যের খনি তুর্কীদেশীয় মাঠবীর কুঠী তখনও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক বেদোনী বলিয়াছেন খ্রীঃ ১৬ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ সর্বপ্রথম মোগল সভায় উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ পুত্র মোরাদকে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ও আবুল ফজলকে উহার তর্জমা করিতে আদেশ করিলেন। বাস্তবিক সম্রাটের নিকট কোনও নূতন বস্তু অনাদৃত হইত না। কৃত্রিম উপায়ে সোনা প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত হইতে জ্যোতিষ সকলই তিনি চর্চা করিতেন। নূতনের প্রতি একরূপ অমুরাগ যেমন সকল উন্নতির মূল তেমনি তাহা অনেক স্থলে কেবল বালকোচিত কৌতুহলমাত্রে পর্য্যবসিত হয় এবং চিন্তেঃ স্থিরতা ও দৃঢ়তা নষ্ট করে। \*বাদশাহ আকবর নূতনের পক্ষপাতী হইয়া বহু উন্নতির সূচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার “দিন-ইলাহি” ভ্রমপূর্ণ ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

শ্রীমুবিন্দনাথ রায় ।

## মারহাট্টা ।

—:—

( ১ )

হিন্দু যবে জাবগ্নত মোগলদলের অত্যাচারে,  
উঠল কাঁপি আর্ঘ্য-ভূমি যবন জাতির চরণভারে,  
ধাতা তোদের করল প্রেরণ সহ্যরতন রক্ষালাগি,  
হিন্দু বীরের হৃদয়-বাগের চরু হ'তে উঠল জাগি;  
সঞ্জীবিত করলি সবে শক্তি সুরা সঞ্চারি ১,  
উঠল মাতি নবীন তেজে দুর্কলৈরো ক্ষুদ্র হিয়া;

শুভক্ষণে আসলি নামি স্বর্গ হ'তে স্বর্গরথে,  
লুপ্ত হ'তে দিস্নি তোরাই হিন্দু নাম আজ বিশ্বহ'তে।  
বীৰ্য্যে তোরা বিশ্বে মহান তাই তো তোদের উচ্চশির,  
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ ধরা ধন্য তোরা আৰ্য্যবীর।

( ২ )

দলন করি দুর্ফদলে করলি পালন পুণ্যবানে,  
আত্মিতে অন্বেষি দিলি শত্রুসংখ্য সমান জ্ঞানে,  
প্রতিহিংসা সাধন তোদের ক্ষমা করি শত্রুজনে,  
স্বধর্ম্মে তোর নিধন শ্রেয়ঃ, শাঠ্য তোদের শঠের সনে;  
স্বাধীনতার করলি পূজা বৃদ্ধ শিশু সবাই মিলি,  
নিভা প্রব সত্য তরে পুরুষনারী পরাণ দিলি;  
ঝঞ্ঝা মাঝে অটল থাকি উঠলি আপন চরণ ভরে,  
হাস্যমুখে করলি বরণ যুদ্ধে মরণ মোক্ষ তরে;  
বীৰ্য্যে তোরা বিশ্বে মহান তোদের সদা উচ্চশির,  
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ ধরা ধন্য তোরা আৰ্য্যবীর!

( ৩ )

অনাহারে রাত্রিদিনে বৃষ্টিধারা পৃষ্ঠে ধরি,  
ছুটলি তোরা মরুর মাঝে ভূধর শিরে অশোপরি,  
বজ্রসম শক্তি দেহে নেত্রে সবার বহি জ্বলে,  
কঠিন করে কঠোর কৃপাণ বিশ্ব-বিজয়-মালা গলে,  
গুরুর বাসে গড়লি ধ্বজা দেবীর আশীষ ধরলি শিরে,  
ঢাললি শোণিত দেশের তরে আপন করে বন্ধ চিরে;  
যুদ্ধ তোদের ধর্ম্ম তরে তুচ্ছ করে আপন প্রাণ,  
শিরের চেয়ে সার বড় তোর প্রাণের চেয়ে শ্রেষ্ঠমান,  
বীৰ্য্যে তোরা বিশ্বে বড় জগৎ মাঝে উচ্চশির,  
কার্য্যে তোদের মুগ্ধ মোরা ধন্য তোরা আৰ্য্যবীর!

ত্রিভুবননাথ বসু।

## বধূ।

হেনস্তের নিশিরম্নাত প্রভাতে ছই পাশের শ্রেণীবদ্ধ তরুবিগির ফাঁকে ফাঁকে পীতাম্বু রোদ্ৰ আসিয়া গ্রামা কাঁচা রাস্তার উপর পড়িয়াছে। কোনও কোনও গৃহস্থের প্রাক্কণের সুপারীগাছের অগ্রভাগ প্রভাতের বাতাস আগিয়া মুচ মুচ কাঁপিতেছিল। নরেন রেশমী চাদর উড়াইয়া এসেসের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে ফুল মোশনে সাইকেল ছাড়িয়া চলিতেছিল। এক একবার বৃক্ষশ্রেণীর অবসান সীমায় মুগ্ধনেত্রে মা লক্ষ্মীর স্বর্ণাঙ্কুরের মত পাকা ধানের স্বর্ণশীর্ষ হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সম্মুখের একটা বিচালী বোঝাই মহিষের গাড়ীকে অনবরত বেল বাজাইয়া এক পাশ করাইয়া সে নিজের পথ করিয়া লইল। খড়ম পায়ে গায়ের ঞ্জির উপর কৌচার কাপড়টা জড়াইয়া ছাতি মাথায় দিয়া বিনয় আসিতেছিল। নরেন তাহাকেও সরাইবার অভিপ্রায় বেল টিপিল, বিনয় একটু সরিয়া হর্ষোজ্জল মুখে কহিল “কি, তুমি ছুটি পেলে?” “পেলান” “ভা এদিকে যাচ্ছে, বাড়ী যাবে না?” নরেন একটু থামিয়া বলিল “যাবে। তোরা ভাল আছিস তো?” “আছি। তুমি এস শীগ্গীর। কোথা যাচ্ছে?” “পোষ্টাফিস।” বিনয়ও নরেনের কাঁধের উপর ভর দিয়া তাহার পশ্চাতে উঠিয়া পড়িল।

তাহাদের চলন্ত সাইকেলটাকে দেখিয়া একটা বাবল গাছের আড়ালে ছইটা তরুণী কৃষক-বধূ আর্দ্রবস্ত্রে জলের ফলসী কাঁখে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটা পুরাতন ইষ্টক বাহির করা চারিদিকে বটঅশথের মোরশাপাট্টা হইবার মত শিকরময় বাড়ীর সম্মুখে নরেনকে শীঘ্র ফিরিবার জন্য পুণঃ পুণঃ অহুরোধ করিয়া বিনয় নারীরা পড়িল। বাড়ী ইঁটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা কিন্তু ভিতর বাহির গোবরের ঘুঁটে এবং তাহার অন্তিমের চিহ্নে চিহ্নে একেবারে ঢাকা সে প্রাচীর ঘুঁটের কিংবা ইঁটের তাহা লক্ষ্যনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিনায় একটা কুপের কাছে বসিয়া একটা কিশোরী গোবরমাটিমাখা হাতে পায়ে সাবান দিয়া স্নান করিতেছিল। বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্য কহিল “উঁহু ওতো হচ্ছেনা সাবি ও যে বানিস রং, শীগ্গীর উঠবে না, একখানা ঝামা এনে দোব?” সাবি মুহূ হাসিয়া কহিল “আচ্ছা তুমি 'ত খুব ফরসা বাপু।” “আমি ফরসা নই তো কি? তোর মত কালপেঁচা? নে নে এই আমার ছুরীখানা নে, একটা পুরু ছাল তুলে ফেললেই দিবি টকটকে রং বেরিয়ে পড়বে।” সাবি এবার উত্তর না দিয়া মুখ ঘসিতে লাগিল। বিনয় তেমনি হাসি মুখে আবার কহিল “বাস্ বাস্ হয়েচেয়ে হয়েচে এইবার মেমগুলোও খোমটা দিতে শুরু ক'রবে। আঃ মা কোথায়? মা, ওমা।” গৃহিণী বাহির হইয়া বলিলেন “কি? সাবি মাতাকে দেখিয়া প্রায় কান্দকান্দ মুখে কহিল “দেখনা মা মেজ্জা কি বলছে।” বিনয় সহাস্যে একবার জঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিল “মা, দাদা এসেচে।” মাতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন “সত্যি? তোকে কে বললে?” “কেউনা। এইমাত্র একসঙ্গে দুজন এলাম সে পোষ্টাফিসে গেল।” “ওমা খবর দিলনা কিছুনা বোমা যে এখানে রয়েছেন” বিনয়ের মুখ দারুন বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল “রয়েচেন তো হয়েচে কি? অন্যায় বা তারই প্রশ্ন কি চিরদিনই দিয়ে আসতে হবে নাকি?” মাতার মুখে স্পষ্ট চিন্তার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সেই সময় রাস্তায় হইতে বধূ হাসিমাখা মুখখানি বাহির হইল “ও ঠাকুরকি ফেপ্‌চো কেন জাই, সাবান না মাখলে যে বিয়েই হবেনা।” “ওঃ না হল তো ভাবি বয়ে বাবে আমার; তার জন্য তোমার এ



মাথা ব্যাথা কেন ? “ওমা আমার মাথা ব্যাথা হবেনা, শুদ্ধ এই ভাবনার কাল সারা রাত্রির ঘুম হয়নি জানতো ?” “ইস্ ! আমার ভাবনায় যে মিথ্যে কথা বোলচো বোদি, ই্যা শুনেচ দাদা এসেচেন ।” বধুর মুখের আনন্দোচ্ছল দৃষ্টিটুকু নিমেষে নিবিয়া স্নান হইয়া গেল ।

সে সজুচিত মুখে ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল । বিনয়ের বড় ভাই নরেন এল-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার ছাড়পত্র গ্রহন করিতে পারে নাই । এন্ট্রান্স পাশ করিবার পরই, প্রীত্য়াক্তে ঢাকার উদয়, মুখের দাঁতগুলি পোকাখাওয়া, পাণ্ডবর্ণা জীর্ণাঙ্গীর্ণা সপ্তম বয়ীয়া নির্মলার সহিত তাহার বিবাহ হয় । নরেন তখন নবীন জীবনের সুখ সৌখিনতার ভরপুর ; সে জাগিয়াই প্রেমের স্বপ্ন দেখিত, নিদ্রার ভর সহিত না । তাহার এমন আসরে কিনা জুটিল একটা কাবত্ব লেশ মাত্র বর্জিতা বালিকা । মেয়েটা তখনো কোনও সরম সঙ্কোচের অধীন হয় নাই । একদিন সন্ধ্যাবেলা নরেন কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া আবার রাত্রির জন্য বাহিরে হইতেছিল । তাহার কোটের বোতামের ঘরে একটা চমৎকার গোলাপ ছিল । নির্মলা ফুলটার জন্য নাচিয়া উঠিল, সে লইবেই, আবদার দেখিয়া নরেনের পিত্ত জ্বলিয়া গেল । ছ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জুতা মারিয়া নিকাল করিবার ভয় দেখাইলেও সেই একশুঁয়ে মেয়ে নিরন্তর হহল না । নরেন নত হইয়া জুতার কিতার ফাঁস দিতে গেলেই সে ফুলটা লইতে গিয়াই স্থগায় মুখ সরাইয়া বলিল “আঃ রামঃ তুমি মদ খেয়েচো” নরেন তড়িৎপেগে সোজা হইয়া উঠিল “খবরদার ! এত স্পর্ধা তোর ।”

তৎক্ষণাৎ মাকে ডাকিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল ঝাঁটা মারিয়া ওইটাকে বিদায় না করিলে সে আত্মহত্যা করিবে । এই ব্যাপার লইয়া মাতাপুত্র বচসা খুবই পাকিয়া উঠিল । ফগে নির্মলাকে বাপের বাড়ী পাঠান হইল । নরেনও বা সন্ন্যস্তীর নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনের ছোট বাবু হইয়া ষ্টেশনে ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অবাধে নরক পক্ষে ডুবিয়া আছে । বছর পাঁচেক পরে সেই পাণ্ডুর জীর্ণ কাটামোতে তরুণ বসন্ত হিল্লোলে শুক লতার মত নির্মলার সারা অঙ্গে অনুপম লাবণ্য ত্রি কচি কিশলয়ের মত জাগিয়া উঠিল । পাণ্ডু মুখে সদ্যবিকশিত গোলাপের রক্তাভাস রঞ্জিত হইল । মুগ্ধা ঝগুড়ী পুত্রের অনুপস্থিতিতে বধুকে কাছে আনিয়া রাখিতে লাগিলেন । পুত্রের আগমন সম্ভবনা হইলেই তাহাকে তিনি পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন ; এবার সে আবার কি কাণ্ড বাধাইবে কে জানে ? বিনয় সুবোধ ও বুদ্ধিমান, সেই কেবল দাদার কার্যকলাপ দেখিয়া জলিয়া যায় । কিন্তু নির্মলার সদ্যপ্রফুল্ল প্রভাত-পঙ্কজের মত হাসিমাখা মুখখানি কেহ কোনও দিন এ জন্য বিন্দুমাত্রও মলিন হইতে দেখে নাই ।

( ২ )

প্রাক্কনের এক প্রান্তে একটা অজস্র শেফালি ঝরা ফুলের মাঝে বাধানো তুলসী-ক্ষেত্র নিচে কচু হরিজ্ঞা তুলসী কলসী ক্ষেত্রের ভিতর লোপামোছা বম-পুকুর লইয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠা বালিকা সুরি সুর করিয়া “রাজার বেটা পক্ষী মারে” তার পর ! তার পর কি ? ও বোদি বলে দাওনা ভাই, দাও,—নরেনের সদ্যপুণ্ডিত কর্ণে তগিনীর উচ্চারিত কথা প্রবেশ মাত্র সে উগ্রভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল । তবে বুঝি মা আবার সেইটাকে আনিয়াছেন ছেলের চেয়ে তাঁর বউ কি বড় হইল ? সহসা বাহিরে দৃষ্টি পড়িল—দান শিক্ত বস্ত্রাবৃত সলিলাত্র ফুটন্ত পঙ্কজের মত একটা সুন্দরীর উপর । ভিজা কাপড় ভেদ করিয়া লাবণ্যময়ীর আরক্তবর্ণের আভা দেখা যাইতেছিল । রেশমের মত তরলারিত কেশদাম স্তরে স্তরে আজাহু আচ্ছাদিত করিয়াছিল । দুগাছি লালশাখার মোমের মত সেই হাত দুখানি ঝাঁটা । সুন্দরী কাচা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল । তাহাকেই সুরি মন্ত্র বলিয়া দিতে বলিতেছিল । নরেনের

মুখুনেত্র আর ফিরিল না,—এই নাকি সেই? তাও কি হইতে পারে? তবে বৌদি বলে কেন! তাহার খুড়তুতো ভায়েদের কাঠারো জ্বী হইতে পারে। চমৎকার সুন্দরী বটে! নির্মলা হাতের আলুর খোসা ছাড়ানো-অর্ধ সমাপ্ত রাখিয়া তাড়াতাড়ি ফুটিত ভাতের ফেন গালিতেছিল এবং সাবিত্রী এক কোণে বসিয়া মশলা বাটিতেছিল। নির্মলা অগ্নুত্তাপে আরক্ত বর্ণশিশু কপালের অলকগুচ্ছ কাঁধের উপর মাথা ঘুঁসিয়া সরাইতেছিল। গৃহিনী স্নান মুখে মৃদুস্বরে বলিলেন “বোমা!” মুখ তুলিয়া বধু বলিলেন “কি বলছেন মা” “ভাত তো নেবে গেচে তুমি ছুটি খেয়ে নাও মা, এখন আসবে গিয়ে।” বধু মুখ নত করিয়া ক্ষণেক কি ভাবিয়া কহিল “আমি থাকি না মা” “কি করি মা ভয় করে যে” বলিয়া শান্তডী আবার খাইয়া লইতে বলিলেন বধু এবারও মিনতিপূর্ণ চক্ষে শান্তডীর মুখপানে চাহিয়া কহিল “আপনার পায়ে পড়ি মা আমি থাকি এখানে।” এবার অস্বস্তি পাইয়া সে প্রসন্নমনে রন্ধনে মনোনিবেশ করিল। দ্বিপ্রহরের খররোদে গোয়াল ঘরের খড়ের চালে বসিয়া কপোতযুগল স্বকীয় ভাষায় কুজন করিতেছিল। ঘরের ছায়ার নিরলস বালিকা সরি রান্নাঘর হইতে বাটা হলুদ সংগ্রহ করিয়া কাঁচকলার খোসার উপাদেয় ব্যঞ্জন রান্নায়া একব্রহ্মকে পরিবেশন করিতেছিল। সম্মুখে বড়দাদাকে দেখিয়া কাদার ভাতমাথা হাতখানা তন্ত্রে কাপড়ে মুছিয়া তাড়াতাড়ি আলনার কাপড় তুলিতে গেল। নরেন একটু হাসিয়া কোন্ কাপড়খানি কার প্রসন্ন করিতে লাগিল। একখানি কাপড়ে সরি বিব্রত হইয়া গেল সেখানা নির্মলার। নরেন প্রসন্ন করিল “এখানা কার?” “বৌদির।” “বৌদি কে?” কি মুগ্ধল! বৌদিদিকে আবার বড়দাদা চেনেন না! সরি চারিদিকে চাহিল কেহ কোথাও নাই যে প্রসন্নটার উত্তরটা দিয়া দিবে। সরি বলিল “জানিনে তো।” “আমোল! বল্চিস্ বৌদি আর জানিসনে?”

সাবি মনে মনে বড়দাদার আগু ছুটিপূর্ণ কামনা করিল। কহিল “হ্যাঁ এখানা বৌদিদিরই তো।” “সে বৌদির নাম কি?” “তার নাম?” “হ্যাঁ। কি?” “নির্মলা” বলিয়া সাবি কাপড়গুলা বিশৃঙ্খলভাবে গল্প মাথায় জড়াইয়া ক্রত পদে ঘরে গিয়ে উঠিল। এবং নিদ্রিতা মাতার কোলের কাছে শুইয়া পড়িল। কক্ষান্তরে নির্মলা সাবিত্রীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল মুক্ত জানালা দিয়া একজোড়া অপলক চোখের উপর দৃষ্টিপাত মাত্র সবেগে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সে সরিয়া বসিল। সাবিত্রী মুখ ফিরিয়াইয়া দেখিয়া হাসিল। সেই সময় সরি হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিল “তোমার নাম বলে দিইচি।” সাবি উৎসুক হইয়া বলিল “কাকে রে?” “বড়দাদাকে” বধু গম্ভীর মুখে কহিল “বেশ” করেচ, ভারি কাজই করেচ কি বকশিস্ পেলে?” সরি অপ্রতিভ হইয়া কহিল “জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই” একটু চমকিয়া নির্মলা চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে নরেন ভাবিতেছিল বেশ দেখিতে হইয়াছে তো? এইবার ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমি এতদিন দেখিনি! তা সঙ্গে যেতে পেলোই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। এখানে তো এই খাটুনি খাটে সেখানে কেবল মাত্র হুজনার কাজ। তা আমিও বড় বাঁধা নই। প্রস্তাবটা কল্পে মন্দ হয় না। বিনয়ের কাছে কথা তুলিয়াছিল। বিনয় কহিল “বলে দেখ মাকে, বৌদিদিকে,—মা পাঠান যদি নিয়ে যাও। আর বৌদি যদি যেতে চান,” নরেন মনে মনে কহিল “যেতে আবার চাখেন না? ওর আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কি? নিয়ে যেতে চাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে।” বস্তুতঃ এই রকম জীলোকদের যে আবার একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে তাহা নরেন বিশ্বাসই করিতে পারিত না। তবে মাকে একবার বলা; কিন্তু বলি বলি করিয়াও যে মুখ ফুটিয়া মায়ের কাছে প্রস্তাব তুলিতে পারিতোছিল না। ক্রমশঃ তাহার ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, সে নির্মলার সহিত কথাবার্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

( ৩ )

সাবি ও সরিকে লইয়া গৃহিণী বাড়ীর সংলগ্ন প্রতিবাসীর টেকিতে কিছু হলুদ কুটিতে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সরিকে নির্মলার কাছে রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সরি আবার মায়ের কাছেই চলিয়া গিয়াছিল। নির্মলা একাকী বাড়ীর কাজ কর্ষ সারিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেলে সে নিয়মিত শাঁথ বাজাইয়া ঘরের ছয়ারে জলের ছিটা দিয়া দীপ জালিয়া তুলসীতলায় দিতে যাইতেছিল। ধূপের মৃদুগন্ধে ছোট প্রাঙ্গনখানি স্তব্ধভিত। নির্মলা তুলসী মূলে প্রণাম করিয়া নতমস্তক তুলিবামাত্র দেখিল সন্ধ্যার অস্পষ্ট ধূসর আলোকে তাহার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া নরেন। তাহার আপাদ মস্তক বারেক কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুত স্পন্দিত বুকটা সামলাইয়া সে মাথার কাপড় টানিয়া মুহূর্তে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নরেন ডাকিল “দাঁড়াও, শোন” নির্মলা অধোমুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের প্রদীপের মৃদুশ্মির সমস্তটা প্রায় তাহারই মুখখানি রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। নরেন কহিল “আমার ছুটি ফুরিয়েছে,—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?” নির্মলা মুখ তুলিল কিন্তু উত্তর করিল না। নরেন আগ্রহের সহিত কহিল “কি বল? যাবে তা হ’লে কেমন?” নির্মলা শান্ত স্থিরকণ্ঠে কহিল “কোথায়?” “আমার সঙ্গে, বাসায়।” “না।” আশ্চর্য্য হইয়া নরেন কহিল “যাবে না? কেন?” নির্মলা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল “যাবোনা।” “কেন শুনি।” “আমি গেলে ঠাকুরঝিদের নিয়ে একা মায়ের কষ্ট হবে।” “ওঃ তাই যাবে না, কিন্তু মা তো আমারই-মা, আর আমারই বোনু ওরা।” “হ্যাঁ,—আমার শাওড়ী ননদের কষ্ট হবে।” বলিয়া আর প্রত্যাভ্রের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া নির্মলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নরেন বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। নরেন ভাবিয়াছিল স্ত্রী তো তাহার, তাহারই ইচ্ছাধীন। যখন যেমন করিয়া ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া রাখিবে কিন্তু ফলে দেখিল ইচ্ছার অধীন হওয়া ত দূরের কথা তার নিজের ইচ্ছাটুকু সতেজে প্রকাশ করিবার পথটুকুও আর নির্মলার নিকট নাই। নির্মলার দৃঢ়তা এমনি কঠিন যে কোনও কথাই যেন আর সেটুকু ভেদ করিতে পারে না। বাত্রার দিন বেলা ১০টার সময় নির্মলা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করিতেলি। সাইকেল লইয়া বাহির হইতে হইতে, নরেন সেখানাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠেস্দিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে আসিয়া চোকাটের উপর দাঁড়াইল। নির্মলা নতমুখে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতে লাগিল।

নরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল “চল্লাম আজ তুমি ত আর গেলেনা” নির্মলা একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া মীরবে মুখ নামাইল। নরেন আবার কহিল “আচ্ছা সত্যিই তুমি যেতে চাও না! এবার নির্মলা মুখ তুলিয়া ধীরে অথচ তীব্রকণ্ঠে কহিল “না, আমি চাই যে এই শব্দের ভিটেতে একটু আশ্রয় পেয়ে থাকতে, আমার জন্যে কার কোন অভ্যস্ত জীবনের ধারা বদলাতে হয় এত আমি চাইনে, কিছু নই বলে, আমি খেলার পুতুলও নই।” নরেন এই তীব্র কৈফিয়তের মুখে এতটুকু হইয়া গেল। প্রতিবাদ করিয়া কোমল কণ্ঠে কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল কিন্তু সাবিত্রীর মনের আওয়াজে তাড়াতাড়ি দাওয়ার নীচে নামিয়া পড়িয়া সাইকেল টানিয়া বাহির হইয়া গেল। সাবিত্রী আসিয়া নির্মলাকে কহিল “বড়দা কি বলিয়াছিলেন বৌদি?” নির্মলার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল সে তাহা গোপন করিয়া কহিল “তা আমি তোমায় বলবো কেন?” সাবিত্রী কহিল “না তাই সত্যি বলনা কি বলছিলেন।” নির্মলা হাসি মুখে কহিল “যে মস্ত একটা খবর বলাই যায় না।” সাবি রাগ করিয়া কহিল “যাও, চাইনা শুন্তে।” নির্মলা ডাকিল “শোন শোন বলছি” সাবি করিয়া দাঁড়াইয়া আগ্রহভরে কহিল “বল” “চমৎকার একটা ব্যয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।” সাবি হাসিয়া ফেলিল কহিল “তুমি মর, তার পর বড়দাদার কথাটা ভাবিয়া তাড়াতাড়ি নির্মলার

কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল “না ভাই তুমি যেওনা গুঁর সঙ্গে, আমরা তোমায় ছেড়ে থাকতেই পারবো না ।” নিশ্চল মনের ভিতর সাবিত্রীর উৎকল মুখের পাশেই নরেনের স্নান মুখখানি জাগিয়া উঠিল ।

দিন কয়েক পরে দুই প্রহরের সময় নিশ্চল রান্না করিয়া বসিয়াছিল । চারি দিকে প্রথর রৌদ্রে ভরা । বিনয় আসিয়া গায়ের কোটটা খুলিয়া দিইর আলনার উপর রাখিতেছিল, নিশ্চল হাসিতে হাসিতে কহিল “আচ্ছা ঠাকুরপো ছপুর যে উৎসব চললো গিদে-তেষ্টাও কি পায়না বাপু তোমার ।” গায়ের গাঞ্জিটা খুলিতে খুলিতে মুচ হাসিয়া কহিল “দেবী তো তোমার জন্যই হয়ে গেল বোদি যে ভারী জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার, জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁটতে হয়েছে” নিশ্চল বিস্মিত হইয়া কহিল “সে আবার কি আমার আবার কি এনেছ ?” “এই দেখনা” বলিয়া বিনয় কোটের পকেট হইতে টানিয়া একখানি সূদৃশ্য রঙ্গান খাম বাহির করিয়া নিশ্চল হাতে দিল নরেনের হাতের লেখা নিজের নামটার দিকে চাহিয়াই নিশ্চল মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল । সে আর লজ্জায় বিনয়ের দিকে চাহিতেও পারিল না । পত্রখানি মুঠার ভিতর চাপিয়া লইয়া ঘরে গিয়া খুলিল । পত্রের প্রতি ছত্রই এই আকস্মিক অনুরাগের আবেগসম্মত প্রলাপে পরিপূর্ণ । যে আবেগ সঞ্চারের পূর্বেই নিশ্চল বক্ষগুহা ধসিয়া থিতাইয়া গিয়াছে এই সামান্য আন্দোলন তাহা বোলাইতে পারিল না । বরং তাচ্ছল্য ভরে নিশ্চল মুচ হাসিল । এসব কিছুতেই তাহার আকাজ্জা নাই । তার জীবন কেবল মাত্র তাৎ নিজের সুখ ভোগে ভরিয়া রাখিতে সে চায় না, বিশেষ বৈধানে সম্প্রীতির অপেক্ষা অপ্রীতির সম্ভাবনা অধিক । গৃহিণী আসিয়া কহিলেন “বোমা চিঠিখানা নরেনের তো, পৌছন সংবাদ দেওয়া তো তার স্বভাবে নেই, ভাল আছে তো ? মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়াই নিশ্চল সরিয়া পড়িল । আকস্মিক বস্তুর উপর যে অদমনীয় ঝোঁক চাপে, আকাজ্জার নিবৃত্ত না হইলে সে উত্তরোত্তর তীব্র চর্দাম হইয়া উঠে । ইহারই উত্তেজনায় নরেনের দিব্যাত্রিগুলো কাটিতেছিল । নিশ্চল উপেক্ষা তাহার আরো যোগ্য বাড়িয়া দিয়াছিল । ষ্টেনে বসিয়া মনে হইতে লাগিল—অভ্যাস পরিবর্তন করিতে হইবে ।

( ৪ )

গৃহিণী স্নান করিতে গিয়াছেন, সাবি রান্নাঘরে উনানে আগুন দিয়াছে, কয়লার ধূমে বাড়ীখানা অন্ধকার । নিশ্চল ঘর দ্বার আঙ্গিনা গোবর-মাটি দিয়া স্বেপিতেছিল, নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল । সেখানকার পুরাতন ইয়ারবুদ তাহাকে কিছুতেই নুতন হইতে দেয় না তাই চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া আসিয়াছে । মা প্রসন্ন করিলে কহিল “ষ্টেনের লোকগুলো খারাপ, তারা ছাড়ে না, তাদের তো বয়ে গেলেও চলে, আমার আর ও-সব ভাতে ডুবে থাকলে চলে কই ?” মা মনে মনে হারির লুট মানত করিয়া কহিলেন “তা হলে এখন বাড়ীতে থাকবি তো ?” “দেখিলে দিনকতক” বলিয়া সে এদিক তদিক চাহিয়া কহিল “মা ওরা আছে তো !” মা অপ্রতিভভাবে কহিল “তা পাঠিয়ে দিলেই হবে ।” “না না তা বলিচেন থাকুন তোমার সেবা টোবা করুক ।” মা একটু হাসিলেন ।

পর বৎসর, বছর-খানেক নুতন খণ্ডরঘর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী নিশ্চলকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল “কই বোদি তোমার ধোকা কই !” নিশ্চল হাসিয়া কহিল “তোমারটা আগে দেখাও” । নিশ্চল বকে মুখ লুকাইয়া সাবিত্রী কহিল “খোৎ” সরির কোলে থোকর মুচ কাকলী শুনিয়া তাতাকে কোলে লইয়া একটু হাসিয়া ঠোক টিঙ্গিয়া কহিল “বড়না ?” নিশ্চল হাসিল “না সত্যি বল গিয়ে একটা প্রণাম করিগে” অঙ্গুলী নির্দেশে ঘর দেখাইয়া দিয়া তাসোজল মুখে নিশ্চল কহিল “যাও ভাই বদলে ভাল হয়ে গেছেন ভয় নেই ।” “আমার আবার ভয় কত হবে কেন ?” বলিয়া সাবিত্রী নরেনকে প্রণাম করিতে গেল । কয়েক দিন পর একজন বাউল তাহাদের লুগর দিকে ঘাসের উপর বহিয়া পাইতেছিল—“সংসার ধোকর টাটি । গড়ে যখন যোগী তখন

তুমি প'ড়ে খেলাম মাটি,—খাজীতে কেটেছে নাড়ী মায়ায় বেড়ী কিসে কাটি।" নরেন পা মাচাইতে মাচাইতে শিশু মহাযোগে বই পড়িতে ছিল "রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটি।" নির্মলা কহিল "কি বোল্‌তে তুচ্ছা?" "তুচ্ছ" "লোকটা শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষর দেখু'চি" "তা—কেন গান ত আর ওয়ি তৈরী নয়?" নির্মলা সহাস্যে কহিল "তুমি কি বল কথাটা সত্যি? বিষের বাটি?" "নয় তো কি?" "বটে? কিসের চেয়ে শুনি।" ময়েম বই নামাইয়া নির্মলার স্থির ধীরোজ্জ্বল মুখপানে একদৃষ্টে দৃষ্টে চাহিয়া কহিল "সব কিছুই চেয়ে গো সব বিষের চেয়ে তীব্র বলেই তো সকল কিছুই অমৃত। তবে যথার্থ রমণী হ'তে জান্‌লে হয়।" নির্মলা স্বামী পায়ের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল—

হে ভগবান জন্মে জন্মে যেন এই সার্থকতা লাভ ক'রিতে পারি।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

## এ যে তোমার ধরা।

সারাটি দিন কি যে কথা বলিস অনর্গল  
 হেথায় ও-সব বুঝবে কেবা বল?  
 যে দেশ হ'তে এলি রে তুই সেই প্রদেশের ভাষা  
 হেথায় কেহ বুঝবে আছা নাহি যে তাহার আশা  
 স্বর্গীয় ঐ মধুর ভাষা যাও মা হেথায় ভুলি  
 হেথায় তোমার শিখতে হবে নূতন রকম বুলি।  
 হর্ষ কৃষ্ণন চলবে নাক বাছা  
 এ নয় তোমার কাননভূমি—এ যে তোমার খাঁচা।  
 সারাটি দিন কি যে করিস খেলনাগুলি নিয়ে  
 কি হবে হায় হেথায় ও-সব দিয়ে।  
 যে দেশ হতে এলি রে তুই সেই প্রদেশের খেলা  
 সঙ্গী কোথা? চলবে না ক হেথায় সারা বেলা।  
 তোমার সাথে যোগ দেবে কে ফেলে সকল কাজে,  
 কারাগারের মতন হেথায় কাজের শাসন রাজে।  
 হেথায় লীলা নেই ক সুধা ভরা  
 এ যে তোমার স্বর্গ নহে—এ যে তোমার ধরা।

শ্রীকালিদাস রায়।

## বিবাহ ও বিবাহের পণ।

-:~:

জিজীবিষা একটা মূল তত্ত্ব। জীব-মাত্রেই বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কেন করে? এ প্রশ্নের উত্তর মাই। ঘোরতর শোক, দুর্ভিক্ষ অমৃত্যু বা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে কোন মনুষ্যই মরিতে ইচ্ছা করে না। মরিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াই মনুষ্য এবং মনুষ্যভেদে প্রত্যেক জীব আহার সংগ্রহ করে। কেন না প্রত্যেক জীবই মুখ্য বা গৌণ ভাবে জনে যে আহার দ্বারা শরীর রক্ষা না করিলে শরীর লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অন্য কোন উপায় নাই! কিন্তু আহার দ্বারা যতই যত্নপূর্বক এই শরীর রক্ষা করা হউক না কেন সে কেবল কিছু দিনের জন্য। অল্প দিনের মধ্যেই হউক বা কিছু অধিক দিন পরেই হউক, মৃত্যু অর্থাৎ এই শরীরের নাশ হইবেই হইবে। এই জ্ঞান অল্পবিস্তর অশুভ ভাবে সভ্যসভ্য সকল মনুষ্যেরই আছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জিজীবিষাও আছে। ইহার ফলে মৃত্যুর পরও এই শরীর বা শরীরের কোন অংশ, অথবা শরীর সংস্কৃষ্ট কোন বস্তু, অন্তত নামটা যত দিন সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা মানবের প্রত্যেক সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপায় ব্যতীত আর এক উপায়ে প্রত্যেক জীবই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। প্রত্যেক জীবেরই শরীর ও মনের অংশ লইয়া নূতন জীবাণু উৎপন্ন হয়—যাহাকে সম্ভান বলে। সেই সম্ভান হইতে আবার সম্ভান উৎপন্ন হয়। এইরূপ উৎপত্তির শেষ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবই বংশ-পরম্পরায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই জ্ঞান অল্পাধিক অশুভ ভাবে প্রত্যেক মনুষ্য এবং মনুষ্যভেদে জীবেরই আছে। সেই জন্য প্রত্যেক জীবেরই মনে প্রবল অপত্যস্নেহ। কেন না অপত্য, জীবের জন্মান্তর মাত্র। এই অপত্য-সম্ভব কেবল বিবাহ দ্বারাই সংঘটিত হইতে পারে। অপত্য উৎপাদনের অন্য উপায় নাই। সেই জন্যই প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে ইহলোকে বাঁচাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রবল যৌন আকর্ষণ স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। বিবাহ করিতে পুরুষেরও যেমন প্রবল ইচ্ছা স্ত্রীরও তেমনিই প্রবল ইচ্ছা। জীবের বর্তমান শরীর লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহাৰ্য্যের প্রতি যেমন প্রবল আকর্ষণ, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভ পূর্বক নব কলেবর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিবাহের প্রতিও তেমনিই প্রবল আকর্ষণ। যে জীব আহার ত্যাগ করিয়া বর্তমান শরীরের ধ্বংসসাধন করে সে যেমন আত্মহত্যা করে, যে বিবাহ না করিয়া অপত্য সম্ভাবনা বন্ধ করে সেও তেমনিই আত্মহত্যা করে। বিবাহ স্ত্রীও পুরুষের সমান স্পৃহনীয় হইলেও জীবরাজ্যে আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই যে পুরুষই বিবাহের জন্য অধিকতর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা করে। স্বাভাবিক অবস্থার অর্থাৎ অল্পাধিক অল্পত মানব-সমাজে এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে পুরুষ স্বীয় বলবিক্রম দ্বারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া বিবাহ করে। সীতার জন্য রামকে, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার জন্য ভীষ্মকে, দ্রৌপদীর জন্য পাণ্ডবদিগকে, গোপার জন্য বুদ্ধকে শারীরিক বলবীৰ্য্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন স্ত্রীরা বীৰ্য্যশূন্য ছিলেন—অর্থাৎ শৌর্য্য বীৰ্য্য প্রদর্শন না করিলে তখন স্ত্রী লাভ হইত না। কিন্তু মানব-সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলের প্রাধান্য আর পূর্বের মত রহিল না। ধন-বল ও বিদ্যা-বল কোন কোন স্থানে তাহার সমকক্ষ, কোন কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সকল বলেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। এই উদ্দেশ্য ধন দ্বারাই মুখ্যভাবে সাধিত হইয়া থাকে। কেন না যে বিদ্যা দ্বারা

প্রয়োজনীয় আহাৰ্য্যের সংস্থান বা ধনাগম হয় না সে বিদ্যা নিম্নল। এই জন্যই সভ্যদেশে বিবাহ করিতে হইলে স্বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে বর্তমান ধনবল, বা বিদ্যাবলে ভবিষ্যতে ধনাগমের সম্ভাবনা, প্রদর্শন করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কন্যার অভিভাবককে ধন দান করিয়া জ্বীলাভ হইয়া থাকে। আসামে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে এবং বঙ্গদেশে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এখন বঙ্গদেশে ইহার ঠিক বিপরীত প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন কন্যার পক্ষ হইতেই বিবাহের জন্য স্বরকে টাকা দিতে হয়। এক্ষণে পরিবর্তনের কয়েকটা কারণ আছে। প্রথম কারণ অর্থনীতি, দ্বিতীয় কারণ আমাদের ধর্ম্মের অমুশাসন। পূর্বে অতি অল্প আয়াসেই সকল শ্রেণীর লোক গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিত। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া এবং অশিক্ষিত বৈদ্যেরা বাঁশের নলের মধ্যে কিছু ঔষধের টিকা সংগ্রহ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তাহা অতি অল্প হইলেও সেকালে সংসার চালাইবার পক্ষে প্রচুর ছিল। অশিক্ষিত কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণের লোক জাতীয় বাবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু এখন আর সেক্ষণ উপার্জনের সুগম পন্থা নাই। বিশেষতঃ এখন দেশীয় ও বিদেশীয় যৌথ বাণিজ্যের ফলে সমস্ত বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় যৎসামান্য টাকায় জীবিকানিকাশ হইতে পারে না। ইহার উপর শিক্ষার ফলে আমাদের জ্বীলোকের অবস্থার অনেক উন্নত হইয়াছে এবং শিক্ষিত পুরুষেরা জ্বীলোকদের অবস্থা আরও ভাল করিতে প্রচেষ্টা করা কর্তব্য বোধ করেন। পূর্বে লক্ষ পরিবারের মধ্যে এক পরিবারে পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত কিনা সন্দেহ। বাড়ীর জ্বীলোকেরাই রন্ধন কায়া করিতেন। এখন প্রায় ঘরে ঘরেই পাচক ব্রাহ্মণ। পূর্বে জ্বীলোকের কোন শীতবস্ত্র ছিল না। এখন তাঁহারা সেমিজ, জামা, রূপার প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পূর্বে তাঁহাদের পরিহিত শাড়ী নাসে একবারও রজকালয় দর্শন করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন প্রাতি সপ্তাহে তাহা হইয়া থাকে। পরিবর্তন এতই হইয়াছে যে সেদিন রাজা রামমোহন রায়েব এক স্মৃতিসভায় যখন রাজার লিখিত জ্বীলোকের অবস্থার বর্ণনা পাঠ করা হইল তখন কতিপয় যুবক তাহা বিখ্যাসই করিছেন না—সেই বর্ণনাকে “অতিরঞ্জিত” “মিথ্যাকথা” প্রভৃতি বিশেষণ অভিহিত করিলেন। এহ সকল শুভ পরিবর্তনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অথচ দেশে বোরতর দারিদ্র্য। ভদ্রবংশীয় যুবকগণ প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ না করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাহারা কেহ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন কেহবা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উপার্জন করিতে আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের শাসনে বা দেশাচারের প্রেরণায় কন্যা পক্ষের লোকেরা তাহাদগকে স্থির থাকিতে দেন না—বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করেন—এবং যুবকাদগের ইচ্ছিত সময়ের পূর্বে বিবাহ করায় তাহাদের যে ক্ষতি বা অশ্রুবিধা হইবে তাহার নিরাকরণ জন্য পণ দেন। কেন না একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দিয়া কোন কাজ করাষ্টতে হইলে তাহাকে টাকা না দিলে সে কেন সেই কাজ করাবে?

ইহা ভিন্ন পণ-প্রথা প্রবর্তিত হইবার আরও কারণ আছে। তাহারও মূলে অর্থনীতি। পূর্বে আমাদের সমাজ অনেক বিষয়ে একায়ত্তীয় পরিবারের মত ছিল। দৈনন্দন ব্যয় বাতীত যখনই কোন পরিবারে এমন কোন শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটিত যাহাতে আতরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক তখনই সমাজের প্রত্যেক পরিবার হইতে টাকা ও স্রব্যাদি সাহায্য দিয়া সহায়ভূতি প্রকাশ করা হইত। কাহারও মৃত্যু হইলে সকল জাত-বাড়ী হইতে মৃতব্যক্তির পুত্রের জন্য কাপড়, আতপ চাউল, মাংস, ঘৃত, চিনি, কলা, আসত। শ্রাদ্ধের সময়ে জাত, কুটুম্ব এবং ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরও টাকা দিয়া সাহায্য করত। যেন সকলেরই সেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য। কাহারও বাড়ীতে পূজা হইলে প্রতিবাসিন্য চাউল, তরকারি, পাঁচ, ঘৃত এবং প্রণামী টাকা পাঠাইতেন। কাহারও সন্তান হইলে

অন্নপ্রাশনের সময়ে প্রতিবেশীগণ সেই সন্তানের হাতে টাকা দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। বিবাহ উপস্থিত হইলে একবার অব্যাহতির সময়ে আর একবার পাকস্পর্শের সময়ে বস্ত্রাদি এবং টাকা নবপরিণীত দম্পতী, প্রতিবেশীগণের আনন্দ ও সহানুভূতিসূচক উপহার পাইত। এই সূত্রপা—শোকের সময়ে এবং আনন্দের সময়ে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ—এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। চুঃখের বিষয় এই সুন্দর প্রথা স্বর্কপথে স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকগুলি বিধবাবিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করায় তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল। সেজন্য ৬প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটে প্রস্তাব করিলেন যে দেশের উপকারের জন্যই যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এত ঋণ হইয়াছে তখন দেশের সকল লোকেরই কিছু কিছু টাকা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঋণ-মুক্ত করা উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন স্থানান্তরে ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এডুকেশন গেজেটে লিখিলেন যে দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন করাকে তিনি ধর্মকার্য্য মনে করেন এবং ধর্মকার্য্য সাধারণে তাঁহাকে সাহায্য করিবে ইহা তিনি ইচ্ছা করেন না সূতরাং তিনি অর্গসাহায্য গ্রহণ করিবেন না। তাহার পর এখন এমনও হইয়াছে যে শ্রদ্ধ সময়ে কাহাকেও টাকা পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা ফেরত দিয়া লিখেন “আমার পিতৃশ্রদ্ধ আমি নিজেই করিব। তাহাতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিব না।” কিন্তু অন্যো তাঁহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য কিছু ব্যয় করিলে কি দোষ হইতে পারে? এখন বিবাহ প্রভৃতি সময়ে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলিতেই এইরূপ ফুটনোট দেখিতে পায়া যায় “লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।” যখন সমাজের এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে এবং সমাজে যখন ঘোরতর দারিদ্র্য বিদ্যমান, অথচ বিবাহ যখন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তখন যে পক্ষ সেই ব্যাপারের প্রধান এবং প্রথম উদ্যোগী তাঁহারাই অগত্যা পণরূপে সেই ব্যয় বহন করেন। বিবাহে যে কেবল একবার মাত্র অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা নহে। ইহার ব্যয় পুনঃপোনিক, প্রথমে বরের বাড়ীর সকলকে ভাল বস্ত্রাদি দিতে হয়। তাহার পর আত্মীয়-বন্ধু লইয়া কন্যার বাড়ীতে বাইতে হয়। বিবাহের পর কন্যার কুটুম্ব-কুটুম্বিনী গুরুপুরোহিতকে প্রণামী দিতে হয়, বাদ্যকর প্রভৃতিতে পুরস্কার দিতে হয়, নববধূ গৃহে আসিলে আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু ব্যক্তিকে ভোজ্য দিতে হয়, বিনাহিত যুগল অন্তত কিছুদিন যে আমোদ-আহ্লাদে কাটাইবে তাহার জন্য তাহাদিগকে বিলাসদ্রব্য দিতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও কতরূপ অপরিহার্য্য ব্যয় আছে। বরপক্ষ যখন এই ব্যয়ের ভয়ে যুবককে বিবাহ দিতে চাহেন না তখন বিবাহের জন্য অধীর কন্যাপক্ষকেই সেই ব্যয়ের জন্য পণ দিতে হয়।

যাঁহার বিবাহযোগ্য্য কন্যা আছে তিনি “কন্যাদায়গ্রস্ত”। তিনি আপনাকে মহা বিপদগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন। কন্যা অতি স্নেহের পাত্রী হইলেও সে পিতার পক্ষে অতি পীড়াদায়ক ভার স্বরূপ। সেই ভার আর একজনের স্বন্ধে আরোপ করিয়া তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাচেন এবং যিনি তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করেন তাঁহাকে টাকা দেন। আর একটা কারণ এই যে পুত্রবান্ ব্যক্তির পুত্রেরাই তাঁহার সমস্ত বিস্তার অধিকারী হইয়া থাকে, কন্যার কিছুই পায় না। এই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ স্বরূপেও বরপক্ষ হইতে পণ চাওয়া হইয়া থাকে।

এখনকার শিক্ষিত লোক মাত্রেয়ই মত এই যে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান না করিয়া যুবকদিগের বিবাহ করা উচিত বহে। কিন্তু বঙ্গদেশের উদ্রলোকদিগের শতকরা নব্বই জনেরই সেরূপ সংস্থান নাই। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে সমাজে কেবল দারিদ্র্য বাড়িবে। বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক পুরুষের হাতে কিছু



অর্থ থাকে উচিত। সেই অর্থ যুবকেরা সংগ্রহ করিবার পূর্বেই যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন তাহাদিগকে অবশ্যই পণ দিতে হয়।

এই সকল এবং আরও নানা কারণে বঙ্গদেশে বরপণ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। সংসারে কোন বস্তুই অমিশ্র ভাল বা অমিশ্র মন্দ নহে। বরপণও সেইরূপ। বরপণ প্রচলিত হওয়ায় এখন আর বালাবিবাহ হয় না। কেননা বরের জন্য পণ সংগ্রহ করিতে করিতে কন্যার বয়স বাড়িয়া যায়। এখন বহু পরিবারের সন্তের আঠার এবং তদধিক বয়স্কানুতা বালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নহে। বয়স একান্ত অধিক হইলে কন্যাদিগের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায় সুতরাং তখন তাহাদের বিবাহ হওয়া আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

বরপণের ফলে প্রত্যেক জাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী এবং কোলিনা প্রথা উঠিয়া যাইতেছে এবং হয় ত জাতিভেদও উঠিয়া যাইবে। ইহাতে কেহ আফ্রাদিত, কেহ বিবাদিত। আমার বিবেচনায় জাতিভেদ উঠিয়া গেলে দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

যে সকল লোকের অন্তঃকরণ সংগ্রহ না করিয়া এবং কন্যা-প্রজনন সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং এখন কন্যার পিতা হইয়া পণের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া অল্প বিত্ত এবং বিত্তহীন লোক বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিবে। তাহাতেও সমাজের কল্যাণ।

বরপণ দ্বারা বিবাহের অপব্যয় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এখন অল্প বিবাহেই বাজী পোড়ান, বাইনাচ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

বরপণ প্রথার সর্বপ্রধান মঙ্গলনয় ফল এই যে নব পরিণীত দম্পতি সংসারে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে হাতে কিছু টাকা পায়। যদি প্রত্যেক পরিবারে এইরূপে সংসার যাত্রা আরম্ভ হয় তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। সুতরাং বরপণ প্রথা বন্ধ করা উচিত কি পণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত তাহা সাধারণের চিন্তার বিষয়।

বরপণের জন্য বহু দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং বহু লোকের বড় কষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু জগতে এমন কোন শুভ অগ্রদূত আছে যাহাতে কোন না কোন লোকের কষ্ট না হয়? যেখানে পূর্বে চাউল, দুধ, মাছ সুলভ ছিল এখন রেল হওয়ার সেই স্থানের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য কতক লোকের কষ্ট অপরিহার্য্য।

বর পক্ষ “অন্যায় করিয়া” “জোর করিয়া” অধিক টাকা লইয়া থাকেন এইরূপ অভিযোগের কোন অর্থ নাই। পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া না দেওয়া কন্যা পক্ষের ইচ্ছা। যেস্থান হইতে পণের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া বোধ হয় সেখানে কন্যার বিবাহ না দিলেই ত হয়। বরপক্ষ কখনই কাহাকেও এমন কথা বলিতে পারেন না যে তোমার কন্যাও দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এত টাকাও দিবে। যোল টাকা দর্শনার চিকিৎসকও আছেন এক টাকা দর্শনার চিকিৎসকও আছেন। তুমি যদি যোল টাকা দিতে না পার বা ইচ্ছা না কর তাহা হইলে এক টাকার ডাক্তারের কাছেই যাইবে। কিন্তু যোল টাকার ডাক্তারকে দোষ দিতে পার না। ব্যারিষ্টার রায় সাহেব প্রত্যহ পাঁচশত টাকা লইয়া থাকেন কিন্তু উকীল মল্লিক মহাশয় পাঁচ টাকার অধিক চাহেন না। মকদ্দমাকারী সাধারণ নিকটে ইচ্ছা যাইতে পারে, রায় সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া সে কখনই বলিতে পারে না যে তিনি “অন্যায় করিয়া” বা “জোর করিয়া” তাহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা লইলেন। হরি বাবু অষ্টালিকাতেই বাস করুন বা কুটীরেই থাকুন, তুমি যখন মনে কর যে তোমার কন্যা তাহার বাড়ীতে বাস করিলে অর্থাৎ তাহার পুত্রবধূ হইলে সেও দুর্ধে থাকবে, তুমিও সম্মানিত হইবে তখন তিনি যে পণ চাহিবেন তাহা দিতে সম্মত হইলেই বিবাহ হইবে। তুমি যদি

তাহা দিতে অসম্মত হও তাহা হইলে অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে তোমাকে হরিবাবু কখনই বাধা দিতে পারেন না। সুতরাং “জোর” “অন্যায়” প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার প্রতি প্রয়োজ্য হইতে পারে না।

বরপণে আপত্তিকারীরা বলেন যে শিক্ষিত সমাজে নারীর সম্মান বর্দ্ধিত হওয়া উচিত,—যদি কন্যার সঙ্গে কতক-  
 \* গুলি টাকাই দিতে হইল তাহা হইলে তাহার সম্মান ও আদর রহিল কোথায়? কিন্তু নারীর সম্মানের লাঘব কত  
 কন্যা পক্ষের লোকেই করিয়া থাকেন। কন্যা রত্ন স্বরূপ। রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না বরং অন্বেষিত  
 হয়। নরত্ন মন্দির্য্যতে মৃথতে হি তৎ। কন্তাপক্ষীয়েরাই ত বর অনুসন্ধান করিয়া নারীর সম্মান থরু করিয়া দেন।  
 অত্র পক্ষে শিক্ষিত বর বলেন “আমি বিবাহ করিয়া আমার পত্নীকে দাসীর মত রাখিতে চাহি না—মহিলার মত  
 সম্মানে রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সেক্ষেপে রাখার উপযোগী অর্থ আমার নাই।” ইহা শুনিয়া কন্তাপক্ষীয়েরা  
 বলেন যে তাঁহারাই সে অভাব পূর্ণ করিবেন। তখন ও বর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে কি কন্তার প্রতি  
 অসম্মান করা হয় না?

সুশ্রী, সুশিক্ষিতা এবং সৎস্বভাব কন্তা ভাল ভাবে থাকিবার অধিকারিণী, সুতরাং সেই কন্তার অত্র অধিক পণ  
 দিতে হয়। অত্র পক্ষে রূপ হীনা অশিক্ষিতা কন্তার বিবাহেও অধিক পণের প্রয়োজন কেননা বিনা পণে তাহার  
 বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রূপ হীনা, অশিক্ষিতা বিকলাঙ্গী কন্তাকে বিবাহ না করিতে যেমন যুবক মাত্রেই স্বাধীনতা আছে তেমনি  
 যৌতুকহীনা কন্তাকে বিবাহ না করিতেও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তবে কি যাহারা পণ দিতে পারে না  
 তাহাদের কন্তার বিবাহ হইবে না? হইতে পারে কিন্তু কন্তাপক্ষীয় লোকের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত পাত্রের সহিত নহে।

যাহারা আইন করিয়া বরপণ উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন যে সেই সঙ্গে একরূপ আইন  
 করিতে হইবে যে কন্তার অভিভাবক যে কোন ব্যক্তিকে বিবাহের প্রস্তাব করিবেন সেই ব্যক্তিই তাঁহার কন্তাকে  
 বিবাহ করিতে বাধ্য—না করিলে দণ্ডনীয় হইবে। আইনে একরূপ একটা ধারা না বসাইলে, কেবল পণ নিবারণের  
 অত্র আইন কখনই কার্য্যকর হইবেনা। সেক্ষেপ আইন প্রচলিত হইলে দেশ মধ্যে আরও হাহাকার উঠিবে। কেন  
 না তাহা হইলে দেখা যাইবে যে অধিক সংখ্যার যুবকই বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে।

যদি বরপণ প্রথা তিরোভাবিত করা কর্তব্য বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে একমাত্র উপায়ে তাহা সাধিত  
 হইতে পারে। কন্তাপক্ষীয়েরা যেন বর অন্বেষণ না করেন। কিন্তু একরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে প্রথমে  
 আমাদের ধর্ম্ম ও শিক্ষার সংস্কার করিতে হইবে।

সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে ধনাগমের আশায় যে সকল যুবক বিনা পণে বিবাহ করেন  
 তাহাদের হৃদয় অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে বরপণ সমর্থক আমার একটা প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকার  
 প্রচ্যাপদ ত্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এইরূপ কয়েকটা কথা লিখিয়া ছিলেন “প্রবন্ধ লেখক বরপণের পক্ষে যে সকল  
 যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কুংকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।” ভারতীতে সেই প্রবন্ধ পাঠাইবার পূর্বে আর  
 কয়েকখানা পত্রিকায় উহা পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু সম্পাদকেরা তাহা ছাপাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই  
 পত্রিকার মধ্যে একখানিতে সম্প্রতি বরপণ সমর্থন করিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু  
 অদ্যাপি তাহা পাঠ করি নাই। নারায়ণ পত্রিকার প্রবন্ধ দেখিয়াছি। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ বরপণের সমর্থক  
 নহে বিরোধীও নহে। ইহাতে কেবল বরপণ প্রথার কারণ, সেই প্রথা নিরাকরণের উপায় এবং তাহার ফলাফল

নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। বরপণ প্রথা যখন দেশের একটা প্রধান সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে তখন ধীর ভাবে সমাজের নেতারা ইহা মীমাংসা করেন এই অভিপ্রায়েই আমি ইহা লিখিয়াছি। যাহারা এই প্রবন্ধ সমালোচনা করিবেন \* তাঁহাদিগকে আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিবেন যে গালাগালি ও যুক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

## মাতৃ পূজা।

—ঃ\*ঃ—

রামপ্রসাদী হর—একতাল।

( ওমা ) মিলেছি মা তোৰ আজি মধুর ডাকে ॥

( মোরা ) হিংসা বন্দ গোছি ভুলে,  
প্রাণ্ আমাদের গেছে খুন্নে,  
এসেছি মা পূজা দিতে

ছুটে তাইতে মিলে তোকে ।

মান্ অভিমান্ ছোট খাটো

ফেলেছিল চোখে কুটো,

এতদিন্ তাই দেখিনিকো,

( এখন ) ভরেছে প্রাণ্ তোরে দেখে' ।

( এবার ) পূজায় যেন বুঝ্তে শিখি—

তুই মা মোদের সবার একই ;

ভারে ভারে যেন ভাল বেসে

হাসি অনুতে পারি মুখে ।

শক্তিময় তোৰ হৃদ্য খেয়ে,

চলেছি মা মাতৃব হরে ;

শত বাধায় আর ফিরতে না হয়,

এই মত বল্ দেয়া বুকে ।

ত্রিশ কোটা তোৰ ছেলে মিলে

অভভেদী মহান্ সুরে,

( তোরে ) ডাক্বে যবে মা মা বলে,'

সাড়়া পড়্বে বিশ্বলোকে ॥

শ্রী কিত্তজনাথ ঠাকুর।

## স্বরলিপি ।



কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

[পা পা] ১' ২ ০ ০ ১

গা গা II { গা গা -২গা | -রসা সা ররা | গা গা -১ | মা পা -১ } I

ও মা মি লে ছিমা তো. র আজ ম ধু র ডা কে .

১' ২ ০ ০

I পপা ধা ধা | ধা -১ ধা | ধা সা -১ | না ধনা স'নধপা I

মোরা হিং সা ঘ ন ঘ গে ছি . ভূ লে. ....

১' ২ ০ ০

I ধা সা' না | সা' রা' -১ | সা' সা' ধা | সা' সা' -১ I

এা ৭ আ মা দে র গে ছে . ধু লে .

১' ২ ০ ০

I পা ধা সা' | সা' সা' -১ | সা' সা' -১ | না না ধা I

এ লে . ছি মা . পু জা . দি তে .

১' ২ ০ ০

I ধনা -স'রা' রা' | সা' না -স'না | ধনা-পধা -ধপা | মধা পা -১ I

ছ. টে. . তা ই তে. . মি লে. . . তো. কে .

১' ২ ০ ০

II { পা ধা ধা | ধা ধা ধা | সা' সা' -১ | না ধনা -ধপা I

(১) মা ন অ ভি মা ন ছো ট . খা টো. . .

(২) পু জা র যে ন বু ঝ তে . শি থি. . .

(৩) শ ক্তি ম র তো র হু ঝ . থে য়ে. . .

(৪) ত্রি শ কো টা তো র ছে লে . মি লে. . .

১' ২ ০ ০

I না না -১ | সা' রা' -গ'রা' | সা' স'না -ধনস'রা' | (সা' সা' -১) } I

(১) কে লে . ছি ল . চো থে . . . . . কু টো .

(২) তু ই মাঝে বে র . স বা . র . . . . . ক ই .

(৩) চ লে . ছি মা . মা ধু . ব . . . . . হ য়ে .

(৪) অ ভ . তে দি . ম হা . ন . . . . . স্ব য়ে .

০

| সা' সা' ধা I

(১) কু টো .

(২) ক ই .

(৩) হ য়ে .

(৪) স্ব য়ে (তোয়ে)

১	২	০	৩
I ধা সাঁ সাঁ   সাঁ সাঁ সাঁ   সাঁ সাঁ -১   সাঁ না -সঁনা I			
(১) এ ত দি ন তা ই দে থি • নি কো ••			(এখন)
(২) ভা যে ভা রে যে ন ভা ল • বে সে ••			
(৩) শ ত বা ধা য় আ র ফি য় তে না হয়			
(৪) ডা • ক বে য় বে মা মা • ব লে ••			
১	২	০	৩
I ধা -ধনা সঁরাঁ   সাঁ না -সঁনা   ধনা পা -ধপা   মধা পা -১ II II			
(১) ড •রে ছে• প্রা ৭ •• তো• রে •• দে• থে •			(এবার)
(২) হা •সি আ• ন তে •• পা• রি •• য়• থে •			
(৩) এ •ই ম• ত ব •ল দে• মা •• বু• কে •			
(৪) সা •ড়া প• ড় বে •• কি• য় •• লো• কে •			

## মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরি ।

:-:-

ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ উচ্চ বা যশস্বী হইতে পারে না, অথবা নির্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকাল থাকিবে এরূপ নহে। লোকে স্বীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই মনুষ্যপদবাচ্যে হইয়া থাকে। অনেক সময় সাধারণের মধ্যে এরূপ অনেক বিশেষ হৃদয়বান ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি দেখা যায় যে, তাহাদের সহিত অনেকের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের নাম প্রচারের জন্য লালায়িত নহেন। কাজেই তাহাদের নাম সকলের নিকট পরিচিত নহে।

মালদহ মুকদম্পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোসাইজী মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরি মহাশয় এই শ্রেণীর ব্যক্তি; তাঁহার নাম বাঙ্গলার অতি অল্পলোকেই জানেন। তিনি জমিদার বা অর্থশালী লোক নহেন। আমাদের দশজনের ন্যায় একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক মাত্র। তবে তিনি গৃহস্থ নহেন;—গিরি সম্প্রদায় ভুক্ত জনৈক সন্ন্যাসী। তাঁহার সাধারণের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, অমুরাগ ইত্যাদি পর্যালোচনা করিলে হৃদয়ের সঙ্গীর্ণতা কণিকের নিমিত্ত অন্তর্হিত হয়। যে কেহ মোহান্তজীর সহিত কিছুদিনের জন্য মিশিয়াছে, সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছে তাঁহার হৃদয় কিরূপ পরহৃৎকাতর। মেট্রোপলিটন কলেজের পালিভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ যখন (মালদহ) কলিগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি হইয়া আগমন করেন, তখন তিনি ও তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বদ্ভাষী কিছুকালের জন্য শ্রীযুক্ত গোসাইজীর সহিত সদালাপে এতদূর সন্তুষ্ট ও গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের নিজ “সঙ্কল্প” পত্রিকায় গোসাইজীর ফটোসহ গুণকীর্তি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার কয়েকটি লোকহিতকর কার্যের উল্লেখ করিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গত আট বৎসর হইতে তিনি আর্থের কষ্ট লাঘব করিবার মানসে রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। মোহান্তজী অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করিয়া এই আট বৎসর কাল স্বস্তে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া উক্ত কাষ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অনেক হুরারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার দাতব্য-চিকিৎসালয় হইতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৫০ জন রোগী ঔষধ লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ কোন মহানারীর সময় তাঁহার গরীব-নারায়ণের জন্য ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিলে মনে এক প্রকার পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তাঁহার প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্রের দুঃখমোচন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কৰ্তব্য। তিনি কয়েকবার ইংরেজ বাজার সরকারী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে পারিতোষ পুষ্ক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও কঞ্চল প্রদান করেন। ১৯১১ সালে উক্ত গোসাইজীর গুরু পিতৃদেবের পরলোক গমন উপলক্ষে তিনি যে একটা ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন, তাহাতে কি সম্ভ্রান্ত শাক্ত ভদ্রমণ্ডলী, কি আশাক্ত সাধারণ সকলেই সমভাবে উদর তৃপ্ত সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রাচীন লোকদিগের মুখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, একরূপ ভাণ্ডারা শত বৎসর মধ্যে হয় নাই।

নিদারুণ গ্রীষ্মে জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়া পিপাসিত পথিকের তিনি আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন। পর্ণগৃহবহুল পল্লীতে এই সময় আবার অগ্নিদেবের উৎসীড়ন আরম্ভ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য কত যে আর্ন্তজন গৃহহীন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাও মোহান্তজীর কৃপাদৃষ্টিতে এড়াই নাই। গৃহদাহ নিবারণকল্পে তিনি কলিকাতা হইতে নিজব্যয়ে ছয়টি দমকল আনাহইয়া ইংরেজ বাজার মিডানসিপ্যালিটিকে দান করিয়াছেন এবং কলগুলি যাহাতে সাধারণের সুবিধাজনক স্থানে রক্ষিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধুকার্যের ফলে মোহান্তজী কত পরিবারের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি মহৎ কার্যের জন্য মোহান্তজী নাম মালদহবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মালদহ বৈরূপ আয়তনে ক্ষুদ্র, সেইপ্রকার শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও এখানে অল্প। এই জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও আবার অনেকে অনাত্র হইতে কার্যোপলক্ষে অথবা অন্য কারণে এখানে আসিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রকৃত মালদহবাসীদের মধ্যে এখনও বিশেষ ভাবে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। মোহান্তজী প্রকৃত মালদহবাসী না হইলেও তিনি অতি শৈশবেই এদেশে আনীত হন এবং এখানেই তিনি লালিতপালিত। কাজেকাজেই মালদহ তাঁহার গক্ষে একপ্রকার স্বদেশ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রাণের টানেই তিনি মালদহের উন্নতি কল্প অর্থ ব্যয় করিতে সর্বদা মুক্তহস্ত।

মালদহে বহু পুরাকাল হইতেই নববর্ষের প্রারম্ভে স্থানে স্থানে “গন্ডীরা” উৎসব চলিয়া আসিতেছে। বহুপূর্বে উহা কিরূপ ছিল তাহা বলা যায় না। তবে কয়েক বৎসর পূর্বে উহা বীভৎস ও কুরুচিপূর্ণ ছিল। ইহা হইতেই তৎকালীন সাধারণ লোকের প্রকৃতি ও ক্রাচ সহজেই অনুমান করা যায়। মোহান্তজী দেখিলেন যে, ইহাই জনসাধারণের শিক্ষার প্রকৃত স্থান। উক্ত “গন্ডীরা” যদি কুরুচিপূর্ণ গীতের পরিবর্তে সহজবোধ্য ও উপদেশপূর্ণ গীত প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে সাধারণের ক্রাচ মার্জিত হইতে পারে এবং সকলেই কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই সাধুউদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি গ্রাম্যগাভরচরিতাগণকে ডাকাইয়া যাহাতে তাহার

উপদেশপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকবার এসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার পদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান পূর্বক লুপ্তপ্রায় “গম্ভীরা”র নবজীবন প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা করিতে হইয়াছে। “গম্ভীরা”র দল উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে বিশেষ প্রশংসার সহিত স্থান পাওয়াছিল। “নাগক” “সঞ্জীবনী” “গৃহস্থ” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় এবং পাবনার সুবিখ্যাত “সুরাজ” পত্রে “গম্ভীরা”র বিবরণ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি উক্ত গম্ভীরা নামে একটি দৈন্যমাসিক পত্রিকাও অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত মোহান্তজী সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে আরও অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক প্রদান এবং অন্যান্যভাবে অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। স্থানীয় “অক্সফোর্ড” উচ্চতরাজী বিদ্যালয় যে সময় মধ্যাহ্নরাজী বিদ্যালয় ছিল, সে সময়ে উহার একবার স্থানভাব হয়। মোহান্তজী উহা জানিতে পারিয়া নিজের অহুষ্টি সত্ত্বেও উক্ত স্কুলের জন্য নিজের গৃহের দুইটি প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া উহাকে শৈশবে রক্ষা করেন। একসময়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট তাঁহার নিজের বাসগৃহ উক্ত স্কুলের নিমিত্ত দান করিতেও স্বীকৃত হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

যাহা হউক মোহান্তজী এক্ষণে স্বগৃহে কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার আদর্শে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক সকলের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত গোসাঁইজীর পরলোকগত গুরু পিতৃদেব গোসাঁই যজ্ঞন্দ গিরি মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ “যজ্ঞন্দ মহাকালী পাঠশালা” নামে অভিহিত হইয়াছে। পাঠশালার ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। দিন দিনই ইহার আশ্চর্য্য শিক্ষাশ্রমালীতে সমৃদ্ধ হইয়া স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদের নিজ নিজ কুমারী কন্যাাদিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থোপাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতঃ স্তম্ভিত হইয়াই যৎসামান্য বেতনে প্রবান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার অধীনে আরও দুইজন পণ্ডিত আছেন। তৎসত্ত্বেও গোসাঁইজী নিজে অনেক সময় পড়াইয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়টির বয় এক্ষণে মাসিক ৬০ টাকা। পাঠশালা অবৈতনিক, কাজেই গৃহভার সম্পূর্ণ তিনি বহন করেন। বালিকাগণের উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ-পদ্ধতি রীতি-নীতি ও স্তব-পূজাদি পরিদর্শন করিলে মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হয়। মনে হয় যেন পূর্বের ন্যায় আমরা এক স্বর্ণযুগের সম্মুখীন হইতেছি।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারকল্পে তিনি দেশের সর্ববিধ সদহুষ্ঠানে অহুরের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে যোগদানে অসমর্থ হইলেও ইনি “গম্ভীরা” সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পানাসম্মিলনীতে ইনি গুরু উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনীতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালে কেবলমাত্র মালদহ হইতে ইনি ও স্বদেশখ্যাত মালদহ জাতীয়শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বোষ বি-এল. মহাশয় অহুষ্ঠানে যোগদানকল্পে আহৃত হন এবং বিশেষ সম্মান যোগ্য স্থান অধিকৃত করেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন মহামান্য রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি মালদহ হইতে এই দুইজনকে আহ্বন করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মোহান্তজীর সকল কার্য একাধারে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ যে, তাঁহার প্রতি সাধারণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও উহা সম্যক পরিব্যক্ত হইতে পারে না।

দৈনন্দিন ব্যাপারেও তিনি একেবারে আড়ম্বরবিহীন। তিনি কখনও শারীরিক সুখ বা ভোগ-বিলাস ইচ্ছা করেন না। বিলাসিতায় যে টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহা অন্য কোন লোকহিতকর কার্যে ব্যয়িত হইলে তিনি উহা সার্থক বিবেচনা করেন। মোহান্তজীর আদর্শ সকলের অনুকরণীয়।

শ্রীকেশবলাল বসু।

## হৃদয়ের পূজা।

—:~:—

( ১ )

হৃদি মন্দিরে চিরদিন ধরে যে পূজা তোমার হয়,  
প্রীতি-চন্দনে, ভক্তি-কুসুম, সে'ত নহে অভিনয়।  
শাস্ত্র-দোহাই অস্ত্র করিয়া পাষাণের পদতলে  
মুখে বলা এক কাজে করা আর ফিরেনা পূজারি দলে  
আয়োজন হীন হৃদয়ের গান, গাহিছে ভক্তপ্রাণ  
হেরিছে হৃদয় আসনে আসীন ভক্তের ভগবান।

( ২ )

মন্দিরে মঠে ছদ্ম বেশেতে ফিরিছে যতক ভণ্ড !  
নগদ আদায় বিদায়ের লোভে সকলি করিছে পণ্ড !  
বার্ষ পূজার জঞ্জাল জমা বেওয়ারিস ডাকঘরে,  
ঠিকানার গোলে পড়ে থাকে চির সঞ্চিত ধূলি পরে !  
মালিকের খোঁজ হয় না যখন আগুনে পুড়িয়া ছাই  
ধূলা হয়ে যায় ধুলার মাঝারে, মূল্য কিছুই নাই।



( ৩ )

ধর্মের হাটে খুলিয়ে দোকান হাঁকিছে দোকানদার,  
 একেরে সাজায় বিচিত্র করে ভুলাতে খরিদদার !  
 শুধু বাইবেল খ্রীষ্টানে হাঁকে, হিন্দুতে হাঁকে বেদ,  
 ইসলাম হাঁকে কোরাণ শরিফ !—কত না ধর্ম ভেদ !  
 সকলেই জানে সুখে দুখে শোকে মানব হৃদয়-বগ্ন  
 এক সুরে বাজে সকল দেগেতে একই তাহার তন্ত্র !

( ৪ )

মন্দির মঠ থাক্ দেশে দেশে যেমন যেখানে আছে !  
 দেবতা যেখানে প্রাচীরবন্দী যাবনা তাহার কাছে !  
 জীবনে মরণে হৃদয়ের পূজা, হে মোর হৃদয়-স্বামি,  
 আপনার হাতে সঁপিব তোমার কমল চরণে আমি,  
 দাঁড়াব মুক্ত আকাশের তলে, জুড়াব হৃদয়মন,  
 সকলের মাঝে হেরিব তোমার রূপ নরনারায়ণ !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ।

## লাহোর ভ্রমণ।

আমার বহুদিনের সাধ—“লাহোর যাইব, লাহোর দেখিব” সে সাধ এবার পূর্ণ হইল । ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যা পাহাড় হইতে রওয়ানা হইলাম; ছোট রেলগাড়ীতেও বড় শীত-বোধ হইতে লাগিল; কল্কা ষ্টেশনে আসিয়া জানিলাম পার্ক-শীত লাহোরে পাইব না । পরদিন প্রাতঃকালে ট্রেন লাহোরে পঁছছিবার কথা কিন্তু এত লেট্ হইয়াছিল—ভাবিত হইলাম, সঙ্গে যাহারা ছিলেন তাঁহাদের বলিলাম—“ষ্টেশনে কেহই থাকিবেন না, এত দেরী পর্যন্ত কোনও বন্ধুই অপেক্ষা করিবেন না, মোটর গাড়ীও থাকিবে না।” বথন ট্রেন লাহোর ষ্টেশনে পঁছছিল, প্ল্যাটফর্মে গাড়ী থামিল, আমার সে ভয় ও সে ভাবনা চলিয়া গেল । অনেক কয়জন আমার প্রণাম্য,—স্নেহের বন্ধুবান্ধবেরা সপরিবারে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন । কত ফুলের মালাই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এক মালার উপর আর এক মালা আমার গলায় ছলাইয়া দিলেন, মনে হইল বুঝি চক্ষু পর্যন্ত উঠিল । মালাগুলি সমস্তই প্রায় পঁদা ফুলের । শুনিলাম এ-সময়ে লাহোরে অন্য ফুল অধিক পাওয়া যায় না । এই ফুলের রঙই হউক আর একটা অপরিচিত মুখ

দেখিয়াই হটক ষ্টেশনের অনেক ঘোড়া চক্ষু আমার দিকে তাকাইল। বন্ধুদের এই সাদর-অভ্যর্থনার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলাম; তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে কত কষ্ট করিয়া সেই অপরিষ্কার ষ্টেশনে বসিয়াছিলেন সে জন্য চুঃখ প্রকাশও করিলাম, কৃতজ্ঞতাও জানাইলাম। লাহোরে আসিয়াছি—কত যে আনন্দ। এত ভাল অভ্যর্থনা পাইলাম। ইহাতে মনে হইল নিঃসন্দেহ—“লাহোরের সবই ভাল।” বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যেখানে একজন সাহেব তাঁহার মোটর গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলাম, বন্ধুবর্গও একখানি মোটর গাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন, কেহ কেহ সে গাড়ীতে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

কোনও ধনী, সম্ভ্রান্তশালী বন্ধু,—তাঁহার সুন্দর ও বৃহৎ উদ্যানবাটী আমার জন্য প্রস্তুত রাখিতে তাঁহার কর্তৃচরী-নিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। পঁছছিলামাত্র এক কর্তৃচরী অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের সকল বন্দোবস্ত কেমন করিয়াছেন জানাইলেন। হর্ম্মা-নির্ম্মিত বারাণ্ডা-সজ্জিত গৃহগুলি, চারিদিকে সুন্দর টবগুলিতে পান্স, চক্ষুকে তৃপ্ত করিল। রেলের পথ, আবার ট্রেন অনেক দেরীতে পঁছিয়াছে; রোদের উত্তাপ, পথের শ্রান্তিদূর করিবার জন্য একটি বেন শীতল ছায়াতল প্রাণ চাহিয়াছিল—তাহাই পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান ও পূজার পর পরিতোষের সহিত আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্নেহের সহোদরা—যিনি আমার কয়দিন পূর্বে লাহোরে পঁছিয়াছেন, তিনি আসিলেন। দুই ভগ্নী মিলিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। কত কথা,—কথা আর শেষ হয় না। লাহোরে কি করিব—কি দেখিব সেই কথাই হইল।

পরদিন লাহোর-ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব আরম্ভ। এই উৎসব সপ্তাহকালব্যাপী হইবে। ইহার ভিতর ১২এ নভেম্বর ব্রহ্মানন্দ-দেবের জন্মোৎসব। এখানকার ব্রাহ্মগণের সাদর-নিমন্ত্রণে এই উৎসবে বিশেষভাবে যোগ দিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইলাম। ১২এ নভেম্বরে বালকবালিকাদিগের একটি পাটির মত হয় কিন্তু তাহাতে সঙ্গীত গীত হয় ও প্রার্থনা হয়। ছেলেরা হিন্দিতে মিষ্টস্বরে পদ্য বলিল, গল্প বলিল, পরে তাহাদের খেলনা এবং মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি একত্র হইয়াছিল—কিন্তু গোলমাল নাই। আর একদিন এই ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের মিলন হইল। প্রথমে এক বঙ্গমহিলা, হিন্দিতে অতি সুন্দরভাবে পূর্ণ উপাসনা করিলেন, পরে পাঞ্জাব-মহিলাগণ একে-একে কয়জন তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিলেন। একটি মহিলা, নানকের উক্তিগুলি কি মধুরস্বরে—স্ববের সুরে পড়িতে লাগিলেন,—মোহিত হইলাম। শুনিলাম, বাঙ্গলায় কথকতা হইবে, এত পাঞ্জাবীর ভিতর বাঙ্গলা কথকতা, মনে হইল—কেই বা শুনিবে, কেই বা বুঝবে। কিন্তু সকলের ইচ্ছায় দুইদিন কথকতা হইল; ঋবের মাতা সুনীতির জীবন এবং মীরাবাইয়ের জীবন,—দুইদিনই মন্দির পূর্ণ, সকলে অতি আগ্রহের সহিত শুনিলেন।

একদিন এক পাঞ্জাবী-ধনী-গৃহিণী তাঁহার বাড়ীতে আমাদের দুই ভগিনীর অভ্যর্থনার জন্য অনেক ভদ্র মহিলা-দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বড় সুন্দর সে দৃশ্য,—হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান সকলে মিলিয়া কেমন সদালাপ করিতেছেন, সঙ্কীর্ণতা ভাব নাই—কেমন সকলের সঙ্গে মিশিয়া সকলে চা পান করিতেছেন। সঙ্কীর্ণতা বোধ করি ইহাদের মনে স্থান পায় না। অনেকগুলি বঙ্গমহিলাও লাহোরে আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা বলিয়া বড় আনন্দ হইল। ধনী-গৃহিণীর এই পাটিতে পরমাসুন্দরী একটি যুবতী দেখিলাম, তাহার সৌন্দর্য্য এ-চক্ষুকে মুগ্ধ করিল, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে একজন আমার আত্মীয়া বলিলেন “ফরাসীদেশের যেম, শাড়ী পবিয়া আসিয়াছেন” পরে বলিলেন কান্দীরি ব্রাহ্মণকন্যা। ইচ্ছা হইল মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা কহি কিন্তু আমার মূর্থতা বশতঃ ভাষা না জানায় পরস্পর হাত ধরিয়া পরস্পরের স্নেহ জানাইলাম।

এক প্রাতঃকালে জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার প্রিয় বেগমের কবর দেখিতে গেলাম। প্রথমে জাহাঙ্গীরের কবর দেখিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সে সময় একখানা ট্রেন আসিতোছিল সে জন্য যাইতে পারিলাম না। রেলের লাইন মধ্যে থাকাতে দুই কবরকে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত করিয়াছে। অগত্যা সম্রাটের কবর দেখিবার পূর্বে নূরজাহানের কবর দেখিতে গেলাম।—একথও জনী সম্মুখে, তাহা অবল্লৈ রক্ষিত;—শুক্লত্ব, কণ্টক-বৃক্ষে পূর্ণ, তাহার ভিতর দিয়া কবর-গৃহে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিলাম। অতি সাধারণ কবর গৃহের মত এ কবর। গৃহের মধ্যস্থলে দুইটি সামান্য প্রস্তর নিশ্চিত কবর, একটি নূরজাহানের কন্যা লাইলার কবর, অন্যটি নূরজাহানের। অল্প কয় বৎসর পূর্বে ছাগ আদি পশু লইয়া পালকেরা এই কবর-গৃহে বিশ্রাম করিত। মান্নীর ভূতপূর্ব লাট কর্জন রাহাতরের যত্নে এ গৃহ ও কবরের সংস্কার হইয়াছে, নতুবা যাহা দেখিলাম--তাহাও দেখিতে পাইতাম না। নূরজাহানের কবরের কাছে অনেকগুলি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আহা! এই কি সেই নূরজাহানের কবর!—বিনি গোলাপ জলে স্নান করিতেন—তাঁহার প্রাণশূন্য দেহখানি এত অল্পে ও অনাদরে পড়িয়া আছে!—মণি-মাণিকা-খচিত যাহার প্রাসাদ ছিল, তাঁহার কবরের উপর এমন কি একটি প্রস্তর-খোদিত নাম পর্যন্ত লিখিত নাই, ইংরাজ গর্ভমন্টে একখানি কণ্ঠফলকে লিখিয়া রাখিয়াছেন, —কোন কবরটি নূরজাহানের এবং কোন কবর তাঁহার কন্যার। দেহের এত অনাদর! নূরজাহানের অতুল রূপবোঁদ, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিল্পদর্শীতা, সমস্ত কি ভুলিয়া যাইবার? সম্রাট জাহাঙ্গীর যে তাঁহার প্রাণাধিকা—বেগম নিকটে না থাকিলে রাজকাৰ্য্য করিতে অক্ষম হইতেন। সেই অস্বাভাবিক স্ত্রীকে কাছে রাখিবার জন্য একটি চারুকাৰ্য্য-নিৰ্ম্মিত অন্তরাল (ক্লোজ) করিয়াছিলেন, সেই অন্তরালের একদিকে রাজসভা ও স্বর্ণসিংহাসনে আসীন সম্রাট; অপরদিকে সেই বেগম নূরজাহান; অন্তরালের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়া নূরজাহান কোনল, সুন্দর পদ্মহস্তখানি সম্রাটের স্বন্ধে রাখিতেন, এই করম্পর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজকাজ সুচারুরূপে চলিত। কতবার প্রিয়তম পতির উদ্ধারের জন্য নিজজীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া শত্রু-শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রাণপ্রতিভা নূরজাহানের হস্তে মস্তক রাখিয়া নূরজাহানের নাম শেব-উচ্চারণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, আজ সেই ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাণের এত প্রিয়—এত আদরের স্ত্রীর কবরের এই অবস্থা! নিজ কন্যা কেবল মাতাকে ছাড়িতে পারিল না! মায়ের কোলে লাইলাও ঘুমাইল! এই কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম আমার সাজাহানের প্রতি অভিজ্ঞি হইল। মনে হইল যে সাজাহান নিজের প্রণয়ের গভীরতা প্রকাশ করিবার জন্য তাজমহল নিৰ্ম্মাণ করিলেন,—পত্নীর নামে এমন মনোহর কবর করিলেন, সেই সাজাহান পিতার প্রতি একটু মাত্র শ্রদ্ধা দেখাইয়াও কি পিতার পরম আদরের প্রিয়-তমা বেগমের একটা ভালরকম কবর দিতে পারিলেন না? সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবর—ওনা যায় নূরজাহান নিজ ব্যয়ে করাইয়াছেন। বেগমের কবর দেখিয়া সম্রাটের কবর দেখিতে গেলাম। এই স্থানটি নূরজাহানের প্রমোদ-উদ্যান ছিল; নিজগৃহ হইতে এই কবরটি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেন। এখনও অনেক ফলের গাছ আছে কিন্তু ফুল অধিক দেখিতে পাইলাম না। বিস্তৃত উদ্যান, উচ্চ প্রাচীর আজ ভগ্নাবস্থায় কালের সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা প্রথম প্রান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার চারিপাশে শত শত ছোট ছোট ঘর। শুনিলাম, সেই ঘরগুলিতে অতীতে ফকির-অতিথি সকল থাকিত, কয় সহস্র দরিদ্রকে প্রতিদিন এই ভাবে সেবা করা হইত। সেই প্রান্তরের একদিকে সুবৃহৎ তোরণ,—সেই তোরণদ্বার দিয়া ভিতরের উদ্যানে প্রবেশ করিলাম, সঙ্গে গাইড ছিল। বলিতে লাগিল—“কত রঙের ফুলগাছ সারি সারি ছিল দুই পাশে,—নানা রঙের প্রস্তরখণ্ডে নিৰ্ম্মিত ছিল পথ,” এখন সে সকল কল্পনার চক্রে দেখিতে লাগিলাম। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। প্রাতঃকালের প্রেক্ষিতিক

ভিতরে এই কবরের দৃশ্য নূতন হইয়া প্রকাশিত হইল। যেন এ পৃথিবীর নখর দেহ এ জড়জগতে ঘুमाইয়া রহিল—আর প্রাতঃকালে নয়ন খুলিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর দেখিলেন স্বদেশে ফিরিয়াছেন, আর প্রাণ-প্রিয়তমা নূরজাহান তাঁর কাছে।

লাহোরের মানিনীর লাট বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী, আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। একদিন জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, কত আদর-সন্মান দিলেন। লাটপত্নী, পাঞ্জাবী সৈন্যদিগের স্ত্রী কত স্বকম দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন—দেখাইলেন, তাঁহার সঙ্গে শিখদিগের ধর্মপুস্তক “গ্রন্থী সাহেব” এক ইঞ্চি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এই পুস্তক প্রত্যেক সৈন্যকে প্রেরণ করেন—বলিলেন। লাট বাহাদুরের বাড়ীতে আমাদের লাহোর পরিভ্রমণের কথা হইতেছিল,—আমি বলিলাম “একটি স্থান আমার দেখিবার বড় ইচ্ছা”—ভানাইলাম কি সে স্থান। সেখানে লাট সাহেবের সেক্রেটারী সাহেব ছিলেন, তিনি বলিলেন “আমার আফিস সেইখান, আহ্লাদের সহিত আপনাকে দেখাইব—যদি আপনি আসেন।” আমরা দুই ভগিনী অনেকক্ষণ লাট-বাহাদুরের বাড়ীতে থাকিয়া বাড়ী কিরিবার পথে সেই স্থানটি দেখিতে গেলাম। স্থানের ইতিহাস;—সম্রাট আকবর যদিও উদার হৃদয়, ধার্মিক, দাতা প্রভৃতি উচ্চগুণে ভূষিত ছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত নৃত্য-গীত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে অনেকগুলি সুন্দরী যুবতী ছিল—যাহারা সম্রাটকে তাহাদের নৃত্য-গীতে মুগ্ধ করিত। এই যুবতীদের মধ্যে একটি পরমাসুন্দরী নৃত্যকারিণী ছিল, তাহার নাম আনারকলি অর্থাৎ বেদানার মুকুল। তাহার রূপ-সৌন্দর্য্য যেন বেগমদিগেরও চক্ষুশূল হইয়াছিল। আনারকলির সৌন্দর্য্যে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম মুগ্ধ এবং আনারকলিও নীরবে গোপনে তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি সাহাজাদাকে অর্পণ করিয়াছে। চক্ষে-চক্ষে তাঁহাদের প্রণয়ের আদান-প্রদান হইয়াছিল, এবং হাসির ভাষায় প্রেমালাপ করিয়াছিলেন। আকবরের বেগমগণ এই কথা আনারকলির বিপক্ষে নানাভাবে সাজাইয়া সম্রাটকে জ্ঞাপন করাইলেন। সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও নিজে চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিবেন—স্থির করিলেন। সন্ধ্যার সময় আমাদের গৃহপূর্ণ সুসজ্জিতা যুবতী নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সকলেই উপস্থিত, বেগমগণের মধ্যস্থলে সম্রাট,—গীত আরম্ভ হইল, নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে, এমন সময়ে সম্রাট সাহাজাদাকে আহ্বান করিলেন। সাহাজাদা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী আনারকলি, তাহার প্রাণাধিক প্রিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, সেলিমও আনারকলির দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইলেন, সে রাত্রে যেন আনারকলির রূপ উথলিয়া উঠিয়াছিল, এত সুন্দর তাহাকে কখনও বুঝি দেখায় নাই। আনারকলির হাসি ও সেলিমের সেই দৃষ্টিতে সম্রাটের তাহাদের গুপ্ত-প্রণয়ের কথা জানিতে কিছুই বিলম্ব হইল না! বিরক্ত ও রুষ্টবশে—রাখিয়া গম্ভীরবশে সম্রাট আকবর বলিলেন “সেলিম, এই আনারকলিকে আগামী কল্য প্রাতঃকালে জীবন্ত-প্রোথিত করিতে হইবে।” নৃত্য-গীত বন্ধ হইল, যাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া সম্রাটকে আনারকলির বিপক্ষে কথা বলিয়াছিল, সম্রাটের এই ভয়ঙ্কর আদেশ শুনিয়া তাঁহাদেরও মুখ শুকাইয়া গেল। দেখা গেল সকলেই ভীত,—কেবল আনারকলি নহে। কি নির্দুর আজ্ঞা! সাহাজাদা সম্রাটের দিকে তাকাইলেন, সম্রাট বুলিলেন—পুত্র, দয়া ভিক্ষা করিতেছে। তখন আবার অবিচলিতবশে বলিলেন “আমি সম্রাট, তুমি আমার কন্মচারী—আমার আদেশ অন্যথা করবে না। আনারকলিকে যখন প্রোথিত করা হইবে, তুমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে।” সাহাজাদা সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রেমোদলভা ভঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুন্দরী আনারকলি, বস্ত্র-অলঙ্কারে বিভূষিতা, নির্দিষ্ট স্থানে গর্তের ভিতর দাঁড়াইয়া,—সম্মুখে তাহার প্রণয়ী সেলিম; আনারকলির মুখে তখনও হাসি, দাঁড়কেন্দ্র মাটি ফেলিতে লাগিল,—শেষ দৃষ্টি পর্য্যন্ত আনারকলি হাসিয়া সেলিমকে জানাইল;—তাহার প্রেম সবভাবে থাকিবে। আকবরের মৃত্যুর পরে সেলিম যখন সম্রাট হইলেন

তখন প্রথম কাজ তাঁহার এই, আনারকলির কবরের উপর মসজিদ করিবেন। তাহাই হইল এবং পারস্তভাষায় অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি কথা এইভাবে লিখিত—“আমি ভগবানকে শেষদিন পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিব, যদি আমার প্রিয়তমাকে আর একবার দেখিতে পাই।” সেক্রেটারী, আরও কত সেই কবর-প্রস্তরখণ্ড হইতে পড়িয়া তর্জমা করিয়া শুনাইলেন। কোন্ হিন্দু রাজা নাকি সেই কবরের উপরের খোদিত প্রস্তর স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এখন এই মসজিদের মধ্যস্থানে নাই, একপার্শ্বে আছে। আনারকলি বাজার—বৃহৎ বাজার। লাহোরের এক অংশ আনারকলি নামে খ্যাত। আনারকলির প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেম, লাহোরে আজও জীবন্তভাবে রহিয়াছে।

লাহোরের যাহুবরে অনেক দেখিবার আছে তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের এক প্রস্তর মূর্তি। এ-মূর্তির সদৃশ মূর্তি আর কোথাও দেখি নাই। গৌতমবুদ্ধের কঠোর তপস্যাকালে অনিদ্রায় অনাহারে তাঁহার সে দেহকান্তি কঙ্কালে কিরূপ পরিণত হইয়াছিল এ-মূর্তি পরিষ্কাররূপে তাহা আজও আমাদের জানাইতেছে। এই মূর্তিতে প্রত্যেক অস্থিগুলি গণনা করা যায়, ললাটের শিরাগুলি উচ্চ, চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে। মূর্তির কাছে দাঁড়াইলে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে, সহজে এই প্রার্থনা উঠে, “হে বুদ্ধদেব, আমার জন্য তুমি কি এই কঠোর তপস্যা করিলে,—তোমার দেহের এই অবস্থা হইল।”

শিখদিগের মহারাজ রঞ্জিত সিংএর সমাধি দেখিতে গেলাম। লাহোর-ভূর্গের সম্মুখে এক বৃহৎ প্রাসাদকূল্য গৃহ, অনেক সোপান উঠিয়া একটি ছাদ অতিক্রম করিয়া সমাধি-গৃহে প্রবেশ করিলাম। মধ্যে মহারাজ রঞ্জিত সিংহের সমাধি এবং তাহার চারিপাশে ছোট ছোট সমাধি, এই সমাধিগুলি মহারাজার সহধর্মিণী মহারানীগণের; তাঁহার পতির সঙ্গে সহমরণে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই সমাধিগুলির সঙ্গে ছুটি বড় কৌটার আকারের সমাধি; শুনিলাম দুটি কপেত চিতার আঙুনে ঝাঁপ দিয়াছিল—তাহাদের ভ্রম্ব ইহাদের ভিতর। গৃহটি বড়ই নির্জন—যথার্থ সাধনের স্থান বলিয়া মনে হইল।

লাহোরের ভূর্গ। এই ভূর্গ এক অন্যত-উচ্চ পর্ব্বতের উপর নিম্নিত। প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর—বেষ্টিত রাখিয়াছে এই ভূর্গকে। কত ঘর, কত মহল, কত প্রাঙ্গণ—দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া দেখিলাম লাহোরের সহর, আরও কত দূরস্থ স্থান;—শত্রুহস্ত হইতে কিরূপে ভূর্গ, দেশকে রক্ষা করিত বুঝিতে পারিলাম। পূর্বকালে ভূর্গই প্রাসাদ ছিল অর্থাৎ নরপতিগণ ভূর্গের ভিতরে সপরিবারে অধিবাস করিতেন। এই উচ্চ পর্ব্বতের উপর এক গভীর কূপ ছিল, বোধকরি সম্রাটগণ ইহারই জল পান করিতেন। আজ সে কূপ বন্ধ। ইহার পর সম্রাটের বাসগৃহ দেখিতে গেলাম। ইহার নাম শিশমহল অর্থাৎ কাচের বাড়ী। তিনদিকে গৃহ, মধ্যে খেতপ্রস্তরের প্রাঙ্গণ। ইহার মধ্যস্থলে ফোয়ারা। গৃহগুলির বাতায়নগুলি অতি ক্ষুদ্র, সেই বাতায়ন দিয়া সম্রাটের মহিষীগণ বন্যপশুর যুদ্ধ দেখিতেন। সম্রাটদিগের তখন এক অস্বস্ত রকমের আমোদ ছিল। বন্য হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি ধরিয়া আনিত এবং এই প্রাসাদগুলির উদ্যানের ভিতর ছাড়িয়া দিত, পশুগণের লড়াই হইত। এই আমোদ দেখিবার জন্য বেগমদিগের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন—অতি উচ্চ তাঁহাদের গৃহে হইলেও সেখান হইতে পশুদের লড়াই স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। সম্রাটের স্নানের গৃহ দেখিয়া অবাক হইলাম, যেতপ্রস্তরের চৌবাচ্চা—তাহার কি পরিপাটি ব্যবস্থা! উষ্ণ-জল শীতল জল কোথা হইতে কিরূপে আসিত, বুঝা গেল না, সিংহের মুখের আকারের কল রহিয়াছে। শিশমহলের একটি গৃহের ছাদ নানারঙ্গের কাচে নির্মিত, দেখিয়া মনে হইল সর্বোৎকৃষ্ট প্রিয় এবং সর্বোচ্চ-আসনা বেগমের এই ঘর। যে গাইড আমাদের সঙ্গে ছিল সে

হঠাৎ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, কেহ কেহ ভয় পাইয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই গাইড্ একখণ্ড কাগজ জ্বালাইয়া হাতে ধরিল। নিমেষে সে ঘরের শোভা সহস্র সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইল, ভাবিলাম এ কোথায় আসিলাম—সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। একটা দীপশিখার আলোতে সেই শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচকণাগুলি নানারঙে হাসিয়া উঠিল। এই গৃহে মণি-মাণিক্যে সজ্জিতা অতুল রূপবতী যুবতী বেগমগণ বৃষ্টি দাঁড়াইয়া বলিয়া ছিলেন—“পতি সত্ৰাটের প্রণয়ের কাছে এ সকলই তুচ্ছ।”

এই দুর্গের ভিতর একটা মন্দির আছে, সে মন্দিরে নাকি এক অতি গভীর ও অন্ধকার কূপ আছে। কিম্বদন্তী—এই ‘লবের কূপ’। সময়ে এই কূপ ছিল এবং এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। লবপুর ছিল লাহোরের নাম এবং ইহার অনতিদূরে কুশীপুর বলিয়া দেশ আছে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, লব ও কুশ দুই পুত্রকে এই দুই রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এ মন্দিরটি এখন বন্ধ,—প্রবেশ নিষেধ।

লাহোরের সকলই ভাল লাগিল। সকলের নিকটে স্নেহ-বাবহার পাইলাম। যিনি অমুগ্রহ করিয়া তাঁহার মোটর গাড়ী দিয়াছিলেন তাঁহার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।

লাহোর ছাড়িবার পূর্বেদিনে বিদায় দিবার জন্য বন্ধু বান্ধবেরা আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন। ব্রহ্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখি—প্রাঙ্গণটি পূর্ণ! সকলে অমুগ্রহপূর্বক স্নেহসন্মান জানাইলেন,—দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আরও কিছু দীর্ঘকাল যদি থাকিতে পারিতাম—বড় ভাল হইত। আমি দুই সহোদরার হইয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম “আমাদের লাহোরে বাস যে এত সুখের হইয়াছে ইহা কেবল তাঁহাদের স্নেহ ও যত্নে” “ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা কখনও দিতে পারিব না”—তাহাও বলিলাম। পরদিন বৈকালে লাহোর হইতে রওয়ানা হইলাম, একুশ সপরিবারে আসিয়াছিলেন, সতাই ফিরিবার সময়—বিদায় লইবার কালে চক্ষু জল আসিল।

আর একটা স্থান দেখা হইল না—সেটা গুরু নানকের জন্মস্থান, পবিত্র স্থানটি স্পর্শ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল।

স্ব, দে।

## কবি বসন্তকুমারের প্রতি।

—(✱)—

কবি তোমার অশ্রুঝরা বুকফাটা ওই সঙ্গীতে

চক্ষে আমার উথলে ওঠে জল,

না জানি হায় বসন্তের কুঞ্জে কাহার ইঙ্গিতে

ঝঙ্কা বায়ে টুটল ফুলদল।

মায়ের চোখে নিবল আলো, মুছল রঙীন আল্পনা,

বিশ্ব-ভুবন শূন্য হল হায়,

শরৎ দিনের মেঘের মত মিলাল সব কল্পনা,

ডুবল ভরী খাটের কিনারায়;

হরষ হাসি মিলায়ে গেল পাঁজর-ভাঙ্গা ক্রন্দনে,  
 হাহাকারে ডুবল যত গান,  
 পারিজাতের পুষ্পকলি পড়ল ঝরি' নন্দনে,  
 হঠাৎ কেঁপে থামল বীণার তান !—  
 তবু তোমায় ঢাকতে হবে অশ্রু হাসির অঞ্জন,  
 তবু তোমার গাইতে হবে হায়,  
 তবু ছবি আঁকতে হবে ব্যথার শোণিত-রঞ্জন  
 সবার তরে মিথ্যা চলনায় !  
 বৃকের মাঝে উঠবে যবে অশ্রু সাগর কমলি,  
 হাসির আড়ে আড়াল করে তাই  
 গাইতে হবে সজল চোখে বীণার তারে সুর তুলি,  
 মুক্তি তোমার নাইগো কবি নাই !  
 কে বোঝে হায় কবির ব্যথা রক্ত-রাঙা অন্তরে,  
 সবাই চাহে শুনতে কবির গান !  
 কে জানে হায় কোথায় জাগে কবির কোমল মর্শ্ব রে,  
 নিখিল হারা নিখিল জোড়া প্রাণ !\*

শ্রীপারমলকুমার ঘোষ ।

## ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস ।

( মৃত্যু—১৩ই আশ্বিন ১৩২৫ ; সোমবার রাত্রি ৫টা । )

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যু হইয়াছে ।

“জন্মিলে মরিলে হবে,

অমর কে কোথা ভবে !”—

কাণ্ডেই অনেক “সাহিত্য্যমোদী”গণ গোবিন্দ দাসের মৃত্যুতে যে কোনরূপ মৌলিকতা খুঁজিয়া পাইবেন না, ইহা নিশ্চিত ।

পূর্ববঙ্গের এট চিরদরিদ্র কবি, জীবনে যত প্রকার সম্ভব, গঃ ও নির্ঘাত্তম সহ্য করিয়া (অথবা সহ্য করিতে না পারিয়া) অবশেষে মৃত্যুর গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিলেন । কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের অন্য শক্তি-চিত্তে আর কোন ধনী লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে না ।

“পরিচায়িকা” পুস্তকাকার কবির শোকোচ্ছ্বাস পাঠ ।

কবির 'চন্দন' কাব্যের দুইটি কবিতায়,—'গুরুগোবিন্দ সিংহ' ও 'বাংলার প্রেম'এ যে রচনা: তারিখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তা'র বাঙ্গলা ১৯৮৫ সাল। স্থান—ভরদৈবপুর। ইহার পূর্বেও কবি আরও কবিতা লিখিয়াছেন। সম্প্রতি গত খ্রীঃাব্দে ১৩২৫ 'নারায়ণ' ও 'নবভারত' পত্রিকায় কবির দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে,—'খুলন' ও 'অম্বর-পৃষ্ঠা'। ১৯৮৫ হইতে ১৩২৫ ঠিক ৪০ বৎসর; এবং ইহারও উজ্জ্বল বা পিঙ্গল পূর্ববঙ্গের এক ভঙ্গলে বসিয়া কবি গোবিন্দ দাস বঙ্গ বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। 'চন্দন', 'কমল', 'কুম্ভ', 'ফুলের', 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী'—এই ছয়খানি গীতিকাব্য আমি দেখিয়াছি। কবির নিকট অত অল্পদিন মাত্র পূর্বে শুনিয়াছি যে, 'নবভারত'-প্রমুখ মাসিক পত্রিকারিতে এত অধিক ঋণ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভাড়া বিধি মত সংগৃহীত হইলে অন্ততঃ আরও চারি পাঁচখানি কাব্য হইতে পারে। অর্থ থাকিলে কবি না হইয়াও যেমন কবিতার পুস্তক ছাপান অসম্ভব হয় না, তেমন অর্থের অভাবে কবি হইয়াও এ যুগে কাব্য ছাপান সম্ভবপর নহে। ইহা এমনি যুগলক্ষণ। গোবিন্দ দাস কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থের এতদূর অভাব ছিল। কবেই তাঁহার অনেক কাব্য অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতে পারিল না। তাহের লেখা তাঁহার অনেকগুলি কবিতা ও কাব্য আছে, নানা কারণে তাহারও প্রকাশ এ রূপ অসম্ভব বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

কবি গোবিন্দ দাসের যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ ছিল, তাহার মধ্যে দুইখানি চমুঠা খাইতে না পাওয়ার অভিযোগই ছিল প্রধান। সব দেশেই দুখী লোকেরা খাইতে পার না। গোবিন্দ দাস দুখী লোক ছিলেন। কাছেই গিনি খাইতে পাইতেন না। 'নব ন্যায়ের' দেশে,—নব-নাগরিক-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যিকেরা যে ইহার মাধ্যম কোন অসম্ভবতঃ দেখিতে পাইলেন, এমন আশঙ্কা আনাদের নাই। তথাপি এমন চমুঠা এক জন ছিল, যাহার বলত যে, কথটা বড়ই লজ্জার ও কলঙ্কের। তা কথটা যাই লজ্জা আর কলঙ্কের হটক না কেন, নিতান্ত নির্লজ্জ আর বেহায়াও ত কেহ কেহ থাকে? জাহুরা প্রথমে কানায়ুধা করিতে করিতে, শেষে কথটিকে একেবারে সাহিত্যের খাস মজলিসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। ১৩১৮ সালে কবি গোবিন্দ দাস তাঁহার চমুঠা-দুর্দশা প্রভৃতি জানাইয়া একটা কবিতা প্রকাশ করেন। 'নব ভারতে' এই কবিতাটা ছাপা হয়। কবিতাটিতে কোন ঘোর-পাঁচ ছিল না। আর কৃষ্ণধর্মের কবিতায় ঘোর-পাঁচ থাকিলেই বা কি করিয়া? কবিতাটিতে স্পষ্ট এই কথা লেখা ছিল যে, "হে ভাই বঙ্গবাসি, আমি প্রতিদিন দুই বেলা খাইতে পাইতেছি না, 'উপোস' করিতেছি; এবং রাত্রি-দিন হাতাকার করিয়া একরূপ 'শুকায়ে' মারতেছি। যদি তোমরা কেউ পার ত আমার দুটি খাইতে দাও। এখন আমার খাইতে না দিয়া যদি মারিয়া দেয়, তবে আমার মৃত্যুর পর, আমার চিত্রায় যদি তোমরা মঠ দাও, তবে তাহাতেই বা এমন লাভ কি? মৃত্যুর পরে অলংকৃত সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমি হয় ত আমার চিত্রায় তোমরা কিরূপ মঠ দিলে, তা দেখিতেও বা আসিতে পারি; কিন্তু তার চেয়ে বলি, কৃপার্ত্ত আমি, আমার চারিটা খাইতে দাও।"

“ও ভাই বঙ্গবাসি,  
আমি মরলে তোমরা আমার চিত্রায় দিবে মঠ?  
আজ যে আমি উপোস করি,  
না খেয়ে শুকায়ে মরি,  
হাহাকার দিবা-নিশি কুখার করি ছট-ফট।  
'ও ভাই বঙ্গবাসি,  
আমি মরলে তোমরা আমার চিত্রায় দিবে মঠ?”



এই কবিতাটি বাতির হওয়ার পর, ১লা চৈত্র ১৩১৮, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি টেনটিটিউট হলে “গোবিন্দ দাসের সাহায্যসামান্য ও তাঁহার বর্তমান অসুস্থ-লাঞ্ছিত চরিত্র-পীড়িত অবস্থার সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবনায় ও তৎকর্তৃক একটি সাহায্যসামান্য গঠিত হইয়াছিল।” এই পর্য্যন্ত। ঐ বৎসরই কান্তন সংখ্যার ‘বীরভূমি’ পত্রিকার নিম্ন-উদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যটিও প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ‘বীরভূমি’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত শ্রীকুলনাথপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত-ব্রত। সম্পাদকীয় মন্তব্যটি এইরূপ,—“ভঃ কবি গোবিন্দ দাস;—ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের নাম সকলের পরিচিত না হইলেও, বাঁহা বা বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, তাঁহার নিশ্চয় তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি আনন্দে সহিত পঠ করিয়াছেন ‘চন্দন’, ‘কমল’ প্রভৃতি যে বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে, তাহা কাব্যরসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই স্বীকার করিবেন। তিনি আজ প্রায় ৩০ বৎসর কাল বঙ্গ-বাণীর সেবা করিতেছেন। তাঁহার সরল নিশ্চল কবিতাগুলি বৈদেশিকতার গন্ধ-বহীন ও বঙ্গ-পল্লীর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস। বড়ই চমকের কথা যে, আজ এই প্রতিভাশালী প্রবণ কবি অতি ভীষণ দারিদ্র্যশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রোগ, শোক ও বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া মূল্যবান সাহিত্যসেবার পর হতভাগ্য কবি আজ অল্প-ভাবে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন; ‘যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল সেই ধরিত্র হব’—দেবী ভারতীর প্রাণ কবির এ মন্বন্তরিক আক্ষেপোক্তি সার্থক হইলেও, একজন একান্ত সাহিত্যসেবক, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাহিত্য-গৌরবে যে কাত সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই তাঁহার স্বজাতির মধ্যে একমুষ্টি তরঙ্গ অভাবে মারা যাইবেন। এ কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য এ দেশে কি কেহ নাই? পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাসস্থান। সেখানে ফুটিয়া তাঁহার হৃদয়-কুহুম সৌরভ দান করিয়াছে, তাহা উপভোগ করিবার অবসর সকলের এখন না হইতে পারে। জীবিত কালে আহারলাভ কবিগণের একমাত্র সৌভাগ্য, তাহা হইতেও ইনি বঞ্চিত। কিন্তু যখন এ দেশের এই যুগের কাব্য-সাহিত্যে কালের নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রকৃত আসন নির্দিষ্ট হইবে যখন ভবিষ্যৎ-শীঘ্রেরা শু'নবে, এই আদর্শীয় কবি দারুণ চরিত্রায় পতিত হইয়া, তাঁহার দেশাসিঙ্গণের নিকট শুধু বাঁচিয়া থাকিবার মত একমুষ্টি অন্ন-সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই, তখন তাহাদের পিতৃগণের নামে এ অপবাদ কি তাহাদিগকে বাজবে না?” এই ত গেল ৭ বৎসর পূর্বে গোবিন্দ দাস সধু কলিকাতার আন্দোলন। ছ'মাস অতীত হয় নাই, ঢাকায় যে সাহিত্য-সম্মিলনী হইয়াছিল—সেই সাহিত্য-সম্মিলনের অভিযোজন-সমিতির সভাপতির আসন হইতে, প্রজ্ঞেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পূর্ববঙ্গের অতীত গৌরবের ইতিহাস বর্ণনা করিতে বাইয়া তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে কবি গোবিন্দ দাসের নাম যথযোগ্য সম্বন্ধেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—“যদি আমার প্রিয়-সুহৃৎ গোবিন্দ দাসের মত আমার কণ্ঠ পাকিত, তবে ‘আদিশূরের যজ্ঞভূমি’, বল্লালের অস্থি-ভস্মে পরিণত যে দেশের ‘পথের ধূলি’,—সে দেশের বিগত সন্মাদ্র কণা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম।”

প্রজ্ঞেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিশ্চিতই তাঁহার অভিভাষণে কবি গোবিন্দ দাসের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ বাঁহারা বিক্রমপুরের অতীত ইতিহাস ও পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আলোচনায় ব্যাপৃত, কবি গোবিন্দ দাসকে তাহাদের বিস্মৃত হইলে ত চলিবে না।

পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা এবং পূর্ব-বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে, দুই দুইবার দুইটি বৃহৎ বিষম্মন-সম্মিলনে, দরিদ্র কবি গোবিন্দ দাসের সাহায্যের জন্য আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমাদের

পূর্বগামী মহাহুতবেয়া সম্ভবতঃ এ বিষয়ে আরও আন্দোলন করিয়া থাকিবেন। বাঙ্গালী তাহার একজন দরিদ্র কবিকে একমুষ্টি অন্ন দিয়া বাঁচাইবার জন্য কিরূপ সভা করে, সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে, সেই বক্তৃতার বিবরণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে পূরদিন প্রকাশ করে, এবং এইরূপে ‘প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু’ ও ‘সাহসে দুর্জয়’ হইয়া কার্য-কালে কিরূপেই বা অতি আশ্চর্য্যকরমে পলাইয়া যায়, এমন যে কত হাঁটিয়া খাটিয়াও আর তাহাদের সন্ধান মিলে না,—এই দৃষ্টান্তের জন্য যদি কেহ কৌতূহলী হ’ন, তবে আমার বিনীত অনুরোধ, তিনি যেন কবি গোবিন্দ দাস সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহায্যসভাগুলিকে স্মরণ করেন। এ যুগে বাগবিহৃতীর আবরণে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী তাহার হৃদয়ের দৈন্যকে ঢাকিবার জন্য যতই প্রয়াস করুক, তাহার সে প্রয়াস বার্থ হইতেছে। বাঙ্গালী যে কতদূর অস্তঃসারশূন্য ও বচনসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মমত্ববোধ, তাহার নিষ্ঠা ও সরলতা, তাহার একটা ভাল কাজ করিবার স্পৃহা ও ক্ষমতা যে কতদূর পর্য্যন্ত কমিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত আত্মস্থ-প্রকৃতি ও সুস্থ-চিত্ত দেশে বস্তুতই বিরল।

যাহা হউক, কবি গোবিন্দ দাস কোনরূপে কায়ক্লেশে মরিতে পারিয়াছেন। এখন তাহার চিতার মঠ দাঁড়, শোকসভা করিয়া মামুলি চলনসই কতকগুলি প্রশস্তিবাক্য চোটপাটের সহিত উচ্চারণ কর, চাঁদার খাতা খোল, যাহা হুঁচু কর, কিন্তু কি ভাবে যে তিনি এতকাল বাঁচিয়া ছিলেন, আর কি অবস্থার মধ্যেই যে আজ নিতান্তই বাঁচিতে না পারিয়া মারা গেলেন, তাহার প্রকৃত খবরটা চাপা পড়িতে না দেওয়াই সম্ভব। কেন না, ইহা একটা ইতিহাস।

কবির জীবিতকালে, বাঙ্গলার ধনী-মানোদের নিকট বাঙ্গলার সাহিত্যসেবী বিদ্বজ্জনদের সভায়, কত বড় বড় বাড়ী ও গাড়ী-জুড়ির সম্মুখে, কত মূল ও শাখাপরিষদ, কত লাইব্রেরী, কত তৈলচিত্র-সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষে, কত সোফা কোচ বাড় লগ্নন ও দেওয়ালের সম্মুখে কবি গোবিন্দ দাসকে একমুষ্টি অন্ন দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কত রকমারী এ্যাক্টিংই না হইয়া গিয়াছে। আর না! মৃত্যুর এই আধার যবনিকা--সেই লজ্জা, কলঙ্ক ও অপমান-ক্ষতকে যেন চিরদিনের জন্য ঢাকিয়া দেয়। দেখিলাম, বাঙ্গলার মজলিসে, হুঃস্থ কাঁবর জন্য করুণরসের উদ্বেক করা বড়ই কঠিন কার্য্য।

যার যেমন কর্ম্ম, সে তেমন ফল ভোগ করে। গোবিন্দ দাস আপন কন্মামুখ্যায়ী ফল ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তা ত বটেই। গোবিন্দ দাস, শুনা যায়, নিতান্তই গৌয়ারগোবিন্দ ছিলেন। বুঝিয়া-সুঝিয়া কথাও বলিতেন না, কাজও করিতেন না, হাতে হাতে তার ফল পাইয়া গেলেন। এ-ও ঠিক কথা। গোবিন্দ দাসের বাড়ীতে লোমহর্ষণকারী অত্যাচার হইল, না হয় হইলই, অমনি সে ব্যাপার লইয়া কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রবল ছুটিল। আহা, অমন যে ‘মগের মূলুক’, সেখানেও কি অত্যাচার হয় না? মগের মূলুকেও কাঁবতা লিখিয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে রুখিয়া দাঁড়ায় কে? এমনি ছিল তাঁর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি! ভাওয়াল হইতে নাকি গোবিন্দ দাসকে কে কবে নির্বাসিত করিয়াছিল। হবেও বা কিন্তু তাই লইয়া এত বিনাইয়া ছিনাইয়া কবিতা লেখার কি আবশ্যক ছিল?

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ,

আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।

\* \* \* \*

আহা তার নরনারী                      ফেলে যে আঁখির বারি,  
 অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে স্রিয়মাণ,  
 বার মাস তের কাতি,                      দিনে রেতে সে ডাকাতি,  
 বৃকে বিধে সদা মোর, শেলের সমান !  
 তাদের কলিজা ভাঙ্গা                      যাতনা-আগুন-রাঙ্গা,  
 শিরায় শিরায় জলে শিখা লেলিহান !

\*   \*   \*   \*   \*

বৃকের শোণিত দিলে,                      যদি তার শুভ মিলে,  
 যদি তার দুখনিশি হয় অবসান,  
 আপনি ধরিয়া ছুরি,                      আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি.  
 কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান !

আবার সেই ভাওয়ালের রূপ-বর্ণনার ভঙ্গীমাই বা কি ?—

তার সে পিকের ডাকে,                      জ্যোৎস্না জমিয়া থাকে,  
 যামিনী মূরছা যায়, শ্যামা ধরে তান !

\*   \*   \*   \*   \*

স্নেহের প্রতিমাখানি,                      অরণ্যের মহারাণী,  
 শস্যের কনক-হাসো চির-শোভামান ।

এমন যে এত বড় একটা বাঙ্গালী জাতি, ইহাকে একদিন ধরিয়া হাত-পা বাঁধিয়া যদি কেহ নিকাসন দেয়, তবে তার জন্য দুঃখ বা প্রতিবাদ করিয়া কবিতা লিখিবে, এও বড় অবিবেচক বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে কেহই নাহি। বরং সেই নিকাসনদণ্ড সমর্থন করিবার জন্য ভাড়াটিয়া লোকের আবশ্যক হইলে, খোদ বাঙ্গালী প্রধানদের মধ্য হইতেই তাহার সংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হইবে। এ হেন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে গোবিন্দ দাসের মত একজন দারিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তির ভিটামাটি কোন্ প্রবলপ্রতাপাব্যস্তিত কে কবে উচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহা কি একটা মনে করিয়া রাখিবার মত ঘটনা, না কবিতা লিখিবার বিষয়? আর ভিটামাটি-উচ্ছেদকারী প্রবল আততায়ীর বিরুদ্ধে ‘চিরজিহ্বা সিংহের’ কবিত্ব-গজ্জ্বল যে শুধু নিষ্ফল, তাহাই নহে; ইহা নানা প্রকারেই বিষন্ন-সঙ্কুল। কিন্তু কবি গোবিন্দ দাসের সে বিবেচনা ছিল না। তিনি তাঁহার নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থা জানিয়াও বলিলেন—

“সংসারে আমার ভাই,

যদিও কেহই নাই,

তবু ত তোমরা আছ; দেশবাসিগণ?”

গোবিন্দ দাস ভাবিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে নাকি তাঁহার আবার ‘দেশবাসিগণ’ আছে!

গোবিন্দ দাস তাঁহার সেই কর্তৃত্ব দেশবাসিগণের নিকট দুঃখ করিয়া বালিয়াছিলেন—

“এ নহে সামান্য শাস্তি,

এ ভাই যৎপরোনাস্তি,

কঁাসির পরেই এই চির-নিকাসন !

বিনা দোষে কেন তবে,  
এ শাস্তি আমার হবে ?

দরিদ্র দুর্বল আমি, এই কি কারণ ?

কি নয় ত কি ? দাস-সুলভ নীচতার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সর্বদাই প্রপীড়িত দরিদ্র দুর্বলকে ঠেলা মারিয়া অতি দ্রুত অত্যাচারী প্রবলের চরণচ্ছায়ায় নিজে মস্তক উত্তোলন করিতে ধাবিত হয়। দৃষ্টান্ত ? বাদ্গলা দেশের সম্প্রতি কয়েকটা উর্দ্ধে উখিত মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখিতে পাইবে। সুতরাং বাদ্গলার কোন বড়লোক (?) গোবিন্দ দাসকে সাহায্য করিলেন না। গোবিন্দ দাসের ‘নির্বাসিতের আবেদন’ আজ ২৩ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। অধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় ইহার প্রধান ত্রুটি যে, ইহা Art for Art's Sake নয়। আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দোষ যে, এই কবিতাটির অর্থ পাঠ করিবামাত্রই অতি স্পষ্ট বুঝা যায়।

তোমরা বিচার কর আমারে যাহারা,  
করিয়াছে নির্বাসিত,  
করিয়াছে বিড়ম্বিত,  
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়-দেশ-ছাড়া,  
পথের ভিখারী করি  
করিয়াছে দেশাতুর্ভী,  
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা—

\* \* \* \*

যারা ভাই বন্ধু হয়ে,  
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,  
আকুলা জননৌ বোন্ কেঁদে হয় সারা !  
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !

গোবিন্দ দাসের ‘আবেদন’ মত বিচার করিবার জন্য কোন সাহিত্যিক কমিশন বসিয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। কেন না, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম যে, কমিশন অনেক একতরফা অহুসঙ্কান ও আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে গোবিন্দ দাসের নির্বাসন দণ্ডের অপ্রকাশযোগ্য অথচ অভিশয় ন্যায়সঙ্গত ‘সাহিত্যিক কারণ’ (?) বিদ্যমান আছে !

যে দেশে কোন নিঃসহায় প্রপীড়িত কবির উপর দিবা দ্বিপ্রহরে উল্লিখিত অত্যাচারের একটা প্রতীকারের জন্য কোটাতে একটি মিলে না,—

সত্যই সে বঙ্গদেশ,

ভরা শুধু ছাগ মেঘ,

সেখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন !

এই কবিতাটির সাহিত্যিক বাচাই করিবার সময় এখনও বহিষ্কা য়া নাই। বাদ্গালীর সাহিত্য যদি না মরে, তবে গোবিন্দ দাসের সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য, সাহিত্য-ব্যবসায়িগণ অবশ্যই একদিন গুজন করিবেন। সে বাটখাড়া

দাঁড়িপান্না ও সে অপক্ষপাত দৃঢ় সংলক্ষণ হস্তের অপেক্ষার হয় ত কিছু দীর্ঘদিনই বা আমাদেরকে বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু একটা কথা আজই বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত যে গোবিন্দ দাস যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সার্থক হয় নাই। দোষ ক'হার? গোবিন্দ দাসের, না তাঁহার 'দেশবাসীগণের'? কোন রসিক ব্যক্তি হয় ত চট্ করিয়া বলিয়া বসিবেন যে, 'দোষ কারো নয় গো শ্যামা',— ইত্যাদি!

এক জন মুমূর্ষু বৃত্তস্থ কবিকে যে কৃত্তর জাতি একমুষ্টি অন্নভিক্ষা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, কি স্বপ্নে, কোন্ সাহসে সে পৃথিবীর বৃকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠার তাহার অন্তিমের প্রায়ণ বজ্রের রাশিতে চায়? পৃথিবী এবং ইতিহাসে তাহার কোন্ অধিষ্ঠান? এক দুর্দম আততায়ী সভ্যতার সংঘর্ষে যে আলোড়ন বাঙ্গালার বৃকে আজ শতবর্ষ ধরিয়া চলিয়াছে,—যাহাকে বলা হয় এক উন্নতিমুখী সংস্কার, যাহার কোন ক্রটি দেখাইতে যাওয়াই ব্রাহ্মণ বা গো হত্যার তুল্য, আমরা কি ভিজ্ঞাশা করিতে পারিব না যে, ইহা কি তাহারই শিক্ষা?

এক একটা ঘটনার জাতির অনেকগুলি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সমস্ত লক্ষণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া বাহির হয়। গোবিন্দ দাসের জীবনী আয়োচনায় অধ্যুয়নকাল ফ্যাসানের ইংরাজানবীশ কেতা-দ্রুত মুখপাত-প্রশস্ত দেশমাতৃকার ও বঙ্গভাষা-জননীর উন্নতিসাধনে নিয়ত বরুণরিকর এবং ক্রুব, সাধ্বলন (বার্ষিক ও মাসিক), পরিষদ (মূল ও শাখা) প্রভৃতি দুর্দম স্থানাদিতে সদা-সর্বদা গগনাগমনে ছটফটায়মান ও নিত্যন্তই বস্তুভিক্ষালব, বাঙ্গালার 'সাহিত্যমোদগণের কোন কোন দিকের একটা অতি বিশিষ্ট পরিচয়ই আমরা লাভ করিয়াছি। মনুষ্যজাতের দরবারে আমরা কাঁব গোবিন্দ দাস সম্পর্কে নিজেদের এই আচরণ যদি কপালে প্রাকার্ড মারিয়া লইয়া গিয়া উপস্থিত হই, তাহা হইলে, ভীষণত্যা সম্ভবতঃ নাও হইতে পারে, কিন্তু সেই দরবারের সদর-দরজার বাহির হইতেই যে আমাদেরকে প্রবেশক্রিয়ের গুরুতর ব্যথা সহ অতি দ্রুত গৃহে প্রত্যা-বর্তন করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

কেন না, কবি গোবিন্দ দাস নির্বাসিতের নিষ্কল আবেদন লিখিয়া, তাহার ঠিক পরের বৎসরেই লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কর ?

\* \* \*

ও মাথিয়া মারি কাটা যত মনে লয়।

গোবিন্দ দাস দেখিলেন, যাহারা 'অধম' এবং 'পিশাচ', তাহারাও অনায়াসে 'বড়লোক' হয়—যদি 'গর্দভের পদযুগল' মাথায় মাখিতে পারে। 'উকীল, ডাক্তার আদি সম্পাদক চয়' এবং আরও বারা মানা-গণা, তাদের 'অবিচার', 'ব্যুভিচার', ও 'ভয়ঙ্কর পাপময় কার্যের' অন্ত নাই, এবং ইহারা 'বঙ্গের উজ্জ্বল আশা'! আরও তিনি দেখিলেন যে, 'বিবেক বিক্রয়, করিতে ইহাদের তিলান্ন দেয় না, এবং সর্বদাই 'বলিতে উচিত সঙ্কটিত র।' 'ইংরাজী শিক্ষা' ও 'পাশ্চাত্য নীক্ষা' এই দুইই তিনি দেখিলেন নিত্যন্ত অগার। 'অই হ্যাট কোট' আর 'বিলাতী কথার চোট' এই সিংহচর্যের অস্তরালেও তিনি প্রকৃত গর্দভটিকে নিত্যন্তই চিনিতে পারিলেন। গর্দভসংস্কারের অহিলার যে ধূর্তাশি ও 'ভণ্ডামি', তাহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

‘কলেক্সি নলেজি ঢং—আর কিছু নয়।’—অর্থাৎ মোটের উপর কবি গোবিন্দ দাস শেষাংশেই আমাদিগকে চিনিরা ফেলিয়াছিলেন। কাজেই আমাদের উপর কোন প্রকার শ্রদ্ধা রাখা করা তাঁহার পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আর যেটা অস্বাভাবিক সব বড় বড় বাঙ্গালীই জানে, এবং শিখে, অর্থাৎ উপরওয়ালার মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত কচলান আর ‘আজ্ঞে হ্যাঁ’,—‘তাঁ বা বলেছেন’—‘আর আপনার মত’ ইত্যাদি এই সমস্ত ভুল নানা রকমেব হুঃখে কন্টে পড়িত হইয় ও তিনি কোন দিন অভ্যাস করিতে পারিলেন না। কাজেই তিনি না থাইয়া মরিবেন না ত মরিবে কে? তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটা নিলজ্জ স্পষ্টতা ছিল এবং কোন রূপ অস্পষ্ট অধ্যাত্মিকতার এমন অভাব ছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া রুচিকে শুচি রাখা একশ্রেণী সাহিত্যিকের পক্ষে বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, ভাওয়াল ভাওয়াল করিয়াই গোবিন্দ দাস মারা গেল। ‘বিশ্ব’, বেচারার খবরটা কোনকালেই লইবার অবকাশ পাইল না। এই আজিকার দিনেও!

এই যে ভাওয়ালবাসী,  
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,  
অবিচারে বাহিচারে ভ্রান্ত হই,  
কে করে তাহার খোঁজ,  
অনুরেরা রোজ রোজ,  
কত যে কুলের বধু চুলে ধরি লয়।  
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,  
পতির বঁধিয়া ঘরে,  
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়,  
কত যে জননী বোন্  
কাটিয়া ঘরের কোণ,  
চুরি করে পিষাচেরা নিশীথ-সময়। ইত্যাদি

কোন ভ্রাতৃলোক এই সমস্ত অশ্লীল (?) ঘটনা লইয়া কবিতা লিখিতে পারেন—এই রকম স্পষ্টভাবে—ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাতে এতটুকু মাত্রও অস্পষ্টতা নাই যে, কোন রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলিতে পারে। এই রকম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ত গোবিন্দ দাসকে ঘাতকের হস্তে গুল্যভাবে হত্যা করিবার যড়যন্ত্র হইয়াছিল। আবার মুক্তিলাভ এমন যে, গোবিন্দ দাস তাহা লইয়াও কবিতা লিখিলেন—

আবার সে মোহে মাতি,  
পাঠাইলি গুল্যঘাতী,  
গোপনে বধিতে মোরে—এ কি লজ্জা কম?  
হা রে জীক কাপুরুষ—হা রে নরাধম।

• আমরা আরও শুনিয়াছি যে, যে মাসে কর্ণার মৃত্যু হইয়াছে—সেই মাসে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি মাত্র ৮ বেলার ভাত খাইতে পারিয়াছিলেন—অবশিষ্ট দিনগুলি চিড়ী ও লবণ খাইয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। লেখক।

## স্বপ্ন-ভঙ্গে ।

প্রিয়াগারা শূন্যপুরী ; শুক, ক্ষুর কবি-গৃহকোণ—  
সত্য, না এ স্বপ্নবাণী ? ক্ষণকাল ভাবিবারে দাও ;  
মা লইয়া অধুমতি কভু তো সে যায়নি কোথাও  
তবে আজ অকস্মাৎ ছেড়ে যেতে কেন হল মন !

কবেছি কি অপরাধ ? কৈ, কিছু পড়ে না তো মনে !  
শোধ কি দিয়েছি তার বুকভরা প্রণয়ের ঋণে ?  
যত ভাবি—মনে হয়, সকলি রহিয়া গেছে বাকী  
শান পাশে বাঁধি মোরে সে কি কভু দিতে পারে ফাঁকি !

কোথা দিয়ে কি যে হ'ল—হিসাবে তো মিলিল না কিছু ;  
বিনিত্র-নয়নে তবে লেখা-লেখা-খেলা কেন আর ?  
উপাড়ি' মগজ হ'তে রাশি রাশি উপমার ভার,  
চন্ ক'ব, ছাদে বসি' মনোরথে মরণের পিছু ।

দিগন্ত ভাসিয়া যায় জ্যোৎস্না-ধরায় ;  
ভুলে গেছি কোথা তার শেষ  
অবাক দাঁড়ায়ে আছি ; হৃদয়ের কাছাকাছি  
কি যে কাঁপে—নাহি তার ঠিকানার লেশ !  
মহসা কি নড়ে গেল, কে যেন রে সরে গেল,  
ভেঙে গেল জেগে-জেগে-যুম ;  
তরুলতা চারিধারে ফুলি' ফুলি' উঠিল কাঁদিয়া  
হৃদয়-পাষাণে রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাসে চকিতে যা দিয়া  
গুমরি' উঠিল যেন জ্যোৎস্না-স্নাতা যামিনী নিঝুম !

শান্ত হও স্নেহময়ি, নিশীথ-প্রকৃতি অয়ি !  
বুঝিয়াছি—কিস্তি কেন শোক ?  
আমারে একাকী হেথা ক্ষণকাল দাঁড়াইতে দাও ;



মুক্ত এই গৃহ-ছাদ

নয়ন জলের ফাঁদ

এখানেও কেন আর পেতে দিতে চাও—

আমি যদি কাঁদি—ছি ছি—বলিবে কি লোক !

\* \* \* \* \*

অশ্রু ? সে তো বহুকাল চুকেবুকে গেছে সই

এখন যে হাসিবার পালা ;

বিজ্ঞ ওষ্ঠপ্রান্ত হ'তে ছুটিয়াছে তীক্ষ্ণ হাস্য

মর্মে মর্মে বিতরিয়া তপ্ত তীব্র জ্বালা ;

এ শুভ সময়ে প্রিয়া তোমার বিয়োগ নিয়া

কাঁদিবার অবসর কই ;—

কাঁদিব ? বল কি সখি !

অদৃষ্ট যদিপি করে মারাত্মক ভুল.

বিক্রপের অশনিরে খামকা ছড়াতে বলে

শিশিরার্দ্র স্নেহ-শুভ্র ফুল—

সত্য করি বল দেখি তবে

বাতুল সে অদৃষ্টই পরিহাসযোগ্য কিনা ভবে ?...

না, না, অশ্রু—দূরমপসর ;

ধর প্রিয়ে, প্রণয়ের পুরস্কার ধর

—অশ্রু নহে, জমাট বরফ

স্বহস্তের পরিস্কার সরল হরফ—

“মরিয়াছ—বাঁচায়েছ মোরে,

চলুক অবাধ হাস্য কিছুকাল ধরে।”

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

## ভবানীপুর তীর্থে।

—:~:—

ভবানীপুর হিন্দুদিগের একটা পীঠ স্থান। এখানে দেবীর বাম গুল্ফ পবিত্র হয়। উহা বগুড়া হইতে অনান বিংশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকাপথে করতোয়া দিয়া একেবারে ভবানীপুরের ঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তবে বৈশাখ বর্ষা না হইলে চান্দাইকোণা হইতে পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে অথবা গো-যানে যাইতে হয়।

বহুদিন হইতে একবার ভবানীপুর বেড়াইতে যাইব ইচ্ছা ছিল কিন্তু কখনও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে একদিন দুর্গা বলিয়া বাতির হইবার মনস্থ করলাম। এদেশে স্থলপথে একমাত্র গো-যানই সর্বশ্রেষ্ঠ যান। তাহারই ব্যবস্থা করা হইল। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গো-যানে আশ্রয় লইলাম। বিশ মাইল পথ,—যান গড়ালিকা সূত্ররং মধুর ঝাঁকুনিতে অশ্রুঃ আশ্রুঃ অঙ্কিত কামিয়া যাইবে এত ভয়েই ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, শকটচালক বিচাল বিছাইয়া যথাসম্ভব আরামদায়ক শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তবু রক্ষা!

একে আমাবসার নিশি, তত্পরি আবার পথে ব্রাহ্মভীতি ও তন্দ্রার উপদ্রব সূত্ররং নিদ্রা মোটেই হইবার আশা ছিল না। এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই মুঘলধারে বারবর্ষণ ও মাঝে মাঝে বজ্র নির্য্যাস হইতে লাগিল। হঠাৎ দেবরাজের একরূপ সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল বলাই বাহুল্য। মাঠা হউক অতিকটে ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রভাতকালে সেরপুরের ডাকবাংলায় পৌঁছলাম। সেরপুরে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস। স্থানটির চতুর্পার্শ্বে জঙ্গল, পথ ঘাটগুলিও অতি কদর্য্য অথচ এখানে একটা মিউনিসিপ্যালি বর্তমান! লোকগুলির চেহারা মালাবর্য্য প্রসিদ্ধিত। থানা, টোলগ্রাফ ও পোষ্টঅফিস হাটখুলে আছে! আয়োজনের ক্রটি নাই—ক্রটি কেবল বোধ হয় লোকের!

সেরপুরে তাড়াতাড়ি স্নানাহারাদি সম্পন্ন করিয়া পুনর্বার গো-যানে আরোহণ করলাম। সেরপুরের সরভাড়া ও রাখবসাই অমৃত! ভবানীপুর, সেরপুর হইতে চারিক্রোশ মাত্র ব্যবধান। যাত্রীগণের যাত্রায়াতের নিমিত্ত পূর্বে একটা “জাঙ্গাল” ছিল; এক্ষণে বগুড়ার বর্তমান ডিষ্ট্রিক্ট জাঙ্গালয়ার ত্রিযুক্ত পূর্ণেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ যত্ন ও উদ্যোগে ঐ অপ্রশস্ত জাঙ্গালটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। পথটির বিশেষত্ব,—একেবারে সরল ও বর্ষাকালেও কাদা হয় না! পথের দুধারে লোকালয় নাই—স্থানে স্থানে কাচং ছই একটা বুনো সাঁওতালের বসতি দৃষ্ট হয়।

বেলা প্রায় ৩টার সময় ভবানীপুরে পৌঁছলাম এবং তৎক্ষণাৎ দেবীদর্শনে যাত্রা করিলাম।

পথে একটা শুভ্রকেশ বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল, বৃদ্ধ আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল। এবং তাহার নিকট হইতে ভবানীপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিলাম।

ভবানীপুরের অনতিদূরেই গোবিন্দপুর গ্রাম। গোবিন্দপুরে একজন কৃতবিদ্যা শাস্ত্রাধ্যায়ী সং ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের একটা পরশ্বিনী গাভী ছিল। গাভীটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা হেতু একটা বালক ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। উপযুক্তপরি দুই দিবস দোহনকালে গাভীর একটুক মাত্র দুগ্ধ না হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। বালকও দুগ্ধ না হওয়ার কারণ অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া হতভম্ব হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে বালক, গাভীটি লইয়া ভঙ্গলে প্রবেশ করিল এবং উক্ত ঘটনার কারণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত একটা অস্থল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গাভীটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সে দেখিতে পাইল গাভীটি দ্রুতগতিতে আসিয়া একটা বিষুবক্ষতলে দাঁড়াইল এবং দাঁড়াইবা মাত্র তাহার স্তন হইতে আপনা-আপনি দুগ্ধদারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সত্তর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় আসিয়া দেখিল স্থানটি প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ও মসৃণ এবং তথায় চুপ্তের চিহ্ন মাত্র নাট; দেখিয়া বালকের বিষয়ের পরিসীমা থাকিল না। সায়ংকালে বালক, প্রভু নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু মনোহর চক্রবর্তীও তৎপর দিবস স্বয়ং বালক-বর্ণিত ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবম্বিত হইলেন। বহু চেষ্টাসত্ত্বেও এই চুপ্তের রহস্যের কোনই সমাধান করিতে পারিলেন না। কিরদ্বন্দ্বের পরে একটা ঘটনায় সমস্তই তাঁহার পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

একদা চাটমোহর পানার অন্তর্গত ডেকলচড়া নিবাসী জনৈক শঙ্খব'ণক ভবানীপুরের ভিতর দিয়া যাঠিতে যাঠিতে একটা পুরাতন পুষ্করিণীতে উপনীত হয়। ধূলাশেলারতা এক অনিন্দা-সুন্দরী বালিকাকে এই স্থাপন-মন্ডল নির্জন বনভূমিতে দেখিয়া বণিক আশ্চর্যান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। বালিকা, বণিককে দেখিয়া শীথ পরিধান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বণিক তৎক্ষণাৎ বালিকার কোমল বাহু যুগলে শীথ পরাইয়া দিয়া মূল্যের নিমিত্ত তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। বালিকা, বণিককে মনোহর চক্রবর্তীর নিকট গমন করিয়া মূল্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।

নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ, জনমানবহীন, হিংস্রজন্তু সমাকুল বনাগ্রদেশে বাপীতটে তাঁহারই কন্যা শীথ পরিধান করিয়াছেন ও মূল্যের নিমিত্ত বণিককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া কিছুই ব্রীতে না পারিয়া বণিক সমভিব্যাহারে জলাশয়তটে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় বালিকার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, শুধু কেবল ধূলাশেলার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, তিনি অধৈর্য হইয়া শিশুর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে ব্রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তের করুণ ক্রন্দনে করুণাময়ীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল এবং সরসীবক্ষে শঙ্খালঙ্কৃত বাহুযুগল কমলকোরক সদৃশ বিকশিত হইয়া উঠিল।

বণিক এতকাল পর্যন্ত নির্ঝাঁক নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এইক্ষণ উভয়ে “মা” “মা” বলিতে বলিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ সেই হইতে বালিকার উদ্দেশ্যে তপ জপাদি আরম্ভ করিলেন এবং প্রায় পঞ্চাধিক কাল অতিবাহিত হইলে স্থপ্নযোগে বিষ্ময়ে পীঠের অস্তিত্ব অবগত হইলেন ও পূজাধনা করিবার আদেশ পাইলেন। তদ্বিবসাবধি তিনি তথায় পর্যকৃষ্টির নিষ্পাণ করিয়া দেবীর অর্চনা ও প্রতি সন্ধ্যায় শঙ্খঘটাদ্বার্নিতে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া, অগুরু মিশ্রিত পূত গন্ধে চতুর্দিক আনোদিত করিয়া সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করিতেন।

একদা মোগল স্ববাদের মীরজুনলা দিল্লী যাঠবার পথে সায়ংকালে এই ভবানীপুরের ঘাটে নৌকা নঙ্গর করেন। স্থবাদের করতোয়ার নির্জন বনাগ্রদেশে শঙ্খঘটাদ্বার্নি শ্রবণ করিয়া কারণ অস্বেষণে একজন অমুচর প্রেরণ করেন। স্থবাদের কয়েকটা কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে সম্রাট কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া বন্দীভাবে দিল্লীতে গমন করিতেছিলেন। যখন অমুচর প্রত্যাগমন করিয়া বনভূমির সমুদয় ঘটনা ও জনশ্রুতি নিবেদন করিল, তখন স্থবাদের একাগ্রমনে দেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস সহ প্রশান্ত মনে অমুচরের ব্যথাগুলি দেবীর উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিলেন। নৌকাপথে প্রায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল, দিল্লী পৌছিতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে।

স্বাধার স্নায় অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িতেছেন এমন সময় একদিন প্রভাতে জনৈক পত্রবাহক সম্মুখীন হইয়া সম্মানে তাঁহাকে অভিবাदन করিয়া সম্রাটের একখণ্ড পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

পত্র সম্রাটের প্রসাদলাভ ও পূর্ববঙ্গের শাসন ভার পুনঃপ্রাপ্তির বিষয় লিখিত ছিল। স্বাধার তৎক্ষণাৎ পূর্ববঙ্গ প্রতাগত হইবার নিমিত্ত নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন।

এবার ভবানীপুরের ঘাটে পুনরায় নৌকা নঙ্গর করিয়া লোকজন সমভিবাভারে পুরী প্রবেশ করিয়া সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিলেন এবং দেবীর ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া দেবীর সেবা-পূজার অভাব মোচনার্থ “ভবতোয়া” গ্রামটী “ভবানীগানে” অর্পণ করেন ও বিপুল অর্থব্যয়ে “বোড়বাঙ্গলা” নাম একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীর অপর নাম ভবানীথান, ভবানীথান হইতে দেবীর নাম ভবানী হইয়াছে, এবং দেবীর ভবানী নাম হইতে “ভবতোয়া” গ্রাম ভবানীপুর নামে অভিহিত।

মনোহর চক্রবর্তী মহাশয় এই বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সঁাতইলের অধিপতির করে সমর্পণ করেন। প্রাক্তনের ফলে তিনি অল্পদিন মধ্যেই সঁাতইলের অধিপতি নাটোর রাজাধিরাজের হস্তে দেবীর বিষয়-সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। নাটোরাদিপতি রামজীবন রায় বাগচর, নাটোর রাজকুলবধু প্রাভঃস্বরগীরা রাণী ভবানী ও তৎকন্যা ভাগ্যসুন্দরী এবং পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ রায় বাগচর পুরীর মধ্যে বহুমূর্তি স্থাপন, মন্দির নির্মাণ ও দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখনও দেবীর সেবাপূজা, বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নাটোরাদিপতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

ভবানীপুর গ্রামটী পূণ্যতোয়া করতোয়ার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু অধুনা ভবানীপুর হইতে করতোয়া প্রায় দুই মাইল পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত। গ্রামে সামান্য কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তান্ত্রিক, নাপিত ও কুস্তকার প্রভৃতির বাস। গ্রামের মধ্যভাগে দেবীর মন্দির; উহার চতুর্দিক প্রাচীর পরিবেষ্টিত। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটী প্রবেশদ্বার। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারটী টেকনির্মিত গৃহ। পুরীর মধ্যে শুষ্কমনে শুষ্কভাবে ও নগ্নপদে প্রবেশ করিতে হয়। কথিত আছে;—জনৈক ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবীর মাহাত্ম্য শ্রীকার না করা হেতু তাঁহাকে রাত্রিকালে কোনও অদৃশ্য ভীমদেহীর হস্তে দস্ত দুইপাটী হারাইতে হইয়াছিল।

পুরীর ভিতরে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্বে অট্টালিকাগুলি নাকি অতি মনোরম ছিল, কিন্তু ১২৯৫ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে সবগুলি ভগ্ন হইয়াছে। ভিতরে দুইটি অঙ্গন—দক্ষিণ অঙ্গনে দেবীর মন্দির, শিবমন্দির, নাটমন্দির, গোলাঘর ও কয়টী ভগ্ন অট্টালিকা। উত্তর অঙ্গনে রন্ধনশালা ও ভোজন-গৃহ। আসাদের উত্তর-পূর্বকোণে কাছারী বাড়ী। এখানে নায়েব প্রভৃতি ৭,৮ জন কাম্যচারী দেবীর বিষয়-সম্পত্তির আরবায়ের হিসাবনিকাশ করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পূর্বদিকে নায়েব মহাশয়ের থাকিবার বাসস্থান, পশ্চিমদিকে বিদেশবাসী যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান। কাছারী-বাড়ীর দক্ষিণে বাজার,—বাজারে মোট আটখানি দোকান, তন্মধ্যে চারিখানিতে ডাল, চাউল, চিড়া, গুড় ও অপর চারিখানিতে চিনি, বাতাসা ও ক্ষীর-তক্তি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য পাওয়া যায়। ভবানীপুরের ক্ষীরতক্তি অতি প্রসিদ্ধ। বাজারের পূর্বভাগে আনন্দবাগ। আনন্দবাগে প্রীতি রবিবারে ও বুধবারে হাট বাসায় থাকে।

পুরীর ভিতর উত্তর পার্শ্বে দেবীর মন্দির, মন্দির মধ্যে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীমন্দিরের পশ্চিম প্রান্তের একটি প্রকোষ্ঠে একটি যজ্ঞকুণ্ড দোণতে পাওয়া যায়। নাটোররাজ রামজীবন রায় বাহাদুর এষ্ট কুণ্ডটী তাঁহার নিজ হস্তের পরিমাপে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১×১ হাত, নির্মাণ করেন। বিশেষত্ব এই যে তাঁহার এক হাতের পরিমাপ আঠার ইঞ্চির দুইহাতের তুল্য।

দেবীমন্দিরের দক্ষিণ পূর্বভাগে “বারুয়ারী” নামে একটি মন্দির—মন্দির মধ্যে নাটোর রাজবংশের কুলধনু রাণী ভবানীর স্থাপিত “ভবানীম্বর” নামে শিবমূর্তি বিরাজিত। মন্দিরটী ভূমিকম্পে ভয় হইলেও এককালে যে ইহার গঠনপ্রণালী অতি মনোরম ছিল তাহা দৃষ্টি মাত্রেই অনুভূত হয়। রাণীভবানীপ্রদত্ত শিবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে শিবের পূজা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হয়।

পুরীর উত্তর প্রান্তের প্রাচীরের বহির্ভাগেই অতি পুরাতন “শাঁখার” বা শাঁখা পুকুর। এইখানেই দেবী বালিকাবেশে শাঁখা পরিধান করিয়াছিলেন।

পুরীর উত্তরপূর্ব কোণে একটি অতি পুরাতন বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—এই অশ্বথ বৃক্ষই আরোহণ করিয়া বালক, গাভীটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

মন্দিরের পূর্বভাগে “বেলবরণ” নামক একটি বিষবৃক্ষ বহু শাখা-পাশা বিস্তার করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নভাগে ইষ্টকনির্মিত সোপান। প্রত্যহ এই বিষমূলে পূজা, ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে। এই বিষবৃক্ষতলেই দণ্ডায়মানা গাভীর স্তন হইতে বালক, দুগ্ধপায়ী নির্গত হইতে দেখিয়াছিল।

পুরীর উত্তরংশে শিববাটী। শিববাটী “কুমার” নামক পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে অবস্থিত। শিববাটীর পূর্ব-ধারের মন্দিরে “তারকেশ্বর” শিবের মূর্তি স্থাপিত। রাণীভবানীর কন্যা তারামন্দরী এষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নামের পরিচয়স্বরূপ এই মূর্তির নাম “তারকেশ্বর” কিন্তু ভূমিকম্পে তারকেশ্বর অঙ্গহীন হইয়াছেন।

পশ্চিম পার্শ্বে পাগলি মায়ের মন্দির। ইহার অপর নাম “ত্রিমুণ্ডি” অর্থাৎ গোমুণ্ড, ব্রাহ্মণমুণ্ড ও জারজমুণ্ড ইহার নিম্নভাগে প্রোথিত আছে। সাধক রাজা রামকৃষ্ণ এষ্ট ত্রিমুণ্ড আসনে “শবসাধনা” করিতেন।

কুমার পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে একটি তেঁতুল বৃক্ষতলে অপর একটি ইষ্টকনির্মিত “পঞ্চমুণ্ডী” আসন। পঞ্চমুণ্ডি আসন যে সমস্ত উপাদানে প্রস্তুত তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। ২টা চণ্ডালমুণ্ড, ১টা শিবামুণ্ড, ১টা দর্পণমুণ্ড, ১টা বানরমুণ্ড তন্ত্রোক্তপ্রক্রিয়ায় পরিশোধিত হইয়া এক একটি আসনের নিম্নভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহারাজ-স্থাপিত এইরূপ অপর চারিটি পঞ্চমুণ্ডি আসন, পুরীতে সাধকদিগের তপস্যার নিমিত্ত সংরক্ষিত আছে। পুরীর যুগকাষ্টের সন্নিহিতে একটি, পুরীর পশ্চিমধারে একগাধা করোগেট টিনের ঘরের মধ্যে একটি, পুরীর দক্ষিণ-পূর্বভাগে জলটলী নামক পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরস্থ বাধাঘাটের উপরে একটি, আনন্দবাগের পূর্বদিকে কেলিকদম্ব বৃক্ষতলে একটি, রাজা রামকৃষ্ণ এই সকল আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবীর সাধনা করিতেন। শেষোক্ত আসনটীর বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য উপাদান ছাড়াও একটি কুমারীর শবদেহ ইহার মধ্যভাগে সন্নিবেশিত।

অনেক নিষ্ঠা-ফল সাধুসন্ন্যাসী এই সমস্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আবার অনেক বিভীষিকা দর্শন করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন।

আনন্দবাগী বড়ই মনোরম স্থল। এখানে রানীকৃত বকুল বৃক্ষ শ্রেণীঃকৃত থাকায় ইহাকে প্রকৃতিরানীর বিহারস্থল বলিলেও অতুক্তি হয় না। আনন্দবাগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, বকুল ফুলের সুবাসে প্রাণে অপূর্ণ আনন্দ সঞ্চার হয়, হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

পুরীর পূর্বভাগে একটি বৃহৎ পুকুরিনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাতইগের অধিপতির কীর্ত্তি।

রানী ভবানীও ভবানীপুর হইতে চৌগা পর্য্যন্ত অপর একটি সরল পনর মাইল দীর্ঘ জাদ্বাল প্রস্তুত করিয়া যাত্রীগণের পথকষ্ট নিবারণ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে দেবীর সেবাপূজার বন্দোবস্তের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা রামকৃষ্ণ নিত্য বলির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। দেবীর ভোগে প্রত্যহ বোয়ালমংসা, বুটের শাক ও তাল প্রদত্ত হয় এবং দেবীর এমনই মহাশ্রী যে এসমস্ত দ্রব্য প্রত্যহই যে কোন প্রকারেই হউক পাওয়া যায়। দেবীর সেবাপূজাদি নিত্যকর্ম্ম নিয়মিতরূপে সম্পন্ন চটবার জন্য পুরোহিত, পণ্ডিত, খাঁড়াইত প্রভৃতি ৬০ জন দাসদাসী নিয়তকাল নিযুক্ত থাকে। চাকী মহাশয়েরা বংশপরম্পরায় দেবীর বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশধররাই বংশপরম্পরায় দেবীর পুরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। পুরোহিত মহাশয়ের অশৌচ প্রভৃতি কারণে মাঝে মাঝে দেবীর সেবাপূজা বন্ধ থাকে, কারণ দেবীর দেহ স্পর্শ করিবার অধিকার অন্যের আদৌ নাই। যিনিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন তিনিই বিপন্ন হইয়াছেন। দেবীর সেবাপূজার কোনও ক্রটি ঘটিলে দেবী তাহা স্পষ্টরূপে রাজগুরু বা রাজপুরোহিতের গোচর করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া থাকেন। অনেকবার নাকি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে দেবী অর্পণরূপে বিরাডিতা।

পুরী দর্শনান্তে দেবীর চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া নিজকস্তব্য সম্পাদনে গমন করিলাম। ফিরিবার পথে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই তবে কেবলমাত্র গাঁড়ুদুহের অঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে বাঘ মহাশয়ের ডাক শুনিয়া একটু ভীত ও বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। সঙ্গে যে ছইটি সাংসী হিন্দুস্থানী বীর ছিলেন, তাঁহারা বিড়ালছানার নাম গাড়ীর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, আমারও তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া হাসি আসিল—যদিও আমার নিজের সাহসের অবস্থাও তখন বিশেষ সঙ্গীন। যাহাহউক ভবানী মাতার আশীর্ব্বাদে নিবিড় বগুড়া আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

## শেষ।

—:~:—

আর কেন ? ফুরায়েছে । শাস্ত কর রুদ্ধ ! রোষানল,

নাহি আর অংসেতে তোমার

স্বাধীনতা-সতীদেহ, গতপ্রাণ হেরি অত্যাচার—

( যে তারে জনম দিল সেই চাহে করিতে সংহার ) ।

হের কি বিকৃত-মুখ দক্ষ ঐ করে পলায়ন,

সঙ্গী যত জর্জরিত ; নির্বাপিত যজ্ঞের ইন্ধন ।

চেয়েছিল যজ্ঞাগারে একেবারে যার নির্বাসন,

বিষুচক্রে তার দেহ দশদিকে পতিত এখন,

স্বাধীনতা-মহাপীঠ কতদিকে হয়েছে গঠন ।

হে ভৈরব ! আর কেন ? ধ্যানে এবে হও নিমগন,

অচিরে লভিবে উমা, তপস্যায় রত সে এখন ॥

বুঝেনি তখন মুঢ়, হেরি ধীর তোমার মুরতি

ধ্যানে মগ্ন অচল অটল,

কি শক্তি তোমার মাঝে লুকায়িত, উৎস ঝটিকার

স্বপ্ত যেন । মুক্ত হলে ত্রিভুবনে উঠে হাহাকার ।

শ্মশান-আলয়, অঙ্গে ফণী আর বিভূতি বিলাস;

তারই সনে সতী রাজে, প্রাসাদেতে নাহি তার বাস ।

স্বাধীনা সে, হোক তুচ্ছ, নিজের ত আবাস তাহার,

তারই মাঝে গড়িয়াছে কি স্থখের আবাস ভোলায় ।

চাহেনি সে নিজে নিমন্ত্রণ,

নিজেছায় উপেক্ষিলে যজ্ঞে নাহি সম্ভাষি যখন

তখনো ত' নির্বিকার—কিন্তু শুনি সতীর মরণ

জাগিল শ্মশানবাসী । কি প্রলয় করিল স্বজন ॥

এমনই একদিন জর্জরিত শত অত্যাচারে

ছাড়ি ঘোর গভীর হৃদয়

ফরাসী আগিয়াছিল, নির্বাপিত একটি ফুৎকারে

যাহা কিছু গোরবের তার ।

এটন্ত সেদিন পুনঃ টলমল বিশাল কৃষিয়া,  
এখনও আবেগে 'তার থাকি' থাকি' উঠিছে কাঁপিয়া  
নিরন্তর উৎপীড়ন নায় ধর্ম্য দলি' যেইখানে,  
প্রলয় বিষাগে তারা সচেতন হোক্‌ মানে মানে  
ভাবি মনে স্বভাব ভোলায়  
মুহুর্তে জ্বলিতে পারে সে নয়ন-অনল-আধার ॥

থাক্ —আজ বায়ু বহে তাহাদের গৌরব-কাহিনী  
মায়ের পতাকা ধরি' প্রাণপণ করেছে যাত্রা,  
সর্বদয় করিয়া দান ভাজিয়াছে কংসের সে কারা ।  
জয়, জয় তাহাদের । এস দিগ্‌ সাক্ষিয়া মোহিনী  
মন্ত্রনের অবসানে স্তরাস্তরে অমৃতের লাগি' ।  
কৃষির করিয়া পান চিরমস্তা তৃপ্ত হল আজি;  
আর নয়—কমলা গো ধরামাকে কর মা বিরাজ ॥

এসেছে দীপালি ত্রিপি । সাজা গুরে সাজা দীপমালা  
এ নয় পূর্ণিমা নিশি, রাস, দোল অথবা কুলন  
ঘোর অমাবস্যা মাকে ভীষণারে এ যে আবাহন  
মুগ্ধমালা গলে লোভে, এ যে কালী । শোণিতের খালা  
স্বপ্ন-পশু বলি করি' সম্মুখেতে কর সমর্পণ ।  
জগৎ শ্মশান এবে—তার মাঝে লয়ে বরাভয়,  
ভয়ঙ্করী ভীমা আজি আসিয়াছে হইয়া সদয় ।  
নামায়ে কৃপাণ রাঙা, ( তৃষ্ণা ত মা মিটেছে এখন, )  
যে মা দে জগতে শান্তি, কৃপাকণা করি বিতরণ ॥

‘‘সিদ্ধি’’ রচয়িতা ।



## মাড়া

সেকালে হইত দৈত্য-দেবতার নিত্য যুদ্ধ, আর একালে তোমার আমার মত মানুষই দেবতার প্রতি নিঃতই খড়াহস্ত। সেকালে আত্মরিক মান্যার খ্যাতি ছিল, একালে মানবের অসরলতা ও কপটতা তদপেক্ষা কম প্রসার লাভ করে নাই। ধর্মের প্রকাশ কাথো—মহন্তাবের অনুষ্ঠান ক্রিয়াতে—আমাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মের তিস্তিও—বলিতে চুঃখ হয়—প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ঐ কপটতায়—অতি দ্রুত, এই বাষ্পীয় শকটের যুগে আমরা উন্নীত হইতেছি তথা-কথিত উন্নত-সভ্যতায়! সভ্যতার নামে স্বার্থের পূর্ণ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলি দিতে চাহিতেছি অন্ধকে—কিন্তু বিধাতার অঞ্চল নিয়মে বলি হইতে হইতেছে আমাদের নিজেকে—নিজের মনুষ্যত্বকে—ফলে মায়াবিনী এই দানবীর প্রশ্রয় দিয়া দেশে ধর্মের নামে ঐ অধর্মের শ্রোত প্রবাহিত করিয়া—নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি—মারিতেছি নৈকে ও মারিতে চাহিতেছি দেশকে—জাতিকে—ভবিষ্যৎকে। সভ্যতার পথ কি তবে সরল নহে?

এক্ষণে আর সত্যসিংহের রাজ্যোচিত বিশাল গম্ভীর উদার রথ এ চতভাগা দেশে উন্মিত হয়না—প্রাচ্যের মহাবিকার আজ অজানিত গিরিগহ্বরে আবদ্ধ থাকায় প্রাচ্যের ঈশপের গল্পের সিংহচর্ম্মাবৃত গদ্গভের অপূর্ণ নৃত্যভঙ্গী দর্শনেই আমরা এত যুদ্ধ ও চকিত যে উগার চীংকার ধ্বনিকে প্তরাজ-গর্জন জ্ঞানে আমরা অসত্য গদ্গভকেই অগ্নানচিত্রে সর্বপ্রকার পূজাদান করিয়া ধর্মপ্রাণ এ মহাদেশকে অবনতির চরম সীমায় আনয়ন করিয়াছি। সত্যই নহে হয় এই কি সেই দেশ—যে দেশের রাজা রামচন্দ্র—রাজা হরিশ্চন্দ্র—সত্য পালনের জন্ত কি না করিয়াছিলেন—যে দেশে ধর্মের অপূর্ণ সভ্যতার জঞ্জলি বৃদ্ধ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্য আদি সর্বভাষী—যে দেশে বর্তমান যুগেও গুরুগোবিন্দ ও রামমোহন কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ণ সমন্বয়ে আধুনিক যুগসভ্যতার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন—যে দেশের নারী সীতা ও সাবিত্রী অগম্যাত্মা—যে দেশের ফুল্লরা ও বেহলা অতুলনা রত্নদীপদদৃশা?—আর এই বাহ্যচাকটিকাময় জাতিমুখরত প্রবন্ধকেরাই কি তবে ইঁহাদের বংশধর?

বালক চিরকালই সরল,—সত্যযুগেও যেমন, কলিতেও তেমন,—আজ যদি কোন বালক, কোতুহলাক্রান্ত হইয়া এই আবরণ-চর্ম্ম ঈবৎ টানিয়া ফেলিতে চায় তবে আর কি রক্ষা! অমনি আমরা বৃদ্ধের দল 'দেশ গেল, ধর্ম গেল, নীতি গেল, বেদাদবীর চরম' প্রভৃতি অরাও-কত-কি-আখ্যানে ও চীংকারধ্বনিতে তাহাদিগকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়া আবার সেই হতভাগ্যদের—সেই কোমল মতি বালকদিগের জাতিচ্যুত ও নানা প্রকার নির্যাতনের ব্যবস্থা করি—প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বতঃস্ফূর্তি অন্ধুরে বিনাশ করিয়া তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ হই। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতই ক্ষীণ হইয়া আসে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়া, ভাবি আমরা চির চক্ষুমান্—দৃষ্টি আমাদের সর্বত্র—সর্বদর্শী আমরা! মোহ ভ্রম আর কাছাকে বলে?

তুমিয়া আসিতেছি যুগে যুগেই নাকি সাধুর পরিভ্রাণের জন্ত ও চক্ৰতর্কিগের শাস্তি ব্যবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব হয়—ঐ বিশ্বাস কি অসত্য?—মনুষ্যবিশেষে অবতারের আবির্ভাব—অত্যাচার নিবারণে দেবশক্তির বিকাশ—এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানিত না হয় সে অশুদ্ধ কথা—কিন্তু তিনি যে ভাবরূপে মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে স্বপ্রকাশ, প্রকটিত হইতেছেন।—তাহা কি অস্বীকার করিবার?—যাহা আসিয়াছে—যাহা এ যুগের দান—তাহার প্রতিরোধ

সম্ভব কি ? সে ভাবের জয় হবেই—ভাবের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনীর মিলনে মন্দাকিনীর প্রশস্ত ও পবিত্র ধারায় স্রুতি করিয়া সমস্ত জগৎকে প্রাবল্য করিতেছে—তাহার ফল নিশ্চয়ই শুভ ;—সে শুভ ফল, ধর্মজগতেও আসিয়াছে—অতএব কপটাচারী সাবধান—যদিও সরল-বিশ্বাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বার্থান্ধিত্বের হঠাৎ ভাবতেছ—কৃতার্থ তুমি—বড়ই চতুর—কিন্তু ও-চতুরতা আর কতদিন—দেবতার অশীর্ষাদে ও-দিনের শেষ—‘তুচ্ছতার অবসান—আত দ্রুত হইবে নিশ্চিত ।

হে সত্যসেবী বলকবালিকা, যুবকযুবতি—ভবিষ্যতের আশা তোমরা—হে সত্যসেবী বৃদ্ধবৃদ্ধা—এস আজ এই শুভ মুহুর্তে রবিকরমণে দেশের সমগ্র নরনারী একমাত্র সত্য ও জ্ঞানের জগৎই প্রাণপণ করিয়া ধরে ঘরে সরলতার ও পবিত্রতার ভীষণ আদর্শ প্রাপ্তি করি—সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্যরূপ শক্তি-সংজ্ঞার স্রুতি করি । বিপুল-বিকার-বিক্ষিত সংঘত ও শুদ্ধ মন ও দেহে যে মহাশক্তির পূর্ণাঙ্গির সঞ্চার হইবে তাহাতেই কপটাচার ও কুসংস্কারের কুৎসং আবর্জনার সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে—তখন সেই সমবেত মহাশক্তি নবযুগের নব জাগরণের জাহ্নবীর পবিত্র ধারায় সমগ্র দেশকে এক নব সৌন্দর্য্যে ও শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া এক বিস্তৃত স্বর্ণপ্রাতিমার ন্যায় জগতের সমক্ষে প্রতীয়মান হইবে—তখন একমনে ও একসঙ্কল্পে জগতের কল্যাণ-কামনার ভারতের আদর্শ কৃষক ও বাণিক, আদর্শ শিল্পক ও ছাত্র, আদর্শ উকীল ও মোক্তার, আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার ও কারকর, আদর্শ বক্তা ও গ্রন্থকার, আদর্শ বিচারক ও বিজ্ঞানবিদ, আদর্শ ধনবান ও নিধন,—এক কথায় দেশের সকলেই এক হইয়া নিজ নিজ মনুষ্যত্বের পূর্ণাবকাশে বাগজগতের ও অন্তর্জগতের সম্ভাব্য শক্তি সমুদয় আয়ত্ত করিয়া ‘বপুল মত্ততা ও অসীম ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত ‘ন্যায় ও সত্যের’ বিজয় পতাকার নিয়ে সগৌরবে দাঁড়াইয়া অপূর্ণ শৌভ্রাভিষে ও প্রেমে স্তম্ভুর ঐক্যতানবান্দ্যে ও কণ্ঠে এক স্তম্ভান্ বাণী প্রচারে আবার এই মোহাচ্ছন্ন পতিত জাতিকে উন্নতির তিমাদ্রিশিখরে উত্তোলন করিয়া জগতের পূজ্য ও অতিকরণীয় করিবার সুযোগ আসিয়াছে ।

হৃদয়ে হৃদয়ে সাদা দিয়াছে,—গ্রহণ কর । ধনা হও বড়র বংশধর তোমরা—সেই স্বত্বিতে আত্মহার্য্য না হইয়া সেই স্বত্বির গৌরব-মতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বর্তমান যুগোপযোগী বিবিধ উন্নতিতে উন্নত হও । কে আজ অতীতের গৌরবে অন্ধ চক্ষু বলিতে পারে,—‘‘তুমি পুরাকালের ক্রিয়া-কাণ্ডকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় মনে কর—উহাতেই এ দেশে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির আবির্ভাব করিয়াছিল—উহাই আমাদের পথ ।’’ সত্যই তাই কিন্তু তাঁহাদের ঋষিত্বের মূলে আধুনিক কণ্ঠ নয়—কন্ঠের মূলতত্ত্বই তাহাতে অমর,—সে মূলতত্ত্ব আজও তোমার হৃদয়ে কণ্ঠ কারবে—অন্য দেশের লোকের অপেক্ষা—এই ভারতের মাটির মানুষ তুমি—তোমাতে তাহার অস্তিত্ব অনেক বেশী—সেই মতান্ উদ্দেশ্য—প্রতিষ্ঠাই ভগবানের কাণ্ড ভাবিয়া, তাঁহার সৃষ্টির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, স্বার্থে আপনায় আত্মার মঙ্গল না ভুলিয়া, নবযুগধর্ম্মে অটল হইয়া, সংযমের বলে বলীয়ান হইয়া—অগ্রসর হও ; ভারতে আবার ঋষির আবির্ভাব হইবে । আজ ভারতের যে নাট্যে—যে গুণে মহামতি ঋষিতুল্য এ যুগের আদর্শ গান্ধী ও ব্রহ্মসেনা লাভ করিয়া ধনা হইয়াছে—গুণ অমুপ্রাণিত লইলে গৃহে গৃহে ঋষির দেশে ঋষির আবির্ভাব নিশ্চিত—এ করনা নহে, সত্য—শাস্ত্রের কথা—অতি সত্য ।

## বক্রকীট ব্যাধি।

—:—

বঙ্গদেশের অধিবাসীদের শতকড়া ৭০ এরও অধিক লোক এই রোগে ভুগিতেছে। কেহ কেহ টপাক, বাঙ্গালীর জড়তা, উৎসাহহীনতা এবং দৈহিক দুর্বলতার কারণ বলিয়া মনে করেন।

ইংরাজীতে যাতাকে শুকনয়ানম ব্যাধি বলে, আমরা তাতাকে বক্রকীট ব্যাধি নাম দিয়াছি। এই কীটের দৈর্ঘ্য বড় জোর এক-তৃতীয় কি এক-চতুর্থ ইঞ্চি। মানুষকে আক্রমণ করিবার সময়ে এই হুক অর্থাৎ বঁড়ের মত বাঁকা হইয়া থাকে।

আমরা যাহা আচার করি তাতা পাকস্থলী চটতে অল্প মধ্যে গমন করে। এই কীট ছোট অস্ত্রের উপরিতাগ বিশেষভাবে আক্রমণ করে। বঁড়শীর আকার ধারণ করিয়া কীট দেহের দুই অগ্রভাগ দ্বারা অস্ত্রের পরদা কামড়াইয়া ধরে ও রক্ত শোষণ করে। কীট ত একটি চটটি নহে, ক্ষুদ্র বংশবৃদ্ধি করিয়া সহস্র সহস্র কীট রক্তশোষণ আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্তহীন করিয়া ফেলিতে থাকে। ব্যাধিক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ রক্তহীন চটতে থাকে প্রথমে সে নিজেকে রুগ বলিয়াই মনে করে না। কিন্তু ক্রমে এই অবস্থার রক্ত শোষণ ফলে রোগী এমন রক্তহীন হয় যে, তাহাদের চক্ষের কোণে রক্তচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, শরীর কাটিলেও গাঢ় রক্ত বাহির হয় না। তাৎপরে কীট যে স্থল আক্রমণ করে উহা খাইয়া ফেলে, সেই স্থলে একটা দাগ পড়িয়া যায়। এইরূপে অল্প মধ্যে সহস্র সহস্র ক্ষত চিহ্ন ভয়ে। অল্প অক্ষত থাকিলে উহা খাদ্যদ্রব্য চটতে যেমন ভাবে রস শোষণ করিয়া দৈহিক পুষ্টির সহায়তা করিতে পারে, ক্ষত অল্প তেমন পারে না। ফলে অজীর্ণতা ভয়ে।

এই রোগ অতিক্রান্ত পরিবাপ্ত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে মলত্যাগ করে উহার মধ্যে টক্সিয়ার অগাধ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ডিম্ব থাকে। হুচীর অগ্রভাগে যতটুকু মল ধরে অনুবীক্ষণ দ্বারা উহাতে ১০১৫টি ডিম্ব দৃষ্ট হইতে পারে। এই ডিম্ব পবে দুই অংশে, ক্রমে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া বিকশিত হইতে থাকে। ক্রমে আবরণ মধ্যে কীট ভয়ে। কীট যতকাল বাহিরে থাকে ততকাল তাহার রক্ষার জন্য এই আবরণের দরকার। জীকীট আকারে পুরুষ কীট চটতে বৃহৎ।

সবুস জমির উপর মল পরিত্যক্ত হইলে এই কীট অতিক্রান্ত জন্মিতে ও বাড়িতে পারে। কীটগুলি ঘাস বা পাতার তলদেশে থাকে।

যাহারা এই সকল স্থান দিয়া চলাফেরা করে, কীট তাহাদের অনাবৃত পদ বাহিয়া লোমকূপ বা ঘর্ষ নির্গমের চিত্র পথে দেহমধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশ স্থানে প্রাথমিকঃ চুলকানি চটয়া থাকে। মানবদেহে প্রবেশের পূর্বে কীট বাহিরে আবরণ ত্যাগ করিয়া যায়। এই কীট কঠিনালী, গ্রন্থি, ফুসফুস প্রভৃতি মানবদেহের সর্ব অংশেই গমন করিয়া থাকে, কিন্তু অস্ত্রে প্রবেশ করিয়া যেমন অনিষ্টসাধন করিতে পারে অন্যত্র তেমন পারে না।

যেখানে সেখানে মল ত্যাগের দ্বারা এই রোগ ভীষণভাবে পরিবাপ্ত হয়। সহরে ও পল্লীগামে সর্বত্রই মলত্যাগের এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যিক যে, ময়লা যথারীতি দূরীকৃত বা প্রোথিত হয়। যে স্থলে মলত্যাগ করা হয় এমন স্থান দিয়া অনাবৃত পদে চলাফেরা করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সঞ্জীবনী।

কোচবিহার টেই প্রেসে শ্রীমঙ্গলনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

# পরিচারিকা

( নব পর্ষদ )

“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ

পৌষ, ১৩২৫ সাল

২য় সংখ্যা।

ব্রাতা।

—:~:—

বিপদে মধুর কর

কে তুমি মো তুন্দর ?

আঁধারে ফুটাও কে গো আলোর জ্যোতিঃ ?

আশার কিরণ ভাঙ্গি’,

রামধনু রং রাঙ্গি

অশ্রুধারিণী দীপে চির আরতি !

শীতের বুকের মাঝে

জীবনের চির বাসা,

সবীন বসন্তে রাজে

চির প্রেম, চির আশা ;

মরণের নীড় হ’তে

ভাসাও জীবন স্রোতে

জীবনে মরণে ওগো চরম পতি।

সঙ্কটে দুর্দিনে  
 তুমি পার কর তরী,  
 বেদনায় তোমা বিনে  
 কে লইবে ব্যথা হরি  
 দূর করি প্রহেলিকা  
 আঁক রবিকর শিখা,  
 দুর্গম পথে ওগো চিরনার্থি !  
 সকল ভাবনা ভয়  
 কেটে যায় নিমেষেই,  
 কোন ক্ষতি কোন ক্ষয়  
 কোনখানে কিছু নেই ;  
 চিরসুখময় বেশে  
 তুমি আছ সব শেষে ;  
 তোমার চরণে লহ প্রাণ-প্রণতি ।

## ঘটকর্পর ।

—:~:—

বিক্রমাদিত্যের সভাস্থিত নবরত্নের নাম নিম্নলিখিত সর্বজনপরিচিত শ্লোক হইতে অনেকেই অবগত  
 আছেন :—

“ধনুস্তুরিঃ ক্ষণকামরসিংহশঙ্কু-  
 বেতাগভট্ট-ঘটকর্পরকালিদাসাঃ ।  
 খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভারিং  
 রত্নানি বৈ বরকর্চিব বিক্রমস্য ॥”

এই শ্লোকটি “জ্যোতির্বিদ্যভরণ” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম,  
 কালিদাস। এই কালিদাস জগৎপ্রসিদ্ধ কালিদাস ‘কি না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এবং নানা কারণে  
 ‘জ্যোতির্বিদ্যভরণ’ গ্রন্থখানিকেও বিশেষ প্রাচীন বা প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না। সুতরাং উপরিলিখিত  
 শ্লোকটি হইতে নবরত্নের অন্যতম রত্ন ঘটকর্পরের কালনির্ণয় করিবার প্রয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ঘটকর্পর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে বাইশটি মাত্র শ্লোকে রচিত  
 ঘটকর্পর নামক একখানি কাব্য প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহার ‘ধমক-কাব্য’ আখ্যা দিয়াছেন।  
 এই কাব্য ব্যতীত ঘটকর্পরের অন্য কোন রচনা আছে কি না, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

এই বাইশটি শ্লোকের শেষ শ্লোকটিতে ঘটকর্পরের নাম আছে :—

“ভাবানুরক্তবনিতানুরতৈঃ শপেয়ম্  
আলভ্য চাম্ব তৃষিতঃ করকোশপেয়ম্ ।  
জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ  
তন্মৈ বঃয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥”

অর্থাৎ “তৃষার্ত হইয়া অঞ্জলিপুটে জল লইয়া আমি যদি অন্য কোন কবি কর্তৃক যমক রচনার পরাস্ত হই তাহা হইলে আমি ঘটকর্পর ( ভগ্ন ঘট খণ্ড ) দ্বারা তাহার জল বহন করিব। প্রেমানুরক্তবনিতানুরতের শপথ লইয়া ইচ্ছা বলিতেছি।”

“ঘটকর্পর” এই শব্দ প্রয়োগ হইতেই ঘটকর্পরকে এই শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাইশটি শ্লোকসমষ্টিও “ঘটকর্পর—কাব্য” আখ্যা লাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক শ্লোকটিতেই যমক নামক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ আছে। কবিও তাই শেষ শ্লোকে গর্ব্বভরে এই বিষয়ে নিজনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একই বর্ণসমষ্টির পুনরাবৃত্তি হইতে যমকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিখ্যাত যমকের এই প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন :—

“সত্যর্থৈ পৃথগর্থায়ঃ স্বব্যঞ্জনসংঘতৈঃ ।  
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্মমকং বিনিগদাতে ॥”

[ সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ ]

মন্মট বলেন :—

“অর্থৈ সত্যর্থভিন্নানাং বর্ণানাং সা পুনঃশ্রুতিঃ ।  
যমকং পাদতদ্ভাগবৃত্তি তদ্ব্যত্যনেকতাম্ ॥”

[ কাব্যপ্রকাশ, ৯ম উল্লাস ]

এই পুনরাবৃত্তির বহুপ্রকার ভেদ হইতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। কেবল ঘটকর্পর যে প্রকারের যমক ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

ঘটকর্পর প্রতি শ্লোকের চার চরণের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়ের শেষ ও তৃতীয় ও চতুর্থের শেষ মিল করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটি এই :—

“নিচিৎ খমুপেতা নীরদৈঃ  
প্রিয়হীনাহৃদয়াবনীরদৈঃ ।  
সলিলৈনিহিতং রজঃ ক্রিতো  
রবিচন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতো ॥”

মেঘ-গুলি আকাশে উঠিয়া আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বিরহিণীর হৃদয়ে যাতনা উৎপাদন করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। রুষ্টিধারায় পৃথিবীর ধূলি প্রশমিত হইতেছে।

তাহার পর এই শ্লোকগুলি আছে।

“হংসা নদন্-মেঘভয়াদ্ দ্রবন্তি  
নিশামুখান্যাদ্য ন চন্দ্রবন্তি ।  
নবাঘুমত্তাঃ শিখিনো নদন্তি  
মেঘাগমে কুন্দসমানদন্তি ॥”

অগ্নি কুন্দের ন্যায় দন্তশালিনি ! মেঘের গর্জনে ভয় পাইয়া হংসগুলি পলাইতেছে। নিশায় আর চন্দ্র দেখা যায় না। বর্ষার নূতন জলে আনন্দে মত্ত হইয়া ময়ূরেরা ডাকতেছে।

“মেঘাবৃতং নিশি ন ভাতি নভো বিতাম্বং  
নিদ্রাভূতৈপি চ হরিং সূখসেবিতারম্ ।  
সেক্সায়ুধশ্চ জলদোদ্য রসস্নিভানাং  
সংরম্ভমাবহতি ভূধরস্নিভানাম্ ॥”

নক্ষত্র বিলুপ্ত হওয়ার রাত্রিতে মেঘে ঢাকা আকাশের আর শোভা নাই। সূখসেব্য নারায়ণ নিদ্রাগত। পর্বতের মত সুবৃহৎ হস্তীগুলি ইন্দ্রধনুখচিত মেঘের গর্জনে শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইতেছে।

“সতড়িঞ্জঃদোজ্মিতং নগেষু  
স্বনদন্তোদধরভীতপন্নগেষু ।  
পরিধীররবঃ ওলং দরীশু  
প্রপততাদ্ভূতরূপসুন্দরীশু ॥”

আশ্চর্য্যরূপ সুন্দর পর্বতসমূহের গুহায় বিদ্যাদৃগুর্ভ মেঘ দ্বারা বধিত জল ঘোররবে পড়িতেছে। মেঘের গর্জনে স্বেদনকার সর্পগুলি ভয় পাইতেছে।

“ক্ষিপ্ৰং প্রসাদয়তি সম্প্রতি কোহপি তানি  
কাস্তামুখানি রতিবহকোপি তানি ।  
উৎকণ্ঠয়ন্ত পথিকান্ জলদাঃ স্বনন্তঃ  
শোকঃ সমুদ্বহতি তদ্বনিভাসনন্তঃ ॥”

কেহ রতিকলহে ক্রুদ্ধ পত্নীর আনন শীঘ্র প্রসন্ন করিবার প্রয়াস করিতেছে। মেঘ সকল গর্জন করিয়া পথিকগণকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। তাহাদিগের পত্নীগণের অসাম হুঃখোদয় হইতেছে।

“ছাদিতে দিনকরস্য ভাবনে  
থাজ্জলে পততি শোকভাবনে ।  
মন্মথে চ ছাদি হস্তু মুদ্যতে  
প্রোষিতপ্রমদয়েদমুদ্যতে ॥”

রবির দীপ্তি আচ্ছাদিত হইয়াছে, গগন হইতে বারিধারা ঝরিতেছে। শোকবর্জনকারী কন্দর্প ছন্দে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হওয়ার বিরহিণী নারী এই প্রকার বলিতেছে।

“সর্বকালমবলম্ব্য তোরদা  
আগতাঃ স্হ দয়িতো গতৌ যদা ।

নির্ঘ্ণেন পরদেশসেবিনা

মারয়িষ্যথ হি তেন মাং বিনা ॥”

হে মেঘগণ ! তোমরা সকল ঋতুতেই থাক, কিন্তু যখন আমার প্রিয় চলিয়া গিয়াছেন, তখনই তোমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। নির্দয় পরদেশবাসী প্রিয়-বিরহিত আমাকে বধ করিতেছ।

“ক্রত তং পথিকপাংগুলং ঘনা

মৃদমেব পথি শীঘ্রলজ্জনাঃ।

অন্যদেশরতিরদ্য মুচ্যাতাম্

সাথবা তব বধুঃ কিমুচ্যাতাম্ ॥”

হে মেঘগণ ! সেই নির্দিত পথিককে বল ( কারণ তোমরাই শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিক্রম করিতে পার ) “এখন প্রবাসের প্রতি অমুরাগ ত্যাগ কর। নহিলে তোমার বধু কি বলিবে ?”

“হংসপংক্তিরাপি নাথ সম্প্রতি

প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।

চাতকোহ পি তৃষিতোহম্মু যাচেত

হুংখিতা মনসি সা প্রিয়া চ তে ॥”

হে নাথ ! এখন হংসগুলি আকাশে শ্রেণী বাঁধিয়া মানসসরোবরের দিকে চলিয়াছে। চাতকও তৃষিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে। তোমার সেই প্রিয়াও মনে অত্যন্ত হুংখ অমৃতব করিতেছে।

“নীলশম্পমভিভাতি কোমলং

বারি বিন্দতি চ চাতকোহ মলম্।

অম্মুদৈঃ শিখিগণোহ পি নাদাতে

কা রতির্দায়িতয়া বিনাদ্য তে।”

কোমল নীলবর্ণের তৃণরাশি শোভা পাইতেছে। চাতক নির্মল বারি লাভ করিতেছে। মেঘগুলি মম্বর সমুদ্রে ডাকাইতেছে। দয়িতাবিহীন তোমার আজ সুখ কি ?

“মেঘশব্দমুদিতা কলাপিনঃ

প্রোষিতা হৃদয়শোকলাপিনঃ।

তোয়দাগমকুশা চ সাদ্য তে

হৃৎকরেণ মদনেন সাদ্যতে ॥”

মম্বরগুলি মেঘের শব্দ শুনিয়া আনন্দিত কিন্তু বিরহিণী হৃদয়ের দুঃখের কথা বলিতেছে। আজ তোমার সে পক্ষী বর্ষার আগমনে ক্লশকায়া, হৃৎকর কন্দর্প তাহাকে অবসন্ন করিতেছে।

“কিং কুপাপি তব নান্তি কাস্তয়া

পাণ্ডুগুপতিতালকাস্তয়া।

শোকসাগরজলে নিপাতিতাং

ঋদুগুণম্বরগমেব পাতি তাম্ ॥”



তোমার কান্তার পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে অলক প্রাপ্ত আসিয়া পড়িয়াছে ; শোকসাগরের জলে সে নিপতিত ; কেবল তোমার গুণস্বরূপই তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে । তোমার কি তাহার প্রতি দয়াও নাই ?

“কুসুমিতকুটজেষু কাননেষু  
প্রিয়রহিতেষু সমুৎসুকাননেষু ।  
বহতি চ কলুষে জলে নদীনাং  
কিমিতি চ গাং সমপেক্ষসে ন দীনাম্ ॥”

কাননে কুটজ প্রস্ফুটত হইয়াছে । প্রিয়বিরহে রমণীগণের মুখগুলি উৎকণ্ঠিত চইয়া উঠিয়াছে । নদীগুলির জল কলুষিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে । দীনা আমার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ না ?

“নার্গেষু মেঘসলিলেন ঞ্চিনাশিতেষু  
কামো ধনুঃ স্পৃশতি তেজ বিনা শিতেষু ।  
গন্তীরমেঘরসিতব্যথিতা কদাচং  
জহ্যাং সখি প্রিয়বিরোগজশোকদাহম্ ॥”

পথ সকল বৃষ্টিতে বিলুপ্ত । মদন ভীক্ৰবাণযুক্ত ধনুর্ধারণ করিয়াছে । হে সখি ! মেঘের গন্তীর গর্জনে ব্যথিত আমি কবে প্রিয়বিরহজনিত শোকদাহ পরিত্যাগ করিব ?

“কুসুমসুগন্ধিতয়া বনেজিতানাং  
স্বনদন্তোদধরবাতবেজিতানাম্ ।  
মদনস্য কুতে নিকেতকানাং  
প্রতিভাস্তাদা বনানি কেতকানাং ॥”

গর্জনকারী মেঘসংস্পৃষ্ট বায়ু দ্বারা কম্পিত কেতকবনসমূহ মদনের নিবাস স্বরূপ হইয়াছে । রমণীগণ কুসুমের সুগন্ধে তথায় যাইতেছে ।

“তৎসাধু যদ্বাং সূতরাং সসর্জ  
প্রজাপতিঃ কামনিবাস সর্জ ।  
ঔং মঞ্জরীভিঃ প্রবরো বনানাং  
নেত্রোৎসবশ্চাসি সযৌবনানাম্ ॥”

হে মদনের আবাসস্বরূপ সর্জ ! প্রজাপতি যে তোমার সুলভ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সাধু । যৌবন-বিশিষ্ট জনগণের তুমি নয়নের আনন্দদায়ক, কারণ মঞ্জরী সমূহে ভূষিত হইয়া তুমি বনের অন্যান্য সমস্ত বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ ।

“নব-কদম্ব শিরোবনতাস্মি তে  
বসতি তে মদনঃ কুসুমস্মিতে ।  
কুটজ কিং কুসুমৈরুপহসাতে  
অগ্নিতাস্মি সত্বপ্রসহস্য তে ॥”

হে নব-কদম্ব বৃক্ষ ! মস্তক অবনত করিয়া তোমার প্রণাম করি । তোমার ফুল-ছায়ায় মদন বাস করেন । হে কুটজ ! পুষ্পসমূহদ্বারা কেন আমার উপহাস করিতেছ ? বিরহিনীর অতি দুঃখকারী তুমি—তোমার প্রণাম করিতেছি ।

“তরুণবর বিনতাস্মি তে সদাহং  
ছদয়ং মে প্রকরোষি কিং সদাহম্ ।  
তব পুষ্পনিরীক্ষিতা পদেহং  
বিসৃজে সহসৈব নীপ দেহম্ ॥”

হে কদম্ব ! আমি তোমায় সর্বদা প্রণাম করি । আমার হৃদয়কে দাহযুক্ত করিতেছ কেন ? তোমার কুসুম-  
দর্শন করিয়া আমি সহসা তোমার পদে জীবন বিসর্জন করিব ।

“কুম্মৈকপশোভিতাং সিতৈ—  
র্যনমুভাযুগলপ্রকাশিতঃ ।  
মধুনঃ সননেকা কাগতাং  
ভ্রমরশ্চুস্বতি যুগলকালতাম্ ॥”

মেঘমুক্ত জলকণা পাইয়া বিকসিত শুভ্র কুম্মভূষিত যুগলকাতাকে মদনের সময় উপস্থিত দেখিয়া ভ্রমর চূষন  
করিতেছে ।

“তাসানুভূতঃ সফল এব তি যা দিনেষু  
সেক্সাযুধাযুধগজ্জিতহৃদ্দিনেযু ।  
রত্নাসবং প্রিয়তমৈশ্চ সমানয়ন্তি  
মেঘাগমে প্রিয়সখীশ্চ সমানয়ন্তি ॥”

এই বর্ষাঋতু তাহাদের পক্ষেই সার্থক যাত্রা । এই ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের গর্জনযুক্ত হৃদ্দিনে প্রিয়তমের সহিত  
রত্নাসব করে ও বর্ষাগমে প্রিয়গণকে আনয়ন করে ।

“এতল্লিখ্য বিরহানলপীড়িতায়া—  
স্তস্যা বচঃ খলু দয়ালুরপীড়িতায়াঃ ।  
স্বস্বারবেণুকথিতং জলদৈরমোদৈঃ  
প্রত্যাযযৌ স গৃহ্মুনদিনৈরমোদৈঃ ॥”

বিরহানে পাড়িত ও করুণ প্রার্থনারত তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ালু তিনি বেণুর নিস্তম্বের ন্যায়  
জলবর্ষণকারী মেঘগর্জনে স্বীয় আগমন বিজ্ঞাপিত করিয়া আনন্দকর্ম্মবিশিষ্ট বর্ষার অতুল্য দিবস বাকি থাকিতে  
থুচে ফিঙ্কি আসিয়াছিলেন ।

এই শ্লোকে উল্লিখিত ‘দয়ালু’ কে ? কোনও টীকাকার এখানে রাগা ও কৃষ্ণকে নায়কনায়িকারূপে উল্লেখ  
করিয়াছেন । কিন্তু সেক্ষেপ কল্পনার বিশেষ কোন হেতু দেখা যায় না । প্রবাসী কোন প্রিয়জনের জন্য বিরহিনীর  
খেদ ধরিলেই সমগ্র শ্লোকগুলির মর্ম্ম স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে ।

কালিদাস ও ঘটকপরি সমসাময়িক, কিংবদন্তী হইতে এই কথা মানিয়া নইলে, মেঘদূতের সহিত এই শ্লোক-  
গুলির সাদৃশ্য অস্বত্ব হইবে । মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে বাস্তবহ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট পাঠাইতেছে, এই শ্লোক-  
গুলিতে বিরহিণী প্রবাসী প্রিয়ের নিকট মেঘকে পাঠাইতেছে । কারণ দিতেছে, মেঘেরাই শীঘ্র পথ অতিক্রম করিতে  
পারে । পর্তুত, নদী প্রভৃতি কোন বাধা তাহাদিগের গাত্রোধ করিতে পারে না । ঘটকপরের বিরহিণী প্রবাসী  
প্রিয়জনকে “পথিক-পাণ্ডুল” বলিয়া তিরস্কার করিতে দ্বিধা করে না । “কর্ম্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম বে আসিতে পারে

না, পথিকবধু তখন একথা মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র। সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে একথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।” (১)

বর্ষাগমে এই চাঞ্চল্য, এই বিরহবেদনার উন্মেষ, বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায়। সেখানকার গ্রীষ্ম প্রকৃতই ভৈরবের রুদ্র নিশ্বাস, তৃণগাছটি পর্যন্ত বিগুহ। চাতকের মতই নরনারীর কণ্ঠে পিপাসা, স্নগভীর কুপমাত্র সলিলসংগ্রহের একমাত্র উপায়। ভূগহীন ধূ ধূ মাঠ। কচিং ছই একটা তরু। তাহারই তলে গো মহিষ নিবস। মধ্যে মধ্যে তপ্ত বায়ু, ধুলির ঝটিকা উড়াইয়া দশদিক আঁধার করিয়া দিতেছে। তাই আজিকার দিনেও গগনে যখন নববর্ষার মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে তখন কৃষকরমণীর কণ্ঠে আপনা হইতেই “কাছরী” ধ্বনিত হইয়া উঠে। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও প্রাচীনকালে জলদ গর্জনে অনধ্যায়ের ন্যায়, স্থূল কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। প্রবাসীর বাড়ী ফিরিবারও এই সময়। কৃষকপরিবারের কণ্ঠে পুরুষেরা, বাহারী চাকরী লইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহারও কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য এই সময়েই ছুটি লইয়া গৃহে ফিরে। আজও তাই বর্ষার আবির্ভাব তাহার চিরন্তন প্রকৃষ্টিটির বিপর্য্য ঘটাইতে পারে নাট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন (২৪মে, ১৮৯০) :—“সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিকবধুদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্তে পারি নে। পোষ্ট অফিস এবং রেলগাড়ী এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই, তাই জনো বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে, আর্দ্রতন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকেন না। ডেকের সামনে বসে চিঠি লিখে, মুড়ে, টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তারপরে নিশ্চিন্ত মনে স্নানাহার করেন। এমন কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্বে যখন ভালরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিশের বন্দোবস্ত হয় নি তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল। তাই—‘প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হ’লো না’ কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল।” (২)

কিন্তু বর্তমানকালে ঠিক তেমনটি না থাকার দরুণ আমাদের কল্পনার অবাধগতিতে কোন বাধা পড়ে না, বরং দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয় বলিয়াই আমরা অবাধ কল্পনার বন্ধা শিথিল করিয়া বদৃচ্ছাক্রমে অভীতের স্বাক্ষরে ঘুরিয়া বেড়াই। কখনও কখনও আমাদের বিরহকাতর মনের বিরোগবাথাটির সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সেই বিস্মৃত বিরহী বিরহিণীদের দারুণ বাথারও ধারণা করিতে পারি। তাই এত যুগ পরেও ‘ঋতুসংহার’, ‘মেঘদূত’ প্রভৃতি আমাদের চক্ষে এক মনোমদ দৃশ্য ধরিতে পারে। তাই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানালোকেও এই মায়াকানন বিসুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ঘটকপরের বর্ষাবর্ণনাতে বিশেষ আড়ম্বর নাই। চন্দ্র সূর্য্য আবৃত করিয়া নিবিড় মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন, সুবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ধুলির উপদ্রব ত নাইই, অবিরল বর্ষণে পথের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পর্কত-গম্বর সকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানে জলের গভীর গর্জন। ময়ূরগণ আনন্দে উন্মত্ত। বারগবুথ মেঘগর্জনে ফুৎ, সর্পসকল ভীত। চাতক “দে জল, দে জল” বলিয়া ডাকিতেছে। হংসশ্রেণী মানসসমোহর অভিযুখে চলিয়াছে। ধরণী নূতন শ্যামল রূপে আচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। নদীর জল বর্ষাগমে

(১) নববর্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) সবুজপত্র : ৩২৪; ২৪৪ পৃষ্ঠা।

কলুষিত। মেঘের গারে ইজ্জদখু শোভা পাইতেছে। কেতক, কুটজ, সর্জ ও কদম্ব প্রস্ফুটিত। ভ্রমর যুগ্মকালতায় বসিতেছে। বর্ষাকালীন কুসুমে ভূষিত তরুগণ বিরহিণীর হৃদয়ে সন্তাপ জাগাইতেছে।

এই ঘটকপর্বের বর্ষাবর্ণনা। যে কৃত্রিম যমকের বন্ধন ঘটকপর্বের স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আর উপমা প্রভৃতির আধিক্য প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও সাদাসিধা কথাতেই তিনি বর্ষার মোটামুটি এক চিত্র দিয়াছেন। অবশ্য বাঁহারা সংস্কৃতকাব্যসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ মামূলি বর্ণনা।

কালিদাস বলিয়াছেন :—

“মেঘালোকে ভবতি স্মখিনোহপান্যাথ্যবৃত্তি চেতঃ

কণ্ঠাল্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥”

মেঘ উদ্ভিত দেখিলে, মিলিত প্রণয়িগণেরই চিত্র অন্যপ্রকার হইয়া উঠে, বাহাদের প্রিয়জন দূরস্থিত তাহাদের ত কথাই নাই। মেঘ উঠিলে পথিকবধুগণ অলকদাম সরাইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে মেঘের দিকে চাহিয়া দেখে, কারণ এইবার তাহাদের প্রিয়জন প্রবাস হইতে ফিরিবে। বর্ষাকালে কে প্রিয়জনের নিকটস্থ না হয়? (৩) ঘটকপর্বের বিরহিণীও তাই উৎকণ্ঠিতা। জয়দেবের আদ্যরসপ্রধান গীতগোবিন্দের প্রারম্ভও বর্ষাবর্ণনায়—“মেঘমেঘুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালজ্জটমৈঃ” আর আমাদের বৈষ্ণবকবিও সেই প্রাবৃত্ত সমাগমেই বিরহিণীর উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, “এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।” ঘটকপর্ব কাব্যের নায়িকাও তাই সুপ্রসিক্ত উদ্ভটপ্লোকে সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছে “কালে বারিধরাগমপতিতয়া নৈব শক্লামি স্থাতুম্।”

বিরহিণীর দেহবর্ণনার একটি মাত্র বিশেষণ ঘটকপর্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার পাণ্ডুগণ্ডে অলকপ্রাস্ত আসিয়া পড়িয়াছে। বিরহিণীদের একবেণীধারণই নিয়ম। মেঘদূতেও বিরহিণীর মুখের উপর সুদীর্ঘ কেশপাশ আসিয়া পড়িয়াছে, মেঘে যেন চন্দ্র ঢাকিয়াছে,—

“হস্তনাস্তং মুখমসকলবাক্তি লম্বালকতা-

দিন্দোদৈর্ন্যং তদমুসরণাক্রষ্টকান্তেবিভক্তি ॥” (উত্তরমেঘ)

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিরহিণী শকুন্তলারও একবেণীধারণ বর্ণনা করিয়াছেন :—

“বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মকামমুখৌ ধৃতৈকবেণী।

অতিনিষ্করণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহরতং বিভক্তি ॥”

ভবভূতির উত্তররামচরিতেও আলুলায়িতকেশা বিরহিণী সীতার অমুরূপ মূর্তি ;—

“পরিপাণ্ডুচূর্ণলকপোলশ্চন্দরং

দধতা বিলোলকবরীকমাননম্।

করণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী

বিরহবাথৈব বনমতি জানকী ॥”

ঘটকপর্ব একটি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করিলেও তাহার দ্বারাই বিরহিণীর স্বরূপটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(৩) “স্বামারুঢ়ং পবনপদবীমুদগৃহীতালকান্তাঃ

প্রেক্ষিষ্যন্ত পথিকবনিতাঃ প্রত্যাদ্যাদ্যসত্যঃ।

কঃ সন্নদ্ধে বিহবিধুরাং ভূতাপেক্ষত জায়াম্ ॥” (পূর্বমেঘ)

কেহ কেহ বলেন ঘটকর্পরের যমককাব্য হইতে প্রধান ভাবটি ( বিরহিণীর মেঘকে দৌত্যে বরণ ) আত্মরণ করিয়া কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কালিদাস ও ঘটকর্পরকে সমসাময়িক বলিয়া মানিলেও, যমককাব্য ও মেঘদূত এ দুইটির মধ্যে কোনটি আগে রচিত তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। বড় জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে উভয় কাব্যের সাদৃশ্য আছে।

মেঘদূতেও যমককাব্যের অনুরূপ বর্ণনা আছে। সেখানেও চাতক ডাকিতেছে ( “বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকন্তে সগন্ধঃ,” ) হংসশ্রেণী মানসে চলিয়াছে ( “নানসোংকাঃ..... সম্প্রসারন্ত নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়ঃ।” ) নীপ অর্দ্ধবিকসিতকেশরযুক্ত ( “নীপং দৃষ্টা হরিতকপিং কেশরৈরদ্ধরৈঃ,” ) ময়ূর ডাকিতেছে ( “শুক্লাপাটৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ প্রতুদ্যাতঃ,” ) কেতকীকুম্ব বিকসিত ( “পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃত্তঃ কেতকৈঃ সৃচিভিরৈঃ,” ) কদম্ব প্রস্ফুটিত ( “ত্বংসম্পর্ক্য পলকিতনিব পৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ,” ) যুথিকাসমূহ প্রাফুল্ল ( “উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যুথিকাজালকানি।” ) কিন্তু এ সাদৃশ্য দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ সংস্কৃত কাব্যের এগুলি মামুলি বর্ণনা। যে কবিই হউন না কেন, যে সময়েরই তিনি হউন না কেন, বর্ণাবর্ণনা করিতে হইলেই তাঁহার এইগুলি অবলম্বন।

আরও দুই এক জায়গায় যমককাব্য ও মেঘদূতের সাদৃশ্য আছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

“আশাবন্ধঃ কুম্বম-সদৃশং প্রায়শো ভ্রাজমানাং

সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণাঙ্ক ॥”

রমণীগণের কুম্বমসদৃশ হৃদয় বিরহে কেবল আশাবৃত্তেই ধুত হইয়া থাকে, নহিলে কবে করিয়া পড়িত।

যমককাব্যেও আছে :—

“শোকসাগরজলে নিপাতিতাং

তদগুণস্বরূপেব পাতি তাম্।”

তোমার গুণস্বরূপই শোকসাগরে পতিত তাহাকে রক্ষা করিতেছে।

যমককাব্যের শেষে বিরহী বিরহিণীর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। মেঘদূতে তাহা নাই। তবে মেঘদূতে প্রাক্ষিপ্ত দুইটি শ্লোক শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মেঘ গিয়া বক্ষপত্নীকে পতির বাস্তা জানাইল ও কুণ্ডের বক্ষকে মার্জনা করিলে পতিপত্নীর সন্মিলন হইল ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

“তৎসন্দেশং জলধরবরো দিবাবাচাচচক্ষে

প্রাণান্তস্যো জনহিতরতো রক্ষিতং বক্ষবধাঃ।

প্রাপোদন্তং প্রমুদিতমনাঃ সাপি ভাস্ত্রী স্বভক্তঃ

কেবাং ন স্যাদবিত্তফলা প্রার্থনাত্যগতেষু।

ক্রুদা বাস্তাং কলদকথিতাং তাং ধনেশোহ পি সদ্যঃ

শাপস্যান্তং সদয়জ্জদয়ঃ সংবিধাতান্তকোপঃ।

সংযোজ্যাতৌ বিগলিতশূচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ

ভোগানিষ্টানভিমতসুখং ভোজয়ামাস শব্দং ॥”

কিন্তু এ মিলনের কথা না শুনিলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। বিরোগান্ত হইয়া কাব্য সমাপ্ত হইবে এই ভাবিয়া অসিদ্ধি কেহ এই শ্লোক রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মেঘদূত কেবল কল্পনার ক্রীড়া। তাহার মিলনে সমাপ্তি দেখিবার জন্য আমরা তত ব্যাকুল নহি।

কোন পাশ্চাত্য সমালোচক ঘটকর্পরের কাব্য অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) যমকে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও এ কথা ঘোষিত হইয়াছে। বিদ্যাধর বলেন :—

“প্রায়শো যমকে চিত্রে রসপুষ্টির্ন দৃশ্যতে।

ছকরত্বাদসাদুত্বমেবমেবাত্র দৃশ্যম্ ॥” ( একাবলী, ৭ম উল্লেখ )

যমক ও চিত্রকাব্যে প্রায়ই রসপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা রচনা করা ছকর এই এক কারণেই ইহা অসাধু।

মহ্মটও বলিয়াছেন “তদেতৎ কাব্যাস্তর্গড়ভূতম্” ( কাব্যপ্রকাশ, ৯ম উল্লাস )। এইজন্য তিনি ইহার বিহীন ভেদপ্রদর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

বাস্তবিকই যমকপ্রয়োগে অত্যধিক নৈপুণ্য দেখাইতে গিয়া কিরূপ শ্লোক সকল রচিত হইয়াছে তাহার উদাহরণ ‘নলোদয়’ নামক কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি সুপরিচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে যমকের যন্ত্রণায় ভাব কিরূপ পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে।

“নসমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।

ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজ্জনঃ ॥”

এইরূপ রচনা করিতে কবিও যেরূপ গলদ্বশ্ম হন, পাঠকেরও সেইরূপ প্রাণান্ত। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ঘটকর্পরের রচনার অর্থবোধ করিতে পাঠকদের এ প্রকার কঠোর আগ্রাস স্বীকার করিতে হয় না। তাহার যমকবন্ধে ভাব বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৃত্রিমতা আছে বটে, কিন্তু তাহা অল্পের উপর দিয়াই গিয়াছে। ‘নলোদয়’ প্রভৃতি কাব্যের তুলনায়, ঘটকর্পরের কৃত্রিমতা কিছুই নয় বলিলেই হয়।

শ্রীশরচ্ছন্দ যোষাল।

( ৫ ) “A lyric poem of a very artificial character, and consisting of only twenty-two stanzas, is the Ghata-karpara, or “Potsherd” called after the author's name which is worked into the last verse. The date of the poem is unknown. He is mentioned as one of the “nine gems” at the court of the mythical Vikramaditya.” Maodonell. A History of Sanskrit Literature P. 339.

## ঘুমন্ত খোকা।

-:~:-

পাতাঝরা হিমের শিশির একটি ফোঁটা শুকায় নি' যা'  
কুণ্ডলিকায় কাপসা ভাসু ঘন মেঘের লুকায় নি' যা' ।  
দ্বিপ্রহরে সায়ের বকের ছায়ায়িত পুলক প্রীতি,  
স্তব্ধ নিবুম বনের স্বপন, তন্দ্রাহত রেশুবীথি ।  
ঘুমায় খোকা—মিলিয়ে গেছে আঁখি কোণের মুক্তাফল,  
মধুর হাসির আবছায়াটি জাগে মুখে অচঞ্চল ।

মহোৎসব সমারোহের একটা শোভা ছটকে পড়ে'  
কাদের বিপুল আয়োজন এ দেছে সেন ব্যর্থ করে ।  
কাহার হারের মধ্য-মণি ছিঁড়ে হেথায় পড়লো এসে,  
ভঙ্গিমা এক গানের যেন ঘুমায় মানবকের বেশে ।  
ঘুমায় খোকা—মানব গৃহের সদানন্দের পুরোহিত,  
যাহার বাণে হৃদ পাতালের ভোগবতী হয় প্রবাহিত !

পরশ ও তোর স্পর্শমণি, কার্য্যারম্ভ খেলায় তোর,  
জপ্ছে নব-জাগরণের মন্ত্র যে রে ঘুমের ঘোর ;  
মর্শ্বে তোমার কর্ম ফলে কাম্মা হাসির সাম্যযোগে,  
উদয়ান্ত গীতাজ্জতি জীবন স্বস্ত্যয়নের ভোগে !  
ঘুমায় খোকা—অধর নড়ে জগদম্বার স্তন্যপানে,  
হাতের মুঠি এলিয়ে গেলেও জড়িয়ে আছে আধেকখানে ।

অবিকৃত মাতৃস্নেহ জমাট যেন তুমার সম  
আদর যেন নিবিড় হ'য়ে মূর্ত্ত শিশু নিরুপম ।  
একটা হিয়ার সব আকঙ্ক্ষা, তৃপ্ত তৃষা, অতুল স্নহ,  
বধূর তপের সফলতা, ছিন্ন মায়ের হৃদয়টুকু ।  
ঘুমায় খোকা—ঘুমের ঘোরে দিচ্ছে সাড়া থেকে থেকে,  
অমনি স্নেহ করের পরশ দিচ্ছে দেহে তিলক এঁকে !

ঘুমায় খোকা—স্বর্গ-মাণিক, মাতৃহিয়ার স্নেহের কাঁপি,  
নারীর বুকের পুতুল খেলা, সজ্জা যাহার জীবনব্যাপী !  
গৃহের তলে থির চপলা, মূচ্ছিত এক বাঁশির গান,  
একটা মোহন ইন্দ্রধনু, ক্রান্ত নদীর কলতান !  
ঘুমায় খোকা—এক অপ্সরার দৃষ্টি যেন নির্নিমেধ,  
একটা যেন আলিঙ্গনের ব্যাকুল বাজ় নিরুদ্দেশ !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## মিষ্টি সরবৎ

—\*—

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

( ৫ )

“না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে কাটাকাটি”—সুপসিক প্রবাদটি অনেক যাহাই হউক, আহমদ সাহেবের পক্ষে কতক অক্ষরে-অক্ষরে সত্য !—রোগী বিদায় করিয়া, ‘কল’শুলা সানিয়া বেলা ছুটির সময় তিনি যখন বাড়ীতে আসিয়া উপরে বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন,—ঘরপানা আমিনা-শুনা, তখন ভদ্রলোকটির মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল !—বুপ্ বাপ্ করিয়া পোষাকশুলা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরে বারেণ্ডায় আসিয়া রক্তমকে ডাকিয়া একমাস জল ও পানের ডিবাটা আনিয়া দিবার জন্য রীতিমত চীৎকার করিয়া,—বাড়ীভুক্ত সকলের কান জালাইয়া, পুনশ্চ ঘরে ঢুকিলেন । উদ্দেশ্য, যদি আমিনা আসে !

রক্তম, মিনিট পাঁচ পরে ঘরে ঢুকিয়া, জলের ঘাশ ও পানের ডিবাটা টেবলের উপরই যে পূর্বাঙ্কে সান্ধাইয়া রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে,—সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সাবশ্রমে বলিল “ছুঁহু আপ্তো ইক্কা পাশ্ কপেয়া ধর্ দিজিয়ে—দেখা নাই ?—”

টেবিলের দিকে চাহিয়া আহমদ দেখিলেন কথাটা সত্য !—আশ্চর্যমন করিয়া অস্বাভাবিক গান্ধীধোর সহিত উত্তর দিলেন, “নেহি,—তোম্ চলা যাও—”

রক্তম প্রস্থান করিল ।—আহমদ অপ্রসন্নভাবে আলমারির চাবি খুলিয়া টাকাকড়ি রাখিয়া দিলেন, তারপর সশঙ্কে আলমারিটা বন্ধ করিতে করিতে দারুণ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—“ছাই ভয় ভাল লাগে না আর ! খেটে খুটে এসে আবার এই………হঁ ! এ সব কি পুরুষ মানুষের কাজ !—”

অন্যদিন অবশ্য আমিনাই এই কাজশুলা করিয়া থাকে !—তবে রাগ হইলে সে, যেদিন গা ঢাকা দেয়, সেদিন নিকশার গৃহকর্ত্তা মহাশয়, নিজের স্বহস্তে গৃহস্থালী শুছাইতে বাধ্য হন,—এং বলাবাহুল্য, এই ছোটখাটো কাজ-শুলা তাঁহার পক্ষে তখন দারুণ অস্বাস্তকর ব্যাপার হইয়া উঠে,—সেই জন্যই উক্ত আক্ষেপ হৃদক বাণী !



চো—চো করিয়া এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা খালি করিয়া,—তিনি আরাম কেশার উপর আড় হইয়া পড়িয়া জরাজীর্ণ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনটা মধ্যাহ্ন কালেই—ডিস্পেনসারীর পাশে ছোট ভোজন কামরায়, পোষাক শুদ্ধ চেয়ার টেবিলে বসিয়া সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। কাজের ভিড়ের জন্য দিন ও রাত্রির আহাৰ সেইখানেই তাঁহাকে সারিতে হয়, নচেৎ সময়ের ঠিক থাকে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া হঠাৎ তিনি অবৈধা ভাবে উঠিয়া, নগ্নপদেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। বারেণ্ডায় আসিয়া উৎকণ্ঠাকুল দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না,—অগত্যা নিরুপায় হইয়া, বিষম-গম্ভীর মুখে বারেণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে বার বার পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু জাফরী কাটা, ঝড়িন্ কাঁচের আয়না-মোড়া জানালা ও খিলান বিলম্বিত চিকের আড়ালে যতটুকু নজর চলিল—তাহাতে সবটুকুই তিনি আঁধার দেখিলেন!—

বহুক্ষণ নিষ্ফল-প্রয়াসের পর নৈরাশ্র-ভগ্ন চিত্তে,—তিনি অবশেষে ঘরে ঢুকিবার উপক্রম করিলেন, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহলের বারেণ্ডায় চিকের আড়ালে আমিনাকে চলিয়া যাঁহতে দেখিলেন,—সে হাসি হাসি মুখে, পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তুর্ণে ইনেবের শয়ন-কক্ষের দিকে যাঁহতেছে!—

তৎক্ষণাৎ আহমদের মনে হইল আবলুও তো শয়ন কক্ষে এখন বিশ্রাম করিতে গিয়াছে! তবে?..... তা হ'লে তো আমিনা নিশ্চয় ইনেববির ঘরে আড়ি পাতিতে চলিয়াছে!—

আর যার কথা?—তিনিও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে পশ্চিম মহলের বারেণ্ডার দিকে ছুটিলেন!—আমিনার ঐ চুরিবিদ্যাটা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে যে আজ রীতিমত অপ্রস্তুতে ফেলিয়া—ভালরূপেই জব্দ করিতে পারিবেন, সেই উৎসাহে তাঁহার মুখমণ্ডল সকৌতুক উল্লাসে হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল!—এখন তাঁহাকে পায় কে!

পশ্চিম মহলের বারেণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন, আমিনা সতাই তখন ইনেবের ঘরের জানালায় ছিদ্র খুঁজিয়া উকি ঝুঁকি মারিতেছে!—আহমদের আর দেখা রহিল না! উচ্ছ্বসিত হাসির সহিত ছেলেমানুষের মত চাৎকার করিয়া উঠিলেন “চোর! চোর! চোর!—ওরে আবলু জলদি বেরো,—তোর ঘরে আড়ি পাতিছে!—”

আহমদ এ মহলের বারেণ্ডায় কখনই আসেন না,—তিনি যে হঠাৎ এমন সময় এইরূপে আসিয়া পড়িবেন, তাহা আদিনার স্বপ্নের অগোচর!—সে পরম বিশ্বস্ত, নিশ্চিত ভাবেই,—রাজ গৃহের রহস্যোদ্ঘাটনে একান্ত মনোযোগে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় এই আকস্মিক বজ্রাবাত!—চমকিয়া থতমত খাইয়া ভয়-চকিত নয়নে পিছন পানে চাহিয়া আমিনা দেখিল,—সর্বনাশ! আহমদ সাহেব তাহার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছেন!—নিমেষে মাথার কাপড় টানিয়া ত্রস্তাকুরঙ্গিনীর মত লঘু লম্ফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া আমিনা ধড়াশু করিয়া খিল বন্ধ করিল!—

বন্দুক হাতে লইয়া, আবলু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন “বাপায় কি? হোল কি ডাক্তার?”

আমিনার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের উপর বাঁ তাতটা রাখিয়া, চলিয়া দাঁড়াইয়া,—সলফ-পর্যটন-ক্লাস্ত আহমদ-সাহেব হাঁপাইতে হাঁপাইতে সরোষে বলিলেন “উল্লু কঁাহাকা!—এতক্ষণে ‘হোল কি ডাক্তার’!—তোর ঘরের কথা একজন চুরি করে শুন্ছে, খেয়াল রাখিস নি?”

স্বপ্ন-বাস্যে আবলু উত্তর দিলেন “ওরে কঁথাই নেই, তো চুরি করবে কি?—চোর ঠকেছে তো!—আহা!”

সবিস্ময়ে আহমদ বলিলেন “বিবি ঘরে নাই ?”

আবলু বলিলেন “সে তো ওধারে খাটের উপর ঘুমুচ্ছে,—আমি এখানে জানালায় কাছে বসে বন্দুক সাফ করছিলুম বৈকালে শিকার করতে যাব বলে—”

আহমদ হতাশভাবে বলিলেন “এখন তা হলে তোরা কোন কথাই কস্ নি ?—

মাথা নাড়িয়া বন্দুকের কল কজা পরীক্ষা করিতে করিতে আবলু মুহূ হাস্যে বলিলেন “এখন ছেড়ে,—ঘরে ঢুকে অবধিই—না! আমি আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।”

আহমদ সবিস্ময়ে বলিলেন “ওরে উল্লুক, তুই কোথাকার বেকুব রে? কথা কইবার জন্যে জাগাস নি।”

আবলু বন্দুকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন “বাঃ, ঘুমুচ্ছে মানুষটা, তার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে—তার সঙ্গে কি এমন মারাত্মক রাজনৈতিক পরামর্শ সুরু করব? বাঃ, ছেলে মানুষদের জ্বালাতন করা,—ও-সব বাঁদরামী আমার ভাল লাগে না; চল—শিকারে বেরুবি?”

আহমদ বিস্ময়িত নয়নে চাহিয়া বলিলেন “তুই কোথাকার পয়গম্বর রে?”

মুহূ হাস্যে আবলু বলিলেন “এই বাংলা দেশেরই মাটির এবং তোরই next door, neighbour, মোদা তোর মত অতটা বখা নই! চল হতভাগা, তোকে এখনি শিকারে যেতে হবে।”

আহমদ ঘোড়াহাতে সবিস্ময় বলিলেন “মাপ কর দাদা এই মাত্র, আমার রোগী গুলির,—তব্বেতব্বাচের রোগগুলি শিকার করে ভয়ানক রকম—জখম হয়ে ফিরছি,—এখন আর শকুনি হাড়গিলা শিকারে উৎসাহ নেই—” আমিনার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া,—অকস্মাৎ হুইহাতে অসতর্ক আবলুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া উপযুপরি তাহার মুখে চুমা খাইয়া কানে কানে বলিলেন, “তুই আমার পেয়ারের দাদা ভাই, তোর পায়ে পড়ি ভাই বল, কপাট-টা খুলে দিক—তুই বললেই খুলবে ও আমার কথা শুনবে না।—”

অপ্রস্তুত আবলু,—এই উৎকট আদরের আক্রমণে ঘোরতর ব্যতিবাস্ত হইয়া—প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর লজ্জাকর দৃষ্টিতে সমস্ত ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন,—কেউ কোথা হইতে এই অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক প্রহসনটা দেখিল কি না? সৌভাগ্যবশতঃ কেউ কোথাও নাই।—আশ্চর্য হইয়া আহমদের দিকে চাহিয়া লজ্জারক্ত মুখে ক্রকুটি করিয়া বলিলেন “ষ্টুপীড রাস্কেল! ছেলে মানুষী দিন দিন বাড়ছে, না? দাঁখাদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিস,—দেখবি দেব এমন থাপ্পর—”

সমস্তভাবে পিছু হটিয়া আহমদ বলিলেন “না, না, বন্ধু, তোমার শিকারী হাতের থাপ্পর যে মোটেই মিষ্টি মোলায়েম হবে না, সে আমার জানা আছে,—ও মতলবটা মূলতুবী রাখ,—বল ভাই কপাট খুলতে—।

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া আবলু বলিলেন “কিছুতেই বলব না,—থাক রাস্কেল ঐখানে দাঁড়িয়ে! আচ্ছা হয়েছে,—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর!—”

আহমদ সকেপে চোখ রাজাইয়া বলিলেন “দ্যাখো এবার আমি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব,—”

আবলু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “আহা! নিজের গর্দান পরহস্তগত,—উনি আবার আমায় শাসাচ্ছেন!”

আহমদ ঘাড় চুলকাইয়া নীরবে কি ভাবিলেন, তারপর সক্রমণ কণ্ঠে বলিলেন “তুই কি নিমকহারাম রে? আমিনা এল তোর ঘরে চুরি করে কথা শুনতে, আমি ভদ্রলোক তোর উপকার করে তাকে ধরিয়ে দিলুম এখন তুই কিনা এই হয়ে দাঁড়ালি! তোর একটুও কৃতজ্ঞতা নাই ?—”

গভীর ভাবে গোঁপে তা দিয়া আবলু বলিলেন “যথেষ্ট আছে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কান ধরে ছই গালে চার খাঙ্গর বসিয়ে ঋণ শোধ করি !”—কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিলেন “সে যে কত বড় ছেলেমানুষ,—তার এই ছেলেমানুষী বুদ্ধি থেকেই তা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তুই ধাড়ী উজ্জ্বল,—তুই কি বলে তার পিছু নিয়ে, এমন বিকট চাঁৎকারে বেয়াদবি করতে এলি ? তোর একটু লজ্জাও করে না ? আমি তো আশ্চর্য্য হই !—”

আহমদকে টানিয়া একটু অন্তরে আনিয়া চুপি চুপি পুনরায় বলিলেন “আমিনা এখন তোর ওপর চটে আগুন হয়ে আছে, খবরদার ওকে এখন তাক্ত করতে যাস্নে, হিতে বিপরীত হবে। তুই সরে পড়, একটু পরেই ওর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

সকলণ ভাবে আহমদ বলিলেন “সকাল থেকে ঘরে যায়নি ভাই—”

কপট ককণার সহিত আবলু বলিলেন “তুমি তো সেই শোকে এগুনি চাইড্রোসেনিক বিষ খেয়ে মরছ না ভাই তবে আর এত খড়্‌ফড়ান কেন ? ভাল মুখে গলাধাক্কা দিয়ে বলছি, চল এখন ওঘরে যাওয়া যাক্ !—হান্সোনিয়মটা তোর ঘরে আছে, না ? চলতো একটু গানবাজনা করা যাক্—” আবলু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

খুব জ্বোরে সশব্দে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আহমদ বলিলেন “হায়রে নির্দয় !—আচ্ছা আবলু,—এসা দিন নেহি রহেগা,—তোরও সময় এগিয়ে এসেছে—”

আবলু হাসিয়া বলিলেন “আম্বক, তা বলে তোর মত লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধি আমার নেই, যে মানুষকে উদ্বাস্ত করে আনন্দ পাব ! বাপ, তুই যেন ডাকাত হয়ে উঠাছস্—”

আহমদ বিজ্ঞভাবে বলিলেন “ওরে ওখানে ডাকাত না গলে চলে না, ওরা স্বেচ্ছায় কি—”

আবলু তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন “বছং খুব,—তোর ডাইওয়েসিস বিদ্যের খুরে গড়, আর কথা কস্মি, থাম !—

( ৬ )

সন্ধ্যার সময় উপরের ঘরে চা খাইবার জন্য গিয়া আহমদ সাহেব দেখিলেন, রস্তম চা লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন “বিবি ভেজ দিয়া ?—”

রস্তম উত্তর দিল “নেই জুজুর, উন্কে তো বোথার জুয়া, না—কেয়া জুয়া—বড়া শির দাঁগাতে, ওহিবাতে ছাঁতে পর শুত্ল হৈন, হামরা ভেজ দিয়া ছোটা মিঞা সাহেব।”

আহমদ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন “ক্যা জুয়া, বোথার জুয়া ?”

আবলু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন “নানা বোথার নয়, বলছি আমি থাম, রস্তম যা তো বাচ্চা, পান আন,”

রস্তম চলিয়া গেল। আহমদের দিকে চাতিয়া আবলু বলিলেন “আচ্ছা বাদরামী করেছিল, দাখ দেখি দে লজ্জায় পড়ে তখন ঘরে খিল দিয়ে, কেঁদে-কেটে মাথামুণ্ডু ধরিয়ে একাকার করেছে—”

অপ্রতিভ হইয়া আহমদ বলিল “কেঁদেছে ?”

ক্ষুণ্ণভাবে হাসিয়া আবলু বলিলেন “খুব, ইনেব বলে চোখ মুখ ফলে রাঙা হয়ে উঠেছে, ইনেবের কাছেও খুব কেঁদেছে,—বলেছে, দাদার কাছে আমি একস্মে আর মুখ দেখাব না ?—দাখ দেখি বুদ্ধি ! আমি সাধ করে ছেলে মানুষের সঙ্গে পরিহাস করতে চাই না, দাখ কেমন মজা—

আহমদ প্রস্তুতভাবে নীরবে চা পান করিতে করিতে কি একটা কথা ভাবিয়া লইলেন। তারপর কাপটা নামাইয়া রাখিয়া ক্রমাগত ঠোঁট মুছিতে মুছিতে বলিলেন “মাথা ধরেছে, নয়? দাঁড়া একটু ডাক্তারী করে আসতে হোল—”

বাধা দিয়া আবলু বলিলেন “খবরদার! সে তেলে-বেগুনে জলে যাবে! তোর ডাক্তারী করতে যাওয়া তো নয়, ডাকাতি করতে যাওয়া!—আর কেলঙ্কারী করিস না আমু. থাম!”

আহমদ উঠিতেছিলেন, আবলুর কথায়, হাসিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, একটু থামিয়া বলিলেন “সত্যি ভাই, বড় বেশী ছেলেমানুষী বুদ্ধি—”

আবলু বলিলেন “আর ঐ ছেলেমানুষকে নিয়ে তুই রঙ্গ করতে যাস, তোর গলায় দড়িও ছোটে না?”

আহমদ ঔনাসোর ভাগ করিয়া বলিলেন “কই আর জুটল, তাহলে খুসী হয়ে এদিন ঝুলে পড়তুম?—” পরক্ষণে উৎসাহের সহিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, “হ্যাঁারে ইনেববিবির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে।”

আবলু হাসিয়া বলিলেন “নিশ্চয় সে অন্তরঙ্গতার মাঝে কি বিচ্ছেদের আঁচর লাগবার যো আছে!”

গভীর ক্ষোভের সহিত আহমদ বলিলেন “দেখলি ভাই, লোহায় লোহায় মিল হয়ে গেল, মাঝখান থেকে যত দোষের ভাগী হল কামার শা—।”

আবলু বিজ্রপের স্বরে বলিলেন “শা—র বুদ্ধি যেমন সূচক!—স্থানে-অস্থানে হাতুড়ীর বা পিটুলেই কি হয় চাঁদ! বোঝ এবার! আঃ, আমিনা এখন মাস ছয়েক তোর সঙ্গে কথা না করে তোকে যদি জঙ্গ করতে পারে, তা হলে—”

লাফাইয়া উঠিয়া বিস্তারিত চক্ষে চাহিয়া আহমদ বলিলেন “আরে বাস্তব! কি সাংঘাতিক লোকেরে তুই! এমন হৃদয়হীন বাক্যটা উচ্চারণ করলি কোন মুখে! না ভাই না, তোর পায়ে পড়ি এমন অলক্ষণে কথা বলিস্‌নি, আমিনা শুনতে পেল আমায় মুন্সিলে ফেলবে! দোহাই তোর—”

হো হো করিয়া হাসিয়া আবলু বলিলেন, “একেবারে বয়ে গেছিস্! একেবারে বয়ে গেছিস্!—আর তোর পাল্লায় পড়ে আমিও ফাজিল হবার দাখিল হয়েছে! তোর বদ্‌মাইস বুদ্ধির তুড়িলাফের ধাক্কা খেয়ে আমার মৌনব্রতটা তে নির্ধাৎ-রকমেই ধ্বংস হয়ে গেছে—তোর সংসর্গে মিশে বাজে কথায় বেজার বক্তার হয়ে উঠেছি! নাঃ, মাটা করলি তুই আমায়!—”

আহমদ যেন অবাক হইয়া গেলেন! গালে হাত দিয়া থানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া,—শেষে মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া নিছক ভাল মানুষের মত অতি নরম স্বরে বলিলেন “ভাই বোনের একই স্বর!—বাহরে বাঃ! আমার কিসমৎ কি চমৎকার! আমি তোদের মাটা করলুম? বলিস্‌ কি, এ্যা?”

কৌতূহলী হইয়া আবলু বলিলেন “আমিনাও ঐ কথা বলে বুঝি? বাঃ, তা হলে স্বীকার করতে হোল, লোক চেনবার অভিজ্ঞতা তার আছে, ভাল।”

আহমদ স্কোপে বলিলেন “ভাল হবে না কেন? তোমারই ত সহোদরা তিনি! তুমি ও-কথা বলবে বৈ কি! হঁ, আহমদকে ছোঁকরা কোথাকার! তুই—”

আহমদের মুখের কথা মুখেই রহিল, রক্তম পান লইয়া ধরে ঢুকিয়া বলিল “হজুর, দাওয়াইখানামে তিন ঠো বেমারী আয়া—”

আহমদ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পান লইয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাঁহার কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। রোগী বা রোগীর সংবাদ লইয়া লোক আসিয়াছে শুনিগেই, তাঁহার কথা বার্তা ত দুয়ের কথা—তাঁহার নিদ্রা পর্য্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত। নিজের কর্তব্যের নিকট তাঁহার এতটুকুও ত্রুটি অবহেলা ছিল না। সেখানে তিনি অটল, স্থির,—একান্ত মনোযোগে কর্ম-তৎপর, দৃঢ়-সংবনী পুরুষ!

রাত্রি সমস্ত কাজ সারিয়া যথাসময়ে শয়নক্ষেপে আসিয়া আহমদ দেখিলেন—আমিনার শয্যা শূন্য,—ঘরের ছয়ারের পাশে বারেণ্ডায় বিছানা বিছাইয়া রস্তুম ও তাঁহার দাওয়াইখানার বালক ভৃত্য মনসুর শুইয়া আছে। আহমদকে দেখিয়া, রস্তুম উঠিয়া বসিয়া—একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘাড় মাথা চুলকাইয়া মুহুরে বলিল “বিবিসাহেব অসুস্থ হইয়া তেতালার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আজ সেইখানেই থাকিবেন, তুফানী বাদী তাঁহার কাছে থাকিবে। সেই জন্য রস্তুম ও মনসুরকে এ বারেণ্ডায় থাকিবার জন্য, ‘ফুফু’ সাহেবা পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

‘ফুফু’ আবলুর পিতার দূর সম্পর্কীয়া এক ভগিনী, হাঁপানি ব্যায়রাম থাকার জন্য বিবাহ করেন নাই। আজীবন চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী হইয়া ধর্ম্মালাচনা ও দানব্রত অচ্যুত করিয়া শুদ্ধাচারে জীবন কাটাইতেছেন। দান না করিয়া কোন দিন জলগ্রহণ করেন না, এমন কি—যে দিন ভিখারী ফকীর কাথাকেও না পাওয়া যায়, সে দিন ঝি-চাকরদের বর্থশীস্ না দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন না। চরিত্রের জন্য আবলুর পিতা ইঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি-সম্মান করিতেন, এখন আহমদ ও আবলু তাঁহাকেই গৃহস্থালীর সর্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া মনে করে। ভাইপো ও জামাতাকে তিনি পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন কিন্তু তাই বলিয়া, দস্ত-গর্জিতা জননীর মত কথায় কথায় তাহাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে যাইতেন না, সেই জন্য তাঁহারও সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আজ্ঞামুখ্যত্ব স্বীকার করিয়া চলিতেন। তবে, আহমদের সময় ছাড়া তিনি ইঁহাদের বড় একটা দেখা দিতেন না। রান্নামহলের তত্ত্বাবধানে ও সকলের খাওয়াদাওয়া দেখাশুনার পর বাকী সময়টা তিনি উত্তর-মহলের দোতলার ঘরে নিভৃতে থাকিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। সে-সময় সে-মহলে কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না। বাড়ীর কেহ অসুস্থ হইলে ফুফু-সাহেবাই তাঁহার তত্ত্বাবধান-কর্ত্রী।

রস্তুমের কথা শুনিয়া আহমদ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “ফুফু সাহেবা কি আমিনা-বিবির কাছেই আছেন?”

রস্তুম বলিল “ই্যা এতক্ষণ ছিলেন, আমিনা-বিবি ঘুমিয়ে যাবার পর নিজের মহলে গেলেন—”

আশ্চর্য হইয়া আহমদ বলিলেন “ঘুমিয়ে গেছে তো? বহুৎ আচ্ছা,—তুমি যাও রস্তুম, তুফানী বাদীকে বলে এস, যদি রাত্রি কোন অসুস্থতা বোধ হয়, তখন যেন আমায় খবর পাঠায়—আস্তে যাও রস্তুম, শব্দ কোর না,”

রস্তুম ধীরে ধীরে গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল ‘বলিয়া আসিয়াছে।’ আহমদ বলিলেন “সকাল ছটায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েই তেতলায় গিয়ে বিবি সাহেবার খবর নিয়ে এসো, কেমন আছেন।”

আহমদ শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঘুম সহজে হইল না। পড়িয়া পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া একটা লজ্জাবহ বিষয়তার বাধা জাগিতে লাগিল। আহা, কেন নির্দোষের মত তখন এমন বাচালতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! ছি, ছি, কামটা সত্যি বড় অশিষ্টতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আচ্ছা বেচারী আমিনা এখন মাথার যন্ত্রণায় কত কষ্টই পাইতেছে!...যাক্ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আহমদ সাহেব এমন দুর্ভাগ্য কিন্তু আর কখনও করিতেছেন না যে,—ইহা ঠিক!

সকালে রস্তুম তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া দিতেই চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন “তেতালায় যাও বাচ্চা—”

রস্তুম, উৎফুল্ল মুখে বলিল “হুজুর খবর এনেছি, বিবিসাহেব ভাল আছেন, স্নান করতে গেছেন।”

খুশী হইয়া আহমদ বলিলেন “ঠিক জান ?”

রস্তুম, মাথাটা প্রায় কাঁধের সংলগ্ন করিয়া, প্রবল গর্বে স্বীকার-স্বচক ভঙ্গি সহকারে বলিল “জী—হাঁ ! মায় আপনে আঁখমে দেখা, বহু-বিবিকা সাং বিবি-সাব গোসলখানামে, যাঁতি—তিনোমে বহুৎ ফুর্তিসে হাঁসি খুঁসি করতে হেঁ, কোই কো কুছ বেমার নেই হুজুর,—”

কৌতূহলী হইয়া আহমদ বলিলেন “তিনোমে হাঁসি খুঁসি ? কোই কোই হ্যায় রে ?”

রস্তুম বলিল “বিবি-সাব, বহু-বিবি-সাব, ঔর ওহায়েদ ভাইয়াকো জরু, তুফানী বাঁদী—”

তুফানীর স্বামী ওহায়েদ মিঞা, আহমদ-সাহেবের ডাক্তারখানার দ্বারবান, সে অষ্টপহর বাহিরমহলেই থাকে, আহমদ-সাহেব সেখানে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পান। অন্তরস্থ বাঁদীকে পাছে প্রভু বুঝিতে ভুল করেন বলিয়া সাবধানী রস্তুম, পূর্বাঙ্কেই তাঁহার সদরস্থ স্বামীর পরিচয়টা পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়া দিল !—পরিহাস-পিয় আহমদ সাহেব, একটু বিস্ময়ের ভাগ করিয়া সহাস্যে বলিলেন “ক্যা ছয়া ? তুফানী বাঁদী ওহায়েদ কো জরু হ্যায় ? হ্যাং গিধোড় ! ময় তো জানে উল্লো নানী হ্যায় রে—”

রস্তুম ‘অত-শত, বুঝিল না, সজ্ঞারে বলিল “নেই হুজুর উল্লো জরু হ্যায়, আপন জরু।

“আপন জরু !—” হাস্যাবেশ বিদীর্ণ প্রায় আহমদ সাহেবের স্বরযন্ত্রে আর পরিহাসের ভাষা যোগাইল না ! কুণ্ঠিত রস্তুম, খতমত থাইয়া অবাক হইয়া গেল ! অতি বুদ্ধিমান রস্তুমের, এ-হেন নিদারুণ হতবুদ্ধি অবস্থা দেখিয়া, আহমদ-সাহেব আর কথা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেন না, হাসিতে হাসিতে গোসলখানায় চলিয়া গেলেন।

একটু শীঘ্র শীঘ্র স্নান প্রভৃতি সারিয়া আহমদ সাহেব পোষাক-কামরায় আসিয়া ঢুকিলেন, বাহিরের দিকে-উৎসুক-কান দুইটি পাতিয়া রাখিলেন, কতক্ষণে বারেণ্ডায় আমিনার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় !—কিন্তু বহুক্ষণ কাটিয়া গেল,—তবুও কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, অগত্যা ক্ষুণ্ণচিত্তে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন বারেণ্ডায় রস্তুম চা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

আহমদ-সাহেবের উৎসাহ-প্রসন্ন মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল। রস্তুমের হাত হইতে চা লইয়া অতি-গম্ভীর স্বরে বলিলেন “আমিনা বিবি কোথা ?”

রস্তুম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল “গোসলখানায়—”

বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তির সহিত আহমদ সাহেব বলিয়া উঠিলেন “এখনও গোসলখানায় ? ভাল যা হোক ! হঁ,—এতক্ষণ ধরে জল ঘাঁটলে মাহুঘের অমুখ করে আর না-করে ? তারপর সেই ঘরে-বাইরে রোগী নিয়ে ‘টানা-পোড়েন’ করে জান-হাস্তরান্ হবে আমার ! ওদের কি—”

রস্তুম কুণ্ঠা-শুক মুখে বলিল “হুজুর আমার ভুল হয়েছে, বিবি-সাহেবরা তখন গোসলখানায় যান নি,—গোহাল-বাড়ীতে গোবর নিয়ে ঘুঁটে ঠুকতে গেছেন—”

আহমদ হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন “ঘুঁটে ঠুকতে কিরে ?—” রস্তুম উত্তর দিল “জী—হাঁ, মোটকা বাঁদী ঘুঁটে ঠুকতে বাচ্ছিল, তাই ওঁরাও ছুজনে সঙ্গে গেলেন, ওঁরাও পারেন হুজুর ! ছুজনে মিলে ‘টিকিয়া-মাফিক’ ছোট ছোট অনেকগুলো ঘুঁটে দিয়েছেন হুজুর।—”

“বটে !—” আহমদ হাসিয়া ফেলিলেন ! রস্তুম সাহস পাইয়া,—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল “আবার মাঝে মাঝে ছ’জনে কুয়াতলায় বাসন মাজতেও যান, বাঁদীরা শুধু জল তুলে দেয়, বাকী সব কাজ ঠগাই করেন ! ফুফু সাহেবকে লুকিয়ে ঐ সব হয় ছজুর !”

রস্তুমের গুপ্ত-দোতা-দক্ষতার বহর দেখিয়া আহমদ-সাহেব যুথ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। নিঃশব্দে চা-পান করিয়া ক্রমালে যুথ মুছিয়া বলিলেন “দ্যাখ্ বাচ্চা, এবার যখন বিবি-সাহেবরা কুয়াতলায় বাসন মাজতে যাবেন, তখন কাউকে কিছু না বলে, চুপি চুপি এসে আমার একবার খবর দিও তো—”

রস্তুম উৎসাহের সহিত বলিল “বহুং আচ্ছা জনাব, কিন্তু তুফানী দিদিটা বড় শয়তান ! ও বিবিসাহেবার পেয়ারের লোক কি না—সন্ধান পেলে সব কাঁচিয়ে দেবে—”

আহমদ-সাহেব টুপিটা তুলিয়া মাথায় দিবার উদ্যোগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন “তুমি একটু হুঁসিয়ারীতে কাজ করো, বখশীস পাবে।

রস্তুম ঘাড় নাড়িয়া সসম্মমে সেলাম করিল।

( ৭ )

দুপুরবেলা উপরের ঘরে আসিয়া আহমদ সাহেব দেখিলেন, তাঁহার জল, পান, আলমারীর চাবি সমস্তই সূক্ষ্মালার সহিত যথাযথভাবে সজ্জিত আছে,—কিন্তু আমিনা নাই। টেবিলের উপর আবলুর লেখা এক টুকরা চিঠি পড়িয়া আছে “যে তিনি আজ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত বাগেটার গাড়ীতে বাঁকীপুর চলিলেন। সেখানে উক্ত বন্ধুর ভাবী-শুভরালয়। বন্ধুর পাত্রী দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির ও অন্যান্য কথাবার্তা ঠিক করিয়া তাঁহার দিন চার পরে ফিরিবেন। তাঁহাদের যাওয়ার কথা হঠাৎ ঠিক হইয়া যাওয়ার পূর্বেই সংবাদটা আহমদকে জানাইতে পারেন নাই। আহমদ যেন ক্রটি মার্জনা করেন।”

আহমদ শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব ঠিক করিতে সুরু দিলেন—যে, আবলু যখন বাড়ীতে নাই, তখন এ কয়দিন আমিনার নাগাল ধরা সম্পূর্ণই অসাধ্য !—পশ্চিম-মহলে ‘শূন্য ঘরে ছনো রাজা’ হইয়া,—ইনেব বিবিকে লইয়া সে নিরঙ্কুশ প্রতাপে মনের সুখে রাজত্ব করিবে ! আবলু নাই,—কোন ছুতা করিয়াই বা আহমদ সাহেব ওমহলে যাইবেন ? এবার ত বড় শত্রু সমস্যায় পড়া গেল !

আহমদ সাহেব অস্থিরভাবে ঘরের এদিকে ওদিকে দ্রুতবেগে পায়চারী করিতে লাগিলেন ! কিছুক্ষণ পরে মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া—হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে রস্তুমকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার আলমারীর চাবিটা হারানিয়া গিয়াছে নাকি—তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না, চাবিটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বল—”

অবিলম্বে রস্তুম আসিয়া উত্তর দিল যে “চাবি কোথাও হারায় নাই, অল্পক্ষণ পূর্বে বিবি-সাহেব তাহা টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।”

আহমদ সাহেব ইসারা করিয়া রস্তুমকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন “পশ্চিম-মহলে ওয়া সবাই কি করছে !”

রস্তুম ততোধিক চুপি চুপি বলিল “ছজুর, তাস খেলছেন, মোটকা বাঁদীকে হুচ্চ ডেকে এনেছেন, চার জনে গ্রাবু খেলছেন—”

আহমদ গোঁফে তা দিতে দিতে চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন “ফুফু-সাহেব! নিজের মহলে আছেন, নয়?”

রস্তুম বলিল “হাঁ—”

আহমদ আরও কিছুক্ষণ ভাবিলেন, তারপর এক টুকরা কাগজ লইয়া পরিকার অক্ষরে উর্দুতে লিখিলেন “আমিনা, আমি আজ বৈকালে হুগলীতে ইমামবাড়ী দেখিতে যাইব, নৌকা ভাড়া করিতে এখনই লোক পাঠাইতেছি, তুমি এবং ইনেনব-বিবি সেখানে বেড়াইতে যাইবে কি?”

আদেশমত রস্তুম, কাগজ লইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া সেই কাগজখানাই আহমদ-সাহেবের হাতে দিল, আহমদ দেখিলেন চিঠির উন্টা-পিঠে লাল কালিতে বৃহদাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—“না।”

আহমদ-সাহেব মাথা চুলকাইয়া শুষ্ক হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রস্তুমের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন “একটা কাজ করতে পার্বে বাচ্চা?”

রস্তুম বলিল “হুকুম করুন—”

আহমদ-বলিলেন “শুঁয়া যেখানে তাস খেল্ছেন, সেখানে সবাইকার সামনে গিয়ে বলিস নি যেন,—‘একটা জরুরী ব্যং’ বলবার আছিল। করে, বিবি-সাহেবাকে আড়ালে ডেকে আনবি, তারপর বলবি যে ‘সাহেবের নস্য ফুরিয়ে গেছে, আপনার আঁচলের রিং-এ টেবিলের ড্রয়ারের চাবি আছে আপনি জলদি গিয়ে নস্য বার করে দিন—’ তাতে বিবি-সাহেবা নিশ্চয়ই বলবেন যে ‘তুমি চাবি নিয়ে যাও—’

রস্তুম বাধা দিয়া উৎকর্ষার সহিত বলিয়া উঠিল, “হাঁ হজুর, তা তিনি এখন নিশ্চয় বলবেন,—”

আহমদ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন “আরে উজবুক, শোন,—তুই অগ্নি তৎক্ষণাৎ বলে উঠবি,—‘আমি নৌকা ভাড়ার কথা বলবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে জলদি যাচ্ছি, আমি এখন অন্য কোথাও যেতে পারবো না,—’ নিজের তজ্জনী আন্দোলন করিয়া আহমদ পুনশ্চ জোরের সহিত বলিলেন—“বলবি ‘সাহেব বোল দিয়া, আপকো যানা চাহি, বহৎ জরুরী কাম্ হায়—’ বুঝলি?”

রস্তুম একদৃষ্টে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া কথাগুলো যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রভুর কথা শেষ হইবামাত্র মজোরে বলিল “জী—হাঁ, আলবৎ সম্বা!—”

আহমদ কোতুহল-সাহস নরনে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন “কি বলবি বল দিখি?—”

আহমদ ঠিক বেভাবে, বেরূপ মাত্রায় কণ্ঠস্বর হৃদয়দীর্ঘ করিয়া যে যে কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, রস্তুম একে একে সব অনুকরণ করিয়া গেল! শেষে ঠিক তেমনইভাবে তজ্জনী আন্দোলন করিয়া স্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি করিল—“সাহেব বোল দিয়া—আপকো যানা চাহি,—বহৎ জরুরী কাম্ হায়!”

আহমদ-সাহেব হাসিয়া বলিলেন “ই্যা ই্যা ঠিক হয়েছে, জলদি যা—”

রস্তুম চলিয়া গেল। আহমদ-সাহেব এবার ভব্যাক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া—নিজের অদ্ভুত ছেলেমানুষী আচরণ-গুলার কথা ভাবিয়া, মনে মনে হাসিতে আরম্ভ করিলেন!—এতক্ষণ বাহিরে,—নিজের স্নকঠোর দায়িত্ব পূর্ণ কর্তব্যের নিকট বন্দী হইয়া, পরম শাস্ত-স্থগীল, ধীর-স্বভাব ভদ্রলোক সাজিয়া, অন্তঃস্থ মানুষদের জীবন-মরণের দায়ের খুঁকি ঘাড়ে লইয়া, গভীর-সংযত চিন্তে কত খাটুনি খাটিয়া,—কত ভাবনাই ভাবিয়া আসিলেন, আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই, চৌকাঠের বাহিরে সমস্ত উদ্বেগ দূর্ভাবনার খোলসটা খুলিয়া রাখিয়া,—এখন একেবারে অসংযত



হুঃশীল হইয়া উঠিলেন ! এ মজা তো মন্দ নয় !—আহমদ-সাহেব কথাটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভিতরে-ভিতরে হাসির উচ্ছাসটা ফেনাইয়া-ফেনাইয়া অসহ্য উজ্জ্বল হইয়া উত্তীয়ার উপক্রম হইল ! সৌভাগ্যক্রমে সামনে তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ-জন কেহ ছিল না তাই রক্ষা, নচেৎ তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেন । গোঁফে তা দিতে দিতে,—অতি কষ্টে নীরব নিখুম হইয়া আড়ে-আড়ে চয়ালের দিকে চাহিতে লাগিলেন । ঠোঁটের কোণে অলক্ষিতে সেকোটুক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল !

কিছুক্ষণ পরে, মুখের উপর প্রকাণ্ড বোমটা টানিয়া আমিনা চয়ালের সামনে দেখা দিল, কিন্তু চোকাঠ ডিঙাইল না ! ক্ষণমধ্যে তাহার হাতের চাবির গোছাটা সশব্দে ছুটিয়া আসিয়া বিছানার উপর ডিগ্বাজি খাইয়া পড়িল ! সঙ্গে সঙ্গে আমিনার বোমটা-মোড়া কোমল সুন্দর মূর্তিটিও চয়ালের সামনে হইতে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইল !

আহমদ-সাহেবের ধৈর্য্য লোপ হইল !—একলক্ষে চয়ালের সামনে আসিয়া বাগ্রকণ্ঠে ডাবিলেন “তুনে যাও, তুনে যাও”

প্রায় কুড়িহাত দূরে গিয়া আমিনা থমকিয়া দাঁড়াইল, মাথার কাপড়টা একটু সরাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া গাভীর ভাবে বলিল “কি ?—”

আহমদ-সাহেব দুই পা অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন “অত দূর থেকে কি বলা যায় ? সরে এস—”

আমিনা ঠিক তেমনই গভীরভাবেই আরও চার পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল “কথার মত কথা সত্যি কিছু থাকে তো অতদূর থেকে খুব বলা যায় ”

আহমদ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন “যায় বটে, তবে সেটা ব্যক্তিবিশেষকে ! তুমি যদি আমার সম্বন্ধীয় ত্রী হতে—”

আমিনার স্কটোর গাভীর্য্য এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল ! ফৌশ করিয়া উঠিয়া, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “কি বলো ?”

আহমদ-সাহেব প্রমাদ গণিলেন !—মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন “এই কথার কথা বলছি, রাগ কোরনা আমিনা, —লক্ষ্মিটি আমার—”

বাধা দিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া আমিনা বলিল “না আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই,—তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, কিছু সুবাদ নাই, একলা তোমার যা খুশী কর !” আমিনা ক্রত প্রস্থানোন্মুখ হইল !

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া—ব্যতিবাস্ত আহমদ সাহেব এবার ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধারের জন্য রাগতঃ ভাবে বলিলেন—“দ্যাখো ভদ্রতার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়াবাড়ী কর তো ভাল হবে না, আমিনা—”

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সদর্পে গ্রীবা উচাইয়া বলিল “মন্দটা কি হবে তুনি ?—” তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল ।

আহমদ সাহেবের অত্যন্ত হাসি পাইল ! কিন্তু এখন হাসিলেই সব মাটা !—ধৈর্য্য ধরিয়া সুগভীর মুখে বলিলেন—“এই আমিও তোমার সঙ্গেই পশ্চিমমহলে যাব, গিয়ে ;—সকলের সামনেই—” তারপর যে কি করিবেন আহমদ-সাহেব খুজিয়া পাইলেন না ! গলায় সুপারী আটকান’র ভাণ করিয়া থক্ থক্ শব্দে কণেক কাশিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া পরে বলিলেন “হাতকড়ি পরিয়ে—”

আমিনা সতেজে বলিল “হঁ ! হাতকড়ি !—আচ্ছা যাও না পশ্চিমমহলে,—আমি চন্দ্রম হার কাছে !—” “মু—” অর্থাৎ—কুহু সাহেবা !

সঙ্গে সঙ্গে—সামনের সিঁড়ি দিয়া তড়তড় করিয়া নামিয়া সত্যসত্যই সে উত্তরমহলের দিকে উধাও হইল ! আহমদ-সাহেব হতবুদ্ধি নির্বাক ! যাঃ, এবার তো মার ওখানে দস্তখুট করা চলিবেনা !

আহমদ-সাহেব হতাশভাবে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, বিছানার উপর আমিনার চাবিটায় দৃষ্টি পড়িল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সেইটা অগত্যা তুলিয়া জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন,—অভিপ্রায়, আমিনা আসিয়া না চাহিলে ফেরত দিবেন না !—কিন্তু সে আশা সন্দেহপূর্ণ !

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন বেলা প্রায় তিনটা বাজে। নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে একবার বিছানার উপর গড়াগড়ি দিয়া লইলেন কিন্তু শূন্য ঘরখানা ক্রমশঃই অসহ্য বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বৈকালিক পরিচ্ছদ পরিয়া একখানা উপন্যাস হাতে লইয়া, একটু জোর-পদশব্দ-সহকারে অসনয়ে ডাক্তারখানায় চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় আমিনার দেখা পাইলেন না, রাত্রেও না। পরদিনও ঠিক সেই ভাবে কাটিল। রস্তুম ও মনসুর বারেওয়া প্রভাহ রাত্রে ঘুমাইতে আসিত। আহমদ কিছু বলিলেন না,—মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, আর হীনতা স্বীকার করিয়া আমিনাকে ডাকিতেছেন না,—আমিনার যেখানে থুঙ্গী সেইখানে থাক, এবার তিনিও নীরব-ঔদাস্য অবস্থান করিলেন ! দেখা যাক কতদূর কি হয় !

ক্রমে আরও দু'দিন কাটিল। চতুর্থ দিনে বৈকালে কিছু দূরের একটা 'ডাক' পাইয়া আহমদ-সাহেব চলিয়া গেলেন, রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিয়া আহায়ে বসিয়া ফুফু-সাহেবার কাছে সংবাদ পাইলেন 'আবলু সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলিয়া সকাল-সকাল আহা করিয়া সে ঘুমাইতে গিয়াছে।'

আহমদ মনে-মনে উৎফুল্ল হইলেন ? এইবার ঘুমুর বাসা ভাঙ্গিল তো বেশ হইয়াছে ! আমিনা এবার কোথা যায় দেখা যাউক !

কিন্তু রাত্রে বারোটোর পর উপরের ঘরে গিয়া দেখিলেন রস্তুম ও মনসুর পূর্বের মতই বারেওয়া পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে, আমিনা নাই !—পশ্চিমমহলে দয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তেতালার ঘরে খুব উজ্জ্বল ভাবে আলো জলিতেছে ! আহমদ-সাহেব এবার সত্যি চটলেন !

( ৮ )

পরদিন সকালবেলা উঠিয়া যথানিয়মে স্নান প্রভৃতি সারিয়া চা খাইতে থাইতে আহমদ রস্তুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট মিক্সা কাঁহা ?—"

উত্তরে রস্তুম জানাইল, তিনি ভোরবেলা উঠিয়া চা খাইয়া গঙ্গার ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। আহমদ আর কিছু বলিলেন না। দুই তিন দিন হইতে তিনি আমিনার সংবাদ লওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কাজেই রস্তুম চুপ করিয়া থাকে। তবে বখশীসের আশা আছে বলিয়া সে বাসনমাজার বগপারটা প্রত্যহ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু রস্তুমের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবিয়াহেবারা আজকাল তাসখেলা লইয়া-ই উদ্বৃত্ত, বাসন মাজতে যায় কে !

চা পান করিয়া, মসলা মুখে দিয়া, ডান হাতে টুপী লইয়া, বাথার চুলের উপর বা হাতটা বুলাইতে বুলাইতে, আহমদ-সাহেব, অনন্যমনে হাতের শক্ত রোগীগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে বারেওয়া পার হইয়া বাহিরের সিঁড়িতে আসিলেন, দেখিলেন ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া, সিঁড়ির দেয়ালের গায়ে কাঁচের জানালায় চক্ষু লাগাইয়া, পারের

আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া, উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া রক্তম এক মনে কি দেখিতেছে। প্রভুর পদশব্দ পাইয়া, খতমত খাইয়া সে সোজা হঠয়া দাঁড়াইল,—তারপর বিনাপ্রশ্নেই কৈফিয়তের স্বরে সলজ্জ-হাস্যে সসম্মে বলিল, “হজুর একটা পাগলী গান গাইতে এসেছিল, দেখুন বিবিসাহেব! ওকে বখ্শীস্ দিচ্ছেন—”

রক্তমের এই অস্যাচিত দোতা-পারিপাটো, আহমদ-সাহেবের রোগীর-চিত্তা উড়িয়া গেল! কোতুহলাক্রান্তনয়নে জানালার দিকে চাহিয়া তিনি একটু দাঁড়াইলেন, দেখিলেন রান্নামহলের ছয়ারের কাছে যেটুকু স্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সতাই সেখানে একজন ছিন্নবসনা অস্তুত আকারের স্বালোক দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহার সামনে দাঁড়াইয়া মুগ্ধিনী দেবী প্রতিমার মত, সদাঃস্নাতা সুন্দরী আমিনা—তাহার আঁচলে একসরা চাল ও গুটিকতক পয়সা দিতে দিতে প্রসন্ন-করণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া মিষ্ট-দয়াদ্র কণ্ঠে বলিতেছে, “দ্যাখো, তুমি আবাস ফাল এসো বুঝ্লে?”

তুফানী বাদী নিকটেই কোণা ছিল, সে আমিনার এই সাদর-নিমন্ত্রণ-আপায়ন-ব্যাপারটা লইয়া হাসিয়া কি একটু পরিহাস করিল,—লজ্জায় পড়িয়া আমিনাও হাসিল! তাহার তরুণ কোমল মুখ, এক অপূর্ব সৌন্দর্য-রাশি-সম্পাতে, মনোরম মাধুরীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—সে কি চমৎকার ভাববিভাজনা!

আহমদ-সাহেবের দৃষ্টি যেন জুড়াইয়া গেল! বিমোহিত চিত্তে নিম্পলক নয়নে, অবাধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন!—আমিনা এত সুন্দর!—তাঁহার মুখে মিষ্ট স্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল!—সেটা তিনি জানেন, জানেন!—তবে তুলিয়া যান যে, সে শুধু নষ্টামী মাত্র! একটা অনির্কচনীয় স্নেহ ভূপ্তির আবেগে তাঁহার সমস্ত বুকখানা এক নিমেষে যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল! আঃ, আমিনা! এযে তাঁহারই প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মী! যতক্ষণ আমিনাকে দেখা গেল, ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভিখারিণী চলিয়া গেল, আমিনাও সরিয়া গেল।—শাস্ত-সৌম্য-জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত বদনে, আহমদ-সাহেব পরিতৃপ্ত-চিত্তে ধীর-পাদক্ষেপে নাচে নামিয়া গেলেন।

অনাদিনের চেয়ে আজ বেশী শ্রুতি-প্রসন্নতার সহিত প্রাভাতিক-কর্জবাগুলি সমাধা করিয়া, দুপুরবেলা একটু সকাল করিয়াই উপরে উঠিলেন, কিন্তু হায়, যেমনবার শূন্য, তেমনই আছে!—অধিকন্তু আজ পান জল পর্যন্ত নাই!—

আহমদ সাহেবের স্বপ্ন হইল তিনি আজ অত্যন্ত সকাল-সকাল আসিয়া পড়িয়াছেন।—আমিনা এখনো তাহার পান জল শুঁচাইয়া রাখিতে আসেন নাই, এইবার আসিবে। কিন্তু তিনি ধরে আছেন জানিলে সে কখনই ঘরে ঢুকিবে না, তবু তা বা চাকরদের মাফকাজ সারিবে! অতএব.....।

ফরিকের জন্য হস্ত হইয়া আহমদ-সাহেব কি একটা কণা ভাবিয়া লইলেন। তারপর সকালবেলা আমিনার যে মুক্তি দেখিয়াছিলেন সেই দৃষ্টি মনে পড়িল, একটু হাসিয়া,—আলমারী হইতে একখানা গল্পের বই টানিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে নিষ্পদপদে নাচে নামিয়া আসিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়া হইল না।

ডাক্তারখানায় শুবের ঘরে বসিয়া কম্পাউণ্ডাররা তখন শুব ও ব্যবস্থাপত্র প্রভৃতি শুঁচাইতেছিল। ভেতরের বারেওয়া ওহায়েদ দ্বারবান, গরমজল ব্রাস্ প্রভৃতি লইয়া জলের ফিল্টার পরিষ্কার করিতেছিল, আহমদ-সাহেব সেইখানে আসিয়া নিকটস্থ বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া, টুপি ও তভারকোট খুলিয়া রাখিয়া—কমাল লইয়া মুখের ও ঘাড়ের ঘাম মছিরা—“আঃ” বলিয়া, বেঞ্চির উপরই আড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। বাঁ হাতের কুহুইয়ে বেঞ্চির উপর ভর দিয়া, বেঞ্চির উপর পা শুটাইয়া, হাতে মাথা রাখিয়া বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ভূতা ওহায়েদ্ মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইল! সনস্ত কাজ সারিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গিয়া, প্রভু হঠাৎ কেন যে এমন অসময়ে নানিয়া আসিলেন, সে তাহার কোনই কারণ ঠাহর পাইল না! তবে আজ ক’দিন হইতেই প্রভুকে সে একটু—‘কেমন-কেমন’ দেখিতেছে, উপরের ঘরে তিনি যে আজকাল বড় বেশীক্ষণ থাকেন না, সে টুকুও লক্ষ্য করিয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া আজকের মত এমন অসময়ে, অকারণে,—পোষাক পর্যন্ত না ছাড়িয়া নীচ নানিয়া আসিতে ত কোনদিন দেখে নাই! ওহায়েদ্ একটু শঙ্কিতও হইল।—সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে আড়-চোখে প্রভুর মুখপানে ছই তিনবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ কিছু অপ্রসন্নতার লক্ষণ সেখানে দেখিতে পাইল না, তাহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না, বিশেষতঃ একেই তাহার জিভ্ জোড়া বলিয়া কথাবার্তায় একটু তোৎলামীর টান ছিল, সেই জন্য সহজে সে প্রভুর সহিত কথাই কহিত না, বিশেষ প্রয়োজনে অল্পস্বল্প যাহা বলিত—তা’হাও খুব ধীরে!

আহমদ্-সাহেব বই পড়িতে পড়িতে বার বার অনামনস্ব হইয়া যাইতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া, সামনের ফুলবাগানের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে ঘড়ি খুলিয়াও দেখিতে লাগিলেন,—তারপর বাগানের ফুলগাছগুলার দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন “দশ—পনের—সতের—পঁচিশ মিনিট হইয়া গিয়াছে। আমিনা এতক্ষণ বোধহয় ঘরে আসিয়াছে, কিন্তু থাক আর একটু হোক,—কে জানে হয় ত বা সে ঘরে আসে নাই, অথবা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিবেন সে বারেণ্ডায় আসিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া পিছু হটিয়া নিঃশব্দে চম্পট দিল! না তাহা হইবে না, সে ঘরে ঢুকিয়া রীতিমত কন্দ্ব্যস্ত হইলে, তারপর—তিনি অতর্কিতে গিয়া ছুয়ারে দাঁড়াইবেন, তা হইলে,—আমিনার পলায়নের পথ রুদ্ধ হইবে!

মনে মনে উপযুক্ত সাধু মতলব আঁটিতে-আঁটিতে আহমদ্-সাহেবের গুপ্তপ্রাস্তে কখন যে, একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি নিজে টের পান নাই,—কিন্তু অহুসকিৎসু ওহায়েদের দৃষ্টিতে সে টুকু এড়াইল না! সাহস পাইয়া,—গরম জলে ব্রাস ডুবাইয়া, ফিণ্টারের কাঁচের দণ্ডগুলির গায়ে সজোরে ব্রাস ঘষিতে ঘষিতে—একটু কুষ্ঠা-সহকারে ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—“ছজুর হজুরং বিবি-সাহেবা এখন ভাল আছেন?”

আহমদ্-সাহেব একটু চমকিয়া অপ্রতিভভাবে বইয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া; সংক্ষেপে বলিলেন—“হু—।” মনে মনে খুব হাসি পাইল! বাঃ ওহায়েদের বুদ্ধিটা তো নিতান্ত ভোঁতা নয়! সেও সমজদার! সেও তাঁহার অনামনস্বতা—ভাব-বৈলক্ষণ্যের হেতু অমুধাবন করিতে পারে!

বইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া,—আরও কিছু একটা কথা ভাবিয়া লইয়া, সহসা তিনি একটু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন “ওহায়েদ্, তোমার বিবি আজকাল রাত্রে ওপরেই থাকে, না?”

ব্রাসের উপর একান্তভাবে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া ওহায়েদ্ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল—“হু—”

আহমদ্-সাহেব বইয়ের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া গোঁফ মুচড়াইয়া একটু যেন ওদাস্যের স্বরে বলিলেন “কাল রাত্রেও নীচে আসে নি, নয়? আচ্ছা মনস্থর, রস্তম, সবাই তো ওপরে থাকে, রান্নামহলের লোকজন সবাই রান্না-মহলেই থাকে,—তাহলে তুমি আজকাল একলাই এখানে থাক? বাঃ, কই আম্মায় তো কিছু বল নি ওহায়েদ্,—”

ওহায়েদ্ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরব রহিল। আহমদ্-সাহেব বক্রকটাক্ষে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসি-হাসি মুখে বলিলেন “ভারী অনায়াস এসব! আর ওপরেও সব ক’টাই জুটেছে ছেলে মানুষ, মহামুন্সিল! কি যে ছাই তাস খেলার নেশা ধরেছে ওদের,—রাত্রি জেগে-জেগে এইবার অস্থখে পড়বে আর কি—” তারপর সোজা হইয়া বসিয়া একটু কাশিয়া বলিলেন “ওহে, তুমি মানা করে দিও তো এবার থেকে যেন রাত্রে ওপরে কোন দিন না থাকে,—যেই বলুক, কাকুর কথা যেন না শোনে, বুঝলে ওহায়েদ্ একটু বুঝিয়ে বোলো—”

ওহায়েন্দ্‌ এবার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, মাথাটা খুব নীচু করিয়া বিব্রতভাবে ঘাড় চুলকাইতে শুরু দিল, কি একটা কথা বলিবার জন্য তাহার ঠোঁট ছইটা একবার যেন নিভাস্ত অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, সলজ্জ-হাসো চুপ করিয়া খুব বাস্ততার সহিত ফিণ্টার সাফ করিতে লাগিল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আহমদ্-সাহেব বেশ-একটু গাভীর্ষ্যের সহিত বলিলেন “আচ্ছা দাঁড়াও, আজ ওদের সকলকারই রাত্রে নীচে আস্‌বার বন্দোবস্ত করছি,—”

“সকলকারই” শব্দটার উপর তিনি এমন অত্যধিক মাত্রায় জোর দিলেন যে,—সেটা ওহায়েন্দের কানেও অতি বিষম বাজিল! তাহার কপালে ঘাম ছুটিল! হাস্যাবিকাশোন্মুখ অবস্থা অধরোষ্ঠ প্রাণপণ বলে দাঁতে চাপিয়া,—হাঁটুর নীচে মাথা ঝুঁকাইয়া, সে একমনে ফিণ্টারের দণ্ডগুলা পরিষ্কার হইল কি না,—তাহাই দেখিতে লাগিল।

আহমদ সাহেব টুপী ও কোট হাতে তুলিয়া, বই লইয়া নিব্বীহ ভাল মানুষের মত টুক্ টুক্ করিয়া মুছপদে উপরে চলিলেন। সিঁড়িতে উঠিবার সময়, জুতার ডগে ভর দিয়া সম্পূর্ণ ই নিঃশব্দে উঠিলেন।

বারেণ্ডায় পৌছিয়া, চিকিত-নয়নে চারিদিক চাহিয়া, শয়ন-কক্ষের দিকে কান পাতিলেন। ট্যাথসকেপ্-দুর্কস্ত চিকিৎসকের কানে,—খুব মূহ একটু খুট খাট শব্দ পৌছিল, উল্লাসে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—নিঃশব্দে ধীরে আসিয়া শয়নকক্ষের দ্বারের দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, আমিনা টেবিলের কাটের পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার আঁতষজ্জের কাঁচের ফুলদানিটা ক্রমালে করিয়া ঝাড়িয়া সযত্নে ফুঁ দিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

আহমদ্-সাহেব স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, একাগ্র নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে মূহ মূহ হাসিতে লাগিলেন।

( ৯. )

ফুলদানি পরিষ্কার করিয়া, পিছনে টুলের উপর হইতে টাটকা ফুলের তোড়াটা লইতে গিয়া, সহসা ছায়ায় নদিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমিনা আচম্কা বিষম-শব্দ করিল “ও মা!—”

পরক্ষণেই সজোরে ঘোমটা টানিয়া, দ্রুতপদে ছায়ায় নদিকে ছুটিল! আহমদ্-সাহেব প্রস্তুত ছিলেন—চক্ষের নিমেষে ধাঁ করিয়া ছায়ায় বন্ধ করিয়া শূসাঁর উপরে শিকল চড়াইয়া দিলেন, তারপর স্বন্দর ভব্রতা-স্বচক সৌজন্যের ভাষায় বলিলেন “কৃপা পূর্ব্বক ক্রটি মার্জনা করুন, আমি পোষাক ছেড়ে এখনি আসছি—”

আমিনা নীরব। কোন সাড়া দিল না।

একটু পরে পোষাক বদলাইয়া, হাতমুখ ধুইয়া আহমদ্-সাহেব হাসিতে-হাসিতে ছায়ায় খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন আমিনা, জানালার কাছে বেতের চেয়ারটার উপর চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মুখের ভাবটা বেশ উদাস গভীর! আহমদ্-সাহেব কিছু বলিলেন না, ছায়ায় বন্ধ করিয়া উপরের চোকাঠে ছিট্-কানি লাগাইয়া দিলেন,—কারণ আমিনা সেটা নাগাল পায় না।

আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া, আমিনার নিকটস্থ হইয়া,—নিজের নস্যের কোটা খুলিয়া আমিনার সাম্নে ধরিয়া আহমদ্-সাহেব বিনয়স্বচকস্বরে বলিলেন “এক টিপ্ গ্রহণ করুন”

“অত শিষ্টাচার আমার সহ হবে না—” বলিয়া আমিনা ধীর গভীরভাবে উঠিয়া-পড়িবার চেষ্টা করিল, আহমদ্-সাহেব ত্রস্তে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন “করেন কি? বসুন—” তারপর একহাতে তাহার মাথার কাপড় লড়াইয়া দিয়া অন্য হাতে চিবুক ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া—গভীর স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে

বলিলেন—“বলি,—যতটা দয়া আর করুণা সবই কি সেই রাস্তার পাগলী আর ভিথারিণীদের জন্য থরচ হবে ?—  
যেরও যে একজন অনুগ্রহ-প্রত্যাশী কান্দাল—”

বাধা দিয়া আমিনা ক্রভঙ্গী করিয়া সকোপে বলিল “দ্যাখো—”

হতাশ-করুণ-কণ্ঠে আহমদ-সাহেব বলিলেন “কি আর দেখব বল, আজকাল তুমি যে রকম ভয়ানক হয়ে  
উঠেছ, তোমার দিকে চাইতেও ভয় করে—”

আমিনা ফণ্ করিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “বেশ, ছেড়ে দাও—”

বাস্ত হইয়া আহমদ-সাহেব ঘোমটা উন্টাইয়া দিয়া বলিলেন “বেশ! এই দিলুম নাও—এখন শোনদেখি,  
বল এইখান—“পরফণে সুর বদলাইয়া একটু গভীরভাবে বলিলেন “ঠাট্টা-তামাসা নয়, বাস্তবিকই কতকগুলো  
জরুরী কথা আছে, কান দিয়ে শোন, বলি আজকাল এসব কি মুন্সিলের কাণ্ড সুরু করেছে বল দেখি, এ যে এবার  
কেলেকারী ঘটতে চল—”

আহমদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমিনা এবার সত্যি একটু বিস্মিত হইল, সন্দিক্ষেরে বলিল “কিসের কেলেকারী?”

আহমদ-সাহেব মুকুবিয়ানার সহিত গোঁফ মুচড়াইয়া প্রাণপণে গাভীরা রক্ষা করিয়া বলিলেন “এই আমার  
ওপরই না হয় তুমি রাগ করেছে,—তা বেশ করেছে,—কিন্তু আমার গরীব চাকরটির অন্ন মানুছ কেন বন্ধু দেখি?  
ওহায়েদের স্ত্রীকে ওপরে রাখে আটকে,—নাঁচে যেতে দাও না, আর সে বেচারী যে ওদিকে পাগল হয়ে মরবার  
দাখিল হয়েছে—”

আমিনা অবাক হইয়া স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিল! ক্ষণপরে তীব্র বিষ্ময়ের সহিত বলিল “সে বলেছে  
বুঝি তোমায় ঐ কথা? উঃ কি শয়তানী বুদ্ধি!—বলি এখন পাগল হয়ে মরবার জন্যই যদি এত বুক ধড়ফড়  
করেছে,—তবে তখন অমন তেজবাজি করে বিয়াল্লিশ লাফ ছুঁড়ে মরতে গিয়েছিল কেন? সেটা জিজ্ঞাসা করতে  
পার নি?”

নাকের কাছে নসোর টিপ তুলিয়া ধরিয়া, ঠোঁট মুখ কঁচুকাইয়া আহমদ-সাহেব অত্যন্ত বিষ্ময়ের সহিত  
বলিয়া উঠিলেন “তাই নাকি? ওহায়েদ আবার লাফ টাপ্ ছুঁড়ে জানে নাকি? কই আমি ত সে খবরের  
কিছুই জানি না!—”

আমিনা রাগিয়া বলিল “তা জানবে কেন? তুমি জান ওরু, আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! সাথে তোমার  
ওপর রাগ হয়?—”

আহমদ-সাহেব শশবাস্তে বলিলেন “থাক থাক, এখন আমার ওপর রাগটা মাপ কর,—ওদের ব্যাপারটাই  
বল।—তারপর কি হয়েছে?—”

আমিনা বলিল “কি আর হবে? তোমার পেয়ারের চাকরকেই জিজ্ঞাসা করো।—তুফানীর সঙ্গে কিরকম  
সম্বাবহারটা করে কিছু খবর রাখ?”

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া,—প্রাণপণ শক্তিতে নস্য টানিতে টানিতে আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা কি করে  
দাখব? ওহায়েদ তার জ্বর সঙ্গে কখন কি ব্যবহার করে,—সে কি আমার সাক্ষী রাখবার জন্যে তার ঘরে  
ডেকে নিয়ে যায়?”

তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমিনা সজোরে বলিল “চলুম!—ফের যদি তোমার সঙ্গে কোন কথা কইতে আসি—”

খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “হাঁ হাঁ, সবুর!—”

আমিনা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল “এক লহমাও নয়!—ছয়ারের ছিটকানিটা খুলে দাও, আমি চলে যাই—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “যাবেই তো, এখন একটু থাম।—ওহায়েদ-দম্পতীর-ঝগড়া ঝাটা মিটমাটের একটা বন্দোবস্ত না করে তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না, বোস—”

আমিনা বলিল “আমি ওদের ঝগড়া মেটাবার কি বন্দোবস্ত করতে যাব :?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “যেতে কোথাও হবে না, ঘরে বসেই সে বন্দোবস্তটা তুমি ঠিক্ করে ফেলতে পারবে।”  
এখন শোন বলি,—ওর জীকে আজ রাত্রে বাইরে পাঠিয়ে দাও, পারবে ত ?”

ক্রভঙ্গী করিয়া আমিনা বলিল “না কিছুতেই না!—তুফানী কোন্মতেই বাহিরে যাবে না—”

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

## গান ।

—:~:—

আমারে ডাকবে তুমি  
জানি গো জানি মনে,  
সবাকার আঁখির আড়ে,  
সবাকার সঙ্গোপনে ;  
জানি গো সবার শেষে  
আমারে ডাকবে তেসে,  
যমুনার আঁধার তীরে  
মিলনের বৃন্দাবনে ।

ওরে ও অন্ধ হিয়া  
মেল রে মেল আঁখি !  
আলোয়ার আলো থুঁজে  
মোহ-ঘোর টুটল নাকি ?  
জাগ রে জাগ স্মৃথে  
মরণের শীতল বুক,  
লুকায়ে অতল-তলে  
আঁধারের আলিঙ্গনে !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

## বৌদ্ধ নরক ।

—:~:—

পুণ্যকর্মের ভূয়ঃ অগুষ্ঠান ও পাপকর্মের বিরতি—সমাজস্থিতির প্রাথমিক ভিত্তি । সৌধের সৌকুমার্য মুখ্যতঃ স্থপতির কৌশলাপেক্ষী, গোণতঃ ভাস্কর ও চিত্রকরের শিল্পপটুত্বসাপেক্ষ । বিজ্ঞ স্থপতির অভাবে সৌধের স্থিতি কল্পনা করা যায় না ; যদি সৌধই না রহিল—ভাস্কর কোথায় তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দিবেন,—চিত্রকর কোথায় তাঁহার তুলির রঙ ফলাইবেন ? সেইরূপ সমাজপতিরা সমাজ-সৌধের সৌষ্ঠবের কথা চিন্তা করিবার পূর্বে সমাজস্থিতি ও স্থায়িত্বের কথাই প্রথমে আলোচনা করেন—সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন । ধর্মই সমাজের প্রাণ, ধর্মই প্রতিষ্ঠা, ধর্মই সংরক্ষক ; অধর্ম সমাজের গ্লানি, অধর্ম দৌর্বল্য, অধর্ম ক্ষয় ও ধ্বংস—এককথায় ধর্ম্যে স্থিতি ও অধর্ম্যে বিলয়—এই মূলমন্ত্রই সমাজনিয়ন্তাদের নিরন্তর ধ্যান ও ধারণার বস্তু । কোন্ যুগে কোন্ সমাজের কোন্ ধর্ম্য তাহা সেই যুগে সেই সমাজের কর্তার নির্ধারণ করিবেন ; কেননা সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, তাহার স্বাশ্রয় সনাতন নিয়ম নাই—একই সমাজের এক যুগের ধর্ম্য অন্য যুগের উপযোগী নহে । তবে উচ্চ স্বতঃসিদ্ধ যে কোনও বিশিষ্ট যুগধর্ম্যের উপেক্ষা ও অবহেলা সেই সমাজের পক্ষে থাকিবে । এই জন্যই সমাজব্যবস্থাপকগণ সংস্কর্মের প্রণেদনার্থে ও অসংস্কর্মের নিবারণার্থে একের পুরস্কার ও অন্যের শাস্তির বিধান করিয়াছেন ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

দেহের সর্কাব্যব পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যই যেমন কাস্তি ও লাভগোচর বিধায়ক, ব্যাধিপীড়িত শীর্ণ কলেবরে বিবিধ কৃত্রিম ও চেষ্টা স্বত্বেও যেমন প্রকৃত সৌন্দর্যের আবির্ভাব হয় না, তেমনই পরিপূর্ণ-স্বাস্থ্য সমাজেই কেবল সাহিত্য ও চাক্ষুশিল্পের সম্ভব হয় ; ব্যাধিগ্রস্ত মরণোন্মুখ সমাজে তাহার বিকাশ সম্ভব নয় । চরিত্রসরস ক্রমরাজির শাখাপল্লবই প্রকৃতভাবে উন্নতি হইয়া উঠে, নীরস স্থূল তরুসকালে পুষ্পদোহনসম্ভব কবিসমনপ্রসিদ্ধির অনুরূপ হইলেও স্বভাববিরুদ্ধ । এই সমাজস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যে সকল বিধিনিয়ম উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রত্যেক সমাজ-সেবীর একান্ত পালনীয় । এতৎপ্রসঙ্গে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দার্শনিকের চক্ষে নিতান্ত অদার্শনিক মনভুলান পিতামহী মাতামহীর উপকথা হইলেও সমাজরক্ষায় তাহার যথার্থ স্থান ও মূল্য আছে । যাহাদের লইয়া সমাজ ভাঙ্গাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দার্শনিকখ্যাতির অভিমান করিতে পারেন । ধর্মই ধর্মের পুরস্কার—এই ভবের মর্মগ্রহণকারীর সংখ্যা অল্পপ্রাণবদ্ধ । অতএব পুণ্যের প্রলোভন ও পাপের বিভীষিকা দেখাইয়া ‘অদার্শনিক’ অপবাদের কলঙ্ক শিরোমার্গ্য করিয়াও যদি কোনও ত্রুটি সমাজরক্ষণে যত্নবান হন, তবে তাহাকে প্রকৃত বীর, প্রকৃত উপকারী বলিয়া ধরন করিয়া লওয়া যাইতে পারে ।

এতদ্ব্যতীত সমাজসংরক্ষণচেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে যুগেযুগে দেশেদেশে বিভিন্নজাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । সভ্যতার জন্য যে যে জাতির খ্যাতি, তাহাদেরই মধ্যে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দেখিতে পাই । গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়, টিউটন, মুসলমান ও হিন্দুগণ তাহাদের স্ব স্ব বুদ্ধিবৈবেক কল্পনার ক্ষুরগের অল্পপাতে স্ব স্ব ধর্মের অল্পমুখ স্বর্গ ও নরক গড়িয়াছেন । প্রথমতঃ সংহিতাকারগণ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সাধারণ লোককে ধর্ম্যে প্রবর্তিত করিবার ও অধর্ম্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য মোটামুটিভাবে স্বর্গের সুখৈশ্বর্য ও নরকের ভীষণ যন্ত্রণার বর্ণনা করিয়াছেন । এই অসংস্কৃত উপাদান প্রকৃত কারিগরের হাতে পড়িয়া ক্রমবিবর্তন নিয়মে শিল্পের বস্তু হইয়া



পড়িয়াছে। মহাকাবিগণ স্ব স্ব অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই উপাদানকে নিয়োজিত করিয়া আটের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। গ্রীক মহাকাবি হোমর, ল্যাটিন মহাকাবি ভার্জিল, ইতালীয় মহাকাবি দান্তে, ইংরেজ মহাকাবি মিল্টন, বাঙ্গালীর মহাকাবি মাইকেল মধুসূদন এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। ওডিস, এনীড্, ডিডাইনা ক্রমোডিয়া, প্যারড্রোইস্ লষ্ট, মেঘনাদবধকাব্যে তাঁহাদের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। টিউটনের সাগা গ্রন্থে, যুদ্ধদীর তালমুদে, মুসলমানের কোরাণে, হিন্দুর রামায়ণমহাভারতে ও বৌদ্ধের ধর্ম ও জাতকগ্রন্থসমূহে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ নরকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। সিধিনের সহিত এনিয়াসের মত, ও বৌদ্ধের সহিত দাস্তের মত, মায়ার সহিত রামচন্দ্রের মত, দেবদূতের সহিত যুদ্ধিরের মত, মাতলির সহিত নিমির মত পুণ্যবান পাঠক চলুন একবার বৌদ্ধ নরক ঘুরিয়া আসি।

আমরা নিমিজাতকে পাঠ করি যে মাতলির সহিত বিদেহনৃপতি নিমি, নরক দর্শন করিতেছেন। মাতলি নিমিকে নরকের নদী বৈতরণী দেখাইলেন।

পুতিগন্ধময়, ক্ষার লবণাশু, উষ্ণোদক, জ্বালাময়ী শিখা পরিবেষ্টিত বৈতরণী দেখিয়া রাজা ভীতচিত্তে মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“সারথি, এই যে অশরীরিগণ তপ্ত নদীতে নিমজ্জিত হইয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, উহারা কোন্ পাপে পাপী?” পাপ পরিপক্ক হইয়া কিরূপে ফল প্রসব করে, তাহার বর্ণনা করিয়া মাতলি কহিলেন, “হে রাজন, যাহারা সংসারে ধনমদে দর্পিত হইয়া দুর্ব্বলের পীড়ন করে, তাহারা পাপ অর্জন করিয়া এই বৈতরণীতে নিক্ষিপ্ত হয়।”\*

বৈতরণী অস্থিহিত হইলে, রাজা নূতন দৃশ্য দেখিলেন। কৃষ্ণকুর, শবল গৃধিনী, ভীষণ বায়স কর্তৃক বিক্রান্ত পাপীগণকে দেখিয়া নিমি কহিলেন—“সারথি, আমি এই দৃশ্য দেখিয়া ভয় পাইতেছি। কে উহারা?” “ইহারা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীকে কটু বাক্য কহিবার জন্য এখানে বায়স কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে।”

জলন্ত পাবকে অবলুপ্তিত ও লোহিতবর্ণ অয়সপিণ্ড কর্তৃক চূণীকৃত পাপীগণকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—“কে ইহারা?” সারথি উত্তর করিলেন, “মর্ত্যে ইহারা নিদ্রাহ নিম্পাপ ব্যক্তিগণকে জ্বালায়ন্ত্রণা দিবার পাপে এখন তপ্ত লোহগোলকদ্বারা পিষ্ট হইতেছে।”

জলন্তঅগ্নার গহবরে ভক্ষিত পাপীগণের চীৎকার শ্রবণে ব্যথিত রাজা জিজ্ঞাসিলেন—“কে উহারা?” “জনসত্ত্বের সমক্ষে ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল ও স্ব স্ব ঋণ অস্বীকার করিয়া লোকের সর্বনাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য এই পাবকচূর্ণীতে সিদ্ধ হইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।”

\* হিন্দুশাস্ত্রে বৈতরণীর বর্ণনা এইরূপ :—

নদী বৈতরণী নাম দুর্গকা কথিরাবহা।

উষ্ণোদ্যো মহাবেগা অহিবেশ তরঙ্গিনী।

মেঘনাদবধকাব্যে অষ্টমসর্গে বৈতরণীর বর্ণনা তুলনা করুন :—

বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী

বজ্রনাথে; রহি রহি উথলিছে বেগে

তঃপ, উথলে বধা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ

উচ্ছলিয়া ধুমপুঞ্জ, অস্ত্র অঘিতেছে।

ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বালাময় বহ্নিপরিবৃত্ত বিপুল লোহকটাহ অবলোকন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন—“অধোমুখ, উর্দ্ধপদে পাপীগণ যে তপ্ত লোহকটাহে বিসৃষ্ট হইতেছে, উহারা কে ?” “নিম্পাপ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের নিষ্ঠাভন হেতু এই লোহকটাহে উহারা দগ্ধ হইতেছে ।”

“ওই যে ভগ্নগ্রীব পাপীগণ উত্তপ্ত পয়োপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোন্ পাপে উহারা কলুষিত ?” “এই চুষ্টগণ সংসারে বিহগকুল ও অন্য ত্রিষাক্জাতের সংহারের নিমিত্ত নিষ্ঠুর কার্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজেরা ভগ্নগ্রীব হইয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ।”

“ঐ যে গভীর নদী প্রবাহিত হইতেছে, আর উহার বেলাভূমিতে কতকগুলি প্রেতমূর্ত্তি অগ্নিতপ্ত হইয়া তৃষ্ণা প্রেমনাভিপ্রায়ে যেমন অবনত হইতেছে আর জলরাশি তুষরাশিতে পরিণত হইতেছে, উহারা কে ?” “উহারা ক্রেতৃগণকে বঞ্চনা করিয়া তুষ্মিশ্রিত শসাকণা বিক্রয় করিবার পাপে এখন অগ্নিদগ্ধ, পিপাসাতুর হইয়া জল পান করিতে উদাত্ত হইবামাত্র জলের পরিবর্ত্তে তুষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে ।”

ভল্ল, বর্ষা ও ঈষৎফলবিক্ত হইয়া যে প্রেতগণ নিরন্তর বিকট চীৎকার করিতেছে, কে উহারা ?” “ঐ চুষ্টগণ পরম্পাপহারী—রক্ততনুবর্ণ, ধনধান্য, গোমেষছাগ প্রভৃতি পরের সামগ্রী হরণ করিয়া—বর্ষাফলক বিদ্ধ হইয়া এখন তাহার ফলভোগ করিতেছে ।”

“ঐ যে কতকগুলি প্রেতমূর্ত্তিকে গলদেশে রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে কণ্টন করা হইতেছে, উহারা কোন্ অপরাধে অপরাধী ?” “উহারা মৎসাজীবী, কসাই, লুন্ডক, অথবা গোমেষছাগমহিষাদির হস্তারক । গতায়ুঃ প্রাণিগণের দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার পাপে আজ নরকে শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ।”

“বিকট দুঃস্বপ্নময় পুরীষহ্রদে ঐ যে বুভুক্ষু প্রেতগণ সাগ্রহে মলমুত্র গ্রাস করিতেছে, উহাদের এ শাস্তি কেন ?” “পরশ্রীকাতর, অস্বাস্থ্যপরবশ হইয়া উহারা বন্ধুর নিকট থাকিয়া তাহারই সর্বনাশ করিয়াছে । সেই পাপ জ্ঞান করিবার নিমিত্ত এই বীভৎস ভক্ষ্যের ব্যবস্থা ।”

পুতিগন্ধময় তপ্ত রক্তহ্রদের পানীয়ে ঐ-যে প্রেতমূর্ত্তিগুলি তৃষা নিবারণ করিতেছে, উহারা কে ?” “ভক্তিপূতাপাত্ত পিতামাতার প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের এই শাস্তিভোগ ।”

“চক্ষু বিদ্ধ শতশত বিশিখের ন্যায় ঐ যে পাপীদের জিহ্বা লোহকটকে বিদ্ধ হইয়াছে, আর জলাশয় হইতে উত্তোলিত মৎস্যের ন্যায় যাতনায় নিরন্তর ছটফট করিতেছে, কে উহারা ?” “উহারা মর্ত্যভূমে লোভ পরবশ হইয়া বিপণীতে ক্রেতাগণের সহিত মিছামিছি দর করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহাদের পুণ্ডিতা চিরকাল লুক্কায়িত থাকিবে ; কিন্তু তাহা হয় নাই । বৈদীর্ঘ্যবিক্ত মৎস্যের ন্যায় এখানে তাহারা যন্ত্রণা পাইতেছে ।”

“দূরে দেখিতেছি যে বিকৃতবাহু, রক্তাক্তকলেবর ভয়পৃষ্ট কতকগুলি নারী বিলাপ করিতেছে—তাহাদের কটিনেশপর্যন্ত ভূমিতে প্রোথিত, উর্দ্ধভাগ বলিবেষ্টিত,—উহারা কোন্ দোষে দোষী ?” “উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উৎসব নীচকার্য্যে বংশগৌরব মলিন করিয়াছে । বিশ্বাসহীন, স্বামিত্যাগিনী কুলটা ঐ নারীগণ জঘন্য ইঞ্জির পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কোনও পাপকর্ম্মে বিরত না হইয়া সুরতকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে ।”

তাহার পর রাজা পরদারগামী, পরধন্যাপহারী, পরধন্যাবলম্বী প্রেতগণের শাস্তি দর্শন করিয়া স্বর্গাভিমুখে চলিলেন ।

পাঠক অবগত আছেন যে মহারাণা অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রয়োচনার তাহার পিতা বিশ্বিদারকে কারারুদ্ধ করিয়া অনাহারে দ্বাখিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন । দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রাণনাশ করিবার জন্য বিবিধ

উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। অবশেষে পাপের জন্য অমৃতপ্ত হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি শ্রাবস্তি গমন করেন। তথায় জেতবনের প্রবেশ দ্বারে ক্ষিত্তিভল ভিন্ন হইয়া তিনি অবীচি নরকে নিক্ষিপ্ত হন। অজাতশত্রুও সেই ভয়ে ভীত হইয়া বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন ও ধর্মপথে থাকিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। সেই প্রয়াসে বুদ্ধদেব যে কাহিনী বলেন তাহার নাম সন্ধিচ্ছ-জাতক তথায় সন্ধিচ্ছ কাশীরেশ প্রজ্ঞদত্তের নিকট নরকের বর্ণনা করিয়াছেন।

“স্বাক্ষন, যে সমস্ত জীব, ধর্মকে পদদলিত করিয়া অধর্মের পথ গ্রহণ করিয়াছে, নরকে তাহারা কি যাতনা সহ করে তাহার কথা শুনি। সঞ্জীব, কালহুণ্ড, রোরুব, মহারোরুব, সভবাত, অবীচি, তপন, পতাপন, নামে আটটা বৃহৎ নরক আছে। ইহাদের হইতে পলায়ন অসম্ভব। উদ্‌সদ নামক ১২৮টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরক আছে। পাপীগণ এইখানে বহিষ্কৃত হইয়া সন্তাপিত হয়। ভয় যাতনা দুঃখময় এই প্রদেশ। প্রত্যেকটি চতুর্দার বিশিষ্ট চতুষ্কোণাকৃতি। লোহময় তাহার কুটিমতল, লোহময় তাহার প্রাচীর, লোহময় তাহার শীর্ষদেশ—শতযোজন ব্যাপী বলিতে ও তাহা জবীভূত হয় না। যাহারা ধার্মিক সন্ন্যাসীর অবমাননা করে, তাহারা অধোমুখ হইয়া ইহাতে তাক্ত হয় আর উঠে না, তপ্তপাত্রে ভর্জ্যমান মৎস্যের মত অগণিত বর্ষ তাহারা স্বীয় পাপের জন্য ভর্জিত হইতে থাকে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোন দ্বার দিয়াই পলায়ন অসম্ভব। মহাপন্নগবিষ যেমন তাজা তরুণ ব্রতচারী সন্ন্যাসীগণের রোষও পরিহার্য। গোতমের অবমানকারী সহস্রভূজ, মহেশ্বাস কেকরাজ অর্জুন, কৃষ্ণদৈপায়নের লাঞ্ছনাকারী অন্ধকগণ, মেজর, দণ্ডিক প্রভৃতি নৃপবন্দ নরকে পড়িতেছেন। লোভ অথবা মাৎস্যর্গের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে নরপাংগুল পিতৃহত্যা করে, অনন্তকাল ধরিয়া কালহুণ্ড নরকানলে সে দগ্ধ হয়। অয়সকটাহে বিদ্ধ হইয়া তাহার গাত্র হইতে মাংস খসিয়া খসিয়া পড়ে, অয়সশরে বিদ্ধ হইয়া তাহার চক্ষু উৎপাটিত হয়, সে ক্ষারজলে বিসৃষ্ট হয়, পুরীষ ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়, এইরূপে সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। মুখ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য অলস্ত হলফলকে অথবা লৌহগিণ্ড মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, অথবা ক্ষুদ্র রজ্জুর সাহায্য লওয়া হয়। এতদ্বিধ মুখে মলমূত্র প্রদত্ত হয়। অসিত অথবা পিঙ্গল বর্ণ ক্রব্যাহারী গৃধ্রী কাকোলগণ কঠিন লৌহচক্রে বিশিষ্ট বিবিধ শকুন, সিংহ খণ্ডখণ্ড করিয়া তাহার জিহ্বা বিদীর্ণ পূর্বক সেই রক্তার্দ্র মাংসপিণ্ড ভক্ষণ করিতে থাকে। ইত্যন্তঃ ভ্রাম্যমান প্রমথগণ দগ্ধ বক্ষোদেশে অথবা ভগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকট ঘোর হাস্যসহকারে ভীষণ মুষ্টি বৃষ্টি করে। মাতৃঘাতীর শাস্তি কম নিদারুণ নহে। বিকটাকার দানবগণ লোহময় ভীম তলাগ্রে তাহার পৃষ্ঠদেশ কর্ষিত করিয়া জবীভূত তাম্রের মত রক্তের স্রোত বহাইয়া দেয়, ও এই বীভৎস পানীয়দ্বারা তাহার পিপাসার জ্বালা শান্ত করে। রক্তশোণিতহৃদে ভাসমান ন্যাকার জনক গলিত শবে সেই দেশ দুর্গন্ধীকৃত। শোণিত বর্দ্দমের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠে, ভীষণ লৌহহুঁচীমুখ ক্রমিকীট প্লাজচর্ম বিদীর্ণ করিয়া সোৎস্রুকে সেই মাংস ভক্ষণ অথবা রক্তপান করিছে। •

০ নিরবিলে দৈববাণী, ভীষণ মুষ্টি

যনমুত হানে দণ্ড নন্দক প্রদেশে,

কাটে কুশি বজ্রনখা মাংসাহারী পানী

উড়ি পড়ে ছায়া দেহে হিঁড়ে নারীভূঁড়ী

হহহহহে। আর্তনাদে পুরে দেশ পানী — সেযনাথবর আইম সর্গ।

ক্লেশস্ফীকারীগণ ক্ষুরধার নামক নরক হঠাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ শ্রোতের বৈতরণী নামক নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। সেই নদীর উভয় তীরে সুদীর্ঘ লৌহকণ্টক বিশিষ্ট উচ্চাশির অনলমাণ্ডত শাল্মলীতরু বিরাজিত। এই সুতীক্ষ্ণ লোহিতাত্ত তপ্তকণ্টকে বিদ্ধ হইয়া বাভিচারী বিশ্বাসহস্তা পতিগণ ও অসতী নারীসমূহ কষ্টে পাইতেছে। লৌহবেত্রাদিত পৃষ্ঠদেশ, উৰ্দ্ধপদ অধোমুখ, নিরুত্তাবয়ব পাপীগণ সারারাত্রি যন্ত্রণায় জাগরিত হইয়া আছে। শৈলপদ স্ফুটিত পয়ঃপূর্ণ লৌহকটাে প্রত্যুষে তাহারা লুকায়িত হইয়া স্বপ্ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। পণলব্ধ যে স্ত্রী স্বামী অথবা তাহার পরিজনবর্গকে ঘৃণা অথবা অমধ্যাদা করে, তাহার রসনা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া অসংখ্য ক্রিমির আহার্য্য হয়। তপন নরকে তাহাকে ভীষণ যাতনা সহ করিতে হয়।

গোমেষশূকরহস্তগণ, মৃগয়াকারীগণ, মংসাজীবগণ ও দম্ভাগণ লৌহমুদগর পিষ্ট হইয়া অথবা বর্ষাফলক ও সায়কবিদ্ধ হইয়া লবণাশুতে পতিত হয়। জালিয়াতগণ দিবানিশি লোভগদাঘারা বিমদিত হইয়া অন্য কোন পরদ্বীর উদগীরিত পুৰীষতুল্য ভুক্তবো নিজে ক্ষুরবাত্ত করিতেছে। লৌহমুখ কাক, কাকোল, গৃধ্রী, গধু, সকলেই এই যাতনা ক্রষ্টে পাপীগণের মাংসে স্বীয় অতৃপ্ত জঠর পুরাইতেছে।

ইহা ব্যতীত চতুর্দ্বার জাতকে উস্‌দ নিরয়ের উল্লেখ পাই। তথায় মিত্রবিন্দক নামে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবা, মাতাকে প্রহার করিয়া নরকগামী হইয়াছে। ঐ নগর মিত্রবিন্দকের নিকট সুরমা বলিয়া প্রতিভাত হইল। সে সঙ্কল্প করিল—আমি উহার রাজা হইব। সেখানে সে এক পাপীর শীর্ষদেশে ক্ষুরধারবৎ এক চক্রকে ঘূর্ণায়মান দেখিতে পাইল—তাহার যে যাতনা হইতেছে তাহা তাহার মনে হইল না। সে ভাবিল যেন তাহার মস্তকদেশে পদ্ম রহিয়াছে। শৃঙ্খলকে সে মালা বলিয়া, রক্তবিন্দুকে চন্দন বলিয়া, বিকট আর্দ্রনাদকে স্নিগ্ধ গীত বলিয়া ভ্রম করিল। পরে বুঝিতে পারিল যে লৌহ কুলালচক্র পদ্ম নহে—ক্ষুরচক্র।”

অন্য অন্য জাতকে আমরা লৌহ-কুন্তী, গৃহনিরয় (বিষ্ঠানরক), কাকনিরয়, পত্ননিরয় প্রভৃতি নরকের কথা পড়ি। মহানীরদ কস্যপ জাতকের বর্ণিত নরক সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়া বৌদ্ধ নরক বর্ণনা শেষ করিতেছি। শবল ও সাম নামে বিপুলকায় মহাবলশালী দুটি কুকুর লৌহদন্ত দ্বারা পাপীগণকে খণ্ড খণ্ড করে।

চতুর্দিকে ক্ষুরসংযুক্ত অগ্নিশিখা বেষ্টিত শৈল আরোহণ করিবার সময় পাপীর ত্বক্ ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্ত নিশ্চত হইতে থাকে। সুতীক্ষ্ণ লৌহভল্লযুক্ত, রক্তপায়ী, কণ্টক সন্মার্জন, কৃষ্ণমেঘতুলা বনে যমতৃণগণ কড়ক তাড়িত হইয়া পাপীগণকে প্রবেশ করিতে হয়। নরকের সেগ ভীষণ রক্তকলঙ্কিত শাল্মলীতরু আরোহণ করিবার সময় ত্বক্ ভিন্ন ও অপসারিত হয়। সেখানে মেঘপুঞ্জের মত ঘন উচ্চ উচ্চ বনশ্রী আছে। শত শত তববারি তাহার পত্র, মল্লধারকপায়ী লৌহচুরিকা দ্বারা তাহারা মণ্ডিত, সেই পাথে প্রবেশ করিতে গিয়া পাপীগণ রক্তাক্ত কলেবর হয়।

এই নরকবর্ণনায় এমন কিছু বিশেষত্ব নাই। হিন্দু নরকের বর্ণনাও প্রায় এই প্রকারের। বাস্তবিক দাস্তে ও ভাস্কিলের নরক বর্ণনার সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মেঘনাদবধের কবির কাব্যে নরকের বর্ণনা বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু পুরাণোক্ত নরক, এনীড বর্ণিত নরক, ডিডাইনা কমেডির নরক, (Fairie Queen) ফেরী কুইনের নরক—এই সবগুলির সংমিশ্রণে তাহার নরক গঠিত হইয়াছে। যাহারা এই মহাকাব্যগুলি পড়িয়াছেন তাহারা আমার এই উক্তির ষাণার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্থলে স্থলে নরক হইবে যেন মেঘনাদ কাব্যে এগুলির অনুবাদ পাঠ করিতেছেন। অতএব যদি বৌদ্ধ নরকের স্থান বিশেষের সহিত মেঘনাদবধকাব্যের নরকের সাদৃশ্য থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই—যেহেতু প্রধানতঃ হিন্দুনরকের ছায়া

লইয়াই বৌদ্ধ-নরক গঠিত হইয়াছে ইহাই আমার ধারণা ! আমি আপাততঃ মহাভারত হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তৃতা সমর্থন করিতেছি ।

\* \* \* \* \*

ইতশ্চৈতশ্চ কুণ্ঠৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ১৮ ॥  
অস্থিকেশ সম কীণং কুমিকীটসমাকুলম্ ।  
জলেনৈ প্রদীপ্তেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৯ ॥  
অয়োমুখৈশ্চ কাকাদৈর্গৃহৈশ্চ সমজ্জিতম্ ।  
মূচীমুখৈস্তথা তৈঃ বিক্কাশৈলোপমৈবুতম্ ॥ ২০ ॥  
দদর্শোষোদকৈঃ পূর্ণাং নদীং চাপি স্তম্ভগামম্ ॥ ২১ ॥  
অসিপত্রবনং চৈব নিশিতং ক্ষুর সংবৃতম্ ॥ ২২ ॥  
করস্ত বালুকা তপ্তা আগ্নীশ্চ শিলাঃ পৃথক্ ।  
লৌহকুন্তীশ্চ তৈলসা কাথ্যমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ২৩ ॥  
কূটশাখালিকং চাপি হৃৎস্পর্শং তীক্ষ্ণকণ্টকম্ ।  
দদর্শান্যশ্চ কৌন্ত্যেয়া যাতনাঃ পাপকর্শিণাম্ ॥ ২৪ ॥

—মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব—ষষ্ঠীয় অধ্যায়।—

লৌহমুখকাক প্রভৃতি ক্রব্যাহারী শকুনগণ, অসিপত্রবন, ক্ষুরসংযুক্তবন, লৌহকুন্তী, তীক্ষ্ণকণ্টক শাখালীতরু—  
আমরা বৌদ্ধনরকে দেখিতে পাইয়াছি । অমুশাসন পর্বে ২২৯।২৩০ অধ্যায়ে মহেশ্বর, উমার নিকট নরকবর্ণনা  
করিতেছেন । তাহা হইতে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ।

অসিপত্রবনে ঘোরে চারয়ন্তি তথা পরাম্ ।  
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্তথা শ্বানঃ কাংশ্চিত্তত্র হৃদস্তিবৈ ॥ ৩২ ॥  
তত্রবৈতরণী নাম নদী গ্রাহ সমাকুলা ।  
হৃৎস্রবেশা চ ঘোরা চ মূত্রশোণিত বাহিনী ।  
তস্যাং সংমজ্জন্ত্যেতে ভূষিতাম্ পায়য়ন্তি তাম্ ॥ ৩৩ ॥  
আরোপান্তি বৈ কাংশ্চিত্তত্র কণ্টকশাখালীম্ ।  
যজ্ঞচক্রেষু তিলবৎ পীড়্যন্তে তত্র কেচন ॥ ৩৪ ॥  
অদ্বারেষু চ দহন্তে তথা হৃৎকৃতকারিণঃ ।  
কুন্তীপাকেষু পচ্যন্তে পচ্যন্তে সিকতাশ্চ চবৈ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমং রৌরবং নামম্ শতবোজনমায়তম্ ।  
ভৃশং হৃগন্ধ পুরুষং ক্রিমিভির্দারগৈবৃতম্ ॥  
অতিঘোরং অনির্দেশ্যম্ প্রতিকূলম্ ততস্ততঃ ।

মহারোরবসংজ্ঞং তু দ্বিতীয়ং নরকং প্রিয়ে ।

তৃতীয়ং নরকং তত্রঃকণ্টকাবন সংজ্ঞিতম্ ।

\* \* \* \*

অধিকুণ্ঠমিতিখ্যাতং চতুর্থং নরকং প্রিয়ে ।

\* \* \* \*

দুঃখস্থানমিতি প্রাহুঃ পঞ্চকষ্টমিতি প্রিয়ে ।

\* \* \* \*

অন্যে চ নরকাঃ সন্তি অবীচি প্রমুখাঃ প্রিয়ে ।

শ্রীকালীপদ মিত্র

## বন্দী ।

কভু, কাজল-আঁকা কমল-চোখে  
অশ্রু জলে ভাস !

কভু, রক্ত-রাজ্য গোলাপ-ঠোটে  
মোহন হাসি হাস !

হেরি, স্তব্ধ কভু চন্দ্রবদন  
মেঘের অভিমানে

কিবা, সোহাগ-মুখে চকিৎ চাহ'  
আমার মুখপানে !

তুমি, লক্ষ্মী কভু ঘরের কোণে  
লজ্জাবতী লাজে,

কভু, কঠোর ভব বজ্রশোভা  
বুকের মাঝে বাজে !

কভু, তীব্ররূপে দহন করে  
অগ্নি শুধু জ্বালো,

কভু, শাস্ত্ররূপে স্নিগ্ধ তুমি  
শাস্তিবারি ঢালো !

তুমি, শীতল কভু তুমার-সাদা  
 পাষণ হুনে মম,  
 কভু, সপ্ত-রঙা—বর্ণঘটায়  
 ইন্দ্রধনু সম !  
 তব, রূপান্তরের অসীম লীলা  
 ঢেউয়ের মত ভঙ্গী,  
 তুমি, লক্ষ ফুলের কণ্ঠমালা  
 হাজার রঙে রঙ্গী !  
 আমি, হার মেনেছি দ্বন্দ্ব কেন ?  
 এখন কর সন্ধি,  
 শুধু, রেখোই মনে একটা কথা  
 'তোমার আমি বন্দী !'

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ।

## পার্বতী ।

পাগাড়ের কোলে ছোট পাগাড়ি-ঘেরে পার্বতী । নিরঝরির মত চঞ্চল পাগাড়ের কোল দিয়ে ছুটে চলত, পিঠের উপর মোটা কালো বেণী ছলে উঠত, লাল টুকটুকে গালের উপর আকাশের রোদ পিচলে পড়ত, পাগাড়ের শক্ত বকের উপর কোমল পায়ের চাপ দিয়ে পাকতাতরুর শাখা ধরে সে যে নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত তা কেউ বুঝতে পারত না । গরীব মাবাপের একটি মাত্র মেয়ে বড় আদরের—কিন্তু আদরের অমুরূপ বস্তু হ'ত না সে শুধু টাকার অভাবে । কচিগায়ে কোন দিন নতুন কাপড় দিতে পারে নি মা বাপ—নিজের পুরান কাপড়ের ছেঁড়া কালো ঘাগরা আর কুণ্ডি পরিয়ে এই দশ বছর তাকে পালন করেছে, শীতের দিনে গুণিরের কুচি পায়ে ফুটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে—তবু নতুন জুতা কিনে দিতে পারে নি, এ-কষ্ট যে মাবাপের প্রাণে কত গভীর কত বিরাত, তা শুধু মাবাপের প্রাণই জানে !

তার দিন আনন্দ—দিন খেত, বাপ তার পথের ধারে বসে ছোট ছোট বুড়ি ডালা তৈরী করে বিক্রী করত, আর মা তার পিঠের উপর বড় বড় বোঝা ফেলে যাত্রীদের মালপত্র পৌছে দিত । যে খুসী হয়ে যা দিত তাইতেই দিন কেটে যেত, তার কোন দিন মনে অসন্তোষ আনে নি—এই মনে করে যে ভগবান তাদের পরের দোরে ভিক্ষে চাওয়ান নি । খেতে খায় এই তাদের স্নেহ,—আর বাকি যা অভাব—সে পার্বতী পূর্ণ করেছে ! এমন করে স্নেহ-স্নেহে দিন কেটে যেতে লাগল, পার্বতী বড় হতে লাগল । যেমন করে সকাল বেশার গোলাপ কুঁড়ি সারাদিনের

রৌদ্র-তাপেও একটি একটি করে দল মেলে দিতে থাকে তেমনি করে এত অভাবহঃখের ভিতরেও তার যৌবনের কুঁড়িটি তার সর্বাঙ্গে একটি একটি করে সৌন্দর্যের দল মেলে দিতে লাগল ! তার গোলাপী গালের আভা আরো গাঢ় হ'ল, তার চোখের তারা আরো কালো হ'ল, তার চুলের বেণী আরো পুষ্ট হ'ল, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুডোল হ'ল, তার পায়ের চলন মুহূ হ'ল, তার মুখের হাসি আরো সলাজ হ'ল !—আর অত্যন্ত গোপনে প্রেমের দেবতা তার প্রাণের সিংহাসনের উপর বসে অর্থাভাবে বিক্রম করে নানারকম যাত্ৰ বিস্তার করতে লাগলেন ।

পার্বতী এখন তার মাকে সাহায্য করে, সেও এখন ষ্টেশনে গিয়ে নবাগত অতিথিদের ভার বহন করে নিয়ে যায়, তার নবজাগৃত শক্তিতে সে পার্কীয়া-পথের উপর দিয়ে অক্লেশে ছুটে চলে, কপালের উপর দিয়ে মুক্তাবিন্দুর মত ঘর্ম্মবিন্দু ঝড়ে পড়ে—সে ক্রক্ষেপও করে না ।

পূজার ছুটিতে বড় কাজের ভিড় ! কত দেশবিদেশের লোক আসে, কত রকম-বেবকমের পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র ভাষা ! এ সময়ে পার্কীতীদের আর অবসর থাকে না, সেই সকালে উঠে একটু রুটি খেয়ে বাহির হয় আর সারাদিনে আহার বিশ্রামের সময় থাকেনা । সে-বছর পার্কীতীর বাপমা মনে করেছিল—যেমন করে হ'ক পার্কীতীর বিয়ে দেবে, সে ত সহজ নয়—সে যে অনেক টাকার কাজ, তাই বাপমা আর মেয়ে মিলে উপার্জনের দিকে মন দিয়েছিল । কাজের আনন্দে পার্কীতী ভুলে গিয়েছিল—এ কিসের আয়োজন, তবু এতে সে আনন্দ প্ৰেত,—কি যেন হবে—যাতে নূতনত্ব আছে, আর ভাবনা চিন্তার অবসান আছে—যে ভাবনা এতদিন থেকে তার বাপমাকে পীড়া দিচ্ছে, এমন কি তার মনকে নিস্তার দেয়নি ।

সে দিন তার মার অন্ত্র, পার্কীতী একা গিয়েছিল ষ্টেশনে, গাড়ীর শব্দ, লোকজনের কোলাহল, যাত্রীদের ছড়াছড়ি, নবাগতদের ব্যাকুলতার মাঝে পার্কীতী একা যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকলে “কুলি” “কুলি” ! পার্কীতী ফিরে দেখলে একজন বাবু । সে উৎকল হ'য়ে তার ব্যাগটিকে কপালের উপর ঝুলিয়ে পিঠে ফেলে নিলে । যুবার বয়েস অল্প, প্রতাপদক্ষেপে সাদা পায়ের উপর ধূতির কৌচায় কালো পাড় ছিলে উঠছে, কালো কৌকড়া চুল গ্রীবার উপর ঝুলে পড়েছে, আর পার্কীতী তারই অনুসরণ করে চলেছে । তারপর পথ ফুরাল, পার্কীতী তার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল, বাবু কি মনে করে পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করে তার হাতে দিলে, চোখে তার করুণা ছাড়া আরো কিসের দীপ্তি ছিল—সে-কি রেহ—সে-কি আর কিছু ? পার্কীতী সেলাম করে পথে যেতে-যেতে কি ভেবে আর একবার ফিরে চাইলে, তারপর বিলম্ব না করে দ্রুতপায়ে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল ।

প্রায়ই পথে ঘাঁটে যুবার সঙ্গে দেখা, পার্কীতী ভুল করে অন্য পথে চলে যায়, এমন প্রায় নিতাই হ'তে লাগল । পার্কীতীর মনে যে যুবার কথা ভাবে—যুবাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়, একদিন যুবাকে না দেখলে কেন যে তার সারাদিনটা হুঁতরে যায়—কেন যে চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কেন যে সারারাত হঃস্বপ্নে ভরে ওঠে—তা সে নিজেই টের পায় না । সে নানা ছল করে দিনে পাঁচবার করে যুবার বাড়ীর সমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, কতবার সে বাড়ীর কটকের কাছে বিশ্রাম করতে বসে, এ জন্য তার কত কাজের ক্ষতি হয়, মার কাছে তিরস্কার পায় তবু সে একবার করে দেখবার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারে না । আবার সময়ে-সময়ে পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'বামাত্র মনে হয় একি তার মতিচ্ছন্ন হ'ল, তখন তাড়াতাড়ি না দেখার ছল করে লজ্জার মুখ আরক্ত করে কাজের পথে ছুটে যায় । বাড়ীতে গিয়েও তার মনে স্থিতি থাকে না, বাপমা কি টের পেরেছেন ? সে চোখ ভুলে তাঁদের মুখে চাহিতে পারে না, পেট ভরে খেতে পারে না, বাপমার কাছে আগের মত আশ্বাস করতে পারে না ।



টাকা ত জমেছে এখন পাত্র চাই যে. অন্ন ব্যয়স চাই, ভাল বাড়ী চাই, আবার ছ'পরসা যদি হাতে থাকে তবেই বাপনার সাধ পূর্ণ হয়। এমনট পাওয়া কি সোজা কথা? শেষে একজন জুটল, নেপালী এক বজমানের ছেলে কিন্তু ব্যয়স বড় বেশী—তা আর কি করা যায়! এমন পাত্র হাত ছাড়া করা উচিত নয়—বিশেষ মেয়ে যখন পরসার মুখ দেখবে। বাপমা মনে মনে কত ভুলনা-কল্লনা করতে লাগলেন, আর এদিকে পার্কতীর তরুণ-জীবনের তরুণ-জগত অন্ধকারে ডেয়ে আসতে লাগল। তার সঙ্গিনীরা তাকে দেখেই বিয়ের কথা নিয়ে ঠাট্টা করে, প্রাচীনরা উপদেশ দেয়—পার্কতী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল! এই বিপদ থেকে কেমন করে নিস্তার পাবে এই ভেবে-ভেবে সে আহারনিদ্রা ভাগ করলে! সে কেমন করেই বা তার মাকে জানায়, এ যে তার বাপমায়ের বড় আফ্লাদের কথা, চির কালের ইচ্ছা! সে আফ্লাদ সে ভেঙ্গে দেবে কেমন করে? আর কেন? নিজের মনেই ভাবে, যুবাকেই-বা কেমন করে জানাবে, কি বলবে সে? ভাবতে গিয়ে তার হৃদস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম করে, তার সমস্ত দেহের রক্ত, মুখে ছুটে এসে ফেটে বাহির হতে চায়। এষে অসম্ভব, যুবা-যে বাঙ্গালী, যুবা-যে বিদেশী! তবু জানি না কোন্ ছরাশায় সে যুবার বাড়ীর কাছেকাছে ফেরে, দূর থেকে যুবাকে দেখে, তার ইচ্ছা করে সে ছুটে গিয়ে বলে ওগো বিদেশী বঁশু, এ-তুমি কি করছ—আর-যে চরণে ঠাই না দিলে বাঁচিনে! কিন্তু মনের বাসনা—মনেই রয়ে যায়, কোথা থেকে পোড়া লজ্জা এসে মনটাকে ছম্ড়ে ফেলে, এমন একদিনের লজ্জার-মুখ সেই যুবাটি দেখে ফেললে। কি ভেবে তার পরদিন তার বাড়ী যাবার জন্ত বসলে। পার্কতীর সে-দিন সে-রাত যেন তার বুকের ভিতর ভাঙব নৃত্য বাধিয়ে দিলে, সে-যে কি বলবে, কেমন করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করবে, কেমন করে যে তার গোপনমনের অত্যন্ত গোপনপ্রেম নিবেদন করবে তাই হাজার-বার করে হাজার-রকমে ভেবে রাখতে লাগল! কিন্তু বলতে-যে হবেই সে নিশ্চয়, সময়ও বড় বেশী নাই, কাল বাদে পরন্তু তার আশীর্বাদ, সে হাত-খোঁড় করে বার বার বসলে “হে ঠাকুর এর মাঝে যেন পরিত্রাণের উপায় করে দিও।...তাকে যেন পাই!”

একটু বেলা হয়েছিল তখন, যুবা বারাণসী ইজিচম্বারে বসে থবরের কাগজ পড়ছিল, এমন সময় পার্কতী এসে সোপানের এক পাশে দাঁড়াল; যুবা, চোখের উপর থেকে থবরের কাগজ নামিয়ে পার্কতীকে বসতে বসলে। প্রথমেই যুবা কথা পাড়ল;—তার দারিদ্রের কথা, অন্যের কষ্ট কি বড় বেশী, কি করে তাদের রোজগার হয়—ইত্যাদি। পার্কতী মনেমনে হাজারবার ভাবলে তার মত ধনী আর কে আছে পৃথিবীতে, কিন্তু মুখে যুবার কথায় সায় দিয়ে গেল; সে কিছুতেই স্থির করতে পারলে না, এই কথার স্রোতকে সে কেমন করে ফেরাবে। কেবল মস্তমস্তের মত সে কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল, তার মনের গোহান কথা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার চিরঅভ্যস্ত দেহ, আজ প্রথম এই শীতে যেন জমে হিম হয়ে আসতে লাগল, তার সর্কশরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। তখন কুচি কুচি মেঘ. পাখাড়ের মাথায় জমা হচ্ছে—আর স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র কণেকণে স্নান আবার কণেকণে উজ্জ্বল হচ্ছে। আর পার্কতীর মন সন্কেহতে চলছে। সে দিন যুবার বুঝি অবসর ছিল, তাই একটি একটি কথা করে পার্কতীর নাম, তার বাপমায়ের কথা, তার শৈশবের কথা সবই ছেনে নিলে। শেষে হঠাৎ কি মনে করে বসলে “আচ্ছা পার্কতী, তুমি আমার কাছে চাকরী করবে?” পার্কতী ভাবলে সে বুঝি আর এ-সুখ সইতে পারে না, সুখেরও যে এত বড় আঘাত আছে তা সে জানত না, তার সর্কাজ সুখের আবেশে অবশ হয়ে আসতে লাগল! তবে ত সে প্রকাশ করে বলার দায় থেকে নিস্তার পেল, বাবু ত সবই বুঝেছেন, তাকে কাছে রেখে সেবা নেবেন এর চেয়ে সৌভাগ্য পার্কতীও কল্লনা করতে পারে নি ত! তখন সামনে নীল আকাশের কোলে মেঘে ঢাকা বরফের পাহাড়

যেযমুক হয়ে সকাল বেলায় রোদে জল-জল করে জল উঠেছে, পার্বতী সেই দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল “হ্যাঁ”। তখন যুবা বললে “তবে সময় ত বেশী নেই, পূজার ছুটি ত ফুরিয়েছে, কালই যে তাকে কলিকাতায় যেতে হবে, এর মাঝেই ত পাকা কথা দেওয়া চাই।” পার্বতী অনেকক্ষণ থেকে শুধু এইটুকু জানিয়ে গেল “গরীবের ভাগ্যে যদি চাকরী জুটেছে সে কি তা ছাড়তে পারে?”

এবার যে বিদায় নেবার পালা! এতদিনের সংস্রব ছেড়ে—এতদিনের স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে—চলে যাবার পালা! কিন্তু বাবামাকে কিছুতেই জানান হবে না, তাঁরা যে বাধা দেবেন। সে শুনেছিল কলিকাতায় পাহাড় নেই শুধু, ধানক্ষেত আর মাঠ, সে রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কেবলি ছবি আঁকতে লাগল সেখানে এই উচু-নীচু পাহাড় নেই, কেবল সমতল, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে খুঁড়িতে-নড়িতে মল বাজিয়ে নির্ঝরনী ছোটো না—সকালে উঠে বরফের পাহাড়ের এই রক্তকাস্তি দেখা যায় না, আর সেখানে বাপ নেই আর মা নেই, শুধু আছে সেইজন—যার জন্যে পার্বতীর মন এমন ব্যাকুল, এই সুখভ্রমের যুগপৎ-তরঙ্গ-দেলায় হাসি-অশ্রুর একত্র সমাবেশে পার্বতীর তরুণ মন দোল খেতে লাগল। তবু সে মন স্থির করেছিল যাবেই।—সে যে কথা দিয়েছে, আশা দিয়েছে,—আর পেয়েছে! রাত তখন অনেক, মাঝ আকাশে কৃষ্ণপঙ্কজের আধখানা চাঁদ, অশ্রুভরা চোখের জোরকরা হাসির মত হাসিছিল, আর পার্বতীর চিরকালের বন্ধন, তাকে বাড়ীর দিকে টেনে ধরছিল। মাবাপ তার ঘুমে অচেতন, পার্বতী আস্তে আস্তে মার বুকের কাছে একবার মাথা রাখলে, বাপের পায়ের কাছে একবার মাথা ঠেকালে, তারপর কিছু না নিয়ে সেই কনকনে শীতের মাঝে বেরিয়ে পড়ল। তারপর যখন সে যুবার সঙ্গেই গাড়ীতে উঠল, তখন কেবলি তার মনে হ’তে লাগল—পাহাড়ের কঠিন শীতল বকে যে এত মেহের উদ্ভাপ ছিল—তাত সে জানত না, তাই গাড়ী যেমন পাক খেয়ে-খেয়ে নামতে লাগল তার মনে হ’ল কে-যেন এতদিনের এক একটি বন্ধন তার বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, আর তার ছুই চোখের পাতা, অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠতে লাগল! তবু তার ভিতর থেকে তার মনে হ’তে লাগল এ কোন্ স্বপ্ন রাজ্যের দৃশ্য! সেই স্নান জ্যোৎস্নার আলোতে সাদা মেঘের গুপ, কালো পাহাড়ের বকে ঘুমিয়ে আছে, আর তারি আশেপাশে বড়-বড় লম্বা গাছগুলি সদাজাগ্রত গ্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা ছোটোছোটো ঝোরা, তরল রৌপ্য ঢেলে বয়ে যাচ্ছে!—পার্বতীর মনে হ’ল এ ত রেলগাড়ী নয়—এ যে স্বর্ণরথ, আর সে কোন্ এক অজানা রাজপুত্রের সঙ্গে কোন্ এক ‘সবপোয়েছের’ দেশে উড়ে চলেছে!

এত বড় সহর? এত গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম সে জন্মে দেখেনি! তবু তারি ভিতর থেকে পার্বতী কল্পনা করছিল ছোটো একটি নির্জন বাড়ী,—তারি ভিতরে নির্জন প্রেমে মগ্ন তারা দুটি প্রাণী! কিন্তু হঠাৎ তার স্নেহের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—যখন সে দেখলে দাসদাসীতে পূর্ণ মস্ত এক দ্বিতল বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল! সে যুবার পিছনে পিছনে নির্ঝাঁক হয়ে উপরে উঠে গেল! নানারকম আস্‌গাবে পরিপাটি করে সাজান শয়নকক্ষ; যুবার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীও সে ঘরে প্রবেশ করলে। একটি খাটের উপর একটি তরুণী শুয়ে, যুবা প্রায় ছুটে ছুটে গিয়ে তরুণীর ছুইহাত নিজের হাতের মাঝে তুলে নিয়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বললে “সুখা, কেমন আছ সুখা? তোমার অসুখ শুনে সেবার জন্যে এই দেখ একজন পাহাড়ী আয়া সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, ওরা অস্বরের মত ঝাটতে পারে, সারাদিন তোমার দেখতে পারবে। পার্বতী এই তো” বলে ফিরতেই যুবা দেখলে,—পার্বতী, মাটির উপর মুখ খুবের পড়ে আছে! ব্যাপার কি? মুখ যে একেবারে পাংশু—দেহ অসাড় অটোতন্য! যুবা তরুণীর কপালে হাত দিয়ে বললে “ভয় পেও না সুখা, ও কিছু না, ও ঝি—শিগ্গির এক ঘটি জল আন ত! ওরা নেপালী কিনা, পাহাড়ের ঠাণ্ডা থেকে এসে কল্‌কাতার গরমে ভিন্নি গিয়েছে!

## স্বরলিপি ।



আমায় ভাষের ভেলায় ভুবন-প্রোতে ভাসাও এবার ভাই !

এই ভয়ের বাধন চাইনে কখন, অকূলে কুল নাই বা পাই ।

আমায়,—নিয়ে চল জগত ছেড়ে ; সব কলরব শাস্ত করে

শূন্য হ'তে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—

জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত সীমার অন্ত নাই !

তোমায় আমায় খেলব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই ;

তাবের ভেলায় ভুবন প্রোতে ভাসাও এবার ভাই !

চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়ে—

মাটির মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয় ;

মহানন্দ মুক্ততাতে বিশ্ব ছাড়া বিশ্বাসেতে

মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই !

নতী খেটে দম যে ছোটো— ( এবার ) গতি কেটে মুক্তি চাই ।

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-প্রোতে ভাসাও এবার ভাই !

কথা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজামা, সরস্বতী । স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

সঙ্গীত-সজ্জের সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী ।

II সাঁ সঁসাঁ | ঝাঁ ঝাঁ সাঁ | না ননা | দা দা পা I  
আ মায় তা বে র তে লায় ভূ ব ন

I ঝাঝা পা | দা দা ঝা | গা গা | ঝা সা সা I  
প্রো. তে ভা সা ও এ বা র ভা ই

I সা সসা | গগা গা গগা | দা ঝা | দা না সঁসাঁ I  
এ ইভ য়েব বা ধন চা ই নে ক খন

I না সাঁ | ঝাঁ সাঁ সাঁ | না না | দা ঝা দা II  
অ কূ লে কূ ল না ই বা পা ই

- ২  
[সাঁ সঁসাঁ]  
(আ মায়) • ০ ১
- I ক্ষা দা | না -১ না | সাঁ ঋঁ | সাঁ না সাঁ I  
নি রে চ • ল জ গ ত ছে ড়ে
- ২ ৩ ০ ১
- I না সাঁ | না না দদা | দা ননা | না -১ না I  
স ব ক ল রব শা স্ত• ক • রে
- ২ ৩ ০ ১
- I দা দা | পা পা -ক্ষা | গা গগা | গগা গা -১ I  
শূ ন্য হ তে • শূ ন্যা• স্ত• রে •
- ২ ৩ ০ ১
- I পা ক্ষা | গগা -১ ঋা | ঋা -১ | সা -১ -১ I  
দি গ স্তে• • • দু • রে • •
- ২ ৩ ০ ১
- I না সা | গগা গা -১ | দা ক্ষদা | দা না সাঁ I  
জী ব স্ত• তা • স জী• ব যে থা
- ২ • ০ ১
- I সঁসাঁ গঁগাঁ | ঋঁ সাঁ সাঁ | না ননা | দা -ক্ষা দ  
প্রা• স্ত• সী মা র অ স্ত• না • ই
- I ক্ষা দদা | না -সাঁ সঁসাঁ | ঋঁ ঋঁসাঁ | না সাঁ -১ I  
তো মায় আ • মায় থে লব দে থা •
- ২ • ০ ১
- I না সঁ | ঋঁ সাঁ -১ | না দা | পা -১ ক্ষা I  
উ ড়ি রে প • রা ণ পো • ড়া
- ২ ৩ ০ ১
- I পা ক্ষা | গাঁ গাঁ গাঁ | গাঁ গঁগাঁ | দা ক্ষদা না I  
ছা ই ভা বে র ভে লায় ভু ব• ন
- ২ • ০ ১
- I ননা সাঁ | না সাঁ গাঁ | ঋঁ সঁসাঁ | না দক্ষা দা II  
প্রো• তে ভা সা ও এ বার ভা • • ই
- II সাঁ সাঁ | ঋঁ সাঁ -১ | না দা | দা পা -ক্ষা I  
চো থে চো থে • দু থে দু থে •

I আ পা | দা -১ আ | গা -১ | ঝা -১ সা I

হু দ রে . হু দ . . . র

২' ০ ১

I না সা | গা -১ গা | গা গা | আ দা না I

মা টি র . মা হু ব জা নে না

২' ০ ১

I সা' সা' | গা' -১ গা' | ঝা' ঝা' | না -দা আদা I

সে শ্রে মে . র প রি চ . . র

২' ০ ১

I না সা' | ঝা' -১ স'সা' | সা' স'সা' | আ সা' -১ I

ম হা ব . ছ . যু ক . জা তে .

২' ০ ১

I না স'সা' | না -১ দা | দা ননা | না- না- -১ I

বি ব . ছা . ডা বি ঝা . সে তে .

২' ০ ১

I আ আ | গা -১ গা | গা আ | দা না সা' I

ম হা প্রা . গে প্রা গ মি শা তে

I ননা স'সা' | গা' ঝা' সা' | না দদা | দা -আ দা I

ঝা . কুল ম র ম আ কুল তা . ই

২' ০ ১

I গা' গ'গা' | সা' দা -১ | আআ গা' | ঝা' সা' নননা I

দ জী . খে টে . দ ম বে ছো টে (এবার)

২' ০ ১

I সা' গ'গা' | ঝা' সা' -১ | না ননা | দা -আ দা I

গ জী . কে টে . যু ক্তি . চা . ই

২' ০ ১

I সা' স'সা' | ঝা' ঝা' সা' | না ননা | দা দা পা I

আ মায় তা বে র তে লায় ভু ব ন

২' ০ ১

I আআ পা | দা দা মা | গা গা | আ সা সা II II

খো . তে তা সা ও এ বা র তা ই

## সুন্দর ।

—:~:—

একদিন জীবন-প্রভাতে প্রথম তোমার মুহূর্তের জন্য দেখিরাছিলাম তাহার পরে সারা জীবন ধরিয়া তোমার ধরি ধরি করিয়াছি কিন্তু ধরিতে পারি নাই। সে দিন বসন্তকালের প্রভাত সময়ে জাগিয়া দেখি কোকিল দৈয়েল শ্যামা স্তমধুর স্বরে গান ধরিয়াছে, পূর্ব দিন উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া, উদ্যানে জাতিযুথিমল্লিকা গন্ধরাজ নাগেশ্বর গোলাপ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যায় তটিনীকূলে বেড়াইতে গিয়া দেখি, একখানি তরি ধীরে ধীরে ডাসিয়া যাইতেছে, আরোহী মধুরস্বরে বাঁশরীতে কি গান ধরিয়াছে, আকাশে দেববালারা এক এক করিয়া সন্ধ্যাধীপ আলিতে লাগিল। সেই দিন হইতে হে চিরসুন্দর তোমার চরণে জীবন উৎসর্গ হইয়াছি।

এই দেখ আমার বেশভূষা সুন্দর করিয়াছি তোমাকেই ধরিয়া রাখিবার জন্য। আমার শয়নগৃহের প্রাচীরে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি ফ্রেমে আঁটা কত ছবি টাঙ্গাইয়াছি। প্রকৃতির রম্যনিকেতন সমুদ্রকূলে পর্বতের পাদমূলে দেবমন্দির গড়িয়াছি তাহা স্বর্ণমণ্ডিত চূড়ার বিভূষিত করিয়াছি, মন্দির-গাত্রে কত লতাপাতা ফুল আঁকিয়াছি একদিকে বনের পাখী ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহারা তোমার খাঁচায় বসিয়া গান শোনায়ে, আবার আমি তাহাদের স্বরের অনুরোধে কত যত্ন গড়িয়া আমার স্থলিত স্বর মিলাইয়া তোমার গান শোনাই। প্রাতঃকালে বাগানের ফুল তুলিয়া, চন্দন ঘষিয়া, স্নগন্ধে তোমার পূজা করি;—আবার সন্ধ্যা ধূপধূনার গন্ধে মন্দির আমোদিত করিয়া তোমার আরতি করি। একদিকে স্নমিষ্ট স্নপক ফল দিয়া তোমার তৃপ্তসাধন করিতে যাই—আবার দধিভৃগু মধুমিষ্টার দিয়া তোমার ভোগ দেই। প্রকৃতি তোমার মধুর স্পর্শে মলয়ানিল বাজন করে, আমি তোমার সম্মুখে চামর ঢুলাই। কই তবু ত তোমার ধরিতে পারিলাম না। তোমার পাষণমূর্তি যে তেমনই থাকিল।

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর সুন্দর মূর্তি গড়িয়া দিল, সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর সুন্দর প্রতিমূর্তি আঁকিয়া দিল। তন্ময় হইয়া ভাবিতাম—আনন্দে মাঝে মাঝে হৃদয় ভরিয়া উঠিত কিন্তু তবুও কেমন অসম্পূর্ণতা ঠেকিত। এতে যে চেতনা নাই।

জীবনের পূর্বাঙ্কে এক বালিকার হৃদয় দেখিলাম ! জড়প্রকৃতিতে যাহা পাই নাই এই বালিকাতে তাহাই পাইলাম। জড়প্রকৃতিতে পাইয়াছিলাম রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এই বালিকা আমার শিখাইল—প্ৰীতি। সেইদিন হইতে আমার হৃদয় বুঝিল মানুষের হৃদয়েও সৌন্দর্য আছে। সেইদিন স্থলিত স্বরে গাহিয়া ছিলাম,—

হায়, পীরিতি না জানে যারা।

এ তিন ভুবনে, মানুষ জনমে

কি সুখে আছেয়ে তারা ॥

কিন্তু এই পীরিতি কি সকলেই জানে ?—

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে

পীরিতি সহজ কথা।

বিবিধের ফল নহে ত পীরিতি

নাহি মিলে যথা তথা ॥

কেন না,—

পীরিতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া  
পরেতে মিশিতে পারে ।  
পরকে আপন করিতে পারিলে  
পীরিতি মিলয়ে তারে  
ছই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও  
থাকিলে পীরিতি আশ ।  
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন  
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

এই পীরিতি হইতেই আমার হৃদয়ে দয়া প্রেম ভক্তি স্নেহের জন্ম । জীবনের মধ্যাহ্ন আসিতে না আসিতে বালিকা আমার জীবনাক্ষ হইতে চলিয়া গেলে এক ক্ষুদ্র শিশুর আবির্ভাব হইল । সে কি স্বর্গীয় সুষমা লইয়া আসিয়াছিল । ছুঁইতে ভয় হইত—পাছে আমার মলিন করস্পর্শে তাহার কোমল অঙ্গ মলিন হইয়া যায় । তাহার প্রাতি-অঙ্গ, হে চির স্নন্দর, তোমারই বিকাশ দেখিতাম । তাহার হাসিতে মুকুতা ঝরিত, আধ-আধ মধুর বাণীতে তোমারই সঙ্গীতের মুচ্ছনা শুনিতে পাইতাম । কিন্তু কেমন জড়প্রকৃতিতে তোমায় ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই—এখানেও তেমনই হইল—সে শিশুও আমার জীবনমধ্যাহ্নের শেষমুহূর্ত্তে কোথায় অহুত হইল ।

জীবনের অপরাহ্নে ভাব ও শব্দঝঙ্কার মিলাইয়া কবিতায় তোমার সৌন্দর্য্য খুঁজিতে লাগিলাম । তখন গাহিলাম;—

তুমি স্নন্দর তাই তোমারই বিশ্ব স্নন্দর শোভাময় ।

জীবনের স্নন্দর কাজগুলি গুছাইয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে লাগিলাম, লোকে তাহার নাম দিয়াছিল “সাহিত্য” ।

আজ মনে চাইতেছে মধুস্পর্শমলয়ানিলে তোমারই স্পর্শ অনুভব করি—তোমারই কোমল রাঙ্গা চরণ স্পর্শে সরোবরে রক্তকমল ফুটিয়া উঠে, তোমারই কোমল করস্পর্শে চম্পকগুলি ফুটে, তোমার অধরসুধাস্পর্শে গোলাপের এমন স্নন্দর শোভা, তোমার মধুবাবীর কণামাত্র শুনিয়া দৈয়েল, পাপিয়া, কোকিল, শামা, স্বরলহরীতে আকাশ মাতাইয়া তুলে । তোমারই অঙ্গের আভার ফুলের, পাখীর, সকাল সন্ধ্যায় আকাশের, অমন মনমাতানো বর্ণ, তোমারই নিঃশ্বাসের গন্ধের এক কণা পাইয়া ফুল অমন গন্ধে জগৎকে মাতাইয়া দেয় । তোমারই হৃদয়ের পার্শ্বে যুবক-যুবতীতে প্রেম, পিতামাতায় স্নেহ, সন্তানে ভক্তি, মানবে করুণার বিকাশ । তোমায় সর্বত্র তিল-তিল করিয়া দেখিতেছি—কিন্তু হৃদয়মন্দির আমার শূন্য । আমি মধুপের ন্যায় তিল-তিল করিয়া মধুসঞ্চয় করিয়াছি—কিন্তু মধুচক্রে আমার শূন্য । তোমায় হৃহর্ত্তের অধিক ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না । সাধ মিটিল না—এমনই করিয়া কত যুগ-যগান্তর কাটিয়া গিয়াছে কত-কত জন্ম বিফল হইয়াছে,—

জনম জনম হাম রূপ নেহারল

নধন না তিরপিত ভেল ।

সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল

ঐতিগণে পরশ ন গেল ॥

তাই অতৃপ্ত আকাজকা লইয়া তোমার জন্য ছুটিয়াছি । দোষ ত তোমারই,—ভূমিই ত—

অলপ বয়সে পীরিত করিয়া

রহিতে না দিলে ঘরে ।

হে চির সুন্দর, তোমার পাইবার জন্য কত বেদনা কত কষ্ট পাইয়াছি । কিঙ্ক—

কেহুত না কহেরে আওব তোৰ পিয়া ।

কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥

কাচার অভিশাপ আছে জানি না তাই এই জীবনসন্ধায় চিরবিবাহে আমার দিন কাটিতেছে । আজ চাহিয়া দেখি সুগাধবলিত মন্দির কালের প্রকোপে মগাবর্ণ, চিত্রগুলি মলিন, তোমার পূজায় পুষ্প শুষ্ক, স্বর্গীয় শিশু কাণের করাল ছায়ায় বিষন্ন কিংবা সংসারের প্রথর কিরণে শুষ্কপ্রায়, মানবের দয়ামায়া করুণা মেহপ্ৰীতির পরিবর্তে হিংসা ঘেব নিষ্ঠুরতা । যাহাকে দূর হইতে সুন্দর দেখিয়াছি নিকটে গিয়া দেখি—সৌন্দর্য্য কোথায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । সুন্দর শল্পনমাচ্ছন্ন প্রান্তর দূর হইতে কি মনোহর, নিকটে গিয়া দেখি কুৎসিত মৃত্তিকা ; কমলকানন স্নানোভিত সরোবরে নামিয়া দেখি পয়ের পাঁপড়ি ঝরিয়া পড়ে কিংবা আমার হস্তপদ জড়াইয়া যায়, জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় । হায় কেন বুঝিলাম না ইন্দ্রিয় আমার প্রবঞ্চনা করে নাই, লালসাই আমার সাধনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাই হে চিরসুন্দর, আমি দেখিয়াও তোমার দেখিলাম না—হাতের কাছে পাইয়াও তোমার একমুহূর্ত্ত কালও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না । এখন আমার ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে । প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর ত তোমায় অমুত্তব করিতে পারিতেছি না । আমার স্রাণ দৃষ্টিতে আর তোমায় ত দেখিতে পাইতেছি না । আমার আশাও বুঝি শেষ হইল,—

গমন অবধি তুমি ন ভেন বিশেষ

ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ ।

করহি মিলন রহ মুখ নাহি সুন্দর

জনি খিন দিবসক চন্দা ।

প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরয় নির

কমল গরত্র নকরন্দা ॥

তোমার,—

আসিবার আশে, লিখিছ দিবসে

খোয়াসু নখের ছন্দ ।

উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে

ছ আঁখি হইল অন্ধ ॥

হইলই বা চক্ষু অন্ধ, নাই বা দেখা দিলে । নয়নে দেখার আসে যার কি ! হে চিরসুন্দর, হে অন্তরের দেবতা,—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব,

শ্রেয়চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া

জ্বরে তুলিয়া লব ।



তাও কি বলিতে হয়,—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ ।  
 দেহ মন আজি তোহারে সঁপেছি  
 কুল শীল জাতি মান ॥ ( চণ্ডীদাস )  
 \* \* \*  
 বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব,  
 এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,  
 সেখানে তোমারে থোব ॥ ( জ্ঞানদাস )

হে সুন্দর—এই শেষ নিবেদন !

শ্রীরাখালরাজ রায় ।

## অপহৃত ।

—:~:—

কত না সুখমা ছিল প্রকৃতি-আননে !  
 শ্রাম-তরু-লতা-কুঞ্জে, কুসুম-কামনে,  
 নীলাকাশে, নীলজলে, নীল-নবঘনে,  
 সুনীলম শৈলমালা আকাশের সনে  
 যেথায় মিশিয়া আছে, চারু ইন্দ্রধনু  
 স্তবর্ণ-গরিমাময় স্তবিচিত্র তনু—  
 কত ছিল, সব সখি লইয়াছ তরি  
 কোন্ মায়া-মন্ত্র-বলে ?—হেন যাদুকরী  
 হেন মায়াবিনী তুমি কভু নাহি জানি !  
 ক্ষুদ্র ও ললাট, অই ক্ষুদ্র মুখখানি,  
 আরক্ত অধর-ওষ্ঠ শান্ত দু'নয়ন,  
 রাখিয়াছ ওরি মাঝে করিয়া গোপন  
 অনন্ত বিশ্বের হরি অনন্ত সুখমা !  
 ধন্য তব ইন্দ্রজাল অয়ি নিরুপমা !  
 তাই এ ধরণীতল বিরস মলিন,  
 শূন্য রিক্ত নিরন্তর আভরণহীন !  
 তাই তব আঁখি-কোণে চঞ্চল স্তহাসি  
 দেখায় সে পলে-পলে ইঙ্গিতে আভাসি  
 লুকান' বিশ্বের ধন সৌন্দর্যের রাশি ।

শ্রীকেন্দ্রলাল সাহা

## জাতি-ভ্রষ্টা

— ❦ —

( ১ )

সে ছিল ব্রাহ্মণ-কুমারী; বলা বাহুল্য পূর্বদ্বন্দের বহু পুণ্যবলে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছিল সে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে, নিকষ কুলীনের ঘরে। কিন্তু তার পুণ্যের কড়ি বোধহয়, নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ওই জন্মলাভ ব্যাপারেই, নৈলে কি ভূমিষ্ট হতে না হতেই পাপ-গ্রহ তার ভাগ্যকে অমন করে অধিকার করতে পারত ! জননী তার জন্ম দিয়েছিলেন, কোল দিতে পারেন নাই; সদ্যজাতাকে ধর্মীর বুকে ফেলে রেখেই ধর্মাত্ম্যগের তাগিত তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। যে চারটা দিন, জীবনমরণের সংগ্রামস্থলে অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন, তাতে আত্মজ্ঞা-শ্রোত প্রবল হলেও শক্তির প্রবাহ একবারেই ছিল না। দেহ রক্তহীন; কঙ্কালসার, সম্মান-স্বপ্নস্পর্শ-লোলুপ-বাহুর এমন বল ছিল না যে বক্ষের ধনকে বক্ষ-আশ্রয়ে বন্ধ করতে পারে ! মাতৃহে কি নিদারুণ নিষ্করণ অভিশাপ !—আপনার জনও তখন তাঁর নিকটে কেহ ছিল না ! বোগীর যথানাম ঔষধের ব্যবস্থা হলেও তাঁকে গৃহান্তরে নেবার ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব ছিল ! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সংসার প্রস্থিতিকে শয়ন-কক্ষে স্থানান্তরিত করে, জাতাশোচের জের সর্ব বস্তুতে সংক্রামিত করলে জাতিপাতের আর বাকী থাকে কি ! ব্রাহ্মণের প্রাণটা জাতিহীন হ'তে বিদ্রোহ হ'য়ে উঠলেও মন তাতে কিছুতেই সায় দিতে পেরেছিল না,—পল্লী-সমাজে একবারে হয়ে থাকবার সাহস তাঁর ছিল না; ফলে, স্বামীর প্রাণভরা সঙ্গহুত্বটি সত্ত্বেও, এক, সংস্কারের অত্যাচারে সাধ্বীকে শেষ মুহূর্ত্ত গণ্ডতে হয়েছিল, প্রায় নিঃসঙ্গ একা ! স্মৃতিকা-গৃহে সঙ্গী ছিল মাত্র তাঁর ধাত্রী,—তাঁর সমবয়সী একটি হাড়ীর-মেয়ে। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা, অদমা পিপাসায়, হাড়ীর মেয়ের হাতে জল পান না করেও অন্য উপায় আর তাঁর কি ছিল আতুরে নিয়ম নাস্তি ! ভগবান দিন দিলে, গম্ভীরানে সর্বশুদ্ধি,—পিপাসা প্রাবল্যে সে কণা তাঁর স্মরণে এসেছিল কি না সন্দেহ ! বোগীণী সঙ্গহুত্বের পূর্ণমুষ্টি দেখতে পেরেছিলেন, সেই নীচ জাতীয় রমণীতে।—বাছাকে তাঁর সে কত যত্নে কোলে ক'রে তাঁর রোগ-শয্যা পার্শ্বে বসে থাকত ! অত যন্ত্রণার মধ্যেও মাতা তাঁর প্রাণের ছালায় হতভাগীর কথা ভুলতে পারতেন না ! বার বার ফিরে ফিরতিনি ধাত্রীর ক্রোড়স্থিত কন্যাকে দেখতে; তাঁর নিস্ত্রস্ত নয়নজ্যোতি দীপ্ত হয়ে উঠত। কন্যার চিন্তায়—কন্যার ভবিষ্যৎ-আশ্রয়স্থল শূন্য দেখে হতাশায় মার প্রাণ কি যে করত; নিমজ্জিতের সমুৎপত্ত তৃণগাছটি অবলম্বনের মত, তিনি সেই নিস্তার নীচজাতীয়া রমণীটিকে আশ্রয় না করে পারেন নাই। ক্ষীণহস্তে তার হাতটি চেপে ধ'রে, অতিক্ষীণ স্পর্শ করণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ভোলার মা, ভুই আমার খুকুর মা,—তুই তাকে কোল দিয়েছস, চিরকাল কোলই রাখিস বোন্ !' তাঁর সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভোলার মা তাঁর শেষ অমুরোধ ফেলতে পেরেছিল না, মাতৃহীন মাতৃস্থান পূর্ণ করেছিল সেই। পিতার মনটা প্রথম প্রথম কেমন খুৎখুৎ করত, অবশেষে কিনা অস্ত্রাজের হ'তে ব্রাহ্মণের মেয়েটাকে এমনভাবে সমর্পণ করতে হ'ল ! উপায়ান্তর ছিল না; ভ্রগতলা শিশুকে মানুষ করা কি পুরুষের কাজ ! জীলোকহীন সংসার ! উচ্চ বংশীয়দের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, নিজ ইচ্ছায় যে তাঁর মেয়েটির লালনপালনের ভার নিতে ইচ্ছুক—পরের সম্মানের জন্য বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান সভ্যতার রীতি নয়; ব্রাহ্মণকে অগত্যা ব্রহ্মণ্যগর্ব খর্ব্ব করে হাড়িনীর হাতে সম্মানকে অর্পণ করে তুই হতে হয়েছিল ! যে বাই বলুক, সে ভার সে নেবার অযোগ্য ছিল না ! ঈকলে অপরা

মেয়েটাকে মাথেকো রাক্ষসী নামে অভিহিত করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ও নীভংস-করণার উদ্বেক করতে চেষ্টা করলেও সেই অমৃত্যুর অন্তর কেবল প্রতিনিয়ত হতভাগীর জন্য করুণায় কাঁদতে থাকত। আহা, হতভাগী, একটা দিনের জন্যেও মার কোল পায়নি, ওর যে কি কষ্ট অন্যে কি বুঝবে! বুকের মধ্যে থেকে নিতে তার প্রবল ইচ্ছা হ'ত। কচি মুখে চুষনের পর চুষন দিয়েও সে তৃপ্ত হ'তে পারত না। হায়! সে কি তার মার মত যত্ন করতে পারবে! বামুনের মেয়ে, কোন্ পাপ তার কোলে ঠাঁই পেয়েছে। অপরাধ যেন আর বাড়িও না ঠাকুর। মেয়ের দুঃদৃষ্টের কথা স্মরণে এসে মনটা তার যে কি হয়ে যেত! কেবলি তার মনে হ'ত—তার ক্রটিতে ও যেন আর কষ্ট না পায়!

দিন দিন করে বৎসরও পোরিয়ে গেল; খুঁকী তখন হামা নিতে শিখিলে, ছ এক পা হাঁটতে পারে, এটা ওটা টেনে-হেঁচড়ে স্থানভ্রষ্ট, নষ্ট করে,—কতই না তাতে আমোদ! হাড়িনী, গুকার সে সকল কার্যে অদ্বুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেত, হাড়ীকে আনন্দ আতিশয্যে সে, সে সংবাদ না দিয়ে থাকতে পরিত না,—হাড়ি মাথা নেড়ে বলত “হবে না বামুনের মেয়ে—বুজি কি হবে ওর আমাদের মত!” সে মন্তব্যে ভোলার মার প্রাণে যেন তুষ্টি দিত না। ‘বামুনের মেয়ে’—কথাটা যেন পর পর! সত্যিও যে পেরে,—আকাশের চাঁদ ওয়ে,—সে আত্মকুড়ের হাড়ি! না, না—মন বলে—‘না’—তারা যে মানেয়ে—এক। হাড়িনী খেতে বসতে কখন হামা দিয়ে এসে দুটু মেয়ে পাতেই ভাত তুলে মুখে দিত! ‘আঁ! করে কি! হাড়ীর ভাত! ভোলার মা চমকে উঠত,—রাঙ্কুসি!—দুধ খেয়ে পেট ভরে না! এঁটো হাতেই, শুনা দিতে, তাকে বুকের কাছে তুলে নিত! বুকের ধন বুকে তুলে নিলে অন্য কথা কি আর মনে থাকে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, ছোট বড়, জাতি-অভিমান সব অতল স্নেহসাগরে ডুবে যায়; মাতৃস্নেহ কি কখন ছোট-বড় জাতিভেদে ভিন্ন! ভোলার মার মনে হ'ত খুঁকী যে তারি। সোচাগভরে আদর করে সে তাকে কত কি বলে ডাকত “চুখু-চুখি-চুখিনীর ধন চুখিনি,—চুলু-চুলু, চুলুমপি-চুলাপি!”

চুলাপীর বাপের বাড়ীর পাশেই ছিল হাড়ীর বাড়ী। বন্যোবস্তুর সর্ভে হাড়িনীর, বামুনবাড়ী থেকেই মেরেকে মাছুষ কন্সবার কথা, কার্যে কিন্তু চলেছিল ঠিক তার বিপরীত। অষ্ট প্রহরের সাড়ে সাত প্রহর চুলাপী কাটাত হাড়ী-বাড়ীতে। অত বাধাবাধির মধ্যে হাড়িনী ধরা দিত না। মেয়েও একদণ্ড তার কাছ ছাড়া হ'ত না। পিতা তাতে মনে ননে কষ্ট হলেও স্পষ্ট করে প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পেতেন না; কত্নার জীবনমরণ তখন ভোলার মার অগ্রগুণিগ্রহের উপর,—আর অমন করে মার মত স্নেহে মেয়েকে যে লাগনপালন করছে, তাকে কোন্ মুখে ও-কথা বলা যায়!

অজ্ঞান, অবোধ পাঁচ বৎসরের কম বয়সের দুঃখপোষা শিশু;—তার আবার পাপ পুণ্য কি! শাস্ত্রের বিধিও ছাই! নিরুপায় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের জাতিত্ব-গর্ব অদ্বুত রাখতে, মনে মনে অমন শত বৃক্কর অবতারণা করতেন,—জুগোষ হলেই শাস্ত্রের বিধি সর্বাধ্যায় আবৃত্তি করে, কত্না সম্বন্ধে তাঁর বিধিব্যবস্থার যথাশাস্ত্র শুদ্ধতার সাফাই পাইতেন! কিন্তু ক্রমেই কথার প্রাকৃত ব্যাপারটা চাপা দেওয়া তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠছিল, কারণ মেরেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পাঁচ বৎসর অতিক্রম করে আরও এক ছ' করে ন' দশে উপনীত হলেও, তার বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শাস্ত্রীয় বিধি মান্য করে চলবার প্রবৃত্তি তাতে একটুও প্রকাশ পেল না! বয়সের কুলনায় তার বুদ্ধি-বৃত্তি অনেকপাশি বেগী বলেই মনে হ'ত,—সংসারের কার্যে, পিতার সেবাক্ষেত্রে, বাধ্যতার সেবেকরণ কতই দেখাত, শীততার সঙ্গে সেগুলি যেননা সঙ্গায় করত তা ও-বয়সী মেয়ের পক্ষে অতি বুদ্ধির পরিচয় হলেও, অন্তরঙ্গ আতিগতগৌরবে সে যে কত উচ্চে তা হাবা বেয়ে বুঝে নিতে তখনও শিখতে পারলে না।

হায়, মোহান্ন জীব, মায়ায় যে দৃষ্টিহারী—তার প্রকৃত বস্তুজ্ঞান কবে হবে,—সে সব বুঝে, বুঝতে চাইত না কেবল হাড়িনীকে হাড়িনীর ভাবে,—তার সমস্ত গুণ, সমগ্র ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল হৃৎহৃদয় মায়া—অন্ত্যজ্ঞার সংসর্গে বিরক্তি আসা যে স্থলে উচিত ছিল, সেখানে তার কোন্ পাশে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার সঙ্গ-অমুরক্তি! সে পিতার সন্ধ্যা আত্মিক, পূজাপ্রণালীকে ভক্তিভরে মান্য করে এসেছে, সে প্রয়োজন প্রকরণে উপকরণ আয়োজনে আরও কার্যো প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধিবাবস্থাকে সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রেখে পিতার প্রীতি উৎপাদন করেছে, সে কেবল মান্য করে চলতে পারেনি—মাকে তার দূরে রাখবার বেলায়! পিতার তুষ্টির জন্য, হাড়ীর বাড়ী হতে ঘুরে এসে স্নান পর্যন্ত করেছে,—সে স্নানে তার দেহ শুচি বা যাই হ'ক, মন তার তাতে পবিত্র করতে পারে নাই; আর বান্ধু তার মনে হ'ত—কি জন্যে তার সে ছাই স্নান—শুচির চেষ্টা তার বৃথা—হাড়ীর-সংস্পর্শ-অশুচি যদি তার স্নানে যায়, তবে তার চেয়ে শুচির মিথ্যা অভিনয় আর কি হতে পারে! যে দেহের প্রতি অগুণরমাণু অন্ত্যজ্ঞার বক্ষরক্তে,—হাড়িনীর পৌষে যে দেহ পুষ্ট,—যার অঙ্কে স্থান পেয়ে তার জীবন—স্পর্শ যার অমৃত হতেও অমৃত,—তার সংস্পর্শে যে অপবিত্রতা তার কি শুচি স্নানে! জাত্যাভিমানের আবরণে তা' লৌকিকভাবে ঢাকা পরতে পারে—কিন্তু দেহ মনে মিশে গিয়েছে যা—তা দেহ থাকতে কি করে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলবে! অতটুকু মেয়ে এত কথা চুনিয়া চুনিয়া ভাবতে পারত না,—নিজের মনের ভাব তার কাছে সপ্রকাশ হয়ে দেখা দিত না সত্য কিন্তু তার অশোভাস্থিতে ওরই প্রতিধ্বনি হ'ত! শুচি অশুচির কথা ভাবতে তার মন কেমন অবশ হয়ে আসত,—পিতাকে সন্তুষ্ট করতে সে সনস্তই করতে রাজি ছিল কিন্তু তার কেন যেন মনে হত—সত্যের নামে মিথ্যার এক হাস্যকর অথচ মুক অভিনয়! মন তার হৃৎকোষে কাণায়-কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠত—আহা! বাবার তার সে বিনে আর কে আছে,—হতভাগী সে—ভাগ্য তার কেন অমন হ'ল! ভাগ্যবতী সে—অমন মমতার অফুরন্ত উৎস,—হৃৎমার কোল পেয়েছিল বলে। কি প্রাণটা তার,—ভদ্রলোকে যে কাজে মাথা দিতে পারে নাই সে নিম্পর নীচজাতি হয়, জননীর অধিক কষ্ট সয়ে তা সুনস্পর করেছে। সে হ'ক নাচ, যে নীচই কত উচ্চ। তাকে কে তুলনায় আনতে পারে—তাকে তাগ করে পিতাকে বা তুষ্ট করে কোন্ প্রাণে! গোলমালে, এলোমেলোভাবে প্রাণটা তার তোলপাড় হতে থাকত—অতটুকু মেয়ের কি সাধি সে মন বুঝে কাজ করে—কেবলি তার চোখ ফেটে কল বেরোতে চাইত—অথচ ঐ বয়সেও তাকে চেষ্টা করে সে ভাব গোপন করতে শিখতে হয়েছিল! হৃৎ তার কিনারা পেত না, যখন তার সকল হৃৎখের শান্তিহীন ও উন্টো বুঝে, ভিন্ন ভাবই প্রকাশ করত। হৃৎমা, তার ধরণ ধারণ হাবভাব দেখে বলত—“ছি! ছলু! এখনো কি ছেলে মানুষ আছিস—এখন ত সব বুঝতে হয়—বামনের মেয়ে তুই—তোর কি আর এখন এ সব সাজে!” সাজে না কি? মার কাছে স্নেহের আধিকার! হায় সংসার! এতই কঠোর—এতই হৃৎকোষ তুই—স্নেহ দিয়ে আণ দিয়েছে যে সেও স্নেহের দাবি বুঝে না কেন! সত্যই বুঝে না—সংসারাজ্ঞা ভাবতে পারে না কোনটি সত্য কোনটি অনিত্য! বড় কষ্ট!—বজ্রের সমান, হৃৎমার আভ্যোগ তার প্রাণে আঘাত করত। রাগে ক্ষোভে বলতে ইচ্ছা হ'ত “বামুন নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব।” সংসারে যে ধুয়েই পবিত্র হতে হয়, বড় হৃৎখে তাকে তা বুঝতে হয়েছিল, ক্ষোভে তাকে আরও উন্মত্ত করত। রাগে অভিমানে সে আর ঠিক থাকতে পারত না—হৃৎমার সঙ্গে কথা বন্ধ করত—এক বেলা ক'টা ঘণ্টা—শত যুগের কষ্ট সয়েও হৃৎমার বাড়ী যেত না, তাতেও কি রেহাই ছিল! অন্তর্দৃষ্টিহীন ‘হেড়েনী!’ তাকে না দেখে পাগলের মত হয়ে ছুটে আসত—বুঝতে; কত সোহাগ জানাত, ভাঙেও মন গলে না দেখে চোখের জলে গুণ্ডা সাসিয়ে সব মান অভিমান ভাসিয়ে দিত। অত কি সওয়া যায়! যার একবিন্দু অশ্রুতে বিশ্বের জমাট অশ্রু, কোন্ প্রাণে তা দেখে সে স্থির থাকতে পারে—সব ভুলে গিয়ে

সে দুধমার গলা, দু বছরের মেয়ের মত জড়িয়ে ধরে যে পাপ নিরাকরণের জন্যে এত;—তাহাই আবার করে বসত !

( ২ )

সব সমস্তার সাময়িক সমাধান হয়ে গিয়েছিল, ছলুর বিবাহে। যেটার লক্ষ্য রেখে, যার অন্তরায় ভেবে, পিতা, আচার-সনসার অত উতলা হতেন, সে উৎকর্ষার শেষ হয়ে গিয়েছিল মনোমত ঘরে মেয়ের বিবাহে, কণীয়া বরণীয় ঘরে বরে, সূর্যস্ব পণ করেও মেয়ে দিয়ে তিনি হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলেন। ভোলার-মারও আনন্দের অবধি ছিল না। ও ভয়টা কি তারই কন ছিল! পাছে তার সংস্পর্শ-সম্বন্ধ মেয়ের ভবিষ্যৎ-সুখের বাধা হয়, একেই গৃহিনীহীন সংসারেও মেয়ে, তাতে যদি আবার রটে—ছোট লোকের সংস্পর্শ এসে, মেয়ের ভ্রোচিহ্নিত সকল গুণের অসম্ভব অবনতি ঘটেছে,—তবেই মেয়ের ভাল বিয়ে হয়েছে আর কি! সে তাই ছলুকে ইদানীং একটু দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করত। আজীবন ভদ্র সংসারের অতি নিকটে থেকে, সে ভদ্রবরের আচারআচরণ সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তাই সম্বল করে, সে মেয়েকে ভদ্রবরের মত কাজকর্মে সুনিপুণ করে তুলতে চেষ্টা করেছে; ছলুর বিবাহে সেও সোচ্চারিত নিঃশ্বাস ফেলে বৈচেছিল; যখন সে শুনেছিল, সংসারের কাজ কর্মের ছলু শগুরঘরে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে, তখন তার আনন্দগর্ভের সীমা ছিল না,—সে সর্ববিয়ে নিজে কৃতার্থ মনে করেছিল! এ বিবাহের মূলে তার চিন্তা ছিল অনেকখানি; প্রকৃত পক্ষে বলতে হলে, সেই ছিল এ বিশ্বের ঘটকী। বরের বাড়ীর পাশেই তার বোন-ঝির বাড়ী, তারা ওদের নিত্যস্থ অল্পগত প্রজা। দিনরাত ডাকেহীকে সকল কাজে সুনিববাড়ী, তাদের গতায়ত,—একবাড়ীর লোকের মত! ভোলার-মা বোনহিকে দেখতে কতবার ওখানে গিয়েছে; সে বিধবা হলে—তাকে তথায় একটা মাস কাটাতে হয়েছিল; সেই সময় বোন-ঝির মুনিববাড়ীর স্বপ্ন সমৃদ্ধি আচারআচরণ দেখে মনে মনে বাড়ীর বড় ছেলেটির সঙ্গে ছলুর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছিল। সংসারে শগুরশাওড়ী ছিল না বটে, কিন্তু ওবাড়ীর ছেলে ছটির প্রশংসা দশের মুখে,—মা না থাক, আছেন ছেলের পিসী, বুড়ী ভালমন্দে বেশ মাছুষ—এমন সংসারে মেয়ে দিতে কার অসাধ! সে মূলে লক্ষ্য রেখে মেয়ের অপূর্ণ রূপগুণের কথা সুপ্রচার করতে কম করে নাই, তার খুব বিশ্বাস ছিল,—যে ছলুকে একবার দেখবে—অপছন্দ করতে পারবে কোন্ চোখে! কার্যেও ঘটেছিল তাই।

ছলুর সংসার সুখের সংসার, অভাব বলতে কিছু ছিল না। ছলুর দেবর তার সমবয়সী, বৌদি বলতে, শুই কর দিনেই, সে অস্থির হত, ছলুরও তাকে বড় ভাললাগত—ছুটি যেন ভাইবোন—জানকীর পেছনে এ-কালের লক্ষণের মত! হাসিঠাট্টায় সংসারের কাজকর্মে সে বৌদির সাহায্য করে কৃতার্থ হতে চাইত। ছলু কত বিবেচ করত—কিন্তু সে কথা শোনে কে! পিসী-শাওড়ী, বোমার কাজকর্মের খুব পিয়ার করলেও, দেবরের সঙ্গে অত মেশামেশিটা আদবেই পছন্দ করতেন না; ছেলেটা সব বিষয়ে ভাল হলেও বড় তর্কিক,—অনাচারী—বামুনের ছেলে হয়েও হিঁদ্র আচারবিচার তেমন মেনে চলতে চায় না; তার কথা মত বোমাটা চলেই হয়েছে আর কি! এর মধ্যেই ও সুবির মেয়েটাকে জাতে তুলে নিয়েছে যেন। সুবি হেড়েনীটা নিজে ত অমন নয়, দেব স্বিজে বেশ ভক্তি আছে; আর ওর মেয়েটা হয়েছে তেমনি টিট! প্রকাশ ছোঁড়াটাই ত তাকে নাই দিয়ে অমন করে তুলেছে, ছোটলোকের মেয়ে,—তাকে অত ‘আল্লাদ’ দিলে মাথার উঠবে না ত কি? যখন তখন ছোঁরামাড়া, কটিনটি—সাত বছরের মেয়ে তারিখা ঘোব কি,—প্রকাশটা ছুঁপাতা ইংরেজী পড়ে বা হয়েছে! আজকালকার ছেলে; সেকেন্দে

বুড়ী হাড়ে হাড়ে তার বাবুজির চট্টলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করতেন না ; অথচ তার অহিন্দু আচার তার পক্ষে সহ্য করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। ওর যা ইচ্ছা করুকগে—বৌটাকে কোন ছুতায় উপদেশগুলো কিছু মিঠকড়া বলবার প্রলোভন বুড়ী কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছিলেন না কিন্তু ছলু তাঁকে সে সুযোগ একেবারেই দেয় নাট। সংসারের কাজ কর্ম সে নিজেই দেখে শুনে এমন সুনিপুণভাবে করে যেত, তার চলাফেরার মধ্যে এমন একটা সহজ সংযত ভাব ছিল, যা দেখে অন্য কথা মনে জাগা অসম্ভব ছিল ; সে লোকের মানাই উদ্রেক করেছে—মানাহীন করে নাই !

যাই হ'ক একদিন বুড়ীর সন্দেহ সত্যই মূর্ত হয়ে উঠেছিল ; বোনাটি এমন একটা কাজ করে বসলেন, যা একটা নদশাশুর মেয়েও করতে বিধা বোধ করত। বোনা কিনা সুবির ঐ মেয়েটাকে ছোঁয়ানাড়া করে নিজ হাতে চুল বেঁধে দিতে পারে ! বাবুজির-বাসা চুলগুলোয় আধ শিশি গুগন্ধি তেল ঢেলে, নিজের চিকুণীতে আঁচড়ে, নিজের ডাড়ির ফিতেটা দিয়ে ঘোঁপা বেঁধে দিয়েছে,—এও কি বামনের মেয়ে পারে—একটু ঘেমা পিড়ি নাই বাপু, এবাড়ীর মেয়ে হ'লে কি পারত ! এও বোধহয় ঐ পাপাশুর পরামর্শে, বোধহয় কেন,—নিশ্চয়ই ! সে, হাজার হ'ক, পুরুষ মানুষ, সে যা করে তাই সাজে, বোনা কেন তার কথা শুন্তে গেল ! নতুন বৌ তার একি ব্যবহার ! জিজ্ঞেস করলে কিনা বলে “না, ও কেন বলবে, আমি নিজের মনেই করেছি,—অতশত বুঝতে পারিনি পিসিমা, মেয়েটার একডালি চুল এলোমেলো আঁধিসাঁদি হয়ে ছিল, কেন যেন মনে হল ওর চুলটা বেঁধে দি, ওকে ছুলে যে দেব হবে সে মনে আসেনি পিসিমা ।”

সত্যি ওর মুগের দিকে চাইলে এর কপা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, হাবা মেয়ে, ওকে নিয়ে বামনের সংসার কি করে চলবে ! হাড়িনীর কোলে মানুষ চরেছ যে তার কি আর বাছবিচার জ্ঞান থাকে !”

সে কথা শুনে ছললীর চোখে জল আসে,—হার ! কোন পথে চলবে সে। সত্য ত হাড়িনীকে সে কি করে দূর রাখবে,—হাড়িনী যে তার প্রাণে দেবী হয়ে জাগ্রত রয়েছে ! তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত অমন কাজ আর সে কখন করবে না !

কাজে আবার কখন সে পিসিমার অপচন্দ অহিভ্রান্তীতে গিয়ে পৌঁছত, সে নিজেই জানতে পারত না। সুবির দুঃস্বপ্ন, ওর মেয়েটার চপলতা, সকলের উপর তার দেবরের মতবাদ তাকে তোলপাড় করে দিশাহারা করে দিত ! তার ত প্রাণপণ চেষ্টাই ছিল—যাতে অন্যে হুঃখ পায় এমন কাজ কখন সে করবে না, কিন্তু দেবর তার জোর করে বলত, না বৌদি,—সংসারে কোন্ কাজ বাথা না দিয়ে হয়েছে,—সোচ্ছা ভাবে চলতে হলেই এক জায়গায় না এক জায়গায় বাথা এসে দাঁড়াবেই—তাকে অতিক্রম করতে হ'লে বাথা না দিয়ে আর উপায় কি ? থাকে সত্য বলে জেনেছি, তার প্রতিষ্ঠা করতে হবেই,—অন্যের চাঞ্চের কথা ত দূরের আশ্র-নিগ্রহ করতে হয় যদি তাও শ্রেয় ! নৈতিক-জগত ও সমাজে সংঘর্ষটা কোথায়, তাদের মধ্যে কোথায় বিরোধ, কোথায় মিলন, ছলু বুঝবে কি করে,—সে ত আজীবন নৈতিক-আচারনিয়মকে মান্য করে এসেছে ; আবার দেবরের উদার ছকুলহীন মতগুলোতেও যে সে তারই প্রাণের কথা খুঁজে পায় ! মন বলে এক, প্রাণ প্রার্থনা করে অন্য—ছলু পথের মাঝে শুদ্ধিত করে দাঁড়ায় ! গম্ভীর পথ কোন্টি !

এক দিন সুবির বড় জ্বর, বিধবাকে দেখবার মত তার আর কে আছে ? সেই সাত বৎসরের মেয়েটি মাত্র, কোলে একটি দেড় বছরের থোকা ; থোকাটার সে দিন কি কষ্ট ; মা-টা প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, ছেলেটা পড়ে পড়ে কাঁদছে—তার সাতবছরের বোনের মাথা কি তাকে সামলে উঠতে পারে ! ছললী তার অবস্থা দেখে

আর ঠিক থাকতে পারল না,—ছেলেটাকে কখন কোলে তুলে নিয়েছিল! সূর্যের পাশে বসে মাথা টিপে দিচ্ছিল। পিসিমা সে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে যখন দেখলেন ছেলের কাণ্ড, তাঁর বিষ্ময়ের সীমা রটল না,—হাঁ, একটু জলটল দিতে হয়...দূরে থেকে দাও,—চাড়ী, ডোম, চণ্ডালে আর তফাত কি—একবারে তার ছেঁড়া কাঁথায় উঠে বসা হয়েছে! জাত আর রাখলে না বোমা!”

পিসিমার গলা শুনে প্রভাত এসে উপস্থিত হ’ল। সে বলে “কিসে জাত থাকল না পিসিমা।” পিসিমা তাকে ভয়ই করতেন, বেশী কিছু বললেন না,—যাবার মুখে, ছোট্ট একটা মস্তকা প্রকাশ করে গেলেন! “বলতে ভয় হয় বাপু, তোদের যা ইচ্ছে করবে যা—আমার কি—বিধবা মানুষ, বোমা হাবিধা খরে যায় তাই বলতে হয়; তা না হয়, ও ওঘরের কোন কাজ বা নাই করলে!”

প্রকাশ হেসে বলে “তা’ হলে বৌদি একটা কাজে ছুটি পেনে,—উঠলে কেন—ছুটির সময়টা বেচারীর কাছে বসে থাকলে অনেক কাজ হবে।”

হুলালী মনে যথেষ্ট অশোয়াস্তি অনুভব করছিল। পিসিমা রাগ করে গেলেন! হুলালী বলে, “ঠাকুর পো তুমি না হয় খোকাটাকে একটু ধর, যদি কোন কাজ থাকে সেয়ে আসি,—পিসিমা অবিধা কোন দরকারের জন্যেই আমার খোঁজ করছিলেন!”

প্রকাশ বলে “তা হচ্ছে না বৌঠান! তোমাকে পিসিমা একঘরে করেছেন, এ ঘর বিনে তোমার আর আপাততঃ অন্যঘরে কাজ দেখা যাচ্ছে না,—ঘোড়ার কাজ যদি মেড়াকে দিয়ে চলত তবে আর কথা ছিল কি—সূচ ও চালনী এক গোত্র হলেও কাজ যে তাদের ভিন্ন—ছেলে রাখা আমাদের কাজ নয়, মার কাজ মার জাতেই করতে পারে, ছকুম কর, আর যা করতে হয় করি!”

হলু ক্ষুরিত অধরে বলে “মার জাত হয়েই ত যত অপরাধ হয়েছে তাই।”

সে কণ্ঠে এমন একটা করুণামিশ্রিত অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল যার বলেই প্রকাশের প্রাণে বৌঠানের মনের ভাব স্পষ্ট হয়ে দেখাছিল! সে বলে “সত্যিই বৌঠান! পুরুষের স্বাধীনতার সঙ্গে মেয়ের প্রাণটা যদি থাকত তবে আর সংসারের আবিলা রইত কি! বন্ধনমুক্ত ঘোড়ার মত আমরা, আমাদের মনের বেগ সংযত করতে না পেরে কেবলি পথে অপথে ছুটাছুটি করে অথবা নিজ শক্তির ক্ষয় করি, নিজেরাও ক্লান্ত হচ্ছি, আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যাদের তাদেরও হয়রান করতে কম করি না, তোমাদের মত ধৈর্যের বল—সংয়ের লাগাম আমাদের থাকত যদি তবে বলো, কাজ হ’ত কত, তোমরা টেনে আছ বলেই আমরা একভাবে টেকে আছি!”

হলু সত্যিই এবার হেসে ফেলে, “বলেছ বেশ—তোমার কেবল কথায় কথায় বক্তৃতা;—শুন্তেও আমার বড় ভাল লাগে—কিন্তু তাই, সে টানটায় ধরা দিতে তবে যে বড় চাও না।”

“ওই ত দোষ তোমার বৌঠান,—বাস্তবিকত কথা এনে পাড় বড়,—সকল কাজেরই যোগ্য অযোগ্য আছে,—এই ধর না,—এই খোকাটাকে নিতেই আপত্তি করছিলাম—ও তোমার কোলে কেমন স্থিতির হয়ে আছে দেখ!”

হলুর প্রাণে সে কথায় মেহরস ঢেলে দিল, সে খোকাকে বুকে চেপে ধরে বলে “আমি তবে ওকে নিয়ে একটু আসি ঠাকুর পো—ওকে ত একটু দুষ খাওয়াতে হবে; মেঘটারও ভাতটাত কিছু চাই ত! ওবে বেশী রাত হলে ঘুমিয়ে পড়বে! সূর্যের মেয়েকে বলে “ললি টেপু আমার, তুই ছোট বাবুর কাছে থাক—আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।”

পথে বেড়িয়েই তার মনে হল—তাইত পিসিমা অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন,—হাড়ির ঘরে ভাত নিয়ে আসলে কিবা ভাবেন! ডুখ দিলে সুস্থ হই যদি, তাই না হয় করলেমাকস্থ তাতেও তাঁর মনের খুঁৎখুঁতিনি যাবে কি? এমন অবস্থায় ওদের ফেলেই বা থাকা যায় কি করে।”

চক্ষে তার তখন আনন্দ নিভে গিয়েছিল—পরানন্দে,—প্রেমে তার প্রাণ তখন পূর্ণ—সে চালিত পুত্রলিকার মত চলেছিল,—প্রাণের কথাটাই কানে মনে শুনতে পাচ্ছিল—খাণ্ডুড়ীর ভয়—পিসিমার কথা সে প্রবাহে ডুবে গিয়েছিল যেন, তার বারবার মনে হচ্ছিল—মানে বা অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে দ্বার, সে-পাপের ভয় ক’রে, কেন সে-যে পাপের নিরাকরণ হয় না সেই মহাপাপে ডুববে!

ভয়ে ভয়ে সে খোকাকে কোলে করে বাড়ী ঢুকছিল, ভয়ে ভয়েই বলি নিজের সুস্থস্থ আনন্দনিরানন্দের ভাব সে হারিয়ে ফেলেছিল—কেবল মনে হচ্ছিল তার, পিসিমার কথা—ছেলেটাকে কোলে দেখে পাছে তিনি বাথা পান! অবোধ শিশু বৃকে তার মুখ লুকিয়ে, হাত পা নেড়ে চেড়ে খলখল করে হেসে সারা হচ্ছিল, কি আনন্দ! ‘মার বৃকের ধন—মা তোর আজ পড়ে—কে তোকে কোল দেবে বাছা!’ আর কি দ্বিধা থাকে?—পরকীয়া রসে যে মন তার মজেছে!

স্বামী ঘরের রোয়াকে বসে ছিলেন, হলু তাকে লক্ষ্য করে নি; তিনি হেসে বলেন ‘বেশ’ ত সেজেছে—তাই পিসিমা বলছিলেন তোমার জাত নাই!”

ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে, হলু আড়ালে দাঁড়িয়ে বলেন “ওর মার যে বড় অসুখ—ওদের রাখে কে। ছোট মেয়েটা কি পারে!”

স্বামী বলেন, ‘তাতে তোমার দোষ দিচ্ছে কে! আমিত যেতে মানা করি নি!’

হলু স্বামীর চরণে মনে মনে শত সহস্র প্রণাম জানাল! চক্ষের জল আর কি বাধা মানে! সতাই তার শিবের মত স্বামী লাভ হয়েছে!

সাহস পেয়ে হলু বলে “তবে তুমি একটা কাজ কর, দুটি ভাত বেড়ে দাও না—টেপীকে সকালে সকালে খাইয়ে দি—আমিত ঘরে যাব না।”

স্বামী তেমনি স্থিত মুখে বলেন “তুমি যাও—যার কাজ তার সাজে। কে তোমায় এক ঘরে কলে—ওদের ছুঁয়েছ, ওদের ভাত খাওনি ত!”

এর পর কি আর হলুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আছে।—মনে পড়ল তার আর একদিনের কথা,—তিনি বে জেনেগুনে—তাকে চরণে স্থান দিয়েছেন। মনে জাগল শৈশবের স্মৃতি—সে ভাব-প্রাবল্যে তা গোপন করতে পারল না—বলে, “ওদের ভাত ত আমি খেয়েছি, তবুও ত তুমি আমায় নিয়েছ, আজ যদি আবার আমি খেয়েই থাকি তবে কি এখন ত্যাগ করতে পারবে! আমাকে চরণে স্থান দিতে তুমিও যে জাত খুঁয়েছ!”

স্বামী বলেন “জাত তখন গিয়েছিল কি না জানিনা—জাত রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেম জানি;—সফল তা হয়েছে! তোমার পেয়ে, খাণ্ডুড়ীর—তোমার হৃদ মার স্বভাবে যে চেতনা জেগে ছিল, আজ তুমি তার মূর্তি দিলে, আর কিসের দ্বিধা—কিসের গোল! বাহিরের মানে শুচি হয়ে ওদের জন্যে ভাত বাড়তে হয় বাড়গে—আমি সে সব শুনতে চাইনে,—দাও খোকাকে কোলে দাও—ওকে মাটিতে রাখতে দিয়ে আর কাঁদাতে দিচ্চিনে!

প্রাণে প্রাণ মিলে গেল। হলুও যে তাই চায় সে আর থাকতে পারল না—স্বামীর চরণে মাথা রেখে বলে “তথাস্থ!”

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।



## বিরহের দান ।

—:~:—

যৌবনেরি যে কয় দিবস প্রিয়ার সাপে রই নি আমি  
 একটু ভেবে দেখলে বুঝি, সে-কয় দিনই অধিক দায়ী।  
 সে-কয় দিনে বিফল ভেবে মাঝে-মাঝে অশ্রু বয়  
 কিস্তি সে সব ভ্রান্তিবিলাপ—সেগুলি মোর নষ্ট নয়।  
 যে-কয় দিবস কাটায়েছি প্রেমানন্দে সঙ্গে তার  
 যে-কয় দিবস অঙ্গ পরশ লভিয়াছি অঙ্গে তার  
 সে-সব দিনের স্মৃতির স্মৃতি মাদকতার রোমাঞ্চে  
 পেয়ে গেছে কাল-সাগরে চিহ্ন-হারা। নিমজ্জন।  
 অন্তরে তায় ধ্যান করেছি যে-ক'টা দিন পাইনি কাছে  
 অন্তঃস্তরের প্রতিবিম্বে তাহার শুধুই চিহ্ন আছে।  
 তাহার নব যৌবনেরি রূপটি চপল মনহরা,  
 গেল নাক' কোন ছলে বাহুর পাশে তায় ধরা।  
 দূরে রহি প্রিয়া আমার ধান-ধারণার বন্ধনে  
 বন্দী হয়ে রয়ে গেল উজল চির-যৌবনে।  
 যত্নে রাখি রত্ন-সম দুহদিনের সে সম্বলে  
 দুর্ভিক্ষে সেট বিরহের দিন যাপনার ঐ ফলে।  
 অক্ষয় যৌবনের মধু অন্তরেরি মোঁচাকে  
 রইল জমা পার্বে নাক' হরতে কভু কাল তাকে।  
 কুসুমহার। হবে যখন রূপ মাল্যের গাছ পালা  
 বন্ধে আমার তুলবে তখন যৌবনের ঐ-জয়-মালা।

শ্রী কালিদাস যায়।

## সাম্য।

মহাযুদ্ধের অবসানেও পশ্চিম গগনে হিন্দুর বিশাল ওড়ার ধ্বনির অহরূপ দিগন্তভেদী নিনাদ প্রতিগোচর হইতেছে—  
 কিসের?—সাম্যের। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার তদানীন্তন লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ডে মহাত্মা ক্রমওয়েল যে পাকজন্ম শব্দ  
 ধ্বনিত করিয়া এক মহাসাম্যের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং বাহার অধিকতর পুষ্টি ও বিকাশে তৎকালীন পাশ্চাত্য  
 জগতের সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় কয়সী দেশ বন রক্তিম বরণে মণ্ডিত হইয়া কি ভীষণ তাড়ন বৃত্তাই-না করিয়াছিল—

আজ আমরা তাহারই পূর্ণাভিনয় ও পূর্ণাহুতি এই জগৎপাপী মহাসমরযজ্ঞে দেখিতে পাইলাম। সহস্র সহস্র কালানল-বর্ষী করকাধারা-বর্ষিত ঘোরাক্রকারাবৃত অমানিশা-প্রকৃতির কোলে দেখিলাম—রণরঙ্গিনী বরাননী সূতঘী নিরুপমা মা আমার—সুধাপানে উন্মত্তা - এলোকেশী দিগ্ধসনা হইয়া অতিকায়া—ভীষণরূপে রক্তাক্ত লেলিহান্ জিহ্বার রক্ত-বীজের রক্ত লেহন করিতেছেন—মায়ের অপূর্ণ রণনৃতো ও ভীষণ-পদভরে সমগ্র মেদিনী বিকম্পিত—সমস্ত জীব ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত—প্রলয়মেঘের ছন্ধারে—ভীম ঝঙ্কারে সৃষ্টি বৃষ্টি আজ রসাতলে যায়, এমন সময়ে সংহাররূপী মহারুদ্ধ ও সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্রীর পদতলে সৃষ্টিনাশভয়ে শিবরূপে নিজেই বিলুপ্তিত—অমনি নৃত্যলীলা মা আমার স্থিরা জ্যোতির্ময়ী সিন্ধু সুহাস্যে বরাভয়দায়িনীরূপে প্রকাশিত হইলেন—কোন্ অলঙ্ঘ্য মস্তবলে চকিতে সমস্ত রণবাদ্য থামিয়া গেল—শত সহস্র বজ্র গর্জনে যে গোলা মহাশক্তিতে মুহূর্ত্ত পূর্বে রক্তগঙ্গা বহাইতেছিল আজ মস্ত-মুগ্ধের মত তাহা সংরুদ্ধ—তাই আজ জগতের নরনারী ব্যাকুল হৃদয়ে শুভলগ্নে বিশ্বমাতার শাস্তি প্রদায়িনী মুনজন-মনোহরা মধুর-কলাপী রূপ দেখিবার জন্য সহসা সকলেই ক্ষণতরেও উর্দ্ধগ্ৰীব—উর্দ্ধনেত্র। বিশ্ববাসী এই বিশাল নীরবতার মধ্যে অনাহত ধ্বনির ন্যায় ‘মঠেঃ’ ‘মঠেঃ’ রবে আশ্রয় হইয়া সাম্যের অমৃতারুণ কিরণে ভাসিতে লাগিলেন। যাহাদের পুণ্যচেষ্টায় আজ শয়তান, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় কোন্ অজানিত দূর পথে পলায়নপর এবং শীতপ্রদেশের জমাটবাধা অন্ধকারও বালকাকিরণসম্পাতে দূরীকৃত—যাহাদের ক্ষরিত পুত্ররক্তে ধরিত্রী স্নাত হইয়া প্রেমবসনাবৃত—সেই সমস্ত বিগতজীবন, জীবিত বীরের চরণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রলিপাত করি। যাহারা সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগতের ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের—জাতি ও ধর্ম্মের—প্রকৃতি ও বর্ণের লক্ষলক্ষ বীরকে একত্র সাম্যমন্ত্রে অভিষিক্ত ও অভিসিক্ত করিয়া প্রত্যক্ষরূপে শিক্ষাদান করিলেন—আজ এই মহামন্ত্র-পুণ্যাগাথা কীর্ত্তন করিয়া সেই প্রত্যাবৃত বীরগণকে বরণ করিয়া লই। এই পুণ্যস্মৃতি আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনের স্তম্ভপাত করুক এবং ভবিষ্যৎশীঘ্রগণের নিকট স্থায়ী আলোকস্তম্ভরূপে প্রকাশিত হইয়া চিরস্মরণীয় হউক।

যখন মনে হয় এই মহাকুরুক্ষেত্রে অসভ্য কৃষ্ণকায় নিগ্রো ‘মেশিনগান’ স্বন্ধে লইয়া শিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় বীর দর্পে ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধে চলিয়াছেন—ভারতের কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী—যাহারাই একদিন সামান্য কাষ্ঠজ-বিজ্রাটে সিপাহীবিরোধীরূপ মহামেঘের সঞ্চারণ করিয়াছিলেন তাহারই আজ জাতিধর্ম্ম সংস্কারাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সূদূর ইউরোপথ্যেও অনভ্যস্ত শীতে আড়ষ্ট না হইয়া সরল বীরের ন্যায় পঙ্গপালের মত সমরাগ্নিতে পরার্থে আত্মবিসর্জন করিতেছেন—মহাত্মা গোবিন্দ সিংহের ধর্ম্মবজ্রে গঠিত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শিখগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সূদূর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রে—শোধ্য ও বীর্ঘ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ইউরোপবাসীকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া মৃত্যুর হার, বালকের ক্রীড়ণকের মত আপন কণ্ঠে পরিয়া লইলেন—জহরব্রতপরায়ণ রমণীর গর্ভসজ্জাত প্রতাপের মত বীরপ্রসবিনীর সন্তানেরা—হলদীঘাটের বীরেরা—দলে-দলে সিংহের মত অগ্নানবদনে রক্তাক্তকলেবরে যুদ্ধ করিতে করিতে বজ্রগোলা বৃকে ধারণ করিয়াও অগ্রসরগতিতে ছিন্নভিন্ন—এমন কি ভীকু কাপুরুষ বলিয়া চিরপরিচিত বাঙ্গালীর শিক্ষিত মেধাবী ভদ্রসন্তানও “আমার রাজা—আমার রানী” বলিতে বলিতে সংঘতপাদিক্ষেপে অটল হৈমধ্যে—অমিত ভেজে ও অদম্য উৎসাহে অপূর্ণ রণকৌশল দেখাইয়া—স্বদেশের মুখোজ্জল করিয়া অব্যক্ত এক স্তম্ভহান্ আশার মোহন ছবি মৃত্যুমুখে প্রাকট রাখিয়া বিদেশের রণপ্রান্তরে শায়িত—তখন বিশ্বম্বে মন আপ্লুত হয় এবং ইঁহাদিগকে চিরবাধীনতা সুখপরায়ণ ব্যাজবলদৃশ্ত স্বৈতকার্যবীরের পাশাপাশি সমানভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সাম্য দেবতার হস্তচাণনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ইহা এই মহাকুরুক্ষেত্রে পূর্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আশা করি

এখানে একথা বলিলে দোষ হইবে না যে স্বাধীনতার চিরনীলানিকেতন ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকা নাকি অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা ও ন্যায়বিধি সংরক্ষণের জন্যই এ মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অজ্ঞ আমরা—রাষ্ট্রনীতিজ্ঞও নহি—তবে সহজ বুদ্ধিতে এ-টুকু বেশ বুঝি আমাদের মত অজ্ঞই এ দেশে অনেক যাহারা পলিটিক্সের গভীর সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিলেও ধনীলোকের পোষাককুরের মত নীরবে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া থাকে আর মনে করে বৃহৎ ভোজের সময় অবশ্যই পরিশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাতেই তাহাদেরও ‘ভোজ’ হইবে। এ দেশের ধনীর গৃহে ভূরি ভোজনের দিন এখনও ( মাছুষ না পাইলেও ) কুকুরবিড়াল পূর্ববৎ আনন্দই পায়, কিন্তু পাশ্চাত্যপ্রণালীব ভোজন ব্যাপার পৃথক রকমের তাহাতে কুকুরের নির্দিষ্টবৃত্তি অপেক্ষা বেশী আশা করা নিতান্ত অন্যায়। এ দেশের জন সাধারণও বলিয়া থাকে ‘ভোজনের ব্যাখ্যা খাবার পর’ অতএব উদয়ন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মত মূর্খসাধারণ ওভাবের কথা উপর কোনরূপ চীকাটিপ্পনা করিতে নিতান্তই অক্ষম। তবে ছেলেবেলায় বাপমা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট ইহা শুনিলাম যে—“সাহেবেরা মিথ্যা কথা জানেন না—আশিতের রক্ষক—ন্যায়ের আদর্শ।” এক্ষণে আমি বুড়ো বলিলেও চলে—আমার পোড়া-অদৃষ্টে এমন ইংরেজের পুণ্যস্পর্শস্থ থাটে নাই। ছেলেবেলা হইতে ভূতের ভয়েরও নানা প্রকার কথা শুনিয়া আসিতেছি—আমার ভাগ্যশ্রুতে ঠাঁহাদেরও দর্শনলাভ ঘটে নাই তবুও যখন দেশের ‘অব্যাব্য-বিদ্যাবিশারদগণ’—বড় বড় ব্যারিষ্টার—পণ্ডিত প্রভৃতি মনোবিগণও দেবতত্ত্ব ছাড়িয়া প্রেতস্বের জন্য দেশবাসীকে উদ্ভুদ্ধ করিতে কম পরিশ্রম করেন নি তখন এ কথা আমার বেশ মনে হয় দেশের রাজনৈতিকবিশারদগণেরও পলিটিক্সের ভূতের ছায়া দেখাইয়া দেশ নাচাইবার ও মজাইবার প্রয়াস তুল্যরূপ হইবে। এক কথায়—আমি নিজেই পাড়াগোয়ে ভূত—অতোশতো বুঝি না, তবে বুঝি, বজ্রপাত হইলেও কলিকাতা হাইকোর্ট যখন উন্নত শীর্ষে সুবিচারকরূপে দণ্ডায়মান—তখন জাষ্টিস্ শ্রীর আশুতোষের উক্তিই আমাদের নজির—“পলিটিক্স পরাধীন জাতির জন্য নয়।” বিশেষতঃ পলিটিক্স চিরকালই চোরাবালু—নতুবা সিজারের মত বীর ও পণ্ডিত—সিশিরোর মত রাজনৈতিকবক্তাও এর মধ্যে একেবারেই ডুবিয়া গেলেন! অতএব আমার মত মূর্খেরা ও-কথায় কানে-আঙ্গুল না দিয়া আর কি করিবে?

এই মহাকুরুক্ষেত্রে যে সামোর ছবি দেখিতে পাই তাহার ভিত্তি পাশ্চাত্যজগতের অন্যান্য বিষয়ের মত—বহির্জগতেই। বহির্জগত সতত পরিবর্তনশীল ও ষড়বিকারযুক্ত—অহর্জগত ঠিক তাহার বিপরীত। সোজা কথায় প্রাচ্যের সামোর ভিত্তি দেশাত্মবোধে অর্থাৎ দেশকে সাম্রাজ্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার তছপরি এই সুবর্ণমুষ্টি স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাচ্য সামোর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি স্বয়ং শতদলের উপর বসটিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের সতিত গাঁথিয়া এক বিরাট সামোর অগ্নি সোমা অপরূপ মূর্তির স্বপ্নকাশরূপে দর্শন করিয়া পরানন্দে আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়াছেন। একদিন এই সামোর ধ্বনি পূর্ণাঙ্গীণ ভারতবর্ষে আত্মা স্বর্ষিগণ জলদগভীর স্বরে এঠরূপে শুনাইয়াছিলেন;—

‘শৃণু বৈ তে অমৃতন্ত পুরাঃ

আ যে ধামার্মি দিব্যানি তসুঃ

বেদাত্মেতং পুরুষং মহাত্মং

আদিতবর্ণং তমসঃ পরন্ত্যং।’

ইহাই প্রাচ্যের—সনাতন ধর্মের সামোর মূলনীতি! ইহাই মানবের—মানবের কেন ‘সমগ্রের’ একীকরণের পুণ্যময় বেদমন্ত্র। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—কত রাজ্যের উত্থান ও পতন কালসাগরে বৃষুদয়ে

জ্বাল প্রকাশ হইয়াছে—কত বড়, বজ্রবাত, বিলীমকী এ হতভাগা দেশের উপর দিয়া বহিয়া কত অমূল্য ধন বিনষ্ট করিয়াছে তবুও মনে হইতেছে যেন সেই স্মরণাতীত কালের স্বর্গমণি আজ আসিয়া আমাদের নিকট বলিতেছেন ‘হে অমৃতের পুত্রগণ—তোমরা শোন’। এই পবিত্র-চতুর্দারিদ্র্যানুশ্রবণে মৃত আমরা কি সত্য সত্যই অমৃতের সম্মান! আহত জন্তুর ন্যায় ভাড়িত—গৃহহীন—সম্বলানহীন আমার মত ভাগ্যহীন মূর্খরাও কি তবে অমৃত হইতে উদ্ধৃত? দ্বীপটি নিজের হাড় দিয়া দেবপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে বজ্র গড়িয়া দিলেন—স্বয়ং বিষু, ভৃগু-পদ-চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর মহিমা যে কত বড় তাহার স্পষ্ট ছবি জগৎকে দেখাইলেন—এমন সব পুণ্যাত্মা মহাআগণ আমাদের মত হতভাগ্যাদিকে জন্য মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিতে এ সব লিখিয়া যান নাই জানি—তবুও এমন অবস্থায় পড়িয়াছি যে নিরাশাও হইতে পারি না কারণ ‘আমরা অমৃতের সম্মান’—আবার আশা করিতেও সাহসে ক্লান্ন না—কাঁদিতেও পারি না—হাসিলেও দোষ—বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া বলিব কি—বলিবারও শক্তি এবং অধিকার উভয়ই হারাষ্টয়াছি।

বায়ুও যেন আজ ললিত বন্ধারে মধুর ভৈরবী রাগিণীতে কানে কানে বাজিতেছে ‘হে অমরের সম্মান—শোন!’ আলোও যেন অন্ধকার চিদাকাশে বিদ্যুৎ-অঙ্কনে তাহারই হিরন্ময়মূর্তি প্রকাশ করিতেছে—আর প্রাণের দেবতা যেন কোন্‌ গুপ্ত-গভীর গুহা হইতে দৈববাণীর মত বলিতেছেন—“আত্মাঃ বিদ্ধি—আপনাকে জানে।”

‘তুমি উত্তর বা দক্ষিণ মেঘবাসী হও—তুমি শ্বেতকায় বা পীতকায় হও—গৌর বা কৃষ্ণবর্ণ হও—তুমি বজ্র-মূল্য শ্বেতমর্শ্মরানিস্থিত হিম্মবাসী হইয়া বিপুল ধনরাশির উপর পা ছড়াইয়া বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া দরাকে সরা জ্ঞানই কর বা পর্ণকুটীরবাসী হইয়া মুক্তিকাল্যাণ গ্রহণ কর—তুমি অক্ষরাভিমাত্রী উচ্চবর্ণসজ্জাত পণ্ডিতই হও বা নিরক্ষর চণ্ডালই হও—তুমি পুরুষই হও বা নারীই হও—তোমরা সকলেই যে—‘এক-মাতৃষ—এক দেবতার সম্মান—তোমাদের সকলের লইয়াই যে এক বিরাট মন্ত্যাত্মের সৃষ্টি—ইহা ভুলিলে তো চলিবে না।’ ইহাই তো প্রাচ্যের সাম্য দেবতা। হঠা ভুলিয়া বিশ্বপ্রেম বা সাক্ষরাত্ম প্রেম লাভ করিতে চাওয়া মনে হয় যেন অমৃতভাগু-ভ্যাগে হলাহল গ্রহণ করা—প্রসন্নসাললা পুতগঙ্গোদক নিঃক্ষেপে লবণাস্থপান তুল্য। যে অন্তর্ভক্ষেণে এই হতভাগ্য জাতি তাঁতাদের পূর্বতন মহাপুরুষগণের এই উদার ও মহান নীতি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই ইহাদের সন্মানাশয়ের সূত্রপাত। ‘গতসা শোচনান্যন্ত’ যাহা হইবার হইয়াছে। অতীতের শিক্ষাটুকু লইয়া—অতীতকে ভুলিয়া এস আমরা চিরপূজ্য সেই আর্গিষ্ট্যগণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই ও অগাম বিশ্বাসে—বপুল বলে—অসীম ধৈর্যে নিজ নিজ সংঘত-পবিত্রতার মহাশক্তিতে বলীয়ান হইয়া নিভয়ে অক্লান্তগতিতে ভী নসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই—তাহা হইলেই এ মহাদেশের পুরাতন শ্রী ও সৌন্দর্য্য নূতনের পোষাকে ফিরিয়া আসিবে—সুনিশ্চিত। আমাদের হুঃখ দূরকরিবার জন্যই দেবতুল্য স্ববিগণ আহ্বান কারতেছেন—

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনঃসি জানতাম্।

সমানো মন্তুঃ সমিতিঃ সমানী

সমানং মনঃ সমচিত্তদেয়াম্।

সমানী বঃ আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ

সমানামন্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥”

ঋগ্বেদ, ১০, ১৯১, ২। ৩। ৪।

‘তোমরা একত্র মিলিত হও, অবিরোধ করিয়া বাক্য বল, তোমাদের মন অবিরোধজ্ঞানলাভ করুক। মন্ত্র, সমিতি, মন ও চিত্ত একরূপ হউক। তোমাদের আকৃতি সমান হউক, হৃদয় সমান হউক, মন সমান হউক—যেন তোমাদের সাহিত্য শোভন হইয়া উঠে।’

যে দিন আবার এ মহান সত্য জাতীয়-জীবনে পরিস্ফুট হইবে এবং ইহার ঐক্যসত্যও সমাকরূপে আমরা উপলব্ধি করিব—সেই দিন আবার প্রতিজন্যর হৃদয়ে অন্তরেরমানুষটি জাগিয়া উঠিয়া সহস্রদলপদে বিকশিত দেখিব এবং সমগ্র ভারতভূমি এক সুবৃহৎ কোটি-কোটি-দলপদে পরিণত হইয়া তাহার শুদ্ধশুদ্ধবর্ণে ও নিশ্চল গন্ধে সমস্ত জগৎ আকুলিত করিয়া স্বর্গের বিমল পারিজাতরূপে প্রকাশিত হইবে। তখনই আমাদের জাতীয়-জীবনের অন্তরে এমন মহাশক্তির উদ্ভব হইবে যে বালক প্রহ্লাদের ন্যায় আমরা সৰ্ব্বপ্রকার নির্যাতনে অচল অটল অটুট থাকিয়া সিদ্ধিলাভ ও নির্ভয়ে অবাধে সৰ্বত্র বিচরণ করিবার সক্ষমতা লাভ করিব। সেই দিন আবার এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে—দেবগণ আবার পুলকে সুধাবৃষ্টি করিবেন। সত্যযুগের আবির্ভাবে দেবরাজ ইন্দ্র এবার কোটি-কোটি-দধীচি-হাড়-নিশ্চয় নূতন অমোঘ বজ্রাস্ত্র লইয়া ন্যায়স্বয়ং পরিচালনার্থে সিংহাসনারূঢ় হইবেন—অমরবৃন্দের আশীর্বাদে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, করুণা ও প্রেমের গঙ্গা শতসহস্রমুখী হইয়া প্রবাহিত হইবে—অভিশপ্ত এই সাগরসন্ততিগণ সৰ্ব্বপাপহারিণী সুরধুনীতে স্নান করিয়া শুভ্র বসনে ও নবজীবনে শোভমান ও দীপ্তিমান হইয়া অকৃত্রিম কৃতজ্ঞাবনতহৃদয়ে ও গদগদকণ্ঠে মধুর উদাত্ত সুরে যুগশ্রেষ্ঠ সাধক কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবেন,—

‘হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর !  
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্ডলস্বর  
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে  
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে  
বনম্পতি ওষধিতে এক দেবতার  
অথও অক্ষয় ঐক্য ! সে বাক্য উদার  
এই ভারতেরি ! যারা সবল স্বাধীন  
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন  
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীৰ্য্য জ্যোতিমান  
লজিয়া অরণ্য নদী পার্বত্য—পাষণ—  
তারা এক মহান বিপুল সত্যপথে  
তোমাতে লজিয়াছেন নিখিল জগতে ।  
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ,  
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ !

তখন নবভগীরথের নবজাহ্নবীধারায় দেশ প্রাবৃত হইয়া অমরস্রবী ক্ষেত্রও প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করিবে—দৈব-জ্ঞানসম্পন্ন অমরগণ ভারতে বিচরণ করিয়া অতুল্য স্বাস্থ্যের বিতরণ করণের দেবদেহ গঠন করিবে—দেবতার ঘোষা-দ্বিধে মহামারী হৃদয় অপরিত্রা অকালমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত ও নির্বাসিত হইবে,—সামান্য মরণারীও পরিমিতাহারী-অনলস হইয়া শুষ্কচিত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনকের মত আত্মজ্ঞাননিরত থাকিয়া সংসারাজরীর প্রাধান্য ঘোষণা

করিবে। রাজর্ষি জনক বিশাল রাজ্যের ভার ঝুঞ্জে লইয়া এই অমরপথে বিচরণশীল ও জীবন্ত বলিয়া পরিচিত, পাশ্চাত্য ঋষি সঙ্কেটসিও নাকি রিপুজয়ী ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন—সামান্য একটা প্রদীপ জ্বলিলে যখন তাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বলান যায় তখন এসব আগুনের উৎস কি শুদ্ধ শোভাবর্দ্ধনের বা বৈঠকী-সিদ্ধান্তের জন্যই জগতে প্রবাহিত ও প্রচারিত? মহতের পূজার বিধি সর্বদেশেই সমানভাবে বণিত ও কথিত—তখন আদেশের অনুকরণ ও তুল্য হইবার চেষ্টা অমরপুত্রগণের নিকট কখনও অনায়াস নহে। কথায় দেব বা অমর সাজিলে দেবত্বের আসন ভুলভ হইত না—সভাগৃহে বা বৈঠকে মোখিক অসরল অভিনয়ে মহতের পূজার অনুষ্ঠান নহে—প্রতিজীবনের প্রতিদিনে—প্রতিমুহূর্তে ইহার আয়োজন ব্যাকুল ও সরল মনে পবিত্রতার পুষ্পোপচারে করিতে হয়। সরলতা বা আন্তরিকতা ইহার প্রধান অঙ্গ। সরলভাবে যাহারা যে প্রকার শুভচেষ্টারই প্রয়াস পান তাহারাই পূজা আর যাহারা সারল্যের ভাণ করেন তাহারাই পণ্ডিত হইলেও ঘৃণ্য। আর যাহারা এইরূপ শুভচেষ্টার মূলে অবজ্ঞা ঘৃণা বা শ্লেষের ভীত বিষ ঢালিয়া দেন তাহার মানবের চিরশত্রু—শরতানের অমুচর। বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক কবি তাই সাহিয়াছেন,—

‘আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান  
দিয়ৈছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ  
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।  
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস শব্দরৌ  
তার উর্দ্ধশিখা যেন সর্ব উচ্চে রাখি,  
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।  
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা  
আত্মার মহত্ব মম তোমারি মহিমা  
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,  
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,  
হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে  
তারে যেন দণ্ড দেই দেবদ্রোহী বলে।  
সর্বশক্তি লয়ে মোর! যাক আর সব  
আপন গোরবে রাখি তোমার গোরব।’

\* \* \*  
‘জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন,—  
ভক্তি যেন ভয় নাহি হয় পদানত  
পৃথিবীর কারো কাছে; শুভচেষ্টা যত  
কোন বাধা নাহি মানে কোন শক্তি হতে;  
আত্মা যেন দিবারাত্রি অব্যাহত স্রোতে  
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা পানে  
সর্ববন্ধ টুটি! সদা লেখা থাকে প্রাণে

‘তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার

তাভা কেড়ে দিলে অমান্য তোমার।’ ”

এই জনাই সর্বদেশের শাস্ত্রই—বেদ, কোরাণ, বাইবেলও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—‘মুখ্যতঃ তুলন্য জন্ম।’ শাস্ত্র যখন নির্বিরোধে যখন, খৃষ্টান, আত্মগাল ব্রাহ্মণকে—এমন কি স্ত্রী পুরুষেরও অভেদ জানে অমৃতের অধিকারী বলিয়া সরল ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গেলেন তখন আর কত কাল ‘শ্রেণীবিশেষে’ ‘অধিকারীবিশেষে’—জড়িত মন তুলানো কথা দিয়া আত্মতুরিতার অবলেপে সমাজের এই বিবক্ষিত অচ্ছাদিত রাখিয়া ইহার পোষণ ও পরিপুষ্টিতে—তুলন্য জন্মের সুমহান লক্ষ্য বার্থ করিবে? যখন দেখি রাজাদিরাজ কুদীন রাজা বা দীনাতিতম ভিক্ষুক চণ্ডাল, মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিরক্ষর মুচির দেহ একই উপাদানে গঠিত—একই প্রকার রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি প্রবাহিত, অধিষ্ঠিত এবং সকল দেহেই ইঞ্জিয়ারিরও একরূপ বিকাশ ও কার্য—মৃত্যুরপর পরিণামেও এই দেহের সমভূতে লয় বা আশ্রয়—তখন কি মনে হয় না ‘সব মানুষ এক’? তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় পরাবিদ্যা বর্তমান ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সহজ বা একরূপ নহে কিন্তু কোন বিদ্যাই বা তরুণ? যাগতে এ বিদ্যা সহজ ও সরল হয়—ঘরেঘরে গৃহীত হয়—জনেজনে এই বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া জন্ম মার্থক করিতে পারেন তাহারই উপায় কি সাধকবৃন্দের করা উচিত নয়? কেহ কেহ বলেন,—এ যে কলি! যখন দেখি সকল যুগের—সকল দেশের একত্রিত জ্ঞান ও শিক্ষা আমাদের সামনে একাধারে সজ্জিত ও গ্রহণীয়ভাবে বিন্যস্ত তখন কি কলিযুগ বড় বলিয়া মনে হয় না? যখন দেখি পরধন ও প্রাণ নির্দয়ভাবে অপহরণকারী মহাদম্ভা ও মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী বলিয়া পরিণামে খ্যাত—তখন কি আমরা বিশ্বয়ে ও শ্রদ্ধার অবনতশির হইয়া তরাহাত্ম্যকৌর্তনে গর্বি ও আনন্দ অন্তর্ভব করি না?—আবার যখন কলিযুগ সত্যযুগে পরিণত হইবে—তখন কি মানবচিত্ত তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অচিন্ত্যনীয় বিশ্বয় শ্রদ্ধা গর্বি ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইবে না? যুগান্তকারী এ মহাকুরুক্ষেত্রেও কি কলির বিনাশ সাধন হয় নি? ধর্মির প্রতিধ্বনি আছে—উত্তরের কি প্রত্যুত্তর নাই?

মনে হয় প্রাচ্যের এই সামোর আদর্শ গ্রহণ করিবার তিনিই অধিকারী—যিনি জিহেজ্রিয় ও শুদ্ধমনা হইয়া আত্মতত্ত্ববান্। জাতি, কুল, বিদ্যা, তপ, যোগ, যাগ, ধ্যান, ধনজন ও যৌবন—ইহার কিছুই অপেক্ষা করে না যদি কেহ সরল শুদ্ধ মনে ও দেহে অনন্যাচিন্তে সেই পরমপুরুষের আশ্রয় লয় এবং তদ্ব্যবহাবে ভাবিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য সম্পাদন করে। এই অর্থও সত্যকে—‘সমগ্র-একীকরণ’ সাম্যকে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কে—এই অরূপের রূপকে—সচ্চিদানন্দময়কে—অবাস্তবমনসগোচরম্কে দর্শন করিলে রিপু নাকি আপনা-আপনিই জয় হয়—ত্রিতাপজালাও থাকে না এবং সর্বপ্রকার জয় তিরোহিত হইয়া মন অপরূপ শুদ্ধ-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়! কেটি মধ্যাহ্ন-স্থ্যা বা কেটি পূর্ণচন্দ্র মিশ্রিত আলোকরাশিও ইহার তুলনায় অকিঞ্চিকর বা অতি তুচ্ছ। যে মৃত্যুর পথ কেটি অমানিশার অন্ধকারাপেক্ষাও ভীষণতর তাভাও আলোকসম্পাতে শত সহস্র বৎসরেরও অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইবার মত এই অচিন্ত্যনীয় জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শোভায় বিরাজ করে;—সংশয় তিরোহিত হইয়া মন তখন মুক্ত—সুখস্থঃ পাপপুণ্য আনন্দানিরানন্দ শুচিঅশুচি সংস্কার মায়া প্রভৃতির রাজত্ব ছাড়িয়া উজ্জ্বলিমুখী হয় এবং মন, ভ্রম হইয়া নিত্য সুখামকরন্দ পানের নেশায় ডুবিয়া যায়। তখনই সাম্য আসিয়া স্বাধীনতার আলিঙ্গনপাশে চিরাবদ্ধ হয়। মনে হয় এইখানেই সাধক জীবনশুক্ল।

প্রতীচ্যের সাম্য গাড় হইয়া মৈত্রী বা জমটি সজ্বলিতরূপ প্রকাশ পায় এবং ঐ সজ্বলিত একরূপে চালিত হইয়া বহিজগতের স্বাধীনতা-প্রয়াসী হয় এবং উহা লাভও করে। কিন্তু স্বাধীনতার নামে অনেক সময় ইহাতে

উদ্ধৃতিগত এবং ভীষণ তাণ্ডবৃত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য স্বাধীন দেশের সর্বশক্তিসম্পন্ন ও অগাধ ঐশ্বর্যপরিপুষ্ট শাসনযন্ত্রদ্বারাই সাধারণতঃ এই সকল জাতীয়-সত্ত্বের সৃষ্টি হয়; এবং ইহার আয়তন, গঠন শক্তি ও চালনার উপরই ইহার সাফল্য নির্ভর করে। ইচ্ছা ও আবার নানা বিভাগে বিভক্ত,—পলিটিক্স, পলিটিক্যাল একোনমী, সোসিওলজী প্রভৃতি বহুবিধ নামে এই সকল বিভাগ পরিচিত। আবার সময়ে-সময়ে বিভিন্ন-বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া ইচ্ছা এক বিপুল বিরাট জনসঙ্কল্পে প্রকাশ পায়—বলিতে গেলে তাত্ত্বিক অনেকটা আমেরিকার ষ্টীলট্রাষ্টব্যোথকারবারের মত—মনে হয় পরিণামেও তদ্রূপ সর্বগ্রাসী। অবশ্যই এই বিরাট সঙ্কল্প-শক্তিকে সমাক্রমে পরিপুষ্ট করিতে হইলে উপরোক্ত বিভাগীয় শাস্ত্রাদিতে সমাক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং উহার সমাক্ত প্রয়োগ শিক্ষা করাও কর্তব্য। ব্যবসা না শিক্ষা করিয়া যেমন ভাবের প্রাবল্য শুধু পাকা ব্যবসায়ী হয় না এবং তাহার ফল যেমন অধিক ক্ষেত্রেই তিক্ত ও বিষময় হয় তদ্রূপ প্রতীচ্যের মূর্ত্যাকরণের ফল হাতেহাতেই ফলিয়া থাকে—ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে বোধ হয় কাহাকেও পরের ঘরে যাঁচিতে হইবে না। এ-কথা এখানে বলিয়া রাখা অনায়াস হইবে না—শিক্ষা বা বিদ্যা সমাক্রমে প্রয়োগ করিবার শক্তি বা সামর্থ্য যে ব্যক্তি বা জাতির নাই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ বার্থ—আমার মনে হয় উহা মৃত্যুর গাত্রালঙ্কার রূপ সৌন্দর্যের ন্যায়। বন্ধনগ্রস্ত ক্ষুধার্তের সম্মুখে যেমন স্নান্য ধরিলে তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় না—প্রয়োগ বিনা অধীত শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যও কি তদ্রূপ নহে? সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত লইয়া এ দেশ কি কারবে যদি তাহার দ্বারা একটা রোগীর চিকিৎসাও না চলে? প্রবন্ধের প্রথমাংশে লিখিত পলিটিক্স ক্ষেত্রের নির্বাকের মত এসব ক্ষেত্রেও আমাদের নীরব থাকাই কর্তব্য। আমরা যে দেশ সংসারের এই বিক্ষেপে চঞ্চল নহে—যে দেশে ভয় বলিয়া কিছু নাই—সেই দেবতার দেশে,—অমৃতের সেই তেজঃ পুঞ্জ অধিগণ প্রদর্শিত পথে আবার ফিরিয়া যাই;—যেখানে গেলে মন মুক্ত হইয়া চিরস্বাধীনতা লাভ করে এবং মৃত্যুরও কালমেঘ অচঞ্চল সোদামিনীর প্রকাশ করে।

মনে হয় প্রাচ্যের সাম্যাদর্শ চরম—উহার ভিত্তিও পাকা—উহা চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উহার কর্তব্য ও অনুভূতিতে প্রতি হৃদয়ে একাধারে সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাব স্বতঃই মধুর ও সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে; উহা নদী সমূহের মত আপনগতিতেই সমুদ্রে মিশিয়া মহাসাগরের আকার ধারণ করে। মন যখন মহানন্দসাগরে—শুদ্ধজ্ঞানালোকে ডোবে উঠে আবার ডোবে তখন তত্ত্বের এই মধুর উক্তি মনে পড়ে,—

“পীড়া পীড়া পুনঃ পীড়া পুনঃ পপাত ভূতলে।

উথায় চ পুনঃ পীড়া পুনর্জন্ম ন বিদাতে ॥”

এবং এই সঙ্গে মৈত্রী বা কারুণ্য বা প্রেমে চল চল হইয়া পরমভক্তকবির মত এইরূপে বিশ্বজনের মঙ্গলকানায় সকলকেই ডাকিতে থাকে—

“তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে  
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)  
বুকের আঁচল খানি ধুলায় পেতে  
আঙ্গিনাতে মেলাও গো।  
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি  
মলিন না হয় চরণ তারি,  
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে  
এল এল এল গো।



আকুল      হৃদয়খানি সম্মুখে তোর  
                  ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ॥

তোমার      সকল ধন্য যে ধন্য হল হল গো ।  
                  বিশ্বজনের কল্যাণে আজ  
                  ঘরের ছয়ার খোলো গো ।

হের      রাঙা হল সকল গগন,  
                  চিত্ত হল পুলক—মগন,  
                  তোমার      নিত্য আলো এল ঘারে  
                  এল এল এল গো ।

তোমার      পরাণ প্রদীপ তুলে ধোরো  
                  ঐ আলোতে জলে পো ॥”

মনে হয় একদিন এই প্রেম স্নমধুর মুরলীর ধ্বনিতে পরিণত হইয়া অজস্র সুখাধারা বরিষণে গুরুগঙ্জনভূষায় শোভিতাজ্জ গোপনারীর দেহমনপ্রাণ ও আত্মা সমস্তই হরণ করিয়া—কুল লাজ ভঙ্গ যমুনার পূতবারিতে বিসর্জনে—মহানন্দরূপ রাসাভিনয়ে—দেবতাদেরও বাঞ্ছিত ও ভোগ্য নিত্য বৃন্দাবনলীলার প্রকট করিয়াছিল—যে দিন গোদনসমূহ নবশ্যামলতৃণরাজি উপেক্ষা করিয়া হীনচেতনে ঈষৎ নিম্নীলিতনেত্রে মোহন মুরলীর অমৃতরোমহনে ব্যস্ত—পক্ষীগণ বৃক্ষডালে বাসিয়া সে দেবতুল্যভঙ্গরে পুলকে আত্মহারা ও হতকীভূত—বিনা পবনে তরুসাজিও সেই মৃতসঞ্জীবনীস্বরে চেতনার মূহু মূহু সঞ্চালিত—এবং সে অভিনব বাঁশদীর অমৃত আকর্ষণে যমুনার পুণ্যবারিও সবিভাভগামিনী হইয়া উত্থান । আবার সেই দিনের আশায় বাঙ্গালার কবিকুঞ্জের শ্রেষ্ঠতম ভক্তের মুরলী-ধ্বনির মত এই কবিতা-সুধা সুধীর ‘পাঠকপাঠিকাকে সাদরে উপহার দিয়া অতি বিনয়ের সাহিত্য ভক্তচরণে অবনত হইয়া আজ ‘আম বিদায় গ্রহণ করিতেছি ।—

“গাব      তোমার সুরে  
                  দাও সে বীণায়ত্ন ।

শুনব      তোমার বাণী  
                  দাও সে অমর মন্ত্র ॥

করব      তোমার সেবা  
                  দাও সে পরম শক্তি,

চাইব      তোমার মুখে  
                  দাও সে অটল ভক্তি ॥

সইব      তোমার আঘাত  
                  দাও সে বিপুল ধৈর্য্য ।

বইব      তোমার ধ্বজা  
                  দাও সে অটল দৈর্য্য ॥

নেব      সকল বিশ্ব  
             দাও সে প্রবল প্রাণ,  
 করব    আমার নিঃশ্ব  
             দাও সে প্রেমের দান ॥  
 যাব      তোমার সাথে  
             দাও সে দখিন হস্ত,  
 লড়ব    তোমার রণ  
             দাও সে তোমার অস্ত্র ॥  
 জান্ব    তোমার সত্য  
             দাও সেই আশ্বাস ।  
 ছাড়ব    স্নেহের দাস্য  
             দাও দাও কল্যাণ ॥”

বৃদ্ধ ।

## বিশ্বাসে ।

—:~:—

জীবনের ধন মরণ রতন  
             হে চিরসুহৃদ মোর !  
 ভব করুণায় হয়েছে আমার  
             বৃকের তমসা ভোর,  
 কাল যবনিকা গিয়াছে সরিয়া  
             আমার আঁধার রাতি —  
 চক্ষে আমার ভাতিছে পুলক  
             লক্ষ অরুণ ভাতি !  
 সুন্দর হ’তে সুন্দরতর  
             অমর জ্যোৎস্না ভরা  
 চন্দন-মাখা-নন্দন-ফুল  
             মন্দারময় ধরা ।

মঙ্গল নীরে হেরি যে আজিকে  
বিশ্ব করিছে স্নান  
দেখিছি তোমার পদ্ম চরণে  
রয়েছে আমারো স্থান।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

## ভাষা-শিক্ষা।

—(—)—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
শ্রীচরণে।

আমরা যখন বাঙলা ভাষাকে স্কুল কলেজের ভাষা করে তোলবার প্রস্তাব করি, তখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক, আমাদের উপর খড়াহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিশ্বাস বাঙলা, বিজ্ঞা-শিক্ষার ভাষা হলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজি শিখবে না। এর পাশ্চাত্য জবাব অবশ্য এই যে, তারা ইংরাজি না শিখতে পারে কিন্তু বিজ্ঞা শিখবে। কিন্তু এ জবাবে কারও মন ভিজবে না। আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তির এ উত্তরে সমস্বরে বলবেন যে, সে বিজ্ঞা নিয়ে কি হবে—যার সাহায্যে জীবন যাত্রা নিকাশ করা যায় না। ইংরাজি না জানলে যে ভদ্রসন্তানের ‘দিন আনা দিন খাওয়া’ চলে না, এ কথা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেও জানে। ও ভাষায় অজ্ঞ হলে যে আমাদের ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানীগিরি, মাষ্টারি, এমন কি রাজ-নৌতির নেতাগিরি করাও বন্ধ হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং এ সব ক্রিয়া বন্ধ হলে বাঙালীর জীবনে আর কি কাজ থাকবে? ও অবস্থায় আমরা যে ঘরে বসে সাহিত্য রচনা করব তারও সম্ভাবনা কম। যা কথায় কথায় ইংরাজির তরজমা নয়, তা যে বাঙলা সাহিত্য, অস্তিত্ব সাধু-বাঙলা সাহিত্য হতে পারে না। তার প্রমাণ শতকরা নিরনব্বই জন বাঙলা গদ্য লেখকের লেখায় অর্থাৎ আমাদের সকলের লেখায় নিতাই পাওয়া যায়। অতএব ইংরাজি না শিখলে যে বাঙলার সর্বনাশ হবে, এ বিষয়ে দ্বি মত নেই—এবং থাকতে পারে না। তবে বাঙলা না শেখাটা ইংরাজি শিক্ষার সহুপায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রসাদে দেশের লোক যে ইংরাজি শিখছে—ইংরাজি নবিশদের এই ধারণাটি অনেকটা অমূলক। পাঁচ বৎসর বয়েস থেকে শুরু করে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে—আমাদের বিজ্ঞাদীরা যে, ইংরাজি ভাষার উপর কতটা অধিকার লাভ করে, তার পরিচয় যিনি কখন B. L. পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করেছেন, তিনিই পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদে হাতে উকিলের সনদ দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন সাধু-ইংরাজি লেখা দূরে থাকুক ইংরাজিও লেখেন না, শতকরা পঁচিশজন লেখেন বাবু-ইংলিশ, আর শতকরা দশজন বা লেখেন, তা দিনেমার ভলদাজ কিম্বা আলোমানের ভাষা হতে পারে—কিন্তু ইংরাজের নয়; অথচ এঁরা সকলেই কালকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের

গাজুয়েট! এত দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজি ভাষার এই একাগ্র চর্চা এতটা বিফল হয় কেন? বাঙালী জাতি সরস্বতীর কুপায় বঞ্চিত নয়, তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার এই ব্যর্থতার কারণ কি?—কারণ এই যে, পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেরা ইংরাজি ধরে এবং পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তারা দিবারাত্র এক ঐ ইংরাজিরই চর্চা করে।

সকল শিক্ষার মত, বিদেশীভাষা শিক্ষাও কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। শৈশব এ শিক্ষার উপযুক্ত কাল নয়, বালক এ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নয়। শিশুর দেহের পক্ষে মাতৃভাষা, বালকের মনের পক্ষে মাতৃভাষাও তাই। অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য বিনা বালকের মন গড়ে ওঠে না। ছেলেরা যে ভাষা অষ্টপ্রহর শোনে, আর যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা কয়, সেই ভাষার সাহায্যেই তাঁরা পরের কথা বুঝতে ও নিজের কথা বোঝাতে শেখে। ছেলের মন ও ছেলের ভাষা, ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ; সুতরাং এ দুই এক সঙ্গে যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি গড়ে ওঠে। তারপর অল্পপ্রকাশ করবার চেষ্টাতেই মানব-সন্তানের ভাষার উপর যথার্থ অধিকার জন্মে এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শিশুর দেহের সঙ্গে তার মন এবং তার মনের সঙ্গে তার স্বভাষা-জ্ঞান যে এক রকম স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে, এ কথা বললেও অতুক্তি হয় না। অপরপক্ষে বিদেশী ভাষা সজ্ঞানে শিখতে হয়; সুতরাং তা শেখবার জন্য সেই মন চাই—যে-মন বালকের নেই। বারো বৎসর বয়সের পূর্বে বিদেশী ভাষা শেখবার চেষ্টাটা ছেলেদের পক্ষে যে, শুধু কষ্টকর ও ব্যর্থ, তাই নয়—তার মনের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। মধ্য মাংস সেবন ছোট ছেলের দেহের পক্ষে যতটা উপকারী, একটি বিদেশী ভাষার চর্চা ছোট ছেলের মনের পক্ষে তার চাইতে বেশি উপকারী নয়। আনন্দের ছোট ছেলেদের তা গিলিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা জীর্ণ করবার শক্তি তাদের নেই। কলে অল্প বয়সে ইংরাজি শিখতে গিয়ে, আমাদের ছেলেরা ইংরাজিও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে না এবং লাভের মধ্যে শুধু মানসিক মন্দাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মন ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষার চাপে জড় হয়ে পড়ে, সে মন কৈশোর ও যৌবনে তার পূর্ণশক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ যুবকদের মনের যে দম ও কশ নেই, তার একমাত্র কারণ আমাদের এই লুপ্তভাষা শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু ইংরাজি শেখাটা আমাদের অনবজ্ঞের সংস্থান করবার জন্য এতই প্রয়োজন, যে আমাদের সমাজের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক একবাক্যে বলবেন,—চোক আমাদের ছেলেরা মনে পড়ুক, তাঁদের ঐ পাঁচ বছর বয়স থেকেই A. B. C. শিখতে হবে, নাচং তারা বয়সকালে ইংরাজি-নবিশ হতে পারবে না। না ভেবেচিন্তে কথা কওরাটা, বিশেষত সেই সব বিষয়ে—যে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বেননা অপর দেশের শিক্ষার ত্রুণ লী এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে এঁরা যদি কিছু খোঁজ খবর রাখতেন, তাহলে এঁরা এ কথা জানতেন যে, বারো বৎসর বয়সের পরে, অর্থাৎ মাতৃভাষার উপর যথেষ্ট পরিমাণে অধিকার লাভ করবার পরে, ছেলেরা দু-তিন বৎসরে বিদেশী ভাষা যতটা আয়ত্ত করতে পারে, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে শুরু করে তারপর দশ বৎসরের অবিরাম চর্চায় তার সিকর সিকিও পারে না। এই কারণে ছেলেদের বারোবৎসর বয়সের আগে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার সংগ্রহে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এদেশেও পুরাকালে উপনয়নেরপরই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অতএব ভাষা শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে—মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বঙালীমাত্রেয়ই অশিক্ষিত পটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশির ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা বাঙলা লিখতে বসলে অবিলম্বে আবিষ্কার করতে পারবেন। সাহিত্যে আমাদের দুর্বল সুখচোঁরা দ্বারা যে অপর কোনও সভ্যদেশে নেই, তার কারণ আমাদের শিক্ষার ভুলে

আমরা আশৈশব আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাই নি। স্কুলের ছেলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব এবং বাঙলাতে করা বারণ। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ লোকের ভাষাজ্ঞান ছোট ছেলের জ্ঞানেরই সমতুল্য, খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য যতখানি ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যে ক'টি কথা না জানলে নয়, আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী সেই ক'টি নিত্য ব্যবহার্য্য কথাই অক্লেশে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের অন্তরে মাতৃভাষার ভিত্তি আছে কিন্তু সে ভিত্তি এত কাঁচা যে, তার উপর কি দেশী কি বিলেতি কোনও পাকা ভাষার ইমারৎ খাড়া করা যায় না। অতএব মাতৃভাষা যদি আমরা শিক্ষা করি, তাতে করে ইংরাজি-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে না; উপরন্তু, আমাদের মন সবল, সুস্থ এবং সক্রিয় হয়ে উঠবে। তখন আমাদের আর, এ বলে দুঃখ করতে হবে না যে, দেশে এত বিদ্যে আছে অথচ তা দেশের কোনও কাজে লাগে না। পৃথিবীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যে সকল বিদ্যা যে আমাদের মনের চক্রবাহে ঢুকতে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না, তার কারণ আত্মপ্রকাশের সহজ পথটিই আমরা বাল্যকালেই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

মাতৃভাষাও শিক্ষা করবার জিনিস, কিন্তু তাই বলে যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে আমরা একটি বিদেশী অথবা একটি মৃতভাষা শিক্ষা করি, সে উপায় সে পদ্ধতি, মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকও নয়—উপযোগীও নয়। বিদ্যারস্ত্রেই অমরকোষ ও মুক্তবোধ কণ্ঠস্থ করাই হয়ত সংস্কৃত শেখার সহজ উপায়, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্যে কাউকেও মাতৃভাষা শিখতে হয় না; সুতরাং ও উপায় অবলম্বন করতে শিশুদেরও বাধ্য করা অসঙ্গত। যে উপায়ে ছেলেরা ভাষা নিজে শেখে, সেই উপায় অবলম্বন করেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, অতএব এশিক্ষার গোড়ার ব্যাকরণ অভিধানের কোনও স্থান নেই। বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে, বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ শেখা। কিন্তু মাতৃভাষার গোড়াকার শিক্ষা হচ্ছে—বস্তুর সঙ্গে তার নামের, বাচ্যের সঙ্গে তার বাচকের সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা। ছেলেরা এছাড়া কিছু গুরুত্ব সাহায্য না নিয়ে, আপনাকে হাতেই যে-সব কথা শেখে, সেই শব্দসংগ্রহই হচ্ছে সব ভাষারই মূল উপাদান, এই উপাদান করায়ত্ত না করলে, ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার জন্মে না, এবং একটি বিদেশী-ভাষা শেখার মুক্টিই এই যে, সে ভাষার মূল উপাদানের পুঁজি নিয়ে আমরা তার বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করতে বসি নে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষা লেখাপড়া দিয়ে শুরু করবার দরকার নেই, অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়াটা বিদ্যারস্ত্রের প্রথম ক্রিয়া নয়।

‘সবুজ-পত্র’।

১লা অক্টোবর, ১৯১৮।

ত্ৰীপ্রমথ চৌধুরী।

## কবিতার ভাষা।

—:~:—

‘স্বপ্নভঙ্গ’ শীর্ষক যে সমিল গদ্যটি আপনাদের বিখ্যাত পত্রিকায় ছেপে দিয়েছেন, সেটির জন্য অনেকেরই কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হল দেখছি। ‘অবস্থা বা’ দাঁড়িয়েছে তাতে ঘটক-মহাশয়ের তত্ত্বাগমন সন্ধাননাও অনতিদূর দেখে ভয় পেয়েও যে না গিয়েছি এমন নয়। অ-কবি যদি কবিশৈল্যে লোভে হাত বাড়ায় তা’ হলে তার কপালে যে দুর্গতিই ঘটবে একথা যুগান্তের আগে টের গেলে কি আর পাঁচজনের কথাই ভুলি! এখন, কবিতা দিখে কে’ল

করেছি, ভাষা লিখে তা' বিলকূল শুধরে না নিলে বিপদ এড়াবার কোনো উপায়ই দেখছিলেন। ভিক্ষা,—নর্তকীকে যখন আসরে নামিয়েছেন তখন এই সারঙ্গীটিকেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চালিয়ে দেবেন; তাতে ভাষার মান কিছু কমবে বটে, কিন্তু কবিতার দাম বহুগুণে বেড়ে যাবে। ভাষা ছাপা আরও এইজন্যে দরকার, যে ও-কবিতাটা আসলে, এই পরবর্তী বক্তব্যেরই আখড়াই, হিসাবে পাঠানো গিয়েছিল।

“কবির রচনার তাঁর জীবনের ঘটনা প্রকটিত, ইহা অমুমান করা নিরাপদ নয়”—আপনাদের এ-উক্তি শুধু যে আমি মান্য করি তাই নয়, হাতেকলমে তার সত্যতা সর্বসাধারণকে দেখিয়েও দিতে চাই। জীবনে যে পদ জমা হয়েছে তা' বেমালুম চেপে যেতে পারা এবং জীবনে যে পদ ফোটেনি তা' বেপরোয়া ছেপে যেতে পারা,—অপরকথায় মনোরাজ্যে ভগ্নতপস্বী সাজাই যে শ্রেষ্ঠ কবির কাজ, একথা যখন আপনারা মানেন, তখন আশা করি আলোচ্য কবিতাটিকেও উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলেই গ্রাহ্য করবেন—যেহেতু, ও-পদার্থে একটু নূতন ধরণের শোকোচ্ছাস প্রকাশ পেলেও, বস্তুতঃ, শোকের কোন কারণ ঘটেনি। আপনাদের ভাষাতেই বলি—ও-কবিতা রচনা করবার সময় “কবির কল্লনা, সুখদুঃখ, কেবল নিভের মধ্যে সীমাবদ্ধ” ছিল না; “বিশ্ব তাহার আপনায়” হয়ে গিয়েছিল, আর কাজেকাজেই “বিশ্বের সুখদুঃখে তাহার হৃদয়তন্ত্রীও” অকস্মাৎ “বদ্ধত” হয়ে উঠেছিল।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতখানি ‘বিশ্বপ্রেম’ এতদিন প্রকাশ না করে ঘরের কোণে বসেছিলুম কেন? উত্তর—উপযুক্ত কবি-গুরু জোটেনি বলে। অর্থাৎ, আমার এই খানকতক পল্কা পঞ্জরাস্থির আড়ালে দৃশ্যমান বিশ্বের প্রকাণ্ড সুখদুঃখ যে ঘোড়দৌড় খেলবার উপযোগী ফাঁকা ময়দান খুঁজে পাবে, এ-ভরসা কোনো সম্পাদক এ যাবৎ আমাকে দেননি; সম্প্রতি, আশ্বিনের পরিচারিকায় আপনাদের কাব্য-সম্বন্ধীয় উপদেশ থেকে সত্য আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে—অতএব স্থির করেছি যে এখন থেকে আপনাদেরই পরামর্শ-মারফিক চলবো। বলা বাহুল্য, ‘স্বপ্ন ভঙ্গে’ হচ্ছে এ-চেন-সকলেরই পরলা নখরের নমুনা।

জলজ্যাস্ত জীর বৃকে কল্লনার ছোরা বসিয়ে দিয়ে ছন্দে বিলাপ করতে পারা শুনেছি অসামান্য লিপিচাতুর্যের ফল। লিপিচতুর-রূপে গ্রাহ্য হবার এমন সস্তা উপায় থাকতে এতগুলো বছর যে বৃথাই কাটিয়েছি, এজন্যে আজ অনুতাপ হচ্ছে। কাব্যের গালভরা ভাষার বাক “বিশ্বের সুখদুঃখ হৃদয়তন্ত্রীর বন্ধার” বলা হয়, সেটা যে লৌকিক “জোচ্চুরি” শব্দটিরই অলৌকিক নামান্তর, একথা আগে জানলে নিশ্চয়ই এতকাল চুপ করে থাকতুম না—কেননা, ও-বিদ্যা অভ্যাস করলে আয়ত্তাধীন করে নিতে খুব বেশী দেরী হয় না। তা' ছাড়া, চুরি বিদ্যে যখন বড় বিদ্যে, তখন অভ্যাস করাও প্রত্যেকেরই উচিত—শুধু এইটুকু দেখে যে ধরা পড়তে না হয়।

প্রশ্ন উঠেছে—“ও কবিতার লক্ষ্য কে?” হৃৎকথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত; কেন না, বড় কবিদের মতে কবিতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। তবে, এক্ষেত্রে বড় কবিদের প্রতিধ্বনি না করলেও ক্ষতি দেখেছেন—অতএব একটা জবাব গড়ে তোলা যাক :—

কবিতার উপলক্ষ্য যখন ঘরের জী, তখন কবিজনোচিত লক্ষ্য যে পরের জীই হওয়া উচিত তাতে আর সন্দেহ কি! “প্রিয়াহারা শূন্যপুরী” এই শুভ্র মিথ্যাবাদটা কাব্যাকারে ঘোষণা করে’ কল্পিত শূন্যস্থানটা পূর্ণ করে’ নেওয়াই এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ছিল—কিন্তু হার, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি; কারণ, শেষের ছ'ছাত্র মেকি ধরা পড়ে গিয়েছে। ও রকম কাঠ-খোটা ধরণের প্রণয়ীর সঙ্গে প্রেম করবার উদ্যম যে কোনো প্রেমিণীরই থাকতে পারে না তা' গোড়াতেই ভেবে রাখা উচিত ছিল। মানব চরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকতেই যে অমন চমৎকার কবিতাটা মাঠে মারা গিয়েছে

তা' বুঝি, কিন্তু উপায় কি? শিল্পকার্যে যাঁরা পরিপক্ব, তাঁদের হাতের কাজ, ভোরের মুখের খাদ সহজে ধরা পড়ে না—কিন্তু রবি বাবুর মতন প্রতিভা ও হৃদয়-শিল্পবুদ্ধি কি আর এক কথাতেই পাওয়া যায়!

আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন যে উর্চুদরের কবিতা নিজেকে কিছুই লেখেন না, হৃদয় সরস্বতী এসে তাঁদের 'কলম' ধরে লিখিয়ে দিয়ে যান। আমি অবশ্য উর্চুদরের কবি নই—ওই কবিতা যখন লিখেছি তখন সস্ত্রানে যে লিখি তা' বলাই বাহুল্য। তবে কি সরস্বতী এসেছিলেন? উত্তর,—অবশ্য কিন্তু একটু প্রকারভেদ আছে। সরস্বতীরা হচ্ছেন চুই বোন—বয়োভোষ্ঠা যিনি, তাঁর সাক্ষাতকার লাভ করবার সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি—কেননা তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং লক্ষ্মীমহুদেরই স্বন্ধে বসে থাকেন। আমার ঘারে মধ্যে মধ্যে চুই সরস্বতীই যে চাপেন তা' আপনারা বুঝতে পারেন কি না জানিনে, কিন্তু আমি বেশ টের পাই—অন্ততঃ তথাকথিত কবিতাটি লেখবার সময় যে তিনিই চেপেছিলেন একথা হৃদয় করে বলতে পারি।

সে যাই হোক, ও-কবিতায় একটা উপকার হয়েছে। মনোজগতে খুনি হতে পারা বিশেষরকম গুলীর-লক্ষণ হোক আর নাই হোক, স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে ও-ভাবে চত্যা করা পুরুষ কবি-মাত্রেয়ই অবশ্য কর্তব্য; যে হেতু ও-রকম মিথ্যা-প্রকারে সে-বেচারীদের পরমাশু বেড়ে যাবে। আমার মতে স্ত্রী-কবিতাও অবসর মত কাব্যে স্থানী হওয়া করলে মঙ্গল করবেন না, কারণ সেক্ষেত্রেও ফল সমানই হবে। বিশেষতঃ কলমের গোঁচাখুঁচির সাহায্যে ও কাজের চর্চা রাখলে সত্যিকারের ছোরা-বাবুদের লোভ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; তা' ছাড়া 'ঐ বাবু' করতে করতে সত্যিসত্যিই বাবু এসে পড়লে পূর্বাধার গা-সওয়া থাকার দরুণ ব্যাপারটা বিশেষ গায়ের লাগবে না।

ভাষা এইখানেই শেষ করা যাক কারণ কাকুরের চেয়ে বীচির বহর বেশী হওয়াটা কিছু নয়। আশা করি কবিতা লিখে যে আঙুলের অভাব প্রকাশ করেছিলুম, তার যথোচিত সেলামী দিতে পেরেছি। এখন কবিতা ও ভাষা একত্র পড়ে বিচার করুন—আজ্ঞে সেলামীটুকু কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে—লেখকপক্ষে না সম্পাদকপক্ষে?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

## ভ্রম সংশোধন।

—(ঃঃঃ)—

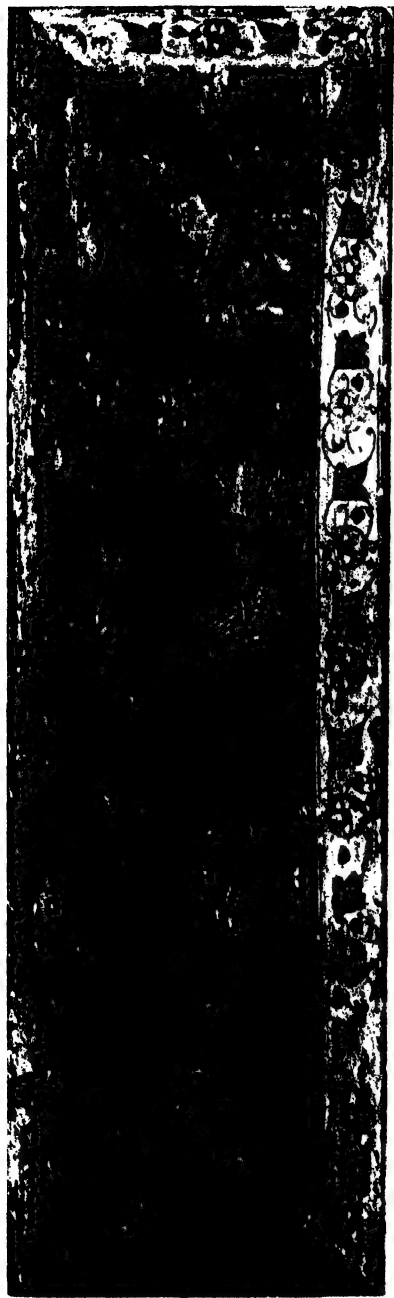
অনবধানতা প্রযুক্ত গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা পরিচায়িকা নিম্নলিখিত ভুলগুলি ছাপা হইয়াছে;—

৩৭ পৃষ্ঠায় 'শেষ' নামক কবিতায় 'মহনের অবসানে সুরাহরে অমৃতের লাগি'—এর পরে 'চিরতন সেই হৃদয় আজো' বেন নাহি উঠে জাগি' এই পংক্তি বসিবে।

'ছিন্নমস্তা তুষ্ট হেলা আজি'—'আজি' স্থলে 'আজ' হইবে। 'তৃষ্ণা ত মা মিটেছে এখন'—'তৃষ্ণা' স্থলে 'তৃষা' হইবে।

৪র্থ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তিতে 'শান্তি'র স্থলে 'শান্তি' হইবে।

কোচবিহার টেটু প্রেসে শ্রীমদ্বাথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।



ভূকামিনের বক্রপান

প্রাচীন পুথির পটভূমি অঙ্কিত চিত্র হইবে



ভীষ্মের শরশয্যা

এ অঙ্কিত চিত্র হ





# পরিচারিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“তে প্রাপ্তবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ

৩য় বর্ষ ।

{

মাঘ, ১৩২৫ সাল ।

৩য় সংখ্যা ।

গান ।

—:~:—

স্বর ভুলে যেই ফিরতে গেলেম

কেবল কাজে

লাগল বুকে তোমার চোখের

ভৎসনা যে ।

উধাও আকাশ উদার ধরা

সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা

মিলায় দূরে, নাগাল তাদের

মেলে না যে—

স্বর ভুলে যেই ফিরতে গেলেম

কেবল কাজে ।

বিশ্ব যে সেই সুরের পথের  
 হাওয়ায় হাওয়ায়  
 চিত্ত আমার ব্যাকুল করে  
 আসা যাওয়ায়।  
 তোমায় বসাই এ-হেন ঠাই  
 ভুবনে মোর আর কোথা নাই,  
 মিলন হবার আসন জরায়  
 আপন মাঝে  
 সুর ভুলে যেই সুরে ঝেড়াই  
 কেবল কাজে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

## স্বরূপ।

—(—#—)

স্বরূপ—সে যে চৈতন্যের কথা—সে যে সাধনার পুণ্যাগাথা—সে যে বাক্য মন ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানাতীত—সে যে সর্বত্বাতীত। তিনি যে, সকল দেশ—সকল কাল—সকল অহুভূতিতে সমভাবে ব্যাপ্ত থেকেও, সবাবি বাইরে। প্রতির কথাও—‘সর্বং ত্বদ্বিৎ ব্রহ্ম।’ তিনি আবার ‘গুহাহিতং—গহ্বরেষ্ঠং’ হ’য়েও স্বপ্রকাশ—জ্যোতির্ময়। এ’তে কিছুই বলা হ’ল না কোন্‌দিনই বা কে পেরেছে,—তা’র বিচিত্র কথা বলে’ শেষ ক’রতে পারবে না বলেই—কোরাণ বল্লেন—

“কোল-লাও কানাল্ বাহ’রো মেদাদালেকালেমাতে  
 রাবির লানাক্‌দাল্ বাহ’রো কাব্লা আন তান্ ফাদা  
 কালেমাতো রাবির ও লাও জেএ’না বেমেছলিহি মাদাদা।”

কোরআণ সূরা কহফ ৩ রুকু।

অর্থাৎ তুমি বল যে, ‘আমার প্রতিপালকের কথা লিখবার জন্য যদি সাগর মসী হর এবং তারি’ অহরূপ সাহাস্য ও পাওয়া যায় তা’ হলেও তা’র কথা লিখে’ শেষ কর’বার পূর্বেই সাগর নিঃশেষিত হয়ে যা’বে।’

পুণ্যদন্ত গঙ্কররাজ শিবমহিমন্তোত্ত্রে বল্লেন—

“অসিতগিরিসমংগ্রাং কজ্জলং সিদ্ধপাটম্।  
 সুর-তরুবরশাখা লেখনীপত্রমূর্খী।  
 লিখতি বসি গৃহিহা সারদা সর্বকালম্।  
 তদপি তবগুণানামীশগায়ং ন য়তি ॥”

অর্থাৎ সিদ্ধ-পাত্রের পূর্বত প্রমাণ কালি গুলে কল্পতরু-বৃক্ষের শাখা লেখনী ক'রে—পৃথিবীকে লিখবার পাতা ক'রে—স্বয়ং ভগবতী—দশভূজাও যদি যুগ যুগ ধ'রে লিখতে থাকেন—তবুও হে পরমেশ—তোমার মহিমার কথা লিখে শেষ ক'রতে পারবেন না। সোজা কথায় ব'লে বলা যায়—‘পৃথিবীর সব জল-কূপ, দীঘি, সরোবর, হ্রদ, নদী, সাগর—সকলি যদি কালি হ'ত—আর সমস্ত বন জঙ্গল কেটে কলম তৈরি ক'রে’ যাবতীয় নরনারীর হাতে হাতে দিয়ে তাঁর মহিমার কথা লিখতে বলতো এরূপ ভাবে দিনরাত প্রলয় কাল পর্যন্ত লিখলেও না কি তাঁর মহিমার কথা—কিছুতেই শেষ ক'রতে পারত না’। তাইতে গুণ্ডে পাঠ ‘অনন্তও তাঁর কথার অন্ত না পেয়ে ফিরে এ'লেন’—‘ব্রহ্মাদি দেবতা নাকি ধ্যানে তাঁকে শেষ কোরে’ দেখবেন ব'লে ধ্যানস্থ হ'লেন—যুগের পর যুগ চলে গেল তাঁরা ধ্যানেই রইলেন—সে মহা-অনন্তের অন্ত আর পেগেন না’।

তাঁর ছায়া স্বপ্নে দেখে’ কত রাজা রাজতন্ত্র ছেড়ে আনন্দে তাঁ'রি খোজে বন্যাসী হলেন,—তাঁরি জন্যে কত দেশের কত মহাত্মা হাসিমুখে আগুনে প্রবেশ ক'রতে একটুকুও দ্বিধা-বোধ করেন নি,—কারাগার, নির্বাসন, অকথা নির্ঘাতন, তরবারি, বিষ এমন কি ‘ক্রুশে’ও—তাঁ'র প্রেমে বাসর সজ্জা রচনা কোরে—অনন্তের কোলে আনন্দে ঘুমিয়েছেন। তাঁরি জন্যে কত মূনি, কত যোগী, অনাহার অনিদ্রায় শুষ্কদেহে গহন বিজন বনে ধ্যানে নিমগ্ন।—এ সব তো’ মিথো বলেও মনে হয় না—এ তো পাগলের পাগলারি বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নাই—এ তো কবিরও উদ্দাম কল্পনা নয়—জগতের ইতিহাস তা' বজ্রডাকে ব'লে যাচ্ছে। এ যে সেই—‘যল্লাভাৎ নাপরো লাভো যৎ সুখাৎ না পরং সুখং, যজ্ঞজ্ঞানাৎ না পরং জ্ঞেয়ং।—যাঁকে লাভ করলে আর অন্য লাভের আশা থাকে না—যাঁকে পেলে সকল সুখ-সকল আনন্দ লাভ হয়—যাঁকে জানলে আর তা'র চেয়ে বড় কিছু জ্ঞানবার থাকে না—পরানন্দে—পরশাস্তিতে দেহমনপ্রাণ ভুবে যায়। অন্যভাবে ব'লে গেলে এ কথা বলা যেতে পারে যে তাঁ'কে পেলে তাঁর জন্যে দেহমনপ্রাণ বিসর্জন করবার শক্তি জন্মে। তাঁর সামান্য ঈর্ষিতে এ সব সে হেলায় ত্যাগ ক'রতে পারে। সত্যপথের পথিককে ভয় বা মৃত্যু তার বিষম ভ্রুকুটি হানতে পারে না—এমন কি মহাকালও তার বিশাল চেউ হিমালয়ের চরণে ক্ষুদ্র নদীর তরঙ্গের মত হু'য়ে পড়ে দূরে স'রে যায়। অনন্ত সৌরভগত—সূর্য্য, চন্দ্র, তারা সবয়ে স'রে তাঁর উর্দ্ধপথ খোলসা করে’ দেয়—তাঁকে ও'নে সে কেবল উর্দ্ধে উঠতে থাকে—পতন আর তাঁ'র নাই—অনন্ত উন্নতির কথা তার কাছে বাস্তবে পরিণত হয়। বীধন-হার্য্য প্রাবণ-ধারার মত' প্রলয়ের বাতাসের মত' সে নিখিল ব্রহ্মাও জুড়ে ফেলে। বন ঘিরে' দাবানল যেমন নাচে—সমুদ্র ঘিরে' বাড়বানল যেমন খেলে—ঘননীলমেঘে যেমন বজ্র ঘো'রে—তেমনি ক'রে সে মহানন্দে ছুটিতে থাকে। সে তখন পরমহস্ত কবির মত এ'ল্লি ক'রে গাইতে গাইতে ভূষিত চাঁতকের নাগ কেবলি উর্দ্ধে ধাবিত হয়।

“ও অকূলের কুল,      ও অগতির গতি,  
ও অনাথের নাথ,      ও পতিতের পতি !  
ও নয়নের আলো,      ও রসনার মধু,  
ও রতনের হার,      ও পরাণের বঁধু !  
ও অপরূপ রূপ,      ও মনোহর বাণী !  
ও ভিখারীর ধন,      ও অবোলাও বোল—  
ও জননের গোলা,      ও মরণের কোল !”

এন্নিধারা স্বরূপের বিচিত্র রস ও গন্ধে ভুবন প্রাবিত হ'য়ে যায়—আকাশও পরিবাস্ত হ'য়—অন্তরে অন্তর—  
জদয়ও সে রসে ও গন্ধে মেতে উঠে।

মন যে দিন এ'রি গন্ধ প্রথম পে'ল সে দিন কি আবেগে—কি আনন্দে কস্তুরী-মৃগের মত সে যে ছুটতে আরম্ভ  
করলো তা' আর কি ব'লবো—কত পাহাড়—কত বন—কত তীর্থ—কত-না-দেশ সেই অমৃতের গন্ধ বহন ক'রে  
আনছে মনে করে' সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'ল আর ভাবতে লাগলো—‘এ প্রাণমন মাতানো গন্ধ কোথেকে  
আসছে’? হায়! এ যে তার নিজেরি’—নাভির-গন্ধ!

পরম ভক্ত কবি তুলসীদাস বলেছেন—

“সব হি ঘটমে হরি ভায় পহছানতা শাহি কোই।

নাভিকে স্নগন্ধ মৃগ নাহি জানত চুঁড়ৎ ব্যাকুল গোই ॥”

মনে হ'চ্ছে এ'রি গন্ধে একদিন আকুল হ'য়ে দেব দৈত্য দানব একত্রে সমুদ্র মন্থন ক'রে স্রুধার ভাণ্ড উঠিয়ে-  
ছিলেন—অসুর নিজ বুদ্ধির দোষে সে স্রুধাপানে বঞ্চিত হ'ল—সে স্রুধা দেবতার পান ক'রে অমর হলেন—সকল  
যুগে কি একই দশা? সে যুগে স্রুধার জন্য হ'য়েছিল সমুদ্র-মন্থন—এ যুগে হ'ল ধরণী-উৎখাতন। এ যুগের উত্থিত  
স্রুধা কা'র ভাগ্যে লভা—দেখবার বিষয় বটে। স্রুধা যে চিরকালই দেবভোগ্য—তবু অমৃতের পুত্রগণকে সজাগ  
করা কর্তব্য মনে হয়। যারা দ্বিতীয়-মন্থন আশায় ভুলে রহিবেন—তাদের ভাগ্যে যে তীব্র হলাহল—তা'তে আর  
ভুল নাই—এ যুগে তো' শিব এসে আর হলাহল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'বেন না—নিজ নিজ শিব নিজকেই খুঁজে  
নিতে হবে—সেটা পূর্বেই জেনে রাখা ভাল।

যা'ক সে কথা—মন তো' আর কস্তুরী-মৃগের মত বোকা নয়—তা'র যে বুদ্ধি আছে, তাইতে সে সব দেখে  
গুনে' ঠাওরায়—এ গন্ধ যে তার নিজেরি'। মন একে একে সমস্ত বাহির খুঁজে যখন দেখে ‘বাহিরে’ তা'র অমরত্ব  
নাই, তখন সে আপনাআপনি নিঃসন্তর' পানে ফিরে চাইতে বাধ্য হয়—তখন সে বুঝতে পারে—‘সেখানেই তা'র  
অমরত্ব অঙ্কিত—অতি গোপনে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।’ এই তার প্রথম শুভ-দর্শন—বহিমুখী প্রবৃত্তির এই  
প্রথম অন্তর্মুখীওন। সকল বিধে যা'কে খুঁজে পে'ল না আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে সে দেখতে পে'ল তাঁর ‘প্রকট-  
আগুন’ এই দেহ-ইঞ্জিন চালনা কোরছে। কঠোপনিষদে আছে—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥”

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান।’ এ কথাও  
শুনতে পাওয়া যায়,—‘রথে তু বামনঃ দৃষ্টঃ। পূনর্জন্ম ন বিদ্যতে।’ এই ‘রথ’ দেহ এবং ‘বামন’ যে আত্মা তা'ও কি  
আবার বোলতে হ'বে? বাইবেলেও আছে—“This is the temple wherein resides God”—অর্থাৎ এই  
মন্দিরেই ভগবান বাস ক'রেন।’ প্রকৃতই এ দেহ মন্দির—যেখানে প্রত্যক্ষ দেবতার বাস!

মন এইরূপে নিজ অন্তরে প্রবেশ করে—বুদ্ধির গর্ভে ঢুকে, বিবেক—চক্ষু'কি গ্রহণ করে—চক্ষু'কি জলেতে  
হাজার ব'হর রইলেও তা'র আগুন হারায় না—যখন ঠোকা যায়—আগুন বের হ'বেই। মন যে কত বড় তা'  
আর কি, ব'লব—ক্রীততেও আছে “মনসৈবানুদৃষ্টব্যম্”—এই ‘মনের’ দ্বারাই ব্রহ্মকে দৃষ্টি করবে। মন এইরূপে  
বুদ্ধির আশ্রয়ে নিজের ঘর আলো ক'রে দেখতে পার—বাহ্যতঃ এই দেহে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ঘ্র, হস্ত,

পদ, বাক্য পায়ু ও উপস্থ রূপ দশটি দরজা দিয়া বস্তুজ্ঞান গ্রহণ করে—যা'র সারথি 'বিবেক-বুদ্ধি', মন দৃঢ়-লাগাম ও গৃহস্থামী স্বয়ং 'চৈতন্য'। রাণ্যগীন রাজ উপাধি যেমন—জলহীন সাঁরাবর যেমন—মধুহীন মোটাক যেমন—শক্তিহীন প্রভু যেমন—তাঁ'রাও ঠিক তেমনি যারা ইন্দ্রিয়াদিকে, স্ববশে না এনেই মনে করেন বুদ্ধিকে জেনেছি—সে যে এদের সারথি—এবং বুদ্ধিকেও, আত্মার স্ববশে না এনে মনে মনে শুধু ভাবেন 'চৈতন্যই তো রথস্থামী'। আরও মোটা কথায় বললে বলা যেতে পারে,—যারা এ-সব কথা শুধু—মুখে মুখেই আঙড়ান—অবিশা হীন্রয় ও রিপুকে বশে না এনে—তাঁদের দশা ঠিক মল্লেকহীন বারিষ্ঠারের ভাবী মল্লেকের জন্য আইন নজীর উদ্ধৃত ক'রে বিবম বস্তৃতা দেবার মতো'।—যদি কোন অভিনেতা ভূতোর 'লিভারী-ওয়াল' পোষাকটি পারধান ক'রে শূন্য রাজসভাগৃহে এসে নিজ-প্রভুর সিংহাসনটি দখল ক'রে ভূতোর পাঠ আবৃত্তি কোরতে থাকেন তখন কি রিপু-পরতন্ত্র বাবু পণ্ডিতদেরও 'চৈতন্য-অভিনয়ের' কথা—কাহারও মনে উদয় হয় না? সরল সত্য কথায় বলতে গেলে তাঁদের দশা অবিকল ভূমিশূন্য রাজার—বড় বড় খেতাবের লেজের মতো। এ যে সাধনার ধন—সাধনা ক'রে লাভ করতে হয়;—নতুবা কি এতদেশে এত শাস্ত্রের উদ্ভব হ'ত আর মহাপুরুষদেরও এতকথা বলবার কি প্রয়োজন ছিল! সাধনার ধন সাধন দ্বারাই লাভ করতে হবে ব'লে উপনিষদ্ ভারস্বরে ব'লে—'নামমায়া বলহীনেন লভাঃ'। এখানে মনে করে দেওয়া ভাল চৈতন্যের উপাসক সকলেই হ'তে পারেন—এক্ষেত্রে বালক বৃদ্ধ, দ্বীপুরুষ, বড় ছোট, পণ্ডিত মুর্থ, ধনী নিধন, সকলি সমান—এই জন্যই নিখিল জগতের নরনারীকেই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে। এবং 'তিনি' এই সব কারণেই 'অধম-তারণ'—'পাতত-পান'—'পরম-দয়াল' ব'লে চির-পরিচিত। সত্য-ধর্ম—সনাতন-স্বরূপের-কথা চিরদিন—যুগে যুগে মহা-আশার বাণী-প্রচার ক'রে আসছে,—নিশ্চয় মনে রাখতে হবে নিরাশার বাণী অধর্মের—শয়তানের। পরম বৈষ্ণবতন্ত্র প্রেমানন্দ ব'লেছেন—

“শ্রীকৃষ্ণ ভক্তনে                      সবে অধিকারী

কুলের গরব নাই।

কহে প্রেমানন্দ                      যে করে গরব

নিতান্ত মুরখ ভাই॥”

এই কারণে এখানে বেদবেদান্তসর্গশাস্ত্রবেত্তা মহানহোপাধ্যায় তর্কচূড়ামণি বা বেদান্তবাগীশ—রাবণ রাজার মতও মহাপ্রতাপশালী ত্রিদিবেশ্বর—ঐশ্বর্য্য-তাকিয়া হেলানে বিলাসী মহাস্ত মহারাজ বা অগাণত শিব্য-ঘেরা মঠ-স্থামী বা ভারতী যখন গালে হাত দিয়া বসে শুধু ভাবনা করেন ও নিরাশায় মগ্ন হন বা অভিমান-ক্ষৌভ-ক্ষেপে শুধু স্মৃতিরই পরিচয়ে সাধুতার অভিনয়ে 'বাহবা' পান তখন তাঁদের সামনে দিয়া রুহিদাস মুচি, গুহক চণ্ডাল, যবন হরিদাস,—দৈতাপুত্র প্রহ্লাদ উর্দ্ধশিরে প্রভুর নাম গাথিতে গাথিতে রোমাঞ্চিত দেহে ও প্রেমাক্রমণে কি আনন্দে চ'লে যান তা' আর কি বল্বে—শুষ্কচাত্রী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও দেখে অবাক হ'য়ে. এঁদের চরণে নতশিরে ধূলাবলুহিত হ'ন। দরিদ্র বিহুরের ঘরে প্রভু, যুগে যুগেই এসে থাকেন—মদগন্ধিত রাজা হৃষণ্যধনের প্রাসাদে যান না;—প্রভু আমার—দীনহীন মুর্থ গোপ বালকবালিকার ভারও নিজ স্বন্ধে আনন্দে বহন ক'রলেন অতঃ মহারাজ কংসের ভার সর্কসহা ধরিত্রীকেও বহন ক'রতে দিলেন না;—দৈত্যরাজ বলি সে শিববাহিত পদ নিজের মাথায় রেখে চিরধনা হ'লেন—আর কি না তাঁরি গুরু ব্রাহ্মণ গুফাচার্য্য একটা চোখ কানা হ'য়ে বসে' ভাবনায় ডুবলেন। ভারতে যে ধনি বিদেশেও তা'ই। যে দিন ছুতোরের ছেলে মহাপুরুষ যীশু ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে তাঁ'রি প্রেমে প্রাণ বিসর্জন ক'রলেন—সে দিন কে ভেবেছিল যে ঈশ্বরের প্রেমই ঐ মহাআর দেহে প্রকট? যদিও যেতকায় দানবের হাতে

এমন মহাপুরুষেরও প্রাণ গেল, তবুও সে করণ দেবহৃদয় সকলের জন্যে অমূল্য প্রেম-সুখা ঢেলে' দিয়ে নিজ পবিত্র রক্তে দানবের পাপ ধোত করলেন। যে সব দানবের হাতে তিনি প্রাণ হারা'লেন—তা'দেরি বংশের ছেলেমেয়ে পরবর্তী কালে সেই মহাপুরুষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পুজো দিতে লাগল'—পশ্চিম চিরকাল জড়-উপাসক নতুবা কি যৌত্তর মত পরমভক্ত দেবতাকে ক্রুশবদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিতে হ'ত? কেন মনে হয় ব'লতে পারিনে—এসুগেও পশ্চিমে বর্তমান যুগোপযোগী পরমভক্ত মহাপুরুষ এসে দেখা দিলেও তাঁরও যে দানবের হাতে অপমৃত্যু হ'তে পারে—পশ্চিম গগনের হাব ভাব দেখে' তা' বেশ বুঝতে পারা যায়। ভারত চিরদিনই প্রভুভক্তের উপাসক—ভারত জড়োপাসকের পূজা কো'রতে য়ে'— তা'দেরি চালনায় যেন প্রভুভক্তের অহুসরণ ও সেবা ক'রতে কখন' ভুল না করেন ইহাই প্রার্থনা। এ দেশের মুক্ত-পুরুষেরা পুনঃ পুনঃ ব'লে গে'ছেন যে ভক্তের সঙ্গ ও সেবাই মুক্তির প্রধানতম প্রকরণ—এ পথে চললে ভারত যে আশীর অজয়ে—অমর হ'য়ে উঠবে তা'তে কি আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে?

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ ছেড়ে দিলে—বলতে হয় হজরত মোহাম্মদ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ 'বীর সাধক' যাঁরা সংসার-অশ্রমে থেকে বীরের ধর্ম অসি গ্রহণ করে 'নায় ও সত্যকে' প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন তাঁহাদিগকেই 'বীর-সাধক' বলা হইল। মনে হয়—যে অসি 'নায় ও সত্য' রক্ষার্থে উখিত হয় না—সে অসি কি অসি? হজরত মোহাম্মদ তাঁর অবস্থানুযায়ী সম্ভাব্য সমুদয় শক্তি—ভিতরের ও বাহিরের আহরণ করে—তিনি তাহা ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই প্রয়োগ ক'রেছিলেন—যে অসি তিনি ধারণ ক'রেছিলেন তাহা নায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই। কাফের সেই—যিনি সত্যস্বরূপ ত্রাণের ভজনা না করে অসত্যেরই ভজনা করেন,—তাইতে তিনি এমন-কি, আপন খুড়ো আবুজ্জহেল প্রভৃতিতে কাফের—'কাফেরের মত-কাফের' সংজ্ঞায় অভিহিত করে তাঁদেরও বিরুদ্ধে অসি, চালনা করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এমুলানের ভাষায় ইহাকে— 'জেহাদে আস্গর' বা 'সোগ'রা' বলেন। তিনি নিজে অসত্যসেবী—'মোনাফেক' মুসলমানদিগের বিপক্ষেই যুদ্ধ করে গিয়েছেন। তাইতে কোরাণের এ উক্তি— "ওমিনালাহে মা'ইয়াকুলো আনান্না বিল্লাহে ওবিল্ ইয়াওমিল্ আখেরে ওমাহম্ বোমোমেনী।" অর্থাৎ—(হে-মোহাম্মদ!) নান্যের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা মুখে ব'লে থাকে—'আমরা ভগবানে বিশ্বাস-স্থাপন ক'রেছি' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী—সত্যসেবী মুসলমান নহে (মোনাফেক)। প্রকৃত মুসলমান সেই যিনি নায় ও সত্যের জন্য—'আল্লাতালার জন্য তুচ্ছ প্রাণ সমর্পণ ক'রতে কখনও পিছু-পা হন না। এই কারণেই 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ-মোহাম্মদ রসুল উল্লা'—মুসলমানভক্তের নিকটে এত মধুর।

ভারতের মহাত্মা গুরুগোবিন্দও সেই ধাতুতে গঠিত ছিলেন এবং তিনিও শিখগণকে—বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, সংযমী-শিখভক্তগণকে সত্যদর্শে দীক্ষিত ক'রে নায়ের অসিই হাতে তুলে দিয়েছিলেন।—ভীমকায় ও বজ্রদেহে করাল অসি কেন?—বলাবাহুল্য শিখভ্রাতাগণও ঐ মুসলমানভ্রাতাগণের মতো বীরনাদে বলবেন—'নায় ও সত্য' রক্ষার জন্য। শিখ ভক্তগণের নিকটে 'স্ত্রী গুরুজী কা ফতে' তাই একরূপ প্রাণস্পর্শী ও উদ্ভাদক। মহাত্মা রামমোহনও যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠপথ—ভারতের মুক্তির পথ—নিজ প্রতিভাবে দেশবাসীর সম্মুখে এঁকে ধরে'ছিলেন কিন্তু তিনি তাহা নানা কারণে বাস্তবে—জীবন্ত মূর্তিতে গড়ে তুলে যেতে পারেন নি! তিনি ইহা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে বেদান্তের সার্বভৌম নীতি বা সূত্রই হিন্দুকে আবার এগুণে ধর্মজগতের শীর্ষস্থানে আনতে সক্ষম হ'বে। ইহার অমুসরণ করলে হিন্দু আবার এক বিশাল শ্রেষ্ঠ ভাতিতে পরিণত হ'য়ে—'আর্য্য-সনাতন' নামের গৌরব রক্ষা করতে সমর্থ হবে। তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুগামীরা তাঁকে ঠিকমত বুঝতে না পেরে—'ব্রহ্মচর্য্য' যে ব্রহ্মজ্ঞানের

মূলে একথা ভুলে গিয়ে—শিব গড়তে অন্য আর কিছু গড়ে' তুলেছেন—তাই এত অল্পদিনেও তাঁরা শক্তিহীন ও ঠাই ঠাই—তাঁদের এতুল আর দূর হ'লে তাঁরা যে মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত প্রকাশ হ'তে পারেন তা'তে আর ভুল নাই। ঈশ্বরের রাস্তা, এ সংসারে প্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'লে—‘ব্রহ্মচর্যা ও পবিত্রতা,’ ‘ন্যায় ও সত্যকে’—পূর্ণভাবে বাস্তবে পরিণত করতে হ'বে—একথা সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে ব'লেছেন। চৈতন্য সাধনার পথে প্রথমেই ব্রহ্মচর্যা বা সংযম শিক্ষা করা উচিত বলে' সে কালে ব্রাহ্মগণ প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সংযম রীতিমতভাবে শিক্ষা ক'রে তৎপর—গার্হস্থ্য-ধর্মে ব্রতী হ'তেন। ব্রহ্মচর্যা ব্যতীত ব্রহ্মলভের উপায় নাই ব'লেই মুণ্ডকোপনিষদে আছে—“সত্যেন লভাস্তপসা হোষা আত্মা সমাগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিতাম্।” অর্থাৎ তিনি (আত্মা) সত্য, তপস্যা, সমাগ জ্ঞান ও নিত্যব্রহ্মচর্যা দ্বারা লভ্য। কঠোপনিষদেও আছে,—

“যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত সমনস্বঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভ্যো ন জায়তে ॥”

অর্থাৎ যিনি বিবেকী, সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হ'ন—যা হ'তে ভয়-ভাবনার একেবারেই শেষ। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও রিপুকে জয় করাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্যা। ‘রিপুজয়’ অনেকে ‘রিপুত্যাগ’ বলে' ভ্রম করেন। সন্ন্যাস-ধর্মে ‘রিপুত্যাগ’ হ'তে পারে—সংসারীর ‘রিপুজয়’ শিক্ষা করাই উচিত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীনে সংযমিত হ'য়ে থাকবে—মন কখনও রিপু দ্বারা চালিত হ'বে না,—সোজা কথায় দেহ ও মনে রিপুর প্রভাব থাকবে না। কেহ কেহ এ কথা মনে করতে পারেন যে বাহ্যেই সংযত হ'লেই বুদ্ধি ‘রিপুজয়’ হয় কিন্তু সেরূপ ভাবনাও ভুল, কারণ তখনও স্বল্পভাবে মনে ইচ্ছার আঘাত করতে পারে। অতএব মনেও যখন রিপুর স্বল্পপ্রভাব থাকবে না—এমন কি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থাতেও—তখনই সাধকের রিপুজয় হ'য়েছে বুঝতে হ'বে। গীতায় আছে—

“কশ্চেইন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরৎ ।

ইন্দ্রিয়াণি বিমুঢ়াশ্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥”

এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি জয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে তৎপর সাধককে বিবেক-বুদ্ধি অমুঘায়ী ‘ন্যায় ও সত্যের’ জন্য ইচ্ছাদের প্রয়োগ করলে, ঈশ্বরের কার্যেই ইন্দ্রিয়াদি নিযুক্ত বা অপিত করা হ'ল বলে মনে হয়। ‘অবিশি’ এক একটা রিপুজয়ে বিপুল চেষ্টা ও নিত্য-অভ্যাসের প্রয়োজন হয় এবং তদরূপ মনের ‘একাগ্রতা’ ও ‘ঐকান্তিকতা’ অসাধারণরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠে—বুদ্ধি তখন স্পষ্ট—বাস্তবরূপে উপলব্ধি ক'রে যে মনের ভিতর এমন এক মহাশক্তি আছে যাহার বল পৃথিবীর সকল সমবেত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। বোধ হয় কাহারও অজানা নাই—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্যর্যের জালা কি তীব্র ও ভয়ানক। কত রাজরাজেশ্বর ও ইচ্ছাদের একটীর দংশনে অস্থির হ'য়ে নিরুপায়ে জলেপড়ে' মরেন—কখনও বা ধূলায় পতিত হ'য়ে মোহে কঁদে কঁদে সারা হ'ন,—কত মনীষী মহাপণ্ডিতও এঁদের একটীর শক্তির নিকট এক মুহূর্ত্তে পরাজয় স্বীকার করে' গৌরবহীন হ'ন—কত প্রবীণ বিখ্যাত বীর এঁদের একটীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের যুদ্ধ করিতেও অক্ষম;—এ'তেই বুঝতে পারবেন এই ছ'টাকে জয় করলে যে কত শক্তি ও কত আনন্দ জন্মে তা' আর কাউকে বলতে হবে না। আর আনন্দের পশ্চাতে শান্তি বা সন্তোষ আপনা-আপনিই এসে' পড়ে—তা'ও কি আবার বলতে হয়? রিপুজয়ে ‘শক্তি’ ও ‘শান্তির’ বাস্তব মুর্ত্তির দর্শন হয়। মহাচৈতন্য—ইউনিভারসিটির ছাত্র তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে—



ব্রহ্মধ্যানরূপ-ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রাপ্ত হ'ন। সোজা কথায় তখন তিনি ধ্যানস্থ হ'বার অধিকারী হ'ন—যে ধ্যানে অরূপের রূপ—অবাঙ্‌মনসগোচরমূকে দর্শন হয়। তাইতে' মুণ্ডকোপনিষদে লেখা—

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিবুদ্ধসমুত্ততস্ত তং পশাতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।”

—অর্থাৎ জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা অন্তর বিবুদ্ধ হ'লেই, ধ্যান দ্বারা এই আত্মার দর্শন হয়।

একটি কথা সকলের বিশেষ করে' মনে এঁকে রাখা কর্তব্য যে ‘ব্রহ্মচর্য্য’ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সিংহ-দুয়ারে' বসে' পাহারা দি'ছেন তাহা ধনীলোকের পোষাকপরিচ্ছেদের মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইচ্ছামত' গ্রহণ বা ত্যাগ ক'রবার জিনিষ নয়—ইহা ছ' একদিন, ছ' একমাস বা ছ' একবছর পালন করে' ইতার সম্যক শিক্ষা হ'য়েছে ব'লে কখনও মনে করা উচিত নয়—ইহা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আঁকড়ে' ধরে' থাকতে হ'বে ব'লেই ‘নিত্যব্রহ্মচর্য্য’ শব্দ সিদ্ধেরা ব্যবহার ক'রেছেন। রিপু জয় ক'রতে সাধককে কিরূপ যুদ্ধ চালি'তে হয় তাহা সিদ্ধ কবীরের ভাষায় নিয়ে দেওয়া হ'ল,—

“পকড় সমসের সংগ্রাম মৈ' পৈঙ্গিয়ে

দেহ পরয়ন্ত কর বুদ্ধ ভাঙ্গি।

কাট সির বৈরিয়া দাব জ'হকা তুই,

আয় দরবার মে' সীস নব্‌জি ॥

স্বর সংগ্রামকো দেখ ভাগে নহ'ই,

দেখ ভাগে সোঙ্গি স্বর নাহ'ই।

কাম ওর ক্রোধ মদ লোভসে জ্বনা,

মচা ঘমসান তন খেত মাই'ই ॥

লীল ওর সাঁচ সন্তোষ সাধী ভয়ে,

নাম সমসের তঁহা খুব বাজে।

কহৈ কবীর কোই জুঝি হৈ স্বরমা

কায়রা' ভীড় তঁহ তুত ভাজে ॥

সাধকা খেলতা বিকট বেঁড়া সতী

সতী ওর স্বরকা' চাল আগে।

স্বর ঘমসান হৈ পলক দো চরকা,

সতী ঘমসান পল এক লাগে ॥

সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জ্বনা

দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঙ্গি ॥

মুসলমান ভক্ত এসলামী ভাষায় এইরূপ সংগ্রামকে ‘জেহাদে আকুব্ব’ বা ‘কোব্বা’ বলেন।

ভিল যেকরূপ নিপীড়িত না হ'লে তৈল বাহির হয় না—দধি যেকরূপ মথিত না হ'লে নবনী তৈ'রি হয় না—জুঁহি যেমন না খুঁড়'লে জল উঠে না—বিনা ঘর্ষণে অরগি-নিহিত অগ্নির প্রকাশও যেমন হয় না, তেমনি ‘ব্রহ্মচর্য্য’ ভিন্ন মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ কখনও হ'তে পারে না। যেমন হাজার বৎসর ‘আশ্বিন’ ‘আশ্বিন’ বণে

মহাচীৎকার ক'রলেও শীতক্লিষ্ট ব্যক্তির শীত নিবারণ হ'য়ে শরীর গরম হয় না—‘জল’ ‘জল’ ব'লে চীৎকারেও যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির পিপাসা দূর হ'তে পারে না—তেমি' নিত্যব্রহ্মচর্য্যে ভিন্ন প্রকৃত ‘শক্তি ও শান্তি’ কখনও লাভ হয় না।

অনেকে আবার ‘ব্রহ্মচর্য্যকে’ একাতার- মিরাদিস খাওয়া বা কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রকরণ বা আচার-ব্যবহার মাত্র মনে ক'রেন—সে রূপ মনে স্থান দেওয়া যে অন্যায়, তা' একটু বিচার করে' দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যিনি জিহবার গোভে বা শুক্ল রসনার তৃপ্তিব জন্য অন্যায় আহারাদি ক'রেন—যিনি নিরামিষাশী হ'য়েও রিপুসেবায় তৎপর—আমার মনে হয় পরিমিতাহারী - নিরামিষী - জিতেন্দ্রিয় মাংসাশীর চেয়ে তাঁ'দের স্থান কখনও উচ্চ নহে। যা' খেলে শরীর সুপুষ্ট বলশালী কশ্মঠ ও নীরোগ থাকে এবং রিপু ও তৎসঙ্গে মনের আত্মাধীন থাকে অর্থাৎ যাহাতে শরীরের পূর্ণ বিকাশ হয় অথচ রিপুও বশে থাকে মনে হয় সে রূপ আহারই শ্রেষ্ঠ ;—যদি ‘সাত্বিক’ নামের কোন সার্থকতা থাকে তবে এইরূপ খাদ্যাদিচ ‘সাত্বিক আহার।’ এই জন্যই বোধ হয় গীতাতে সাধককে ‘পরিমিতাহারী’ হ'তে বলে' গিয়েছেন। সোজা কথায় ‘পরিমিতাহার’কে ব'লতে হয়,—‘না-কম, না-বেশী’ অর্থাৎ কম খেয়েও শরীর চর্চন করা পাপ—আবার বেশী খে'রে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া বা শরীরকে রোগ প্রবণ বা রোগযুক্ত করাও তে'মি' পাপ। চৈতন্য তো' আহার ক'রেন না—তিনি যে দেহরূপধরে বাস করেন সেই ঘরখানা তাঁর বাসের সম্যক উপযোগী ক'রে রাখবার জন্যই আহার,—সেই খাদ্যই কি শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয় না— যাহাতে দেহের পূর্ণ উৎকর্ষ বা অভিযুক্তি হয়? যে-দেহের পূর্ণ বিকাশ যে-খাদ্যে হইবে তাহাকে তাহাই দিতে হইবে— বলা বাহুল্য অবস্থা - পাত্র—কাল ও স্থান বিশেষে কখন' আমিষ—কখন' নিরামিষ—কখন' বা উভ-সংযুক্ত আহারের ব্যবস্থাও ক'রতে হবে। মাংসাদি আহার যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্তরায় হ'তে পারে না তাহা বেদপুরাণাদি পাঠে বেশ বুঝতে পারা যায়—মহাতপা অগস্ত্য ও মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ উভয়েই যে মাংসাহারী ছিলেন তাহা সকলেই জানেন বলে' এখানে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত ক'রে বিরক্ত করা অন্যায় মনে করলাম। অগ্নিও যে হিন্দুদের একজন মহাতেজস্বী দেবতা তা'তে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই—তিনি না হ'লে হিন্দুর আয়ুর্থাণিক যাগযজ্ঞাদি কিছুই করা যায় না—এমন কি বিগ্রহাদির আরত্নিক বা ভোগাদিপাকেও তাঁ'রই স্মরণ নিতে হয়। অভিমানী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণেরও দৈনিক আহার্য্য-প্রস্তুত বিষয়েও অগ্নির সাঙাঘা বাতিরেকে আর অন্য কোন উপায় নাই, অথচ বলতে লজ্জা হয়—অগ্নি, গো-ব্রাহ্মণ-শুকরাদি সমস্তই অগ্নিানচিত্তে যুগে যুগে গ্রহণ ক'রে আসছেন ব'লেই তাঁর এক নাম ‘সর্বভূক।’ এ কথা শুনে' কেউ মনে ভাববেন না যে আমি-অগ্নির নাম দেবতার গিটে থেকে কেটে দিতে বলছি বরং আমি মনে করি অগ্নির চেয়ে আর তেজস্বী দেবতা হ'তে পারে না ;—কারণ তিনি এত খে'য়েও সে-সমস্ত অনাহারসে জীর্ণ ক'রে তাঁ'র দেহে এক অসম্ভব বলের সম্ভাবনা বা সঞ্চার করেন অথচ তিনি শুদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয় থেকে' তাহা সতত পরমচৈতন্যের উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করে থাকেন। উপযুক্ত আহারে যে দেহের সম্যক পুষ্টি ও বল হয় এ কথা আর্ষাধ্যায়দের অবিন্দিত ছিল না ব'লেই তাঁরা ‘পঞ্চকোষে'র প্রথমই ‘অন্নময় কোষ’ উল্লেখ ক'রেছেন। অধিকন্তু তাঁরা দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রিয়-সংযম ও রিপু জয় ভিন্ন দেহের ও মনের পূর্ণতম-বিকাশ কখনও হ'তে পারে না।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দিলেও ইতিহাস যুগের মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের করুণায় ছল্ ছল্ লাগণে ঢল্ ঢল্—প্রশান্ত ও উদার—সৌম্য ও মিষ্ট অপূর্ব মধুর দেব-মুগ্ধতিথানি মনে জেগে উঠে। মহাপুরুষ কয়েক বৎসর কঠিন যোগাভ্যাসে নিষ্কৃৎ, হ'য়ে স্কুমার—স্বকোমল নবনীতুল্য দেহকে অনাহারে বা স্বনাহারে

কঙ্কালসারে পরিণত ক'রেছিলেন অথচ যে জনা এত কষ্ট সহ্য করলেন তা'র কিছুই লাভ ও'তে হ'ল না—সে হৃদয়বিদারক অবস্থার বর্ণনা আমি এখানে করব না কিন্তু যা'রা আহারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বা আহার সংযমিত হ'লেই রিপু জয় বা মন বশ হয় মনে করেন—তা'দের স্মরণের জন্য এ কথা উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলেম না। আবার বুদ্ধদেবও যে তাঁ'র দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে জনৈক কুণ্ড নামক কন্ঠকার ভক্তগৃহে শূকরের মাংস ভক্ষণ ক'রেছিলেন—তজ্জনা তাঁ'র দেহত্যাগের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় নি'—এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সমগ্র মুসলমানজগতের পূজ্য মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও সমগ্র খ্রীষ্টানজগতের পূজ্য মহাপুরুষ যীশু, উভয়েই যে মাংসাহারী ছিলেন তদ্বিষয়ে আর বেগী কিছু বলা অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। আশা করি এই সব বিষয় নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি দি'য়ে বিচার করে' আহার ও ব্রহ্মচর্যের পার্থক্য বা সংযোগ বুঝে' প্রকৃত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে কেহই কুণ্ঠিত হবেন না।

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পর সাধক ধ্যানের অধিকারী হ'ন ইহা পূর্বে বলা হ'য়েছে। এখানেই যা' কিছু অধিকারীর বিচার—বল্লে বলা যায়। অর্থাৎ যা'র হাস্ত্রয় সংযম ও ত্রিপুজয় হ'য়েছে—তিনি নিরক্ষর মূর্চি বা মেথর হ'লেও ব্রহ্মরূপধ্যান করবার অধিকারী হ'লেন—রিপুপরশ বেদান্ততত্ত্ব বা ভাগবততত্ত্ব, স্বামী বা ভারতী, রাজর্ষি বা মহর্ষি—অজিতেন্দ্রিয় কেহই সে অমূল্য ব্রহ্মরূপ ধ্যান—প্রকৃত ধ্যান করতে সক্ষম ন'ন। এ কথা ভুলে যা'রা চোখ বুজে' ধ্যানে ব'সেন—তা'দের এই ধ্যানে যাহা লাভ হয় তাহা প্রকাশ ক'রে বল্লে অনেক বিদ্যাদিগ্গজের মাথা হেঁট করতে হয়,—সুখ হেঁট নয় অনেক সময় মাথা মুড়ে' ঘোল ঢাল্লেও সেরূপ ধ্যানের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। পাতঞ্জল ব'লেছেন—“তত্র প্রত্যায়ৈকতানতা ধ্যানম্”—চিন্তাবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। নদীর স্রোত যেমন একটানা ব'য়ে যায় অমনি সাধকের চিন্তে ব্রহ্মরূপের ভাবনা অবিরত আগুতে থাকে—ত্বিক প্রথম যৌবনের গভীর ভালবাসার টানের মতো। বাহিরে কত কাজ হ'চ্ছে কিন্তু মনে যেন তা'র প্রিয়তমের মূর্তিই ভাসছে। এই প্রিয়তম আজ স্বরূপ বা সত্য। স্মৃতিতে আছে “এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমেতি”—ব্রহ্মের অপর নাম সত্য। যীশুও ব'লেছেন “Truth is God”—সত্যই ঈশ্বর। সিদ্ধ কবীরও ব'লেছেন—

“কোই রহীম কোই রাম বখানৈ

কোই কহে আদেশ।

কহে কবীর অন্ত না পৈহো

বিনা সত্য উপদেশ ॥”

আরও ব'লেছেন—

“জিন কে নাম না হৈ হিরে ॥

ক্যা হোবে গল মালা ডালে কহা সুমিরণী লিরে।

ক্যা হোবে কালী মে' বস কে ক্যা গঙ্গাজল পিরে।

হোবে কহা বরত কে রাখে কহা ভিঅক শির হিরে।

কহৈ কবীর শুনো ভাঙ্গৈ সাধো জাতা হৈ জম লিরে।”

রিপু-জয়ী মন এই বিচিত্র ও অন্ত-হীন সত্যকে ধ্যানে, একান্ত ও একাগ্র চিন্তে ধারণা করতে প্রয়াস পান। বলা বুধা রিপু জয় হ'লেই ‘জ্ঞান ভক্তি’ হয়। যখন ইন্দ্রিয় জয় হয় তখনই প্রকৃত ইন্দ্রিয়াভীতভাব সাধক বুঝতে পারেন এবং রিপু জয় হ'লে মন বদ্ধ হয় এবং সাধক তখন বেশ বুঝতে পারেন আত্মা মন-পার বা মনাতীত।

তেমনি যখন বিজ্ঞ-জ্ঞানে ধ্যান দ্বারা ভাগ্যানান—স্বরূপ দর্শন করেন তখনি' সাধক ঠিক বুঝতে পারেন যে ইহা প্রকৃতই জ্ঞানাতীত। 'ভাগ্যানান'—বললাম এই জন্যে যে কঠোপনিষদ ইহা লেখা আছে—

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যা, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমৈবৈষ বৃণতে তেন লভ্য, স্তমৈষ আত্মা বিবৃণতে তমুংস্বাম।”

অর্থাৎ ‘এই আত্মা উৎকৃষ্ট বচনের দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারাও যায় না। ইনি যে ব্যক্তিকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই ইহাকে পাইবেন, সেই ব্যক্তির নিকট ব্রহ্ম ‘স্বরূপ’ প্রকাশ করেন।’ সাধারণ ভাবে বলতে গেলে—চাষী যেমন সারা-ছর কষ্ট করে চাষা আবাদ করলেও সময় মত বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হয়, তেমনি তাঁর কৃপা-বৃষ্টি বিনে স্বরূপ-দর্শনরূপ ফসলের আশা নাই বলে একরূপ কথা উপনিষদে লেখা,—মনে হয়। এ কথা তিনিই বলবার অধিকারী যিনি সাধনার ‘ইন্টারমিডিয়েট’ রূপ ধ্যানের পরীক্ষারও পাশ হয়েছেন। যে কথা যেখানে বলা উচিত সেখানে সেটি না বলে তাঁর সম্যক প্রয়োগ হয় না এবং গাধার পিঠে মানুষ না চড়ে—মানুষের পিঠে গাধাকে উঠিয়ে দেবার মতো হয়। অনেকে এমন আছেন সাধনার কথা অধিকক্ষেত্রেই উল্টো ভাবে প্রয়োগ করে থাকেন তাই কারণ তাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ না করে সর্বোচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী বলে পরিচয় দেন। আবার এটুকুও বলি, সাধনা করে যারা বলেন, তাঁরা আমাদের চিরপূজ্য। সাধনার ক্রম জেনে সাধনার বাখ্যা করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত—আদৌ সাধনার পথে না যেয়ে যারা অতীত মহাপুরুষদিগের প্রতি বিজ্ঞ বা কটুক্তিপ্রয়োগ করে স্বকীয় বিদ্যা জাহির করতে ক্রটি করেন না—তাঁদের এ-বিদ্যা বা সভ্যতা যত কম প্রচার হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সাধনা অহুমানের বা শুদ্ধ অহুভূতির নহে—বা কেবল ভাবের প্রতিমাও নহে—ইহা এক অচিন্ত্যনীয় ভাবে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ। মনে হয় যে মহাপুরুষ বাহা সাধনা করেছেন তাহাই তাঁহার দেহে প্রকট হয়ে তজ্জপ দেবতার সৃষ্টি করেছে। এই কারণে শ্রুতি বলেন—‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।’ এমন কি সাধারণের মুখেও শুনতে পাই,—‘বাদশী ভাবনার্হস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।’

সত্য বা ব্রহ্মের ধ্যান অর্থে সহজ ভাবে কি বুঝতে হবে? যেমন ইন্দ্রিয়াদি সংযম বা রিপুঞ্জয় প্রথমে মনে অহুভূত হয়ে পরে উহা মনে ও দেহে জয় হইলেই উহা বাস্তবে পরিণত হ'ল এবং তাহার প্রকট মূর্তি সাধক দেখতে পেলেন, তেমনি ধ্যানেও আত্মা বা স্বরূপ দর্শনের একটি সুস্পষ্ট সত্যছবি দেখতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণনা করতে গেলে যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অর্থাৎ সিদ্ধ বা মহাপুরুষদের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে তাঁরা যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সব আপাতবিরুদ্ধ বাক্য ধ্যানে সম্যক ও নিঃসন্দেহ রূপে নিমাংসা করে—উহা দেখে—বাস্তবে যতদূর সম্ভব গড়ে তুলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ সোজা কথায় বলতে গেলে, এমনি করে বুঝান যেতে পারা যায় বলে মনে হয়,—‘আত্মার জাতি নাই’ এই একটা কথা—আত্মা সম্বন্ধে—মহাপুরুষের উক্তি;—যখন মনে মীমাংসা করে সুনিশ্চিতভাবে সমস্ত মানুষ এক বলে’ বিশ্বাস হ'ল তখন সাধক ধ্যানে উহা পেলেন—ধ্যানে যে প্রকট মূর্তি সাধক দর্শন করলেন উহাই ভাবের মূর্তি বলা যেতে পারে এবং উহা ধ্যানে স্থায়ী হ'লে ‘ভাব-সিদ্ধ’ বলে ক্ষতি হয় না—আবার যখন সাধক নির্বিকার চিত্তে অগ্নানবদনে—প্রীতির সঙ্গে হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি সর্বজাতিরই অন্নাদি গ্রহণ করতে লক্ষ্য হ'লেন তখনই তাহা বাস্তবরূপে প্রকাশ হ'ল বুঝতে হবে এবং উহা ‘করণ-সিদ্ধ’ বলা যেতে পারে। এইরূপে ‘আত্মার সর্বত্র সমভাবে স্থিতি’—একটা উক্তি। তা' হ'লে তিনি নির্জনে—বনেও যেমন, সংসারেও তেমন;—তীর্থেও যেমন—আমাদের সামনেও

তেমন ;—মন্দিরে মঙ্গলদেও যেমন—অস্ত্রাজের ঘরেও তেমন ;—চন্দনে যেমন—বিষ্ঠায়ও তেমন ;—মাথার উপরে যেমন—পায়ের নীচেও তেমন ;—স্থলেও যেমন—স্থলেও তেমন ;—ইত্যাদি বাক্যগুলি ভাবনায় যখন সত্য বলে মনে স্থির ও অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে তখনই উহা ‘ভাবসিদ্ধ’ এবং যখন সাধক তীর্থাদি বা মান্দরাদিতে অবস্থাচক্রে গেলেও তজ্জন্য পৃথক্ কোনরূপ বিশেষভাবে উদয় হয় না অর্থাৎ সর্বত্রই ‘একভাব’—তখন ঐ উক্তির মর্ম বাস্তবে পরিণত হ’ল এবং তখনই ‘করণ সিদ্ধ’ বলা যায়।

এইরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—বেদযজ্ঞ মন্ত্রাদি—পাপ পুণ্য—সুখ দুঃখ—কর্ম অকর্ম—শুচি অশুচি শত্রু মিত্র—পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা—গুরু শিষ্য—দিবারাত্রি—আলো অন্ধকার—মৃত্যুভয় বা যে-কোনো ভয়—সাকার নিরাকার—বাহ্য অন্তর—লক্ষণ অলক্ষণ—ভূত ভাবযাত বস্তুমান—কাল মহাকাল প্রভৃতির তত্ত্ব ভেদ করে’ ইহা অমুভূতিতে পরিফুট রূপে প্রকাশ ও বাস্তবে দর্শন হ’লে এবং তৎসঙ্গে পরমপুরুষের রূপালাভ সমর্থ হ’লে সাধকের নিকট স্বরূপের অগন্ত ও জীবন্ত মুক্তি প্রত্যক্ষ হয়। সিদ্ধেরা একে আত্ম, সূর্য্য, জ্যোতি বা ‘নূর,’—হিরন্ময়কোষ প্রভৃতি আখ্যায় ব’লেছেন। চক্ষুস্থান ব্যক্তি নিরাকার ও মূর্খ হ’লেও সূর্য্যের উদয় দেখে যেমন ব’লে ‘দিন হ’য়েছে’—তেমনি সাধনার পাপ ও সংশয় দূরীভূত হয়ে’ অজ্ঞান-অন্ধকার সত্য-সূর্য্যের উদয়ে বিনষ্ট হওয়ার এবং ত্রিতাপজ্বালা না থাকায়—পরানন্দ ও পরাশাস্তির বিমল মধুর জ্যোৎস্না নিত্য-আলোকরূপে সাধক-হৃদয়ে ফুটে উঠে বা ভাসতে থাকে—তখন তিনি বেশ জানতে পারেন আত্মা, স্বপ্রকাশরূপ দেখা দিয়ে আজ তাঁকে ধন্য ক’রেছেন। নানক এম্মি সময়েই একথা বলতে পেরেছিলেন—

“প্রভু তেঁই তব শরণাই আয়া

উতারা গেয়া মেরা মনুকা সনুসা যব তেরে দরশন পায়।”

এবং উপনিষদেও লেখা—

“ভিদ্ভাতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্যাস্তে সর্বসংশয়া ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।”—“ন স পুনরাবর্ততে—ন স পুনরাবর্ততে।

সাধনার এই অবস্থা ‘জীবমুক্তি’ বলে অভিহিত—ইহাই অরূপের অপরূপ রূপ—স্বরূপ বলে’ কথিত। তখন তিনি জীবমুক্ত অবস্থায় চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণের ন্যায়, বাক্য থাকিতেও বাক্যহীন ন্যায়, মন-সত্ত্বও মনরহিতের ন্যায় এবং প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণের ন্যায় নিঃস্বার্থ হ’য়ে বিচরণ করেন। এবং এ সকলেরই যে অতীত তিনি তখন আর তাহা কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে হয় না। পাওজলের ভাষায় ইহাই সর্বজ বা সর্বিকল্প সমাধি। এই ‘আত্মতত্ত্ব’ লাভ হ’লে তৎপর সাধকের ‘পর-তত্ত্ব’ লাভের অধিকার জন্মে। ‘পর-তত্ত্ব’ বা পরমাত্মা অন্য ভাষায় নিকর্ষজ বা নিক্সিকল্প সমাধি। আবার এই ‘পরতত্ত্বই’ প্রেম বলে’ পরিচিত। অথও সত্য লাভের পর প্রেমের জন্ম। মহাপুরুষ যীশু অবশেষে ব’লোছিলেন “Love is god.”—‘প্রেমই ভগবান’। এই প্রেমের জন্যই শিব পাগল—ক্রীমতী রাধিকা উন্মাদিনী—এই প্রেমেরই মহাপুরুষ চৈতন্যদেবও উন্মাদ হ’য়ে সাগরে ডুবে’ পরমটোতনো মিশেছিলেন। এই প্রেমের কথাই সাধক কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ‘অমৃতের উৎস’ কবিতায় ছুটিয়ে’ দিয়েছেন—এ’রা “একমুঠো কথার—আদিরস” তাঁদের কবিতায় ঢেলে যা’ন নি—অমৃত ঢেলে’ গিয়েছেন বলে পরমভক্ত রায় রামানন্দ ও ক্রীচৈতন্য ইহা কত ভালবাসতেন—এখনও এ সব কথার বহু ভক্ত কেঁদে কেঁদে ধূলায় গড়াগড়ি যা’ন। সে যে প্রেমের কথা—পরম ব্যাথার কথা! পরম ব্যাথার কথা ব’লেই—

সে-কথা 'শ্রুতান্তনুগুণ এবং আরও বিচিত্র। সে কথার একটু আভাস দে'বার জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত হ'তে সামান্য ক'টি ছত্র উদ্ধৃত করে' এ প্রবন্ধ শেষ করা হ'ল।

“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম      নেন জ্ঞানদেহে  
সেই প্রেম নুগোকে না হয়।  
বদি হয় তার যোগ      কত না হয় বিরোগ  
বিরোগ হইলে সে কত না জীয়ে ॥”

\* \* \*

“শুদ্ধ প্রেম সুখদিক      পাঠ তার এক বিন্দু  
সেই বিন্দু জগত ডুবার।  
কহিবার কথা নর      তপাপি বাউলে কর  
কহিলে বা কেবা পতিয়ার ॥”

বৃদ্ধ

## মিলন-সন্ধ্যায়।

—:—

আজিকে কেন মোরে কত যে কাজ  
করিতে হবে ভাবি তাই  
এ কি এ মন পীড়া কহিতে লাজ  
অথচ কিছু নাশি পাই !  
দৌঘীর ঘাটে গিয়ে ফিরি হরিতে  
গামোছা ফেলি ঘাটে আসি বাড়ীতে  
কে যেন মোর তরে অপেক্ষি আছে ঘরে  
আমি যে বধু ধীরে চলিতে হয়  
কিছু যে মনে আজি নাহিক রয়।  
গৃহের কাজে মন লাগেনা মোটে  
যা'করি এলো মেলা তাই  
এঁটোটি না ঘুচায়ে পুকুরঘাটে  
ভোজন শেষে ছুটি যাই !

ডুমুর, আতা, জাম, বাঁশেতে ঘেরা  
 পুকুর-পাড় হ'তে বাবলা বেড়া  
 আ'লের বাঁকা পথে কে যেন দূর হ'তে  
 আসিছে দ্রুতপদে এ বাড়ী পানে  
 বলিয়া বারেবারে নয়ন ঠানে ।

ঢাকিতে চাহি যত প্রাণের কথা  
 সকলে তত বুঝে লয়—  
 কেন যে কাঁপে হাত, রাঙিয়া উঠে  
 কপোল কাণ অসময় ।  
 ঠাট্টা যদি কেউ তা লয়ে করে  
 সরমে মরে যাই কথা না সরে—  
 মিথ্যা দিয়ে শত বুঝাই নানা স্রুত—  
 যদিও ধরা পড়ি তখনি বটে  
 অসল কথাটি ত' তবু না ফোটে !

কি যেন হয় নাই, কি কাজ সবি  
 রয়েছে বাকী সারিবার  
 মনেও পড়ে না কি—বোঝার মত  
 হৃদয়ে রহে গুরুভার !  
 হয় ত আসিয়া সে দেখিবে তাই  
 আমার আয়োজন কিছুই নাই  
 অক্ষমতা তাই ঢাকিতে এত চাই  
 বুঝা আড়ম্বরে ব্যস্ততায়—  
 স্থখে কি দুখে এ যে বোঝা না যায় ।

যেমন আসিবে সে অমনি সবে  
 তারে যে আগে ঘিরে নিবে  
 সোহাগে সমাদরে চুম্বতে স্নেহে  
 প্রবাস দুখ ঝাড়ি দিবে !

উপোষী পিপাসিত এ চিতে মোর  
কি যে সে কাতরতা বেদনা ঘোর  
বুঝিবে বল বা কে ? দেখিব দ্বার ফাঁকে—  
অধীর হয়ে ক্ষণ গণনা করা  
নদীর তটে থাকি পিয়াসে নরা !

হা বধু ব্যথা তোর সবার বেশী,  
সবার চেয়ে বুঝি, ভাই !  
তাই কি তোরি বেশী ছলনা হেন ?  
এ বিনা বুঝি গতি নাই ।  
প্রেমের নিকষ কি বধুর ছল  
অধরে হাসি রাগ নহনে জল ?  
কে জানে অত শত—সময় যায় যত  
হৃদয় দুর দুর করিছে তত  
অধীর ব্যাকুলতা জাগিছে কত ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## মিষ্টি সরবৎ ।

—:~:—

( ১০ )

আমিনার সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আহমদ সাহেব একটু বিপন্ন হইলেন । ভাবিয়া চিন্তিয়া এক টিপ নস্ত টানিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন “কাজটা ভাল হচ্ছে না আমিনা, ওহায়েদের জীকে অমন ভাবে আঁকারা দিয়ে তুমি বড়ই অন্যায় করছ—তাকে বলে দিও, এসব রাগারাগির ফল ভাল হবে না, আমি শুনলুম ওহায়েদ নাকি ক্ষেত্র বিয়ে করবার অস্ত্রে খেপেছে ।—”

আমিনার হুই চোখে দৃষ্ট বিছাৎ খেলিয়া গেল ! স্বামীর মুখপানে চাহিয়া জ্বলজ্বল করিতে বলিল “কি ? বিয়ে করবার অস্ত্রে খেপেছে ? ওঃ ! আর তুমিও বোধহয় তার বিয়ের খরচ গুছিয়ে নিয়ে, বরকর্তার সাজ সেজে তৈরী হয়ে বসে আছ, কেমন ?—”

উদাস দৃষ্টিতে আনালার দিকে চাহিয়া, নিরীহ ভালমাসুকের মত অতি কোমলস্বরে আহমদ সাহেব উত্তর দিলেন, “অগত্যা ! আশ্রিত, অলুপ্ত, পেরারের চাকর, সে বেচারী যদি বিয়ের জন্য ঝোঁকই ধরে বসে, তবে আমি কি আর খরচের অস্ত্রে কুণ্ঠিত হতে পারি—”



রাগে আগুন হইয়া আনিয়া বলিল “বেশ, বেশ, বেশ! দাও তুমি তোমার পেয়ারের চাকরকে নিয়ে থাকগে, তুফানীর ভার বইল আমার ওপর—আমি ওর ব্যবস্থা করব! ওঃ, একটা বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সীমা রাখলে না, আবার আর একটা বিয়ে! গলায় দড়িও জুটল না! আহা, ভাগ্যে বাবা ওদের বিয়ে দিয়ে গেছিলেন, তাই আজ তুফানীর ওপর এত ভাব, বালি বিয়েটা যদি না হোত তো তুফানীকে পেত কোন চুলোয়?”

আহমদ সাহেব হঠাৎ বিয়ন খাইয়া থক থক করিয়া কাশিয়া উঠিলেন! তারপর কনালে মুখ মুছিতে মুছিতে হাত্তোজ্জল নয়নে আনিয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন “তা সে যে চুলোতেই তোমার তুফানী ছাই চাপা থাক, ও যখন ছাই উঠে তাকে টেনে বের করেচে, তখন তো ও নিজের দখলি স্বত্ব ছাড়তে পারে না।—এটা ঠ্যা কি না তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কোর, সে আইন টাইন পড়েচে—”

অত্যন্ত চটিয়া আনিয়া বলিল “তুমি ধান, তোমার তার জন্তে খটকা লী করতে হবে না। চাকরের বিয়েব ধুমধামে লেপেছে সেই ভাল,—” আনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সরিয়া বাইবার উপক্রম করিয়া তখনই মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে করিয়া বলিল “তা তুমিও নিজে এই সঙ্গে একটা করে এস, না,—বেশ ভালই হবে! চাকরের নতুন বিবি আস্তে, তোমার নিজেরও অগ্নি—”

আহমদ সাহেব হঠাৎ বাধা দিয়া, চাকর নির্মমে আনিয়াকে কাছে টানিয়া লইয়া, একহাতে নিজের বুকের উপর তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া অজ্ঞ হাতে নস্ত্রের টিপ তুলিয়া তাহার নাকের কাছে ধরিয়া সহাত্তে বলিলেন “নাও, নিঃশ্বাস টেনে বলতো এবার কি বলছ?—”

আনিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মুখ সরাইয়া লইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আরক্ত মুখে বলিল “গেলুন, গেলুন, ছাড়—”

বাস্তবশ্রে আহমদ সাহেব বলিলেন “এর বেলায় গেলুন, গেলুন, কেন? বল না, কি বলছ—”

আনিয়া রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল “ছেড়ে দাও—” আনিয়ার অবস্থা দেখিয়া আহমদ সাহেব নস্ত্রের টিপ ধরা হাতটা একটু দূরে সরাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহাকে ছাড়িলেন না। আনিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া স্কন্ধ হইয়া বলিল “এল্লি করেই নাচুমকে জন্মে কেলেতে হয়?”

অর্ধহৃৎক কটাক্ষ হানিয়া স্বামী বলিলেন “হু, বোঝা!—”

আনিয়া সে কটাক্ষের নম্র কি বুদ্ধিগ, এবং মনের অবস্থা তাহা কি হইল, তাহা অন্তর্গামীই জানেন। প্রকাশ্যে কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে বলিল “আমি বুঝতে চাই নে, বার সখ্ হয়, সে বুঝুক—পরক্ষণেই ব্যস্ত হইয়া বলিল “ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আমার চের কাজ।”

স্বামী ত্রস্তে বাধা দিয়া বলিলেন “নাও, নানলুন হার! স্বীকার করছি সখটা ষোল আনা আমারই,—এখন ঠাণ্ডা হও।—কতটা কাজ আছে? আমার কিছুই ভাগ দেবে না!”

আড় তোখে স্বামীর পানে চাহিয়া আনিয়া হাসিয়া কেলিল! জ্বলন্ত নয়নে নয়নে স্ত্রীতিবহ পুলকের বিদ্যাহ ধেলিয়া গেল! সাগ্রহে স্ত্রীকে বৃকে ওড়াইয়া ধরিয়া গাঢ়শ্বরে স্বামী বলিলেন “বড় শয়তানী করেছে!—এল্লি রাগই, কি করতে হয়?—”

হাসিমুখে স্বামীর কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া আনিয়া নিঃশব্দে বাড় নাড়িয়া,—সম্প্রতিভ ভাবেই জানাইল “হয়!”

স্বামী আবার হাসিয়া উঠিলেন! তারপর সেই কথা লইয়া ছজনে বহুকণ পরিয়া পরিহারের তর্ক চলিল, সে তর্ক আর কুরায় না! স্বামীর সনস্ত আপত্তি শুন করিয়া, নাগাসুও যুক্তির সাহায্যে আনিয়া পরম বিজ্ঞতার সহিত

মস্তবা প্রকাশ করিল যে স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে এক ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করেন তবে স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গে এগার ইঞ্চি পরিমাণ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে, ইহাতে স্বামীর রাগ করা অসম্ভব !

কথাটার অর্থোক্তিকতা লইয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলে অদুরন্ত তর্ক চলিবে, এবং এই আসন্ন সন্ধির মাঝে বিচ্ছেদের নূতন আয়োজনও হয়ত বা সুপ্রস্তুত হইয়া যাইবে ! বুদ্ধিমান্ আহমদ সাহেব, সুশীল কোমল ব্যবহারে ব্যাপারটা শোধরাইয়া লইয়া সত্বপায়ে আমিনার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন । আমিনা সলজ্জহাস্তে মুখ সরাইয়া লইয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “আচ্ছা, যাও, এখন অনেকক্ষণ গল্প করা হয়েছে, আর নয়, এবার ভদ্রলোকের মত ছিটকিনিটা খুলে দাও দেখি, চলে যাই—”

সকৌতুক নয়নে স্ত্রীর পানে চাহিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “পারিশ্রমিক ?”

কপট-কোপে ক্রভঙ্গি করিয়া আমিনা বলিল “ওঃ ভয়ানক ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে যে, কথায় কথায় পারিশ্রমিক ! আমার কাছেও হাত পাতছ ?—”

হাস্তোজ্জ্বল বদনে স্ত্রীর চোখে চোখ মিলাইয়া স্বামী উত্তর দিলেন “না হলে দিন চলছে না যে ! অবস্থা আশ্চর্য কাল অত্যন্ত শোচনীয় !—”

স্বাগতঃ ভাবে আমিনা বলিল “দ্যাখো আবার ঐ সব কথা বলবে যদি—”

বাধা দিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “হাঁ, হাঁ কল্পে মাপ কর । আশ্চর্য না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু পরচর্চাটা বড় তরুণী হয়ে পড়েছে, ওটা না হলেই চলবে না আমিনা, রাগ টাগ কোর না । মেহেরবাণী করে আমার কার্যোদ্ধার করে দাও । সংসারের গৃহিণী তুমি,—হাসি তামাসা নয়, আমিনা, সব সময় তোমার ছেলেমাছুষী শোভা পায় না, সংসারের শাস্তি শ্রুতলা রক্ষায় তোমার দায় ঢের, বুঝলে—” তাঁহার পরিহাসের স্বর পরিবর্তিত হইল ।

স্বামীর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে একটা গুরুভার দায়িত্বের সঙ্কেত আমিনার মনের উপর সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল । একটু বিচলিত হইয়া উৎকণ্ঠিত নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া আমিনা বলিল “আমি কি করব বল—”

স্বামী সন্তোষে আমিনার হাত নিজের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইয়া, কোমলভাবে বলিলেন “আমি ঠাট্টা করে তোমার রাগিয়ে দিয়েছি আমিনা, মাপ কর । ওহায়েদ বিষের কথা কিছুই জানে না, সে তেমন ছেলেই নয়—”

প্রতিবাদের স্বরে আমিনা বলিল “না, নয় ! সব খবর তো জান ! তোমার কাছে ভিজে বিড়ালটা সেজে থাকে, তুমি মনে কর, আহা মরি এমন চাকর আর হয় না ! চাকরের গুণ কত, তা তো জান না,—তুফানী বেচারাকে জালিয়ে মারে !”

নস্য টানিয়া একটু চিন্তিত ভাবে আহমদ সাহেব বলিলেন “কারণ কি ?—”

আমিনা বলিল “খোন্টাকে মালুম—তুফানীকে কিন্তু বড় উদ্ভাগ করে ! আহা, কি অন্যায় বল দেখি, রাত দুপুরের সময় বেচারাকে খেতে খুঁটে একটু ঘুমুতে গেছে, তখন কি না মিছে কথা বলে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে জ্বালাতন করা, এতে রাগ হয় না ?

আহমদ সাহেব নীরবে মুহু মুহু হাসিতে লাগিলেন, আমিনা অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল “ওধু তাই ! ওর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে জল করবার জন্যে, তোমার নবাব চাকর আবার তোমার সেই টাইগার কুকুরের বাচ্চাকে বিছানার ওপর তুলে নিয়ে গেছিলেন, একেই তুফানী কুকুর টুকুর হৃৎকণ্ঠে দেখতে পারে না, কাবেই ও

আরও চটে যায়। তাতেও তোমার সেই নবাব হটবার পাত্র নন, তিনি শুকে দেখিয়ে দেখিয়ে, কুকুর বাচ্চার মুখে মুখ দিয়ে চুমো খেয়েছেন, ওনলে বিদ্যো !”

আহমদ সাহেব হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ! আমিনা একটু ম্লান হইয়া অসন্তোষের সহিত বলিল  
“তা তুমি হাসবে বৈ কি ! তোমার কি বল না—

পরক্ষণে একটু গভীর হইয়া বলিল “না না, সত্যি, হাসি ঠাট্টার কথা নয়, এগুলো কি রকম অন্যায় বল দেখি—”

হাসি সংযত করিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “দ্যাখো আমিনা, ও সমস্যটা মীমাংসার ভার যদি আমার উপর দাও তো—আমি এখনই চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি করে দিতে পারি, কিন্তু তুমি স্বাধীন চটে আগুন হয়ে, এখনই হাত ছাড়া হয়ে যাবে, সে ভয়ও প্রচুর পরিমাণে আছে ! অতএব ও ছঃসাহস প্রকাশে কাজ নাই,—তোমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—ওহায়েদ দম্পত্যের বগড়া ঝাঁটি মেটাবার ভারটা ওদের উপরই দাও, ওরাই সে কাজটা সব চেয়ে সুস্থভাবে শেষ করে ফেলতে পারবে, তোমার আমার বিদ্যো বুদ্ধি সে ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে যাওয়া, সব চেয়ে নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ !—আর বাস্তবিক সত্যি কথা,—স্বামী স্ত্রীর বগড়া ঝাঁটি হারী করে রাখা, বড় কদম্বা অশাস্তিকর ব্যাপার !—”

ব্যঙ্গস্বরে আমিনা বলিল “আহা ! এর মধ্যে এত তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে তোমার ! ধন্য হলুম !—কিন্তু একটা কথা দ্বিভ্রাস্য করি,—বগড়া ঝাঁটি হারী করে রাখা কদম্বা অশাস্তিকর ব্যাপার হলেও—মূলে সেটা সৃষ্টি করা কিন্তু, খুবই সৌন্দর্যব্যাঞ্জক শাস্তির ব্যাপার, কি বল ? হাসছ কেন ? বল না ঠিক করে, সেটা খুব ভাল খুব আনন্দ-জনক, খুব মনোরম ব্যাপার, কেমন ?”

মানুষের মানুষত্ব বাহ্যিক মনোভাব আছে, মানুষের হৃদয় লইয়া, অন্যের হৃদয়কে অনুভব করিবার ক্ষমতা বাহ্যিক আছে,—প্রকৃত সত্যের নিকট নভশির হইয়া দণ্ড গ্রহণের ভেদাধিতা তাহারই থাকে ! আমিনার ব্যঙ্গপূর্ণ মন্তব্য-ভংসনটুকুর, আঘাত—আহমদ সাহেবের এতদৃঢ়তার অসঙ্কোচ পরিহাস-উজ্জল মুখখানা,—এইবার সংকোচ হজ্জাররাগে রাঙা করিয়া তুলিল ! অমাপ্যদী দৃষ্টিতে চাহিয়া, বিনয়ের স্বরে বলিলেন “মাপ কর, মাপ কর আমিনা,—সে কতুর মাপ কর, আমি নিজের দোষ স্বীকার করছি, সংসারে মানুষ মাজেরই ভুলটুকু হয়ে থাকে—কিন্তু সে ত্রুটি কি চিরদিনই মনে রাখতে আছে,—”

বাধা দিয়া আমিনা বলিল “আছে বৈ কি ! মনোস্তম্বক যা কিছু,—মানুষের মনে তা চিরদিনই ছেগে থাকে—”  
সজোর আমিনার হাত চাপিয়া ধরিয়া আন্তরিক মিনতিপূর্ণ স্বরে আহমদ সাহেব বলিলেন “চিরদিনই ! সমান ভাবেই ?”

আমিনা মুহূর্তের জন্য চমক বিচলিত হইয়া—তখনই আত্মবিস্মরণ করিয়া লইল, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু বেশী মাত্রায় উদাসভাব অবলম্বন করিয়া বলিল “সমানভাবে ? হ্যাঁ সমানভাবে সেই ব্যবহার করে চল, সমান ভাবেই সব আবার মনে থাকবে,—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ, সে হাতটা ছাড়াইবার জন্য এক টান দিল।

“সেটি হবে না,—” বলিয়া আহমদ সাহেব আরো একটু কোরের সহিত আমিনার হাত চাপিয়া ধরিলেন  
আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল “উহ-হ ছাড়, লাগছে—”

কুষ্ঠিত-বিনয়ের স্বরে স্বামী বলিলেন “বড় চটিয়েছি আমি, তোমার এত রাগ হবে, তা বুঝতে পারি নি,— এখন বড় ছুঃখ হচ্ছে, বল তুমি, আমার কিসে মাফ করবে—”

আমিনা বাতিবাপ্ত হইয়া বলিল “হবে, হবে,—সে হবে এখন! উঃ, চুড়িগুলা যে ভয়ানক লাগছে, হাতটা যে গেল আমার —”

আহমদ সাহেব হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাতমূল চাপিয়া ধরিলেন, পাছে আমিলা পলাইয়া যায়! কিন্তু আমিলা পলাইল না. উণ্টা তাহার চোখের সামান, বন্ধনমুক্ত হাতখানা তুলিয়া ধরিয়া, সঙ্করণ অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিল “দ্যাখো দেখি কি করলে? চুড়িমুক্ত হাতখানা এতদিন জোরে মুড়িয়ে ধরেছ যে, হাতে রক্ত জমে গেল—”

অপ্রতিভ আহমদ-সাহেব, সমস্ত তাহার হাতখানা ধরিয়া স্ক্রুশীল পেশিমণ্ডল টিপিয়া, এদিকে ওদিকে রক্ত পরিচালন করিতে করিতে, ঈষৎ অনুতপ্ত-স্বরে বলিলেন “দ্যাখো দেখি বিদ্যা!—তুমি এম্মি পাগলামী স্ক্রু করেছ যে আমার স্ক্রু পাগল বানাবার যো!—তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্যমনস্ক হয়ে, তোমারই হাত এম্মি মোরে মুঠিয়ে ধরেছি যে,—ছিঃ!—আর লাগছে?”

স্বস্তি-গঞ্জক স্বরে আমিলা বলিল “না, আর না, বেশ হয়েছে, ছেড়ে দাও।” আমিলা হাতখানা টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘড়ির দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল “দেখতে পাচ্ছ?—এবার ভালমাসুকের মত জামাজোড়া পরে বেড়িয়া পড় দেখি, ছয়রাটা খুলে দাও, আমি আগে চলে যাই—”

আহমদ সাহেব বলিলেন “ঐ! আসল কথাই যে অসমাপ্ত রয়ে গেল! সে হবে না, কথাটা ঠিক করে ফেল, বল আজ ওহায়েদ মিস্তার দ্বী নীচে যাবে ত?”

ঘাড় নাড়িয়া আমিলা বলিল “না, সেটা হচ্ছে না, তোমার অহঙ্কারী চাকরের স্পর্শকে প্রত্যয় দেবার জন্য তুফানী যে আগেই ঘাড় নীচু করবে, সেটা আমি হতে দেব না —”

বিপন্ন হইয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “আহা মেহেরবানী করে, এ যাত্রা তাকে ক্ষমা করতেই বল,—”

আমিনা অধিকতর বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল “আচ্ছা গরজে লোকত তুমি! কে তুফানীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে যে তুফানী আগেই গায়ে পড়ে তাকে ক্ষমা করতে বাবে?”

আহমদ সাহেব বলিলেন “আহা চাইবে, চাইবে—ওহায়েদ ক্ষমা চাইবে, না হলে পৃথিবীপুঙ্খ মানুষের ঘরকল্লাই চলতো না! আগে, আপাততঃ হুটোকে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগটা দাও—”

আমিনা হাসিয়া ফেলিল!—ঘাড় ফিরাইয়া টোবলের বইগুলার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখোচোখী চাইলে,—এ রকম ক্ষেত্রে মানুষের যে কি-রকম বিভ্রান্ত ঘটতে পারে সেটা তোমার আশীষাদে আমার খুব ভাল রকমই জানা আছে, সেই ক্ষেত্রেই তুফানী বেচারী অত যত্নে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে!—” তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল “আচ্ছা চাকরের জন্তে তোমার এত মাথাব্যথা কেন, বল দেখি?”

ঈশ্বরস্বরে আহমদ সাহেব বলিলেন “সেটা বলব এখন এরপর—খুব সঙ্গোপনে! আপাততঃ বল—”

বাধা দিয়া আমিলা বলিল “আপাততঃ নূতন কথা কিছুই বলবার নাই, ঐ এক কথা,—তুফানী যেতে পারবে না, যদিও যায়, আমি তাকে যেতে দেব না—” পরক্ষণে কি একটা কথা মনে পড়ায়, একটু হাসিয়া বলিল “সে গেলে আমার চলবে না, রাতে আমার কাছে থাকবে কে?”

আহমদ সাহেব কি একটা কথা বলিতে গিয়া, সহসা ত্রস্তভাবে থামিলেন,—আমিনার মুখপানে চাহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিলেন ।

পাছে নিজেও এখনই হাসিয়া ফেলে,—সেই ভয়ে আমিনা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আলমারীর দিকে বাইতে বাইতে বলিল “সাড়ে চারটে বাজতে চল, গল্পের জের কি আর মিটবে না ?—”

“মিটতে দিচ্ছ কই ?” বলিতে বলিতে আহমদ-সাহেব উঠিয়া আসিয়া আমিনার স্বক্মূল ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া স্নেহময়ন্বরে বলিলেন “আর কেন, মিনতি করছি এবার মিটিয়ে ফেল, আমার আর সময় নাই, দুটুমী ছেড়ে সোজানুজি বল,—আমার অমরোখটি রাখবে ত ?”

আমিনা ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া আলমারীর দিকে চাহিয়া বলিল “আচ্ছা দুটুমী না হয় ছেড়েই দিলুম কিন্তু সত্যি বলছি, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?—থাক না দিন স্বতক, হোক না ওহায়েদ একটু ভঙ্গ, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে । ওদের মুখের বগড়া মুখেই শেষ হয়ে গেছে, মনে কারুর কিছুই নাই, সে আমি বেশ জানি—কেন ভাবছ তুমি ?”

নস্যা টানিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “আহা, আমি না হয় ভয় ভাবনা, কাউকেই আমল না দিলুম, কিন্তু তাহলেও এটা যে খুব আনন্দ বা উল্লাসের বিষয় নয় সেটা ত মান !—তাছাড়া ওহায়েদকে ভঙ্গ করা ?—তুমি বল আমায়,—আমি নিজের বুকে হাত রেখে কসম খেয়ে বলছি, সে ভঙ্গ হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে !—দোহাই তোমার আমিনা—”

পিছু হটিয়া আমিনা ব্যস্তভাবে বলিল “আঃ কি যে কসম খাওয়া, দোহাই দানা শিখেছ,—বাও ভাল লাগে না ! একটু থামিয়া বলিল, “নাও, আমার স্বক্মারী হয়েছে, বল এখন আমায় কি করতে হবে ?—কিন্তু মনে রেখো, তুফানী নেহাৎ সোজা পাত্র নয়, সে আমার হকুমে পায়ে হেঁটে কবরে নামতে রাজি আছে, কিন্তু আমি যদি এখন সোজানুজি বলতে বাই যে,—‘যা তুফানী ওহায়েদের সঙ্গে দেখা করে আর,’ তাহলে সে মোটেই আমার গ্রাহ্য করবে না—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “আহা এতটা সোজা করেই বা বলবার দরকার কি ? একটু না হয় বাঁকা করেই বল,—আমার খাতিরে—”

হাসিয়া আমিনা বলিল “তথাস্তু ! বল কি করতে হবে !—”

আহমদ-সাহেব পুনশ্চ নস্যা টানিয়া দৃষ্টিস্তা-গভীর মুখে বলিলেন “এস দেখি, আমার পোষাক কামরায়,—সেইখানে পরামর্শটা স্থির করা যাক, পোষাকটাও ততক্ষণে পরা হবে ।”

মিনিট দশেক পরে, সাজসজ্জা করিয়া, সহসা-প্রফুল্লমুখে ছাড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আহমদ-সাহেব পোষাক কামরা হইতে বাহির হইয়া—নৌচে নামিয়া গেলেন ।—

( ১১ )

রাজি নগটা রাজিবাব পূর্বেই, আমিনা ‘খুম পাওয়ার’ আছিল। করিয়া, সাজোপাজ-সঙ্গে তাড়াতাড়ি আহমদ সারিয়া আসিল । তারপর ইনেককে ডাকার শয়ন কক্ষে পাঠাইয়া দিয়া,—ইদানিন্তন ব্যবস্থামতে তুফানীকে লগ্নে লইয়া নিজের ভালমাহবের মত—তেতলায় চলিল ।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সহসা “ওহো—” রবে সুদীর্ঘ উদ্বেগপূর্ণ-বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, আমিনা তীক্ষ্ণবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তুফানী বিস্মিত হইয়া বলিল “কি হোল—”

শশবাস্তে তড় তড় করিয়া সিঁড়ি বহিয়া নামিতে নামিতে আমিনা যথাসাধ্য ব্যাকুলতা জানাইয়া, দ্রাব্য স্বরে বলিল “যাঃ! আলমারীর চাবিটা ভাড়াভাড়িতে কোথায় রেখে এসেছি, মনে নাইতো! আর ভাই তুফানী চট করে এইবেলা চাবিটা খুঁজে রেখে আসি—”

তুফানী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া, আমিনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, চলিতে চলিতে দ্রুত তিরস্কার পূর্ণস্বরে বলিল “দিন রাতই হেথা সেথা ছটোপাটি করে বেড়াচ্ছ, তা ঘরের জিনিসের তদ্বির করে কে? বল্লে তো কথা জুন্বে না—”

আমিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “আহা! কোন লক্ষ্মী এত উপদেশ দিচ্ছ গা? বলি, তুমি কথা শোন? আচ্ছা আমি অনুমতি দিচ্ছি,—যাও তো লক্ষ্মী,—তোমার নীচে কার,—ঘরখানার অবস্থাটা একবার তদারক করে এস তো—”

তুফানী একটু হাসিয়া বলিল “সে ঘর কি আর এখন আমার আছে? থাক্লে নিশ্চয়ই তদারক করত যেতুম—” পরক্ষণে সে কথা উল্টাইয়া লইয়া আমিনাকে ভাড়া দিয়া বলিল “চল চল আবার চাবি খুঁজতে তিন ঘণ্টা পার করবে তো—এদিকে নটা বাজে, জুঁস রেখো—”

আমিনা চলিতে আরম্ভ করিয়া পরম নিশ্চিন্ততা-জ্ঞাপক স্বরে বলিল “রেখেছি মোদ্দা রাত্রি এগারটার কমে কেউ ঘরে আস্ছে না, মনে রেখো—”

দক্ষিণ মহলে শয়নকক্ষে আসিয়া আমিনা এদিক ওদিক খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া গেল, তবুও চাবির সন্ধান মিলিল না। এদিকে ষড়িতে টং টং করিয়া নটা বাজিয়া গেল। আমিনা হতাশ হইয়া একখানা সোফায় বসিয়া পড়িয়া বলিল “যাঃ চাবি তো তাহলে হারাল!”

তুফানী চিন্তিত মুখে চারিদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল “সাহেব তো পকেটে করে নিয়ে যান নি? জান কিছ—”

“তা কি করে জুন্বে—” বলিয়া আমিনা উঠিয়া বাস্তভাবে চাবি খুঁজিতে লাগিল। তুফানী নিজ মনেই অমুচ্চস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিল “তা হয় তো হতেও পারে, তোমার সঙ্গে এখন কথাবন্ধ হয়ে আছে, তাই তোমার ভাবিয়ে জল করবার জন্য হয়তো চাবিটা লুকিয়ে রেখেছেন, তোমার কি মনে হয়?”

আমিনা গম্ভীরভাবে বলিল “তা হতেও পারে,—গুণে তো ঘাট নেই। কিন্তু নিজে যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে বড় মুন্সিল হবে। খোঁজ তুফানী, আগে আমরা খুঁজে-পেতে ভাল করে দেখি, তারপর জিজ্ঞাসা করা যাবে।”

অদ্বৈত স্থানগুলা পুনরায় অদ্বৈত করিতে করিতে,—তুফানী বলিল “কই বাপু, এখানে তো কোথাও চাবি দেখছি না,—সাহেবজীই চাবি নিয়ে গেছেন তা হলে!—আচ্ছা আমিনাবিবি,—তখন বহুজীর কাছে তো স্বীকার করলে না, কিন্তু আমার কাছে মিথোটা বলা তোমার উচিত হয় না, সত্যি করে বল দেখি,—হুপুর বেলা অতক্ষণ ধরে যে ঘরে বই পড়ে কাটালে, তা সাহেবের সঙ্গে তোমার কোন কথাই হোল না?”

আমিনা টেবিলের কাগজপত্র উটুকাইয়া দেখিতে দেখিতে, সুগভীর মুখে বলিল “তুমি বুঝি আমার তেরি বেহারা ঠাউরেছ, তোমার আন্দাজ তো খুব! আমি আবার কথা কইব? আমার বুঝি লজ্জাসরম কিছুই নেই—?”

তুফানী একটু হাসিয়া বলিল “আহা তোমার লজ্জাপন্ন থাকলে কি হবে অন্য পক্ষেরও যে পেটা থাকবে। তার তো কোন মানে নাই। আমি মানছি তুমি কথা কও নি কিন্তু তিনিও কি অমনি চুপ করেছিলেন ? আমার তো, তা মনে হয় না—”

আমিনা ক্রুদ্ধিত করিয়া বলিল “বেশ না হয় তো আমি নাচায়—”

অকস্মাৎ—“রস্তুম” বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিয়া আহমদ-সাহেব গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ প্রাণী দুইটি সন্ত্রস্তভাবে মাথার কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া গেল। চকিত নয়নে তাহাদের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, আহমদ-সাহেব আপনা হইতেই গম্ভীরভাবে জানাইলেন “শরীরটা কিঞ্চিৎ খারাপ হওয়ার জন্য, তিনি সকাল সকাল ডিম্পেনসারীর কাজ সারিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন, এখনই শুইয়া পড়িবেন।” আমিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন “রস্তুম কোথা গেল ?”

আমিনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ‘জানেন না।’

পকেটে হাত দিয়া, সহসা বিষয়ের সহিত চমকিয়া আহমদ-সাহেব বিস্ময় উদ্ভূত হইলেন বলিয়া উঠিলেন “ওহোঃ! ষাটা চুক গিয়া হো! ওহায়েদ--” বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন—।

তুফানী নিঃশব্দ-পদে ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, আমিনার দিকে চাহিয়া তিনি সহসা ব্যগ্রভাবে বলিলেন “ওহায়েদ কো আওয়ার ?”

আমিনা অসুস্থত্বের বলিল “সেই রকমই শুনেছি, কোন দরকার আছে ?”

ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন “আ—হোঃ?” অর্থাৎ “হাঁ!” পরক্ষণে পকেট হইতে একটা নূতন ব্রাক্সের কোটা ও একখানা সাবান বাহির করিয়া আমিনার হাতে দিয়া বলিলেন “জুস্তকে রওগণ ওর কুস্তকো সাবান,—তুনা ওহায়েদকো পাশ ছোড় দে আনা চাহি এ—জলদি উনুকে ভেজ দেও—”

চাপা হাসির ঠেলার আমিনার ঠোট দুটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, অতিকষ্টে সংযত হইয়া ক্রত আসিয়া তুফানীর হাতে জিনিস দুইটি দিয়া কানে কানে বলিল “বরের মুখখানি দেখে সব যেন ভুলে যেও ন, জলদি ফিরো,—তুমি এলে তবে আমি তেতলার যেতে পারব, মনে রেখো,—যাও শীঘ্র, আর দাঁড়িও না।”

তুফানী কোন উত্তর দিল না, নীরবে একটু হাসিয়া প্রভুর আদেশ পালনের জন্য সদরের সিঁড়ির দ্বার পার হইয়া নীচে নামিয়া চলিল। “অর্ধপথ গিয়াছে, এমন সময় পিছনে সশব্দে সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া, আমিনা খিল আঁটিতে আঁটিতে সকেতুক হাস্যে বলিল “আজ আর অন্যরে ঢুকতে পাচ্ছ না মশাই, সেই-খানেই’ থেক—”

তুফানী ব্যস্ত হইয়া বলিল “মাপ কর আমিনা বিবি,—”

আমিনা মোলোয়েম হুয়ে উত্তর দিল “সে হবে এখন, কাল! আজ আমার ভারি ঘুম পেয়েছে, এখন চম্বু কিছু মনে কোর না,”

আমিনা সত্যই শয়নক্ষেপে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিবার পর ব্যস্ততার আসিতেই, আমিনা দেখিল তুফানী সামনে দাঁড়াইয়া। চোখো-চোখি হইতে দুজনের মুখেই সলজ্জ-স্নিত রহস্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল!—তুফানী কি একটা কথা বলিতে

বাইতেছে দেখিয়া, আমিনা তাড়াতাড়ি বলিল “কুন্তেকো রওগণ আর কুন্তেকো সাবুন, হুনো চিঙ্গ কালরাত্রে যথাস্থানে পৌঁছেছিল ত ?

তুফানী কপটকোপে বলিল “নাঃ, সে আমি খেয়ে ফেলেছি ! আচ্ছা, দাদার একদিন দিদির একদিন,— সেটা মনে রেণো, এবার সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হলে, ডেকো আমার তেতলায় যাবার জন্যে,—যাব ভাল করে ! আর এই কান মলে নাকখুঁ দিয়ে রাখছি ফের যদি কখনো তোমার সঙ্গে তাস হাতে করি !— উঃ, কাল রাত্রে যে বকুনিটা দিয়েছে আমার !

সবিনয়রে আমিনা বলিল “কে, ওহায়েদ !—কে বলে তাকে তাস খেলার কথা ?

একটু এদিক ওদিক চাতিয়া তুফানী বলিল “খোদ মালিক !—” কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তুফানী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল “উঃ, আমার ওপর সে রাগটা যদি দেখতে ! বলে, “হজরৎ বিব সাহেবেরা ছেলেমানুষ, তাঁরা ছেলেমানুষী করতে পারেন, কিন্তু তুমি বুড়ো ধাড়ী কি বলে তাঁদের সহায়তা কর ?—আমার মনীবের দিল খারাব হয়ে যায়, তাঁর শুকনো মুখ দেখলে আমার শুদ্ধ কান্ ঘাবড়ে যায় । আমার সাহেব অসময়ে আজ কাল ওপর থেকে নেমে আসেন, তাঁর হাসি নেই, সে শ্রুতি নাই !.....এই সব আরো কত কি ।—”

লজ্জায় আমিনার মুখ লাল হইয়া উঠিল । ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল “এসো তো কলঘরে, সব শুনি ।— তুফানীকে টানিয়া লইয়া আমিনা দ্রুতপদে কলঘরে চলিল ।

কলঘরে ঢুকিয়াই আমিনা বেদীর উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল “বলতো সব—”

তুফানীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল “দ্যাখো আমিনা বিবি, আমি সব সত্যি কথাই বলতে রাজি আছি—কিন্তু তুমি কসম খেয়ে বল, সাহেবের সঙ্গে লড়াই ঝগড় বাধিয়ে বলবে না ?

অধৈর্য্যভাবে আমিনা বলিল “হ্যাঁ হ্যাঁ সে কসম খাব এখন, তুট থাম—”

তুফানী হাসি হাসি মুখে বলিল “খামলুম, আমার দায়-দোয় নেই !—সাহেবের ওপর রাগ করবার ছুতো টুকু তুমি হরখাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছ, আর আমি যে তোমার রাগের খোরাক গুটিয়ে দিয়ে যাব, সে বান্দা আমার পাও নি । একেই তো যে খোশনাম হয়েছে আমার—তা বলবার নয়—

আমিনা বলিল “তুই বলবি কি না, তাই বল—”

তুফানী সবিনয় বলিল “আমার মাথ খাও, বল এই তুচ্ছ কথা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি করবে না— একটু হাসিয়া আমিনা বলিল “না, করব না,—আম্মার কসম ! বল—”

গতকাল দুপুরের পর ওহায়েদের সঙ্গে আত্মদ সাহেবের যে যে কথা হইয়াছিল, তুফানী রহস্যকোমলকণ্ঠে ধীরে ধীরে সব বলিল নিজের স্বামীর উদ্দেশ্যে কিছু কিঞ্চিৎ ঠাট্টাও করিয়া লইল । যে হেতু গৃহবিবাদে আক্রান্ত প্রভুর গুণ মুখ দেখিয়া, তাহারও অন্তঃকরণ ব্যথিত !—

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া আমিনার রাগ ভাল হইয়া গেল, কিন্তু ওহায়েদ দম্পতীর মিলন ব্যবস্থা লইয়া— আত্মদ সাহেব তাহাকে যে কিরূপ নির্দয়ভাবে ঠকাইয়াছেন সে কথাটা মনে পড়ায় বড় অসুখ হইতে লাগিল । ‘আহা, আমিনা কেনই যে বোকামি করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কাহল !



হুপুর বেলা নিড়তে স্বামীর সঙ্গে ভূতপূর্ব ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে বলিয়া আমিনা মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিল। প্রকাশ্যে তুফানীকে বলিল “তোর কোন ভয় নাই।”

অনেক দেৱীতে স্নান করিয়া স্নানাগার হইতে বাহিরে আসিল। আহমদ-সাহেব তখন রক্তমের হাতে চাঁ খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

হুপুরে কাজকর্ম সারিয়া আহমদ-সাহেব উপরে আসিতেই, আবুল-সাহেব তাঁহার কাছে গিয়া হাজির হইলেন। হুজনে গল্প চলিতে লাগিল। আমিনা বাহির হইতে শব্দ পাইয়া, নিঃশব্দে তেতলায় পলায়ন করিল ইনৈবও তাহার সহগামী হটল, হুজনে সমস্ত হুপুরটা সেইখানেই পড়িয়া ঘুমাইল। তুফানী কোথায় রহিল আমিনা তাহার খোঁজ লইল না।

রাত্রে আজ আর তাস খেলা হইল না,—যেহেতু তুফানী নাককান্ন মুচুড়াইয়া শপথ করিয়াছে, সে আর তাস খেলিবে না।—আজ আমিনারও তাস খেলায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না, সে ইনৈবকে ধরিয়া উর্দ্ধ কবিতার বই পড়াইয়া,—কাব্যচর্চা করিয়া কোনমতে সময় কাটাইয়া, যথাসময়ে শয়নকক্ষে চলিল। তেতলার ঘর আজ শূন্য পড়িয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মাথার শিয়রে আলো জালিয়া রাখিয়া স্বামী বিছানায় শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, আমিনা ঘরে ঢুকিতেই কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া পরিত্রাস-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—“বোঁও ভি, সবাল থেকে দেখাই পাই নি যে, হুপুরে তেতলায় গিয়ে ঘুম দেওয়া হোল কেন?”

আমিনা নত নয়নে গম্ভীরভাবে বলিল “আমার খাস”—তারপর পানের ডিবা সামনে রাখিয়া বলিল “রইল পান—” পরক্ষণে চাদরখানা টানিয়া, আপাদমস্তক মুড়িয়া দিয়া, বিছানার একপাশে ঝুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

আমিনার ভাবগতিক দেখিয়া আহমদ-সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। কাগজ ফেলিয়া, আমিনার মুখের আবরণ সরাইয়া, বিজ্ঞপের স্বরে বলিলেন “এর মধ্যে আবার কি বেমার ধরল?”

আমিনা মুখ সরাইয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া, একান্ত উদাসীনভাবে বলিল “বেমার আবার কি ধরবে? আমি কি আর মানুষ, যে আমার বেমার হবে? আমি হচ্ছি একটা আস্ত গাধা!—না হলে, কাল, কেনই যে তোমার পেয়ারের চাকরের অমন সাংঘাতিক ধরণে প্রাণ ধড়্-ফড়্ করেছিল, আর কেনন করেই যে সে-খবর তোমার প্রাণে এসে পৌঁছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কেনই যে তার জন্তে অমনভাবে তোমার মাথা টন্ টন্ করে উঠেছিল, সে সব কি আর আমার বুঝতে বাকী থাকত?—মানুষ হলে, তখন আমি সমস্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতুম, কিন্তু আমি ত মানুষ নই আমি জানোয়ার, তাই—” এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলিয়া, শেষের কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া—অজ্ঞ দিকে সরিয়া গিয়া সে শুটি-শুটি মারিয়া শুইল।

আহমদ-সাহেব বুঝিলেন, তুফানী-বাদীর মারফৎ সমস্ত ব্যাপার ফাঁশ হইয়া গিয়াছে!—অজ্ঞ-ক্রটি কালনের জন্ত তর্ক বা প্রতিবাদ না করিয়া তিনি নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য,—সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজখানা তুলিয়া চোখের সামনে ধরিয়া পরম মনোযোগ সহকারে দেখিতেও তুলিলেন না।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিঃশব্দেই কাটিল। তার পর আহমদ-সাহেব একটু নড়িয়া-চড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন “আমিনা ঘুম পেয়েছে কি?”

আমিনা একটু উশ্ণুস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আহমদ-সাহেব খবরের কাগজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পুনশ্চ বলিলেন “খবরের কাগজে কতক গুলো মজার খবর বোড়িয়েছে। পড়ব—শুনবে?”

মুখের উপর কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া আমিনা অশ্রুটস্থরে উত্তর দিল—“হঁ, ঘরের মজা নিয়েই অতিষ্ঠ হয়ে আছি, আর খবরের কাগজের মজায় কাজ নাই”

বাধা দিয়া স্বামী আগ্রহের স্বরে বলিলেন—“আগ নো না—”

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া আমিনা বলিল “না আমি শুনব না,—” কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমিনার—  
এতক্ষণকার তর্কনিরস্ত রসনা মহাশয়ের, ধৈর্য্য গাভীর্য্য সব টগমল করিয়া উঠিল! হঠাৎ মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—“আচ্ছা দাদার কাছে আজ হুপুর বেলা সব কুটুর-কুটুর করা হয়েছে তো?—”

স্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন “কুটুর-কুটুর?” আমার হাঁড় ঠাউরে বসলে না কি?—”

শুইয়া শুইয়া আরাম উপভোগ করিতে করিতে ঝগড়া করিলে ঝগড়ার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে? কাজেই আমিনা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর দিল “না, পরগণ্ডার তুমি! বল না সোজা করে,—দাদার কাছে একদিনের সমস্ত খবরগুলি লাগিয়েছ ত?—”

স্বামীর মুখে ছুটে কৌতূহলের দাপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাগজ ফেলিয়া কুহুইয়ের উপর ভর দিয় একটু উচু হইয়া নরম স্বরে বলিলেন “কি লাগাব?—আবলু কদিন বাড়ী ছিল না তাই অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে আবলুর জীকে আমিনা দখল করে বসেছিল?—”

ফোঁস করিয়া আমিনা বলিল “দ্যাখো, আবার!—”

হতবুদ্ধির ভাণ করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “তবে? তবে কি লাগাব যে, আমার ওপর রাগ করে আমিনা ঘরে ঢুকত না, তাস নিয়ে তাদের তেতলার নিভৃত দফতরখানায় যেত এবং অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য খুঁটে ঠুকত বাসন মাজত,—ভিস্তিনী ঝাড়ুদারণী—ইত্যাদি—

বর্ষাক্ত মুখে আমিনা বলিল “কে বললে তোমায় এত কথা বল তো? নিশ্চয় রক্তম লক্ষীছাড়া! নয়?”—

ঔদাস্যের সহিত আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা সে যেই বলুক, অবশ্য কথাগুলো যে খুব খাটি সত্য, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহলেও ভদ্রলোক আবলুল মিক্রা এমন বেয়াদব Inquisitive নয় যে পরের পারিবারিক-তত্ত্ব অন্বেষণে সেই ঠিক-হুপুরের রোদে আমার কাছে ছুটে আসবে, সে এসেছিল বৈষয়িক ব্যাপারের সম্বন্ধে কথা কইতে!”

সম্মিষ্টভাবে আমিনা বলিল “আমার সম্বন্ধে কোন কথাই দাদাকে বল নি?—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “কিছু না, বিশ্বাস না হয় বল এখনি আবলুকে ডেকে তোমার সাম্নেই—”

ব্যস্ত হইয়া আমিনা বলিল “দ্যাখো, তা হ’লে ভাল হবে না বলছি—”

চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “ঐ নাও! আমার অকারণে সন্দেহ করবে, অথচ আমি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী সাফাইয়ের নামোল্লেখ করলেই, চক্ষু চড়কগাছ বানিয়ে বসবে, এত বন্দ মজা নয়!—”

আমিনা বলিল “হঁ! কত বড় ভাল মানুষ তুমি! তুমি যতই সাক্ষী পন্ন্য কর, আমি তোমার এক চুলও বিশ্বাস করি না!—সাধে তোমার ওপর রাগ হয়?”

বাধা দিয়া আহমদ-সাহেব সোৎসাহে “হোক্ হোক্ আরো হোক্—আরো হোক্! মেহেরবানী করে বল আর আমায় কি করতে হবে, কিসে তোমার ক্রোধ-রিপূব আরো শ্রীবৃদ্ধ সাধন হবে—”

আমিনা ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে ছই মুহূর্ত নীতবে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল “অবাক্ করলে, উঃ! কি ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি? আচ্ছা কাল হুপুরবেলা গতিজ্ঞা করেছ না, যে আর কখনো আমার সঙ্গে লাগবে না? এখনো যে ছ রাত্রি পোয়ায় নি! কি ঘণা! ছিঃ!—”

স্বামীর রক্তভরে সুদীর্ঘহৃন্দে বলিলেন “আচ্ছি বাৎ!—অতঃপর?—”

রাগিয়া আমিনা বলিল “ঝকুমারী আমার! ফের যদি তোমার সঙ্গে কই—তবে—”,

ক্ষিপ্রহন্তে আমিনার মুখ চাহিয়া ধরিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “হঁ! হঁ! ওটা ঐ-পর্যন্ত থাক, আর নয় আমিনা, মারফ কর—”

কিন্তু আমিনা মারফ করিবে কি, তাহার অন্তরাআ তখন শোচনীয় হুঃখে দ্বিয়মান! আহমদ-সাহেব যে ওহায়েদের সহিত পরামর্শ করিয়া—আমিনার পরম প্রিয়পাত্রী, তুফানীর ভবিষ্যত মাটি করিয়া দিলেন, সে মনস্তাপ আমিনা রাখে কোথায়? কাজেই উপযুক্ত প্রসঙ্গটা লইয়া সে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামীর সহিত বাদামুবাদ করিয়া শেষে গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিল—“এবার আমার হৃদশা কি হবে বল দেখি? যে দিন তুফানীকে আমার দরকার হবে সে দিন—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “অবশ্যই তাকে পাবে, ওহায়েদ আমার ছরস্ত চাকর—সে ইসারায় কাজ বোকে! দেখেছ ত রাত বিরাতে কল এসেছে, আমি তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গেছি, কিন্তু ওহায়েদ হঁসিয়ার!—আনি নীচে নাম্তে না নাম্তে জ্বীকে ওপরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে,—

ঘাড় নাড়িয়া আমিনা বলিল “সে আলাদা কথা,—সে যে তোমার গরজ!—কিন্তু যে দিন আমার গরজ পড়বে,—তোমার সঙ্গে যে দিন ঝগড়া হবে সে দিন আমি একলাটি কেমন করে—”

হা হা করিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “কোই হরজ নেই,—যে দিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি ‘একলাটা’ হয়ে পড়বে, সে দিন তোমার দোসর যোগাড় করে দেবার জন্য দায়ী রইলাম, আমি!”

আমিনা সকোপে বলিল “আহা!”

ঝড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

## পূজারিণী ।

—:~:—

সেবার যখন মহামারীর করাল গ্রাসে পড়ি  
 ঘরে ঘরে ছেলে বড় যাচ্ছে গড়াগড়ি  
 পরলোকের শমন এল জোর  
 বৃদ্ধ পুরোহিতের ভাগ্যে হ'ল না রাত ভোর ।  
 অসময়ে মুখের কথা বন্ধ ক'রে  
 এই জগতের অন্তরালে কোথায় গেল সরে ।  
 আর কোন ত ক্ষোভ ছিল না মনে  
 কেটেছিল সকল বাঁধন ইহলোকের সনে,  
 ঘরে শুধু ঠাকুর ছিলেন, ছিল পূজার ভার,  
 আর ছিল তাঁর একটি দুহিতার  
 সুবাবস্থা করতে বাকি,  
 মৃত্যু যবনিকা যখন পড়ল জীবন ঢাকি' !

শোকে অধীর বালা  
 —এখনো যে জ্বলছে বুকে স্বামীর মৃত্যুজ্বালা  
 দারুণ হুহু রোলে ;  
 স্বামীহারার একাট বাঁধন পিতা গেলেন চলে ।  
 শিশুকালে মাতৃহারা  
 পিতার স্নেহে মুছেছিল দুই নয়নের ধারা  
 খুঁটি নাটি কাজে,  
 ভুলেছিল সকল অভাব তাঁরি বুকের মাঝে !  
 যতই মনে পড়ে সে সব কথা  
 উথলে ওঠে চাপা বুকের বাথা  
 ছুটি চোখে অশ্রু নাহি বাঁধন মানে  
 তাহারি মাঝখানে

পড়ল মনে যে নারায়ণশিলা আছেন ঘরে

কে তবে আজ তাঁহার পূজা করে ?

শ্যামা বলে “ঠাকুর তুমি তবে

অভাগিনীর দুঃখে কি আজ উপোসী হ’য়ে রবে ?”

মৃতদেহ বিদায় হ’লে মুছে নয়ন ধাওয়া

পাগল পারা

শ্যামা এবার ছুটল যত বামুন ঘরে ঘরে

সবার কাছে এই মিনতি করে,—

“ঠাকুর ঘরে আছেন উপবাসী .

মহাপাতক হ’তে মোরে বাঁচাও কেহ আসি !”

কেউ এল না শুনে

নানারকম ছতনাতা তুলল বুনে বুনে ।

ও পাড়ার ঐ ভট্টচার্যির ছেলে

এ কাজ নিতে পারত অবহেলে,

আসল কথা সবাই জানে শ্যামার ঘরে নাটক কড়ি

তাতে আবার সারাজীবন থাকতে হবে পড়ি

কঠিন শুদ্ধাচারে,

ক’টা মানুষ এমন ক্ষতি স্বীকার করতে পারে ?

আবার শ্যামা ফিরল ঘরে

যুক্ত দৃঢ় করে

বললে “ঠাকুর মনে বড়ই পেয়েছি আজ ক্লোভ

তোমার পূজার বেশী যারা করে টাকার লোভ

তারাই পূজার অধিকারী,

অশুদ্ধ কি হ’ল কেবল সাধবী সতী নারী ?

সইব না ত আর

এমন ভ্রান্ত মিথ্যা লোকাচার ।”

তবু তাহার মনের কোণে শঙ্কা কেন আসে  
 জানি না সে কোন্ ঠাকুরের দারুণ পরিহাসে  
 ক্রমে ক্রমে সব গিয়েছে তার  
 কে বলবে যে এই কাজেতে ইচ্ছা কি তাঁহার !  
 কোশাকুশি নিয়ে তবে সুর হ'ল ঘণ্টা নাড়া  
 তবু কেন প্রাণ দিল না সাড়া  
 তবু কেন থামল নাক' বুকের কাঁপুনি যে  
 ভেবে না পায় নিজে !

এদিকে ত উঠল মহারোল  
 বিষম গগুগোল,  
 নারায়ণের পূজা কবে করেছে কোন্ নারী ?  
 তবে কেন বুঝতে নাহি পারি  
 ঠাকুর তুলে নেন সে পূজাভার,  
 —রহস্য তাঁহার !

এমনি ক'রে কিছু দিনে থামল কোলাহল  
 ক'রে নানান্ ছল  
 সবাই আসে তাহার ঘরে  
 মুখে যাহাই বলুক মনে শঙ্কা যেন করে !  
 শ্যামা ভাবে আপন মনে কি হ'ল যে তার  
 যারা কভু চাইত নাক' ভুলে একটিবার  
 তাহার পানে  
 আজ্ যে কিসের টানে  
 প্রণাম ক'রে এসে দাঁড়ায় সবে  
 ভালমন্দ বার্তা নেবার দরদ এল কবে ।  
 ভাল নাহি লাগে এ সম্মান  
 আপন মনে দিবারাতি কাঁদে শ্যামার প্রাণ  
 কোথায় গেল সে দিনগুলি  
 বহে গেছে দুঃখসুখের হাজার লহর তুলি',

ছিল না এই বাঁধাবাঁধি  
প্রতিবেশীর দুঃখে শোকে উঠত হিয়া কাঁদি',  
ছুটত যবে তাদের ঘরে বসত গিয়ে পাশে  
আজ্ সে কথা ভাবে শুধু আকুল দীর্ঘশ্বাসে ।

যোড় হাতে সে কয়—  
“ঠাকুর তুমি এ কোন্ খেলা খেল্ছ লীলাময়,  
বসতে জুড়ে বুক  
হতভাগীর ভাগ্যে বুঝি সইল না সে সুখ ?  
পাই না কেন প্রাণে সাড়া  
দাসীরে কি করলে চরণছাড়া ?”

ক্রমে ক্রমে বছর গত মন বসেছে কাজে  
তবু কেন সন্দেহ যে আসে বৃকের মাঝে—  
করে নাড়া চাড়া,  
জগতে কি নেইক পূজা ইহার চেয়ে বাড়া ?  
ভক্তি শুধু বন্ধ রবে শুদ্ধ দেবালয়ে  
বাহির নাহি হ'বে জগৎজয়ে ?  
বিচার ক'রে চলবে পলে পলে  
সকল জাতির পুণ্যতীর্থজলে  
শুদ্ধ হ'য়ে গড়িয়ে সেকি পড়বে নাক' প্রেমে ?  
শশীরকর-লেখার মত ধরার বৃকে নেমে ?

আবার সুর করলে যাওয়া আসা  
দুঃখে সুখে ভালবাসা  
দুঃখী আহুর জনে;  
নিন্দা অপবাদের শঙ্কা রাখলে না আর মনে ।

মল্লিকা সে ভ্রষ্টা-নারী,  
শ্যামা শুধু শুনলে কাণে অসুখ বড় তারি  
ভরসা কিছু নেই বাঁচিবার গিয়েছে সব ধন,  
কোথায় বদ্যি, কোথায় পথি, কোথায় আজ্ঞজন !

তখনি সে জুটল সেথা গিয়ে,  
 ব্যাপার কি এ—  
 অভাগিনীর বুকের বোকা একটিমাত্র ছেলে  
 কোথায় যাবে ফেলে !  
 হতজ্ঞানে ঐ চেতনা রয়েছে জাগরুক  
 বেনী ক'রে ভাঙছে ভাঙ্গাবুক !  
 ভূতুছায়াবিবর্ণ সে চেয়ে মায়ের পানে  
 ত্রাস জেগেছে শিশুর প্রাণে,  
 ফুঁপিয়ে কঁদে ধরল গলা শ্যামার বুক এসে,  
 অশ্রু জলে শ্যামার হৃদয় আপনি গেল ভেসে !  
 মল্লিকা তার হাতের মাঝে ধ'রে শ্যামার  
 বল্ল কথা দুটি  
 “দিদি গো আজ আমার জন্মশোধ  
 একটিমাত্র এই অনুরোধ,—  
 চরণ হাতে দিও না আর ঠেলে,  
 তোমার পুণ্যে তরে' যাবে এই অভাগীর ছেলে!”  
 মল্লিকারে নিয়ে গেল শ্মশান ঘাটে  
 যে পথ গেছে বহু দূরের মাঠে  
 সে পথ দিয়ে চল্ল শ্যামা ঘরে  
 মাতৃহারা শিশুটিকে চেপে বুকের 'পরে ।  
 কিন্তু এ আর রইল না ত চেপে  
 লোকের মুখে মুখে আরো উঠল ফুলে ফেঁপে,  
 মুচি কিস্বা হাড়ির ছেলে হ'বে,  
 পুষ্টি-ছেলে পূজারিণীর কেউ শুনেছে কবে ?  
 তারে নিয়ে ছি ছি পালন-করা,  
 পাপের ভারে ডুবল বুঝি ধরা !  
 ডের সয়েছে তার  
 তা' বলে কি গ্রামের মাঝে সইতে হ'বে এমন অনাচার !



ধর্ম্মে যারা চাঁই  
 সবাই মিলে বললে শ্যামায় আজ তাড়ানো চাই !  
 মিঠেকড়া যুক্তি শেষে হ'ল এই  
 প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া উপায় নেই,  
 ছেলে ছাড়ুক আজ,  
 নয় ত ছাড়ুক ঠাকুর-পূজ নিয়ে তাঁহার অভিশাপের বাজ !  
  
 ক্ষণকালের জন্য যেন শ্যামার চোখে নিভল দিনের আলো  
 কোনটা মন্দ কোনটা ভাল  
 বুঝতে নাহি পারে,  
 ছেলের মুখে চেয়ে আবার বন্ধ ভেসে গেল অশ্রুধারে !  
 ভাবলে মনে হেসে  
 এত ব্যাথার ব্যথী হয়ে এই ব্যাথাতে বিকল হ'ব শেষে ?  
  
 এখনো ত যাই নি ভুলে মনে,  
 মল্লিকা যে ইচ্ছাটিরে জানিয়ে গেল সঙ্গোপনে !  
 এখনো ত যাই নি ভুলে পিতার উপদেশে  
 দিয়েছিলেন কতই স্নেহে কতই ভালবেসে !  
 এখনো ত যাই নি ভুলে কিযে গভীর স্নেহে  
 মরা মায়ের স্তন্য আজো বইছে সারা দেহে !  
  
 রইল না আর দ্বিধা কিছু,  
 ভাবলে নাক' উপায় আঙুপিছু  
 বেরিয়ে প'ল দিন দুপুরে পথের মধ্যখানে  
 হাজার সুরে আস্তে শুধু লাগল তাহার কাণে  
 পাপীঠা সে ভট্টা-নারী ;  
 —চোখে তাহার আনন্দাশ্রু বারি  
 বুকের মাঝে ঠেলে ওঠে মাতৃস্নেহ-ধারা,  
 মা পেয়েছে শিশু মাতৃহারা !

## বিবাহের পণ।

—:—

(প্রতিবাদ)

অগ্রগণ্যের ‘পরিচারিকার’ প্রকাশ্যে প্রবন্ধ বীরেশ্বর সেন মহাশয় লিখিত ‘বিবাহ ও বিবাহের পণ’ শীর্ষক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে প্রবণ লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে আমরা তাহার সহিত একমত। স্ত্রীপুরুষের যৌন-মিলন ভগবানের অভিপ্রেত এবং তাহা কেবল বৈধ-বিবাহদ্বারাই সাধিত হইতে পারে। সকল দেশে সকল সময়ে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং আমাদের দেশে ইহা দশবিধ সংস্কারের অত্যন্তম সংস্কার এমন কি ধর্মসাধনের উপায়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। পুরুষ বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবে এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিবে, ইহাই আমাদের ধর্মের অমুশাসন; এবং ইহা হিন্দুসমাজ চিরকাল পূর্ণভাবে মানিয়া চালায়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর ভাবগোচর এক বিপুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে আমাদের অধিকাংশ সামাজিক প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একান্নবর্তী-পরিবার প্রায় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গিয়াছে,—কতকটা এই ভাবসংঘাতে, কতকটা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহারই ফলে, ভদ্রসমাজে পুরুষের বালাবিবাহ রহিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে বাক্যগত জীবনযাত্রার ভাবনা একান্নবর্তী-পরিবারভুক্ত পুরুষকে কিংবা তাহার অভিভাবককে কখনই বড় পীড়িত করিত না। সুতরাং পঞ্চদশ কি ষোড়শবর্ষ বয়স্ক বালকের বিবাহের পথে বিশেষ কোন বাধাই ছিল না। কারণ তাহার যে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র সংসার হইতে পারে, যাহার ভার তাহাকে নিজেকেই বহন করিতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা তখন বড় ছিল না। সে ভার একান্নবর্তী পরিবার গ্রহণ করিত। অন্নবস্ত্রের অভাব তখন এরূপ ছিল না, এবং আধুনিক বিলাসিতা নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করে নাই গৃহে গৃহে সুখস্বচ্ছন্দ্য,—স্বাস্থ্য ও শান্তি বিরাজ করিত।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। একদিকে যেমন নানা কারণে দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়া যাউতেছে, বৃহৎ পরিবার পালন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার শিক্ষিত যুবক নব শিক্ষার প্রভাবে পিতা ভ্রাতা কি অপর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং যতদিন না সে উপার্জনক্ষম হয় ততদিন সে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অভিভাবকও তাহার এই মতের পোষকতা করেন। ফলে তাহার বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই নূতন অবস্থার আরও একটি ফল এই হইল যে বিবাহক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর পাত্রের উদ্ভব হইল। যাহারা সুশিক্ষিত হইয়া অর্থোপার্জনে সক্ষম, কিংবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র তাহারা স্বভাবতঃই সুপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল আর যাহারা মুর্থ অতএব (সাধারণতঃ) অর্থোপার্জনে অক্ষম কিংবা দরিদ্র বা অসচ্চরিত্র এইরূপ কুপাত্রের সংখ্যাও কম হইল না। এইরূপ প্রভেদ পূর্বে ছিল না। তখন লোকে বর দেখিয়া কন্যাদান করিত না, বর দেখিয়া করিত। বালক-বর বিধান কি মুর্থ, চরিত্রহীন কি অসচ্চরিত্র এরূপ কথা উঠিতই না; কারণ পনের বোল বৎসর বয়সে বালকের চরিত্রও গঠিত হয় না, শিক্ষাও নামে মাত্র হয়। বর মিলিলেই বিবাহ হইয়া যাইত। কোলোনিয়র কথা অবশ্য স্মরণ্য।

পুরুষের বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেল বটে; কিন্তু কন্যাদের বিবাহ এখনও বার কি তের বৎসরের মধ্যে সমাধা করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের পিতারা বন্ধপারকর। এ-বয়সে বালিকাদের সুশিক্ষিতা ও কলাভিজ্ঞা (accomplished) হওয়া ত দূরের কথা, তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্যও সমাক্রূপে বিকশিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, যেটুকু শিক্ষাও এই বয়সের মধ্যে সম্ভব তাহাও সাধারণতঃ বালিকা-দগকে দেওয়া হয় না। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে যদিও বিবাহাখী যুবকদের মধ্যে শিক্ষাদার তারতম্য অনুসারে বেশ একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, কিন্তু তথাকথিত বিবাহযোগ্য বালিকাদের মধ্যে বংশ ও রূপ বাতীত আর কিছুই পরস্পর পার্থক্যের কারণ থাকিতেছে না। যদি তাহারা সুশিক্ষিতা ও গুণবতী হইত এবং যৌবনের রূপলাবণ্যে ভূষিতা হইলে তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও একটা জাগমনের সুনির্দিষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি হইত। তাহা হইলে হয় ত আধুনিক পণপ্রথা ভিন্ন আকার ধারণ করিত। ইহা যে একেবারে থাকিত না তাহা বলা যায় না। কারণ সকলেই সুপাত্রে স্ব স্ব কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সুপাত্রের সংখ্যা খুব বেশী নহে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে পাত্র সম্বন্ধে একটা প্রাতিযোগিতা অনিবার্য্য। ইহাই আধুনিক পণপ্রথার প্রধান কারণ। ইহার উপর যদি কন্যার রূপ ও বংশগোবরন থাকে তাহা হইলেও সংপাত্রকামী পিতাকে অর্থালঙ্কারের প্রলোভন দেখাইতে হয়।

এইরূপে কন্যাপক্ষই পণপ্রথার আশ্রয় দিতেছেন। বরপক্ষও পণগ্রহণটিকে বরের মধ্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই জন্যই দেখা যায় আভিজাত্যগর্বিত ধনীদেব মধ্যে পণের পরিমাণ অতিরিক্ত মাত্রায় বেশী। আমাদের আড়ম্বরপ্রিয়তাও এই প্রথাটাকে নিম্নর ও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। জাঁকজমক না করিলে আমরা তুষ্ট হই না। অথচ ইহার জন্য নিজে খরচ করিতে, হয় দারিদ্র বশতঃ অক্ষম, নয় স্বচ্ছলতা স্বত্বেও কুণ্ঠিত; সুতরাং কন্যাপক্ষের-অর্থশেষণ বাতাত গত্যন্তর নাই। বীরেশ্বরবাবু বলেন, 'বরপণ দ্বারা বিবাহের অপব্যয় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।' এ কথা কন্যাপক্ষে সত্য হইতে পারে, কিন্তু বরপক্ষের দিক হইতে সত্য নহে। বাজীপোড়ান এখন ফাসান নহে বলিয়া উঠিয়া গিয়াছে; তৎপারবার্ত্তে অনাক্রূপ অপব্যয় আসিয়াছে। বাইনচ নৈতিক কারণেও রুচির পারবর্তন বশতঃ বিবাহের উৎসবসভা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্থলে শোভাযাত্রা প্রভৃতি পূর্ণাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে যাত্রা বণা হইল তাহা হইতেই আধুনিক বরপণের কারণ বোঝা যাইবে। কিন্তু বীরেশ্বর বাবু এক অস্বুত মত বক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক পুরুষের হাতে কিছু অর্থ থাকা উচিত। সেই অর্থ যুবকেরা সংগ্রহ করিবার পূর্বেই যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বলেন তাহাদিগকে অবশ্যই পণ দিতে হয়।' সুতরাং 'বরপণ প্রথার সর্বপ্রধান মঙ্গলময় ফল এই যে নবপরিণীত দম্পতী সংসারে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে কিছু টাকা পায়।' এই মত সত্য হইলে, সম্ভ্রান্তপন্ন ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে কখনও পণের দাবী করিত না। কিন্তু কাগ্যক্ষেত্রে দেখা যায় এই শ্রেণীর বরকর্ত্তারই 'খাঁই' সকাপেক্ষা বেশী, ছেলে জন্ম হইলে ত কণাই নাই। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র বরও বিবাহে যাত্রা কিছু পণ পায় তাহা প্রায় সমস্তই (অবশ্য বধূর অলঙ্কার বাতীত) বিবাহের সময়েই খরচ হইয়া যায়। একথা বীরেশ্বর বাবুই অগ্রজ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন, 'বিবাহ যখন একটা ব্যবসায় বাণ্যার তখন বেগক্ষ সেই বাণ্যারের প্রধান এবং প্রথম উদ্যোগী তাহারাই অগত্যা পণরূপে সেই ব্যয় বহন করেন।' তাহা হইলে আর পণপ্রথার 'মঙ্গলময় ফলের' আশ্বস্ত থাকে কোথায়? 'শিক্ষিতবর' যদি পত্নীকে 'মহিলার নত সম্মানে রাখিতে ইচ্ছা' করেন (এবং

ভদ্র পরিবারে প্রত্যেক বরেরই ইহাই কর্তব্য), তাহা হইলে তিনি কি বিবাহেলব্ধ পণের অর্থ হইতে এই ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন? তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে পণের টাকা বিবাহে সমস্ত ব্যয়িত না হইয়া বরের বা তাহার অভিভাবকের হস্তে থাকে, তাহা হইলেও সেই অর্থের পরিমাণ কত এবং কতদিনইবা তদ্বারা পত্রীকে ‘মহিলার মত’ রাখা যায়? স্বামী নিজে কৃতী না হইলে স্ত্রীকে সম্মানে রাখবে কি করিয়া?

যদি পণের অর্থ বরপক্ষকে না দিয়া কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহা স্ত্রীধনরূপে কন্যার নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন এই দরিদ্র দেশে এই প্রথাযে কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বীরেশ্বর বাবু যতই কেন ইহাকে একটা ‘শুভ অনুষ্ঠান’ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করুন না, ইহা সনাজে অশুভ ব্যতীত কোন শুভ ফল আনয়ন করিতেছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

কিরূপে এই অকল্যাণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারে তাহা সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। বীরেশ্বর বাবু বলেন, যে একমাত্র উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে;—তাহা হইতেছে এই, ‘কন্যাপক্ষ্যেরা যেন বর অঘেষণ না করেন।’ এই উপদেশ অনুসৃত হইলে বরপণ কমিতে পারে, কিন্তু অনেক কুমারীর ভাগেই যে বরলাভ ঘটয়া উঠিবে না তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একেবারেই বাস্তব নহে। স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য সমাজেও কন্যার বিবাহের জন্ত অনেক মাতাকে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বরশিকারের চেষ্টা করিতে হয়। বার্ণার্ড শ (Bernard Shaw) তাঁহার ‘Getting Married’ নামক নাটকের ভূমিকার এক কথা সকলকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—‘The daughters of women who cannot bring themselves to devote several years of their lives to the pursuit of son-in-law often have to expiate their mothers’ squeamishness by life-long celibacy and indigence. অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোক জামাতা সংগ্রহের জন্ত যথেষ্ট ব্যয় না করে তাহাদের কন্যারা চিরকুমারী থাকিয়া ছুখে ও দারিদ্র্যে তাহাদের জননীদিগের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। পাশ্চাত্য-সমাজেই যখন এই অবস্থা তখন বরপণ নিবারণ চেষ্টায় উক্ত পন্থা অবলম্বনে যে বিশেষ সুফল লাভের আশা নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে নারীর স্বাধীনভাবে জীবননির্মাণের সম্ভাবনা খুব কম, এবং পিতা বা অগ্র্য কোন নিকট আত্মীয়ের উপরও তাহার নির্ভর করা বোধহয় বেশীদিন চলে না; সুতরাং বিবাহ তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। শুধু জীবিকার জন্ত নহে, জীবনের একটা অবলম্বনের জন্তও হিন্দু নারীর বিবাহের প্রয়োজন। সাধারণ হিন্দুসমাজে বহিজর্জতের বড় ধার ধারে না। তাহাদের সম্বন্ধে রাণী লুইসার উক্তি বিশেষরূপে সত্য—‘The children’s world, that is world enough for me’—শিশুদের গণ্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

অতএব যাহাতে তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা কমিয়া যায় এরূপ কিছু করা উচিত নয়। আমি উচ্চশিক্ষিতা স্বাবলম্বনক্ষমা মহিলাদের কথা বলিতেছি না। সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের কথাই বলিতেছি।

একটা পরিবর্তন সমাজে আসিয়াছে— তা সে পণপ্রথাযে ফলেই হউক কিংবা পাশ্চাত্যভাব ও আদর্শের সংঘর্ষেই হউক। তাহা এই যে, এখন আর মেয়েদের যৌবনবিবাহে হিন্দুসমাজ কোন আপত্তি করে না। পূর্বে কাহারও গৃহে দশ বৎসরের বেশী বয়সের কন্যা অনুঢ়া থাকিলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইত। এখন প্রায় ঘরে ঘরেই পনের বোল বৎসরের যুবতী কন্যা বিবাহমানা। বরপক্ষও এরূপ কন্যা গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব বয়স্কা কন্যাদের প্রায়ই কোনরূপ অশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। আমরা যদি সকলে মিলিয়া মেয়েদের বারো তেরো বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব অশিক্ষিতা ও সদৃশশালিনী করিয়া পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি, তাহা হইলে একদিকে স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা যেমন সমাজে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। অপরাধকে তেমনই আবার পণপ্রথার ভীষণতাও কমিয়া যাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ।

## বরুণ ।

—(✱)—

হে বরিশু হে বিরাট হে বরাজ বারীন্দ্র বরুণ  
দাও দৃষ্টি বিশ্বপরে স্নিগ্ধ শাস্ত সন্মুখ করুণ ।  
তোমার বিরাট দেহে নদ নদী শিরা উপশিরা  
বহিতেছে রসধারা এ বিশ্বের বারুণী মদিরা ।  
সঞ্জীবিত উদ্দীপিত এ নিখিল তব কৃপা-রসে,  
হে রসবিধাতা দেব বিশ্ব তব পিপাসায় অসে  
ঢাল' ঢাল' আশীর্ব্বাদ গিরিশৃঙ্গ ভাঙিয়া চুরিয়া  
প্রপাত নির্ঝর ধারে নিখিলের আর্ততা হরিয়া ।

বিদ্যাং ক্রভঙ্গি তব, ঘনদল তব কেশ-পাশ,  
ধূসরে শ্যামলকরে সঞ্জীবন তোমার নিশ্বাস ।  
বিক্ষোভিত বৌচিকুল আন্দোলনে তোমার স্তম্ভন  
আনিছে বিভবরাশি বিশ্বতটে লুটিয়া নন্দন  
কণ্ঠে ঢুলে মীন-মাল্য নক্ৰকুল ঘোষে জয়ধ্বনি,  
তিমিঙ্গিল রক্ষা করে স্নগহন তব রক্ত-খনি ।  
পদ্মাসন রচে তব হংসকুল ভাস্কর ধবল  
কম্বুনাদে অন্ববালা ঘন-ঘন সঞ্চারে মঙ্গল ।  
তোমার প্রসন্ন হাস্য কুবলয়ে কুমুদে কঙ্কারে  
ফুঠে উঠে হ্রদে হ্রদে শতহ্রদা-প্রকাশে মল্লারে ।

মরুদ্বর্গ করে সেবা শৈবালের চামর ঢুলায়ে  
বিনতা নন্দন সেবে সুকোমল পক্ষাণ্ডে বুলায়ে  
পুষ্কর ধরেছে ছত্র জলন্তস্তে ; সায়াহ্ন স্বপনে  
আবর্তক হস্তে উড়ে জয়ধ্বজা প্রাণীচীর কোণে ।  
লাবণ্য অমৃত ধারে তৃপ্ত কর বিশ্ব প্রজাকুল  
হে প্রচেতা চেতন্যান্ কর মোরে তব পূজাফুল ।

হে বদান্য মুক্তহস্ত বিধাতার দানের সচিব,  
রাখ শুদ্ধ বিশ্বপরে তব সৌম্য চরণ রাজীব ।  
তোমার প্রবাল গৃহে ইন্দিরার শৈশব উৎসব  
লাজ-রুষ্টি সম তুমি ছড়াইছ মৌক্তিক বেভব ।  
পারিজাত সুধাভাণ্ড দেহ তুমি দেবতামণ্ডলে  
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে দেছ তুমি দেব আশুগুণে  
ত্রিভুবনে আহ্লাদিতে দেছ তুমি চক্ষিকা কৌতুক  
উপেন্দ্রে দিয়াছ তুমি রমা সহ কোস্তভ যৌতুক ।  
তাহাদের পুত্রগণে মুষ্টিভিক্ষা দেহ মাতামহ  
হর' তুমি স্নেহস্পর্শে তাহাদের যাতনা দুঃসহ ।  
স্রোতে স্রোতে তব লও পাঠাইয়া বারতা তোমার  
পোতে পোতে ভরে দাও আশীর্ব্বাদ পণ্যের সম্ভার,  
তটে তটে অম্লসত্র খুল তুমি অকুণ্ঠিত স্নেহে  
ঘটে ঘটে জীবরস পাঠাইয়া দাও গেহে গেহে,  
কুপে কুপে পাঠাইয়া অনাবিল শীতল যতন  
চুপে চুপে রক্ষা কর স্রষ্টি তব হে জীব জীবন,  
নদে নদে গদ- গদ তব প্রেম আশ্বাস সাস্বনা  
হ্রদে হ্রদে পদ্মগন্তে দূর কর দাহের যজ্ঞণা,  
ভূবে ভূবে মীন সব খুঁজে তব অভয় চরণ  
চির শুভে মুঠে মুঠে আনি মোরা করিয়া হরণ ।

প্রণমি যাদসাংপতি, নমি তব রুদ্র রূপ পায়,—  
শিব রূপে শুভ দাও ধ্রুব দাও তব রুদ্রতায় ।  
ছঙ্করে রথের চক্র, তব হস্তে ভীম নাগপাশ  
বন্যার প্লাবনে বুঝি বিশ্বভূমি করে ঐ গ্রাস ।

ভেঙে চূরে অনিতোর আয়োজন দুর্শ্বদ উদ্গদে  
 উদ্যান অটবো ক্ষেত্র গিরিদরো পুর জনপদে  
 খণ্ডপ্রলয়ের মত খণ্ড খণ্ড করি বিশ্বলালা  
 করে। বিশেষ সমভূমি গলাইয়া হিমাঙ্গির শিলা  
 ঐ মহাকাল মুক্তি, মোরা জলপ্লাবনের 'পরে  
 ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম ভাসি ডুবি কাঁপি থর থরে।  
 তব দিগ্গজ শিরে অন্তগামী সৃষ্টির সংঘাতে  
 ধ্বক ধ্বক গজমুক্তা পিঙ্গবর্ণ অনল সম্পাতে  
 দেখায় ভীষণ লীলা। ঔর্ববাহি দাউ দাউ জ্বলে  
 স্বর্ণ দীপ মণিগৃহ, জতুগৃহ সম যায় গলে।  
 সিদ্ধগুর্ভ শৈল শৃঙ্গ একাকার ও-পক্ষ পরশে  
 বারুণী প্রমত্ত রক্ত চক্ষুদাঁপ্তি আত্মাকোষে পশে।  
 এই ভীম মুক্তিমাঝে আছে তব গোপন আগ্রাস,  
 এ মুক্তি হেরিয়া তব শেষে দৈত্য পেয়েছে তরাস।  
 এই মুক্তি ধরে' তুমি চূর্ণ কর সকল জীর্ণতা  
 ওঙ্কারে ঘোষিত করি নব নব জীবন বারতা।  
 এই মুক্তি ধরি তুমি ব্যোমপথে করেছ প্রেরণ  
 স্বর্গ মর্ত্যে দেবনরে যাহা চির মধুরমিলন  
 ধ্রুব জননীর যাহা চিরন্তন শাস্ত্রত স্বরূপ  
 বেদের অনলবাণী। ধ্রুবগর্ভ প্রলয়ের ভূপ!  
 এ মুক্তিতে হেরি তব বিশ্বগ্রাসা বিভীষিকা মাঝে  
 ধ্রুবে অমৃতবাণী যুগাত্মায়ে ঘনারাবে বাজে।  
 তব ভৈরবতা মাঝে প্রজাপতি আনাসা গ্র ডুবে  
 "সম্বর সম্বর রূপ শাস্ত্র হও" যাচিছে ত্রিষ্টুভে।  
 যুগে যুগে সংসারের এ ভীষণ প্রলয় প্রকাশে  
 ভাস্বর করিয়া দাও জ্ঞাননেত্রে ধ্রুবে অভাষে।

শ্রীকালিদাস রায়।

## মেঘমুক্ত ।

—:~:—

সংসারটা তার কিছুতেই ভাল লাগছিল না । কি যেন একটা হয়ে গিয়েছে । কি,—কেন,—কায় অপরাধে ? সে প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না ! সে ত জ্ঞানবুদ্ধিতে কখনও হট্ট বনে কারো অনিষ্ট করে নি,—তবে কেন তার এ শেষ বয়সে এত পরিতাপ ! জীবনটার সে কখন হৃৎকে আনল দেয় নি' দিতে হ'ল কি না সেই এই বয়সে । গরীব গরগার ছেলে; গরীবভাবেই সে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিল, তাতে আবার হৃৎ কি ! দৌবনে সে যথেষ্ট উপার্জন করেছে, বহু পরিশ্রমে—তাতে সুখই ছিল—হৃৎ কোথা ? শরীরখানাও ছিল তার তেমনি, কষ্টপুষ্ট,—যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়—কষ্ট পাথরের চক্কে একটা পাহাড়ের মত । পরিশ্রমের শরীর,—এটি অঙ্গ পুষ্ট-সুন্দর,—যেন স্থপতির গড়া, পাথরে খোদা নিখুঁত মূর্তি ! বৃদ্ধ বয়সেও যখন সে অনায়াসে, কাঁধে পুরা এক মণি হৃৎ তার নিয়ে, বাহু ছাড়ে ছাড়ে অবাধ গাড়ে হুটে চলত, বাহুবন্ধপুষ্ঠের বাসপেশী তার দেহগতির ছন্দ অনুবাহু, তালে তালে উঠানামা করত, দর্শক তখন মনে মনে না বলে পারত না,—‘হী, একখানা চেহারার মত চেহারা বটে !’ কেবল চেহারার জন্ত সে সর্বজনপরিচিত ছিল না, যে তাকে দেখে নি, সেও তার নাম শুনেছে, তার সাহসের কথা গর্বের,—গর্বের বিষয় ছিল,—এক-জীবনে উন্নতির উদাহরণ দিতে হ'লেই তার নামটা সবার আগে উঠত; কোন মতে মাথা-লুকাবার-মত কুঁড়ে ঘরকে একদম পাকা ইমারতে পরিণত করতে পেরে ছিল ও-অঞ্চলে কেবল গিরীশ গরলাই ! ঠিক সে জন্তও নয়, লোকে জানত তাকে জন্ত কারণে । লোকটা ছিল সে স্বতন্ত্র রকমের,—অমন সহজ, সরল প্রাণীটাকে বুঝে ওঠা কেমন কঠিন ছিল । এক দিকে ছিল সে যেমন হিসাবী;—হিসাবের এককড়া কড়ি তার কাছে রেহাই ছিল না, অল্প দিকে আবার হাত ছিল তার তেমন দরাজ,—লোকটা বেহিসাবীর একশেষ,—অর্থদানের পাত্রপাত্রের হিসাব তার একবারেই ছিল না,—‘দেব’ বললে দেবী সহিত না,—‘না’ বললে ‘হী’ বলায় কার সাধা ! লক্ষ্মীর কৃপাও তার প্রাত ছিল যেমন, লক্ষ্মীছাড়ার মত খরচটাও ছিল তার তেমনি ! অত ধনের অধিকারী হয়েও দুটা পয়সা আনবার জন্ত কিনা সে করত,—রোজগারের বেলায় ছোটবড় বাচবিচার তার আদৌ ছিল না, আবার অর্পের তুলনায় ছোটবড়কে পৃথক করে দেখতে সে জানত না—সে আপনাতঃ পরকে বুঝত—সেইটাকেই ছিল তার সমতা ! লোকে স্থির হয়ে সেটাকে তাকিয়ে দেখতে চাইত না,—তাকে একাধারে বিপরীত ভাবাপন্ন ভেবে নিয়ে, তার সম্বন্ধে কত কি মন্তব্য প্রকাশ করত,—কেহ বলত,—‘হবে না, বেটা ভেমে গরলা,—বুদ্ধি আর ওর হবে কতটুকু; আশ বছর বয়সেও গরলা জাতের বুদ্ধি গরলা না—ওর ত বয়স বাট পেরেয় নি ! গরলা কুলের খোকা,—ওর চোখে ধুলো দিতে আর ক'জন !’, কেহবা সহানুভূতিতে সারা হয়ে বলত ‘লোকটার চিরটা কাল একভাবেই গেল, ঐ বীক আর কাঁধ ত'তে নামল কৈ ? একজীবনে রোজগারটাও ত কম করলে না,—নিজে তার আর ভোগ করলে কতটুকু । চিরটা কাল খেটেই মলি, তবে সুখ করি আর কবে !’

তারও যে সুখ হৃৎকের ধারণাটা অস্ত্রের অপেক্ষা ভিন্ন রকমের ছিল তা' নয়, সেও শোওয়াবস, অবিরাম-বিশ্রামকেই সুখের উপাদান বলে ভেবে এসেছে, কিন্তু চেষ্টা করেও তার মধ্যে সুখের সন্ধান পায় নি । অসুখবিসুখ তার শরীরে অতি কমই ছিল, তবু যদি কোন কারণে তাকে একটা দিনের জন্ত দৈনন্দিন কাজ হ'তে অবসর নিতে বাধ্য হ'ত, সে দিনটা তার আর কাটতে চাইত না,—কেবল তার মনে হ'ত, ‘বড় কাজ বা অসাধ্যভাবে পড়ে আছে,—



অন্তে কি তার কাজ তারি মত করে সমাধা করতে পেরেছে ! কোথায় বা কি হ'ল !—সে না হ'লে তার সংসার যেন অচল ! সে দিন সে দশবার, ছেলেকে ডেকে ভিজ্ঞাসা করত—‘অমুক কাজ করা হয়েছে কি ? অমুক বাড়ী ছুধ দেওয়া হয়েছে ত ? লোক জনের কাজে বিশ্বাস কি ! ওদের যে কচি কচি ছেলে মেয়ে অনেকগুলি,—সময় মত ছুধ না পৌঁছালে কি কন্ম কষ্ট !’ এমনি শত প্রশ্ন তার মনে উঠে তাকে আস্থার করে তুলত । সুখ বলতে মাথার তাব ঘাই থাকুক, মনের সুখ তার ছিল সেট পরিশ্রমে, — কার্যের সুসমাপ্তিতে—এবং সেইটাই ছিল তার সকল উন্নতির মূল ! আদিত্যে পরিশ্রমটা অর্থ-লালসায় আরক্ত হ'লেও, পরিণামে ওটা হয়ে গিয়েছিল তার স্বভাব;— কার্যের মিষ্টতার রক্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে কাঙ্ক্ষাই ছিল তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ! ফলে দাঁড়িয়েছিল, তার যে কথা সেই কাজ ! দেশশুদ্ধ লোক বুঝেছিল,—গিরীশের মুখ হ'তে, কোন কাজে একবার ‘হঁ’ কথা আদায় করতে পারলে, তার সুসমাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত ! তাই ছোটবড় সকল কাজে ডাক পড়ত তার সকলের আগে; সময়ের অভাব বরং তার ছিল, গ্রাহকের অভাব ছিল না । আনন্দ আদর অর্থ—সংসারীর যাবতীয় সুখ দান করেছিল তাকে, তার শ্রমাহুরক্তি, সুন্দরভাবে কন্ম সম্পাদনের চেষ্টা ।

সে চেষ্টা ত জীবন-ভর সমভাবেই চলছিল, তবু কেন তার শেষের দিনগুলো সহসা এমন আকারে দেখা দিল ! দেহটা অকস্মাৎ হবার পূর্বেই কন্মানন্দ তার নিভে আসাছিল ! কোথা, শেষ বয়সে কন্ম-যজ্ঞের অবসানে সে সাফল্য আশা করেছিল, তা না কেন্ অপরাধে তার সংসারে—না তার মনে অশান্তির বিষ ঢেলে দিল । এর পূর্বেও ত জীবনে কত অশান্তির কারণ এসেছে তাতে তাকে দমাতে পারে নি, প্রিয়তমা পত্নী তাকে একটি মাত্র পুত্র উপহার দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিল,—ছোট ভাইটি, প্রতি কার্যে তার সহায়, ছারার মত ছিল,—সেও চিরগস্থান করেছিল; এমন বুকভাঙ্গা শোকে তার অধীরতা প্রকাশ পায় নি,—সে সকলি ভুলে গিয়েছিল কন্মানন্দে,—যারা গিয়েছিল তাদের শোকে নিজেকে কাজের বাহির হতে না দিয়ে যাদের তারা রেখে গিয়েছিল, তাদের যত্নে, লালনপালনে আত্মনিয়োগ করে, সংসারের কন্মকেই বরণ করে নিয়েছিল । তারপর—পুত্রকে সে পাঠশালে পড়াশুনায় ভাল দেখে, বড় আশায়, তাকে একে একে ইংরাজির তিন তিনটা পাশ করিয়ে এনেছিল, বড় আশা তার মনে ছিল, ছেলে জঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন হবে,—সে আশা হত হলেও সে আহত বন্ধকে হাজতাপ করতে দেয় নি, কন্ম-বাধনে সে নিজেকে কসে বেঁধে শক্ত হয়ে সকল ক্ষোভ দূরে ঝেড় ফেলেছিল !

তখনও জীবনে বতটুকু বেলা ছিল, নিজের গতিতে নিজের ভাবে নিজের গন্তব্যপথে পুরা ভরসা নিয়ে চলবার পক্ষে সেই ছিল যথেষ্ট ! আশার আলোকে তখন কি তার মনে উঠতে পারে—সায়াক্ষের কথা ! তার মন ছিল তখন আহরণে,—অগণিত বস্তুরস্তার তার সম্মুখে—বিচার করে কি, রয়েসয়ে, সেগুলি খুঁটে তোলবার ! সঞ্চয়ের আমলে, জৈঙ্গার প্রাবল্যে, দেহশক্তির গতিতে সে উর্দ্ধ আকাশপানে চেয়ে দেখতে অবসর পায় নি—স্বর্ঘ্য তখন কোথায় ? সহসা কেন সন্ধ্যার আগত অন্ধকার-ভীতিবিহ্বল কোন এক আকুল পক্ষীর আর্তস্বর শ্রবণ ক'রে তার মন এমন হয়ে গেল,—সম্মুখে মুখ তুলে চাইতেই নভরে পড়ল—দিবা যে প্রায় অবসান ! গন্তব্যপথ যে কত দীর্ঘ !—কোথায় তার শেষ ! প্রান্তে কি সে, জীবনে উপনীত হতে পারবে ! পা কি আর উঠতে চায়,—চলার আনন্দ যে তখন প্রাপ হ'তে নিভে গিয়েছে ! ভাবনার শেষ নাই ! কোথায় আশ্রয়, কে দেবে ? মক্ক-উদ্ভান বেন সে দেশটা,—কারো ত সেখানে ঘরবাড়ী নাই,—সবাই পথিক—কে কা'কে আশ্রয় দিতে পারে ! এত আশা, এত উৎসাহ, আহরণের আনন্দ সবই যে বৃথা—কেবল আরো কষ্টের কারণ,—সত্যই কি সব তার তত্ত্বের লভ্য—অপরিহার্য পরিণামে সব পরিত্যজ্য !

( ২ )

গিরীশ ত জানে সব বিষয়বিভব সমস্তই তার আপনার,—তার মাথার ঘান পায়ে ফেলে উপার্জনের কড়ির সে সমস্ত ! তারই,—সমস্তই তারই,—কি উপায়ে সেগুলিতে তার অণু স্বামী স্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, সে চেষ্টা এত কাল সে করে এসেছে ! কত কষ্টে, কত যত্নে নিঃস্বার্থে গড়ে তোলা সংসার ! তার প্রত্যেকটি পাকা, চিরস্থায়ী কর্ত্তে সে কত না চেষ্টা করেছে ! সে সর্বের প্রতি তার কি গভীর টান,—মমতা,—মায়া ! এখন কেন সেগুলির দিকে চাইতে ভাবনা আসে—হায় ! তার অভাবে সে সর্বের দশা কি হবে ! তার অভাব ! ভাবতেই প্রাণটা চম্কে ওঠে ! যেটা এতদিন ভুলেছিল,—জেনেও যাকে প্রাণে স্থান দেয় নি,—সেইটা এখন কেন যেন,—দূরে ঠেলে রাখতে চাইলেও কখন কেনন করে এসে উঁকিঝুঁকি নারে ! কে যেন এতকাল ডেকে ডেকে ফিরেছে,—অচা কাজের আবেশে সে স্বর কর্ণে পৌছে নি একবার যখন শুনেছে তার আস্থান কি আর না শুনে উপায় আছে, ডাকছে—যেতেই হবে—সকল ছেড়েও তার আশ্রয় না নিয়ে গতান্তর নাই আর ! পরপারে তার ঘর—পারের-তরী বড় পল্কা,—বহিবার মত ভার সহিতে পারে না !—তবে উপায় ? এত যত্নের এত ! পড়ে রইবে কি এ-পারে ! তাদের কে এমন করে রাখবে ! ভাবতেই বৃদ্ধের প্রাণের নাখে কেনন করে ওঠে ! এমন অট্টালিকা—চিরস্থায়ী করে গড়া—তারও যে চূণবাঁলি যত্নের অভাবে খসে পড়ে ! বহুরে এক কলি চূণ না ফিরলে মলিন হয় ! তার এ কাজ এমনি করে, এমনি যত্নে কে হয়, বর্ষে বর্ষে দেখে শুনে সুসম্পন্ন করে তার কীষ্টিগুলি অক্ষত রাখবে !

ছেলে ?—সেই ত আছে ! না সে ত ও-কাজের কেউ নয়,—তার মত করে এ-সব রক্ষা করা হরিশের সাধ্য কি ! সে পারবে না—পারবে না ! বৃদ্ধ আজীবন অশ্রের ক্রতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি, সে এখন কি করে তা পারবে ! লোকে বলত—এটিই তার উন্নতির মূল ;—আজ সেইটাই হয়েছে তার সব চেয়ে তীব্র বেদনা !

( ৩ )

ছেলে বি.এ,—সে ব্যবসার কি বোঝে—না, বুঝতে চেষ্টা করে ! অর্থের কার না আনন্দ, অর্থগণের কার অনিচ্ছা কিন্তু শিক্ষিত ছেলের আয়াসেই যে অত্যন্ত ! সে চাষ চকুরী তাও কর্ত্ত্বপণা, আজকাল তা ক'জনের ভাগ্যে মিলে—জুটলেও যেমন চাকুরীই হ'ক না দাসত্বে সে কর্ত্ত্বও জটিল ! ছেলে তাই বাড়ীতে বসে ! সুসজ্জিত বৈঠকখানায় মজলিস্ করে' গল্পে গল্পে দিন কাটায় ! তাকে দিয়ে গিরীশের সংসার ঠিক থাকবে ! ছেলে তাকে কতদিন বলেছে, 'বাবা, আর কেন—অনেক করেছে,—জীবনে একটু সুখশোয়াস্তি কর—ছাড় ওসব দৈ ছুখ,—নিজ কাঁধে ওসব বওয়া আর ভাল দেখায় না !' কেন ভাল দেখায় না ? হয় কাজ বলে ? কিসে হয় ? শারীরিক পরিশ্রম ওতে যে অত্যধিক ! শিক্ষিতের মত মস্তব্য বটে ! কিন্তু খেটেই যে সে, বড় যদি হয়ে থাকে পরিশ্রমেই সে বুড়—সকলি তার বাঁকের কড়ির ! মাটি ধরে উঠেপড়েই ত সে চলতে শিখেছে ! সেটাকে, আদির আশ্রয়কে কেউ ছোট করে দেখালে প্রাণে বড় বাঝে ! ছেলের কথায় বুড়োর বড় হুঃখ হয়, ভয় হয় সে সকলি অপাতে দেবে, অপব্যয় আর ব্যয় এক নয় ! অপব্যয় হতে কি ক'রে সে তার এত সাধের সংসারকে রক্ষা করবে ! এত দিন যেগুলিকে নিত্য বলে মেনে, তাদের অস্তিত্ব অটুট অটল রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, আজ তার মহাপ্রস্থান-শক্তি প্রাণ সেগুলির উপর অনিত্যতার ছাপ ঘেরে দিলেও সে তাদের নিত্যতাই আর্থনা করছিল—অনিত্যের নিত্যতা কোথা ? সেটার সন্ধানে বিফলমনোরথ হয়েই সে

আকুল ! তার হতাশ প্রাণ হাহাকার করছে। মুখ ফুটে কথাটি পর্যাস্ত বলতে তার ইচ্ছা হয় না—ভাবে আর ভবে ! ঠিকই সে নিজেই নিজের নিকট দুর্কোষ ! কেবল একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার আবছায়া তার চতুর্দিকে ঘিরে ফেলছে যেন, সে খুঁজে পায় না করণীয় কি ? উপায় কোথা ?

( ৪ )

গিরীশের যখন এমন মনের অবস্থা, ছেলে তার তখন সমাজের উচ্চ সোপানে উঠতে বাস্তু ! এ পোড়া দেশে জন্মগ্রহণ করে, হরিশের সকল আশাভরসা, জ্ঞানগর্ভ নষ্ট হ'তে বসেছে ; তার ! তাদের এমন বাড়ীঘর, এত ধন রত্ন, শিক্ষিত সে,—এ সকল গুণগরিমায় সে যেটাকে ঢাকতে চায়, সেটা তার প্রাণে কাঁটা হয়ে নিরন্তর বেদনা দিচ্ছে ! সকলে তাকে সভ্যভবা যাই বলুক সাক্ষাতে যত প্রশংসাই করুক না কেন, সে ঠিক জানে, গোপকুলে যে তার জন্ম, সে কথাটা তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না ! সেইটাই শেল হয়ে বিঁধে তার প্রাণে ! তার দুঃখ, তার চিন্তা এ পোড়া ভারতে কেন জাতিভেদ অস্তিত্ব লাভ করেছিল ! রাগে ক্ষোভে স্বার্থে তার ইচ্ছা হয়; সেই পন্থা সে তখনি আবিষ্কার করে যাতে জাতের 'জ' পর্যাস্ত সেই মুহূর্তে লোপ পায় ! হরিশের সে দুঃখ অমূলক নয়, জাতির অত্যাচারে তাকে যে অনৈক সহ্যেতে হয়েছিল, একটা প্রেমসঙ্গত তাতে লুকাইত থেকে, জাতির দাগ ভার মনে আরো স্পষ্ট করে তুলেছিল। সে প্রাণটা তার অবহেলায় ফেলে দিয়েছিল, এক ভামিনী তরুণীর রাঙা চরণ তলে ! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম-কুমারী সে। তাদের মিলন-পথে কোন বাধা ছিল না। ধন, ঐশ্বর্য, শিক্ষা সকলই পরিণয়ের অনুকূলে, কেবল প্রতিকূলে ঐ জাতিটা ! তরুণীর জাতিজাল-ছিন্ন উদারপন্থী পিতা, স্পষ্টই তাকে জানিয়েছিলেন "জাত ব'লে কথা নয়—তাদের পারিবারিক প্রথায় ব্রাহ্মণের জাতে কন্যাসম্প্রদান নিষিদ্ধ।" পারিবারিক রীতির উপর আর কথা চলে না ! সর্বরীতির বাহিরে যাঁরা—ভেদভেদমুক্ত, সাধ করে তাঁরা আর প্রথার পাকে পড়ে না ! তাঁদের অকাটা যুক্তির ন্যায্যতা-অন্যায্যতা পরীক্ষা করে দেখবার, অবসর না নেবে, নিজেকে চেয়ে দেখবার প্রবৃত্তির অভাবে, যত ক্রোধ, যত আকোশ তার তীরের মত এসে পড়েছিল ঐ জাতটার উপর আর এই মাটিটার উপর,—সেই মাটিটা এমন বদগুণ বিশিষ্ট যে তার উপর বাস করলে জাতিহীন হতে গেলেও সিন্ধবাদের ভূতের মত জাতিটা আবার কোন্ স্থানে কাঁধগরদান জুড়ে বসে—সংস্কাররীতি ঠেলে ফেলতে চাইলেও রেশম কীটের স্তার মত অ-সংস্কার সংস্কার হয়ে চতুর্দিকে ঘিরে বেড়ে বদ্ধ করে ! হরিশের প্রাণ তাই তখন বিষম তিক্ত, উৎক্লিষ্ট উদাস—তারও কাছে সংসারটা ভাল লাগছিল না একবারেই ! পিতাই ত তাকে এমন বিপন্ন করেছিল—জন্ম দিয়া ;—আজও সে কাঁধ হ'তে বাঁক নালাতে চায় না—চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে লোকে কি করে ভুলতে পারে ? ভজ্ঞতা ভবাতা থাকে কিসে !

পিতা ও পুত্রের, বৃদ্ধ ও যুবকের হৃদয়ে ভিন্ন আকারে একই চিন্তা, একই সমস্যা—'থাকে কিসে'—কিসে আধের ছেড়েও আধারটাকে বজায় রাখা যায় ! ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষে পড়ে না, চকল যুবক পাঁচজন্যর কাজে অস্থির চিত্ত হয়ে বুঝতে পারে না, শূন্য আধারেও যে বায়ু—আয়ুই তাদের !

পিতার নিকট পুত্রের কাকি অজ্ঞাত থাকে ক'দিন ! সমস্তই সে জানতে পেরেছিল তাতেই আরো তার চিন্তায় বৃদ্ধি করেছিল....তার ধন মান জাত রক্ষা হবে কি করে।

বৃদ্ধ একদিন পুত্রকে ডেকে বলে "হরিশ ! ও-সব খেয়াল ছাড় বাবা, তোকে সংসারে প্রতিষ্ঠা করে বাই—আমার সময় ত প্রায় হয়ে এসেছে—আপাত্ত কারিস না আর।"

শিক্ষিত পুত্র তখন স্পষ্টই বলে ‘না আমি গরলার অশিক্ষিতা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করতে পারব না—  
বিয়ে যদি করতে হয় তবে শিক্ষিত-সমাজে !’

• পিতা হেসে বলে “পাগলামী ছাড়, গরলার ছেলেকে কোন বামনে মেয়ে দেবে ! দিলেই তুই তাকে নিতে  
যাজি হবি কেন—দুখে দৈয়ে কি এক হয়—মিশালে দুটাই দৈ হয়ে যায় যে।” ছেলের ক্রোধের অবধি থাকল না  
সে বলে “বাবা তুমি বুঝবে কি ! চিরদিন বামুনকে বড় করে দেখে মানুষের প্রকৃত স্থানটা কোথায় দেখতে  
ভুলে গেছ, দাবিটা করতেও সাহস করতে পার না, যুগ-যুগান্তরের বশত এ-দেশের প্রাণটা এমনি নীচে  
নামিয়ে দিয়েছে ! মেয়ে দেয় না দেয় বুঝ আমি সেটা, সকলি আর তোমাদের মত নয়,—জাত জাত বলে প্রাণ  
মান সব বিনাবিচারে পরের পায় নোয়াতে যাবে।

বুড় বলে “বটে ! বিয়ের তোর সুবিধে হচ্ছে না বলে, জাতটা হ’ল যত দোষের ! জাত ত্যাগ কি যে সে  
করতে পারে,—ত্যাগ যে তাতে অনেকখানি, ধন জন ত্যাগের চেয়েও সে ত্যাগ বড়। লোক জানে মরণ তার  
সমস্তই কেড়ে নেবে, জাত-অজাত থাকবে না তবু চায় সে মৃতসংকার, নিজ জাত দিয়ে করাতে, গুণের উপর  
জাতের প্রতিষ্ঠা সেটা কি সহজে কেউ ছাড়তে চায় !”

ছেলে বলে “গুণের উপর জাতের প্রতিষ্ঠাটা ত ভারি !—তাই যদি হ’ত তা হ’লে কথা ছিল কি ! তুমি  
আমি তবে কি এ ভাবে পড়ে রইতাম, হিন্দুর কথা ত দূরে—যারা জাতকুল ঘুচিয়ে মানবসংজ্ঞা মিশতে চেয়েছে  
তারাই কি গুণের উপর ওর প্রতিষ্ঠা মেনেছে, মুখে বলেও নেন রয়েছে—ঐ রক্তের কথা—জাতটা আমাদের  
অধঃপতন এনেছে এমনি !”

পুত্রের মন্তব্য বুড়ের আস্থা না থাকলেও, পুত্রের কথা তাকে স্মরণ করিয়া দিয়েছিল, আর একটা দিনের  
কথা ! আজ তার মনের পরদা উঠে গিয়েছে, নতুন আলোক-সম্পাতে সে দেখতে পেয়েছে কোথায় জাত, কোথায়  
জাতহীন হয়েও মানুষের গৌরব ; কিসে এই অনিত্য ধনের সাফল্য,—তার সম্ভাবহারে ! সমাজের, সংস্কারের  
অত্যাচারে সে দিন সে কি ভুলটাই না করে ফেলেছে ! সেও যে তার ছিল রক্ষণীয়।—অসহায় তার সাহায্য  
ভিক্ষা করে তার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাকে ধনী জেনে, জ্ঞানী বলে মেনে এমন একটা অনায়েব প্রতীকার-  
প্রার্থিনী হয়ে সে তার স্মরণ নিয়েছিল ! বুড় এই জাতির গর্বে দেশের সঙ্গে সেও অন্ধ বনে’ ছাঁতিলীর সকল প্রার্থনা,  
তার সকল বেদনা উপেক্ষা করেছে,—সত্যি যেটাকে সত্য বলে মেনে শতঅত্যাচার শির পেতে নিয়েছিল, গিরীশ  
তার সে মহত্ব দেখতে না পেয়ে, তাকে জেনেও নেনও, তার কষ্টের লাভব করে নি, হুঃখের কারণই হয়েছে ! এতটাই  
সে গরীব ছিল, স্বামীর শ্রাদ্ধটা পর্যন্তা যথাসময়ে সম্পন্ন করে শুদ্ধ হতে পারে নি ! তার উপর মেয়েটা তার বিয়ের  
বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, বিয়ে তার দেয় নি, ভাল ঘরে না হ’ক্ যে কোন একটা বরে মেয়েটাকে দিয়ে সে জাত-  
রক্ষা করতে পারত ত, তেমন বয় অনেক ছিল, তাতে তার মতি ছিল না ! তাই তাকে দশে মিলে এক-  
ঘরে করেছে ;—গ্রামে স্বজাতের গণ্ডিতে তার আর বসবার উপায় নাই ! মানুষের জাতরক্ষা করতে গিয়ে,  
ভালকে বরণ করতে গিয়ে সে কত হুঃখ পেয়েছে, বুড়ের আজ তাই মনে উঠল, সে বলে “ওরে সঞ্জিই বলেছি  
গুণের উপর জাতের প্রতিষ্ঠা, সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি,—তাই ত ওরা জাত ছেড়েও জাত ছাড়তে  
পারে নি ! জাত রেখেছে বলে স্বজাতিরা ছেড়েছে যাকে জাতহীন হয়েও যে জাতিতে শ্রেষ্ঠ,—তাকেই তবে রক্ষা  
কর, সেই হবে আমার বরণীয়, তার করম্পর্শে আমার ধন-উপার্জন সার্থক হবে—যে আমাকে যাই বলুক না কেন

আমি ওকেই সর্বময়-কর্ত্তীৰূপে গ্রহণ কর্ব ; ওর কন্যাই হবে আমার পুত্রবধূ, উত্তরাধিকারিণীরূপে ওকেই আমি গ্রহণ করলাম, কিছুইতেই এর অন্যথা হবে না !

পুত্র বলে “কে ?”

পিতা বলে “সেই সতী—যে স্বামীর শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হ'বার পূর্বে সর্বস্ব বেচে স্বামীর ঋণ কড়ায়গণ্ডায় শোধ করেছে,—যে অপাত্রে কন্যা দেবার চেয়ে তাকে আজ্ঞাও কুমারী করে' রেখেছে, সেই মানদা গোয়ালনী । সকলের চক্ষে যে হীন হলেও আজ আমার চক্ষে পূজ্য, জাত যখন তুইও মানিস্ না, তোর চক্ষেও সে তাই হওয়া উচিত; আপত্তি আর করবি কিসে, শিক্ষায় ? ওর যদি শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে বই পড়েও বেশী শিক্ষা হয় না; ওর যদি জাত না থাকে জাত তবে কারো নাই, ওর ধন নাই থাকুক অর্থবিত্ত আমার ডুবতে যাচ্ছিল, ওই, সে সব রক্ষা করবে—ওর মেয়ের মত মেয়ে ত আমি আর দেখছি না।”

পুত্র ত্রাসে ভাবল “তাই ত ! বুড়ো যে একরোখা, অবশেষে সব ধনরত্ন হ'তে বঞ্চিত করবে নাকি ! বশ্যতাই মঙ্গল ! সে নত শিরে বলে “ তোনার যা ইচ্ছা বাবা, ছেলে কবে বাপের অবাধ্য !”

বৃদ্ধ অনেক দিন পরে মেঘমুক্ত আকাশের মত চিন্তামুক্ত হয়ে বলে “জানি।”

বাহিরের জাতি ছাড়িলে কি ফল

অন্তরের জাতি না গেলে

মানুষের জাতি রেখেছে যে জন

জাতি আসে তার কি ফলে ॥

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস ।

পত্র ।

জানি না সে কোন পরম বিরহী লিখিয়া কয়েক ছত্র—

বিরহীর মন-বিনোদন হেতু সৃষ্টি করেন পত্র ।

যাহার অভাবে অনাদি দুঃখ পেয়েছে বিরহী যক্ষ,

সম্ভাবে যার শকুন্তলার বিরহে হ'ল মোক্ষ ।

বাথিতের ব্যথা দূরিতে কি চিঠি সঞ্জীবনের মন্ত্র ।

কৃৎকারে যার নিমেষে উড়িল মোহের সাবেক তন্ত্র ।

প্রণমি তাহার স্রষ্টারে আমি ; বিরহের ব্যথা অল্প-

করিয়া যে চিঠি দিয়াছে আমারে সহ করার কল্প ।

শ্রীবৈষ্ণবাথ কাব্যপুরাণভীর্ষ ।

## ছিন্টে-ফোঁটা ।

—\*—

ছবি আমরা যখন দেখি তখন সেটাকে দেখি আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের মানসিক ভাব ও অবস্থার বশবর্তী হয়ে, তাই কোন ছবি কোন ব্যক্তির মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায় আবার কারো বা সেই ছবিটা মোটেই ভাল লাগে না। অনেকটা রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং সর্পে রজ্জুভ্রম যে মানসিক কারণ থেকে ঘটে, ছবি দেখাতেও তাই ঘটায় সম্ভাবনা। বস্তুত শিল্পীর মানসিক অবস্থার ছাপটিই শিল্পীর পটে লেখা থেকে যায় এবং তাঁর সেই ভাবটি নিতে হ'লে সমঝদারের শিল্পীর চেয়ে আরো গভীরতার দরকার।

প্রকৃতির ভিতরকার রস-লাবণ্য গ্রহণ কর্তে হ'লে যেমন একটা বিশেষ বোধশক্তির বিকাশ না হ'লে হয় না, ছবি-দেখা সহজেও ঠিক ঐ কথাই খাটে; বরং ছবি-দেখতে সেটার চেয়ে অনেক বেশী হৃদয় অস্থিত ও শিফা থাকার প্রয়োজন। প্রকৃতিতে যে চঞ্চলতা আছে তার বাতাসের স্পর্শে, প্রতিনিহত আলোর বদল প্রভৃতি ছবিতে দেবার যো নেই কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্তের বাতাসের স্পর্শ এবং পাতার পাতার আলোর নাচন' যা শিল্পীর মনকে স্পর্শ করেছে সেইটি শিল্পী ঠিক সেই একভাবে অনন্তকালের জন্যে সঞ্চয় করে চিত্র-পটে ধরে রাখেন। তাই যদি কোন যুবকের প্রতিচ্ছাত পটে দেখি, সে পটের যুবক বাস্তব-জগতের সচঞ্চল গতিতে বার্কিক্যে উপনীত হয় না, সেই পটে একভাবেই যুবকের যৌবন অটুট থেকে যায়। তাই দেখি ছবি মৌন, সংবত।

শিল্পী শিল্প রচনা করেন কেবল হাতের বা চোখের সাহায্যে নয়, তার মনট দিয়েই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য; তাই ছবিতে কোন শিল্পী কতটা রং দিয়েছেন, কি উপায়ে ঐক্যেছেন সেটা দেখার চেয়ে কোন শিল্পীর পটের তার মনটির কতটা বোঝ পাওয়া যায় সেইটিই দেখার প্রয়োজন।

শিল্পী মাজেই আত্ম-বিস্মৃত। যে শিল্পী যতটা নিজের বিষয় সজাগ থাকবেন, তাঁর শিল্প ততটা স্থূল ও কদাকার-ভাবে দেখা দিবে। হৃদয় অস্থিত কখনও নিজের বিষয় সজাগ থাকেন না বলেই তাঁর স্পর্শনাটক লজ্জাবতীর মত লজ্জিত হয়ে পড়ে।

প্রকৃতি অসীনের মধ্যে সীমাকে আমাদের সামনে ধরে দেয়। কিন্তু শিল্পী দেখার রেখা ও রঙের সীমার দ্বারা অনন্তকে। প্রকৃতির তাই অনন্ত নীল আকাশ, উদার গন্তার সবুজ অনন্তের আভাস আমাদের দৃষ্ট নাগায় এনে ধরে দেয়, আর শিল্পী সেই প্রকৃতির অনন্ত ভাবটিকে সীমাবদ্ধ রাখার যাত্রতে অনন্তের মহিমা প্রচার করে।

শিল্পীর শিল্পকলা তার রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মনে যে উজ্জ্বল জাগিয়ে তুলে দেশের ও দেশের একটা সমূহ উপকার সাধন করে তুলবে—এমন কথা বলা যায় না; তবে শিল্পকলা অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে মনের যে গভীরতা ও সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি বাড়ায় সেটা দেশের ও দেশের পক্ষে একটা কম লাভ নয়। এই কারণেই দেশের ছবি যত প্রচলিত হয় ততই তার মূল্য বেড়ে যায়। এখানে শিল্পীর রং বা তুলির দাম নয়—তার গভীরতাই মূল্য।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার ।

## প্রীতি-গীতি ।

—:~:—

এ কেমন ও গো এ কেমন ও গো  
 এ কেমন ও গো রীতি !  
 অনাদিকালের সুমহান সুরে  
 ধ্বনিতেছে প্রীতি-গীতি !  
 দলে দলে লোক আসিতে যাইতে  
 শুনিলে পাতিয়া কান,  
 বাজে কার বাঁশি, উঠে কার হাসি,  
 নাহি তার অবসান !  
 ধারা হ'তে নামে ধারা,  
 হয় না সে পথহারা,  
 সাক্ষ্য দিতেছে আকাশে নীরবে  
 রবি শশী গ্রহ তারা !  
 ভাঙে আর ভাসে চুপে চুপে আসে  
 ঢেউয়ের পরে ঢেউ,  
 গড়িয়া ভাঙিছে ভাঙিয়া গড়িছে  
 চোখে দেখে তারে কেউ !  
 জীবনের তটমূলে,  
 মরণের উপকূলে,  
 মিলন বিরহ বিরোধের গানে  
 এক সুর কেবা ভুলে !  
 থামে নাক প্রীতি, থামে নাক গীতি  
 কিছু নাহি শেষ হয়,  
 অস্তবিহীন জীবনের ধারা  
 সে যে মৃত্যুঞ্জয় !

• • • • •

আজ তুমি আমি যে গান গাহি শো  
 তরুণ অরুণালোকে,  
 আমাদের মত গেয়ে চলে গেছে  
 যাদের দেখি নি চোখে !  
 বিচিত্র একস্থরে  
 হৃদয় অন্তঃপুরে  
 আজো অতীতের অশ্রুত গান  
 জগতে জগতে ঘুরে !  
 এক গান গেয়ে, এক তরী বেয়ে  
 চলিছে সর্বলোকে,  
 এ-পারে ও-পারে আলোকে আঁধারে  
 স্থখে দুখে রোগে শোকে !  
 বাহুপাশে লয়ে টানি,  
 কহে' মৃদু আশা বাণী  
 চিনেও সে-জনে নারিনু চিনিতে  
 জেনেও নাহিক জানি !  
 হাসি ক্রন্দনে জীবনে মরণে  
 নিতি করে আনাগোনা,  
 নিখিলের স্রোতে চলা ফেরা তার  
 মুখেতে ঘোমটা টানা !  
 • • • • •  
 ঘুচিল মরণ ভয়,  
 হ'ল জীবনের জয়,  
 ফুরাবে না তুমি, হারাব না আমি  
 র'ব যেথা সব রয় !  
 অভয় বারতা করিছে ঘোষণা  
 নীরবে তুলিয়া তান,—  
 শেষ হ'ল বলে যা'র লাগি কাঁদি  
 তারো নাহি অবসান !



ভাসিছে কালের ভেলা,  
চলিছে রসের খেলা,  
অজ্ঞাত এক মিলন-তীর্থে  
মহামানবের মেলা !  
কোন্ সাগরের কমল হ'তে  
ভেসে আসে প্রীতি-গীতি,  
কবেকার গানে কে গো সে ভুলায়  
বিশ্বজনার ভীতি !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

## পুতুলিচতুষ্টয়।

—:~:—

( ১ )

বৌবরাজ্য লাভের পরই অবস্কারাজের হৃদয়ে সন্তানসম্বন্ধ উদয় হয়। অপরিপুষ্ট ধন—অপরাধের ক্ষমতা—আর ভরুণী পত্নীর প্রতি তরুণহৃদয়-পূর্ণ প্রেম। কিছুই অভাব ছিল না—কেবল এই সমস্ত সুখকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার স্বামীজীতে একটা শিশুর কামনা করিতেন।

সে বছরদিনের কথা। সংসারে সকল বাসনাই পূর্ণ করিতে পারিয়াছে এমন পুণ্যবান কয় জন আছে? বৌবর-কুমারী শেব হইয়া গেল তথাপি তাঁহার নিঃসন্তান। দেবদ্বিগ্ধে তাঁহাদের অচলানিষ্ঠা—কিন্তু হতাশাপীড়িত রাজদম্পতি বিবিধপ্রকারে দেবদর্শনা করিয়াও অদৃষ্ট দিরাইতে পারেন নাই। তাঁহার চুঃখী ছিলেন,—অশেষ সুখরাশি বেষ্টিত হইয়াও তাঁহাদের অন্তরে শুনাতা ও মৈনোর সীমা ছিল না।

বিধাতার বরে অবশেষে তাঁহাদের প্রায় শেষ বয়সেই বৃহৎ হৃদয় আলোকিত করিয়া সুলক্ষণা রাজকুমারী জন্ম-গ্রহণ করিলেন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির পূজামুহূর্ত্তে জন্ম বার্তা শুনে তাঁহাদের করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন বীণাপাণি। পূজার আয়োজন শতশ্রমে বর্ধিত করিয়া রাঙা সেই পূজার আনন্দে কন্যার জন্ম-উৎসব মিলাইয়া দিলেন।

পঞ্চমী চন্দ্রকলা দিন দিন বাড়িতেছিল;—রাজকুমারীও হনীভূত জ্যোৎস্নারশির ন্যায় দিন দিন ব্যোমবিকাশের চাক্ষুস লাভ করিতেছিলেন। ক্রমে পঞ্চবর্ষ অভীত। রাজা বলিলেন, এই কন্যা শুধু আমার হৃদিতা নহে,—প্রকৃত প্রস্তাবে এ আমার পুত্র,—তাহার শিক্ষাদীক্ষা আনি পুত্রের ন্যায় বিধান করিব।

তাহাই হইল! যথাসময়ে বিন্যাস্ত ক্রিয়ার পর অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত রত্ননাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দী গোপালভট্ট সেই বাধ্যবয়স হইতেই কন্যাকে বৃহৎ বৃহৎ রাজনীতির উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার কোন্ অঙ্গই ত্রুটি থাকিল না।

অবস্থারাজের জীবনশ্রোতে মন্দধারা বহিত ছিল,—তিনি বারুকোর সীমায় উপনীত, তখন রাজকন্যা পূর্ণ-যৌবনা! আনন্দবন্ধারিত গর্বিত হৃদয়ে রাজা দেখিলেন,—কন্যা রূপে অতুলনীয়—আর ততোধিক অতুলনীয়—কিন্মা ও বুদ্ধিতে! সাধারণ রাজপুত্রেরা ঐশ্বর্যাদর্পে বিদ্যা বা জ্ঞানলাভে উৎসুক থাকে না বা পিতার দৃষ্টান্তে মৃগয়া বা যুদ্ধনাট্রেই আসক্ত হইয়া উঠে—কিন্তু বীণাপাণি নারীস্বভাবমূলক মৃহতার ধারা, নিজের শিক্ষার স্বয়ং উদ্যোগিনী,—আর বয়ঃপ্রবীণ পিতামাতার দৃষ্টান্তে দেবদ্বিজের তত্ত্বিমতী,—শুশিক্ষায় বালিকা অনেক রাজা ও রাজকুমারের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

অধ্যাপক রত্ননাথ শাস্ত্রী আসিয়া রাজাকে জানাইলেন, “রাজকন্যার অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, অন্নকালেই বালিকা শিক্ষকের অধিকৃত বিদ্যা সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছেন।

শাস্ত্রীই তখন সে-দেশের সর্বপ্রধান পণ্ডিত। তাঁহার কথায় রাজার আনন্দের সীমা থাকিল না, তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর গিয়া কন্যাকে ডাকিলেন—প্রশান্ত সাগরের ন্যায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও তেমনি সুস্থির গাভীর্য্য লইয়া বীণা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যাহই রাজা কন্যাকে দেখিতেন—কিন্তু আজ যেন তাঁহাকে নূতন চক্ষে দেখিলেন। রত্ননাথ শাস্ত্রীর অতুল্যা ছাত্রী—এই কন্যা কি তাঁহারই ছাত্রী? এই যেতবসনা—জ্যোতিষ্ময়ী এক স্বয়ং বীণাপাণিই তাঁহার গৃহে জন্ম লইয়াছেন?

উচ্চ সত অঙ্গ, আদর ও আশীর্বাদ লভয়া তিনি কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কন্যা চলিয়া গেলে রাণী বলিলেন,—“এইবার বীণার বিবাহের উদ্যোগ কর।”

মুগ্ধহৃদয় রাজা স্মিতমুখে কি চিন্তা করিতেছিলেন, পত্নীর বাক্যাবসানে সানন্দস্বর বলিলেন “আমিও এই কথাই ভাবিতেছিলাম! আমাদের বয়স হইয়াছে, রাজ্যশাসন আর ভাল লাগতেছে না;—বীণার বিবাহ দিয়া সেই উপযুক্ত পাত্রকে আমার ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

রাণী বলিলেন, “মগধরাজপুত্র যোগ্যপাত্র নহেন কি? মগধরাণী আমার বাল্যসখী,—তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—”

মগধরাজপুত্র? আমি তাঁহার কথা জানি। কিন্তু মহিষি! শুধু পাত্র বা রাজা দেখিয়া আমি কন্যার বিবাহ দিব না। আমার বীণাপাণি নির্দোষ নয়—বালিকাও নয়,—সে ইচ্ছা করিয়া বাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে সেই তাহার পতি। তুমি অগ্রে তাহার মত জান,—পরে পাত্র স্থির করিব।”

কন্যার মত? মগধরাজপুত্রের সহিত বিবাহদিতে রাণীর বহুদিনের সাধ,—কন্যার মত লইতে হইলে এ আবার কি গোল বাধাইবে কে জানে?

রাণী দুইদিন সন্দেহে কাটাইয়া সখীদিগকে দিয়া রাজকুমারীর মতামত জানিলেন তাঁহার মগধরাজ কেন—কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আজীবন কুমারী থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা।

বিবাহ করিবে না? এ আবার কি কথা? ক্রীলোকে বিবাহ করিবে না ইচ্ছাও কি কথা? বিরক্ত হইয়া তিনি রাজাকে বলিলেন,—“নারীর শিক্ষা অনেক সময় বিড়হন্যায় পরিণত হয়,—কন্যা কি বলিয়াছে জান?”—সকল কথা শুনিয়া রাজা হাসিয়া বলিলেন,—“ইহা ত কোন দোষের কথা নয়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই বলিয়াছে ত? বিবাহ করিবে না—এ কথা ত বলে নাই? কেন ইচ্ছা নাই তাহা না জানিয়া কেন এত চিন্তা করিতেছ? তাহাকে ডাক,—আমি স্বয়ং তাহাকে সকল কথা বলব।”

বীণা আসিয়া নতমুখে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভাব দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পিতার সজ্জব পূর্বেই বুঝিয়াছেন।—রাজাও তাতা বুঝিলেন; হাসিয়া বলিলেন—“তুমি ত সকল কথাই বুঝিয়াছ মা—আমাদের বুদ্ধ বয়সের সন্তান তুমি,—আমাদের জীবন ক্রমে আরও সঙ্গী হইয়া আসিতেছে এ সময় তোমাকে বিবাহিতা দেখিলেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি,—তাহাতে তোমার আপত্তি কেন বীণা ?—”

কন্যা নীরব।—রাজা বলিতে লাগিলেন,—“বিবাহ শুধু তোমার জন্য নয় মা !—কন্যাকে পাত্র করিতে পিতা শাস্ত্রানুসারে বাধ্য,—আর তোমাকে কি আমার বুঝাইতে হইবে যে অধিক দিন তোমার কুমারী অবস্থায় রাখিলে আমি লোকসমাজেও নিন্দনীয় হইব ?—”

কন্যা মুহূর্তমাত্র অকুণ্ঠিত করিলেন—পরে পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে বলিলেন—“আমি তাহার জন্য বলি নাই।”—

“তবে কিসের জন্য বলিয়াছিলে। তোমার অভিপ্রায় কি ?”

বীণার মুখে লজ্জার রক্তরাগ দেখা যাইতেছিল,—অক্ষুটস্বরে তিনি বলিলেন,—“তাহাতে হয় ত আমি অশুখী এই আশঙ্কা করিতেছিলাম। কিন্তু যথার্থ কথা, ইহাতে আপনাদের প্রতি অন্যায় করা হয় বটে।”

রাজা হাসিলেন।—“না মা, শুধু আমাদের কথা ভাবিও না !—তোমার অস্থখের কারণ এখন তুমি নিজেও বিবেচনা করিতে পার,—তোমার পিতা মাতা শুধু তোমার সুখই দেখিতে চান,—কেবল তোমার আনন্দই এখন আমাদের আনন্দ। তাই ত এ কথা লইয়া এত আলোচনা করিতেছি বিবাহে তোমার আপত্তির কি কারণ খুলিয়া বল।”

কন্যা কিন্তু কিছুই বলিলেন না; তাহাকে লজ্জিত দেখিয়া রাজাও নীরব থাকিলেন।

( ২ )

পূরদিন রাজকুমারীর সখী আসিয়া মাতাকে বলিল যে বিবাহে রাজকুমারীর কোন আপত্তি নাই কিন্তু তাহার পূর্বে কয়েকটা দ্রব্য তিনি প্রার্থনা করেন।

রাণী বিস্মিত হইলেন। বিবাহের পূর্বে আবার কি চাই ?—বলিলেন, “কি চাই বল।”

সখী বলিল, “তিনি একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী স্বর্ণকার চান, আর একমণ স্বর্ণ, একমণ রৌপ্য এবং ঐ পরিমাণে তাম্র ও গৌহ প্রার্থনা করিতেছেন।—”

ধাতু আর স্বর্ণকার ? রাণী হাসিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা বলিলেন “হাসিও না রাণি, বীণার বুদ্ধির তুলনা নাই,—এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয় তাহার কোন অসঙ্গি আছে। তাহাকে বলিও আমি শীঘ্রই তাহাকে ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেছি।”

দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণকার আসিয়া কন্যাকে প্রণাম জানাইল,—“রাজকুমারী কি অমুমতি ?”

বীণা হাসিয়া বলিলেন, “অমুমতি সামান্য,—এই চারি প্রকার ধাতুতে চারিটা মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে তোমার সহিত আমার একটি সন্ধি থাকিবে,—তোমাকে সপরিবারে আমার এই অস্তঃপুরের উদ্যানে বাস করিতে হইবে। যতদিন না আমি আদেশ দিব ততদিন বাহিরে যাইতে পারিব না। ইহা শুনি সম্মত ?”

স্বর্ণকার বলিল, “অসম্মতির ত কোন কারণ নাই মা, আমি স্বচ্ছন্দে তোমার সন্তানের ন্যায় বাস করিব— তাহাতে কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তোমার কাজ কি বল দেখি?”

“কাজ ত বলিলাম। চারিটা পুতুল প্রস্তুত করিতে হইবে। আমি যেক্রপ বলিয়া যাইব অবিকল সেই আকারে গঠন করিবে—সকলই আমি বলিয়া যাইব, তুমি কেবল আকার দিয়া যাইবে মাত্র।”

তাঁহাই হইল। ভবন-সংলগ্ন এক গৃহে স্বর্ণকারের পরিবারবর্গ আসিয়া বাস করিল।—শিল্পীর বাহিরে যাইবার আদেশ নাই,—উদ্যানের সীমা লঙ্ঘন নিষেধ। দ্বারে প্রহরী।—বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে এখনও সকল মূর্তি গঠিত হয় নাই।—কিন্তু তাহাতে শিল্পীর বিরক্তি ছিল না,—কন্যার বর্ণনামুখ্যায়ী মূর্তি রচনা করিতে করিতে সে আনন্দে বিভোর থাকিত,—যে প্রতিমা নির্মাণে যেন মাদকতা ছিল,—উত্তেজনা ছিল। কর্ম্মাবসরে স্নানাহারকালেও সে সেট চিন্তায় অন্যমনস্ক থাকিত!—রাজকন্যার গোপনরহস্যে সেও যেন অন্তরের সহিতই যোগ দিয়াছিল।

বৎসর শেষ হইল,—রাণী অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিলেন। কন্যার এই নূতন খেলার তিনি কোন কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।—তিনি সখিদগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আর কত দেবী?” তাহার রাজ-কুমারীর নিকট জানিয়া বলিল “আর বিলম্বের কারণ কিছুই নাই।—বল গিয়া তিনি সমস্তই স্বয়ম্বর হইতে চান।—তবে বিবাহে তাঁহার বিশেষ পণ আছে সেইগুলি যথাযথ পালিত হইলেই তিনি বিবাহ করিবেন নতুবা নহে—

স্বয়ম্বর। রাণী বিরক্ত হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইয়া রাজা বলিলেন,—“তা বীণাই আমার স্বয়ম্বর হইবার যোগ্য।—আমি এখনই তাহার উদ্যোগ করিতেছি। কিন্তু তাহার পণ কি?”

দাসী বলিল,—“তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে সম্প্রতি তিনি যে চারিটা মূর্তি প্রস্তুত করাইয়াছেন, বিবাহার্থীকে তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।”

“প্রকৃত মূল্য? এ কথার অর্থ?”

“অর্থ আর কি? পুতুলির যাহা ন্যায্য মূল্য তাহাই বলিতে হইবে।”—

হাসিয়া রাণী বলিলেন,—“স্বর্ণকারের কার্য্য রাজপুত্রগণকে করিতে হইবে বুঝি?”—

রাজা বলিলেন “সে যাহাই হউক,—বীণা যাহা ইচ্ছা করিয়াছে তাহাই হইবে,—আমি এই মর্মেই স্বয়ম্বর ঘোষণা করিব।”—পরে দাসীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—“এ ঘোষণা কি রাজন্যবর্গের জন্য—না মনুষ্য-নির্কিশেষে হইবে?—বীণা একথা কিছু বলিয়াছে কি?”

নভশিরে দাসী বলিল,—“হাঁ! মহারাজ,—রাজকন্যা বলিয়াছেন এ নিমন্ত্রণ জাতিধর্ম্মনির্কিশেষে হইবে। তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলে সে যেই হউন তিনিই তাঁহার বরমালা লাভ করিবেন।”—

রাণী বলিলেন,—“সে যদি একজন সামান্য স্বর্ণবণিক হয়?”—

হাসিয়া রাজা বলিলেন “তুমি ভুল বলিতেছ রাণি,—জাতিধর্ম্মনির্কিশেষে বলাতেই বুঝিতে হইবে যে সহজ লোকের পক্ষে ইহা অসাধ্য, কন্যার প্রতি অবিচার করিতেছ কেন—জান ত সে হিন্দুধর্মে প্রবল অমুরাগিনী!”

স্বয়ম্বরের সংবাদ দেশময় প্রচারিত হইল!

অকৃত পণ!—পুতুলির মূল্য নির্ণয়;—ইহার অর্থ কি মন্দির?—

রাজারে অনেক মন্ত্রী অনেক অর্থ করিলেন,—তবে উত্তর সাধারণ অর্থ আর কি চটতে পারে ?—সঙ্গে উৎকৃষ্ট নিকষ,—বিজ্ঞ স্বর্ণবণিক,—স্বর্ণকার এবং একজন গণিতশাস্ত্র বিশারদকে লইয়া যাইতে হইবে।—উত্তমরূপে পরীক্ষার পর, স্বর্ণ রোপের মূল্য নির্ধারণ,—ইহা আর বেশী কথা কি ? !—

তাহারা সকলেই ভাবিতেছিলেন,—কিছুই কঠিন নয় এ পণ !—আমিষ্ট নিশ্চয় রাজকুমারীকে লাভ করিব !—কিন্তু একটা আশঙ্কা,—যদি অন্য কোন রাজা বা রাজপুত্র আগেই গিফ্ট পরীক্ষায় জয়ী হইয়া বসে ?—

সাধারণ লোকও অনেক চলিল, কেহ দর্শনার্থী আর কাহারও বা এমনও আশা ছিল যে—‘যদি রাজগণ পরাস্ত হন—তবে একবার আমরাও চেষ্টা করিয়া দেখিব !’—

( ৩ )

অবন্তী নগরের বহির্দেশে বিশাল প্রাচীরে সুবিস্তীর্ণ পটাবাস নগরী নির্মিত হইয়াছিল।—নিমজ্জিত প্রত্যেক রাজার জন্য এক এক অংশ পৃথকপৃথকভাবে সজ্জিত,—তাহাতে—শয়ন উপবেশন ভোজনাদির জন্য উৎকৃষ্ট স্থান,—পারিষদগণের জন্য, কৰ্মচারীবর্গের জন্য,—হস্তী অশ্ব শকটাদির জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা।—তাহাতে যথাযথ দাসদাসী খাদ্য পেয়াদির প্রাচুর্য্য দেখিয়াও সকলে বিস্মিত হইলেন।—

নিকটের রাজগণ পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলেন।—রাজকন্যা বলিলেন—“অনর্থক বিলম্ব করিয়া ফল কি বাহারা আসিয়াছেন তাহাদের নিকট পুতলি প্রেরিত হউক,—প্রত্যেক রাজা দশদিন করিয়া সময় পাটবেন, ইতিমধ্যে প্রতিমার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিয়া আমার জানাইবেন,—উত্তর সত্য হইলেই আমি তাহাকে বরণ করিব।”—

তাহাই হইল।—মহারানীর বিশেষ অহুরোধে পুতলি সৰ্ব্বাঙ্গে মগদশিবারে প্রেরিত হইল।—দেখিয়া মগধ রাজকুমার ভাবিলেন আমাই সৌভাগ্যবান,—কারণ এ পুতলির মূল্য নির্ণয় কিছুমাত্র কঠিন নহে।—

কি সুন্দর গঠন !—প্রথম দিন পুতলি করটি তাতে হাতে শুধু দেখিতে দেখিতেই ফিরিল।—চারিটি মূর্তিই একই আকারের,—ওসন্ন সহাসাবদনা স্বর্ণময়ী নারী,—কোমল বিশদ নেত্রা স্বেতোজ্জ্বল রজত-প্রতিমা ;—আর সেই অতুল্য কারুশিল্প তাম্র ও লৌহ প্রতিমাধ্বয় সহসা দৃষ্টি আকর্ষণী না হইলেও একবার চক্ষু তাহাতে পতিত হইলে দৃষ্টি ফিরাইতে পারা কঠিন ! সে গঠনের—সে ভঙ্গীর বুঝ তুলনা নাই।

দ্বিতীয় দিন হইতে রাজার সুদক্ষ স্বর্ণকার কতই না উপায়ে পুতলিকা চতুর্দিকের মূল্য নির্ধারণ করিয়া রাজাকে জানাইল ; সে ফল রাজা দেখিলেন মন্ত্রী দেখিলেন,—ধন্যধাক্ষ দোহলেন ? অবশেষে সকলেরই বিশ্বাস হইল গণনা নিভুল,—পুলকিত হৃদয়ে রাজা ভাবিলেন—কল্যাণপ্রভাবে আমাই এই বিশাল অবন্তীরাজ্যের আধিপত্য ও তাহার লহিত সর্বজনপ্রার্থিতা কুমারী বীণার পাণিলাভ করিব !

আশায় উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতেই রাজা পুতলিকা ও তাহাদের মূল্যতালিকা রাজকন্যার নিকট প্রেরণ করিলেন। কি উত্তর আসিবে ? কখন আসিবে ?—শীঘ্রই আসিতেছে, এত উৎকণ্ঠা কেন ? রাজকন্যা তাহারই। বালিকা এ কি তুচ্ছ পণ লইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র ভূপতিকে আহ্বান করিয়াছে ? এত সামান্য বাহা,—রাজা অন্তরে-অন্তরে হাসিয়া আকুল হইলেন।

দণ্ডব্রম্ম মধ্যে দূত ফিরিয়া আসিল। কি সংবাদ ? রাজকন্যা কি বলিলেন ! দূত তাহাদের প্রেরিত পত্রখানি ফিরাইয়া দিল—উপরে স্বর্ণাকরে রাজকন্যা লিখিয়াছেন—“গণনা ভুল, পুতলির যথার্থ মূল্য নির্ণয়িত হয় নাই।”

আনন্দ-উজ্জ্বাস থামিয়া গেল ;—কিয়ংকাল স্তব্ধ থাকিয়া রাজকুমার বলিলেন—এত করিয়া গণনা করিয়াও ভুল করিলে ? ধিক্ !”

বণিক তোলিক—সকলেই অধোমুখ, মগধ-শিবির নীরব হইয়া গেল।

পরদিন কাশীরাজের পালা। মগধের পরাজয়ে তাঁহার আনন্দের সীমা নাই,—রাজরাণীর পক্ষপাতি-তার মগধ প্রথম স্থান পাইয়াছিল—নতুবা কাশীরাজের তুলা কে ? নিকোঁধ মগধ হারিয়াছে,—এখন আর রাজকন্যার ওনা ভাবনা নাই, তিনি তাঁহারই ! অবস্খীর বিশাল রাজ্য কাশীরাজ্যে যুক্ত হইলে আর তাঁহাকে কে পাইবে—তুইদিনে মগধ জয় অনিবার্য্য,—তাঁহার পরই বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিবেন ! হয় ত—হয় ত একদিন কাশীই যে ভারত সাম্রাজ্যের একছত্রী সম্রাট হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

দশম দিনের প্রভাতে কাশীরাজের নির্ণয়পত্র রাজকন্যার নিকট প্রেরিত হইল। আবার আশা উদ্বেগ,—কিন্তু উত্তরও ঠিক তেমনি নৈরাশ্যপূর্ণ !—কাশীরাজেরও মীমাংসাপত্র ভ্রমপূর্ণ—রাজকন্যা আবার এই উত্তর পাঠাইয়াছেন।

পরদিন কাশীরাজের পালা। যথারীতি চেষ্টা ও দশদিনের প্রভাতে রাজকন্যা তাঁহার উত্তরও “হয় নাই” বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে দশর্শ-ত্রিগর্ভ, পাঞ্চাল, কোশল, মথুরা, সিদ্ধ ও কাম্বীর। একে একে সকলেই পুতুলি পাইলেন—এক কাহারও উত্তরই বীণাপাণির মনোনীত হইল না !

এক রহস্য ! এতগুলি দেশের বিজ্ঞ স্বর্ণবণিক, রাজনাবর্গ, সুধী মন্ত্রীগণ সকলেই কি মূর্থ—অন্ধ—জ্ঞান নাই কাহারও ? রাজকন্যা কি এই সকলকেই উপহাস করিতে ডাকিয়াছেন ? সকলেই চিন্তিত—কিন্তু পরাজয়স্বপ্নেও কেহ দেশ ভাগ করিতে পারিতেছিলেন না,—কে জয়ী হইবে—কেমন করিয়া—কি উত্তর দিয়া জয়ী হইবে—এই কেতুতলে সকল রাজাই শিবিরে বাস করিতে লাগলেন।

অবস্খীরাজেরও অর্থবায়ের সীমা নাই, প্রত্যহ সেই চতুঃসজ্জিত রাজনাগণের পরিচর্যা আহারাদির ব্যয়ে তিনিও যেন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে তাঁহার হৃৎক ছিল না,—কিন্তু কন্যার যে কি ইচ্ছা, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। রাণী বলিতেছিলেন, বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তাই বীণা এ সকল উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে ! নতুবা এতগুলি রাণীর উত্তরও কি ভুল হয় ? বীণা কি এত বিহ্বলী ?

রাজগণ অবস্খী ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু রাজকন্যার আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে কি ঘটে দেখিবার জন্যই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কত্বেকদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট রাজারাও পরাস্ত হইলেন। রাজাদের হৃদশা দেখিয়া সাধারণ লোকও কেহ অগ্রসর হইল না। শেষে রাজকন্যার পুতুলি সে দিন অপরাীক্ষিতভাবে পড়িয়া থাকিল।

নিবাস ফেলিয়া রাণী বলিলেন, “কন্যার আর বিবাহ হইয়াছে !”

( ৪ )

মগধরাজকুমারের বালাবদ্ধ তারানাথ, স্বয়ম্বর ঘোষণার সময় দেশে ছিলেন না। তিনি দেশে ফিরিয়া এই দেশবাসী মহা-উৎসাহজনক সেই দীর্ঘকালব্যাপী স্বয়ম্বরের উৎসব দেখিবার জন্য অবস্খী দেশে মগধকুমারের অতিথি হইলেন।

রাজকুমারের বন্ধুকে পাইয়া মহানন্দ! “সখা, আর এ পুরাতন অবসাদজনক শিবিরবাস সহ্য হয় না,—কৌতূহলের দায়ে চলিয়া যাইতেও পারিতেছি না—অথচ এ বিরক্তি যেন অসহ্য হইয়া পড়িতেছে!—এ সময় তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

তারানাথ প্রশ্ন করিলেন,—“কি সে অদ্ভুত পুতুলিকা? কতগুলি রাজা আজ বৎসরকাল ধরিয়া যাহার মূল্য নির্ণয় করিতে পারিলেন না,—সে পুতুলিকা কেমন?”

মগধকুমার হাসিয়া বলিলেন—“শুধু রাজগণও ত নয়, কত প্রসিদ্ধ স্বর্ণকারেরও মূল্য নির্ণয় বার্থ হইয়া গেল। বুঝিয়াছি,—এসকলই রাজকুমারীর ছলনা। ডাকিয়া রাজনাবর্গের অপমান করাই তাঁহার অভিপ্রায়। কি করিব, স্ত্রীলোক—কিন্তু অবস্থি-মহারাজ কেন আমাদের এ কষ্ট ভোগ ও লজ্জা দিলেন?—এ অনায়েব কি প্রতিবিধান নাই?”

তারানাথ বলিলেন—“অবস্থীর উপর অনায়েব ক্রোধ করিতেছ বন্ধু! এই বৎসরাদিক কাল ধরিয়া তোমাদের আতিথা-সৎকারে তাঁহার কত চেষ্টা কত ব্যয় ও কিরূপ চিন্তা গিয়াছে তাহা ভাবিতেছ না কেন? কন্যার বিবাহ দিতে কোন্ পিতার অনিচ্ছা!—তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইও না। তবে রাজকুমারীও তাঁহার পুতুলি”—মুহূর্ত্তকাল অকুণ্ঠিত করিয়া তারানাথ বলিয়া উঠিলেন—“ভাল সখা, আমি একবার সেই প্রতিমা চারিটি দেখিতে পাই নাকি?”—

রাজকুমার হাসিলেন। “পুতুলি? তুমি পুতুলি দেখিয়া কি করিবে সখা? যদিও সে শিল্প চতুষ্ঠয় দ্রষ্টব্য-হিসাবেও সুন্দর—”

কতকটা তাহাও বটে!—তারানাথ বন্ধুর কথার সহিত বলিয়া উঠিলেন, কতকটা তাহাও বটে!—এ দেশের লোক যাহার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে—সে পুতুলি দেখিতেও সাধ যায় সত্য।”

“পুতুলি দেখিতে আসে নাই তারা, তবে তোমার যখন এতই সাধ তাহা দেখিতে,—তা আমি বোধ হয় তোমার সে বাসনা মিটাতে পারি;—অদ্য প্রাতে দূত বলিয়া গিয়াছে, “যদি আবার কোন রাজা ইচ্ছা করেন তবে পুতুলি আনাইয়া যতদিন ইচ্ছা রাখিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।”

তারানাথ আনন্দিত হইলেন। রাজাও নূতন উৎসাহে বলিয়া পাঠাইলেন যে আমার শিবিরে আর একবার পুতুলি প্রেরিত হউক।

যথাসময়ে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি কয়টি আসিল।—বহুলোকের করম্পর্শেও তাহাদের দেহে কিছুমাত্র মালিন্য দেখা যায় না,—রাজকন্যা স্বয়ং তাহাদের স্পর্শের চক্ষু কালিমাদি পরিষ্কার করিয়া যেন নূতন করিয়া রাখিয়াছেন।—

মূর্ত্তি আনীত হইলে তারানাথ বলিল “এ পুতুলি আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, তুমি এক মাস সময় লইবে। আর আমার জন্য একটা নির্জন শিবির নির্দেশ করিয়া দাও, পাচক ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইবে না—এমন কি তুমিও না!”—

রাজকুমার উচ্চহাস্য করিলেন।—“বটে! এমনভাবে পরীক্ষা?—এ পরীক্ষায় নূতনই আছে বটে!—ভাল কুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে।”

নদীতীরে—শূন্য প্রান্তরের সম্মুখে দ্বার রাখিয়া তারানাথের নির্জন নীরব শিবির প্রতিষ্ঠিত হইল।—পার্শ্বে সরল সুদীর্ঘ পুরাতন বৃক্ষতলে শিলাসন,—দূরে পর্বতশ্রেণীর ঘন নীলিমা,—মুহূর্ত্ত হাসিয়া তারানাথ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মগধ-শিবিরেও কোন বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না,—মাঝে মাঝে রাজা, পাচককে প্রশ্ন করেন যে “বন্ধু কি করিতেছে ! কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতেছে ?—”

পাচক উত্তর দেয়—“সে কখনও তারানাথকে পরীক্ষা বা সেকুপ কোন চেষ্টা করিতে দেখে নাই ।—প্রত্যহই সে দেখে যে তিনি স্নানাদি করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন । পুস্তলি কয়টি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, আহার প্রারম্ভে যুবক আচার্য্যাদিগকে সেই প্রতিমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেন—বোধ হয় যেন নিবেদন করিতেছেন ।—তার পর স্বয়ং আহার করেন ।—” ইহার অধিক আর সে কিছুই জানে না ।

রাজা বিস্মিত হইলেন । কিভাবে সে পরীক্ষা করিতেছে দেখিতে তাহার কৌতূহল জন্মিতেছিল, গোপনে তিনি লুকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোথায় কি ?—তারানাথকেও কখনো সে সকল কিছুই করিতে দেখিতে পাইলেন না !—কখনো বা দেখিলেন তিনি নদী-সৈকতে বসিয়া কোন একটি প্রতিমাকে ক্রোড়ে লইয়া সঙ্গীতমগ্ন,—“সুদয়ে দেখি তোমা যে চারু-সংগে,—এসগো সেই রূপে জগত-মাঝে !”—কখনো বা শিলাসনে বসিয়া পুস্তলি-সম্মুখে ধ্যানমগ্ন,—বাহু-চৈতন্য হীন, দৃষ্টি সেই মূর্তির প্রতিষ্ট স্থির—তাগাতে আর প্রকাশ্য দর্শনশক্তি নাই ! কখনো বা এমনো দেখা যায় যে পুস্তলি কয়টিকে লইয়া তারানাথ, স্নানে নামিয়াছেন,—খেলার চলে হাসিয়া হাসিয়া তাগাদের সঙ্গিত অলাপ করিতেছেন—তাগদিগকে স্নান করাইয়া অঙ্গমার্জন করিয়া বস্ত্রাদির অভিনব সজ্জা প্রদান করিতেছেন ! গেন থেলা—গেন পূজা—!

প্রতীক্ষা ও উৎকর্ষের মধ্য দিয়া মাস অতীত হইল । পূর্ণ দিন সন্ধ্যার সময় কুমার পরিদর্শগণের সঙ্গিত সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, সকলেই খেলায় নিবিষ্টচিত্ত,—খেলা শেষ হইয়া আসিতেছে, জয়-পরাজয়ের প্রতি উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি ও চিন্তা নিবন্ধ,—তারানাথ নিঃশব্দে আসিয়া তাঁগাদের পার্শ্বে বসিলেন ।

সেবারের খেলা শেষ হইল । জয়ের আনন্দে কপালের ঘন ঘুঁষিয়া কুমার মুখ তুলিয়াই মিত্রকে দেখিতে পাইলেন,—তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন !—“জয় হোক ! রাজকুমারের সঙ্গত্রেই জয় হউক !”

“এতদিনে রাজকুমারকে স্মরণ হইল নিষ্ঠুর !—তোমার পুতুল খেলা শেষ হইয়াছে এতদিনে ?”—সখাকে আলিঙ্গন করিয়া কুমার গদগদকণ্ঠে তাঁগাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন ।—

তারানাথ বলিলেন, “সেও ত তোমারই জন্য সখা !—তোমার জন্য এই চিন্তা আমার অতদূর অগ্রসর করিতে পারিয়াছিল নতুনা শুধু ঐ পুস্তলি লইয়া এই যে মাসকাল আমার যত্ন ও পরিশ্রম—তাহার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? না ঐ সকল অকার্য্যকারণেই আমার তেমনভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইত ?—”

“কোন প্রয়োজন ছিল না, পুস্তলির মূল্য লইয়া আমার আর কোন উদ্বেগ নাই,—এখন আমি কিছুদিন তোমার সঙ্গিত বাস করিতে চাই ।—সেই বালাকালে—সেই গুরুর নিকট শিক্ষার সময় আমরা দুইজনে যেমন একত্র একভাবে থাকিতাম,—তেমনি—”

সাদরে রাজকুমারের কর চুখন করিয়া তারানাথ বলিলেন,—“দরিদ্র বন্ধুকে এত ভালবাস সখা ?—ধন্য !—তোমারই জন্য একটা কাজ করিতে পারিয়াছি ভাবিয়া আজ আমার চিত্ত যেন ভারিয়া উঠিতেছে !—সে কাজ যতই তুচ্ছ হোক না কেন, এই সমস্ত ভারতের নৃপতি-সমাজের মধ্য দিয়া তুমি উচ্চ মাথায় রাজকন্যার বরমালা পরিয়া দেশে ফিরিবে,—এ চিন্তায় আমার বড় স্থখ হইতেছে প্রিয়তম !—এ দীনহীন বন্ধুর অতি ক্ষুদ্র কার্য্য প্রার্থিতার স্পর্শের মধ্য দিয়া যখন তুমি অনুভব করিবে—”



কুমার হাসিয়া উঠিলেন। “কি বলিতেছ সখা?—তুমি কি সত্যই উন্মাদ হইয়াছ?—কোথায় প্রার্থিতা—আর কোথায় তাহার স্পর্শ!—কি বলিতেছ তুমি?—তোমার পুতুলখেলার পরিণাম”—

তারানাথও হাসিয়া বলিলেন,—“তাহার পরিণাম তোমার বিবাহ!—এই বিশাল জনতার মাঝ দিয়া মহা-গৌরবের অভিযান!—আমি কেবলই সেই কথা ভাবিয়া সুখানুভব করিতেছি,—তোমার সেই আনন্দ-গৌরবের স্বয়ম্বর মালা লাভের—”

হাসিয়া কুমার লুটাইয়া পড়িলেন।—তাঁহার সখা কি বলিতেছে?—যাহাই হউক এ সকল কথা লইয়া হাসি তামাসা সেও মন্দ নয়।—তিনি পরিহাসের সুরে বলিলেন,—“তাহার পর?—বিবাহ উৎসবে তুমি किसের পদ লইবে তারা?—গায়কের! না ক্রীড়কের?”

“আমি—? আমি ভোজনের আসনে বসিব সখা? পাহাড়েপাহাড়ে বেড়াইয়া শ্রান্ত আছি—ভাগ করিয়া আহাতিদিও হয় নাই,—তোমার বিবাহের কল্যাণে কয়দিন থাইয়া বাঁচিব!—আর সখা, যদি রাজকুমারীর আর কোন প্রয়োজন না থাকে—পুতলি কয়টা আমার দিতে বলিও।—আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।”—

“সত্য?—তাহা দেখিয়াছি বটে!—কিন্তু তোমার পুতলিলাভ ও আমার মালালাভ—এ দুয়ের মধ্যে সম্ভাবনার স্থিতি কতখানি বল দেখি? অতলস্পর্শ সাগর না হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ?—কত বড় দূরত্ব!—”

কিছুমাত্রও না!—এখান হইতে অবস্তি-প্রাসাদ—এইটুকু দূরত্ব মাত্র!—যাও বিলম্ব করিও না, এখন রাজত্ববনে সংবাদ পাঠাও যে “কলাই তুমি স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিতেছ,—রাজকুমারী যেন প্রস্তুত থাকেন—কলাই তাঁহার বিবাহ।”—

বজ্র দৃঢ়-স্বর শুনিয়া রাজকুমারের অন্তরও চমকিত হইয়া উঠিল।

রাজকুমার নিঃশব্দে সখার প্রতি চাহিলেন। দীর্ঘ উন্নত বলবান দেহ—কৃষ্ণকেশরাজিমণ্ডিত বৃহৎ মস্তক, প্রশস্ত ললাটের নিম্নে বিশাল উজ্জল চক্ষু যেন হাসিতেছে?—ওদ্ধভাবে রাজকুমার তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

( ৫ )

প্রভাতে কোলাহলে ও উৎসাহে ক্ষুদ্র অবস্তি যেন ঝঞ্ঝাচকল সাগরের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

\* নৃপতিগণ বিস্মিত!—মগধ কি গণনার মূল্য নির্ধারণ করিল!—রাজকন্যা কি সে মূল্য মনোনীত করিয়াছেন!—একেবারে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান!—কি করিয়া কি হইল!—মগধ কি করিল।

কেহবা হাসিল—কেহ পরিহাস করিল—অনেকে রাজরাণীর ষড়যন্ত্রের কথাও বলিতে ভুলিল না।—“রাজ-কুমারী অবশেষে মাতার চেষ্টায় মগধকে বিবাহ করিতেছেন!—বিবাহ ত হওয়া চাই!—দেখিলে না, পুনরায় বনন আবার পুতলি প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখনই ত বোঝা গিয়াছিল যে এখন রাজকুমারীর আপনায় প্রয়োজনও বড় মাথা তুলিয়াছে।”

যাহাই হউক—বিবাহ দেখার কৌতূহল কাহারও কম ছিল না।—বৃহত্তমধ্যে রাজসভা পূর্ণ হইয়া গেল।

মণ্ডপ মধ্যে —সম্মুখেই পাত্রমিত্রবেষ্টিত মগধরাজকুমার,—পুতুলি চারিটা বস্ত্রাবৃত হইয়া তখনও তাঁহাদেরই নিকট স্থাপিত ছিল।—রাজকুমার স্বহস্তে বীণাপাণিকে তাহা প্রদান করিবেন!—প্রত্যেক পুতুলির কণ্ঠে তাহার প্রকৃত মূল্যতালিকা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।—কন্যা নিজে তাহা দেখিয়া লইবেন!

কিন্তু কন্যার নিকট হইতে এ কথার আপত্তি আসিল!—পুতুলির মূল্য যথার্থই হইয়াছে কিনা এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে।—তিনি মগধের আহ্বানে প্রকাশ্য-সভায় যাইতে প্রস্তুত ন'ন!—তবে জালাস্তরালে উপবিষ্টা ডাকিয়া তিনি পুতুলি পরীক্ষা করিতে পারেন।

তাহাই হইল —যাহারা শুধু রাজকন্যাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইল।—রাজগণ বুদ্ধিলেন—“এই কন্যা বুদ্ধিমত্তা বটেন!—মগধের কথায় তাহারাও হতবুদ্ধি হইয়াছেন কিন্তু তিনি হন নাই!—আপনার কর্তব্যে তাঁহার কোনখানেই ত্রুটি নাই!—সহসা কোন নূতন কথা ভুলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া অসাধ্য।

সভা পরিপূর্ণ,—স্বর্ণ-যবনিকার অন্তরালে রাজকন্যা আগমন করিলেন, কক্কি আসিয়া ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে তাঁহার প্রণাম জানাইল। অরুণবসনা তরুণী দাসী—তপনপ্রমুখিনা উষার ন্যায় জ্বালসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—মগধকুমার একবার অন্তরে অন্তরে শিহরিলেন।

অবস্তী-মন্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন,—“মগধরাজকুমার পুতুলির মূল্য নির্ণয় করিয়াছেন—এই কথা কল্যা দূতমুখে কথিত হইয়াছে,—সমবেত রাজন্যবর্গকে সেই জন্য আমরা নিমন্ত্রণ করিয়াছি।—এক্ষণে কুমার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন।”

রাজকুমার শুকমুখে তারানাপের প্রতি চাহিলেন।—তাঁহার মুখে অস্পষ্ট হাসি—চক্ষু স্পষ্ট সঙ্কেত!—মুহূর্ত্তে আপনাকে স্মরণ করিয়া কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন “হঁ! আমরা মূল্য নির্ণয় করিয়াছি বটে!—তবে তাহার সত্যাসত্য কুমারীর বিচারে প্রতিপন্ন হইবে।”

কক্কী পুতুলি লইয়া দাসীকে দিল,—সে অন্তরালস্থিত রাজকন্যার নিকটে লইয়া গেল।—মুহূর্ত্তকালও নহে—তৎক্ষণাৎ দাসী ফিরিল!—“হঁ! যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইয়াছে!”—স্বর্ণপুতুলির মূল্য স্থির!—সমস্ত সভা তরু হইয়া গেল!—মগধের বক্ষোরক্ত সবেগে উছলিয়া উঠিল, তারানাথ হাসিতেছিলেন—বালকের ন্যায় মুক্ত আনন্দের হাসি!

রোপাপুতুলি দেখিয়াও রাজকন্যা বলিলেন—“ইহারও যথার্থ মূল্য নির্ণীত হইয়াছে!—” কন্যার নিকট-বস্তিনী সঙ্গবীণগণ দেখিল বীণাপাণির মুক্তি স্থির, দেহ ঘর্ম্মাক্ত—আসন্ন লজ্জায় অথবা কি জানি কেন,—ঘনীভূত সৌন্দর্যের সহিত চন্দ্রকান্তি বদনমণ্ডল অরুণদর্শন-সম্ভাবিতা পদ্মিনীর ন্যায় কোমল।

ক্রমে তাত্রপ্রতিমা আসিল ও তাহার কণ্ঠ-লগ্ন পত্রে দৃষ্টি করিয়াই কন্যা বলিলেন—“হইয়াছে!” তাহার পর লৌহমুষ্টি আসিল।—ভাবভূক্ত মুখে সত্যভাবে কন্যা তাহার প্রতি চাহিলেন—ইহার কণ্ঠে মূল্যতালিকা নাই।—চরণপাশ্বে স্বর্ণপত্রে উৎকীর্ণ—অক্ষরমালা!

তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যা অধোমুখ হইলেন!—আবার চাহিলেন,—সেই উজ্জল স্বর্ণবস্ত্র তাহা—“হইবে মূল্য, আমি স্থির করিতে পারিলাম না,—বোধ হয় অমূল্য।”

সখীরা দেখিতেছিল,—রাজকন্যার মুদিত প্রায় নয়ন হইতে ওলধারা ঝরিতেছে—কতক্ষণ পরে সেট স্বর্ণলিপি-খানি কপালে স্পর্শ করাইয়া গদগদস্বরে তান বলিলেন, পিতাকে গিয়া বল, “আমার সমস্ত উত্তরই মিলিয়াছে,—যিনি এই প্রশ্ন পূর্ণ করিয়াছেন তিনিই আমার স্বামী?”

‘প্রতিহারী জানাইল, “রাজকন্যার সকল প্রশ্নের উত্তরই ঠিক হইয়াছে।”

মগধদলে মহাচর্যে জয়ধ্বনি উঠিল।—অবন্ত্যরাজ উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। আদেশ দিলেন, “উত্তর যখন বীণাপাণির মনোমত হইয়াছে তখন তিনি এই সভায় আসিয়া রাজকুমারকে মালাদান করুন; কারণ তাহাই স্বয়ম্বরের প্রথা।”—

মগধের অদ্ভুত ভায়ে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য হইয়াছিলেন।—ইহার পর কন্যার আগমন সম্ভাবনায় তাঁহার আরও অভিভূত হইয়া গেলেন। বাঁহার বাহা বক্তব্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলেই একদৃষ্টে যবনিকার প্রাতি চাহিয়া থাকিলেন।

রাজকুমারী আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন।—অতুণা সুনন্দী!—হাঁ তাহাই ত!—মেঘাস্তরিত স্বর্ষের সহসা প্রকাশে নব রৌদ্রালোকের ন্যায় সে রূপজ্যোতিঃতে সভা যেন আলো হইয়া গেল!

সুগঠিত মর্ম্মরপ্রতিমাব্য শুভ্রকান্তি, নিটোল দেহাষ্ট বেষ্টন করিয়া পদ্মরাগত উজ্জল রক্তবর্ণ চিনাশুক, প্রতীপাদক্ষেপে তাহার স্তরেস্তরে আলোছায়ার মনোমদ শোভা,—বক্ষস্থল আবৃত করিয়া মুক্তাগর সারি দিয়াছে,—একথও প্রকাণ্ড হীরক কণ্ঠমণিরূপে জলিতেছে।—মস্তকে চূর্ণ হীরকের শোভন শিরোভূষণ,—তাহা হইতে তিনটি প্রকাণ্ড দীর্ঘ মুক্তা নামিয়া সম্মুখের কপালে পড়িয়াছে—তাহারই উদ্ধে হীরকশুভ্র পক্ষীপক্ষচূড়া,—দীর্ঘ পাদবিক্ষেপের তালে তালে নূপুর বাজিতেছিল,—কন্যা আনিয়া সেই অগণত মুকুটধারীগণের মধ্যবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন—সকলেই ভাবিতেছিলেন,—যেন কোন দেবীপ্রাতনা আনিয়া কে সেখানে স্থাপন করিয়া গেল!—ইনি যেন মূর্ত্তিমতী হিন্দীরা—যেন স্বরূপিণী বীণাপাণি!

অবন্ত্যরাজ ডাকিলেন—“এস মা! ইনিই মগধরাজকুমার,—তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ইনিই তোমার স্বরমালা লাভাধিকারী হইয়াছেন,—এস এই রাজগণের সম্মুখে তুমি ঠাককে বরণ কর।”

কুমারী অগ্রসর হইয়া পুষ্পাধার হস্তে আনন্দকলাবী নাম্না বিচিত্রা মালা রাজকুমারের কণ্ঠে পরাইতে উদ্যত হইলেন।—রাজ্যান্তঃপুরে মঙ্গলশব্দ বাজিয়া উঠিল—সভাপ্রাঙ্গে বাদ্যকরদল বাদ্যোদ্যম করিবার জন্য প্রস্তুত—এমন সময় মগধকুমার যেন চমকিত হইয়া পিছাইয়া গেলেন।—

“স্থির হও রাজকুমারী!—মহারাজ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।”—

রাজকুমারী যে ইচ্ছায় ইহার এই পদ করিয়াছিলেন তাহার নীনাংসা কিরূপভাবে ও কাহার দ্বারায় ঘটিয়াছে তাহা লমস্ত না শুনিয়া মালাদান করিবেন কেন?

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তারানাথ মৃৎস্বরে বলিলেন,—“একি বলিতেছ রাজকুমার? আমার এত কষ্ট সব বিফল করিবে?—” সেইরূপ মৃৎস্বরে কুমার বলিলেন,—“তুমি স্থির হও! রাজকুমার প্রাতি আমার বাহা কর্তব্য তাহা পালন করিতে হইবে।”—পরে পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

“গুহন অবন্ত্যরাজ! রাজকুমারি—আপনিও অহুধাবন করুন,—তাহার পর বাহা ইচ্ছা করিবেন। স্বর্ণকার বা মণিকের সহায়তায় যেভাবে পরীক্ষা ও মূল্য নিরূপণ চলিতেছিল তাহাতে যদি আনি বা অস্ত্র কেহ জয়ী হইতাম তাহা হইলে সে জয়পরাজয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিত এবং কস্তার মালালাভের অধিকারী হইতাম।

এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা ঘটে নাই;—মাত্র একজনের বুদ্ধিবলে,—কাধাগত বুদ্ধি নহে—তাহা কেবল মানসিক চিন্তার প্রাচুর্ষ্য মাত্র;—সেই অসাধারণ দীর্ঘজীবন মহাম্মার কৃত এই গৌরবজনক কার্যের কৃতিত্ব আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি—আর সে হিসাবে এই অসামান্য বুদ্ধি নারীর পাণিত্রহণেরও বোধহয় আশি যোগ্য নহি!—এই যে দিবাকান্ত পুরুষ, আমার সখা এই রাজনন্দিনীর উপযুক্ত পাত্র,—কন্যা বোধহয় এমন স্বামী কামনা করিয়া সেই আশ্চর্য্য পণ করিয়াছিলেন।—ইহাদের মিলন হোক ইহাই আমার একমাত্র কামনা।”—

কুমার নীরব হইলেন। সকলের দৃষ্টি তারানাতের প্রতি দিগিল।—তাঁহার মুখ ভয়ে বা লজ্জায় বিবর্ণ,—হা মহারাজ আনই এ কাণ্ড করিয়াছি বটে, কিন্তু রাজকুমারীর পাণিত্রহণের আশায় করি নাই—সে কথা মনে জাগিলে নিশ্চয় এ কার্য্য করিতাম না ইহা স্থির—! আমি সামান্য প্রমজীবী—কার্য্যক্ষেপে জীবন ধারণ করি—রাজপুত্রের স্ত্রীত্ব জনাই পুন্ডলিগুলিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

তাঁহার কথার বাধা দিয়া অবস্থি:হী বলিলেন,—“তাহা বুদ্ধিগাছি, কিন্তু রাজকুমার যখন আপনাকেই সমস্ত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন তখন আপন বিবাহ করিবেন না কেন?”—

“বিবাহ কেন করিতে চাহি না তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না—বিবাহে আমার মন নাই এই পর্য্যন্ত;—স্বল্প সন্ত য গুঞ্জন উঠিল—কন্যা আপনার হাতের মালা তারানাতের চরণতলে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিতা, মগধকুমার ও অন্যান্য সভাস্থ সকলকে প্রণাম জানাইয়া মুছ গতিতে যবনিকা-অন্তরালে চলিয়া গেলেন।—

আবার শব্দ বাজিয়া উঠিল।

( ৬ )

অবস্থিরাজ তারানাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন “তবে এখন বিবাহের আয়োজন করিতে পারি কি?”

“বিবাহ!—না মহারাজ বিবাহে ত আমার কখনও আপত্তি নাই!—তবে রাজকন্যা বিবাহে আমি প্রস্তুত নহি!—রাজকুমারের জনাই আমি এ কাজ করিয়াছিলাম, আমার বড় সাধ ছিল যে সখার জয়লাভ দেখিয়া—নিজেও সুখী হইব;—কিন্তু—”

তারানাত অধোবদন হইলেন।—রাজা বিমর্ষভাবে বলিলেন—“যে জনাই হউক ঘটনা যখন তোমার এই অবস্থার উপস্থিত করিয়াছে এবং আমার কথা তোমাকেই মালদান করিয়াছে তখন তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে!”

মুছ হাতের সহিত তারানাত কহিলেন,—“রাজকন্যা ভুল বুঝিলেন,—আমার বন্ধুই তাঁহার এ ভ্রমের কারণ—আমায় কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে যে ঐশ্বর্য্য আর দারিদ্র্য্য পরস্পরের বিরোধী গুণ—ইহাদের মিলন প্রায়—”

বাধা দিয়া মগধকুমার বলিলেন,—“তোমার কথাগুলো শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে না সখা!—ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য্যকে দাঁড়ানুনাধিকভাবে দেখে—তবে আমার সখা বলিতেও বোধহয় তোমার আশ্রিত—”

তারানাত লজ্জিতভাবে হাদিয়া বলিলেন,—“বন্ধুত্ব স্বামীত্ব—এ উভয় কি সমতুল্য সখা?”—

এইবার পুনরায় রাজকুমার দাসী যবনিকার বাহিরে আসিল।—সে করযোড়ে রাজাকে জানাইল,—“বিবাহের ক্ষমতা যেন ইহাকে উত্তাক্ত করা না হয়!”—

অবস্থিরাজের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল,—দাসীর কথায় অশ্রুট গর্জ্জনস্বরে তিনি বলিলেন,—“না আমি কাণকেও উত্তাক্ত করিতে চাই না!—কিন্তু বীণাকে বুঝিতে বল—সভার মধ্যে এভাবে তাহার মাল্যের অপমান—আমারও অপমান!”—

“অপমান! মহারাজ! ইহা আপনাকে ব্যথিত করিল? না, আমি কাহারও মনে কষ্ট দিতে চাহি না! আমারই ভুল হইয়াছিল—আনি আপনাদের দাসেরও তুল্য নই—আমার দ্বারায় আপনাদের অপমান সম্ভবে না!—রাণকুমারীর দত্ত সম্মান আমার শিরোধার্য!”—বলিয়া তারানাথ পদতলে মাল্য তুলিয়া মস্তকে ষ্টেন করিলেন।

দূরস্থ রাজগণ তাঁহাদের এসকল বাক্যলাপ শুনিতে পান নাই।—রাজকন্ডার তারানাথকে মালামান পরে তাঁহাদের মুখ আলাপ—অবশেষে তারানাথের মালাধারণান্তে অশ্রীরাঞ্জের তাঁহাকে ধাতুহুকাদলে আশীর্বাদাদি শেষ হইলে,—স্বয়ম্বরের প্রধান ব্যাপার শেষ হইল দেখিয়া তাঁহাদের দূত আসিয়া জানাইল,—“রাজকুবর্গ, পুতুলিকা-গুলির মূল্য কি নির্ধারিত হইয়াছে প্রকাশ-সভায় জানিতে চাহেন।”

\*মগধ-রাজপুত্র বলিলেন, “শুনিলে সখা?”—

তারানাথ বলিলেন, “শুনিয়াছি! এত জানিলে”—

সখাকে অঙ্গুলি তর্জ্জন করিয়া রাজপুত্র বলিলেন, “নিতি করি তোমায়—আর দ্বিধা করিও না!”—

দূতের উত্তরে রাজমন্ত্রী বলিলেন,—“উত্তম মগধ-রাজকুমার। আপনার সখাকে অহুরোধ করুন,—তিনি কি উপায়ে পুতুলির মূল্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন!”—

মুহূর্ত্তের রাজপুত্র বলিলেন, “দল সখা বল। একথা সত্যই প্রকাশযোগ্য।”—

সেইরূপ স্বরে হাসিয়া তারানাথ বলিলেন,—“বিবাহ ত হইল রাজকন্ডার সহিত, সঙ্গে পাইলাম এই অবন্তী রাজ্য—আবার এই সভামধ্যে বক্তার আসন ইহাও আমারই! না রাজকুমার!”—

“হাঁ সখা! ইহা তোমারই উপযুক্ত!” তোমায় বলিতেই হইবে।”

“তোমার লজ্জা হইতেছে না নির্দোষ! এসকল যে তোমারই ছিল—! তুমি কি বুঝিবে আমার চিন্তে কি ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে?”—

“তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া রাজকুমার বলিলেন, ছিছি তারা! ছিঃ!—আর এসকল কথা মুখেও আনিও না।—তোমার এই ব্যবহারে রাজকুমারীর মনে কি কষ্ট হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতেছ না কেন?”—

“রাজকন্ডা? হাঁ,”—তারানাথের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিছাৎ খেলাইয়া গেল! ক্ষণকাল পূর্ব্বের দৃশ্য,—সেই চরণাবনতা বিষন্ন ভক্তিমতি পূজারিণী! চারিদিকে বলসিত ঐশ্বর্য্য মুকুটের মধ্যে দীনহীন তারানাথেরই নিকট লুপ্তিতা প্রণতা-রাজকুমারী!

সে দিব্য চরিত্রগরিমায় যুবকের মস্তক অবনত হইল। তাহার পর কি দৃশ্য?—সকল স্বপ্নের অতীতা স্থির ইচ্ছাবৃত্তি,—কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার জ্ঞাত তাহার সৃষ্টি হয় নাই—কর্ত্তব্যের আকর্ষণে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরে কর্ত্তব্য শেষে সে মুহূ নুপুর সিঁধন ধ্বনির সহিত স্থির চরণে চলিয়া গেল। আবার বাহিরের কোলাহলে—তাহার স্থির মনোভাব, অবহেলাভাব দাসীর আকারে আসিয়া জানাইল যে,—“সংসারের কোন কিছুই ওনা তাহার ক্রোধ নাই—শুধু তাহার জন্য যেন কাহাকেও উদ্ভাস্ত করা না হয়!”—হাঁ তাহাই বটে!—ইহা তাহার কর্ত্তব্য-পালন ব্যতীত আর কিছুই নয়!

মুহূর্ত—মুহূর্তমাত্র তারানাথ ভাবিল—“ইহা অবহেলা,—শুধু কর্তব্য—শুধু”—মুহূর্তকাল এই চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে যেন শুক করিয়া দিল—! কর্তব্য!—সংসারে কর্তব্য পালনের মূল্য বড় বেশী,—কিন্তু—ইহা কি সত্যই শুধু প্রাণহীন শুক কর্তব্য মাত্র?—

রাজকন্যার প্রদত্ত মালাগাছি তারানাথ মাথা বেড়িয়া গলার পরিয়াছিলেন,—এতক্ষণ সেই মস্তকবষ্টিত অংশ-টুকু—শিথিলভাবে কপাল ও কর্ণ বেড়িয়া নামিয়া আসিতেছিল—এইবার তাহা গড়াইয়া তাহার গলার আসিয়া পড়িল!—পূর্বের বক্ষোলম্বিত মালাংশ প্রায় জাহ্নু পর্য্যন্ত আসিয়াছিল—এবারের ক্ষুদ্র বেটনটুকু নামিয়া কেবল কর্ণ বেটন করিয়া বক্ষস্থল স্পর্শ করিল!—মিথুগন্ধী সুকুমার পেলব-পরশ,—তারানাথ শিহরিয়া উঠিলেন!—যেন কাহার পুষ্পকোমল বাহুলতা—যেন কেমন সুগন্ধ নিবিড় বন্ধনচেষ্টা!

তারানাথ অনামনক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, মগধরাজকুমার দেখিলেন তাহার প্রিয়সখার মুখে যেন কোন দিব্য জ্যোতির দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে,—সর্ব্বাঙ্গে এক অপ্রতিম প্রভাবের আবির্ভাব।

সখার নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন “ঘটনার আকার বুঝিয়াছ কি বন্ধু!—তোমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেই হইবে!—ইহাতে আমার ও রাজকন্যার উভয়েরই মর্যাদা নিহিত—ইহাও ভাবিয়া দেখিও।”—

হাসিয়া তারানাথ বলিলেন, মূল্য ত প্রতিমাদের দেহেই সংলগ্ন আছে।

( ৭ )

সভা মধ্যে পুনরায় মূর্তিচতুষ্টয় আনীত হইল।

বয়োপ্রবীণ কোশলরাজ উঠিয়া আসিয়া মূর্তিগুলির নিকট দাঁড়াইলেন। মূল্যতালিকা তাহার কর্ণে সংলগ্ন আছে,—কোথায় তাহা?

তিনি প্রথমেই স্বর্ণপ্রতিমাকে টানিয়া লইলেন,—কৈ—? হাঁ এই যে! স্বর্ণ প্রতিমার শিল্পশোভার চরম উৎকর্ষমর বক্ষের উপর একটি ‘কানাকড়ি’ একটি সামান্য সূত্রে বদ্ধ হইয়া ছলিতেছে!—তথ্য কপর্দক! এই বহুভার-স্বর্ণ—এই অতুল্য-নির্মাণ—ইহার মূল্য সামান্য ছিদ্র-কপর্দক?—পূর্ণ নহে অর্দ্ধ-কপর্দক?—ইহার মূল্য এই নির্ণীত হইয়াছে?—তাহার পর রৌপ্যমূর্তি,—তাহার কর্ণে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিলম্বিত,—এক স্বর্ণমুদ্রার এত বড় প্রকাণ্ড রৌপ্য—তাহার মূল্য এক স্বর্ণমুদ্রা?—ইহাই কন্যা প্রকৃত মূল্য বলিয়া মানিয়া লইলেন?—হইবে না কেন, স্বর্ণপ্রতিমার মূল্য যখন একটি ‘কানাকড়ি’—তখন রূপার আর কি মূল্য হইবে? সে হিসাবে এক স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট—বয়ঃ অধিকই হইয়াছে!

তাত্রপুতুলির কি মূল্য?—তাহাকে নিকটে লইয়া কোশলরাজ দেখিলেন—ইহার কর্ণে কোন মুদ্রা প্রথিত নাই,—একখানি পত্রে স্বর্ণবর্ণাকরে লিখিত রহিয়াছে—“সংসারে ইহার মূল্যও অযুত স্বর্ণমুদ্রা!”—পত্রখানি মূর্তির বক্ষে সংলগ্ন।—

তাত্রমূর্তির মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা?—হাঁ, স্বর্ণের তুলনার ভাস্কর্য এই মূল্য বখার্ব হইয়াছে বৈ কি!—আর রাজকন্যাও ঠিক এই মূল্য নির্ণয়কারীর ন্যায়ই বীমতী!—কোন মূর্খ রাজার দেশে “মুড়ি মুড়কী”র একদম হইয়াছিল বলিয়া পরিচালের কিম্বদন্তি আজিও চলিয়া আসিতেছে—আর কুমারী বীণার পরিণয়ে ভাস্কর্য মূল্য স্বর্ণের অপেক্ষা দশ সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইল!—অমরত্বের বিশেষত্ব বটে!—

অনেকে হাসিল—আবার অনেকে যেন কি একটা চিন্তা করিয়া গুরুভাবে বলিল—“না নিশ্চয়ই ইহার কোন গুঢ় অর্থ আছে।”—

চতুর্থপুত্রলিকার কি মূল্য? ঔৎসুক্য ও অবজ্ঞা উভয়ভাবে দৃষ্টিই তাহার প্রতি পতিত হইল।—শিল্পচাতুর্য্যের চরমোৎকর্ষ?—প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীই যেন সজীবভাবে কীল্যবৈচিত্রে খাঁচিত;—সেই নিমেষখীন চক্ষুতে যেন ধ্যানপরতার ভাব অঙ্কিত,—সরাঙ্গের কলনাময় আবেশ—চক্ষুর মুষ্টি হইতে কি যেন খাঁসরা পড়িতেছে,—কেশ ও বেশ শিথিল, কেবল গুষ্ঠাধরে হির অ নন্দের অপারম্পূট হাস্য, উবার আভাষের মত দুটিয়া উঠিতেছে!—

ইহার মূল্য আবার পদতলে! স্বর্ণ পরে খোদিত,—যেন ক্ষেত সোনার ফুলটি দিয়া প্রতিমাকে পূজা করিতেছে!—মূল্য সংখ্যা কত?—“আমি ইহাও মূল্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না বোধহয়—ইহা অমূল্য!”—

কোশলরাজ বলিয়া উঠিলেন “এ প্রতিমার মূল্য দাও নাই কেন?”

তারানাথ এইবার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“এ প্রতিমার মূল্য?—বলিয়াছি ত মহারাজ,—এ প্রতিমার মূল্য সংসারে নাই,—মাথুষের কৃত গণন-সংখ্যায় ইহার মূল্যাক্ষপাত হইতে পারে না!—সেই জন্যই বলিয়াছি ইহা অমূল্য!—ঐশ্বর্য্যে স্বর্ণে বা মণিমাণিক্যের সহিত যে ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই—কি দিয়া মূল্য নির্ধারণ করিব?”—

“মূল্য নাই? লৌহ প্রতিমার মূল্য নাই,—এ কিরূপ কথা! এ কথার অর্থ কি, তাহা তুমি বিশদভাবে প্রকাশ কর!”

অপূর্ব্ব মূল্য গণন!—সভার সকলে উদ্গীৰ্ণভাবে তারানাথের প্রতি চাহিয়া ছিলেন!—সে বিশ্বয়বিস্ফারিত নয়ন বিশাল জনতার সম্মুখে তিনি পুনরায় স্ত্রিময়ান হইয়া গেলেন!—পার্শ্ব হইতে মৃহস্বরে মগধকুমার কহিতেছিলেন,—“বল সখা! বল,—এ সঙ্কোচের সময় নয়—বল!”—

তারানাথ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলেন “আমাকেই কি বলিতে হইবে?” মগধ বলিলেন “তুমি না বলিলে বলিবে আর কে? এরহস্য আর কে জানে?” তারানাথ বলিল “আর এক জন জানে।”

“এ হইসের গুপ্ত মন্ত্ৰ অবস্তিরাজ-সংসারেও আর একজন জ্ঞাত আছে!—মা জননী বীণাপাণি তাহার অধম সন্তানের দ্বারা তাহার অসামান্য জ্ঞান, পুত্রলির আকারে পরিণত করিয়াছিলেন,—আজ আবার কে প্রস্রাবিত মহাবাক্য-উৎসুক জনতার সম্মুখে প্রকাশের ভারও তাহার এই ক্ষুদ্র ভক্তের প্রতিই অর্পণ করিয়াছেন।—অবস্তী কৈশর!—ভারতের সমবেত নরপতিগণ!—অধিনের নিবেদন শ্রবণ করুন।”—

অবস্তিরাজ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—এ সেই বৃদ্ধ স্বর্ণকার!—এতদিন যাহাকে বীণাপাণি আপনায় পুরোদ্যানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন—এ সেই!—সচাঁকতে তিনি বলিলেন,—বল শিরি, তোমার বক্তব্য লীজ প্রকাশ করিয়া বল!—

স্বর্ণকার প্রথমে তারানাথের চরণে প্রণত হইল,—“প্রণাম মহাশয়!—তুমিই ধনা!”—তাহার পর রাজগণের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে কব্বোড় করিয়া সে বলিল,—“এই প্রণতি—আমি একল সভায় উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি!—আমার ন্যায় দীন ব্যক্তি এ সভায় উপস্থিত থাকিবার যোগ্য নয়,—কিন্তু যেমন বাগ্‌দেবীর দম্ভায় মুকুট বাচাল হইয়া উঠে—তেমনি আমি আমার দেবী বীণাপাণির কৃপায়—এ সভায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি!—আমার দৈন্য আদি সকলের চরণে রাখিয়া তাহার মহিমামূর্ত্তি শ্রবণে—এই স্বপ্নদর্শী কথা বলিতেছি।”—

স্বর্ণকার অগসর হইয়া স্বর্ণমূর্তিকে উঠাইয়া লইয়া বলিল,—“মাস্তন মহারাজ, লক্ষ্য করিয়া দেখুন,—এই স্বর্ণ প্রতিমার সেনান বিশেষত্ব আছে কি না, সর্বাঙ্গে কোথাও কোন দৃষ্টব্য আছে কি না !”—

কোশলরাজ বলিলেন, “আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি,—নূন করিয়া আর কি দেখিব,—যদি কিছু অভিনব ব্যাপার থাকে তুমিই তাহা প্রকাশ কর ।”—

স্বর্ণকার বলিল, “তাহা নহে,—আমার বোধ হয় রাজগণ স্বহস্তে কোনদিন ইহাদের পরীক্ষা করেন নাই,—মূর্ণ শাত্তকোবি ও সামান্য গণনাস্বাস্থ্যবৎগণই ইহাদের মূলা লইয়া অনর্থক সন্ময় নষ্ট করিতেছে মাত্র । নতুবা ভারতের এতগুলি উজ্জল বাদ্যের মধ্যে কেহই যে ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন না ইহা অন্তর্দ্বের কথা !—হাঁ দেখুন প্রভু, এই পুস্তকের কর্ণবন্ধে, অতি সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র নাই কি ?”—

“আছে বাট ! তাহা কেহ লক্ষ্যও করেন নাই,—কিন্তু এ ছিদ্রে মূলায় কি তারতম্য হইবে ?”—

স্বর্ণকার বলিল, “ইহাতেই ইহাদের মূলা বোধ হইবে মহারাজ !—এই দেখুন ইহার দুইটি কর্ণপথেই ছিদ্র,—ইহার মধ্য দিয়া এই স্বর্ণস্রুতগাছি চালনা করুন দেখি ।”—

একটি দীর্ঘ স্বর্ণস্রুত বাহির করিয়া সে কোশলবাস্কর হস্তে দিল,—বিস্মিত হাস্যে কোশলপতি পুস্তকের কর্ণদ্বিজে তাহা চালনা করিলেন,—তার এক কর্ণে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কর্ণপথ দিয়া বাহিরে আসিল ।—“মূর্তির ভিতর কি শূন্য ?”—অনেকেই এই প্রশ্ন করিলেন ।—

“না মূর্তিটি শূন্যগর্ভ নয়,—কিন্তু এখনও কি কেহ ইহার মূলা বুঝিলেন না ?”—

কেহ উত্তর দিল না,—অবস্থিরাজ বলিলেন,—“তুমি কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিও না,—বাহা বলিবার তাহা পরিস্কারভাবে বলিয়া যাও ।”—

স্বর্ণকার যেন কিছু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—“ক্ষমা করুন !—আমি অল্প কথাতোত সকল বলিয়া লই ।—স্বর্ণ-মূর্তির উভয় কর্ণপথের বিশেষত্ব সকলেই দেখিলেন ত ?—ইহাই ইহার প্রকৃত মূলায় অমুমান হ’ল ।—যে বাক্তির কর্ণপথের এমনি অবস্থা—উপদেশ, সং কথা—এবং যে-কোন স্ত্রীতব্য কথাই হউক না কেন, এক কর্ণে শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাতঃ দ্বিতীয় কর্ণদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়,—যাহার অন্তঃকরণে সে সকলের কিছুমাত্রও প্রবেশ করে না,—সংসারে সে মাহুষের কি মূলা ?—না এই ছিদ্রকপর্দকেরও তুল্য নহে !—তাই এক ভগ্নবরাটক ইহার মূলা নির্দিষ্ট হইয়াছে !”—

স্বর্ণকারের কথা শেষ হইতে না হইতে কোশলরাজ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—“উচিত মূলা নির্দিষ্ট হইয়াছে !—আমরা অন্ধ,—কিছুই বুঝিতে পারি নাই !—তাহার পর—! বল,—বল ভাগ্যবান !—”

তাহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্ণকার রোপাপুস্তককে উঠাইয়া লইল ।—বলিল, “এই দেখুন, ইহারও কর্ণবন্ধে, সেইরূপ ছিদ্র,—কিন্তু সূত্র—দেখুন দ্বিতীয় কর্ণপথ দিয়া বাহির হইল না, এবার তাহা প্রতিবার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে,—সহপদেশ বা জগতের প্রকৃত হিতবানী শুনিয়া—এ অন্ততঃ প্রকাশ করিয়া বলিতেও জানে,—চাহিয়া দেখিলেই অমুভূত হইবে—স্বর্ণমূর্তির ন্যায় ইহার মুখে সে তরল ভাবহীন হাস্যও নাই—সে প্রসন্নতা চোখের মধ্যেও হাসিয়া উঠিয়াছে ।—এ তৎক্ষণ না হইলেও তৎপ্রায়,—এরূপ বাক্তির মূলা আছে—ইহাদের মূলা স্বর্ণ দিয়া নিরূপিত হইতে পারে । তাই ইহার মূলা একটি পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা ।”—



“তাহার পর—!” রাগ-প্রসন্ন বদনে কোশলরাজ বলিলেন—“তাহার পর!”—

“তাহার পর তাম্রপুতলি! ইহারও কর্ণে চিত্র এবং এই দেখুন স্বর্ণশলাকা কথঞ্চিৎ অধঃকৃত,—যেন কণ্ঠ গঞ্জে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই জাতির পুরুষ সর্বদাই হিততত্ত্ব ও আনন্দ, ইহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন,—সম্পূর্ণ বোধ না হইলেও প্রত্যেক পদার্থেরই ভাব নির্ণয়ে ইহার সচেষ্ট;—শুধু মুখের কথাতেই ইহাদের জ্ঞান শেষ হয় না—নিজের মধ্যে লইবার জন্যই ইহার বাকুল।—সংসারে এই শ্রেণীর মহুষ্যও অতি বিরল,—তাই ইহার মূল্যও—দরিদ্রের পক্ষে মহৈশ্বর্য—অমৃত স্বর্ণমুদ্রা নির্ণীত হইয়াছে—!”

সভা নীরব।—সত্তোবর্ষগোমুখ ঘনঘটার ছায়া সে বিরাট সভা যেন কিসের ভায়ে অবনত মুখ—স্থির—শান্ত!—সে শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়ায়—তাঁহাদের পরিহিত মণিমাণিক্য বালার উপরে যেন একটি স্নন্দর সজল-কোমল আভা দেখা দিয়াছে!—পুষ্পিত উপবন শোভার উপর—নবজলধর শ্রামলছায়াপাত সৌন্দর্যের মত তাহা মধুর! শীতলকারী!—

ভাববিগলিত চক্ষে স্বর্ণকার এইবার লৌহ প্রতিমাকে উঠাইয়া লইল।—

“আর অধিক বলিবার নাই,—দেখুন মহারাজ। লৌহমূর্তিরও কর্ণে রক্ত,—তাহাতেও হৃৎ চালনা করিলাম,—কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই—অনায়াসে তত্ত্ব গিয়া প্রতিমার—অন্তস্তল-হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে!—বিনি হৃদয়বান্ পুরুষ, জগতের সমস্ত সত্য—সমস্ত আনন্দ—সম্পূর্ণভাবে গিয়া তাহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে!—সত্য তাহার জ্বংপিণ্ডের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়—আনন্দ তাঁহার সমগ্র ধমনীতে চালিত হয়—সে মহাপুরুষের জীবনেই এখন এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়া যায়!—চাহিয়া দেখুন তাম্রপ্রতিমার মুখ চিস্তাকুল, উদ্বিগ্ন অথচ তেজোরাশি বেষ্টিত।—সে যেন আপনার মধ্যে কি এক বিশাল শক্তির অমুভব পাইয়াছে, তাহার অঙ্গুলীবদ্ধকর প্রার্থনারত,—যেন কিসের প্রয়াসী?—কিন্তু এই লৌহ পুতলি,—”

সহসা বক্তার স্বর রোধ হইল,—কিয়ৎকাল সে যেন আপনাকে স্মরণ করিয়া লইয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল।—“সকলে চাহিয়া দেখুন এই মূর্তির আকৃতি স্বতন্ত্র,—এই উদাসী মূর্তির আকারে সে প্রতিভার ক্ষুরণ আর দেখা যায় না,—দেহের বন্ধন এলায়িত;—চক্ষুর স্বচ্ছতার সম্মুখে যেন কোন অদৃশ্য বস্তু ভাসিয়া উঠিয়াছে—নেত্র-তারকার তাহারই অস্পষ্ট ছায়া।—সেই ছায়াই ভাবে সমস্ত প্রতিমাটির ভাবও বোধহয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—আমি নিজে এই মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি, মাতার নিকট তাহার ব্যাখ্যাও শুনিয়াছি, কিন্তু চিন্তার দৌর্ভাগ্যে ইহার ভাব আবার আমার নিকট অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে!—”

স্বর্ণকার আবার নীরব হটল।—কোশলরাজের গগুদেশ ধৌত করিয়া দরদর অশ্রুধারা ঝরিতেছিল,—আনন্দকণ্টকিত দেহ অবস্তীরাজ দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলেন সভায় কাহারও চক্ষু শুক নয়।—সকলের মুখেই এক অভিনব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে!—

মগধ-রাজকুমার যুজ্জ হর্ষোষ্মেগে তারানাতের কর্ণে বলিলেন,—“সখা, চাহিয়া দেখ!—”

সভা উত্তরোল হইয়া উঠিতেছিল,—কোশল, মদ্র ও সিদ্ধদেশের বিজ্ঞ নরপতিত্রয় আসন ত্যাগ করিয়া রাজকুমারীর জাল সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—গজীর আশীর্ষচনের সঙ্গিত কহিলেন,—“না বুঝিয়া তোমার অনেক ঘোব দিয়াছিলাম কুমারি!—কিন্তু এই বয়সে তোমার স্বয়ম্বরে আসিয়া বে শিকলাভ করিলাম—তাহা প্রকৃতই অমূল্য,—মারীরয়! তুমি মনোমত পতিলাভ করিয়া সুখী হও!

( ৮ )

অবন্তিরাজ সভা ভঙ্গের আদেশ করিতেছিলেন,—এমন সময় আবার একজন দূত আসিয়া জানাইল,—কাশীরাজ ও কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা করেন যে, কিরূপে ইনি এই প্রতিমাগুলির রহস্য ভেদ করিলেন—।

কোশলরাজ বলিলেন, —“ইহা কন্মগত কোব চেষ্টা নহে,—মানসিক ক্ষুতির ক্ষমতার ফল। একথা প্রকাশ্যে না বলিলেও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়,—তবে রাজগণ যদি শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তবে তোমার বলিতে আপত্তি কি বন্ধু ?”—

মগধ-রাজকুমার অরিত্যগ্নে বলিলেন “কিছুই না !”—পরে বন্ধুর কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ভাবিয়াছিলে—বস্ত্রের আসন হইতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছি,—কিন্তু বিধাতা তোমার এরূপ বাম সখা, আমি কি করিব বল ?—এখন ঐ আমাদের সনবয়স্ক বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হইবে—”

তারানাথ বলিলেন “এ সভার মাঝখানে কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে সত্যি খুষ্টতা,—কিন্তু আর ইহাদের অনুরোধ লঙ্ঘন করিবার সাধও আমার নাই।—”

“বলিব—কথা বলিব,—কিন্তু কি বলিব তাহাও যে বুঝিতে পারিতেছি না !—বলিবার মত কথা কি আছে বল দেখি ? সে কথা শুনিবার জন্য ইহাদের এত আগ্রহই বা কেন ?”—

এই সময় কোশলরাজ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—“আমুন মহাশয়, প্রথমতঃ কি উপায়ে আপনি পুস্তলিদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করেন সেই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করুন। যুবক রাজগণ সত্যি কৌতুহলী হইয়াছেন।”—

তারানাথ মুহূ হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“কৌতুহল ?—হাঁ, প্রথমে আমারও কৌতুহলই হইয়াছিল মহারাজ !—কিন্তু আমার প্রথম চেষ্টাতেই সন্দেহ হইয়াছিল যে প্রতিমাগুলির মূল্যের অর্থ—বাহ্যবিষয়ে বা স্বর্ণরৌপ্যের দিক্ হইতে নির্ণীত করা হয় নাই, রাজকুমারীর উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, তাহার মধ্যে মনস্তত্ত্ববিশিষ্ট কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে।—সেই জন্য আসিয়াই আমি সখাকে পুনরায় পুস্তলিগুলি প্রার্থনা করিতে বাল, আমার ইচ্ছা ছিল যে যদি আমার বুদ্ধিতে সে রহস্য ভেদের ক্ষমতা হয়—তবে আমার প্রিয়সখাকে আন্তরিক প্রণয় উপহার দিবার একটি বিশেষ উপলক্ষ্য পাইব।—”

হাসিয়া তাঁহাকে খোঁচা দিয়া রাজপুত্র বলিলেন,—“এ ধানভানিতে শিবের গীত আরম্ভ করিলে কেন ? বাহা বলিতেছ বলিয়া যাও।”—

“আমাকে নিজের ইচ্ছায় বলিতে দাও সখা !”—পরে সভার প্রতি ফিরিয়া তারানাথ বলিতে লাগিলেন।—“তাহার পুস্তলিগুলির আকৃতি ও মুখভাব দেখিয়াই আমি বুঝিলাম যে আমার অনুমান যথার্থ, মানববুদ্ধিবৃত্তি সকলই এই পুস্তলি আকারে রচিত হইয়াছে।—ইহাদের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন, কোন বিষয়কে উদ্দেশ্যে করিয়া যে তাহা নিশ্চিত তাহা নির্ণয় করা সত্যি দুঃসাধ্য।—তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে এ রাজসভা বা জনতাযুগ্মরিত শিবিরে বাস করিয়া নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা যায় না,—অথচ এ গুপ্তবিষয় স্থির করিতে প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক,—তাই সখার নিকট নির্জন শিবির,—বাধাবিপত্তিহীন অবসর প্রার্থনা করিয়া লইলাম।—”

বলিতে বলিতে তারানাথ কিছুক্ষণ থামিলেন।—মুহূ হাসিয়া একবার রাজকুমারের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ;—“তাহার পরের কথা আমি কি করিয়া বলিব বুঝিতে পারিতেছি না।—বলিয়া মাহুষ বুঝাইয়া দেওয়ার

মত শত্রু ব্যাপার বড় কমই আছে।—আমিও প্রথমপ্রথম কিছুই বুঝিতে পারি নাই,—ক্রমে ধারণা হইল যে এই স্বর্ণ বা লৌহপুত্তলি লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে,—তাম্র বা রৌপ্যপ্রতিমাঙ্গর পূর্বোক্ত প্রতিমূর্তি-স্থলের মধ্যবর্তী মাত্র,—রহস্যের সৃষ্টি এই দুইটির মধ্য দিয়া আরম্ভ হইয়াছে।—ভাবিলাম, কিন্তু তাহাদের গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশের সাধ্য কিছুতেই হইতেছিল না।—”

সলজ্জ হাসির মধ্যে তারানাথ আর একবার নীরব হইলেন।—উঁঠার মুখে যেন কেমন অপূর্ণ আলোকের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল; মগধকুমার কোমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সখার পানে চাহিয়াছিলেন,—তাঁহাকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন,—“বলিয়া যাও না।”—

“বলিতেছি।—কিন্তু যথার্থপক্ষে সে সকল কথা ত ঠিক বলিবার মত নয়,—আমি কেমন করিয়া যে সে কথা প্রকাশ করিব তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিতেছি না।—হঁ” বলিয়া তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—“বলিতেছি, আমি আমার সাধামত সকল কথা বলিতেছি কিন্তু বলিবান্ন দোষ হয় ত তাহার অর্থ পরিষ্কৃত হইবে না।—সে কথার অনেক অংশ বক্তব্য,—বলিয়া প্রকাশ করা যায়—আর কতকাংশ এত—”

বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি যেন কোন বহিষ্কৃতী হৃদয়বেগকে সঞ্চরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন।—“সেই পুত্তলিগুলি ধাতু নিম্নিত,—প্রকাশ্য জড় বাতীত আর কিছুই নহে,—কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহার যখন নির্মিত হয় তখন ইহাদের কাল্পনিক ও কাল্পর চিত্তবৃত্তির স্ফূরণ ইহাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আপনার আভাষ রাখিয়া গিয়াছে।—ইহার জড়মূর্তি হইলেও নির্মাতার ইচ্ছাশক্তির অনুসরণ সর্বদাই ইহাদিগকে অক্ষুটতর চৈতন্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।—না, আমি সে সকল কথা আর বলিতে পারিব না,—তবে এইটুকু পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি তখন ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে শুধু বাহ্যিক অনুসন্ধান বা পর্যালোচনায় সহজে ইহাদের মর্মভেদ করিতে চেষ্টা করা বড় কঠিন, অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর।—সেইজন্য আমি পুত্তলিগুলির সেবাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম।—বেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উহার রচিত, সেইভাবে উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের প্রীতি উৎসারিত করিয়া দিয়া আমি সেইভাবে পূজা করিয়াছি,—তদন্তচিত্তে তাহারই ধ্যান করিয়া, সেবা করিয়া, আর অকপট চিত্তে তাহার সঙ্গলাভের প্রার্থনা করিয়া তাহাকে আমার মধ্যে আবিস্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।”

“জড়ে চৈতন্যের অনুধ্যান আমাদের দেশে নূতন কথা বা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়,—সাধনার তারতম্য ও প্রণালী-ভেদে স্বয়ং ব্রহ্মগুপ্তির আভাষও তাহাতে প্রতিকলিত হয়,—সেইরূপ সাধকের ইচ্ছাশক্তির ও সাধনার নিয়মানুসারে জড়সংলগ্ন চিন্তা অপর চিন্তার মধ্যে সজীবিত হওয়া কোন আশ্চর্য্য কথা নয়।—আমি ভাল বাসিয়া—পূজা করিয়া এ প্রত্নিমাগুলির নিকটস্থ হইয়াছিলাম।—এমনও ঘটয়াছিল যে উহাদের কল্পনা বা রচনার পরমাণু বিন্দুও আমার নিকট সজীবভাবে ধরা পড়িয়াছিল।—উহার কতটুকু অংশ কাব্য—আর কতটুকু আরাধ্য—কোন ক্ষীতিটুকু উজ্জ্বলের কোন রেখাটি অনুভবের তাহা আমার চক্ষে যেন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতিকলিত হইয়াছিল—উহাদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘প্রকৃত স্কুলা’—তাহার সম্বন্ধে আমার শেষে কোন সন্দেহ কোন ভাবনাই ছিল না, আমি উহাদিগকে চিনিয়াছিলাম, উহাদের নির্মাণকল্পনা সত্যই আমার সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।—তাহাতেই সধাকে আমি নিঃসন্দেহে স্বয়ং প্রার্থনা করিতে বলি।”

তারানাথ নীরব হইলেন। সভাস্থ সকলেই নির্বাক, আনন্দোজ্জ্বলিত নয়নে অবস্থিগত নতমুখ জামাডার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কতক্ষণ পরে মগধরাজকুমার প্রশ্ন করিলেন,—“আপনাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে কি ?—”

হাঁ! হইয়াছে!—কোশলরাজ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—“হাঁ! হইয়াছে!”—ইহার পর আর কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না! ইনি জানৌ, ইহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আর কিছুই নাই,—কিন্তু তুমি,—রাজকুমার আমি এতখানি বয়সে তোমার ন্যায় স্বার্থত্যাগী কখনও দেখি নাই?—এ বৃহৎ ব্যাপারে অনেক দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও শিক্ষণীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে তুমিই আদর্শ,—তোমার স্থতির সম্মানে এই স্বয়ম্বর সভার মহত্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।—তুমি ধন্য!”—

তারানাথের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল,—মগধরাজকুমার তাঁহার কাণে মুখ রাখিয়া বলিলেন, “লাভটা কার বেশী তারা?”—

সেইরূপ মুহূর্ত্তে তারানাথ বলিলেন,—“এতক্ষণে আমার মনের আশায় ঘুচিয়াছে।—আমি তোমার মাথার পোরবের হার পরাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা শতগুণে মূল্যবান—মহিমার সর্বোচ্চ ভূষণ সম্মান-সুকুট তুমি লাভ করিয়াছ।—ইহা তোমার স্বকৃত কর্মের পুরস্কার—ইহাই তোমার যোগ্য! আজ তোমার বন্ধুদের গৌরবেই ধন্য!”—

নিয়ের বিশাল জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে গুঞ্জনধ্বনির অক্ষুট কোলাহল,—অবরোধ জালশ্রেণীতে মুহূর্ত্তে সিজ্ঞন, রণধ্বনি নূপুর নাদ,—রাজগণ পরস্পর আনন্দ সম্ভাষণের বৈচিত্র্য,—সভাতোরণ-শিরে আনন্দের উদ্ভাসিত লীলাময়ী সাধনা রাগিণী বাজিয়া উঠিল।

শ্রীহেমনলিণী দেবী।

## ইতিহাস।

—:~:—

পক্ষপাতই লক্ষ্য তোমার, সত্য বলনা,  
দস্তে বড় করতে কর নিত্য চলনা।  
ভোলো রিপূর শৌর্য বীর্য বিপুল চাতুর্য,  
কলঙ্কেতে ঢাকো তাদের হিয়ার মাধুর্য।  
জিঘাংসা ও হিংসা পোষো নাটক ক্ষমা হে,  
ক্ষুদ্রে তব রক্ত কর স্বার্থ জমায়ে।  
সাজাও তুমি অসৎ হয়ে প্রবল বৈরীকে  
গুপ্তঘাতীর বসন চোপাও প্রেমের গৈরিকে।  
কাপুরুষে বীর করহে, রোদ্দ্র নীহারে  
নরবলির যুপকে বসাও বোদ্ধ বিহারে।  
সাজাও তুমি শঠকে সাধু, মুক্ত ভোগীকে,  
মঠকে বল নাট্যাশালা, দস্যু যোগীকে।  
জাতীয়তার জাল খতিয়ান নকল দাখিলা  
অহঙ্কারের ব্যঙ্গ ছবি বুঝায় আঁকিলা।

শ্রীকুমারজন মহলিকা।

## পূর্ব এবং পশ্চিমের সামাজিকতা ।

বিগত ২২শে নবেম্বর তারিখের “The English man” পত্রিকায় বিলাত হইতে সংবাদদাতা ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্যার সত্যেন্দ্রনাথ সিংহের “Social life in Bengal” নামক বক্তৃতার যে মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে প্রসঙ্গক্রমে ঐ উপলক্ষে আমার কিছু বলিবার আছে । Lord Islington সেই বিদায় সভার সভাপতি ছিলেন । তিনিও ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশীর মধ্যে সামাজিকতা দৃঢ়তর হওয়া অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন । সভাস্থলে “General cheering greeted Lord Islington’s declaration” হইবার দরুণ এই কথাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্রিটিশবাসী এ কথা অন্তরের সহিত অমুমোদন করিয়াছেন । স্যার সত্যেন্দ্র স্পষ্টাঙ্গাভাবে এবং ভাষাতেই বলিয়াছিলেন ;—

“Sir Satyendra spoke in warm terms of the good work of the Calcutta Club in bringing Indians and Englishmen together in intimate social relations on a footing of perfect equality.

এ উপলক্ষে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন,—

“He said he could not resist the temptation of expatiating on the immense political value of organised work in this connection. Quoting the remarks of the Montagu Chelmsford Report in the social problem, he said such general observations had often been made and perhaps had not been productive of much good effect.

He had a practical suggestion to make, namely, that the rule or convention in English clubs excluding Indians as such should be got rid of without delay, People in the United Kingdom could not conceive the amount of bitterness which was created by a rule of that kind. “When we come to this country” said Sir Satyendra, “some of us belong to the most exclusive clubs in London, clubs to which perhaps many of my English friends in Calcutta would not find it possible to belong. But when we go back we are told, if not expressly, at any rate by implication, that we can enter this or that club only as waiters. If my suggestion is adopted, no harm will be done.

দেশ কাল পাত্র ভেদে সব কাজ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য । আমাদের একান্ত বিশ্বাস দেশী বিলাতী মিশামিশি যেমন Black and white মিশামিশির ন্যায় হইয়া পরিবে । East and West ছদিক হইতে অবশ্য মিলিত হইবে, ইহারই পূর্বোভাব আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতেছি । আগতের আগর যুদ্ধে এ সম্পদই লাভ হইবে বলিয়া

আমরা একান্ত বিশ্বাস করি। আপদ বরাবর সম্পদকে আকর্ষণ করে। তাই বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, “স্বপ্ন এবং দুঃখ পথায়ক্রমে ঘুরতেছে এবং—

স্বপ্নের লাগিয়া যে করে পীরিত

দুঃখ যায় তাঁরই ঠাই ॥”

এই আপদ এবং সম্পদ সংসারের জন্য যমজ-সন্তানের কাজ করিতেছে। এই যমজ-সন্তানই ভবিষ্যৎ জগতে সন্তানের কাণ্ডা করিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষে আমি একটি ইংরেজ বন্ধুর কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে মর্ত্যলোকে নাই; কাজেই মৃত বন্ধু সন্ধে স্মৃতি বলাই ভাল এবং সঙ্গত। ত্রিপুরারাজ্যের একজন অহেতুক বন্ধু জুটিয়াছিল যখন ত্রিপুরারাজ্যের এবং ব্রিটিশগভর্ণমেন্টের মধ্যে কতকগুলি বোরতর রাজনৈতিক কার্যে জটিলতা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক জটিল কার্যের খবরাখবর সাহিত্যিক জগতের জন্য নহে। এই ইংরেজ বন্ধুটির নাম পর্যন্ত, সমস্ত—ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া বলিলেও, বঙ্গদেশেও কেহ জানেন কিনা আমি বলিতে পারি না। Mr. C. W. Mc. Minu ছিলেন I. C. S. এবং জাবলপুরের কমিশনার অবসর গ্রহণ করার পর ত্রিপুরারাজ্যে তিনি ব্রিটিশ ত্রিপুরার বিত্তীয় কর্মদারীর ম্যানেজার হইয়া আসেন। তিনি কার্য করিতেন ম্যানেজার রূপে,—কিন্তু প্রাচীন ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি তিনি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার কর্মস্থান ইংলণ্ডকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষকে ছদ্মে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলিতেন;—

“ইংলণ্ড আমার Father-land, ভারতবর্ষ আমার Mother-land. আমি যেন ভারতবর্ষের কোলে চির শান্তি লাভ করিতে পারি।”

শগবান তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষই তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীতে Circular road সমাধিক্ষেত্রে সমাধিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় কর্মময় জীবনে তিনি ছিলেন মহারাজার “Obedient servant।” আর যখন তিনি গভর্ণমেন্ট ও রাজার মধ্যে Buffer রূপে থাকিয়া কোন বিষয় মীমাংসা করিতেন তখন তিনি ছিলেন মহারাজার “Sincere friend” এমন কি তিনি মহারাজা রাধাকিশোরের নিকট পত্রাদি লিখিতে এই ভাষাই ব্যবহার করিতেন। এই ছন্দা বন্ধুকের দ্বারা তিনি কত কার্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, কত সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রাচীন রাজ্যের কত মান ইজ্জত, বহাল রাখিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য এবং অপ্রাসঙ্গিক হইবে। প্রবন্ধ লেখকের সহিত এই ছই ক্ষেত্রে আমাকে কত মিশিতে হইয়াছে, কর্ম করিতে হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতে হইয়াছে তাণা বর্ণনাতীত। এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজকর্ম জগতে মিশিতে গিয়া সংসার জগতে বন্ধু পাইয়াছিলাম। এই ইংরেজ বন্ধুটিকে পাইয়া যথার্থ ইংরেজ জাতির মহত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠকবর্গের নিকট কৈফিয়ত দিতেছি।

“Tippera Succession” ব্যাপারে তিনি ব্রিটিশ উচ্চ আদালত Privy councilকে পর্যন্ত দোষারোপ করিতে কুঠা বোধ করেন নাই। এবং তিনি যদি দৃঢ় এবং সরল ভাবে এ কার্য না করিতেন তাহা হইলে ত্রিপুরার উত্তরাধিকারী হইয়া এ প্রাচীন ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে একটা ঘোরতর দোষ স্পর্শ করিত।

এখানে আমরা Mr. C. W. Mc. Minu কতৃক Tippera Succession সম্বন্ধে রিপোর্ট উদ্ধৃত করিলাম ;—

“The decision of 1818 has been regarded as the Magna Charta of Bara Thakurs, it was confirmed by the Sudder Dewani in 1820 and the decision is quoted by them again in 1887. It is referred to by the High Court on 20th September 1804. With due reverence as the precedent and lastly the Privy-Council in 1809 March 15th. Accepts this plea so tainted and corrupt with unquestioning faith and all courts have since regarded this whited sepulchre of corruption, as a shrine of British Justice an incarnation of righteous Equity Page 8.”

পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে ত্রিপুরা সম্বন্ধে আর কোন কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি ভারতের কি রকম বন্ধ ছিলেন তাহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি যখন লণ্ডন গিয়াছিলেন তখন আমাকে একখানা পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

East Bourne, London,  
20-9-

“Why not reprint the three letters and the Times articles and add your own comments and send copies to the Governors and English native papers. Ask His Highness. Probably I spent five days of nine hours each on these letters and I may say it. I am the only man in England who could lay his hand on all the facts and figures, which I have mentioned. I give my whole time to such studies causing domestic contention thereby, that is when the Purda system is a boon! Often twice a week my wife declares war against my book threatens to burn it etc. Golehab and I am going to fight together for certain reforms Native members in Council in India and England, simultaneous examinations for Civil Service and Commissions for native officers.”

ইংরেজমহলে মাঝে মাঝে আমাকে তিনি “দেশীদের জন্য প্রবেশ নিষেধ” জারিগার গতিবিধি করিতে গিয়া অনেকবার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। সে দরুণে আমার যে লাভ হইয়াছিল এবং ইংরেজ ভদ্রলোকের যে সব বদ্ব্যবহার দূর হইয়াছিল সে পুণ্য—Mr. Mc. Minu সাতবেশের পুণ্য বটে। আমরা উপলক্ষ রাখ। তিনি স্বদেশী গোলমালের বহু পূর্বে ভারতের উৎপন্ন জিনিষ ব্যবহার করিতেন এবং বস্ত্রাদি তিনি দেশীয় জিনিষের দ্বারা প্রস্তুত করাইতেন। এমন কি ইংরেজী জিনিষ ব্যবহার কার বলিয়া তিনি আমাদের সহিত ঝগড়া করিতেন! স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সদাসমুদায় দেশীয় পোষাকে থাকিতেন—এ কথা আমাদেরই স্বরণ করাইয়া দিতেন এবং প্রাচীন রাজ্য—আমাদের প্রাচীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাবাহত করিতেন।

তিনি ভারতবর্ষের জন্য কি কাষ্য করিতেন এবং তাঁহার প্রাণে ভারতবর্ষের টান কেমন উজ্জ্বল বহিত তাহা পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। অথচ আমরা কেহই এ খবর জ্ঞাত নহি। অনেক সময় অনেকে Mc minuকে বাঙ্গালী বিধেয়ী বলিয়া জানিত কিন্তু সে ভ্রম অনেকে এখন টের পাইয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে Mc. Minu সাহেবের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইতাম। তিনি দেশীয় লোকদিগকে ইংরেজের সহিত মিলন সংঘটিত করেন ইহা তাঁহার আন্তরিক মতলব ছিল। এ জন্য তিনি মাঝে মাঝে ভারত-বাসীদের dinnerএ নিমন্ত্রণ করিতেন। একদিনের কথা আমার মনে আছে। আমাকে তিনি United Service Clubএ dinnerএ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অহুরোধ করিলেন, দেশীয় পোষাকে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহা আমার পক্ষে একটা মুশ্কিল হইয়া পড়িল। উপস্থিত হইয়া দেখি কয়েকজন Civilian এবং তৎসহ ইংরেজ মহিলার মজলিস। আমার যতদূর মনে হয় Mr. Buckland ও Miss. Buckland উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গা ইংরেজীতে Buckland সাহেবের সহিত আলাপ করিতে পারি কিন্তু—Miss. Buckland সর্বনাশ! আমি Mc. Minu সাহেবকে ধরিয়া বসিলাম। আমাকে যে Miss Buckland এর চাওলা করিলেন এখন উপায় কি? আমি যে মহিলা মজলিসে আনাড়ী। Mc. Minu সাহেব বলিলেন, “কুচ্ পরোয়া নাই। তুমি প্রাচীন রাজাবাসী, তোমার ভয় কি? কিন্তু rightly aimed flattery, অব্যর্থ সন্ধান।” একটা কথা মনে আছে—Buckland সাহেব আমাকে সমাহিত করিতেছেন “তোমরা মফঃস্বলের লোক, আমার মেয়েকে Moffessilite করিও না।” Miss Buckland সঙ্কাসে উত্তর দিলেন “Moffessilite কাহাকে বলে আমি জানি না” ( কারণ তিনি সপ্তাহকাল হইল বিলতা হইতে আগতা। ) আমি বলিলাম “আপনি অবশ্য Moffussalite, কারণ Moffussul-এই ভাল গোলাপ কুটিরা থাকে।” Miss Buckland পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বাক্যালাপ ও dinner সরস হইয়াছিল। তার পর দিন Mc. Minu সাহেব আমাকে বলেন “গত রাত্রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করার দরুণ আমার Sample ঠিক হইয়াছে। কেন ইংরেজরা বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিবে না। ইহা লইয়া আমার সহিত ঘোরতর তর্ক চলিত, কিন্তু আজ আমার জিত হইয়াছে।” তখনও Calcutta Club হয় নাই। কাজেই আমার নিতান্ত ধারণা যে Mc. Minu এর একাগ্রতার দেশীয় ও ইংরেজের একটা platform প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে দেশীয় ও ইংরেজগণ সমভাবে মিশিতে পারে।

কলিকাতার club সৃষ্টির বছরদিন পূর্বে Mr. Mc. minu উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ধরণের একটা রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হওয়া উচিত, যাহাতে দেশী এবং বিলাতী লোকের অভিন্ন পূর্ণমাত্রার অভিনীত হইতে পারে। “পূর্বে পশ্চিম আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে” একথাই সেই দিন স্যার সত্যেন্দ্র লণ্ডনের সামাজিক বিদ্যায় ভোজে বলিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়া ছিলেন বালা আমার মৃত ইংরেজ বন্ধু Mr. Mc. minu হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এক্ষণে যে রাজ্যে আছেন সেই রাজ্যে বসিয়া এ তামাসা দেখিতে পাইবেন ইহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।



## অশ্রুর আকর্ষণ।

—(২০০)—

মলিন মুখে মুক্ত ঘরের পাশে  
চোট্ট মেয়ে দাঁড়াল সে এসে,  
শুধানু তায় 'চাই কি আমার কিছু?'—  
রইল চুপে মুখটি ক'রে নীচু।

ছিন্ন বসন, রক্ষ অশ্রু মাখে,  
দুইগাছি তার কাঁচের চুড়ী হাতে;  
শুধানু তায় 'চাই কি আমায় বল',—  
চক্ষে তাহার ঝরল শুধুই জল !

বল্ল ধীরে মুছে আঁখির ধার  
'মা কি তবে বাঁচবে না'ক আর ?'—  
শীর্ণ দুটি হাত ধরে তায় আনি  
চোখের জলে লইনু বুকে টানি।

চুস্বিত তায় মুখখানি তার তুলি  
কাদন বুকে উঠল থলি ফুল,—  
হেরিনু সে আঁর্ত মুখের গাঝে  
মা-হারা মোর মেয়ের ছবি রাজে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

# পরিচারিকা

(নব পর্ষদ)

“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

{

ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল।

৪র্থ সংখ্যা

গান।

জীবনের ভার নাও নাও প্রভু,  
বেদনার ভরা নাও হে,  
জননীর মত বুকে লয়ে টানি’  
নয়ন মুছায়ে দাও হে।

বিফল সাধনা অবশ পরাণ,  
পথে পথে ঘুরি’ গেল দিনমান,  
বড় বেদনায় আসিয়াছি পায়  
বারেক ফিরিয়া চাও হে।

ছুয়ারে ছুয়ারে ভিখারীর প্রায়  
করুণা মাগিয়া কুথা ফিরি ছায়,  
লহ ব্যথা ভয়, লাজ পরাজয়,  
নয়নের বাসি লও হে।

প্রণয় স্বপন, স্নেহের পিয়াস,  
বুকভরা শত আশা অভিলাষ,  
বিরহ-বেদন, হরষ-মিলন,  
সকল ভুলায়ে দাও হে।

পারি না বহিতে জীবনের ভার,  
দিবসের খেয়া ফুরালো আমার,  
চির ঘুমঘোর আনি' প্রাণে মোর  
চেতনা হরিয়া নাও হে।

শ্রী পরমলকুমার ঘোষ।

## সৌন্দর্য্যবোধ

—:~:—

সৌন্দর্য্যকে যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি আমরা বুঝিতে পারি ইহা আমাদের জীবনের বিশেষ একটি শুভলক্ষণ। সৌন্দর্য্য সকল সময়ে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না, আমরা সকল সময়ে তাহা বুঝিতে পারি না, তাহা উপভোগ করিতে পারি না; কিন্তু জীবনের কোন কোন বিশেষ মাহেস্ত্রক্ষেপে তাহা যখন আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে তখনই আমরা জানিতে পারি সৌন্দর্য্যবোধের মাঝে কতখানি গূঢ় আনন্দ নিহিত আছে।

এই সৌন্দর্য্যকে যুগে যুগে আমাদের ভারতবর্ষ কেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে তাহার চিহ্নসকল এখনও বর্ত্তমান। চিত্রকর রংএর পর রং ফলাইয়া, শিল্পী কঠিন প্রস্তরখণ্ড-সকল খোদিত করিয়া, সঙ্গীতকার মীড়ের পর মীড় টানিয়া এবং কবি ছন্দের জাল বুনিয়া সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে এই যে এত চেষ্টা তাহা কি সত্য সত্যই সেই সকল গুণীদের সহিত বিলুপ্ত লইয়া গিয়াছে? আমাদের জ্ঞান তাহার কিছুই কি অবশিষ্ট নাই? গুণী যে অমর, তাহাদের তিরোভাব অসম্ভব! আমরা তাহাদের সাক্ষাৎ পাই, যখন সে শুভমুহূর্ত্ত আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়। সেই সকল সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন যখন আমাদের আবেশ-বিহ্বল করিয়া তোলে, সৌন্দর্য্যকে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট করিয়া দেয়। আমরা যখন সেই সকল অতীত সৌন্দর্য্যের মোহে ডুবিয়া যাই তখনই বুঝিতে পারি আমাদের ভারতবর্ষ কি সৌন্দর্য্যের দেশ! এমন গভীর সৌন্দর্য্যের ধ্যান করিয়া স্তম্ভরকে কেহ কোথাও পাইয়াছে কি না জানি না। যখন দেখি প্রাতি রংটির মাঝে কি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য রাখিয়া তাহার চিত্র আঁকিয়াছিল, তুলির স্পর্শে হৃদয়বেগকে কি প্রাণবানু করিয়া তুলিয়াছিল, বর্ণভঙ্গিমার ভিত্তর দিয়া কি উজ্জলতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তখনই বুঝিতে পারি আমাদের অপেক্ষা তাহার সৌন্দর্য্যকে কতদূর সত্য করিয়া বুঝিয়াছিল! এখনও দেখি প্রস্তরের উপর কি হৃদয়শিল্প তাহার রাখিয়া গিয়াছে, কতশত বৎসরের

সাধনালব্ধ অমৃতত্বকে প্রস্তরকলকের উপর খোদিত করিয়া গিয়াছে, পুষ্পের দলগুলির মাঝে কি স্বাভাবিকতা, কি জীবন্ততাব জাগাইয়া গিয়াছে তখনই বলিতে ইচ্ছা করে,—

“সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে  
অপূর্ণ পুলক ভরে উঠে প্রফুটিয়া  
লক্ষ্মীর চরণসদ্ব পদ্যের মতন।”

ইহার পর কবির সৌন্দর্য্যবোধ। সে যে সৌন্দর্য্যকে কেমন করিয়া রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আমাদের দেশের পুরাতন কবিদিগের পদাবলীতে দৃষ্ট হয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য যদি না প্রাণের মাঝে মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিত তবে কি কবি বলিতে পারিত,—

“হাতক দরপণ      মাথক চুল  
নয়নক অঞ্জন      মুখক ভাষুল !  
হৃদয়ক মৃগমদ      গীমক হার  
দেহক সরবস      গেহক সার।”

এ ত শুধু বিলাসের সামগ্রীর সহিত তুলনা হইল, তাই কবি ক্ষান্ত না হইয়া আবার রাধার মুখ দিয়া বলাইলেন,—

‘পাখীক পাখা      মীনক পানি  
জীবক জীবন      হম তুঁহু জানি !’

এত বলিয়াও মনে হইল কিছুই বলা হয় নাই তাই রাধা আবার বলিতেছেন,—

তুহু কৈছে মাধব      কহবি মোয় ?

হে মাধব, তুমি যে কেমন তাহা কি আমায় বুঝাইয়া দিবে ?

এমনি করিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে। এত সুললিত এবং আকাজকাপূর্ণ প্রেমের কবিতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথায় পাইব ? ইহার প্রধান কারণ আমাদের ভারতবর্ষে যেমন পাশ্চাত্য দেশ সকল তেমন নহে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থল আমাদের এই দেশের গুণীদিগকে সৌন্দর্য্যের উপাদান অনুসন্ধান করিবার জন্য দেশান্তরে যাইতে হয় নাই, চারিদিকে এমনি সৌন্দর্য্যের বাহুল্য ! নদ নদী পর্ব্বত কন্দর ও সমতল ভূমির এমনি একত্র সমাবেশ সকল দেশে দৃষ্ট হয় না। আবার সর্ব্ব প্রদেশের ফুল ফল শস্য আমাদের এই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে, মাটির এমনি গুণ ! প্রকৃতি যে শুধুই এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিয়াছে তাহা নহে, এই সকল প্রকৃতি-দত্ত সামগ্রী হইতে আমরা কতরূপ রং উৎপন্ন করিয়াছি ; কতরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। বিদেশীয়গণ প্রকৃতির নিকট এই সাহায্য পায় নাই তাই তাহারা কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাই আমাদের প্রাচীন হিন্দুযুগের পর যখন মুসলমানের রামত্ব আরম্ভ হইল, তখন শিল্পকলার মাঝেও একটি নূতন বৃগ আসিয়া পড়িল। তাহারা সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতির অমুকরণ আরম্ভ করিল, প্রকৃতির বৃকে তাহারা যেমন যেমন পত্রপুষ্প ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিল তাহাই আপনাদিগের শিল্পকলার মাঝে প্রতিকলিত করিবার চেষ্টা করিল, ইহার ফলে মুসলমান শিল্পী উন্নত হইলেও সেই সঙ্গে সহায়ভূতি অভাবে হিন্দুদিগের যে একটি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল তাহা ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। আমাদের ভারতবর্ষ কখন অমুকরণ করিবার চেষ্টা করে নাই ; সে যে সৌন্দর্য্যের স্বাদ হৃদয়ের মাঝে উপলব্ধি করিয়াছিল তাহারই আনন্দে নূতন নূতন

শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকালই সৌন্দর্য্যকে নূতন করিয়া দেখিয়াছে, নূতন করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কখনও অন্যের নিকট হইতে তাহা ভিক্ষা করিয়া লয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসকল শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া শিল্প-সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, তাহার অমুসন্ধান-প্রবৃত্তি সর্বদাই অন্তরমুখী দিকে। যখন পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ একটি বস্তু দেখিত এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিত তখন এতদূর বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিত যে নূতন সৃষ্টির মাঝে বস্তুতত্ত্বতাই প্রধান হইয়া দেখা দিত কিন্তু ভারতবর্ষ তাগ করে নাই। একটি বস্তুকে দেখিবার সময়ে তাহার বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতিকে প্রভেদ করিয়া দেখিয়াছে এবং যতটুকু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা তাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় ভাবটিকে মূর্তি দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের সৃষ্টির মাঝে সূক্ষ্মতা ও ভাবতত্ত্বতা এবং পাশ্চাত্য শিল্পের মাঝে স্থূলতা ও বস্তুতত্ত্বতা আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? পদার্থ, না গুণ, না মনোবৃত্তি? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনের মাঝে উদয় হয়। সৌন্দর্য্যকে পদার্থ অথবা গুণ কিছুই বলা যাইতে পারে না, ইহা অনেকাংশে মনোবৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। কারণ যদি একটি বস্তুর কোন বিশেষ গুণ থাকিত তবে তাহা ব্যাক্তিবিশেষের নিকট প্রভেদ হইত না; ইহা হইতেই বুঝা যায় সৌন্দর্য্য শুধু অন্তরের জিনিস তাই একটি বস্তুর মাঝে আমি যতখানি সৌন্দর্য্য দেখি অন্যে তাহা দেখে না। প্রাচীনকালের শিল্পকলা দেখিলে জানিতে পারা যায় তখন প্রতি ব্যক্তির কি সৌন্দর্য্যবোধ ছিল এবং এই সৌন্দর্য্য-বোধ যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন এক একটি ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এক একটি বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, সমস্ত ভারতবর্ষ সেই একই রীতি অনুসারে শিল্পকলার সাধনা করিত। তাহারই ফলে সঙ্গীত-শিল্পে রাগরাগিনী, ভাঙ্ক্যে ও চিত্রাঙ্কণে শিল্পশাস্ত্র ও কাব্য সাহিত্য দর্পণের সৃষ্টি হয়।

শিল্পে আমরা যেমন আনন্দ রসাস্বাদ করিতে পারি তেমনি কোন কোন শিল্পে দুঃখেরও মাধুর্য্য লাভ করি। আমার বিশ্বাস এই দুঃখানুভূতিপূর্ণ শিল্পই শ্রেষ্ঠ, ইহা একদিকে আমাদের কৰুণার অভিব্যক্তি করিয়া তোলে তেমনি আপনার মাধুর্য্য মুগ্ধ করে। দুঃখের সহিত সৌন্দর্য্য মিশ্রিত হইয়া যে চাক্ষুশিল্পের উদ্ভব তাহার তুলনা নাই। এই দুঃখভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পাশ্চাত্য দেশে ও ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেও বহুল পরিমাণে প্রভেদ আছে। আমাদের দেশীয় শিল্পীগণ দুঃখকে হৃদয়ের মাঝে গভীর ভাবে ধ্যান করিয়া যে অমৃতটুকু পাইয়াছিলেন তাহা এখনও তাঁহাদের শিল্পকলাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং চিরকাল রাখিবে। সৌন্দর্য্যকে ধ্যানের দ্বারা এমন করিয়া উপলব্ধি করিতে আর কোন্ দেশ সক্ষম হইয়াছে?

দেশী ও বিদেশী প্রেমের মাঝেও এই একই প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশের প্রেম শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সন্ধান করিয়াছে এবং যখনই তাহা পাইয়াছে তখনই ক্ষান্ত হইয়াছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরের জিনিসটুকু পাইবার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দি,—

“Her cheeks are like the blushing cloud

That beautifies Aurora's face

Or like the silver crimson shroud

That Phoebus' smiling looks doth grace,

Her neck is like a Stately tower

Where Love himself imprisoned lies

To watch for glances every hour  
From her divine and sacred eyes."

এমন করিয়া প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা চলিল, কিন্তু তাহর পরপারে আর কিছুই নাই; যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা কোন অতৃপ্তি নাই। ইহার সহিত একবার দেশীয় কবিতার তুলনা করি। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই শুধু বিদ্যাপতির মূল কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—এইটুকু মনে রাখিতে হইবে ইহা পূর্ণ সম্ভোগের কালের কবিতা—তাহা হইলেই ইহার গূঢ় আকাঙ্ক্ষার গোপন বেদনামাথা স্রুটুকু প্রাণের মাঝে বাজিয়া উঠিবে,—

‘জনম অবধি হম রূপ নেহারমু  
নয়ন না তিরপিত ভেল  
সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলু  
প্রতিপথে পরশ না গেল !  
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়মু  
না বুঝমু কৈছন কোল  
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখমু  
তবু হিম জুড়ন ন গোল !’

—:~:—

## শ্রেষ্ঠ-সম্মাস ।

—(—#—)

( গাথা )

একদা কপিলবাস্তু নগরের চ্যগ্রোধ আরামে  
উপজিল নৃপ নন্দ ভগবান বুদ্ধে নতি কামে !  
প্রসন্ন স্নগত, নন্দে কহিলেন সাদর বচনে—  
“পুণ্য যদি চাহ বৎস্য, ভোগ রাগ বিলাস ব্যসনে  
তাজি লহ বেরাগ্যের বৈজয়ন্তি চৌবর-কেতন  
জগতের কল্যাণেতে ক’রে দাও আত্মনিবেদন  
আকর্ণ আরক্ত গণ্ড নিবেদিল নন্দ করযোড়ে—  
“প্রব্রজ্যায় নাহি বাঞ্ছা ক্ষমা কর প্রভু এবে মোরে ।”  
পূর্ণ এক বর্ষ পরে নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে  
নিজে প্রভু আসিলেন নন্দ মহারাজের পুরীতে

সুবচ্ছন্দে বন্দি' পদ নন্দ অভিনন্দিয়া স্নগতে—  
 পদত্রজে পিছে পিছে চলিতে লাগিল রাজপথে,  
 আশ্রমে পুরোপকণ্ঠে পৌঁছে দিতে বুদ্ধ ভগবানে  
 সুবিনীত, স্নানাহীন নগরের মহোৎসব পানে !  
 পৌঁছায়ে স্নগতে সজ্জ্ব নন্দ যবে মাগিল বিদায়  
 নিবারিয়া ভগবান, বসিতে কহিল ইসারায় ।

“এত কেন দ্বরা বৎস, সংসার কি এতই সুখের ?  
 দেখিছ' না জরা মৃত্যু হাহাকার আকর দুখের ?  
 সম্পদ সে ইন্দ্রধনু ! এ দৌষন পর্ব-বিগ্ৰু চলে  
 প্রতিপদে তিলে তিলে জরসী আমার সূকবলে !  
 সর্ব শেষ আছে মৃত্যু—ফেলে যেতে হয় সব যত  
 সুখই। ভঙ্গুর ভবে বারান্দা-ক্রভঙ্গের মত !  
 সম্পদ, স্বজন, প্রিয়া, ভোগবাজ্ঞ যত দিন প্রাণ  
 দেহাশ্বে বিলীন সব ! দেখ' এক বৈরাগ্যেই জ্ঞান !

নন্দের প্রবণ চিত্ত দোলাকুল সন্দেহ ধোলায়  
 স্তম্ভিত মারুত সমআন্দোলিত লতিকার, হায় !  
 প্রাণ মন সর্ব-অঙ্গ যে মন্দিরে বন্দী ও বন্দার  
 গুঞ্জরিছে স্তম্ভীর চুম্বি' মুখ মকরন্দ-চাক্র—  
 যাহার বিরহে দেহ ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু-মাহিনায়—  
 তার তরে লজ্জা কেন বচনের ঘটে অন্তরায় ?  
 কহিল রাজেন্দ্র শেষে—“গৃহই আমার প্রিয়, প্রভু,  
 ভাল হোক মন্দ হোক প্রত্যায়া ইচ্ছা নাহি কভু !”

না ছাড়িয়া তবু বুদ্ধ দানিলেন বহু উপদেশ  
 একান্ত সে অনুরোধ এড়াইতে নারিল নরেশ ।  
 প্রত্যাগত হ'ল নন্দ । পরিধানে কাষায় বসন  
 পাত্র-পাণি, বনবাসী, মনোভুঞ্জে স্তম্ভিত বচন ।  
 প্রিয়ার চিন্তায় ধ্যানে যাপে দিন মর্ম্মদাহী ছলে  
 তিতে বন্ধ নিরন্তর বেদনার তপ্ত আঁধি জলে !  
 পূর্ণ হ'ল এক মাস । জাগে নন্দ প্রিয়াস্মৃতি নিয়া  
 বিনিম্ন নিশায় হেরে তদ্রূপ কান্তা আশ্রয়ণী ।

দিন দিন পাণ্ডুরূপি প্রিয়া হারা ( নহে বোধি ধ্যানে )  
 দেখিয়া নন্দেরে প্রভু পুছিল ডাকিয়া কাছ-পানে,  
 এ ত্রুত পরম ধর্ম্যে মনঃস্থির হইয়াছে কি না !  
 উত্তরিল অধীর নৃপতি—“মরিতেছি প্রিয়া বিনা !  
 ফিরাইয়া লহ দেব এ নিষ্ঠুর করুণা তোমার,  
 যেতে দাও গৃহে মোরে কিম্বা দাও সঙ্গ দয়িতার !  
 এ বৈরাগ্য দীক্ষা যে গো হত্যা সম নিষ্ঠুর ভয়াল  
 কুটিল হিংসার মত, স্বার্থসম স্ত্রীচ, দয়াল !”

কাটিল আরেক মাস । অপরাহ্ন । বহে মন্দানিল—  
 নিঃসঙ্গ বসিয়া নন্দ । উজ্জ্বল শান্ত অম্বর স্ত্রীল ।  
 আঁকিল কাস্তার চিত্র গলিত গৈরিক শিলাতলে  
 মণ্ডি মনোমাদুরীতে কল্পনায় মিলনের ছলে !  
 কহিল তন্ময় নন্দ—“সত্য প্রিয়ে এই মিথ্যাচার !  
 আমার সম্মান চেয়ে মিথ্যা ভবে কিছু নাই আর !  
 এ চাঁবর রক্ত বর্ণ তব প্রেম রাগ মঞ্জিমায়  
 কাটে দিন ছদ্ম বেশে, বাঁচি শুধু তোমারি চিস্তায় ।

অদূরে শুনিতেছিল কয় জন ভিক্ষু এ বিলাপ  
 প্রভুর গেচেরে আসি কহি’ দিল শ্রমণের পাপ !  
 সহসা উদ্যোত হ’ল স্নগতের বদন-মণ্ডল  
 পুলকে স্পন্দিল নেত্র, উপজিল চরণ-চঞ্চল ।  
 গম্ভীর আননে প্রভু ভংসিলেন নন্দ নরনাথে—  
 “উদ্ভ্রান্ত হ’লে কি নন্দ ? বিসর্জিলে লজ্জা ধর্ম্মসাথে ?  
 এই চর্ম্ম রক্ত মাংসে গড়া’ এই কুশ্রী দেহ তরে  
 দলিছ চরণে এ কি জ্যোতির্ম্ময় অমর স্নন্দরে ?”

কহিল অধীর নন্দ স্নন্দরীর বিরহের ভারে  
 “ক্ষমা কর হে ঠাকুর, রূপহীনা বলো না তাহারে !  
 কন্দর্প কামুকলতা, অনিন্দ্যা-স্নন্দরা, স্ত্রীলোচনী,  
 কুন্দলিতা সে যে অমুপমা—নিবিড় স্তবক-স্তনী ;  
 স্তললিত লোল ক্রলতার সাবলীল লাম্যে যার  
 শিশ্ন করে জয়, যার অনবদ্য বদন-শোভার



পরিমাণ-পরিমাপে শোভাকর হের চন্দ্রমায়—  
তুলাদণ্ডে উর্দ্ধে অধিকৃত আপনার লঘুতায়।

“আমার বিহনে সে যে বিরহিণী চক্রবাকী হেন  
চেয়ে আছে নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকার দিগন্তরে যেন !  
বিদায় প্রারম্ভে তার সকাতর মৌন দৃষ্টিখানি  
উপাড়িতে নারি আজো শল্যসম বন্ধে আছে হানি !  
মণি রত্ন গজ বাজি রাজ্য সৌধ আমার সকল  
দয়িতা পরশমণি—ইহলক্ষ্মী বিহনে বিফল !  
প্রিয়াই আমার স্মৃতি, ধ্যান পূজা, সব সেই মম—  
দিগ্ধিদিকে দেখি তাই—তারি কথা তারি লিপি সম !

ধীরে ধীরে কহিল স্নগহ—“বৎস্য মোর এ যে ভ্রম !  
অকল্যাণ-মিত্র মোহে তাজিবি কি কল্যাণ পরম ?  
রমণীয় কিছু নাই ভবে । মানবের অনুরাগ,  
আর এই চিরন্তন কামনা ও প্রার্থনার ফাগ  
লাগে যার গায় ( হোক সে কুৎসিত যত এই ভবে )  
তারেই সুন্দর করে, প্রিয় করে মাধুর্য্য-গৌরবে !  
মুছে ফেল এ স্নেহ-কলঙ্ক, ছিঁড়ে দেখ মায়া ডোর  
কি কুৎসিত বীভৎস সংসার দিয়াছ যাহারে ক্রোড়।”

“দয়ার দেবতা যে গো করুণার তুমি অবতার—  
এ কি বাণী তব মুখে, এ কেমন তব ব্যবহার ?  
ক্ষুদ্র নর আমি ভবে, বুঝি ও গো ক্ষুদ্রতর কথা  
সেই শ্রেষ্ঠ স্বর্গ তার যার তরে বাজে যার ব্যথা !  
সন্তুষ্ট যে যেথা থাকে থাকিবারে দাও তারে সেথা  
পথিক সে নিজে খুঁজে লয় সুপথ তাহার যেথা !  
আমি যারে ভালবাসি সে আমার স্বর্গ মোক্ষ সব  
আমারে যে ভালবাসে সে আমার পরম বৈভব।”

“জনক ও জননীর যুগ্ম প্রেম প্রীতি রসায়নে  
জন্মারম্ভ গর্ভে যার ; বাৎসল্যের স্তন্য ও চুষনে  
নিয়ত বাড়িল যাহা ; বলভীর বাহুবলী যারে  
একান্ত আগ্রহে ঘিরি রাখিয়াছে আলোঅন্ধকারে—

সে কি পারে বিসজ্জ্বতে ক্রম্যগত প্রীতি ভালবাসা ?  
পশুও পারে না যাহা, মানুষে তা' কর' তুমি আশা ?  
কুমি কীট ক্রমে যথা থাকে তারা সেথায় হরষে  
বাঁচে না কখনো তারা প্রাসাদের বিলাস আলসে !”

এতেক কহিয়া নন্দ উন্মাদের মতন অধীর  
বুদ্ধ পদে রাখি চীর, সসন্ত্রমে আনমিল শির ।  
পরি নিজ পূর্ব বেশ চকিতে ছুটিল নরপতি  
জনপদ পথ ধরি আপনার মনোরথ গতি ।  
“প্রেমই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ” কহিলেন প্রভু পুলকিত—  
“প্রিয়-সেবা-তোষে যাহা মহানন্দে হয় উপচিত,  
মানবের মন গোমুখীতে । এ প্রেমে যে আত্মহার  
কৌপীন তাহার মিথ্যা, সম্মাসে সে সকলের বাড়ি ।” \*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## মিষ্টি সরবৎ ।

—:~:—

( ১৩ )

মহরমের ছুটি হইয়াছে । আবলু-সাহেবের বড় ভগিনী, স্বামীর সহিত পুত্রকন্যাদের লইয়া এখানে আসিয়াছেন । শিশুদের কোলাহলে বাড়ী আনন্দ-মুখর । আমিনা এবং ইনেবের স্মৃতি উৎসাহের সীমা নাই । রহমান-সাহেব অত্র সম্পর্কে ইনেবের জননীর মাতুল, কাজেই একদিকে মাতামহ অর্থাৎ নন্দাই হওয়ার অধিকারে আইন-সঙ্গত পরিহাস-রসিকতার ক্ষমতা লাভ করিয়া, প্রোট ডেপুটী-সাহেব এই নবীন দম্পতি-যুগলকে লইয়া খুব আনন্দ জমাইয়া তুলিয়াছেন ! ইনেব সলজ্জ, আমিনা ব্যতিব্যস্ত ! আবলু-সাহেবের নিগ্রহের সীমা নাই, তবে মেহমম্মী জোষ্ঠা তাঁহার সহায় আছেন তাই রক্ষা ! রহমান-সাহেব সময় বিশেষে নিঃস্বার্থ করুণা-পরবশ হইয়া আহমদ-সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেও, মাঝে মাঝে তাঁহাকে জঙ্ক ও করিতেছেন বিলক্ষণ !—রহমান-সাহেবের প্রকৃতিটি সদাশান্তময়, মনটি উদার মেহশীল । তাঁহার সহধর্ম্মীণীও অনেকটা তাই, তবে মেহ ও কোমলতা গুণের আধিক্যে তাঁহাকে একটু স্বভঙ্গ দেখায় । আহমদ এবং আবলু ইহাদের উভয়কেই আন্তরিক সম্মান করিয়া চলিতেন ।

জোষ্ঠা ভগিনী আসাতে আবলু-সাহেব তাঁহাকে পশ্চিমমহল ছাড়িয়া দিয়া নিজে দিওলে উঠিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণ মহলের আঙা ভাঙাতে একেবারেই হতভম্ব হইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া আহমদ-সাহেব

\* ( বোধিসত্ত্বাবদান করলতা হইতে )

ঊহাকে নিজের মহলে টানিয়া আনিয়াছেন। আহমদ-সাহেবের পোষাক-কামরার পাশের ঘরটি স্তম্ভরূপে নূতন আসবাবপত্র সাজাইয়া-গুছাইয়া, আবলু-সাহেবের বাসের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

সে দিন সমস্ত সকালটা ধারিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া, অপরিসীম গৃহিণীপণ্য সহিত,—অভ্যাগত আত্মীয়-গণের সেবা-মন্ত্রের সুব্যবস্থা করিয়া, দুপুরবেলা সকলের আহারদি শেষ হইলে আমিনা তাহার দিদির কাছে গিয়া আড্ডা দিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বেচারী ইনেবও ছায়ার মত তাহার অনুগামী হইল।

দিদি তখন ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া একটু নিদ্রা যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। কুশল-মুষ্টিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সভয়ে চুপি-চুপি বলিলেন “আন্তে, আন্তে,—থোকায়খুম এসেছে,—একটু শব্দ পেলেই ও উঠে পড়বে। আমিনা তোর ঘরে যা, ইনেবকে ও ওর ঘরে দিয়ে যাও, আবলু আছে সেখানে।”

ইনেব লজ্জায় জড়সড় হইয়া কি একটা প্রাতিবাদ করিতে গেল, ইতিমধ্যে আমিনা সপ্রতিভ হান্তে বলিয়া উঠিল “সে তো আমি বলেছি ওকে, তা ও লজ্জায় দিশাহারা হয়ে রয়েছে, সেদিকে খোঁসতে রাজি নয়, আমার লেজুড় ঘরে ঘরে বেড়াচ্ছে,—আমি কি করব ?—”

দিদি একটু স্নেহময় ভৎসনার স্বরে বলিলেন “তুই-ই যত নষ্টের জোড়! তুই ভাল মানুষের মত নিজের ঘরে যা দেখি, তার পর আমি দেখছি ইনেব কোন্ দিকে যায়—”

রহমান-সাহেব পাশের ঘরে শয্যায় শুইয়া তাহার প্রিয়তম ফরসীটির সহিত বিশ্রান্তালাপ করিতেছিলেন, এ ঘরে হাঙ্গামা শুনিয়া, ফরসীটি হাতে লইয়া সহস্র মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন “কি—ব্যাপার কি? ছই স্থিই বে এখানে! বেচারী সখা ছুটি কোথা?”

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, দিদির কোলের কাছে নিদ্রাতুর ছয় মাসের শিশুটি চমকিয়া চোখ মেলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। আমিনা সোলাসে হাততালি দিয়া বলিল “ঐ! দেখলে দিদি,—উনিই থোকাকে গুঠালেন,—আমার দোষ নাই কিন্তু,—আমায় বোকো না—”

দিদি কৃত্রিম কোপে বলিলেন “না, বক্বো না! নে এবার ছেলে নিয়ে থাক! ঝি চাকরেরা সবই খেটেখুটে এতক্ষণে খেয়ে একটু দুমুতে গেছে, সকলের শরীরেই আলস্য আছে, তোদের মত তো কেউ নয়! আমি তো তাদের এখন কিছুতেই ডাকব না, তোকেই ভোগাব—”

আমিনা উৎসাহের সহিত বলিল “বেশ তো, দাও না, তাতে আমি ডরাই না—”

ইনেব ব্যস্ত হইয়া বলিল “না আমি ওকে নেব—”

আমিনা ক্রান্তে শিশুকে তুলিয়া লইয়া সকোপে বলিল “নেবে বৈ কি তুমি! শালাও এখান থেকে, দিদির হুকুম,—যাও তুমি দাদার ঘরে—”

“আর তুমি ?—” বলিয়াই ইনেব সলজ্জভাবে মুখ নীচু করিয়া হাসিল।

একটা মোড়া টানিয়া লইয়া, নিকটে বসিয়া রহমান-সাহেব উৎসাহের সহিত বলিলেন “ঠিক ঠিক ঠিক-কথা !—” তারপর চুপে আমিনার দিকে বুঁকিয়া-পড়িয়া একটু চুপি চুপি বলিলেন “যাও না,—তুমিও তোমার feeding-groundটির দিকে রওনা হও না—দুপুরবেলা হেথা-সেথা ‘দুপুরে মাতন’ ক’রে বেড়াচ্ কেন—”

আমিনা রাগতভাবে চোখ রাঙাইয়া বলিল “দেখুন, আপনি থামুন, দয়া ক’রে—”

জ্বরী দিকে চাহিয়া বিক্রপের স্বরে রহমান-সাহেব বলিলেন “দ্যাখো, ধমকের ঝাঁজটা দ্যাখো একবার !—না, জীমান ভায়া আমার, বিলক্ষণ জন্ম হয়ে আছেন বটে ! ওগো সুন্দর—”

আমিনা তাঁহার কথা চাপা দিবার জন্ত খুব চোঁচোমেচি করিয়া ‘হাঁথী পর হাওদা, খোড়ে পর জিন্’ ইত্যাদি রবে বালা-অভ্যাস্ত একটা কি কবিতা আবৃত্তি শুরু করিয়া দিল ! শিশু ক্ষুষ্টির উচ্ছ্বাসে, মেঝের উপর সুকোমল চরণ ছুইখানি ঠুকিয়া ঠুকিয়া থপ্ থপ্ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সান্নায়ে পিছনে ঝুঁকিয়া অসামঞ্জস্য তালে, মাসীমার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নাচিতে লাগিল। গোলেমাতে রহমান-সাহেবের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, আমিনা মনে মনে স্বস্তি পাইয়া, গর্গ-প্রকুল মুখে বলিল “দেখ্ছি দিদি,—থোকা কেমন নাচ্ছে ?”

দিদি কোন কথা বলিবার পূর্বেই রহমান-সাহেব ফরসীর নল ফেলিয়া, আমিনার মাথাটা ছুইহাতে ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া—গৃহস্থ সকলে যাতাতে শুনিতে পার, এমনভাবে সংগোপনে (?) বলিলেন “থোকা তো বেশ নাচ্ছে, কিন্তু থোকার মেসামশাইটির অবস্থা কি-রকম হচ্ছে একবার খোঁজ নাও—শুন্ছি—শুন্ছি—”

ত্রস্তে মাথা টানিয়া লইয়া, আমিনা ভগিনীপতির মুখপানে চাহিয়া জ্রুকৃষ্টি করিয়া বলিল “দেখুন—” পরক্ষণেই দিদির সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই সে হাসিয়া ফেলিল !—তারপর ক্ষুণ্ণভাবে অনুরোধের সহিত বলিল “দ্যাখো তো ভাই দিদি,—আমি শুঁকে বড় ভাইটির মত মান-সম্মদ করতে চাই, আর উনি কিনা এমনিভাবে রঙ্গ করে সব উড়িয়ে দেবেন !—” ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল “হুঁ ! গবর্ণমেন্ট যে কি গুণেই আপনাকে হাকিম করেছিলেন, আমি অবাক হয়ে তাই ভাবি ! কি বিদ্যেই শিখেছেন, আহা !—”

ফরসীতে সুদীর্ঘ-টান দিয়া রহমান-সাহেব কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমিনা বাধা দিয়া বাস্তবাবে বলিল—“দেখুন, আপনার রসিকতাগুলো বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু আপনার ঐ ফরসীর উৎকট রসালাপ—ও আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।—আমি আশ্চর্য্য হই যে, দিদি কেমন করে আপনার ঐ ফরসীটাকে বরদাস্ত করে নিলে !—আপনার ফরসীটাকে দেখলে আমার তো কেবলই মনে হয় যে কতকটা আছড়ে ভাঙ্গি, আর ফরসীটা দরিয়ার জলে ভাসাই !”

জ্বরী দিকে চাহিয়া রহমান-সাহেব কপট-বিস্ময়ে বিক্রপের স্বরে বলিলেন,—“শোন, শোন, প্রেতুপ্‌স্যানটা শোন একবার ! আচ্ছা আমিনা বিবি,—সত্য বল তো—নসোর সৌগন্ধটা বড় মিষ্ট, না ?”

লজ্জায় আমিনা চুপ !—ঘাড় হেঁট করিয়া, সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। যেন থোকার পা ছুইখানি সে একান্ত মনোযোগে দেখিতেছে !—

দিদি এতক্ষণ নীরবে হাসি-হাসি মুখে ইহাদের বাকবিতণ্ডা শুনিতেছিলেন। এইবার আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন “নসোর গন্ধ মিষ্টই হোক, তিক্তই হোক, সেটা ওর কাছে পরম সুন্দর হতেই বাধ্য !—আমিনা, তুই উঠে পড়তো দিদি,—ইনেবকে ওর ঘরে দিয়ে যা, এখান থেকে তর্কের ঝড় সয়ে আমি এখন একটু ঘুমিয়ে বাঁচি—”

আমিনা বলিল “ওঠো ইনেব—”

ইনেব এমন মজলিশ ছাড়িয়া উঠিতে সুরু হইয়া দিদির দিকে চাহিয়া মুহু স্বরে বলিল “আপনার খালি ঘুম, ঘুম—একটু জেগেই থাকুন না—”

আমিনা বাধা দিয়া বলিল “না, নাঃ ! দিদি বেচারী ঘুমুক, তোমাতে আমাতে পলাই,—শুধু একলাটি জেগে বসে থাকুন ওই ফরসী ওলা বগড়াটে মানুষটি—”

রহমান-সাহেব বলিলেন “দেখ্বে, যাব তোমার ঘরে বগড়া জমাতে—”

দিদি বাস্তব হইয়া বলিলেন “আহা কি ছেলেমানুষী কর ।—”

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমিনা অমনি তৎক্ষণাৎ জড়ঙ্গী করিয়া বলিল “হাঁঃ ! তাই বটে, না তাই বটে ! বিত্তী ছেলেমানুষী—” পরক্ষণেই থোকাকে কোলে লইয়া ইনেবের হাত ধরিয়া সে বাহির হইয়া চলিল। দিদি সম্ভ্রান্ত হইয়া বলিলেন “ওরে ছেলেটাকে দিয়ে যা, ও এখনি কারাকাটি জুড়ে তোদের বাতবাস্ত করবে যে !—”

“কাদে যদি তো, দিয়ে যাব—” বলিয়া আমিনা চট করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রহমান-সাহেব বিজ্ঞপের স্বরে কি একটা কথা বলিলেন, আমিনা শুনিতে পাইল না।—ইনেব একটু ছুটানীর হাসি হাসিয়া, পিছনপানে ফিরিয়া বলিল “ডাক্তার-সাহেব এখনো ঘরে আসেন নি, আপনারা ভাববেন না।”

হো হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া রহমান-সাহেব ঘরের ভিতর হইতেই উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“তবে যাব নাকি আমি,—শুন্ছ আমিনা—”

আমিনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, ছুটিয়া পলাইল।

পশ্চিমমহলে পা দিয়া ইনেব আমিনার কাণে-কাণে বলিল “ও ভাই আমিনা দিদি, যতক্ষণ না ডাক্তার-সাহেব আসেন, ততক্ষণ চল তোমার ঘরে বসি গে—”

আমিনা গৃহিণী-জনোচিত গাভীরোর সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল “না না,—দাদা পাশের ঘরে আছে, এখন ও ঘরে গিয়ে তোমার গল্প করা হবে না, যে দিদি শুন্লে রাগ করবে, দাদাই বা কি মনে করবে ? বল্বে আমিনাটার জ্বালায় দিনেরবেলা ইনেবকে একবার দেখতে পাবার যো নাই।”

লজ্জার লাল হইয়া ইনেব বলিল “হ্যাঁ তা বৈকি ? তা কক্ষণে বলবেন না। দ্যাখো না, উনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন—”

“আজ্ঞা দেখি, ধরতো থোকাকে” বলিয়া আমিনা থোকাকে ইনেবের কোলে দিল। থোকা হাতপা ছুড়িয়া চাকলা প্রকাশ করিয়া কতকগুলি অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিল। আমিনা তাহার বাচালতা দেখিয়া সৰ্ব্বোপে শাসন করিয়া বলিল “ওরে ছেলে, চুপ ! মানুষী বরে আছে, আবার এইখানে চেঁচিয়ে ‘কাউ কাউ’ করা হচ্ছে ! ফের যদি চেঁচাবে তো দেব এখনি ছুঁক করে এক কিল বসিয়ে !—”

আমিনা মুঠা উদ্যত করিয়া থোকাকে কিল দেখাইল। থোকা পরম খুশী হইয়া থক্ থক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—তারপর নিজের ছোট্টহাতের কচি আঙুল দুইটি মুখে পুরিয়া চুক্ চুক্ করিয়া চুসিতে চুসিতে—শাসনকণ্ঠী মাসীমার দিকে নিতান্ত নিরীহভাবে জুল্ জুল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

থোকা বিদ্রোহিতা তাগ করিয়া শাস্ত হইয়াছে দেখিয়া, আমিনা নিশ্চিত হইয়া নিঃশব্দ পদে, অদূরস্থ ঘরখাসির দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। তারপর দ্বারের ফাঁক হইতে উঁকি দিয়া, ঘরের ভিতর চকিতের জন্য নৃষ্টিকোপ করিয়া—ব্যস্তলমস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত চুপি-চুপি ইনেবের কাণে কাণে বলিল “ঐ তো দাদা জেগে আছে !—ওয়ে ওয়ে বই পড়্ছে, তুমি যাও ভাই, ছুটু নী কোরনা—”

দ্বিতীয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে খোঁকাকে টানিয়া লইয়া ক্রতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা ইনেনব সগজ্জভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

( ১৪ )

ঘরে তখন আহমদ-সাহেব আসেন নাই। আমিনা শেলফের উপর হইতে একখানি বাণী গল্পের বই টানিয়া লইয়া,—শয্যার কাছে আসিল। খাটের উপর খোঁকাকে শোওয়াইয়া দিয়া, তাহার উপর বুক দিয়া পড়িয়া উপস্থাপি শিশুর মুখে চুমা খাইয়া, অনেক রকম আদর জ্ঞাপন করিল। শিশু পরম পরিতোষ সহকারে “হৌক-হৌক” শব্দে আন্তরিক প্রসন্নতা জানাইয়া পা ছুড়িতে ছুড়িতে আঙুল চুষিতে লাগিল। আমিনা পাশে শুইয়া পড়িয়া, বকের কাছে শিশুকে টানিয়া লইয়া, বইখানি খুলিয়া চোখের সামনে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ দিল। খোঁকা সেই নিস্তরঙ্গতার অবকাশে আঙুল চুষিতে চুষিতে, কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল।

আগে কিছুক্ষণ কাটবার পর সিঁড়িতে আহমদ-সাহেবের জুতার শব্দ হইল। আমিনা কাণ খাড়া করিয়া একবার শব্দটা শুনিয়া পুনশ্চ পুত্রে মনঃসংযোগ করিল, বইখানা তাহার অন্তস্থ ভাল লাগিয়াছিল। কাজেই, তখন চাড়িতে পারিল না।

জুতার শব্দটা সিঁড়ি ও বায়ের গা পার হইয়া ক্রমে ঘরারের কাছে পৌঁছিল। ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া, সহসা বিষমমুচক স্বরে —“এ কি !” বলিয়া আহমদ-সাহেব দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

আমিনার ক্রক্ষেপ নাই ! সে একমনে পড়িয়াই চলিল। মিনিট দুই তিন কাটিল, আহমদ-সাহেবের আসন্ন কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমিনা আরক পরিচ্ছদটা শেষ করিয়া অসুস্থিত্ব দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল,—দেখিল স্বামী চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া বিষম-মুগ্ধ নগ্ননে তাহার পানে চাহিয়া কৌতুক-স্থিত—অথবা মূহু মূহু হাসিতেছেন !

খোঁকা যে আমিনার বকের কাছে শুইয়া আছে, পড়ার ঝোঁকে আমিনা সেটা ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামীর হাসি দেখিয়া সগজ্জভাবে একটু সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। নিদ্রিত শিশু, নাড়া পাইয়া, চমকিয়া,—ঘুমের ঘোরেই ভীত ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিনা সরিতে পারিল না। স্তম্ভপূর্ণ শিশুকে চাপড়াইতে-চাপড়াইতে আড় চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল “অমন করে হাসছ যে ?”

“তোমার দেখে—” বলিয়া আহমদ-সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। আমিনা বলিল “ওকি, ঐ পোষাকেই ঘরে ঢুকছ যে!—”

“দাঁড়াও খোঁকাটিকে একবার দেখে দাঁট—” বলিয়া তিনি খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিগ্ন দৃষ্টিতে শিশুটির দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বলিলেন “চন্দ্রকার যমুচ্ছে।—খোঁকাটি তোমার কাছে এমন করে শুয়ে আছে, দেখে হঠাৎ আমি চমকে গিয়েছিলুম !”

“জ্ঞা-কৃত্তিত স্বরে আমিনা বলিল “কেন ?—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “ও, তোমার বকের কাছে তুমি ভাবে শুয়ে আছে, হঠাৎ দেখেই আমার চোখে কেন কেন এক রকমই লাগল ! ছোট ছেলে এক মহারাজ জিনিস, না !”

তিনি হেঁট হঠাৎ শিশুর লগাটে একটি চুমা খাইলেন। আমিনা সন্তুষ্টিভাবে একটু সরিয়া গেল। সংস্কার দৃষ্টিতে শিশুর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল “হুঁ নী দেখো,—এ ধারে অগাধে ঘুমুচ্ছে,—কিন্তু আমার কাপড়টি ধরে আছে শক্ত মুঠায়! পাছে আমি গালাই!—”

আহমদ সাহেব কোন উত্তর দিলেন না, কি একটা কি কথা মনে পড়ায়,—আমিনার মুখ পানে চাহিয়া নীরবে শুধু হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি দেখিয়া, কে জানে কেন,—আমিনার ভাবী লজ্জা বোধ হইল, সন্তুষ্টিভাবে একটু নাড়িয়া-চড়িয়া—সরিয়া গুইয়া, একটু কাশিয়া অশ্রুট ধরে বলিল—“আবার হাসিতে শুরু দিলে যে! রকম কি?—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন, “একটা কথা মনে পড়ল”

আমিনা বলিল “কি?—”

চকিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া, আমিনার কাপের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নস্থে তিনি সন্নিহিত “ভাবছি, এমন কোন একটি খোকার মা হ’লে, এখন তোমার নেহাৎ মন্দ মানায় না, আমিনা!—আর তা হ’লে, কথায়-কথায় ঘর-থেকে ঠিকুরে পালায় নফানিকেশ!”

“আচ্ছা, যাও—” বলিয়া লজ্জাবিত্ত আমিনা—হাতের কাছে কোথাও কিছু নাপাইয়া থাপু করিয়া হইটো টানিয়া নজের মুখের উপর চাপা দিল। আহমদ-সাহেব হাসিতে হাসিতে পোষাক কামরার দিকে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পোষাক চাড়িয়া সাবানে হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, আহমদ-সাহেব সাধারণ বেশে ন স্নান কোটাটি হাতে লইয়া মুখে একটি অগ্নি হীন চুরুট ধরিয়া, ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। আমিনা তখনও তেমনি অ-স্থির পড়িয়া আছে। আহমদ সাহেব তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া মুখের উপর হইতে বইখান সরাইয়া লইয়া দেখিলেন—সে তখনো চোখ বুজিয়াই নিঃশব্দে হাসিতেছে!

অত অকস্মিক স্নেহ পূর্ণ একটি মুহূর্তপেটাবাত আসিয়া আমিনার গালের পাশে পৌঁছিল, কিন্তু সে চোখ চাভিল না,—মুদ্রিত নয়নেই স্বামীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া, চুপ চুপ বলিল “এখানে বসতে হবে না, ছিঃ, জ্বর খোলা রয়েছে, দেখছা?—ভ্রলোকের মত উঠে গিয়ে ওধারে ঐ কোটার ওপর বোস—”

দ্বিতীয় কপট-গাঙ্গারী বলিলেন “এই অমুরোধটা কি নিতান্ত অভদ্র-জনোচিত হোল না? চিঃ, শিষ্টাচার ক’কে বলে একবারেই জান না দেখছি। কোচে বসব এখন এরপর, আগে এটখানে বসে প্রিয়বন্ধু গোহনীবাবুর স্মৃতি-উপহার এই সুগাবান চুরুটটির দাহন-কার্য সমাধা করি—”

সবিস্ময়ে চোখ মেলিয়া আমিনা বলিল “কী? চুরুট পোড়াতে হবে? এই ঘরে বস? আমার কাছে?—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা কি করব? অস্তরঙ্গ বন্ধুর আন্তরিক অমুরোধ!—সে মাথার দিবা দিতে বলেছে—”

আমিনা বাতিবাস্ত হইয়া বলিল, “ভাই-ভ্রম ঐ বিটকেল গন্ধে আমি যে এখন মাথা ধরে মরব!—”

আহমদ সাহেব জরাজীর্ণ করিয়া গস্তীরভাবে বলিলেন “সেই জনোই বন্ধুর এত আগ্রহে অমুরোধ করেছেন।”

মাথা তুলিয়া, বিফারিত চক্ষে চাহিয়া আমিনা বলিল “কি ? আমার মাথা পরিষে নারবার জ না তোমার বন্ধু মাথাও দিবা দিগে অধুরোধ করেছেন ?—আঃ ! তবে বুঝি বন্ধুদের কাছে আমার নামে কুৎসা কথা হয়েছে সব ? না ?—”

আহমদ-সাহেব উদাস দৃষ্টিতে জানাশার দিকে চাহিয়া নরম স্বরে বলিলেন “তা যৎকিঞ্চিৎ করতে বাধ্য হয়েছি বৈ কি ! আমার কোন সখ মেটাবার যো নাই ! ঘরে বসে চুরুট-আগুতা খাও, তা সে পথও বন্ধ ! এতে আপণেব হয়, কি না হয় ?—কাজেই বন্ধুদের কাছে তৎপরে কথা কিছু কিছু বাগছি ।”

আমিনা অবাক হইয়া গেল ! ক্ষণপরে কুরুকটে বলিল “কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি !—উঃ, এর জন্যে তোমার এত আপণেব !—বন্ধুদের কাছে অভিযোগ করতে যাওয়া ! ছিঃ !—বেশ আমি আর কিছুট বলব না, তে মার যা খুশী তাই কর, ঘরে বসে চুরুট খাও, গাজা পাও, গুলি খাও, আমি কিছু আপত্তি করব না । তবে ওসব বিটুকল গন্ধ আমার সঙ্গ না, আমি বাইবে চলুম ।—”

আমিনা সতাই উঠিয়া পড়িল । নাড়া পাইয়া ঘুমন্ত শিশু চমকিয়া চোখ মেলিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া কান্দবার উদ্যোগ করিল । আমিনা থামিল, সাবধানে শিশুকে পুনশ্চ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতে-পাড়াইতে, সাতিশর অঙ্গসংগ্রহ সহকারে—অথচ খুব সংযত স্বরে অশ্রুভাবে বলিল “আঃ এ ছোটটিও হয়েছে তেমনি !—”

“হু” বোঝ—” বলিয়া আহমদ-সাহেব মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে শুরু দিলেন । আমিনা অভিমান-দজল-দৃষ্টি তুলিয়া বলিল “আর হাসতে হবে না, থাম—”

অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আহমদ-সাহেব থামিলেন । চুরুট-টি ছুড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, সহাসে বলিলেন “এই নাও, রইল চুরুট ! আমার নানা দাদাও কখনো চুরুট খায় নি, আমি তেই ছেলেমানুষ ! রহমান-সাহেবের জন্য এক বাস্ক কিনি এনে চলুন, তাই তারই একটা নিয়ে এসেছিলাম তোমার রাগাবার জন্য ! মাপ কর আমিনা আব চোটা না, নোহিনী বাবু এসব খবরের এক হরফও জানেন না,—যতগুলি কথা বল ছ তার আদ্যোপান্ত সবই মিথ্যা !”

আমিনা বিফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল “সব মিথ্যা ?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “সমস্ত ! আমি শুধু তোমার চটে উঠবার দক্ষতটা দেখছিলাম ! উঃ, কি ভয়ঙ্কর !”

বিষম সংশয়ান্বিত হইয়া আমিনা বলিল “এতগুলি কথা সমস্তই মিথ্যা ?—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “সমস্ত ! সমস্ত ! সমস্ত ! ‘বলকুল মিথ্যা ! কিন্তু আমি নিজেই ঘোষ স্বীকার করছি, আর রাগ করা চলবে না তোমার ।—”

আর যায় কোথা ! এতক্ষণ আমিনা যদিবা রাগ করিতে ভুলিয়াছিল, এবার তুলিল না । সহ্যের স্বাক্ষর নাড়িয়া বলিল “নাঃ রাগ করা চলবে না ।—খুশী হয়ে তোমার বন্ধুস্ব দেবে নয় ? আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার পা দুটো ধরে ঠক ঠক করে পায়ে মাথা ঠুকি—”

আহমদ-সাহেব কোন উত্তর দিলেন না । মুছ-মুছ হাসিতে হাসিতে চট করিয়া উঠিয়া গিয়া ছায়ারর সেই ছিটকানটা বন্ধ করিয়া দিয়া, নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া, টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজবানি তুলিয়া লইয়া, কোচে গিয়া বসিলেন । তারপর সুবোধ বালকটির মত তাগাতেই মনঃসংযোগ করিলেন ।

আমিনা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া ঠাঁহার পানে চাহিয়া রহিল । কিছুক্ষণ পরে আহমদ-সাহেব অতি সম্ভরণে খাড় কিরাইয়া আড় চোখে তাহার পানে চাহিলেন, চোখোচোখি হইতেই সমাধিমুখা আমিনার আভ্যন্তরিক



শাস্তির কি যে ব্যাঘাত সংঘটিত হইল, বলা কঠিন, হঠাৎ সে উচ্চ উচ্ছ্বাসে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল! আহমদ-সাহেব ব্যস্ত ভাবে দাড়ি চুলকাইয়া থক থক করিয়া কাশিয়া হাসি সামলাইয়া লইয়া পুনশ্চ কাগজে চোখ দিলেন। আমিনা হাসিতে হাসিতে বলিল “অবাক্ করেছ তুমি! উঃ, ঠোঁটে কি মিথো কথাটি যোগানই আছে? আশ্চর্য্য বটে! আমার হো একটা মিথো কথা বলতে গেলে কি কোথাও একটা জিনিস চুরি করতে গেলে, আগে হাসি পায়। ওবেলা দিদির বোটো থেকে একটু জরদা চুরি করতে গিয়ে—” বলিয়াই হঠাৎ সে থামিল, ঢোক গিলিয়া, একটু থত মত পাইয়া বলিল “জরদা খেলে দিদিকে বেশ দেখায়, না?—”

আহমদ-সাহেব কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সন্ধিগ্ধভাবে বলিলেন “হঁ, খেতে পরেছ বুঝি? দ্যাখো ঠাট্টা-তামাসা নয়,—ডাঁড়া দিখ, খাঁটি নিকোটিন্ ওসবে আছে! বুকে পেও—”

আমিনার মুখ শুকাইয়া গেল। কোনমতে আশ্বদমন করিয়া বলিল “হ্যা, খেতে পরব কেন? তাই বুঝি পায়! ঐ ইনেব বলাছল কিনা,—তাই—” বলিয়াই বিচলিত ভাবে সে কথা উল্টাইয়া লইয়া—চকল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাফিয়া,—ফশু করিয়া বইখানা টানিয়া হইয়া, পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বলিল “দ্যাখো এতে একটা চমৎকার গল্প পড়্ছিলাম, বেশ গল্পটি, আচ্ছা বল দেখি লোকে মদ খায় কেন?”

আহমদ-সাহেব কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন “মাতাল হবার জন্য—”

আমিনা উৎসুকভাবে বলিল “আচ্ছা মাতাল হয় কি করে বল দেখি? আমি কক্ষণো মাতাল দেখি নি, একদিন মাতাল দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়—”

আহমদ-সাহেব পরম নিলিপ্ত ভাবে গৌফ মুছাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন “থাব, একদিন মদ হব মাতাল—”

নিদারুণ অলজ্ঞার স্বরে আমিনা বলিল “তুমি! ওহ্!—” বলিয়াই বইখানা চোখের সামনে তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মিনিট কয় পরে, পুনরায় বই হইতে চোখ তুলিয়া, কৌতূহলপূর্ণ স্বরে বলিল “আচ্ছা সত্যি বলতো—মাতাল হয়ে কি করে?—”

আহমদ-সাহেব উদাস-গম্ভীর কণ্ঠে একটানা ছন্দে বলিয়া চলিলেন “হাসে, কাঁদে, নাচে, লাফায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি করে। আবার সময় বিশেষে, অত্যন্ত প্রিয়তম ব্যক্তিটির জীবন সংহার করেও বসে!—”

আমিনা সভয়ে বলিল “ওরে বাবা!—” তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি একটা কথা ভাবিয়া গেল। শেষে স্বামীর মুখপানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাফিয়া কি যেন লক্ষ্য করিতে করিতে—সঙ্গে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আহমদ-সাহেব কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া, প্রাণপণে মৈথ্য বজায় রাখিয়া, অগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন “হাসিটার অর্থঃ”

আমিনা কৌতুক-স্থিতমুখে বলিল “সত্যি,—ভাবছি, যদি কোনদিন তুমি সত্যি-সত্যি মদ খেয়ে মাতাল হও, জ্ঞান হলে আমি কি করি?”—সে আবার হাসিয়া উঠিল।

আহমদ-সাহেব কাগজ ফেলিয়া, এনিকে ওদিকে নসোর কোঁটাটা খুঁজিতে খুঁজিতে, গম্ভীরমুখে বলিলেন “বিষয়টা চিন্তনীয় বটে! একদিন Experiment করে দেখতে হবে।—”

আমিনা বলিল, “এই থাং নাকি?—”

আহমদ-সাহেব বেন আকাশ হইতে পড়িলেন! কপালে চোখ তুলিয়া, মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন “বাঃ, তা, না হ’লে চলবে কেন?—”

আমিনা বিস্মিত হইয়া বলিল “সত্যি খাবে?”

শয্যার উপর হইতে নস্যের কৌটাটি তুলিয়া প্রাণপণে এক টিপ্ নস্য টানিয়া, একটু কাশিয়া ক্রমালে মুখ মুছিয়া,—বইয়ের শেলফের দিকে চাহিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “There is no doubt about it. আমি ভোঁ খাবই, আর সেই সঙ্গে খাওয়াব আবলু মিঞাকে!—”

চমকিয়া আমিনা বলিল “কি? দাদাকে-সুদ্ধ খাওয়াবে!—” পরক্ষণেই ঘোরতর অবিবাহের সহিত সজোরে বলিল “হুঁ! দাদা তো আগে খেয়েছে! সে তোমার মত নয় তো!—”

আহমদ-সাহেব ততোধিক জোরে বলিলেন “এই কথা! দেখো তবে!—Through fire and water. এই কাণ মলে কসম্ খাচ্ছি, আবলুকে মদ খাওয়াবো, খাওয়াবো, খাওয়াবো! নিভেও আলবৎ খাব!—তখন দেখো মজা! তারপর দুই ঘরে দুই মাতাল নিয়ে তোমরা দুকনে কি কর সে আমার দেখতে হবে.”

ভয়ে আমিনার প্রাণ ধুক্ ধুক্ কারতে লাগিল, কিন্তু বাহরে আত্মপ্রকাশ না করিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিল “দ্যাখো, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না—”

আহমদ-সাহেব সোজা হইয়া কিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধত্ব করিয়া বলিলেন “এই নাও! আমি কি ভাল লাগ্‌বার জন্যে বলছি? না, সত্যি সত্যি-ই ঠাট্টা করছি!—আমি আসল কথাটা বলছি?—”

এবার সত্যি আমিনার মাথা গরম হইয়া উঠিল—হঠাৎ, বাধা দিয়া উত্তেজনার সহিত বলিল “খেও, খেও, খেও! তোমার যা খুশী তাই কোরো। কিন্তু ঘর ঢুকতে পাবে না তা ব’লে রাখছি,—আমি সেদিন ঘরে থিল দিয়ে একলা থাকব!—”

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া, আহমদ সাহেব পরম মনোযোগ সহকারে পুনশ্চ নম্র টানিয়া,—সুগভীর কণ্ঠে বলিলেন “থিল দিয়ে থাকতে পারো, থেকো, মোক্ষ এই জানালার পাশে ঐ নারকেল গাছে যিনি বসবাস করছেন,—মাঝে মাঝে পদাঘাতে বিনি নারকেল বালতোগুলো ভেঙ্গে সশব্দে মাটিতে ফেলে দেন, জানো তো তাঁর কথা—তিনি রাখে ঐ জানালা থেকে উঁকি দিয়ে তোমায় একলা দেখে যদি, আলাপ-পরিচয় করতে ঘরে ঢোকেন—”

দিনে দুপুরের রৌদ্রালোকে, এ কথাগুলো বিশেষ কার্যকরী হইল না। আমিনা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “দ্যাখো ভাল হবে না বলছি—”

“আঃ শোন না, সত্যি কথাই বলছি—ঠাট্টা নয়, এই—সত্যি যদি রাগ করে কোনদিন ঘরে থিল দিয়ে একলা তুমি থাক, তা হ’লে মনে রেখো, উনি সে দিন নিশ্চয়ই—” আহমদ সাহেবের মুখের কথা মুখেই রহিল, বাতির হইতে রক্তম উয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল “হজুর বেমারী আয়া—ভরুরী ডাক—”

আহমদ-সাহেব বিছানায় শুইয়া পড়িতে যাইতেছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “কাঁহা সে আয়া?—”

রক্তম উত্তর দিল “হোগলি—রায় বাহাদুর সাবকো মোকাম-সে,—হাওয়াগাড়ী লায়, আপকো যানে হোগা, চিঠি ছায়—”

“মাটা করেছে রে? আহা. এমন ভাট আসরে,—বজ্রাঘাত! বলিতে বলিতে আহমদ-সাহেব আসিয়া উয়ারের ছিটকিনী খুলিয়া ফেলিলেন। রক্তমের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িয়া, ব্যস্তভাবে বলিলেন “উনু কো বৈঠে কুর্সি দে দেও, ওঁর মেরা সেলাম দেকে বোল দেও, সা’ব পোষাক পিন্কে জল্দি আঁতে হে—”

রস্তম চলিয়া গেল। আহমদ-সাহেব ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে বাছিয়া খুঁজিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে একখানা বই টানিয়া লইয়া—তাড়াতাড়ি পাতা উন্টাইয়া নির্ঘণ্ট-পত্রে খুঁজিয়া কি একটা অধ্যায় বাহির করিয়া মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে পড়িলেন। তারপর একটু ভাবিয়া বইখানা রাখিয়া বলিলেন “আমিনা ওঠো, ওঠো, ঐ আলমারীটা খুলে ডিক্যাপিটার ফিক্যাপিটার সমস্ত যন্ত্রগুলো বের করে দাও দেখি—”

আমিনা মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া তখন বিহানায় শুইয়া পড়িয়াছে, সে কোন উত্তর দিল না।

আহমদ-সাহেব তাহার বাহুল্য পরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন “শুন্ছ, ওঠো, বড় তাড়াতাড়ি। লেডি ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছেন, লোক ছুটে এসেছে, প্রহতির অবস্থা মূর্খ, এখন কথা কইবার সময় নাই,—ওঠো, যন্ত্রগুলো বাগে ঠিক করে দাও, আমি পোষাক পরতে চল্লম।”

আমিনার রাগ যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছিল, কিন্তু তবু সে এই ব্যবহারে এখন একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। মেঘের উপর ফিকারোদ বিকাশের ন্যায় একটুখানি ক্ষীণ হাস্যভরা হাস তাহার ঠোঁটের উপর ফুটিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের বলিল “আর মদের ডিক্যাপিটার-টাও বহি করে দিতে হবে না?”

আমিনার গালে একটি মুহূর্ত্তকাল চাপেটাষাত করিয়া শ্মিতহাসো আহমদ-সাহেব বলিলেন “ও কথার জবাব ফিরে এসে দেব, এখন সময় নাই।” তারপর দ্রুতপদে তিনি পোষাক-কামরায় চলিয়া গেলেন।

আমিনা নিঃশব্দে উঠিয়া যন্ত্রের ব্যাগ শুছাইতে বাসল। কোন্ ক্ষেত্রে কি কি জিনিসের প্রয়োজন, সেগুলো সে স্বামীর সহায়তায় শিখিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে আহমদ-সাহেবের কোন জিনিস ভুল হইলেও, আমিনার হইত না। সেইজন্য বিশেষরকম ঝগড়া-ঝাটি কিছু হইলে আমিনা যখন নিশ্চিন্তরূপে গা-ঢাকা দিত, তখন চিকিৎসক মহাশয় বড়ই বিদ্রোহিত পড়িতেন, তবে অল্প-স্বল্প ঝগড়া-ঝাটি থাকলে, এরকম অবস্থায় আমিনা সেটা সহজেই চাপা দিয়া ফেলিত—কারণ স্বামী ঘরের মধ্যে সামনে বসিয়া থাকিলে আমিনা নির্দয়-বিদ্রোহিতা করিতে পারে, কিন্তু তিনি যখন বিশ্রামের স্বচ্ছন্দ্য বলিদান দিয়া, কঠোর-দায়িত্বের পথে, তরুণ কর্তব্যপালনে যাত্রা করিতেন,—তখন স্বামীর উপর সহানুভূতিতে এবং কি একটা অজ্ঞাত আগ্রহে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তারপর—যতক্ষণ না স্বামী, শ্রমক্রান্ত দেহে, সাকল্যের আনন্দ-জ্যোতিঃ উজ্জ্বল দৃষ্টি লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেন,—ততক্ষণ তাহার স্বস্তি থাকিত না। কলহ বিবাদ থাকিলে, অবশ্য, এ সময় হঠাৎ সামনে আসিতে আমিনার ভারী লজ্জা হইত, তাই সামনে দেখা দিতে পারিত না, কিন্তু এই সময়টির জন্য, আড়ালে তাহার একান্ত উৎসুক চক্ষু দুইটি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকিত।

পোষাক পরিয়া এ ঘরে ঢুকিয়া আহমদ-সাহেব দেখিলেন যন্ত্রের ব্যাগটি শুছাইয়া কোলে লইয়া, আমিনা একটা সোফায় বসিয়া, শুষ্কভাবে কি ভাবিতেছে। তিনি নিবটহ হইতেই আমিনা ব্যাগটি খুলিয়া সামনে ধরিল, জিনিস-গুলার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন “ঠিক হয়েছে সব, আর কিছু চাই না।—”

তারপর আহমদ-সাহেব ব্যাগটি হাতে লইয়া গ্রন্থানোদ্যত হইয়া ছয়ারের কাছে সহসা দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া সপরিহাসে বলিলেন “চটে অভিশাপ দিও না, মেহেরবাগী পূর্বক কল্যাণ প্রার্থনা কর, যেন নির্ঝরে কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসি, বুঝ্গে”

আমিনা কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু স্নান হাস হাসিল। সঙ্কট-পীড়িত রায় বাহাদুর-গৃহের বিবাদ-কলন-স্বৃতি তাহার সরল কোমল-কিশোর মনটিকে কেমন একটা সমবেদনা-ভারে সঞ্চার করিয়া খুলিয়াছিল, স্বামীর পরিহাসের উত্তরে—এখন আমিনা কথা কহিতে পারিল না।

রাত্রি সাড়ে আটটার পর আহমদ-সাহেব কল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দাওয়াই-খানার অনেকগুলি ঐশ্বর্য-প্রার্থী জমা হইয়া বসিয়াছিল, পোষাক বদলাইয়া হাতপা ধুইয়া তাড়াতাড়ি রাত্রে আর শেষ করিয়া, তাহাদের বথোচিত বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। সমস্ত কাজ শুছাইয়া ডিম্পেন্সারী হইতে উঠিতে তাহার রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, শয়নকক্ষে আসিয়াই জামা খুলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আজ সমস্ত দিনে একবারও তিনি শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিতে পান নাই, তার উপর গুরুতর পরিশ্রমে শরীর অত্যন্তই শ্রান্তি অলস বোধ হইতেছিল। কাজেই আর বসিতে পাড়িলেন না।

আমিনা বোধহয় নিকটেই কোথা অপেক্ষা করিতেছিল, মুহূর্ত্ত পরেই সে বাগড়াবে ঘরে ঢুকিল। তাহার গালে তখন প্রচুর পরিমাণে পান ঠাসা ছিল, কাবেই প্রথমটা সে কথা কহিতে পারিল না একটা বেতের চেয়ার টানিয়া সামনে আসিয়া বসিয়া—টুকটুক পাতলা ঠোট্ হুখানি কষ্টেই একটু ফাঁক করিয়া—সাবধানে চিবুকটা উচু করিয়া অস্পষ্ট ভাবে বলিল “সেখানকার খবর কি বল তো ? তোমার রোগীটি কেমন আছে ?”

একটু হাসিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “খবর ভাল। তুমি নিজে হাতে সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছ, রোগী সুস্থ হচ্ছে কি বাকী থাকে !—

আমিনা আগ্রহের সহিত বলিল “কি ছেলে হোল ? থোকা ?”

আমী উত্তর দিলেন “না খুকি। বেশ সুন্দর ছুটপুট শিশু। তবে মা-টি-অত্যন্ত ছেলে মানুষ কি না তাই কষ্টটা কিছু বেশী পেয়েছেন।—নাও মশারীটা ফেলে, শুয়ে পড়, ভারী ঘুম পেয়েছে আমার—”

টোক গিলিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ সংজ্ঞারে শিহরিয়া—শরীর ঝাঁকাইয়া—আমিনা চেয়ার ছাড়িয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, তারপর বিনাবাকো উর্দ্ধ্বাশ্রমে বাহিরের দিকে ছুটিয়া পলাইল।

আহমদ-সাহেব অর্থাৎ কিছু ব্যক্তি পারিলেন না অবাক হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট ক্রমে পনের মিনিট কাটিল, আমিনার দেখা নাই। শ্রান্ত আহমদ-সাহেবের অত্যন্তই অবসাদ বোধ হইতেছিল, তিনি উঠিয়া আর আমিনার খোঁজ লইলেন না। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন সে নিশ্চয় পশ্চিমমহলে গিয়াছে। তিনি ক্রান্ত চক্ষু মুদিয়া নিদ্রার চেষ্টায় মন দিলেন।

কণ পরেই দুয়ারের কাছে জুতার শব্দ হইল। আহমদ-সাহেব চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবলু-সাহেব বাহির হইতে ডাকিলেন “আহমদ, আছ, জী—”

আহমদ-সাহেব উত্তর দিলেন “আছি ঘরে এস—” ঘরে ঢুকিয়া,—বাগ চকল দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিয়া আবলু-সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন “আমিনা ঘরে নাই ! তাহ’লে এরা দুটোতে কোথা গেল এখন ? পশ্চিমমহলের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে, উত্তর-মহলেরও দুয়ার বন্ধ, এরা তাহ’লে গেল কোথা ?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “সে কি ? হুজনেই গেছে ? তাহলে দ্যাখো পোষাক কামরার ঢুকেছে বোধহয়।”

আবলু সাহেব বলিলেন “না, না,—আমি সব ঘর খুঁজ এসেছি।—বারেণ্ডায় নাই, কোথাও নাই।

আহমদ-সাহেব একটু রহস্যের সুরে বলিলেন “তবে কি হুজনের ডানা টানা বেরুলো নাকি—” বলিতে বলিতে তিনি শস্যর উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন “চল, একবার সন্ধান করে দেখা যাক কোথায় উড়ল হুজনে—”

আবলু সাহেব একটু বিরক্তভাবে বলিলেন “না, না, ঠাট্টা নয়। দ্যাখ দেখি অন্যায়, রাত হুপুে কোথায় হুজনে ছটোপাটী করতে বেরুল, এতে দিচ্ ধরে না ?”

আলোক লইয়া বাহিরে আসিয়া দুজনে চারিদিক খুঁজিলেন, কোথাও কাহারও সন্ধান পাইলেন না। এবার আহমদ-সাহেবেরও ক্রয়গল রীতিমত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন “তবে কি এরা পশ্চিম মহলের তেতলার ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে?—”

আবুল-সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন “না না, আমি ওমহলে দিদির কাছে ছিলুম, একটু আগে আমি ওমহল থেকে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে ও-দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল, তখন এরা দুজনে এখানে বারেগার ছিল।—তারপর আমি খানকতক চিঠি লিখতে বসেছিলুম, একটু পরে ইনেব গিয়ে দ্বিজাসা করলে, মশারীটা এখনই ফেলতে হবে কি না, আমি বারপ করলুম, সেও বাইরে চলে এল, বাস আর দেখা নাই।”

কণেক নীরব থাকিয়া আহমদ-সাহেব চিন্তিতভাবে বলিলেন “দক্ষিণমহলের ছাদের চাবি খুলে সেইখানে যাব নি তো?—গুণে ঘাট নাই, চলতো আলোটা নিয়ে, একবার দেখে আসা যাক।”

বারেগার পাশে সিঁড়ি দিয়া, আলোক হাতে দুইজনে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, ছাদের দুয়ারের চাবি খোলা! আবুল সাগ্রহে বলিলেন “এই যে!”—তারপর দ্রুত অগ্রসর হইয়া দ্রুত কণ্ঠে ডাকিলেন “আমিনা—”

ছাদ হইতে কণবশের উত্তর আসিল “জী—”

তিনলক্ষে সিঁড়ি পার হইয়া দুইজনে ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন একটা কার্পেটের গালিচার উপর হইটা বালিশ মাথায় দিয়া আমিনা ও ইনেব নিঝুম ভাবে পড়িয়া আছে।

নিকটে আসিয়া আবুল বলিলেন “এখানে এমন করে শুয়ে কেন?”

দুই জনের কেহই কোন উত্তর দিল না। ইনেব মুখের উপর ঘোমটা-টা প্রচুর পরিমাণে টানিয়া, খুব ভড়সক হইয়া শুইল, আর আমিনা বালিশের উপর মুখটা প্রাণপণে গুঁজিয়া নিশ্চন্দ হইয়া রহিল।—

আহমদ-সাহেব তাহার মাথাটা ধরিয়া সোজা করিয়া মুখের সামনে আলোটা জ্বলিয়া ধরিয়া দীরভাবে বলিলেন “কি হয়েছে বল দেখি তোমাদের; সত্যি করে বল, কিছু অসুখ করছে?”

মুখের উপর হাত আড়াল করিয়া আমিনা অশ্রুট স্বরে বলিল “হাঁ বড় অসুখ করছে?”

দুই জনেই সমশ্বরে প্রশ্ন করিলেন “কি হচ্ছে?—”

আমিনা আর উত্তর দেয় না। উপর্যুপরি প্রশ্নপুষ্ট হইয়া অবশেষে নিঃশব্দ স্বরে বলিল “বড্ড বুক ধড়্-কড়্ করছে আর মাথা ঘুরছে,—আমাদের।”

এ বংশে কস্মিনকালে কাহারও মূর্ছার ব্যারাম নাই। আর থাকিলেও—এমন ভাবে দুইজনেই যে এক সময়ে সে ব্যাধির পূর্বরূপ আক্রমণে আক্রান্ত হইবে, এমন কোন কথা নাই! আহমদ-সাহেব সংশয়-উৎকণ্ঠিত-চিন্তে দুই জনেরই ধমনী-গতি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মাথা ও কপাল অত্যন্ত গরম! বুঝিলেন যে কোন কারণেই হউক, একটা দ্বারবিক উদ্ভেজনার আঘাতে দুইজনেই নিদারুণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অত্যন্ত কোমলভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন “কিছু ভয় পেয়েছ কি তোমরা? সত্যি বল দেখি”

দুই জনেই ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই বেশ একটু বিচলিত বোধ হইল। আহমদ-সাহেব দেখিলেন দু জনেরই কপাল দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে।—

একটু ভাবিয়া তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন “ঠিক করে বল দেখি, তোমরা কিছু খেয়েছা কি ?—”

বলা বাহুল্য, আমিনা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িল—‘না ।’ কিন্তু ইনেনব স-সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আহমদ-সাহেবের সন্দেহ দূত্বের হইল, পরম আশ্বাসের স্বরে অতি স্নেহমূল্যভাবে তিনি বলিলেন “বলুন তো বিবি-সাহেব, আপনি সত্যি কথা বলুন তো, কোন ভয় নেই আপনাদের, কেউ কোন কথা বলবে না, আপনি ঠিক করে বলুন—কিছু খেয়েছেন আপনারা, নয় ?—হঁ, বলুন তো কি খেয়েছেন ? বলুন, তাতে বজ্জা নেই—আচ্ছা আবুল, জিজ্ঞাসা কর তো ভাই—উনি কি বলেন—”

ইনেনবের সামনে খুঁকিয়া আবুল বলিলেন “বল না কি বলছ, কি খেয়েছ তোমরা ?—”

অশ্রুট স্বরে সত্যে ইনেনব বলিল “জরদা ।”

আবুল-সাহেব বলিলেন “জরদা ! অঃ ! ওরে আহম, জরদা খাওয়া হয়েছে !—” পরক্ষণে দ্রব উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন “বেশ হয়েছে ! আচ্ছা হয়েছে ! থাক দুজনে এই ছাদে পড়ে ! জরদা খাওয়া ! ওঃ, তারপর কাল মদ খাওয়া হবে, পরশু গাঁজার কল্কে পরদা হবে,”

সহায়ত্ব-করণ কণ্ঠে আহমদ-সাহেব বলিলেন “আহা থাম, থাম—এখন কিছু বলিস্ না। জরদার তেজে ওরা যে কতখানি জখম হয়েছে, সে ওদের অন্তরাস্থ্যই টের পেয়েছে আর কিছু বলতে হবে না ।—”

ক্লান্তভাবে আবুল বলিলেন “কি বলিস্ বল দেখি ভাই—সাধে রাগ হয় ! এই উপুর রাষ্ট্রে, জরদা খেয়ে ছাদে এসে পড়েছে, তোতে আমাতে দুজনেই যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা হলে ষ্ট্রুপাউ ডটো থাকতো সারারাত্রি এই খোলা যায়গায় হিমে পড়ে ! তারপর ! এমন রাগ হচ্ছে আমার, হচ্ছে করছে গলা টিপে ছটোকে ছাদ থেকে টপু টপু করে ফেলে দিই—”

বাধা দিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “যথেষ্ট সুবিচার হয়েছে আর নয়। আমার ঘরে শেল্ফের উপর তাকে অভিকলোনের শিশিটা আছে, নিয়ে আয়। আর একটু জল আর একখানা পাখা, হাঁ আর পোষাক কামরার আলনায় শালটা আছে আমার, সেটাও আনিস, এদের পাগুলো বড় বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ।”

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া আবুল দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন। ক্লান্তভাবে আমিনার মন তখন পরিপূর্ণ, কাজেই স্বামীর হাতখানি টানিয়া নিজের ঘম্মাক্ত ললাটে চাপিয়া ধরিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে, একটু অশ্রুযোগের স্বরে বলিল “তুলি নিজে এসেছি বেশ করেছি, দাদাকে স্নান ডেকে আনলে কেন বল দেখি ? দ্যাখো দেখি এখন দাদা কত রাগ করছে—এর পর ইনেনব বেচারীকে হয় তো আরও বকুনি দেবে—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “আমি আবলুকে ডাকি নি, আমি তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। আবলু ঠিক খোজবার জন্যে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ক্রমে আমার কাছে এসে হাজির ! তা তোমরা জরদা খেয়েছিলে, বেশ করেছিলে, ওপরে ছুটে এলে কেন ?”

আমিনা বলিল “হ্যাঁ ! তারপর সেইখানে টাটকা টাটকা ধরা পরে তোমাদের কাছে আরো জল হই আর কি ! এতেই রক্ষা নাই !—দ্যাখো তুমি যেন আর রসান দিও না, তোমার পায়ে পড়ছে, এবার থেকে যা বলবে সব শুনবে, দাদাকে থামাও—”

একটু হাসিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “আচ্ছা থাম, ওকে মজা দেখাচ্ছি ।”

সিঁড়িতে আবলুর পদশব্দ পাইয়া, আমিনা স্বামীর হাতটি সরাইয়া দিল। আবলু নিকটে আসিয়া জলে অ-ডি-কলোন ঢালিয়া ছুজনের মাথায় দিলেন। আহমদ-সাহেব পাখাটা তুলিয়া সজোরে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন “শালটা ছুজনের পায়ে ঢাকা দিয়ে দে।”

আবলু-সাহেব তথাকরণে ব্যাপ্ত হইতেই, আহমদ-সাহেব হঠাৎ মহাব্যস্তভাবে বলিলেন “এর পা গরম হয়ে এসেছে, দ্যাখতো দ্যাখতো ঠুঁর পা কি এখনো তেমন ঠাণ্ডা আছে—”

ইনেব সসঙ্কোচে পা গুটাইতে যাইতেছিল, আবলু বিরক্তভাবে বলিলেন “আঃ থাম—না’—” তারপর পায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন “নাঃ এখনো বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে।”

আহমদ-সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন “দে তো ভাই খুব জোরে রগড়ে—এখনি গরম হয়ে যাবে।”

সরল চিত্ত আবলু-সাহেব দ্বিধাহীন চিত্তে চিকিৎসক মহাশয়ের সত্বপদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। আহমদ-সাহেব আড় চোখে আমিনার পানে চাহিয়া একটু ইঙ্গিতসূচক কটাক্ষ হানিয়া অতি নরম স্বরে বলিলেন “আহা এই সময় এক টিপ নসা হ’লে বড় সুবিধেই হোত! আচ্ছা আবলু, তুই নীচে গিয়েছিলি যখন, তখন আমার নস্যের কোটা-টা ভুলে এলি কি বলে?”

আবলু-সাহেব সরল ভাবে উত্তর দিলেন “নস্যের কোটার কথা তুই তো আমার বলে দিস্ নি—”

বাধা দিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “বলে আবার দেব কি? একটু হিসেব করে কাষ করতে হয়! বি, এল পাশ্চ কল্লেই কি হয় হে!—”

একটু হাসিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন “তা বটে! কিন্তু তোমার নস্যের কোটা-টাও যে ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে ধরতে হবে, ইউনিভার্সিটি সে কথা আমার শেখায় নি—।”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা শেখাবে কেন! ইউনিভার্সিটি তোমায় শুধু শিখিয়ে দিয়েছে যে তোমায়—” বলিয়াই ইনেবের দিকে চাহিয়া দস্তরমত অভিমানপূর্ণ অহুযোগের স্বরে বলিলেন “বুঝলেন্ বিবিসাহেব, আবলুর প্রাণের বত কিছু ভক্তিবালবাসা সব আপনার ঐ ত্রীচরণে সমর্পণ কর্তেই ইউনিভার্সিটি বলে দিয়েছে! আর কারুর জন্যে কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখতে বলে নি—আমার এত ভালবাসার নস্যের কোটার জন্যও—না!” বিব্রত হইয়া আবলু-সাহেব বলিলেন দ্যাখ্ অহু! এবার ঠাশ্ করে এক চড় বসিয়ে দেব তোমার গালে—”

অনিপুণ অভিনেতার মত অতি করুণ কোমল কণ্ঠে, আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা দেবে বৈ কি! তোমায় এমনই কি-দিনই পড়েছে, বল! তুমি এখন একজন!”—সেবার সেয়া সেবা—হজরৎ বিবি সাহেবের চরণ সেবার অধিকারী এখন তুমি! আহা!—”

আমিনা আর সামলাইতে পারিল না। বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত ইনেব ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া পা টানিয়া লইয়া ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। আহমদ-সাহেব বলিলেন “আহা আপনি উঠবেন না, আপনি শুয়ে থাকুন, কেমন মাথাটা এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে তো!”

মাথার অবস্থা ভাল কি মন্দ, ইনেব নিজে সেটা তখন সম্পূর্ণরূপে অহুত্ব করিতে যদিও অক্ষম, কিন্তু লজ্জার খাতিরে ষাড় নাড়িয়া জানাইল “হী ভাল।”

ইনেবকে উঠিতে দেখিয়া দায়ে পড়িয়া আমিনাও উঠিল। আহমদ-সাহেব বলিলেন “তোমরা এবার নীচে যেতে পারবে?”

আমিনা ও ইনেব দুইজনেই মুখ চাওয়া-চাঙ্গি করিয়া স্বীকৃত হইল। আবলু ও আহমদ-সাহেবের সাহায্যে উভয়ে ঘূর্ণ অবসর দেহে কোনক্রমে নীচে নামিয়া আসিল।

সে রাত্রির মত সেইখানেই সকলে নিশ্চর হইলেন। আবলু-সাহেবের তিরস্কারের পালাটা যদিও সেইখানেই শেষ হইল, কিন্তু আমিনা ও ইনেব লজ্জায় ও সঙ্কোচে আবু তু' শব্দ উচ্চারণ করিল না।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

## অক্ষম ।

—:~:—

( ইংরাজী হইতে )

ছলছল চোখে কহিল ক্ষুদ্র তারা  
মোর প্রতি কারো নাহি বুঝি হয় মমতা  
ধরার আঁধার একটু হরিতে পারি  
আমার বক্ষে নাহি যে তেমন ক্ষমতা ।  
রজনী কহিল “বাছা মোর” বুকে টানি  
“চান্দ্র-জগতে তুই যে রে প্রাণ-অংশ  
জানিস্ নে তুই তোর দাম কতখানি  
তুই বিনা হবে সৌরজগৎ ধ্বংস ।”

শরতের মেঘ দুর্বল স্রিয়মান  
কহিল কাঁদিয়া কি হবে ব্যর্থ জীবনে,  
কয়টি বিন্দু সলিলে আমার প্রাণ  
নিঃসার হীন নিঃশ্বাসে কি হবে ভুবনে ?  
কহিল কানন “বাথ নহ ত ভাই  
তুমি বিনা মোর সংসার হবে খিন্ন  
শীতের শিশির বরিষার ধারা নাই  
কলি-দলে আজ কে ফুটায় জেমা ভিন্ন ?”



ক্ষুদ্র শিশুটি ভাবে জননীর মত  
 সংসার-তরী-ক্ষেপণি পারিবে ধরিতে  
 বলে মার কোলে কাকুতি করিয়া কত  
 “আমি যে হায় মা পারি না কিছুই করিতে।”  
 চুমা দিয়া মাতা কহে তারে বুকে টানি’  
 “তুই বিনা হবে নিখিলের খেয়া বন্ধ  
 কেমনে জানিবি তোর দাম কতখানি  
 তুই বিনা হবে সংসারখানি অন্ধ।”

শ্রীকালিদাস যায়।

## সাত্ত্বিক আহার।

গুরু। ‘আজি এ ভারত লজ্জিত হে, হীনতাপক্ষে মজ্জিত হে।’ বলিতে পার ইহার কারণ কি ? কারণ আর কিছুই না। ভারতবাসী আজ ধর্মভ্রষ্ট। হীন অহুসারের মোহে সে আজ নানাবিধ অখাদ্য খাইয়া দেহে ও মনে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভ্রভেদী কীর্তিপতাকা বহন করিবার শক্তি সে কোথা হইতে পাইবে ? এখন বুঝিয়াছ—কেন অখাদ্য খাইতে নিষেধ করি।

শিষ্য। গুরুদেব, এ নিষেধ অনাবশ্যক। ইট, পাথর, টিন প্রভৃতিতে আমার কোনকালেই রুচি নাই। শুধু আমার কেন ? কয়েকজন স্তন্যপায়ী শিশু এবং দু’একজন উন্মাদ বাতীত কাহারও ঐসকল দ্রব্যে আস্থা দেখি না। আমি বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা, গুজর, পাজাব সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, মানুষের যাহা খাদ্য মানুষ তাহাই খাইয়া থাকে।

গু। অখাদ্য বলিলে নিকৃষ্ট খাদ্যকেই বুঝিতে হইবে।

শি। নিকৃষ্ট খাদ্য বর্জনীয় একথা সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করি, এবং এই কারণে সাগু বা বালি ভ্রমেও স্পর্শ করি না।

গু। আমি সাগু, বালির কথা বলিতেছি না আমি—

শি। বুঝিয়াছি, আপনি চালকুমড়া, কাঁচাপেঁপে, খোড় ইত্যাদিকেই অখাদ্য বলিতে চান। তা, এগুলিকে বিসর্জন দিতে আমার কিছু মাত্র দ্বিধা নাই।

গু। তুমি কুটর্ক করিতেছ। আমি চালকুমড়াকে অখাদ্য বলি নাই। তুমি জান, ভগতের বাবড়ীর পদার্থই খাদ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু যাবতীয় পদার্থই খাদ্য নহে। কোন দ্রব্য খাদ্য কিনা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে শরীরের উপর তাহার ক্রিয়া কিরূপ। শাস্ত্রে আছে অন্নময় শ্রোণ অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের প্রকৃতি অনুসারে

ভোক্তার আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকাবোজী কুমি মেরুদণ্ডহীন, চর্কল, ও ধরণীর অতি মলিন পক্ষসাগরে চিরনিমজ্জমান, আর নীর-দনীর প্রয়াসী চাতক চটুল পতংগচালনপটু, স্বচ্ছন্দচারী ও চিরনিমুক্ত নীল বিমানের বার্তাবাহ। জীবজগতের সর্বোচ্চ স্তরের মানবও যদি আজি হঠাৎ ভূমিসংলগ্ন কীটপতঙ্গাদি লেহন করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক শতাব্দী পরে শরীর গঠনে এবং বলবৃদ্ধিতে সে অতি কদর্যা ভেকের অনুরূপ হইয়া পড়িবে। অতএব সদসঙ্গিচারণা স্তনিপুণ বুদ্ধির সাহায্যে তাহাকে এমন খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে যাহা তাহার একমাত্র সাধ্য অনন্ত উন্নতির অনুকূল।

শি। আপনি কিরূপ খাদ্যের বিষয় বলিতেছেন বন্ধুতে পারিলাম না। Hydrogen বা coal gas এ উদয় পুষ্টি করিলে উন্নতি হইতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

শু। তুমি জান মানুষের উন্নতির মূলে তাহার বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যত মার্জিত তাহার উন্নতিও তত অগ্রসর হইবে। সকলেই জানেন চর্কল দেহে সবল মনের অস্তিত্ব অসম্ভব। উৎকট শিরশীড়া বা কর্ণশূল লইয়া স্থির বুদ্ধির কার্য্য করা চূঃসাধ্য টেহাও কাহারও অবদিত নাহি। অতএব যে খাদ্যে শরীর কোনপ্রকার প্লাসি না হয়, বাহ্য সহজপাচ্য, এবং যোগ্যতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, এক কথায় যা সম্বল সম্পন্ন তাহাই প্রকৃষ্ট খাদ্য। সাংখ্যিকার বলেন “সৎ লঘু প্রকাশক মিষ্টমৃগষ্টভুকং চঞ্চল রতঃ। গুরুবলকামবতমঃ—” ইহার অর্থ—সৎ লঘু এবং প্রকাশক। নিজে চঞ্চল এবং অন্যের চাঞ্চল্য বিধায়ক রতঃ। এবং গুরু ও বুদ্ধির আবরণক তমঃ। ইচ্ছাদের মধ্যে সব্বই বাঞ্ছিত।

শি। আপনি কি Sanatogen বা Panopeptenকেই মানবের একমাত্র খাদ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন?

শু। তোমার মহিষিকার ঘটিয়াছে। গোমাসে সম্বৃত Panopeptenকে তুমি পাদ্য বলিতে চাও! তোমার রসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না ইহাই আশ্চর্য্য! উপরোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আমিষ আহার মাত্রই রাসিক। কারণ ভীষ মাত্রই চঞ্চল এবং আচাণ্যরূপ গৃহীত হইলে ভোক্তার শারীরিক ও মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়। সর্ককেই জানেন মাংসানী গধু, বাঘ, শূগল, ভল্লবাদি ভীষণ কত হিংস্র, চঞ্চল ও হুস্তবৃত্ত। অপর দিকে নিরামিষাণী ভীষমাংসেই শাস্ত্রপ্রকৃতি ও নিরীহ, যথা শশক, মেঘ ও গাভী—

শি। ও মহিষ, বরাহ, ঘোটক ও মকট।

শু। কথার উপর কথা কহিও না। পশু পক্ষাদির মাংস রক্তোশুণাঙ্ক পুর্কেই বলিয়াছি। কিন্তু সকল মাংসে রক্তোশুণের মাত্রা সমান নহে। ‘অজ্ঞানেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং’। ইহা হইতে বুঝা যায় রক্তোশুণ রক্তবর্ণ, তমঃ কৃষ্ণ ও সত্ত্ব শুক্লবর্ণ। অতএব যে মাংস যত অধিক রক্তবর্ণ তাহা ততধিক পরিমাণ রক্তোশুণ। এই কারণ, অতিরিক্ত ‘শুক্লরোগমৃগমাংসে পুষ্ট’ ভাতিগণ অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, রক্তহিন্দ্র ও অহিরব্রি হইয়া থাকে। এই সকল জাতি অকারণ-উদ্বেগনার কখনও মেরুপ্রদেশে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, মাটিতে শুভ্র ক্যাটে, আকাশে পাখা নাড়িতে চায়, জলে Submarine এবং স্থলে motor car চালায়, এবং বিষয় হঠাৎ বিষয়াস্তরে লাফালাফি করিয়া জীবনলীলা সমাপন করে, বা আপন আপন শিরচ্ছেদ করিয়া প্রাণে ত্যাগের মাতিয়া উঠে। ইউরোপীয় মহাসমরে একবার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে উন্নত বলিয়া ভ্রম করেন। কিন্তু এ উন্নতি ঐহিক, অবিভজ্যকরাতিশয়যুক্ত ও অবাস্তব। আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। এবং চাঞ্চল্য ভাণ্ডার প্রত্যাবার। বহুবিষয়-বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তিকে সমাহিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সাধনা রাসিক ভাতিগণের অজ্ঞাত। কাক কখন কিরূপ রব করে, এবং ওহার কোন বরের সহিত বিখনিয়নের কোথায়

কতটুকু যোগ আছে, কাক ‘ক্রোধ’ বলিলেই বা কাহার মাথাঘ টাক পড়বে এবং ‘কুরুতং’ বলিলেই বা কাহার গৌরব গজাইবে এই বিষয় বহুবর্ষ ব্যাপী এক নিষ্ঠ গবেষণা, চীন, জাপান, জার্মান বা মার্কিণে প্রত্যাশা করিতে পার? কখনই না।

শি। গুরুদেব বৃষ্টিতে পারিলাম চাঞ্চল্য নিবারণই জীবনের মহাত্মত এবং মানবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য আফিও।

শু। তুমি শব্দবচন বিস্তৃত হইতেছ। পূর্বের যাহা বলিলাম তাহা চইতে বেশ বুঝা যায় আফিও তমোগুণাত্মক, কারণ তাহা ক্রুদ্ধবর্ণ, বুদ্ধির আবরণক এবং শুক্ল...দমে ভারি না হইলেও দামে ভারি। ইহা কখনও প্রকৃষ্ট খাদ্য হইতে পারে না। তবে রাজাসিক অপেক্ষা তামসিক শ্রেয়ঃ। কারণ রুরজোগুণে অনিষ্ট, তমে ইষ্টও নাই অনিষ্টও নাই। কিন্তু রজস্তমোবিক্ষিত সাস্বক আহারই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ইষ্ট। সবগুণাত্মক খাদ্য গুরুবর্ণ, সহজপাচ্য ও জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশক। যথা;—সুত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সন্দেশ ও সফেন আতপ তগুলের অন্ন।

শি। গুরুদেব, বহুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছি। ভবৎকাথিত লঘু পথ্যের একটাও পরিপাক করিতে পারি বাল্যে বোধ হয় না। আমি প্রতাহ প্রাতে দুইটা করিয়া মুরগীর ডিম খাইয়া থাকি। আশীর্বাদ করুন ইহাতেই আপনার সবগুণের বিকাশ হউক।

শু। তগুল অপেক্ষা ডিম সুখপাচ্য ইহা তোমার মুখস্থ কথা। ডিমে কতটা উত্তেজনা হয় তাহার কিছু হিসাব রাখ?

শি। উত্তেজনা ত লক্ষ্য করি নাই। তবে ডিম আশ্বাদ করিলে উহা আশ্বদের প্রবৃত্তি অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া যায় বটে।

শু। তবেই হইল। তোমার রসনার পরিতৃপ্তি হইবে বলিয়া প্রতাহ দুইটা প্রাণী হত্যা করিতে চাও। এইরূপ নিয়মিত হিংসার চর্চায় কি তোমার মানাসিক উন্নাত হইবে?

“সচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।

অসাদগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুৰ্য্যাত্ পাতকং মহৎ।”

শি। শাকেরদ্বারা উদরপূর্তি হইয়া থাকে সত্য। এই পূর্তিই কি আহারের উদ্দেশ্য?

শু। শাকাদরদ্বারা কি কেবল উদরের পূর্তিই হইয়া থাকে? তুমি জান উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক এবং মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাত মৎস্ত মাংসাদি স্পর্শ করেন না বাল্যেই এত বালষ্ঠ ও কশ্মক্ষম।

শি। কাবুলীরাও বালষ্ঠ এবং—

শু। কাবুলীরা শীত প্রধান দেশের লোক। উহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। শাকসবজিই মানবের স্বাভাবিক খাদ্য ইহাই ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যগণের আধুনিক মত। তুমি ইহা বিশ্বাস কর কি না?

শি। অবশ্য বিশ্বাস করিব। তবে বাংলা দেশ ইউরোপ নহে, আমরাও পণ্ডিত নহি। তাই আমাদের শ্রীতিভোজ মাত্রই চপ, কাটলেট, কোর্সী, কারির এত প্রাচুর্য্য।

শু। অথাৎ খাইয়া বাহাদের রুচিবিকার ঘটিয়াছে তাহারাই ঐ সকল গলাধঃকরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাহারা চিরকাল নিরামিষাণী মৎস্ত বা মাংসের আশ্বাদ ও তাঁহাদের হৃদয়জনক।

শি। এ কথা সত্য। পশ্চিমদেশীয় পাচকগণ মৎস্ত স্পর্শ করেন না। কিন্তু শুনিয়াছি উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার মৎস্তের আশ্বাদ পাইলে মৎস্ত চুরি করিয়া খাইতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা বিকৃতরুচির পরিচয়

সন্দেহ নাই। আমার ত কখনও পুঁইশাক চুরি করিয়া থাইতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ পুঁইশাকের স্বাদ আমার অবদিত নহে।

গু। প্রবৃত্তিরেয়া ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা। মাংসাহারে এই বলবতী প্রবৃত্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে উহা পরিহর্জ্য।

শি। এইবার খাড়াখাড়া বিচারের পথ স্বগম হইল। বুকিলাম বরফমিশ্রিত ঘোলের সরবৎ পান করিবার জন্ত প্রাণ আকুল হইলে লক্ষা ও লবণ সহযোগ যাবের ছাতু খাটতে হইবে।

গু। সাংসারিক জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব। এই জন্ত শাস্ত্রে পশুবলির ব্যবস্থা; বলির পশু আহার করিতে পার।

শি। পদধূলি দিন, গুরুদেব। আপনি আমার স্নাতবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। বলির পশু থাইতে পাইলেই চরিতার্থ হই। আর কিছু চাই না। পাঁট, খাসি ছাড়া, অল্প মাংস কয় দিনই বা থাইতে পাই?

গু। কিন্তু তোমরা বৃথামাংস খাও।

শি। মাংস পাইলেই মুখে পূরুয়া দিই গুরুদেব। কণামাত্রও বৃথা হইতে দিই না।

গু। তুমি আশ্বাদ কর, আর না-কর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। স্বয়ং জগন্মাতা যাহাকে খাণ্ডরূপে গ্রহণ করিবেন শুধু তাহারই দেহ সার্থক, অল্প সবই বৃথা। অতএব ছাগল থাইতে ইচ্ছা হইলে তাহাকে দেবতার নিকট বলি দিতে হইবে। দেবোদ্দেশে ছিন্নমুণ্ড ছাগমাংস মহাপ্রসাদ।

শি। মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে মাংস ক্রয় করি, হিংসার ধার ধারি না। কিন্তু ছাগলকে বলির জন্ত প্রস্তুত করিতে হইবে আমাকেই। ইহাতে হিংসার চর্চ্চা হইবে না?

গু। বলি দিয়া তুমি তাহার কল্যাণই কর, হিংসা কর না?

শি। আপনি কি নিজের কল্যাণ কামনা করেন?

গু। নরবলির প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তোমার এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে।

শি। বলি দিলে ছাগের কল্যাণ হয় বটে, কিন্তু আমার কল্যাণ হইল কৈ? মাংস থাইতে ইচ্ছা হইলেই যদি কালীঘাট ছুটাছুটি করিতে হয়, তবে ত জীবন দুর্ভর হইয়া উঠে। কাজ নাই, গুরুদেব, আমি এখন হইতে কুমড়া আর কলাই ডালকে জীবনের সম্বল করিলাম। শুধু তরকারীতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচালক্ষা আর পেঁয়াজ দিয়া খেদ মিটাইব। আর ত কোন উপায় দেখি না।

গু। পেঁয়াজ অত্যন্ত উগ্র, গরম ও অশাস্ত্রীয়। উহা স্পর্শ করিতে পার না। তবে কাঁচালক্ষায় দোষ নাই। কারণ লক্ষার খাণ্ডপদার্থ বীজ স্বেতবর্ণ ও সাহিত্যিক।

শি। গুরো, পেঁয়াজ পর্যাস্ত নিষিদ্ধ হইলে দাসের প্রাণসঙ্কট হইয়া উঠে। গুনিয়াছি ভারতের অর্ধেক লোক কেবল এক বেলা মাত্র আধিতোতক আহার করিতে পায়। আমাকে দেখিতেছি দুই বেলা আধ্যাত্মিক আহার করিয়া গীত্বেই ব্রজে বিলীন হইতে হইবে।

গু। পেঁয়াজ ছাড়া আর কোনও নিরামিষ খাণ্ড কি সংসারে নাই?

শি। অনেক আছে। উল্লসরপত্র, অম্বথমূল, আরও কত কি আছে। কিন্তু সকলের রুচি সমান নহে।

গু। তোমার রুচি দেখিতেছি কেবল পশুমাংসে।

শি। কেবল পশু বলিবেন না, গুরুদেব। মীন, কুর্খ, ভেক, কর্কট, পানকৌরী ইত্যাদি কিছুতেই আহার অকিচি নাই।

শু। তুমি এক কাজ কর। মনু বলিয়াছেন “মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদঃ।” অতএব তুমি অন্য সর্ব্ববিধ মাংসের পরিবর্তে মৎস্য আহার কর কর। মৎস্য নির্দোষ।

শি। গুরুদেব, যদি এতদূর অনুগ্রহ করিলেন ত আর একটু করিতে কৃপণতা করিবেন না। মৎস্যো অনুমতি দিয়াছেন, মৎস্যের Equivalent এ শু দিন।

শু। তুমি চাও কি ?

শি। আমি বলিতেছিলাম ইংরাজী হোটেলের Chicken, Pork ইত্যাদি বড় পছন্দ করি। যদি মৎস্যের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে —

শু। এ কথা আমার কাছে বলিলে তাই রক্ষা। আর কোথাও বলিও না। বলিলে জাতিচ্যুত হইবে।

শি। কেন, গুরুদেব ?

শু। কেন ? নিষিদ্ধ মাংস খাইলে দেহ রুগ্ন হয়। শূকরের মাংসভোজিদিগের মধ্যে ফিতাকুমির প্রকোপ কাহারও অবদিত নহে। আর পোমাংস ভোজনের পরিণাম কুষ্ঠরোগ ইহা হয় ত প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

শি। একবার ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পারিলে হয় ত প্রত্যক্ষ করিতাম। কিন্তু ধর্ম্মলোপ ভরে সমুদ্র যাত্রা করি নাই। যাহা হটক, অখাদ্য খাইয়া যদি রুগ্ন হই, তাহা হইলে ধোপ ও নাপিতের অভাবে, মালিন বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে বা কণ্টকিত শ্মশ্রু কণ্ডুয়নে অতিষ্ঠ হইলেই কি স্বাস্থ্য কিরিয়া পাইব ?

শু। স্বাস্থ্য কিরিয়া পাইবে কি না সে চিন্তা সনাজের নহে। তুমি নিঃকর্ম্মদোষে শরীরপাত করিতে উদ্যত হইলে সমাজ তোমাকে তাগ করিবেন। তোমার উপর সনাজের এই দণ্ড।

শি। সুরাপান করিলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু সুরাপানও কখনও জাতিচ্যুত হয় না।

শু। সুরায় দোষ নাই “দ্রবদ্রবাসাহচর্য্যাং।”

শি। রুগ্নের প্রতি সমাজের এত আক্রোশ কেন ?

শু। আক্রোশ হইবারই কথা। রুগ্ন ব্যক্তি সমাজে বাস করিবার যোগ্য নহে। কারণ সামাজিক সমন্বতানে তাহার সামর্থ্য নাই।

শি। এ কথা সত্য। আপনি সে দিন মজুমদার গৃহে ছানা, দধি, ক্ষীর ও কাঁটাল অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিয়া তিন দিন শয্যাগত ছিলেন ; কাজেই হালদার পুত্রের উপনয়নে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শু। হাঁ, সেদিন আহারটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল।

শি। আপনি কি জাতিচ্যুত হইয়াছেন ?

শু। আমি জাতিচ্যুত হইব ! আমি তিন সন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ না করিয়া জগৎগ্রহণ করি না। আমাকে তুমি জাতিচ্যুত করিতে চাও ! তুমি ! হতভাগা, নাস্তিক কুশান, গোখাদক,—

শি। গুরুদেব এতক্ষণে বুঝিলাম কোন্ খাণ্ড সহগুণাত্মক।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

## বুথায়াত্রা ।

—:~:—

( ১ )

তোমায়ে ভুলিয়ে নাথ বাহির হইলু যবে,  
তখনো জানি নি মনে এমন বিফল হবে,  
যাত্রা মোর প্রভাতের ;  
মেঘভাঙ্গা আকাশের,  
শ্রীরব স্রুটুটা মোরে নীরবে কহিল যবে,—  
“বুথা স্ত্রী পসারিণি”—ভাবি নি এমন হবে।

( ২ )

গিয়াছে কাটিয়া সেই প্রভাতের হেলাখেলা,  
নাহি সে তরুণ রবি ; এখন বাড়িছে বেলা,  
হেলিয়ে পড়েছে রবি,  
মনে হয় বুথা সব,  
কে কহে ডাকিয়া মোরে “পসারিণি ভাঙ্গ মেলা,”  
গিয়াছে কাটিয়া সেই প্রভাতের হেলাখেলা !

( ৩ )

মদীতটে বাঁধা তরী, মাঝি ডাকে উভরায়,—  
“কোথায় পারের যাত্রি ! শেষ খেয়া বহি' যায় !  
বেচা কেনা হ'ল নাকি ?  
ঐ শুন থাকি থাকি  
সন্-সনি উঠে হাওয়া, নদীপারে যাওয়া দায়—  
আঁধার আসিলে হবে ; শেষ খেয়া বহি যায়।”

( ৪ )

আমার ত বেচা কেনা কিছুই হ'ল না হয় !  
 কেমনে যাইব পারে ভাবি তাই নিরুপায় !  
 কোথায় পারের মাঝি !  
 এ ঘোর ছুদ্দিনে আজি,  
 ল'বে কি করুণাভরে এই দীন অভাগায় ?  
 আমার ত বেচাকেনা কিছুই হ'ল না হয় !

( ৫ )

“একখানি ঠাই মোর এখনও রয়েছে বাকী,  
 কে তুমি পারের যাত্রী ডাকিতেছ থাকি থাকি ?  
 তোমারে লইতে হ'বে ;  
 আর কেহ পড়ি র'বে,  
 সায়াহ্নের নদাকূলে—থাক্ ক্ষতি নাহি তায়,  
 তোমার যে নাহি কিছু ! তোমারে কি ফেলা যায় ?”

শ্রীকেশবলাল বসু ।

## ফুলের স্বপন ।

—(ঃঃঃ)—

ফাল্গুনের সন্ধ্যা । একদিকে যেমন পাতা ঝরার ধূম, আর একদিকে তেমনি নতুন কচি পাতায় নতুন পল্লবে  
 কিশলয়ে সবুজের ছড়াছড়ি, কাঁচা জীবনের রসের ঢেউ, নতুন আনন্দ-উৎসবের জয়পতাকা । নতুন গাছে নতুন  
 ফুলের বিকাশ, রংএর জারিজ্বার, সৌন্দর্যের উৎস ! এমনি একটি ফাল্গুনের সন্ধ্যায় মলয় বাতাসের মাতামাতিতে  
 ছোট একটি গোলাপ কঁড়ি একটি গোলাপ গাছের পাতার আড়ালে ছলে ছলে সারা হচ্ছিল । পাপাড়গুলির কঠিন  
 বাধন একটু শিথিল হয়েছে, ফুটব-ফুটব কর্চে তবু ফোটে নি, গন্ধ তখনও বাহিরে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ভিতরে-  
 ভিতরে গোলাপ কঁড়িটির ফুটনোমুখ অঙ্গরটিকে মসৃণ করে রেখেছে, এমনি তার অবস্থা । আশেপাশে আর  
 যারা ফুটেছে তাদের লজ্জার বাধন টলে হয়েছে, অবগুণ্ঠনও কমে এসেছে, তারা আনন্দে হেসে এ ওর গায়ে  
 ঢলাঢলি করছে, কঁড়িটি তাহঁতেই কণে-কণে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে, পাতার আড়ালে গিয়ে হাসি চেপে  
 আবার উৎসুক হয়ে মাথা তুলে দেখছে,—এই নব-যৌবনদীপ্ত অগত্যান্যকে ।

কোথা থেকে একটি মন্ত বড় কালো ভোম্বা উড়ে এসে তার কাছেই জাজির হ'ল। কুঁড়িটি ভাবলে এত ফোটা ফুল থাকতে তার কাছে এ আদ্যার কেন? বেচারার মনে বড় ভয়ও হল, সে ত ঢুকল, কেমন করে আশ্বর্য্য করা হবে? কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, অত বড় কালো ভোম্বা কোন জোর জবরদস্তি করলে না, শুধু বড় করণ সুরে আদ্যার জানাতে লাগল গুণ্ গুণ্ গুণ্! কি সে সাধা-সাধনা গুণ্ গুণ্ গুণ্! আশে পাশের ফুলগুলি এ রঙ্গ দেখবার জন্তে কেঁলি চারিদিক দিয়ে উঁকি কুঁকি দিতে লাগল। বেচারী ছোট গোলাপ কুঁড়ি যতই সরে যতই ছলে-ছলে বলে “না না” ভোম্বাটিও ছাড়ে না, বড় অভিমানভরা সুরে বারবার তিক্ষা চায় গুণ্ গুণ্ গুণ্! কিন্তু ওদিকে সন্কারও ত বড় বেশী দেবী নেই, হাক্কাপাত্কা অন্ধকারের একটা সুন্দর পর্দা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপর ধীরে ধীরে নেমে আসছে; সমস্ত দিনের আলোক পারাবার সম্ভরণ ক'রে নক্ষত্রগুলি নিজেনের আঁচড়াচা প্রদীপগুলিকে আঁত সপ্তপর্ণে বাঁচিয়ে ছ' একটি করে আকাশপ্রান্তে পৌছতে আরম্ভ করেছে! তখনও গোলাপকুঁড়িটির ভয় ভাঙেনি, সে আগের মতই বারেবারে অস্বীকার জানাচ্ছে। অগত্যা ভোম্বাটি বড় হুঃখে, বড় অভিমানে আর সাধাসাধনা না করে, এবার ভেঁ করে উড়ে গেল। বেচারী নিশ্চয়ই বুঝেছিল যেখানে অধিকার নেই সেখানে তিক্ষা চাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই হ'তে পারে না। গোলাপকুঁড়িটি মনের ভিতরে কি এক রকম অব্যক্ত বেদনা নিয়ে সেই পাতার শ্রমল শয্যার উপর ঘুমে ঢলে পড়ল।

সে দেখলে তার পুষ্পজন্মের অনেক বছর আগে সে যেন এই পৃথিবীরই মানুষ ছিল, ওদেরই মত হাসতে কঁদতে ভালবাসতে জানত! এক বড়-মানুষের বাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারী মেয়ে,—মা বাপের আদরের ছালাণী! রূপও তার তেমনি, যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সহজ ধারায় করে পড়তে চাইত; ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য যেমন কিছুতেই পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, তেমনি রবির স্বর্ণোজ্জ্বল রাশি যেমন কিছুতেই মেঘে চাপা পড়ে না তেমনি। স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য ভরপুর এই মেয়েটির মনে রূপের গর্বেরও তেমনি অন্ত ছিল না, সে জানত সে রাজরাজী হবার উপযুক্ত, সে হাজারে একজন! এই রূপকে নানা উপায়ে ফুটিয়ে তোলার দিকেও তার কম দৃষ্টি ছিল না, সে তার কালো চিকণ কুন্তল কখন বা এলিয়ে, কখন বা শিথিলভাবে কবরীবন্ধ করে কখন বা বেণীবন্ধন করে নানা ভঙ্গিতে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দেখত কিসে তাকে বেশী সুন্দর দেখায়। নিত্য নূতন রংএর কাপড় পরে, বর্ষায় নীলাম্বরী, শরতে আশমানি, বসন্তে কনকটাপার মত বাসন্তি রংএর কাপড়, আবার কখন বা ফিরোজা, কখন বা গোলাপী, তবু তার মন উঠত না, যে রং তার এমন সোণার অঙ্গে মানায় সে রং বুঝি এখনও সৃষ্টি হয় নি! মণিমাণিক্যচিত অলঙ্কারেরও নিত্য নূতন পরিবর্তন হ'ত। মাতার স্নেহাঙ্ক চোখে এগুলি কোন দিন দোষাবহ বোধ হয় নি, বরং মনে মনে এই কণাই ভেবেছেন,—আহা, সে যদি সব ভোগ না করবে তবে করবে কে? বড় হুঃখের মেয়ে যে তাঁর! পিতার এ সকল দিকে দৃষ্টিই ছিল না, কেমন করে তিনি সংপাত্রে তাকে সমর্পণ করবেন, কেমন করে সে চিরস্থায়ী হবে! বয়সও তার কিছু বেশী হয়েছিল, পিতামাতার স্নেহাকুল মন তার বিবাহের কথা ভাবলেই বিচ্ছেদ-কাতর হয়ে উঠত তাই সে কথা এত দিন ঠেলে রেখেছেন কিন্তু আর যে চলে না, মেয়ের বয়সও যে হ'ল! এদিকে পিতামাতার মনের মত পাত্রও যে মেলে না।

তারপর সে একদিন ঘরের আড়াল দিয়ে পিতামাতার কথা শুনতে পেল,—“সব ত ভাল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে আমার গোলাপী তার শেষে এমন কালো বর”—



“তোমরা মেয়ে মানুষরা কেবল রূপ দেখ, কি সং বংশের ছেলে চাক, কি সচ্চরিত্র, পরোপকারী, ধর্ম্মবিশ্বাসী, যেমন ওর বাপ ছিল ঠিক তেমনি ; রূপ নাই হ’ল—”

“গোলাপীর কি মনে ধরবে সেই কথাই আমি—”

“মেয়ের আবার মনে ধরাধরি কি ? অমন জামাই আর পাবে কোথায় ? তোমার বাবা মা কি দেখে আমার মেয়ে দিয়েছিলেন বল ত ?”

মা হেসে মুখ নত করলেন, বাবা নিশ্চিন্তের সুরে বললেন,—“ষেয়ে আমাদের চিরমুখী হবে সে ভাবনা করো না।”

“তা হলেই হ’ল ; আর আমি কিছুই চাই নে।”

মা হাসিমুখে উঠে গেলেন।

গোলাপীর চাকর সন্ধ্যাই বিয়ে হ’ল ; কিন্তু সে রাতে সে যখন স্বামীর মুখ দেখলে তখন তার কেবলি ইচ্ছা হ’ল সে চীৎকার করে কাঁদে, কিম্বা আত্মহত্যা করে ! হয়ে উঠল না কোনটাই, হ’বার মাঝে হ’ল শুধু সে চাকর কাছে ঘেঁসলে না, আর ভোর থাকতে উঠে পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল !

এদিকে চাকর গোলাপীকে নিয়ে নিজের বাড়ী গেল। তাদের নিজের বাড়ী ; বিষয়-সম্পত্তিও মন্দ নয়, টাকা-কড়ির কোন অভাব নেই, তাই চাকর বেশী করে পরের উপকার করার অবকাশ পায় ! গোলাপীই বাড়ীর কর্ত্রী, তার ইচ্ছাই সেখানে সর্বময়ী, চাকর দাসী সকলেই তার আজ্ঞা পালনে উৎসুক, গোলাপীর কিন্তু তাতে মন ওঠে না। পিতামাতার উপর অভিমান ক্রমে রাগে পরিণত হ’ল, কি তার এতখানি রূপ সে কি এমন করে বার্থ হয়ে যাবে ? এই কি তাঁদের সংপাত্র ? এমন কালো স্বামী যে তাঁর মুখে চাইলে দিনের আলোও অন্ধকার হয়ে আসে। সে নিজের দেহের দিকে চায় আর স্নোভে তার ছুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এমন অতুল্য রূপ সেকি এমন স্বামীর হাতে পড়ে অনাদরে শুথিয়ে করে যাবার জন্য ? এ দেখে কে, এর মূল্য বুঝে কে, মূল্য দেবে কে ? স্বামীর ত সেদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি যে কি ভাবেন, কি ভেবে দিন কাটান, তা গোলাপী বুঝতেও পারে না। বুঝতে চেষ্টা করলেও তার প্রবৃত্তি হয় না। এমন যে বসন্তকালের সন্ধ্যা, তার স্বামী কোথায় এসে বলবেন “প্রিয়ে তোমার রূপ সাগরে আমি ডুবে আছি, তোমার পদতলের রক্তিম ছায়ায় আমি মৃত্যু কামনা করি !” তা নয় কোথায় কার বাড়ী রোগীর পথ্য জোটে নি, কোথায় কার বাপের শ্রাদ্ধের সংস্থান নেই, কোথায় কার বাড়ী মরা ওঠে নি, সেইখানে তার স্বামী ! গোলাপীর আপাদমস্তক জলে যায়—এ সব কি সহ হয় ? সে নিজের রূপের মাদকভায় মত্ত হ’য়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়, কেমন করে সে একে প্রকাশ করবে, কেমন করে জগৎকে দেখাবে তার সেই সৌন্দর্য—যা বুঝি কেবল মনেই কল্পনা করা যায়।

বাড়ীর অতিথি-অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করা গোলাপীর কাজ, তাই একদিন স্বামী এসে যখন বললেন “গোলাপী চল আমার ছোটবেলার বন্ধু রমণীমোহনের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দিই” সেদিন গোলাপী বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হ’ল না। এমন ত প্রায়ই ঘটে।

অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবা, কালাপেড়ে মিহি ধূতি পরা, গায়ে সিঁকের পাঞ্জাবী, মাথায় কঁোকড়া কালো চুল ! রমণীমোহন অবাক হয়ে দেখলে একি রূপ, তার চোখের পাতাও বুঝি পড়ে না ! গোলাপী বারেবারে আরক্ত হয়ে ভাবলে,—এই বুঝি সেই, যাকে সে এতদিন ধরে চেয়ে এসেছে, সে তার রূপ দেখে মস্তমুগ্ধ হয়েছে ! গোলাপীর মন এক মুহূর্ত্তে পলকিত হয়ে উঠল !

এমনি করে আলাপ যতই গাঢ় হ'তে লাগল তার রূপের সাধনাও বেড়ে চলল। সে মনকে বারে বারে বোকায়ে এত কিছু অনায়াস নয়, সে সুন্দর তাঁই সে সৌন্দর্য দেখাচ্ছে, এ যে তার বিদিত বয়, কিন্তু তার ও রমণীমোহনের মনের মাঝে কোথায় যে মোহ বসে লুকিয়ে পাপের জাল বিস্তার করছিল তা সে বুঝতেও পারলে না।

চাকর উদার মন আকাশের মত ; সেখানে মেঘ বড় একটা দেখা যায় না।

স্বামীর ভাবে একটু স্নেহ প্রকাশ হ'ত না, তিনি ভেমন হাসি-খুসি সদা-প্রফুল্ল ! সন্ধ্যার সময়ে প্রায়ই বাড়ী থাকেন না, যত রাজ্যের অভাব-বেদনা দূর করার তার বিধাতা বুঝি একা তাঁর উপরেই দিয়েছেন। রমণীমোহনও এই সময়টিতে আসেন, কাজেই তাঁর আতিথ্যের সেবার তার পড়ে একা গোলাপীর উপর, ক্রটিও হয় না কিছুই।

এমনি করে ঘটনা যখন অনেক দূর গড়িয়েছে তখন গোলাপী শুনে তার স্বামীর কদরোগ হয়েছে। স্বামী সেজন্তু এতটুকুও ক্ষণ নন, তিনি বলেন “মরব ত সবাই একদিন, এ বৎ ভালই হ'ল প্রস্তুত হ'য়ে থাকবার কুসং পাওয়া গেল !”

শরীর ক্রমেই যে ঢল ঢল হ'য়ে পড়ছে এ কথা তিনিও যেমন ভেসে উড়িয়ে দিতেন, গোলাপীও মিত। মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলেও চাকর বুকের বাধাটা ত্যাগ প্রবল হ'য়ে উঠত কেন যে তা চাকর বুকেও বুঝতে চাইত না।

নিবিড় বর্ষা ! জলের আর বিস্তার নেই, কেবলি ভেতের ডাক আর কণে কণে মেঘগর্জন রুষ্টি পতনের অবিরাম পানের তাল বাজছে ! স্বামী সেদিন ত্যাগ আসবার বাড়ী ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় নিলেন, এদিকে রমণীমোহনের আজ গোলাপীর অমুরোধে বিশেষ নিমন্ত্রণ।

স্বামীকে অসময়ে বাড়ী ফিরতে দেখে পর্যাপ্ত গোলাপীর মন কিছু বিকল্প হ'য়েছিল, আরো ত'ল যখন তিনি ডাকলেন “গোলাপ, একটু কাছে এস, বুকের একটু তাই বুলিয়ে দাও ত !” রমণীমোহন এ দিকে অনেকক্ষণ হ'ল বাইরের আফিস ঘরে বসে আছে, গোলাপী সাধাপক্ষে বিরক্তি দমন করে বসলে “এখন ত বসতে পারছি নে, ঠাকুর হটগোল বাধিয়ে দিয়েছে ; সংসারের কাজগুলো সেয়ে ফেলি” বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার একবার চাকর বুকের বাধাটা বড় প্রবল হয়ে উঠল, নিঃশ্বাসের কষ্টে শ্বাস বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল, তার পরেই সে ভাবটাকে কাটিয়ে তিনি উঠে বসলেন। এদিকে কি কাজে তিনি আফিস ঘরে গিয়ে যেখেন রমণীমোহন ও গোলাপী গল্প-গুজবে মেতে আছে। স্বামীকে দেখে গোলাপীর মাথার দিতরে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ কলতে লাগল, সর্দাক দিয়ে যেন বিতাং খেলে গেল ! সেদিকে ক্রক্ষেপমাত্র না করে স্বামী বললেন, “তুমি কখন এলে ভাই ? তোমরা এখানে গল্প করছ আনি এদিকে গোলাপীকে খুঁজে সারা বাড়ী তোলপার করছি” বলে তাঁর সয়ল উচ্চ হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দিলেন। মাঝে যে একটা বাষ্প জমে আসছিল সেটা এত হাসির উত্তাপে কোথায় উড়ে গেল।

যুখে না বললেও স্বামী জানছিলেন তাঁর মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাই বিষয়-সম্পত্তির উইলও তৈরী হয়েছিল, গুজব উঠেছিল তিনি গোলাপীকে এক চতুর্থাংশ দিয়ে বাকি সব দুঃখী আতুর ভনের মজলার্থে দিয়ে গেলেন।

সে আর এক রাত্রি ; নিমন্ত্রণ রক্ষার পর রমণীমোহনের আর বাড়ী যাওয়া হ'ল না, বৈঠকখানাতেই শয্যার ব্যবস্থা হ'ল। স্বামীর অন্তঃকরণ সেদিন বড়ই বাড়াবাড়ি। গোলাপী অনেক রাতে যখন শুতে এল স্বামী তখন

গভীর নিদ্রাভিত্ত। গোলাপী আপনার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গুয়ে কি এক অবাক্ত বেদনার অস্থিতিতে কেবল ছটফট করতে লাগল। স্বামী তার এত কাছে তবু কত দূর? সে আর কি কখন তাঁর নাগাল পাবে? তারপর হঠাৎ কখন তার হাতখানি স্বামীর হাতে ঠেকে গেল,—একি, এ যে ঠাণ্ডা হিমের মত; পাষাণের মত শর্তু আড়ষ্ট! গোলাপী নানা রকমে স্বামীকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে দেখে ত কোন সাড় নেই; তবে কি স্বামী মৃত? আতঙ্কে শিরের উঠে রমণীমোহনকে ডাকতে গিয়ে দেখলে স্বামীর টাকার ঝঞ্জ ভাঙ্গা, রমণীমোহনেরও কোন চিহ্ন নেই! তবে কি—? এক মুহূর্তের মাঝে গোলাপীর মন যেন সব বুঝে নিলে,—তার স্বামীর মৃত্যু, তাঁর রোগের কারণ, রমণীমোহনের অন্তর্দান; এক মুহূর্তের মাঝে গোলাপীর মন যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল! সে যেন কি এক অসহ যন্ত্রণার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

\* \* \* \*

তার পর আর কোন চেতনা নেই যেন; যখন চেতনা ফিরে এল গোলাপী দেখলে কেবল লাল লাল, কেবল লাল! জবা ফুলের মত লাল, বস্তুর মত লাল—আর কিছুই নেই! তার স্বামীর চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে—হুহু করে লোল জিহ্বা লক-লক করছে, আর তারই মাঝে তার কালো স্বামীর প্রশান্ত কালো স্মিত মুখখানি! বড়ই সুন্দর—বড়ই সুন্দর! কিন্তু এক চিতার আগুন, এ আগুন যে ধীরে ধীরে গোলাপীর অন্তরের ভিতরেও প্রবেশ করছে, সেখানেও আর কোন রং নেই কেবল লাল! আবার দেখলে তার অশ্রুও ত শেষ নেই চোখে, অশ্রুসাগরে সব ভিজিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু সেট আগুনের এমন প্রতাপ, এমন বীণা, এমন তেজ যে তার উত্তাপে অত অশ্রুও শুখিয়ে কাট হয়ে গেল! একি হ'ল—এ যে অস্তর পুড়ে গেল, জ্বলে গেল, ছাই হয়ে গেল,—এমন সময়ে গোলাপ-কুঁড়িটির ঘুম ভাঙ্গল। সে দেখলে স্বপন ত মিথ্যা কিন্তু চিতার আগুন ত মিথ্যা নয়, ও যে ঐ পূব আকাশেও ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি লাল টকটকে জ্বলছে! এ আগুন যে তার মনেও রক্তমা ছড়িয়ে দিয়েছে তাও ত মিথ্যা নয়, তারও যে আগাগোড়া লাল হয়ে ফুটে ফেটে পড়ছে; আর শিশিরাশ্রু যে তার বেদনারক্তিম মনখানিকে ভিজিয়ে দিয়েছে সে কথাও ত মিথ্যা নয়, তবে কাল সন্ধ্যা বেলার সেই কালো তোমরা যে আজ হাজার আহ্বানেও ফিরে আসবে না এ কথাও কি সত্যি? যতই সে ভাবতে লাগল ততই যেন চিতার আগুনের দাহ বেড়ে উঠতে লাগল, তার অশ্রুকে শুখিয়ে তার হৃদয়ের লাল রক্তকে শুবে নিতে লাগল!

## সাম্য \*

—\*—

দাঁড়া তাদের হাতটি ধরে—

ধূলিমেখে সর্ব অঙ্গ

দাঁড়িয়ে যারা পথের পরে।

ক'সনে ভুলে তাদের কথা,

বুকিস্নেক কোথায় বাথা,

( কলিকাতাঃ প্রমথবি বিদ্যালয়ের পরিচালক। বর্তমানপলকে রচিত। স্বাঃপ্রসাদী স্বঃ। )

নিঃস্ব যারা বিশ্ব মাঝে  
 কাঁদে না প্রাণ তাদের তরে !  
 গভীর অন্ধকারে নীচে  
 পড়ে তারা থাকবে পিছে  
 বুকে করে তুলে নেবার  
 নেই কি কেহ যতন করে !  
 ভেদাভেদ সব যাবে ভুলে,  
 দেখবে বারেক নয়ন তুলে,  
 প্রাণের মাঝে সবই সমান  
 জোট বড় পরস্পরে !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

## ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-সমস্যা।

[ বর্তমান জামুরারী মাসের “মডার্ন রিভিউ” পত্রে, পাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ নেতা স্বদেশবৎসক শ্রীযুক্ত লাল লালপত রায় মহোদয়ের “The Problem of National Education in India.” নামক একটি স্ববৌদ্ধিক, সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর পাঠ করা কর্তব্য। আমরা এই অনিন্দ্যমুহুর প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। অস্থবাদে মূলের সৌন্দর্য ও উদ্দীপনা সম্ভবে না,—বিশেষতঃ অক্ষয়ের হস্তে! মূল প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণকে মহাপ্রাণ লালপতের চিন্তা প্রণালীর সহিত পরিচিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ]

ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি-পরিবর্তনায় যাত্রার নিয়োজিত, তাঁগদের দৃষ্টি, কতিপয় মূলতত্ত্ব ও অবস্থা বিশেষে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া অত্যাৱশ্যক। আমি তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত করিব। শিক্ষাই জাতীয়-জীবনের প্রাণ,—ভিত্তি,—আধিক্খা, উতাকে আস্থাসঙ্গিক প্রসঙ্গ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। কি ব্যক্তিগত জীবনের, কি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, উভয়েরই প্রাণমূলে শিক্ষা,—মৌলিক বস্তু! বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রত্যেক জীবনই সমাজের; শিক্ষাও তাহাই,—ব্যক্তিপরস্পরের উহার অভিব্যক্তি ও বিস্তৃতি। শিক্ষাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক যে তাবোই লওয়া হ’ক না কেন, উহার ধরণধারণ, রীতিনীতি, চরমলক্ষ্য ওই সমাজ-তত্ত্বে,—সামাজিক অস্থঠের প্রধান প্রধান ক্রিয়াকলাপের উহা অন্যতম। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সুখাপেক্ষী, এককে ছাড়িয়া অন্যের গতান্তর নাই, উভয়ের ওভান্তত এমন ওভপ্রোত তাবো বিলুপ্তিক।

শিক্ষা চরম সাফল্যের সোপান ; সেই সাফল্যই জীবন,—উন্নতির অবাধ অনন্ত প্রবাহ ! স্রোত যেমন অবিভাজ্য, জীবনও তদ্রূপ,—উহার অবিরাম উন্নতি প্রবাহের বিভাগ অসম্ভব । ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যার্থে পণ্ডিতগণ জীবনকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করিলেও উহার মূলত্রে বিভাগের অতীত,—এক । জীবন,—গতিশীল জীবন—সর্ব জৈবীশক্তির সমবায়, লক্ষ্য তাহার অধেষ্ট,—ক্রমোন্নতির চরম সীমায় ।

জীবন পরিবর্তনশীল, সত্য ; কিন্তু কেবলি পরিবর্তনশীল নহে,—পরিবর্তনশীল,—পরিবর্তন উন্নতির দিকে । মনুষ্যের প্রাণ অচল স্থাবর্য্য নহে,—শক্তির আধার । প্রাণ-শক্তির বিকাশ অনেক ক্ষেত্রে অতি দীর্ঘ হইলেও, উহার গতি বে নিত্য তাহা প্রবসত্য ! কর্ণের ধর্ম নিয়ত হৃদয়ে-হৃদয়ে কার্য্য করিয়া পরিবর্তন আনয়ন করিতেছে ; ব্যক্তিগত পরিবর্তনে, পরিবর্তনে সমাজ-শক্তির বিবৃদ্ধি ; ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, সমাজের উন্নতিতে তেমনি ব্যক্তির । আত্ম ও পরকে একত্রে আবদ্ধকারী বহুবিধ কার্য্য, ও ভাবাদির সমন্বয়ে সমাজ-দেহ ; সে সকল গুণাবলীর আভ্যন্তরিক উন্নতিতেই সমাজের শক্তি,—স্বাস্থ্যোন্নতি । দেহের অন্তঃস্থ যেগুলি তাহার একটিকেও পরিভাগ্য করিয়া শরীর যেমন স্বাস্থ্যলাভ করিতে অসমর্থ,—সমাজ-দেহেরও তেমনি, বাহ্য প্রধান প্রধান অংশ,—ধর্ম্মকর্ম্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক-উন্নতিমূল্যক বৃত্তি যেগুলি তাহার,—বিকাশ ও উন্নতির ব্যঙ্গ্য না হইলে সামাজিক উন্নতির আশা আকাশকুসুমতুল্য ! এক কথায়, মনই সর্ববিষয়ের মূলে ; মনই আশা, উৎসাহের, জ্ঞানের, মাতৃভূমি, মনের কোড়েই, তাহার স্বাস্থ্যকর স্তনোই—উহার ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় করিয়া আত্ম-বিকাশে সমর্থ হয়, সুতরাং পারিপার্শ্বিক-জগতের প্রভাব মানুষের উপর অদমা, তাহার পামশূন্য হওয়া অসম্ভব—একথার কোন সত্যতা নাই ; বরং পারিপার্শ্বিক-জগতের বন্ধন. সুনিয়ন্ত্রিত আত্মশক্তিতে যে যতখানি ছিন্ন করিতে সমর্থ সে ততখানি স্বাধীন । স্বাধীনতাই পরিণতির তৌল-যন্ত্র ; সবল অন্তঃকরণের পরিচায়ক । স্বাধীনতা বলিতে সেই মানসিক পরিবর্তন, বাহার বলে মানুষ স্বভাবের প্রভাবকে অপ্রতিহতভাবে গ্রহণ না করিয়া বা সমাজের সমষ্টির প্রভাবে আত্মবলি না দিয়া, আত্ম-আদর্শকে সমাজের অমুকুল গঠনে গড়িয়া তুলিতে পারে, ও তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় । স্বাধীনতা সর্ব-সুখাধার, স্বাধীনতা বাতীত সুপের অস্তিত্ব অসম্ভব । স্বাধীনতা অর্থে বাহ্যিক,—শারীরিক-দাসত্ব-বিমুক্ত—অবস্থা নহে,—প্রবৃত্তির পামশূন্য, সংস্কারে অনমুরক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা । সমস্ত আবিলা, মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যে যতখানি আপনার প্রভুত্ব আপনাতে লাভ করিতে পারিয়াছে, সে সেই পরিমাণে স্বাধীন ;—আত্মজ্ঞানের অমুপাতে স্বাধীনতার অমুপাত, অথচ সে কোনক্রমেই সমাজ ছাড়া নয় । তাহার ব্যক্তিতে যে সত্য প্রকটিত, সমাজের ব্যক্তিটিতেও তাহা নিহিত,—জাতীয়ত্ব তাহা পরিপূর্ণ ! জাতির চোট বড়তে, তার কম বেশী লোকসংখ্যায়, জাতীয় উন্নতিঅবনতি স্থচিত হয় না—সুস্থ সবল কর্ণ ও একতাগুণবৃত্ত অধিবাসী যে জাতিতে বহু অধিক সে জাতি তত উন্নত । একতা বলিতে সমষ্টির বাহ্যিক একীকরণ বা একপন্থায়ের আনয়ন নহে,—প্রাণে-প্রাণে একই মূলশক্তি ক্রিয়া করিলে প্রতি হৃদয়ে যে অমুকৃত ও উদ্বেগ এক হইয়া যায়,—একই লক্ষ্য সকলের,—তাহার সাফল্য বিধানের জন্ত সকলের সমবেত চেষ্টা, সাহায্য সহানুভূতি,—একতও দেশের একই কার্য্য,—ব্যক্তির ও সমাজের, সমাজের ও জাতির কার্য্য-কারণ, ধ্যান-ধারণা একই লক্ষ্য,—সেই না একতা,—জাতীয়-জীবনের সাক্ষ্য—হৃদয়স্পন্দন ! জীবনের এই স্পন্দনকে অমুক রাধিব্যার চক্ৰই শিক্ষার আবৃত্তক । প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ও প্রথম লক্ষ্য তাহাই ; শিক্ষার বিমল আলোকে যেন প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মবুদ্ধির উদ্বোধন হয়— তাহাকে সমস্ত সংস্কার হইতে বিমুক্ত, বিমুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করে—যেন সর্বসন্দেহমুক্ত সে অনার্য্যসে বিধাধীনভাবে বলিতে পারে, বুঝিতে

পারে। সে নিজেই তাহার ভাগ্য-বিধাতা,—তাহার শুভাশুভ তাহার আত্মশক্তিতে,—ভাগ্যদেবতা বলিয়া আর কেহ কোথা নাই ; পূর্নকৃত কর্মফল মিথ্যা—তাহার আত্মশক্তি মানসিক বল সর্লশক্তি হইতে প্রবল ; তাহার উন্নতিতে উন্মেষে, সমাজের উন্নতি ! সে সমাজে যুক্ত হইয়াও আপনার হৃদয়-শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে আপনাতে স্বাধীন,—আবার স্বাধীন হইয়াও আত্মকৃত কর্মের ফলাফলের জ্ঞাত সমাজের নিকট দায়ী, তাহার কণ্ঠব্য অতি গুরু, কিন্তু সাধ্যাতীত কিছুতেই নহে । তাহাতে আত্মপরের অপূর্ন মিলন—স্বার্থে পরার্থের অপূর্ন সম্মিলন—কি অপার্থিব আনন্দ ! শক্তির—মানবিকতার কি বিমল বিকাশ ! ভারতবাসী আপনার মধ্যে এত বড় শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেও আজ ভীত, সে সর্বদা নিজকে আত্মশক্তি বিবর্জিত পরমুখাপেক্ষী ভাবিয়া ভাবিয়া এমন স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এমনি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে যে প্রতিপদে সে বিশ্বাস করিতে চায়, সে নিজে কিছুই নহে, পরের সাহায্য বাতীত কোন কর্ম সম্পাদনে অক্ষম, দৈবই তাহার পাতোক কার্যনিয়ন্তা ! আত্ম-জ্ঞানহীন জীবনই কি সর্বদুঃখ ও সর্বনাশের হেতু নয় ?—আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্রই কি হওয়া উচিত নহে—যাহাতে প্রতি প্রাণ অমুভব করিতে পারে, কর্ম ও কিস্মৎ অদমা বা অজেন্য নহে, মানুষ ইচ্ছা করিলে আত্মশক্তি প্রভাবে, অবিরত চেষ্টায় আত্মকে উন্নতি-শিখরে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ, সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহার পরিবর্তন আনয়ন করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণ পারগ । হিন্দুধর্ম কুত্রাপি দৈবের বলবত্তী হইতে উপদেশ দেন নাই ; বরং উহার কর্মবাদ দৈবের দুর্লভতাই জ্ঞাপন করিয়াছে । জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্রও তাহাই হওয়া উচিত ; অতি জোরের সহিত প্রচার করিতে হইবে,—মানুষ আত্মশক্তি প্রভাবে জীবনের শ্রোত, চিন্তা, কর্ম, সামাজিক-অবস্থা সমস্তই উন্নতির দিকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ । কর্ম মন্ত্রের উপরে কিছুতেই নহে । মহাদায়ী ধর্ম ও কখনও দৈবের কিস্মতে আস্থা স্থাপন করিতে বলেন নাই ; তথাপি স্বাকার না করিয়া উপায় নাই, ভারতের কোঁকট এই দৈব বিশ্বাসে !

শিক্ষা দ্বারা এই জড়ভাবের মূলে কঠারাঘাত করিতে হইবে ! হঠতে পারে ভারতের মাটির ধর্মই এই দৈবের দিকে, কিন্তু মাটির গুণ বা আবহাওয়ার তেজ অনতিক্রম্য নহে, মনের বলের নিকট বাহ্যিকশক্তি তুচ্ছ, তাহার বলেই সকল বাহ্যিক-বাধা অতিক্রম করিতে হইবে । ভৌগোলিকসংস্থান বা পূর্নপুরুষের রক্তই মানুষের স্বভাবের নিয়ন্তা—তাহার সামাজিক স্বভাব গঠনের আদিকারণ—এই প্রাচীন মতবাদের অসত্যতা সুপ্রমাণিত হইয়াছে ; ভারতবাসীকে তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইতে হইবে ; পারিপার্শ্বিক-জগতের আবহাওয়ার প্রভাব ব্যক্তির মনের ও সমাজের উপর কার্য করে সত্য কিন্তু ঐকান্তিক অধাবসায় উন্নতির পথের সকল কণ্টক দূর করিতে সমর্থ, মানুষের চক্ষের বর্ণ মনের উন্নতির পরিমাপক নহে, মানসিক শুভতাই সর্ব বর্ণের উপরে—তাহা আর সভ্য জগতে বর্তমান যুগে প্রমাণিত হইতে বাকি আছে কি ?

সত্য বলিতে গেলে, ভারতীয় মন কয়েক শতাব্দী হইতে প্রবাহটীন, নিশ্চল—কেহ কম, কেহ বা বেশী ; শাস্ত্রীয় বিধিব্যবহার কড়াকড়, পুরোহিতের পক্ষপাত বাবস্থা, শিক্ষার সঙ্কট, জ্ঞানার্জনের সুযোগাভাব, দেশে অবিরত অশান্তি, জাতি ও ধর্মের হনু, সন্ন্যাস ও সংসার একাকার করিয়া সংসারের অনিশ্চয়তা, অসারত্ব অতিশয় গাভীরের সহিত বড় বড় কথায় প্রকৃত শাস্ত্রবাক্যরূপে জোর গলায় প্রচারিত হওয়ায় লোক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জাতীয় জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, অমন জলদগন্তীর স্বরে যে জ্ঞান্ধি থাকিতে পারে তাহা ধারণার আনিতে না পারিয়া কেবল তাহারাজীত চকণ হইয়া পশ্চাৎ পদে ভর করিয়াছে ; জাতীয় উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় নাই একটুকু—হটিয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকথানি ; জীবনকে গতিশূন্য করিয়াছে গতি দিতে পারে নাই । সময়

সময় সেই নির্ধারণমুখ, জীবনবহিঃ প্রজ্জলিত করিতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই,—তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাও তিরোহিত হইয়াছে কারণ তাঁহাদের উপদেশ আদর্শ কাহারও বা প্রেমে, কাহারও বা ক্রিয়াকাণ্ডে, কাহারও বা শাস্ত্রীয় মতবাদে প্রতিষ্ঠিত, সাধারণ শিক্ষার উপর একটিও সংস্থাপিত নহে; স্মরণ্য স্বর্গের অন্তর্ধানই ঘোর অন্ধকার; বিগত সহস্র বৎসরে ভারত লাভ করিতে পারিয়াছে অতি অল্পই, হারাইয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী; হারায়ছি বলিতেই স্বরণে আসে ভারতের অতীত কথা—কি ছিল কি গিয়াছে। ভারতের অতীত চিত্র সম্বন্ধেও দুই দলের দুই মত—একটি অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত! একদল বলেন “ভারত আশ্চর্য সভ্য কবে, চিরকাল এ দেশে অসভ্যের (barbaras) বাস। গতিহীন অমূল্য জীবনের উদাহরণস্থল ভারতবাসী! কি মনস্তত্ত্বে, চিন্তারাজ্যে, কি আবিষ্কার ক্রিয়ায় কি কর্মজীবনে ভারত কবে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? ভারতীয় মানবসম্মত পক্ষাব্যাহার রোগগ্রস্ত,—স্থগু!” এই সে দিনেই একজন নিছক সমালোচক ছাপার হরণে প্রচার করিয়াছে ভারতবাসীর জাতীয়তায়-আত্মপ্রসাদ—“আমরা একজন হইয়াছি ভাব”—বুধা, (“There never was a Civilization in India.”) যে গর্ব করিবার মূলে কিছুই নাই। ব্রিটিশ শাসনের আদি অবস্থাতেও বিলাতী সমালোচক জেম্‌স্‌ মিল ও প্যাট্রি ফানারগণ পুনঃ পুনঃ ভারতের ইতিকথা ঐ বর্ণেই চিত্রিত করিয়া অসীম আত্মপ্রসাদ ও বস্তুর সহিত পরিচয় না লইয়াই পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কালে অবস্থার পরিবর্তন হইল,—পাশ্চাত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারে। ইউরোপীয় জগত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ (অধিকাংশই তাহার ভ্রমপ্রমাদযুক্ত হইলেও তাহাই) পাঠ করিয়া প্রাচীন সভ্যতার ভারতের স্থান,—জ্ঞান গরীমায় ভারত কত উন্নত হইয়াছিল তাহা মানিয়া লইল। ভারতবাসী এক প্রাতে জাগ্রত হইয়াই দেখিল (তৎপূর্বে নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীও ভারতের অতীত গৌরবে ইউরোপীয়ের ন্যায় আহ্বাহীন ছিল)—তাহারা আর অসভ্যের সন্তান নহে, মস্তিষ্কের উন্নয়ন, চিন্তাশক্তির প্রথরতা, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ এত উন্নত ছিলেন যে বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তাঁহাদের বিদ্যাব্যবহার স্তুতিভাষ্য করিয়াছেন; এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বক্ষ গর্বে ক্ষীত হইয়া উঠিল,—আমরা আমাদের একটা কদর যেন খুঁজিয়া পাইলাম—অতীত গৌরবে স্ফুর্জমান হইয়া ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল চিত্রে কল্পনা করিতে সাহসী হইলাম। উন্নতি যে আমাদেরিগকে আলিঙ্গন না করিল তাহা নয়, নব্যযুগের জাগরণের নব উৎসাহ উত্তম আমাদেরিগকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিল! সেই শুভ মুহূর্ত্তেই ভারতের নব্যযুগের অভ্যাস, (renaissance) নবজাগরণ। কিন্তু ওই অতীত গৌরবের সন্মোহে অনিষ্টও আমাদের কম হয় নাই; আমরা গর্বে অন্ধ হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম অনেকেই। বিপক্ষ সমালোচকের উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া যুক্তির পরিবর্তে ‘উত্তর’ গাহিতে আরম্ভ করিলাম। একদর্শী হইয়া, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের পক্ষ হইতে জগতের যাহা কিছু উন্নতির—সত্য শিব সুলভ, তাহাদের আবিষ্কার স্থান দাবী করিয়া বসিলাম। তাহাতেও বরং ক্ষতির কথা ছিল না, আমরা যদি গর্বমোহে আমাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা বিস্মৃত না হইতাম। বর্তমান সভ্য-জগতের উন্নত জ্ঞান, শিল্প-কলাদি সমস্তকেই তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতে বাইরা ‘আমরা কি ছিলাম’ সে চিন্তাতে, আমরা ভুলিয়া গেলাম ‘আমরা এখন কি?’ যেখানে লজ্জার অধোবদন হওয়া উচিত ছিল,—যে স্থান হারাইয়াছি তাহার জন্য অনুশোচনার সহিত, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অদম্য উৎসাহ অধ্যবসায়ের আবির্ভাব স্বাভাবিক ছিল, তাহার স্থলে এই মাটির গুণে—আমরা লাভ করিলাম বুধা অহঙ্কার! উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত এ ভাব ভারতবাসীর হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইবার আশা নাই। আমাদের জীবন-সমস্তা ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে; মহাপরীক্ষার সময় সমুপস্থিত,

এখন আপনাকে বুঝিয়া চলিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী,—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা মাথা তুলিতে পারিব না কোন দিনই।

যে জাতি অবিরত বৈদেশিক দ্বারা অবজ্ঞাত, এমন কি স্বদেশের নেতাদের নিকটেও, যাহারা আত্মসম্মান ও আত্ম-বিশ্বাসের বাণী শুনিতে পায় না তাহাদের উন্নতির আশা আর কিসে? স্মৃতরাং বর্তমানের নেতাদের প্রধান কর্তব্য ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—যাহাতে দেশের লোকের আত্মমর্যাদা ও আত্ম-শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে সেই শিক্ষার, সেই উপদেশের ব্যবস্থা করা। প্রচলিত দৈব বিশ্বাস, পরনির্ভরতা, সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি অতি অনিষ্ট-কারী মতবাদ যাহাতে ভারত ভুলিয়া যায়, যাহাতে শক্তিশালী শাস্ত্রের প্রকৃত সত্তা প্রকাশ পাইয়া পূর্বগৌরবের মর্মেয় সহিত বর্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষা দেশবাসী প্রাপ্ত হইতে পারে—জাতীয়শিক্ষা-পদ্ধতি সে রূপ-ভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত নহে কি?

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচকগণ তখন তখন বলিবেই,—আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়া আছি,—আমাদের বহু বর্ণ বিভাগ, বহু জাতি, ধর্মবিপর্যায়, শত শত ধর্মসম্প্রদায়, বহু প্রকার ভাষা—সাধারণতঃ লাভের পথে আমাদের অন্তরায় অথবা শাসন শক্তির উন্মেষ আমাদের মধ্যে এত ঘীর যে অতি দূর ভবিষ্যতেও স্বায়ত্ব-শাসনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত আমরা হইব না। এই জনাই বুঝি, আমাদের উপদেষ্টাগণ ভারতের জনসাধারণকে ক খ গ ঘ এর সহিত পরিচিত হইতে দিতেও পরান্থ এবং আমাদের সম্মানদিগের জন্য ব্যবসাবিগ্নাজনক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে নারাজ; তাহারা উপদেষ্টা রূপে অবতীর্ণ হইলেও আমাদের অন্ধকারে রাখাই যে তাহাদের অভিপ্রেত, তাহাতেই তাহাদের স্বার্থ তাহা কি বুঝিবার ও স্বদেশবাসীকে বুঝাইবার সময় আসে নাই! সত্য সর্বকালেই সত্য,—পুরাকালেও সত্য যাহা ছিল আজও তাহাই,—শাস্ত্র যাহা তাহার বিপর্যায় ঘটে না—মূল সত্য চিরকালই অটুট, কিন্তু তাহার বাহ্যিক আবরণের তাহার হাসবুদ্ধি স্তম্ভিত। ঋষিগণ কথিত মূল লক্ষ্য-স্থল (principle) শাস্ত্র কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ উন্নত হইলেও তাহা চরম বা পরিবর্তনের বাহিরে নহে! যাহার আরম্ভ হইয়াছিল ঋষিগণের সেই স্মদুর অতীতে, আজ তাহার পরিণতি যদি অনাত্ম, অন্য জাতির হস্তে ঘটয়া থাকে তাহা ভারতে—এই এককালের নিদ্রিত ভারতে—ঘটে নাই বলিয়া যদি ঈর্ষার সে উন্নতিকে উন্নতি না বলিতে চাও,—আধুনিক উন্নতির চরম পরিণতি যদি, আকারে প্রকারে, প্রাচীন পুঁথি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কর—তাহা হইলে এই বিংশশতাব্দীতে তোমার জন্ম বুঝা! সর্বদা মনশ্চকু উন্মিলন করিয়া আমাদের পক্ষে স্মরণ রাখিতে হইবে আমার নবযুগে নব পৃথিবীতে বাস করিতেছি—আমাদের পূর্বপুরুষের এবং আমাদের গৃহস্থালী মধ্যে কত তফাৎ, কত পরিবর্তন! কত উন্নতিঅবনতির চিহ্নে তাঁহাদের ও আমাদের গৃহস্থালী এক ও একস্থানে স্থিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন আর এ গৃহের ব্যবস্থা সে গৃহের উপযোগী করিলে চলিবে না—কালধর্ম লক্ষ্য করিয়া বর্তমানকে উন্নত প্রকৃতির প্রেক্ষণে, প্রণালীতে রক্ষা করিয়া আয়রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের জীবন মন প্রাণ জাতি আবাস, এককণার অন্তর ও বাহির সময়ের প্রেকোপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, আমি অবস্থা—ভিত্তির কথা, স্মরণে রাখিয়া বর্তমান স্মদুঢ় ভাবে এরূপ উন্নত প্রণালীতে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে ভবিষ্যতেও যেন সমস্তই অটুট থাকে, কোন ক্রমেই কেহ যেন বুঝাইতে না পারে—আমরা কাহারও অপেক্ষা হীন,—আমরা যেন এই উন্নতমুখী সংসারের বুকে বাসা বাঁধিয়া বিন্মত না হই—ভূত হইতে বর্তমান, বর্তমান হইতে ভবিষ্যত উন্নত হওয়া চাই। বর্তমানে উহার আমাদের পক্ষে যতই হীন বলিয়া চিত্রিত করিতে প্রয়াস পা'ক না কেন, এখন এমন প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে যাহাতে



প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিছুতে আমাদের গকে আর বুঝাতে পারিবে না—আমাদের অতীত হীন ছিল—বর্তমানে আমাদের অস্তিত্ব নাস্তি। সে বিপদ আর নাই—বিপদ আমাদের ভবিষ্যত লইয়া—এখনও আমরা পদে পদে অতীতের গৌরবে ভুলিয়া যাইতে চাই—অতীত ও বর্তমান এক নহে—অতীত আমাদের অতি উজ্জ্বল হইলেও বর্তমানে অন্যের নিকট আমাদের শিক্ষা করিতে অনেকে আছে, আমাদের অতীতের সচিত্র মিলে না বলিয়াই আধুনিক উন্নতি হীন নহে,—আমাদের গ্রহণীয়, অমূল্য করণীয়—অবশ্য তাহাদের আকারে নহে; গ্রহণীয় তাহাদের ভাবে—এদেশের উপযুক্ত আকারে—মূলে এক হইলেও আকার হইবে তাহার বিভিন্ন—মূলতঃ মহামানবসত্ত্ব এক—একই অমৃতের পুত্র কিন্তু জাতীয়তায় তাহাদের আকার ভিন্ন ভিন্ন—মূল ঠিক রাখিয়া জাতিকে আপনার ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এষ্ট কথা স্মরণে রাখিয়াই মনস্বিনী এনি বেসান্ত বলিয়াছেন—‘জাতীয় শিক্ষা, আত্মপ্রাণ ও বিকশিত-স্বদেশ-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। উহার আবহাওয়া হইবে খাঁটি দেশীয়,—ভারতীয় সাহিত্যের মিষ্ট মধুর নূতনত্ব তাহা নিত্য সম্ভব থাকিবে,—পুরাতনের অপকারী অংশ বিবর্জিত হইয়া উন্নত ভবিষ্যতের চরম লক্ষ্যে উহার গতি হইবে।’ তাহা হইলেই ভূত ভবিষ্যত বর্তমান কাছাকাছে ছোটবড় করিবার উপায় নাই! ধর্মজগতে ন্যায়দর্শনে, শিল্পকলাদিতে পূর্বপুরুষগণ উন্নত ছিলেন বলিয়াই বর্তমানে আমরা সেগুলিতে পশ্চাতে পড়িয়া আছি—তাহা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইলে চলিবে না, বরং আমরা গর্বের সহিত বলিব “আমাদের পূর্বপুরুষ সকল তথোদয়ই মালেক ছিলেন, আমরা নেশায় বিভোর হইয়া তাঁহাদের অর্জিত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি, আর না চেতনা যখন ফিরিয়া আসিয়াছে—আমরা উন্নতবংশের সন্তান—আমরা সূক্ষ্ম-বিদ্যা আয়ত্তের অধিকারী—আমরা স্বল্প চেষ্টাতেই আমাদের উন্নত পিতৃপুরুষ হইতেও উন্নততর সোপানে—জগতের সর্বজাতির লোভনীয় সুউচ্চ শিখর জয় করিয়া লইব।

মানবিকতা নিত্য উন্নতিশীল। মনুষ্যের জ্ঞান নিরন্তর অগ্রসর হইতেছে; প্রকৃতির উপর মনুষ্যের কর্তৃত্বও দিন দিন বাড়িতেছে। সভ্যতা, আমাদের গকে এক উন্নত মৌখ প্রজ্ঞতকরণোপযোগী সর্বদোষমুক্ত ভিত্তি, সুদৃঢ় পঠনমঞ্চ দান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিয়াছে! আমাদের জনসাধারণ অল্প দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে, সুযোগ সুবিধা পাইলে পৃথিবীর কোন জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভারতবাসী পশ্চাৎপদ নহে। আমরা একতার উপাসক হইলে অচিরে মনুষ্যোচিত ধর্ম্যে কণ্ঠে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে; এখন হইতে আর কোন সুযোগকেই বুণা যাইতে দেওয়া হইবে না; আমরা স্পষ্টই বুঝিয়াছি—দৈহিক বলই চরম বল নহে—মানসিক শক্তিই শক্তি—দৈহিক বন্ধন মাত্রই অধীনতা নয়—আন্তরিক বল অজয়, মানসিক গুণের পরিবাস্তিই স্বাধীনতা পরম আনন্দের হেতু!

এমন অবস্থায় নেতাদের আর জনসাধারণকে কোনক্রমেই ভাবিতে দেওয়া উচিত নয় যে তাহারা অল্পের অপেক্ষা হীন; বৈদেশিকগণও যে জাতীয়তা ও সভ্যতা ক্ষেত্রে আমাদের অল্পরত অবস্থার উল্লেখ করিয়া তুচ্ছ-ভাচ্ছিয়া করে তাহারও প্রতিবাদ পতিকার করা কর্তব্য। আমরা যতই নির্জিত হই না কেন, আমরা শিরদাঁড়া সোজা করিয়া আমাদের মস্তক সর্বদা উন্নত রাখিব, আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিকে চাগ্রত করিয়া স্মরণে রাখিব—আমরা মাহুষ,—আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকেও সেই শিক্ষার মনুষ্যের ধর্ম্যে মাহুষ করিয়া তুলিব। মাহুষ যে, নিজকে ছোট করিয়া দেখিলে সতাই ছোট হইয়া যায়। কাহারও নিকট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার বা কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক নাই! বন্ধুর সমালোচনা আমাদের আত্মকোষ করি—তাহাতে আমরা উপকৃত হইব; স্বদরদীনে,

ঈর্ষাময়-জাতিবিদ্বেষী-হলাহলে অস্থির হইবার কারণ নাই, নীলকণ্ঠের বংশধর আমরা অনায়াসে সমস্ত গলাধঃকরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইব।

পরের নন্দায় আমরা টলিব না, প্রশংসায় আমরা আত্মগরাইব না—আমরা একথা তুলিব না মূনিরও মতিভ্রম ঘটে। আমাদের পিতৃপুরুষের যে মতবাদটী ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা ভ্রম বলিয়াই গ্রহণ করিব, যে মতটী উন্নতির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহার উন্নতিতে সচেষ্ট হইব, আমাদের সকলদাই অরণ রাথিতে হইবে আমাদের আদর্শ আমাদের উন্নতিমূলক ও উন্নতযুগের উপযুক্ত হওয়া চাই! সেইটিতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালীকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই কার্য সম্পাদনে সাহস ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ প্রয়োজন; ইহাতে একতা, পরস্পর সহায়তা, মৈত্রী ও কল্লকেন্দ্র এক-উদ্দেশ্যমূলক হওয়া চাই, সর্বোপরি চাই,—কি ব্যক্তির, কি সমগ্র জাতির আত্মনির্ভরতা ও আত্মজ্ঞান। কেহ যদি আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তাহা গ্রহণে অবশ্য আমরা পরাভূত হইব না কিন্তু কার্যসম্পাদনে নির্ভর করিব কেবল আপনার শক্তির উপর। জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা সমাধানেও আমাদের একই নীতিতে (in this spirit) লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা প্রত্যেক বস্তুকে, প্রত্যেক মতবাদকে, চিন্তাকে, চিন্তা প্রণালীকে, আধুনিক সভ্যতার উজ্জল বৈজ্ঞানিক আলোকে ধরিয়া প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিব—তাহাতে সত্য ও সত্য কতখানি—তাহার পর না তাহা গ্রহণের কথা! তীব্র সমালোচনার চিহ্নিত হইলে আমাদের চলিবে না, চরম পরীক্ষার আমাদের কার্যকলাপ পরীক্ষিত হ'ক—আমরা তাহাই প্রার্থনা করি,—তবে না আমরা ধরিতে পারিব আমাদের অবলম্বিত পন্থা কতখানি বিপদসহ,—সার তাহাতে কতটুকু! ভবিষ্যতে তাহার অস্তিত্বের সম্ভবনা কি পরিমাণ! সত্যই আমরা ইংরাজ, জার্মান বা আমেরিকান বা জাপানীর অনুকরণ করিয়া বিদেশী হইতে চাই না,—তাহাতে আমাদের মঙ্গল নাই,—তাহাদের সত্যতা আর আমাদের সভ্যতার মাপ (standard) কখনই এক হইতে পারে না—আমরা ভারতবাসী, ভারতবাসীই থাকিব। মনে প্রাণে তাহাই প্রার্থনা করি,—উন্নতিতে, উত্তমে, উৎসাহে, আত্মশক্তিতে আত্মপদে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাই, মনুষ্যবংশের চিরআকাঙ্ক্ষিত মান্নির-পথগামী যাত্রীর অগ্রপংক্তিতে অগ্রসর হইব,—ভারতের অতীত গৌরব—প্রাচীন সভ্যতায় প্রথম পংক্তিতে তাহার স্থান—প্রথম ছিল—প্রথম থাকিতেই হইবে আমাদের—সেই স্থিতি, সেই ভবিষ্যৎ-আশা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া আত্মপ্রসাদের সহিত বলিব—আমরা আদি উন্নতির মাতৃভূমি ভারতের সন্তান; ভবিষ্যতেও মাকে আমাদের গৌরব-কিরীটে ভূষিতা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিব—“মা আমার!”

আমাদের জাতীয়তা এই এক ‘মা’ ডাকের মধ্যেই নিহিত! জাতীয় শিক্ষা বলিতে কি বুঝিব? স্থানীয় বা প্রাদেশিক, কিম্বা সাম্প্রদায়িক শিক্ষাই কি জাতীয় শিক্ষা? অধীত বা অধ্যয়ন-সহায়ক ভাষা বা অধ্যাপকের অথবা অধ্যয়ন-বাবস্থাকারীর জাতি অনুসারেই কি উহার নামকরণ? না—তাহা কিছুতেই নহে! সত্য কবে স্থানবিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিতে গতিবদ্ধ। আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ বলিয়াছেন,—সত্য যে শাস্ত্রত এখনকার ঋষিগণও তাহাই প্রচার করিতেছেন তাহাই,—বিজ্ঞান ও ন্যায়ের পরিমাণে সত্য অদ্বৈত! পাশ্চাত্য ন্যায় বিজ্ঞান, বৈদেশিক জাতি কর্তৃক আবিষ্কৃত ব্যাখ্যাত, বলিয়াই কি আমার তাহা গ্রহণবিমুখ হইব? আমরা এই যুগেও কি সেক্সপিয়র, বেকন, গেটে, শিলার, এমারসন, হুইটম্যান প্রমুখ, লক্ষ্যমাত্রা মণীষীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই—তাহাদের অমূল্য উক্তিগত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারি,—না তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে? ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অস্ত্রোপচার বিদ্যা, বায়ুবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্ভিদবিজ্ঞা,

জীবন প্রভৃতি কি আমাদের পূর্বপুরুষের জ্ঞান অতিক্রম করে নাই? বাবসা, বাণিজ্যনীতি, অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতি ৭ সাময়িক-যান-বাহন তত্ত্বের ত কথাই নাই। বৈদেশীক বলিয়া সে সকল পাবিত্যগ করিতে হইলে কি আর সভ্যজগতে কোন জাতির স্থান থাকে! আমরা ইদানিং ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ও ইউনানী হকিমী চিকিৎসা প্রণালীর অতি চুপশংসা ও সর্বোৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা শুনিতে পাই,—উহাতে যতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট সহায়ত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়াই কি পুনাকালের আয়ুর্বেদকে বর্তমান কালের বৈদেশীক চিকিৎসা প্রণালী হইতে উন্নত বলিতে হইবে,—অধুনক শিশুচিকিৎসা শিশুপালন, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি ভারতে যতই প্রসারিত হয়, ততই মঙ্গল সে কথা কে একদৃশীর মঃ অঙ্গীকার করিবে! ইউরোপও ত একথা বল না—পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে তাহাদের যে চিকিৎসা প্রণালী ছিল তাহাই তাহাদের চরম; তাহা হইলে উন্নতি হইত কিরূপে?—তবে আমরাই কেন গতিশীল হইয়া বলিব—আমাদের যাগ ছিল তাহাই চরম—প্রাচীনের উপর উন্নতির আর স্থান নাই—তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বর্তমানের অস্তিত্ব নাই—স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য!

আমাদের একদল লোকের মুখে শুনিতে পাই “কাজ কি বাবু ভুজ-জগত লইয়া অত কথা,—আধ্যাত্মিক উন্নতিই উন্নতি! আমায়ক ভাবাপন্ন যাহারা তাহারাই এসব বাহ্যিক বস্ত্র লইয়া মাতিয়েছে, মাতুক,—আমাদের নিভৃত (retired) জীবনই ভাল, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই সুখ—আমরা যা আছে সেই যথেষ্ট!” মুখে শুধু এসকল অসার অকথা বাক্য বলিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত নহে, তাহার পুস্তক লিখিয়া, কবিতা ও গুরুত্ব এই অজুত আধ্যাত্মিকতার বিষয়াজ দেশময় ছড়াইতেছেন,—এরা যদি দেশের বন্ধু—পরিব্রাজক হন—হা হরি—দেশদ্রোহী তবে আর কাহার! ‘হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রাণের স্বদেশী ভ্রাতৃগণ—সাবধান—আধ্যাত্মিকতা আর জড়তা এক নহে, তাগ অর্থে হারান নহে—ধান বলিতে নিদ্রা নহে। আধ্যাত্মিকতা যে সর্ববিষয় আত্মার উন্নতি—পরিণতি—মনুষ্যের মানুষ্যত্ব, পূর্ণ বিকাশের দিকে গতি!...দেহের মনের সকলের! আমরা নিভৃতে থাকিতে ইচ্ছা করিলেই কি একাধারে পড়িয়া থাকিতে পারিব, যে দেশের আয়তন কুড়িলক্ষ বর্গমাইলের অধিক যাহার অধিবাসীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর ১/৫ সে দেশের সম্ভাবনার পক্ষে কি আত্মগোপন সম্ভব? সম্ভাবন যদি মাতৃ ধন হইতে নিষ্কণ্টকে বঞ্চিত করে, তাহার অতুল অপরিমিত ঐশ্বর্য্য অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে না—অ’না আসিয়া দখল করিয়া লইবে নিশ্চয়।

আপনার ধন, অধিকার যে ‘আধ্যাত্মিকতার ওহিলায় বা আলোশ্রে’ অপরকে বিনাবাক্যবায় ছাড়িয়া দেয় সে কত দুঃখ অপদার্থ, কাপুরুষ! সবল আকাঙ্ক্ষা করে আপনার দখল। যাহা আমাদের তাহা কেন বিদেশীকে ভোগ করিতে দেব?

আমাদের সম্ভাবনায় যাহা গ্রাষ্য প্রাপ্য,—তাহা হইতে আমাদের বঞ্চিত করিলে পাপ কি আমাদের ল্পর্শ করিবে না? আমাদের বিত্ত, স্বত্ব, স্বাধীনতা, মাননিকতা বাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, বাহাতে তাহার উন্নতি, সেই পন্থাই আমাদের অবশ্য অবলম্বনীয়, সেই শিক্ষাতেই আমাদের সম্ভাবন-সম্ভবিত্তিকে শিক্ষিত করা অত্যাৱশ্যক। সেই শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা! তাহারই সুব্যবস্থা হউক!

মনুষ্যের মূলগত স্বভাব এক; বিভেদ বিভাগ কেবল সম্প্রদায়ে, ভাষায়, আবাসভূমির আবহাওয়ার,—তাহাতে কি? বাহ্যিক বিভিন্নতা যে তুচ্ছ; আন্তরিক,—আভ্যন্তরিক ধর্ম,—জগতে বে এক,—এক হইতেই চাহিতেছে,—প্রাণের স্বভাব একতা,—তাহা হইতেই হইবে। যুক্তরাজ্যে আসিয়া একবার নয়ন মন সার্থক করুন। সমগ্র সভ্য-জগতের অধিবাসী, বহু জাতি, বহুবর্ণের সদমস্থলে উপস্থিত হইয়া জয়দম করুন,—সত্যতা শিক্ষা,—বিকল্প-

পক্ষের শত প্রতিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা স্বত্বেও—মানুষকে গলাইয়া মিলাইয়া কি মোহিনী শক্তি বলে এক করিয়া ফেলিতেছে,—এক মহামানবে পরিণত করিতেছে । পথিকের, পর্যটকের বেশভূষা ধারণ-ধারণ, ভাষা, বাক্য, কথন-ভঙ্গী দেখিয়া শুনিয়া কি আর বিভেদ করিবার উপায় আছে—এ, ও-জাতি হইতে ভিন্ন ! তথায় দেখিতে পাইবেন জগতের সকল জাতি, সম্প্রদায় পৃথিবীর সকল ভাষা ওতপ্রোত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক ! একই ভাষায় সকলে এমনই ভাবে বাক্যালাপ করিতেছে, যে তাহাদিগকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই—এ-আমেরিকান ও ইংরাজ ও-ভারতবাসী ইত্যাদি ইত্যাদি ! এক, গা-বর্ণে সময় সময় পরিচয়, তাহাও বাহ্যিক, বেশ ভূষায় তাহাও এমনি ভাবে আচ্ছাদিত যে সহজে ধরিবার উপায় নাই ! কার্যক্ষেত্রে, কুশলতায় ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন জাতি এমনি মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে । বিসদৃশ ও অতি সামান্য, আমি এমন চীনা ও জাপানী অনেক দেখিয়াছি, যাহারা ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, ইউরোপীয়দের চেহারার সহিত এমনভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে প্রকৃত পরিচয় না জানা পর্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই তাহারা ইউরোপীয় নহে । জাপান যে কত দ্রুত ইউরোপীয় হইয়া পড়িতেছে তাহা অনেকেই অবগত নহেন । জাপানের এই অমুকরণ প্রবৃত্তিকে অনেকেই নিজার চক্ষে দেখিবেন কিন্তু জাপানীরা যে ইউরোপীয়দের অমুকরণ না করিয়াই পারে না । এই অমুকরণ যে স্বাভাবিক, সার্বজনিক ! এই যে, সে দিন যুক্তরাজ্যবাসী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ একপ্রাণ হইয়া জাংশ্বেরী বন্ধুত্ব যুদ্ধ করিল, এমন কি আমেরিকায় ভূমিষ্ট জাংশ্বেরী-সন্তান জাংশ্বেরী বন্ধুত্ব অস্ত্র-ধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—ইহার মূলে কি—ঐ একপ্রাণতা—দেশের স্বার্থ এক হইয়া নূতনত্বের দিকে অগ্রসর নহে ?

সত্য,—একীকরণ-জগত ভীষণ ! জগতের বৈচিত্র্যই সুন্দর ও নমনীয় ! তাহা সুন্দর বা যাহাই হ'ক্ জগতের বৈচিত্র্য মরিতে বাসিয়াছে । না—ঠিক্ তা নহে, বাহ্যতঃ উহার আর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না,—না—তাহাও নহে একবারে উহা বিলুপ্ত হইবার নহে,—তবে দুইশত বৎসরে উহা এমন হইবে যখন সমস্ত সভ্যজাতির চিন্তা, সভ্যতার জ্ঞান, মূলতঃ এক হইয়া যাইবে ! তৎকালে তাহাদের প্রচারকের, অধ্যাপকের, বাজকের, রাজনী তত্ত্বের ভাব ও ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে পারে কিন্তু জনসাধারণের জীবন-গতি এক হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে একই খাদে,—লক্ষ্য সকলেরই হইবে মহামানব সজ্জের মহাসমুদ্রে ! ইউরোপ ও এশিয়া এক হইয়া যাইবে, আফ্রিকা আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া দাঁড়াইবে, আমেরিকা কোল দিবে—পৃথিবী হইবে এক !—তখন আর এ বিভিন্নতা থাকিবে না,—এ ভিন্ন, বিদেশী, ওর দীক্ষা কেন আমি গ্রহণ করিব—সে ভাব জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে ।—এক দিন জগত, ভারতের নিকট শিশুর ছায় শিক্ষা করিয়াই আজ উন্নত হইয়াছে,—আমরা কেন তবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার নবরঙ্গে পূর্ণ করিতে, তাহাদের নিকট হইতে আহরণ করিতে কুণ্ঠিত বা লাজিত হইব !

শ্রীজানকীবল্লভ বিন্দাস ।

## বরণ ।

মরণের রূপে আজি হেরেছি তারে

মম কুঞ্জদ্বারে !

এত যে সাধের দেক

সযতনে রচা গেহ

যত শ্রেয় যত প্রেম

দিব উহারে !

সংসারে নানা কাজে

লুকায়ে আছিহু লাজে

গোপনে নানান্ সাজে

চিনে যাহারে !

মরণের রূপে আজি হেরেছি তারে

মম কুঞ্জদ্বারে !

ফিরিলে দুয়ার পানে

কতমত সাবধানে,—

দেখেছি সে আহ্বানে

আঁখির ঠারে !

করমের মাঝে যবে

বঁধুয়া সে বাঁশী-রবে

ফুকারি ফুকারি ক'বে

‘মনোর ভারে—

ভুলিয়া কি গেছ প্রিয় ভুলিলে কারে ?’

র’য়ে কুঞ্জদ্বারে !

এস আজি এস প্রিয় !

হে অনন্ত কমনীয় !

তুমি মম বরণীয়

লহ আমারে !

অবসান দিন-শেষে  
বিরাম-নগন-শেষে  
নিবিড় হিয়ায় এসে  
ধর গো তারে !  
যে তোমা ভুলিয়াছিল অহঙ্কারে ?

শ্রীমুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

## ভাগ্যালিপি ।

—:~:—

( ১ )

ইন্দ্রিয়া দরিদ্র কন্যা । সংসারে তাঁহার মা-ই ছিলেন একমাত্র অবলম্বন । তিনিও প্রায় মাসাধিক কাল হইতে শয্যাগত । এই দুঃখের দিনে, মহেন্দ্র বাবুই তাঁহাদের ছিলেন একমাত্র সহায় । লোকে বলে—ইন্দ্রিয়ার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাঁহার মাতা বলিতেন, তাঁহার নাকি জন্মপত্রিকায় ষোল বৎসরে কি একটা দোষ আছে । তাঁহার পূর্বের বিবাহ দেওয়া তাঁহার পিতার নিষেধ ছিল । কিন্তু প্রতিবেশিনীদের তীব্র বাক্য জালায় বিধবা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন । আজ এই রোগশয্যায় পড়িয়া দুঃখিনী বিধবা, কন্যার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন । এই অসহায় বালিকাকে কে বিবাহ করিবে ! তাঁহার এমন কোন হিতৈষী বন্ধু নাই, যিনি এই দুঃখিনী বালিকার বিবাহে সাহায্য করিবে বা দেখিয়া শুনিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তাহাকে দান করিবে । তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মাতাপুত্রীর দিন চলিতেছিল, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, তবু তাঁহার উপরে এতটাই চাপ দিতে বিধবার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল । ইন্দ্রিয়া সুন্দরী, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি হয় ত তাঁহার স্নেহের কন্যাকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিতেও পারেন । একটু ক্ষীণ আশা বিধবার অন্তরে জাগিয়া উঠিল । কিন্তু বাধা ঐ জন্মপত্রিকায় । বিধবা ভাবিয়া আকুল হইল, কাহার নিকট তাঁহার স্নেহের কন্যাকে রাখিয়া যাইবেন ! জগতে এমন কোন আত্মীয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া এই অনাথা বালিকা জীবনের বাকি দিনগুলি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিতে পারিবে ।

ইন্দ্রিয়াকে কিন্তু সেজন্য চিন্তিত বলিয়া মনে হইত না । সে রুগ্না মাতার সেবা করিয়া, সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাঁয়া দিত । এবং প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজে শয্যা ত্যাগ করিয়া, স্নানান্তে শিবপূজা করিয়া পুজার ফুলগুলিসহ মৃত্তিকানির্মিত শিবলিঙ্গটি গঙ্গার জলে—বিসর্জন দিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিত । অপরাহ্নে যখন মহেন্দ্রবাবু তাঁহার মাকে দেখিতে আসিতেন, তখন তাঁহার সহিত আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় গল্প করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত ।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল । ইন্দ্রিয়ার মাতার অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল । সে দিনটা ছিল বড় দেথনা । আকাশে করিকরভের মত স্তূপে স্তূপে মেঘ সঞ্চিত হইয়া দলে দলে

যেন এদিক্ ওদিকে মাতামাতি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সে ভীত মনে সেই অন্ধকার-ময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়াছিল। তাহারও হৃদয়টা জুড়িয়া বুঝি এমনই একটা কালো মেঘ, ঐ উন্মত্ত জড়ের মতই তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

মাতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। একটি সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভাগ করিয়া কহিলেন “আমি ত চল্লম ইন্দু, কিন্তু তোর কোন একটা ঝিল্পে করে দিয়ে যেতে পারলুম না, এই আমার বড় দুঃখ রইলো।” মাতার বাক্যে ইন্দিরার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইবার মত হইলেও সে শান্ত স্বরে কহিল “তার জন্যে দুঃখ কি মা? আমি চিরকুমারী থাকবো।” ক্ষণকালে মাতা উত্তর দিলেন “তা কি হয় মা! সমাজের ভয় সকলেরই আছে, এমন অবস্থায় কে তোকে ঘরে ঠাঁই দেবে? রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত করিয়া ইন্দু কহিল “তোমার ত আর ছেলেমেয়ে নাই মা, যে, তাদের বিয়ে দিতে হবে, আমার সমাজের ভয় কি মা? মহেন বাবুর স্নেহ-ছায়াতে সে আমি স্বন্দে দিন কাটিয়ে দেব।” মাতা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন “মহিনকে একবার খবর দে তো মা।” ইন্দিরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

( ২ )

মহেন্দ্র বাবু সুসজ্জিত অট্টালিকার বহু দাসদাসী সমভিবাগারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই বৃহৎ পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহের সৌন্দর্য্য যাতে বৃদ্ধি করে সেই স্ত্রী পুত্র পরিবার তাঁহার যে নাই! বিজ্ঞা-উপার্জন, বিষয়ালোচনা, অর্থ-উপার্জন করিয়াই তিনি দিন কাটাইতেছিলেন। যাহাতে অনুরাগ, তিনি তাহাই করিয়াছেন, সংসারে অনুরাগ ছিল না। কাজেই সেটা নিশ্চয়োজন বিবেচনা করিয়া ভাগ করিয়াছিলেন। এমনি করিয়াই তাঁহার জীবনের সন্তুবিংশতি বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল, এবং অবশিষ্ট দিনগুলি সেইভাবে কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যে দিন বালাবন্ধু মোহিনী বাবুর অনুরোধে এই দুঃস্থ পরিবারের উপকারার্থে আসিয়া তাহাদের সহিত পরিচিত হইলেন, যে দিন বালাবন্ধু ইন্দিরা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল সেই দিন হইতে কি যেন একটা মোহে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এমন গোলাপী রং এমন চোখ! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যেন সেই কোমল দেহের সর্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন “এত রূপ!” তাঁহার উদাসীন-ময় জীবনটাকে কে যেন এই দরিদ্র-পরিবারের সহিত একত্রে বাঁধিয়া দিয়া তাহার জীবনে সাফল্য আনয়ন করিয়া দিল। তিনি প্রতি দিন তাহাদের বাড়ী যাইয়া ইন্দিরার মাতাকে দেখিয়া আসতেন। এবং সরলপ্রাণ ইন্দিরার সহিত গল্প করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতেন। লোকে নানা প্রকার কথা রটাইতে ছাড়িত না। এতটা বিধবা সময়ে সময়ে যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিয়া কতাকে বড় একটা মহেন্দ্র বাবুর সহিত মিশিতে দিতে চাহিতেন না, আজ কিন্তু তাহার সে দ্বিধাসঙ্কোচ আর রহিল না। মহেন্দ্র বাবু আসিলে তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন “বাবা, আমি ইন্দুকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি, যদি যোগ্য পাত্র পাও বাবা, তা হলে ইন্দিরার বিয়ে দিও। তুমি আমাদের অনেক উপকার করেচ, আর বেশী কি বলবো বাবা, বিধবার এই শেষ অনুরোধ পার ত রক্ষা করো।” ইন্দিরা সজ্জ দৃষ্টিতে একবার মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া, মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল “না মা, তুমি এ অনুরোধ করো না, আমি জীবনের বাকি দিনগুলো এমনই বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো, সেজন্যে ঠুকে বুঝি অনুরোধ করছি।” মহেন্দ্র, শশবাস্তে বলিয়া উঠিল “না না, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি প্রাণপণ যত্ন করবো।” মহেন্দ্রের বাক্যে মাতার জ্ঞান মুখখানা সন্ধ্যার জ্ঞান আলোটুকুর মত

সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াই মুহূর্ত্ত যেন গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গেল। বিধবার কৃত্তর অস্তরের শেষ আর্দ্রাব-বচনটুকুও জানাইবার অবকাশ হইল না। বিধবা তাহার হস্তায় কণ্ঠ্যকে অর্পণ করবার জন্তই যেন এতক্ষণ জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

হিন্দুর মাতার মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বাবু একজন বৃদ্ধা শ্রীলোককে হিন্দুর নিকট নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর সে বাড়ীতে সন্ধ্যাহঁ যাওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া ঘন ঘন যাত্রা আসা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কেবল আপনাত হৃদয়ের দুঃখিতা অনুভব করিয়া মনে মনে লাভজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিলেন। এই আকর্ষণের পারণাম কি? ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপ সন্ধানে উপনীত হইতে না পারিয়া ভবিষ্যতের হাতে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া স্বকল্পিত শত যুক্তিতে আত্ম-প্রতারণায় আত্মস্থ হইতে, মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন।

সেদিন রাববার, হাতে কোনও কাজ না থাকায় ছুই বন্ধুতে বাসিয়া গল্প করিতেছিলেন। একথা সেকথার পর মোহিনী বাবু বলিলেন “হিন্দুর বিয়ের আর কোথায় চেষ্টা করা যাবে তাহ, তুমিই তাকে বরণ করে নাও না?” মোহিনীর বাক্যে মহেন্দ্র যেন আকাশ হতে পাড়লেন, “আমি! বলিস্ কি রে, এ বয়সে আবার বিয়ে?” ঈশ্বর হাসিয়া মোহিনী বাবু কহিলেন “তোমার চেয়ে কত বড়ো পার হয়ে যাচ্ছে, ত তুই! তোমার এমন কি বেশী বয়স হয়েছে শুনি?” মহেন্দ্র উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—“খেপলি না কি রে! আমার মত পাত্রের হাতে এমন রত্ন দেওয়া যায়?” সোৎসাহে মোহিনী কহিল “বৈদ্য যাবে না, তুমি পাত্রটা মন্দাকসে? একটু বয়স বেশী! তা এমন ঢের হয়ে থাকে।” পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া মহেন্দ্র কহিলেন “তারপর এই বড়ো বয়সে নাতনীর বয়সী স্ত্রী এনে, চুলে কলপ মাখিয়ে আগার নুনের করে যৌবনের অভিনয় করতে হবে বাহা!” মহেন্দ্র এই উপহাস বাক্যে মোহিনী মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, “ইন্দু বা কি কচি থকো রে, তারও ত পনরো পঞ্চাশের বোধ হয়। যাক্ তুই ত কাকুর কথা রাখবে নে, মিছে বলা।” বলিয়া সে ফুল মনে উঠিয়া চলিয়া গেল।

( ৩ )

গোধূলির শেষ-সূর্য্যের কিরণটুকু তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে নাই। খিরকির সমুদ্রস্থ নদীতে যেন সোনার গলে টল মল করিতেছিল। পরপাবে যংদুর দৃষ্টি যাত্র মাতার পর মাতা যেন প্রকৃতির শ্রীমাঞ্চল-খানি বিছাইয়া দিয়াছে। সূর্য্যদেব যাই যাহ করিয়াও যেন দরার দারা কাটাওয়া তখনও যাইতে পারিতোছিলেন না নির্জ্ঞান ঘাটে বসিয়া হিন্দুর মাতার কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহার সমস্ত হৃদয়খানা দারুণ বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। অস্তরের শূন্যতা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় চক্ষু হইতে বর্ষ বর্ষ কান্না অশ্রু বারিয়া পাড়িতেছিল। সহসা মহেন্দ্র বাবুর আগমনে যেন তাহার চক্ষুর ধারাটা একবারে দলাইয়া গেল। বহুদিন পরে হঠাৎ তাঁহাকে আনিত্তে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত, একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়স আজ হিন্দুর প্রথম জানিতে পারিল,—সে যুবতী! যে সমাচার তাহার কাছে এই পঞ্চদশ বৎসর অগোচর ছিল, হঠাৎ আজ কোন বৈজ্ঞানিক তার যোগে কে যেন তাহা তাহাকে জানাইয়া দিয়া গেল, কি একটা নূতন ভাষা তাহার কানে কি কহিয়া তাহার হৃদয়টাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। যেন তরুণ, কিরণ-পাতে স্তব্ধ তুষার নিব্বরের মত সে বিগলিত বিচলিত হইয়া মস্তক নত করিল। মহেন্দ্র বাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন “আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে দেখতে না পেয়ে এখানে এসুম, তুমি একলা এখানে বসে কি করছ ইন্দু?” একটু দিন পূর্বে যাহার সাংঘাত গল্প



করিয়া শেষ হইত না, আজ লজ্জায় তাহার সচিত ইন্দ্রিরা কথা কহিতে পারিল না। লজ্জারাগে তাহার সৌন্দর্য্য যেন শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। মুগ্ধনেত্রে মহেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। একটুখান পরে আপনাকে সংযত করিয়া কহিলেন—“একটা কথা আছে ইন্দু, ভিতরে এস।” লজ্জানত নেত্রে, বাতাহতা গতার ন্যায় কম্পিত চরণে ইন্দ্রিরা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মহেন্দ্র বাবুর ক্ষয়হস্তীও সংসা যেন বেশুরা বাড়িয়া উঠিল। সেভাব তিনি অহরতম প্রদেশে চাপা দিয়া শাস্তকণ্ঠে যেন সন্মুখের প্রাচীরটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “একটি পাত্র পাওয়া গোছ, যদিও একথাটা তোমাকে বলা নিম্নাশ্রয়জন, তবুও তুমি বড় হয়েচ, উচিত বোধে আমি তোমার মতটা জানতে এসেছি, ইন্দু।” এই বার তিনি ইন্দুর মুখের পানে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। নত মস্তক, চঞ্চাচ্ছাদিত কণ্ঠে ইন্দ্রিরা কহিল “মার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা ত আপনার অবদিত নাই, তবে একথা কেন :” একটুখানি থামিয়া মহেন্দ্র বাবু কহিলেন “সে কোনও কাজের কথা নয় ইন্দু, কোনও ব্রাহ্মণ কল্যাহই অববাহিত থাকার ব্যস্থা নাই। তা ছাড়া তোমার দেখাশুনা করবে কে ?” শাস্তকণ্ঠে ইন্দ্রিরা কহিল “একটি অনাথা ব্রাহ্মণ কল্যা আপনার কাছে বোধ হয় ততটা ভার নাও হতে পারে। অন্ততঃ আমিও তেননিই আশা করি।” ক্ষুণ্ণ স্বরে মহেন্দ্র কহিল “সে জ্ঞান নয়। এ চিরজীবনের কথা। তুমি ভাল করে বুঝে দেখো ইন্দু, তারপর আজ না হয় কাল একথার উত্তর দিও। আমি এখন চলুম।” বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তস্তল মথিত করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। নিরতিশয় বিষন্ন মনে সেই স্থানে ইন্দ্রিরা বসিয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের শক্তি, অন্তরের সে দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল যেন।

( ৪ )

মহেন্দ্র বাবুর চক্ষে সংসার শূন্য,—তাঁহার দাসদাসীপূর্ণ সেই বৃহৎ বাড়ীখানা যেন জনমানব ছীন। কিন্তু এই শূন্যতা যে, কোন খানটায় তাহা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম কহিতে না পারিলেও একটা যে কিছু ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। একখান চৌকির উপরে শুষ্কশয়নবস্থায় তিনি সেই কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া মিলাইয়া দেখেছিলেন। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন চাকর আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি টেরও পান নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়া সন্মুখের খোলা জানালাটা দিয়া বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন। অমান বস্ত্র বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নৈজের ভীষনটা যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। শত আবশ্যকেও আজ কাহাকেও কাছে ডাকিতে ইচ্ছা হইতে ছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার দিকে চাহিয়া স্থপাতের গড়া মুষ্টির মত শুষ্কভাবে বসিয়া বিরূপে যে, সময় কাটিতে ছিল তাঁহার খেয়াল ছিল না; কখন যে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও মনে নাই। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন প্রহাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভৃত্য ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—“বাবু, মোহিনী বাবু এসেছেন।” “আচ্ছা, এই-নে নিয়ে আস।” বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। গত রক্তনীর অন্তরের অবসাদটাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া মুখে চোখে প্রকল্পতা আনিতে চেষ্টা করলেন।

মোহিনী বাবু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন “কি হে মহেন, আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন বল শু ?” মহেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। “তুই স্বপ্ন দেখেছিস না কি রে ?” মহেন্দ্র একথা অস্বীকার করিলেও মোহিনী স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—একটা চিন্তায় যেন ক্ষুণ্ণ অহরহ দগ্ধ করিয়া তাঁহার বদনে একটা বিষাদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা গোপন করা মহেন্দ্রের সাধ্যাতীত হইলেও সে গোপন করিতেছে কেন ? ভাবিয়া মোহিনী কহিল

“ইন্দিরার বিয়ের কি হলো হে?” সহসা মহেন্দ্রের মুখখানা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল “সে ত বিয়ে করতে চায় না, বুঝা চেষ্টা করেছে আর লাভ কি ভাই।” বিস্মিত হইয়া মোহিনী কহিল “সে কি হে, বিয়েই করতে চায় না! কি বলে সে?”

“সে বলে—চিরকুমারী থাকবে।” একটুখানি চিন্তা করিয়া মোহিনী কহিল “এও কি সম্ভব! তুমি ভাল কোরে জিজ্ঞেস করো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও কথা আছে।” আগ্রহের স্বরে মহেন্দ্র কহিল “তবে চলনা রে একটু ঘুরে আসা যাক। হয় ত তোর কাছে সে কথাটা সোজা হয়ে যাবে।” মোহিনী একটুখানি হাসিয়া কহিল “আমার কাছে ত সে কথা সোজা হয়েই রয়েছে, তুই ত বুঝাব না ভাই, মিছে বলা।” বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মহেন্দ্র আনমনে উত্তর দিল “দূর তুই যান্নর তাই ভাবিস।” মোহিনী কোন কথা না বলিয়া আবারও একটুখানি হাসিয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্রে বাবু চন্দ্রিকে অনেক বুঝাইয়াও স্ববশে আনিতে পারিলেন না। ভাবিলেন তাহার জননী যখন— তাঁহারই উপরে তাহার সম্পূর্ণ ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য। ইন্দিরার বিবাহের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এবং আপনার অবাধা অন্তরটার উপরে মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রাণপণে তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের স্বার্থের জন্য তাহার প্রতি অন্যায় করিবার তাঁহার কোন অধিকার?

( ৫ )

গৃহকর্ষ্য সমাপনান্তে ইন্দ্রি তাহাদের ক্ষুদ্র অঙ্গনের এক কোণে তাহার মাতার পরিত্যক্ত স্থানটিতে বসিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। পঞ্চমীর অর্দ্ধফুট জ্যোৎস্না ক্রমে সরিয়া যাইতেছে—চাঁদও পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপরের নীল আকাশে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ স্থানে স্থানে যেন উপেক্ষিত ভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রি আকাশের পানে চাছিল শূন্য মনে তাছাই দেখিতেছিল। আকাশের স্থানে স্থানে কুল পেন্ডার মত মেঘগুলি যেমন ভাসিয়া যাইতেছিল—ইন্দ্রিও অন্তরের সমস্ত চিন্তাগুলো যেন তেমনি একটির পর একটি ভাসিয়া যাঁতেছিল। ইন্দ্রিয়ার ভাগ্যালিপির কথা সে যেদিন মায়ের কাছে শুনিয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই চিরকুমারী থাকার কথাটা প্রচুরভাবে তাহার অন্তরে জাগিয়াছিল। এই পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে ত আর অজ্ঞ কিছুই ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর মন তাহা চায় না কেন? আর একটা আকাজকা তাহার অন্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিয়া উঠে কেন? সহসা চমকিত হইয়া সে যখন আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থানটাতে দৃষ্টিপাত করে—দেখে সেখানে একটা অকুল সমুদ্রই বহিয়া যাইতেছে। তেমনি উদ্বেল উচ্ছ্বাস তেমনি বাতাসের শব্দ, তেমনি দিকহারা অশান্তি। কিন্তু কেন? তবু-জিজ্ঞাসু হইয়া সে যখন সেই সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন কি দেখিতে পায়? কেবল নৈরশাময় অন্ধকারের সহিত তাহার জীবনের সহস্র সংঘাতময় ধারণাগুলো মিশিয়া যেন অকূলে ছুটিতেছে। কিন্তু আর একটা জীবনের অস্পষ্ট ছায়া অজ্ঞাতে তাহার জীবনের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে এমন দিশাহারা করিয়া তুলে কেন? জননী যদি তাহার সেই শেষ মুহূর্ত্তে এমন একটা অসম্ভব আশার আভাস না দিয়া যাঁতেন, তাহা হইলে হয় ত সে আপনার ভাগ্যালিপিতাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে জীবনটাকে বাঁচাইতে পারিত। কিন্তু এখন ত তাহা হইবার উপায় নাই, এ যে তাহার মায়ের দান। তিনি শ্বশুরে বাহাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই যে তাহার একমাত্র উপাস্ত দেবতা। তাহার কথা সে মিথ্যা হইতে দিবে না,

করং চিরদিন এমনি জলিয়া মরিবে। সে চিন্তার অন্তরে শিহরিয়া উঠে। না, না, তাহা যে হটবার মছে! তাঁহার মানসস্থল নষ্ট সে ভইতে দিবে না, তাছাড়া এই অনাথা বালিকাকে কি তিনি হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছেন? এ শুধু তাঁহার দয়া মাত্র! পশ্চাত্তাপ পদ শব্দ সে সচলিত হটয়া ফিরিয়া চাছিল। বুঝা হরি ম—“হাঁ গা বাছা, সারা রাতটা কি বোসেই কাটাবে? ঘরে এস না মা।” “এই যে যাই হরির মা।” বলিয়া সে উঠিয়া ঘরে গেল।

পরদিন সকালে স্বচন্দ্র বোপিত বৃক্ণগুলিতে জল সেচন করিয়া সে বাড়ীর ভিতর পাগলনে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—মহেন্দ্র বাবু আসিয়া তাহারই অপেক্ষার বসিয়া আছেন। তখন তাহার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যাত খেলিয়া গেল। রোমাঞ্চিত দেহে, সে মধ্য পথেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পদস্থ যেন আর উঠিতে চাচে না। তাহার সেট অবস্থা দৃষ্টি করিয়া মহেন্দ্র বাবু একটুখানি হাসিয়া কহিলেন “আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি ইন্দু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে এস না, একটা কথা আছে।” ইন্দু ভাবিল ‘আবার সেট কথা! এ কথার কি শেষ নাই? প্রতিদিন এই বাক্যবাণে জর্জরিত করিবার জন্যই কি উনি এখানে আসেন! এ’ক বৃহস্ত! যাক্ আজ সে কথার একটা নীমাংসা শেষ করিয়া দিবে। আর নিতাই এ’ত তীর জাগান্দী ঘটনা লইয়া বাক্যলাপ আর সচ্য হয় না।’ ধীরে ধীরে উঠিয়া যাওয়া সে মহেন্দ্র বাবুর একটু দূরে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর, মহেন্দ্র বাবু আপনাকে সংগত করিয়া লইয়া বলিলেন “তুমি আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ ইন্দু—” ইন্দুরা কিজানু দৃষ্টিতে একবার মহেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিয়া লইল। সহসা চারি চক্রে মিলন হইয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু বাত্বের দিকে দৃষ্টি ফরাইয়া লইয়া আন মনে যেন বলিয়া উঠিলেন “তোমার অন্তরের কথাটা স্পষ্ট না শুনে আমি আজ আর উঠি না ইন্দু।” ইন্দুরা প্রাণপণ বলে হৃদয়ে লুপ্ততা আনিয়া কহিল “সেটা নাট গুলেন, আমার ভাগ্যকিপির কথা ত আপনার অবদিত নাই, সেটাই কি বাথট হয়?” “কিন্তু আমি তোমার কোষ্টির মিল্ করেই তার বাবস্থা করেছি-তবুও তুমি সেট কথাটাই কেন যে ঘরে রয়েছ, আচ্ছা আমার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হওয়া কি তুমি সম্ভব মনে কর?” “না—যাক্ সে কথা আর আমি শুনতে চাই না। কিন্তু তাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি?” “নিশ্চয়ই, নইলে কোকে ভাবাবে কি—” একটুখানি থামিয়া ইন্দু কহিল “তবে গুলুন, ভে’ব’ছিলুম এ জীবন পাকতে একথা আপনাকে জান’ত দোষ না, কিন্তু আপনার পীড়াপীড়িতে আজ আমাকে ব’লে হলে, দোষ নেবেন না। মা আমাকে সম্প্রদান করে গেছেন, আমি নিবেদিতা! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করা অসম্ভব।” বিন্মিতভাবে মহেন্দ্র বাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন “এ’া কি বলে, তুমি নিবেদিতা! কিন্তু এ কথা ত তোমার মা আমাকে কিছুই বলেন নাই। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ইন্দুরা “মায়ের শেষ সময়ের কথার্ত্তলো একবার ভেবে দেখুন দেখি, কিন্তু সে জাজ আমি আপনাকে লোকের কাছে অপদস্থ করতে চাই না। আমাকে ক্ষমা করুন।” বলিয়া ক্রতপদে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

( ৬ )

সেদিন ইন্দুরার সজ্জিত বাক্যলাপের পরে, একটি কালো পর্দা মহেন্দ্র বাবুর চোখের সম্মুখ হটতে সরিয়া গিয়া, সমস্ত ঘটনাটা যেন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। তবুও তিনি কাঁপিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, এই কথাটাই ঠিক তার অন্তরের কথা কি না। এতক্ষণ তিনি ইন্দুরার দিকটা লইয়াই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতে ছিলেন, এবং সেই দিকটাতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজের দিকটা ভাবিয়া দেখিবার মত তাঁর নোটেই

অবসর হয় নাই। চঠাৎ সে কণাণী মনে পড়িয়া সমস্তই যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে মনে—লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন “এতকাল পরে বিবাহিত জীবনী কেনন লাগিলে! লোকেই বা কি বলিবে? ছিঃ!” সমস্ত জুতার শব্দে ফিরিয়া চাতিতেই, সমুখ মোহিনী বাবুকে আসিতে দেখিয়া শশবাস্তে উঠিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন।

স্নেহ-ভাসিয়া মোহিনী কহিল “কিহে, তুমি যে, একবার ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়া, বাপার কি বল দিকি?” “বিলম্ব, কে, আমি! আমি রোজই ত বেরই ভাই, ঘোরই দেখা গাইনে।” বলিয়া তাড়াকে এক প্রকার টানিয়া লইয়াই শয্যাঘর হইয়া বসিল।

এ কথা সে কথার পর, মোহিনী বাবুর জেবার টান তাঁর অন্তস্তল মধ্যে রাখেন যা কিছু লুক্কায়িত ছিল, সমস্তই প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, একটুকুও গোপন কোনাখান আটকাইয়া রহিল না। মোহিনী বাবু নিতুন্ড-ভাবে বসিয়া সব শুনিলেন, একটা আশ্রমের নিঃশ্বাস ভাগ করিয়া কহিলেন—“যাক, তাহলে এখন সব উদ্‌ঘাট করা যাক, কি বল?” আজ চঠাৎ বন্ধু নিকট ছদ্মবেশ সমস্ত ভারটা উন্মোচন করিয়া দিয়া, মহেন্দ্র বাবু অনেক পরিমাণে মনটা হালকা বোধ করিলেন ও একটু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, এবং কহিলেন “সে ভাই এত বাস্তব কেন? এখনও তার মনেও কথাটা ঠিক দেখা যায় নাই, সেবস মাঘর আদর্শ বলেই যদি—” বাধা দিয়া মোহিনী বাবু কহিল “আচ্ছা তাই হোক কিন্তু এসংবাদটা তোমার ত্রিশূলক দিতে পারি কি? কারণ—বহুর মাগী, কনের শিসি হয়ে সমস্ত ভাদটা ত তাকেই বটেতে হবে, কি বল?” মহেন্দ্র বাবু কি বলিতে উদাত্ত হইতেই, মোহিনী বাবু বলিয়া উঠিলেন “থাম ভাই, আর কোনও কথা আমি শুনত বাধা নই।” প্রকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রাণের জোৎস্নাময়ী রজনী অলস মধুর পবনে তরলতা—সোনালি চোখগুলোকে মুগ্ধ মন তুলিতেছিল। এমনি একটা আশ্রমময়ী বাঁমনীতে মহেন্দ্র বাবুর সহিত ইন্দিরার শুভ পরিণয় হইয়া গেল। এ বিবাহ সেরূপ উৎসবান্বিত কিছুই হইল না। মোহিনী বাবু চুই তরফা ভার বহন করিয়াও নিঃশব্দ বস্ত্রিগণকে আদর-অভ্যর্থনার ভূমি করিতে পারিয়াছিলেন। যথা সময়ে ইন্দিরা আসিয়া মহেন্দ্র বাবুর মন গৃহ পূর্ণ করিয়া দিল।

সব্বৎসর পরে আনন্দময়ীর আগমনে যেন সমস্ত বঙ্গ ভীর্ণ অবসাদ দূরে রাখিয়া নবজন্ম লাভ করে—প্রবাসী স্বর্গ প্রবাস বাপানের পর, শত আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল যেন কত নিহিত স্পন্দ বেলনার—কত ক্ষুদ্রীর্ণ বিরহের অবসানে কত স্মৃতি—আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া গৃহীকে আবাহন করিয়া কয় তেননি মহেন্দ্র বাবুর শূন্য গৃহখানি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ইন্দিরাকে আবাহন করিয়া লইল। এবং সেই আনন্দময়ী যেন শতধারে ইন্দিরাকে ও স্পর্শ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন একটা অণুনা তন্ত্রীতে সহসা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার সমুদ্রের যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিল।

ইন্দিরা নেতাৎ বালিকা ছিল না, মহেন্দ্র বাবুর বিশৃঙ্খল সংসারে সীতাই শৃঙ্খল স্থাপন করিয়া, মহেন্দ্র বাবুকে সুখী করিতে যৎসামান্য চেষ্টা করিয়াছিল, এবং বোধ করি সফল হইতেও পারিয়াছিল। আমরা দৃঢ় কর্ত্তি বলিতে পারি যে, মহেন্দ্র বাবুর অস্বস্ত-রঞ্জিত কেশকলাপে কলপ মাথাইবার আদৌ প্রয়োজন হয় নাই, তবে স্তম্ভভীর নিশিথে তাঁতাকে নৃতন করিয়া কোনও অভিনয় করিতে হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা সঠিক অবগত নহি, বরং তাঁতাকে পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিই দেখা যাইত।

হান্সরাকে কিন্তু একটু ক্ষুণ্ণ বর্ণিয়াই বোধ হইত। যদিও মাতার শেষ অমুরোধ রক্ষা হইয়ায় একটা অব্যক্ত আনন্দে তাহার হৃদয়স্থানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্য চিন্তা সেখানে স্থান পাইত না, তথাপি আপনার ভাগ্যলিপির কথাটা মাঝে মাঝে কঁটার মত খচ খচ করিয়া বাঁধিয়া তাহার অন্তরটাকে বাঁধিত করিয়া তুলিত। মহেন্দ্র বাবুর স্নেহ শাস্ত্র বাক্যে তাহা ঢাকিয়া ফেলিলেও সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। মহেন্দ্র বাবু বলেন— “তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না, মানুষ যে মানুষের অদৃষ্ট গণনা করিয়া এত সুস্পষ্ট বলিয়া দিতে পারে তাহা একবারেই অসম্ভব। আর যদিই তা হয় ত তিনি পুরুষাকারের দ্বারা নিশ্চয়ই খণ্ডন করিতে পারিবে। এত শীঘ্র সেটা ফলবার কোন বিচিত্র কারণ নাই। অন্ততঃ তাহার এত সুস্থ স্বপ্ন দেহে।

( ৭ )

তখন গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্ৰামে সহরের ন্যায় অস্ত্যধিক গ্রীষ্ম না থাকিলেও এক একটা দমকা আভাস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেন আগুন বৃষ্টি করিয়া বাইতেছিল। অমনি একটা সময়ে ইন্দিরা হরির মাকে সঙ্গে লইয়া, খিড়কির দ্বার দিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটিতে পা দিয়া যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এবং তাহার মাতা যেখানে বসিয়া পূজা অর্চনা করিতেন, সেই তুলসীমন্ডের নিকটে বসিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার সর্বময়ী কত্নী হইলেও ইন্দিরা তাহার মাতার পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র কুটিরখানির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিগত জীবনের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি যে, এই কুটিরখানির সহিত বিজড়িত হইয়া আছে, সেখানেই সে যে আশ্রয় পালিত হইয়াছে, কত হর্ষোচ্ছাস, কত মর্ষবেদনা যে, তাহার মূলিকণার মধ্যে নিহিত আছে, বাহা আজীবনের পরিচিত, তাহা কি দুই একদিনে সহজে বিস্মৃত হইতে পারে? তাই মহেন্দ্র বাবুর প্রকাণ্ড পুরী ত্যাগ করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া এই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র কুটিরখানিতে বাস করিত, এবং বৃহৎ অট্টালিকা অপেক্ষা, এইখানেই সে যেন বেশী আরাম বোধ করিত। আর একটা মাস, তার পরেই সে ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া সতরো বৎসরে প্রবেশ করবে। তা হলেই আর কি? ভাবিয়া তাহার অন্তরতম স্থান হইতে আপনা হইতেই যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এমন ভাগ্য কি সে করিয়াছে! তাহার অদৃষ্টকালের তন-রাশি কাটিয়া গিয়া, সে সৌভাগ্য রবি কি উদ্ভিত হইবে? শুষ্ক প্রায় আশা লতাটিতে নব নব পত্র মুঞ্জরিত হইয়া কুসুমকলিকা প্রফুল্লিত হইয়া তাহার অদৃষ্ট-কানন সুশোভিত সৌরভময় করিয়া তুলিবে? সে ভাগ্য যে, সে করিয়া আসে নাই। একটা অগোচর বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অমনি দুইটি চোখের পাতা যেন অশ্রু সিক্ত হইয়া উঠিল। স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় কোনমতে সে তাহা রোধ করিয়া অন্যদিকে মন দিতে চেষ্টা করিতেছিল।

আজ প্রীতি ভোজ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া মোহিনী বাবু—মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গণে পা দিয়াই ডাকিলেন “মহেন্দ্র কই হে?” মহেন্দ্র বাবু শয্যাায় শয়ন করিয়া ছিলেন, ভিতর হইতেই ডাকিলেন “কে মোহিনী, আর তাই।” ঘরে ঢুকিয়াই মোহিনী বাবু কহিলেন “এমন সময়ে তুমি আছ যে? আজ আমার ওখানে নেমতন্ন, দুজনরই বৃক্ষে।” “কিন্তু আমি ত তাই আজ যেতে পারব না, আমার শরীরটে আজ তত ভাল নাই, লেজ ত খুঁই হঠাৎ রে! কিন্তু আজ কাল আমার শরীরের দিকে একটু বেশী মন দিতে হয়েছে কিনা। তা তাই লেজটা ক্রীড়াফুলকে হুঃখ করতে নিষেধ করে দিস বৃক্ষি।” একটুখান খামিয়া তাবার আপনা হইতেই কহিলেন “আমি আর এক দিন থের আসবো’খন, আ ইন্দুক নিয়ে যা, তাহলেই দুজনকে খ ওরানর ফল হবে,

আমার শরীরটে নিতাস্তই খারাপ, নইলে আমিও যেতুম।” ক্ষুধা স্বরে মোহিনী বাবু—“কি হয়েছে তোমার?” বলিয়া গায়ে হাত দিয়া—“তাই ত গাটা একটু গরম ঠেকছে যেন, কাজ নেই তাই যে দিন-সন্ধ্যা পড়েছে। কিন্তু শ্রীশ ফুলকে পাঠিয়ে দিস্ আমি গাড়ী পাঠাব।” বলিয়া তিনি গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বাবু ডাকিয়া বলিলেন “হাঁ সে আর বলতে হবে না তুই যা।”

হিন্দু রান্নাবর হইতে তাঁহাদের বাক্যানাপ শুনিতেছিল। শরীর অসুস্থ, কথাটা শুনিয়া তাহার বৃকের ভিতরটা হাঁৎ কারিয়া উঠিল। হস্তের কাঁ দূরে তেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল, এবং মহেন্দ্র বাবুর ললাটে হস্ত রাখিয়া কহিল “উঃ তাই ত, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে যে।” বলিয়া ভাত চাকিত নেক্রে মহেন্দ্র বাবুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল “তুমি আমার যাওয়ার কথা শুঁকে আবার কেন বললে? আমি ত যেতে পারব না।”

মহেন্দ্র বাবু একটুখান হাসিয়া কহিল “কেন?”

“তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে?”

“তাতে কি? আমি ত আর এক দণ্ডেই মরে যাব না।” ইন্দিরা অন্তরে যেন শিহরিয়া উঠিল, ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল ‘আহা কথার ছিঁর দেখ না, তা হ’লেও আমি যাব না কিন্তু।’

“না হিন্দু সে হবে না, আমি এখনও অনেক দিন বাঁচবো, তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি যাও।” বলিয়া আপনার শরীরের প্রতি এক বার দৃষ্টি করিয়া আবারও কহিল “এ শরীর শীগ্গির ভাঙতে না, তুমি একটু:তই ভয় পাও কেন বল ত?”

তবুও আমি যাব না, হরির মা গিয়ে বলে আসুক।”

“ছি, হিন্দু তা হয় না, আমাদের কোনোই তাদের এই আয়োজন, শ্রীশ্ ফুল তাহলে অত্যন্ত ক্ষুধা হবেন, তুমি মিছে ভয় করছো, আমার তেমন কিছুই হয় নি ত।” বলিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া ললাটে চুষন করিলেন। হান্দরা কিস্তি সে কথা শুনিয়া না, ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ঐযথ পথের কোনও ক্রট হইল না, তার উপর হৃদয়ার প্রাণপণ শুশ্রূষা, তবুও কিস্তি অর প্রতি দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যেন শয্যার সহিত মিশিয়া বাইতেছে। হান্দরা তাহা লক্ষ্য করিল। রোগ যে চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িতেছে, তাহা বুঝিতে হান্দরার বিবেক হইল না। তবুও কিস্তি সে আশা ত্যাগ করতে পারিল না। হায়, আশা না মিটিতেই যে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতে বাসিয়াছে, নিষ্ঠুর ভাগ্য যেন যোচময় সুখ স্বপ্নের মতই তাহাকে ভ্রান্তি করিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। স্বামীর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়া সে ভীত বেদনায় দগ্ধ হইতেছিল।

শশবাস্তে মোহিনী বাবু ধরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন “শ্রীশ্ ফুল, এখন কেমন দেখতে?” বিবর্ণ মুখে, তাহার বড় বড় কালো চক্ষু দুইটি মোহিনী বাবুর মুখের উপর স্থাপিত রাখিয়া কাম্পিত কণ্ঠে কহিল “দেখুন” সহসা তাহার দুইটি চক্ষু সজল হইয়া উঠল। কি নিরাশার সে চিত্র, কি বিবাদনয়া সে মুর্তি! সোদিকে মোহিনী বাবু আরওক্ষণ চাহিয়া থাকতে পারলেন না, অন্য দিকে দৃষ্টি ফরাইয়া লইয়া কহিলেন “একটু সারলেন বাবু পারিবস্তন-ব্যবস্থা করা যাবে, তা হইলেই সেরে যাবে এখন, ডাক্তারবাবু ত খুবই আশা দিয়ে গেলেন, ভয় কি শ্রীশ্ ফুল।”

হান্দরা শুধু একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন কথা বলিল না।

কি বলিবে সে—এসবই তার দগ্ধ অদৃষ্টের ফল। নহিলে এমন সুস্থ সবল দেহ, বৎসর অতীত হইতে না হইতে এমন কঠিন রোগাক্রান্ত হইবে কেন? কখনো তাহার শয্যাপার্শ্বে—প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। হায়, সে

যদি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিত, তাহলে ত আজ এই মশ্বর্ত্তদী তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে হইত না। সেজালা যে ইটা-পেক্ষা ঢের ভালো ছিল। তবু ত দিনান্তেও সে এক বার তাঁর মুখখানি দেখিতে পাইত। একটা নৈরাশ্রের হা হা রব যেন তাহার সমস্ত হৃদয়টা ছাপাইয়া উঠিল। রুদ্ধ অশ্রুরাশি প্রবণের ছায়া বর্ষ-বর্ষ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বহুকণ নিস্তব্ধতার পর মহেন্দ্র বাবু চক্ষু মেলিয়া পত্নীর মুখের উপর ম্লান দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন “ইন্দু এমনি কোরে দিবারাত্রি কি নিজের শরীরটাও ভেঙ্গে ফেলবে? আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবো ভয় কি তোমার! একটু এই বিছানার পাশেই শোও দেখি।” এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া পড়িলেন। একটুখানি আগনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ দুর্বল হাতখানি বাঁধাইয়া পত্নীর কম্পিত হস্তখানি ধরিয়া আপনায় রক্তশূন্য ওষ্ঠের উপরে চাপিয়া ধরিলেন। “ছি ইন্দু তুমি কীদেটা?” বলিয়া একবার তাঁহার সেট ম্লান বিবর্ণ মুখে মুহূর্ত্তের জ্ঞান হসিতে চেষ্টা করিলেন। দিবসের শেষ রক্ত আভাটুকুর মত, মুমূর্ষুর ম্লান হাসিটুকু যেন একবার উজ্জল হইয়া উঠিয়াই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। ইন্দুরা দুই বাহুর স্নেহ-নিবিড় বেষ্টনে স্বামীর চৈতন্যহীন দেহটাকে সাবধানে জড়াইয়া ধরিয়া কপোল-তলে কপোল রাখিয়া বাহুজ্ঞানশূন্যের ছায়া বলিল “ওগো তুমি সেরে ওঠো, আমাকে একলা ফেলে যেও না, আমার যে তিন কুলে কেউ নাই গো, ভাগ্যদীনা দেখেও যে তুমি ঘৃণাভরে পায়ে ঠেল নি, দয়া করে বুকে তুল নিরেছিলে।”

শ্রীমতী শরদিন্দু দাসী।

## প্রভাতী।

—:~:—

ওগো উষার উদয়-অরুণ

সোনার শতদল,

নীল-সাগরের ফুল তুমি গো

অম্লান উজ্জল!

অন্ধকারের বন্ধ টুটে

কি আনন্দে উঠলে ফুটে,

দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলে

আলোর শতদল!

নীল-সাগরের ফুল তুমি গো

অম্লান উজ্জল!

সৌরভে প্রাণ আকুল হ'ল,  
উঠলো গেয়ে পানী ;  
ফুলের ভারে পড়লো মূয়ে  
বনের যত শাখা ।

তোমার পানে চেয়ে চিলাম,  
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম !  
মাথার 'পরে কাহার আশীষ  
করলো অবিরল !  
ওগো উষার উদয়-অরুণ  
সোনার শতদল ।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু ।

## ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য শিল্প প্রদর্শনীর দশম অধিবেশন ।

:-:-:-

আমরা এবার প্রাচ্য-শিল্প প্রদর্শনীর দশম অধিবেশন দেখতে গিয়েছিলুম। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এট শিল্প-সভার পূর্বের সকল প্রদর্শনীতেই উপস্থিত ছিলাম ; এখন সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের যেটুকু বলবার অধিকার হয়েছে সেইটুকু মাত্র বলতে যাচ্ছি। এবারও ষষ্ঠসমবায়ের দ্বিতলে একটি হলে একত্রিবিদশ খোলা হয়েছে। হলে প্রবেশ করবার পথে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কতগুলি ভাস্কর্য রাখা আছে। সেগুলি সবই ইরোপীয় পদ্ধতিতে গঠিত, প্রাচ্যশিল্প-প্রদর্শনীতে সেগুলি খাপ খায় নি বলে আমাদের বিশ্বাস কিন্তু সেগুলি শিল্পকলার আসরে স্থান পাবার যোগ্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। ডি, পি, কার্শাকার রচিত স্থায়ী রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিমূর্তিটি আমাদের মন লাগেনি। তাছাড়া শ্রীযুক্ত হিবল্লার রায়চৌধুরী রচিত মূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মণালয়ের ব্রজের প্রতিকৃতি এবং বিড়াল ছানা কোলে একটি শিশুর মূর্তি, এই দুইটি উৎকৃষ্ট রচনা। শিশুর হাসিটি বড়ই মধুর কুটে উঠেছে।

চিত্র-শিল্প প্রদর্শনী গৃহে আমাদের প্রথমেই চুখানি জাপানী সিল্কের বড় চিত্র চোখে পড়লো। এই ছবি চুখানির বিষয় আমাদের সর্বশেষ জানা না থাকলেও চিত্র রচয়িতাকে শতমুখে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। চিত্র চুখানি ভাল কল্পনার দ্বারা বাচাই হবার উপযুক্ত ; আমাদের সেগুলির বিষয় বেশী কিছু না বলাই ভাল মনে করি।



প্রাচ্যশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবারকার চিত্রশুলিতে একটি মুক্তির ভাব আছে, তাতে রঙ্গের চটক বা রেখার বাহুল্য নেই ; কিন্তু তবুও সব ছবিগুলিতেই দেখবার চেয়ে ভাববার কথাই যেন বেশী করে মনে পড়িয়ে দেয়। অবনীন্দ্র বাবু প্রস্তুতিত চেরী গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুল পাখীটি এঁকে আমাদের চেরী গাছের গান না বোঝালেও তাঁর গাছের চিত্রটিতেই যেন সঙ্গীতের রস মাখান আছে বেশ বোঝা যায়। কুয়াসার ছবিটিতে স্বভাবের নয়তার উপর কুয়াশার আবরণের একটা হৈয়ালীর কথা স্বঃই মনে হয়। অনেকে বলেন যে চিত্রকলাতে অসীমের কাব্য ও সঙ্গীতের মত অসীমের ভাবে আনা যায় না। তাঁরা যাক অবনীন্দ্র বাবুর 'এসিয়ার আলো' চিত্রখানি দেখেন, তা হলে দেখবেন যে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের পরে তাঁর জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে যে এক অনিন্দনীয় দেবভাব ফুটে উঠেছে, তার উপর আকাশ থেকে অনন্তের অসীম আলো যেন আশীর্বাদে মত বর্ষণ হচ্ছে। অনন্তের আভাস দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। হিমালয়ের চিত্রগুলি আমাদের কত মনে লাগেন। নন্দলাল বসুর ঝড়ের ছাতি একটি শিল্প পদশনার শ্রেষ্ঠ চিত্র। প্রথমে ছবিখানিকে একটা হৈয়ালি বলে মনে হয়। প্রথমে ছবিটা চোখেই পড়ে না মনে হয় যেন চিনা হরকের মত অচেনা একটা কিছু। পরে দেখতে দেখতে দেখা গেল কোনারক মান্দরের দ্বিতল কাঁিসের উপর যে কতগুলি সারি সারি পাখরের মুক্তি আছে—কোনটি কর্তাল বাজাচ্ছে—কোনটি বা বাঁশী, কেউবা ঢোল—এই ছবিটিতে সেই বিরাট ভাষাধার ভাষাশেষের উপর প্রকৃতির দৌরাঙ্গা দেখান হয়েছে। নন্দবাবুর এই ছবিটিতেও অবনীন্দ্র বাবুর এসিয়ার আলোর ছবির মত দর্শকের মনে অনন্তের ভাব জাগিয়ে তোলে। নন্দবাবুর বনে হারানো গাভার ছবিটি একখানি আশ্চর্য রচনা। এটিকে শুধু বাঙলা দেশের চিত্রাঙ্গণ পদ্ধতি অনুসারে আঁকা বলেই যে আমাদের ভাল লাগে তা নয়, এটিতে একটি সহজ ছন্দ (Rythm) একটি গাত (movement) বা ভাবের সঙ্গে দেখানো হয়েছে তা অল্প ছবিতেই পাওয়া যায়। নন্দবাবু এবারে ছুঁথের বিষয় খুব কম ছবিই প্রদর্শনীতে দেখতে পেলুম। শারদত্ৰী একটি আলাকারিক পারকল্পনা (decorative design) শরৎ-ঋতুর শুভত্ৰী অমল-ধবল মেঘের মধ্যে যেমন ফুটে ওঠে এটিতে সেই রসটির সন্ধান পাওয়া যায়। গোচারণ, শীত ও বসন্ত নন্দলাল বাবুর অপর দুটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কুলির শব্দাঙ্গন চিত্রখানি এবং বাঙালার আটখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবারকার শ্রেষ্ঠ রচনা, এগুলির প্রত্যেকটির বিশদভাবে বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সময় ও স্থানভাবে বলা গেল না। গগণেন্দ্র বাবুকেই আমরা জনকোলাহল বা ভীড়ের ছবি আঁকতে দেখি, অপর আধুনিক শিল্পীরা বড়ই একলা একলা ভাবের চিত্রই এঁকে থাকেন। কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার ছবিটিতে কবিরকে সামনাসামনি না দেখতে পেলেও ছবিটিতে তাঁকে সহজেই চেনা যায়। এই ছবিটিতে চন্দ্রাতপের উপর থেকে একটা যে শুভ্র আলোকপাত এবং পটভূমিতে (back ground) অসংখ্য জন-কোলাহলের ভাব শিল্পী দেখিয়েছেন জাতে ভাবুক দর্শকের মনে অনেক গভীর ভাব জাগিয়ে তোলাবার সত্তাবনা। দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী একটি নবীম শিল্পী। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাম ও উৎসাহ খুবই প্রশংসার্হ। তাঁর চিত্রশুলিতে যদিও তাঁর শিক্ষকের হাতের পরিচয় পাওয়া যায় তবুও নবীন শিল্পীর উদ্যমকে প্রশংসাই করতে হয়। নরেন্দ্রনাথের 'বাউল' নন্দলাল বসুর চিত্রের নকল, সিন্ধের উপর বড়করে আঁকা। তা ছাড়া 'রাখাল' এবং 'সকাল'। সকালের পদ্যগুলি জাপানী পদ্য-চিত্রের নকল যদিও তা প্রদর্শনীর তালিকায় ভুক্তমত উল্লেখ করা হয়নি। ক্ষীতেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি শিল্পী ধীর চিত্রে আমরা একটি নিজস্ব ধরণ (style) দেখতে পাই যেটা মোগল চিত্র, অক্সা চিত্র ও আধুনিক চিত্রের মাঝামাঝি থেকে তৈরী। শিল্পীর অজ্ঞাতেই এইরূপ নিজস্ব শিল্প রচনার্ণ গঠিত হয়ে থাকে। চাঁদের আলো

ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল, তা ছাড়া গনেশজননী ও মহাদেবের ও চৈতন্যদেবের ছবি। ক্ষিতিক্রনাথের এবারকার চৈতন্যের ছবিটি তাঁর রচিত পূর্বের চৈতন্যদেবের মত ভাল না ওৱালাও এমন একটি ভক্তি রসাপ্লুত ভাব মাথান আছে যে ছবিটি বর্ণবাহুল্য হলেও সৌন্দর্যের হারান মোটেই হয় নি। একটা ময়ূর, গাছের ডালে বসে আছে—চৈতন্যদেব তারই পাশে আনন্দ অদৌ হয়ে নৃত্য করতেন। আনন্দ-নৃত্যের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গেও ভীষের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ বড়ই মধুর ফুটেছে। শৈলেন্দ্রনাথ দে এবারে আমাদের কালিদাসের যে কয়েকটা মেঘদূতের ছবি দেখা গেলেন এগুলি অনেক দিন আমাদের মনে থাকবে। ছবিগুলির রচনার ভিতর এমন একটা নিষ্ঠাক্তা ও সরলতা আছে যা এবারকার অজ্ঞাত প্রাণসাযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে নেই বলেও অতীতি হয় না। অসিত কুমার হালদারের মানুষ, হুদ্দিন, নতুন-আলো, সরাই, আশীর্বাদ, এই কয়েকটা চিত্র আছে। মশাল হাতে একটা তেজী মানুষের প্রকাণ্ড ছবিটি দিগ্বির উপর আঁকা।

প্রতীক্ৰনাথ ঠাকুর জীবজন্তুর কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেচেন। এই তরুণ শিল্পীর ছবিগুলিতে বেশ একটা নবীনতার গন্ধ আছে এবং সেই জন্তেই আমাদের মধুর লেগেছে। প্রতীক্ৰনাথ ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ animal painter হবেন এরূপ আশা করা যায়। এইরূপে এক এক জন শিল্পী এক একটা বিষয় অভিজ্ঞ হওয়া মন্দ নয়। অনীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর একটি ‘জগাই মাধাই’—তাও আবার নন্দলাল বাবুর নকল। আসল ছবি তাঁর কেন দেখলুম না জানি না। তাঁর হাত আছে ভবিষ্যতে তাঁর হাতের আসল ছবি আমরা দেখতে পেলুম খুসী হব। শ্রীরমেশচন্দ্র বসু মজুমদার ‘শোকাতুরা’ ছবিখানিতে শোকের ভাব এবং সেই সঙ্গে রঙের সরলতা মিলিয়ে খুবই সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। তাঁর জামদারী-কাহারী একটি বাঙ্গাচিত্র। হিতিকপীড়িত প্রজাকে একজন পাইক জমিদারী কাছারীতে ধরে নিয়ে এসেচে, জামদার ভূঁড়ি ও হুকো নিয়ে বাস্তবিকের পাশে বসে খোসামোদ করচে, একখান সামাজিক শিক্ষাপ্রদ নাটকের মত দর্শক মাত্রকেই চমৎকৃত করে তোলে। হুংখের বিষয় ছবিখানিতে তিনি রঙ দেন নি। বিপিনচন্দ্র দেব আঁকা ছবিগুলির মধ্যে ‘কনের’ ছবিটি আমাদের ভাল লেগেছে। এই ছবিটিতে একটি কনে রাঙা-শাড়ী পরে জলা দেশে পৌঁটাপুঁটলি নিয়ে নৌকায় চড়ে স্বত্ববড়া যাচ্ছে আঁকা হয়েছে। ঠাকুরমার ছবিটিতে ঠাকুরমার মুখের খাসর ভাবটি বেশ কিছু মুক্তি বিন্যাস (figure composition) ভাল ওৱায় নি বলে মনে হয়। আলপনা ছবিটি অবনী বাবুর পাক্ষীতে প্রকাশিত ছবিটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের কয়েকটি ছবি আছে। অখিনীকুমার রায়ের খেলার সার্থী। একটি ছেলে হামা দিয়ে বাছুরের সঙ্গে খেলা করচে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ঠিক বাঙলাদেশের পাড়ারায়ের ভাব মনে জাগিয়ে দেয়। চাক্র রায়ের এবারে মোট দুখানি চিত্র, তাও উল্লেখযোগ্য নয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের রাধাকৃষ্ণের কয়েকটি ছবি ভারি চমৎকার। এই শিল্পী মোগল শিল্পের দ্বারা অধু প্রাণিত।

কাগজে দেখলুম কোন সুধীয্যক্তি হর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের ছবির ভিতর বিলাতিভাব আছে বলে হুংখ প্রকাশ করেচেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বিংশশতাব্দীতে শিল্পীরা যদি বিলাতি শিল্প-রীতি জেনে এরা নিজের দেশীয় রীতির অজ্ঞতার দ্বারা দেশের শিল্পকে জাগাতে চান তাতে শিল্পকলার উন্নাত অনিবার্য। কিন্তু এ কার্যটি অবশ্য ওস্তাদ শিল্পীর পক্ষেই সহজ ও ভাল পথ। নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্ধ-অনুসরণ করতে বিপদে পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা। নবীন শিল্পী হর্গাশঙ্কর বাবুর চিত্রগুলিতে আমরা প্রবীণ শিল্পীদের হাতের পরিচয় যথেষ্ট পেলুম এবং এইটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান অন্তরায়। নচেৎ এবারে তাঁর চিত্র অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীদের চেয়ে ভাল হইত। কৃষ্ণচূড়া এবং বাঁশরী নামক দুখানি ছবি প্রদর্শনীর তালিকা ছাড়াও আছে। এই দুইখানি হর্গাশঙ্কর

বাবুর নবীন জাতের নবীনতারই পরিচয় দেয়। হুর্গেশচন্দ্র সিংহকে আমরা ওস্তাদ শিল্পীদের দলের একজন বলে জানতুম তাঁর হাতে এত কাঁচা কাজ আশা করি নাই। নটেশনের আঁকা “জোনাক” “বরণা”। সি. কে. কে ওয়ারিশ এর ‘সাপ পূজা ও অজ্ঞাত কতকগুলি চিত্র আছে, অজ্ঞতার ছবির নকলটি বেশ হয়েছে। সারদাচরণ উকীলের নাম অনেকেই জানেন, তাঁর কিন্তু এবারে বেশী ভাল ছবি দেখলুম না। তবে সুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ছবিটি ভাল ছবি। কুপের ধারে চিত্রটির বর্ণবন্যাস ও আঁকার ধরণ একেবারে বিলাতির অনুরূপ। হাকিম খাঁর গ্রীষ্মকাল একটি মাত্র ছবি। ছুংখের বিষয় পাখা হাতে মহিলাটির গহনাগুলি একেবারে হালফাসানের কুংসিং গহনার মত চোখের পীড়া দেয়। দেবীপ্রসাদের Homeward bound ছবিটি জ্বাতাহুসারে বিলাতি ছবির নকল না হলেও বড়ই বিলাতি-প্রাচ্য-শিল্প প্রদর্শনীর যোগ্য নয়। ‘হোলি থেলার’ চিত্রটিতে মূর্তিবিজ্ঞান (figure composition) প্রশংসা করবার না থাকলেও ছবিটি দেখবার মাত্র ভাল লাগে। ও, সি, গঙ্গোপাধ্যায়ের “রাধিকা” একটি শোচনীয় চিত্র। রাধার মাথার খোঁপা, গংনা ও পরিচ্ছদ বাঙালী বাড়ীর গৃহিণীর কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। গাছের আড়ের শ্রীচন্দ্রের কুংসিং চেহারা ও রাধার স্থূল বিকলাঙ্গ আমাদের চিত্রকলার প্রতি বিতৃষ্ণাই জন্মিয়ে দেয়। এবারে তাঁর “বুদ্ধের প্রতিমূর্তির উৎপত্তির কারণ” ছবিটির পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসারযোগ্য। কিন্তু বুদ্ধমূর্তি তিনি যা এঁকেচেন সেটি বুদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কতদূর সঙ্গত হয়েছে বলা যায় না। বুদ্ধগৃহে বুদ্ধদেবের কেশের বর্ণ নীল, দেহের বর্ণ কাঞ্চনবর্ণ, ঠোঁট লাল, বসন পীত প্রভৃতি অনেক বিষয় বিশেষভাবে নির্দেশ করা আছে। ছবিতে এগুলি না হেনে আঁকতে গেলে বুদ্ধদের কাছে বুদ্ধমূর্তি অন্য কোন মূর্তি বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা। এখানে আমাদের বলা প্রয়োজন বোধকরি যে শিল্পী শ্রীযুক্ত ও, সি, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যদি রেখাকোশল ভালরূপে আয়ত্ত্ব করে ছবি আঁকেন তবেই তিনি যথার্থ শিল্পী হতে পারবেন। এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায় বসন্তের ছবিটি সুরঞ্জনাথ করের “বসন্তের” ছবিটি থেকে ভাব গ্রহণ করে আঁকলেও আমাদের ভাল লাগল। সাধাহানের বন্দী অবস্থার ছবিটি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমোদ গঙ্গোপাধ্যায় একটি উদীয়মান শিল্পী। নিরঞ্জন সেনের চিত্রা, ও পারবাতের ছবি দুখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদ্মকন্যা ছবিটির অসামঞ্জস্যতার কারণ এই যে একটি সুকোমল পদ্মের উপর একটি ওড়নাপরা গহনাপরা স্থূলকায়্য রমণী মূর্তির অবস্থান। পাগল ছবিটি বাহুল্য বর্জিত ভাল ছবি।

বরেন্দ্র সেনের অনেকগুলি বাস্তবচিত্র আছে। আমরা সেগুলির প্রশংসা করি। শিকারী ও ঝরণার ধারে ছবি দুখানি হুর্ভাগ্যবশত Edmand Dulac ও Duras এর আঁকার পদ্ধতির হুবহু অনুরূপ বলে মনে হয়। “উর্ধ্বশীর্ষ” ছবিটিতে নৈবকে এরূপ ‘অক্টোপাসে’ মত বোরালো পেঁচালা করে আঁকার স্বার্থকতা কি বুঝি না। তবে আলঙ্কারিক হিসাবে মন্দ হয় নি। যাইহোক বরেন্দ্র বাবু যে বাধাবীধি পথ না মেনে পথ কেটে চলবার চেষ্টা করছেন, এতে তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়। শ্রীমতী প্রতীমা দেবীর ‘স্তনটানা’ ওস্তাদ শিল্পীর হাতের কাজের মত পাকা রচনা। শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর রেখাঙ্কণ কোশল আমাদের খুবই ভাল লাগে।

পরিশেষে শ্রীমতী সরলা দাসী, রচিত ‘পরশুরাম’ ও ‘মা ও ছেলে’ সেগুন কাঠে খোদাইকরা ছোট—সুন্দর মূর্তির কথা না উল্লেখ করে শেষ করতে পারলুম না।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

## প্রদোপ ।

—:~:—

নহ তুমি রাজরাণী চিরসুখ নিলীনা,  
কৃষকের বধু তুমি আভরণ বিহীনা !  
সভাতলে জ্বলনাক রূপরাশি বিলায়ে,  
গৃহবধু থাক তুমি গৃহকোণে মিলায়ে !  
মলিন আঁচর তলে সরমেতে জ্বলিয়া  
দোনের কুটীর তুমি থাকগো উজলিয়া !  
গরীবের বধু তুমি শঙ্কিতা সরমে !  
বাতাসেরও পরশেতে মরে যাও মরমে !  
দেবসেবা কর তুমি তুলসীর মূলেতে !  
ঠাই পাও সমাদরে দেবের দেউলেতে !  
আকাশ-প্রদোপ হয়ে আকাশেতে উঠিয়া  
দেবতার শুভাশীষ লও দেবি লুটিয়া !  
মুম্ময়ি দেবি অয়ি এমনই জ্বলিয়া,  
দোনের কুটীর থেকে চিরই উজলিয়া !

“বনফুল”

## মানব সাধনার চরম বাণী ।

—:~:—

মনে হয় কি একটা শেষ কথা আছে,  
সেইটা হইলে বলা সব বলা হয় ;  
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে,  
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয় ।  
সে কথা হইলে বলা নীরব বাণী  
আর বাজাব না বাণী চিরদিন তরে—  
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি’  
মাহুৎ এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে ।”—রবীন্দ্রনাথ ।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধ যে পংক্তি কতিপয় আজ মাথায় করে' দাঁড়াচ্ছে, কিছুদিন আগে আর একটা প্রবন্ধ তা' বৃকে রেখে বলেছিল “কে বলতে পারে, কোন্ moliumকে আশ্রয় করে' সেই last words প্রকাশ পাবে যা' শুনে মানবজগতের মনের চেহারা বিগলিত বদল হয়ে যাবে,” আর সেই সঙ্গে এই দ্বিতীয় বাক্ত করে'ছিল যে কবির সমস্ত জগৎ যে কথার সন্ধানে ফিরছে তাকে প্রকাশ করবার গৌরবও তিনিই ভবিষ্যতে বহন করবেন। কিন্তু “At the cross roads” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে কবি স্পষ্টাক্ষরে স্বীয় অক্ষমতা জানিয়া বললেন যে জগৎ এমন এক শিশুর জন্ম-প্রতীক্ষায় আছে যার আধাঙ্গ-চেতনা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সজাগ হবে এবং তিনি যা' করতে ব্যর্থকাম হলেন তা' অবলীলাক্রমেই করে যাবে। কবি ডাঙ্কট ডাকশিশু যদি এতদিনে জন্মে থাকে, তবে তার message নিশ্চয়ই কবিগুরুর হস্তগত হয়েছে; ইতিমধ্যে আমরা যে স্বাণীর সন্ধান পেয়েছি, তার উল্লেখ অনাশ্রুক হবে না,—কেননা তা' শুনলে মানুষ ঘরে না ফিরুক, পথে বেরুতে পারবে। উন্টো ফলের কথা বলছি এইজন্যে যে এ-প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথের পরে জন্মাবার বাহুদ্রী প্রকাশ করতে পারায় স্বভাবতই তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী, অধিকন্তু ও-সাধনার ধারাকে পেছিয়ে না দিয়ে অগ্রসর করে' দেবার উচ্চাভিলাষও যে রাখেনা, একথা বললে মিছে কথা বলা হয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ব্যাপারের কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটায় আমার অসংখ্য গুরুর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখেছিলুম—“Who aimeth at the sky, shoots higher than he that means a tree”—কিন্তু আজ আর কারুর সঙ্গেই আমার কিছু মাত্র মতভেদ নেই, কেননা ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পোলিটিক্যাল বহিবিদ্রোহ ও ভারতবর্ষীয় ধর্মক্ষেত্রের ফিলজাফিক অস্থবিদ্রোহ, এই পরস্পর বিরোধী ব্যাপারের সমকালীন অরুণি সংঘর্ষে সর্বাবরোধের চরম-সময়-বাণী আমার বৃকের মধ্যে জলে উঠেছে। কিছু কাল যে অগ্নির অলপ-শিখার শক্তিতে অনেক বজ্রবান্ধকে বাণিত করতে বাধ্য হয়েছি, আজ তার শাস্ত-শীতল আলোক-প্রভা ভারতবর্ষীয় নব-ব্রাহ্মণ-সমাজ বা লেখকমণ্ডলীর পদপ্রান্তে পৌঁছে দিতে দাঁড়িয়েছি। চুঃখ যে মানুষকে কত সহজে সংশোধন করে, তা' নিজের জীবন দিয়ে সব চেয়ে ভাল জানি বলেই অপরকে চুঃখু দিতে আমি ভয় পাইনি,—তবু যাদের অন্তরে আবাত করে' বারংবার নিজেকেও কাঁদিয়েছি তাঁরা আজ আমার ক্ষমা করুন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্তির জয়গান করে' অনেকেরই কাছে আমি প্রহেলিকাবৎ হয়ে আছি—কিন্তু প্রহেলিকা এর মধ্যে কিছুই নেই—আমাদের অহুনিহিত প্রেমের স্বচ্ছ মুকুর-সন্মুখে যে যেভাবে দেখা দেয়, মুকুরও তাকে ঠিক সেই ভাবই প্রত্যর্পণ করে' থাকে। প্রমথ বাবুর বৃত্তাকার শিল্প-চাতুর্য্য সকল-মতেই মত দিয়ে নিজেকে সকলেরই সমান বুদ্ধিমান মনে করাতে চেয়েছিল,—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য ও অগত্যা তাঁর শিষ্যোত্তমের সাহিত্যের স্বন্ধে চরম সদর্থ আরোপ করে' তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবারই চেষ্টা করে' এসেছে। শিবের যখন মাথা ঘোরে, সুদর্শন-চক্রও তখন ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে—কেন যে এটা হয় তা' বলা যায় না, তবে হয় এককম। ‘চার-ইয়ার'-সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে' এনাগাদ যতগুলি প্রবন্ধ ও চিঠি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তা' ঠিক পর পর পড়ে এসে এ-প্রবন্ধ পড়লে এবং এ-প্রবন্ধ পড়ে সেগুলি আর একবার পড়লে সকলেই তাদের বথার্থ অর্থে চিনে নিতে পারবেন। কিন্তু সে যাই হোক, প্রমথনাথের শিষ্য-স্বাকার আমার পক্ষে আরোজনীয় ছিল এবং তাতে আমার বথেষ্ট উপকৃতও হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাণের চেয়ে উপ-প্রাণে মানুষের মমতা বেশী; একথা যদি সত্য হয়, তা' হলে গুরুর চেয়ে উপ-গুরু

প্রতি টান বেশী দেখিয়ে নিশ্চয়ই আমি অমানুষের কাজ করিনি। তা' ছাড়া আরও একটা কথা আছে ; রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, তাঁর সার্টিফিকেটের শাসনে, শিশু থেকে আরম্ভ করে' অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তো চোখ বুজে করতে পারে,—ও-সার্টিফিকেটকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে তাঁর নিন্দা করতে পারে এবং সার্টিফিকেট-বিহীনের উচ্চ প্রশংসা করে' লোককে দাবিয়ে দমিয়ে সকলের চোখ বাঁধিয়ে দিতে পারাতেই তো কেরামতির পরিচয়। আপনারা আপনাপন মনকে জিজ্ঞাসা করে' ঠিক বলুন দেখি—এ পরিচয় আমি দিতে পেরেছি কি না ?

জানি, আপনারা সব প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন যে আমাকে একটুও প্রশংসা করবেন না। বেশ, আমিও কারুর প্রশংসার কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখিনে—আপনাদেরও নয়, আপনাদের রবীন্দ্রনাথেরও নয়, প্রনথনাথেরও নয়। তাঁদের সার্টিফিকেট দরকার হলে, অন্যের দেওয়া টাকা, কড়ি, মান, সম্মান হাতে ছড়াতে ছড়াতে আমার কাছে ছুটে আসবেন ভালবাসা নিতে ও ভক্তি দিতে।

কিন্তু না, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে যেন আমি ইচ্ছা করলেই প্রমথবাবুর “গুরুমারা বিদ্যার” দোহাই দিয়ে এক টিলে এই যুগল-গুরু-হত্যা করে' তাঁদের আসনে পাকা হয়ে বসতে পারি। কিন্তু সত্য কথা এই যে সে ছুরভিসন্ধি আমার নেই। প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথ জানেন কিনা বলতে পারি নে যে আমার অপূর্ণ গুরুকরণের নজির হচ্ছে এই :—

“নমস্কার অতীতের মহাত্মা মহর্ষিগণ,

দীক্ষাগুরু যোগীন্দ্র নারদ,

নমস্কার হে রবীন্দ্র ! যাঁর হরিনাম বোণে

উথলিছে শত-চিত্তহ্রদ—

নমস্কার মানবের যত তিতকামীগণ ! তথাপি বিদ্যার চাহি আজ,  
মৃদঙ্গ-বীণারী সুরে ছড়ানো জড়ানো জুদি মুক্ত হোক বিশ্বরঙ্গমাখ,  
যাঁর নামে শতবীণা ঝঙ্কারিছে মুহমূহঃ চাহে, নাহি চায় চরম বিরাণ

যুমের আরাম ;—

তোক সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে

বুঝি নাই যারে ;

খুঁজে লব প্রাণ হতে তারে”—প্রাণ ও প্রকৃতি (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১২)

এখন জিজ্ঞাস্য—খুঁজে কিছু পেয়েছি কি ? উত্তর—অবশ্য, Law of spirit কে পাওয়া গিয়াছে।

কি সে Law ?

সেই কথাই বলতে দাঁড়িয়েছি—অতএব ক্রমশঃ বলেছি :—

( ২ )

গৌর-সংখ্যা ‘সাহিত্য’ সেদিন লিখেছি—“Law of Gravitation যেমন আবিষ্কৃত হবার পূর্বেও ছিল এবং মানবজাতি বৃদ্ধি-বিচ্যুত হবার পরও থাকবে, Law of spirit বা আর্টও তেমনি কবিবুলের জন্ম পূর্বে থেকেই

আছে এবং ও-বংশ নির্বংশ হয়ে যাবার পরও থাকবে। কোন্ কবি কি পরিমাণে এই Lawকে নিজের মধ্যে পেয়েছেন সেইটুকু মাত্র তাঁদের কেতাব পড়ে আমরা জানতে পারি—অবশ্য যদি সে-নিয়ম আমাদের মধ্যে থাকে।”

অপর পক্ষে;—

পৌষ-সংখ্যা ‘মালঞ্চ’ Sex problem সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছি তাতে ব’লছি—“আত্মার অভাবের নামই প্রেম বা প্রেমের অভাবের নামই আত্মা নয়; প্রেম আত্মারই স্বভাব। এই প্রেমকে নিজের মধ্যে পাবার পর চিন্তা-চাকল্যের কোনো বালাই আর থাকতেই পারে না, কিন্তু তারপর মানুষের প্রতি কর্তব্যের কথাটা সহজেই এসে পড়ে। এই কর্তব্য-বুদ্ধির সাহায্যে প্রেমকে যথাযথ-ভাষে চাটনা করবার শক্তি তখন অনায়াসেই হয়ে আসে।”

উক্ত উক্তির যুগল-মুহুর্তে দেখা যাবে যে প্রথমটীতে যাকে ‘আত্মা ও নিয়ম’ বলা আছে, দ্বিতীয়টীতে তাকে ‘প্রেম ও কর্তব্য’ নামে চিহ্নিত করা গিয়াছে—প্রথমটী হচ্ছে পুরুষ আর দ্বিতীয়টী স্ত্রী। কিন্তু ‘মালঞ্চ’ আমি কর্তব্যের বা lawএর internal দিকটা চেপে external দিকে পাঠকদের মনকে টলিয়ে দিয়েছি। কেননা, তখনও ‘সারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে দেবার সময় আসেনি। পূর্বেই ‘পরিচায়িকায়’ বলেছি যে মানব জ্ঞে-একাজের কর্তব্য মর্দন করে’ তার তত্ত্বগুলিকে পর্দায়-পর্দায় বেঁধে তুলতে চাওয়াই নিপুণ শিল্পীর কাজ—আর বলিনি বা’ তা হচ্ছে এই যে জীবন-শিল্প-স্থানে আমার সহস্ত আমার গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের চেয়ে যে অনেক বেশী পাকা, এ-বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, আমার নিজের একবিদূও নেই। প্রকৃত পক্ষে, একটা চণ্ডাও দরকার; কেননা, গুরুর চেয়ে শিষ্য দড় না হলে তাঁর স্বরূপকে পরিচিত করবে কে ?

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে দস্ত আর গলাবান্ধ করেই আমি জয়ী হয়ে চলেছি—নইলে ‘Law of spirit’ ‘Duty of love’ ইত্যাদি মামুলি কথাই তো আউড়ে চলেছি—law বা dutyটা যে কি, তা তো কৈ বলছেন !

বটে !—তবে,

প্রকৃতি ঘোমটা খোল, দেখাও সহজ সত্য

রেখেছ যা’ আবরণে ঢাকি

লুকায়ে স্বরূপ, ছি ছি, কেন গো আকুল কর

চিন্তপটে মায়াচিত্র আঁকি

এ-প্রাণ পুরুষ আঁজি তোমার ঘোমটা দেখি স্বহস্তে সরাসরি দিতে চার—

বিষজন সভা-মাঝে, আয় মোর প্রিয়তমা, হাসিমুখে বাহিরিয়া আর,

স্নোকেব উপরে স্নাক বর্ষে বর্ষে জমিয়াছে, শাস্ত্রে রুদ্ধ সাধনার পথ,

এই আ-র্জনা ভেদি’ চলিছ চুটিয়া তবে সুনির্মল রশ্মি-রেখাবৎ

দীপ্ত মনোরথ !—

চিরপ্রেমময়ি অরি ! ধরিয়া ফেলেছ তোরে, আর কোথা যাবি—

এই দেখে প্রাণে নোর হলিতেছে চাব ! ...

প্রশ্ন শুনি—কৈ, দেখাও দেখি চাবি ? ...

দেখবে ? বেশ, তবে বেড়িয়ে পড় এই দীন-দরিদ্র ভারত-পল্লীপ্রান্তের চির-কিশোর প্রাণ থেকে সেই অপরাভূত পরাক্রম ঐক্সজালিক চাবি যার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সাধক-চরিত্রের অশ্রু-কলঙ্ক-কালিমা মুহূর্তে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—যার অদম্য মন্ত্রশক্তি এই ভ্রমসাচ্ছন্ন মানব বাসভূমিকে কলির অধিকার থেকে আত্মতে- ছিনিয়ে নিয়ে সত্য-লোকের নির্মল জ্যোতির্গর্ভে ও অপাপবিন্দু সপ্তম-স্বর্গে চক্কর নিমেষে উন্নীত করে ধরতে পারে। বেড়িয়ে পড়, বেড়িয়ে পড় আমার প্রাণের প্রতিভায় অর্থময় চিত্রপুরাতন নবীন বাণী। ভগ-দগীতার অন্তরাশ্রা, রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত ভগবান জাতীত ভারতবর্ষে পতিতোদ্ধার-দক্ষ মহাপ্রসন্নতার জগত-বিস্ময়কর ফল,—

বল, হে আমার জীবন-গীতার চরম আটটি। বণ এই যোগাসন দেহমন্দির-অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের আত্মা-সমষ্টিকে আকৃষ্ট করে' ওলদগন্তীর বজ্রগর্জনে সেই জ্যোতির্গর্ভিত পূণ্যবাণী—

“যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাং স্তুথৈব ভজামাহং”

তানিয়ে দাঁও সকলকে যে এই হচ্ছে ‘প্রাণের নিয়ম’, ‘প্রেমের নিয়ম’ দৃশ্যমান বিশ্ব মর্শ্বের ‘কেন্দ্রীয় নিয়ম’, যাতে আত্মসমর্পণ করলে নরনারী যেখানে যা করুক, তোমারই আদেশ প্রতিপালন করবে, তোমারই চিরগৌরবায়িত ভর-পতাকাকে বহন করবে। বৈরাগ্যের পথই প্রেমের পথ,—কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এই বৈরাগ্যই তার অচল শিখা আলিয়ে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছে; রবীন্দ্রনাথের “বজ্র-গৌরব” এই বৈরাগ্যেরই দাস, আর আদর্শ-নারীরা কবির ঐ বৈরাগ্য-শিখায় তাদের প্রেমের হবি-পাত্র প্রফুল্ল-চিত্তে উজাড় করে' দিয়ে স শিখাকে হোমান্বিত-শিখায় পরিণত করেছে।

যাও তবে আমার বন্ধ-নিহত মহাবাণী—ধীরে ধীরে গিয়ে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আলিঙ্গন কর; আর আলিঙ্গন কর সেই রবীন্দ্রনাথের বিরট সাহিত্য-কীর্তিকে যে রবীন্দ্রনাথ ঐ বাণীই বরপুত্র। চারিদিকে যাক তবে আকাশে বাতাসে এই পরমাত্মার চরম নিয়ম, আর গড়ে উঠুক এই পলিটিকের ধ্বং ও ধ্বংসের পলিটিকের ভরা বিশ্ব-ভুবনের মশকোজ্জ্বল সেই—

## “প্রেমের জগৎ”

যেখানে বাবহারিক বা সামাজিক শাসন-রজ্জু নরনারীকে স্পর্শ করতে পারে না,—যেখানে পাপ নেই, শোক-ভাপ নেই,—আছে শুধু নির্মল নিকলঙ্ক সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্বর্ণ সিংহাসনে নরদেবতা ও নারীদেবীর অপাপবিন্দু যুগল মূর্তি নির্ভয়ে আলিঙ্গন-বন্ধ,—আর তার চতুর্দিকে বিচিত্র পরহিতব্রতে ছুটে বেরুবার ভক্ত ভাওত ভারতবর্ষের কক্ষা-লঙ্ক কলরব। এস ধনী, নির্ধন, যে যেখানে আছে—এস সাহসিকা নারী ও বীৰ্য্য অটল পুরুষ দ্বিধাশূন্য চিত্তে এই আত্মার আদেশ গ্রহণ ও প্রচার কর। গ্রথিত হয়ে যাক তোমাদের দেহে, মনে, প্রাণে, কণ্ঠে ও বাকে এই অনোধ নিয়ম—

“যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাং স্তুথৈব ভজামাহং”।

কৃকার্পণমস্ত।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।



## রামীর প্রতি ।

—(❖)—

কোন্ নব বৃন্দাবনে, কালিন্দীর তটে—  
লইয়া কলসা কক্ষে আসি একাকিনী  
দাঁড়াইলে, হে সুন্দরি, রামী রজকিনি !—  
কি চিত্র আঁকিলে তুমি কবি চিত্র-পটে !

সেদিন কি জেগেছিল ফাল্গুনের দিন ?  
পুলকি উঠিয়াছিল সারা বিশ্বখানি ?  
কোকিল ঝুলিতেছিল বিশ্ব প্রেম স্বাণী !  
শিহরি উঠিতেছিল কানন বিপিন !

অথবা নামিয়াছিল আষাঢ় নবীন ?  
মেঘে মেঘে হেরেছিল সমস্ত আকাশ ?  
অদূরে মাধবী কুঞ্জে কেকাকল-বীণ—  
শসিয়া শসিয়া ওঠে আর্দ্র বাতাস !

নিমেষে পড়িল ধরা চণ্ডিদাস কবি—  
হেরিল তোমার রূপে রাধিকার ছবি :

শ্রীঅশ্বতোষ মুণোপাধ্যায় ।

## বীরবলের হালখাতা ।\*

—❖—

( সমালোচনা )

“সবুজ পত্রের” সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবল রূপে ১৩০৯ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৩ সালের চৈত্র পর্যন্ত ১৫ বৎসর ধরিয়া যে সকল প্রবন্ধ মাসিকপত্রে লিখিয়াছিলেন সেগুলি তিনি “বীরবলের হালখাতা” নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। “প্রকাশিত” বলিলে ঠিক বলা হইল না, “ছাপাইয়াছেন” বলাই উচিত, কেন না তিনি উহার পূর্বের গ্রন্থ “সনেট পঞ্চাশৎ” ও “চার-ইয়ারি-কথা”র ন্যায় এই বইখানিরও কোনরূপ বিজ্ঞাপন দেন নাই।

\* পরিচায়িকার প্রভু হইতে এই অবজ্ঞাপাট্টা গ্রন্থের সমালোচনা ১৩২৪ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সঃ।

ইটার দুই কারণ আছে, তিনি এই পুস্তকে বলিয়াছেন “আমি সাহিত্য-ব্যবসায়ী নই। অর্থাৎ অদ্যাবধি আমি বই কিনেই আসছি, কখনও বেচিনি, সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করলে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্রেতার দিক থেকে যা বলবার আছে তাই বলতে পারি, বিক্রেতা হিসাবে কোন কথাই বলতে পারিনে।” তদ্বিন্ন তিনি বিজ্ঞাপনের বিরোধী কারণ বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি মিথ্যা কথা বলেন এবং বিজ্ঞাপনে আত্মসত্তার প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ হয়। তাই সুবুদ্ধিপত্রের কাহারও বিজ্ঞাপন তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। কয়েকমাস হইতে সবুজ পত্রের মলাটে পুস্তক কয়খানির নাম, দাম ও প্রাপ্তিস্থান ছাপান হইতেছে। পুস্তক বা গ্রন্থকারের নাম একটা বিশেষণও নাই। তিনি বিলাত ফেরত হইয়াও বিলাতের commercialism এর দিকটা কর্ঘ্যা বোধে পরিহার করিলেন। আর আমাদের সাহিত্য-ব্যবসায়ী গ্রন্থকারেরা লম্বা খরচ করিয়া কিংবা না করিয়া বড় বড় লোকের সার্টিফিকেট সহ বিজ্ঞাপনে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা জরিয়া ফেলিতেছেন!

এই পুস্তকখানিতে মোট ২৭৮ পৃষ্ঠা আছে; তদ্বিন্ন উৎসর্গ পত্র ও টাইটেল পেজ আছে কিন্তু সূচীপত্র নাই ও পুস্তকের মূল্য কোথাও লেখা নাই। আবার কাগজের মলাট! ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে গ্রন্থকার বইয়ের ব্যবসারে একেবারে অনভিজ্ঞ। সবুজপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিয়াছি বইখানির দাম একটাকা এবং বই হইতেই পেন্সিল দিয়া একটা সূচীপত্র তৈয়ার করিয়াছি তাহাতে দেখিলাম সর্বমুদ্য ৩০টি বিষয় বা প্রবন্ধ আছে। ইহার প্রথমটির নাম “বীরবলের হালখাতা” ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসে লেখা। আরও দুটি ১৩০৯ সালেই লেখা ৪র্থটি ১৩১২ ও ৫মটি ১৩১৯ সালের লেখা। অবশিষ্টগুলি ১৩২০ হইতে ১৩২৩ পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরে লেখা। গ্রন্থকার যে এই পনের বৎসর ধরিয়া এই বীরবলী চং বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

বীরবলী চঙে এমন একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহা বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই সহজে চিনিয়া ফেলিবেন। ইহা ঠিক যাদু-সাহিত্য বা হাসির-গানের শ্রেণীভুক্ত নয়। তথচ বিজ্ঞপও ইহাতে আছে কিন্তু সেই বিজ্ঞপের অন্তরালে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি কথাও অসার নহে। ইহা কোন কোন মত সম্বন্ধে কাহারও অন্যমত থাকিতে পারে। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা অতি অল্প। বীরবলী চঙে অহুপ্রাস, যমক, দ্ব্যর্থ ও উপমাগুলি সূন্দর ও অপূর্ণ। কেবল যমকের প্রয়োগে একস্থানে একটা ভুল কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেটা ধর্ম্মবোয় মধ্যে নহে, কারণ উপহাসে ওরূপ ব্যবহার আমরা সকলেই করিয়া থাকি।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটি ব্যক্তিগত কথা লইয়া লিখিত। এগুলি সাময়িক সংবাদপত্রের উপযোগী। যে সময়ে বাহির হইয়াছিল তখন ইহাদের একটা উপযোগিতা ছিল। স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবার মত গুণ এগুলিতে নাই। সুতরাং এগুলিকে সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান না দিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি সূন্দর ও সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি কথা এই যে—সাহিত্য মনের খেলা, খেলার যেমন কোন উদ্দেশ্য নাই সাহিত্যেরও তেমনই কোন উদ্দেশ্য নাই। খেলাতে যেমন আমরা আনন্দ পাই, সাহিত্য আলোচনাতেও তেমনই আনন্দ পাই। বেশ সূন্দর কথা, কিন্তু ফুটবল খেলাতে সময় সময় আনন্দের পরিবর্তে যেমন নিরানন্দ জন্মে আমাদের সাহিত্যের আলোচনা বিভাগেও তাহাই হয়, সুতরাং সেই নিরানন্দের স্বতি জাপন্নক রাখিবার প্রেরণা কি?—যা’ক অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবগুলিই ভাল তবে এক শ্রেণীর ভাল নয়। অধিকাংশ প্রবন্ধেই স্থানে স্থানে “অতিবুদ্ধি” প্রকাশিত হইয়াছে এই “অতিবুদ্ধি”র কল্প-সেবক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার

প্রয়োজন তাহা বাঙ্গলায় খুব কম লোকের আছে। যে সকল বঙ্গীয় পাঠক কেবল নভেল নাটক না পড়িয়া অন্য বইও কখন কখনও পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের চিন্তার নূতন নূতন দ্বার ইহাতে খুলিয়া যাইবে।

বঙ্গসাহিত্য, বাঙলাভাষা, বাঙলার সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, শিক্ষার প্রথা, সঙ্গীত আর্ট, চিত্রকলা সমালোচনা, মাসিকপত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ইহাতে পাওয়া যায়। বাঙলাভাষা কিরূপ হওয়া উচিত এই লইয়া একদিন যে “গোলযোগ” হইয়াছিল স্বনামে ও ছদ্মনামে আমিও তাহাতে একদিন “গলাযোগ” করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে বীরবলের মতে সকলে যায় না দিলেও তাঁহার কথাগুলি খুব প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—শব্দকল্প-ক্রম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে। তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনও আপত্তি নেই। যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে কথা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির পাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।—এজন্য তিনি “এষা, মজ্জুষা, করতুম, বৈতালিক” প্রভৃতি আনকোরা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষা কোট উইলিম কলেজের পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া সংস্কৃতামুসারিণী হইয়া যে নিজের জাতি হারা ইচ্ছাছে সে কথক গ্রিয়ার্সন সাহেবও জোর-গলায় Linguistic Survey of India পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বীরবলী ভাষার “করলুম, করতুম, করে ও তার” স্থানে “করিলাম, করিতাম, করিয়া ও তাহার” লিখিয়াও যে ভাষা সরল করা যায় তাহার সাক্ষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌখিক-ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রে লিখিয়াছেন “ভাষার মৌখিক গঠন লেখায় যতদূর সম্ভব রক্ষা করবার সার্থকতা এই যে, তাতে করে রচনা প্রথমতঃ দুর্বোধ্য হয় না, দ্বিতীয়তঃ তা স্মৃতিতে কষ্ট হয় না। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন ও কাণ দুই-ই যে ধারণের বাক্য শোনার চিরদিন অভ্যস্ত, যতদূর সম্ভব রচনার সেই ধারণের বাক্যই ব্যবহার করা শ্রেয়। ভাষা জিনিষটা বক্তার একলার সম্পত্তি নয়, শ্রোতাও তার অংশীদার।” হয় ত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ত তলব করিতে পারেন যে “তুমি তবে মৌখিক ভাষার লেখনা কেন?” স্মরণ্য এইখানে একটু ক্ষুদ্র কৈফিয়ত দিলে ভাল দেখায় না। আমি বহুদিন হইতে ক্রিয়া ও সর্কনামের কেতাবী রূপই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কয়েকবার চিঠিপত্রে মৌখিক রূপ লিখবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু অভ্যাস দোষে ঝিঁচুড়ী পাকাইয়া বসিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।” দ্বিতীয়তঃ বানান ঠিক করিতে পারি নাই কোথায় হসন্ত দিব আর কোথায় উপরে কমা দিব। তৃতীয়তঃ আমি কখনও কথার বার্তায় “করলুম, করতুম” বলি না, “করতাম, করলাম” বলি।

বাঙ্গলার সমাজ সম্বন্ধে বীরবল এমন কথা কোথাও বলে নাই যাহাতে কাহারও মনে আঘাত লাগিতে পারে অথচ বহুদোষ দেখাইয়া দিয়াছেন যাহা সমাজ সংস্কারকেরা মনে রাখিলে অনেক কাজ হইতে পারে, তিনি বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের এমননি ২৪টি ব্যাধির অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন যাহা কেহ কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। কথা—বাঙ্গালী সমাজে প্রাচ্য দর্শনের শিষ্য বলিয়া রূপ-কানা আর যুরোপীয় ফ্যাসনের দাস বলিয়া রঙকানা। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও মনের ভাবে মিল নাই। আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি হয় বর্তমান যুরোপের দিকে এগোনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছোনো। আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মসাহিত্য সকলক্ষেত্রেই যুরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আরস্ত করবার চেষ্টা করায় নিতাই ইতোনষ্টতত্ত্বোক্ত হইছে। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে;—শুধু মধ্য নেই। ইত্যাদি—

এই পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর কথা আছে তাহাও বঙ্গীয় পাঠকের প্রাণধানযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি। গল্প পাড়তেই অধিকাংশ পাঠক ভালবাসেন, ইহার কারণ সম্বন্ধে বীরবল বলেন,—আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য। নিজের জীবন ঘটনাপূর্ণ না হলেও অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চা করে' মানুষে সুখ পায়। অন্যরূপ অবস্থায় পড়লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেঁরে না হয়ে অপূর্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারত এই মনে করে আনন্দ অনুভব করে। যুদ্ধ সম্বন্ধে বীরবলের মারফত “নারীর পক্ষে” আমরা কয়েকটি সারগর্ভ কথা শুনিতে পাাইয়াছি। নারা বলিতেছেন, “আমরা সব জীবনের সৃষ্টি করি, স্মৃতির সং- জীবনের রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্বপ্রধান ধর্ম এবং তার ধ্বংস করা মহাপাপ। মানব- জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিম্বা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়। মানব পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয় তার প্রমাণ তার দেহ। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয়, তাহলে অনেকে মিলে অনেকে বধ করা যে কি করে ধর্ম ভাত পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।”—পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানের মতে - “সমাজ হচ্ছে একমাত্র রক্ষা এবং বাস্তবমাত্রেরই তার অঙ্গ; নিজের স্বার্থের জন্য করলে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য করলে সেই একই কাজ মহাপুণ্য।” খাঁটি বীরবলের ধর্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো—পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেঁচ থাকা।” অন্যত্র বীরবল বলিয়াছেন “বিজ্ঞানের বলে বলীমান হয়ে ঈশ্বরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল; এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ করবে।” ইহার মধ্যে অনেকগুলি অমূল্য বচন আছে।

আমাদের বর্তমানে শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন “যত দিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নবশিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারবো, এতদিন কনসারভেটকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অথবা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে স্থান না পেত, তাহলে না ভেবে চিন্তে, লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে, সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। কেবল মাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম চারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। স্কুলে লিখে এসে যে কালি আমরা হাতে আর মুখে মেখেছি, তার ভাগ আমরা দেশস্থ লোককে দিতে চাই। যেমনি একজনে লোক- শিক্ষার সুর ধরে, অমনি আমরা যে তার ধুরো ধরি তার একটি কারণ এই যে, একাজে আমাদের শুধু বাক্যব্যয় করতে হয়, অর্থ ব্যয় করতে হয় না। আমাদের শিক্ষকের একহাতে সংস্কৃত আর এক হাতে ইংরেজি ধরে, আমাদের উপর দুহাতে চাবুক চালাচ্ছেন। যারা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরাজি ভাষায় ওকালতি এবং “কলাবতী” করেন, তাঁরা যে ও ভাষার শুধু পড়া মুখস্থ দেন, তা শ্রোতা মাঝেই বুঝতে পারে।” আর কত তুলিব?

সাহিত্য সম্বন্ধ “মলাট সমালোচনা” ও “বইয়ের ব্যবসায়” এ তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের লেখক ও পাঠক উভয়কেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশের অনেক বই বিজ্ঞাপন, সার্টিফিকেট ও চক্চকে মলাটের দোহাই দিয়া ভি পি যোগে অনেক লাইব্রেরীতে স্থান পায়। সেগুলি পড়িলে সময়ে সময়ে মাকাল ফলের কথা মনে পড়ে। “বীরবলের হালখাতা” হাতে পড়িলে অন্ততঃ সে কথা কাহারও মনে পড়িবে না একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

## গ্রন্থ-সমালোচনা

বনমল্লিকা—রচয়িতা শ্রীমান কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,। আকার ৯৬+১১/০ পৃঃ; ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য বাঁধাই ১ টাকা আঁধা ৫০ আনা। প্রকাশক মেসার্স চক্রবর্তী, চাটাজি এণ্ড কোং। ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কবি কুমুদরঞ্জনের পরিচয়, বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার নিকট নূতন করিয়া দেওয়া নিশ্চয়োজন। বাঁহার মানস-সরোবরের অপূর্ণ সৌন্দর্য্যধার ‘শতদলের’ সুবিমল মিষ্টমধুর সৌরভে, বাঁহার ভক্তিশ্রব্দ-চর্চিত ‘বনতুলসী’র পবিত্রতা ও মনোহারিষে ভাব-যমুনা ‘উজানি’র নানা ভঙ্গের রস-তরঙ্গে বঙ্গবাসী বিমোহিত;—বাঁহার ‘একতারার’ সুমধুর বন্ধারে বাণীর বীণা-নিঃসরণ সজীবিত, পল্লীর প্রাণ অধ্যুষিত, তাঁহার আর নব-পরিচয়ের স্থান কোথা? যিনি মুচ্ছনার মুচ্ছনার সুনিপুণ চিত্রকরের মত পরিচিত বর্ণসজ্জাতে, সকল মনুষ্যের নিত্য উপভোগ্য অতি প্রাণের, গ্রামের, জন্মভূমির, গৃহের ভাবময় আলোখ্য স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কনে পটু, যিনি প্রাতঃ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিতের ফটোগ্রাফের তাঁহার পরিচয়ের আর বাকি কি আছে! বাকি ছিল অতি অল্পই—সেই অল্পের ব্যবধানও মুছিয়া ফেলিগাছে তাঁহার এই স্বভাবজাত ‘বনমল্লিকা’,—মল্লিক-মালকরের শাস্ত্রসাম্পদ পুত্র মন-মালকে যে মল্লিকা জন্মলাভ করিয়াছে তাহা সত্যই অনিন্দ্য,—আম্মার আকাঙ্ক্ষিত সৌরভ-বারতায় ভরপুর! তাঁহার পুষ্পবিধীর এটি উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি! ইহাতে তাঁহার পূর্বের সেই পল্লী-চিত্র—

‘মাটির দেয়াল খড়ের চালা গোবর দেয়া মেজে’ ‘ছাড়া কোকিলের গান’ ‘পশু পাখী তরু লতার রেহ’—

‘তীর্থ আমার স্বর্গ আমার ক্ষুদ্র গৃহকোণ,

‘সফল আমার পুণ্যপুকুর সফল আরাধন’

‘শম্পাশ্রমল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ-ছায়ে

পল্লীরানীর ভক্ত ছালাল, কতই গীতি নিত্য গাহে।’

আরও—

‘ঘর কর টাবটুব রও তুমি নিত্য,

বাঙলার প্রাণ তুমি, কৃষকের বিত্ত’

পূর্বের ত্রায় তাঁহার কাব্য অলঙ্কৃত করিয়া আছে—অধিকন্তু বনমল্লিকার সৌরভে গৌরবে—

‘ভাবার অলকানন্দা, ভাবের শ্রীবন্দাবন, গোবিন্দের গীত

যৌবন যমুনা জলে ভাসিয়ে আনিলে তুমি আনন্দ সচ্চিৎ’—

অতর্কিত হইয়া প্রচার করিয়াছে—

ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ

গান আর প্রাণ তুমি করে ধিলে এক,—

চিত্তবৃত্তি হইলে স্বপ্ন আর টেকে কতক্ষণ ? মাঝের কুজাটকা যতই ঘন হ'ক না কেন সূর্য্য কিরণ মূর্ত্ত হইয়া উঠিলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে কোথা ? তখন যে আপনি নয়নে ধরা পড়ে—

‘সত্য দিয়া মিথ্যা গড়, মানুষ ভেঙ্গে চিত্র,  
কাস্তি দিয়ে ভ্রান্তি রচে শত্রু না সে মিত্র ?  
হারার সে যে কোমল কারা,  
নিঃস্ব আমার বিশ্ব সারা,  
নিত্য লভে নেত্র ধারা  
দুহ জগতের অর্ঘ্য ।’

তখন কি আর সে সব কিছু প্রাণ চায় ? তখন যে—

‘বেচা কেনা নেনা দেনা চুকিয়ে যায় সব  
নীরবতায় ডুবে যায় মেলার কলরব’

তখন—

‘ধ্যান তারে পেতে চায় প্রাণ চায় তারে  
গান মরে খাঁজ,  
জীবন সফল হবে পরিপূর্ণতার  
তারে পেলে বুঝি ।  
কোন স্থলগনে স্বাণী নক্ষত্রের জলে  
ধন্য হব আমি,  
ফলিবে এ রক্ত বৃকে সেই মুক্তাফল  
বল অন্তর্য্যামী ।  
ধ্যান মোর মূর্ত্ত হ'ক প্রাণ পা'ক ছবি  
দাও সেই ধন,  
সার্থক হউক মোর তুচ্ছ দেহ গেহ  
জীবন যৌবন ।’

জীবন যৌবনের গর্ভ ত তখন তাঁহার অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে ; দেবতার দান রূপে তাহা সার্থক হ'ক ।  
ওক্তি হৃদয়ে শুভ্র মুক্তার ন্যায় তাঁহার অন্তরতন প্রদেশেও দীপ্তমান সেই—শুভ্রকায়মন্ত্রণমন্ত্রাবিরঃ শুভ্র  
অপাগবিদ্ধম্—(ঈশ ৮)—“ যিনি তমোহীন, দেহহীন, ক্রতহীন, ভ্রায়ুহীন, মলাহীন, পাপহীন, যিনি,—তাঁহার  
তত অধিষ্ঠান, আসন সংস্থাপিত হইয়াছে ! ভক্তের

‘সব গিয়েছে সব গিয়েছে  
নয়'ক তবু নিঃস্ব রে,  
সব গিয়েছে সব গিয়েছে  
সব পেয়েছে জীবনে ।’

অস্তরে তাঁহার কেবল উচ্ছলিত—

উদ্ধারের এ মন্ডাকিনী  
শ্যামের সরল বাঁশীর সাড়া  
মুর্মুর এ সঞ্জীবনী  
অন্ধ জনের নয়ন তারা  
শোকের প্রলেপ দুঃখের সাথী,  
জীবন মরণ সম্বল কর  
আঁধার বুকের উজল বাতি  
বল রে হরেকৃষ্ণ হর।”

তখন—

“অকূল নিরে ব্যাকুল তুমি অদূর তোমার ঘর  
পরকে কর আপন তুমি, আপন কর পর।”

ওগো কেবা আপন, কেবা পর—সকলই যে আজ তাঁহার ভূমানন্দে আপন—তাঁহার মনে প্রাণে যে ধ্বনিত  
হইতেছে—

“ভূমিব স্তম্ভ নাল্লৈ স্তম্ভমস্তি।”

সে স্তম্ভে সে আশ্রয়,—বিশ্বসঙ্গীতের মধুর ধ্বনি তাহাকে বিস্তার করিয়াছে, প্রাণ আকুল হইয়া বলিতেছে—

‘গীতী জানি, রচিত কার জানিনে তার নাম,  
কোন দেশেরি লোক সেটা গো কোথায় তাহার ধাম ?  
এই মনোহর মন্দির হায় শিল্প কাজে ভরা,  
জানতে ওগো পারবে না ত কাহার হাতে গড়া।’

কে তুমি—হে অস্তর ? কোথায় তুমি ?

‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্যো—’

‘সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না বাক্য যাইতে পারে না, মন বুদ্ধি যাইতে পারে না—’ ও সে এমন, সে এমন  
কথায় কে বলিতে পারে—

‘স এষ নেতি নেতি আত্মা।’

ওগো সকল ধ্যানধারণার অতীত সে আত্মা ! ওগো সে যে অস্তরে বিরাজমান হইয়াও অস্তর,—তাঁহার  
রূপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না,—ভক্ত তাই কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে,—দেখা দাও হে—

“তোমার নামের অহুরাগী আমার করণে,  
ভেঙেচুরে একেবারে নূতন গড় হে।  
চুকিয়ে দাও আশার নেপা, সকল অহঙ্কার.  
নামিয়ে দাও প্রাণের ঢোকা, অভিমানের ভার,  
তুমি থামিয়া দাও একেবারে হিয়ার ধুক ধুক,  
শেষ দাবী দাও ওই চরণে লুকাইতে মুখ।”

যদি ওই অভয় চরণে শরণ পাই তবে আর কিসের ভয় —

“বিপদ সাগর গর্জে যদি, ভয় করোনা মন  
অগস্ত্য যে আসছে পথে দম্ভ কতক্ষণ ?  
রাজার চেয়ে নইত কমি গরব কিসের তার  
ফকির চেয়ে নই যে বড় কিসের অহঙ্কার ।  
জীবন আমার অফুরন্ত অন্ত কোথা হায়,  
পনের সে যে হস্তধন্য ওই মিলিয়ে যায়  
বাড়তি নহে কমতি নহে নিক্তি ধরে দান,  
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান !  
ভয়ও আছে, অভয় আছে, আছে বুকের বল,  
কাটাভরা মৃণাল আছে, সোণার শতদল,  
শিশুপালে বধ করে সে, রাথালে দেয় কোল,  
ইন্দিতে সে জগৎ দোলায় কদম্বে পায় দোল,  
বলির মাথায় দেয় সে পদ, ভৃগুর পদে বুক,  
ভরকে করে অভয় সে যে দুখকে করে সুখ,  
আছে পাঞ্চজন্য ধ্বনি, আছে বাণীর গান,  
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান ।

এ চরম অভয় বাণীর উপর আর বালবার কি আছে !

মন্দিরা,—রচয়িতা শ্রীমান বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । আকার ১৬ পে, ৯৩+১৯০ পৃঃ; সুন্দর ত্রুটিক কাগজে পরিপাটি ছাপা । মূল্য সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই ১৯০ আনা । ‘মানসী’ কার্যালয়, কালিকাতা হতে প্রকাশিত ।

সপ্তস্বরী,—এখানিও শ্রীমান বসন্তবাবুর । আকার ১৬ পে ১৪০ পৃষ্ঠা সুন্দর রেশমী বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট,—দেশপূজ্য কতিপয় মহাশয়, সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্রে শোভিত, মূল্য এক টাকা । ‘মানসী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

ক. ব. বসন্তকুমারও চেনা বামুন । যে দিন তিনি প্রথম ভয়ে ভয়ে

“ধামি অযোগ্য আসিয়াছি ওগো

কারম্য হুয়াশা শুনাতে গান

কিছু নাই মোর আনিয়াছি তাই

মন্দিরা এই কীসার দান,” বলিয়া মন্দিরা হস্তে দিলীত নম্র

ভাবে সাহিত্য-আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; ঠাঁহার হাতের শুণে, কীসার মন্দিরাতেই, ‘ঐক্যতানের



সুশিক্ষিত রিনিকি যিনিকি খনন হবে' মিষ্ট মধুর শাভিয়া উঠিয়াছিল। সে দিনই তাঁহার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। সে বারতা, শ্রোতৃবর্গের সে ভাব কবির নিকটও অজ্ঞাত ছিল না—তিনি ল্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন—

“জগতের আজি,            বিশাল আঙিনা  
পূরিয়া গিয়াছে চরবে;  
উৎসবে মাতি            চলেছে সকলে  
বিপুলানন্দ রভসে।”

তিনি সেই দিনের সাফল্য বুঝিয়াছিলেন, মন্দিরাই যে হস্তে এমন স্বাক্ষর আছে, তাহার ভবিষ্যত উজ্জল, তাই সে দিনের সভা শেষে কবি আশার সুরে গাহিয়াছিলেন—

“ভাস্কর সভা থামুক রে গান, আজকের স্নাত ভবে;  
আবার যখন আসব হেথায়,—তখন সে স্বান হবে।”

সত্যিই সে দিন হইতে কবি সমভাবে আসর ভরকাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ‘সপ্তস্বর’—

“সপ্ত ভদ্র কুশুম ধবল বাণী পবিত্র রূপ,  
সপ্তচ্ছন্দ শুভবর্ণ মন্দের স্মৃতি-স্বপ্ন,  
ভক্তচিত্ত সেবার রক্তে রাঙা সপ্তলা দল,  
সপ্ত কণ্ঠ রচিছে মালিকা স্মৃতি নতরল,—  
ভারতীর করে সপ্তস্বর-নিধান  
সপ্তবর্ণ সপ্তলোকের সপ্তশতীর গান—

পন্নীর গান, প্রাণ প্রেমের দান, সুখ ও দুঃখ, প্রকৃতি পূজা, কি সহজভাবে তাঁহার সুস্বর-লহরে সজীবিত হইয়া উঠিয়াছে! বসন্ত বাবু ভাব সাগরের ডুবুরী, প্রকৃতির পুংসক, পন্নী-কী-নের সুখ-মহনকারী অমর, আবার স্বহস্তা পারাবারের তুফান—কবির হৃদয় উচ্চ, সরস, সবল, তিনি পরকে আপন ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন,—সমবেদনা, সহানুভূতি তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তাঁহার গান এত মিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী। অধিকাংশ স্থলে কবির ছন্দাদি সুন্দর বিষয়োপযোগী কিন্তু স্থানে স্থানে তাল যে না কটিয়াছে তাহা নহে,—আমরা বিনীতভাবে কবির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি। প্রার্থনা কবির অনাবিল, অবিরাম ভাব উৎসাহ অফুরন্ত, হক—করি যে সাধনায়—

“বনে করিয়াছি যে তপ কঠোর

তারি ফলে আজি এ সুযোগ মোর” লাভ করিয়াছেন, তাহা মনের কৃপায় সার্থক হ'ক।

কোচবিহার টেট প্রেসে শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারের আটান "চণ্ডিকাব্রত" পুঁথির বিতীয় পাটার (এক পৃষ্ঠা)

( শালবাহন রাজ ও ধনপতি )

"সনাক প্রকারে তারে করিছি ল'ন  
একপ তুমি। হুপ বলিছে তখন

( ধনপতির কমলে কমিনী বন্দন )

"কেবা বা ইহন্তে কস্তা তপনি আসি।  
অখান তাহার এক করিক গ্রাসিয়া"

( খড়ে বিধবস্ত ধনপতির নৌকা )

"পরে সাধু চলিল নৌকার পর চড়ি  
দেবীর কোপেতে রাতে নৌকা গেল উড়ি"

কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারের আটান "চণ্ডিকাব্রত" পুঁথির প্রথম পাটার (এক পৃষ্ঠা)

( ধনপতি ও পুরনা )

"জানাইলা সাধু তুমি। ধনপতি  
গৃহিনীক বলিছেন একপ তারতী"

( পুরনাকে দেবকস্তাগণের দেবপুত্র। শিক্ষাদান )

"হা। ছাগ পাবা আর হবা পুত্রবতী  
দেবীর সন্তাবে দুঃখ যাবে নীত্ৰগতি"

( পুরনার পুত্রায় ঘটে ধনপতির পদাঘাত )

"সেঙ্গপ দেখিয়া অতি কোথবল হয়।  
তন্তন করিল পদে আঘাত করিয়া"

( পুরনার হৃতিকাগার )

"ঈপতি তাহার নাম রাধিল তখন  
প্রসবিল হৃত নিজ কুলের নন্দন"



# পরিচাৱিকা

( নব পৰ্য্যায় )

“তে প্ৰাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বৰ্ষ ।

চৈত্ৰ, ১৩২৫ সাল ।

৫ম সংখ্যা ।

বৰ-মঙ্গল ।

—:~:—

আমি      কৰেছিঁলু খুব কঠোৰ তপ  
কত না জনম জনম ধৰিয়া তোমাৰ জপ  
তাই তুমি মোৰে দিয়াছ এ বৰ  
এই সংসাৰে বাঁধিবাৰে ঘৰ  
মানবেৰ মাৰ্কে এইটুকু ঠাই,  
কৰুণাময়,  
নহিলে এ ভূমি অমনি কখন স্নানত হয় ?

আমি      চেয়েছিঁলু এক স্নেহেৰ পুৰী  
এত স্নেহ তাই দিয়াছ দেবতা জগত-জুড়ি,  
খনে খনে নানা জনে জনে দিয়া  
এত যে পসৰা দিছ' পাঠাইয়া  
তৰু গিৰি নদী মৰু মৰী আদি  
জলে ও খলে—

মোরই জৰে নাকি পাঠায়েছ, তাই সকলে বলে।

আমি ডেকেছিলাম তোমা আদর করে'  
তারি প্রতিদান দিচ্ছি' বুঝি এই আজিকে মোরে।  
সখা সখী প্রিয়া হিয়ার পাতে  
একি সপ্তগাহ দিবস রাত্রে ?  
চিনিনা জানিনা যাদেরে কখনো  
তাদের' ডাকা—  
পথে পথে একি পদে পদে তব ফেরৎ রাখা ?

আমি একবার ভাল বেসেছি বলে  
এত কল্যাণ এত ভালবাসা দিলে কি চলে ?  
পশু ও পক্ষী কাঁটপত্তন  
করে দেছ' মোর অন্তরঙ্গ—  
এক কণা পেয়ে শতগুণ দিয়ে  
কি লীলা তব ?  
অজ্ঞেয় তুমি এ তারি আভাষ নিত্যনব।

আমি শুভখনে তোমা বাঁধিতে গিয়া  
বাঁধা পড়ে গেছে কঠিন বাঁধনে আমার হিয়া !  
কত না সুখের এ যে বন্ধন  
নানা রূপে করি পরি-রন্তন  
জাগিতেছে চির অন্তরে মম  
অমৃত-আলো  
ধরণীতে তাই এত প্রাণাধিক বেসেছি ভাল !

আমি তোমারে পাইব করিয়া আশা  
এসেছি মর্ন্ত্যে—তোমারি বক্ষে বেঁধেছি বাসা !  
তাইতো ডাকিনা কভু তোমা মুখে  
ডাকে কি মায়েরে—শিশু মা'র বুকে  
তবু সংসার যে বলে মিথ্যা  
সে থাকে দূরে—  
আমি যেন থাকি মানবের এই মিথ্যাপুরে !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## মিষ্টি সরবৎ ।

—(••)—

( ১৬ )

পরদিন সকালে আহমদ-সাহেব বাথ-গাউন ও জাপানী ঘাসের শব্দশীন চট পরিণা স্নানাগার হইতে পোশাক-কামরায় যাইবার পথে,—আব্দুল বরোকে একটা তর্ক-বিতর্কের অক্ষুট আওয়াজের মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ শুনিতে পাইয়া, কোতুল্লী হইয়া একটু দাঁড়াইলেন। শুনিলেন ইনেবের কি একটা কথার উত্তরে আব্দুল হাসা-কোমল কণ্ঠে বলিতেছেন, “কি মুন্সিল! আমি কি নিজের কণ্ঠের জন্যে বলেছি! আহ-মু বেচারী খেটে-খুটে বাড়ী এল, সে যে রাত বারোটার সময় একটু ঘুমিয়ে আরাম পাবে, তোমরা তার খোঁটা রাখলে না, হুজনে জরদা খেয়ে মাতাল হয়ে তেতালার খোলা ছাদে গিয়ে হাঙ্গির হলে!—আহ-মু না হয় হেসেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, কিন্তু ও যে খাম্কা তোমাদের অনায়েবের জন্যে কতটা কষ্ট পেলে, সেটা বিবেচনা কর। ও-গরীব না হয় কিছু বল্লই না—”

বাধা দিয়া মুহ-কোমল-কণ্ঠে ইনেব বলিল “তাই বুঝি,—গরীবের হয়ে বড়লোক তুমি,—তাড়াতাড়ি আমাদের’ জন্যে গাঁজার কল্কের ফরমাস্ দিয়ে বসলে?—”

অপ্রতিভ হাস্যে আব্দুল-সাহেব বলিলেন “আঃ বলছি তো, আমার রাগ হয়েছিল, আমি রাগ সামলাতে পরি নি, অনায়েব করেছি।—কিন্তু সেটুকু নিয়ে এত রাগারাগি কেন? বুঝেছ,—রাগটা হচ্ছে, মানুষের মহৎ দুর্বলতার লক্ষণ।”

ইনেব অধিকতর মৃদুস্বরে বলিল “সেটা এখন বুঝলুম, কাল কিন্তু গাঁজার কল্কে আমদানি হওয়ার সময় বুকেছিলাম,—ও জিনিসটা ঠিক তার বিপরীত সামগ্রী—”

এবার আহমদ-সাহেবের দৈর্ঘ্য লোপ হইল! লুকাইয়া কথা শুনিতে হইতেছিল বসিয়া একেই তো তাঁহার অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল, তার উপর এই আভমান-গঞ্জিত দাম্পত্য-আলোপের সৃষ্টিতর রহস্য-বাঞ্ছনায় তাঁহাকে একেবারেই বিচলিত করিয়া তুলিল! সশব্দে হাসিয়া ডয়ার ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর পা দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। ইনেব চট্ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া ঘরের এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

খুব মস্ত গোছের বিনীত ভাব দেখাইয়া—আহমদ-সাহেব সামনে মাথা বুঁকাইয়া বলিলেন “বিবিসাহেব, অনধিকার প্রবেশের ত্রুটিটা দয়া করে ক্ষমা করবেন, আপনাকে কিছু বলবার জন্ত অমুগতি ভিক্ষা করতে এলাম, বলব?—”

ইনেব ষাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সম্মতি জানাইল।

আহমদ-সাহেব বলিলেন “দেখুন, এই উজবুক-টাকে আর কিছু বলবেন না, কাল যেমন আপনার ওপর অসম্মান-জনক উক্তি প্রয়োগ করেছি, তেমনি হাত-নাগাদ পায়ে ধরে ‘খ্যাপোলজিও’ চেয়েছে, মনে আছে তো আপনার!—বলুন, আর কি ওর ওপর রাগ করা উচিত?—”

ইনেব স্তব্ধ ! আব্দুল-সাহেব এতক্ষণ একটু বোকা বনিয়া বসিরাছিলেন, এইবার আহমদ-সাহেবের আকস্মিক আবির্ভাব ও এত আড়ম্বরপূর্ণ বিনয় নিবেদনের যথার্থ অর্থ বোধগম্য হইতেই—সজোরে উচ্চ হাস্য করিয়া সকৌতুকে বলিলেন “ওরে শয়তান ! তুই বৃষ্টি এতক্ষণ বাইরে ওং পেতে কথা শুনছিলি ?”

কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া—উন্টা ঘাড় উচাইয়া—রীতিমত জোরের সহিত ধমক দিয়া আহমদ-সাহেব জ্ঞ কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন “না শুনলে তোর সদগতি করবে কে রে, রাহেল। চুপ উল্লুক, তুই এখন আসামীর কাঠগড়ায় আছিস্, মালুম থাকে যেন—” তারপর ইনেবের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ নম্র-বিনয়ে সসৌজন্তে বলিলেন “তা হলে এক এবারের মত ক্ষমা করলেন, তো ? বলুন—”

ইনেব বিপদগ্রস্ত হইয়া নীরবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।—

আহমদ-সাহেব পুনরায় বলিলেন “বেশী কিছু নয়। ঘাড়টি নেড়ে হাঁ বলুন। আমি চলে যাই—”

অগত্যা ইনেব মৃতাভাবে ঘাড় নাড়িয়া “তথাস্ত্” জানাইল।

আহমদ-সাহেব আব্দুলর দিকে চাহিয়া গর্জ-প্রফুল্ল মুখে বলিলেন “বৃষ্টি রে বেকুব ! ওকালতী শুধু পাশ করলেই চর না, নিজের ঘরে, জটিল-গার্হস্থ্য-ব্যাপারের মীমাংসার ওবিদ্যার ব্যবহারিক-দক্ষতাটা,—Great quantity জেনে রাখা চাই। নচেৎ তোমার মত উজ্জ্বলের পক্ষে ওবিদ্যা বিলকূল নিফল !—”

আব্দুল কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি ছয়ারটি টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া, নিজের পোষাক কামরায় চলিয়া গেলেন। পিছনে আব্দুলর হাস্যধ্বনিতে ঘর ঝঙ্কত হইয়া উঠিল। আহমদ-সাহেবের আর দৃকপাত নাই।

পোষাক পরিয়া শয়ন-কক্ষে আসিয়া দেখিলেন,—আমিনা চা প্রভৃতি লইয়া বারেওয়ার দিকের ছয়ার দিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

টোবিলের উপর চা রাখিয়া আমিনা যেমন ফিরিয়া দাঁড়াইবে—আহমদ-সাহেব অমন পিছন হইতে আচম্বিতে তাহার কানের পাশে বুঁকিয়া পড়িয়া ব্যঙ্গপূর্ণ বিনয়ের স্বরে বলিলেন “বন্দেগী জনাব, জয়দার নেশা এবার ভাঙ্গল ?”

“আচ্ছা, যাও—” বলিয়া সলজ্জ হাস্যে মুখ সরাইয়া লইয়া,—আমিনা একটু ক্ষোভ-মিশ্রিত অমুযোগের স্বরে বলিল “আমি তো সে জানি ! আমি একদিন জরদা খেয়ে দোষ করেছি, কিন্তু তুমি পঞ্চাশ দিন ধরে ঠাট্টা করে তার স্বাদের স্বদ উত্তল করবে ! তুমি এমন ভয়ানক লোক, হঁ !—”

আহমদ সাহেব হাস্ত হইয়া বলিলেন “আরে না না, চোটো না, চোটো না। আমি এখন ভয়ানক লোক মোটেই নয়, বরং একজন মস্ত Peace-maker—মহাশয় ব্যক্তি ! জানো, তোমার দাদার ঘরে এইমাত্র শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করে আসছি।”

বিস্মিত হইয়া আমিনা বলিল “দাদার ঘরে ? কেন ? কি হয়েছিল সেখানে ?”

আহমদ সাহেব মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিলেন “বিশেষ কিছু নয়, শুধু একটা বিরাট দাঙ্গার আয়োজন ! তোমার নানালক দাদাটী একেই তো নিরেট আহাম্মক তার ওপর নেহাৎ উজ্জ্বল, দেখলুম বিপদে পড়ে সে বেচারা নিতান্তই ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছে, কি করি—অগত্যা দয়া পরবশ হই’য়ে একটু এগিয়ে গিয়ে, তার মাথাটা বাঁচিয়ে দিয়ে এলুম !—”

আমিনা একটু হাসিয়া বলিল “আগা তুমি এতদূর শান্তিপ্রিয় সনাতন মান্ত্র হয়ে উঠেছ ? তা বেশ ! এখন এবার আমার সঙ্গে কতক্ষণে খুটিমাটি আবৃত্ত হবে, ঠিক করে বল দেখি ?”

আহমদ-সাহেব চারের পেয়ালার চুমুক দিতেছিলেন, একটু হাসিয়া পেয়লাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন “না না, ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বলছি শোন,—দ্যাখো তোমার চটিয়ে দেবার আগেও আমি মনে করি তোমার চটা বনা, আর—চটিয়ে দেবার পরও আমার বড় অমুতাপ হয় যে আহা কেন চটালুম!—কিন্তু ঠিক ঐ চটানোর সময়টিতে—আমার সে সব কিছুই মনে পড়ে না।

আমিনা হাসিয়া বলিল “আহা! কি চমৎকার মহত্ব!”

ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রস্তুত হইয়া,—আহমদ-সাহেব রুমালটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া একটু নয়ন সুরে বলিলেন “দ্যাখো, কিন্তু ওর মধ্যে আর একটা কথা আছে জানো, যে,—একহাতে তালি বাজে না?—”

আমিনা দস্তুরমত প্রতিবাদের সুরে, তৎক্ষণাৎ বলিল “বাজে না? কেন বাজবে না? খুব বাজবে, এই দ্যাখো—” বলিয়া নিজের বাঁ হাতটা সামনে প্রসারিত করিয়া দিয়া, তার উপর ডান হাতটা উপর্যুপরি সশব্দে আঘাত করিয়া সম্মিত মুখে বলিল “দেখলে এই তো, এমন করেও তালি বাজে!—”

হা হা শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “নাঃ, আমার হার মানালে আমিনা! তোমার এখন আর পেরে ওঠবার ঘো নেই!—বাপ!—”

সলজ্জ সঙ্কোচে আমিনা বলিল “আহা!” তারপর তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য, আলমারীর দিকে চাহিয়া বলিল “যন্ত্রগুলো কাল থেকে নীচেই পড়ে আছে বাবু, ওগুলো কবে সিন্ধু করে ওপরে পাঠাবে?”

আহমদ-সাহেব উত্তর দিলেন “আজই ৯টার সময় ষ্টেরেলাইজ-বক্স থেকে তুলে সাফ করে কম্পাউণ্ডার ওপরে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক তেমনি যন্ত্র করে তুলে রেখে। আর, কালকের টাকাগুলো তুলেছ?—”

আমিনা বিস্মিত হইয়া বলিল “টাকা? নাঃ, কই কোথায় আছে টাকা? তুমি তো বলনি আমার কিছু,”

ততোধিক বিস্মিত হইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “বলি নি? বাঃ!—” পরক্ষণেই ভুল সংশোধন করিয়া—পুনশ্চ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন “তার মধ্যে—বল্বেই বা কাকে? কাল যে তুমি মস্ত এক নেশার কাঁখে চড়ে নরলোক ছেড়েই যাত্রা করেছিলে।—”

সলজ্জ হাস্যে অভিমান কুপিত দৃষ্টি তুলিয়া আমিনা বলিল “আবার সেই কথা!—দ্যাখো, এবার কিন্তু—”

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আহমদ-সাহেব সুরে সুর মলাইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন “এবার কিন্তু ভাল হবে না!” না আমিনা—”

একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া আমিনা বলিল “হ্যাঁ—রাতদিন ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না,—খাম। টাকা কোথা রেখেছ—?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “বালিশের তলার,—না, না, বোধ হয় এই ঘোড়াতদানির তলার রেখেছি, দেখে দেখি, তোলো ওটা,—হ্যাঁ ঐখানেই আছে, গুণে রাখো—”

টেবিলের ঘোড়াতদানি তুলিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া আমিনা গুণিতে লাগিল। আহমদ-সাহেব নীরবে তা প্রকৃতির সেবার মন দিলেন।

আমিনা টাকা গণিয়া লইয়া বলিল “এই পকাশ টাকার একখানা নোট,—দশটাকার তিনখানা নোট, আর এই পুতুরো সাড়ে বাইশ টাকা, এই তো সব শুদ্ধ?”



আহমদ-সাহেব বলিলেন “হাঁ, ঐ রকমই কত হবে, আমার ঠিক মনে নাই। খুচরা কত আছে বলে, সাড়ে বাইশ? আচ্ছা ওটা আমার Diurnal বাস্তব রাধ, আর রায় বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর ঐ আশি টাকা—ওটা—”

বাণ দিয়া আমিনা সাগ্রহে বলিল “কি বলে। এটা রায় বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর পাওনা? ওঃ!—” পরক্ষণেই একটু তুষ্টমী-মাখা বিনয়ের হাসি হাসিয়া বলিল “তবে আর তুমি এটা নিয়ে কি করবে? এটা আমার দান করে দাও—”

একটু হাসিয়া কোমল স্বরে স্বামী বলিলেন “তুমি নেবে? তা নাও।—এটা আর আমার টাকার সঙ্গে রেখে না, একেবারে তোমার কাশে রাখ।” ক্রমশঃ মুখ মুচিষ্টা, মশলার ডিবাটি সামনে টানিয়া হইয়া, মুখে মশলা দিতে উদ্যত হইয়া সহসা কি একটা কথা মনে পড়ায় সকৌতুক হাসে সহসা তিনি বলিলেন—“শোন শোন আমিনা, আমার দিকে চেয়ে দেখে—”

আমিনা পিছন ফিরিয়া আলমারী খুলিতেছিল, স্বামীর বাস্তব-আহ্বানে বিস্মিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল “কি—?”

প্রচলিত-বিজ্ঞপ্তি অত্যন্ত বিনয়-কোমল কণ্ঠে স্বামী বলিলেন “বলছি কি.—আমার ওপর রাগ হলেই তো—ওগুলি আবার ফিরিয়ে দেবে?”

এটা আমিনার চিরচিরিত অভ্যাস! তবে টাকাকড়ি যাহা হাতে লইয়া খরচ করিয়া ফেলিত, রাগ হইলে সেগুলো হাতে হাতে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিতে পারিত না বলিয়া, যথেষ্ট আপেক্ষাকৃতক অশ্রুতাপের উক্তি শুনাইয়া দিতে ক্রটি করিত না! স্বামী নীরবে গুণিতেন আর নিঃশব্দ কৌতুকে হাসিতেন! তারপর অবশ্য যথাসময়ে আমিনার রাগ ঠাণ্ডা হইত, এবং সন্ধি হইলেই—সকলের আগে, ফেরৎ দেওয়া সম্পর্কে ফিরাইয়া লইতেও সে বাধ্য হইত! কিন্তু তা হইলে কি হয়? রাগের সময় রক্ষা থাকিত না!

স্বামীর কথায়—আমিনা বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল “হাঁ! তা দেব!—” বলিয়াই স্বামীর মুখের পানে উজ্জল-স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, পরিষ্কার কৈফিয়তের স্বরে, অদ্বান-বদনে বলিল “দেব না? নিশ্চয় দেব? তোমার ওপরই যখন রাগ করলুম, তখন তোমার জিনিসই বা নিতে গেলুম কেন? তা আমি নেব না—”

বাক্স-স্বরে আহমদ-সাহেব বলিলেন “অতএব পত্র পাঠ যথাসর্ব্ব্ব ফেরৎ দানই,—রাগের সময় প্রশস্ত বিধি! আচ্ছা আমিনা, ঠাট্টা নয়, রাগ করো না, একটি কথা সত্যি করে বলতো—গুন্ড, চোঁ দখো আমার পানে,—আচ্ছা, সংসারে এমন কতগুলো জিনিস আছে, যা একবার নিলে, আর ফেরৎ দিতে পারা যায় না,—জানো তো? আচ্ছা, এবার রাগ হলে সেগুলো ফেরৎ দেবার কি ব্যবস্থা করবে বল দেখি—”

বাস্তব ভাবে কাশবাক্সটা হুম্ করিয়া আলমারী হইতে নামাইয়া, আমিনা একান্ত মনোযোগে হিসাব মিলাইতে লুপ্ত করিল। স্বামীর কথার উত্তরে কিছু বলিল না।

স্বামী পিছন হইতে ডাকিলেন “গুন্ড, কবাব দাও না,”

আমিনা ‘হুঁ, হুঁ’ কোন শব্দও করিল না।

আমিনার সামনে আসিয়া, তই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া কুঁকিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া—আমিনার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া,—আহমদ-সাহেব পরিহাস-গঞ্জিত স্বরে বলিলেন—“গুন্ডে কি কিছুই পাচ্ছ না?—কথার কথার নাই কেন?”

সকোপে স্বাক্ষর হানিয়া আমিনা বলিল “আমি জানি না, যাও!”—কিন্তু ঐ পর্যন্ত! আর নয়! নিদারুণ অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও বেচারী খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মঠা অপ্রস্তুতে পড়িয়া,—ঠাৎ সব চাড়িয়া-ছুড়িয়া তড়াঙ্ক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! আঁচল এইতে চাবিটা খুলিয়া বানাৎ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া,—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিভরা রাগের স্বরে বলিল “এই নাও, -রইগ সব! গোছাও তুমি, আমি পারব না চলুন—”

ক্ষিপ্ৰ-হস্তে তাহার কাঁধ ধরিয়া থামাইয়া স্বামী, বাঙ্গা মিশ্রিত বিষ্ময়ের স্বরে বলিলেন “আরে হঃ! তালিম দেওয়া তুঁকিঘোড়াটির মত, তড়াঙ্ক করে লাফিয়ে উঠে ছুটছে কোথা? রহে, রহো—”

আমিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল “হ্যাঁ রইবে বই কি! আচ্ছাঃ! আমি তুঁকি ঘোড়াই হই, আর আরবী ঘোড়াই হই—এবার থেকে তুমি যতক্ষণ ঘরে থাকছ ততক্ষণ আমি আর ঘরেই ঢুকছি না!—সকালে বিকালে তুমি বেরুবার পর—আর রাত্রে তুমি ঘুমাবার পর, তবে আমি ঘরে আসুব, মনে রেখো—”

মাথা হেলাইয়া—যেন সর্কাস্ত্রকরণে অমুমোদনের স্বরেই আহমদ-সাহেব বলিলেন “আচ্ছি বাৎ! এখন ভাল মানুষের মত আমার বাস্তুটা গুছিয়ে দিয়ে যাও দেখি!”—আমিনাকে টনিয়া বাস্কের কাছে তিনি বসাইয়া দিলেন।

অশ্রুত স্বরে আমিনা বলিল “হঁ! আমি যেন পাগল নাকি—তাই খেপিয়ে থাবার যোগাড়! দ্যাখো আমি যতক্ষণ ঘরে থাকুবো—ততক্ষণ তুমি—থবরদার—আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, বুঝলে?”

হাস্য রুদ্ধ অধরে, চক্ষু বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া নীরব সম্মতি জানাইয়া, আহমদ-সাহেব টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া ষ্টাম্পে-কোপ, পার্মেটার প্রভৃতি পকেটে পুরিতে লাগিলেন।

বেচারী আমিনা—স্বামীকে কথা কহিতে বারণ করিলেও—তৎক্ষণাৎ ঈদ্ব দায়ে পড়িয়া, সে সর্ব্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিল, নিজেই! নোট কয়খানি বাস্কে তুলিতে উদ্বত হইয়া বলিল “তা হা! এই টাকাটা আমি নিলুম, বুঝলে—মহরমের দিন কাঙ্গালী-ভোজন করাও এতে—কেমন?”

আহমদ-সাহেব ক্ষণিকের জন্ত নীরব রহিলেন। তার পর একটু কাশিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মিটি-মিটি চক্ষু আমিনার পানে চাহিয়া বলিলেন “ও সম্বন্ধে আমার কিঞ্চৎ বক্তব্য ছিল, কিন্তু কথা কহিতে বারণ করেছ, নয়? কই বা কেমন করে?”

একটু হাসিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া আমিনা বলিল “তা না হয় কও,—আমি অসুমতি দিছি। বল কি বলবার আছে?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “বলছিলুম কি,—এই তো সেদিন বক্রীদের সময় কাঙ্গালী-ভোজন করালে। মহরমের দিনও কাঙ্গালীদের ভোজনটা যেখানে হোক বর্ণে পরিমাণে জুটবে, তার ওপর কেন আর তুমি আড়ম্বর করে গৌণমিল দিতে যাবে; তার চেয়ে, যদি যথার্থই টাকাগুলি দ্বারা কর্তে চাও; তা হলে সামনে এই শীতকাল আসছে, খানকতক কয়ল কিনে—অক. আতুর, কাণা, খোঁড়া—বারা যথার্থ পাবার পাত্র, তাদের দান কর, দান সার্থক হবে। শীতের সময় তারা গারে দিবে বঁচবে।”

আমিনা একটু ভাবিয়া বলিল “ঠিক বলেছ, ওটা আমার মনেই পড়ে নি।—তাই করব, কিন্তু—” একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল “এই ক’টি তো মোটে টাকা, এতে ক’খানিই-বা কয়ল হবে, আর কিছু দাও না—” বলিয়াই

পরম উৎসাহের সহিত বলিল “তোমার পকেট থেকে বার করতে হবে না। ইতিমধ্যে এল্লি পরণের যদি আর একটি ‘কল’ পাও, তবে সেই টাকাটি আমার দিয়ে দাও,—বুঝলে?—তা হলেই এক রকম হবে।”

আহমদ-সাহেব একটু হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

আমিনা কাশাবাক্স বন্ধ করিয়া আলমারীতে তুলিয়া কি একটা কাজের জুতা টেবিলের কাছে সরিয়া গেল। আহমদ-সাহেব তখন টেবিলের আধনার সামনে বুকিয়া দাঁড়াইয়া, কপালের চুল সরাইয়া সোলা চাটটি ঠিক করিয়া মাথায় বসাইতেছিলেন, আমিনাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া মুগ্ধভাবে বলিলেন “কেমন, সাজসজ্জা ঠিক হয়েছে? যম রাজার মহাবল পরাক্রান্ত অশুরগুণির সঙ্গে লড়াই করে জিতে উঠতে পারবো তো?—”

আহমদ-সাহেবের কথাগুলি বোধ হয় কিছু বেশী মাত্রায় নীচু স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, বেচারী আমিনা সেগুলো ঠিক যথার্থরূপে শুনতে পাইল না,—সে একটুখানি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া,—আন্দাজেই একটা যুক্তি-সঙ্গত স্তম্ভীমাংসা ঠিক করিয়া লহয়া পাতলা টুকটুকে ঠোট চর্খানি উন্টাইয়া, খপ্ করিয়া জবাব দিল “কী! লড়াই আর লুই! তা তোমার তো কোন বিদ্যারই কসুর নাই, ও ছুটি বিদ্যায় হাত পাকাবে, ও-আর বেশী কথা কি?”—বলিয়াই সে হিসাবের খাতাটি ও দোয়াত কলম টানিয়া লইয়া, পরম নিশ্চিন্তভাবে টেবিলের উপর বুকিয়া পড়িয়া হিসাব লিখিতে উদ্যত হইল।

“কোন বিদ্যারই কসুর নাই? কোন বিদ্যারই না? চুরি জুগচুরি বাটপাড়ি, দাগাবাজি—” বলিতে বলিতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া আহমদ-সাহেব নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সহসা দুহাতে আমিনার কটি-বেষ্টন করিয়া নিকটে টানিয়া বলিলেন—“আর, আর,—বল বল আর কি?”

লেখার বাধা পাঠিয়া, আমিনা মহা বিরক্তির সহিত প্রবল গাভুর্য্যে বলিল “আঃ, ছাড় ছাড়,—সময় নেই, অসময় নেই, কি যে রঙ্গ কর, তার ঠিক নেই,—ছাড়—। দ্যাখো, এই রইল তবে, তুমি লিখো—” আমিনা রাগ করিয়া কলম ফেলিয়া দিল।

আহমদ-সাহেব পরম আশ্চর্য ভাবে বলিলেন “যাক!—এবার বল, আর—আর কি?”

আমিনা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল “আমি জানি না, যাও—”

বাঁ-হাতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “বাস, একটু সরে এসে বস, তারপর?”

আমিনার রাগও ধরিয়াছিল, হাসিও পাইতেছিল—বিপর্যয় হইয়া হঠাৎ সে টুক করিয়া জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া দুহাতে সবলে স্বামীর হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখ গুঁজিয়া, হাসিয়া ফেলিল। তাহাকে উঠাইবার চেষ্টায় টানটান করিতে করিতে আহমদ-সাহেব বলিলেন “শোন-না, শোন—”

বারেণ্ডা হইতে আবলু-সাহেব ডাকিলেন “আহমু—”

মুহুর্তে আমিনাকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “হাঁ জী—এস,—বহেই আছি।”

যুক্তি পাইয়া আমিনা শশব্যস্তে উঠিয়া—তৎক্ষণাৎ দে ছুট! পোষাক-কামরার দিকের দ্বার খোলা ছিল, স্তম্ভাৎ সে সেই পথেই প্রস্থান করিল, খাইবার সময় পর্দার আড়াল হইতে—ছুট কোতুকের হাসিতে উজ্জল মুখখানি বাড়াইয়া একবার শুধু অশ্রুট বরে বলিল “বেশ হয়েছে!”

আবলু সাহেব ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্রতিভভাবে ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া মূহু স্বরে বলিলেন “আমিন্ এইখানে ছিল, আমি তো জানিতাম না!—

আহমদ-সাহেব তখন টেবিলের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া হিসাবের খাতাখানির দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি সংযত করিয়াছেন! যেন—এতক্ষণ তিনি একমনে হিসাবের খাতাই দেখিতে ছিলেন! আবলু-সাহেবের কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অসম্মতভাবে উত্তর দিলেন—“তুমি তা না জানার, তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি শুধু আমারই হিসাবের খাতায় ভ্রমের ঘরে একটা মন্ত অঙ্ক বাদ পড়ে গেল! আর একটু হলেই আমার হার্টফেল হয়ে গিয়েছিল আর কি!”—

শেলফের বইগুলার দিকে চাহিয়া মুহূর্তসময় আবলু সাহেব উত্তর দিলেন “তোমার মত হার্টলেস মানুষের হার্ট ফেল হবে, সে যে নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না!—”

ধমক দিয়া আহমদ বলিলেন “নিমকহারাম! এই না তোমার ঘরে গিয়ে কত কষ্টে অমন সুন্দর ঘটকালীটা করে এলুম—”

শেলফের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া আবলু বলিলেন “যেমন তুমি, তেমনি তোমার ঘটকালী! পরিণাম তার, চমৎকার শোচনীয়!”

তর্জ্জ করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “কি! আমার ঘটকালী বার্থ? এ যে অসম্ভব!”

পরক্ষণেই স্বর বদলাইয়া একটু কোতুহলের সহিত বলিলেন “সত্যি তামাসা নয়, কি হোল রে আবলু?”

আবলু-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বাসিয়া বইখানার পাতা উন্টাইতে-উন্টাইতে বলিলেন “সেটা সাধারণের নিকট অবজ্ঞা!—”

আহমদ-সাহেব অধীরভাবে বলিলেন “আরে উল্লুক আমি সাধারণের সামিল নই, আমি একটা মন্ত অসাধারণ! বল এখন—”

চশমার ভিতর হইতে—সলজ্জ-স্নগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবলু-সাহেব নিম্নস্বরে বলিলেন “তুই ঠুপীড় এখন আমিনার কাছে গল্প করবি তো? না তোকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এইটুকু জেনে রাখতে পারিস,—চটে-মটে, ঘর ছেড়ে পিটুটান দিয়েছে, আর শাসিয়ে গেছে, যে আর এ মহলে আসছে না, আজ রাত্রে যেখানে হোক আশ্রয় নেবে!—”

মাথার টুপী খুলিয়া মাথা চুলকাইয়া, চিন্তিতভাবে একটপ নস্যা টানিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “ওরে ইনিও যে তোমার বোনের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠলেন! এদের এসব ব্যামো কিসে ষোচে বল দেখি?—”

কোতুক-স্মিত হাস্যে আবলু-সাহেব বলিলেন “তুই তো হাকিম, দাওয়াই বাংলানোর দায় তোমার!—”

মাথা চুলকাইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “তা বটে!”—তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন “হুঁ! পদমর্যাদা ধর্ম করটা, বড় আপশোষের কথা! আচ্ছা বন্ধু তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দাওয়াই বাংলানোর ভারটা আমিই নলুম!

আবলু-সাহেব বিজ্রপের স্বরে বলিলেন “দাওয়াইটা কি হবে শুনি? স্টিমুলেন্ট মিকশচার?”

জাহাঙ্গীর কঁধে চপেটাঘাত করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “অবসাদগ্রস্ত মুমূর্ষুর পক্ষে সুপ্রযুক্ত্য ঔষধ তাই! দাঁড়া, অনেকগুলি কাঁহিল রোগী হাতে আছে, আগে সে গরীবদের দেখে আস, তারপর এঁদের চিকিৎসা মন দেব!—”

টুপীটি তুলিয়া লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

( ১৭ )

কিন্তু গরীবদের দেখিতে গিয়া, দৈববিড়ম্বনায় চিকিৎসক মহাশয় এক ধনবান হোণীর পাঞ্জায় পড়িয়া সেই দিনই সাড়ে এগারটার ট্রেনে বস্তার চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে কাহারও সহিত দেখা হইল না,—আমিনার সচিতও নয়। তারপর সেখানকার কাজ সারিয়া চার দিন পরে মহরমের শেষ উৎসবের পূর্ব দিন বেলা সাড়ে চারটার সময় বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ডাক্তারখানায় ঢুকিয়া প্রথমেই কম্পাউণ্ডারদের নিকট রোগীক্কেব সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানিয়া লইয়া তিনি সরাসর দ্বিতলে উঠিলেন। রস্তম পোষাকের ব্যাগ লইয়া পিছনে পিছনে উপরে চলিল।

দ্বিতলের বারেণ্ডায় আবলু-সাহেব তখন একখানা ইজি চেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়া কি একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়িতেছিলেন। শ্রান্ত ভ্রমলোকটিকে দেখিয়া শশব্যস্তে, মমতাপরম্প চিত্তে চেয়ারখানি তাহাকে সরাইয়া দিয়া, নিজে একটা টুল লইয়া বসিলেন। তারপর চিকিৎসা চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের সম্বন্ধে সংক্ষেপ সংবাদ আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেন। রস্তম পোষাকের ব্যাগ নামাইয়া দিয়া, আহমদ-সাহেবের জুতামোজা খুলিয়া দিতে বসিল।

জুতামোজা খুলিয়া, পোষাক উৎরাইয়া পরিবার ক্রম প্রভুকে ‘খোতি ও কুর্ভা’ দিয়া রস্তম নিজ মনেই বুদ্ধি খাটাইয়া, আমিনার খোঁজে চলিল। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই সে উর্জ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উৎসাহ-উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া-ই ডাকিল “জনাব—”

তাহার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে, কথোপকথনরত শ্রালক-ভগিনীপতি এক যোগে চমকিয়া বলিলেন “কি হয়েছে ?—”

আবলু-সাহেব যে সেইখানে ছিলেন, উৎসাহ-উন্মত্ত রস্তম সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, নচেৎ সে এমনভাবে আদব-কারদা বিগহিত চালে অকস্মৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার ‘জনাব’কে ত্রস্ত-আবাহনে চমকিত করিতে সাহসী হইত না ! এতকণে হুঁস্ হইতেই কুর্ভা-ভীত নয়নে আবলু-সাহেবের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া, অপ্রতিভভাবে ঘাড় চুলকাইতে-চুলকাইতে, শুটি-শুটি চরণে, নিতান্ত ভাল মাহুকের মত গজেন্দ্রগমনে আসিয়া—আহমদ-সাহেবের চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল, তারপর বিনাবাক্যে নিঃশব্দে তাহার পরিত্যক্ত পোষাকগুলি লইয়া পোষাক-কামরায় গমনোন্তত হইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আহমদ-সাহেব সবিস্ময়ে বলিলেন—“কি হয়েছে রে ?”

রস্তম থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ঘাড়ের আবার কি ব্যাধির উপদ্রব বাটল কে জানে,—সে ব্যতিব্যস্তভাবে উপযুপরি ঘাড় চুলকাইতে-ই লাগিল ! প্রভুর প্রেমের উত্তর দিব্য অবকাশই যেম পাইল না !—আবলু-সাহেব যারপর নাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন “কি বলতে এসেছিলি, বল,—খামূল কেন ? কি খবর ?—”

একটু থমকিয়া—ত্মিত নিম্প্রভ নয়নে বারেণ্ডার মেঝের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে—কুর্ভা জড়িত স্বরে রস্তম বলিল “খবর কিছু নয় হুজুর,—বিবি-সাহেবা উপর-মহলে নেই, তাই বলতে এসেছি।”

আবলু বলিলেন “কোন্ বিবি-সাহেবা ? আমিনা ?—কোথায় সে ?—”

রস্তম বিচলিতভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর সত্তর-চল্লি আবলু-সাহেবের উৎকর্ষ-ব্যগ্র দৃষ্টির দিকে আর একবার চাহিয়া হঠাৎ আহমদ-সাহেবের পানে কিরিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিয়া ফেলিল “তারা ছ’জনে, বহলী স্বরু—কুরাতলার বাসন মাজতে গেছে, হুজুর।”

মুহূর্তে আহমদ-সাহেবের দৃষ্টি পরিষ্কার হইল ! পূর্বকথা মনে পড়িল ! তড়াক্ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া উৎসাহ-বাগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—“কি—কি—কি ? বাসন মাজ্জতে গেছেন ? বহুজী সুদ্ধ ? নীচে কুয়া-তলার ?—”

এতক্ষণে রস্তুম যেন ধরে প্রাণ পাইয়া বাঁচিল !—গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, পরম আগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—“জী, হাঁ ! বাঁদীরা দাঁড়িয়ে হাসছে ওঁরা দুজনে বাসন মাজ্জছেন।—” একটু থামিয়া বলিল “আবো তি বহৎ বর্তন মাল্নেকো জমায়েৎ হায় জনাব—”

আহমদ-সাহেব সাগ্রহে বলিলেন “এখনও টের ‘বর্তন’ আছে ? তুমি কি বলেছ তাঁদের, আমি এসেছি ?—”

রস্তুম বলিল “কিছু না হজুর, তাঁরা আমার দেখতেই পান নি। আমি চুপি চুপি পিছু হেঁটে পালিয়ে এসেছি। তাঁরা কেউ টের পান নি।”

দাঁতে ঠোট চাপিয়া হাস্য রোধ করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “কে আছে সেখানে ? ফুফুজী,—খোকার মা—”

রস্তুম বাগ্ধতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল “কেউ না হজুর, কেউ না। তাঁরা সবাই এখন ঘুমুচ্ছেন, সেখানে সেরেফ বাঁদীরা আছে, তবে তুফানী দিদিও আছে হজুর—” বলিয়া ঠোট কঁচকাইয়া সে একটু অগ্রসরভাবে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ তুফানী দিদির উপস্থিতিটা বিশেষ সুবিধাজনক নয় !

আহমদ-সাহেব বলিলেন “ঠিক বলছ, ফুফুজী সেখানে নাই ?—”

রস্তুম দৃঢ়তার সহিত বলিল “না জনাব, তিনি এখন সেখানে যাবেন না—এ ঠিক।”

আহমদ-সাহেব বলিল “রস্তুম, ঘরে টেবিলের বাঁ পাশের ড্রয়ারটা খুলে দাখ, গোটাকতক আধলা পরসা আছে, ছুটো বের করে আন,—চট্ করে—”

ঝুপ্ করিয়া পোষাকগুলি চেয়ারের হাতার উপর ফেলিয়া দিয়া, একলক্ষ রস্তুম ঘরে ঢুকিয়া, একটানে হড়ান্ করিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া, দুটি আধলা পরসা লইয়া ক্রণমধ্যে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আহমদ-সাহেব সে ছুটা হাতে লইয়া, আবলু-সাহেবকে ঠেলাদিয়া বলিলেন “ওঠ।”

আবলু-সাহেব এতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়াছিলেন, এবার সবিস্ময়ে বলিলেন “কোথায় ? সেখানে নাকি ?”

আহমদ-সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন “রস্তুম, এগিয়ে দেখ্ বাচ্চা, ফুফুজী সেখানে এসেছেন, না কি—”

আজ্ঞা মাত্রে রস্তুম ঘোড়দোড়ের ঘোড়ার মত লক্ষ দিয়া ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

আহমদ-সাহেব বলিলেন “লো আবলু, নতুন বাঁদী ছুটির তলব চুকিয়ে দিয়ে আসি।—”

সত্বরে পিছু হাটিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন “তোমার মরণ-বাড় বেড়েছে, নয় ?...তারপর ?—”

আহমদ সাহেব বলিলেন “তারপর আর কি ? তোমার বিবিসাহেবা এবার চটে গিয়ে কি করেন দেখা যাক্—”

ঘাড় নাড়িয়া আবলু-সাহেব বলিলেন “না ভাই, আহ্ হু, অত দেখাদেখিতে আমার সাহস নেই, ওসব দিকে আমার বুদ্ধি খেলবে না—”

আহমদ-সাহেব তাঁহার ঘাড় ধরিয়া রীতিমত ধাক্কা দিয়া বলিলেন “আলবাৎ খেলবে। ‘চালালেই চলিশ বুদ্ধি, না চালালেই হত বুদ্ধি’—জানো তো, ভড়্কাচ্ছ কেন?”

কিন্তু এত উৎসাহ সত্ত্বেও আব্দুল-সাহেব পুনশ্চ পিছু হাটিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন “না না, তুই বুঝ্ছিস না, ওদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিটা ভয়ানক বেশী, এখনি হয় তো মার কাছে কিছা দিদির কাছে গিয়ে নালিশ করবে—”

আহমদ-সাহেব সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন “খেপেছিস তুই, তা পা হবে না, চল—”

ঘোর বিপদে পড়িয়া আব্দুল-সাহেব সকাতরে বলিলেন “দোহাই আত্ম, আমার বাদ দিয়ে চল ভাই, দেখ্ একে তো সেখানে আমি আছি—”

হাসিয়া পরিহাস ভরে ঘাড় নাড়িয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “তেম্মি তুই তো আমি ও যাচ্ছি হে,—”

বাদা দিয়া আব্দুল-সাহেব বলিলেন “তারপর—” বলিয়ায়াই তিনি একটু থামিয়া, হাসিয়া বলিলেন, “আমার সঙ্গে কথা নাই,—সেই দিন থেকে—”

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া ঘাড় উচু করিয়া—আহমদ-সাহেব তর্জ্জন করিয়া বলিলেন “কথা নাই? কেন? তুই কথা কস্‌নি, কেন রে উল্লু—”

মুহু হাঞ্জে আব্দুল সাহেব উত্তর দিলেন “কার সঙ্গে কথা কইব রে উল্লু! দেখা পাই না বে—”

“অঃ” বলিয়া আহমদ-সাহেব মুহূর্তের জন্ত থামিয়া একটু ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন “আচ্ছা চল, তবে দস্তুরমত ভূম্ননীই শুরু করা যাক! তোর বোনের ঘোর সন্দেহ যে, আমি তার—নালক দাদাটিকে অহোরাত্র তালিম দিয়ে শিখিয়ে শিখিয়ে সাবালক করে তোলাবার চেষ্টায় আছি, চল তো ভাই, আজ তার সন্দেহটা নিশ্চুল করে দিয়ে আসি—”

ঠিক সেই মুহূর্তে, রস্তুম সিঁড়ির দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া, সুদক্ষ গুপ্ত চরটির নিঃশব্দে আহ্বান-সঙ্কেত করিল! আব্দুল-সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল, আহমদ সাহেব জুতা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে নগ্নপদে তাঁগকে টানিয়া লইয়া দ্রুত ছুটিলেন! অগত্যা আব্দুল-সাহেব ভাল মাহুকের মত নিজেও জুতা খুলিয়া ফেলিলেন।

পথপ্রদর্শক রস্তুম, বহু খরগোশের মত লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়া নিঃশব্দে আগে আগে ছুটিয়া চলিল, পিছু পিছু চলিলেন তাঁহারা!—এদকের সিঁড়ি বহিয়া তাঁহারা সোজা রান্নামহলের উঠানে নামিয়া আসিলেন, সামনেই একজন দাসী ঘর ধুইতেছিল, আর একজন উঠান খাট দিতেছিল, তাহারা সসন্ত্রমে খাঁটা ফেলিয়া, মাথার কাপড় টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময় নির্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল!

রস্তুম বীরদর্পে বুক ফুগাইয়া, কুয়াতলার কাছাকাছি হইয়া, একটু দূর হইতে—পরম মোলায়েম ভাবে নাকি সুরে হাঁকিল “তুলানি দিদি, তয়া সে হট্ বাও—”

তুফানী বোধ হয় প্রহর-বাপদেখেই কুয়াতলার দ্বারে অবস্থান করিতেছিল, কিন্তু সে সময় কোনদিকেই ভয়ের সম্ভাবনা না থাকায় সে বেচারী বোধহয় অতিরিক্ত মাত্রায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে—তাহার ‘সতর্ক-নজরটা’ বাহিরের দিকে না রাখিয়া ভিতরের দিকেই—কস্ম নিরতা বিঃ সাহেবাদের, নৈপুণ্য-ক্রুটি সংশোধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চির-চঞ্চল রসনা মহাশয়ও সকৌতুকে আশ্ফলিত হইতে ক্রুটি করিতেছিল না!—এ হেন সূখ সৌভাগ্যের মাঝে রস্তুমের একান্ত বেসুরা কণ্ঠস্বরটা তুফানীর কান অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঠেকিল, ত্রুণ্ডে পিছু ফিরিয়া,

অকস্মাৎ রক্তমের পিছনে যুগলমূর্তি দেখিয়া,—সে যেন হতভম্ব হইয়া গেল ! বিবি সাহেবাদের সাবধান কারিয়া দেওয়া চুলায় ঝাউক,—সে আর নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ পাইল না ! ক্ষিপ্র হস্তে ঘোমটা টানিয়া স্টুট্ কারিয়া সেখান হইতে কোনদিকে সরিয়া পড়িল !

কণমধ্যে আবলুকে টানিয়া লইয়া আহমদ-সাহেব কুয়াস্তলার দুয়ারে হাজির ! একটু নিয়কণ্ঠে বলিল “কৈ ? মুন্সী-সাহেবদের বাড়ীর নতুন বাঁদী ছুটী কৈ ? এই যে ! আহা মরি মরি;—এমন না হলে কি বড় লোকের বাড়ীর বাঁদী বলে মানায় ? আসুন সাহেব দেখুন, কি নসীবের জোর আপনার ! কি থপ্পুরথ শোভা ! আহা মরে যাই, মরে যাই—”

আমিনা ও ইনেব তখন কোমরে আঁচল জড়াইয়া হাতের কনুই পর্য্যন্ত স্ক্রিক্, ছাই, খোল মাখিয়া একাগ্র মনোযোগে ঘাঁড় হেঁট মরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে থালা বাটি রগড়াইতেছিল সহসা এই অভিনব সম্ভাষণে বিষম চমক খাইয়া—ঘাঁড় তুলিয়া চাতিয়া হুজনেট যেন নিমেষ মধ্যে বজ্রাহত হইল ! পরক্ষণে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া সেই ছাই মাখা হাতেই মাথার কাপড় টানিয়া হুজনে সম্ভ্রান্তভাবে দু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল !—অবশ্য দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ।

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে আবলু-সাহেব লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন “ছাড়, আহমু ছাড় আমি এবার চলে যাই—”

সুগভীর বিষয় প্রকাশ করিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “যাবেন কি মশাই ? সে কি কথা !—খোদা আপনাকে এমন সব আশ্চর্য্য দৌলতে দৌলতবান্ করেছেন আপনি সে মৌভাগ্য আমার দেখাবার জন্তে মেহেরবাণী করে এতদূর অবধি টেনে নিয়ে এলেন—”

প্রতিবাদ করিয়া আবলু-সাহেব বলিলেন “আমি টেনে এনেছি ! ত্বাপ্ আহমু ফের মিথ্যে কথা বলবি.....”

চোখ টিপিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “আহা থামুন, থামুন, তাও আর লজ্জা কি ? বকুলোক আমি মশাই—। আদাব্ বিবি সাহেব, বেয়াদবী মাফ্ করবেন—আসুন মুন্সী সাহেব,—বেচারি বড় মুখ করে বড়লোকের বাড়ীতে খাটেতে এগেছেন, অনেক পাওনার অংশ রাখেন, কিছু ভাল রকম বখশীস্ দেন—” বলিয়া একটি আধ পরসি আবলুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া,—ইনেবের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন ।

প্রাণপণ অনিচ্ছায় হাত টানিয়া লইয়া আবলু-সাহেব বলিলেন “তুমিই দাও না—”

জোর-গলায় আহমদ-সাহেব বলিয়া উঠিলেন “ছোঃ ! ও কথা কি বলতে আছে ?—” সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটিয়া মাথা নাড়িয়া,—দৃঢ় মুষ্টিতে আবলুর হাত ধরিয়া, হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, ইনেবের সন্ধিকটে উপস্থিত করিলেন । বিপর আবলু সাহেব অগত্যা আধ পরসিটি ফেলিয়া দিয়া মুহু স্বরে বলিলেন “আমার দায় দোষ নাই । এ সব, আহমু পাজীর বদ্মাইসি, আমিনা তোমরা আমার ওপর রাগ-টাগ কোর না—” বলিয়াই তিনি হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেলেন । আর পিছন ফিরিয়া চাহিলেন না ।

আহমদ-সাহেব সসৌজন্যে ইনেবের উদ্দেশে বলিলেন “এই নেন, আপনার পাওনা মুন্সী সাহেব চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, এবার আপনার সজিনীর পাওনাটা, বুকে নেন, এই রইল—” হেঁট হইয়া তিনি ইনেবের পায়ে কাছে অন্য আধ পরসিটি ফেলিয়া দিলেন ।



আমিনা এতক্ষণ ঘোমটা টানিয়া, আড়ষ্ট কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার ঘাড় ফিরাইয়া ঘোমটার ভিতর হইতেই একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল ‘দাদা গিয়াছেন কি না’—তারপর মুখ তুলিয়া ক্রকুটী করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল “আর কিছু পারলে না? বাড়ীতে পা দিয়েই আনাদের সঙ্গে শয়তানী জুড়ে দিলে!—”

তাই চক্ষু কপালে তুলিয়া গভীর আক্ষেপের স্বরে আহমদ সাহেব বলিয়া উঠিলেন—“এর নাম শয়তানী জুড়ে দেওয়া হোল! বাঃ, হায় খোদা, ছুনীয়ায় কাকুর উপকার করতে নেই, সংসারের মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ বটে!”—

“হাঁ, সংসারের সবাই অকৃতজ্ঞ, শুধু তুমিই খুব স্নাতজ্ঞ সদাশয় মানুষ! থাম এখন—” বলিতে বলিতে বেচারী আমিনার চোখ দিয়া সত্য সত্যই রাগে জল বাহির হইয়া পড়িল!—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া হাতের উন্টা পিঠে করিয়া ঘোমটার কাপড়ে চোখের জল মুছিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল “যাও, ঢের হয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে আর রক্ত দেখতে হবে না, দয়া করে সর এখন—”

আহমদ সাহেব বলিলেন “এই যে সবুজ দয়া করে, কিন্তু শোন দেখি, একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে, শোন,—শোন,—” আহমদ সাহেব তাহার ঘোমটার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একটু নিম্নস্বরে বলিলেন “শোন দেখি, একটা বলি আবুলুর বিবি কি সত্যি তোমার—লাখরাজ,—না পীরোত্তর সম্পত্তি, যে এমন বেহিসেবী চালে, নিষ্পরোয়াভাবে তাঁকে দখল করে বসেছে! বেচারী আবুলু যে একবারও তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পায় না, এইটাই বা কি রকম কথা?”

আমিনা অবাক হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল! তারপর বিস্ময়ে এবং কতকটা রাগেও ঝটে, মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল “কী! আমি ইনেবকে দখল করে বসেছি! শোন ইনেব শোন, শোন একবার কথা শুনো!—তখন তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করতে না,—খালি বলতে তোমার পায়ে পড়ি আমিনা দিদি, হাতে ধরি আমিনা দিদি, মাথা খুঁড়ি আনিদা দিদি,—এবার দ্যাখো বিনা দোষে আনিদা দিদির মাথায় কত দোষ পড়ছে, এবার আমিনা দিদির মাথা কে বাঁচায় বল দেখি!—” অশ্রু উচ্ছল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল “এখন ইনেব আমারই লাখরাজ সম্পত্তি, পীরোত্তর সম্পত্তি হবে বৈ কি! কিন্তু তখন আমি ওকে ডেকেছিলুম, না ঐ—নিজে থেকে ছিনে ছোঁকের মত আমায় পেয়ে বসেছিল! জিজ্ঞাসা কর না ওকে, আমি পঞ্চাশ বার ওকে বলেছি যাও দাদার ঘরে,—তবুও কথা শোনে নি,—এখন আনাবি দোষ!—” কথা বলিতে বলিতে আমিনার চোখে জল আসিয়া পড়িল!

এবার আহমদ সাহেব ভিতরে-ভিতরে একটু বিপদগস্ত হইলেন,—আল্লাজের জবরদস্তী করিয়া যে মানুষটির ঘরে দোষের যোকা চাপাইয়া ফেলিয়াছেন, সে মানুষটি রাগের চোটে এখন কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন—নগ্নে, নগ্নে! কিন্তু মুখে ‘খাটো’ হইবার পাত্র ত তিনি নন, কাষেই নিজের ‘আল্লাজী-চালটা’ এখন সোজানুজি স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইল না! নিরীহভাবে ঘাড় চুলকাইয়া একবার ছদ্মস্বরে দিকে চাহিলেন, তার ইনেবকে লক্ষ্য করিয়া,—অতীব স্কোমলতার সহিত—খাঁটি পঞ্চম স্বরে বলিলেন “তা যাক্ যা হয়ে গিয়েছে, তা বয়ে যেতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ, ওলব বান্ধে কথা নিয়ে বকাবকি করা নিফল। এখন ছিনে ছোঁক মহাশয়া, আপনি মেহেরবাণী করে ক্ষান্ত হোন, যা হয়ে গেছে, যাক! এখন যা হওয়া উচিত, আপনি সেই চেষ্টায় মন দেন, বুঝলেন? মুন্সী সাহেবের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন। কেনন, রাজী তো? বলুন আমার অহুরোধ রাখবেন? বলুন—”

ইনেব অভ্যস্ত কলের পুতুলটির মত ঘাড় নাড়িল, না হইলে সে বেচারার নিস্তার ছিল না, তাহা সে ঠিক জানিত। এই একটি অমরোধ পালনে অস্বীকৃত হইলে, এখনই যে দশলক্ষ উপরোধের বোঝা তাহার ঘাড়ে স্তূপীকৃত হইবে, সে ভয়টা তাহার অত্যন্তই ছিল সেই জন্য, দায়ের পাট সারিয়া সে ত্রস্তে ঘাড় নাড়িল।

আহমদ-সাহেব পরম আশ্বস্ত চিত্তে, সসৌজন্তে অভিবাদন করিয়া বলিলেন “আচ্ছা, আদাব বহৎ আমি, আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম, জানবেন। আর আপনাকে জালাতন করার জন্তে যেটুকু অপরাধ হয়েছে, নিজগুণে মার্জনা করবেন।—”

প্রস্থানোত্তত হইয়া ছয়ারের কাছ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া আমিনার দিকে চাহিয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন “তুমিও কিছু মনে-টনে কোর না যেন, বুঝ্লে—”

আমিনা তখন গালে হাত মিয়া গুম্ হইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাঁহার এই অভিনব সুর পরিবর্তন শুনিয়া, বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া বলিল “কি ?—”

আহমদ-সাহেব ঢোক গিলিয়া বলিলেন “এই বল্ছি যে রাগ-টাগ কোর না—”

এতক্ষণে আবার আমিনার মনের মধ্যে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতা ঝড়ার দিয়া উঠিল! সজোরে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল “নাঃ, করবো না! আচ্ছা, তুমি যাওতো এখন—”

শরীকত দৃষ্টিতে চাহিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “অর্থাৎ—‘ভবিষ্যতে দেখা যাবে?’ না, না, ওসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দাও—ওগুলো ভয়ানক অগ্রাঙ্গ!—” যেন নিজে তিনি সমস্তই জায়নঙ্গত কাজ করিয়াছেন ও তাঁহার ব্যবহার-গুলিও আত্মোপাস্ত নির্জলা ভালমানুষীর পরিচয়ে পূর্ণ! কিন্তু আমিনার তখন রাগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, কাজেই সে আর কলহ করিতে পারিল না, অক্ষুট স্বরে শুধু বলিল “হঁ!—”

আহমদ-সাহেব একটু চিন্তিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

## স্মৃতির ভরা। \*

—:~:—

আজো সে মুখখানি পরাণে রাজে গো,  
বেদনা-বিদলিত হৃদয় মাঝে গো!  
জ্যোছনা-ধারা-সম প্রণয়-সুধারশি,  
অধরে অমুপম মধুর মৃদু হাসি,

করুণা-ছল-ছল নয়নে, আঁখিজল,  
 মাধুরী-ঢল-ঢল মোহন সাজে গো !  
 পড়ে গো পড়ে মনে চাহিয়া মুখে মম  
 কহিল—‘যাই তবে, যাই হে প্রিয়তম,—’  
 মুছাতে আঁখি খারা কাঁদিয়া হনু সারা,  
 আজো সে শেষ-বাণী মরমে বাজে গো !  
 হারিয়ে গেছে সব, ফুরিয়ে গেছে খেলা,  
 স্মৃতির ভরা লয়ে কাটিছে সারা বেলা,  
 দু’দিন এসেছিল, দুদিন হেসেছিল,  
 দু’দিনে লুকাল সে স্বপন মাঝে গো !  
 শুক্ হিয়া আজি, ছিন্ন বীণা তার,  
 তুষিত ভাঙা বুক হাহারব অনিবার,  
 মরণ আসি কবে বেদনা জুড়াইবে,  
 আছি সে পথ চাহি আঁধার সাঁঝে গো !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

## আমাদের হিন্দুর নারীপূজা ।

ঃঃঃ

আজন্মকাল শুনিয়া আসা যাশ্বিতেছে, আমাদের এই হিন্দুধর্ম বড় উদার ; এই সনাতন ধর্মে স্ত্রীজাতির প্রতি বড় সমাদর, বড় সম্মান ; নারী জাতিকে পূজা করিবার কথা আছে ; হিন্দুর কাছে নারী—দেবতা ।

যখন এই হিন্দুসমাজের রহিবিবাহ, অসংখ্য বিবাহের বিষয়, বাঙ্গালী হিন্দুর গোরবের কোণিত প্রথা মনে আসে, যখন ঘরে ঘরে হিন্দুবিধবাগণকে দেবী বানাইবার বন্দোবস্তের ব্যবস্থানিচয় দৃষ্টিগোচর হয় ; যখন আত্মীয়কুটুম্ব পরিচিত অপরিচিত স্বজাতির “হাঁড়ির খবর” জানিতে পারা যায়, দেশের লোকের সামাজিক ও সাংসারিক আচার-ব্যবহার প্রণিধানপূর্বক দর্শন করা যায়, তখন আদর-সম্মানের কথাটা মোটের উপর কথার-কথা ভিন্ন আর কিছু মনে ত হয় না । কোন্ ধর্মই বা কথায় ও কাজে, উপদেশ ও আচরণে বিশেষ রকম মিল বা সঙ্গতি দৃষ্ট হয় ? হিন্দুধর্মই যে একা ধরা পড়িয়াছেন এমন নহে । তবে কিনা আমাদের এই হিন্দুজাতির আপনার ঢকা আপনি বাজাইবার সখটা বড় অধিক ।

অনেকের মুখে—বিশেষতঃ প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞজনের নিকট শুনা গিয়া থাকে,—এখন সময় পড়িয়াছে মজ, কেহ কিছু মানে না, শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ পালন করে না, তাই এখনকার কালে নানা জীবচার ও ত্যাগার অন্যায়

ঘটে, কিন্তু আগেকার কালে—(কোন স্বর্ণ যুগে কে বলিবে?)—লোকে বড় ধার্মিক ছিল, নিষ্ঠাবান ছিল, শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল, তখন এমন সব হইত না। সত্য না কি?

আমাদের শাস্ত্র সব মুনি-ঋষিগণ প্রণীত; তাঁহারা ছিলেন অগাধ পণ্ডিত, অসীম জ্ঞানী, দেবজানিত ব্যক্তি, দেবতা-বিশেষ। স্থলে স্থলে দেবতার চেয়েও বড়; কেননা দেবা মায়, অনেক সময়ে দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলতেন। অনেক মুনি অনেক শাপে অনেক দেবতাকে অনেক প্রকারে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। এতেন মুনি-ঋষিগণ—তাঁহারা ত্রিকালদর্শী এবং সর্বজ্ঞ—তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রমধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, কিরূপ অভিশ্রম প্রকাশ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ দেখাইবার বাসনা আছে।

ধর্মশ্রাণ হিন্দুজাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ এবং তাহার বিধিনিষেধ, স্মৃতি ও পুরাণ মধ্যেই লিপিবদ্ধ। স্মৃতি ও পুরাণ সমূহেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা সেই সকল হইতেই অন্ন-ব্রহ্ম উদ্ধৃত করিব। অত্র হইতেও কিছু উনাইব।

ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের ভিতর ভগবান মহুই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ববাদী সম্মত। এই মহু-রচিত সংহিতাতে আছে—

“যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে রমণ্যে তত্র দেবতাঃ।” ৩ অঃ ৫৩ শ্লোঃ

যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, পূজা আছে, দেবতারা তথায় পসন্ন থাকেন।

তথু তাহাই নহে; অপিত— “যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বস্তত্রাফলঃ ক্রিয়াঃ।” ৩ অঃ ৫৩ শ্লোঃ।

যে পরিবারে স্ত্রীলোকে পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ধর্ম সমুদয় বৃথা হইয়া যায়!

মহৎউক্তি কে না স্বীকার করিবে? এই সঙ্গে আরও রহিয়াছে—

“শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্চাত্যন্ত তৎ কুলম্।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বদ্ধন্তে তদ্বি সর্বদা॥” ৩ অঃ ৫৭ শ্লোঃ।

যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাষ্ট দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোনও দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধ হয়।

এই সকল শ্লোক পাঠ করিলে, স্ত্রীলোকের সম্মান ভগবান মহুর নিকট বিলক্ষণ উচ্চশ্রেণীর ছিল মনেই ত হয়।

ইহার সহিত মহর্ষি আবার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—

“জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতপূজিতাঃ।

তানি কৃত্যাহতানি ব বিনশ্চাত্য সমস্ততঃ॥” ৩ অঃ ৫৮ শ্লোঃ।

\* “দ্বিরন্তা প্রিয়ঃ সাক্ষাৎ রূষ্টদেবতাঃ।

বর্জ্যন্তি কুলং তুষ্টাঃ নান্দন্ত্যাপমানিতাঃ॥” (বৃহৎ পরাশর।)

স্ত্রীগণ সম্বন্ধে থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; রূষ্ট হইলে রূষ্টদেবতা স্বরূপ; সম্বন্ধ হইলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি করেন, অপমানিত হইলে কুলনাশিনী হইবেন।

† “আয়ুর্জিতং যশঃ পূজাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্নানার্গং সদা।

নশ্চান্তে তদাপ্রীতৌ তাসাং শাপাদ সংশয়ঃ॥” (বৃহৎ পরাশর।)

স্ত্রী প্রীতি হইতে পুরুষের আয়ু ধন যশ পুত্র লাভ হইয়া থাকে; স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদিগের শাপ হইতে এই সমস্তই নশ-প্রাপ্ত হয়।



দিয়াছেন, সেট মনুষ্য, সেই ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ ভগবানই আবার স্বাক্ষরে—তরুণী গুরুপত্নীর প্রীতি যুবা শিষ্যের সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করিয়াছেন—

“স্বভাব এষ নারীনং নরানামিহ দূষণম্।

অহোহর্গাম প্রমাদ্যন্ত প্রমদানু বিপশ্চিতঃ ॥” ২ অঃ ২:৩ শ্লোঃ।

ইহলোকে পুরুষদিগকে দূষিত করাই জীলাকালের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতগণ জ্বালোক সম্বন্ধে কখনও প্রশংসা বা অসাবধান হন না।

এই সঙ্গেই আবার টুকিয়াছেন;—যুবা শিষ্যের পক্ষে যুৱতী গুরুপত্নীর পদধূলি হইবার উদ্দেশে পা ছুঁইতে পর্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন, \*—দোষটা পড়িতেছে এক জাজ্ঞাতির উপর; পুরুষ চিরকালই নির্দোষ ভাণে মাহুঘটি। তাহা হইলে ব্রহ্মচার্য্যত্রী শিষ্যবর্গের এত শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি, এত শিক্ষা, এত অভ্যাস, এত সংযম, এত আচার বিচার গহরী মাথা কুটাকুটি, সবই কি জল বদ্বদ্ব?

অরণ্য রাখিবেন, শিষ্য-গুরুপত্নী সম্মান ও জননী বললেও চলে—তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা হইতেছে। অনেকে বলিতে পারেন—ইহা সাবধানের পরামর্শ; রক্তের সম্পর্ক ত নাই, একটু বেশী সাবধান হইলে দোষ কি? কিন্তু শুধু ইহা শাকিলে ত বরং রক্ষা ছিল। রক্তের সম্বন্ধও বাদ পড়েন নাই। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা দেবকল্প ভগবান অসম্ভুচিত হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষায় সচরার করিয়াছেন,—

“মানা স্বয়া ভূত্বা বা ন বিবিক্রাসনো ভবেৎ।

বলবান্নিঞ্জিগ্রামো বিদ্বঃসমপি কথ্যত ॥”† (২ অঃ ২:১৭ শ্লোঃ)

মাতা ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতিরও সঙ্গিত নির্জন-গৃহে বাস করিতে নাই। ইহার কারণ—ইন্দ্రిয়গণ এতদূর বলবান যে তাহার জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

নিভাস্ত বাড়াবাড়ি নহে কি? কি আশ্চর্য্য রচি! কি অদ্ভুত শিষ্টাচার! স্পষ্টাদিত্য কি সীমা নাই? যুনি ঋষি হইলে কি সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারিবার প্রয়োজন হয় না? জিতেন্দ্রিয় মন্থিতুল, তাঁহারা সম্ভবতঃ অসুখ্যামো, তাঁহাদের মতে কাহারও সম্পর্ক জ্ঞানটুকুও নাই। :ছয়া ও পশুতে তাহা হইলে তফাৎ কি? সর্বত্রই বুদ্ধি—

“স্বতকুন্ত সমা নারী তপ্তাস্তার সমঃ পুমান্।”

আশ্বনের ভেজে যি গলে, না, এখানে বঃ একটু উল্টা গাওরাই হইয়াছে। মনুষ্য স্ত্রীর আদি যুগের বীভৎস আচার-ব্যবহারের জের আদিও কি মিটে নাই? মনে করা যাইত, এ প্রকার উক্তি চাণক্যম্প্রোক্ত বা

\* এই সংপরামর্শ সম্বন্ধে এমন মতব্যও কেহ প্রকাশ করিয়াছেন—“ঋষিদিগের নানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি এবং তাঁহাদিগকে শতবার নন্দন্য করিতেছি।” হীন উচ্ছাসভরে কহিয়াছেন—“সুনির্মল প্রভাত আকাশের ন্যায় সুনির্মল ভাবোদ্দীপক কি সুন্দর বিধি!” (কিতৌদ্রনাথ ঠাকুর)

যাহা হউক পুরাণোক্ত চন্দ্র ও তারার গণের মূল কোথায় বুঝা যাইতেছে। অহল্যা ইন্দ্র সম্বাদে ‘উত্তর’ বাওরাই হইয়াছে বোধ হয়।

† স্বষ্টিকর্তা প্রজাপতির নামে কুৎসিত উপাখ্যানের মূল বুদ্ধি এইখানে। ঋতি স্মৃতি বাহাতে ইহিত মাত্র করেন, পুরাণ উপপুরাণ যে বিষয়ে মহামহীকহ ঋড়িয়া থাকে।

হিতোপদেশেই শোভা পায়। মহা-মহা-ঋষি, তাঁহাদের মুখেও এমন কথা! জীজ্ঞাতির প্রতি—মাতৃজাতির প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বটে! ইহার নাকি নারীপূজার নিদর্শন! নারীকে দেবী করিয়া তোলা! জীজ্ঞাতির পূজা পাইবার যোগ্যতার পরিচয়?

স্মৃতির এই অনুশাসনের বশবর্তী হইয়াই নিশ্চয় প্রান্তঃস্বরসীয়া ‘পঞ্চকন্যা’র অন্যতমা শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা ঠাকুরাণীকে উপদেশ দিয়াছিলেন;—“প্রাত্যহ ও শাষ তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদের সহিত একত্র বাস করিও না।” (মহা। বন। ২৩৩ অঃ) এটিও ত আর এক মহর্ষি (বেদব্যাসের) রচনা।\*

মাতব্বর মুনিঋষিগণের আক্কেল বিবেচনা দেখিয়া অবাচ্ হইতে হয়। জীলোক ত দূরের কথা, কোন পুরুষ লজ্জায় ঘুগায় অধোবদন না হইয়া থাকিতে পারেন?

পর পর তিনটি মন্তব্য-শ্লোকের সার মন্তব্য দাঁড়াইয়াছে,—পুরুষকে দূষিত করাই জীলোকের স্বভাব; জীলোক পুরুষমাত্রকেই উন্মার্গগামী করিতে পারে, সম্পর্ক-বিচার নাই।

এতাদৃশ কথা যাহারা বলেন, এমন মত যাহারা পোষণ করেন, তাঁহারা ইহা আর লেখেন কি না—‘জীজ্ঞাতিকে পূজা করিও হয়!’ তাঁহারা ইহা আর নারীজাতির নাম দিয়াছেন ‘মহিলা!’ একি প্রহেলিকা?

শুধু ইহাই নহে, অবদান করুন; যে মহর্ষি প্রচার করিয়াছেন, ‘যেখানে নারীর পূজা হয় না, সে কুল উৎসব বার’,—সেই অসীমজ্ঞানী মহাপুরুষই স্পষ্টাক্ষরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে উত্থিত: করেন নাই,—

“নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতঃ।

স্বরূপং বা বিরূপং বা পুমানিতো বা ভুঞ্জতে ॥

পৌংশচল্যাক্ষলচিহ্নাচ নৈবৈহাচ্চ স্বভাবতঃ।

রক্ষিতা যত্নতোহপীত তর্জ্জ্বেতা বিকূর্ষতে ॥” (৯ অঃ ১৫ শ্লোঃ)

জীলোকেরা সৌন্দর্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই। স্বরূপই হউক আর কুরূপই হউক।.....ইহার পর বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্যে শোভা পায় না।

মহর্ষবর আরও উপদেশ দিতেছেন,—

“বিধাতা কর্তৃক জীজ্ঞাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ; ইহা বিশেষ অবগত হইয়া সতত তাহাদের রক্ষা বিধান, সবিশেষ যত্নগান হওয়া পুরুষের কর্তব্য।” (৯।:৬)

অর্থাৎ অষ্টপ্রহর কড়া পাঠাড়ায় রাখিবে। ইহারই নাম নারী-পূজা। ইহাই নারীজাতির প্রতি সম্মান না সমাদর?†

\* ‘পঞ্চম বেদ’ মহাত্ম্যের তেও রচিয়াছে,—

সহস্রে কিল নারীণাং প্রোপ্যতেকা কদাচন।

তথা শত সহস্রেণু যদি কাচিৎ পতিব্রতা ॥

† বিষ্ণুশর্ম্মা শাস্ত্রের বচন দেখাইয়া দিয়াছেন,—

“ন লজ্জা ন বিনীতত্বং ন দাক্ষিণ্যং ন তীক্ষ্ণতা।

প্রার্থনাভাব এবৈকং সতীত্বৈ কারণং স্ত্রীয়াঃ ॥” (১৬১ শ্লোঃ)

এই সকল কথাই আরও কিছু ফাঁপাটরা ফেনাইয়া মহাভারতে 'নারদ-পঞ্চচূড়া স্মৃতি' সন্নিবেশিত হইয়াছে। সে নিবন্ধ এমন অশ্লীল, জঘন্য, এমন লজ্জাজনক, এতদূর মানিপূর্ণ, সমগ্র স্ত্রীজাতির এমন মহাভানিকর, যে এখনকার কালে যে সকল কদর্যা কথা উদ্ধৃত করিয়া পত্র পৃষ্ঠা কলুষিত করা চলে না। কোতুহলী পাঠক অমুশাসন পর্কি অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় দেখিয়া লইবেন। তাহার মধ্যেই আছে,—

“তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বক্র এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে ভদ্রানকয়ে স্ত্রীজাতি কখনই উহাদের অপেক্ষা নুনা হইবে না।”

সন্দেহ হয়, এ সকল অংশও কি ভগবানের অবতার-বিশেষ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাসেন্দ্র প্রণীত। যে লেখনী হইতে 'সতী সার্বভৌম দমঃস্তুী বাহির হইয়াছে, এই স্ত্রীচারিত্র বর্ণনা তাহারই রচিত? স্বেচ্ছ-ভাষার Blasphemy একটা শব্দ আছে, তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি জানি না; ইহা কি তাহাই নহে? এ সকল কথা, এমন সব মত উল্লেখ বা উচ্চারণ করিলেও পাপ হয়।

যাহা হউক আর কিছু না হউক, অন্ততঃ শ্লীলতার অনুরোধে উত্তর প্রদানে অসমর্থ সমগ্র নারীজাতিকে দেবঋষ-মানবকুলের ভক্তভাজন ভগবান মনু যে মাটিফকেট দিয়াছেন, তাহার বাড়ী অপবাদ বা গালি কি আর হইতে পারে! প্রথম তিনিই পথ দেখাইয়াছেন বলিতে হয়। তিনিই যে সবার বড়, সবার আদি। তিনি যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা হইতে পুরাণ উপপুরাণ ইতিহাস জাহাজ-বাধা কাছি পাকাইয়াছেন।

এই মহর্ষি মনুই কিনা আবার বলেন,—

“প্রজানার্থং মহাভাগঃ পৃথার্হী গৃহদীপ্তয়ঃ।

স্বিয়ং শ্রিয়শ্চ গেষু ন বিশেষোহাস্ত কশ্চন ॥” ৯ অঃ ২৬ শ্লোঃ।

গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহা কলাগকর প্রজ্ঞোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যাই হইয়া থাকে; এই কারণ গৃহমধ্যে স্ত্রী ও স্ত্রী এতদ্ব্যয়ের কিছু মাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না।

ইহা কি বিদ্রূপ, না রহস্য, না স্তোত্রবাক্য? যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়া অকথ্য ভাষায় গালি পাড়িয়া 'আবার কলাগভাজন,' 'মাথার্হী' 'গৃহলক্ষ্মী'!—পদগুলি আর্থ-প্রয়োগ ন' কি?

তবে, এখানে ভাল কথা বলিবার একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে,—‘প্রজানার্থং’। স্বার্থের উপরোধে ‘লক্ষ্মী মেয়েটি’!

মহাভারতে দেখা যায়— “শ্রিয় এতাঃ স্ত্রিয়া নামঃ সংকার্যা ভূতিমিচ্ছতা।

পালিতা নিগৃহীতাস্চ স্ত্রীঃ স্ত্রী ভবতি ভারত ॥” (অনুঃ ৪৬।১৫)

যতী নহেন, ব্রহ্মচারী নহেন, স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিবার বিশেষ কারণ যাঁতাদের দোষিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাদেরও এত প্রকার সব মত! আশ্চর্যের অধিক। এমন না হইলে আর পূণ্য!

বিদূষণ্ডা সপ্তমে স্ত্রর চড়াইয়া মহাভারত হইতে তুলিয়াছেন,—

“নাগ্ন হৃপ্যাতি কাচ্চানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।

নাস্তকঃ সর্ষভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥” (অনুঃ ৩৮।২৫ শ্লোঃ)

স্ত্রীজাতিকে পুত্রও অধম করা হয় নাই কি? স্ত্রীলোক ও বালকে বৃথিতে পারে এমন ভাষায় এ সকল শ্লোকের অলুপাদ না করাই ভাল। অন্য মহাবিগণ!



যিনি শ্রোয়োলাভার্থী, তিনি জ্বালোকদিগকে সংকার করিবেন। উভারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

বাঃ ! এই মহাভারতের অনেক বচনই আমরা শুনাইতেছি। কি সুন্দর লক্ষ্মীঠাকুরাণী বানানো হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি ; কুম্ভঃ আরও দেখিতে পাইব।

মহাভারতে বহুবিবাহের বহুল প্রচলন, রাক্ষস-বিবাহের অস্বাভাবিক এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরিত্যক্ত পত্নীকে স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তির ভাণ্ড পাশা খেলায় বাজি রাখা,—পত্নীর প্রতি ব্যবহারের আত্মজ্ঞানমান দৃষ্টান্ত—অন্য-পন্থের গভীর অন্ধরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। সভামধ্যে সর্বজন-সমক্ষে কুলবধু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,—জ্ঞানীজ্ঞাতীর প্রতি কোন্ ব্যবহারের নিদর্শন !

অমন বে রামায়ণ, যাহাতে দ্বীর সোনার প্রতিমা গঠনের কথা রহিয়াছে, সেই রামায়ণ গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়,—মহর্ষি অগস্ত্যা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরিচয় দিতেছেন,—“আবহমান কাল হইতে জ্বালোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা অসম্পন্ন অমুরাগিনী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গ-পরিহারে বিদ্রোহের চাকলা, মেহহেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অস্ত্রায় আচরণে বায়ুও গুরুড়ের শীততা অবলম্বন করিয়া থাকে।” ( আরণ্য ১৩ । )

তাজ্জব ব্যাপার ! বিশ্বয়ের বিষয় এই যে এই মহাবির সংধর্ম্মিনী দেবী লোপামুদ্রা সাধ্বীরমণীকুলের আদর্শস্বরূপ। স্বল্পপুণ্যাস্তগত কাশীধামে দৃষ্ট হয়, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধান নিচয়ের সকল খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানিয়া চলিতেন। এহেন পত্নীর পতিরও জ্ঞানীজ্ঞাতী সম্বন্ধে এমন কঠোর ধারণা ! কল্পিতেই নিকৃতি নাই।

রামায়ণে আছে—সীতাকে বনবাস দিয়া রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া, তাহাই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতঃ সস্ত্রীক বজ্রাদি নির্বাহ করিয়াছিলেন। কি সুন্দর ! কিন্তু ইহাও আমরা ভুলিতে পারি না,—যে পত্নী, যে সীতা পিতৃআজ্ঞার রামের বন-গমন কালে দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন,—“নাথ তুমি যদি অজ্ঞাই বনে গমন কর আমি পদতলে পথের কুশ কণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব।” সেই পত্নীকে, সেই সীতাকে লক্ষা জয়ের পর রাম হেন স্বামী অগ্নানবদনে কহিয়াছিলেন—“তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃৎকণের বাহুবলে এই বৃক্ষশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জ্ঞাত নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনায় প্রথ্যাত বংশের নীচতা কালনের উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে .....তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডাধমানে, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাহি না.....” আরও কত রক্ত বাক্য মর্ম্মবিদারক তিরস্কার আছে, পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। সকল কথা ভুলিবার প্রয়োজন বা কি ? পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহারের নিদর্শন পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যথেষ্ট হইয়াছে। ( লক্ষা ১১৬ )

স্মৃতি-পুরাণের কথায় আসা যাক।

অপর একজন স্মৃতিকার অত্রিমূর্নি আজ্ঞা করিয়াছেন,—

“ওপস্তপতীর্থযাত্রা প্রত্যাখ্যা মন্ত্রসাধনম্।

দেবতারাদানাক্ষেব স্ত্রীশূত্র পতিনানি বট্ ॥” ( ১৩৫ শ্লোঃ )

জপ তপস্যা তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন ও দেবতা-অরাধন এই সকল কার্য্য জীলোক ও শূদ্র জাতির পাতিত্যজনক, অর্থাৎ করিতে নাই । \*

দেখা যাইতেছে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বেলায় জীজাতি শূদ্রের সমান ; তা' তিনি ব্রাহ্মণীই হউন, ক্ষত্রিয়ীই হউন, আর যাহাই হউন না কেন । জীজাতি সব একসাড়া । ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে জীপুরুষে বামুন-শূদ্র পার্থক্য ;— অগচ্ছ জী 'সহস্রিণী' । স্বামী'র সঙ্গে অনেক কাজে চল, স্বামী ছাড়া একা জী'র কিছুই চলে না । সম্মান-সোহাগের চূড়ান্ত ! নাম দিয়াছেন 'অন্ধাজিনী'—ইহাই যথেষ্ট, আবার কি ?

স্মৃতিশাস্ত্রে রহিয়াছে,—

“শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা ।” ( দায়ভাগ ১৩।১৩ )

ভগবান মনুর আদেশ,—

“শাস্ত্রোক্তা বিধি অমুসারে জীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না ; স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই, ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ ।” †

আদর পূজার ইহাও বুঝি অভিজ্ঞান । অপেক্ষা করুন, আরও আছে ; ভগবান মনু এই সঙ্গেই জানাইয়াছেন,—

“শয্যাসনমলঙ্কারং কানং ক্রোধমনার্জ্জবম্ ।

দ্রোণভাবং কুচর্ধ্যাশ্চ জীতো মনুরকল্পয়ৎ ॥” ( ৯ অঃ ১৭ শ্লোকঃ )

জীজাতি হইতে শয়নাসন-ভূষণ-শীলতা, ক্রোধাদি, পরহিংসা, কোটিল্য ও কুংসিতাচার—এ সমস্তই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ।

মহাভারতে মতটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—

“ন চ জীগং ক্রিয়া কাচিদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ।

নিরাস্ত্রিয়া হৃশাস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতামিতি শ্রুতিঃ ॥” ( অমু ৪৩।১১ )

জীগণের প্রতি কোনও কার্য্য বা ধর্ম্ম নিদিষ্ট নাই ; উহারা বীর্ষাবহান, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী ।

মহাভারতে স্থলাস্তরে রহিয়াছে,—

“স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষণাং লঘুচিত্তা হিতা স্মৃতাঃ ।

চলনশালা দুঃসেব্যা দুর্গ্রাহা ভারতস্তথা ॥

প্রাক্তস্য পুরুষস্যোহ বণা বাচঃ তথা স্ত্রিয়ঃ ।” ( অমু ১২ শ্লোকঃ )

জীগণ বহু দোষের আকর এবং তাহারা অত্যন্ত লঘুচিত্ত ; তাহারা চল প্রকৃত । অনেক সেবা করিলেও তাহাদের মন পাওয়া যায় না । পণ্ডিতগণের বাক্য বেরূপ দুর্জের, জীলোকের হৃদয়ও সেইরূপ ।

\* শাস্ত্রের বিধান এইরূপ, কিন্তু পুরাণ-ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, অনেক ব্রাহ্মণী, অনেক ক্ষত্রিয়া, এ সকল বিধান 'খোরাই' কেয়ার করিয়াছেন । তাঁহারা জপতপ, তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন বা দেবতারাদন, ইহার কোনটাই বাদ দেন নাই ।

† ক্রমে ইহা হইতেই বোধহয় দাঁড়াইয়াছে,—জীলোককে লেখাপড়া শিখাইতে নাই, জীলোক লেখাপড়া করিলে বিধবা হয় ; তবে আমরা নেপথ্যে বলিয়া রাখিতে পারি—শ্রীতত্ত্ব গৃহস্থত্ব প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে জীলোকের বেদমন্ত্র পাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হয় । প্রাচীন ও অপ্রাচীন স্মৃতিমধ্যে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিরোধ ।

অত কথায় কাজ কি ? কোমারব্রতী ভীমদেবের মুখ দিয়া জ্ঞানসমুদ্র মহর্ষি বাস এক কথায় সার ওষু প্রকাশ করাইয়াছেন,—

“ন হি জীভাঃ পরং পুত্র পাপীয়ঃ কিঞ্চিদন্তি বৈ ।” ( অম্ব ১৪০১৪ শ্লোঃ )  
ইহলোকে জীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই ।

সাধু !

এমন সব কথা যাহারা ধর্মগ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, জীভাতি সংক্ষেপে একরূপ যীশাদের মত, তাহাদেরই লেখনী হইতে আবার বাহির হইয়াছে কি না—‘ন রীজাতি পূজ্যঃ’ ইহারাই আবার বলেন কিনা—

“ন গৃহম্ গৃহমিত্যন্ত গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।”  
গৃহিণী না থাকিলে গৃহ গৃহট নহে । এমন কত কথাই আছে ! ‘গৃহশাভা’, ‘গৃহলক্ষ্মী’ ।

এই ব্যাসদেবই বলিয়াছেন,—

“যান্ন বিন্দতে জায়াং তাবদন্ধিং ভবেৎ পুমান্ ।” ( ২১১৪ শ্লোঃ )  
স্ত্রী যে পর্যাস্ত না ঘরে আসেন, সে পর্যাস্ত পুরুষ অন্ধিন্ হুয়া । বাঃ !

শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারগণের অন্যতম দক্ষ প্রজাপতি ( ? ) বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—“জীলোক সকল জলোকার তুল্য ; অলঙ্কার বস্ত্র ও অন্ন প্রভৃতির দ্বারা উত্তমরূপে প্রাণিপালিত হইলেও তাহারা সর্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে । ক্ষুদ্র জলোকা মন্ত্র্যের কেবল রক্তই শোষণ করে, আর কিছু না, কিন্তু জীর্ণ জলোকা পুন্স্বের রক্ত ধন মাংস বীৰ্য্য বল ও সুখ—সমস্তই শোষণ কর ।”

শ্লোকগুলা গুনানই ভাল—

“গোমিৎ সর্কী জালোকঃ ভৃগুশ্চাদনান্দৈঃ ।

সুভৃত্যাপি কৃত্য নিত্যং পুরুষং হপকর্যাত ॥

জলোকা রক্তমাংসে কেবলং সা তপস্বিনী ।

চৈতরং তু দনং বিত্তং মাংসং বীৰ্য্যং বলং সুখম্ ॥” ( ৪১৯—১০ শ্লোঃ )

রক্তশোষী জেঁাক ! পূজার আর বাকি কি ?

কুলটা সম্বন্ধে একরূপ উক্তি সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে কোথাও কোথাও দেখা যায় । কিন্তু অরণ্ন রাখিবেন, এখানে ভদ্র ঘরের স্ত্রী বধু কন্যা কুলকামিনীর কথা হইতেছে, কুলভাগিনীর নহে ।

মহর্ষি দক্ষ আরও কাহিয়া গিয়াছেন,—

“মল্লিকা বালভাবে তু যৌবনে বিযুখী ভবেৎ ।

ভূত স্নানাতে পশ্চাদ্ বৃদ্ধভাবে দ্ববং পতিম্ ॥” ( ৪১১১ শ্লোঃ )

যখন ( স্বামী স্ত্রীর ) পরস্পরের বয়স অল্প থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্কদা শঙ্কাসুক্ত থাকে ; যখন পরস্পরের বয়স কাল উপস্থিত হয়, তখন স্বামীর প্রতি অসুরাগিনী হয় না ; ৭র্থঃ স্বামীর ইচ্ছামত হলে না ; যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় ভুচ্ছ তাহিল্য করে ।

সত্যই কি তাই? হায় মহর্ষিগণ! তোনরা কি গৃহিণী লইয়া কোন বয়সেই সুখী কি নিশ্চিন্ত হও নাই? তাই কি এত তপস্বী আস এত কটুকাটব্য দ্বিতোপদেশ তাহা চঠলে ত ঠিক উপদেশ দিয়াছেন,—

“ন দানেন ন মানেন নার্ক্বেন ন সেবয়।

ন শাস্ত্রেন ন শাস্ত্রেন সর্কথা বিষনাস্ত্রিয়ঃ ॥” (৩৭০ শ্লোঃ)

দিলে ধুলেও নয়, মাগার করিয়া রাখিলেও নয়, সরল ব্যবহারেও নয়, সেবাশ্রদ্ধাও নয়, মারধর করিলেও নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিলেও নয়; কিছুতেই কিছু হয় না; নারীজাতি বড়ই বঁকা; জীজাতটা একেবারেই বাগ মানে না।

ইহাই বটে জীজাতিকে পূজা? এই নাকি নারীজাতির প্রতি সম্মান বা সমাদর? এই বুঝি হিন্দুধর্মের দেবীর পরিচয়?

স্বতঃসংহিতাকার ব্যাসদেব আজ্ঞা করিয়াছেন,—

“দাসীবাদিষ্ট কার্ষেণ চার্গা ভর্তু সনা ভবেৎ ॥” \*

ভার্গা দাসীর ন্যায় সতত স্বামীর আদেশের অনুবর্তন করিবে।

সে আদিষ্ট কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায়ই হউক, পত্নীকে পালন করিতেই হইবে; নহিলে প্রত্যাবার ঘটে, স্বীর পক্ষে সে আদেশ বিচার করিবার অধিকার নাই।†

মহাত্ম্যরতে রহিয়াছে,—

“পাত দরিত্র ব্যাধিত বিপন্ন রিপূর বশবর্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণ বিরোগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা চঠলে স্বীর অবিচারিত চিন্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্তব্য।”

(অনুশাসন। উমা মহেশ্বর।]

নারীপূজার ইচ্ছাও ত একটা মন্ত অভিজ্ঞান!

জগৎগুরু শ্রীমন্ শঙ্করাচার্য্য প্রবোক্তরে চূড়ান্ত মীনাংসা করিয়া চন্দ্রাবন্ধে জীজাতির পরিচয় দিয়াছেন,—

‘সুগ্রাবৎ সম্মোহনকারিণী’ ‘পিশাচী’; তাহাতেও বুঝি আশ মিটে নাই; “ক্রমে—‘দ্বারং কিমন্তন্নরকসা? —নারী।’ নরকের দ্বার নারী। সাবাস্ যতী ব্রহ্মচারী! চিরকুমার ভূম, তবু কখনও ঘা খাও নাই! বিনা অপরাধে মর্দ্যাবাত।

হিন্দুশাস্ত্রের অপার কক্কা! এই নারীজাতিকে আবার বলা হয়—‘আধ্যাত্মিকের অংশ।’ জীজাতি—জীলোক মাত্রই দেবতা। মার্কণ্ডের চণ্ডীতে আছে,—

“বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ॥” (১১৫ শ্লোঃ)

•মহাত্ম্যরতে দেখিতে পাইবেন,—

“দেববৎ সত্ত্বং লাক্ষী ভর্তারমহুপশ্যতি। ওশ্রবাং পরিচর্য্যাক দেবতুলাং প্রকৃষতি ॥”

† স্বামীর যথেষ্ট আদেশ ও পত্নীর তাহাই মাগার করিয়া লওয়ার কথা উঠিলে অনেকের ‘বিষমঙ্গল ঠাকুরের’ বলিক-সম্বাদ মনে আসবে। কিন্তু সেটা বোধ করি অতিথি-গণ্যকারের আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়াই গণ্য করিতে হয়।

হে দেবি দুর্গে ! ভগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, যত প্রকার জীলোক আছে, সকলই তোমার অংশ ।

মা দুর্গার অংশের প্রতি কি সম্মানই দেখানো হইয়াছে, হইয়া আসিতেছে !

বড় হুংখাই কবি গাহিয়াছেন,—

“রে বর্ষর নর ! গতি কি হত তোমার

বিহনে অঙ্গনা অবতার !

কে গাঁথিত প্রেম হুত্রে সমাভের হার—

পিতামাতা কুমারী কুমার !

দয়া ধর্ম শিখাইয়া কোমল করিয়া হিয়া

কে করিত সভ্যতা স্থাপনা—

কে পুরাত স্বর্গচ্যুত আশ্রয় কামনা ?”

কিছা থাক—আমরা করিব উক্তি, কবিদের মতামত শুনাইতে বাস নাই ; শাস্ত্রবাক্যের কণা চইতেছে ।

মনে হয় সনাতন ধর্মের পাণ্ডাগণ চট্টা আশুগ হইবেন । তাঁহারা চক্ষু রাখাইয়া বলিবেন ‘অন্তান্ত ধর্ম বাতাই থাকুক আমাদের হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে মাতা ভগিনী ভাষা এবং অপর জীলোক সম্বন্ধে ভাল কথা কি নাই ?’ আছে ; গোড়াতেইত আমরা অনেক কথা শুনাইয়াছি । অধিকন্তু মহুসংহিতায় এনন বাকাও রহিয়াছে—“মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া ।” (২।১৪৫ শ্লোঃ) । “ভাৰ্য্যা আপনার দেহ, অতএব তাহাদের প্রতি অত্যাচারণ কোনরূপেই বিধেয় নহে ।”—“পরপত্নীকে ভাৰ্গবী বলিয়া সম্বোধন করিবে । (১২।১২২ শ্লোঃ) । স্মৃতি রচয়িতা ঋষি আপত্তি ও বিষ্ণু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—“পর পত্নীগণকে মাতৃবৎ ভগিনী বা কন্যাবৎ দেখিবে ।” (৩২৩ শ্লোঃ) অতি উত্তম । এসকল পুরুষের প্রতি উপদেশ ; কিন্তু দেবকর ঋষিগণ জননী ভগিনী পত্নীদিগকে, ক্রিয়াক্রমে কি পরিচরে, ভগত সমক্ষে খাড়া করিয়াছেন ?

প্রাচীন প্রায় সকল ধর্মই স্ত্রী জাতিকে গালি গালাজ প্রচুর পরিমাণে এবং বর্ষরোচিত রূঢ় ভাষায় পর্যন্ত আছে ;—অবশ্য সর্বত্রই, লেখনী অন্ত,—পুরুষ সিংহের থাবায় । কিন্তু অপর ধর্মের কথা আমরা স্নেহ ধর্ম, স্নেহ আচার বলিয়াই উড়াইয়া দিয়া থাকি । ভগতের সারধর্ম বলিয়া আমরা যাছা জানিও মানি, তাহা সভ্যতার জন্মভূমি আৰ্য্যামীর রক্তভূমি এই ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্ম শাস্ত্র মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি আছে তাহারই অল্প স্বল্প নমুনা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য । সকল কথা উদ্ধৃত করিবার বিদ্যাও আমাদের নাই এবং তাহা করিতে গেলে সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া পড়ে । তুলনার কথা আসিতেছে না, তবে হইয়া বোধহয় অব্যাহত বলা যাইতে পারে যে হিন্দুশাস্ত্রে যে রূপ উল্লঙ্ঘ্য ভাষায় ‘বে-আব্ব ভাবে’ কুৎসিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, (যথা—মহাভারতে ‘নারদ পঞ্চচূড়া সম্বাদ’—অমুশাসন পর্ব ৩৮অ, কিন্না ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে—ত্ৰীকক্ষ জন্ম খণ্ড, ৮৪ অধ্যায়) সেরূপ আর কোথাও নাই । ধর্ম গ্রন্থের কথা বলিতেছি, উপন্যাস ইপাখ্যানের নহে । এসব কথা এখন থাক ।\*

ভগবান মহু আজ্ঞা করিয়াছেন,—

\* হয়ত কেহ কেহ বাইবেলের Old Testament উল্লেখ করিবেন কিন্তু সেখানে এরূপ ভাবে নাই বরং “আরব্য- উপন্যাস” কতকটা পাল্লা দিতে পারে । (Burton's Arabian Nights. Supplemantary Volume: শেষ ।)

“ঈলোক বালিকাই চউক, বৃণ্ডীট হইক বা বৃদ্ধাই চউক, গৃহে থাকিয়াও ঈলোকের কিঞ্চিৎ মাত্র কার্যা ও স্বতন্ত্র ভাবে করা উচিত নহে। ঈলোক বালাবস্থার পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে; কিন্তু কখনও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না”

মহর্ষি অগ্নি আদেশ দিয়াছেন—

“ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।” স্ত্রী জাতি কখনও স্বাধীন অবস্থার অবস্থানের যোগ্য নহে।

ঋষির স্পষ্ট খুলিয়াই বলিয়াছেন—

“ঈলোক পিতা ভর্তা ও পুত্র—ইহাদের সহিত পৃথক হইলে পিতৃকুল ও পত্নিকুল—উভয় কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকে।” (৫.১৭৯)

অতএব মহর্ষির উপদেশ—“ঈলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদিগের অধীনে রাখিবে। নিয়মিত বিশ্রাম সময়েও ঈলোকদিগকে তাহাদিগের রক্ষাকর্তার নিদেশমত কার্যা করিতে হইবে।”

ঋগ্বেদে বাক্যবাক্য বলেন—“পিতামাতা বালাকালে, স্বামী যৌবনে, ও পুত্রের বৃদ্ধাবস্থায় ঈলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; ঠিকাদের অভাব হইলে আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগকে রক্ষা করিবে। কোন সময়েই ঈলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না।” (১৮৫)

নারদ বাবস্থা দিয়াছেন,—“যদি স্বামীর বংশ নির্মূল হয়, অথবা জাতির উত্থাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্মূল হইলে রাজা ঈলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ ঈলোক ধর্ম বিরুদ্ধপথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।”

পৈতিনসির অনুজ্ঞা,—“ঈলোকদিগকে সর্বদা সাবধানে রাখিবে।”

গৌতমের বিধান,—“স্ত্রী ধর্মকার্য্যে ও স্বতন্ত্রা অথবা স্বাধীন হইবে না। কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ উহার অমতে কাজ করিবেনা।” (১৮১)

বৃহস্পতির উপদেশ—“স্বশ্রু অথবা অন্য কোন প্রাচীনা ঈলোকে তরুণ বয়স্ক ঈলোকদিগকে সর্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।”

শ্রুতিকার বিষ্ণুর আজ্ঞা,—“ভর্তা প্রবাসে থাকিলে, বেশবিত্তাস না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কশ্মেই অন্ততন্ত্রতা ঈলোকের ধর্ম।” (২৫অ)

বাক্যবাক্য এক্রপস্থলে ক্রোড়া, সভাদর্শন, উৎসব দর্শন, এমন কি হস্ত পরিহাস ও নিষেধ করিয়াছেন।” (১৮৪)

দেখা বাইতেছে, সকলেরই সন্মত প্রচুর। মহিলাকুল অবলা বলিয়াই কি এই অতি সাবধানের বন্ধোবস্ত? শুধু তাহাই নহে; সকল ঋষি যুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—ঈলোককে কোনমতে স্বাধীন থাকিতে দিবে না, জাতিটা অবিদ্বাসিনী।

ব্রহ্মাও পুরাণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—“ঈলোক অতি চেষ্টা পদার্থ, উহার সঙ্গ সর্বদা পরিহার করিবে। হৃদয়ে ক্ষুব্ধতার, যুখে মধুরতাযিণী, জীজাতির অন্ত পুরাণাদিতেও পড়িয়া পাওয়া যায় না। অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।”

হিতোপদেশে তাহা হইলে হিত উপদেশই দিয়াছেন,—

“বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু ( রাজকুলে ৫ )।”

তাইত আমরা কথার কথার প্রবচন আওড়াই—“ঈবুদ্ধি প্রলয়করী।”

দ্রীলোকের রক্ষার জন্য ঋষিরা এত বাগ্ন, বুঝা বাইতেছে যথেষ্ট কারণ ছিল; ছিল বলি কেন? আছে ও চিরকাল থাকিবে বলাই ঠিক।

যাঃ হইক, জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিবৃন্দ একমত,—দ্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, দ্রীলোক যাঃজীবন পুরুষের বশে থাকিবে; —ইহা শাস্ত্রের আদেশ; মানরা লঙ্কতেই হইবে। বশে থাকিতে হইলেও আদর পূজার অসম্ভাব না ঘটিলে পারে; বশে থাকিতে হইবেই যে দাসীবাঁদীর ন্যায় থাকিতে হইবে’ এমন কোনও লেখা পড়া নাই। কিরূপ থাকিতে হয় তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

দ্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি ও আরাধ্য দেবতা।

মহু বলিয়াছেন,— “নাস্তি দ্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্রাশেষিতম্।

পতিং শুক্রযতে যেন তেন স্বর্গে মদীয়তে ॥” (৫।১৫৫)

দ্রীলোকদিগের স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ও বিনা ব্রত এবং উপবাস মাই। কেবল পতি সেবা দ্বারাষ্ট্রী স্বর্গে প্রাপ্তি লাভ করে।

স্বতিকার বিষ্ণুর ও এইমত। (২৫।১৫)

পুরাণ উপদেশ দিয়াছেন,—

“ইদম্বেব ব্রতং দ্রীণাময়মেব পরোব্রতঃ।

উরমেকা দেব পূজা ভক্ত্যুৎসাহাং ন লজ্যয়েৎ ॥”

দ্রীলোকদিগের ইচ্ছাই একমাত্র যজ্ঞ, এই একমাত্র ব্রতানুষ্ঠান, এই একমাত্র দেবভার্ত্তন যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন কারবে না।

পতিবাক্য পালনই পত্নীর একমাত্র পরম ধর্ম।

বৃহৎ পরাশরে (স্বাত শাস্ত্রে) রহিয়াছে,—

“ভাবন্ বাপি মৃত্যো বাপি পতির্যেব প্রভুঃ দ্রীণাং।

নাশুচ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমচ্যেৎ ॥

জীবনে মরণে পতিই দ্রীর প্রভু। পাত ভিন্ন পত্নীর অন্য দেবতা নাই; অতএব দ্রী পতিকেই প্রভুত্বাবে দেবতা জ্ঞানে পূজা কারবে।

কল পুরাণে আছে,—

“তীর্থ স্নানাগ্নিনী নারী পতিঃ পাদোদকং পিবেৎ।

শকরাণাপ বিষ্ণুস্তা পতিরেকোহাধকো মত ॥” (কাশীখণ্ড ৪)

পত্নীর গঙ্গাস্নান ইচ্ছা হইলে পতির পাদোদক পান করিলেই সেই ফল হইবে। মহাদেব বা নারায়ণ হইতেও পতি পত্নীর কাছে বড়।

স্বতিকার অজিরও এই মত (১৩৭ শ্লোকঃ)

হিন্দুর ঘরের মা লক্ষীদের বালবার ভো নাহি যে ‘পতির মত পতি হইলে আমরা এ মতটা মানিতে পারি।’ মুনি ঋষি, এ সে দিকটাও পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

সুন্দ পুরাণের অনুজ্ঞা,—

“ক্লীবং বা দুর্বলং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা ।

সু স্থিতং চ স্থিতং বাপি পতিমেকং ন লভয়েৎ ॥”

পতি ক্লীব বা দুর্দশাপন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হউক, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থাপন্ন হউক, স্ত্রীর কখনও তাহার অবাধা হওয়া চলিবে না ।

অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই, দৃষ্টান্ত মজুত আছে । স্মৃতির এই আইন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে আমাদের শাস্ত্র গ্রহে নানা গল্প রচিয়াছে ; একটি এই,—

এক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ অথর্ষ কুষ্ঠ রোগী, একদা জনৈক সুন্দরী বৈশ্যাকে দেখিয়া খাপ্পা হইয়া উঠেন । বৃদ্ধের সনির্বন্ধ অমুরোধে তাহার পত্নী—হিন্দু ঘরের পতিপরায়ণ রমণী তাহাকে কাঁধে করিয়া সেই বারবান্ধার ভবনে লইয়া যান । রূপ বাবসারী সেই দরিদ্র অথর্ষকে দেখিয়া সম্মার্জনী লইয়া তাড়া কারিতে উদাত । পতিপ্রাণা পত্নী সেই নীচ বৈশ্যার হাতে পায়ে ধরিয়া—গৃহস্থ বধু বাণাজনার দাসী ব্রাহ্ম স্বীকার করিয়া—সেই ভীমরতিগ্রস্ত স্বামীর অভীষ্ট পূরণে তাহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন । ( মাকণ্ডেয় পুরাণ ” )

সুন্দর গল্প ; কিন্তু হঁহা পাতিত্রতোর নিদর্শন না পত্নীত্বের অবমাননার কঙ্কলোচ্ছল দৃষ্টান্ত ? আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ কাবি যথার্থই বলিয়াছেন,—“ভগবতের মধ্যে অদম্যতম কাপুরুষতার এই গল্প ।” ( রবীন্দ্রনাথ )

জ্বালোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুক্রমা করাই প্রধান কন্তব্য । স্বামী কানা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ণগা হউন, ছুটে হউন, তথাপি স্ত্রীর তিনি গুরু, পূজ্য ও হৃষ্টদেবতা । স্বামীর চরণ সেবা করিলেই জ্বালোকের পরকালে পরম গতি লাভ হয় ।

স্মৃতিকার বাসদেব তাহার সংহিতায় আদেশ করিয়াছেন,—“পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধবী স্ত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে না ।” ( ২।৪৮ শ্লোঃ )

ভগবান্ মহু আজ্ঞা করিয়াছেন,—

“বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈকো পরিবর্জিতঃ ।

উপচায়াঃ স্ত্রিয়া সাধবা সততং দেববৎ পাতঃ ॥” ( ৫।১৫৪ শ্লোঃ )

শীল রহিত অর্থাৎ কদাচারী, কামুক অর্থাৎ লম্পট, গুণহীন অর্থাৎ বিদ্যাবুদ্ধি সৌন্দর্যাদি বিহীন হইলেও পতিকের উপেক্ষা না করিয়া সাধবী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় তাহার সেবা কারবে ।

স্বামী কদাচারী হয় হউক, পরদারগামী হয় হউক, কোন গুণের সহিত তাহার সম্পর্ক না থাকে না থাকুক, তবু তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, দেবতার ন্যায় ভাক্ত কারবে । সকল পাপে পাপী হইলেও, সকল দোষে দোষী হইলেও স্বামী, স্ত্রীর নিকট হইতে দেবতার মত পূজা পাইবার অধিকারী ।

আর স্ত্রীর বেলা ?—ভগবান্ মহুই জানাইয়াছেন,—“পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিম্ননীয়া হয়, পরকালে শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানা প্রকার পাপ রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মার পীড়া ভোগ করে ।” ( ৫।১৬৪ শ্লোঃ )

স্বর্গবি বিধান দিয়াছেন—

“বদ্ধাষ্টমেহধিবেদ্যাশ্চ দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সর্বাশ্চশ্রিয়বাদিনী ॥” ( ৯।৮১ শ্লোঃ )



স্ত্রী বক্ষা হইলে অষ্টম বৎসরে, মৃত পুত্রা হইলে দশম বৎসরে, কন্যা মাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসরে, কিন্তু অপ্রিয় বাদিনী হইলে সদা সদা পরিত্যজ্য। বৃহৎ পরাশরেও এই বিধান পাওয়া যায়।

বক্ষা, মৃতপ্রাণী কিম্বা কন্যামাত্র প্রসবিনী হওয়া কিছু স্ত্রী বেচারীর হাত নহে, তথাপি সে পরিত্যজ্য;—  
এমনি যন্ত্র বিচার!

স্বতিশাস্ত্রে আছে,—“স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করে, বা মুক্তহস্তে ব্যয় করে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।”

প্রার্থকাটার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পুরুষের বেলায় সাত খুন মাপ,—তিনি কুৎসিতাচারী বেশ্যাসক্ত গুণসম্পর্ক-হীন হইলেও স্ত্রীর পক্ষে দেবতা, আর স্ত্রী, মাত্র মিষ্টভাষিণী না হইলে তাহাকে সদা সদা ‘তালাক্’ দেওয়া চলে।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, কুঁহলে ঘরকন্নার অপটু, উড়ন্তু স্ত্রীকে Divorce করা চলে। গৃহিণী ঠাকুরাণীদের এটা খেয়াল রাখা ভাল।

স্বামী লম্পট পরদাররত হইলেও স্ত্রীর নিকট দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়াছেন,—

“নিবাসায়া: ব্যভিচারিণা: প্রতিকূলা শুথৈব চ।”

কিম্বা স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে নিবাসিত করিতে হয়।

স্বতিকার বিষ্ণুর আদেশ,—

“যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।” (৫ অঙ্কঃ)

স্বতিকার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রর আজ্ঞা,—

“যে স্ত্রী আপন জ্ঞাতদর্পে কিম্বা সৌন্দর্য্যাদিদর্পে নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহুলোকসমাজে লইয়া কুকুব দিয়া খাওয়াইবে।” \* (৮। ৩৭১ শ্লোঃ)

\* এই স্থানে কিঞ্চৎ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে না হইতে পারে। এক সময়ে প্রব্রু উদ্ভিরাছিল—অসতী স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না? স্মৃদ্ধর্শী সমালোচক বহুমন্ত্রে তাহার বড় পুঙ্খ উত্তর দিয়াছিলেন: “স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়; তাহা হইলে অসতীত্ব পার্শ্ব বড় শাসিত থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা বিধান হইলে ভাল হয় না? যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পক্ষী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও, সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মহাপাতকী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলই বিষয় পাইবে, কেন না সে পুরুষ। কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রীলোক। ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ হৈ চৈ করি বহি বেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?” (সাম্য)

ব্যভিচার ত গুরুতর ব্যাপার, জ্ঞান পক্ষে সামান্য ক্রটিতেও বিষম মুশ্বিল। স্বন্দপুরাণে আছে,—“স্বামীর কথায় স্ত্রী কড়া জবাব করিলে তাহাকে শিয়াল কুকুর হইয়া জন্ম লইতে হয়—

“সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জনে বনে ।”

পতি তাড়না করিলে, পত্নীকে মুখটি বুদ্ধিমা সস্থ করিতে হয়, নতবা পঞ্চমো বাঘ বিড়াল হইতে হয়—

“তাড়িতা তাদিতুক্লেস্তং সা ব্যাস্ত্রী বৃষদংশকা ।”

পতিকে না দিয়া পত্নী নিজের মিষ্টান্নাদি মুখে তুলিলে বাড়ড শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়—

“তামে সা শূকরী ভূয়াৎ বহুস্তাপি স্বাবদ্ভুজা ।”

পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করিল স্বাক্ষে টাংগা চাখো হইতে হয়—

“নটাক্ষয়াত যান্যং বৈ কেকরাক্ষী তু সা ভবেৎ ।”

পুরুষান্তরের দিকে ভাল করিয়া চাটিয়া দোখলে কাণা কুমুদী কুংসিত হইয়া জন্ম লইতে হয়—

“কানা চ বিমুখী চাপি কুরুপা যাপি জায়তে ।”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রহিয়াছে—

“বাকহর্ষনাস্তবেৎ কাকী হিংসনাচ্ছুকরী ভবেৎ ।

সপৌ ভবতি কোপনে দণ্ডে চ গর্দভী ভবেৎ ।

কুকুরী চ কুবাকোনপক্ষা চ বিদর্শনাং ॥ ( ত্রিকুণ জন্ম ! ৭৫।৪৪—৪৫ শ্লোঃ )

এই প্রকার ছোট বড় নানা অপরাধে ( ? ) আরও নানা পশুজন্ম লাভ প্রভৃতি রাবস্থা আছে। সকল কথা তুলিবার আমাদের স্থান নাই। বুঝা যায় ছোট ছোট ছেলেদের যেমন জুজুর ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখিতে হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতিতে সেইরূপ সুল্লর সহজ উপায়ে বেশ রাখিতে চাহেন। পান হইতে চুণটুকু না খসে ; ভা হইলেই বিপদ ! সাবধানের মার নাই ; কেন না, পুরুষের নিকট প্রবাদ বাক্য হইয়া রহিয়াছে,—

“স্ত্রিযাঃ চরিত্রাঃ দেবা ন জানান্তি কতো মনুষ্যাঃ ।”

যত দোষ একা স্ত্রীজাতির ! গো-বেচারা পুরুষ ! ভাগ্যে : শাস্ত্রকার নাই !

স্ত্রীজাতিতে পূজার কথা হইতেছে, কথাটা সপ্রমাণ হয় নাই কি ?

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে আছে,—

“ন চন্দ্রস্বর্ঘ্যো ন তরুং পুমান্ বা নিরীক্ষাতে ।

ভর্তু বর্জং বরারোহা সা ভবেৎ ধর্মচারিণী ॥”

( মহাভারত । উষামহেশ্বর সম্বাদ )

যে নারী, অপর পুরুষের মুখ দেখা ত ঘরের কথা, পতির মুখ ব্যতীত পুংলিঙ্গ শব্দ বাচক চন্দ্র স্বর্ঘ্য কিম্বা বৃক্ষকেও নিরীক্ষণ না করেন, সেই নারীই ষথার্থ ধর্মচারিণী ।

\* আমাদের দেশের পুরুষ—পতিকেই নারীর একমাত্র প্রেয় ধোয় প্রেয় বলে নির্দেশ করেছে। সেই আদর্শ ভাদের সম্মুখে খাড়া করে ধরে রেখেছে। নিজের স্বার্থান্ধিত্ব জন্য সমাজে যত কঠোর বিধান—এই অভাগিনী নারী জাতির জন্য। পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হউক, অশ্লীল বৎসর বয়সে দশবার বালিকা বিবাহ করুক ; স্ত্রীকে পদাঘাত করুক, সমাজ সব সহ্যে, কেবল নারী জাতির পান থেকে চুণট খসলেই সর্বনাশ !—দ্বিজেন্দ্র রায় ।

বলিতে ইচ্ছা হয়,—আমুন মা লক্ষ্মীবা, কে কে যথার্থ ধর্মচারিণী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, দেখা যাক।  
হা ধর্ম! তুমি কোথায় চরিয়া বেড়াও কে জানে?

শাস্ত্রকারগণ নিদেশ করিয়াছেন,—

“অনুকূল্য ন বাগদুষ্ঠা দক্ষা সাধবী প্রিয়ম্বদা।\*

আত্মগুপ্তা স্বামীভক্তা দেবতা সান মাহুযী ॥” (দক্ষ ১৪৪ শ্লোঃ)

যে স্ত্রী পতির সদা অনুকূল আচরণ করে, ও মধুর ভাষিণী এবং স্বধর্মরক্ষায় সদা বাপ্তা ও পাত্তর প্রতি অকপট তত্ত্বিমতী, সে স্ত্রী মাহুযী নয়, সে দেবতা। (পাত কু। কথ্য শ্রু যাগ্‌ই হউন না কেন—এ টুকু স্মরণীয়।)

দেবতা বনিয়া যাঁহবার সহজ উপায়!—সহজ?

নামে ত দেবতা আছেনই, কাছে দেবতা হঠতে হইলে, তাঁহাদেহ দৈনন্দিন কার্যকলাপ কর্তব্যানুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্রে কি আছে, আমাদের একবার দেখিয়া লইলে মন্দ হয় না।

অগ্নিপুরাণে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে—

“সা শুদ্ধা প্রাতরুখ্যায় নমস্তুতা পতিম্ স্মরম্।

প্রাক্তনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জ্বলেন বা ॥

গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।

সুং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতান্ ॥

গৃহকৃত্যং স্নানবৃত্তা ভোজ্যত্বা পতিং সতী।

অতিথিং পূজয়ত্বা চ স্বয়ং ভুক্ত্যে স্তব্ধং সতী ॥”

স্ত্রী প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া, পতি-দেবতাকে নমস্কার করিয়া, গৃহতল ও প্রাক্তনদেশ গোমর বা জলদ্বারা অমুলিপ্ত করতঃ ও অন্যান্য গৃহকর্ম সম্পন্ন করিয়া স্নান করিতে যাইবেন। স্নান করিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে পতিচরণে প্রণিপাত করিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য গৃহ দেবতার পূজা সমাপন পূর্বক অবশিষ্ট গৃহকার্য্য নির্বাহ করিয়া পতিকে ভোজন করাইতে হইবে। পতির আহ্বারান্তে উপস্থিত অতিথিকে ভোজন করাইয়া সর্ব শেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্বারা তাঁহাকে কণ্ঠ্যং উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে।

এমনই কার্য্য দেবতা হঠতে হয়! হায়! স্বর্ণ যুগ গেল কোথায়? এখানে সব কথা নাই। পুরাণের এই দেবতা বনিবার প্রণালীটুকু স্থতি শাস্ত্রে (ব্যাস সংহিতায়) আরও বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; দেবীগণের উপকার উদ্দেশ্যে আমরা তাহার মর্ম্মার্থ শুনাইয়া রাখি;—

\*অগ্নিযবাদিনী বা দুর্ম্মখীকে ঋষি ঠাকুরেরা বোধ হয় বড়ই ডরাইতেন; অন্য সদা ‘তালুক’ দিবার ব্যবস্থা জনান গিয়াছে; পরম্ব মহাভারতে রহিয়াছে—মিষ্টভাষিণীর সুনাম,—

“সমায় প্রবিবক্তেবু ভবন্ত্যাবাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।

পিতরো ধর্ম্মকাগোমু ভবন্ত্যর্জুসা মাতরঃ ॥

কান্ত্যর্থেপি বিপ্রানো জনস্যাম্বনিকস্য ঐষ।

যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্য স্তম্বাদ্ভায়া পরাগতিঃ ॥”

“জীলোক প্রত্যাষে পতির শয্যাভ্যাগের পূর্বে শয্যাভ্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে। তৎপরে গোময় গোলমুত্র ও জল সংমিশ্রণ করিয়া গৃহের চতুর্দিকে ‘গোবরছড়া’ দিবে। তৎপরে পাকোপযোগী ধোতস্থালী প্রভৃতি পাত্র সকল পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া জল ও তুলাদি পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। পাকশালার সমস্ত পাত্র প্রতিদিন বাহির করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত করিবে। মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা চুল্লী সংস্কৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। শিল নোড়া প্রভৃতি যুগ্ম বস্তুগুলি পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবে না, যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবে। এইরূপে পূর্বাহ্নকৃত্য সকল সমাধা করিয়া স্বস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি গুরু-জমকে প্রণাম করিবে এবং কাশমনবাফা দ্বারা স্বীয় বিগুদ্র চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সদা পতির আজ্ঞাহুবর্তিনী হইবে।

নির্মল ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায়, নিরত তৎপরা হইবে। তৎপরে অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোকুবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট যে কিছু অন্ন থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষ ভাগে আয়বায় চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবে। এইরূপ প্রত্যাহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে, আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহ নীতি বিধান করিবে এবং সাধুশয়ন আন্তরীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে তাঁহারই নিকট তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।” ২২। ২০—৩২ শ্লোঃ।

হিন্দু নারীর দেবী হইতে হইলে এই প্রকারে চলা চাই।

প্রায় সকল স্মৃতি-পুরাণেই এই প্রকার ব্যবস্থা। এমন না হইলে আর আমরা লোকের কাছে কেমন করিয়া বড়াই করিয়া বেড়াই ‘দেখ দেখি হিঁদুর ঘরের মেয়েরা কেমন সেবা-পরায়ণা, মেহশীলা, কথার বাধ্য, সাক্ষী, ধৈর্য্যবতী, কষ্টসহিষ্ণু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আরও অনেক কথা, অনেক বিধান আছে, আমরা অল্পের ভিতর নমুনা দেখাইয়া যাইতেছি।

স্মৃতিতে পারিতেছি, আম্রকালকার এই সভাসমিতি, বক্তৃতা, আন্দোলন, অবাধ জীশিক্ষা, জীস্বাধীনতা, সত্ৰাণ্ডেটি, নারীভোটের দিনে বধু ঠাকুরাণীরা কণ্ঠবোর বর্দ্ধ দেখিয়া ঠোট টিপিয়া হাসিবেন ও বলিবেন—‘এ ত ক্রীতদাসীগণের রোজনাম্ভা, দাসাগিরির পালার এর চেয়ে নূতন কথা আর কি থাকিতে পারে? সে সব দিন-কাল গিয়াছে, হে বাপু। এখনকার দিনে আর এ সব চলে না।’

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

\* নারীহুঃখকাতর মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুরমণীর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন—  
“বিবাহের সময়ে জীকে অর্দ্ধঅঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু ব্যবহারের সময় পণ্ড হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নীকে দাস্যবৃত্তি করিতে হয়।” (সহমরণ, ২য় খণ্ড)

মনে হয়, হিন্দু আচার্য্য কেহ কেহ চট্টিয়া যাইবেন, এবং বিবাহকালীন মন্ত্র দেখাইয়া দিবেন, “সম্রাজ্ঞী শস্ত্রে ভব, সম্রাজ্ঞী শস্ত্রে ভব, নন্দন চ সম্রাজ্ঞী অধি দেয়ু।” কিন্তু Theory ও Practice একত তফাৎ তাই ত আমরা দেখাইতেছি। শাস্ত্রে এমন কথাও আছে, “অর্দ্ধং ভাৰ্য্যা মল্লব্যস্য ভাৰ্য্যা শ্রেষ্ঠতমা সখা। ভাৰ্য্যা মূলং ত্রিবার্গস্যঃ ভাৰ্য্যা মূলং তরিত্যতঃ ॥” কিন্তু ব্যবহারে ?

## সমাজভ্রষ্টা ।

—❀—

বাণী যখন নয় বছরের দিশু  
 পূর্ণ যুবা স্বামী তাহার দিশু  
 পিতৃধনের অধিকারী,  
 যৌবনেরই মত্ত মদে বিষম অত্যাচারী,  
 দিনে দিনে পলে পলে করছে আয়তন :  
 —বাল্যস্থলভ ভয়,  
 লজ্জা চরম, শঙ্কা, ডরে বাণীর মনে ত্রাস  
 কঠিন হ'ল অন্তর-বাড়ী বাস !  
 ঘরে বিস্তার মন উঠে না নিত্য নতুন ছল  
 পক্ষ-মলিন পাপের গভীর জল  
 তারি তলায় ডুবল ক্রমে  
 পাপের বোঝা নিত্য নতুন উঠল জমে জমে ।

স্বামীর দরশন  
 ভাগ্যে যদি মিলে কভু কাঁদে বাণীর মন !  
 এমনি করে তিন বছরে  
 অত ধনের একটি কড়ি রইল না আর ঘরে,  
 দেনার দায়ে মুখ দেখান ভোর  
 দিশুরে সেই গ্রামের মাঝে গুঁজে তখন মিলল না'ক আর ।  
 আত্মজনে বললে “আহা বাছা  
 বয়স নেহাৎ কাঁচা  
 জানি না কোন্ মনের দুখে  
 একটি কথা বললে না'ক মুখে  
 যোগী হয়ে বেরিয়ে গেল দেখি,  
 ঘরে যে বৌ নেকী  
 হারামজাদা নেহাৎ পাজী  
 আর কিছু না এসব শুধু বৌয়েরই কারসাজি !”

তারপরে লোক-পরম্পরায় খবর এল গ্রামে  
নিশু নামে

এ গাঁয়েই মরেছে একজন

শীর্ণা নদীর ধারে যেথা আছে গভীর বন

বীভৎস কোন্ রোগের ক্ষতে ;

বাড়ীর লোকে তখন সবাই বাণীর কাছে বসে নানামতে

“তা বাছা আর তোমায় নিয়ে করব বল কিনা

রাত্রি দিনা

কে আর হবে তোমার সেবা নিয়ে

ধাক আপন মাঘের বাড়ী গিয়ে!”

বাণী বিদায় হ’ল যবে

বয়স ত্রাহার বছর বারো হবে !

সিঁথীর সিঁদূর মুছে তাহার হাতের নোয়া ছাড়ি

বাণী এবার ফিরল মাঘের বাড়ী !

বিধবার ঐ একটমাত্র মেয়ে

তাহারি মুখ চেয়ে

ভুলেছিলেন স্বামীর মৃত্যু, দৈন্ত্য দুখ জ্বালা ;

অনেক সেধে, অনেক জপে মালা

দুরাত্মীর সাহায্যেও শেষ কড়িটি ফেলে

পেয়েছিলেন আশাতীত, পেয়েছিলেন বড়-ঘরের ছেলে !

বাণীরে তাই দেখে যে আজ

মাথায় যেন পড়ল ভেঙ্গে বাজ !

বড় সুখে অকাতরে মাঘের বুকে নিদ্রা গেল বাণী ;

কপালে কর হানি

মাতা বসে রইল নিশি জাগি

বললে শুধু, “দুর্দৃষ্টে এই কি ছিল হায় রে হতভাগী!”

চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে চাকরী নিল মাতা

পরের বেড়ী ধরতে গিয়ে ভিক্ষে ওঠে ভারি চোখের পাতা,

নইলে কিবা থাকবে ?

—দুটি পেটের অন্ন কোথা পাবে ?

বাণী হেথা ভাগ করে নেয় মায়ের বেদনাকে  
হাতে হাতে এটা-ওটা গুঁড়িয়ে দিতে থাকে !  
এমনি করে কাজে বিরাম হীন  
দুঃখে সুখে লাগল যেতে দিনের পরে দিন !

বাণীর দেহে রূপ ধরে না আর  
যৌবনেরই বসন্ত-সস্তার  
এল জীবনকুঞ্জবনে,  
সর্বদেহ ফুটল সঙ্গোপনে ;  
ফোটে যথা অকারণে উষার ফুলবালা,  
ফোটে যেমন জ্যোৎস্না-ভাসি প্রেমামৃত ঢলা  
নিশীথ-রাতে,  
চিত্রকরের হাতে  
ফোটে যেমন শিল্প-কলা, কবির মনে রং,  
ফোটে যেমন কচি রোদে কাঁচা সোনার ঢং !  
জীর্ণ বেশে ছিন্ন সাজে  
আরো বেশী পূর্ণ শোভা ফোটে দেহের মাঝে,  
—শত হাজার মেঘস্তব  
ঢেকে যেমন রাখতে নাবে দীপ্ত রবিকর !  
এত রূপের ভার  
আপন মাঝে থাকতে নাহে আর  
ভরা মধুচক্র সম,  
আমাত নব মেঘের মত নিবিড় নিরুপম,  
একটু ছুঁলে ওরে  
অবঝারিয়ে অবঝারিয়ে পড়বে বুঝি ঝরে !

চৌধুরীদের বড় ছেলে মণি  
রূপের গুণের খনি  
ওকালতি প্রশ্ন করেছে দু'মাস ৪ ল সবে  
ভাগ্য যাচাই করতে এবার বিদেশপানে বেরিয়ে যেতে গেল

বাণী সেদিন পরিবেশন কর্তে গেল পাতে

কেমনে এক সাথে

দৌহার পানে দৌহার আঁখি নেমে

উঠল না আর মুগ্ধ হয়ে রইল সেথা থেমে ।

ক্ষাণিক পরে ফিরল যবে বাণী

থরথরিয়ে কাঁপছে দেহখানি ।

তার পরেতে এক সকালে জলের কলসি নিয়ে

বকুলতলা দিয়ে

বাণী যখন ফিরতেছিল মগির সাথে দেখা

পথ একা,

কাছে এসে বললে কি যে লজ্জা-জড় সুরে

এক নিমেষে বাণীর জগৎ উঠল ছলে ঘুরে !

কোনমতে আপনাকে সে সুসম্বৃত করি

বললে “হরি হরি

অমন কথা আনলে কেন মুখে

বড়ই দুখে

পড়ে আছি চরণচায়ে, অভাগিনীর দুঃখ কেন লবে

আমায় নিলে তুমি যে আজ সমাজভ্রষ্ট হবে !”

ছুটে গেল আপন গৃহ পানে

লুটিয়ে পড়ি ভূমির 'পরে ব্যথাব্যাকুল প্রাণে

অনেক কাল কাঁদল সেদিন বাণী ।

তার পরেতে বেশী ক'রে মাথার কাপড় টানি

লেগে গেল আবার কাজে

রান্নাঘরের বাসনগুলি আপন হাতে মাজে ।

মগি গেল প্রবাস-গাসে

আপন মায়ের কাছে তাহার পত্র কভু আসে,

এমনি করে কাটল তবে মুখ না চেয়ে কারো

বহুরখানিক আরো !

শেষে যে দিন পিয়ন এসে বাণীর হাতে দিলে চিঠি

মাটির সাথে মিশিয়ে গেল দিটি



থরথর কাঁপল হিয়া  
 অশ্রু শুধু পড়ল বার দুটি নয়ন দিয়া !  
 লেখা আছে “ছেড়েছি সব আশা  
 তোমার ভাল চাওয়ার লাগি খুঁজে না পাই ভাষা ;  
 বন্ধু বলে দিলাম হাতে  
 প্রথম উপার্জনের টাকা এই চিঠিটির সাথে  
 অমুগ্ধ নয়,  
 —হয়ত কাজে লাগতে পারে দুঃখে অসময় !”

চারি দিকে পড়ল চিড়িকার  
 মুখ দেখান হ'ল ভার,  
 “যেন্মা একি লজ্জা একি ছাই  
 একটুখানি ধর্মের ও ভয় নাই ?”  
 চৌধুরীদের গিন্নি এসে বললে শেষে বাণীর মায়ের কাছে  
 “প্রকাশ যেন হয় না কোনখানে ;  
 তবে কি না কেমন করে রাখ'ব বল আর  
 রাস্তা এবার দেখ আপনার !”  
 প্রতিবেশী বললে সবে “কেমন ক'রে থাক'বে বল কাছে  
 নম্রা নারীর ছোঁয়াচ লাগে পাছে  
 বৌঝিয়েদের বিপথ-পানে আবার যদি টানে  
 তার চে' বাপু আপন-বাসা খোঁজ গে কোনখানে !”  
 মণির টাকা কয়টি নিয়ে হাতে  
 মায়ে ঝিয়ে বেরিয়ে গেল নিশীথ ঘন রাতে ।  
 সকালবেলা শ্রাবণ-ধারা ঝরল অবিরল  
 বিধাতার এ দুটি চোখের দুঃখ-করুণ জল !

## মেয়ে ।

—\*—

কেদার বাবু আদালতের কেরাণী । পঁচিশ টাকায় আরম্ভ করিয়া এখন প্রায় বিশ বৎসর চাকুরী করার পর তাঁহার বেতন বাট টাকায় উঠিয়াছে । এদিকে মা যন্ত্রির কৃপাগ্রাস্ত্রার্থে দুইখানা তক্তাপোষেও ছেলেদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠিতেছিল না । ইহা ছাড়া মা, বিধবা ভগ্নি একটী, দুইটী পিতৃদীন ভাগিনেয় তাঁহার সংসারভুক্ত । বড় মেয়ে লীলা, বিবাহের বয়স ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয়া কন্যা উমাও বিবাহের উপযুক্ত পিতৃ সংসারের খরচ চালাইবার জন্যই বাজারে প্রায় দুই হাজার টাকা দেনা হইয়া গিয়াছে । পুত্র ললিত তীক্ষ্ণ মেধাবী, কিন্তু তাহার স্কুলের বেতন দেওয়াই ভার স্বরূপ ছিল, এখন সে স্কুল ছাড়াইয়া কলেজের দ্বাবপাশ্বে আসিয়া পড়িয়াছে । দুই গ্রহের গৃহিণী অর্থাৎ কেদার বাবু মা বসিয়া ডি়ে দিতেছিলেন এবং লীলা রাশি রাশি ডাল বাটিয়া দিতেছিল । কেদার বাবু আসিয়া একটু দূরে ছায়ায় পিড়ি পাতিয়া বসিলেন । মা প্রশ্ন করিলেন “তোদের সত্য বাবু যে ভেগের জন্যে কনে দেখতে গিয়েছিলেন তা কেমন নি ?” কেদার বাবু সম্মুখে হেলের বাটী লইয়া বসিয়াছিলেন, গলায় পৈতা কোনরে নামাইয়া কহিলেন “আজ ফিরেচেন, সত্য বাবু সাত হাজার টাকার কমে ছেলের বিয়ে দেবেন না ।” সত্য বাবু অফিসের একশত টাকা বেতন ভোগী ছেড়ক্লার্ক । অবস্থা তাঁহার যেমনট হউক না কেন, উপযুক্ত পুত্র দুইটির বিবাহে তিনি যথেষ্ট লাভবান হইবার আশা রাখেন । মাতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন “কিন্তু তাঁর বড় ছেলে জ্বরের ত এখনও বিয়ে পাশও করেনি, এখন বিয়ে দেবেন ?” “দেবেন বই কি, গুঁর নাকি এই সময়ট টাকার বেশী দরকার ।” মা মুহূ হাসিয়া কহিলেন “মন্দ ব্যাপার নয়, বাপের টাকার দরকার তাই ছেলের বিয়ে,—তা তোরও ত টাকার দরকার তুইও দে ছেলের বিয়ে, অত ভাবনাঃ কেন মিছা খুন হচ্ছি !” কেদার বাবু ক্ষণেকের ভরে আত্ম-বিশ্রুত হইলেন, চিন্তার গাঢ় ছায়া তাঁহার মুখে লেপিয়া গেল । “ছেলের স্বীকে স্বস্তর ভরণপোষণ করবেন, এত বড় উপকার সেই হতভাগা কন্যাদায়িত্বের করবেন বলে তাকে কিঞ্চিৎ দোহন করে নেওয়া এঁরা উপযুক্ত উচিতই মনে করেন মা ।” লীলা একবার নত চোখ তুলিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইল । মা কহিলেন “তাতে করেন, কিন্তু নিজের মেয়েকে দিতে ইচ্ছে আর কার না করে, তবে আমাদের এই শ্রেণীর লোকের আর দিয়ে পেট ভরে না আমরা কথা থেকে অত দিতে পারি ।” “হঁ, মা আমাদের মধ্যে সমাজে কয় জন আর বড় লোক আছেন,—আমাদের মত কুড়ি থেকে এক শো এই মাইনের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই ত তিন ভাগ । আমরা পেটের দ্বায়ে সংসারে খরচের জন্য, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, ঋণগ্রস্ত হই,—আর ছেলের বিয়ে দিয়ে তা থেকে মুক্ত হই, আবার বি. এ, কেল করে আমার ছেলেও ঢুকবেন এই কেরাণীর কাজে যদি বড় ভাগা হয় তো পাশটা কোরে একটা স্কুল মাষ্টার হবেন, আমার ছেলের আবার বিয়ের কথা বল্চো মা ?” উমা আসিয়া ডাল বাটিতে বসিল ; লীলা উঠিয়া রান্নাঘরে মায়ের সাহায্যে গেল । কেদার বাবু দুই কন্যার পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘান করিতে গেলেন । এই গলগ্রহ কন্যা দুইটির বয়স যে স্থান-কাল না মানিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল, এমনকি শুধু এই মেয়ে দুইটীই নয়, ইহাদের মা পর্বাস্ত্র যেন বিশ্বসংসারের কাছে অপরাধী হইয়া উঠিতেছিলেন । কন্যা হইয়া জন্মিবার অভিশাপ যে কোন্ পাপে কাহার নিকট পাঠিয়াছিল তাহা না জানিয়াও তাহারা যে বাপ মায়ের কত বড় বাল্যই তাহা বুঝিয়া সবা সর্বদা কুন্তিত, শঙ্কিত মনে নিঃশব্দ সংসারের কান্ন করিয়া যাইত । তবু এই বোকা যে অসহ্য লাগিত না সে এই জন্য যে তাহাদের মাঝে সজিনী যতগুলি সকলেরই এই অবস্থা !

( ২ )

দিন কয়েক হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে, কাদায় ছোট মেটে বাড়ীর চারিদিক যেন পচিয়া উঠিয়াছিল। লীলা ও উমা ভিজিয়া ভিজিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করতে ছিল। লীলা উচ্ছিন্ন বাসনগুলি বাহির করিয়া মাজিতে ষাটতোড়ল উমা পথ রোপ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল “আনায় দে দাদি, তুই আজ খুব ভিজ্জেচিস্, আর ভিজ্জেলে নিশ্চয় অসুখ করবে।” লীলা হাসিয়া কহিল “যতোর গরিপণা ক’রতে হবে না, তুই ঘরটা তো পরিষ্কার করগে যা” লীলার একটা ছয় বৎসরের ভাই সতু কি একটা আবদার লইয়া ঘরের ভিতর উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল, কেদার বাবুর ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল “আঃ জ্বালিয়ে মাঝলে যে! এক পাল মেয়ে রয়েছে; সে গুলো ক’রচে কি?—এই উমি”—তুই বোন্ পরস্পর মুখ চাচল আরক্ত মুখে বাসনের খোঁজা হুন্ করিয়া নামাইয়া লীলা অক্ষুট কণ্ঠে কহিল “যা মরগে যা”—ছোট ভাইটাকে কোলে করিয়া ভুলাইয়া লীলা বিছানায় বসাইয়া দিতেছিল তাহার মা কহিলেন “তোরা শীগগির কাজ সেরে এসে একজন কেউ থুকীকে নে, এটার জর হয়েছে বোধ হয়।” কেদার বাবু একধারে বাসিয়া তানাক খাইতেছিলেন, কহিলেন “কোনটার আবার জর হ’ল?” “থুকীর। আজ কাদান থেকে এই রকম জর হচ্ছে, কি জানি দিদির মেয়েটা এমন ঘুস্ ঘুসে জরে দিন কয়েক ভুগে শেষটা মারাই গেল।” কেদার বাবু কহিলেন “তোমার দিদির কপালের কথা ভেড়ে দাও, তিনি ত মেয়েকেই আদর ক’রতেন, তাঁর মত ভাগ্যা হ’লে আমি ত বেঁচে যেতাম, তাঁর ভো পাচটা মেয়ে হ’ল, তার মাথ আছে একটা, মেয়েগুলো জন্মায় আর মরে, আমার ছেলেগুলো বৎ রোগেও ভোগে কিম্ব—” মাতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লীলার পানে চাহিয়া কহিলেন “হয়েচে যদি তো মরলেই কি রফা।” তুই চক্ষু ভরা অশ্রু লইয়া লীলা ফিরিয়া আসিয়া উমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল “যা আর ভিজ্জেতে হবে না।” উমা একটু অশ্রুগা হইয়া দিদির মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া তারপর চলিয়া গেল। বুঝল হই তো নিতাকার ঘটনা, তাহাদের দুইটি ভাগ্যের মরণে আত্মহীন হইক, সংসারে সমাজে পিতামাতা কতখানি মুক্তি পাইতে পারেন তাহা ত পলে পলে তাহারা বুঝিতেছিল। গ্রামা চলিত কথা—ঋণ পরিশোধ ও কন্যা মরণ এক,—আপাততঃ ব্যাপাদায়ক হইলেও পরম নিশ্চিন্তকর। সন্ধ্যায় কেদারবাবু বাজারের ঠিকা চাকর সঙ্গে করিয়া বাহির হইতেছিলেন। ঘটাখানেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর চাদর ও ছাতি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। লীলা ধূপ ধূনা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই পিতাকে অসময় শায়িত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের দুই ভগ্নির প্রসঙ্গমাত্রে পিতার মুখে যে গভীর হইয়া ওঠে তাহা দেখিয়া শুনিয়া তাহারা প্রায়ই সরিয়া সরিয়া বেড়াইত। কিন্তু পিতার শয্যা গ্রহণে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভীতকণ্ঠে লীলা প্রশ্ন করিল “অপনার কি শরীর খারাপ লাগছে বাবা, অসুখ ক’রচে?” কন্যার প্রশ্নে অলিয়া উঠিয়া কেদারবাবু ত্রিহুকণ্ঠে কহিলেন “না, আমার মস্ত সুখ তোমরা, হয় তোরা মর নর আমি মরি তা হলেই সব অশান্তি চূকে যায়।” লীলা অসম্বরণীয় অশ্রু লুকাইবার জন্য, বিশ্বের কালীমাথা আঁধার মুখ লইয়া বাহির হইয়া গেল। তুলসী-মূলে মাথা রাখিয়া বোধকরি প্রার্থনা করিতেছিল “হে ঠাকুর মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও!” গৃহীণী সঙ্কটাত্মক শেষ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, কহিলেন “ঘরে কে লীলা, কেহু?” অক্ষুট কণ্ঠে লীলা জানাইল “হ্যাঁ।” মা ঘরে গিয়া কহিলেন “অসময় শুয়ে কেন রে?” কেদারবাবু মাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিলেন কহিলেন “দেখ মা ওই মেয়েগুলোকে দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে।” মা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন “এই এত ভাবনা তেবে তেবে একটা উপায় তো হচ্ছে না, হোক, বড় হ’ল বই তো নয়, ঘরে ঘরেই তো এখন এমন হচ্ছে।” “তা বলে তো আর নিশ্চিন্ত হুতে পারিনে, এরপর দেখছি, মা, আমাদের মত বাপমায়ে আর মেয়েরা বিয়ে দিয়ে উঠতে পারবে না, বিদ্যাকর

দশা হয়ে উঠবে।” সম্প্রতি লীলার বিবাহের যে কথাবার্তা হইতেছিল এইটা সর্বাপেক্ষা অল্প মূল্য। সুপাত্র অনেকগুলিই জুটিয়াছিল কিন্তু অর্থের জন্য তাহা বর্জিত অসম্ভব; বর্তমান পাত্রটি ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে। বরের পিতা, কেদারবাবুর সমবয়স্ক, চল্লিশ টাকা বেতনভোগী কিন্তু দুইটা কন্যার বিবাহে তাঁহার ভদ্রাসনখানি বন্ধক পড়িয়াছে, এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহা উদ্ধার করিবেন। সুতরাং সর্বসম্মত প্রায় তিন হাজার দর দিয়াছেন। পাত্র আবার পড়িবে। কিন্তু পাত্রের বয়স দেখিলে সে যে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে প্রবেশ যোগ্য একেবারেই নহে ইহা বালকও বুঝিবে। কেদারবাবু অনেক অমুনয় বিনয় করিয়াও যখন শেষ উত্তর একই পাইলেন; তখন মাথার হাত দিয়া বাসিয়া পড়িলেন। এখন অগত্যা ললিতের বিবাহ দেওয়া বাতীত উপায় নাই। ললিতের যে সম্বন্ধ আসিয়াছে সে কন্যার পিতা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। হুগলিতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করেন। ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে গ্রহণ করিলে চারি পাঁচ হাজার পাইবার আশা করা যায়। তবে যখন বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা বেচাকেনার বাজারই হইয়াছে তখন দরদস্তুর করিলে আরো কিছু পাওয়া বা আদায় করা বাইতে পারে।

( ৩ )

নির্দিষ্ট পাত্রের সহিত লীলার বিবাহ দিবার পূর্বেই ললিতের বিবাহ হইয়া গেল। ভুবনবাবুর কন্যা প্রথম প্রচুর যৌতুকসহ দরিদ্র কেদারবাবুর অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নগদ তিন হাজারের কিছু অধিকমাত্র পাওয়া গেল। তাহাতে কেবলমাত্র লীলার বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কেদারবাবুর উপযুক্ত পুত্র আর ছিল না। বাস্তব বিবাহের পনের অর্ধে বাজারের ঋণ ও উমার বিবাহ হইতে পারে। তথাপি বাস্তব একসঙ্গে এই দুইটি কন্যা সম্প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন একনা কেদার বাবু পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন না। একজন বৃদ্ধা আত্মীয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহার দেবর ত্রীযুক্ত গিরিশ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করিবেন। যদিও গিরিশবাবু, কেদারবাবু অপেক্ষা কিছুমাত্র কনিষ্ঠ নন, এবং তাঁহার দুইটি পুত্রবধু, পোত্র-বর্তমান তবু যৌতুক ও পণ কিছুকিছুই যখন প্রয়োজনান্বিত্য নাই তখন এমন সুযোগ কেদারবাবু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। গ্রাম্য সম্প্রদায় ঠাকুরদাদা কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন “আমি শুনেছি গিরিশের শরীর আজকাল একটুও ভাল নেই, ওখানে এ কাজ না করাই ভাল, সংছেলের সংসারে কি আর ঠাই পাবে? শেষটা সেই হাঁড়িতে যারগা ত দিতেই হবে, তবে কেন এমন তাড়াতাড়ি করচো?” দুঃখ বলিয়া বুঝিলেও কেদারবাবু দীরকণ্ঠেই উত্তর দিলেন “হাঁড়িতে স্থানভাবের জন্যই কি মেয়ের বিয়ে লোকে দিয়ে থাকে দাদা? হাঁড়িতে এখনও অমন চারটে মেয়ের স্থান আমার হ’তে পারে। কিন্তু বিয়ের পর; এ পাত্র হাত ছাড়া ক’রলে আমি আর পাত্র পাব কোথা?” এ সংবাদে কন্যার মা গোপনে উচ্ছ্বসিত অশ্রু অঞ্চলে মুছাইলেন কিন্তু সন্তানের মাতা হইয়া স্বামীর যে কতি করিয়াছেন এত বড় অপরাধের পর আবার এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। ললিত মনে মনে যথেষ্ট সাতস সঞ্চয় করিয়া পিতার নিকট প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু নতমুখে মাথা চুলকাইয়া অনেক কষ্টে এইটুকু মাত্র বলিতে পারিল যে “উমির বিয়ে এখন নাই বা হ’ল পরে চেষ্টা করলেই হবে।” কেদার বাবু গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন “পরে হবে, টাকা আসবে কোথেকে তুমি?” ললিত অত্যন্ত মিম্মা অফুট কণ্ঠে কহিল “এর পরে যদি কোনখানে—” মুখ বিকৃত করিয়া কেদার বাবু কহিলেন “বিনা পরসার? পাপল হয়েচ তুমি; তোমার বিয়েতে আমি টাকা নিই নি? কে আমার মেয়েকে ওমনি নেবে, আমি তো ফতুর হয়ে গেলাম। এই আমাদের সন্তানদের লাসের তত্ত্বই ত ভাড়াটে বাড়ীর সংখ্যা বাড়চে। এর পর কুড়ি টাকা ত্রিশ টাকা

মাইনের তোমার খাড়ে এই সংসার প'ড়বে, তার চেয়ে যেমন তেমন কোরে তোমার এই দায় থেকে তো উদ্ধার ক'রে রেখে যাই; আমার এই অজীর্ণ, অথলে জীর্ণ শীর্ণ দেহখানা আর কদিন? উমা লীলার চেয়ে তোমার অবস্থা কিছুমাত্র সুখের হবে না বাপু কোনও ভাবনা নেই, যাও। আর আর প্রভাতের পক্ষা না পাইয়া ললিত অধোমুখে ফিরিয়া গেল। পিতামহী কপালে হাত দিয়া কহিলেন “ও সব যার যেমন বরাত।” বাস্তবিক ইহা ছাড়া আর সাধনা কি আছে?

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উমা দেখিল দ্বার খুলিয়া ঠাকুমা বাহির হইয়া গিয়াছেন; বাহিরে চাহিয়া দেখিল সেই অগ্রিম মেঘাচ্ছন্ন দিন, আকাশের সীমা হারা পাংশু মেঘের কোনওখানে কিছুমাত্রও ফাঁক নাই। বাড়ী ঘর গাছপালা সব বর্ষাসিক্ত। কোপাও একটু শুক একটু পরিচ্ছন্নতা নাই; অন্তর বাহির সবই ভারাক্রান্ত ম্লান। ইহা ছাড়া ঘুম ভাঙিতে যে দেবী হইয়া গিয়াছে এই কুণ্ডাতে সজ্জ হইয়া সে উঠিয়া পড়িল শয্যা তুলিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল লীলা তখনও ঘুমাইতেছে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া উমা কহিল “ও দিদি আজ কপালে কি আছে, ওঠ একেই দেয়া হয়ে গেচে এখনও ঘুমচ্ছস? ” লীলা ঠিক যেন জাগিয়াই ছিল এমন ভাবে ক্লিষ্টবরে কহিল “তুই বা কাজ ক'রগে আমি আজ পারছিনে উঠতে আমার অসুখ ক'রছে।” উমা তাহার কপালে হাত দিয়া চুপি চুপি কহিল “কিন্তু অর হয়েছে শুনলে বাবা শিচরই বকবেন ডাই।” লীলা তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল “আমার বুঝি অর হয়েছে? আমার শুধু মাথা ধরেচে, তুই বলসনে কাউকে, গেরে গেলেই উঠবো।” উমা বাহির হইতেই কেদার বাবু প্রশ্ন করিলেন “তোরা এখন উঠি বুঝি? আশঙ্কার মুখ বিবর্ণ করিয়া উমা নীরবে সরিয়া গেল। তাহার ঠাকুমা কহিলেন “এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো তোদের, হাজার বার ডেকে ডেকে এদের ওঠাতে পারিনে, আমরাও ছোট বেলা ঘুমতাম বাপু, এমন ঘুম তো কক্ষণে ঘুমুইনি, আর তিনি? তিনি বুঝি এখনও ওঠেনই নি?” কেদার বাবু রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন “এখনও ঘুমুচ্ছে কি? বা তুলে দিগে বা” উমা বলিবেনা স্থির করিয়াও বলিয়া ফেলিল “তার অসুখ করেছে।” কেদার বাবু কহিলেন “কি হয়েছে?” “মাথা ধরেছে” ঠাকুমা ষিচাইয়া উঠিলেন “মাথা ধরেচে বলে আর উঠতেই পারচে না? তবে থাক এই বাসি ঘর দোর অমনি পড়ে পাক।” উমার মা কোলের খুকীকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন কহিলেন “ঘর উম একে নিয়ে গিয়ে লীলার কাছে দিয়ে আর, আমি কাজকর্ম সেরে ফেলচি” মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মাথার গামছা চাপাইয়া লীলা বসন মাজিতে বসিয়া গিয়াছে, উমা ছুটিয়া গেল “তোরা ছুটি পারে পড়ি দিদি ওঠ, জরে তোর সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে আর অলে ভিজিসনে।” লীলা আরক্ত মুখে গজিয়া উঠিল “তুই একটা আন্ত বোকা উনি, ওঠ, ওঠ, করচিস, উঠে যাব কোথায়, কে ক'রবে এসব তুই তো? তোর বুঝি অর হতে জানে না?” উমা ম্লান মুখে কহিল “অর তো আমার হয় নি” বাহিরের কাজ লীজ সারিবার জন্য ছুই বোনেই বলিয়া পড়িল। এমন অবস্থায় অবহেলায় কন্যা হইয়া জন্মিবার অতি কঠিন অপরাধে জীবনমৃত অবস্থায় মেয়েদের কৈশোর জীবন সকল কষ্টে সহিষ্ণু হইয়া ওঠে।

( ৪ )

লীলা ও উমাকে পাত্রস্থ করিবার পর কেদার বাবুর অজীর্ণ-জীর্ণ অস্থিপঞ্জর কথখানা বেন এলাইয়া পড়িল। পড়িল সংসারের নিকটতো মুক্তি নাই, ললিতের পড়া অতি কষ্টে চলিতেছিল কিন্তু আর যে চলিতে পারে এমন কোন আশা নাই। লীলা ও উমা উত্তরের কর্ণ ভার একা সুখময় হাতে পড়িয়াছে স্তব্রাং সাংসারিক শৃঙ্খলা ও ভেমন নাই। কয়েকদিন হইতে কেদার বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি একমাসের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিতে

বাধা হইয়াছিলেন। ললিত কলেজ ছুটিতে ফিরিয়া গায়ের পাঞ্জাবীটা অতি সাবধানে খুলিয়া রাখিতেছিল কিন্তু পুরাতন পাঞ্জাবীটা একটু টানেই ফাসিয়া গেল। সুখমা বসিয়াছিল তাহার পানে চাহিয়া ললিত কহিল “যাক্ গে এটা বাবুগারে অযোগ্যই হ’য়ে গেচে, বাবা কেমন আছেন?” “ভাল আছেন, বেশ গল্প করছেন।” ললিত নিমেষকাল তাহার পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে কহিল “তুমি কেমন আছ?” সুখমাও হাসিয়া মুখ নত করিল। অন্য ঘরে কয়েক দিনের রোগ ব্যর্থতার পর সেই দিনই কেদার বাবু সুস্থ হইয়া জীবিত সন্তান আলাপ করিতেছিলেন। কথা যে ললিতের প্রথম সন্তান পুত্র বা কন্যা কোনটা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ললিতের মা কহিতেছিলেন যে তাঁহার প্রথম সন্তান ললিত কেদার বাবু ও জননীর প্রথম সন্তান সুতরাং ললিতের প্রথম সন্তানও পুত্র হওয়ারই অধিক আশা। হর্ষোদ্ভল মুখে উভয়ে তাহাট আলাচনা করিয়া ললিতের সাক্ষ্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। ললিত আসিয়া পিতার পাশে বসিল। তাহার মুখ প্রচ্ছন্ন বেদনাহত। উমার বৈধবা সংবাদ সে পাইয়াছিল কিন্তু জরাজীর্ণ দেহ পিতাকে জানাইতে পারে নাট। কিন্তু পিতার অসুস্থ সংবাদে স্বয়ং উমাই অভ্যস্ত বাকুল হইয়া ললিতকে পত্র দিয়াছিল। কয়েকদিন পরে পিতার হৃৎপিণ্ডে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মুখে একটু প্রেসর দ্বারা দেখিয়া আর সংবাদ দিয়া আঘাত করিতে পারিল না। দিন কয়েক পরে উমার পুনঃ পুনঃ আগ্রহে ললিত তাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিল। উমা আসিয়া যখন পৌছিল তখন তাহার মা ললিতের জন্মদিনের বর্গীয়া শাড়ী কৃত কাজের অঙ্কুরণে সুখমার স্মৃতিস্মারক শাঁক লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং ধাত্রীকে সন্তান জন্মিয়ামাত্র হলু দিবার জন্য মনে করিয়া দিতেছিলেন। উমাকে দেখিয়া হাতের মঙ্গল শব্দ প্রবল অমঙ্গল শব্দে একটা জল কেরোসিনের টিনের ভিতর পড়িয়া গেল। ললিত শুক কঠিন কণ্ঠে রোমনোদ্যাত্ত মাকে কহিল “চুপ্ গো! না এত নুতন নয়? বিয়ের দিনইত হয়েছিল; যাও যা|ক’রছিলে করগে।” কেদার বাবু ললিতের ভবিষ্যৎ জীবনের কতকটা নিরাপদ সূচনা স্বরূপ পৌত্র জন্ম সংবাদের আশার বিধানার বালিশে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। উমাকে দেখিয়া অকস্মাৎ সমুদ্রে বজ্রপাত হইলে মানুষের যে অবস্থা হয় তাঁহার সেইরূপ হইল। কিছুকণ নির্নিমেবে কাঠের মত শূন্য দৃষ্টিতে নিরাতরণ্য স্তব্ধবেশ বালিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বহুকণ সঞ্চিত দীর্ঘ জন্মভেদী শ্বাস প্রবল জোরে তাগ করিয়া নিঃশব্দে গুইয়া পড়িলেন, তখন স্মৃতিকা গুণ্ডে নবজাত শিশুর ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিরও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বিব্রত হইয়া ধাত্রী সান্ত্বনার স্বরে কহিতেছিল, “ভি ছি মেয়ে হয়েছে বলে কি কান্দতে আছে? মেয়ে না হলেই কি সৃষ্টি চলে গা? চুপ কর চুপ কর, এরপর আবার কত খোঁকা হবে।” ললিতের পানে একবার চাহিয়া কেদার বাবু পাশ ফিরিয়া জীকে প্রসন্ন করিতেছিলেন “কি হল?” কিন্তু তাঁহার বাক্যক্ষুরণ হইবার পূর্বেই তাঁহার জিজ্ঞাসু নেত্রের সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা পরম উল্লাসে নাচিতে নাচিতে আসিয়া অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কহিল “ওমা খুকী হয়েছে, খুকী হয়েছে।” চুই চুই বিস্ফারিত করিয়া গুণ্ড কণ্ঠে “মেয়ে হল : আবার মেয়ে—? বলিতে বলিতে কেদার বাবু শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার লুপ্তিত মস্তক ব্যস্ত ভাবে ধরিত্তা কেলিয়া ললিত ডাকিল “বাবা—বাবা কি হল? জল নিয়ে আয়, জল নিয়ে আয় উমি, বাবার ফিট্ হ’য়ে গেচে।”—

শ্রীনিহারবালা দেবী।

## একঘরে ।

—:~:—

বিলাত যাইয়া কেহ হইয়া বিদ্বান  
স্বদেশে ফিরিলে তার কি প্রতিবিধান ?  
সে যে বড় হয়ে গেল এই অপরাধ  
ধরি তারে জ্ঞাত হতে করে দাঁও বাদ ।

এতই নিষিদ্ধ খাওয়া খাইলাম হায়,  
কোনো ফল লাভ দেশে হইল না তায় !  
তাহার অখাওয়া খাওয়া হইল সাথক  
এই দুঃখ সহ্য করা যায় কীহাতক ?

যত্বপি অনুট হয় তবে তারে ধরো  
ভাগিনী বা ভাগিনীর সাথে চেষ্টা করো  
যদি রাজী নাহি হয় দূর কর তারে  
সবে মিলে একঘরে কর একেবারে ।

যদি উচ্চপদ পায় তাহার আফিসে  
অথবা তাহার কোন সহী সুপারিশে  
চেষ্টা করো জামায়ের চাকরীর তরে  
চাকরী না পেলে তারে কর একঘরে ।

ব্যারম্ভার হয়ে যদি, বিনা পয়সায়  
অমুরোধ করে দেখ তব মামলায়  
ওব ত্রিফ লয় কি না, দেখ চেষ্টা করে  
না হইলে একেবারে কর একঘরে ।

যত্বপি কখনো পড়াবিষয় ঠেলায়  
সবে মিলে গিয়ে তার ধরো দুই পায়  
যত্বপি বিপদে রক্ষা করিতে না পারে  
সবে মিলে একঘরে কর তবে তারে ।

যদি না ভাগিনা তব পায় শিক্ষা ব্যয়  
টাকা ধার দিয়ে যদি শোধ তার লয়  
যদি মোকদ্দমা তব না দেয় জিতিয়ে  
জাত গেছে বলে তারে দাও তাড়াইয়ে।

আত্মীয় বলিয়া খুব কর মেশামেশি  
সবারে জানতে আরো কর ঘেঁষাঘেঁষি  
তাহে যদি মাখামাখি নাহি করে বড়  
তবে তারে সবে মিলে একঘরে করে।

তার পর ছেলেমেয়ে বড় হলে তার  
বৈবাহিক সম্বন্ধের চেষ্টা বার বার  
করে দেখ যদি তবু না হয় বেহাই  
একঘরে করো তারে দিও না রেহাই।

যদি বা সে সমাজের নাহি ধারে ধার  
ভ্রাতা ভগিনীরা সব আছে ত তার  
তাহাদের কুটুমের কুটুম যাহারা  
শেষকালে একঘরে হউক তাহারা

দেখাও সমাজ আজো যায় নাই মরে  
রাগিলেই করিবারে পারে একঘরে  
বাথা যদি পায় কভু সমাজের বুক  
পাবে সে ত একঘরে' করিবার সুখ।

বেতালভট্ট।

## বিবাহ সমস্যা।

— :# : —

শিরোমণি। কেন পাত্রের অভাব কি? তোমার মেয়ে ত বেশ সুবর্ণাক্রান্তা, রূপে গুণে সর্বজনস্বন্দর।  
কৃষ্ণকান্ত। গুণের কথা বলিবেন না, শিরোমণি মহাশয়! জীজ্ঞাসিত গুণ তার অঁচল ইত্যাদির দ্বারা একটা  
অনাবশ্যক উপসর্গ। তবে আমার কন্যার রূপ আছে বটে। বঙ্গদেশ যদি বাকিমচন্দ্রের উপস্থান-লোক হইত তাহা  
হইলে এতদিনে একটা পাত্র জুটিত নিশ্চয়, কিন্তু হুঁজুগ্যক্রমে—



শি। তুমি অস্ত্রার কথা বলিতেছ। এদেশে গুণের আদর নাই? তবে পাঁচীর মার এত সুখ্যাতি কেন? ভাল রাখিতে না পারিলে তাঁহার এত সুখ্যাতি হইত?

ক। আমার অপরাধ হইয়াছে। গুণ বলিতে আমি সত্যপ্রিয়তা, ত্রায়নিষ্ঠা ইত্যাদিকে বুঝিয়াছিলাম।

শি। এগুলি পুরুষোচিত গুণ। নারীতে ইহারা বিসদৃশ, সন্দেহ নাই। স্ত্রী সহধর্ম্মীণী। পুরুষের ধর্ম্মের অনু-বর্ত্তনই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার নিজের ধর্ম্ম থাকিলে, অর্থাৎ তিনি নিজে সত্যপ্রিয় বা ত্রায়নিষ্ঠ হইলে সংসারে অশান্তি হইবার সম্ভাবনা।

ক। এই কথাটা পূর্বে বুঝিলে ভাল হইত কিন্তু তাহা বুঝি নাই। ছেলেগুলির সঙ্গে তাহাকেও এসব এই সব কুশিক্ষা দিয়া বসিয়াছি। আচ্ছা শিরোমণি মহাশয়, আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মকথা শুনিলে শূদ্রের কানে গলিত শিশু চালিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। কতাকে মাহুয করিবার চেষ্টা করিলে পিতার প্রতি একরূপ কোন দণ্ডের বিধান আছে কি?

শি। না। বরং এমন কথা আছে “কত্ৰাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়ান্তি বহুতঃ।” কিন্তু কথার কথায় পতির প্রতিবাদ করিতে শিখান শিক্ষা নয়।

ক। আমার তবু হয়, আমার জামাতা যদি প্রতিবাসিনী বিধবার বাস্তবীতা কলে-কোণলে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমার কত্ৰা প্রতিবাদ করিবই।

শি। পাত অস্ত্রার কারণে অগদীশ্বর তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তাহা লইয়া স্ত্রীর মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। পাতকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করাই সাধবা স্ত্রীর কর্তব্য। দেবতার সমালোচনা করা পাপ, এবং প্রতিবাদ করা মহাপাপ।

ক। তবে উপায় কি হইবে শিরোমণি মহাশয়! পতি দেবতা, পিতাও ত ছোট খাট দেবতা। সেই পিতৃ-দেবের প্রতি আমার কত্ৰার যেরূপ ব্যবহার তাহা আদৌ আশা প্রদ নহে। তাহার শাসনে আমার একটুও বেকাঁস কাজ করিবার উপায় নাই। কস্মিন্দ্রে তু'এক টাকা উপরি পাহতাম তাহাও বন্ধ করিতে হইয়াছে। এই হৃদ্যন্ত মেয়ে পতিগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শালগ্রামের মত নির্বিকল্প হইবে হঠাৎ কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

শি। নিঃশব্দ হইয়া না। তোমার কত্ৰার শিক্ষার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। পাতগৃহে আবার তিনি নূতন শিক্ষা পাহবেন।

ক। এই এক সাহসনা আছে বটে। আমার এক বন্ধু কত্ৰার শেমিৎ পরা প্রতিষ্ঠা কতক গুণা কুঅভ্যাস ছিল। তাহার পতিগৃহে এগুলি গ্রীষ্ট্রানী, বাবুয় নী, দেমাকের পারিচায়ক বালিয়া গণ্য হইত। একত্ৰ কিছু দিন তাঁহাকে ক্রেশ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রাবল্যে শাস্তিপূরী কাপড়ের লুতাতত্ত্ব জালে অশ্রু আচ্ছাদন করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হিন্দুদের পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমার কত্ৰার সংক্ষেপে কত একরূপ পার-বর্ত্তন প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ তিনি নিতান্ত শিশু নহেন।

শি। বয়স কত হইল?

ক। আপনি আমাদের আত্মীয়, নিতান্ত ঘরের লোক। আপনার কাছে বলিতে সঙ্কোচ নাই; বয়স পনেরোর অধিক হইয়াছে। কিন্তু বাজারে এগার বৎসর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। মিথ্যার সাধ্যাথে কোনরূপে স্বর্ণ বস্ত্র রাখিয়াছি। সত্য কথাটা প্রকাশ পাইলেই উচ্ছ্বসন চতুর্দশ পুরুষ তৎক্ষণে এখান নগরের মহলাকে বুণ্ড করে পাড়িয়া ঘাইব এইরূপ অবস্থা।

শি। তাইত, আর রাখা চলে না।

কু। মেয়েটাও এমন দুর্ভাগা যে রসদ আধা হইতে সিকি করিয়াও তাহার বাড়ি কমাইতে পারিলাম না। এ-দিকে জ্যাঠা মহাশয় শ্রুতি করিয়াছেন। আম দরিদ্র, আমার মেয়েকে কালেজে পড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? মেয়ে যদি পাড়ায় পাড়ায় ভাস খেলিয়া বেড়াইত বা চবিবগ ঘণ্টার মধ্যে সতর ঘণ্টা ঘুমাঃ কাটাইতে পারিত তাহা হইলে কোনরূপে সমাজে টিকিতে পারিতাম। কিন্তু কিতাব পড়া, আঁকিরে, বাজিরে, গাঃয়ে মেয়ে লইয়া আমি কী করি? আমার জাত, ভাত দুই মারা যাইবার যোগাড় হইল।

শি। আমরা সকলেই নিষেধ করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার জ্যাঠা মহাশয় এমনি গোঁড়া যে কাহারও কথার কর্ণপাত করেন না। তা—আজকাল গেখাপড়া জানা মেয়েও ত অনেক চায়।

কু। গেখাপড়া জানা কেন? তাহার সবই চান, পরীর মত রূপ, ঞীর মত বিনা, শাহারার মত টাক, গাঃর মত বুদ্ধি, সবই তাঁরা চান যদি সং সঙ্গে একটা মোটা রকঃের যৌতুক থাকে। আমার কাছে যে আসল জিনিষটার অভাব। অঃ দেশের এমনি অঃ ইঃ যে গঃ কাপড় দিয়া ভিক্ষা করিলেও কিছু মিলে না। সেদিন আমারই একটা বঃ কাছে একজন কন্যাদায়ঃ ভঃলোক ভিক্ষার্থে আসিয়াছিলেন। বঃ বলিলেন “কন্যাদায় বলিঃ কোন পদার্থ আমি জানি না। পেটের দায় বা প্রাঃের দায় বুঝিতে পারি। কিন্তু কন্যাদায় কি?” আমি বলিলাম “আপনি স্বঃ প্রঃ হঃ কত সংকার্ধ্য দান করিয়া থাকেন, অঃ এঃ বিপঃকে ভিক্ষিঃ সাঃযা করিতে কঃপণতা করিলেন কেন?” তিনি ঈঃর দিলেন “বিপঃ কে? অর্থ না থাকিলে যদি কন্যার বিবাহ দেঃ না যায় তবে বিবাহ না দিলেই চলে। তাঃাতে নিঃ হঃতে পারে, ধোপা নাপিতের কাঃা নিঃেকে করিতে হঃতে পারে, নিঃঃের লুটি পলায় বঃ হঃতে পারে, প্রঃবাসীর চঃমঃপে তাঃখেল নিঃ হঃতে পারে। ইঃর কোনটাই মারাত্মক নয়। একঃরে হঃয়া থাকায় আঃস্থ আছে। কিন্তু লোকের আঃস্থ নিঃরণ করিবার মত অর্থ আমার নাই। তোমাকেও হাটিয়া আফস করিতে হয়। তাঃাতে তোমার কঃ চঃ নিঃয়। তাই বলিয়া তুমি কাহারও নিকট মোটরকার ভিক্ষা কর না, করিলেও বার্থক্য হঃবে। যদি এমন চঃ যে কন্যাকে পাতঃ করিতে না পারিলে সেটা অনঃারে প্রাঃ হরাঃবে, তবে সেই কন্যাকে উপার্জনক্ষম করিবার জন্য ব্যঃ করিতে প্রঃ আছে। এ বঃিত সেরূপ কোন সাঃযা প্রার্থনা করেন নাই। কন্যার সূতঃর জন্য ইনি যে খুব ব্যঃ তাহারও কোন প্রঃমণ নাই। সঃবতঃ তিনি নিঃের জনাই ব্যঃ। কন্যাকে রঃ, বঃ বা নেঃাথোরের হাতে সঃর্পণ করিয়া তিনি খুব সঃব লোক নিঃ হঃতে আঃরক্ষা করিঃন। বঃদেশে এরূপ বঃরতা বিরল নঃ। অর্থ দিয়া যদি হঃর কঃর বাইত তাহা হঃলে আমার সঃস্ত সঃস্তির বিনিঃয়ে দেশের এই হঃয়ইনতা দূঃ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এরূপ হঃবার উপায় নাই। অতঃব কন্যাদায়ঃস্তের হাত দিয়া বঃকঃার পকেট ভঃি করা নিঃস্ত বঃে খঃচ মনে করি। টাকা দিয়া কখনও কোন black mail বঃ হয় নাই। বাংগাদেশের এই black mailও বঃ হঃবে না, বঃ উঃরঃর বঃিত থাকবে, বঃদিন কন্যাপক্ষ এই কথা বুঃাঃতে না পারিঃন যে গঃর একা তাহারই নঃ।

শি। হোঃ, হোঃ, হোঃ, তোমার বঃ ত ঞেঃ সঃপদেশ দিয়াছেন। তবে আর চিন্তা কি? কন্যাকে অবিবাহিত রাখিলেই সকল গোল মিটিয়া গেল।

কু। সঃনাশ! এরূপ করিলে পূঃপুঃয়ের প্রঃত অসঃান দেখান হঃবে না? “ন গঃসাঃতেঃ গঃেঃ লিঃে কাঃ্যে সঃঃ কঃ,” ইত্যাঃি বীরগণী আনাদের দিয়ার দিয়ার প্রঃবাহিত হঃতেছে। আমরা বীরদর্পে

গতায়ুগতিকেরই অনুসরণ করিব। আমাদের দেশে সীতা পরিত্যাক্ষা হইয়াছিলেন “রাবণস্য চ দৌরাখ্যাত্।” আমাদের এগনকার সমাজেও ছুরাখ্যার অভাব নাই। অতএব ধেরেকে হাত পা বাধিয়া জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে যেখানে হউক এক ছাত্রগায় ফেলিয়া দিতেই হইবে।

শি। না, জলে ফেলিতে হইবে কেন? আচ্ছা, তুমি এই উপলক্ষে সর্বশুদ্ধ কত ব্যয় করিতে পার?

কু। পাঁচ শত।

শি। তাহা, পাঁচশত টাকার বর মেলাত অসম্ভব। আত্মকাল ছেলের বাজার দর বেরূপ! মেহলতা মরিল, আরও কত কুমারী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিল তবু ত দেশের চৈতন্য হইল না।

কু। বোধ হয় পণে ঘাটে বন্ধুতা যপেট হয় নাই বলিয়া। আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই জীবনে ছুই পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন। অথচ কন্যা ইচ্ছার মূল্য স্বরূপ এই টাকাটা চাইলেই পাওয়া যায়, বিনাক্ষেপে। এই নির্মিত চাহিবার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি ত্রুচ্যারজন কন্যাকর্তা জোর গলায় বলতে থাকেন “হে বন্ধুগণ, পণ গ্রহণ করিলে কন্যাকর্তাকে ক্লেশ দেওয়া হয়, অতএব তোমরা এখন হইতে আর বরপণ চাহিও না।” কিংবা যদি গাল দিয়া বলেন “যে পণ গ্রহণ করিবে সে স্ত্রদখোর ও সম্ভান বিক্রেতা।” তাহা হইলে বরপণ প্রথার যে চির উচ্ছেদ হইবে এ কথা মানব চরিত্রের মাতেই স্বীকার করিবেন।

শি। এ সকল আলোচনা এখন নিম্নপ্রয়োজন। আমি বলিতেছিলাম আমার হাতে একটা পাত্র আছে।

কু। আছে? দর কত?

শি। হাজার টাকার মধ্যে করিয়া দিতে পারি।

কু। হাজার টাকা কোথায় পাইব, শিরোমান মহাশয়?

শি। কেন? তুমি ত পাঁচশত টাকা খরচ করিতে পার। বাকী টাকা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া পাইবে। তারপর মাসে ২৫ টাকা করিয়া দিলে ছুই বৎসরেই সে টাকা শোধ হইয়া যাইবে।

কু। বিষয়টা অতি নিপুণতার সহিত বুঝাইয়াছেন। টাকাটা ত নগদ পাইলাম। তারপর?

শি। তারপর আর কিছুই না। পাত্র হাজার টাকা পাইলেই সম্বষ্ট হইবেন। তাঁর পূর্বপক্ষের জীর অকঙ্কারাদি অনেক আছে। সে সব আর তোমাকে দিতে হইবে না।

কু। পাত্রটা দোস্তবরে?

শি। দোস্তবরে ঠিক নয়। একটা তাঁর চতুর্গ পক্ষ।

কু। পূর্ব পূর্বপক্ষের সম্ভানাদি বর্জনান?

শি। হাঁ। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিবাহিত। স্ত্রীপুত্র লইয়া সকলেই পৃথক সংসার করিতেছেন। গৃহবিবাদের কোন সম্ভাবনা নাই।

কু। তাহা হইলে পাত্রটির বয়স আশী বৎসরের কম নয়, দেখিতেছি।

শি। অত হইবে না। এই ভিত্তান্তর চলিতেছে।

কু। কি করেন?

শি। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করিতে হয় না। কালীঘাটে এদের বিবাহানি বাড়ী আছে তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়। বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তিনি ভোমার কন্যার নামে লিখিয়া দিবেন।

ক। তাইত, অতি মহাশয় ব্যক্তি ! পাত্রটীর নাম কি ?

শি। ত্রিবিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় !

ক। কাশীঘাটের বেঠা ! সে যে একটা পাঁড় মাতাল !

শি। হুঁ, মাঝে মাঝে একটু আদটু নেশা করেন বটে। তা সে কুসংসর্গে পড়িয়া। অনেকদিন হইতেই গৃহহীন। দেখিবার লোক কেহ নাই। এ অবস্থায় মানুষ একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। বিবাহ হইলেই সে দোষ শুধরাইয়া যাইবে। পাতিকে সম্পথে লইয়া যাওয়াও ত দ্বার কর্তব্য। এইখানেই ত শিক্ষার সার্থকতা।

ক। কিন্তু এ সার্থকতা লাভের অবসর ঘটিবে কি ? লোকটা ত হুচারি দিনের মধ্যেই মাথার শির কাটিয়া মারা যাইবে।

শি। এটা তুমি অতি অযৌক্তিক কথা বলিলে। বিষ্ণুবাবুর বয়স এতই কি বেশী ! লোকে বিরানব্বই বৎসর বয়সেও দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন সে খবর রাখ ? তাহার তুলনায় ইনি ত যুবা। এখনও শরীর বেশ দৃষ্টপুষ্ট।

ক। হাঁ, ভুঁড়ি বিপুলায়তন বটে।

শি। আর যদি তোমার কন্যার অদৃষ্টে বৈধব্য লেখাই থাকে তুমি কি তাহা খণ্ডন করিতে পার ?

ক। তাহা ত পারি না। কিন্তু আমি অতি মোহাক্ষ। আমার ঐ একমাত্র কন্যাকে ভাড়িকাঠে ফেলিয়া বিস্কুলোকে পাঠান, বা বেঠা মাতালের হাতে দিয়া জীবনের চরম সার্থকতায় নীত করা, ইহার কোনটাতেই আমার মন সরিতেছে না।

শি। বিষ্ণুবাবু সম্বন্ধে তুমি পূর্ক হইতেই মন বিস্বাদ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়া তাহার দোষগুলি তোমার চক্ষে পড়িতেছে। কোন মানুষের প্রতি এরূপ অকারণ বিদ্বেষ ভাল নহে। সকলের মধ্যেই ভগলান আছেন।

ক। আমি বাহিরের মানুষটিকেই খুঁজিতেছি। ভিতরে ভগবান্ না থাকিলেও আমার চলিবে।

শি। তোমার মনের মত পাত্রই বা কোথায় পাইবে, শুনি।

ক। একটা পাত্র আছে। ছেলেটা Assistant Engineer, বয়স ছাব্বিশ সাতাইশ, যেমন কার্তিকের মত রূপ তেমনি হৃদয়, সরল ব্যবহার। যদি অনুমতি পাইত—

শি। এ ছেলে ত হীরার দরে বিকাইবে। তুমি ইহার কাছে ঘোঁসিতে পারিবে ?

ক। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় পাত্রটা জীবন্ত পুরুষ মানুষ। পিতৃভক্তির আঁচ লাগাইয়া জড়পদার্থ বনিয়া যায় নাই। ইহাকে হীরার টুকরার মত খপ্ করিয়া নিক্তিতে চড়ান সহজ হইবে না।

শি। তবু কন্যাকে সাজাইয়া দান করিতে হইবে ত।

ক। সে কথাও হইয়াছিল। তিনি বলিলেন “জীকে সাজাইবার ভার আমার, আপনাদের নহে। আপনার দত্ত অলঙ্কারে লোক চক্ষু বাঁধিয়া বেড়ান তাহারও গৌরবের হইবে না, আমারও না”

শি। এমন পাত্র ! এও সম্ভার ! কোথাও গলদ নাই ত ?

ক। কৈ গলদ ত কিছু দেখি নাই। রূপে, গুণে,—

শি। আমি এ সব গলদের কথা বলিতেছি না। তুমি বংশ, গোত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ সন্ধান লইয়াছ ?

ক। লইবার প্রয়োজন হয় নাই। পাত্রের নাম সত্যজ্ঞত ঘোষ

শি। কি বলিলে? সত্ত্বত—?

কু। ঘোষ।

শি। ঘোষ? গোয়ালা?

কু। না, Assistant Engineer.

শি। তুমি শিববন স্থিতিরত্নের পৌত্র হইয়া গোয়ালার ঘরে কন্যাসম্প্রদান করিতে চাও! তোমার হইল কি?

কু। স্মৃতি হইল।

শি। ইহাকে তুমি স্মৃতি বল? হিন্দুব বিবাহে এত যে বৈধবৈধি ব্যবস্থা তাহা কি শাস্ত্রকারগণের একটা গাঁজাখুরি বলিতে চাও?

কু। সে কথা বলি কেন সাহসে?

শি। তবে কোন বুদ্ধিকে অত্রাক্ষণে কত্যা সম্প্রদান করিয়া পাক্ত হইতে চাও?

কু। পতিত হইব কেন?

শি। কেন “হীরতে হি মতিত্বাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ” এ কথা মাস কি না?

কু। মানি বৈ কি। মানি বলিয়াও ত বেটী মাতালকে ছাড়িয়া সত্য ঘোষের উপাসনা করিতেছি।

শি। বিষ্ণুচরণ বাবু নীচ হইলেন! তিনি কতবড় কুলন তা জান? স্বয়ং কামদেব পণ্ডিতের বংশ।

কু। বংশের সহিত ত কত্যা বিবাহ দিতে পারি না।

শি। বিষ্ণুবাবু বা ছোটাকস? তোমরা ত পাঁচ পুরুষে ভঙ্গ। তিনি এখনও স্বভাবে আছেন।

কু। তাঁহার স্বভাব ত মাতলানী।

শি। বার বার ঐ একটা দোষের উল্লেখ করিতেছ কেন? সংসারে নিষ্পাপ কে? তোমরা জীবনে কোন পাপ কর নাই?

কু। অনেক করিয়াছি। মেয়েটাকে অপাত্রে দিয়া সেই পাপের মাত্রা আর বাড়াইতে চাহি না।

শি। তোমার মতে ব্রাহ্মণ অপাত্র, আর গোয়ালা হইল সম্পাত্র! তোমার স্পর্শক ত কম নয়! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে জান? যিনি ব্রাহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ; যজন, বাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন যাঁহার কার্য্য তিনিই ব্রাহ্মণ; সমস্ত বিষয় বাসনা বিসর্জন দিয়া, কামক্রোধাদি কর্তৃক অল্পহত চিন্তে তত্ত্বজ্ঞানের অতুসন্ধানে জীবন অতবাহিত করা যাঁহার ব্রত তিনিই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ এক সময়ে হিন্দুগণের শিরোভূষণ ছিলেন। সংসারধরণীর অধিপতি রাজচক্রবর্তীগণ বিনত মুকুটমাণিক্যালোকে ইহাদের চরণাবিন্দ সমুদ্রাসিত করিয়া কৃতার্থ হইতেন। অনাদি কাল হইতে ভৃগুদেব নামে অভিহিত সেই ব্রাহ্মণকে তুমি আজ হীন, নীচ, অপাত্র বলিলে! কি বলিব, এখন ঘোর কলি। তাই তোমার রসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না।

কু! বেটীর এত গুণ ইহা ত পূর্বে জানিতাম না।

শি। বেটীর প্রতি এত আক্ৰোশ কেন? তুমিই বা ব্রাহ্মণ কিসে? তুমি কি তিন সঙ্খা গায়ত্রী পাঠ কর?

কু। আমি ত ব্রাহ্মণ নহি। এবং এই কারণে অত্রাক্ষণে কত্যা দান করিতে আমার কিছুমাত্র বিধা নাই।

শি। ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলেও তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার ধর্ম্মপীঠে এখনও ভরদ্বাজ মুনির রক্ত প্রস্রাবিত হইতেছে। ঘোষপুত্রেরা কি গুণ আছে, শুনি?

ক। কেন? কন্যার কাম্য রূপ, নাতার কাম্য বিন্দু, পিতার কাম্য শ্রুতি, সবই আছে। উপযুক্ত ভোক্তা মিলিলে মিষ্টানেরও অভাব হইবে না।

শি। একল গুণ কি ব্রাহ্মণের ঘরে চুলভ?

ক। ব্রাহ্মণের ঘরে চুলভ নহে। গোয়ালার ঘরেও সুলভ দেখিতেছি।

শি। তাহাও যদি হয়, তবু ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া গোয়ালার খাঁজাতছ কেন?

ক। স্থানান্তর গোয়ালার ছাড়িয়া অনিশ্চিত ব্রাহ্মণ গৃহেতে যাই কেন?

শি। তোমার মতে জাতিভেদ প্রথাটাই তাহা হইলে আশ্চর্য। কিন্তু জগতের কোথায় জাতিভেদ নাই? ভারতবর্ষ মহামণ্ডল। ক মহাসভা প্রচার করিয়াছেন জান? সেই মহাসভা এই যে বৃন্দলতাকাটপতঙ্গাদির মধ্যে জাতিভেদ আছে। যথ;—উদ্ভিদ রাজ্যে তুঙ্গী, উদ্ভব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ,—

ক। রক্ষা করুন, উদ্ভবের সাহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত নহি।

শি। বিবাহ দিতে বাগতেছি না। আমি শুধু দেখাইতেছি জগতের সর্বত্র বর্ণভেদ আছে।

ক। সেজন্য এত পরিশ্রম করিয়া ভারতবর্ষ মহামণ্ডলে যাইতে হইবে কেন? আপনি বলিলেই বুঝিতে পারিব উদ্ভব বৃক্ষ ব্রাহ্মণ, এবং বেষ্টী মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি ত কন্যার ব্রাহ্মণ আয়োজন করিতেছি না যে ব্রাহ্মণ না হইলে কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমি তাহার বিবাহ দিব, একটা সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছি।

শি। তোমরা হইপাতা ইংরাজী পড়িয়াই জাতিভেদের উচ্ছেদ করিতে চাও। জাতিভেদ থাকিতে দেশের কত কল্যাণ হইয়াছে জান? বংশানুক্রমে এক কাজ করিয়া তাহাতে দক্ষতা লাভ করা যায় এ কথা তোমাদের গুরু ইংরাজও অস্বীকার করিবেন না।

ক। আমিও অস্বীকার করিতেছি না। আমি নিশ্চয় জানি পিতৃপিতামহের ব্যবসার অবলম্বন করিলে সত্য যোগ চক্ষে যেমালুম ভাবে জল মিশাইতে পারিত। আমিও তাহা হইলে অন্য পাত্রের সন্ধান করিতাম।

শি। তুমি বলিতে চাও আপন আশ্রয় বাবসা ত্যাগ করিয়া সকলেই Assistant Engineer হউক।

ক। এমন কথা বলি নাই।

শি। আর বলিতে বাকী রাখিলে কি? কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। গুণকন্ধ্যাত বর্ণভেদ হইবেই।

ক। হইয়াছেও। যেমন আমাদের দেশে উচ্চবর্ণ বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি এবং নিকৃষ্টবর্ণ যত চাটুযো পাউরুটি ওয়ালা, মধু বাঁড়ুযো পাচক প্রভৃতি।

শি। অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণ যে বর্ণভেদের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং মহাজনগণ যে বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য, কেবল তোমার বণিত বর্ণভেদই গ্রাহ্য। তোমার মতে ভারতের তাবৎ লোকই ভ্রান্ত। তুমিই কেবল ঠিক বুঝিয়াছ। কেবল তোমার বুদ্ধিই অনাবিল। আর কি বলিব? নিজের বুদ্ধিতে চলিয়া অধঃপাতে যাও।

ক। তবে চলিলাম।

শি। থিক্!—একটা কথা,—সত্য যোগকে ত জামাতা করিবে। কিন্তু কোনদিন তোমার কন্যার আহাৰ্য্য কালে তিনি যদি অকন্ধ্যাৎ সে স্থানে উপস্থিত হন?

ক। ক্ষতি কি?

শি। কৃতি কি? শূদ্রের চক্ষু হইতে এক প্রকার magnetism নির্গত। ইহার সহিত মিশ্রিত হইলে অন্ন বিষময় হইয়া উঠে, এ কথা তোমার জানা নাই।

কু। সত্য না কি, শিরোমণি মহাশয়? একথা ত জানা ছিল না। তবে আপনার উপদেশই শিরোধার্য্য করিলাম। এখন বেশ বুঝিতেছি বোধপুঞ্জের নেত্রবিগলিত দৃষ্টির সহিত ম্যাগনেটিস্মের ধারা প্রপাত অগ্নের সহিত উদরসাৎ করিয়া আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সুস্থশরীরে বেঠার শ্রীকৃষ্ণখণ্ডসারিত সুরাসুরভি সমুদ্রমানে নিভান্নান করা আমার কন্যার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

শি। তোমার এই ধর্ম্মভাব দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। কিন্তু একটা বড় বিষ দেখিতেছি। Patel bill পাশ হইতে বসিয়াছে। একবার পাশ হইয়া গেলে অঘরে কিম্বাহ দেওয়াই আইন হইবে। তখন সর্ব্বশ্ব পণ করিলেও আর বিক্ৰচরণকে জামাতা রূপে বরণ করিতে পারিবে না।

কু। এখন উপায় কি, শিরোমণি মহাশয়?

শি। আর্ন্তনাদ। আমরা হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি। Consent bill পাশ হইবার দুর্দিনে বাংলার আট কোটা নরনারী কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল “ধর্ম্ম যায়!!” আজও ধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আজও গগনম্পর্শী আর্ন্তনাদের প্রয়োজন। যদি উক্ত বিল পাশ হইয়া যায় তখন এ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই চলিবে। কিন্তু পাশ হইবার পূর্বে, এই ধর্ম্মকে কিছুতেই লোপ পাইতে দিব না। ইহা লোপ পাইলে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইব।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

## প্রামোদ্যাদ।

— :: —

(Shelley)

প্রথম মধুর            তন্দ্রাটুকুর  
আবছায়া-ঘোরে, মোর  
সুম ভাঙে যবে        দেখিতে দেখিতে  
স্বপ্ন-প্রতিমা    তোরা—  
ধীর সমীরের    মৃদু-নিশ্বাসে  
শিহরে তখন রাতি,  
আর, আকাশে চড়ানো    তারায় তারায়  
কাঁপ লো কনক-ভাতি।

তুহারি-স্বপন মাঝখানে জাগি'  
 চমকি' উঠিয়া পড়ি ;  
 কে-জানে কেমন কে-যেন অমনি  
 চরণে বাঁধিয়া দড়ি,  
 টেনে টেনে টেনে

আমারে লইয়া আসে  
 অগ্নি প্রেমময়ি, তোরি এ মুক্ত  
 বাতায়নটীর পাশে ।

ঢুলে ঢুলে পড়ে মদির সমীর  
 ঘন-ভিমিরের বুক—  
 স্তব্ধ নীরব তটিনীর কোলে  
 ঢুলে পড়ে গাঢ় স্নেহে ;  
 চাঁপার স্রবাস করে—  
 স্বপ্নে মধুর কল্পনা যথা  
 সজ্জিত থরে থরে ।

পাপিয়ার যত গান,  
 তুলি' তরঙ্গ যামিনীর বুক,  
 সে-বুকেই পুনঃ লুটাইয়া স্নেহ,  
 লভে, আহা, অবসান—  
 আনিও যেমন অগ্নি প্রণয়িনি মোর  
 মরণে মিলাব লুটায়ৈ হৃদয় তোরা ।

বিছানো ঘাসের বিছানা হইতে  
 এ-তনু তুলিয়া ধর—  
 মোহে মুরছিয়া মগ্নি বুঝি এইবার ;  
 ও-প্রেম-বারিদ গলায়ে, সখিরে,  
 চুস্বন-বারিধার  
 বৎস কর অধরে ও মোর  
 অঁধি-গল্পব-পর ;



পাংশু শীতল গগু আমার, হায়,  
বুকের ভিতরে ক্ষত-তালে নাচে প্রাণ-  
ও-কোমল-হৃদি কমলে ইহারে  
চাপিয়া ধরিবি আয়,  
মিলন-পুলকে ফেটে হই খান্ খান্ ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

## বেদনার স্মৃতি ।

—:~:—

( ১ )

সেন্টপল গির্জার পাশের বাড়ীখানাতেই সেই বুড়ো বাস করত । গির্জাতে যখন প্রভাতীসন্ধ্যাত অন্ধ হ'ত বুড়োও তখন শয্যা ছেড়ে সে দিনের কাজের ভিড়ে তন্ময় হ'য়ে পড়ত । কাজ ছিল শুধু টাকা ধার দেওয়া আর উঁচু হারে সুদ লওয়া । তার বুড়োকে ‘ইহুদী সাইলক’ নামেতে হঠকয়েছিল—পাড়ার ছেলেদের দৈনিক কাজ ছিল বুড়োর সমালোচনা । শুধু সমালোচনা নয়—বুড়ো যখন সেই কালো মিশ্মিশে টুপিটা মাথার দিখে, গায়ে পাদরীর মতন ময়লা একটা টিলা পোষাক পরে তার পুরাণো লাঠিখানার উপর তর দিখে ধীরে ধীরে পথে হেঁটে চলে যেত, তখন কত বাড়ীর জানালার মধ্য দিখে যে নিঃশব্দ, ময়লা ঐ সাদা ধবধবে মাথার উপর পড়ত তার গণনা হয় না । বুড়োর কিন্তু তাতে মোটেই লক্ষ্য ছিল না—সেই ছেঁড়া ময়লা পোষাকের কাপড় দিয়েই মাথাটাকে মুছে, যেমন চলেছিল তেমনি চলে যেত ।

অধমর্ণের দল যখন এমন উত্তমর্ণের নিকট এসে কিছু সুদ ছেড়ে দেবার জন্ত চোখের জলে বুড়োর নীরল কঠিন প্রাণটাকে একটু সরস, নরম করতে চাইত, তখন কিন্তু বুড়ো শুধু এক গম্ভীর ‘না’ উত্তর দিয়েই তার রসহীন এবং নিষ্ঠুর স্বভাবটাকে মূর্তিমান করে তুলত । যুথের সে ভাব দেখে কারো আর দয়া ভিকার অন্য দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস হ'ত না । হতভাগারা শুধু সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুঁজি পাটা বা কতক সব নিঃশেষ করে’ অগণশোধ করত । আর বিষন্নতার কাল ছাপ মুখে নিয়ে বাড়ী গিরে আসত । কেউ কি এমন নিষ্ঠুর হৃদয় বুড়োর কাছে সহজে আসত ?—নিভাত্ত নিরুপার হয়ে, বিপদে পড়লে তবে এসে এর দ্বারে হাত পাতত । বুড়োও তখন হাতের মুঠোতে পেয়ে তার রক্ত শোষণ করতে ছাড়ত না । সকলে তাকে সাথে কি ‘ইহুদী সাইলক’ বলত ? বুড়ো যখন সুদের টাকাগুলো এক এক করে গণতে শুরু করত—তখন দস্তশূন্য যুথের হাসির মাঝেও যেন কি রকম একটা জ্বর তাব ফুটে উঠত । হুঁং হুঁং হুঁং শব্দ ক্রমাগতই যেন তাহার কর্ণকুলে বীণাধ্বনির মতন বেজে উঠত ।—আর ওদিকে অধমর্ণের এক একখানা বুকের পঞ্জর ভেঁদে ওঁড়ো হ'য়ে যেত । বুড়োর আসল নামটা ছিল ক্রোটাস্ । যেমন বুড়ো নিজে বিদ্যুটে স্বভাবের, তার নামটাও ছিল স্নেহপূর্ণ । বুড়ো কিন্তু সার্বদা জন্ত মোটেই কেয়ার করত না—যে ইচ্ছে সাইলক বলুক—যে ইচ্ছে ক্রোটাস্ বলুক, তাতে সে মোটেই রাগ

করত না—শুধু হাসত। কিন্তু সব হাসি, সব আমোদ ঐ সকাল বেলার টাকা শোধের সময় যেন কি রকম একটা গাঙ্গার্যো মিলিয়ে যেত। বুড়োর আর একটা রোগ ছিল সে রাত্রে বের হত না—যাদও কোনদিন তাকে রাত্রে দেখা যেত, তা কদাচিৎ। জিজ্ঞাসা করলে বলত চাঁদের আলো বড় ঠাণ্ডা, তার সহ্য হয় না। বুড়োর সবই ছিল ষাপ্ছাড়া অদ্ভুত রকমের—কেমন রহস্যজনক। লোকে বলত বুড়ো নাকি বেশ জামিয়েছে—দশ বার লাথু হবেই—কার্পণ্য দোষ কেবল তাকে একটা পাইও খরচ করতে দেয় না। বুড়ো নাকি গভীর রাত্রে আলো জ্বলে সঞ্চিত স্ত্রী গণনা করত, আর থলিগুলো আরও কসে বাঁধত, রাতটা তার উপর শুয়েই কাটিয়ে দিত। ছেলেরা যখন জিজ্ঞাসা করত “আচ্ছা সাইলক”, এত যে জামিয়েছ—তাকি যাবার বেলা নিয়ে যেতে পারবে? আর যাবার সময়ও ত ঘানয়ে আসল, চুকাল গিয়েছে—তিন কালে ঠেকেছ। বুঝা সফর ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, খেয়েদেয়ে আমোদ করে, দিন কটা কাটিয়ে দাও। কেন নিজকে কষ্ট দিচ্ছ!” বুড়ো শুনত এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত অন্যটা দিয়ে। আর হাসত, কিন্তু হাসির সঙ্গে কি করুণ মর্মস্পর্শী দীর্ঘ শ্বাস বোরয়ে বাতাসে মিশে যেত?

অর্থের আনন্দের মাঝে তবে কি কোন বিষ লুকান আছে?

( ২ )

যুবকদের সকলেই বুড়োকে বিক্রপ করত, বাক্যবাণ বিদ্ধ করতে কেউ ছাড়ত না। কিন্তু হার্বার্ট ছিল শান্ত, শিষ্ট, ধীর যুবক—বুড়োর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, সে বেশ শিষ্টভাবে কথাবাত্তা বলত, কুশল জিজ্ঞাসা করত। বুড়োও এই ছেলেটিকে আদর বদ্ধ করত, পথে দেখা হলে হৃদয় দাঁড়িয়ে কথা চলত।

হার্বার্ট সেদিন রাত্রে হোটেল থেকে ভোজন করে ফিরছিল। মনের স্মৃতিতে গান গাইতে গাইতে হার্বার্ট ঠিক গোরস্থান এসে পড়ল। চাঁদ উঠেছে জ্যোৎস্না গোরস্থানটিকে বেশ জাঁকাল করে তুলেছে, বেশ একটু শীতও পড়েছে, রাস্তার বরফ পড়তে শুরু করেছে। গোরস্থানের দিকে চাইতেই সে যেন কি একটা দেখতে পেল। তাইত! ঐবে কি একটা পাথরের উপর বসে! সাদা পোষাক। এমন সময়ে কে এখানে এমনভাবে বসে! কোন সাদা-শব্দ নাই—যেন একটা জড়পিণ্ড। যুবক কৌতূহল বশে, এক পা ছ’পা করে তার সামনে গিয়া দাঁড়াল—যেন ধস্ত-চালিত হয়ে। বুড়ো ক্রোটসমূখমুখে চেয়েই বলে “কে? হার্বার্ট, বসো।”

“আপনি এখানে এমনভাবে রাত্রে বসে রয়েছেন, চাঁদের আলো না কি আপনার অসহ্য?”

“তা কি করব, আজ বে আমার অভিসার! কিছুতেই তাই আমাকে ঘরে ধরে রাখতে পারে নি।”

“অভিসার? তা—কি?”

“কেন অভিসার বুঝলে না? আজ বে আমার তার সঙ্গে এখানে মিলন হবে! আজ আমার মজা উৎসব।”

“ক’র সঙ্গে?”

“আমি থাকে ভালবাসি—কেন বুড়ো বলে কি এ-ছদ্মবেশে এক সময়ে প্রেম, ভালবাসা ছিল না?”

বুড়ো একটু থেমে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলো।

“হার্বার্ট, চেয়ে দেখ, ওই বে একটা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। ওটা এট কিছুকণ হ’লো আমার মাথার পুরে ছিল। এই বে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, এটাও কি সব সময়ই ঠিক এক ভাবেই চলছে? কখনও ধীর, কখনও প্রবল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বে চাঁদ রয়েছে ওটাও মাঝে মাঝে মেঘের বৃকে ডুবে যায়—জোছনাও কালো হয়ে যায়। এই তো কিছুকণ হ’লো আমি সহরে ছিলাম, কিন্তু এখন এখানে। তুমি ত আর এখানে আসবার জন্যে আসনি—কোথার যেতে কোথায় এসে পড়েছ। তাই বলছি জগতটার মধ্যে মিনিটে মিনিটে পরিবর্তনের স্রোত

বেশ "বল হ'য়ে বয়ে যাচ্ছে। আজ তুমি আমোদে রয়েছ—আজ তোমার ক্ষুধার্তন জীবন, আজ তোমার কাছে থরা যা বলে বোধ হচ্ছে কিন্তু এমন দিন হয় ত আসতে পারে যে দিন হার্বার্টও ঠিক এরই একটা কিছু উন্টা হ'য়ে যাবে। আমার জীবনেও এরি একটা পরিবর্তন হ'য়ে গেছে—আজ তোমরা আমাকে কুপণ বলছ, 'ইহুদী সাইলক' নাম দিচ্ছ,—আরও কত কি ভাবে জালাতন করছ। কিন্তু হার্বার্ট আমি কি কুপণ হ'য়েই জন্মেছিলাম, আমি কি সতাই ইহুদী? তা নয়, আমারও একটা বয়স ছিল, একটা সময় ছিল যখন কেউ আমাকে ইহুদী বলতে সাহস পেত না—আমিও হুহাতে টাকা উড়াইতাম—কুপণের স্বভাব মোটেই ছিল না আমার। সেই এক সময় এখন কালের স্রোতে কোথা ভেসে গিয়েছে!—সকলই ঐ সর্বস্বান্তার বিধান—সকলই তাঁহার ইচ্ছা। যাক, বড় ফেনিয়ে তুলছি,—আমি যে এই সহরেই একজন ফলবিক্রেতা ছিলাম, তা বোধহয় তোমাদের কেউ জানেই না। তখন তোমরা ছিলে না—তখন যারা ছিল, যাদের নিয়ে আমোদ করেছি তারা আজ কোথায়? ফল বিক্রয় করতাম—নানা রকমের ফল; সেই কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় অস্ট্রেলিয়া, কোথায় আমেরিকা, কোথায় আফ্রিকা পৃথিবীর প্রায় সব স্থান থেকেই আমার দোকানে ফল আসত। যে ফল অন্য কোথাও পাওয়া যেত না তা শুধু আমার ওখানেই পাওয়া যেত। তাই আমার অনেক সম্রাস্ত লোকের সহিত পরিচয় ছিল। দোকানে বসেই কত লর্ড, ডিউকের দেখা পেতাম। আমিও তখন নিজেকে খুব উঁচুনে যাচাই করতাম—ফলবিক্রেতা ছিলাম বলে কি! মনে হ'ত আমার মতন সৌভাগ্যবান লোক অতি বিরল। যখন এত বড় বড় লোক এসে বলত, "ওহে ক্রোটসন্স, একটা ফল দেও তো" তখন আমার বুক যেন সাত হাত চওড়া হয়ে যেত—আমি হাসিমুখে বহুস্তে ফল তুলে দিতাম। জীবনটা চলেছিল বেশ কিন্তু একদিন কোথায় যেন কেমন করে হঠাৎ একটা স্থানে বাঁধা পেয়ে সব গুলটপালট হয়ে গেল। কি ছিলাম হয়ে গেলাম কি!

সে দিনের কথা আজও মনে আছে। থাকবে না কেন! সে স্থিতি কি সুছবার—সে যে জীবনের মহা পরিবর্তনের মুহূর্ত! সে দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—দস্তুর মত ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমি গরম পোশাক পরে—দোকানে বসে পথের দিকে চেয়েছিলাম। তাই ছিলাম আজ আর খন্দের আসছে না—এই দুর্ভাগ্যে কি কেউ আসতে পারে? চিন্তা স্রোতে বাঁধা পেল ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে। দেখি দ্বাবে একখানা ফিটন—ফোনও ডিউক হ'বে। আরোহীকে দেখে আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারলাম না—কারণ এর পূর্বে আর কোনও মহিলার গুত আগমন আমার দোকানে হয় নি! ডিউক অব আনিংটনের কন্যা যে আজ এমন দুর্ভাগ্যে আমার দোকানে আসবে—স্বপ্নেও মনে হয় নি। আমি যেন একটা কি হ'য়ে গেলাম! কি মতিচ্ছন্ন? চোখে চোখ! সিবাষ্টিয়ানের সুখ লাল হ'য়ে উঠল—চোখের পাক্সা নেমে আসল! স্নানধুর মৃদুস্বরে একটা কথা বের হ'লো "করেকটা ফল দিন।" আমি ফল দিতে অগ্রসর হ'লেম, যতবার দেই ততবারই হাত কঁপে ফল পড়ে যায়, তার পরে মনে নাই কি করেছি, সবই গোল হ'য়ে গেল। যখন আবার আগেকার মতন চেয়ে দেখলাম—বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—সিবাষ্টিয়ানের ফিটনের চাকার দাগ রাস্তার কান্নাতে বেশ ফুটে উঠেছে, তা কালে মুখে মিলিয়া বাবে কিন্তু স্মরণ মধ্যে যে একটা দাগ রেখে গেছে তা কি সুছবার না মেগাবার! হার্বার্ট তুমি ভাবছ সব আজওঁবি—সব মিছা! আমিও অনেক সময় ভাবি যে এরূপ একটা অভাবনীয় ব্যাপার কেমন করে বন্য়ার তলের মতন এসে আমার জীবনের এক কূল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল। হার্বার্ট, বোধহয় ভাল লাগছে না, আর বিশ্বাসও হ'চ্ছে না? বুড়ো হয়ে গিয়েছি, মাথার চুল পেকে গিয়েছে, পাগলের মতন এক আরব্যোপন্যাসের গল্প কেঁদে বসেছি। মনে হ'চ্ছে না হার্বার্ট? আর তা' না হ'লে মনে হ'ছে বোধহয় আমি কোনও নেশার ভরপুর হ'য়ে এলাপ বকে বাড়ি; আজ, তার পরে কি জানি বলছিলাম?

ভাবি কি রকমে জীবনের এক কূল ভাসিয়ে নিয়ে গেল! যাক্ অদিক বলে কাহিনীটাকে বদ্বীচড়া করার দরকার নেই। তারপর, শোন হার্বার্ট, সিবাষ্টিয়ানের সেই প্রথম সাফাতের পর আমি আর সেই ক্রোটস্ রইলাম না। প্রত্যাহই দোকান খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতাম। খেদের এসে বার বার ডেকে বিরক্ত হয়ে চলে যেত—ক্রেতার সংখ্যা ক্রমে কমতে লাগল। হাঁ করে রাস্তার লোকের মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম, আর যত গাড়ী যাতায়াত করত মনে হত এই বুঝ আবার সিবাষ্টিয়ান আমার দোকানে এসে স্নানধূর স্নরে বলবে—“আজ আগার এসেছি—কয়েকটা ফল দিন।” একদিন সিবাষ্টিয়ানের সেই ফিটনের স্বপ্নই দেখছি—আর পথ পানে চেয়ে আছি—সত্য সত্যই দেখলাম তারই ঘোড়ার মতন একটা ঘোড়াকে উদ্ধ্বাসে লাফাতে লাফাতে আসছে! সর্বনাশ! ঘোড়াটা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল—সাধ্য কি চালকের তাকে তখন বশে আনে,—সকলে ভয়ে হৈ চৈ করে ঘোড়াটাকে আরও উদ্ভেল করে তুলছিল,—মনে হচ্ছিল মুহূর্ত্ত পরেই ফিটনখানা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে। আরোগীর জীবনের আশা তখন সর্ব-শক্তিমান পরমেশ্বরের হাতে। আমার যেন কি একটা মনে হ’ল, কেমন হয়ে গেলাম—দোকান থেকে পাগলের মতন দৌড়িয়ে গেরিয়ে পড়লাম। —সম্মুখে ঘোড়াটা বায়ুবগে অগ্রসর হচ্ছিল। ভীক্লোকগুলো আমার এই পাগলামী দেখে সমস্তের চাঁৎকার করে উঠল—“ক্রোটস্ পেছিয়ে পর, পেছিয়ে পর। দেখছ না ঘোড়া আসছে?” স্বয়ং ভিনেই বোধহয় আমার সহায় ছিলেন তাঁর ভদের কথায় কান না দিয়ে, গিয়ে একেবারে ঘোড়ার বক্সা ধরে ফেললাম—সহসা গতি রোধ হওয়ায় ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে শিক-পায়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফিয়ে উঠলাম ঘোড়াটা তখন একটা ভীষণ চিহ্নি-হিঁ-হিঁ শব্দ করে গাড়ীখানা উল্টে ফেলে দিতে চাইলো। বক্সা ধরে বুলে পড়লাম, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ঘোড়ার লাগাম তখন সেইসের হাতে দিয়ে আরোগীর দিকে অগ্রসর হলাম; আরোগীর প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা, সজোরে গাড়ী হতে বের করে তাকে কাঁধে তুলে নিলাম। একি! এষে—আরোগী নয়,—আরোগী সিবাষ্টিয়ান। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই—লোকে বলে আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম—তারি বাসায় রেখে গিয়েছে।

দিন পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিখান খুলেই দেখি—একি!

প্রিয়তম ক্রোটস্,

এ জীবন তোমার কুপায়ই ফিরে পেয়েছি—এ জীবন তোমারই। গত রাতে এক স্বপ্ন দেখেছি—তুমিই নাকি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলে—তাঁই এ জন্মেও একটা দূত দ্বীপন আমাদের উদ্ধরকে বেঁধে ফেলেছে। জন্মান্তর বিশ্বাস কর? আমি কিন্তু খুব করি। কিন্তু এ জন্মে মিলন অসম্ভব—একটা নয়া বিষ প্রান্তরোধ করছে। তুমি ফল বিক্রেতা—আমি ডিউক কন্যা। এ জগতে যদিও অসম্ভব—কিন্তু জীবনের পরগারে—আমরা এক হ’ব—চির মিলন সেখানে—এখানে নয়। এ জন্ম আমি চির কুমারী থেকে কাটিয়ে দিব।”

হিঁতি তোমার—সিবাষ্টিয়ান।

সে দিনই মনে জাগতে লাগল “তুমি ফল বিক্রেতা—আমি ডিউক কন্যা।” ততো কথা যেন সুতীক্ষ্ম হৃদের মতন হৃদয়ের প্রতি কাণে আঘাত করতে লাগল। মনসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ফল বিক্রেতা বলে আমি জগতে এত ঘৃণা, ফল বিক্রেতা কি মানুষ নয়? শুধু এট জনাই কি উভয়ের মিলন অসম্ভব? এ দেশের ডিউক, লর্ড, ত যাদের টাকা আছে তারাই হতে পারে—কেবল টাকা নিয়ে সম্পর্ক, আচ্ছা,

আমিও কি পরিশ্রমে বিস্তর টাকা সঞ্চয় করতে পারি নে? এই চিন্তা হতেই—দোকান-পাট বন্ধ করে, 'টু লেটে'র এক ছাপ ঘেরে অষ্ট্রেলিয়াতে চলে গেলাম। হার্বার্ট, বড় রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ শোন গির্জার ঘড়িতে ছুটা বেজে গেল। সংক্ষেপে বলে ফেলি—পাগল যখন বাঙাল হয় তখন আর তার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। বাক, অষ্ট্রেলিয়াতে সোনার খনীতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এমন কি তারপরে একটা খনীর স্বত্বাধিকারী পর্যন্ত হ'য়ে খুব টাকা জমিয়ে, মৃত্যুর থলিগুলো কাঁধে ফেলে—পাঁচ বছর পরে আবার এখানেই হাজির হ'লাম। এসেই শুনি আলিংটনের কন্যা চিরকুমারী সিবাষ্টিয়ান কয়েক মাস হ'ল ক্ষয়রোগে মারা গিয়াছে। শুনেই বসে পড়লাম। হা অদৃষ্ট! সিবাষ্টিয়ান তো তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে—আমি করলাম কি? এই যে বিস্তর নিয়ে এসেছি এও তো তার জন্তাই—তবে এই টাকাগুলোও তারই কোন স্মৃতি রক্ষার জন্ত ব্যয় করা উচিত। তখন থেকে যেন কি হয়ে গেলাম—আবার অর্থালিপ্সা হলো—এবার শুধু মৃত সিবাষ্টিয়ানকে পাবার জন্ত তাকে জীবিত করবার জন্ত। কেবলই মনে হ'ত এমন একটা স্মৃতিস্তম্ভ তার কবরের উপর তৈয়ের করতে হবে যেন সে জগতে পুনর্জীবিত হয়ে, বিরাগ করতে পারে। তাই হার্বার্ট—আমি আজ সাইলক, আজ রূপণ; ওই চেয়ে দেখ, নৈশ নিস্তরতার মাঝে অনন্ত নভোমণ্ডলের নিম্নে চন্দ্রালোকে আলোকিত হ'য়ে সিবাষ্টিয়ানের কবরের উপর সৌধ জেগে উঠছে হার্বার্ট বল, তুমিই বল, এখনও কি আমি রূপণ, এখনও কি আমি নিষ্ঠুর, কঠোর—ইহুদী সাইলক? সিবাষ্টিয়ান আর আমি ওখানে বিশ্রাম করব—সংসারশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, গিয়ে সিবাষ্টিয়ানের বাহুর উপরে ওখানে ঘুমিয়ে পড়ব। ওঃ রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে হার্বার্ট, অভিসারের সময় বোধহয় চলে গেল—বোধ হয় সে চলে গেছে। বাই দেখি গিয়ে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ফ্রেটসন্স উর্দ্ধ্বাসে পাগলের মত নগাশ্রাণের বক্ষের উপর দিয়ে দৌড়িয়ে, স্তম্ভরাঞ্জির পশ্চাতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। হার্বার্ট স্থাপুং স্থির হয়ে এক দৃষ্টে বৃদ্ধ যে দিকে গেল সে দিকে চেয়ে রইল, তারপর শিলাখণ্ড হ'তে উঠে একটা মন্মভদ্রী নিঃশ্বাস ছেড়ে, সহরের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল।"

দিন কয়েকের মধ্যেই গোরস্থানে একটা বিচিত্র উচ্চ সৌধ—প্রভাতসূর্যের সোনালী আভাষ বলসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সেন্টপল গির্জার ওই পাশের বাড়ীখানার সম্মুখে সাইন-বোর্ড স্থলতে লাগল—“এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া বাইবে।”

শ্রীহরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## আশ্বাস।

—:~:—

সে শুখাল মোর মুখ পানে চেয়ে

“এই যে গো আমি আছি!”

চিরদিন তারে দূরে দূরে খুঁজি

যে ছিল গো কাছাকাছি!

তাই ত আমার ভরে নাই বুক,

তাই ত আমার ঘূচে নাই দুখ,

তাই ত আমার খুঁজিতে যুঝিতে  
 কাজের হয়েছে হেলা,  
 নিমেষে আসিয়া শুধায় হাসিয়া  
 “এখনো পড়েনি বেলা ।”

## অভয় ।

— ❧ —

হাত দুটি ধরে সে কণিল মোরে  
 “চল ফিরে যাই ঘরে !”  
 কহিলু—“সুখের নফ্ট-নীড়েতে  
 ফিরিব কেমন করে ?  
 যাবনা, যাবনা, ফিরিয়া চাবনা  
 যেখানে জাগিছে ভয়”—  
 “অভয় বারতা শুনাব তোনারে  
 চল—আর দেৱী নয় !”

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ।

## ছিতে ফোঁটা ।

— ❧ —

ছবি জীবন্ত হয় ও চলে কখন ? যখন সমঝদার তার নিজের মনের বস—ভাবকে সমগ্র ভাবে জাগিয়ে তুলে’  
 ছবিটিকে দেখে । তখন ছবি একটা রেখা বা রঙের সমষ্টিমাত্র থাকেনা সেটির ভিতর তখন রঙের ও রেখার  
 অতীত এক অনীকসনীয় জিনিষ সুরের মত তাঁরা অনুভব করতে থাকেন—তখন তাদের কাছে ছবি একটা বাহ্যিক  
 রূপের ছবি নয় সেটা মনের ছাপ বা ভাব ।

কোন দেশের বা কোন কালের শিল্পকে একটা চূড়ান্ত বা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-শিল্প বলে ধরে থাকা চলে না ।  
 —কেননা, শিল্প কলার কোন শেষ নেই ; বিধাতার আশীর্বাদে মানুষের সৃষ্টি ধাতার সৃষ্টির মতই নব-নব ভাবে  
 ক্রমেই বিকাশ পেতে থাকে, তার শেষ নির্দেশ করলেই তাকে প্রাণে মারা হয় ।

শিল্পী মনের গতিশীল চিন্তা থেকে একটি বিশেষ ভাবকে তাঁর কলা-কোশলে দানা বাধেন যেটি বহুশত বৎসর  
 পরেও দর্শকের মনে প্রতিদিন নবীন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । কোন্‌ ওত মুহূর্তে সম্রাট শাহজাহানের মনে বে  
 তাজ নিখানের পরিকল্পনা জ্যোৎস্না-রাজের স্বপ্নের মত ভেসে উঠেছিল, তারি ফলে আজ শত শত বৎসর পরেও  
 তাজ দর্শনে বিশ্ববাসীর মনে নব নব রূপ-রসের সৃষ্টি হচ্ছে—এইখানেই শিল্প বিশ্বজনীন ।

অনেকে ভাবেন চিত্রে রূপ প্রকাশ করাই প্রধান কাজ যেহেতু ছবি বলতে একটা কিছু আকৃতির কথাই  
 প্রধানত মনে হয় ; আবার কেহ কেহ ভাব প্রধান ছবি ভালবাসেন । কিন্তু চিত্রে রূপের ভিতর ভাব-রসের বাস ।

—রূপের সঙ্গে ভাব হরিহর আত্মার মত ছবিতে বিরাজ করে। তবে, রূপের জন্যই প্রধানত ছবি নয়, তার ভাব প্রকাশই হ'ল আসল কাজ।

সাহিত্যের মত শিল্পের নানান ভাবের সমাবেশ দেখাতে গেলে সেটি ঝটিল হেঁয়ালীতে পরিণত হয়ে পড়ে। ( শিল্প হেঁয়ালী নয়। ) তাই আমরা দেখি জগতের শিল্প ইতিহাসে সর্বপ্রাচীন শিল্পীরা একটি কোন মূলগত ভাবকেই চিত্রে ভাষ্কর্য বা স্থাপত্যে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই ভাব সহজেই ফুটে উঠেছে। আবার আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র লন্ডন শহরের ( Impressionist School ) ভাবচিত্রের অভিব্যক্তিতে ছবি বাহ্যিক আকার বা রূপ এমনই তলিয়ে গেছে যে ছবির ভাবটি খুঁজতে গিয়ে বস্তুত অধীর হয়ে পড়তে হয়! এখানে কলা কৌশল ( technique ) শিল্প-কলাকে ( Fine art ) ছাড়িয়ে উঠেছে। এখন তাই ইতালীয় প্রাচীন চিত্রকলা বা মিশর প্রভৃতির প্রাচীন মূর্তিগুলির মত সরল সহজ প্রাণস্পর্শি ভাবের বাঞ্ছনা শিল্পের মধ্যে বড় দেখা যায় না।

শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বস্তুত শিল্পের কোন সংস্রব দেখা যায় না। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের যা-কিছু ছাপ তা তার শিল্পেই চিরকাল অমর হয়ে থাকে, তার জন্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। শিল্পীর শিল্পই তার জীবনের একমাত্র বড় পরিচয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কোনই মূল্য নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত শিল্পকলা আছে যাঃ রচয়িতার নাম বা জীবনী বিষয়টির অতল গর্তে নিহীত আছে।

শ্রী অসিতকুমার হালদার।

## সাক্ষ্য।

আজি মুখ চাওয়া মোর ফুরালো।  
তোমার অসীম করুণা লাভিয়া,  
তাপিত হৃদয় শুড়ালো ॥  
শ্রাবণের ধারা বর বর করে,  
তিশায়ে কঠিন বালুকা উষরে,  
তেমতি, এ জদি-মরুভূ আগারে,  
চিরতৃষা মম নিভালো ॥  
ছিছু পথ চেয়ে বসিয়ে।  
নিশি ভাগরনে আসে নয়ন,  
কখন ফেলেছি মুদিয়ে ॥  
ওগো বার মুখ চাহি প্রভাতে উঠিছু ?  
তোমার মোহন পরশ লভিছু,  
তব ব্যাথাহরা দিঠে, দুখ পাশরিছু  
প্রেম সরোবরে নাহিয়ে ॥

শ্রীমতী সরণী মৈত্রী।

## সেকালের বাঙ্গালীর বেশভূষা ।\*

বাঙ্গালীর বেশভূষা সেকালে কিরূপ ছিল ইহা আলোচনা করিবার অগ্রে, ছুট একটি পুরাতন বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

বৈদিকযুগ সম্বন্ধে সকলের ধারণা—তখন মূনিঋষিগণ বহুল পরিধান করিতেন। সে কথা সত্য্য চাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্নবস্ত্রের ব্যবহার ছিল না এমন নহে। তুলা, পশম ও শণের বস্ত্র নিম্নিত হইত। শণের বস্ত্রকে কোম বলাত। বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বেদে সূচী ও শীবনের কথা আছে। সুতরাং শেলাই করা বস্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মহাসংহিতায় তসর ও রেশমের উল্লেখ আছে। তসরকে কোষের ও রেশমকে পাট বলিত। মহাভারতীয় যুগে প্রথম চীনাংশুক চীনা রেশমের ব্যবহার ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু “বিষকোষে” লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি অমরকোষে চীনাংশুক কথা পাই নাই। অমরকোষ গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে লিখিত, হহাতে যে উল্লেখ নাই মহাভারতীয় যুগে তাহার ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে কর না।

মহাভারতীয় যুগে কিরীট, হার, অঙ্গদ, চক্রবাল, বলরাজদ, বৈদ্যু্যামণি, কুণ্ডল বলর, করে শঙ্খ, মণিময় স্বর্ণহার কিহিনী প্রভৃতি অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। পুরুষকেও সন্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মহাইঃ জ্বালঙ্কার উপহার-স্বরূপ দেওয়া হইত। এক, করে শঙ্খ ব্যতীত সকল অলঙ্কারই পুরুষে ব্যবহার করিত। যোগীসন্ন্যাসীরা অঙ্গন ও বহুল পরিধান আর সাধারণ লোকে শৌভ বসন, সূক্ষ্ম-বস্ত্র, রক্ত-বস্ত্র ও মহাইঃ বসন পারিত। স্ত্রীলোকেও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিত। সৈন্যকে বস্ত্র পরিহৃত এবং সম্ভবতঃ বস্ত্রের আকারে কোনরূপ জামাজোড়াও পারিত। বৌদ্ধযুগেই চহার নিদর্শন পাই।

কলিকাতার মিউজিয়মের ভহুৎগৃহে যে পাণরের রেল বা বেড়া আছে তাহাতে জাতকের চিত্র অঙ্কিত আছে ইহাতে পুরুষের পরিধানে আশ্রিতবস্ত্র থামা আছে। জামাগুলির নিম্নভাগ কৌচকান। নাভিদেশ উন্মুক্ত। কোমর হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত ঘাঘরা কোমরবন্ধ দ্বারা আবদ্ধ। এই কোমরবন্ধের দুই পার্শ্ব দুই পার্শ্বের মধ্য দিয়া প্রারম্ভিক পল্লী করিয়াছে। মস্তকে উচ্চীষ। প্রহরীদের গায়ে চোগা। পুরুষের কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে বলর, গলার হার, কাহারও কাহারও পরিধানে ধাত, ইহার ভাঁও গুলি স্পষ্ট। স্ত্রীলোকের গলার, মস্তকে, কর্ণে, বক্ষে, বাহুতে ও হস্তে, কটি ও চরণে অলঙ্কার আছে। ভহুৎ গৃহের তক্ষণ শিল্প অনুান দুই হাজার বৎসরের।

অমরকোষ হইতে জানিতে পারি পুরুষ মস্তকে মুকুট ও শিরোবস্ত্র, কর্ণে কর্ণবেষ্টন বা কুণ্ডল, গলার হার, কটিতে শঙ্খ ও চরণে নুপুর, বাহুতে কেয়ুর, অলঙ্কার ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোক লিমে চূড়ামণি, সিংহীতে বালজাভা, ললাটে ললাটিকা কর্ণে কণিকা, তালপত্র, গলার কণ্ডুবা ও মুক্তাবলী, দেহজঙ্ঘা বা শতাবলী, একাবলী মল্লভ্রমলা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হার, বাহুতে বলর, কেয়ুর, অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়ক, করতুণ, কটিতে মেথলা ও কিহিনী বা সূক্ষ্ম খটিকা, চরণে পদাঙ্গদ মঞ্জীর ও নুপুর পারিত।

বৌদ্ধযুগে ছাল নিম্নিত কোম, মৃগায়ামক রাকব, কার্পাসজাত চাদর, কোষজাত পটবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। সাধারণে বস্ত্র যুগ্ম ব্যবহার করিত, এইরূপ শৌভ বস্ত্র যুগ্মের নাম ছিল ইলগমীর। প্রাকালিত পট-বস্ত্রকে পজোর্প,



স্বল্প পট্টবস্ত্রকে কুকুল, উড়ণীকে প্রাবৃত্ত ও বহুমূল্য বস্ত্রকে মহাখন, লামান্ত্র বস্ত্রকে চেল বা অংগুত, শোভন বস্ত্রকে সূচেলক বা পট্ট এবং মোটা বস্ত্রকে স্থূল শাটক বলিত।

কঙ্কণ, আসন ও গাত্রবস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত। পরিধেয় বস্ত্রকে অঙ্গুরীয় বা অধাংগুত বলিত। ইহাই ধুতি বা পাজামা। উত্তরীয় বস্ত্রকে প্রাবার বা সংব্যান বলিত। ইহা দ্বারা সর্কাজ আবরিত হইলে প্রাবার ও স্বন্ধে বা গলায় ফেলিয়া রাখিলে উত্তরীয় বা সংব্যান বলিত। অঙ্গ আবরণের জন্য চারিটি পৃথক নাম পাওয়া যায় প্রচ্ছদ-পাট বা নিচোল, নীশার আপ্রপদীন ও চোল বা কুর্পাসক। ইহার মধ্যে আন্তিনবিহীন জামাকে চোল, আন্তিন-যুক্ত জামাকে নিচোল, মস্তক হইতে পা পর্যন্ত আবরণবস্ত্রকে আপ্রপদীন্ বলিত। নীশার কখনও উক্ষীররূপে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিত আবার গাত্রাবরণ রূপেও ব্যবহৃত হইত। সেনার বস্ত্রাদি নিম্নিত জামাকে কঙ্কুল বলিত। (১)

অঙ্গরাগের জন্য কুক্ষ্ম চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কপূর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। লোকে গন্ধ মালাদি দ্বারা অধিবাসন করিত। কখনও কখনও কতকগুলি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইত। লোকে গালে ও কপালে রঞ্জিত গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিত্র আঁকিত। নানা প্রকারের ফুলের মালা ব্যবহার করত, কেহ বা কেশে জড়াইত, কেহ বা শিখায় ঝুলাইত, কেহ বা বক্ষে ধারণ করিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে এইরূপ অঙ্গরাগ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে যে সকল খোদিত চিত্র আছে তাহাতে বৃত্তিতে পারা যায় সেকালে জড়ির কাপড় ও ছিট প্রচলিত ছিল। নর্তকীরা পাজামা ও পাশোয়াজ পরিত। সাক্ষীত্ব উপদ্রবগিরি ও অমরাবতীর স্তূপের চিত্র দেখিলে সেকালে যে পাজামা, চাপকান কোমরবন্ধ চাদর ও বুটের ন্যায় চর্মপাত্রকার ব্যবহার ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। সূর্য্য মূর্তিতে অধিকাংশ স্থলে বুটের ন্যায় পাত্রকা আছে ও জুতার অধিকাংশ (Cycle Hose এর ন্যায়) মোজাদ্বারা আবৃত। এই মোজার উপরিভাগের চুট পার্শ্বে V এর আকারে কাটা। সূর্য্যমূর্তি তিন্ন অন্যত্র ও কোথায় কোথায় পদে বুটের ন্যায় পাত্রকা বা উপানং আছে। বিষ্ণুপুরের মন্দির গাত্রে চিত্রে এইরূপ পাত্রকা দেখিয়াছি।

এইবার বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সেকালের বাঙ্গালীর বেশভূষার উপাদানের বিবরণ আলোচনা করিব।

আমি যে সকল পুরাতন কবির গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিত প্রণীত শূন্য-পুরাণ সর্ক্যাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার বয়স্ক্রম অনুমান হয় শত বৎসর। ইহাতে অলঙ্কারের মধ্যে অঙ্গুরী, টাড়, বালা ও কঙ্কণের নাম পাই। বস্ত্রের মধ্যে স্থূল বস্ত্র, নেতর ধুতি, নেতর বসন, নেতর সূতী, পাট ও জোড়া কথা পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ‘নেত’ কথার অর্থ লিখিয়াছেন ‘ছিন্নবস্ত্র’। যেখানে ‘নেতর পতাকা’ আছে, সেখানে এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু নেতর ধুতি, নেতর বসন স্থলে এ অর্থ অসঙ্গত হয় না। (২) খ্রীষ্টাব্দ দশ শতাব্দীর কবি বিজ্ঞ বংশীবদন তাঁহার মনসামঙ্গলে “নেতের উড়নী” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে মহাদেব ইন্দ্রকে বলিতেছেন “পাট নেত বাস পর গলে রত্নমালা। হাড়মালা মোর গলে পর বাঘছালা ॥” জয়ানন্দ

(১) সৈন্তগণ এতদ্ব্যতীত কোমরবন্ধ, বর্ম, ও টক্ষীর ব্যবহার করিত। জুতাবার ও সৌচিক জাতি প্রস্তুত করিত এবং চর্মকারঙ্গণ পাত্রকা নির্মাণ করিত।

(২) বাণিক গাঙ্গুলি তাঁহার শ্রীধর্ম-মঙ্গলে লিখিয়াছেন, ‘নেতের আঁচল ভিলে মঙ্গলঃ লগে।’ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাই—  
‘পাটনেতে তোট রক্ত দিল একে একে।’

ঊঁঠার চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপের বাজারে কি কি বিক্রয় হইত তাহার বর্ণনা স্থানে বলিয়াছেন “পাট নেত ভোট, সঙ্লাং কবল”, এ চারি স্থলেও ছিন্নবস্ত্র নাতা অর্থ হয় না। এস্থলেই পাট অর্থে রেশম আর নেত অর্থে তসর বা কোন বহুমূল্য জড়যুক্ত কাপাস। ত স্থল বস্ত্র বলিয়া বোধ হয়।

ইহার পরে রূপনাগের ধর্মমঙ্গলে জীলোকের চিত্রিত কাঁচুলির কথা পাই, মাণিক গান্ধূলি এক স্থানে বোলটি শ্লোক ও অন্যস্থলে দুইটি শ্লোকে আর ঘনরাম মোটে ছত্রিশটি শ্লোকে কাঁচুলির চিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। এই চিত্রগুলি একত্র করিলে বোধ হয় বায়োম্বোপের একটি ক্ষুদ্র ফিল্ম হইত। এই কাঁচুলি বহুদিন হইল বাঙ্গলা দেশ অগ্রধান করিয়াছিল। কেবল যাত্রার দলের জীলোকের-পোষাকে ব্যবহার ছিল। এখন অবশ্য কাঁচুলি, বড় বা জ্যাকেটরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। (৩)

মনসারভাগান প্রণেতা ক্ষেমানন্দ জোড়ধুতি, চিকণ-বনাত, আনন্দাই-শাড়ী, ঢোলী, মলমল, ছিট, উড়ুনী গরভস্থতাচুরা, নৌলশাড়ী পাটপাটধর, সালমের থান, ভোটকবল জামা (৪) জোড়া ও পাগ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ষিঙ্গ বংশীবদনের বর্ণনার গঙ্গাজলি-শাড়ী, নেতের-উড়ুনী, পাটশাড়ী, ঘান্নর, নীবিবন্ধ, ঘুঘুরা কথা পাই। মাণিক গান্ধুলির সময় দেশে স্থূচল ব্যবহৃত হইত। নাপিত আখীরের বাড়ী শুভ স'বাদ দিয়া পুরস্কার পাইল “পট্ট কাপাস ইজার খোড়া জোড়া আর।” রাজা শিকারে বাইবেন ঊঁঠার পোষাক এইরূপ “পাগড়ী সুরচিত, শিরপর শোভিত শোভন সাজুয়া গায়। শ্রবণে কুণ্ডল, করিছে ঢল ঢল মকমলি উপানহ পায়॥” ভাটের পোষাকের এইরূপ বর্ণনা আছে “পরিশোভা ভাল, পুরটে মিশাল, এচিত্র পাগড়ী মাখে। তাহার উপর জরি মনোহর, মুক্তামণ্ডিত তাতে॥ শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, করণ কাবাই গায়। হেমহীরা সহ। উপ উপানহ, অতি অল্পুম পায়॥”

কবিকঙ্কণের সময়ে পাটের গড়া, পাটের জাদ, খুঞাধুতি, কাচাধুতি, জোড়গড়া, পীতখড়ি, বিবাহাদি শুভকাৰ্য্যে পীতবসন, জীলোকের বার হাত শাড়ী, মেঘডধুক কাপড়, তসরের শাড়ী, থোঙ্গা ধুতি (উর্গাবস্ত্র), সগল্লাদ, ভোটকবল প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এই ‘সগল্লাদ’ শব্দকে জয়ানন্দ ‘সকলাত’ বলিয়াছেন। ইহা একরূপ বহুমূল্য বিছানা বলিয়া বোধ হয়।

জয়ানন্দ বলেন নবদ্বীপের বাজারে খড়িগ রঙ্গি কাপড়া পাটনেত ভোট সকলাত কবল বিকাইত। জীটৈতন্ত দেব কৃষ্ণকেলী বস্ত্র পড়িতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে বাতাসিদ শাড়ী, কাপড়ের-রাজা, খুঞা, নেত, মজাফুল কাপড় অগ্নিফুল শাড়ীর উল্লেখ দেখিতে পাই।

(৩) পূর্বে যে কঙ্ককের উল্লেখ করিয়াছি তাহার অনুকরণে প্রস্তুত বলিয়া জীলোকের জামাকে কঙ্কলিক বলিত। এই কঙ্কলিকা হইতে কাঁচুলির উৎপত্তি। আমাদের খাতর কৌচাও বোধহয় কঙ্ক শব্দজাত।

(৪) এই জামা ও আধুনিক জামা শব্দ বিস্তর পার্থক্য আছে। জামা জোড়া শব্দের জামা পূর্বকালের কঙ্ক। ইহার পুরো আন্তন ছিল, গলা হইতে কোমর পর্যন্ত চাপকানের ন্যায় তরিয়ে পাদদেশ পর্যন্ত ঘাবরার ন্যায় কৌচকান। ইহা বড় লোকেই ব্যবহার করিত। হিন্দুস্থানী বিবাহের বর এখনও এই জামা পরিয়া থাকে। রাজা থিয়েটারে পূর্বকালের পঞ্জিদরূপে এখনও ইহার ব্যবহার আছে।

ষণরাম বর্দ্ধমান রাজকবি ছিলেন। তিনি শাল দোশালা, সরবন্ধ জোড়ার উল্লেখ করিয়াছে। রামপ্রসাদ রায়-বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন “জরীর পোষাক পরা বেশ চির মাথে” তান্ত্র বনাত, মথমল, পটু’ ভূসনাহ, খাসা, বুটাদার ঢাকাইরা, মালদই লগাটি চিকণ সরবন্ধ-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে দিল্লীর দরবারে বিলাতী খেলাত গারে দেওয়াহলেন।

আমরা ইহাতে দেখিলাম মুসলমান আগমনের বহু পূর্বে আমাদের দেশে পারজামা ও চাপকান ছিল। দরজীও ছিল। অথচ অনেকে বলেন আমরা বাকালী যে পারজামা চাপকান গারে দিষ্ট তাহা মুসলমান বাদসাহদিগের অনুকরণ করিয়া। কোন প্রবন্ধ লেখক দরজী (মুসলমান) কথায় সংস্কৃত প্রতিশব্দ না পাইয়া টুটুড়া সাকিত্য সাম্রাজ্যে বলিয়াছিলেন “মুসলমান আগমনের পূর্বে এদেশে দরজী ছিল না।” রাজা, যোদ্ধা, রাজকর্মচারী প্রভৃতি লোকেই এই জামা জোড়া, কঙ্ক, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে খুতিই ব্যবহার করিত। এই খুতির সুবিধার কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের দেশে প্রস্তরের তক্ষণ শির না থাকিলেও মন্দির গায়ে খোদিত ইষ্টকের চিত্রে পুরাতন বেশভূষার অতীত স্মৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। হুগলী জেলার ব্রিটিশ চক্কান নগর, ও পুরুষোত্তম পুরে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মন্দিরগারে এইরূপ বহু চিত্র দেখিয়াছি। নোকার দাঁড়ী মাঝর পোষাক—চাপকান, কোমরবন্ধ, পায়দারা ও মস্তকে পাগড়ী, পাকী বাতক, বন্দুকধারীর ও ঢাল তলোয়ার ধারীর পোষাক—ছোট চাপকান, ছোট পায়দারা মস্তকে হ্যাটের স্তায় টুপি। নোকার স্ত্রী আরোহীর পোষাক—বন্ধে কাঁচুলি পরনে শাড়ী বা বাঘরা এবং ওড়না কালায়দমন বাহার বৃন্দাভূষিত স্ত্রীর মস্তক বেঁধে করিয়া পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ লোকের খুতিও পরণে আছে।

আমাদিগের দেশের বাস্তাওয়ালা এবং মৃন্ময় মূর্তি প্রস্তুতকারী ভাস্করগণ বহুদিন পর্য্যন্ত পুরাতন পোষাককে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য (Fashion) এর নিকট পরাজিত হইয়া সেগুলিও ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে অদৃশ্য হইতেছে।

এইবার অলঙ্কারের কথা বলিব। সেকালে নিম্নলিখিত অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। মস্তকে রত্ন মুকুট, চুডামণি কপালে বুরি মুক্তাবলী, সিঁথী পশ্চাত্দেশে পুষ্টে রচিত ঝাঁপা, পাটের থোপনা, কর্ণ কর্ণকুলি, চক্রাবলী, কর্ণপুং, কুণ্ডল, ( উপর কর্ণ ) ঢাকী নিম্ন কর্ণ বলি, এই বাল জাজপুর উপরিভাগে এখনও ‘বালি’ নামে অভিহিত। নাসার নাকচনা, মুকুতাবলীযুক্ত বেশর। গলায় হিরণ্য মার্জল শতভরী হার, গড়মুক্তা হার, ত্রীবাণজ চক্রহার, কলধৌত কঠমালা, সরস্বতী হার ও শিশুর গলায় বাঘনখ। বাহ ও মণিবন্ধে তাড়বালা বা টাড়বালা বাজুবন্ধ বা বিজটা, কেশুর, অঙ্গদ, বলর ( বা বালা ) বিভিন্ন নামের শাঁখা বধা লাবণ্য শঙ্খ, ত্রীরামলক্ষণ শঙ্খ, লক্ষ্মীবলাস শঙ্খ, রাঙ্গা কলি, সোণার চুড়ি, খাড়ু, কনক বাজুটি। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, কটিতে কিঙ্কিনী ও সোণার দিকলী, পদে পাগুাল, নূপুর রত্নময় উট গোটামল, মগরা খাড়ু, ব মকর খাড়ু, খুণ্ডবুর লগিত। ( ৫ )

অলঙ্কারের জন্য অগুরু, কালাগুরু, কস্তুরী কুমুম, চন্দন, চুরা, শিলারস প্রভৃতি স্রবঙ্গি দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। এগুলি গারে মাথাইবার কাজ ছিল নাশিচের বণা, —মাণিক পাঙ্গুলির অধিষ্ঠানকালে “মরজন না পত নিবুক

( ৫ ) অলঙ্কাররূপে কড়ির প্রচলন ছিল বধা “খলমল করে গাঁঠা কড়ি স্রতি মূল” ও “হস্ত্রীবে পোড়া করে হীরামাটা কাড়।” ঐচৈতন্য দেব “গুণ্যাদাম” বা কুঁচের মালা গলায় পরিতেন।

নিজ কাজে। মাথার চকন, চুয়া মন্ত মনসিজে ॥” ( ৬ ) স্ত্রীলোকে ললাটে প্রশস্ত সিন্দুর দিয়া গোরোচনা ও চকনের বিন্দু তার চারি পাশে দিত। নরনে কজল লাগাইত। কপূর দিয়া পান খাটয়া অথর রঞ্জিত করিত। স্নানের সময় বিফুটেল, নাররগটেল, আমলকী মাখিত ( ৭ ) ততকালো উবটন ও হরিদ্রা মাখিত। বঙ্গবাসী আফিসের প্রকাশিত মনসামঙ্গলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় বিদ্যমানত এই উবটন কথার অর্থ লিখিয়াছেন “অঙ্গরাগ বিশেষ”, কিন্তু তিনি বিশেষ্যকরিতা কিছু বলেন নাই। জাঙ্গপুর উপরিভাগের রাজপুত জাতির বিবাহে এখনও উবটন ব্যবহৃত হয়। যব, হরিদ্রা ও নানারূপ সুগন্ধি মশলা ভাজিয়া পিশিলেই উবটন হয়। ইহা তৈল ও হরিদ্রার সচিত অঙ্গে মাখিবার প্রথা আছে।

পুরুষেও দীর্ঘ কেশ রাখিত কখনও খোঁপার আকারে বাঁধিত কখনও বা পাগড়ীর মধ্যে ঢাকা থাকিত! ( ৮ ) স্ত্রীলোকের দুই প্রকার খোঁপার নাম পাওয়াই ‘লোটন কুটি ও তুয়া মুঠা কবরী।’ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে বহু প্রকারের খোঁপার নমুনা আছে। খোঁপার ও কেশে চাপা মাংগী প্রভৃতি ফুলের দ্বারা দোহারা তেহারা করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরিত। সামাজিক কার্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে মালাচকন দিয়া অভ্যর্থনা করিবার রীতি ছিল। সমাজপতিষ্ট সর্বপ্রথমে মালাচকন পাঠতেন। ইহার প্রাক্ক্রম হইলেই বিবাদ বাধিয়া যাঁতত। মাথোর খুব বেশী ব্যবহার ছিল বলিয়াই মালাকার জাতির জীবিকা চলিত।

কাচের আয়না কতদিন হইতে চলিয়াছে জানি না কিন্তু শাড়ীতে দর্পণের ব্যবহার ছিল। বেশভূষা করিবার সময় ও বরণ-ভালার দর্পণের ব্যবহার ছিল। বিবাহের বর এ দর্পণ সন্ধান হাতে রাখিত। জাঙ্গপুর উপবিভাগে নাপিতের গৃহে এখনও কাঁসার গোলাকার দর্পণ আছে। বিবাহে এখনও ইহার প্রচলন আছে অথবা তাহাতে বুখ দেখা যায় না।

কাচার মতে “বে জাতির পরিচ্ছদ যত মিশ্র বা ভটল সে জাতি তত উন্নত, সুতরাং আমাদের কোট প্যান্টালুন ইত্যাদি ইউরোপীয় পরিচ্ছদই ব্যবহার করা উচিত।” শতাতপ হইতে আশ্চর্য্যকর পারিচ্ছদের মুখা উদ্দেশ্য। বাক্যভঙ্গরে লোক ভুলান হোর গোণ উদ্দেশ্য। এই গোণ উদ্দেশ্যই বাদ পরিচ্ছদ ব্যবহার কারণে হয় তাহা হইলেও আমাদের সেকালের চোপা, চাপকান, পাছাম, পাগড়ী কি কোট কয়েটকোট, নেকটাই, হাটের নিকট পরাঞ্জিত হইবে? ইউরোপীয় পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে হইলে মনে অন্ততঃ চারি পাঁচ বকনের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয়। সজাতপর লোকের পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত সে সংক্ষেপে কোন কথা বলবার

( ৬ ) ভারত চত্বরের সময়ে আতর গোলাপ রাজারাজরাণিগের মধ্যে বেশ চলিয়াছিল।

( ৭ ) মাথার মাখিবার আমলা কোন কোন গন্ধদ্রবোর সাহিত মিলাইয়া গন্ধ বণিকগণ শিক্রের করিত। যথা কবিকল্পণে—

‘মণ্ডলার বেনা আইল শরর লায়ের বেটা।

আঙলা বাঁড়িয়া যায় করতলে ঘাঁটা।

হুই হুই পণ বেচে আঙলা এক পাত।

তার শিলারস চুয়া কপূর যাবত ॥”

( ৮ ) যথা জ্ঞানমন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—( ক ) “মস্তকের কেশ বাঁধে মল মন্ত পড়্যা।”

( খ ) কনক কণেবর, ধুলার ধূসর, আউল্যাচ চাঁচর কেশে।

( গ ) মিশ্রের বচন শুনি সর্বলোক কান্দে। গায় আঁড়িয়া পরে কেশ নাহি বাড়ে।

আমার অধিকার নাই। কিন্তু ধূতি ও উড়ানী যে আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জাতীয় পরিচ্ছদের উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ঐতিহাসিক্য প্রযুক্ত এ দেশে আট মাস কোন জামা বা পিরানের প্রয়োজন নাই। আর তাঁতের আদিম সন্তান ধূতি উড়ানীকে পারিজামার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখি না। ধূতি পরিয়া শরনে, উপবেশনে, ধাবনে, উল্লঙ্ঘনে, বৃক্ষারোহণে, সমুদ্রগে কোন অসুবিধা নাই। পরিধানে কোনরূপ আশুপ লাগিলেও খুলিতে বিলম্ব হয় না। এখন যেকোন লম্বা কোঁচা করিয়া ধূতি পরিবার রীতি প্রচলন হইয়াছে চাম্পল পকাশ বৎসর পূর্বে সে রীতির উত্তর। এরূপ লম্বা কোঁচা থাকিলে অবশ্য ধূতি পরিয়া সব কাজ করা চলে না। (১)

সেকালে অধিকাংশ লোকেই জামা গারে দিত না, তাই কবিল্প রূপ বর্ণনার “নাতি স্নগভীর।” “দ্রিঘলী” “আত্মহুলধিত বাহু” প্রভৃতি কথা প্রয়োগ করিতেন। তখন অধিকাংশ লোকে কুঁতি করিত। শরীরের গঠনও সুন্দর ছিল। সুঠাম শরীর নয় রাখিয়া দশজনকে দেখাইয়া লোকে আশ্বপ্ৰসাদ লাভ করিত। এখন ডায়াবেটিস ডিসপেন্সিয়া পীড়িত দেখে দেখাইবার মত নহে। ব্রাহ্মণে উপবীত দেখাইলে প্রশংসা পাইত। ব্রাহ্মণেরও প্রশংসা পাওনা উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন সকলের অঙ্গ চাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আর উত্তরীয় বা উড়ানী দ্বারা সেকালে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। বাজারে গিয়া জিনিষ পত্র বাঁধা চলিত। সামান্য শীতে গারে দেওয়া হইত। শীতাপে মাথা বাঁধা চলিত। পথিমধ্যে ঘানের প্রয়োজন হইলে ধূতিখানা ভিজাইয়া উড়ানীখানা পরা চলিত।

পাগড়ী বঙ্গদেশ হইতে কেন উঠিয়া গেল; ইহার কারণ নির্ণয় করিতে আমি অসমর্থ। বঙ্গলার কুবকে রৌদ্র বৃষ্টিতে আত্মরক্ষার জন্য এখনও টোকা ব্যবহার করে। বিলাত ছাতার ব্যবহার বেশী দিনের নয়। আর ৬২পূর্বেই পাগড়ী বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্গত হইয়াছে।

এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। যোগ্যতর হস্তে পড়িলে এরূপ প্রবন্ধ আরও মনোহর হইত বলা বাহুল্য।

শ্রীরাখালরায় রায়।

## বৈরাগী-তলার মেলা।

কে বলো এ ডাঙ্গায় ডেকে আনলে এত লোক  
দেখে আমার ভরলো রে বুক ভরলো দুটা চোক।  
কোন নারদের নিমন্ত্রণে আজকে অকস্মাৎ  
অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে পাতলো এসে পাত।  
আসলো হেতা দিখিজয়ী কোন্ সে রঘুরাজ,  
উঠলো ক্ষীরোদ মন্থনেতে লক্ষ্মী নাকি আজ !  
কোথায় তোমার কপিধ্বজ, কোথায় নারায়ণ  
অষ্টাদশ এ অকৌহিণী চায় কি মহারণ ?

(১) বঙ্গদেশে সুস্বভূতির জন্য বঙ্গদিন হইতে প্রাসক্তি লাভ করিয়াছে। প্রায় চইশত বৎসর পূর্বে বঙ্গের সুস্ব ভূতি বিধেণে চালান যাইত। সাধারণে মোটা কাপড় বা গড়া পরিত। সুস্ব ভূতি ধনীদেহ মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহার করিত।

কোন ফুলনে রাখাশ্যামের আজকে হবে দোল ?  
মুহুমুহু উঠছে কি তাই মধুর হরিবোল ।  
ভাসাইতে কোন নদীয়া, করতে পারে ত্রাণ  
প্রেমের গোরা আনলে হেতা হরিনামের বান !  
বলো কাহার দান-সাগরে এমন মহোৎসব  
কোন ভূপতির তোরণ-দ্বারে আগে এমন রব ?  
ছিল দুদিন হেতায় কেবল ভক্ত সাধু এক  
পতিতপাবন চরণ ধূলার শক্তি তোরা দেখ !

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক ।

## মহীশূরাধিপতির সম্বর্দ্ধনা ।



বিগত ৩রা কাঙ্কন তারিখে কোচবিহার সাহিত্যসভা মহীশূরাধিপতিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন  
পত্র প্রদান করেন ।

বিবিধবিদ্যাবিলাস-রস-রসিকাশেষকীর্তিকুশল-

কব্রকুলশিখামণি-মহীশূর-মহী-মহীন্দ্র-শ্রীশ্রীমৎ সার্ব কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার্

মহারাজ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, মহামুভবস্য

## অভ্যর্থনা-প্রশস্তিঃ ।

এছেহি রাজন্যগণাগ্রগণ্য,  
এছেহি বিদ্যাপ্রণয়প্রবীণ ।  
এছেহি ভূমণ্ডলসর্বমান্য,  
এছেহি সাহিত্যকলাভিনয় ॥ ১ ॥

ওবার্চনাযোগ্যপদার্থহীন-

ক দাসনং কল্পিতমাসনায় ।  
গুহাগ চিত্তার্থ্যমথাত্মপাদ্য  
স্বর্গ্যভোগ্যতত্ত্বাভ্যাস্তুগন্ধিপুষ্পম ॥ ২ ॥

বিদ্যা ধনং ধন্য ইহৈকলোকে  
 তিষ্ঠন্তিনৈবং হি চিরপ্রসিদ্ধিঃ ।  
 ভবন্তুমাঙ্গাদা গুণৈর্বরিত্তং  
 সার্থপ্রবাদোহপি নিরর্থকোহভূৎ ॥ ৩ ॥

হং শীলবান্ ভীষ্ম ইব প্রশস্তঃ,  
 হং ধৈর্যবান্ শৈল ইবাগ্রধূমাঃ ।  
 হং স্ত্রানবান্ জীবসমো বংশস্তঃ,  
 হং ধন্যবান্ ধন্যসুভেন তুল্যঃ ॥ ৪ ॥

ঔদার্য্য-গান্ধার্য্যামহম্ব-শৌর্য্য-  
 চারিত্র-সৌজন্যগুণৈর্বিশিষ্টৈঃ  
 'দিক্‌পালমাত্রাঘটিতো নরেন্দ্রঃ'  
 শাস্ত্রীয়বাদং সফলীকরোষি ॥ ৫ ॥

দেদেশু চ স্থাপয়িতা প্রজানাং  
 বিদ্যালয়ানাং মতিবর্দ্ধনার্থম্ ।  
 সাধুপকারেষু সদানুরক্তঃ,  
 দ্রুতগাম-গৃহাসি তথৈব যুক্তঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যাবীৰ্য্যপ্রথিতবিভবে কাণ্টিমন্তির্গরিষ্ঠে  
 জাতঃ শ্রীমানখিলগুণভূঃ ক্ষত্রবংশাবতংসঃ ।  
 প্রাজ্যং রাজ্যং সকলসুখদং স্নৈগুণৈশ্চ বিধৎসে  
 কুল্যাসেতুপ্রভৃতি-করণৈর্থাভূবিদ্যাবিধিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

মধুর-মধুর-মৃতিঃ শ্রীতিবিশ্রুতধামা,  
 করুণহৃদয়-দৃষ্টিঃ রূপলাবণ্যসীমা ।  
 প্রকৃতিষু শুভবৃদ্ধিঃ রাজ্যভবৌকলক্ষ্যঃ,  
 জয়াতি জয়াতি নিত্যং কৃষ্ণরাজো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

খবেদবস্বিন্দুমিতে শকান্দে সৌরিবাসরে ।  
 গুণম ফাঙ্কনে সৌরঙ্গসদন্তেবিনয়াস্থিতে: ॥ ৯ ॥  
 কোচবিহারসাহিত্যামুশীলনাসমিতিরিয়ম্ ।  
 মহানুরমহীন্দ্রায় প্রশস্তিদীয়তে মৃদা ॥ ১০ ॥





## কোচবিহার সাহিত্য সভার সভাপতি ইয়ম্ উক্তিঃ

নিভোল্ল নারায়ণ মণোদয়ের অভিনায়ণ ।

—:—

YOUR HIGHNESSES and GENTLEMEN,

I deem it an honour and a privilege to be able to say a few words today.

Before I proceed any further, let me, on behalf of the Executive Committee and members of the Cooch Behar Sahitya Sava, offer His Highness the Maharaja Bahadur of Mysore a hearty welcome. It is seldom indeed we get an opportunity of welcoming so great a personage in our midst. Your Highness, through the munificent patronage of our beloved Ruler, this Sava was started 4 years ago with the primary object of historical Research, and a lesser degree the Arts, Sciences and Literature although there are probably hundreds of volumes written on the history of other parts of India, little or next to nothing is known to the outside world of the ancient history of these parts. It is one of our duties therefore, to collect material, and place before the world a true and authentic history of Cooch Behar and neighbouring territories. Before I close, allow me to thank Your Highness for kindly sparing us a few minutes of your valuable time and affording us the opportunity of welcoming you in our midst.

অনুশাসন ।

অধ্যক্ষ সভার কিছু বলিতে সক্ষম হওয়ায় আমি গৌরবান্বিত ও অতৃপ্ত হইয়াছি ।

বিশেষ কিছু বলিবার পূর্বে আমি কোচবিহার-সাহিত্য সভার ও কার্য্য নিকাশক সমিতি সদস্যগণের পক্ষ হইতে মহীশূরাধিপতিকৈ আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । মহামুভব ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ আমরা কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকি । আমাদের লোকপ্রিয় মহারাজের উদার অভিভাবকতার চারি বৎসর পূর্বে এই সভা স্থাপিত হয় । ঐতিহাসিক অতুসন্ধান এবং তৎসংক্রান্ত শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । অত্যাশ্রয় প্রদেশ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সত শত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিপ্যন্ত হইয়া থাকিলেও এতদঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বাস্তবিকভাবে একরূপ অজ্ঞাতই রহিয়াছে । এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ দ্বারা কোচবিহারও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের প্রকৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস ভগদ্বাসীর সম্মুখে স্থাপন করা আমাদের কর্তব্য । আমি আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে মহামহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যে হেতু তিনি বহু মূল্য সময়ের করেক মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মহীশূরাধিপতির উত্তর—

শ্রী

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতিং প্রতি ইয়ম্ উক্তিঃ

অগ্নি মহারাজ ভো ভোঃ পণ্ডিত বর্গ্য সভাসদঃ

কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতিঃ সন্দর্শনাৎ অভ্যর্থনা বাগ্যাজ্ঞ আনন্দ পরবশে ভবাম্যহা ।

ভবনীর প্রশান্তি বচনে মরি মহান্ প্রেমভাবঃ প্রকটীকৃতঃ তদর্থং তত্তত্ববতো বন্দে ।

অস্বদীয় রাজ্যে প্রজানাগ হিতায় বিদ্যাভ্যাসায় চ যে যে প্রযত্নাঃ কৃতাস্তে তে সর্কেহপি ভবন্তিঃ সমাক্ বিদিতা এবৈতি নিতরাং মোদোহম্ অনাদি কালান্ সমুপাগতাঃ ধর্ম্মাদ নিগিল-পুরুষার্থ বোধিন্যাঃ পরিপোষণার্থং বিশেষতঃ প্রচারার্থং চ প্রবৃত্তায়াঃ অসাঃ সমিতিঃ প্রীতির্ম পাত্রতা সমজন্যিতি অমন্দান্দ সুধাষুধো নিমজ্জামি ।

“—” জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরাতি বিরুদ্ধাঙ্কিতসা মহারাজসা সমাবলম্ব্যং ইয়ং সান্নাঃ সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারসা প্রধান ভূতা তৌ ইতোহ পাশকাং খ্যাতি মেঘাতীতি অহং দৃঢ়তরং প্রতোমি । আর্যোভঃ অস্বদীয়েতাঃ পুরাতনেভাঃ ক্রমাদনু প্রাপ্তমিমং বিদ্যানিধিং অপ্রমত্ততরা রক্ষিতং দেশোন্নাত হেতোঃ প্রাচুর্য্যমাপাদয়িতুং চ ভবদীয়া সমিতিঃ ইয়ম্ অতীব সহকারিণীতি মান্য ।

অয়ং ভবতাং পরম প্রেমাম্পদীভূতো মহারাজঃ ভবদীয় কুশলানু যোগার্থং প্রতিক্ষণ মুণ্ডীয় মান্যসাহঃ বর্ত্তন্তে ইতি জানে—কিং চাস্য মহারাজস্য অমুক্তবরঃ মহারাজ কুমার বাকটর নারায়ণাভি ষঃ যশ্চাদবাক্যতা পদ মলং করোতি আনুমান তস্মাদয়ং সমিতিঃ অতিশম্ভেন বুদ্ধিমেষ্যতাতি দৃঢ়তরং প্রতোমি ।

শিবং ভবতু ।  
শ্রীকৃষ্ণ ।

বঙ্গানুবাদ—

## কুচবিহার সাহিত্যানুগীলিনী সমিতির প্রতি এই উক্তি—

মহারাজ ও সুপণ্ডিত সভাসদগণ! আজ কুচবিহার সাহিত্যানুগীলিনী সমিতি সন্দর্শণে ও অভ্যর্থনা বাক্যে আনন্দিত হইয়াছি ।

আপনাদের প্রশস্তি বচনে আমার প্রতি বিশেষ প্রেমতাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য আপনাদের অভিনন্দন করি ।

আমার রাজ্যে প্রজাদের হিতের জন্য ও বিদ্যা-ভ্যাসের নিমিত্ত যে সকল প্রযত্ন করা হইয়াছে তাহা সকলই আপনাদের সুবাদত জানিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি । অনাদিকাল হইতে আগত ধর্ম্মাদি সমস্ত পুরুষার্থ বোধিনী সংস্কৃত বিদ্যার পরিপোষণ ও বিশেষতঃ প্রচারের জন্য প্রবৃত্ত এই সমিতি আমার প্রীতির পাত্র হইয়াছে, এই হেতু আমি প্রগাঢ় আনন্দ সুধা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি । জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নামাঙ্কিত এই মহারাজের অভিভাবকতায় এই সমিতি সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারে সর্ব্বপ্রধান হইয়া ইহার অপেক্ষাও অধিক খ্যাতিলাভ করিবে ইহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি । আমাদের পূজণীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে ক্রমানুসারে প্রাপ্ত এই বিদ্যানিধি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে এবং দেশের উন্নতির জন্য বহল প্রচার করিতে আপনাদের এই সমিতি অত্যন্ত সহায় হইবে ইহা আমি মনে করি । আপনাদের পরম প্রেমাম্পদ এই মহারাজ আপনাদের কুশলের জন্য প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত বিদ্যমান তাহা আমি জানি । বিশেষতঃ মহারাজের অমুক্তবর মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ বধন ইহার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন তখন এই সমিতি যে অতিশয় বুদ্ধিলাভ করিবে তাহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি ।

মঙ্গল হউক—শ্রীকৃষ্ণ ।

মহীসুরাধিপতি সভার হিতার্থে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রদান করেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক তাঁতাকে নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হয়।  
বিদ্যাবিজ্ঞানবিশারদ শ্রীমন্ মহীসুর মহাপানেঃ কৃতজ্ঞতা প্রশান্তঃ।

- ১। জয়তু জয়তু রাজন্ রাজ-রাজ্য বক্ষো  
নয়-বিনয়-চরিত্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধো।  
জনহিত-রত-চিহ্ন-প্রাচীনাশ্রয়ৈকনিষ্ঠ  
মুকুট-বিমল-বুদ্ধে দেশমাতৃদরেণ্য ॥
- ২। প্রকৃতি-বিভব-পূর্তো রাজ ভূমো চ সমাক  
পদিতঃস্থতোভোগো রাজ-কারিক-ভিত্তঃ।  
অগণিত-তনু-পাতং মন্ত্রসিঁদৌ নিযুক্তঃ  
জগতি বিপুল-কার্ত্তি-খ্যাতি-শাস্তা-লভিত্ব ॥
- ৩। বিহার-সাহিত্যসংগ্রহ নিরাক্ষ্য  
স্থাপিত জনহিতা সহস্রম্।  
মুদ্রা বহু মুদ্র-হৃদঃ সদস্যঃ  
গুরুমহে সৌম্য। সসামুবাদম্ ॥
- ৪। পূতাত্মা বিবুধাশ্রয়ো গুণবতাম্ শ্রেষ্ঠঃ শরণাঃসতাম্  
সংসদ্যো শ্রুত-শৌচনির্ম্মলমনা বিদ্যাক্রিপাং গমঃ।  
শাস্ত্রালাপসুখী কলাসু কুশলো বিদ্যার্থ-কল্পদ্রুমঃ  
সদ্ব্যংসাহ-বলোজ্জ্বিতোবিজয়তাং শ্রীকৃষ্ণরাজেন্দ্রপুং ॥
- ৫। ছামণৌকলসংপ্রাপ্তে শনৌ নেত্রমিতেদিনে।  
নভোযুগাতি-শুভ্রাং শ্রমিতে শাকে সমপিতা ॥

হে রাজ-রাজেশ্বর-মিত্র, হে বিনয়, চরিত্র, রাজনীতি, প্রজ্ঞা ও বিবেকের আধার, হে জন-কল্যাণ-নিধান, হে নিকলঙ্ক-কুণীগল সম্পন্ন, হে দর্পণ তুলা স্বচ্ছবুদ্ধি স্বদেশ-মাতৃকার বরণ্যে স্থান! সর্বত্র আপনার জয়জয় বিধোষিত হউক। ১।

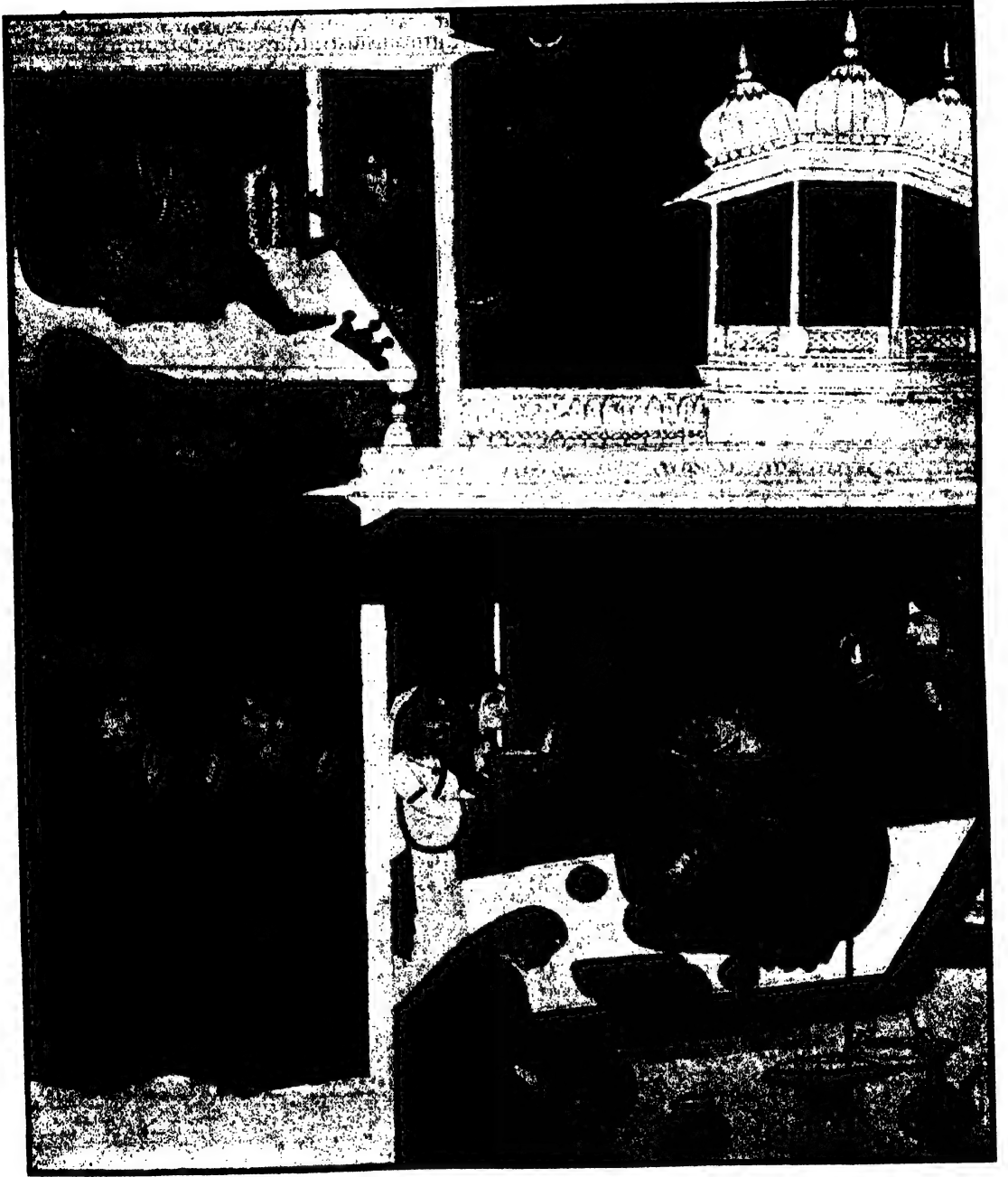
আপনি আশ্রিত ভনমণ্ডলীর বৈভব বুদ্ধিও রাজসমৃদ্ধির শ্রীবুদ্ধির জন্য ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া, “মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাঠন” মূলমন্ত্র করিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সতত স্বলক্ষ্য সাধনে জাগরুক আছেন। বিধাতার করুণার আপান ধরাতলে অসীম যশ কীর্ত্তি ও সুখ শান্তি ভোগ করুন। ২।

আপনি অদ্য কোচবিহার সাহিত্য সভা ভবনে শুভাগমন করিয়া ইহার কার্য্য কলাপ দর্শনে প্রীত হইয়া সংকৃত সাহিত্য-চর্চায় উন্নতকল্পে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আপনার এতাদৃশ অসম্ভাবিত বদান্যতা দর্শনে মুগ্ধ হৃদয় সভার সদস্যগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রু দন্য বাদের সাহিত্য এইমাতৃক দান গ্রহণ করিতেছেন। ৩।

হে ছাত্রসমাজকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণরাজ নৃপে ? আপনার মন অতি উদার ও অতি পবিত্র। আপনি যোগবজ্রের অমূল্যধারার দ্বারা দেবতাদিগের ও শাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্বারা সুধীসমাজের আশ্রয় স্থল। গুণিগণগণনার অগ্রগণ্য, সদাশরদগের পালক, সংসঙ্গে নিরত, পবিত্রতা ও জ্ঞানার্থিতে আপনার মনোমালিন্য নিঃশেষে দৃঢ় হইয়া পিয়াছে। আপনি অপার বিদ্যাপারাবরের অধীশ্বর পারদর্শী। আপনি উদীপ্ত উৎসাহ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও মনোবীজ প্রভৃতি গুণ রাশিতে সতত মেদীপামান। ৪।

ছামণি (সূর্য্য) কুন্তরাগ্নি হইলে (ফাল্গুন মাসে) শনিবারে এরা তারিখে ১৮৪০ শকাব্দে এই কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হইল। ৫।

কোচবিহার ট্রেড প্রেসে শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।



### বিরহিণী রাধা

কুচগেহর রাজপুত্রকাপারের প্রাচীন চিত্র হইতে।



# পরিচারিকা

( নব পৰ্য্যায় )

“তে প্রাপ্নুবান্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ ।

বৈশাখ, ১৩২৬ সাল ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

বৈশাখী ।

—:~:—

কৃষ্ণ তাজে বাঁশী মোহন মধু হাসি, কৃষ্ণ সাজিয়াছে ঐ গো আজ,  
শ্রামের দেহ বাঁকা কোথা সে শিখী পাখা কোথা সে পীতধড়া কোথা সে সাজ ।  
প্রেমেতে বাধা-বাধা কোথা সে নাম রাধা স্নিগ্ধ অন্তরে দিল না ঢালি  
খড়গ ধক্ ধক্ জিহ্বা লক্ লক্ মুক্তকুন্তলা করালী কালী ।

\*

\*

\*

কোথা সে সুন্দর মোহন কলেবর উমার তনুলতা ফুলের বেশ  
মিচোল অকল কাঁপন চকল অদম অন্তরে মদন-ক্লেশ ?  
মোহিনী উমা হেরে রুদ্ধ জেগেছে রে রুদ্ধ অন্তরে বিকার নাই,  
ললাটে থাকি থাকি ফলেছে ঐ জাঁধি মদন ফলেপুড়ে হয়েছে ছাই !

মধুর মধুমান হতাশে ফেলে খাস গেল রে গেল গেল সকল সুখ,  
 প্রেমেরে চুম্বিয়া যা ছিল ঐকশিয়া খরিল সবই আজ ভাঙ্গিয়া বৃক !  
 ফাগুন অঙ্গনে ফুলের বনে বনে যে হাসি নিস্তি নিস্তি লুটিয়া যায়—  
 প্রখর রবি তাপে প্রাণের সম্ভাপে লুখায়ে যার তাহা হায় গো হায় !

## অন্তরীক্ষ কাহাকে কহে ?

অন্তরীক্ষ শব্দের অর্থ যে “অনন্ত গগন” বা “শূন্য” ইহা আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই জানেন, এবিষয়ে আবার সংশয় বা জিজ্ঞাসা কেন ?

হাঁ কথা এইরূপই বটে, সকলে সেই মাকাতার অতিবুদ্ধগিতামহহইতে অদ্বাপর্যায় আবহমান কাল ঐরূপ অর্থই জানিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ অন্তরীক্ষ, নভঃ, বোম বা আকাশ শব্দের প্রকৃতার্থ শূন্য বা অনন্ত গগন নহে। ফলতঃ অন্তরীক্ষ ও নভঃ শব্দের প্রকৃতার্থ “ভুবলোক” বা মধ্যম লোক, এবং উহা বর্তমান ভূরূপ, পারস্য ও আফগানিস্তান ( অপোগস্থান ) কিংবা উহা পুরাণের কেতুমালবর্ষের সহিত অভিন্ন এবং আকাশ ও বোম শব্দের প্রকৃতার্থ আদি স্বর্গ দ্যো বা বর্তমান মঙ্গলিয়া। প্রমাণ ?

প্রমাণ বেদাদি সর্বশাস্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধে অন্তরীক্ষ যে বর্তমান ভূরূপ, পারস্য ও অপোগস্থান, তাহা সপ্রমাণ করিয়া প্রবন্ধান্তরে আকাশ বা বোম যে মঙ্গলিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিব। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন যে—

ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ,

ভুব ইতি অন্তরীক্ষং, সুব ইত্যসৌ লোকঃ। ১৭ পৃ

আমাদিগের অধ্বাষিত এই যে ভারতবর্ষ, ইহাই ভূলোক বা ভুলোক, ঐ যে সুদূর-সংহ স্বর্গলোক, উহারই নাম “সুবঃ” বা “সঃ”, অর্থাৎ আদি স্বর্গ দ্যো বা মঙ্গলিয়া এবং ভুবলোকেই নামান্তরই “অন্তরীক্ষ”।

ভুলোক যে ভারতবর্ষ, পরম ভূমণ্ডল নহে, তাহার প্রমাণ কি ? তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে। ফলতঃ “ভূভারতে” এই প্রবাদবাক্য, ব্রাহ্মণের ভূমেব ও ভূগব নাম ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের “ভূঃ—অয়ং লোকঃ” এই বাক্যের ভূ—যে ভারতবর্ষ, তাহা সংশ্লিষ্ট করে। আর সুবঃ যে সঃ বা দ্যো অর্থাৎ মঙ্গলিয়া, তাহাও

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। তবে যেমন স্বর্গ শব্দ বহুবর্বে “স্বর্গ” বলিয়া বিবৃত, তদ্রূপ “স্বঃ” শব্দও ভাষার বিকারে বহুবর্বে “স্ববঃ” এই আকার ধারণ করিয়াছে। আচ্ছা—

ভুবঃ বে অন্তরীক্ষ

ইহা যেন তৈত্তিরীর উপনিষদের বাক্যানুসারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু অন্তরীক্ষ যে শূন্য বা গগন নহে, পরন্তু কোনও জনপদ, অর্থাৎ তুচ্ছ পারস্য ও অপোগহান, তাহা কেন স্বীকার করিতে হইবে? দেখ প্রামাণ্য কোষ অমর বলিতেছেন যে—

“লোকস্ত ভুবনে জনে”

লোক শব্দের অর্থ মনুষ্য ( জন ) ও “ভুবন” বা জনপদ। সুতরাং বাহার নাম “ভুবলোক”, তাহা শূন্য হইতে পারে না। তবে কেন কলিকাতার একজন মহামান্য ব্যক্তি, আমেরিকার বলিয়া আসিলেন যে—

“ভুবলোক”

পৃথিবী ও শূন্যস্থ স্বর্গের মধ্যবর্তী, কোনও শূন্যবিশেষ? স্বর্গ, শূন্যস্থ কোনও অপাদগম্য স্থান—ইহা কল্পনাসাগরের কেন্দ্রবিন্দুদ্বাশেষ, এবং কেহ অদ্যাপি উহার অবস্থানবিন্দুও নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না, এবং “ভুবলোক” যে একটি শূন্যস্থদ্বাশেষ, ইহাও সধু বলিয়া স্বীকার করা বাহতে পারে না। ফলতঃ “ভুবলোক” একটি গীমাবদ্ধ পাদগম্য জনপদ। বহুস্তং বহুবর্বেদভাষ্যে শ্রীমতা সত্য মহোদয়েণ—

ভূত্বঃ স্বঃ । ৩৭ক । ৩অ

স্তম মহীধরঃ...ভূত্বঃ স্বঃ—পৃথিব্যাদীনি লোকত্রয়নামানি।

এই ভূঃ—ভুবঃ ও স্বঃ, পৃথিবীপ্রভৃতি লোকত্রয়। অর্থাৎ ইহারা তিনটি লোক বা জনপদ। অর্থাৎ এই পৃথিবী পৃথুর পৃথুল রাজ্য ভারতবর্ষ, পরন্তু ভূমণ্ডল ( world ) নহে। পৃথিবী শব্দের মুখ্যার্থ ভারতবর্ষ; কলিতার্থ মধ্যমা পৃথিবী অন্তরীক্ষ, আর পরমা পৃথিবী দ্যৌ বা আদি স্বর্গ ( ঋষুপ্রভৃতিসমুদ্বাপাত্মক বর্তমান মঙ্গলিয়া ) এবং পৃথিবী শব্দের তৃতীয় কলিতার্থ ( Secondary meaning ) ভূমণ্ডল। আর স্বঃ—আদি স্বর্গ দ্যৌ, ও ভুবঃ — অন্তরীক্ষ। কেবল মহীধর নহেন, পাণিনর তত্ত্ববোধিনীটীকার শ্রীমজ্জ্ঞানেন্দ্রসহস্রতী এবং হলায়ুধের ব্রাহ্মসর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্ত বোঁগ-বাক্যবচনও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে—

সপ্ত বাঙতি ( ভূঃ— ভুবঃ—স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য )

উপর্যুপরি ( উত্তরোত্তর ) সংস্থিত সাতটি লোক, পরন্তু ইহাও একটি শূন্য গগন বা শূন্যস্থ কোনও অপাদ গম্য বস্তু নহে।

আচ্ছা বুঝিলাম ও স্বীকার করিয়া লইলাম যে ভুবলৌকিক অন্তরীক্ষ এবং উহা একটি জনপদ বা ভূবন। কিন্তু তবে কেন বেদের বহুস্থলে উহা শূন্যার্থে প্রযুক্ত দেখা যায় ( ৭। ২৫ স্থ। ১ম প্রভৃতি )?



হা, একথা অতি সত্য, বেদের কতিপয় মন্ত্রে “অস্তরীক্ষ” শব্দ পক্ষিগণের বিহারক্ষেত্র গগন বা শূন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্র পৌরাণিক ভ্রান্তির যুগে প্রণীত। কেন না অস্তরীক্ষ যে একটি ভূবন বা জনপদ, তাহা বেদের বহু মন্ত্র পাঠেই জানা যায়। যথা—

অস্তরিক্ষে বিষ্ণুর্বাক্রংস্ত বৈষ্টুভেন চন্দ্রসা। ২৫ক। ২ম যজুর্বৈদ

বামন বিষ্ণু ( কশাপাশ্রম ) স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সহ ( ১৬। ২২স্থ। ১ম ঋগ্বেদ দেখ ) স্বর্গহইতে দ্রিষ্ট হইলে সাম গান করিতে করিতে অস্তরীক্ষে দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ করেন।

বিষ্ণু স্বর্গভ্রষ্ট মন্বাদি দেবগণ সহ ভারতে আগমন করেন। তিনিও নর দেবতা, অন্যান্য দেবতারাদি জননমরণ-শীল নরদেবতা বটেন, ইংগরা কেহই শূন্যচর বা উভচর পক্ষী নহেন, সুতরাং এই অস্তরীক্ষ শূন্য গগন নহে—পরন্তু ভূবন বা জনপদ। তথা হি—

দিবি অনাঃ সদনং চক্রে উচ্চা, পৃথিব্যা মনাঃ অবি অস্তরিক্ষে। ৪। ৪০ স্থ। ২ম

এই মন্ত্রের দিব্ ( উলোক ), পৃথিবী ভারতবর্ষ ( ভূঃ ) এবং অস্তরীক্ষে সদন বা ভবন নির্মাণের কথা বলা হইতেছে। অতএব এই অস্তরীক্ষ জনপদ বা লোকবিশেষ। কেন না শূন্যে সননির্মাণ সম্ভবপর নহে।

তদ্বিবান্ অস্তরিক্ষে যঃ। ৫। ৮৫। ৫ম

তত্র সায়ণঃ... ...যো বরুণঃ অস্তরিক্ষে তদ্বিবান্। যে বরুণ অস্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেনঃ বরুণ দুইজন, একজন অদিতিনন্দন, অন্য বরুণ মাতা মমুর সন্তান। এই দ্বিতীয় বরুণই ভারতবর্ষহইতে অস্তরীক্ষের অন্তর্গত পারস্যে যাল্লা রাষ্ট্র স্থাপন করেন। গ্রীকগণ ইহাকেই Uranas ( বরুণস্ ) বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই বরুণও কশাপের ঔরসে মাতা মমুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং ইনি “মম্বা”, সুতরাং ইহার বাসস্থান “অস্তরীক্ষ”—শূন্য গগন হইতে পারে না। তথাহি অথর্ববেদঃ—

ত্রয়োলোকাঃ সম্বিতা ব্রাহ্মণেন। দ্যৌরেব অসৌ পৃথিবী অস্তরীক্ষঃ। ২২২পৃ। ২ম ঋগ্বেদ

লোক বা ভূবন তিনটি, দ্যৌ বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিরা, পৃথিবী এই অম্লদধুবিভ ভারতবর্ষ এবং অস্তরীক্ষ। ব্রাহ্মণগণ এই তিন স্থানেরই সত্তা অবগত আছেন। তথাহি—

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুত হবং মে, যে অস্তরিক্ষে যে উপদ্যবিষ্ঠ। ১৩। ৫২স্থ। ৬ম

যে সকল দেবতা অস্তরীক্ষে ও দ্যৌ বা আদি স্বর্গ ( দ্যাবি ) মঙ্গলিয়ার আছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।

বিষাংসো বৈ দেবাঃ

অতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—কৃতবিদ্যা লোকদিগের উপাধি বা নাম দেব বা দেবতা। তাঁহারা কেহ কণ্যপসন্তান ও কেহ কেহ বা ধর্ম্মপুত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের বাসস্থান “অস্তরীক্ষ”, শূন্য হইতে পারে না। তথাহি—

অস্তরিক্ষস্য নৃভাঃ। ৬। ১১০স্থ। ১ম

অর্থাৎ অস্তরীক্ষের লোকদিগের নিকট হইতে বা লোকদিগকে।

অন্তরীক্ষে লোক বাস করিত ? অতএব এহন অন্তরীক্ষ শূন্য গগন হইতে পারে না। অন্তরীক্ষে কোন্ কোন্ নরেরা বাস করিতেন ? তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

অন্তরিক্ষা যা প্রজাঃ গন্ধর্বাঋশসশ্চ যে, সর্বাস্তাঃ । ১৪৩১ পৃঃ।

অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব ও ঋশবঃ প্রভৃতি যে সকল প্রজা বাস করেন, —তাহারা সকলে। তথাহি—

অত্র বসাব্য রত্ন দেবা উরৌ অন্তরীক্ষে । ৩৩৯ সূ। ৭ম।

এই বিত্তীর্ণ অন্তরীক্ষ ধবপ্রভৃতি অষ্টবসু স্থখে বিহার করেন।

বসুরস্বরিক্সং । ৫৪০। ৫ম।

ধবপ্রভৃতি অষ্টবসু অন্তরীক্ষে বাস করিতেন। তথাহি—

অন্তরিক্ষা বিষয় প্রজা ইব চতুর্দিশাঃ । আদিপর্ক।

বিষয় শব্দের অর্থ জনপদ—“বিষয়ঃ স্ত্রাং হৃদ্রিয়ার্গে দেশে জনপদেষাপ” ইতানরঃ। অন্তরীক্ষ যে একটি বিষয় বা জনপদ, উহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এত চার প্রকার প্রজার স্থায়। তথাহি বিষ্ণুপুরাণম্—

পূর্বেণ শৈল্যং সীতা তু শৈলং যাতান্তরীক্ষগা।

ততশ্চ পূর্বাধেণ নন্দাধেনৈব সার্বণম্ ॥ ৩৩২ অ। ২ অংশ।

পশ্চিমে উৎপন্ন সীতা নদী পূর্বমুখী হওয়া অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া এক পর্বতহইতে অত্র পর্বত অতিক্রম পূর্বক ভদ্রাশ্বখর্ব বা বর্তমান চীন দেশ দিয়া পূর্ব সাগরে পতিত হইয়াছে।

অতএব যে অন্তরীক্ষে গন্ধর্বাদি প্রজা সকল বাস করেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দেবতারাও গৃহনির্মাণপূর্বক বাস করিয়া থাকেন, যাহার পর দিয়া উত্তানতরঙ্গময়ী সীতা নদী (ইয়াং শিকিয়াং) প্রবাহিত, সে অন্তরীক্ষ কখনও খেচর পক্ষীদিগের বিহারক্ষেত্র হইতে পারে না। তথাহি—

যং শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষাম্ । অথর্ববেদ

যেহেতু নরিয়ান্তরাজার পুত্র শকগণ (স্থখা বংশীয় ক্ষত্রিয়) শাকারী ভাষা (৩৮৭ পৃ সাহিত্যদর্পণ) বহির্মা অন্তরীক্ষে গমন করেন।

ইহাই ককেশ্য পর্বতের পাদদেশ (তুরক) স্থ আর্যারম (Urzarom) প্রদেশ। স্তবরাং এ অন্তরীক্ষ শূন্য গগন নহে।

সকলেই জানেন যে, মহারাজ ত্রিশঙ্কু ভারতহইতে ইন্দ্রতাপ্রাণ্ডির জন্ত স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু ভোট না পাওয়াতে তিনি ইন্দ্রতাপ্রাণ্ডি না পাইয়া অন্তরীক্ষে আসিয়া মন্তক তেট করিয়া থাকেন, আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন না। যদি মহাভারত ও পুরাণের এই ঐতিহ্য অবিতর্ক হয়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, ত্রিশঙ্কু, শূত্রের দিকে পা ও মাটির দিকে নাথা দিয়া শূত্রো নিরাপদে ঝুলিতেছিলেন? না, তিনি মর্ম্মাহত হইয়া অন্তরীক্ষের একদেশ আফগানিস্থানে আসিয়া তথায় থাকিয়া যান, অপমানভয়ে আর ভারতে প্রত্যাগমন করেন না, ইহাই সত্য?

হে সাক্ষীগ ভ্রাতৃগণ! মাধাকর্ষণহেতু যখন সামান্য একটি কুটাও শূত্র থাকিতে পারে না, তখন পাঁচ মণ ওজনের ভীমের গদা এখনও শূত্রো ঘুগিতেছে ও ত্রিশঙ্কুও শূত্রো পা উপরে, মাথা নীচে দিয়া এখনও ঝুলিতেছেন,

তোমরা কি ইহাও বিশ্বাস করিতে চাহ? যেমন চতুর্পাষ্ঠীর পণ্ডিত কুরূক, মধুর ২৩১অ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—

“তোমরা শ্রোতার্থে কোনও আশঙ্কা করিও না,

উগাতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে,”

ভূরূপ তোমরাও কি ইহাও বিশ্বাস করিতে চাহ যে—ঐশ্বর্য কোনও দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রকৃতির দ্বার অর্গলিত এবং যুক্তির বক্ষে পদাঘাত করিয়া ঐ-রূপে শূন্যে পা দিয়া খুলতোড়লেন ও এখনও রাবণের চিতার মতন খুলিতেছেন? হে ভ্রাতৃগণ! বৈদিক কোষ নির্যন্তুর ১৫শ পৃষ্ঠাতে লিখিত আছে (জীবানন্দী সংস্করণ) যে—

বিয়ং, আকাশ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, ভূ, পৃথিবী ও অধ্বর ইতি ষোড়শ অন্তরিক্ষনামানি।

যদি নির্যন্তকোষপ্রণেতা সূত্ৰমণ্ডিকে এই সকল কথা লিখিয়া থাকেন, আর হিন্দু তোমরা ইহা মানিয়া লইতেও নতকন্দের হও, তাহা হইলে যে অন্তরীক্ষের নাম ভূ, পৃথিবী, সমুদ্র ও অধ্বর, তাহা কি প্রকারে শূন্য হইতে পারে?

আকাশ-গঙ্গা ও সত্যদৃগঙ্গা একই, উহা আমাদের কানী ও কলিকাতা-তলবাচিনী ভাগীরথী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যে আকাশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, সে আকাশ কি প্রকারে শূন্য হইতে পারে? বৃহৎ পরাশর বলিতেছেন যে—

পিতৃগাং স্থানমাকাশং

দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥ ৩৩অঃ।

আকাশ (মেরু পর্বতের) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং উহা আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের পূর্ব-বাসস্থান (চরকের ৫০৩ পৃষ্ঠা দেখ—ত্রিব্রহ্ম উপেন্দ্রনাথ সেন সংস্করণ)।

এখন বল দেখি আমাদের বাপদাদারা কি শূন্যে বাস করিতেন, না কোনও পাদগম্য স্থলে বাস করিতেন? আকাশ বা স্বর্গ কি আমাদের আদি জন্মভূমি নহে? যত্নে চান্দোগোন—

হমানি হ সর্বানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

আকাশ এবং জায়ান আকাশঃ পরায়ণম্।

জগতের এই সমস্ত প্রাণী আকাশহইতে সমুৎপন্ন। আকাশ জগতের সকল অয়ন (জনপদ) হইতে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনতম। তাহা হি অমরসিংহঃ—

স্বর্গদী স্রবদীর্ঘিকা

গঙ্গা বা ভাগীরথীর নামান্তর স্বর্গদী (স্বর্গের নদী) বা দেবগণের দীর্ঘী।—সুতরাং এ আকাশ শূন্য বা Sky নহে পরন্তু আদি-স্বর্গ এই মঙ্গোলিয়া (বৃহদারণ্যকেও আছে যে আকাশ মনুষ্যদিগের আদি বাসস্থান।) ঐরূপ সীতা নদী ও গঙ্গাবাদির বিহারক্ষেত্র অন্তরীক্ষও শূন্য সংস্থা নহে, পরন্তু তুরূক, পারস্ত, ও আফগানিস্থান।

আরও দেখ, শূন্য গগনের আর একটি নাম যে ভূ বা পৃথিবী, ইহাও বোল আনা মিথ্যা কথা। কেন নির্যন্তু অন্তরীক্ষকে ভূ ও পৃথিবী নামে সংস্থিত করিলেন? যেহেতু ভারতবর্ষের নাম ভূ ও পৃথিবী, একারণ ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনাধীন তুরূক, পারস্য ও আফগানিস্থান অর্থাৎ অন্তরীক্ষের নামও ভূ ও পৃথিবী হইয়াছে। বেদে অন্তরীক্ষ—মধ্যমা পৃথিবী নামে বিবৃত—

অবমতাং পৃথিব্যাং মধ্যমতাং পৃথিব্যাং পরমতাং পৃথিব্যাং ২।১০।১ম।

অবশ্য পৃথিবী—ভারতবর্ষ, পরমা পৃথিবী আদি স্বর্গলোকে এবং এই মধ্যমা পৃথিবীই অস্তরীক্ষ (সারণ ভাষা দেখ)। তৈত্তিরীয় বৈদিকগণকেও বরুণের অস্তরীক্ষ বাসস্থান “তৃতীয় পৃথিবী” বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বাহার নাম ভূ এবং পৃথিবী, তাহা শূন্য গনন হইতে পারে না।

আরও দেখ—অস্তরীক্ষের আর একটি নাম “সমুদ্র”। শূন্য গগন সমুদ্র বা সাগর নহে, সুতরাং সমুদ্রাপরনামা এই অস্তরীক্ষ শূন্য হইতে পারে না। না পারুক—তথাস্ত—কিন্তু স্থলময় তুরুরু, পারশ্ব ও আফগানিস্থানের নামই বা “সমুদ্র” হইল ও হইবে কেন? উহাদের নাম সমুদ্র হইবার কারণ, এই যে উহারা পশ্চিম সাগরগর্ভে সন্নিবিষ্ট—

ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ।১।১২০।১০ম।

ঈশ্বরের সেই উৎকট তপস্তাহইতে পশ্চিম সমুদ্রগর্ভে (অর্ণবঃ অধি অর্ণবাৎ অধি অর্ণবগর্ভে, ঐ মন্ত্রের ২য় চরণ দেখ) সমুদ্র বা অস্তরীক্ষ (এই মন্ত্রের সারণভাষা দেখ) জন্মগ্রহণ করে।

উহারা সমুদ্র বা জলপ্রধান ছিল, তাই উহাদের নাম সমুদ্র ও আপঃ (এই আপঃ হইতেই অপোগস্থান বা আফগানিস্থান শব্দ প্রসূত)।

আচ্ছা, সারণ যে সমুদ্র শব্দের অর্থ অস্তরীক্ষ করিলেন—তাহা যেন নিবন্টু অহুসারেই করিলেন, কিন্তু উহার নিগম বা শিষ্টশ্রয়োগ কোথায়? মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

ত্রিতো বিভক্তি বরুণঃ সমুদ্রে । ৪।২৫।২ম।

ত্রিতনামক দেবতা মাতা মম্বর সন্তানবরুণকে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র বা অস্তরীক্ষে লইয়া যান।

তাই পৌরাণিকেরা বলিয়া গিয়াছেন বা বলিয়া থাকেন যে—

সমুদ্রো বরুণালয়ঃ ।

সুতরাং বরুণ যখন কচ্ছপ বা কুম্ভীর নহেন, তখন এই “সমুদ্র,” না সাগর ও না শূন্য গগন বটে? তথাহি—  
অথর্ষবেদঃ—

অঙ্গু তে রাজন্ বরুণ! গৃহো হিরণ্যঃ । ৪২০ পৃষ্ঠা। ২য় খণ্ড।

হে রাজন্ বরুণ! অঙ্গু অর্থাৎ অস্তরীক্ষে তোমার যে গৃহ আছে, উহা লৌহময় (হিরণ্য—লৌহ ও স্বর্ণ)।  
তথাহি—যজুর্বেদঃ—

মহুব্যান্ অস্তরিক্ষ মগন যজ্ঞঃ । ৬ ক—৮অ—

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, মাতামহুর সন্তান মহুব্যাগণকে (বরুণ প্রভৃতি) অস্তরীক্ষে লইয়া যান। তথাহি—

বায়ুমস্তরিক্ষাৎ । ৩০০ পৃষ্ঠা ছান্দোগ্য মহেশপালসংস্করণ।

প্রজাপতি সুরভ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা অস্তরীক্ষ অর্থাৎ অস্তরীক্ষের অন্তর্গত আফগানিস্থানহইতে যজুর্বেদমন্ত্রসমাহারার্থে মংঘি বায়ুকে (৪২।২ অ মন্ত্র দেখ) গ্রহণ করেন। তথাহি—

অথ দ্যাতানঃ পিত্রোঃ সচাসা

অমম্বুত শুভং চাক্র পুত্রৈঃ ।

মাতৃঃ পদে পরমে ঐশ্বরি সৎ গোঃ । ১০।৪২।৫ম।

পুত্রি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। ( ১৬৬২/৬৩ম ভাষা দেখ )। মর্ষি ছাতান ( Teuton ) পিতৃভূমি স্বর্গহট্টে ( Paradise lost হট্টে ) মাতৃভূমি ভারতে আগমন করিয়া এখানে বহুকাল বাস করেন। তৎপর অন্তরীক্ষ বা তুরুক্ষ, পারস্ত ও আপগানিস্থান স্থলে পরিণত হইলে তিনি

মাতা গো বা পুত্রির অংশে তুরুক্ষে

একটি গোপনীয় স্থান মনোনীত করিয়া তথায় গমন করেন এবং তিনিই তথায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ও ব্যাবিলোনিয়াপ্রভৃতি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেবগুরুবর্মমহুয্যাদির বাসস্থান এই অন্তরীক্ষ গগন বা শূন্য হট্টে পারে না।

আরও দেখ গগন বা শূন্যের নাম “অধ্বর” ইহাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহ অবগত নহেন। সুতরাং অন্তরীক্ষ—শূন্য গগন হট্টে পারে না। আচ্ছা তুরুক্ষ ও পারস্তাদির নামই বা “অধ্বর” হইবে কেন? না উহাদের নামও অধ্বর নহে, কিন্তু “অন্তরীক্ষ”।

তবে নিষট্টু কেন অন্তরীক্ষপর্যায়—“অধ্বর” শব্দের পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন? আর অষ্ট বহুরা ত প্রথম অমৃত বা তিব্বতবাসী—

তং হ যং প্রথম মমৃতং তং

বসব উপজীবন্তি আগ্ননা মুখেন। ছান্দোগ্য

অষ্ট বহু প্রথম অমৃতে মহর্ষি অগ্নির নেত্র হইয়া বাস করিতেন। তবে কেন ঋগ্বেদ বহুগণকে “অন্তরীক্ষসং” বলিয়াছিলেন? কেনই বা বিষ্ণুপুরাণ তিব্বতপ্রভাবা ও তিব্বতপ্রবাহিতা সীতা নদীকে “অন্তরীক্ষগা” বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন? তিব্বত ত তুরুক্ষাদির অন্তর্গত মহে?

এ অতি সত্য কথা। প্রথমতঃ দ্যো ( আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ) এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অন্তঃ মধ্যে দেখা যায় ( দ্যাবা পৃথিব্যোঃ অন্তঃ মধ্যে ঈক্ষাতে দৃশ্যতে ততি অন্তরীক্ষং )—এই বিগ্রহে তুরুক্ষাদির অন্তরীক্ষ সংজ্ঞা হয়। ঐ সময়ে তিব্বত ও তাতার এবং সাইবিরিয়া বা ত্রিদিব স্থলে পরিণত হইয়াছিল না। তৎপর যখন ত্রিদিবের ( মতঃ—তপঃ সত্য ) উৎপত্তি হয় ( ১২—১৯০স্থ—১০ম ) ও সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা বাইরা উহার নাম “স্বঃ” ও আদি স্বঃ দ্যোর নাম “পিতা” বা পিতৃভূমি ( Fatherland ) রাখেন, তখন সকলে ভ্রান্তিবশতঃ—

দব ও দ্যো ( দ্যোদিবো দ্বে দ্বিত্বো। অমর )

এক ভাবিয়া বসেন, তখন কৃত্রিম দ্যো ( ত্রিদিব ) এবং পৃথিবীর ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী আসল দ্যো ও তিব্বত তাতারকেই সকলে ভ্রমবশতঃ অন্তরীক্ষ ঠাঠরিয়া বসেন। সেহ ভ্রান্তির যুগে প্রণীত কতিপয় ঋগ্বেদে এবং বিষ্ণু-পুরাণে তিব্বত—অন্তরীক্ষ ( বহুরন্তরীক্ষসং ) এবং ( সীতাগাং অন্তরীক্ষগা ) নাম ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া

দ্যো ( মঙ্গলিয়া )

হরিবর্ষ ( তাতার )

কিম্পুরুন্দর্য ( তিব্বত )

এই স্থানগুলিকে দিবাং নভঃ, বা দিবাং অন্তরীক্ষং নামে সংহতি করেন। কালে পরবর্তী ঋষিরা উক্ত স্থানত্রয়কে—

“মধ্যস্থান”

বলিয়া বিশেষিত করিয়া দেন। তাই যাহ—ইজাদি দেবগণকে মধ্যস্থানবাসী দেব বলিয়া সংহতি করেন।

অতঃপর আমরা আর্ষাযুগের বেদভাষ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও সায়ণাদির ভাষা দ্বারা সপ্রমাণ করিব যে “অস্তরীক্ষ” শূত্র গগন নহে, পরন্তু উহা ভুবলোক এবং উহা একটা জনপদ, যাহাতে গন্ধর্বাদি সকলে বাস করিতেন।

তন্মোয়িং যুতবং পয়ো বিপ্রা রিচ্ছন্তি ধীতিভিঃ ।

গন্ধর্কস্য ঐবে পদে ॥ ১৪।২২খ।১ম

তত্র সায়ণভাষ্য—গন্ধর্কস্য ঐবং পদং অস্তরীক্ষং । তথাচ তাপনীরশাধায়াং সমান্নায়তে—

যক্ষগন্ধর্কস্পরোগণসেবিতং অস্তরীক্ষং ইতি ।

বিপ্রগণ গন্ধর্কদিগের দেশে অস্থলি দ্বারা যুতের ন্যায় ঘনীভূত বরফ (যুত—যুতসমুদ্র—বরফময় সমুদ্র) লেচন করিয়া থাকেন। উক্ত গন্ধর্কগণের দেশের নামান্তর অস্তরীক্ষ, তথায় যক্ষ, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ বাস করিতেন। তথাহি—অথর্কবেদঃ—

যে চ মানবাঃ । ১৮৭পৃ ৩য় খণ্ড ।

অস্তরীক্ষ, দিব (দ্বালোক—সাইবিরিয়া) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষে যে সকল মনুষ্যাগণ (মাতা মজুর সন্তান বরণ প্রভৃতি) বাস করেন।

গন্ধর্কো অঙ্গু । ৪।১০।১০ম

অপ্ অর্থাৎ জলপ্রধান অস্তরীক্ষে গন্ধর্বগণ বাস করেন। তথাহি—

সমুদ্রিয়া অঙ্গরসঃ । ৩।৭৮।২ম

অঙ্গরোগণ সমুদ্রপ্রভব অর্থাৎ অস্তরীক্ষবাসী। তথাহি—

যং অস্তরীক্ষে । ২।৯২।৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... অস্তরীক্ষে গন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতে মধ্যমে লোকে ।

যে অস্তরীক্ষাৎ । ৩২৫পৃ ১ম খণ্ড অথর্ববেদঃ

তত্র সায়ণঃ ... ... অস্তরা দ্যাবাপৃথিব্যাঃ ঈক্ষিতং অস্তরা ক্ষাত্বং বা  
যক্ষগন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতং অস্ত রক্ষং ।

অস্তরীক্ষে । ২।৯৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... গন্ধর্বাদিভিঃ সেবিতে মধ্যমে লোকে ।

অস্তরীক্ষাৎ । ৩৮।৮ম

তত্র সায়ণঃ ... ... অস্তরীক্ষাৎ মধ্যমাং লোকাং ।

অস্তরীক্ষে । ১৬৭পৃ অণব ১ম খণ্ড

তত্র সায়ণঃ— ... .. দ্যাবাপৃথিব্যা মধ্যবর্ত্তিনি লোকে ।

অস্তরীক্ষেণ । ৬২৪পৃ ঐ

তত্র সায়ণঃ... ... দ্যাবাপৃথিব্যা মধ্যবর্ত্তিলোকেন ।

অতএব বাহা ছো (স্বর্গ) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) র মধ্যে বর্ত্তমান একটি গৌমাবন্ধ লোক বাহা দর্শনযোগ্য—বাহা যক্ষগন্ধর্বাদির বাসভূমি, তাহা কি প্রকারে শূন্য বা গগন হইতে পারে ?

আচ্ছা গন্ধর্বগণ ত পারলৌকিক স্বর্গবাসী? কোনও পারলৌকিক স্বর্গের কথা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। যদি কেহ হিন্দুশাস্ত্র হইতে পারলৌকিক স্বর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা—

“তেগং বহেয় মুদকং ঘটকর্পরেণ।”

তবে উহা ভাষ্যকারদিগের ভাষা এবং দাশরথির পাভালাতেই আছে। যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব, জুহোয়ানকে বাকিয়া রাখেন, তখন কি অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া মুক্ত করেন না? এখনও আত্মিদিগের দেশে “গান্ধাব”

নামে একটা নগর আছে। উহাই গন্ধর্বগণের নগরবিশেষ, আমরা কি পারলৌকিক গন্ধর্বদিগের নিকট গন্ধর্ব-বিবাহপ্রথা পাইয়াছিলাম? এখনও কি ভারতবর্ষে সঙ্গীতাবলম্বী গন্ধর্বী (গান্ধাবী) ও কিল্লরগণক (মধুকান প্রভাতকে) দেখা যায় না? দেখ মহামায়া রামায়ণও বলিতেছেন যে—

ভরতঃ শুধাজ্ঞান সমেতো লবুবিক্রমো।

গন্ধর্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদাহুগৌ ॥ ৩

ততঃ সমভবৎ যুদ্ধং তুমলং রোমধ্বংগং।

সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়ো জয়ঃ ॥ ৫

ভতেষু তেষু সর্বেষু ভরতঃ কেকয়ীভূতঃ।

নিবেশয়ামাস তদা সমুদ্রে যে পুরোত্তমে ॥ ১০

তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুঙ্কলং পুঙ্করাবতে।

গন্ধর্বদেশে কচিরে গান্ধারবিশয়ে চ সঃ ॥ ১১। ১০১ সর্গ। উত্তরকাণ্ড

ভরত গন্ধর্বগণকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তাঁহাদিগের দেশ গান্ধারে পুত্র পুঙ্কর ও তক্ষের নামে পুঙ্করাবতী ও তক্ষশিলা (ট্যাকশিলা) নামে দুই নগর স্থাপন করেন।

এই পুঙ্করাবতী এখন পেশোয়ার ও গান্ধার কান্দাহার। সুতরাং গান্ধার বা কান্দাহার : যে আফগানিস্থানের অন্তর্গত, সেই আফগানিস্থান কি অন্তরীক্ষের এক দেশ নহে? সর্ববেদে ইহাও আছে যে—এই অন্তরীক্ষ দিয়া দেবদান পথ প্রসারিত এবং মর্যাদ দেবগণ এই অন্তরীক্ষ পথে—ভারতবর্ষে আগমন করেন। সুতরাং এতেন অন্তরীক্ষ কি শূন্য বা গগন হইতে পারে?

আচ্ছা আফগানিস্থান ভিন্ন তুরস্ক ও পারস্যও কেন অন্তরীক্ষমধ্যগত হইবে? যেহেতু স্বর্গবেদে আছে যে—

ত্রীণ অন্তরীক্ষা।

অন্তরীক্ষ তিনটা (ত্রিধা), সুতরাং একারণ আমরা তুরস্ক ও পারস্যকেও অন্তরীক্ষ বলিতে বাধ্য। বরূপ এই পারস্যেরই রাজা ছিলেন। আচ্ছা কেন উহাই হটক না যে তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানও অন্তরীক্ষ, আবার শূন্য বা গগনও অন্তরীক্ষ? এক শব্দের কি নানা অর্থ থাকেনা?

ইহাও আত্ম সত্য কথা। কিন্তু যখন প্রামাণ্য যজুর্বেদ বলিতেছেন যে—

কো অস্যা বেন ভুবনস্য নান্ধিঃ,

কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষঃ। ৫৯ক—২৩৩

এই ভুবন বা তুমুলসহ সকলের নান্ধি বা আত্মপত্তিস্থান (৪। ১০। ১০ম ভাষ্য দেখ) কি তাহা কে জানে? দ্যাবাপৃথিবী কাহাকে কহে—তাহা কে জানে? অন্তরীক্ষ কাহাকে বলে—তাহা কে জানে? অর্থাৎ কেহই জানে না।

জাহা তইগেই জানা গেল যে—এই মন্থপ্রশংসনের সময়ে সকলে অন্তরীক্ষ কাশাকে বলে—ওগতের আদি উৎপত্তিস্থান কি—ছায়াপৃথিবী বলিতে কি বুঝায়, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপরবর্তী কালের মন্থনমুহুর্তে অন্তরীক্ষ “ব” বা পক্ষগণের দিহাশব্দে শূন্য বা গগনে পরিণত হইয়াছে। ( ৭। ২৫ সূ। ১ম ) ফলতঃ উহা অগত প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আচ্ছা, ছায়াপৃথিবী কি ? ছো ও পৃথিবী—অর্থাৎ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং এষ্ট ভারতবর্ষ। আচ্ছা, অন্তরীক্ষকে “যজ্ঞ” বা “অধ্বর” বলে কেন ? দিবা নভঃ বা দিবা অন্তরীক্ষের নাম যজ্ঞ বা অধ্বর। উহা মানবের আদি ওম্মাভূমি, তজ্জন্ত উহাকে অন্তরীক্ষপর্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্ত নাভিঃ । ১৫। ১৬৪। ১ম । ৬২। ২৩ অঃ যজুর্বেদ ।

এই “যজ্ঞ” বা “অধ্বর” সকল ভুবনের নাভি বা আত্মউৎপত্তি স্থান। আচ্ছা, “যজ্ঞ” শব্দের অর্থ যে স্বর্গ, তাহা ত পৃথিবীর কেহই বলেন না ও জানেন না ? যাহারা বেদ পড়েন নাই বা পড়িয়া বুঝেন নাই, তাহারা জানিবেন কি প্রকারে ?

যজ্ঞো বৈ স্বঃ । ১১ক । ১অঃ ভাষ্য । যজুঃ ।

স্বঃ বা স্বর্গের নামান্তর যজ্ঞ। তপাতি—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণঃ—

এতৎ থলু বৈ দেবানামপর্যাক্তত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ । ৯৪৫পুঃ ।

যজ্ঞ বা স্বর্গ জনপদ দেবতাদিগের একট অপরাঙ্কের আয়তন অর্থাৎ জনপদ।

যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে । ইতি শ্রুতেঃ ।

এই যজ্ঞ বা আদি স্বর্গ ছোহইতেই সকল প্রজা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ( ১। ১৩০ সূ। ১০ম দেখ )

অতএব সকলে ভাবিয়া দেখুন অন্তরীক্ষ শূন্য, না তুরষ্ক, পারস্ত ও অপোগস্থান। নভঃ ও অন্তরীক্ষ ?

আচ্ছা অন্তরীক্ষের ইকার দীর্ঘ করা হইল কেন ? ঋষিরা ত “অন্তরিক্ষ” বানান ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ? কিন্তু হঁহা আর্ষ প্রয়োগ। ঋষিরা ত বশিষ্ঠ।

শব্দ ও “বশিষ্ঠ” বলিয়াও লিখিতেন। ফলতঃ উহা ঋষিগণের লিপিকৃত ভ্রম। আচ্ছা অন্তঃ ও ঋক্ষ শব্দের কোন সমবায় অন্তরিক্ষ শব্দ ব্যুৎপাদিত হউক না ?

তাহাতে অর্থ কি হইবে ? অন্তঃ = মধ্য এবং ঋক্ষ = নক্ষত্র। ইহাতে ত কোন অর্থ হাজির করে না ? উহার যোগে ত—অন্তর্ঋক্ষ। ভিন্ন অন্তরিক্ষ বা অন্তরীক্ষ হইতে পারে না ?

আচ্ছা “নভঃ” যে শূন্য নহে, তাহার প্রমাণ কি ? ল্যাটিনগণও ত ইহা ( Nobis ) শূন্য গগনার্থে প্রয়োগ করিতেন ? ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্বে ভারতসম্ভান। সুতরাং তাহারা ল্যাটিন যুগে এদেশ পরিত্যাগ করিতে ইউরোপে নভঃ—শূন্য ও আকাশ—sky হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে “নভঃ” যে কোনও সীমাবদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা সপ্রমাণ হয়। যথা—

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তার পরিসমুদ্রাৎ ।

নভঃ স্তাবৎ প্রমাণং বৈ, ব্যাস মণ্ডল ভো দ্বিজ ॥ ৪। ৭অ। ২অংশ



হে দ্বিজ ! পৃথিবী বা ভারতবর্ষের ভূমিপরিমাণ যত, নভেরও ভূমিপরিমাণ তত । ইহার পরও কি কেহ বলিবেন সে নভঃ, ভুবলোক ও অন্তরীক্ষ, মূলতঃ শূন্য গগন ছিল ?

আমরা এই জগতই একখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অভিধান রচনা করিতেছি, যাহাতে বৈদিক ও লৌকিক সকল অর্থই থাকিবে । আমরা বারাহতরে “মাতা মনু” এই প্রবন্ধে দেখাইব যে—জগতে মনু নামে একজন নারীও বিদ্যমান ছিলেন । যিনি যজুর্বেদীয় লোকদিগের বিশেষতঃ জম্বীর্ণদিগের পূর্বপিতামহী ।\*

শ্রীউঃমশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ।

## দুজনের একজন ।

—:~:—

( E. W. Wilcon )

আসিবে সেদিন, যবে এ-দুয়ের কোনো একজন  
 বুখাই পাতিয়া রবে সজাগ শ্রবণ  
 শুনিতে সে বাণী যাহা কারো কণ্ঠে ফুটিবে না আর ।  
 প্রভাত মিলায়ে যাবে বার বার এসে,  
 মধ্যাহ্ন মলিন হবে জ্বলে জ্বলে শেষে,  
 ধরণীরে ঘিরে ঘিরে আসিবে আঁধার—  
 করুণ দু'খানি তাঁখি প্রতীক্ষায় চেয়ে রবে তবু,  
 সেই পদধ্বনি-আশে যাহা আর ফিরিবে না কভু ।

( ২ )

এ-দুয়ের একজন,—অনতিবিলম্বে যাবে দেখা,—  
 ভেসেছে জীবন-স্রোতে নিতান্তই একা,  
 সঙ্গীহারা, স্মৃতিবিহীন প্রাণ  
 যে-প্রাণে বাজে রে শুধু বেদনারি গান ।  
 এ-মধুর দিনগুলি তখন হয়তো কোনো নবযুগে, মরি,  
 দাঁড়াইবে নবরূপ ধরি'  
 জ্যোতিঃস্নাত প্রাতে  
 বাসন্তী-উষার যেন স্বপ্ন, আহা বরষার রাতে ।

\* ঐযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুকাল হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সকলেরই প্রাণধানযোগ্য ; কিন্তু তাহার উক্তি ও যুক্তিতে এমন অনেক কথা দৃষ্ট হইবে যাঁহা প্রচলিত মতবাদ হইতে বিভিন্ন । তিনি যখন কোচবিহারে সংহারণ সভায় বৈদিক প্রমাণাদি সাহায্যে কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেন, তৎকালে স্থানীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে এত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । আমরা সেটাকে প্রাণেরই পরিচয় বলিয়া মনে করি । যদি কাহারও পাত্তিত নহাণয়ের বক্তব্য সযত্নে কিছু বলিবার থাকে, তাহা সংযত ভাষায়, যুক্তিযুক্ত ভাবে ১০/১১ পাতাইলে আমরা পত্রস্থ করিতে প্রস্তুত আছি । সঃ

( ৩ )

দু'জনের একজন লইয়া বেদনা-দীর্ঘ হিয়া ;  
 ভিজাইবে লবণাক্ত দিয়া  
 যতনে জমায়ে রাখা পত্রগুলি বহুদিনকার ;  
 ক্লিষ্ট ওষ্ঠপুটে বারংবার  
 চুমিবে প্রত্যেক প্রিয়-স্মৃতিটীয়ে তুলি',  
 লজিতে তাহারি মাঝে, প্রীতি-সিক্ত এই সব, মধুবর্ষাগুলি ।

( ৪ )

দু'জনের একজন, অতঃপর করুণ-নয়নে  
 দেখিবে গো একা জাগি' বিরহ শয়নে,  
 এ-সৌন্দর্য্য, এ-আলোক, হাসিভরা এই বহুকরা  
 যেন বা গল্পের ছবি,—যে-গল্প এইরা গেছে শেষ ;  
 ভাবিবে রে—এ-জীবন শুধুই নীরস কার্য্য করা ;  
 সে হতভাগ্যেরে তবে, আশীর্ব্বাদ কর আজ, ওগো পরমেশ ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ খোষা ।

## মিষ্টি সরবৎ ।

—:~:—

( ১৮ )

বৈকালে রোগীদের ডাকাডাকির তাড়ার সহর আহমদ-সংগেব দাওয়াইখানায় চলিয়া যান । সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত খাটিয়া একদকা অত্যাগতগণকে বিদায় করিয়া, দাওয়াইখানা হইতে উঠিয়া তিনি উপরে চা খাইতে গেলেন, ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর আলোটা খুব উজ্জলভাবেই জ্বলিতেছে বটে,—কিন্তু চার দিক দৃষ্টি সঞ্চালনে অহুসঙ্কান করিয়া বুঝিলেন—সবই অন্ধকার ! আমিনা নাই !

নিরুৎসাহভাবে বাহিরে আসিয়া, বারেরবার এদিকে ওদিকে বার কতক পায়চারী করিয়া—অবশেষে,—নিশ্চেষ্ট-করণ কণ্ঠে হাঁকিলেন “রত্নম, মেরে চা লাও —”

রত্নম উত্তর দিল “জী হাঁ, মে-বি বাতে হে—”

আহমদ-সংগেব এবার নিঃসন্দেহেই বুঝিলেন, আমিনার দর্শন আশা বৃথা ! সে আজ এখন কিছুতেই আসিতেছে না ! অগত্যা হতাশ-ভর্য চিত্তে, বারেরবারেই সেই ইজি-চোরারটার উপর আড় হইয়া পড়িয়া, স্নান দৃষ্টিতে সামনের

দেয়ালের আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই ঘটনার পর আমিনাকে আর দেখিতে পান নাই, কাজেই মনটা কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের বোধ হইতেছিল।

মিনিট কর পরে রস্তম চা লইয়া সামনে আবির্ভূত হইল, প্রকুর হাতে চা পাত্র দিয়া চোর-চোখে-দৃষ্টিতে সন্তরে একবার শয়নকক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি বলিল “হুজুরং বিবি-সা’ব ইয়ে কোঠারি কো অন্তর মে হ্যার হুজুব?”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “না এখানে তো নাই, কেন, কি থকর?—”

রস্তম যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!—মাথা নীচু করিয়া একবার ততস্ততঃ চাহিল। তারপর—চোখে একটু জল আনিবার চেষ্টায়, প্রাণপণে চোখ রগড়াইয়া কান-কান সুরে বলিল “তুফানী দিদি আমার তারপর ঝাঁটা মারতে এসেছিল, হুজুর—”

আহমদ-সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন “মারতে এসেছিল? মারেনি তো?”

বৎসরোনাখি ক্ষুণ্ণভাবে রস্তম করুণকণ্ঠে বলিল “না ঝাঁটা মারেনি।—তবে গালে একটা চড় মেরেছে—” সন্তানা দিয়া প্রভু বলিলেন “আঃ তাতে কি হয়েছে? দিদি বলে তো ডাক তাকে,—তা ছোট তাইটা তুমি, আদর করে না-হয় একটা চড়ই মেরেছে, ওকি আর থরতে হয়! তা শোন,—তুমি তো তাকে উল্টে চ’ড়াও নি?”

ফাঁশ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সকাভেরে রস্তম বলিল “না হুজুর, আওরাং বে—”

সব্বট হইয়া প্রভু বলিলেন “হাঁ ঠিক। মনে রেখো যতই কাজিয়া হোক,—যতই রাগ হোক, থবরদার—জংলী জানোরারের মত কক্ষণো আওরাং-লোকের গারে হাত তুলোনা, আর চাষা-চোরাদের মত মুখ ছুটিয়ে গালাগালি কোর না, খুঁসি হয় আদর করে “মুখপুড়ি, পোড়ার মুখটা” বলতে পার, বাস্—তার ওপর আর উঠো না,—বুঝ্লে, মনে থাকবে তো?”

ঘাড় নাড়িয়া রস্তম স্বীকার করিল, থাকিবে—।

পকেটে হাত দিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “তোমার তুফানী দিদি, ক’টি চড় মেরেছে? মোটে একটি?”

আন্তরিক হৃৎখের সহিত রস্তম বলিল “হাঁ হুজুর, মোটে একটি—” সঙ্গে সঙ্গে পুনশ্চ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চোখ রগড়াইল!

প্রভু তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন “যাক তাতে আর আপশোষ করে কি হবে? তবে হু’গালে দুটি চড় হলেই বেশ ভাল হোত, না রস্তম? আচ্ছা নাও এই দুটি টাকা, একটা গোয়েন্দাগিরির বখশীস্! একটা চড় খাওয়া’র বখশীস্ খুশী তো?”

সলজ্জ-সন্তোষে কুণ্ঠিত করিয়া রস্তম বলিল “বো হুজুম খোদাবন্দ—”

আহমদ-সাহেব চা-এর পেরালা তুলিয়া চুমুক দিয়া একটু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন “বিবি-সাহেব কোথায় রে?—”

রস্তম চুপি চুপি বলিল “কি জানি হুজুর কোথায়। তিনি আজ বড় খালী হয়েছেন, আমার ওপরও বহুৎ গোসা করেছেন, আমি কষ্টের কবুল করে পারে পড়ে মাগ চেয়েছিলুম,—তিনি আমার কথা টের পেতেন না হুজুর, এই তুফানী দিদি মুখপুড়িটাই আমার নাম বলে দিলে—না হ’লে—”

মাথা দিরা আহমদ-সাহেব বলিলেন “খুশী হয় তো আদর করে একবার মুখপুড়ি বলতে বলে দিচ্ছি বলে—সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখপুড়িটা হয়ে গেল? না রস্তুম, তুমি বড়ই বেয়াদব হয়ে উঠেছ। নাঃ তুমি ওসব কিছুই বলতে পাবে না, সেরেক্ দিদি—”

খতমত খাইরা রস্তুম বলিল “জী হাঁ হুজুর দিদি—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “তারপর? মাক্ চাওয়াতে বিবি-সাহেব কি বলেন?”

মাথা চুলকাইরা কুণ্ঠিতভাবে রস্তুম বলিল “বাও, তোমার মাক্ চাওয়াতে হবে না, মনীর আদর দিয়ে দিয়ে তোমার কাঁচা মাথাটি কড়মড়িয়ে চাবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন,—তোমার মধ্যে আর কোন পদার্থ নাই, কাল থেকে তুমি অন্যরে ঢুকা না।”

চার পেরালা নামাইরা ক্রমাগত মুখ মুছিয়া আহমদ-সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন “বেশ, অন্যর ঠিকের, অন্যরে ঠিক যদি ঢুকতে পারত করত, ঢুকোনা, কাল থেকে সদয়ে মনহরের জাভাগর তুমি বহাল হোয়ো, মনহর অন্যরে তোমার কাল করবে—”

রস্তুমের মুখ স্নান হইয়া গেল, কিন্তু তবু সে মোরিয়া হইয়া, শেষ চেষ্টা দেখিবার আশায় বলিল “কিন্তু আবার যদি কোন দিন খুশী হয়ে বলেন ‘রস্তুম তুমি অন্যরেই বললি হয়ে আয়’ তা হলে কি আস্ব জনাব?”

আহমদ-সাহেব ব্যাধ নাড়িয়া বলিল “হাঁ আলবৎ”

আখাস পাইরা রস্তুম, পরম আশাষিত হইয়া উৎসাহিত কর্তে বলিল “বিবি-সাহেব আমার উপর রাগ করেন বটে কিন্তু বেশী দিন ‘নারাজ’ হয়ে থাকেন না, একটু রাগ পড়লেই আবার খুশী হয়ে বহৎ মিঠা বাৎ বলেন ‘আপুনে বাচ্চা-মাকিক’ আমার পিয়ার করেন হুজুর।”—বাগতে বলিতে চঠাৎ সে থামিল, কি একটা কথা মনে পড়ার ব্যস্ত-ভাবে বলিল “আজ শুধু আমার ওপরই গোসা করেন নি, বহৎ-বিবিজীর ওপরও বহৎ নারাজ হয়েছেন, ঠকে বলেছেন ‘তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কোরো না, আমার কাছে এসো না—’ ওনে তো উনি কান্নাই জুড়ে দিয়ে-ছিলেন হুজুর!—সে কি কান্না!”

মুহুর্তে সহাস্তবদন আহমদ-সাহেবের শাস্তসংবত অন্তরটা অত্যন্তই বিচলিত হইয়া উঠিল! কারণ এমন নির্দারণ হঃসংবাদটা আবলুকে শুনাইরা প্রাণ খুলিয়া খানিকটা হা-ছতাল করিয়া লইতে হইবে কিনা।—ঐশ হইয়া বলিলেন “ছোট মিঞা কোথায়? জলদি ডাক জলদি ডাক—”

রস্তুম বলিল “তিনি বাড়ীতে নাই হুজুর, সেই বিকালবেলা রান্না-বাড়ী থেকে এসে পোষাক পরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো করেন নাই।”

হত্যা হইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “কেনেন নাই? আচ্ছা রস্তুম এক কাজ করতে পারিস, তোর বিবি-সাহেবকে একবার খুঁজে আনতে পারিস?”

ঠিক সেই মুহুর্তে বাহিরের দিকে সিঁড়ির দুয়ার হইতে, ওয়াহেদ-ভূতা সবিনয়ে নিবেদন করিল “বেমারী লোগ্, মূলকাত মাংতে জনাব—”

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “থাক রস্তুম, থাক এখন, আর নয়। কিন্তু আজ আমি চট-পট কাজ সেরে ওপরে আস্ব, ঠিক সাড়ে আটটা বাজলেই আমার খান দিতে বোলো—”

সেই চপল-পরিহাস-প্রিয় সদামঙ্গল মানুষটি মুহূর্তে আবার স্থির-সংযত হইয়া, নিঃশব্দে দূরত্ব কর্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সে মুহূর্তের গভীর মুখভাব দেখিয়া কে বহিবে হান মুহূর্ত পূর্বে এমনভাবে হাসিতেছিলেন।

( ১২ )

রোগীদের কাজ শীঘ্র সারিয়া, রাজি সারে নরটা বাজিতেই আহমদ-সাহেব উপরে আসিলেন। আহাটটা তৎপূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

উপরের বারেকায় পা দিয়াই, আহমদ-সাহেব তুলিলেন তাঁহার পোষাক কামরায় একাধিক কাষ্ঠের কলসর তুলনা চলিতেছে, তাঁহার মধ্যে আবলুর ও জোটা শ্যালিকা—অর্থাৎ রত্নমান-সাহেবের স্ত্রীর, সুকোমল হাস্যধ্বনিও তুলিতে পারিলেন। একটু বিশ্রিত চট্টা তিনি ডাকিলেন—“আবলু”—

আবলু সেখানে হইতেই সাড়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আলো হাতে কইয়া অগ্রসর হইয়া জোটা শ্যালিকা বলিলেন “কে আহলু নাকি ?”

সমস্তই আহমদ সাহেব বলিলেন “আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যে এমন সময়, এখানে ?”

শ্রিত কোমল-হাস্যে তিনি বলিলেন “এস তো ভাই, তোমার বকুনী দেবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি।—আহলু তুমি মিথোই মড়া কেটে ডাক্তারী শিখেছ, আর মিথোই চিকিৎসার জোরে মস্ত মস্তব্যকে জীহ্ব করে বেড়োচ্ছ, মাথো দেখি তোমার ঘরেই কত বড় একটা মস্ত তরুতরাসে তুত পোষা রয়েছে, তুমি কি রকম ডাক্তার ?

আহমদ সাহেব বুঝিলেন,—আমিনার সম্বন্ধেই কথা হইতেছে, এতটু হাসিয়া তিনি নিরস্তুর রহিলেন।—আবলু আমিনার চেয়ে বড়ই বয়সে বড় ধোন, তিনি যে আহমদ সাহেবের সমবয়স্ক, স্ততরাং তাঁহার সামনে অকাতরে রক্তস্নান-প্রকৃতি স্রোত বহাইতে আহমদ-সাহেবের নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ নয়। কিন্তু এই মাননীয়া বয়োজ্যেষ্ঠা শ্যালিকা—ইহাকে তিনি—একটি চোট-খাটো গুরুজনের সামিল বোঝাই মনে করিতেন, সেই জন্য চকু লজ্জার অধুরোধে চরম-চপল রসনাটি কষ্টেচ্ছতে চাপিয়া রাখিলেন।

ঘর হইতে আবলু-সাহেব বাহরে আসিয়া বলিলেন “কি রে, তুই যে আজ এত সকাল সকাল উপরে এলি ?

আহমদ সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন যে সেখানে রোগীর বাড়িতে কত রাজি তাল করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই, তাই সকাল সকাল উপরে আসিলেন। কথা কহিতে কহিতে নিকটস্থ চেয়ারটা শ্যালিকার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সসৌজন্যে বিনীতভাবে বলিলেন “আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ?”

সম্মত হাস্তে তিনি বলিলেন “দীর্ঘকালি ৪০, কিন্তু দাদা এখন তো আমার সময় নাই, বসতে পারবো না, থাক কোরো। ছেলে ওঠবার সময় হয়েছে,—” পোষাক কামরায় দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন “এই বাদরটা আজ আমাদের যে নাকাল করেছে, বলবার নয়, দেড় ঘণ্টা ধরে বাড়ীর চারিদিকে খুঁতে—তারপর ছাদ খুঁতে না পেয়ে শেষে ওকে খুঁতে বাগানে পর্যন্ত গেছলুম—। আরপর কোথাও না পেয়ে, শেষে ঘুরে ফিরে এসে দেখি তোমার এই পোষাক কামরায় আলনার আড়ালে জানালার নীচে পড়ে একটা কাল রংয়ের শাল মুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুসুচ্ছে,—! তা কেমন ঘুম জান তো, সেত সন্ধ্যা থেকে এই রাত ন’টা পর্যন্ত ঘুম! আজ ইন্সেবের সঙ্গে আড় হয়ে গেছে কিনা সন্ধ্যার হুজনের স্বপ্নটা হয়েছিল—”

আহমদ-সাহেবের আত্ম-সম্বরণ শক্তি লোপ হইল ! হো হো করিয়া মুক্ত শ্বুর্ভি উচ্ছ্বাসেই—সজোরে হাসিয়া উঠিতেই ইচ্ছা হঠাৎছিল, কিন্তু নিতান্ত অশোভন-চপলতা ধরা পড়িবার ভয়ে, হাঁচিয়া কাসিয়া সেটা কোনমতে সামলাইয়া লইলেন । তা হইলেও ‘বলা মুখ, চলা পা,’ ত থানিবার নয়,—ঘাড় হেঁট করিয়া মিটি মিটি চক্ষু পোষাক কামরার নিকে চাঞ্চিয়া বলিলেন “তাঁহলে ঝগড়ার শোকেই অমন সুগভীর নিদ্রাটা এসেছিল বোধ হয় ! আর অন্য পক্ষের অবস্থাটা কি রকম আবলু ? ষ্টিমুলেণ্ট মিক্চার চাই নাকি ?

আবলু কোন উত্তর দিলেন না, শুধু তাঁহার ঘাড়ে একটি চপেটাঘাত বসাইয়া একটু হাসিলেন । তাঁহার জোষ্ঠা, পরিচাস-স্নিগ্ধ, সুকোমল হাসো বলিলেন “হ্যাঁ, সে তোমার ষ্টিমুলেণ্ট মিক্চার চাংবার মতই অবস্থা হয়েছিল কতকটা ! সন্ধ্যার থেকেই দেখছি হেনব শুকনো মুখে একলাটি হেথা-হোথা ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি মনেটা প্রথমে বুঝতে পারি নি । তারপর শুনলুম আমিরা রাগ করে একলাই ও-মহলে চলে গেছে, তাই নাকি ইনেবের বড়ই দুঃখ হয়েছে ! যাক্ তারপর আমনার দেখাই পাই না, দেখাই পাই না, ভাবলুম, তুমি এসেছ সে বুঝি তোমার জিনিষপত্র গোছান নিয়েই বাস্তু আছে, ক্রমে শুনলুম তুমিও ঘরে নাই, আমিরাও ঘরে নাই,—তারপর নিজেও খুঁজতে এলুম ।

আবলু-সাহেব ঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন “আঃ আহমুর ঘুম পেয়েছে দিদি, ওকে ছেড়ে যাও—ওসব ভূতপত ব্যাপার শুনবে না, তুমি থাম ।—”

অদম্য-কৌতূহলে, আহমদ-সাহেবের চক্ষু তখন স্থির-বিষ্ফারিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, আবলুর কাছে এই অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া,—তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন “তুই থাম, হ্যাঁ তারপর কি হল বলুন তো—”

তিনি উত্তর দিবার পূর্বেই আবলু সাহেব ব্যতি-বাস্ত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন “হ্যাঁ হ্যাঁ বলবেন পরে ! ও দিদি বোধ হয় তোমার খোকা উঠে কান্দছে, ও মহলে যাও—”

আহমদ সাহেব বলিলেন “দেখছেন, আপনাকে বিদায় করবার জন্য তাঁহার ব্যস্ততা দেখছেন ? এর নিগূঢ় অর্থটা—মনে মনে বুঝতে পারছেন, নিশ্চয়, সে আর প্রকাশ করে বলাটা ।—”

আবলু সাহেব এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বাস্ত-সমস্ত হইয়া লজ্জারক্ত মুখে ক্রকুটি করিয়া বলিলেন “দ্যাখ্ আহমু—”

আহমদ সাহেবও তৎক্ষণাৎ স্তম্ভকতার সহিত সমানভাবে সমান্তরাল রেখায় ক্র-সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন “দ্যাখ্ আবলু ।—”

আবলুর দিদি হাসিয়া বলিলেন “তোমাদের কলহ পাণ্ডিত্যের জর অরকার হোক্, আমি এবার বিদায় নিই, সত্যিই হয় তো ছেলে উঠেছে—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “না না, উঠলে নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া যেত, পাড়ান, দয়া করে আপনার ভূতের গরটা শেষ করে দিবে যান ।—”

“না দিদি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কিছু বল না—” সঙ্গে সঙ্গে আহমদ-সাহেবের ঘাড় ধরিয়া তাঁহার ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন “ঘুমপে যা—”

আহমদ-সাহেব এক পা পিছাইয়া, দুই পা আগাইয়া আসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন “পী’পড়ের পাখা বে মরবার জন্যই ওঠে, সেটা সর্বজনগ্রাহ্য সত্য! দ্যাখ্ আবুলু, ভাল মুখে বলছি মেলা চালাকি করিস্ নি,—এখনি ঠাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গব! বলব সেদিন রাত্রে র ছাদের উপরকার সেই কথা?—

আবুলু সর্বস্বরে বলিলেন “কি কথা রে?”

চোপ রাঙাইয়া ধমক্ দিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “কি কথা রে? আবার ন্যাকামো হচ্ছে!—দেখ্ বি? বলব তবে? বলি? বলি?—” আবলুর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রাণিকার দিকে চাহিয়া হঠাৎ থপ্ করিয়া বলিলেন “আচ্ছা আপনার জরদার কোটা-টায় কতগুলি জরদা আছে?” আমার দুটি দিতে পারেন?

আবুলু-সাহেবের চোখের ধোঁয়া কাটিয়া দৃষ্টি পরিস্কার হইল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ নীচু করিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একান্ত মনোযোগে গোঁফে তা দিতে শুরু কারলেন!

আহমদ-সাহেবের এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন “কেন বল দেখি? জরদা কি করবে?”

জ্ঞান বদনে আহমদ-সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন “এই আমার গুটি দুই তিন রোগী দাঁতের গোড়া ফুলে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাদের একটু একটু জরদা খেতে ধরাব নেন করছি,—জরদায় উপকার হবে না? কি বলেন আপনি?”

বোগযন্ত্রণাক্রিষ্ট চহুদের তর্দশায় সহানুভূতি করুণচিত্তে তিনি তখনই সাগ্রহে বাড়ি নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন “ই্যা নিশ্চয় উপকার হবে! আমি তো ভাই সেরেফ দাঁতের বাধার জন্যেই জরদা ধরেছি!”

আহমদ-সাহেব অমুমোদনের সুরে বলিলেন “তাট তো বলছি, আচ্ছা, জরদা খেয়ে আপনার পায়ের তলা বখন ঠাণ্ডা হয়ে যেত, তখন কি ঘসে রগড়ে গরম করতে হোত?”

প্রশ্নটা এমনই আশ্চর্য্য তৎপরতার সাক্ষ্য সরল ভাবে উচ্চারিত হইল যে, তাহার মধ্যে যে কিছু নাত্রণ্ড অঙ্কুর আছে, ধরে কার সাধ্য? সরলা ভদ্রমহিলাটি একটু থতমত খাইয়া গেলেন, কি যে উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ইতিমধ্যে প্রভাত্যপন্ন নতি প্রশ্নকর্তা মহাশয় হঠাৎ ব্যগ্রভাবে পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন “থাক্ সে কথা, এখন আমার পোষাক কামরার খবরটা বলুন, কোন ভৃত্য এসে পোষাক-আষাক পরছিল নাকি?—”

আবুলু সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে অশ্রুট সুরে শুধু বলিলেন “জাহাজ ছেলে?”

আহমদ-সাহেব সে কথার কর্ণপাত করিলেন না, শ্যালিকা একটু হাসিয়া বলিলেন “না ততদূর জমকাসো ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তবে ইনেবের সঙ্গে ঝগড়া করে আমার বোনের মনে না কি বড়ই দুঃখ হয়েছিল, তাই কাগড় কেচে এসে এ ঘরে জানালায় নীচে একলাটি চূপ করে বসেছিল—তারপর থানিকক্ষণ অন্ধকার ঘরে একলা থাকতে থাকতে,—ভয়! শেষে ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য শালমুড়ি দিয়ে ধরাশয়্য নিয়ে প্রাণপণে চক্ষু বোজা,—তাতেই আপদ শাস্তি! এতক্ষণে নড়া ধরে টেনে উঠিয়ে খেতে বসালুম আবলু তো হেসেই অস্থির হচ্ছিল!—”

পশ্চিম মহলে পুত্রের কান্নার শব্দ পাইয়া তিনি বলিলেন “তোমরা বসো, আমি এবার চলুম—”

তিনি চলিয়া গেলেন। পশ্চিম মহলের দ্বার বন্ধ হইল। আবলু-সাহেব এ মহলে দ্বার রোধ করিয়া কিরিয়া আসিয়া চকিত কটাক্ষে একবার পোষাক কামরার দিকে চাহিয়া চূপি চূপি বলিলেন “তুমি মন্থবে আজ, দিদির কাছে জরদার কথা তুলেছ, আনিদা সব শুনে পেয়েছে।”

যেন কতই বিস্মিত হইয়াছেন, এমনই ভাবে উত্তোষিত কণ্ঠে আহমদ-সাহেব বলিলেন “তাতে হয়েছে কি ? আমি তো কোন অসঙ্গতশো ও কথা তুলি নি। তুমি যে সে দিন রাত্রে বিবিসাহেবের চরণ সেবা করেছিলে, আমি সেই শুভ সংবাদটা শুধু শুঁকে জানিয়ে দিতে বাচ্ছিলুম না—”

আবুল সাহেব হাসিয়া অধিকতর চুপি চুপি বলিলেন “যাই সাফাই গাও, তোমার সেই আধ পরসার দাম সহজে শোধ হচ্ছে না, মনে রেখো—”

পোষাক কামরার দিকে ঘাইতে ঘাইতে গলা পরিস্কার করিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “আমি একবার গুঘরে যাচ্ছি জামাটা রাখ্‌।—” ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন জানালার পাশে একটি ছোট মাচর পাতিয়া, আমিনা ও ইনেব মুখোমুখি শুইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, তাহাকে দেখিয়া হুজনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল, আমিনা দিল—একটু বেশী করিয়া!—

আহমদ-সাহেব সেটুকু দেখিয়াও দেখিলেন না,—যেন কিছুই হয় নাই এবং কন্ঠন কালে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও যেন একান্ত অসম্ভব,—এমনি ভাবে নিতান্ত সহজ স্বরে তিনি বলিলেন “আমার পোষাকের ব্যাগটা খুলে ময়লা কাপড়গুলো বের করে নিয়েছ কি ?—”

আমিনা রাম-রহিম কোন উত্তর না দিয়া শুধু বোমটাটা একটু বেশী করিয়া টানিল। উত্তর না পাইলেও—আহমদ-সাহেব আপন মনেই পরক্ষণে বলিলেন “তা তুমি কখনই বা বের করবে ? এই তো মোটে বিকেল বেলায় এসেছি। তা যাক গে, এখন আমার সব পোষাকগুলো ময়লা হয়ে গেছে, বুঝলে, কাল সকালেই আমার এক স্ফুট পোষাক বের করে দিতে হবে,— কাল সকালেই সেটা বের করে দিতে পারবে, না আজ রাত্রেই বের করে রাখবে ?—”

আমিনা এবারও নিরুত্তর ! কিন্তু আহমদ-সাহেব নিরুত্তর হইবার পাত্র নন,—যেন উত্তর পাইয়াছেন, এমন ভাবে পুনশ্চ বলিলেন “আজই পোষাক বের করে রাখবে ? তাই রাখ, কাল সে তোমার তাড়াতাড়ি করে কষ্ট পেতে হবে, দ্যাখো, সেই গরদের স্ফুট-টা বের করে দাও—উঠো দেখি—”

আমিনা উঠিল না, নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল, আহমদ-সাহেব অত্যন্ত মৃদুভাবে বলিলেন “তা হলে কি কাল সকালেই দেবে ? আচ্ছা তাই হবে। তা এদিকেও তো রাত দশটা বাজে, তোমরা কেন আর মশার কামড়ে পড়ে আছ, যাও ঘরে শোও গে,—উঠুন তো বিবিসাহেব,—বান, আপনার ঘরে—”

ইনেব জড়সড়ভাবে উঠিতে ঘাইতেছিল, এবার আমিনা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, চাপা গলার তর্জনি করিয়া বলিল—“খবদার ইনেব, তুমি যেতে পাবে না ! কেন,—তুমি তো আমার লাগরাজ সম্পত্তি, পীরোত্তর সম্পত্তি আরো কত কি সব রয়েছে,—তবে আবার কি ! তুমি কোথাও যেতে পাবে না, আজ থাক আমার কাছে !—”

কথাকলা সমস্তই বেশ পরিষ্কার রূপে আহমদ-সাহেবের কাছে ঢুকিল, কিন্তু তিনি যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমন ভাবে বলিলেন “এ্যা, কি বল্ছ ? এখন তোমরা এইখানে থাকবে ? আচ্ছা তা না হয়—”

আহমদ-সাহেবের কথার বাবা পড়িল, বাহির হইতে আবুল-সাহেব ডাকিলেন “আহমু, ওরে,—হ্যাঁশোনিয়াম-টা কি—”



অত্যন্ত বিরক্তির সহিত কুথিয়া উঠিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন, “আঃ খালি পিছু ডাকা! সকল কাজেই পিছু ডাকা! এঠাবলু ষ্ট্রীপীডটা যা হয়েছে,—ভাঙ্গা মগলচণ্ডি,—যত কুস্থপনের গোড়া! ওর জালায় কোন কাজে ভাল হবার ঘো নাহ—”

বাতির হইতেই আবলু সাহেব হাসিয়া বলিলেন “কি এমন মহৎ Expedition এ তুমি সেজে গুজে চলেছ, যে পিছু ডাকায় বাধা পড়ল?—”

অবজ্ঞার স্বরে আহমদ-সাহেব বলিলেন “হঁ! তুমি তার মন্ত কি বুঝবে বল? তোমার কি সে বিষয়ে হঁস পবন জ্ঞান আছে, আহাম্মক ছোত্তরা কোথাকার!”

আবলু সাহেব বলিলেন “তী সে আহাম্মকই হই, আর যাই হই, তুমি যখন ঘরে গেছ, তখন দয়া করে’ হাশ্মোনিয়মটা নিয়ে এস, বেহাগ আলাপ করা যাক—”

মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “তুমি এখন বেহাগ আলাপ করবে বৈ কি? তোমার এখন কী সমস্যা পড়েছে বল! আমার মত তো—হঁ!—বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া পকেট হইতে চাবির রিং বাতির করিয়া তিনি নিজেই পোষাকের ব্যাগ খুলিতে বাসলেন, হাশ্মোনিয়মের খোঁজ লইলেন না। আসল কথা এখন তিনি এঘর ছাড়িয়া বাহরে যাইতে রাজি নহেন। বাহ্যিক একটা ছুতা করিয়া তাই বসিয়া পাড়লেন।

দুয়ারের সামনে আসিয়া আবলু সাহেব বলিলেন “কি এমন দারুণ হুঃখে তুমি দাঁত কপাটি খেয়ে ভিখী গেছ শুনি? কাহারামে দাঁও আমি মিজাই বাজনাটা নিয়ে চলুম—”

পোষাকের ব্যাগ খুলিয়া মগলা কাপড়গুলি বাতির করিয়া বুপঝাপ শব্দে ফেলিতে ফেলিতে আহমদ সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন “তা বাজনার সঙ্গে বেহাগ আলাপ করতে করতে তুমি সন্ধ্যারে বেচেপ্তে যাও, আমার কিছু আপত্তি নাই, কিন্তু বারেবার বসে বাজালে ও-মহলের সমস্ত লোকগুলির ঘুমের দফা নিকেশ হবে, তার চেয়ে সখ মেটাতে হয় তো এখানে বসে সঙ্গীত চর্চা কর।—”

বাজনাটা তুলিয়া আবলু সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন “এইখানে বসব—”

“কত কি ভাতে—” বলিতে বলিতে আহমদ সাহেব হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া আমিনার দিকে চাহিয়া—দেখিলেন যে বোমটার ভিতর হইতে কী কুণ্ডিত করিয়া ফুটু কটাকে তাঁহার দিকে চাওয়া আছে।—আর যার কোথা! মহা-উৎসাহে গৌফ চুমরাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ জেদের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হাঁ, এখানেই তোকে বসতে হবে, খবদার আবলু, তুই কোথাও বেতে পাবি না, বস এইখানে—বাজা এইখানে—আমিও গাইব।—”

শেষের কথাটার মধ্যে একটা ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, এবং গৃহের একটি প্রাণী সেটা খুব তীব্র ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিল! পর মুহূর্তেই দেখা গেল, আমিনা ইনেবের কাণের কাছে মুখ লম্বা গিয়া, ফিস ফিস করিয়া কি পরানর্শ দিতেছে।

এদিকে পোষাকের ব্যাগ খালি করিতে করিতে, আহমদ সাহেব পুনরায় হঠাৎ উল্লাস ভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন “ইয়া আল্লা! ভুলেই গেছি! ওরে আবলু ব্যাগটার মধ্যে যে কার্কনেট, অফ্‌ গ্র্যামোনিয়া থেকে ক্লোরফরম্, ত্র্যাণ্ডি পর্যন্ত অনেক জিনিষ রয়েছে গেছে! আর ভাই, আজ একটু ত্র্যাণ্ডি খাওয়া যাক! আমার মাথা খাস আবলু, আজ তোকে খেতেই হবে—” সঙ্গে সঙ্গে বহিঃ কটাক হানিয়া তিনি আমিনার মুখটার

পর্যবেক্ষণ করিবার প্রয়াস পাঠিলেন, দেখিলেন আমিনা আতঙ্ক-ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার তাঁহার পানে একবার আবলুর পানে চাহিতেছে,—তাঁহার সহিত চোথো চোথি হইতেই সে জুড়ি করিয়া দৃষ্টি ফিরাইল ।

অধিকতর উৎসাহের সহিত আহমদ সাহেব বলিলেন “বুঝ্‌লি আবলু ত্র্যাণ্ডি আছে, রম্ আছে, এইটেই খাওয়া যাক্, কি বল ?—” বলিয়াই লাল রংয়ের তরল পদার্থ পূর্ণ একটা বোতল তুলিয়া, সন্তর্পণে হাত আড়াল দিয়া লেবেলটা আবলুকে দেখাইয়া গোপনে কি একটা ইঙ্গিত করিলেন । আবলু সাহেব তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিলেন “হাঁ হাঁ ঐ ভাল, ও খুব ঝাঁঝালো স্কিনিস, চমৎকার রম্ । দাঁড়া আমার ঘরে গ্লাসটায় জল আনি, একটু জল মিশিয়ে খেতে হবে—” আবলু সাহেব বাঁজনা রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।

ইনেবকে লক্ষ্য করিয়া আহমদ সাহেব খুব কোমলস্বরে বলিলেন “বিবি সাহেব, আপনারা একটু একটু খেয়ে দেখবেন না কেমন ভিনিস ?—”

আমিনা ঘোমটা সরাইয়া ক্রোধ-স্ফুরিত গুঞ্জে বলিলেন “হ্যা দেখবেন বৈ কি ? আচ্ছা বেশ !—” বলিয়াই ছোঁ মারিয়া ইনেবকে উঠাইয়া লইয়া অকস্মাৎ তাঁরবেগে ছুটিয়া পাশের দুয়ার দিয়া আহমদ সাহেবের শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া, চক্ষের নিমেষে খিল বন্ধ করিল !

আহমদ-সাহেব বোতল ফেলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে—বারেবার দিকের দুয়ারেরও দড়াম্ করিয়া খিল বন্ধ হইল ! হতবুদ্ধি আহমদ-সাহেব গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

( ২০ )

আবলু-সাহেব জলের গ্লাস লটকা ঘরে ঢুকিয়া গ্লাসটি আহমদ-সাহেবের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া, মুখে কাপড় চাপা পিঁদিয়া হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িলেন ! আহমদ-সাহেব সক্রমণ মুখে বলিলেন “হাসি নয়, হাসি নয় ! এ-বে বড় মুন্সিল হোল আবলু ! এখন াক করা যায় বল ভাই ?—”

আবলু-সাহেব চুপি-চুপি বলিলেন “এখন ভাই-ই বল, আর দাদা-ই বল, আর নানা-ই বল,—এর ওপর কোন কেরামতি দেখান’র শক্তি আমার ঘাড়ে নাই, এবার তাল সামলাও তুমি মিঞা-সাহেব !

আহমদ-সাহেব কোঁশ্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অধিকতর ক্রমণভাবে বলিলেন “তুমি এমনি বেইমানই বটে !—”

প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহে ততোধিক ক্রমণ স্বরে আবলু সাহেব বলিলেন “কি করব ভাই, তোমার মত এমন ইমান্দার জনিয়ার যে ছুটো পয়সা হয় নি,—সে খোদার কস্বর, আমার নয় ! এখন তুমি কি রকম ধরণে মাত্‌লামী করিবার প্লানটা ঠাউরেছ, আমায় বাৎলে দাও,—আমি বাৎনা বাতাব, আর তুমি loud bray হুরে কিঝিট খাখাজ গাইবে ?”

বসিয়া পড়িয়া ছই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া আহমদ-সাহেব কন্‌সুটস্বরে গৌহ-গৌজ করিয়া বলিলেন “হ্যা ! গাইবে কিঝিট খাখাজ ! আমার বলে এখন যা হচ্ছে,—মাথাটা একদম শুঃলায়েই গেছে !—”

আখাসের স্বরে আবলু-সাহেব বলিলেন “আহা যাক্ যাক্ ৬-মাণা শুঃলায়ে যাওয়াই বঙ্গল ! অনেক মাহুব শরতানী-উপদ্রব থেকে নিস্তার পেয়ে বাঁচবে ।—এখন বন্ধ মদ খেয়ে মাত্‌লামী সুরু কর ।

আহমদ-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিন্তিতমুখে বলিলেন “না বাস্তবিক ঠাট্টা নয়, এখন কি করা যায় বল দেখি ?”

গোঁফে তা দিয়া আবলু-সাহেব বিজ্ঞভাবে বলিলেন “এখন ভো করবার মত সংকাথা দেখতে পাচ্ছি নে, আর তা ছাড়া এমন যকটস্থলে আমিও তোমার কোন পরামর্শ দান করতে রাজি নয়, ছেলে বেগাম ইংরেজ গুরুব নিষেধ শুনেছি—“It is not well to lead others. If all goes well you get an equal share. If not, you alone get all the blame.” এহেন শাস্ত্রের বচন লঙ্ঘন করে—”

অত্যন্ত চটিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “আরে রাখ, তোর শাস্ত্রের বচন!—হাড় জালালে! আমার বলে এখন যে বিপদ হয়েছে,—জান্ গেল—”

বাধা দিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে পূব উচ্চকণ্ঠে যেন পাশের ঘরে সবাই শুনিতে পায় এমনভাবে—আবলু-সাহেব হাঁকিয়া বলিলেন “ঐঃ! তা, এখন জান গেল, প্রাণ গেল, বলে চীৎকার করলে কি হবে? একটা অত্যন্ত সোজা কথা আছে যে ‘ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!’ তা ছাড়া হাকিম মাহুম তুই—হাকিমী যখন শিখেছিস, তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোড়ায় দাঁত বসিয়ে—প্রথমে তোকে একটা নীতি উপদেশ শিখতে হয়েছে যে “Prevention is better than cure.” এখন প্রাকৃষ্টিশের ক্ষেত্রে সে কথা ভুলে গিয়ে এমনতর জাঁদ্রেল ধরণে ডিগ্বাক্তির বহর দেখালে চলবে কেন?

আহমদ-সাহেব কর্ণকের জন্য শ্রুত হইয়া বসিয়া রহিলেন—কি একটু ভাবিলেন। তারপর চঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে নিজের দুই কাণ মোচড়াইয়া বলিলেন “কোন্ আহাম্মক কোন্ বেকুব আর এমন কাষ—”

বাধা দিয়া ত্রস্তভাবে আবলু সাহেব বলিলেন “উহু, না, না, হোল না, হোল না, দাঁড়া আমি ঠিক করে দিই—” বলিয়া ক্ষিপ্তহস্তে, পিছন হইতে আহমদ সাহেবের দুই কান ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন “কোন বেকুব, কোন উল্লুক, কোন গাধা আর এমন ভাষা জীবনে ভোলে! কেমন এ্যা?—”

আহমদ-সাহেবের কাণ দুইটা জলিয়া গেল! কিন্তু আবলুর সে নির্দয় পরিহাসে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার মোটেই ছিল না, কাছেই নিরীহভাবে নিজের কাণের উপরই হাত বুলাইতে বুলাইতে বিমর্ষ করুণ মুখে বলিলেন “না ভাই না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই কসম খাচ্ছি, আর কক্ষণো যদি কিছু বলি! আবলু তোর পায়ে পড়ি ভাই, বাচা আমায়।—বল ভাই এটা রম্ নয়, রোজ-সিরাপ,—”

আবলু-সাহেব চুপি চুপি বলিলেন “আরে থাম, এর মধ্যে রহস্যোদ্ভেদ করা হবে না। তুই এখন খানিকক্ষণ মাত্লামীই কর না—তারপর—”

ভাগ্যোদ্যম আহমদ-সাহেব বিষন্নভাবে বলিলেন “আরে দ্যাং! মাত্লামী করবে! আমার বলে চোখে নেশাই জমছে না, কিছু ভাবই লাগছে না, তা আবার কাটামুণ্ডের দাঁত খামটি দেখাতে যাবে!—নাঃ, ওসব আর হবে না, হবে না—”

অকস্মাৎ বারেক্তার বাতিরের দিকে সঁড়িহা ছুয়ারে করাঘাত করিয়া বাহির হইতে ওহায়েদ্ হারবান ডাকিল “ডাংদার সা’ব্—ডাংদার সা’ব্—”

আহমদ-সাহেবের বিচলিত—বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা সেই শব্দসংঘাতে চট্ট করিয়া স্থির হইয়া গেল! ঘরিতে বাহিরে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া, বলিলেন “কি খবর?”

ওহায়েদ্ সংক্ষেপেই বলিল ‘গল্লার ওপার হইতে ‘কল’ আসিয়াছে।’

আবলু-সাহেব পিছন হইতে আসিয়া কপট-গাভীরো ইংরেজিতে বলিলেন “এ শুধু ব্যক্তি বিশেষের মর্মান্তিক অভিসম্পাতের ফল!—”

আহমদ-সাহেব খাড়া নাড়িয়া বলিলেন “তা সে যাই হোক, আমি আজ কিছুতেই বেরুতে পারছি না, অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক ওরা।” ওহায়েদের দিকে চাহিয়া বলিলেন “নূতন লোক তো?”

ওহায়েদ খতমত খাড়া বলিল “হুজুর, মানুষ নেই মের—”

সহসা স্বভাব-বিরুদ্ধ অসহ্যুতার সহিত অত্যন্ত বিরক্তি ভাবে আহমদ সাহেব বলিয়া উঠিলেন “পঞ্চাশ দিন তোমার কাণে কান্ডে বলে দিয়েছি যে রাত্রে যখনই ‘কল’ আসবে তখনই আগে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নেবে, তারপর—” পরক্ষণে আত্মদমন করিয়া বলিলেন “যাও তাঁকে বল, সাহেবের আজ ভয়ঙ্কর শরীর খারাপ হয়েছে, তিনি আর কিছুতেই বেরুতে পারবে না, আপনারা অন্য ডাক্তার নিয়ে যান,”

আবুল সাহেব বলল “কি কথা বল, নাম ঠিকানা লিখে রেখে যান, কাল সকালে ডাক্তার যাবেন—”

একটু হাসিয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “না না, — সে আর বলতে হবে না, এত রাত্রে যারা ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়েছে তারা নেহাৎ দায়ে পড়েই বেরিয়েছে, কাল সকাল পর্যন্ত ডব্ব সইবার উপায় তাদের নাই, হুঁ! অল্প ডাক্তারই নিয়ে যাক,—কিন্তু ওহায়েদ শোন, যদি পুরাণো রোগী হয়, তাহলে বল, “নাম ঠিকানা দিয়ে রোগীর কি হচ্ছে—কি অবস্থা, সব লিখে দেন, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছেন,” তারপর কম্পাউন্ডার বাবুকে উঠিয়ে দাওয়াই করিয়ে বিদায় দিও—”

“ঘো হুকুম খোদাবন্দ —” বলিয়া ওহায়েদ দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। আহমদ-সাহেব চিন্তিতভাবে বাহরের দিকে এদিকে ওদিকে পায়চারী করিতে করিতে গোঁফ ত্যাগ দিতে লাগিল।

আবুল-সাহেব হাঁজি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, মুহূ মুহূ হাসিতে হাসিতে খুব মিহিম্বরে বলিলেন “বন্ধু, তোমার মেডিকেল সায়ান্সের কসম খেয়ে এখন সত্য করে বল দেখি,—তোমার মগজ ভরা তত সখের শরতানী খেয়ালগুলো, এখন মাথায় কোনখানটার জমাট বেঁধে বসে পড়েছে? এই বেলা সেখানটার জু এন্টে দিই, কি বল?”

একটু হাসিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “জু আঁটতে হবে না, সে আমি এখন মগজ থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে মাথা ঠাকা করে নিয়েছি, না হলে কি খাটতে পারি? সেটুকু ক্ষমতার জোর আমার রাগতে হয়—”

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে দ্বিগুণ উচ্চকণ্ঠে আবুল সাহেব বলিলেন “আমিন্, ভানালা দিয়ে আহমুর ঠেংস্কেপটা বের করে দাও তো, আহমু কলে’ যাচ্ছে—দাও শীঘ্র—”

ঘরের ভিতর হঠাৎ চাবি চুড়ির ব্যস্ত-চঞ্চল বনাংকার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, আহমদ সাহেব আশাবিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চাহিয়া বতিলেন “শুধু ঠেংস্কেপ দিলে তো চলবে না,—একস্ট পোষাক বের করে দিতে হবে যে, লক্ষ্মীটি,—একবার বেরিয়ে এস তো!—দ্যাখে ঠাট্টা নয়, দেবী করবার সময় নাই, আমার রোগী ‘কোলাপ্স’ হয়ে গেছে, এস চট্ট করে—শুনছ—”

হাসি চাপিবার জন্য আবুল সাহেব প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিলেন। আহমদ সাহেব ছায়ায় করাঘাত করিয়া অজুনর পূর্ণ ঘরে বলিলেন “শুনছ, ছয়াহটা খোল, আচ্ছা, এইটেই কি তোমার রাগ করবার সময় হোল, আমার রোগী মারা য়, দ্যাখো, সময় বয়ে যাচ্ছে,—শুনছ, শেষে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরলে রোগী বাঁচাতে পারব না, আঃ কি মুন্ডিল, খোল না—” অধৈর্য্যভাবে তিনি ছায়ায় উপর্যুপরি করাঘাত করিলেন। কিন্তু বহু ছয়ার বন্ বন্ শব্দে একটা বাজ-প্রতিক্রিয়া করা ছাড়া আর কিছুই ফল হইল না।

ওহায়েদ সিঁড়ির ছায়ায় সামনে আসিয়া বলিল “জনাব, ইয়ে বাবুসা’ব মুলাকাৎ মাংতে হ্যো—”

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হঠাতে কাতর কণ্ঠে এক বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন “ডাক্তার সাহেব, দয়া করে একবার এদিকে আসুন, আমি বড় বিপদগ্রস্ত—”

বৃদ্ধের গলার আওয়াজ শুনিয়া আহমদ-সাহেব চমকিয়া উঠিলেন! এ কি! এষে ওপারের প্রসিদ্ধ জমিদার, অবসর প্রাপ্ত সবজ্ঞ রায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর!—শশবাস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন “আদাব, আদাব, এঁক আপনি যে এত রাগে!”

সবজ্ঞ মহাশয় বলিলেন, “নমস্কার, বড় বিপদে পড়েছি, আমার পৌত্র মরণাপন্ন.....” বৃদ্ধ সংক্ষেপে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন “আমি দেওয়ানকে পাঠাচ্ছিলাম, কিন্তু পাছে আপনি যেতে অস্বীকার করেন তাই নিজে ছুটে এসেছি ডাক্তার, অনুগ্রহ করে একবার আপনাকে যেতে হবে,—গেণ্ডার ছেলেটিকে আপনি মরা-বঁটিয়েছেন, এবারেও আপনার হাতে ফেলে দিলাম, দয়া করে—”

ব্যতিবাস্ত হইয়া আহমদ-সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন “করেন কি, করেন কি? এ যে আমার ঘরের কণা! আমার মাপ করুন, আমি জানি না যে আপনি এসেছেন! চলুন আমি এখনই যাচ্ছি, আমার আর কিছু বলতে হবে না।”

আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন “বঁচলুম ডাক্তার-সাহেব, ভগবান আপনাকে স্বীকৃত করুন, আসুন তা’হলে, আমার নৌকা ঠিক আছে—” তিনি নামিয়া গেলেন, ওরাহেদ সঙ্গে গেল। আহমদ-সাহেব বলিয়া দিলেন—কম্পাউণ্ডারকে ঔষধের বাস্ক লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বল।”

তাঁহার অদৃশ্য হইলে, আহমদ সাহেব সশঙ্কে না, এখন ওর সদগতির ভার আপনার হাতে দিতে চল্লুম,—যান ঐ উল্লুকটার কাণ ধরে টেনে নিয়ে যান—”

এবার সতাই দুয়ার খুলিয়া গেল। ইনেন ঘোমটা টানিয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিল, আহমদ-সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের দুয়ার খুলিয়া পোষাক কামরায় ঢুকিয়া আমিনাও বিনা বাক্যে পোষাক বাহির করিতে বসিল।

ইনেন কোন দিকে না চাহিয়া, ভাল মানুষের মত ঘোমটা দিয়া, নিঃশব্দ পদে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, মাঝ পথে আবলু সাহেব তাহাকে আটকাইলেন!—কাণের কাছে মুখ লইয়া গিন্না, প্রসন্ন-উজ্জল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি, সপরিহাসে কি বলিলেন,—ইনেন নিম্ন হাস্যে দৃষ্টি তুলিয়া ততোধিক চুপি চুপি কি উত্তর দিল! আবলু সশঙ্কে হাসিয়া উঠিয়া, উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন “ওরে আহু, তুই কি নিমক্ হারাম্ মাতাল রে! ডাকের নাম শুনে, তেমন জমকাল নেশা চেড়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, লিলাজের মত ডাক্তারী করতে ছুটেছিল! তোর জীবনে ধিক! তোকে যে সবাই ‘ছিং’ বলছে রে!”

ক্ষিপ্ৰ-চতুরতার সহিত তৎক্ষণাত্ ঘরের দুয়ার হইতে মুখ বাড়াইয়া আহমদ সাহেব বলিলেন “কে বিবিসাহেবা বুঝি! ওঃ! বহৎ খুব; বড় খুশী হলুম! দ্যাখ্ আবলু, আমার এই তর্ভাগা সংঘাতে যে তোর সৌভাগ্য-বিকাশ হোল, এতেই আমি আন্তরিক সন্তোষে পরিতুষ্ট হলুম ভাই!—আর বিবি সাহেব আপনি যে থিকার দিলেন ওটা বাধ্য হয়েই মাথার তুলে নিলুম, আমার নত তর্ভাগা জীবদেহ নদীরে লিখনই এই! মদের নেশা তো ফুজ্জ কথা, শক্ত ঘানিতে ঠেকলে মহানিজার নেশা চেড়েও আমাদের ঝোড় ঝুড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে,—তা সে রাই হোক, আমি সাটিককেট দিচ্ছি, আবলু কিন্তু খুব নিমকহালাল মাতাল, আপনি কিছু তাবধেন না, এখন ওর সদগতির ভার আপনার হাতে দিখে চল্লুম,—যান, ঐ উল্লুকটাকে কাণ ধরে টেনে নিয়ে যান—”

আবলু সাহেব বলিলেন “তোমার তার জন্ত ফকরদালালী করতে হবে না, থাম নিজের চরকার তেল দাও।—”

“আচ্ছা” বলিয়া আহমদ-সাহেব পোষাক কামরায় চলিয়া গেলেন। আমিনা তখন তাঁহার শাটে বোতাম পরাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মাথায় কাপড়টা একটু টানিল।

আহমদ-সাহেব বলিলেন “ওয়াহেদের স্বী এসে তোমার কাছে থাকবে, বুঝ্লে, আবলুর স্বীকে ওঘরে পাঠিয়ে দিও।—”

আমিনা নত শিরেই ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার লক্ষণ জানাইল, আহমদ-সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা শোন, চেয়ে দেখো।—”

আমিনা চাহিয়া দেখিল না, শাটটা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিয়া প্যাণ্টে গ্যালিশ পরাইতে পরাইতে চোখ নীচু করিয়া বলিল ‘বল’।—

আহমদ-সাহেব নিকটে আসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন “আচ্ছা আমার এম্মি করে দূর হয়ে যেতে হচ্ছে, এতে তোমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে নয়?—”

“জানি না” বলিয়া আমিনা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আহমদ-সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহঁ—উপর্যুপরি প্রশ্ন স্বর করিলেন, আমিনা রাগিয়া বলিলেন “হ্যাঁ হচ্ছে! যাও!”

যেন কতই দৃষ্ট-চিহ্ন হইলেন, এমনইভাবে আহমদ-সাহেব বলিলেন “হ্যাঁ এইটুকুই স্তন্যে চাইছি! তাই বল! তাই ত হওয়া উচিত!”

কুক্ক-স্নান চোখ দুটিতে গভীর ভৎসনা ভরিয়া আমিনা মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল, তারপর কোন কথা না বাগিয়া প্যাণ্ট ফেলিয়া দিয়া, জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া বাহরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আহমদ-সাহেব আর কথা কহিলেন না।

( ২১ )

পরদিন বেলা বারোটার সময় আহমদ-সাহেব ‘কল’ হইতে ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। আমিনা শরনকক্ষে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কি কাজে ব্যাপৃত ছিল, তাঁহার পদশব্দ পাইয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি ছাড়ার দিকে চাহিল,—না জানি রায়মহাশয়ের দৌতিত্রটির কি সংবাদই এখনই শুনিতে হইবে।

আহমদ-সাহেব চোকাঠে পা দিয়াই মাথা হইতে টুপী খুলিয়া সহাস্র মুখে বলিলেন, “এই নাও, গৃহস্থ ভদ্র মহিলাটিকে দস্তুর মত সম্মান জানাচ্ছে।—”

আমিনা মনের মধ্যে আশ্বাস পাইয়া বলিল, “হ্যাঁ—জুতো মেরে গরু দান বাকি বলে! একি স্নান হয়ে গেছে যে! —সেখান থেকেই?”

আহমদ-সাহেব অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন “স্নান হয়ে গেছে—আহার হয়ে গেছে—রোগী খুব ভাল আছে, কাল রাত্রে গিয়ে বন্টখানেকের মধ্যে তাকে ঠাণ্ডা করে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও সারা রাত্রি ভোকা ঘুমিয়েছি!—”

মনে মনে অভ্যস্ত খুশী হইয়া, আমিনা সকৌতুকে হাসিয়া বলিল “ঘুমিয়েছিলে! ঘুমুতে পেরেছিলে তো! এঁা বল কি? তা হলে সেই সাধের মাতাল যাত্রা ছিরকুটে বাওয়ার আপশেষটা মাঠেই মারা গেল!—”

আহমদ-সাহেব বলিলেন “কি আর করি বল ! তোমার অভিশাপ, সে তো বার্থ হবার নয় ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে চোখকাণ বুজে ক্ষতি স্বাকার করে নিলুম । যাক, আমিনা তুমি আর একটি কলের টাকা চেয়েছিলে এইটে নাও,—” ছইখানি ছইশত টাকার নোট টোবলের উপর রাখা দিয়া বলিলেন “আজ মহরম, কলকাতা থেকে কখন নিয়ে এই একটার গাড়ীতে লোক আসছে, আমি টেলিগ্রাম করে এসেছি ।—”

হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমিনা বলিল, “খুব কৃতজ্ঞ হলুম ! বেশী আর কি বলব ? খোদা তোমার মঙ্গল করুন, আর শয়তান যেন দয়া করে তোমার ঘাড়ের ওপর থেকে সেই গুটু-বুদ্ধির বোঝাটা নামিয়ে নেন, এইটুকু প্রার্থনা !—” তারপর একটু থামিয়া সক্রমণ মুখে বলিল “সত্যি ঐ জনো আমার বড় ছেঁষ ছয়, সময় সময় যেন কান্না পায়—”

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন “আমারও পান্ন—”

হাসিয়া আমিনা বলিল “হ্যাঁ তুমি সেই মানুষই বটে !—”

খপ্পু করিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন, “তা সে যাই হই, এখন মাপ কর, আর অভিসম্পাত দিও না, অন্ততঃ আজ রাত্রে যেন আমার আর ‘কলে’ বেরতে না হয় !”

আমিনা বলিল “তা না হোক কিন্তু কাল মাতাল যাত্রার পর, আজ কি যাত্রা হবে তব ?—”

সজোরে মাথা নাড়া দিয়া আহমদ-সাহেব বলিলেন, “তোবা, তোবা ! আবার ! না আমিনা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর তোমায় কিছুটা ব্লাছ না, এ একেবারে খাঁটি সাক্ষা বাৎ !—লাফটি, আর রাগ কোরনা, সরে এস—”

\* \* \* \*

যথাসময়ে কখন আসিয়া পৌঁছিল, বৈকালে মহাসমারোহে দরিদ্রগণকে কখন বিতরণ করা হইল ।

বড় রাস্তার উপর দিয়া মহরমের মিছিল যাইতেছিল, বাগানের পাঁচিলের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়া আমিনা ও ইনেক সন্ধ্যা পর্যন্ত শোভাযাত্রা-সমারোহ দেখিয়া, বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় পাশের বাড়ীর দ্বিতলের জানালা হইতে তীক্ষ্ণ-কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল,—“ঠাণ্ডা বরফ, ঠাণ্ডা বরফ,—আমিনা—”

সাগ্রহে দৃষ্টি তুলিয়া আমিনা বলিল “এ কি ! মিনতি রাণী যে ! কবে এলে খণ্ডর বাড়ী থেকে ? ভাল আছ ঠাণ্ডা বরফ ?—”

মিনতি হাসিমুখে বলিল “ভাল আছি, আজই এইমাত্র আসছি তোমরা ভাল আছ তো ?—একটা সুখবর শোন, আব্দুল দাদা বি-এল একজামিনে পাশ হয়েছেন, আজ খবর বেরিয়েছে, উনি এসেই তোমাদের বাড়ীতে খবর দিতে চুটেছেন, ওটি কে ?”

আমিনা ইনেককে টানিয়া সামনে আনিয়া বলিল “দাদার গৃহলক্ষী । রজনবাবু পাশ হয়েছেন ? বাঃ, তোমাদের ছুজনের মাঝখানে আজ আমি দাঁড়িয়েছি ভাই, মিষ্টি আন,—”

মিনতি বলিল “বৌদিদি যে ঘোমটা দিচ্ছে, ও কি ভাই তা হবে না, যাও তো ঘোমটা খুলে, ওঁর সঙ্গে আগে বোঝাপড়া করে নিই—দ্যাখো বৌদিদি, তুমি আমার লজ্জা কোর না, একে আমিনা আমার ছেলেবেলার ঠাণ্ডা বরফ,—”

আমিনা হাসিয়া বলিল “তাতে আমিনার দাদা মিনতির বরের সহধর্মী বন্ধু এবং বিবাহের ঘটক, কাজেই ঘটক-গৃহীণী তুমি মিনতির সঙ্গে কথা কইতে বাধ্য—” আমিনা ইনেবের ঘোমটা সরাইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

তিনজনে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। পারিবারিক সংবাদই বেশী। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া উভয় পক্ষ পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, কথা স্থির হইল আবার আগামী কাল সকালে দেখা হইবে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া, সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ইনেব বলিল “আচ্ছা ভাই আমিনা দিদি,—তোমার পায়ে পড়্ছি ভাই, আমার একটি কথা রাখ-না,—”

বিস্মিত হইয়া আমিনা বলিল “কি কথা?”

আমিনার গণাটি জড়াইয়া ধরিয়া, আদব-মাথা অমুনয়ের স্বরে ইনেব বলিল “ঐ তো ভাই তোমার ঠাণ্ডা বরফ একজন রয়েছে, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমার সঙ্গেও একটা কিছু পাতিয়ে নাও—আর তোমায় ‘আমিনা-দিদি,’ ‘আমিনা দিদি’ বলে ডাকতে ভাল লাগে না—খুব একটা মিষ্টিগোছের কিছু পাতিয়ে কেল ভাই।”

সিঁড়ির পাশের ঘর হইতে দিদি ডাকলেন “ওরে আমিনা এখানে আর, শুনে যা—তোরা—”

উভয়ে উঠিয়া গিয়া, পাশের ঘরে ঢুকিল। দিদি সেখানে অসংখ্য গ্লাস লইয়া বিপুল আয়োজনে সরবৎ প্রস্তুত করিতেছিলেন, উভয়কে দেখিয়া বলিলেন “আহম্ম বাড়ীভুক্ত সবাইকে সরবৎ তৈরী করে থাওয়াবার জন্যে এই রোজ সিরাপের বোতলটা আমার দান করেছে, তোরা এক এক গ্লাস নে—” দুইটি গ্লাস তুলিয়া, তিনি দুইজনের হাতে দিলেন।

গ্লাস হাতে লইয়া আমিনা ও ইনেব মুখ চাওয়াচারি করিয়া হাসিল! এ সেই রোজ-সিরাপ!—ঠাণ্ডা আমিনার মাথায় একটা নুতন ফন্দী আবিস্কার হইল, তন্তে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া আমিনা বলিল “খুব মিষ্টি হয়েছে! নাও ইনেব, গ্লাস বদলাবদলি কর ভাই। ছেলেকেলায় একদিন এক পঃসার বরফ কিনে দুজনে ভাগ করে খেয়ে ঠাণ্ডা বরফ পাতিয়েছিলুম ভাই, আর আজ থেকে তোমাতে আমাতে—মিষ্টি-সরবৎ!”

তৎক্ষণাৎ তথাকরণ সুসম্পন্ন হইল! দুইজনে দুইজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরের মুখে চুমা খাইয়া বিলুপ্ত করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, সকৌতুকে ডাকিল “মিষ্টি সরবৎ!—”

অকস্মাৎ কোথা হইতে রহমান-সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সবিস্ময়ে বলিলেন “ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?”

দিদি হাসিতে হাসিতে ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। রহমান-সাহেব হাসিয়া বলিলেন “ভা বেশ! মিষ্টি-সরবৎ পাতার হোল! আচ্ছা এই হুঃগে আমার সঙ্গেও অল্প একটা কিছু পাতিয়ে ফেল—”

গ্লাস রাখিয়া মুখ মুছিয়া “পাতাচ্ছি দাঁড়ান,—“কুইনিন্ মিক্শচার”—রাজি?”

কপালে করাঘাত করিয়া রহমান-সাহেব মহা কোভের সহিত সজোরে বলিলেন “কী! এমন অবিচার! আজকের দিনে, অমনতর মিষ্টি-সরবতের পর,—আমি হলুম তেতো কুইনিন্ মিক্শচার!”

ইনেব সাধনার স্বরে ত্যাড়াডাড়ি বলিল “আহা তার জন্তে হুঃখ করছেন কেন? এই ম্যালেরিয়া ভরা বাংলা দেশে কুইনিন্ মিক্শচার বড় উপকারী জিনিস—”

আমিনা বলিল “বলতো ভাই মিষ্টি-সরবৎ, হঁ! আমি যে ওঁর দর বাড়িয়ে দিলুম তাতে খেয়াল নাই!—এরি অকৃতজ্ঞ —”



ইনেব একটু ছুটামীর হাসি হাসিয়া বলিল “বুঝেন না এবার আপনাকে ওষুদের আলমারীর মধ্যে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হবে—”

দাক্ষণের বারেণ্ডা হইতে আবলু সাহেব ডাকিলেন “রস্তুম, চা লাও,—ডাংদার সাব আ-গিয়া,—”

“ঐ: ! ঠিক হয়েছে—” ক্ষিপ্ত হস্তে দুই জনকে ধরিয়া ফেলিয়া, রহমান-সাহেব উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন “আবলু, আবলু, আহমুকে নিয়ে চট করে এস হো এখানে—”

ইনেব ও আমিনা পলাইবার জন্ত ব্যতিবাস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইল না, আবলু ও আহমদ-সাহেব বাস্ত-সমস্ত হইয়া দাম্পত্যে ঢুকিয়া বলিলেন “কি হয়েছে, কি হয়েছে ?”

রহমান-সাহেব বলিলেন “এঁরা দুই মূর্তিতে চুপি-চুপি মিষ্টি-সরবৎ পাতিয়ে ফেঁকেছেন, আমি টের পেয়ে লোভ সামলাতে পারি না, তাই এঁরা নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে আমার কুইন্নি মিক্শচার বানিয়ে দিলেন— এখন তোমরা বল, এদের যোগ্য শাস্তিটা কি :”

আবলু ও আহমদ-সাহেব মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া নিঃশব্দে মুক্ত-মুত্ হাসিতে লাগিলেন,— কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবলুর দিদি দরের ভিতর হইতে দুই গ্লাস সরবৎ হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিলেন “আমি ওদের যোগ্য শাস্তি ঠিক করে দিচ্ছি— আমিনা এই গ্লাসটা ধর, ইনেব তুমি ধরো এটা—”

দুইজনে বিনা দ্বিধায় আদেশ পালন করিল, তিনি ইনেবকে টানিয়া লইয়া গিয়া আবলুর সামনে দাঁড় করাইয়া-দিয়া বলিলেন “আবলুকে সরবৎ দাও—আজ ওর পাশের খবর এসেছে !”

ইনেব লজ্জায় জড়সড় হইয়া সরবতের গ্লাসটি বাড়াইয়া দিল, আবলু চোখকাণ বুজিয়া সেটা টানিয়া লইয়া সরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে আমিনাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহমদ-সাহেবের কাছে দাঁড় করাইয়া রহমান সাহেব বিজ্ঞপের স্বরে বলিলেন “আমার মাথায় কুইন্নি মিক্শচার ঢেলে দিয়ে ভারি খুশী হয়েছে, এবার দাও দেখি আহমুকে সরবৎ—ও-বেচারার অনেক খেটে এসেছে—”

আমিনা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া বারবার আপত্তি তানাইল, কিন্তু ‘কা কস্ত পরিবেদনা !’ সরবৎটা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতেই হইল !

সরবৎ হাতে লইয়া আহমদ-সাহেব গ্যালিকার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন “সরবতের জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ,—”

সুকুমল হাস্তে মেহময় স্বরে তিনি উত্তর দিলেন “আর আমি, আজকের এই পূণ্যদিনে, কার্যমানে আশীর্বাদ করছি,—এ সরবতের আশ্বাদ, তোমাদের পক্ষে পূব মিষ্ট, মধু ও স্নিগ্ধ আনন্দময় হোক !”

আমিনা ও ইনেবকে দুই পাশে টানিয়া লইয়া দুজনের মাথায় হাত দিয়া রহমান-সাহেব বলিলেন “আর এই সরবতের কল্যাণে তোমাদের হৃদয় উন্নত হোক, আত্মা পবিত্র হোক এবং সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যে তোমাদের জীবন উজ্জল হোক।—”

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ।

## বর্ষ-মঙ্গল ।

—:~:—

এখনো মুছে নি ফাগুনের রাজটীকা  
বনে বনে আর মনে মনে আছে লিখা !  
গাজনের তালে রুদ্রের সাড়া পেয়ে  
বসন্ত ভয়ে বনান্তে পশে ধেয়ে !—

কুন্তল তার উড়ে নীলাকাশে  
দীঘি জলে আঁধি-ছায়া  
পলায়ন-পথে ভূঁই-চাঁপাগুলি  
বিছায় চিহ্ন মায়া ।

শিমুল পলাশ ফুটে  
মাথা কুটে পায় লুটে ;—  
আশোক গুমরি কহে—  
—ফির' ফির' সখা, ওহে !

চিত্রা কুঞ্জে তরুণী বিশাখা আসি  
দাঁড়াইল ধীরে অধরে শুক হাসি ;  
চুতকসায়িতস্বর বিহঙ্গ ভয়ে  
চলে গেল কোথা স্বর্ণ-বীণাটি লয়ে ।

নিমের গন্ধে চাতক কণ্ঠে  
বায়ু পেতে আঁ কান  
তারকাঙ্কিত নিবাক আকাশ  
স্পন্দ বিহীন প্রাণ !

গন্ধ:মিথ্যা কাজে  
ঘুরিল কত না সাজে ;  
কালবোশেখীর মেঘে  
প্রভাত উঠিল জেপে ।

দেখিবা মাত্র আলোক তালী বনাস্তে  
 “জয় জয়” রবে গায়ত্রী স্ফুন্দে  
 গাহিয়া উঠিল কোটি কোটি নরনারী  
 নব দিন অভিনন্দন সারি সারি !

জগতের হিতে গো ব্রাহ্মণ  
 ক্ষেত হল হলীশায়  
 শুভ ভগবতী যাত্রা লগ্নে  
 অর্ঘ্য দানিল পায় ।

গাহিল কুমারী সবে  
 “দশ পুতুলের” স্তবে  
 ঘরে ঘরে এক তান  
 তোমারি স্বাগত গান ।

বাসর-স্বপ্ন লুকাল’ অন্ধকারে  
 মুকুল কলিকা আনমিল ফল ভারে  
 নানা-উৎসবে পুলক মাগিল ছাড়া  
 এক বসন্ত বহু মাঝে হ’ল হারা ।

তব মঙ্গল সজল কুস্ত  
 ছাড়ি কম কটি তট—  
 তুলসী অশথ শিবের মাথায়  
 স্নোভিল ঝারা ঘট ।

নিল তাই নারী যত  
 ফল জল দান ত্রুত  
 কুমারী রচিল স্নেহে  
 পুণ্যপুকুর গেহে ।

দোহুল দীঘল মহীর আঁচল খানি  
 ভরিয়া উঠিল ফল ভারে আশা বাণী ।  
 হইল আবার হিসাবে নূতন খাতা  
 এখনো শুভ্র তাহার সকল পাতা ।

আজ দেখি ভরা গত বরষের  
খাতাটি কালির দাগে  
কে জানে তাহার কোনও অঙ্ক  
আসে কিনা বাম ভাগে।

অনাদি হইতে আসি  
যাও অনন্তে ভাসি  
অতি পুরাতন, তব  
এই লীলা চির-নব।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## প্রেম তত্ত্ব।

—:—

গত সেপ্টেম্বর মাসের Stand Magazine এ All about Love শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক প্রেম সম্বন্ধে সাতটি প্রশ্ন লিখিয়া নয়জন নবল লেখককে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহা দ্বারা এই প্রবন্ধ গঠিত হইয়াছে। উত্তরগুলি আমাদের দেশের লোকেরও মনোরঞ্জক ও চিন্তনীয় বোধ হওয়ার নিম্নে প্রশ্নগুলি ও তাহার উত্তরের অমুবাদ দেওয়া হইল। এই অমুবাদে যথাসাধ্য মূলের ভাব ও ভাষারীতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। “Ideal” শব্দের প্রচলিত বাঙ্গলা প্রতিশব্দ “আদর্শ” ভুল বলিয়া মনে হওয়ার “কল্পনা” শব্দ দিয়া অমুবাদ করিয়াছি। “মনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা” বলিলে বোধ হয় অর্থের অমুবাদ ঠিক হইত। “Idealise” শব্দের অমুবাদ “মনে মনে উৎকর্ষ কল্পনা করা” লিখিয়াছি। Paradox কে “আপাত মিথ্যা” এবং Cynicকে “জ্ঞানাভিমानी” করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এই যে যে সকল স্থানে বিসর্গের উচ্চারণ হয় না সেখানে বিসর্গ লিখিতে হয় না। বাঙ্গলাতেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য বলিয়া “সাধারণতঃ” “প্রধানতঃ” প্রভৃতি যে সকল শব্দে বিসর্গের উচ্চারণ মোটেই করি না সে সকল শব্দে আমি বিসর্গ বর্জন করিয়াছি।

প্রথম প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। কাহার প্রেম অধিক প্রবল? পুরুষের না নারীর?

এই প্রশ্নের উত্তরে হরেন্স আনেসলি ভাচেল (Horace Annesly Vachell) লিখিয়াছেন “সাধারণত নারীর প্রেমই অধিক বলবৎ যেহেতু নারীর পক্ষে প্রেমের যত মূল্য, তত পুরুষের পক্ষে নহে। প্রেম নারীর মন যত অধিকার করে পুরুষের তত নয়।”

অস্টিন ফিলিপ্স (Austin Phillips) লিখিয়াছেন “পুরুষ এবং নারী প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে, সেজন্য এক কথার ইহার উত্তর দেওয়া যায় না; কিন্তু সাধারণত এই কথা বলা যাইতে পারে যে নারীর প্রেমই

অধিক বলবৎ যেহেতু নারীর প্রেম তাহার হৃদয়ভাব হইতে যে পরিমাণে সজ্জাত তাহার মস্তিষ্ক হইতে সে পরিমাণে নহে। সে জন্য দারিদ্রের মধ্যে বিবাহ বা বিবাহের সম্ভাবনা হইলেও নারীর প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয় নারী দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং দুঃখ সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে। তেমন স্থলে পুরুষ ভয়ে সরিয়া পড়ে।”

মে এডিঙটন ( May Edington ) লিখিয়াছেন “সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পুরুষের প্রেম নারীর প্রেম অপেক্ষা বলবৎ। নারীদিগের বিষয়বুদ্ধি এতই প্রবল যে অতি অল্পসংখ্যক নারীর প্রেমও পুরুষের মত নহে। পুরুষের প্রেম পুরুষকে বাঁধিয়া ফেলে এবং উদ্ভাদ করে। নারীর কদাচিত্ একরূপ হয়। পুরুষ মনে মনে পূর্ণ উৎকর্ষের কল্পনা করে এবং সেই মনঃকল্পিত পূর্ণ উৎকর্ষের পূজা করে। নারী যাহা বাস্তবিক তাহাই দেখে এবং বাস্তবিকের প্রতি তাহার প্রেমও সংযত হয়। পুরুষ ভাবপরায়ণ কিন্তু নারীদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যকই সেরূপ। পতিপরায়ণা পত্নী অপেক্ষা পত্নীপরায়ণ পতির সংখ্যা অধিক।”

হেনরী ডি ভিয়ার স্টাপ্‌কুল ( Henry de Vare Stapcoole ) লিখিয়াছেন “পুরুষেই প্রেমের প্রবলতা। যে প্রেম স্থায়ী তাহা পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিক প্রবল নহে কিন্তু আমার বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা উহা নারীতে অধিকতর দেখা গিয়া থাকে।”

শ্রীমতী সী এন্‌ উইলিয়মসন্ ( Mrs. C N Williamson ) লিখিয়াছেন “যদি নিঃস্বার্থতায় শক্তি থাকে তাহা হইলে আমার বিশ্বাস এই যে বিশেষ স্থল ভিন্ন পুরুষের প্রেম অপেক্ষা নারীর প্রেমই অধিক বলবৎ। কিন্তু বিশেষ স্থল এই প্রশ্নের লক্ষ্য নহে। পুরুষের প্রেম নারীর প্রেম অপেক্ষা বলবত্তর রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু তাহা অতি অল্প কারণেই ভগ্ন হইয়া যায়। নারী যদি কুরূপ হইয়া পড়ে অথবা নারীর যদি কোন অপ্রীতিকর রহস্য বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে কল্পজন পুরুষ বর্তমান প্রবল অমুরাগের সহিত তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে? কিন্তু অধিকসংখ্যক নারীই পুরুষ বিকলাঙ্গ বা দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িলেও সেই পুরুষকে ভালবাসিতে থাকিবে এবং সেবা দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে। পুরুষ যাহাই করিয়া থাকুক না কেন সে জন্য অহুতাশ বা প্রাশ্চিত্ত করিলে প্রেমময়ী নারীর প্রেম নষ্ট হয় না।”

ই টেম্পল্‌ থস্টন্‌ ( E. Temple Thurston ) লিখিয়াছেন “অতি অল্প এবং অসাধারণ বিশেষ স্থলে ভিন্ন, নারীর প্রেমই বলবত্তম, সে প্রেম যে ভাবে যে দিক্‌ দিয়াই কার্য্য করুক না কেন। ইহার একমাত্র বর্জিত স্থল আছে। পুরুষ বালা হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত কখন কখন ভক্তির অমুপযুক্ত পিতা বা মাতার প্রতি আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করে। কিন্তু নারীর বেলায় প্রায় একরূপ ঘটে না। সাধারণত যাহা অদ্বুত রসাপ্রিত প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় তাহা পুরুষ অপেক্ষা নারীতে অধিক স্থায়ী হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অদ্বুত রসাপ্রিত প্রেমের দুঃখময় অবস্থাও থাকে যাহার মধ্যে জঁর্ষাই প্রধান।”

উইলিয়ম্‌ লি কুইউক্স্‌ ( William le Quenx ) লিখিয়াছেন “নারীই প্রায়শ অতি গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক নারীই প্রেমের জন্য লালায়িত। পুরুষ কিন্তু নারী হৃদয়কে অতি লঘু ভাবেই দেখিতে অভ্যস্ত। সং পুরুষকে নারী দেবতা মনে করে।”

বার্নস্‌ অর্সি ( Barnes Orey ) লিখিয়াছেন “মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র রচনা করা বড় কঠিন। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে আমাদেরগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে নারীর প্রেম পুরুষের প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রবল; কেন না নারীর প্রেম বাধা দিতে এবং অমুকোচিত থাকিতে অধিক সমর্থ। যেহেতু বাস্তবিক বার্য্যকে

প্রেম বলা যাঠিতে পারে অণ্ড অতি প্রবল হইলে ও দৈহিক প্রেম নহে পুরুষের পক্ষে একপ্রেম, নৈতিক এবং মানসিক গুণের প্রাপ্তি সম্মান ও আদরের সহচর। পুরুষ যে নারীকে সম্মান করিতে পারে না তাহাকে বিবাহ করিতে চাচে ন; অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নারীর প্রতি পুরুষের প্রেমের মধ্যে কতক পরিমাণে বিচার আছে, যদিও এই বিচার সং ও উচ্চ শ্রেণীর কিস্তি নারীর সেক্ষেপ নহে। পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমে সেক্ষেপ বিচায় নাট।—পুরুষ কেমন নারী তাহা বিচার করে না—পুরুষের দোষ থাকিলেও তাহাকে ভালবাসে। নারী যদি ভালবাসে তাহা হইলে সেই পুরুষ চতভাগ্য, হৃৎচরিত্র এবং অপরাধী হইলেও সে নারীর চক্ষে গালাগাড় (Galahad) স্বরূপ—নারী তাহার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে। নারীর শারীরিক সৌন্দর্য্যো মোহিত হইলে অনেক সময়ে পুরুষের মনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয় অনেক স্থলে একপ্রেম ভাব উদ্ভূত হয় যে ‘এই নারী আমার সন্তানের জননী হইবার উপযুক্ত নহে।’ কিন্তু প্রেমের ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয় এমন একটা দৃষ্টান্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ যাচাতে সেটরূপ অবস্থার নারী বলিবে ‘না, এই পুরুষ এ পরিবারের প্রধান হইবার উপযুক্ত নহে—সে আমার সন্তানের জনক হইবার যোগ্য নহে।’

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। নারীর পক্ষে মনোগত প্রেমের কথা মুখে প্রকাশ করা উচিত কি না?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিশ্বাস প্রেমের উৎপাদক। পৃথিবী মধ্য বয়স্ক এবং ততোধিক বয়স্ক নারীতে পূর্ণ যাহারা অবিবাহিত থাকিয়া বিরক্তময় জীবন বাপন করিতেছে, যেহেতু তাহারা উপযুক্ত লগ্নে তাহাদের বাঞ্ছিত পুরুষকে সজ্জাশীলতা বা অভিমান বা গর্ভ বা ক্রৌড়া বশত মনের ভাব বলে নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। নারীর পক্ষে পুরুষ বিশেষের নিকটে প্রেম বক্তৃতা বাতুলতা হইতে পারে কিন্তু এমন পুরুষও আছে যাহার নিকটে প্রেম বক্তৃতা করিলে বুদ্ধিমত্তা হয়। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের এমন পুরুষও আছে যাহাকে নারী যদি বলে যে “তোমাকে আমি ভালবাসি অথবা ভালবাসিতে পারিতাম” তাহা হইলেই চুটী জীবনের সুখ নিক্কারিত হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে স্বীয় বিচার-বুদ্ধি ও সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর এবং নিম্ন জন্মের উপদেশ পালন করাই নারীর যে উচিত।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। নারীর জন্মে যদি বাস্তবিকই প্রেম জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত খুসিয়া বলা উচিত নহে। নারীর পক্ষে প্রগাঢ় প্রেমের ভান করাই নিরাপদ।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত প্রকারে যেমন নিজের প্রেম প্রদর্শন করিয়া থাকে কেবল সেই প্রকারেই করিবেই করিবে। নারীর পক্ষে পুরুষকে বলা “আমি তোমাকে ভালবাসি” ইহা ভয়না। কেন তাহা আমি বলিতে পারি না।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর পুরুষ কেমন লোক তাহার উপর নির্ভর করে। পুরুষ যদি অতি নম্র ও লজ্জাশীল হয় এবং নারী যদি বুদ্ধিতে পারে যে সেই পুরুষের মনে প্রেমের সঞ্চয় হইয়াছে তাহা হইলে নারী তাহাকে নিজ জন্মটী একবারমাত্র উদ্ঘাটিত করিয়া চমকিত করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের যদি অস্বাভাবিক করিবার এবং পরাধীন করিবার ক্ষমতার অভাব না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্মে কি আছে তাহা যেন পুরুষ নিজেই নারীর সাহায্য শতীত আবিষ্কার করিতে পারে (এই কথা) নারীর পক্ষে নিকট হইয়া পাকাই উচিত। This is not early Victorian wisdom. It is Eve—early and late ever the same.

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। নারীর পক্ষে প্রেম একটা উদ্দেশ্য, আমার এই প্রথম ব্যক্তি মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে যতটুকু বলিলে নারীর সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে ততটুকু বলা উচিত। নারীরা না হইলে পুরুষ যেন নিকের কৃতকাংগের মূলা সুলভ বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করে না, নারীও নিকের না হইলে নিকের প্রেমের গভীরতা সুলভ বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করে না।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু আমি অপ্রচলিত মতেরই পক্ষপাতী— আমার মতে নারীর পক্ষে প্রেম ব্যক্তি করাই উচিত। ইহার একটা কারণ এই যে একপাশে বলিলে মনের একটা অসুখময় এবং শোচনীয় অবস্থার অবসান হয় যে অবস্থায় থাকলে পুরুষ তাহাকে ভাগবাস্তব বা না বাস্তব নারী সেই পুরুষের পাত আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। যদি তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে বুঝতে পারে যে সে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে এবং একপাশে যে প্রায় না ঘটে এমন নহে যে নারী মনোগত ভাব ব্যক্তি করে বলিয়া পুরুষের মনেও প্রেম সঞ্চারিত হয় যাহার ফলে সুখময় বিবাহ সংঘটিত হয়। এই প্রশ্নে একটা ফ্রেঞ্চ প্রবচন অধ্যাক্ত করিতেছি। Il y a des mariages heureux, il shy in a point delectueux. অর্থাৎ কোন কোন বিবাহ সুখময় হয়, কোন বিবাহই আনন্দময় হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নারী প্রেম ব্যক্তি করিলে পুরুষের নিকট হইতে অভীষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে একপাশে বিশ্বাস না থাকলে নারীর পক্ষে প্রেম ব্যক্তি করা উচিত নহে কেন না তাহাতে নারী পুরুষের পক্ষে হীন হয়। পুরুষ তাহা হইলে সম্পূর্ণ অনায়াস করিয়া নারীকে চঞ্চলতা ও চঞ্চলতার জন্য দোষ দিতে পারে। না, নারী সাবধান হইবে এবং প্রেম পদাশ্রয় করিবে না এবং পুরুষ যতদিন প্রেম ব্যক্তি না করে উদাসীনতার ভাব দেখাইয়া তুষ্টি অবলম্বন করিবে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। নারীর যদি প্রকৃত প্রেম জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহা গোপন করা অসম্ভব। সহস্র প্রকারে তাহা দেখা দিবে। পুরুষ নিতান্ত স্থূল বুদ্ধি হইলে উহা বুঝতে পারিবে না কিন্তু যদি সেই সময়ে তাহার হৃদয় অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে উহা নারীর প্রতি তাহার প্রেমকে শীঘ্র হটক বা বিলম্ব হটক আকর্ষণ করিবে যেহেতু পৃথিবীতে পূর্ণ প্রেম অপেক্ষা বলবন্তর চূষক নাই।

### তৃতীয় প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। একাধিক ব্যক্তির প্রতি কি একই সময়ে প্রেম সম্ভব?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহুবিবাহকারীরা আমাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্রিগাম্ য়ং (Brigham Young) এর নাম করা যাচতে পারে। আমার একটা লোকের কথা শ্রবণ হইতেছে যিনি দুই রমণীকর্তৃক অমুরাগী পাত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তিনি সেই নারীদ্বয়কে ঈশ্বরের সম্মুখ, অর্থ এবং অমুরাগ অপক্ষপাতে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকটার মৃত্যুর পর প্রত্যেক পত্নীই অপর পত্নীর অস্তিত্ব জানিতে পারিলেন এবং প্রত্যেকেরই মনে স্বামী কিরূপ প্রেম সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। অসম্ভব—কেন না প্রেম একটা পূর্ণ বস্তু, যাহাতে দয়া আশ্রয়, গাঢ় অমুরাগ, ভক্তি ইত্যাদি আছে। কিন্তু আকর্ষণ—প্রবল আকর্ষণ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। এই আকর্ষণ প্রেমে পরিণত হইতে পারে। তখন নূতন প্রেম পুরাতনকে দূর করিয়া দেয়।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। বিশ্ব প্রথম প্রেমের মত নাহ। সে প্রেম প্রবলতা থাকে না। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির প্রতি প্রেমের সাধা বলা অর্থ এই যে একেবারেই আংশিক ভাবে মাত্র প্রেম লাভ করে। প্রেমাস্পদ বা ক্রান্ত গুণ বিশেষ আছে বস্তুত মেরুপ প্রেম পাইয়া থাকে কিন্তু প্রেমাস্পদ ব্যক্তি দোদেগুণে অথগ্রন্থাবে পুজিত হয় না। কেত কেই আংশিক ভাবেই প্রেম প্রদর্শন করিতে সমর্থ—কেত কেই আংশিক প্রেম পাইবার উপযুক্ত।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। না। এমনকি সমস্ত জীবনেও একাধিক ব্যক্তির প্রতি সমান প্রেম হয় না। আমি প্রেমের কথা বলিতেছি। মনের যে প্রবল ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর সর্পকে তত্ত্বপাণিত করে তাহার কথা বলিতেছি না।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। হ্যাঁ, সম্ভব। বিষয়টা বড় বিস্ময়জনক। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আনন্দের মনের এক দিক মাত্র আকৃষ্ট হয়। অন্য ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ মনের দিক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বড় বিপদের সময়ে যথা বিনয়ক্রমে যখন আমরা প্রেমাস্পদ দিগের সঙ্গে একজন মাত্রেই রক্ষা করতে পারি কিন্তু অন্যকে পারি না তখনই আমরা বুঝতে পারি কতটুকু আমরা একান্ত চিহ্নে চাই।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। প্রেমের বদ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা যায়—তাহা যদি সাহচর্য এবং অমুরাগের এবং প্রবল চিত্তাবেগ ও বিশ্বাসের সম্মিলন হয় তাহা হইলে আমার উত্তর না।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয় সম্ভব এবং বাস্তবিক ঘটিয়াও থাকে প্রায়শ। অধিক সংখ্যক লোকের মত আমার বিরোধী হইলেও আমার ব্যবসায় মনের এবং শরীরের এই আশ্রয় অবস্থা পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যেই অধিক। কোন পুরুষ যদি প্রকৃতই কোন নারীর প্রেমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে যেন অল্প নারীর অস্তিত্বই জানিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ যে নিম্ন তাহা নারীর পক্ষে কখনই নহে, সেই ভুলটুকু দোষ হয় একরূপ ঘটিয়া থাকে যে বালিকা বা শাস্ত্র-সুখময় সাতাবক বিবাহের কথা স্থব হইবার পর ইত্যং সে স্বল্প ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আর এক পুরুষকে বিবাহ করে এবং মেরুপ করায় পুরুষের মনে যেরূপ দীর্ঘ পীড়াদায়ক ভাব হয় সে ভাব নারীর হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই না। এক জনের প্রতি অনুরাগই প্রকৃত প্রেম। সংসারে অল্প কেত থাকুক বা না থাকুক তাহাতে আসে যায় না। প্রোটোনিক প্রেম প্রকৃত প্রেম নহে। পুরুষ বা নারীর মনে প্রোটোনিক প্রেম থাকিলে একাধিক অল্প লোকের প্রতি অমুরাগ জন্মিতে পারে কিন্তু প্রেমের মনঃকল্পিত উৎকর্ষ বাহা তাহা থাকিলে অমুরাগের একাধিক পাত্র থাকিতে পারে না।

নবম ব্যক্তির উত্তর। সম্পূর্ণ অসম্ভব, যদি প্রেম বলিলে সর্বত্র সম্পন্ন প্রেম বুঝায়—অর্থাৎ আত্মা বা জীবাত্মা বা হৃদয় অথবা অণু বা আয়নের উচ্চতর অংশকে আমরা যাহাই কেন বলি না তাহারই প্রেম এবং শারীরিক প্রেমের মিলন। চাক্রিক দ্বারা পুরুষ বা নারীর পক্ষে দাসত্ববন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পের প্রতি গভীর অমুরাগও থাকিতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একটিকেও অতি কৃতকের দ্বারাও প্রেম বলা যাইতে পারে না।

চতুর্থ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম সফল প্রায়ই হয় কি না?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। একজন বিখ্যাত সেনাপতি তাঁহার পরীকে প্রাতঃকালে দেখিলেন, সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার সহিত ঘুমে বাস করিলেন। উভয়েই পরস্পরের প্রতি



ভক্তিবৃত্ত ছিলেন। সাধারণ নোকের যাহা বিশ্বাস তাহা না হইয়া বরং এইরূপ প্রেমই অধিকতর সংঘটিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। কখনই নাহ। কিন্তু কেহ হস্ত এত প্রবল প্রবণতা ও আকর্ষণ অনুভব করে যে নিকটে থাকিয়া সেই ভাবগুলিকে অবিলম্বে প্রচ্ছন্ন করিতে অথবা দূরে পলায়ন করিয়া তাহা নির্বাপিত করিতেই হইবে বলিয়া মনে করে। অনেকে স্বীকার করে কিন্তু আধিক্যে লোকই স্বীকার করে না যে থ্যাঙ্কার (Thuckery) যাহাকে কবিদের ভাষায় অমুপাখ্যতি চিকিৎসা (alibi treatment) বলেন সেই চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পলায়ন করে। এরূপ করিবার কারণ এই যে তাহার বুদ্ধিতে পারে যে যাহার সচিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহার প্রকৃতিতে মহা স্ফাহুভূতি অথবা সেই শ্রেণীর কোন ধর্মভাব আছে অথবা বাইরণ (Byron) যেরূপ বলেন “আমরা যে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলে অনির্বচনীয়ভাবে আবদ্ধ” সেই শৃঙ্খলে আঘাত লাগিবে বলিয়া।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। প্রায়ই হয় না। কিন্তু হইয়াও থাকে। যখন হয় তখন তাহা প্রকৃত এবং স্থায়ী। হস্ত উহাতে যে বিষয় রস আছে তাহাতে এমন দোরভ থাকে যাহা চিরস্থায়ী। নরনারী উভয়েরই অপ্ৰতিকাৰ্য্যভাবে বিষয়রসান্বদনের লোভ বড় লোভ—তাগার স্মৃতি ও কোমল স্মৃতি।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনায় আত্মা স্বাভাবিক সংস্কারবশে প্রথম দৃষ্টিতে তাহার উপযুক্ত সহচর চিনিতে পারে, যদিও এই তথ্যটা অবিলম্বে হৃদয়ে মুদ্রিত হয় না। আমার আরও বক্তব্য এই যে যে প্রেমের প্রতি যুবা পুরুষের মতির গতি হয় তাহার প্রথম সঞ্চার প্রথম দৃষ্টিতে হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম—বিশেষ নিয়ম নহে।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিশ্বাস প্রায় এরূপ ঘটে না। প্রথম দৃষ্টিতে হৃদয় হঠাৎ চকিত হয়। এই ভাব প্রেমে পরিণত হইতে পারে বা ইহার পরিণাম বৈরাগ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টির প্রেম তন্ময় অল্প বর্ধনশীল অল্প কোনরূপ প্রেম অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হওয়া উচিত; যেহেতু ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ছইটা আত্মা পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া এক সঙ্গে উদ্ভীন হইয়াছে।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। সকলেই বলে অনেক সময়ে প্রেম প্রথম দৃষ্টিতে জন্মে। যেমন সঙ্গীতের কোন কোন তানলয় বায়ুতে কম্পন উৎপাদন করিয়া সেই কম্পন দ্বারা কাচনির্মিত সামগ্রী এক নিমেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া দেয়, তেমনি কাহারও স্বভাব এরূপ যে প্রথম সংস্পর্শে আসিবামাত্র মনের অগোচরে অমরূপ গুণ চিনিতে পারে বাহা প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে। বিপরীতাহতুতরও এই নিয়ম।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। বিষয় রসপ্রতি প্রেম সর্বদাই প্রথম দৃষ্টিতেই সংঘটিত হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষাতেই এই ঘটনার একটা নাম আছে। ...কোন কোন পুরুষ ও নারী—নারী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরুষ—এরূপ প্রকৃতির যে তাহার এরূপ উদ্ভেদক ও মনোরম অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ আন্বাদন করিয়া থাকে। তাহার কুমার হইয়াই ভাঙিয়াছে—কুমার থাকাই তাহাদের উচিত।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। এক প্রকার কীটগু আছে যাহা যুবকযুবতীর উপর কার্য্য করে এবং যাহার নার বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত রাখেন নাই। ইহা প্রেম কীট। এটি কীট প্রধানত নাচ ঘরে, রঙ্গালয়ে এবং সমুদ্র তীরে প্রদোদল দেয়া যায়। ইহা দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথম দৃষ্টিতে লোকে প্রেমে পড়ে। ইহা চকিত এবং যুবা বয়স অপেক্ষা অল্প বয়স নোকেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা পরবর্তী প্রেম সংক্রমণের পূর্বসংকেত।

নবম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম একটা চারা গাছ নহে। যাহা বাড়ে এবং পুষ্ট হয়। ইহা একটা ভৌতিক শক্তি যাহা সৃষ্ট হয়।

পঞ্চম প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। প্রেমের বিবাহই কি সর্বোৎকৃষ্ট ?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়। পূর্বরাগহীন বিবাহকে যৌথ ব্যবসায়ের অংশ গ্রহণ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, যদি মানুষের দৈহিক উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রকৃত লক্ষ্য হয়। কেবল সাংসারিক লাভ ও সুখের সংবর্দ্ধন অপেক্ষা এবং আত্মার বিক্ষোভক অপেক্ষা দান— এমন কি আপাত্তে দান এবং চুঃখ ভোগ কারয়া মৎস্য লাভ করা শত সহস্র গুণে ভাল।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। প্রেমের বিবাহ যে সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সেই প্রেম যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে বিবাহ নহিলাষিত হয়। স্থায়ী না হইলে পতি ও পত্নীর মধ্যে সেই সুখের অভিজ্ঞতা ও স্বাতির বন্ধন থাকিবে। প্রত্যেক মানবেরই পূর্ণ প্রেমের দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। যদিও সেই লক্ষ্যের সংসাধন অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী হইয়া পড়ে তথাপি যে বিবাহ সেই উৎকর্ষ করনাদ্বারা অনুপ্রাণিত নহে তাহা চুক্তি মাত্র, বাহ্য পুরুষ ও নারীকে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করে।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। প্রেম ভিন্ন এমন কি সেই প্রেম ক্ষণস্থায়ী হইলেও তন্নিম্ন অল্প কোন প্রেরণা বশে যদি কোন পুরুষ নাথাকে অথবা নারী পুরুষকে বিবাহ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বাভাবিক সংস্কারের নীতির প্রশ্রবণের মূল নিহিত। যে পুরুষ বা নারীর স্বাভাবিক সংস্কার ভাল ভূমি নহে তাহার নীতি ভাল ফল প্রসব করিতে পারে না, তাহা হইলে বিবাহকারীকে সেই ফলের অধিকাংশ ভক্ষণ করতে হয়। ইহা বাতীত আরও কথা আছে—বিবাহ প্রসঙ্গে আরও কথা থাকে—ক্ষণভঙ্গুর প্রেমে যে সকল বিবাহ হয় সেগুলির ফল বড়ই বিষাক্ত। অতএব প্রেমের বিবাহই অসীম রূপে সর্বোৎকৃষ্ট।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনার প্রেমের বিবাহই বিবাহ নামের যোগ্য। অল্পে তুষ্টি প্রকৃতি হয়ত প্রেম ভিন্ন অল্প উদ্বোধের বিবাহে স্মৃতি হইতে পারে। তাহারাই সেই শ্রেণীর লোক যাহারা জীবের সর্বোৎকৃষ্টের নিম্ন পদস্থ বস্তুতেই সন্তুষ্ট। চুঃখোন্মত্তের সময়ের দৃষ্টি এবং সদৃশল হৃদ্যালোকে দৃষ্ট দৃষ্টের মধ্যে যে প্রভেদ সূক্ষ্ম এবং প্রকৃত সুখের মধ্যে সেই প্রভেদ।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। রাজ শাসনের পক্ষে প্রেম শূন্য বিবাহ ভাল হইতে পারে যেহেতু যে নারী স্বামীকে ভালবাসেন সেও নিশ্চয়ই তাহার সন্তানদিগকে ভালবাসিবে এবং যত্ন করিয়া মানুষ করিবে। কিন্তু ইহাতে বিবাহকে আইনের চুক্তি রূপ অবনীত করা হয় যাহাতে উভয় পক্ষই রাজশাসনের ভূত্যা মাত্র। প্রশ্নের যে এই অভিপ্রায় তাহা বোধ হয় না। পতিপত্নীর পক্ষে প্রেমের বিবাহ বাতীত অল্প কোন রূপ বিবাহই সন্তোষজনক সঞ্চয় হইতে পারে না। এই জন্যই বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিবার আইনের সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে। পবিত্রতার ঠিক নিম্নেই যদি পরিচ্ছন্নতার স্থান হয়। তাহা হইলে দাম্পত্য সুখের অভাব এবং সংসারের সর্ববিধ অমঙ্গলের অঙ্কে একই পল্লীবাগী। ( শেষ বাক্যটির মূল এই—It cleanliness is next to godliness, unhappiness in marriage is surely in the same street with half the evils of the world, )

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। এই প্রশ্নে একটা অতি বড় প্রশ্ন উঠে। সে প্রশ্ন এত যে,—প্রেম বস্তুটা কি? প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠাপিত বিবাহত যে প্রত্যেক বিবাহেচ্ছু মানবের সর্বোৎকৃষ্ট মানসিক বস্তুনা সে বিষয়ে প্রকৃতিস্থ কোন পুরুষ বা নারী সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু “প্রেমে পড়া”টা যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রথম অনুদান তাহাতে আমার যোরতর সন্দেহ হয়। “তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া পরে অধকাশ হইলে অনুতাপ করিবে,” এত যে পুরাতন ভয়ানক পবচন ইঙ্গা সেই সকল যুবকযুবতীর প্রতি প্রযোজ্য ব্যবহার পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পরস্পরকে না চিনিয়া, পরস্পরের স্বভাব গুণ ও দোষ না জানিয়া গিজার বা রেডিওর আফিসে যায়। আজকাল যে মধ্য বয়সে বিবাহেব সংখ্যা বাড়িতেছে সেই বিবাহই মোটের উপরে অতি সুখের বিবাহ। ইহার কারণ এই যে তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া হয় না থাকে।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। কি এই মর্শ্ব ও চর্ভিক্ষের দিনে কুটীরের প্রেমে ও এত ব্যয় হয় যে মনবৎসর পূর্বে অট্টালকাতেও তত হইত না। কিন্তু টাকার জন্য প্রেম অপেক্ষা মোটে প্রেম না হওয়াই ভাল। আমার অভিজ্ঞতায় সে সকল বিবাহে টাকার বন্দোবস্ত আছে তাহার কোনটাও সুখের হয় না।

নবম ব্যক্তির উত্তর। তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রথম বিবেচনার বিষয় এই যে মনস্বিনী নারীর পক্ষে প্রেম-হীন বিবাহের মত বাত্বৎস বস্তু আর কিছুই নাই। নারী যদি মনস্বিনী না হয়—সে যদি পুতলিকা মাত্র, মৃৎপিণ্ড, চেতনাহীন চিত্তাশূন্য জীব হয়, তাহা হইলে সে কেবল একটা সামসারিক এবং সামাজিক সন্তান মাত্র লাভ করে—সে মত কোন পুরুষকে স্মৃতি করিতে পারবে না। দৈহিক সুখের জন্য কৃতজ্ঞতা অথবা নারীর নিজ পরিভ্রমের প্রতি উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, জীবনহীন স্মৃতি ভাব মাত্র যাহা প্রথম প্রকৃত প্রলোভনের স্পর্শে শুকাইয়া যাইবে। নারী দগের দৃষ্টিতে অবশ্য এইরূপ প্রতীক্ষমান হয়। প্রেম অতি অগভীর হইলে তাহা এমনই দুর্বল ভাঙ্গু হয় যে তাহার পক্ষে কোন নারীকে স্মৃতি করিবার সম্ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্ন। সৌন্দর্যহীন নারীর পক্ষে সুন্দরী নারীর মত প্রেমাস্পদ হওয়া কি সম্ভব?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। যে নারী পুরুষের প্রেমাস্পদ হয় সে নারী কি সেই পুরুষের কাছে সৌন্দর্যহীন? কত কুৎসিত নারী পুরুষের মনে ভক্তিভাব উৎপাদন করিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। “সৌন্দর্য্য থাকে দর্শকের চক্ষুতে।” আমার এক রসিক বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন অথবা অন্যের কথা অধ্যাহৃত করিয়াছিলেন যে তিনি তাহার চল্লিশ বৎসর বয়সের পুকে সৌন্দর্য্যহীন নারী দেখেন নাই। একথাটা হয়ত অত্যাশ্রিত। কিন্তু আমার কথা এই যে আমি এক প্রকার মাত্র সৌন্দর্য্যহীন নারী জানি। যাহারা হাবভাব বজ্জিত, কোমলতা বজ্জিত, তাহারাহ সৌন্দর্য্যহীন। আমরা কি প্রত্যেকেই ভক্তিতাজন সৌন্দর্য্যহীন নারী দেখি নাই?

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। যৌন আকর্ষণ একটা গুঢ় রহস্য। কেহ একপে আকৃষ্ট হইলে বুঝিতে পারা যায়। সুস্থী নারী কখনো-শূন্য হইতে পারে। সৌন্দর্য্যহীন নারীর তাহা বহুপরিমাণে থাকিতে পারে। সেই গুঢ় বস্তুটা নারীকে পুরুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা যে পরিমাণে দেয় সৌন্দর্য্য সে পরিমাণে সম্ব না। সৌন্দর্য্যহীন নারীর সেই গুঢ় বস্তুটা থাকিলে তাহার প্রেমিকেরা বুঝিতে পারে না যে তাহার সৌন্দর্য্য

নাই। সেও তাহাদিগকে তাহা জানিতে দেয় না। অন্য নারী বাতীত বোধ হয় তাহা কেহই জানিতে পারে না।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। প্রকৃত প্রেমের সহিত স্ত্রীর গঠন এবং বর্ণের কোন সংশয় নাই। আমার বোধ হয় ঋণযুক্ত চিব্বশীন নারীকে আমি ভালবাসিতে পারি না। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী চেনিভল লাম্বট (Daniel Lambert) কেও (অর্থাৎ চেনিভল লাম্বট) কেও স্বভাবের পুরুষ ছিলেন সেইরূপ স্বভাবের নারীকেও আমি ভালবাসিতে পারি না। কিন্তু এই ভাণের সংহত, পুরুষ সে কেবল নারীকেই ভালবাসে কিন্তু তাহার রূপ বা আকৃতি ভালবাসে না, এত মত তথ্যের কোন সন্দেহ নাই। সাধারণত পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ অতি কুৎসিত জীব, তথাপি যেনন করিয়াই হউক নারীও পুরুষকে ভালবাসে। যুগের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহাকে, নাই বল আর আশ্বাস বল বা অন্য কিছু বল তাহা পুরুষকে দরিদ্র বরাহস্ত করতে পারে। ইহা না থাকিলে অতি সুন্দর সুখও কৃত্তিকর মুখস মাত্র, এবং বোধ হয় যেন অতি সুন্দর মুখের পশ্চাতে সেই বস্তুর অস্তিত্বের অভাব থাকাই সাধারণ নিয়ম। মোটের উপরে আমার বিবেচনার সুন্দরী নারীর মত সৌন্দর্য্যহীন নারীও প্রেমাস্পদ হইতে পারে যতক্ষণ তাহার মন সৌন্দর্য্য গীন না হয়।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। কেবল যদি সে দেবতা হয় বা অতি প্রতিভাশালিনী হয়। কিন্তু তথাপি ইহা একটা প্রতিলিকা ভাস। যে পুরুষ তাহাকে ভালবাসে সে হয়ত তাহাকে সুন্দরই দেখে।

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। আকৃতির সহিত প্রেমের কোন সন্দেহ নাই। চার্লসই প্রকৃত প্রেমকে পরিচালিত করে। সৌন্দর্য্যহীন নারীর যদি চার্লস-সৌন্দর্য্য থাকে তাহা হইলে যে পুরুষ তাহার চার্লস ভালবাসে ও জানে তাহার চক্ষে সে সুন্দরী।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। কদাকারেও এমন প্রণয়ভেদ আছে যাহা নীরস সৌন্দর্য্য অপেক্ষা পুরুষের চিত্তাকর্ষক। যে সুন্দরী নারীর মুখে তাহার প্রধান বা একমাত্র আকর্ষণ তাহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যহীন নারী অধিক দিন পতিপ্রাণা হইয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বোধ হয় জীবনীশক্তির আকর্ষণই সর্ব্বপ্রধান। জীবনীশক্তিবৃত্তা নারীর প্রশংসাকারী এবং প্রেমের অভাব হয় না।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। নিশ্চয়ই। আমাদের প্রধান নারীগণ এবং সর্ব্বপ্রধান নারিকাগণ সৌন্দর্য্যহীন ছিলেন। মোটের উপরে দীর্ঘ চিন্তাশীল পুরুষ উদ্ভাসরূপে জানে যে চন্দ্রও যত গভীর সৌন্দর্য্যও তত গভীর। সে ইহাও জানে যে, যে ফুল অতি সুন্দরী তাহাই অতি মারাত্মক। যে সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে। তাহার নারীর সৌন্দর্য্য গ্রাহ্য করে না। নারীর স্মৃতি, শাস্ত্রভাব, বর্ণের মিষ্টতা এবং পবিত্রতা অভিপ্রের্ত্তা স্বামীকে আকর্ষণ করে। তাহার সুন্দর মুখ অব্বেষণ করে তাহার অনেক সময় তাহার মনে লুক্কায়িত দুঃস্বপ্ন দোহিতে পায়। আমার ইচ্ছা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে সুন্দরী নারীমাত্রই দুঃস্বপ্ন, কিন্তু প্রায় অতিমাত্রায় সৌন্দর্য্য অনেক সময়ে গর্ব্ব, প্রেমোদাসক্তি, প্রাণশালিন্য উদ্ভীপন করিয়া থাকে যাহা অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষকে ক্লান্ত করে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। পারে না হইলেও পরিমাণে হয় যে হেতু নারীর পক্ষে প্রথমে পুরুষের উচ্চতর অংশের (higher self) বাহাকে প্রাণ, আত্মা, অহম্ বাহাই বল না কেন তাহার প্রেমাস্পদ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভব। তখন যদি সে পুরুষের ইঞ্জিরও অধিকার করিয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতি সেই পুরুষের পেন সুন্দরী নারীর অনাস্বাদ্য প্রেম অপেক্ষাও বলবত্তর এবং অধিক স্থায়ী হইবে। প্রথমে তে যে পুরুষ নারীর সৌন্দর্য্যের বিকটে বেজার আত্মসমর্পণ করে তাহা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সুন্দরতর অধিক আধ্যাত্মিক ভাব

সম্পন্ন মনুষ্য হইয়া পড়িবে এবং অধিকতর শ্রম-পরায়ণ হইবে। এস্থলেও যেন আমরা প্রেমের সর্বপেক্ষা অধিক ক্ষমতার কথা স্মরণ করি—প্রেম মহা-মহিম মনোভাব, উঠা যে কেবল দৈহিক ভাব নহে ইহা যেন মনে করি।

#### সপ্তম প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। কোন পেম কি চিরস্থায়ী হইতে পারে?

প্রথম ব্যক্তির উত্তর। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুসাধ্য নহে। সসীম মানব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আমরা যেন খাশা করি যে প্রকৃত অমর প্রেম চিরকালের জন্য প্রস্ফুটিত হয়। প্রেতাশ্বাবাদীদের মতে ঠা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর। যাহা সাধারণত ভ্রমবশত “চিরস্থায়ী প্রেম” নামে অভিহিত হয় তাহা দীর্ঘকালের অভ্যাস মাত্র; কিন্তু যদি পুরুষ ও নারীর একজন অন্য অপেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্য এমন অপরিমিত ভাবে প্রধান হয় যে নিজেকে আশ্রয়দাতা ও যেশীল বলিয়া মনে করে এবং নিজের প্রতি চক্ষুণের মনে পূজার ভাব উদ্ভিক্ত করিতে পারে, অথবা যদি দুই জনই উচ্চাচ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সমান বা কিছু ছোট বড় হয় যাহাতে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, অথবা প্রায় যেক্রপ ঘটিয়া থাকে উভয়েই যদি বুণা গব্বী এবং এমন নিরোধ হয় যে পরস্পরকে লইয়া তাহাদের সন্ধীর্ণ অবশিষ্ট জীবন কালের জন্য সুখে উন্নত হয় এবং পরস্পরের কাছো পরম সন্তোষ লাভ করে তাহা হইলে চিরস্থায়ী প্রেম হইতেও পারে।

তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। কিন্তু উভয় পক্ষে প্রায় ইহা ঘটে না। নারী বুদ্ধিমতী হইলে সে স্বামীর নিকট হইতে চিরপ্রেম পাইয়া থাকে কিন্তু স্বামী পত্নীর নিকট হইতে তত পার না। দুই জনের স্থায়ী বাতীহারিক প্রেম পৃথিবীর সর্বপেক্ষা সুন্দর বস্তু।

চতুর্থ ব্যক্তির উত্তর। আমি বোধ করি যে প্রকৃত প্রেম ই একমাত্র বস্তু যাহা চিরস্থায়ী তৃপ্তি কাননা নষ্ট করে, মৃত্যু, শত্রুতা নষ্ট করে, বান্ধিকা, উচ্চাভিলাষকে বধ করে এবং সময় আমাদের সমস্ত আদরের বস্তুকেই গ্রহণ করে ও ভাগিয়া দেয় কিন্তু প্রেমকে কিছু স্পর্শ করে না। মানুষ প্রেমকে ছাড়াইয়া উঠে না কিন্তু প্রেম মানুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়—যত বৎসর অতিবাহিত হইতে থাকে উহা তত বল দান করে, নাশকে ক্ষয় করে এবং নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর ইহা প্রস্ফুটিত হয়।

পঞ্চম ব্যক্তির উত্তর। আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রেমমাত্রই চিরস্থায়ী হয়। একপ না হইয়া পারে না। ইহা চির প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা এবং ফুংকারে নির্কাপিত হইতে পারে না। প্রেমাস্পদের মৃত্যু হইলে যদি অপর জীবিত ব্যক্তি আর একজনকে ভালবাসে তাহা হইলেও প্রথম প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হইয়া থাকে তবে দ্বিতীয় প্রেমাস্পদ সেই মৃত প্রেমের স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই উত্তর হইতে প্রশ্নটা বিল্লিষ্ট করিলে এই পাড়ার—প্রেম কতবার প্রকৃত প্রেম হইয়া থাকে?

ষষ্ঠ ব্যক্তির উত্তর। প্রশ্নটা কিছু অস্পষ্ট। যদি ইহার এই অভিপ্রায় হয় যে প্রেম কি প্রেমিকদিগের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী হয়? তাহা হইলে ইহার উত্তরে হাঁ বলিতেই হইবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চিরজীবন ভালবাসিতে পারে—বান্ধিক্য তাহাদের প্রেম আর দেহগত থাকে না। কিন্তু শিশুদের প্রেমের মত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও তাহাতে ভাব-প্রবণতা থাকে। “চির” শব্দ যদি অনন্তকাল বুঝায় তাহা হইলে উত্তরদাতা অনতিজ্ঞতা হেতু তুচ্ছতাৰ অবলম্বন করিতে বাধ্য।

সপ্তম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম যে কেবল স্থায়ী হয় তাহা নহে কিন্তু উত্তর গাঢ়তা গভীরতা এবং কোমলতা জীবনের সকল অবস্থাতেই বর্ধিত হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে এই তুল্য সুন্দর অবস্থা থাকে যে স্থলে দুইজনের একজনকে অহংজ্ঞান শূন্য হইয়া অন্যের সকল কার্যে অন্তর্মনন করিয়া নিজের ব্যক্তিগত মুচিয়া ফেলিয়া অন্যে যাহা করে তাহাই ভাল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কোন পুরুষ বা নারী দূর দেশে পতিত গাম্ছাখানাকে ভালবাসিতে পারে না কিন্তু সেই গাম্ছাখানাও কখন কখন প্রেমের সমকক্ষ দয়া উদ্বেক করিয়া থাকে।

অষ্টম ব্যক্তির উত্তর। হাঁ। আমার এক পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী, চলেন বাঁহারা সাতান্ন বৎসর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা প্রেমিক দ্বয়ের মত বসি সেবন করিতে বাসিতেন; স্বামী পত্নীর হাত তুলিয়া লইয়া তাহাতে স্নেহে চাপড়াইতেন। তাঁহারা বলিতেন যে দ্বার বন্ধ করিতে হইবে কি পুলিশ রাখিতে হইবে এইরূপ সামান্য বিষয় ভিন্ন তাঁহাদের কখনও নহভেদ হয় না। প্রতি রাত্রিতেই সেই সাতান্ন বৎসর বয়স্ক স্বামী পত্নীর জীর্ণ হাত তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিজের দিকে প্রেমিকের মত চুষন করিতেন। একবৎসরের মধ্যে উভয়ের মৃত্যু হইয়াছিল—তাঁহাদের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত পরস্পরকে সর্বপ্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন। আমি নিজে ইহা দেখিয়াছি এবং এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে।

নবম ব্যক্তির উত্তর। প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হইবে। কিছুই তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। কিছুই তাহাকে ক্ষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু সময় যখন প্রেমাম্পদের মুখে অক্ষয় বদী অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহার পরও প্রেম থাকিবে। পূর্ণ প্রেমের অর্থ পূর্ণ বিশ্বস্ততা, পূর্ণ বিশ্বাস মন ও শরীরের পূর্ণ সাহচর্য, লাভ ক্ষতি, কল্লনা এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ঐকমত্য। হৃৎ, কষ্ট, বিরক্তি, চিত্র প্রলোভন প্রভৃতি নরকের সমস্ত শক্তিও প্রেমের শক্তিকে পরাভব করিতে পারে না।

বহু লোকে ভাবে যে এরূপ প্রেম নাই কিন্তু তাহা অবশ্যই আছে। কেবল বিক্রপকারী লোকের সমক্ষে তাহা আত্ম ঘোষণা করে না।

#### অমুবাদকের কথা।

যে নয়জন নবেল লেখক ও নবেল লেখিকা প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনটি বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে। সকলেই বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থলে প্রেম চিরস্থায়ী হয়। সকলেই বলিয়াছেন যে রূপহীনা নারীও প্রেমাম্পদ হইতে পারে। সকলেই বলিয়াছেন যে যে বিবাহে পূর্বরাগ আছে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। আমাদের বাঙ্গালীর বিবাহে পূর্বরাগ মোটেই নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর ভাগ্যে উৎকৃষ্ট বিবাহ নাই।

নারীর প্রেম অধিক না পুরুষের প্রেম অধিক? এই প্রশ্নের উত্তরে সাতজন বলিয়াছেন যে নারীর প্রেমই অধিক। দুই জনের মতে পুরুষের প্রেম অধিক। আমাদের দেশের কবিদের মত জানিতে ইচ্ছা হয়।

পাঁচ জন বলিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে এক জনের অধিক লোককে ভালবাসিতে পারে না। চারিজন বলিয়াছেন পারে। আমাদের দেশের কবিদের মত কি?

প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম সঞ্চার হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে সাতজন হাঁ এবং দুই জন না বলিয়াছেন। এশিয়ার কবিগণ বোধ হয় সকলেই হাঁ বলিয়া উত্তর দিতেন। এশিয়ার সভ্য সমাজে বিবাহের পূর্বে যুবক যুবতীর

পরম্পরের সান্নিধ্য প্রায়ই ঘটে না। সুতরাং সেরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইলে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া যায়। সংস্কৃত কবিরা এই প্রথম দৃষ্টি সজ্জাত প্রেমকে “ভারা-মৈত্রক” “চক্ষু-রাগ” প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

নারীর পক্ষে প্রথমে প্রেম ব্যক্ত করা উচিত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সাত জন হাঁ এবং ছই জন না বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কাব্যে এরূপ পড়িয়াছি কিনা মনে হয় না। যে নারী প্রথমে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে পুরুষেরাই প্রথমে বিবাহের প্রস্তাব করে। আমাদের দেশের কবিগণের রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের নায়িকারাই প্রথমে মনোভাব ব্যক্ত করে। শিবের জন্ত পার্বতী তপস্তা করিয়াছিলেন এবং প্রথমে নিজেই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। জৈবধানী প্রথমে কচের নিকটে প্রার্থিনী হইলেন। তথা হইতে প্রত্যাত্যাত হইবার পর যযাতির প্রেমাধিনী হইলেন। যযাতি বেচারার অপরাধ এইমাত্র ছিল যে তিনি মুমূর্ষু দেবধানীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কুপ হইতে তুলিয়া বঁচাইয়াছিলেন। শশিষ্ঠাও প্রথমে যযাতির নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন। দময়ন্তী হংসভূতমুখে নলকে মনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শকুন্তলাও ছয়মুখে দেখিবামাত্র ধৈর্য হারাইলেন এবং তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। সাবিত্রীও প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া সত্যবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ জ্ঞাপন করিলেন। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে স্বয়ংবরা হইবার সময়ে নারীমাত্রই পুরুষের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় মনের অভিপ্রায় জানাইত। কিন্তু আমি তাহা বলি না। আমার মতে নিমজ্জিত বা রবাহত যত পুরুষ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইত তাহাদের তথায় উপস্থিতিই তাহাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিত। তাহার পর, কথার পক্ষে মাল্যদান প্রথম মনোভাব প্রকাশ নহে। বঙ্গীয় তরুণীরা যুবকদিগের সান্নিধ্যের সুযোগ পাইলে কি করিতেন বলা কঠিন। কিন্তু বর্তমান সময়ে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরাই তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া তাঁহাদের জন্ত প্রথম উদ্যোগী হইয়া বর অমুসন্ধান করিয়া থাকেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

## মানস-সরোবর।

—:~:—

কেন ডাকিয়াছি তাই চাহ জানিবার ?  
চাই না কিছুই প্রিয়া, শুধু ক্ষণতরে  
দাঁড়াও সম্মুখে ; মোর নয়নের 'পরে  
পড়ুক কনক-রেখা কিরণ তোমার।

অনন্ত বাসনা ভরা অশান্ত হৃদয়  
মরে' যাক্, গলে' যাক্ তপ্ত তীব্র লাজে।  
অমৃত সরসী এক মুহূর্তের মাঝে  
করুক স্নেহজন—নিশ্চরঙ্গ শাস্তিময়,

প্রতিবিশ্ব সেই নিখুঁত জ্যোতি নিরমল ;  
 দেখিতে দেখিতে সেই মানস-সরসে  
 কনক-কমল এক বিকাশ হরষে  
 উঠুক ফুটিয়া—মূর্ত প্রেম-শতদল !  
 বিশ্বের সুসমা-রূপে আমি তুমি প্রিয়া,  
 তারি মাঝে রাখ দুটি চরণ-কমল,  
 দাঁড়াও মহিম-ময়ী মূর্তি অচল,  
 অনন্ত জীবন মাঝে দাও ডুবাইয়া ।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ।

## পাগল ।

—:~:—

লোকটা গাঁয়ের বাইরে একটা ভাঙা মন্দিরের মধ্যে পড়ে থাকত । তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানা ছেঁড়া কাল রঙের কম্বল, একখানা কাঁদা ভাঙা পাথরের রেকাব, একটা মাটির গেলাস আর একটা পুঁটলী । সে যে কতদিন আগে ও-গাঁয়ে এসেছিল তা কেউ ঠিক বলতে পারে না ; চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছোকরার বলত তারা ছেলে বেলা থেকেই—তাকে ঐ রকম দেখে আসছে । তার নাম কেউ জানত না ; লোকে তাকে ‘পাগল’ বলেই ডাকত । পুঁটলীটি সকল সময়েই পাগলের কাছে থাকত ; যখন বেকরত সেটা তার পিঠে ঝুলত, আর যখন ঘুমাত তখন সেটাকে প্রাণপণে হুঁহাত দিয়ে পাগল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখত । কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত “পাগল তোমার পুঁটলীতে কি আছে ?” পাগল পুঁটলীটাকে কোলের উপর রেখে অনিমেব নয়নে দেখত, আর হুঁচোখ দিয়ে তার ঝন্ ঝন্ করে জল পড়ত, শেষটা হঠাৎ হো হো করে হেসে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলত “আছে আছে জিনিস আছে ;” কেউ যদি তার পুঁটলী কেড়ে নিতে যেত পাগল তাকে ছুটে মারতে আসত । তার ব্লি ছিল “আজ্ঞা গেল কোথায় ?” সে আপনার মনে কত গান গাইত, কত কবিতা আওরাত, কত কাঁদত কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে এক জ্বরগার দাঁড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলত “আজ্ঞা, গেল কোথায় ?”

তখন রোদ পড়ে এলেছে । ছোট ছোট ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছিল । “Pass here রমেশ” “Off side” “Foul there” এই রকম নানান রকমের কণ্ঠস্বর ; ফুটবলের “চপ্ চপ্” শব্দ ; বাঁশীর “ফুন্ ফুন্” সবগুলির একসঙ্গে মিলে সেখানে একটা পবিত্র আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল । এমন সময় বঙ্গ-গভীর ঘরে কে বলে উঠল—“আজ সাতটার সময় পাঁচখান জাহাজ ছাড়বে, কে বিলেত যাবে বাও ; কার গার বেঞ্জী জোই ছিল ?—জোণাচার্য্যের গার ?—না দমরস্তীর গার ?” ছেলের দলে মহা আনন্দধ্বনি হ’ল ; সকলেই সম্বরে চীৎকার করে উঠল “ওরে পাগল, আসছে রে !” তার পরেই পুরা দমে আবার খেলা চলতে লাগল । এবার



খুব নিকটে শব্দ হল—“আচ্ছা গেল কোথায়?” “ভরে বাবারে” বলে নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে ছেলেরা পালাতে লাগল; কেউ পিছনে এসে তার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল; কেউ বলতে লাগল “পাগল, একে ধরে নিয়ে যাও;” কেউ বললে “পাগল, দুটুবল খেলবি?” “হা হা সব পালায় কেন! সব পালায় কেন!” বলতে বলতে পাগল মাঠেই নম্রা এসে ঘোর করে দুটুবলে একটা “কিক্” করলে। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এধার ওধার তাকিয়ে “আচ্ছা গেল কোথায়” বলতে বলতে আবার চলল। ছেলের দল যখন পিছন থেকে তাকে বড়ই বিরক্ত করছিল তখন কেবল পাগল এক একবার পিছন ফিরে বলছিল “আচ্ছা গেল কোথায়?”

বোশেখের রাত্তির। তখনও পাড়া একেবারে নিবুম হয়ে পড়ে নি। চারি ধারে চাঁদের আলো ফট্ ফট্ করছে; দূর থেকে নাকে মাঝে এক একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে; চাঁদের আলোয় বিহ্বল হয়ে গিয়ে রাত জাগা এক পাখী যেন কিসের খোঁজে ‘পিং’ ‘পিউ’ করে চারি ধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক গরম, ঘর বাড়ীর জানালা প্রায় খোলা; কেউ ক্রমাগত হাতপাখা নাড়ছে; কেহ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলছে ‘মা তার!’; কেউ বলছে ‘উঃ কি ভীষণ গরম!’ বোশাও ছেলে ‘না হল খাব’ বলে কান্না কান্না করে দিচ্ছে; মা ঘুমের ঘোরে বলছে ‘এই যে দি’ কিন্তু ততই ঘুম যে দেওয়া আর হয়ে উঠছে না; কোন বাড়ীতে ছোট্ট ছেলে ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে আর বিছানায়ই শোবে না; তার বাবা তাড়ি দিয়ে বলছে ‘মার খাবি, ঘুমো!’ এমনি সমস্তার মুখোয়াদের বাড়ীর কাছাকাছি গভীরস্থরে আওয়াজ হ’ল “আচ্ছা গেল কোথায়?” বৈকুণ্ঠ বাবুর তখনও ঘুম আসে নি, তিনি খাটের ওপর অঙ্গ-শাশ্বত ভাবে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ‘ভুড়ুক’ ‘ভুড়ুক’ করে থেমে থেমে শুড়-শুড়ীর নল্টি টানছিলেন; গিন্নী মেকোত এক ধারে তাঁর চার পাচ বছরের ছোট্ট নাত নীহারকে নিয়ে শুয়েছিলেন; নীহাররঞ্জন ঠাকুরমার ঘরের ওপর একখানি কাচ পা তুলে দিয়ে, বীরের মত ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুমা মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছিলেন আর এক একবার টল্টিচ্ছিলেন। অল্প দিন গিন্নী এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু আজ কর্তার উপদ্রবে তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে। বর্তা একটু আগাই ‘ঘরে বেড়াল ঢুকেছে’ বলে গিন্নীকে মহা ব্যস্ততার সহিত উঠিয়েছিলেন। গিন্নী তন্ন তন্ন করে খাটের তলা, সিন্ধুরের তলা সব দেখেও বিড়ালের কোন অঙ্গসন্ধান না পোয়ে কর্তাকে বক্তে বক্তে আবার শুয়েছিলেন। কর্তা তখনও বলছিলেন “হ্যাঁগা, বেড়াল পেলো?” গিন্নী চুপটি করেছিলেন। “আচ্ছা গেল কোথায়?” শব্দ শুনেই বৈকুণ্ঠ বাবু বলে উঠলেন “এই বেটা পাগল দেখাচ্ছ আজ মন্দিরে যায় নি!” “হগো শুনচ? পাগল আর বেশী দিন বাঁচবে না!” গিন্নী এবার মহা জুজু হয়ে বললেন “তবেই আর কি এবার একেবারে আমার শরীরে স্বর্গলাভ!” “আহা ফট্ করে চট কেন?—চট কেন? তাই বলছি!” গিন্নী আর উত্তর দিচ্ছেন না; কাজেই এবার কর্তা বাধা হয়ে নল্টি নামিয়ে রেখে “দুর্গা দুর্গা!” “অস্তিকল্প মুনিমাতা ভগিনীকান্তকীর্ণা জরংকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্ততে,” “গড়ুর’গড়ুর’ ইত্যাদি নানা রকমের মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে গুয়ে পড়লেন।

( ৪ )

সকালে উঠেই সকলে দেখল বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ীর কাছেই তেঁতুল গাছটার তলায় পাগল বসে আছে। তার সঙ্গে একটা কথাও নাই,—চোখ দুটো যেন তার ঠিকের বেরুচ্ছে,—গাল দুটো বসে গিয়েছে; সে এক ভীষণ চেনার! কিন্তু তার পুটলী ঠিক আছে। অনেকে তাকে চাল দিতে গেল; বৈকুণ্ঠবাবু কি তাকে ভাত দিতে গেল; তরকারি গিন্নী তাকে একখানা কাপড় দিতে গেলেন; কিন্তু পাগল সেদিন কিছুই মিলে না, মাথা মেঁকে

জানিয়ে দিল, সে কিছুটা চাব না। সমস্ত দিন পাগল সেখানে চুপ করে বসে থাকল। কত লোক এল, কত লোক গেল; ছেলেরা কেউ টিল ছুড়ে নারল, কেউ গায়ে ধুলো দিল; কিন্তু আজ পাগল একটুও নড়ল না,— একটা কথাও বলল না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি—যখন সে রাস্তাটা প্রায় নিহত হয়ে এল পাগল একবার উঠে চারিধার বেশ ভাল করে দেখে নিল, তারপর আবার আগেকার মত চুপচুপ করে বসল। নীহার কিয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল; বাড়ীর দরজার মধ্যে ঢুকে সে বিকে বললে “আমি পাগল দেখে, কি আমি পাগল দেখে” কি অনেক ভয় দেখাল, বললে “পাগলে ধরে নিয়ে যায়;” কিন্তু নীহার কিছুতেই ছাড়ল না; বললে “আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখে ওর কাছে যাব না।” “আচ্ছা এত দরজার মধ্যে থেকে দেখ, যেন বাইরে যেও না” এই বলে কি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। যখন নীহার দেখলে কেউ কোথাও নেই সে আস্তে আস্তে পাগলের কাছে এসে তার পাঞ্জাবীর বুকে পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে তাকে বললে “পাগল তোমার খিদে পায় না? তোমাকে বুকে কেউ পয়সা দেয় না? আমাকে আমার দাদামহাশয় রোজ একটা করে পয়সা দেয়। তুমি এই পয়সা নাও, খাবার খাবে।” পাগল এদিক এদিক তাকিয়ে আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল তারপর নীহারকে হঠাৎ বোলে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে ভড়িয়ে ধরে এদিক এদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে ছুটল। পথ দিয়ে বারা আসছিল তারা দেখতে পেয়ে চীৎকার করতে লাগল। পাগল তাদের দিকে ফিরে ফিরে হসাস করে চুপ করতে বলে আবার পিছনে তাকাতে তাকাতে ছুটল। নহা তৈ তৈ পড়ে গেল। বৈকুণ্ঠবাবু চাকর দ্বারা পেয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে পাগলকে ধরল; বৈকুণ্ঠবাবু নিজে গলদঘন্য অবস্থায় সেখানে এসে “মার শালাকে মার, শালা আমার বাতাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল” বলে আশ্বাসন করতে লাগল; যে ঘা পেলে তাই দিয়ে পাগলকে মারতে লাগল। সে মূদ খুন্ডে পড়ে গেল; সবাই যখন দেখলে পাগলের মুখ দিয়ে বলকে বলকে রক্ত উঠছে তখন তারা তাকে কেড়ে দিয়ে যে যার কাছে চলে গেল। ঘটনা দুই তিন পরে পাগল উঠে বসল; তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে একটু একটু করে চলতে লাগল। সে রাস্তার ধারে যাদের বাড়ী ছিল তারা সে রাস্তাে সবাই শুন্তে পেয়েছিল রাস্তা দিয়ে কে বলতে বলতে যাচ্ছে—“কেড়ে নিল গো কেড়ে নিল।”

( ৫ )

সাত আট দিন পরে বেলা দশটা এগারটার সময় বোসেদের বড় দীঘির ঘাটে মস্ত একটা গোলমাল বেধে গেল—“সে পাগলটা—পথের ধারে পাড়ের তলে মরে—পরে আছে—” কেউ বললে “সে হতেই পারে না—” আমি তাকে কাল বিকেলে মন্দিরের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছি;—” কেউ বলতে লাগল “বেশ হয়েছে বেটা মরেছে—বাঁচা গেছে, ছেলেপুলে সব রকম পেলো;” কেউ বলল “বেটা বেতাল সিঁকি ছিল;” কেউ বললে “কালী সাধনা করতে গিয়ে লোকটা পাখল হয়ে গিয়েছিল;” কেউ বললে “আজ পাগলটা অনেক দিন এ গায়ে ছিল, মরে গেল!” বৈকুণ্ঠ বাবু তখন একধারে জউলির আঠা ধরে পৈতে মাড়ুছিলেন; তিনি শেষ কাকর লোকটার কথা মতা চটে গিয়ে খট খট করে খড়ম পায় দিয়ে সেখানে এসে চোখ বুজিয়ে বললেন “কেহে তুমি বদ্‌ ছোকরা? কলেকে পরে হাঁরাজি শিখে তোমার এই বিঘো হচ্ছে! বেটা হলে চুরী করে নিয়ে যাচ্ছিল সে দিকে তোমার লক্ষ্য নেই আর বেটা চোর বন্দারেস্ মরেছে আন্ত ভোমার ওই ছুঃখ।” তার পরই আর এক বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন “বুঝলে রামদয়াল খুড়ো এবেই, বলে যোর কলি, রামদয়াল খুড়ো তখন বন্ধ দৃষ্টিতে হারচরণ

পেরাদার শাওড়ী জল নিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখছিলেন; তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন “বোর কলি! বোর কলি!”

যখন এক দলের মধ্যে এই রকম ঘোরতর বাগবিতণ্ডা চলছিল আর একদল—যারা এখনও ঠিক বুদ্ধ হয়নি—তারা বললে “চলছে পাগলটাকে একবার দেখে আসা যাক।” দেখাদেখি বুদ্ধদের মধ্যেও অনেকে চললেন। আমাদের বৈকুণ্ঠবাবুও তাদের মধ্যে ছিলেন।

পাগল গুটিগুটি ভাবে উপুড় হয়ে মরে পড়েছিল, হাত দুইখানা তার বুকের নীচে একটা পুটলী আঁকড়ে ধরে ছিল। বুদ্ধদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন “ওর বুকের তলায় গুটি কিহে?” একটা ছোকরা পাগলের বুকের তলা থেকে সেটা টেনে বার করতে যাচ্ছিল; বৈকুণ্ঠবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন “তুমি বড় Rash Boy দেখছি। তুমি বিনোদ সরকারের ছেলে না? আচ্ছা দাঁড়াও তোমার বাপকে বলে দিচ্ছি।” ততক্ষণ হাড়ি, ডোম, মুন্সফরান সব জাতের লোকই সেখানে জমে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পাগলের বুকের তলা থেকে সেই উঁচুপানা জিনিষটা টেনে বার করলে। সন্ধ্যাই দেখলে এটা পাগলের সেই পুটলী, তখন মহা বাগ্ৰভাবে সকলই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন “আচ্ছা খোল ত, ঐ পুটলীটা খোল ত, ওর মধ্যে পাগলের কি ছিল দেখতেই হবে।” পুটলী খোলা হ’ল। বার হ’ল একছোড়া ছোট্ট চিড়ুতো, একখানি ছোট্ট কালাপাড ধুতি, একটা ছোট্ট কোট, একখানি জীর্ণ বর্ণপরিচয়, একখানি ভান্সা প্লেট, কঞ্চির জাঁপে লাগান একটা প্লেট পোশাক, একটা লাটিন, একটুখানি দড়ি, আর দাঁত দিয়ে কামড়ান ছোট্ট একখানি সোনার পদক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌপাধ্যায়।

## ইরিতকী।

—:~:—

শুক ও কসায় তুমি ভক্তিহীন জ্ঞান  
রসহীন তুমি যেন রূপহীন ধ্যান,  
দেবকাজে পিতৃকাজে নিত্য ব্যবহার  
ঔষধে পাঁচনে কর কত উপকার।  
আছে তব বহু গুণ সব তুমি পার  
প্রাণ রসনায় শুধু তৃপ্তি দিতে নার।  
বৃন্ত ক্ষেপে, যুদ্ধ বায়ে যাও তুমি ঝরি’  
পাকিবার, বহু আগে রও ভূমে পড়ি।

কিন্তু শুনি মহাফল এও সত্যকথা  
ভক্তি রসে পক্ক হলে দাও অমরতা ।  
তপোবনে থাক তুমি যোগী ঋষি দলে  
দেবভোগ্য হও তাঁহাদেরি ভাগ্য ফলে ।

শ্রীকৃষ্ণদরশন মঞ্চিক ।

## আমাদের হিন্দুর নারীপূজা ।

—:~:—

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহীণীদের, পূর্ববর্ণিত রোক্তনামচা, কুটীরবাসী লক্ষ্মীহীনের লক্ষ্মীদের পক্ষে, সম্পন্ন গৃহস্থের নয় । তাঁহাদের জানাইয়া রাখা ভাল, মহাভারতে দেখিতে পাইবেন,—যখন শ্রীকৃষ্ণমহাশয় সপত্নী-বিচ্ছেদবিশী সত্যভামা দেবী পঞ্চস্বামী-সাহাগিনী দ্রোণদী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে স্বামী বশ করিবার ঔষধ চাহিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মরাজেন্দ্রাবতী তাঁহার নিত্যকর্ণের ঠিক এইরূপ—বরং কিছু বেশী—পরিচয় দিয়া সপর্কে কহিয়াছিলেন—  
“তবে সত্যভামে, আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি ।”

( মহা । বনপর্ব । দ্রোণদী-সত্যভামা সন্ধা । )

হিন্দু কবি হিন্দুর মনের কথাই ছন্দোবদ্ধে বাহির করিয়াছেন,—

“আদর্শ জননী

সুভগিনী গৃহলক্ষ্মী তবু তুমি সতি !

নারায়ণ চরেছে সখি, দেবত্রে বিলীন—

অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন !” অহা !

এখানে বিশেষ অবধান—যোগ্য এইটুকু,—এই নিত্যকর্ণ-তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায়, নারীজাতির বাবু সাজিয়া উল বুনিয়া, নাটক-নভেল ডিটেক্টিভ উপন্যাস পড়িয়া দিনাতিবাহন শাস্ত্রাহুমোদিত নহে । অপিচ, আজ পণ্ড-বাগান, কাল বাড়ঘর, পরপু স্বদেশী মেলা ঘুরিয়া বেড়ানও শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ । আর, থিয়েটার, বায়োফোন, পর্দাপাটি, জেনানাপার্ক—সে সব বিষয়ের আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

অনেক বিচক্ষণ লোকের ধারণা,—হিন্দুদিগের জেনানা প্রথা—কঠোর অবরোধ—মুসলমান রাজাদিগের আমল হইতে, অত্যাচার ভয়ে উদ্ভূত হইয়াছে ; মতটা কি ঠিক ?

হিন্দুশাস্ত্রেও রহিয়াছে,—

“তন্মারারী পটেরব্রহ্মদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃত্যঃ । অশ্রুদ্যুত্যা বা রামা শুভাভ্যাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥

সঙ্কল্পাগামিনী ধাতু স্বতরা পুত্রী সমা । অন্তর্দৃষ্টা সদা সৈব নিশ্চিতং পরগামিনী ॥

( ব্রহ্মবৈবর্ত পর্বণ । )

বাহারা পণ্ডিত তাঁহারা বহু বস্ত্রে স্নানাদিগকে সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালে রাখেন। অসুগাম্যতা রক্ষণগণ শুদ্ধ ও পতিব্রতা হন। যে সমস্ত স্নানলোক স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে গমন করে, তাহারা শূকরী ভুল্যা। তাহারা মনে মনে কুভাব পোষণ করতঃ পরে পরপুরুষে অভিগত হয়। •

হিন্দুস্তানের প্রতি আসল ব্যবহারের বিধান কিন্তু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়, স্মৃতিকার ঋষি শঙ্খ ও লিখিত। শঙ্খঋষি উপদেশ দিয়াছেন,—

লালনীয়া সদা ভার্গ্যা ভাডনীয়া তপৈব চ।

লালিতা তাক্তিতা চৈব স্ত্রী স্ত্রী ভবতি নাত্তথা ॥”

ভার্গ্যাকে লালন ও ভাডন দুইট করিতে হয়। যে স্ত্রী লালিত হয়, তাক্তিতাও হয়, ( অর্থাৎ আদরসোহাগ পায়, চড়টা চাপড়টাও লাভ করে ? ) সেই লক্ষ্মীহরাদিনী হইতে পারে, অস্তথা নহে।

চানকা-ঠাকুর তবু ছেলেপুণ্ডের লালন-ভাডন করিবার ‘প্রাপ্তে কু ষোড়শ বর্ষে’ লিখিয়া একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই স্মার্ত ঠাকুরের আভ্যাস বোধ হয়, ভার্গ্যাকে সকল বয়সেই ভাডনা করা ( ঐশ্বান ! ) বাইতে পারে।

ঋষি লিখিত উপদেশ দিয়াছেন,—

“গ্রাকামো বর্ধমানঃ তু মেহার তু নিবারিতা।

অবশ্য সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিক্রপাক্ততা ॥”

স্ত্রী যদি যথেষ্ট ব্যবহার করে, এবং রেহ বশতঃ যদি কেহ তাহাকে নিবারণ না করে, তবে পশ্চাতে আর তাহাকে বশ করা যায় না; যেমন ব্যাধি উপেক্ষিত হইলে চিকিৎসকৃত্ত হইয়া পড়ে।

ইহার উপর আর কলম-বাঁজি চলে না। অতএব সাবাস্ত হইল,—ঋষিগণের পরামর্শ,—স্ত্রীকে স্ত্রীজাতিতে কখনও স্বাধীনভাবে অর্থাৎ আপকৃতি অহুযায়ী কিছু করিতে দিও না। এবং অবশ্যক বুঝিলে মধ্যে মধ্যে বকুন বকুন দিতে লিখা গাল-গাণ্ড কারতে তথা কল বুঝি না শুভক চড়টা চাপড়টা দিতে ইতস্ততঃ করিও না।

শুধু চড় চাপড় কেন? অপর স্মৃতিকারগণের কথা দূরে থাক স্বয়ং ভগবান মনু—

স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে তাহার মস্তক তন্ন পৃষ্টদেণ প্রভাত স্থানে শাসনার্থ ( রজ্জু বা বেহুদল নির্মিত ) বেত্রাঘাত করিবারও বিধি দিয়াছেন।

স্থল বিশেষে, বৃক্ষ তটা বেত্র অপেক্ষা চন্দ্রাতি ক্রান্ত রজ্জু ( চাপুক ) দ্বারা দণ্ড দিবার বিধিও পাশ করিয়াছেন।

( ৮২৯৯ ও ৯২৩০ )

লাজ্জাকার—স্মৃতি পুরাণ রচয়িতাগণ সকলকেই পুরুষ, পুরুষভাষিত হাতে পাইরা, নারীর মহাদা কেমন রাখিবার জন্য তাহাই আনন্দ দেখাইতেছি।

হিন্দু জাতির আচার ব্যবহারে স্ত্রী পুরুষ বৈষম্যের স্পষ্ট প্রমাণ একটি দেখিতেছিলাম, এখানে শুধাইলে মন্দ হয় না,—

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বয়স লক্ষ্যে বাহারা শুক ভূবৈবন, তাহাদের কাছে পরিত হইতে হইবে, কারণ বৈদিক যুগে কিবা দূর প্রাচীন কালে এত আঁট-আঁটি ছিল না।

স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ সহস্রবার বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-লগনা স্বামীহীন হইলেও পুনর্বিবাহে অধিকার নাই। পুত্র—পুরুষ সন্তান পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী কিন্তু ছুঃখিনী কন্যার—স্ত্রী সন্তানের পিতৃ ধনে কিছু মাত্র অধিকার নাই। পুত্র কন্যার অবর্তমানে মৃত্যু স্ত্রীর স্ত্রীধনে নির্বৃদ্ধ স্বয়ং কিন্তু অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামীর ধনে স্ত্রীর জীবনস্বয়ং মাত্র। এরূপ স্থলে স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া স্বামী বাহা ইচ্ছা করিতে পারেন কিন্তু মৃত পতির সম্পত্তির দান বিক্রয়ে স্ত্রীর কোনও অধিকার নাই। নিজের প্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সে সম্পত্তি ব্যয় করিতে অনধিকারিণী। শাস্ত্রে আছে,—

“স্ত্রীণাং স্বপতিদারস্ত উপভোগ ফলঃ স্তুতঃ।

নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুৰ্য্যুঃ পতি-দারাত্ কথঞ্চন ॥” (দায় ভাগ)।

স্ত্রীলোক শিল্প (কর্মাদিঘারা) নিজে উপার্জন করিলেও সে ধন স্বামীর হইবে। পিতা মাতা বা স্বামীর ধনে তাহার নিবৃদ্ধ স্বয়ং নাই—কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র; সে ভোগবিলাসিতার বা আশুস্ব-সাচ্ছন্দ্যের জন্ত নহে; সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক-কার্য ও অত্যাশ্রয় সংকার্যে নিয়োগ জন্ত।

স্ত্রী বিধবা হইলে—যদি তিনি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরেরও ভাৰ্যা হন, তথাপি এক বেলা বৈ ভোজন করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রে আছে—

“একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।” (প্রচেষ্টা)

ইচ্ছা হইলেও তিনি একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে পাইবেন না। শাস্ত্রে আছে—

উপভোগোহপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদিন।” (স্তুতি)।

যে পর্যাঙ্কে তিনি স্বামীর সঙ্গিত শয়ন করিতেন, সে পর্যাঙ্কে বৈধবাদশায় শয়ন করিলে স্বামীকে পাতিত করিবেন; অতএব তু শয়্যাই বিধি। শাস্ত্রে আছে—

“পর্যাঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।

তস্মাৎ তু শয়নং কার্য্যং.....।” (প্রচেষ্টা)।

যে গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে তিনি আশৈশব অভ্যস্তা, তাহা বিধবা নারী স্পর্শও করিতে পারেন না। শাস্ত্রে আছে—

“গন্ধ দ্রব্যান্ত সন্তোগে নৈব কার্য্যন্তরা পুনঃ।” (স্কন্দ পুরাণ)

স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহাকে দর্পণে মুখ দেখিতে নাই; পর পুরুষের মুখ দর্শন করিতে নাই; নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ করিতে নাই। শাস্ত্রে আছে,—

“ন হি পশ্চতি দর্পণং।

মুখং পরপুরুষাঙ্ক যাত্রা নৃত্য মহোৎসবং।

নর্তকং গায়নঞ্চৈব স্তবেশং পুরুষং শুভং ॥” (ব্রহ্ম বৈবর্ত)।

যে শিরশোভা কেশদাম স্ত্রীলোকের প্রকৃতিদত্ত ভূষণ, সেই চুলগুলি পর্যন্ত বিধবার রাখিতে নাই। শাস্ত্রে আছে—

“বিধবা-কবরী বন্ধো ভর্তৃবন্ধার জারতে।

শিরসো বপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা ॥” (কাশী খণ্ড)

বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ, এই অন্য বিধবা সর্বদা মস্তক মুগুন করিয়া রাখিবে।

অধিক কি একটি সামান্য পান থাইতে ইচ্ছা হইলে তাঁহার খাইবার অধিকার নাই ; বিধবার নিকট পান গোমাংস। শাস্ত্রে আছে,—

“তাম্বুলং বিধবা স্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাম্।

তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রৈশ্চ গোমাংস সদৃশং ধ্রুবম্॥” ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ,—

যবানৈর্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পুষ্যাত্রৈঃ।

প্রাণযাত্রাং প্রকুব্বীত যাবৎ প্রাণ স্বচ্ছ ব্রজেৎ।”\* কানীখণ্ড।

প্রাণ যে পর্যন্ত আপনি না যায়, তাবৎকাল যবান, ফল ভোজন, শাকাহার কিবা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবেন।

এমনই হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য। সঙ্কমরণ, অমুমরণ বন্ধ হওয়ায় এমনই করিয়া বিধবাকে জীবন কাটাইতে হয় ! তুষের শাশুন !

মনে হয়, অনেকে বলিবেন,—এ সকল বিধান বিলাস বর্জন ইন্দ্রিয়-সংযমের পৈঠা। তাহা হইতে পারে ; কিন্তু রক্তমাংসের শরীর, বিধবা হইলেই বালিকা কিশোরী যুবতী যুগ্ম সকলেরই কি কায়-মন কাঠ-পাষণ হইয়া যায় ?

কেহ কেহ হৃদয় বলিবেন,—‘কর এমনই বা শাস্ত্রের এত কড়া কড়ি মানিয়া চলে?’ সে কথা হয়ত সত্য, কিন্তু আমরা শাস্ত্রের আদেশ বিধান শুনাইয়া যাইতেছি মাত্র। কে কি করে, না করে, জানি না। তবে, ইহা ত স্বীকার করিতেই হয়,—যাঁহারা না মানিয়া চলেন, তাঁহারা শাস্ত্রকে অমান্য করেন, স্তত্রাং তজ্জনা প্রত্যাব্যগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

স্ত্রী বিধবা হইলে ত এইরূপ ব্যবস্থা ; এদিকে যুগপত্নীক স্বামীর পক্ষে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, যত চিচ্ছা যাহা ইচ্ছা থাইতে পারেন ; যেমন ইচ্ছা পরিতে পারেন ; যেরূপ ইচ্ছা বিহার করিতে পারেন, বিলাসের সমস্তই উপভোগ করিতে পারেন ; কিছুতেই শাস্ত্রের বাধা নাই, কোন আপত্তির উল্লেখ নাই।—শাস্ত্রকার সবাই ত পুরুষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে,—

“বিধবাকে কেশসংস্কার করিতে নাই, গাত্রসংস্কার করিতে নাই ; কোনরূপ যান আরোহণ করিলে বিধবাকে নরক গমন করিতে হয়।”

স্কন্দ পুরাণে রহিয়াছে,—

“বিধবাগণ ভূমি-শয্যা আশ্রয় করিবে, অসময়ে আহার করিবে, পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলে তাহাদিগের নরক দর্শন ঘটিবে।”

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে উজ্জল অন্ধরে খোদিত রহিয়াছে,—

\* “কামন্ত কপয়েদেহং পুষ্প মূল ফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহীত্বাং পত্যৌ প্রোতে পরস্য তু ॥” ৫। ১৫৭  
পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প মূল ফলের দ্বারা চীনের কর করিবেন, কিন্তু কখনও পর পুরুষের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিবেন না।—ইহা ভগবান মন্মথ উপদেশ বা আদেশ।

“জীবনহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামীহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দর্শন করিলে কখনও কার্যাসিদ্ধ হয় না জননী ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্বাদ আশীর্বিষের ন্যায় পরিত্যজ্য।”

( কাশীখণ্ড । ৪ অধ্যায় ।

আপনারা কি বলিবেন না সার্থক ‘দেবী’ সংজ্ঞা, সম্মানের পদবী !

বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রবীণ হিন্দু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—

“হিন্দু-বিধবার চির-বৈধবা প্রথা হিন্দু সমাজের দেবী-মন্দির।” \*

হিন্দুর ঘরের জনৈক পুরমহিলা এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গুঢ় তত্ত্ব বড় পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছেন,—

“.....চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিয়া থাকেন, ‘আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে?’ অথচ দেবীটিকে বিবাহের চান্দা তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না, পাছে দেবীর মুখ দেখিলে, আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে! মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না,—দেবীর ডাক পড়ে শ্রাহের পিণ্ড রাঁধিতে!.....

হিন্দুর ঘরে বিধবা ভগিনীটির দান চড়িয়া যায় তখন, যখন স্ত্রী আসন্ন প্রসবা, যখন রাঁধা বাড়ার লোকের অভাব, যখন কচি ছেলেটিকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া ছুটি খাওয়াইতে হয়।”

এমনই করিয়া আমরা করি নারীর পূজা! জগৎ-সমক্ষে বুক ফুলাইয়া জাঁক করিয়া বেড়াই—স্ত্রীজাতি আমাদের কাছে দেবতা। কেহ তর্ক করিতে আসিলে, আমরা কোন্ কাগজে, কোন্ কেতাবে, অপর দেশের অপর জাতির কে কোথায় কবে স্ত্রীলোকের প্রতি হর্ষাবহার করিয়াছে, তাহা আওড়াইয়া আপনাদের গলন্দ ঢাকিবার চেষ্টা করি।

আবার শাস্ত্রপুরাণ ষাঁড়াদের বেশী পড়া আছে, তাঁহারা হয় ত পুরাণ হইতে শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়া বলিবেন, এমন কথাও আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

“যেখানে যেখানে ( সাদ্ধী ) স্ত্রীলোকের পাদম্পর্শ হয়, সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।”

( স্কন্দ পুরাণ । কাশী খণ্ড । )

আমরা না বলিয়া থাকিতে পারি না—বাকাই সার! ধনা হিন্দুশাস্ত্র! ধনা ধর্মশাস্ত্রকারগণ!

স্বদেশ-বৎসল, স্বধর্ম প্রেমিক ভারতের সুসন্তান কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—“সুসভা ইয়োরোপে বা আমেরিকায় স্ত্রী জাতির আদর আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহাদের কেবলমাত্র আদর ছিল না অধিকন্তু সেই আদরের সহিত ভক্তি ও পূজা মিশ্রিত হইত। ধর্মপ্রাণ আর্থাগণ স্ত্রীজাতিতে দেবতার অংশ—মহাশক্তির অংশ দেখিতে পাইতেন।” †

কেমন দেখিতেন, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এই আদর ভক্তি-পূজার শ্রোত এমন ভাবে গড়াইয়াছিল যে জীৱন্ত নারীকে জনস্ত অগ্নির মুখে সমর্পণ করিবার গোঁজামিল ব্যবস্থা চালাইয়া তবে তৃপ্তি লাভ করা হইয়াছিল।

\* স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Kt. D. L.—“জান ও কর্ম।”

† বাবু সায়দাচরণ মিত্র—“শক্তিভারত মহিলা।” ( ভূমিকা )



নারী-পূজার বেগ সামলানো শক্ত বুঝিয়াই না এই ভারতে স্থানে স্থানে শিশু-কন্যা হত্যার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল—শ্রুতি-স্মৃতির আদেশ বিধান শিকায় তুলিয়া রাখিয়া ?

উপসংহার কালে আমরা শ্রীমতী অনিলা দেবীর অমূল্য প্রবন্ধ “নারীর মূল্য” হইতে আর একটু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না,—

“ইংরেজ যখন আমাদের কাছে বলে,—‘তোমরা নারীর মূল্য জান না, মর্যাদা বোধ না; তোমরা তাহাদিগকে আমাদের আফ্লাদে যোগ দিতে না দিয়া, ঘরের কোণে নির্বাসিতা করিয়া রাখ, তোমরা বর্বর।’ আমরা তখনই মনু-পরামর্শ হইতে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলি—‘না, আমরা মা বোনের মুখে রং মাখাইয়া, স্যান্সন ক্লারেট পান করাইয়া উত্তেজিত করিয়া, সভা সমিতিতে নজরানী লইয়া ফিরি না; আমরা তাহাদের ঘরের কোণে পূজা করি।’ এই প্রকার কথার যুদ্ধে তখনকার মত একরকম জিত বটে, কিন্তু পূজাটা কি ভাবে হয়, তাহা আলোচনা করিলে, অনেক কথা বাহির হইয়া পড়ে।”

ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের চরণে নমস্কার পূর্বক সেই আলোচনাই আমরা সংসামান্য করিয়াছি।

হিন্দুজাতির আচার অনুষ্ঠান কেবলমাত্র শাস্ত্রশাসিত নহে; লোকাচারের প্রভাব ইহার উপর বিলক্ষণ। পুরুষ-জাতির কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের যথা আদেশ, অবলা জ্ঞানহীন জ্ঞানীজাতির সম্বন্ধে তাহা দশ গুণ অধিক কুচলসাধ্য। লোকাচার আবার তাহাকে শত গুণ কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। আত্মস্বার্থার্থপর পুরুষ আমরা, সৌন্দর্য্যে ক্রম্পিত করিতে চাহি না; সৈনিক দৃষ্টি ফিরাইতে আমাদের অবসর বা প্রবৃত্তি নাই। সে বিষয়ে আলোচনা করা অনেক নিরাপদ মনে করেন না; কারণ, এসম্বন্ধে তাহাতে জ্ঞানীজাতি চকু ফুটিয়া যাইতে পারে; ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। যে নির্ঘাতিত সে চির নির্ঘাতিতই থাকুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এমন না হইলে আর পূজা! এমনই পূজা না হইলে যে সমাজ গলট্ পালট্ হইয়া যায়; সংসার ছারখার হয়! ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। বুদ্ধিমানের যুক্তি সন্দেহ নাই।

যাহা হউক এই সম্বন্ধে জনৈক্য অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী নিষ্ঠাচারী জগদ্বান হিন্দুর মর্ম্মস্পর্শী করুণোক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লই :—

“হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাসদ বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্তব্য ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে চতুর্ভাগ্য অবলাগণের কল্যাণগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।” †

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

## বসন্ত ।

—:~:—

( চীনা কবি ছু কুঙ হইতে )

নিখিল ভরিল ঋতুরাজের রূপে ।

কমল কুমুদ মালা যেন রূপবতী বালা

ফুটিল তড়াগ দীঘি অন্ধ কূপে ।

ঘনাইল পীচবন পাতার ছায়ে

কুঞ্জ অসিয়া উঠে মলয় বায়ে

গাহিল অযুত পাখী কনক কিরণ মাখি

উইলো ফুটিল নদী পুলিনে চুপে ।

চির পুরাতন তবু নিতুই নব

ভাবের হৃদয়ে পুন সমুত্তব ।

সুন্দর পানে গিয়া ছুটে আজি উছসিয়া

পূজা তার নিশিদিন কুসুম ধূপে ।

নিখিল ভরিল ঋতুরাজের রূপে ॥

শ্রীকালিদাস রায় ।

## ভট্টাচার্য্যের পত্র ।

( মারফৎ শ্রীনরেশচন্দ্র দেব । )

পরম গুভাশীষ পুরঃসর বিজ্ঞাপনবিদঃ—

মহাপ্রিয় বে বিরাট দরখাস্তখানিতে সহি দিবার জন্য আমাকে নিকরক অহরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন 'তাহা অত্যন্ত বখাবিহিত স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন । দিল্লীর লাট দরবারে এত বড় প্রকাণ্ড একখানা খারসাধ্য অসংখ্য দস্তখত সমেত দরখাস্ত পেশ করিবার যে কি বিশেষ আবশ্যকতা আপনারা বিবেচনা করিলেন, আমি তাহা সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলাম না,—বরং আমার ত মনে হয় ইহাতে একটা সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে এই যে উক্ত দরখাস্তখানিতে আপনারদের মত যে সকল নামজাদা দস্তখতকারী আছেন বিপক্ষ পক্ষের যদি

কোন ভাল কৌতুহলী উত্তমরূপে তাঁহাদের জেরা করিতে সুরু করেন তাহা হইলে আপনাদের চিত্তমানী এখনও কতটা ঝাঁট বজায় আছে তাহা পড়িয়া যাইতে পারে সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় ও কর্তব্য ছিল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ‘অসবর্ণ বিবাহ’ আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে শুনিয়া আপনাদের মত গণ্যমাত্র দেশের লোকেদের এতটা ভীষণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। কেবলমাত্র যদি আপনারা শিহরিয়াই কান্ড হইতেন তবে আর কোন কথাই ছিল না। কিন্তু আপনাদের শিহরণের সঙ্গেসঙ্গে ধর্মনাশভয়ে ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিত হইয়াছে, এবং আপনারা সদলে সহরে বাহির হইয়া দেশের আর সকলকেও ভয় দেখাইয়া ভীত সন্ত্রস্ত করিবার জন্ত! দ্বার ভাঙ্গিয়া আপনাদের দল অপরের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তারস্থের চীৎকার করিয়া বলিতেছে:—“ধর্ম যার! কর্ম যার! মান যার! মর্যাদা যার বিষয় সম্পত্তি রসাতলে যায়! বংশ ভেঙ্গে যায়! হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত প্রায়! পবিত্র বর্ণাশ্রম, অশুচি হবার উপক্রম! মহাসংহিতা সংহার হল! শ্মৃতিশাস্ত্রের শ্রাব্দ হল! বামুন কায়েত কামার—কৈবর্ত শূদ্র চামার—হল একাকার! একান্তবর্তী পরিবার গেল ছারখোর! সর্কনাশ হল! সর্কনাশ হল!” “যদি ‘যদি ভাল চাও, আপন মঙ্গল চাও, পুত্র কন্যার কল্যাণ চাও—আর যদি ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা থাকে, নরকের ভয় থাকে, ধর্মের মতি থাকে—ঈশ্বরের ভক্তি থাকে—তবে এস দলে দলে এই দরখাস্তখানায় দস্তখত করে দাও, নতুবা সব যায়, আর রক্ষা নাই!”—বাস্—

হৃৎগে যোগ দিবার লোকের অভাব এদেশে পূর্বেও কখন ঘটে নাই এবারও ঘটিল না! দেখিতে দেখিতে ছোট বড় অনেকেই ভাল কি মন্দ বিচার না করিয়াই আস্ত হিন্দুধর্ম বিলোপের আশঙ্কায় সশঙ্কিত আপনাদের ঐ দলটিতে সত্তর যোগ দিতে সুরু করিয়া দিল—যেমন সর্বত্র হইয়া থাকে! কেহই একবার অভিনিবেশপূর্বক চিন্তা করিয়া তর্ক করিয়া,—অমুকুল ও প্রতিকূল অবস্থায় সম্যক বিচার করিয়া, সত্যাসত্য প্রাধান্য করিয়া দেখিল না যে তাহাদের আশঙ্কা অমূলক কিনা?—এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে সত্যি হিন্দুর সর্কনাশ হইবে কিনা? অথবা প্রকৃত পক্ষে উহা দেশের ভাবী অকল্যাণের কারণ হইবে কিনা?—কেবল মাত্র জনতার মুখে বাধস নামে প্রসিদ্ধ কোন পক্ষা বিশেষকর্তৃক নিজ, নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় অপহরণের ভ্রু:সংবাদ পাইয়া সকলেই উর্দ্ধ্বাশ্রমে সেই অদৃষ্ট বারসের পশ্চাদ্ধাবন করিল! ইহা বস্তুতই একান্ত পরিতাপের বিষয়!—আপনি হয় ত বলিবেন “সে ভাবনার আমাদের দরকার কি উটচাম্! ওরা ভাল মন্দ বুঝুক আর না বুঝুক দরখাস্তখানা সই করে চেড়ে দিচ্ছে যখন—বাস্!—আমাদের কাজ ফতে!”—বিস্ত আমার মনে হয়—ঐটে যেন আরও বেশি পরিতাপের বিষয়!—দস্তখত যে শুধু কেবল মাত্র ধড়া-চুড়া বাধা নিকরীয়া রাজা রাজদার ও তাদের অমুগত, অমুগ্রহপ্রাপ্তী বেতনভূক্ত কি বাধিক বৃত্তি প্রাপ্ত প্রজা, কর্মচারী, গুরোহিত, কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হইয়াছে তাহা নহে—পরন্তু বহু শিক্ষিত বিদ্যান বুদ্ধিমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সম্রাটের প্রদত্ত উপাধীপারী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণেরও হইয়াছে!

জনসাধারণের এতদিন ধারণা ছিল যে ঐ সকল ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আছে এবং কালের গতির সহিত সমপাদক্ষেপে চলিয়া উঠিয়া নিশ্চয়ই ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলের স্থচনা করিতে পারিবেন কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে দেশের লোকের উক্ত ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন! উপাধিপ্রাপ্ত বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অধিকাংশ শিশুত্ব হইলেও তাঁহাদের অনেকেরই সংসাহসের মেকনও নাই! রাজা মহারাজার অমুগোদে, উপগোদে, খাতিরে, বা বহুয়ের প্রলোভনে যে দেশের নেতৃ স্থানীয় জনমাত্র ব্যক্তিগণ অল্পান বদনে আপনাদের স্বাধীন চিন্তা স্বতন্ত্র মত বা প্রকৃত সংবুদ্ভিটুকু এত সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন সে দেশের ভবিষ্যত কে এমনই

বহুকাল-তিমির গর্ভেই বিলীন থাকিবে তাহাতে আর বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই ! সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল যুবকবৃন্দ যাহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্ব ছাত্র বলিয়া মোহরাক্তিত তাহাদেরও অনেকে নাকি এই রাজস্বকুবাহী অতিকায় দরখা খানায় দস্তখত করিবার হৃদ্যন্ত প্রেলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যদিও একরূপভাবে কোতুলকের বশবস্তী হইয়া নিবিচারে যাহা তাহাতে নাম স্বাক্ষর করাটা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বটে তবে যেহেতু যুবক সম্প্রদায়টা—সকল দেশে চিরদিন হঠকারিতার জ্ঞাত প্রসিদ্ধ সূত্রাং এই সহি দেওয়ার জ্ঞাত তাহাদের বিশেষ অপরাধ করিতে পারা যায় না। আরও আমার বিশ্বাস যে ঐ ‘অসবর্ণ বিবাহ’ বিধির বিরুদ্ধে লিখিত আপনাদের বিরাট আবেদনে দস্তখতকারী অনেক অবিবাহিত যুবকই মনোমত সুপাত্রী পাইলে অচিরে স্ববর্ণের বাহিরে বিবাহ করিতে বোধ হয় তৎপারিত হইতস্ততঃ করিবে না ! এবং উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলে আমিও স্বয়ং শাস্ত্রাভ্যাসী বিধি-ব্যবস্থা বাহির করিয়া তাহাদের পরিণয় কার্য সম্পাদন করিতে এক মুহূর্তও অবহেলা করিব না।

এখন আপনি হয় ত আমাকে বলিতে পারেন যে ‘আচ্ছা, মহাশয় যখন স্বয়ং এই আইনটার এত পক্ষপাতি,—তখন কি হিসাবে তদ্বিরুদ্ধ আবেদনে স্বাক্ষর দিলেন—ইহার উত্তরে আমি সর্বদা জানাইতে চাই যে আমার উপস্থিত বড়ই টানাটানি চলিতেছে সূত্রাং নগদ কিছু প্রাপ্তি আমি সংক্ষেপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। একে আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ—গুণকর্মবিভাগশঃ না হই, অন্ততঃ জন্মাধিকার উত্তরাধিকার ও সূত্রাধিকার সূত্রে ত’ বটেই ! তারপর যজ্ঞমান সাধনই হচ্ছে আমাদের উপস্থিত একমাত্র শাস্ত্রসম্মত উপভোগ্যিকা, কাজেই মধ্যে-মধ্যে আমাদের এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণই দিতে হয়, নচেৎ যজ্ঞমান চটিবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। আমি ইতি মধ্যেই মনু, যজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি ঘাঁটিয়া অসবর্ণ বিবাহের অমূল ও প্রতিকূল অনেকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি ; কি জানি কখন কাহার বিরূপ ব্যবস্থা লইবার প্রয়োজন হইবে তখন উহা কাজে লাগিতে পারে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা যাক যে অসবর্ণ বিবাহ-বিধি আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইলে ভারতের মহামহিমাম্বিত হিন্দু ধর্মের সত্যসত্যই কঠোর একেবারে অপঘাত মৃত্যু হইবে কি না ? আমার মনে হয় এ ত্রিকালের বিচিত্রবর্ণ মহাস্বপ্নের এত সংক্ষেপে কখনই দেহভ্যাগ করবে না ! সে ব্যবস্তু মৃত্যুজয় ! কারণ ইতিহাস পথ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্রস্থ ব্রাহ্মজী একবার ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহার কঠলয় বিষটুকু অমৃতে পারণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু “এক ধর্মরাজ্য পাশে থাও ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বৈধে দিব আমি !” তাহার এ শুভ ইচ্ছা সার্থক হয় নাই, তার পর আসিলেন গুরু নানক, গুরুগোবিন্দসিংহ কিন্তু তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারিলেন না—তার পর মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পালা কিন্তু তাঁহারও সমস্ত পরিশ্রম তনীয় পূর্ববস্তীগণের দ্বারা তাঁহার জীবদ্দশার সঙ্গেসঙ্গে শেষ হইয়া গেল ; অনাদি বুদ্ধের নবযৌবন বারবার ফিরিতে ফিরিতেও আর ফিরিয়া আসিল না ! শাস্ত জরা তার লোচন ও ওজ্র কেশ লইয়া অমর হইয়া রহিল। সূত্রাং বৃথা আপনাদের হিন্দুধর্ম লোপের আশঙ্কা ! এমন কি এই হালের কতকগুলি ছুটনার আলোচনা করিলেও আপনারা আমার এ কথা প্রমাণ পাইতে পারেন।

প্রথম ধরুন সতীদাহ। নির্দোষী নিরপরাধনী ছুঃখিনীদের বাঁচাইবার জন্য ; অকারণ নিষ্ঠুর নারীহত্যার মহাগাতক হইতে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য, যখন ঐ পৈশাচিক প্রথা রহিত হইয়া গেল তখনও আপনারা

ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং তখনও আপনাদের মুখের বুলি ছিল ঐ এক কথা “গেল! হিন্দুধর্ম এইবার রসাতলে গেল!” কিন্তু দেখা যাইতেছে যে ‘সত্যদাহ’ রহিত করিয়াও হিন্দুধর্ম—সম্পূর্ণ ও টুট ও নীড়েট অবস্থায়ই আছে তাহার কোনও অংশই এখন রসাতল পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই!

তারপর যখন অভাগিনী বালবিধবাদের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল হইতে দেখিয়া, তাহাদের মহিমান্বয় নারীকন্ঠটা একেবারে বার্থ হইতে দেখিয়া গৃহে গৃহে গুপ্ত কলঙ্কের ক্লম্ব কালিমা নিবিড়রূপে হইতে দেখিয়া “বিধবা-বিবাহ” বিধির ব্যবস্থা হইল তখনও যে বিপুল আন্দোলন তাহার বিরুদ্ধে আপনারা খাড়া করিয়াছিলেন তাহারও মুখের বুলি ছিল ঐ সেই পুরাতন ক্রন্দন “গেল হিন্দুধর্ম গেল!”— অধিকন্তু ছিল এক বাঁতস আশঙ্কা—“বুঝি এইবার মা, খুড়ীমা ও জ্যাএইমাদের দ্বিতীয় পতি পারগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে হয়!” কিন্তু সে ভয়ও এতদিনে অমূলক সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে!

তারপর আবার যখন বাল্যবিবাহের বিষময় ফল নিবারণের জন্য হিন্দুর ভাবী বংশধর গণের, দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভান সমূহের ভাবী জননীগণের অপরিণত দেহ পরিপুষ্ট হইতে দিবার জন্য তাঁহাদের শারিরীক স্বাস্থ্য ও অঙ্গসৌষ্টব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সদ্যবিবাহিতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা বধুগুলিকে আশঙ্কিত অববেচক পুরুষের পশুপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত আলিঙ্গন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের আশীর্বাদ মত “সম্মত আইন” বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তখনও আপনাদের ঐ একই পেশাদারী সুর অনেক জায়গায় শোনা গিয়াছিল “ধর্ম যায় ইজ্ঞাৎ যায় আব্রু যায়!—সনাতন হিন্দুধর্মের চিরন্তন্যস্তঃপুরে অপরিচিত বিদেশী শাসনকর্তার একি অনধিকার প্রবেশ—?”

তারপর এই আবার যখন কত অসংখ্য প্রবাসী প্রণয় মুগ্ধ অসবর্ণ নবদম্পতীর সুখ-সৌভাগ্য-সিদ্ধ প্রকৃত মিলনটিকে, বিকৃত সমাজের অকথ্য মালিন অত্যাচারে ম্লান হইতে না দিবার জন্য উহার পীড়নে ও অভিশাপে তাহাদের জীবনব্যাপী নিরানন্দলাভ হইতে পরিভ্রাণ করিবার জন্য—এই পরিণয়পুত প্রণয়ী দম্পতীদের নির্দোষ শিশু-সন্তানগুলির পরিচ্ছন্ন কলাটপটে বাহাতে আর স্বার্থ সন্ধীর্ণ জীর্ণ সমাজে পঙ্কিল শাসনদণ্ড অথবা কলঙ্কের ছুঁত ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিতে না পারে—মিশ্র সমাজের প্রদত্ত ঐ জন্মগত লজ্জার অসহ্য ধিকারে বাহাতে তাহাদের অমূল্য জীবনের মুকুলগুলি বিকাশের সুযোগ অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া না যায়—বর্জন-নীতি-পথে নিক্সাগোন্ধূষ হিন্দুজাতি বাহাতে অবশ্যস্তাবী ধ্বংসের করাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া অসংখ্য জাতিধর্মনির্কীর্ণে দিন দিন পৃথক ও দুর্বল না হইয়া ক্রমে একতাবদ্ধ হুহু ও সবল হয়—এই আশায় স্বদেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল মনীষী মহাত্মা প্যাটেল এই অসবর্ণ বিবাহ বিধি সম্বন্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন কিন্তু আজও তিনিতেই সেই একই প্রাচীন আর্ন্তনাদের কৃত্রিম বোল!—সেই চিরাত্যস্ত কপট বিলাপ—“যার! যার! ধর্ম যায়, হিন্দু যায়! সর্বস্ব যায়! হার! কি হইবে?”

দোহাই আপনাদের চুপ করুন! আর ওই একঘেয়ে সাবেক চীৎকার ভাল লাগে না! নতুন কিছু বদ্যপি থাকে তবে ঝোড়িয়া ঝুড়িয়া বাহির করুন নচেৎ ওই মায়াকান্নায় আর আবশ্যক নাই। আমি আপনাদের অন্তর দিচ্ছি! এত শক্তি বিচলিত ও অধৈর্য্য হইবার কারণ নাই! হিন্দুর সনাতন হিন্দু এখনও বহুকাল অটুট থাকিবে। কোন অনাদিকালে হিন্দুধর্মের পরপার হইতে এই জঘন্যীপে সমাগত প্রাচীনতম আৰ্য্যজাতির—প্রাণের প্রত্যেক গুণে কুশাগ্রশুভ্র দুর্বাদল, ধান্য ও যবশীর্ণ—হরিতকী তিল তুলসী ও বিষপত্রের পবিত্র প্রভাব এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পুরোহিতের প্রভারণা প্রকাশ পাইলেও পিতৃজ্ঞানের বা ওপর্ণবিধির ভোজ্যের প্রতিবাদ

করিতে সক্ষম এমন পুণ্যসিংহের জন্মকাল এখনও সুদূরপরাহত। অষ্টাদশ পুরাণের অষ্টপাশ মুক্ত হইতে অষ্টাশীতি শতাব্দীর সাধনা আবশ্যক—সাদ্ধি এক শতাব্দীর শিক্ষার কর্ম নয়! পৃথিবীর কোন দেশের কোনও ভূগোলে বা মানচিত্রে কোথাও এ কথা লেখা না থাকিলেও তথাপি হিন্দুর ছেলে কি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারে যে ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া যুগ্মসহস্র সগর-সন্তানকে মুক্ত করিবার জন্য মকরবাহিনী জননী ভারবী ওরফে গঙ্গাদেবীকে সুরলোক হইতে মর্ত্যে আনয়ন করেন নাই? পরন্তু গঙ্গা একটা নদী বিশেষ—যাহা হিমালয়ের গোমুখী শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া বহুদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক বঙ্গোপসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে! সর্বনাশ! ইহা সত্য জানিয়া ও বুঝিয়াও যদি কেহ জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে সাহস করে তবে নিশ্চিত জানিবেন যে অচিরে এই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানে একালেও হিন্দুসমাজে সে ঘোর নাস্তিক বলিয়া অত্যাতি পাইবে! অতএব মাঠে: ?—উক না কেন অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ—হিন্দুর হিন্দুত্ব বিনাশ—আমরা জীবিত থাকিতে কোন বিধি-বিধানেরই নাগপাশ সাধন করিতে সক্ষম হইব না! বলে' রাজা রামমোহন রায়ের মত মহাপুরুষ ব্যক্তি যে কাজে হাত দিয়া রুতকার্য্য হইতে পারিলেন না—পণ্ডিত দ্বৈতচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গদেখা যাহারা বার্থ পরিয়া বসিয়া আছে—তাহাদের কাছে কিনা ঐ বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্যাটেল? সত্যযুগে যাহারা ত্রিভুবনপতি দাস্তিক বলরাজকে পথের ভিখারী করিয়াছিল ত্রেতাযুগে রাবণের দেব দ্বিজ অভক্তি দেওয়া যাহারা তাহাকে সবংশে নধন করাইয়াছিল! দ্বাপরে যখন ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দ মদগর্বে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মণ্য শক্তিকে তুচ্ছ করিতে উদাত্ত হইয়াছিল তখন এই ভারতবর্ষে নিক্ষত্রিয় কারতে যাহারা কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া ছিল আর এই কাশ্মীরে যাহারা বাক্ষণের অবমাননাকারী মগধাধিপতি নন্দ মহারাজের গুপ্ত বংশ ধ্বংস করিয়া নৌঘা বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মতেজের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল তাহারা কি আজ সামান্য একটা অসবর্ণ বিবাহবিধির ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইবে?—ধিক!

দৈবচক্রবিপাকে যদিই বা আজ ঐ অসবর্ণ বিবাহ বিল বিধিবদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলেই কি আপনারা মনে করিয়াছেন যে দেশে উক্ত প্রথা প্রচলিত হইতে থাকবে? অসম্ভব! কাশী কনৌজ ও নবদ্বীপ ভারতে বিরাজমান থাকিতে তেজঃপুত দীর্ঘচূড়া ও যজ্ঞোপবীতের বস্ত্রমানে উহা সম্পূর্ণ অচল এক জড়পদার্থে পরিণত হইবে! সেই 'বিধবা বিবাহ বিধব' অবস্থাটাই আজ কি হইয়াছে স্বরণ করিয়া দেখুন না কেন! সমস্ত দেশে বংশের মধ্যে পাঁচজন হিন্দু বধবারও বিবাহ হইয়া উঠে কিনা সন্দেহ! তারপর দেখুন ঐ 'সম্মতি আইন'। আজ পর্য্যন্ত কয়টা মামলা আদালত উঠিয়াছে? প্রতি বৎসর কত অসংখ্য বালিকা অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসবে অক্ষম হইয়া স্মৃতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। কত না বোড়শী তাহাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর অন্ত্রগ্রহে অবিচ্ছেদে উপস্থাপন করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া ও কালে উরাগ্রস্ত স্বাস্থ্যহীন রক্ত, দুর্বল, শীর্ণ, পাতুর ও মলিন হইয়া ক্রমে তাহাদের সেই হতভাগ্য জীবনের প্রভাত বেলা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে অসময়ের ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে! ঐ সকল অপরিণত শরীর নষ্টস্বাস্থ্য ক্রমশঃতার গর্ভভাগ দুর্বল নিজস্ব সন্তানেরা বৎসর বৎসর শিশু মৃত্যুর তালিকার হার বৃদ্ধি করিয়া গন্তব্যস্থানে চালায়া যাইতেছে কিন্তু কখনও কি গুনিয়াছে কোনও সনাতন হিন্দু ভ্রাতৃভাইদের বিরুদ্ধে কোনও কন্যাগণের সনাতন হিন্দু অভ্যাসকে কখনও তাহাদের কন্যাদের স্বাধীনতা প্রদানের অপরাধে বা উহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য বাণ্যজীবনদের দায়ী করিয়া কোনও পশ্চাদিকরণের সম্মুখে অভিযোগ করিয়াছে? প্রায় অনেক মনে মনে হয়ত তাহাদের অভিসম্পাত দিয়া থাকেন কিন্তু সাধ্য কি যে আইনের সাহায্য লইয়া পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজের অবমাননা করেন বা শাস্ত হিন্দুদের মর্যাদা নষ্ট করেন?—

দরখাস্তখানি যদি দিল্লীর পথে এখনও রওনা হইয়া না থাকে তবে উহা আর পাঠাইবেন না। আমি আবার বলিতেছি আপনি স্থির জানিবেন যে সৃষ্টির আদিম সভ্যতার যুগে প্রতিষ্ঠিত এই অতি প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী—তাহার সনাতন হিন্দুধর্মের চূর্ভেদ্য দুর্গ শিখরে শ্রেষ্ঠ বর্ণের পদরজ মাখিয়া রক্ষা-কবচ মাচলী ও শান্তি স্বস্তায়নের প্রভাবে এখনও বহুকাল পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া স্থতির শাসন ও পৌরাণিক পুঁথির প্রতাপ প্রচার করিতে থাকিবে। জানে ত' একবার যখন এই সনাতন পুঁথির শাসন না মানিয়া দেশে নির্বোধ লোকেরা সমুদ্র যাত্রা করিতে সুরু করিয়াছিল তখন ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কেমন শান্তি ভোগ করিত? শেষে এই তাল তলার চটীজুতার তলায় মাথা নত করিয়া প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ ভোজন ও উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থায় করা উচিত! আমি বলি যদি কেহ একান্তই অসবর্ণ বিবাহ করিয়া ফেলে তবে সে উক্ত ত্রিবিধ ক্ষুরে মস্তক মুগুন করিলেই তাহাকে জাতে তুলিয়া লওয়া হইবে এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিলে সব দিক বজায় থাকে এবং ভবিষ্যতে আর যজমান চটিবারও ভয়টা থাকিবে না—। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই সব বাজে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বৃথা আমাদের শক্তিক্ষয় না করিয়া ওই পাপ ইংরাজি শিক্ষাটার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করা যাক আসুন! ঐ ইংরাজি কুশিক্ষাই যত অনিষ্টের মূল! উহারাই আমাদের শাস্ত্র পুঁথির ও তন্ত্র মন্ত্রের সমস্ত ফাঁকী ধরাইয়া দিয়াছে! অতএব ওইটাকেই সর্বপ্রায়ে উচ্ছেদ করা হউক! ইতি—

সত্যত শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।

## স্বরলিপি ।

—\*—

বাউল সুর—তেওরা

এমন, বন্ধ কুলুপ অন্ধকারে  
ফিরবো আমি কাহার দ্বারে  
পূজার কুসুম শুঁথিয়ে যাবে  
দুয়ার তবু গুলবে না রে  
আমার এ-ঘর আমার দুয়ার  
আমার যাবার নাই অধিকার  
প্রদীপখানি জালিয়ে এনে  
ভরচে হৃদয় হাহাকারে!  
অঁচল বাধা চাবিখানি  
হারিয়ে কোথা গেল জানি  
চোখের জলে ভরচে দিশা  
এখন বল ডাকবো কারে?

গান ও সুর—শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ।

॥ { মা- পা পা' | গা -১ | গা- মা I মা- পা পা | পা- ১ | পা- ১ I ॥  
ব • ক কু • লু প্ অ • ক কা • রে •

I পা -ধা ধা | ধা -১ | ধা -না I পা পনা -১ | ধা -নধা | পা -ধা I }  
ফি র্ ব আ • মি • কা হা র দা • রে •

I 'সা' -সা' -১ | সা' -না I নরা রা' র'সা' | সা' -১ | স'রা' -সা' I  
পু জার • কু স্র ম্ শু কি যে যা • বে •

I না সা -১ | না -১ | না- সা' I ধনা -সা' না | ধা -নধা | পা- ধা II  
হু য়ার • ত • বু • থু ল্ বে না • রে • •

I { সা সা -১ | রা -১ | রা -গা I মা পা -১ | পা -১ | পা- -১ I  
আ মার • এ • ধ র্ আ মার • হু • য়ার •

I পাধা -১ | ধা -১ | ধনধা পা I পা -ধনা না | ধা -নধা | পা -১ ]}  
আমার • ধা • বা র্ না ই অ ধি • কার •

I পসা' সা' -১ | সা' -১ | সা' -না I নরা' রা' রা' | সা' -১ | স'রা' -সনা' I  
প্র দীপ • ধা • নি • জা লি যে এ • নে •

I না সা' সা' | না -১ | না -সা I ধা না -১ | ধ -নধা | পা ধা II  
ভ র্ ছে হু • দয় • হা হা • কা • রে •

I সা সা -১ | রা -১ | রা -গা I মা পা -১ | মা -পা | গা -মা I  
আ চল • বা • ধা • চা বি • থা • নি •

I পসা' সা' সা' | সা' -১ | সা' না I নরা' রা' -সা' | সা' -১ | সা' -না I  
হা রি দে কো • থা • গে ল • জা • নি •

I বসা' সা -১ | সা' -১ | সা' না I নরা' -১ রা' | সা' -১ | সা' -রা' I  
চোখে র • জ • লে • ভ র্ ছে দি • শা •

I না সা' -১ | না -১ | না সা' I ধনা -সা' না | ধা -না | পা -ধা II  
এখ ন • ব • ল • ডা ক্ ব কা • রে •



## চিত্রশিল্পী ।

— \* —

নিধাতা বেচারাকে মনের এত ঐখগ্যা দিয়েও তার ঘরের দৈতু দূর করেন নি। সে যে এমন চিত্রশিল্পী তা কেউই জানত না, তার গুণপণা ভগ্ন-ঢাকা অনলের মত গোপনে জলেছিল, পতাস্তুরালের গোপন কলির মত তা আড়ালে ফুটেছিল, সে লোকচক্ষুর দৃষ্টিঅগির কাছে মুগ্ধ-প্রশংসা পাবার জন্ত একেবারেই বাগ্র ছিল না, সে জানত অরণ্যের মাঝেই বনফুলের গোরব! সে তার ছোট ঘরের কাছে বসে বিপুল জগতের দিকে চেয়ে দেখত—ঐ অনন্ত নীল আকাশের তলায় এই শ্রামল পৃথিবী, ঐ গাঢ় শ্রাম বনের প্রান্তটুকু, ঐ ছয় স্বতুর বর্ণ-গন্ধ-গীত-সম্ভার, ঐ গ্রহনক্ষত্রের হীরক-খণ্ডের মত উজ্জ্বল আলো, ব্রীড়া-রক্তিম হাসির মত উষার ঐ প্রথম বিকাশ, মৃদুঘুর শেষ আশার মত ঐ সন্ধ্যার শেষ কোটিং, বিধবার পটুবস্ত্রের মত জ্যোৎস্নার শান্ত-বিস্তার, সমস্ত যেন তার প্রাণটিকে সৌন্দর্যাসিক্ত করে তুলত! তার তুলির লিখন দিয়ে মনের সেই রসসম্ভোগকে চিত্রিত করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করত এই ছিল তার পুরস্কার। কিন্তু ক্ষুধা নামে যে রাক্ষসী ঝঠরের ভিতর বাস করে, সে একটি দিনও আপনার প্রাণ্য আদায় না করে মানুষকে নিস্তার দেয় না। শিল্পী ব'লে তার মনে এতটুকু করুণা ছিল না, সে প্রতিদিন পূর্ণ কর আদায় করে নিত। বেচারী দেখল এমন করে প্রকৃতির রসগ্রহণও সম্ভব নয়, তখন সে এক দিন অন্নচিন্তায় ঘরের বাহির হয়ে পড়ল। দেশের রাজা ঘোষণা করেছিলেন গুণের মূল্য দেবেন। বেচারী অনেক আশা করে' পরদিন রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। এই চক্ চকে বলমলে রাজসভা, তাতে সোনার ছত্রের তলায় স্বর্ণ-চামরের হাওয়ায় বসে' নরপতি। তার মাথার হীরক-কিরীট থেকে যেন মুহূর্তে-মুহূর্তে আলোর বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে পড়'ছিল, সেই যন্ত্রপুস্ত শরীরটি যেন বহুকণ্ঠে মথমলের জাগ্রতিমে সোনার মস্নদের উপরে, স্বর্ণছত্রের তলায় সূর্য্যের উদ্ভাপ আর মাটির কাঠিথ থেকে ঝাটিয়ে রাখা হয়েছে, গোলাপী আতরের সৌরভে পৃথিবীর দৈতুকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। দণ্ডধারীরা স্বর্ণ-দণ্ড ধরে' যেন কাগকে শাসন করতে দণ্ডায়মান, চাটুকারেরা রাজার স্তুতি গান করে জগতের ক্রন্দন কোলাহলকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। এমন যে রাজসভা সেই রাজসভায় যখন দরিদ্র শিল্পী প্রবেশ করলে, তার মাথা থেকে পা অবধি সকল দৈতু যেন তার বুকের মাঝে বি'ধতে লাগল, তার পায়ের ছিন্ন পাত্কাও যেন তাকে দিকার দিল, সে হোঁচট খেয়ে সভাজনের তাস্তাস্পদ হয়ে পড়ল। বেচারী আদব-কায়দা কিছুই জানত না, নীচ হয়ে নমস্কার করে সে চোখ নত করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজার তোষামোদকারীরা কেহ বলল “মহারাজ সন্ময় নষ্ট করে কি লাভ? ওকে অন্দর-মহলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হক্,” কেহ বললে “কাঁধে একটা বুর্লি, আর হাতে খঞ্জনী নিলেই ঠিক মানাত!,” কেহ বলল “এতে রাজসভার অপমান করা হয়,” এমনি করে একটা মিশ্রিত কোলাহল যেন সেই বিদ্রুত রাজসভার মাঝে ভ্রমর গুঞ্জনের মত গুণ-গুণ করতে লাগল। বেচারী লজ্জায় যেন অধিক সঙ্কুচিত হয়ে পড়'ছিল, তার মুখখানি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। যখন সে তার মলিন উত্তরীয়ার আড়াল থেকে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করে বললে, সে চিত্র দেখাতে এসেছে তখনি আবার একটা কোলাহল উঠল “দাঁড়াও দাঁড়াও, উনি হচ্ছেন চিত্রশিল্পী, দেখ'ছনা চোখের তুল-ঢুলে চাওনি, দেখ'ছনা ভোলা-ভোলা ভাবখানা!” বেচারী সে কথায়কর্ণপাত মাত্র না করে' একেবারে রাজার কাছে গিয়ে তার কাগজের আস্তরণ খুলে একখানি চিত্র উন্মুক্ত করে ধরলে। সে বুঝ'ছিল—যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে' অপর পক্ষের বৈজয়ল দেখে পলায়ন

করা যেমন হাস্যাস্পদ, অভিশ্রায় সিদ্ধি না করে এ রাজসভা থেকে প্রত্যাবর্তন করাও সেইরূপ বিজ্ঞপের কারণ হবে তাই সে ভাবছিল এ পরীক্ষা থেকে বত শীঘ্র মুক্তি লাভ হয় ততঃ মঙ্গল। সে মন্ত্র বেচারা আজ্ঞার অপেক্ষা না রেখে আপান আপনার গুণপণা দেখাতে গেল। মূঢ়ের মত রাজা তার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন, তার অর্থ যেন—এর অর্থ কি, আমি ত কিছুই গ্রহণ করতে পারছি নে! শিল্পের মন্দির যতই মধুর হক্‌না, সে এমনি সুন্দর সৌন্দর্য যে তাকে এমনি করে সহস্র লোকের মুক্ত কর্ণের কাছে ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে তার সৌন্দর্য হানি হয় তার গৌরব হ্রাস হয় কিন্তু বেচারা শিল্পী নিরুপায় হয়ে আপান তার মর্মে প্রকাশ করতে বসল। মনের ভাবটুকু এমনি উঁচু গলায় ব্যক্ত করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর হ্রাসকবার কৈপে গেল, শেষে সে বলতে লাগল—“এ চিত্রটির নাম প্রতিচ্ছায়া! আমরা ভগবানের চোখে বত সুন্দর সেই ছবিটি অঙ্কিত করতে চেষ্টা করোছি। এই যে লোকটি যার অঙ্গে সৌন্দর্যের লেশ নেই, সমস্ত অঙ্গে দৈন্তের ছায়া সেই জগতের কাছে অপমানিত লালিত অধিকনও ভগবানের মনের কাছে কি অপূর্ণ সুন্দর। এই যে ভগবান তাঁর সামনেই দাঁড়িয়েছেন, তাঁর বুকের কাছে এই যে ছবি সেটি হচ্ছে এই কুৎসিত লোকের ছায়া। ভগবানের কাছে সে কি বিচিত্র সৌন্দর্যমায়িত হয়ে উঠেছে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির লাভণ্য এসে জড় হয়েছে, যুগযুগান্তের বসন্তের ছাপ যেন তাতে জেগে উঠেছে, ভগবানের মুখের আলো মুখের রূপ যেন এই বুকের ছবিখানিকে উদ্ভাসিত করেছে। তারপর সেই ছবি যখন এই কুৎসিত লোকের মনে আঁকা পড়ল অর্থাৎ যেদিন সে জানতে পারলে সেই চিরসুন্দরের মনে সে কি অক্ষয় সৌন্দর্য লাভ করেছে, তার সেই কালো রূপও কি আলো হয়ে উঠেছে সেদিন সে আত্মপ্রসাদ ফিরে পেল। এই লোকটির বুকের কাছে এই যে ছবিখানি ওটি হচ্ছে ভগবানের মনে তার ছবির প্রতিচ্ছায়া! সেদিন সে নির্বাক-বিশ্বয়ে গৌরবের আসনে আপনার স্বরূপটিকে দেখেছে। আপনার এ রূপ দেখে তার আশা আর মিটে চাইছে না।” সভাসদেরা নীরবে তার ব্যাখ্যা শুনছিল, মধু পান করতে করতে ভ্রমরের গুঞ্জন যেমন শুরু হয় তেমন করে তারা শুনছিল। মহারাজা বললেন “তোমার প্রতিভা স্বীকার করি, কিন্তু এমন শত শত প্রতিভাশিল্পী প্রাতিদিন আমার রাজ সভায় আসে। এর চেয়ে অধিক গুণপণা দেখালে পুরস্কার পাবে।” তখন চাটুকারের দল চীৎকার করে আনন্দধ্বনি করে উঠল ঠিক বলেছেন মহারাজ! আমাদের রাজা স্বয়ং তার ধর্মের অবতারণা!”

বেচারা সেদিন স্নান মুখে রাজসভা থেকে বেরিয়ে চলেছে এমন সময়ে এক দাসী এসে চিত্রকরকে জানাল ‘রাজকুমারী চিত্রগুলি একবার দেখবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। সে জানত না যখন রাজসভা বিজ্ঞপের হাস হাসছিল তখন একটি গবাক্ষের মুক্তা ঝালরের আড়াল থেকে দুটি টানা টানা বড় চোখ তার জন্ত করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, যখন সে কাম্পিত কণ্ঠে চিত্রের মন্দিরকু ব্যাখ্যা করছিল তখন সেই দুটি চোখে আনন্দ উজ্জ্বলিত হয়ে পড়ছিল। বেচারা তাড়াতাড়ি মলিন কাপড়ের মোড়কটি রাজদাসীর হাতে দিয়ে লজ্জিত হয়ে বলল, “আমি তাঁর দাসাত্বদাস তিনি যে অহুগ্রহ করে দেখতে চেয়েছেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।” দাসী চিত্রখানি নিয়ে দ্রুত চরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে। সে কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর দাসী চিত্রখানির সহিত একটি স্বর্ণ মূদ্রা শিল্পীর হাতে দিয়ে বললে “রাজ-কুমারী বললেন আপনি অলঙ্কারে এ আনন্দের উপহার গ্রহণ করুন, ঠাকুর ঘরে যেমন ভক্ত সওয়া পরসার প্রসাদ দিয়ে তৃপ্তি অহুতব করে এও তাই, এ চিত্রের মূল্য নয়, আনন্দের মূল্য!” বেচারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললে “তাকে বলো এ কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।” দাসী ফিরে গেল। সে কক্ষের শিল্পিনী প্রবেশ করে উপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ

করে দেখলে, বাতায়নে একখানি গোলাপের মত হাসিভরা মুখ তাকে অভিনন্দন করছে, সে কতক্ষণ নির্বাক বিষ্ময়ে সে সৌন্দর্য্য পারিজাতের দিকে চেয়ে রইল যখন কৃতজ্ঞতায় তার নয়নপল্লব সিক্ত হয়ে উঠল তখন তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সে গৃহের দিকে ফিরে গেল।

পরদিন সে সাহসে বুক বেঁধে আবার একখানি চিত্রপট নিয়ে রাজবাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হল। এবার সভাসদেরা পূর্ণ দিনের মত বিক্রপ হাসি হাসল না বেচারী সঙ্কোচের স্বাক্ষরেও অনেকখানি আরাম বোধ করলে। মহারাজ বল্লেন “দেখি চিত্রকর আজ তুমি কি এনেছ! সে সঙ্কিত লঙ্কার চিত্রখানি তাঁর সম্মুখে তুলে ধরলে। মহারাজ বল্লেন “তুমিই বাখ্যা করে শুনাও। আমার স্থূল বুদ্ধি ওর মাঝে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না!” অমনি চাটুকারের দল চীৎকার করে উঠল “বলেন কি মহারাজ! বলেন কি! ওর বুদ্ধি এমনি তীক্ষ্ণ যে রাজার বুদ্ধকে হার মানায়?”—বেচারী লঙ্কার জড়সড় হয়ে বললে “মহারাজের আজ্ঞা পালনীয়।—এ চিত্রখানির নাম স্পর্শমণি। পৃথিবীতে যে বসন্ত এসেছে, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যে ঐশ্বর্য্যময়ী হয়ে উঠেছে, কাক্ষন গাছে কাক্ষন ফুল ফুটেছে, চাঁপগাছে চাঁপা ফেটেছে, বকুল গাছে কোকিল গেয়েছে, সে কথা জানা নেই শুধু ঐ প্রেমহীনের কাছে, তার শুষ্ক পুঁপিপত্র নিয়ে দ্বার বন্ধ করে বসে আছে। তারপর একদিন দ্বার মুক্ত পেয়ে একেবারে অতর্কিতভাবে গুপ্ত বসনা প্রেম আসছে, এত লবু চরণে ঘরে প্রবেশ করে এত মুহূ স্পর্শে সে তার বক্ষের নীড়ে আশ্রয় নিল যে সে অমূল্য মাত্র করতে পারল না। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে প্রেম আপনার কাজ করছিল, স্পর্শমণির মত তার মনমানাকে সোণা করে দিচ্ছিল তারপর যে দিন বসন্ত অন্তিমিত হয়েছে, সূর্য্যের প্রথম তাপে তৃণহীন সেদিন তার বক্ষে পত্রশূন্য ধরণী প্রেম তাকে বাহিরে টেনে আনল; কোথায় রইল তার শাস্ত্র কথা, কোথায় রইল তার বিধি বিধান, কোথায় রইল তার শুচি বিচার? বস্ত্রে তার মাটি লেগেছে সেদিকে দৃকপাত নেই, পথের ধূলি যে চন্দন প্রলেপের মত কপালে লেগে গেছে সেদিকে দৃষ্টি নেই সে একেবারে প্রেমে আত্মহারা হয়ে একটা শুষ্ক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছে! যাকে সে সমস্ত শাস্ত্রের মাঝে খুঁজে পায় নি, কালো অক্ষর-গুলি যাকে গোপন করে কেবল রসহীন জটিল শব্দ রূপে বেজে উঠেছিল, সে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে সেই প্রেমময়কে বিশেষ বিস্মিত দেখেছে, রূপরসগন্ধস্পর্শ দ্বারা গ্রহণ করতে পারছে প্রেম এমনি স্পর্শমণি!” রাজা যখন এই অর্থের সহিত চিত্রটিকে মিলিয়ে দেখলেন তখন সমস্তই অতি সহজ এয়ে এল, তিনি আনন্দিত হয়ে বল্লেন “চিত্রকর, এ সুন্দর চিত্রখানির উচিত পুরস্কার তুমি পাবে!” চাটুকারের দল সম্মুখে বলে উঠল “আমাদের মহারাজের মত গুণগ্রাহী আর কে আছে?” সে বিনয়ের সহিত নমস্কার করে রাজসভার বাহিরে এসেই আবার কিসের প্রতীক্ষায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। মনের উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল এমন সময়ে রাজদাসী হেসে এসে অভিবাদন করে সম্মুখে দাঁড়াল। আজ আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হল না সে তাড়াতাড়ি চিত্রখানি দাসীর হস্তে প্রদান করলে। সে একাকী দাঁড়িয়ে মনে মনে ছুটি কালো চোখের প্রশংসা করলেন, পদ্মদলের মত ওষ্ঠের কাছে একটুখানি মুহূ হাসি! দাসী অস্তঃপুর থেকে কখন যে প্রত্যাগমন করেছে সে জানতে পারেনি; নিদ্রোচ্চের মত চমকিত হয়ে উঠল যখন দাসী চিত্রখানি তার হাতে প্রত্যর্পণ করে কাপড়ের অন্তরাল থেকে কি একটি দ্রব্য নিয়ে তার সম্মুখে ধারণ করে বললে, “রাজকুমারী তোমার চিত্রকলা দেখে আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ এই করকঙ্কণটি উপহার পাঠিয়েছেন।” সে বহুচালিতের মত তা গ্রহণ করলে, যজ্ঞ চালিতের মত একবার মাথার স্পর্শ করলে তারপর আনন্দ বিহীন কণ্ঠে বললে “দেবীর প্রসাদ ভক্ত যেমন করে গ্রহণ করে তেমনি করে আমি গ্রহণ করছি ধনো!” দাসী কৌতুকের হাসি হেসে প্রস্থান করলে। বেচারী কঙ্কণটিকে

কতক্ষণ নাড়াচাড়া করলে দুইহাতে চেপে একবার বকের কাছে তুলে ধরলে। উপরে দৃষ্টিপাত করে দেখলে—সেই সুন্দর মুখখানি তেমনি জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করছে। রাজকুমারীর দৃষ্টি যেন তার অন্তরে স্পর্শ করছিল, তার নয়ন আপনি নত হয়ে এল, সে মাতালের মত আত্মতোলার মত গৃহের অভিমুখে প্রস্থান করল। কোথা দিয়ে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত অতিবাহিত হ'ল সে জানতে পারে নি, সে যেন একটা সুখের নেশায় উন্মত্ত হয়েছিল। পরদিন প্রভাতে সে তার চিত্র চয়ন করতে বসল, সেই অন্তঃপুরবাসিনী রাজকুমারী কাছে যা তুলে ধরা যায় এমন অঙ্কন কোনটি? শেষে সে আপনার প্রিয়তম চিত্রখানি নিয়ে কম্পিত বক্ষে রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। নিকটেই দ্বারাস্তরালে একটি কোমল বক্ষের স্পন্দন সে করুণা করছিল। একটুখানি ভ্রূণের শিজিনী একটুখানি নিঃশ্বাসের দ্রুত শব্দ সে যেন বকের মাঝে অনুভব করতে পারছিল। অকারণে তার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হ'য়ে উঠছিল, তার হস্ত কম্পিত হয়ে উঠছিল, তার মুখের কথা মুছ হয়ে আসছিল। আজ মহারাজের পাশেই তার আসন স্থাপিত হয়েছে, সভাসদেবী সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলে। সে যখন তার চিত্রখানি তুলে ধরল, তখন রাজা বললেন “শিল্পি তোমার ব্যাখ্যাটুকুও চিত্রের মতই মধুর আর সুন্দর তাই তোমার মুখ থেকেই আমি এরও ব্যাখ্যা শুনতে চাই।” সে একবার আপনার মনের ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করে নিলে, তারপর বললে মহারাজ এটি চিত্রখানি আমার প্রেষ্ঠ শিল্প। এই চিত্রখানি অঙ্কনকাণ্ডে আমার মনের উপর যে রং ধরেছিল সেই রং দিয়ে যদি মহারাজ এ চিত্রখানি দেখেন তবে এর পুরা রসটুকু গ্রহণ করতে পারবেন। এর নাম সর্সনাশের ডাক্। ঐ যে বিলাসিনী নারী—ও হচ্ছে মানবাত্মা। ওর অশন চাই, বসন চাই, ভূষণ চাই, অলঙ্কার চাই, ওর কামনার নীলাধরী, বাসনার মুকুট চাই, কৃত্রিম বর্ণের আবরণে সে একেবারে চাপা পড়েছে, এমন কি কৃত্রিম অহঙ্কারের রংএর প্রলেপে তার দেহের বর্ণটুকু ঢাকা পড়েছে। একদিন যখন সে বিলাস-সজ্জায় আবৃত, এমন সময়ে ঘরে আগুন লাগল! কি আগুন, সে কি আগুন! অতর্কিত আগুন তার সব বিলাসের উপাদানকে ভস্ম করে দিল, একেবারে চাই করে দিল; তার বাসনা গেল, কামনা গেল, গর্ভ গেল, অহঙ্কার গেল, সব একেবারে ভস্ম হয়ে গেল! এখন ভিতরের শুদ্ধা নারীটুকু বাহির হয়ে পড়েছে, কি তার দেহের বর্ণ যেন ঐ সূর্য্য কিরণের মত উজ্জ্বল! পাবকশিখা তাকে একটি অগ্নি স্কুলিঙ্গের মত জ্যোতিঃস্বয়ী করে গেছে, যেদিন সে এত বড় বিপদের হাত এড়িয়ে শুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে সেদিন সে পরমাত্মার আহ্বান শুনলে। যে দূরতম ছিলেন তিনিই যে নিকটতম তিনিই যে প্রিয়তম তিনিই যে একমাত্র স্বামী এই জ্ঞানটুকু হবামাত্র সে আপনার বাসগৃহ ত্যাগ করে অভিসার করলে! সে সব ত্যাগ করলে তার মায়া—তার মোহ—সব ত্যাগ করলে, আজ আর কোন বন্ধন রাখা চলেবে না, সর্বস্ব ত্যাগ করে সে পরমাত্মাকে পাওয়া—নয়ত সর্বস্ব নিয়ে তাঁকে না পাওয়া। সে মনে মনে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল তাই সে সর্বস্ব ত্যাগকেই শ্রেয় বলে বরণ করেছে সে একেবারে পথে বাহির হয়েছে। সর্সনাশের ডাক্ শুনে এই তার অভিসার।” রাজা নির্বাক্ হয়ে চিত্রকরের কথা শ্রবণ করছিলেন, তিনি আনন্দ গদ-গদ কণ্ঠে বললেন “শুণি তোমার শিল্পশ্রুণ আমার মুগ্ধ করেছে। কোন্ পুরস্কার তোমার যোগ্য আমি তাই বিবেচনা করে দেখে কাল তোমায় পুরস্কৃত করব।” সে সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে সভা থেকে নিঃস্রাস্ত হল। সে ভেবেছিল দাসী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু বাহিরে এসে দেখলে কেহই নেই। সে মনের ভিতরে একটা মৃদু বেদনা অনুভব করলে নিরাশার একটা মৃদু আঘাত! এমন সময়ে উপরের গবাক্ষ থেকে একগাছি শিরীষ ফুলের মালা তার গায়ের কপড়ে এসে পড়ল, চমকিত হয়ে দেখলে রাজকুমারী! তাঁর বক্ষের উপহার কি তার চরণ স্পর্শ করলে? সে পরম প্রেমভরে তাড়াতাড়ি ফুলের মালাখানি উত্তোলন করে কণ্ঠে ধারণ করলে, একবার কপালে চক্ষে কপোলে

ওষ্ঠে বক্ষে স্পর্শ করে সে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরে গেল। রাজকুমারীর কালো চোখের কোণে একটা অশ্রুর গ্লাবন টল্ টল্ করে উঠেছিল—কি তার অর্থ? পরদিন প্রভাতে রাজা শিল্পীর প্রভাকার এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন কিহু কই সে চিত্রকর? রাজ আজ্ঞার শিল্পীর সন্ধানে পাইক ছুটল, সন্ধান পাওয়া গেল তার গৃহ উন্মুক্ত জনশূন্য সে নিরুদ্ভিষ্ট হয়েছে।

## মানুষ ।

—:~:—

আপনারে নিয়ে ঝাছি  
আপনারে পেলে বাঁচি  
আর কারও নাহি রাখি হুঁস  
জগতের সেরা জীব আমরা মানুষ ।

কাহার কোথায় প্রাণ কিসে হয় ব্যথা দান  
কিসে তার অবসান  
মানবের কি ব্যথা পরম  
জেনেও জানিনা মোরা তব্বের কোথায় গোড়া  
করি তাই নাড়াচাড়া  
জগতের সৃজন চরম ।

কাজ বাগাবার তরে হাসিরে রেখেছি ধরে  
নয়ত কে স্থির করে  
কত না হাসির দাম  
দাতারও দানের খাতা নিজতরে তরে পাতা  
এ নয় আমার গাথা  
মিথ্যা কিনিতে নাম ।

ভিতরে কি আছে হার দেখাব কৌচার পাড়  
ছুঁচার কীর্তন থাক্ বাহিরে জলুঘ  
এই হ'ল মোরা জীব-জগতে মানুষ ।

ঐবৈভনাথ কাব্যপুৰাণভাষ্য ।

## মানসিক দৃঢ়তা এবং উৎসাহ ।

আমরা ইংরেজী Decision কথাটির মানসিক দৃঢ়তা আখ্যা দিতেছি, Webster ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন “Determination ; Unwavering Firmness” আমরা Energyর অর্থবাদ উৎসাহ দিয়াছি । Webster এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন “Internal or inherent power ; Power exerted, force, Vigour.” একাগ্রতা Earnestness কথার এই ব্যাখ্যা “Arduous or zeal in the pursuit of anything.” সাহস Courage কথাটির এই ব্যাখ্যা “That quality of mind which enables men to encounter dangers and difficulties with Firmness, boldness, resolution.” এই সমস্ত গুণগুলিই পরস্পর একপর্যায়ে সম্বন্ধ এবং একভাবে একটি যাহা বুঝায় অপরগুলিতেও তাহাই বুঝায় । একটিকে অপরগুলি হইতে বিশ্লেষ করা কঠিন, জীবন কাব্যে সকল গুণের সমবায়েই এক মূর গঠিত হয় । একটির শেষ এবং অপরটির আরম্ভ কোথায় এ বলা কঠিন, যাহা হউক ইহার কোনটর কি গুণ ও পার্থক্য কোথায়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান আমাদের কার্য নয়, ইহার সমবায়ে আত্মবিশ্বাসে, আত্মজয়ী হইয়া মানুষ কি প্রকারে অমাহুতিক কার্য সম্পন্ন করে এবং ভয় ও মৃত্যুজয়ী হইয়া বিরাজ করে তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য । এই অদম্য উৎসাহই সিজারকে অসীম খ্যাতি দান করিয়াছিল এবং এই পোপেরই তিনি সঙ্গীদিগকে জোর গলায় কহিতে পারিয়াছিলেন “ভয় নাই—সিজার এবং তাহার সেই ভাগা তোমাদের সঙ্গে আছে ।”

তাঁহার অপরাজয় সঙ্কল্পের পাশে মানসিক দৃঢ়তা, উৎসাহ, সাহস এবং একাগ্রতা আসিয়া চূর্ণাঙ্গকে পরিহাস ও ভীতিকে বিদূরিত করিতে পারিয়াছিল । এই গুণগুলির উৎসাহে সজীবিত হইয়াই লুথার রাজত্ব ও আভিজাত্য-বর্গের প্রচলিত চির পরিচিত ধারার উপর সংস্কারের ছাপ মারিতে পারিয়াছিল । একটা কাজ করিতে যাওয়ায় পিটকে পার্লামেন্টের একজন সভ্য বলিয়াছিলেন ‘এ অসম্ভব,’ উত্তরে পিট বলিয়াছিলেন “অসম্ভব ! অসম্ভবকেই আমি পদদলিত করে চলে যাই ।” একবার তার চিন্তা কোন কিছু উপর সজাগ হইয়া উঠিলে বাধা বিঘ্ন সব আগুনের মুখে চাই হইয়া যাইত ।

‘অসম্ভব’ সম্বন্ধে এই সব কাহিনী শুধু খেয়াল কথা নহে, যাহারা বাধা বিঘ্ন কঠোরতাকেই অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করেন তাহাদের কাছে পিটের কথা অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের মানসিক দৃঢ়তা আছে এবং মানুষেই কি করিয়া গেছে তাহা জানেন তাহারা ওই উক্তি-কেই কর্তব্যের আহ্বান বলিয়া মনে করিবেন । ‘কিটো’ মনুষ্য সম্বন্ধে লিখিবার বেলায় লিখিয়াছিলেন ‘আমি নিজে অসম্ভব বলে কোন কিছু বিশ্বাস করি না, মানুষ নিজের সুবিধা এবং পরিশ্রম অনুসারে যা সে ইচ্ছা করে তাতেই পরিণত হতে পারে ।’ নিজেব জীবনেই এ কথার সত্যতা তিনি প্রমাণ করে গেছেন । বাধার বালক কিটো যে আতুরালয়ে জুতোর নক্সা তৈয়ার করিত তার সঙ্গে একবার পরবর্তী জীবনের “Pictorial Bible,” Daily Bible Illustrations” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিশ্ববিখ্যাত কিটোর তুলনা করুন । যদি সত্যই ‘অসম্ভব’ বলিয়া কিছু থাকিত তা নিশ্চয়ই দরিদ্র বধির বালক এবং পুরা-তত্ত্ব-বারিধির মধ্যে কিছু দেখা যাইত । কিন্তু কিটো তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন না, ইহার মানসিক দৃঢ়তা এবং জলন্ত উৎসাহের সম্মুখে সব স্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল । দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে কোনরূপ অসম্ভবই টেকে না । “qui credit potest protest” যে পাবিব বলিয়া মনে ভাবে সেই পারে ।

প্রায় প্রত্যেক কাজেই ভাল মন্দ এমনভাবে জড়ান থাকে যে, মন্দ হইতে ভালটুকু শুধু বাড়িয়া লইলেই হইল না, মন্দ তাগ করিবার উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা ও সেই সঙ্গে থাকা একান্ত আবশ্যিক। যুবকদিগের কু-ইচ্ছার প্রণোদন হইতে দূরে থাকার জন্য আজকাল এ ধর্মের দিকে যথেষ্ট নজর রাখার প্রয়োজন। এ স্থানে মানসিক দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প স্থির করিবার ক্ষমতা না থাকিলে পতন অনিবার্য।

বর্তমান যুগ যুবকদিগের চরিত্রে এই সব উপাদান চায়; কর্মক্ষেত্রে যুবকদিগের জন্য—মঙ্গলার জন্য বৃদ্ধেরা আছেন। শারীরিক শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের জন্য যুবকেরা বলবান। আলেকজেন্ডার মাত্র কাড় বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার রাজত্বের বার বৎসর মানবইতিহাসের একটা কাব্য-যুগ। তিনি বিশ্ব বিজয় করিয়া তেত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

জুলিয়াস সিজর তিনশত জাতিকে জয় করেন, আটশত নগর অধিকার করেন, ত্রিশ লক্ষ লোক পরাজিত করেন, সাম্রাজ্যের প্রধান রাজনীতিক রূপে পরিগণিত হ'ন, বক্তা রূপে সিজারের সমান এবং লেখক রূপে ট্রাসিটাসের সমান বলিয়া তাহার যশ যখন পরিব্যাপ্ত তখন তিনি যুবক মাত্র।

উনিশ বৎসর বয়সে ওয়াশিংটন উপনিবেশের এক প্রদেশের সহকারী শাসক হ'ন, একুশ বৎসর বয়সে তিনি ক্রান্তে দূত রূপে যান, তখন হইতে তাহার বিবাহ সময় সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দেশের কোন না কোন উচ্চ শ্রেষ্ঠ কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ভরা যৌবনের সময় তিনি সাধারণের ক্ষেত্রে হইতে বিদায় লইয়া মাউন্ট ভারনসে বিশ্রাম জীবন কাটাইতে যান। ক্যালভিন ছাব্বিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Institutes' লেখেন। উনত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে মার্টিন লুথারের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়। পিট্ কলেজ হইতে বাহির হইয়াই 'চাউন্স অব্ কমন্স'ে যান, তেইশ বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রী হ'ন, এবং ত্রিশ বৎসরের পূর্বেই গ্রেটব্রিটেনের সর্বাধিক ক্ষমতাসালী রাজনীতিকরূপে পরিগণিত হ'ন।

এ উদাহরণগুলি হইতে ব্যক্তি-বিশেষ সম্বন্ধেই খাটে, কিন্তু জাতির শক্তি এবং আশা যে তাহার যুবকেরাই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কোন কোন যুবকের নামজাদা ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বা অপর কিছু হইবার দৃঢ়সংকল্প শুনিয়া কেহ কেহ উপহাস করেন, ইয়েল কলেজের ছাত্র ক্যালোনের সংকল্প যেমন তাহার সহপাঠীর নিকট অহমিকাপূর্ণ ও অসম্ভব মনে হইয়াছিল তাহাদের নিকটও একথা তেমনি লাগে, একাদিন ক্যালোনের একজন সহপাঠী পাঠে তাহার অত্যন্ত মনোযোগ দেখিয়া ঠাট্টা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—“কংগ্রেসে ঢুকে বাহাতে আমি খ্যাতি অর্জন করিতে পারি—সে জন্য বাধা হইবেই আমার সময়ের সদ্ব্যবহার যথোচিত করতে হয়।” কথা শুনিয়া তার সহপাঠী এ ভাবে হাসিলেন যেন এ ঠাট্টার কথা—ক্যালোন তখন বলিলেন “তুমি সন্দেহ কচ্ছ না কি! আমার নিজের ক্ষমতার উপর এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে—তিন বৎসর মধ্যে যদি আমি দেশ—সভার একজন খ্যাতনামা প্রতিনিধি না হতে পারি তো আজই আমি কলেজ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।” কেহ হয়তো একে অহমিকা বলিতে পারেন—কিন্তু ইহা সেই মানসিক দৃঢ়তা ও উদ্যম যাঁহার কাছে অসম্ভব ও সহজ-সম্ভব হইয়া আসে। চরিত্রের এই অমিত তেজ যদি ভাষায় প্রকাশ হলে অনেক সময় অহমিকাপূর্ণ বা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় এতে ছ'মুখী প্রতিভা নিয়ে একজন যা করিতে পারিবে অপর এর অভাবে দশমুখী প্রতিভা নিয়েও তা করিতে পারিবে না, সাহস ভরা উদ্যম একমুখী প্রতিভাকে বত উর্দ্ধে উঠাইতে পারিবে মানসিক দৃঢ়তাপূর্ণ দশমুখী প্রতিভাও তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না।

এইখানে যতগুলি কৃতকার্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা গেল তাহাদের মধ্যেও বাকস্টনের মত চরিত্র বল দেখাইয়াছেন অল্প লোকেই, স্বাভাবিক বুদ্ধির চেয়ে মানসিক দৃঢ়তা ও উদ্যম প্রভাবেই হীন ধনী ও মানী হইয়া গিয়াছেন। রেভারেণ্ড টমাস বিনি ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“একটা অব্যবহিক আলস্যপরায়ণ বালক যাহার মধ্যে প্রাতিভা কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কোন ক্ষুরণ দৃষ্ট হয় নাই, যে ছাত্ররূপে নিজেকে কোন ভাবে পরিচিত করিতে পারে নাই শুধু কুকুর, খেলা ও বন্দুক লইয়া কাটাইয়াছে, উনিশ কি কুড়ি বৎসরের পর—সম্পত্তি যাহা পাইবার আশা ছিল তাহাতেও ছাঁট পড়িল, বাইস বৎসরে স্বামী ও পিতা হইল কিন্তু কাজ কর্ম কিছু নাই সদাই অভাব যুক্ত কিন্তু প্রথম জীবনের শত অভাবগ্রস্ত এই বালক পর জীবনে কেবল যে শুধু ধনী ও মানী হইয়াছিল তা নয়, বিগত লেখক, বিস্ময়কর ব্যাবস্থাপক, জনপ্রিয় বক্তা, ও সাম্রাজ্যের একজন ভিত্তি রূপে পরিণত হইয়াছিল—” কি করিয়া কোথা হইতে এসব আসিল? বাকস্টনের নিজের লেখা হইতেই এ কথার উত্তর দিতেছি “যতই আমার বয়স হইতেছে ততই নিশ্চিত রূপে আমি বুঝিতে ছ যে দুর্জয় ও ক্ষমতাশালী লোকের প্রভেদ কোথায়? উৎসাহ—অদম্য সঙ্কল্প দৃঢ়তা, একবার যা স্থির—তা করিতেই হইবে, হয় মরণ—নয় জয়। শুধু এই শুণেই বিশেষ যা করণীয় সবই করা যাইতে পারে। এ ছাড়া কোন প্রতিভা, অবস্থাচক্র সুযোগই হুঁপাওয়ালা জীবকে মানুষ করিতে পারিবে না।” অবশেষে বালোই সেই সব ক্ষণিক সুখ দানী আমাদের মধ্যে একদিন যখন ভবিষ্যতের ভীত চিত্রে সজাগ হইয়া উঠিল অমন সেই মুহূর্ত্তে বাল্য সঙ্গী খেলা ধূলা সব পরিত্যাগ করিলেন। পরে এই একাগ্র ইচ্ছা ও অদম্য উৎসাহ পার্লামেন্টও বহু সৃষ্টিত, সুকৌশলী দলের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে গোঁয়ার বলিতেন, এমন স্থির সঙ্কল্প লোকের এ আখ্যা ছোট্টা কিছু অসাধারণ নহে—কিন্তু তিনি সতাই গোঁয়ার ছিলেন না, তাহার মানসিক দৃঢ়তাই লোকের চোখে এই ভাবে বাজিত। একবার ইনি বলিয়াছিলেন—“মানুষের মেরুদণ্ড অবশ্য থাকা চাই নইলে কি করে সে তার মাথা সোজা রাখবে? কিন্তু সেই মেরুদণ্ড আশ্চর্যকর মত নোয়াবে, নইলে কপাল তার চৌকাঠে লেগে চিরে যাবে যে।”

পিজারো একজন জলদস্যু ছিল কিন্তু তার বীরত্ব ও সাহস ক্ষমতা ছিল বিরাট মহাপুরুষের মত। পেরুলুইনের একাগ্র আকাঙ্ক্ষা হইতে তাহাকে সহস্র বিপদ, কঠোরতা এমন কি মৃত্যু ভীতিকেও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। প্যাক্সোতে খাদ্যভাবে সঙ্গীয় লোকজন সকল পাগলের মত হইয়া উঠিল, ব্যাধি পীড়ায় অস্থির করিয়া তুলিল, তবু তাহার একাগ্র উদ্দেশ্য হইতে একতিল বিচ্যুত করিতে পারিল না। এমন সময় ভাগ্যক্রমে একখানা জাহাজ দেখা গেল, জাহাজের কাপ্তান তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে পানামায় লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কাপ্তানের সে কক্ষণ বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া নিজ তরবার দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বালির উপর এক রেখা টানিলেন, তারপর দক্ষিণ মুখে হইয়া তিনি তাহার দস্যুতার সঙ্গীদিগকে বলিলেন “বন্ধু ও সঙ্গীগণ! ও পাশে শ্রম, ক্ষুধার আশা, নয়তা, ভীষণ ঝড়—এবং মৃত্যু, এ পাশে সুখ ও আনন্দ। ওই দেখ পেরু তার খন সম্পদ নিয়ে রয়েছে—এখানে পানামার চির দরিদ্র! বেছে নাও—জনে জনে কি চাই? আমি নিজে দক্ষিণেই যাবো। মৃত্যু সম্ভব জানিয়াও তিনি পানামার জীবন বাঁচানো হইতে পেরুই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতেও শিখিবার বখেট আছে। সতের বৎসর বয়সের সময় সিজার জলদস্যুদের হাতে পড়েন, দস্যুরা মুক্তিপণ চায় একশত। উত্তরে তিনি বলেন “একশ কেন পাঁচশ দিচ্ছি, কিন্তু ছাড় পেয়েই তোমাদের মৃত্যু ব্যবস্থা কোরব আমি।” স্পেনে তার সৈন্যেরা বিপক্ষ সৈন্যদের আক্রমণ করিতে তার আদেশ অমান্য করায় তিনি হাতে হাতিয়ার লইয়া গর্জিয়া বলিলেন, “আমি মোরখো এখানে!” এই বলিয়া স্পেনীয় সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, অগণিত তীর তাহার



দিকে বসিত হইতে লাগিল, এই অপূর্ণ বীরত্ব দেখিয়া তাহার সৈন্যেরা আর স্থির থাকিতে পারিল না—তাহারাও দলে দলে শত্রু সৈন্যের উপর পড়িল ও জয়যুক্ত হইল।

রোমে জনরব উঠিল যে পথে বাহির হইলেই সিঁড়ারকে হত্যা করা হইবে। এই কথা তাহার কানে গেলে তিনি নিজ দেহরক্ষী সৈন্যদের বিদায় দিয়া একাকী অরক্ষিত অবস্থায় পথে বাহির হইলেন, হত্যা-সঙ্কল্প-কারীরা তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মনে করিল ইনি নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন।

যুবকেরা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে পায় পায় শত বাধা দোখতে পাইবেন, এই প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে মানসিক দৃঢ়তা তাহাদের বিশ্বাসী সঙ্গীরূপে থাকিয়া তাহাদের বাধা উত্তীর্ণ করা হইতে পারিবে। এমন অনেক সময় আসে যখন মানুষকে নিজ মানসিক অবস্থার অপেক্ষা অনেক দরিদ্র বেশ এবং নিম্ন শ্রেণীর কাজ আরম্ভ করিতে হয়, এইখানে চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে দারিদ্রের মর্মান্বাদনা এবং অপরের উপহাসের ফল বড় ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। স্বচ্ছন্দপ্রিয়তা এবং স্বাভাবিক কার্যে অনিচ্ছা মানুষের বহু মহৎ ভাবকে সুপ্ত রাখে, যদি এই দৃঢ়তা ও উদ্যম তাহাদের বিজয়ের পথে চালিতে না করে ত তাহা অমান সুপ্ত হই থাকিয়া যায়।

একটা ঘটনার উল্লেখ করি—এক যুবক ইংলণ্ডের এক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ছিলেন, এক উচ্চশ্রেণীতে তাহাকে ‘এ্যালজাব্রা’ শিখাইতে হইত, শিক্ষকের বইখানার সমস্ত আঁকই বেশ করা ছিল, শুধু একটা অধ্যায় তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, ক্লাশ ফ্রেনই সেই অধ্যায়ের দিকে আগাইয়া যাঠিতেছিল, তিনিও আঁকগুলি কষিবার জন্য বিপুল শ্রম করিতেছিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই ঠিক মিলিতোঁছিল না, ততশ হইয়া তিনি অপর একজন শিক্ষকের নিকট আঁকটি লইয়া গেলেন সে শিক্ষক কথাও দিলেন ঠিক কারিয়া দিবেন, কিন্তু সে দিন ক্লাসে সে অধ্যায় পড়াইবার কথা তাহার পূর্বদিন কিছুই না কারিয়া ফেরৎ দিলেন। শিক্ষক তখন কি করেন! ক্লাসে গিয়া তিনি আঁক কষতে পারেন নাই এ স্বীকার করা ছাড়া আর গতাস্তর নাই! এ বড় অপমানের কথা। চার মাইল দূরে তাহার এক বন্ধু ছিলেন তিনি খুব ভাল আঁক জানিতেন। স্কুলের পর বন্ধুর কাছে গেলেন, কিন্তু বন্ধু তখন বাসায় নাই এক সপ্তাহের পূর্বে তার ফিরিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, শেষ আশাও এই ভাবে গেল! নিরাশ চিন্তে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, পথে আসিতে আসিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন অকৃতকাৰ্য্যতার কি চূড়ান্ত নিদর্শন তিনি! “কি! এ্যালজাব্রার একটা সমস্যার সমাধান করতে পাচ্ছি না! ক্লাসে ফিরে গিয়ে আমার এই মূৰ্খতা দেখাতে হবে।” দৃঢ় সংকল্প এবং উৎসাহ তাহার চিন্তকে সজাগ করিয়া তুলিল, তিনি উচ্চৈশ্বরে বলিয়া উঠিলেন “আমি পারবো এ সমস্যার সমাধান করতে! আমি কষবো এ আঁক!” বাড়ী পৌঁছিয়া নিজ গৃহে গিয়া তিনি এত দৃঢ়তা লইয়া আঁক কষিতে বসিলেন—যে এ না হওয়া পর্য্যন্ত আহাৰ নিদ্রা কিছু নাই আজ। তিনি ক্লান্তকাৰ্য্যতা লাভ করিলেন, আঁকটি সম্পূর্ণ কষিয়া তার নীচে রাখিলেন “১২। ১৪ বার চেষ্টার পর ২০। ২৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া সেপ্টেম্বর ২—১৮—রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আঁকটি কষিতে সক্ষম হইলাম।”

একাগ্র সংকল্প ও উদ্যমে মানুষ বুঝিতে পারে যে কি মহাশক্তি তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। মানব-সমাজে অগ্রণী হইতে গেলে জাতির এই দুইটি গুণ বিশেষভাবে থাকা দরকার।

## ছোট বড় ।

—( আলোচনা )—

চোখ মুগ ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যে সংস্কারের আলোক ও বাতাস আমাদের বুকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে—এমন কি, অধিকাংশ স্থান বেদখল করে' ফেলেছে, তার নাম হচ্ছে কাব্য-সাহিত্য, তা, সে গল্প বা পাঠ্য যাতেই বিচিৎ হোক না কেন। কাব্য-সাহিত্য আমি তাকেই বলছি, যা' মানুষের হৃদয়-ধর্মকে বোঝে করে' আমাদের অশ্লীলিত বৃত্তি বৈচিত্র্যের আঘাতে সংঘাতে আন্দোলিত হ'তে হ'তে বৈচিত্র্যনার উপকূলে গিয়ে ভেঙে পড়ে;—যা' ঘটনার চেয়ে ভাবনাকে, যুক্তির চেয়ে মনন শক্তিকে, স্ক্রিয়ার চেয়ে ইঙ্গারাকে বেশী বেগবতী করে' যায়,—এক কথায় যা' বাহিরের চেয়ে ভিতরকে বা রসাত্মক বাক্যের চেয়ে 'বাক্যের আত্মা' এই রসকেই অধিকতর উজ্জ্বল করে' ধরে। এই কাব্য-সাহিত্যের আবার দ্বিগুণ বেশী আবিষ্কার করা যায়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রমথনাথ, শচন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গীতাত্মক-বাক্যের প্রতিভা-উদ্ভাবিত প্রণালী-বৈচিত্র্য তার নিজস্ব আছে প্রচুর; কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে সে-সবল কথার উল্লেখ চাই কি অনাবশ্যকও হতে পারে, কেননা, কালীপ্রসন্ন বাবুর অধা-নাটকীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি উক্ত লেখকবৃন্দের অসুস্থ ও নয় বা অতিরিক্ত ও নয়—অগত, তাঁর চিত্রণ প্রণালীর এমন একটি বলিষ্ঠ ও স্বাভা-স্বন্দর মনুষ্য-বস্তুক চিত্রণ রূপ আছে, যা পাঠকপাঠিকের ডেকে সজোরে বলতে পারে "মনস্তত্ত্ব-ব্যবসায়ীদের যুক্তি-যুক্ত রস-বিশ্লেষণ-কৌশল উপভোগ করবার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও একটু নেক নজর করে' গেলে সময় ঠেট হবে না।"

এই লেখকের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বর্তমানের মানব-বিস্তার-প্রধান রস-সৃষ্টির যুগ ইনি Sociologyকেই প্রাণের সমস্ত উদ্ভাপ দিয়ে বাবে দাঁড়িয়েছেন; অর্থাৎ সমস্ত মানব-পাতি এই ঐকান্তিক নিষ্কার ফল মানব-স্ব-দৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁকে অনুদারও করে' তোলেন। এটা বড় কম শক্তির পরিচায়ক নয়; কেননা, মানুষ সাধারণতঃ যে ক্ষেত্রে কাজ করে, সেই ক্ষেত্রের সত্যই তার কাছে অজ্ঞান হ'লে ঠাট্টা যে অজ্ঞান ক্ষেত্রের সত্যকে মান করে, থাকে এটাও প্রাকৃতিক সত্য,—আর এ সত্যকে যিনি যে পরিমাণে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম, সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃত র প্রভু।

'ছোট বড়'-সম্বন্ধ কথা কইবার আগে কেতাব-রচয়িতাদের প্রকৃত সম্বন্ধেও যে কথা কইতে হচ্ছে, তার কারণ, প্রসঙ্গান্তরে পূর্বেই বলেছি যে গ্রন্থের চেয়ে গ্রন্থ কতর দিকে আমার নজর পৌঁছে। বস্তুতঃ কোনো বই পড়ে বইটা কেনন হয়েছে তা' দেখার চেয়ে, তার রচয়িতার চিত্ত গঠন বিক্রপ তা, দেখাই সর্বপ্রাণে দরকার; আর তা' এইজন্তে যে আমাদের দেশে ছোট-মুখে বড় কথা শুন্তে পাওয়া একেবারেই আশ্চর্য্য নয়। সাধারণ রস-মঞ্চের চুস্তরিজ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মতন সাহিত্য-রচয়িতারও নবল দেব-দেবী আতক ল মুলত। 'ছোট বড়' সম্বন্ধে আমার পক্ষ থেকে সকল কথার প্রণয় ও প্রণয়ন কথা হচ্ছে এই যে একেতাবে লেখক বড় আশ্রয় নিয়ে অনেক ছোট কথা বলেছেন, কিন্তু ছোট মুখে কোন বড় কথা বলে' বুদ্ধিমানের পিাত চোঁয়ে দেন নি। এ গ্রন্থের ভাগা দেবী আলো-ছায়ার বরণ ডাঙা মাথায় করে' সাত গোড়া ভিন্ন জাতীয় যুগল-মুখিকে সাত পাকে প্রদর্শন করে' গিয়েছেন, আর সে মুখি সাতটি এই—

( ১ ) রাইচরণ ও মালতী, ( ২ ) কিরণলাল ও সাগরী, ( ৩ ) শঙ্করাম ও ক্ষেমকরী, ( ৪ ) ললিতকান্ত ও বিজয়া, ( ৫ ) মোহিত ও মীরা ( ৬ ) সুরপনাথ ও লীলা, ( ৭ ) মোহিত ও বেলা। এই সমস্ত যুগলের মধ্যে প্রথম তিন জোড়া ছোট তরফের, আর শেষ চার জোড়া 'বড়-বরের। অর্জুনকে ত্রীকূক্ষ উপদেশ দিয়েছিলেন

উপস্থাস—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

--“নরিদ্রান ভর কোন্তেয়, মা প্রজচ্ছবরে ধনম্”—কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁর মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি ঐ ‘ছোট’র ভরফে ঢেলে দিলেও ‘বড়’ ক্রিকেট এক চোখোমি করেন নি,—ধোঁষে-গুণে ছুঁদিকেই ঘটনার টেউ তুলে গিয়েছেন।

তাঁর রাইচরণ ও মালিনী, হৃদয়-সঙ্গমতার ভিত্তিভূমিতে কোমল ও কঠোরের নিপুণ বিমিশ্রণ যাক্ত আঁকা ছুটি স্বর্ণম্পর্শী চরিত্র। কিশোরাল ও সাগরীর মতন বৃদ্ধ-উজ্জল, সংযত, সরল তথচ Stage-free প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর জীবন্ত চিত্র দেখে লেখক মহাশয়ের হাতের তুলি কেড়ে নেবার লোক হয়। সব চেয়ে আমাদের আকৃষ্ট করে’ছ তাঁর ‘কেমব্রী-চরিত্র’ এবং আমার বিশ্বাস, এ-জাতী নিখুঁত ফটোগ্রাফের অন্তর্নিহিত অমল সৌন্দর্যটুকু চক্ষুমানদের দৃষ্টি সর্বাগ্রহে আকর্ষণ করবে,—এরূপ চরিত্রাঙ্কণ যে-কোনো শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর পক্ষেই গৌরবের কথা। বিজ্ঞানকে লগ্নক অন্তরভরা শ্রদ্ধায় মণ্ডিত করে’ এ-গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে দেবী-প্রতিমার মতন তুলে ধরেছেন,—প্রসূতিত ঘটনাপুঞ্জের ব্যত-প্রতিব্যত তাঁরই মর্ম্মস্থানে এসে তঃখ ও ককণা, মূর্খি ও জ্ঞানিতা, অসদর্পাই ও গার্মার ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে; এঁকে দেখলে মনে পড়ে রবান্দ্রনাথের সেই উক্তি—“মহৎ হৃদয় ছাড়া কাণ্ডারা সাহবে, জগতের মহাভঃখ যত।”

এই ঘটনাবহুল গ্রন্থখানির ফাঁকে ফাঁকে পল্লী ও সহরের নানাজাতীয় নিসর্গ-শোভা শাস্ত্র-লীতল ছায়া ফেলে নেমে আসায়, গ্রন্থ-পথযাত্রী চিত্ত-পথিক অনায়াসেই শ্রান্তিদূর কর্ত্তে পারে। পাত্রপাত্রীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার মধ্যে ফেলে লেখক মহাশয় “অবস্থা বুরে বাবস্থা” করবার নৈপুণ্য যে তা’বে প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁর বুদ্ধদানিতা, মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের স্বহৃদে ও আশাআকাঙ্ক্ষার কার্যাকাণ্ড-সম্বন্ধ কালীপ্রসন্ন বাবু যে কতটা তন্ন তন্ন করে’ দেখেছেন, তা’ শুধু ‘ছোটবড়’ কেন, তাঁর যে-কোনো কথাবেই উজ্জল হয়ে আছে। প্রাচীন ও আধুনিক কচির সমন্বয়-সামন-কল্পে তিনি যে একটি একাগ্রলক্ষ্য স্থির-স্থিত নানান গল্পে চালিয়ে যাচ্ছেন, তা’ কোনো বিষয়ের একদেশদশী মীমাংসার উপনীত হ’তে অনিচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য উঠবে।

আধুনিকের চোখে এ-জাতীয় রচনা প্রণালীর দোষ যা’ থেকে তা’ এই, যে এতে জায়গায় “অনেক কথার একটুখানি” বলা হয় এবং তাতে পাঠকের বৈধীচ্যুতি ঘটে। কিন্তু উত্তরে কালীপ্রসন্ন বাবু অনায়াসেই বলতে পারেন যে তিনি সাধারণ পাঠকের চিত্তোৎকর্ষ-বিধানের জন্যেই তাঁর সুশিক্ষিত লেখক জীবনটী উৎসর্গ করেছেন, স্তবরাং মনোব্রাজ্যে ভ্রাম্যমান নয়নারীর বিচারে যা’ দোষাই বলে’ গণ্য, তাঁর উদ্দেশ্যের অণুকূল তাই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট গুণ,—কেননা সাধারণ পাঠক সূচাগ্র-তীক্ষ্ণ অশ্রুভূমির অধিকারী না হওয়ায় “অল্পের মধ্যে অনেকখানিকে” বাগাৎ করে’ উঠতে পারে না। বলা বাহুল্য, তাঁরও জবাব নিখুঁতই হবে; তা’ ছাড়া, আমাদের রচনাদি যে সকল মানস-মহলে বার্থ হয়, তাঁর সৃষ্টি যে সেখানে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে থাকে, আমি নিজেই তাঁর একজন পাকা সাক্ষী। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ও প্রাবেশিনী, যাঁরা পাছে মজলা হয় এই মেধাক্ক আশঙ্কায় আমার লেখা untouched by hand রেখে যান, কালীপ্রসন্ন বাবুর ৭১ বা অন্য রচনা পেলে অকণ্ট অবস্থায় ফেরত দিয়ে যাওয়া যে দরকার মনে করেন না, তা’ আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি।

সে যাই হোক, ‘ছোটবড়’-রচয়িতার অস্বীকৃত ব্রত যে বঙ্গীয় সমাজের একটি প্রকাণ্ড দিকের পর্দা তুলে নবকটম্পর্শ পাঠক ও লেখকের চক্ষে এতটা নূনতর ideal realistic জগত চিত্র খুলে ধরবার দায়িত্বভার সগৌরবেই বহন করে’ চলেছে, এতখানি চোক্ত-পোখ বলা খেতে পারে।

ঐতিহ্যকৃষ্ণ ঘোষা

## গ্রন্থ-সমালোচনা

ভাষা ও সুর।—ঐশ্বর্য আন্তরিক মুখোপাধ্যায় বি-এ, প্রণীত ও ১নং তাঁতিবাগান রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত। আকার ১৬ পে: ১৬৩+১১/০ পৃষ্ঠা; ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্য পূর্ব কাগজের বাধাই ১ টাকা।

ঐশ্বর্যকর ভূমিকায় সমালোচকের কলম হাতে তুলিয়া লইয়া লিখিয়াছেন—“ভাষা ও সুর” একখানি গীতি কাব্য—কল্পিত পুরুষ কবিতার সমষ্টি মাত্র। কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আবেগ ও একটা প্রবাহ আছে যিস্মি আবার বিশ্বাস।—তবে হৃদয় যখন কাঁদিয়া উঠে, \* \* \* আমাদের বাহ্যজ্ঞান আর লুপ্ত হইয়া যায়, এবং সেই হিসাবে এই কাব্যের হৃৎ একটি কবিতার স্থানে স্থানে একটু আধটু ভাষায় ছন্দে ও মিলের দোষ পরিদর্শন হইবে। “হৃৎ” একটি মুদ্রাক্ষর প্রমাদ রহিত গিয়াছে।” লেখকের এই সত্য উক্তিই আমাদের প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই!—

“কিছু নাই, কিছু নাই, শুধু চাই, শুধু চাই,  
ছাট হয়ে যায় জীবন যাবন      ছাই হয়ে যায় মানবের মন,  
ছাই হয়ে যায় প্রণয় রতন,      কেঁদে কেঁদে ছুটে যাই!—  
যাটা ছিল খাঁটি হয়ে গেল মেকি!—      প্রাণ কেঁদে বলে,—হায় হ’ল একি?  
খেতে হয় তাই খাই, (?)      কিছু নাই, কিছু নাই!”

কবিতার নমুনা। লেখক কৃতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট,—তাঁহার নিকট আশার বাণীই আমরা আশা করি, তা না দিন দিন কেন দেশের আশা, উন্নতি শিক্ষার কল যাহারা, তাঁহারা দিন দিন এমন হতাশ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন! কবি মনঃক্লান্ত হইয়া উদাস-প্রাণে—

“বাক্ বাক্ সব চলে যাক্!  
বাক্ স্নেহ, বাক্ আশা, বাক্ ফুল, বাক্ পাতা, (?)  
হ’ক্ ধরা জলে পুড়ে থাক!  
\* \* \*  
বাই আমি, বাও তুমি, তোমারে পেছ না আমি  
এ জীবনে আর।—

বড় ভূষা, বড় ভূষা,      চারি দিকে মরুভূমি  
অনল অনল চারি ধার—”

বিভীষিকা যেখিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন—“গাঠন ধ্বংসের গীতি” তিনি জানেন যে—

“যে গীত মিশিয়া যাবে ধ্বংস-কোলাহলে

মোরে লয়ে ক্ষণেকের পরে।”—জানিয়া শুনিয়া এ

“প্রাণের এমামের উচ্ছ্বাস” প্রকাশ করিলে সংসারের অপকার ব্যতীত উপকার আর কি আজকাল অনেক শেখ-বুনি অনেকের মুখেই শুনিতে পাঠি,—কবি কলম ধরিয়াই “তুমি সখি মোর; হোঁহে হোঁহা বরি হাত, নাহি-করি দৃকপাত চলব কেবল” \* \* \* “যে

এই বাক্য মাকে রাণি, চুবন দিবে!",—“অপূর্ব (!) আনন্দেরে হুঁটি প্রাণ ভেসে যাবে—মৃদব নয়ন!” ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়া কলেন। শিক্তি তাঁহারা, নিজে বুঝেন ও জানেন সমস্তই, তাঁহাদের উক্তি কতদূর সমীচীন—

“কি বলিতে কি যে বলি শুধু মর্মে মর্মে জলি,

পাগল হঠক্ মোর বাকী কি আঁর” আর না!—

—কবির ভাষা ও ছন্দে বেশ প্রবাহ বিভ্রম; তাঁহাদের একরূপ শক্তি আছে—তাঁহারা খেয়ালে, তাহার অপব্যবহার করিলে বস্তাবকই দুঃখ হয়।

তুবার।—কবিতা-গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীমুরেশ্বনাথ সেন। ৪২ জর্জ টাউন, এলাহাবাদ চট্টতে শ্রীমন্ত-কুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ‘ইণ্ডিয়ান প্রেসে’ মুদ্রিত। আটপেপারে পরিপাটি ছাপা। ১৬ পেঃ ৫০ পুঃ কুমার কাগজের কতায়। মূল্য উল্লেখ নাই।

‘তুবারে’ও প্রেমিক-প্রেমিকার বা কবীত্বের ‘মানস-সুন্দরীর’ প্রেমের খেলা, নানা ভাবে, নানা স্থরে তাহার বিকাশ-চেষ্টা; সেই অল্পপক্ষে স্বরূপে পাইতে কবি আকুল হইয়া ফিরিয়াছেন!—

“খুঁজিয়াছি তোমা কত জনতার মাঝে মোহাক ভেবেছি, তব পেরেছি সন্ধান;  
সখ্যতার গ্রন্থে বধা জনের বিরাজে, ভেবেছি, দেখেছি তব লাভকা-বিতান;  
বেধার পিতার পুণ্য জননার মেহ শতেক গরুর তুলি স্পর্শেছে হিয়ার;  
জ্যোৎস্নার আবছারে হয়েছি সন্দেহ অঞ্চলের অন্তরালে দেখেছি তোমার।”

কিন্তু অল্পের রূপ চর্য চক্ষুতে পড়ে নাই। “পাইনি দেখিতে তোমা—বুঝি আকর্ষণ!”

সেই আকর্ষণ কবি মুগ্ধ। আশার কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

“বারেক বদি গে পার আমার মথরে দাও, ভগো, দাও তুমি একটা ফুংকার  
শিরির জাগিবে পক্ষী হৃদয় পিঞ্জরে গলিবে চিম্বাচি শিরে আবদ্ধ তুবার।”

ভুল ভুল! আঁক তুমার ক ফুংকারে গলে? তুবারকে গলাইতে হঠলে উত্তাপ চাই, ফুংকার নয়! বুধে ভুল বলিলে হইবে না—

‘ভগো আমি সেই গান সেই গান চাই

যে সঙ্গীতে সারা গোড় মাঠাল নিমাই, যে গান মথিত হ’ল ব্রজের গোকুলে।”

সে যে বড় সাধনার কল! অসার স্বরূপ কথা! ‘চাই চাই’ রবের স্থান, অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় উক্তি স্থান কথায় কোথা? “সে বড় বিষম ঠাই। শুক শিষ্যে ভেদ নাট।” সংযমে, আত্ম-স্বত্বতে, বিশল আনন্দের অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দ বিড়ার যে তাহার বন্ধেই না তাঁহার প্রকাশ-জীবে জীবে তাঁহার বিভূতি দর্শন—সাম্যের

মৈত্রীর ভাব,—প্রেম,—তখন না—প্রাণের প্রার্থনা—

গো আমি সেই গান, সেই গান চাই, আর্ঘ্যে ও অনাৰ্ঘ্যে হবে জাতীর বন্ধন  
নাই বণ ভেদ, সারা কাল নাই সমস্ত মানবে এক সাম্রাজ্য রক্ষণ।”  
বনে তাহা সার্বক করন।





# পরিচারিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“তে প্রাপ্তবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

{ ক্রীষ্ট, ১৩২৬ সাল। }

৭ম সংখ্যা।

দরবেশ।

—ঃ\*ঃ—

দ্বার খোলো ওগো, দ্বার খোলো ওগো,  
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—  
ঘরছাড়া মোরে যে করিল ওরে  
তারি ঘর খুঁজি দেশদেশ ;  
গিরিদরীবন ভ্রমিয়া বেড়াই,  
মনের মানুষ মিলিল না ভাই.  
আলেক্সার প্রায় লুকালো কোথায়,  
সন্ধান নাহি হল শেষ।

কত দিন মাস, বরষ বরষ,  
কত যুগ গেল বৃথা হায়,  
স্নেহনীড় ছাড়ি' ছু'পাখা পসারি'  
বিঃদ্র ভাসিল নীলিমায়;—



কোথায় হারাল ধরণীর কোল,  
 বনবীথিকার স্নেহ-হিম্মোল,  
 পিয়াসার জল মাগি অবিরল  
 বিফলে অসীম অজানায় !

কোন নিষাদের বংশীবাদন,  
 কোন রাখালের বেণুতান,  
 মনোহরিণীয়ে ভুলাইল ধীরে,  
 গোপীয়ে করিল আনচান ?—  
 বিসরি' শ্যামল শোভাসস্তার  
 মরুবালাকায় একি হাহাকার !  
 কবে যমুনায় টুটে যাবে হায়  
 অভিসারিকার অভিমান ?

ঘর হল পর, নিকট হৃদয়,  
 মিলিল না তবু অবকাশ,  
 পথ চলি' হায় পথ না ফুরায়,  
 বৃথা খুঁজে মরা বারমাস;  
 পায়ে ছিঁড়ে এশু স্নেহের বাঁধন,  
 ভেঙাগিয়া গেহ, প্রিয় পরিজন,  
 তবু শেষ ঠাই মিলিল না ভাই,  
 একি গো নিষ্ঠুর পরিহাস !

—বিদায় বিদায় হে গিরি কানন !  
 হে নদনিবাস গীতিময় !  
 ফিরিশু আবার আঁচলে তোমার  
 ওগো পুরাতন লোকালয় !  
 বাহিরের আলো-রাগিণী-লীলার  
 ইজিত খুঁজি' হারাইশু হায়,  
 মানবের মাঝে বুঝিশু বিরাজে  
 চিরমানবের পরিচয় ।

ঘার খোলো ওগো কে আছ ভবনে,  
 দুয়ারে দাঁড়িয়ে অনিমেষ  
 হের গেহহীন স্বপ্নন বিহীন  
 কুণ্ঠিত দীন দরবেশ ;  
 মনের মানুষ কোথায় আমার,  
 সন্ধান হেথা মিলিবে কি তা'র ?  
 মিটিবে কি আজ প্রাণের পিয়াস ?  
 বৃথা পথ-চলা হবে শেষ ?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

## ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-সমস্যা--

স্বদেশী শ্রীযুক্ত লাল লাক্ষপত রায়ের অভিমত।

বর্তমান এপ্রেল মাসের ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রে শ্রীযুক্ত লাল লাক্ষপত রায় মহোদয়ের “National Education” শীর্ষক জাতীয়শিক্ষা স্বদেশীয় আর একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থ তাহার অনুবাদ।

( ২ )

জাতীয়-শিক্ষা স্বদেশী তিনটি অভিমত আমার সমক্ষে বিদ্যমান। প্রথমটি শ্রীমতী এনি বেনাঙ্কের, দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলকের ও তৃতীয়টি সার রাসবিহারী ঘোষের। তন্মধ্যে, নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে গেলে, মাত্র প্রথমটিতে বিষয়োপযোগী গবেষণা বর্তমান; সুতরাং সেইটিরই আলোচনা প্রথমে করা যাক। শ্রীমতী বেনাঙ্ক বলিয়াছেন “বৈদেশীক অনুশাসনে, বৈদেশীক আদর্শে যে জাতির সম্ভ্রানগণের শিক্ষা ব্যবস্থিত, সে জাতি যত দ্রুত পুরুষহীন ও তাহারা জাতীয় চরিত্রে বৈরূপ অসার দুর্বল হইয়া পড়ে এমন আর কিছুতেই নহে। ১৮৯৬ খৃঃ হইতে আমি বরাবর ভারতবাসীকে জেনের সহিত ভূ-স্বাতন্ত্র্য বন্দিয়া আনিতেছি যে, তাঁহাদের সম্ভ্রানগণকে যে প্রণালীতে যে শিক্ষা দান করা হইতেছে তাহা জাতীয়তার বিরোধী ও আত্ম-ধ্বংস-বিনাশকারী! বৈদেশীক আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, বৈদেশীক পোষাকপরিচ্ছদ, বৈদেশীক হাবভাব রীতিনীতি দেশ-বিদেশে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে মণ্ডিত করিয়া, মিশনারী বিদ্যালয়ে বিদেশীয় ভাষায়, একরূপ ভাবে বাল-কন্যে বর্ষিত হইলে, তাহার উর্বরতার আশা আর কোথায়? একরূপ শিক্ষার ব্যতীকর প্রকৃতিগত-আত্মধর্ম্মটি পর্য্যন্ত যে সত্ত্বাহীন হইয়া তাহার জাতিপ্রাণতাকে কীর্ণ হইতে কীর্ণতর করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

শ্রীমতী বেনাট শিলা সমস্যা সমাধানে আরও অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—“আমাদের জাতীয় শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত ?” এবং ইহার উত্তর তিনি নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করিয়াছেন।

( ১ ) “ভারতের জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতবাসীর দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের কর্তৃত্বে তাঁহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া অত্যাৱশ্যক ! ভারতের যাহা বিশেষত্ব সেই ঐকান্তিক ভক্তি আদর্শ, জ্ঞানবাদ ও তাগার নীতিসূত্র, ভারতীয় ধর্মের মূল-সত্তা,—সর্ব বস্তুতে ঐশিক-শক্তির অনুভূতি,—সর্বপ্রকার সম্প্রদায়িকতা হইতে বিরুদ্ধ করিয়া জাতীয় শিক্ষার মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য। তাহার মূল ভিত্তি হইবে,—প্রশস্ত-উদার, সংনীল-নমনীয়, সর্বভূতপ্রিয়াক্ষক। সে শিক্ষা সর্বত্রই মানিয়া লইবে—সমগ্র মানব সমাজের গন্তব্য-লক্ষ্য ভগবান,—পথ বিভিন্ন,—লক্ষ্য এক, সকলকে পৌঁছাইতে হইবে আশ্রয়-আশ্রিতে। স্বীকার করিতে হইবে—সকল সাধু সিদ্ধপুরুষ ( prophets ) তাঁহার প্রেরিত, তাঁহার বাণী প্রচার করিতে অবতারণা হইয়াছিলেন।”

( ২ ) “জাতীয় শিক্ষাকে প্রদীপ্ত উজ্জল শ্রাব্য স্বদেশ-প্রেমের আবহাওয়াতে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস আলোচনা দ্বারা, এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলাদি শূকুমার-বিদ্যা, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, উপনিবেশ-সংস্থাপন বাণিজ্যবাবগা প্রভৃতি যুগোচিত সর্ব কার্যে ভারতবাসীকে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া সেই প্রাণ-বায়ুকে স্বাস্থ্যদায়ক নিশ্বাস মধুর করিয়া রাখিতে হইবে। ধর্মশাস্ত্রের সহিত অর্থশাস্ত্র ও তুল্য ভাবে অধ্যাত হইবে। ধর্মালোচনার উৎসাহে বিজ্ঞান ও রাজনীতিকে বিস্তৃত হইলে চলিবে না।”

( ৩ ) “জাতীয় শিক্ষাকে গৃহশিক্ষা হইতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সমস্ত পণ্ড হইবে। একের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ও মূলতত্ত্ব অন্যের সহিত ওতপ্ৰোত ভাবে মিলিত হওয়া চাই। পারিবারিক জীবনের বহির্ভাগে পোষাকী জাতীয়তা,—গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিতে হইবে। কলেজের অধ্যাপক, ইন্সট্রুর শিক্ষক গৃহের উপদেষ্টাগণের সহিত একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিবেন।”

( ৪ ) “জাতীয় শিক্ষাকে প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয় ধাতুতে গঠিত করিয়া জাতীয় স্বভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে নূনাত্মিক পরিমাণে ইংলণ্ড বনিয়া গেলে চলিবে না—ভারতকে ভারতের নিখিলত্বে (into a mightier India) অত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বৃটনের আদর্শ ইংরেজের পক্ষে কল্যাণকরী কিন্তু ভারতের মঙ্গল ভারতীয় আদর্শে! আমরা প্রতিধ্বনিকে প্রার্থনা করি না ( বিদেশীর সহিত ) সমস্বরতা ( monotony ) আমাদের কাম্য নহে, নিম্ন ঐক্যতানে প্রকৃতির ও পরমেশ্বরের বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ আমাদের জাতীয়তার একত্বের মধ্যে যাহাতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহারই বিধি বিধানই আমাদের করণীয়। প্রকৃতি কি একই বর্ণে, একই প্রকার বৃক্ষ লতার, পত্র পুষ্পে, সরিৎ সাগরে, পর্বত প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে আত্মপ্রকাশ করেন? মূলের বৈচিত্র্য বিকাশেই পূর্ণসত্তার প্রকাশ,—‘একমেব’ একত্ব নহে। ভারতের পক্ষ হইতে দোষাশালনার্থ পক্ষ সমর্থনের জন্য ওকালতীর আবশ্যকতা নাই, ভারতীয় ধরণধারণের, দীর্ঘনীতি ও পরম্পরাগত প্রবাদ কিংবদন্তির অমূল্য কৈফিয়ৎ দেওয়া নিম্প্রয়োজন,—ভারতের নিঃস্ব ভারতওই—তাহার প্রমাণ জগতে হইয়া গিয়াছে,—পক্ষ সমর্থন প্রচেষ্টার আর আবশ্যক? যে দেশের অতুল সৌন্দর্য্য সম্ভারের ভিতর দিয়া ভগবান স্বয়ং যে দেশের স্রষ্টাজন চিত্তে আদিত্যে আত্মবিকাশ করিয়াছিলেন, সে দেশের জাতীয়তার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণার দরকার?”

শ্রীমতী বেনাটের এই অভিমত প্রকাশের ভাষা কি হৃদয়গ্রাহী, প্রত্যেক দেশনায়কের মনোমদ! কি ওজস্বীকার, কি উৎসাহবর্দ্ধন, কি মানসিক নিশ্চলতা সাধনে, তাহা অদ্বিতীয়! আমিও নিজে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া

প্রত্যক্ষ করিয়াছি ইহা কিরূপ ফলপ্রসূ! \* \* \* শ্রীমতী বৈশাখের উদ্দেশ্যে আমাদের,—ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার অঙ্গ হইল কি? তিন খ্রিস্টাব্দিকাল সোসাইটি ও বারানসীর হিন্দু কলেজ সম্পর্কে যেসকল অক্লান্তভাবে ও আন্তরিকতার সহিত কাৰ্য্যাহুতান করিয়াছেন এবং ভারতের স্বরাজ স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রই ভারতবাসীর হৃদয়ে গভীর প্রভাব উদ্ভূত হয়। সুতরাং এরূপ প্রভাবের উক্তি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে হইলে তাহা বিশেষ বিবেচনা ও প্রকার সঙ্গিত আলোচিত হওয়া উচিত। সেই ভক্তি-আনন্দ হৃদয়ে গভীর প্রভাব সহিত, তাঁহার মতবাদ আলোচনা করিয়া আমাদের যদি বলিতে হয়, আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, তাহা দোষাবহ হইবে কি? তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করেন না—কেহ অন্ধ-ভক্তের মত, তাঁহার মতবাদের অনুসরণ করে! সন্নিবন্ধে অপ্রাস্ততার দাবীও নিশ্চয়ই সে মনস্থানী রাখেন না।

ভারতীয় জননায়কের কর্তব্য অতি কঠোর! তাঁহাদিগকে এমন একটি মানবসংজ্ঞার জাতীয়তার বিধি-বিধান ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইতেছে, বর্তমান সময়ে যাহার পারবর্তন, পরিবর্তন, গ্রহণ পরিবর্তনে গঠনের সুগ! সুবিবেচনা ও শিক্ষাই সুগঠনের মূল! সুতরাং শিক্ষাই আমাদের জীবন-মরণ-প্রশ্ন-সমাধানের আদিকথা, সর্ব-সময়ের প্রধান সমস্যা—জাতীয়তার ভিত্তিভূম! কাজেই শিক্ষাসম্বন্ধে কোনও উক্তি—তাঁহার শিক্ষা, পরিণাম ও প্রণালী ‘যবৎ-ভাবে’ বিশেষ-বিবেচনার বাহিরে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আমাদের ভবিষ্যত, শিক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে! অতএব আমাদের সম্পূর্ণ মানসিক বল, যাহার যতখানি শক্তি, প্রাজ্ঞতা, স্থির-বুদ্ধি যৌতাবে এই শিক্ষা-সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করা উচিত! হঠাৎ যেন কাহার (কু) সংস্কার বা ভাব-প্রবণ হৃদয়বৃত্তিতে চালিত হইয়া বিপথগামী না হয়! ইহার প্রত্যেক দিকটা গভীর গবেষণা এবং সমাধিত ও তুলনামূলক চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত, পরীক্ষিত হইয়া গৃহীত হওয়া আবশ্যিক! আলোচনা-অনুপেক্ষ-ক্রত-সিদ্ধান্ত ভাবপ্রবণ বা সংস্কারবদ্ধ হৃদয়ের সমাধান আমাদের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত না করুক, তাহাতে যে উন্নতির গাও হাস করিবে তাহা ঐব সত্য!

জাতীয় অস্তিত্বের এখন তরল অবস্থা! ইহার গঠন বিশেষ বিবেচনা ও বিচক্ষণতা সাপেক্ষ। যোমের জ্ঞান ইহাতেও ছাপ অতি সহজে সত্ত্বর অঙ্কিত হইবার কথা! জন-সাধারণ যাহাদিগকে নেতৃত্বপূর্ণ মানিয়া লইয়াছে যাহাদিগকে ভক্তি করে ও ভালবাসে তাঁহাদের মতবাদের-ছাপ তাহারা অন্যায়সে নির্বিচারে গ্রহণ করে! কোন ধারণা রীতি-নীতি জাতীয়জীবনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠা হইলে, তাহা নিশ্চল করা সহজ নহে; \* \* \* সেই হিসাবেই এই প্রবন্ধের অবতরণা—মারাত্মক সমালোচনা বা বক্তৃতা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

( ৩ )

আমাদের জাতীয় আদর্শ কি, তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা সর্বপ্রায়ে আমাদের হওয়া উচিত। এই নিখিল সভ্যজগতের (Civilized world) অবিহিত অটুট অংশ রূপে, আমাদের দেহ ও মনের কাষা দ্বারা, সভ্যতার অধিকতর পরিপূর্ণনে নিযুক্ত থাকাই কি আমাদের জাতীয়তার আদর্শ? অথবা আমরা অন্ত সকল বৈদেশীক জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, একক, আপনাতে আপনি আত্ম-জাতীয়-উন্নতি সাধনকেই জাতীয়তার লক্ষণ বলিয়া মনে করি? অবশ্য আমরা শাসন-প্রণালীতে-স্বাধীনতা, অর্থনীতির বিধিবিধানে-অধিকার, জাতীয়তার একতা,

পরস্পর স্মৃতি-সমপ্রাপ্ততা ও ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা, সকলেই প্রার্থনা করি কিন্তু তাহার পরিণাম কি ? ইহারা কি আপনারা আপনাতেই সীমাবদ্ধ ? না—অন্ত কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য, পরিণতির উপায় স্বরূপ ? যদি তাহাই হয়—তবে সে পরিণতি কি ?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন ‘মোক্ষ’ই আমাদের লক্ষ্য ও প্রার্থিত বস্তু ! মোক্ষ অর্থে কি ? ইহাই কি বৌদ্ধ ধর্মের ‘নির্বাণ’, বৈদান্তিকের পরমাত্মায় জীবাত্মার সমাধি অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষণিক পূর্ণানন্দ কিম্বা খ্রীষ্টানদের মুক্তি বা গোড়া মোস্লেম সম্প্রদায়ের ‘স্বর্গ’ ? অথবা সমস্তই ইহার ‘ত্রাস্তি’ ! প্রকৃত মোক্ষ,—মুক্তি বা স্বাধীনতার মতবাদে নহে—দুঃখ-দৈন্ত, রোগ-শোক, অজ্ঞান-অবিজ্ঞা, সর্ব প্রকার দাসত্ব ইহাতে বিযুক্ত অবস্থাই ‘মোক্ষ’—তাহা কেবল আমাদের নিজেদের নহে—আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের পক্ষেও । ভারতে এমন ধর্মের অভাব নাই—যাহার মতে মুক্তি—পারত্রিক নিত্য-সুখ লাভের একমাত্র উপায় কৃচ্ছসাধন ; দুঃখ-দৈত্যাদির মধ্যে দিয়াই পারলৌকিক পূর্ণানন্দ অর্জনের নিদেয় ; প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্মগুলির যেকোনও এই কৃচ্ছসাধনের দিকে ! দুঃখ-দৈন্ত রোগ-শোকাদিকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর ব্যাপারে ভারতবাসী যেকোনও সহিষ্ণুতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না তাহাদের সকলের লক্ষ্যই মুক্তি বা নির্বাণে—ত্যাগের দ্বারা পরানন্দ অর্জনে ? কিন্তু ইহাও ঐক্যবস্তা যে আমরা নিজের বা সন্তান-সন্ততির জন্য কেহই দুঃখ-দৈন্ত, রোগ-শোক, অজ্ঞতা-অধীনতা ইচ্ছা করি না ! হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই এ বিষয়ে এক মত ! ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ, স্বাস্থ্য ও জ্ঞান অর্জনই যে ইহলোকে সুখ লাভের একমাত্র উপায় ইহা প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্মমত-সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লালসিত । ‘মহুগের’ অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্মপ্রবৃত্তি এই দিকে । কিন্তু আজও জগত ইহাতে তথাকথিত সিদ্ধ, পুরোহিত, যাজক, সমাজসংস্কারক তিরোহিত হয় নাই—বা তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে না বাহারা সর্বকাণ্ডের অন্তঃকালে অবস্থান করিয়া সকলকে বাঁধিতে চাহিতেছেন আপন-আপন মতে ;—এবং সুবিধানত প্রকাশ্যে বাহিরে আসিয়া প্রচার করিতেছেন অনিত্যতার বিষময় মতবাদ !

বৈরাগ্য বা ত্যাগের-দারিদ্র্য আজও ধর্মের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া আছে । সন্ন্যাসী, দরবেশ এবং মঠধারীগণ আজও মহুগের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ! এমন কি বিজ্ঞ ও উদার সংস্কারকগণ পর্যন্ত ইহাদিগকে ভক্তি-প্রজ্ঞা করেন । আমরা সন্ন্যাসীদিগকে ধর্মজ্ঞ ধর্মাত্মা বলিয়া মান্য করি, কাজেই ভাবপ্রধান মন তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে । সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যে অনেক আধুনিকভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেরা সন্ন্যাস-জীবনের ধার একটু না ধারিলেও সন্ন্যাস ধর্মের উপদেশ এবং আদর্শ দেশের যুবকগণের মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন ।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি মনোজ্ঞ স্থল ও মহান মূলমন্ত্র দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সেই সেই ধর্মাম্বুরাগীকে ( সন্ন্যাস বা ব্যক্তিকে ) জীবন-আহবে ধ্বংসস্থ হইতে রক্ষা করে কিন্তু ধর্মোপদেশের বা জাতীয় সাহিত্যের অধিকাংশই জীবনের অনিত্যতা পরিবর্তনশীলতার উপরই জোর দেয় ও আপামর সাধারণ, ধর্মতথ্য সেইভাবে বৃদ্ধিতে চায় । জীবনের উদ্দেশ্য,—পরিবর্তনের মধ্যেও যে পরিবর্তনের সম্ভাব্য বর্তমান—সে কথা সে সঙ্গে অনুধাবন করিতে তাহারা বিশ্বস্ত হয় !

পূর্ণজ্ঞানই মুক্তি,—ইহাই উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্মের শিক্ষা । কেবল অধ্যয়ন বা ধর্মসাধন-বিধি অন্ধরে-অন্ধরে পালন করিলেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না । জীবনের প্রত্যেক দিক অনুশীলনে, পরিচর্যায়—মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ ;

যিনি জ্ঞানে, ধর্মে, সামাজিকতা, লৌকিকতায় চৌকশ, ধীর সংযত, তিনিই না বৃদ্ধ,—পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী। চিত্ত তাঁহার পূর্ণস্বায় নিবদ্ধ, তাঁহার চক্ষে নিখিল বিশ্বের কিছুই পরিত্যজ্য নহে; তিনি সংসার ছাড়া নহেন। সামাজিক প্রত্যেক কন্তব্য, পুরাঙ্গস্তর তাঁহার করণীয়, সংসারের আচার-বাবহার, রীতি-নীতি, দায়িত্ব, দায়াদ, কুটুম্বিতা সমাজের অবস্থা-বাবস্থা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা, সংসারে বাহ্য যাহা শিক্ষণীয় জ্ঞাতব্য, পূর্ণজ্ঞান অর্জন করিতে হইলে তাঁহার প্রত্যেকটির অনুশীলন ও আশ্রয় করিতে হইবে। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে না তাঁহার, জীবনের একটা দিকের উৎকর্ষতা সাধন উদ্দেশ্যে অপর কোন আর একটা অংশ পরিবর্জনের অধিকার,—সাংসারিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা যিনি অর্জন করিয়াছে, তিনিই উগা বর্জন করিয়া, জীবনের অপর উদ্দেশ্য সাধনে অল্প আশ্রম গ্রহণ করিবার ইচ্ছাদার। পুরাকালের বিষয়-বাসনা ত্যাগের মূল ঐশ্বর্য্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন ও দারিদ্র্যের গরীমা প্রচার নিহিত ছিল না, জীবন-নাটকের বিশেষ অঙ্কে বা বয়স বিশেষে বিষয়-বাসনা ধন-আকর্ষণ হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া মনপ্রাণের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ, সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবানে পূর্ণ আশ্রয়-পূর্ণই সে বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য ছিল! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে সন্ন্যাসীর উল্লেখ নাই; তৎকালীন শাস্ত্রকে সন্ন্যাসধর্ম্মাত্মকুলে ব্যাখ্যাত করিতে হইলে যথেষ্ট টানিয়া-বুনিয়া করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, আদিকালে প্রত্যেক মুনি-ঋষিরই অর্থবিত্ত বর্তমান ছিল; পরিবার পরিজন সহ তাঁহারা বসবাস করিতেন। সত্য বটে তাঁহারা কোলাহল-পূর্ণ জনতা, নগর হইতে দূরে অবস্থান করিতেন,—তাঁহা সংসার ত্যাগ হইয়া নহে,—সংসারের উপকারার্থে। শাস্ত্রারম্পদ আশ্রমে নিরিবিলি বসিয়া, যোগ-সমাধিতে আত্মস্থ হইয়া, জীবন ও আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম নিরূপণ, জগতের, বিশ্বমানবের, জাতির, দেশের অশেষ কল্যাণ চিন্তায় ধ্যানস্থ থাকিতেন। অনিন্দিতা পরিখুঁট করিয়া তুলিতে তাঁহাদের চেষ্টা ছিল না—তাঁহাকে যাহাতে জয় করিয়া শাস্ত্র বস্তুর সাক্ষাৎলাভ ঘটে তাহাই ছিল তাঁহাদের চিন্তা গবেষণার মূল। তাঁহাদের শেষ, লক্ষ্য নহে;—লক্ষ্য শেষ সীমায়—চরম-পরিণামে—মানবিকতা, সামাজিকতার পূর্ণ-পরিণতিতে!

মুক্তির আশাতেও তাঁহাদের সে সাধনা নহে,—জীবনসমস্তা সমাধানে মনুষ্য-সত্ত্বকে সাহায্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য! আত্মস্বার্থ হইতে পরার্থই ছিল সে সাধন-আদর্শ! কালে তাঁহাদের জীবনের সেট সুমহান উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝিয়া, পরার্থ সাধনে আত্মোৎসর্গকে ত্যাগ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিল। ত্যাগই হইল তখন তাঁহাদের চক্ষে পরম গরীমাময় আদর্শশীর্ষ,—মানবজীবনের সার্থকতা—অকূল অন্ধকার জীবন-সাগর-বক্ষে আলোকমঞ্চের শিরোস্থিত পথপ্রদর্শক আলোক-রাশি! আদর্শ! সত্য বটে জাতির অতি অল্প লোকই ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ-প্রয়াসী, কারণ ও-মানবধর্ম্ম প্রতিকূল আদর্শ, জীবনে প্রতিপালন করা ত সহজ নয়! সুতরাং অনেকেই এই কামা-বস্তুটিকে নিজ জীবনে লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও দশমূলে এই সন্ন্যাস ও ত্যাগ-মহিমা প্রচার করিয়া কৃতার্থ হয়, সংসারকে অনিন্দ্য বলিয়া সাধুতা জানায়,—ভাবটা যেন এমন—যদিও বক্তা স্বয়ং ( ঘোর ) সংসারী কিন্তু মনের অবস্থা যেন তাহার এমন ( কথার ) যে অল্পে বিশ্বাস করুক—তাঁহার সন্ন্যাসী বনিত্তে আর বেশী দেরী নাই। এমন প্রচারের নিশ্চয় তত্ত্ব, মাহুষকে ‘সাধু’ সেবার অনুরক্ত করিয়া তোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভৌতচিন্তে আমাদের বলিতে হইতেছে—এ প্রবৃত্তি কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—আজকালকার মহম্মদী ও খ্রীষ্টিয় প্রচারক-প্রবরদের সম্বন্ধেও নূন্যাদিক পরিমাণে একথা খাটে! অনিন্দ্যবাদ-সংস্কার একরূপে আমাদের হাড়ে-মাংসে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল যে পৌত্তলিকতাবিধ্বংসপ্রয়াসী ( iconoclastic reforming agencies ) ‘আর্য্যসমাজ’ ‘ব্রাহ্মসমাজ’ এবং বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের পর্য্যন্ত এই অনিন্দ্যবাদের দিকে কোঁক।

তীহাদের স্তোত্র, সঙ্গীত ও প্রার্থনা এই ভাবে পূর্ণ! এমন কি হংরাঙ্গী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় স্বভাবের প্রধান স্থান ব্যাপিয়া আছে এই নশ্বরবাদ, নাস্তিবাদ; (negation) আমাদের ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা নশ্বরতা নহে—একথা সপ্রমাণ করিতে যে বাহার ধর্মগ্রন্থ হইতে শত সহস্র প্রমাণ ইচ্ছিত করিতে পারেন, সত্য, লিখিত প্রমাণে আদর্শ আমাদের অন্ত প্রকারের কিন্তু সত্যকে সরলভাবে মান্য করিতে চাইলে আমাদেরিগকে বলিতে বাধ্য হইতে হইবে, —আমাদের জনসাধারণ মধ্যে “সংসার অসার” এ বিশ্বাস হৃদয়ে হৃদয়ে!—এ কথাও গোপন করিবার উপায় নাই আমাদের সমগ্র সাহিত্যে এ ভাবের অবাধ প্রসার—আধ্যাত্মবাদের নামে ইহা গৌরবের স্থান আধিকার করিয়া আছে। মনুষ্য চরিত্র যেরূপ বিস্মৃতভাবে ও নান দিক দিয়া হিন্দুর পুরাণ ও মহাকাব্যে আলোচিত হইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে কিন্তু তাহাতেও এ সুরের অভাব নাই।

এই সর্বনাশা মুক্তির বিরুদ্ধে আজ কাল যে দুই একটি প্রতি-উক্তি শুনিতে পাই—সংসারটাকে একটু আমল দেই—সেটা কি ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পর্ক-বাহিত বৈদেশিক শিক্ষার ফল নহে? ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পর্কহীন এই শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে ইহঁদের সুযোগ ঘটয়াছিল ভাবিয়াই সময় সময় আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভারিয়া উঠে! এ শিক্ষা ব্যতীত জাগরণ-চক্র দেখা দিত না—দিলেও সূদূত ভবিষ্যতে লোক ভাগ্যে হইত কিনা কে জানে! আমার মনে হয়—ভারতের এই অনিষ্ঠা-নশ্বরবাদের মূলে কঠারাঘাতই ভারতবাসীর এখন প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, —ইহাই আমাদের জাতীয় দুর্বলতার মূল কারণ! খ্রীষ্টীয় ধর্মেরও এই মতবাদের প্রতি বথেষ্ট অনুরক্তি আছে কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যদি সেই দিকে মন দিতেন তাহা হইলে কি তাহারা কখনও আজ এরূপ উন্নত হইতে পারিতেন? খ্রীষ্টীয় ধর্ম তীহাদিগকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করে নাই,—খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংসার ‘বরুদ্ধ মতিগতি’ সম্বন্ধে ইউরোপ যে এত উন্নত,—জীবনকে জীবনরূপে গ্রহণ করাই তাহার কারণ,—সংসারকে রক্ষা করিয়া জগতের উন্নতি সাধন প্রচেষ্টাই তাহার আদিত। সুতরাং আমাদের প্রধান কর্তব্যই এখন সাধারণের মনভাব পরিবর্তনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করা—তীহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া—এ জীবনেরও একটা মহান উদ্দেশ্য বর্তমান, —পারবর্তনের ভিতর দিয়া জীবন পথে জীবাত্মা শান্ত মহাত্মার সন্নিপস্থ হইতে পয়াস পাইতেছেন—এ যাত্রার পথ হারাইলে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছান একপ্রকার অসম্ভব। সাধারণের দারণ জীবনটাই হহতেছে যত দুঃখকষ্টের হেতু—আত্মা ইহা হহতে পরিজ্ঞান পাইবার জন্য সর্বদা চটুচটু করিতেছে! অগচ জীবনের উপর টান জীবের সকল টানের উপরে! ভারতবাসীকে এখন বিশেষরূপে বুঝাইবার দিন আসিয়াছে—জীবন নিত্যের স্বরূপ, মূল্যবান, হুল্লভ; যাহা কিছু অর্জন করিবার কালই এই জীবন—ইহা যত বেশী প্রবর্তিত হয়,—সময়ের অপচয় না করিয়া ইহার উৎকর্ষতার যতই আভিহিত হয় ততই মঙ্গল!

পুরাকালের হিন্দুদিগের মধ্যে এই জীবন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পরিস্ফুট ছিল,—মানবিকতার ক্রমবিকাশ ‘কিরূপে সাধিত—সে ধাংগা,—বিবর্তনবাদ-জ্ঞান তীহাদের ছিল তাহার প্রমাণ আছে! তীহাদের সে মতবাদের জের আজও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, নশ্বরবাদের ঘোর তুফানেও এক কোণে মাথা তুলিয়া আছে। এখনো, এমন কি হিন্দু নিরক্ষর চাষীকে মনুষ্য জন্মের কথা জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে “মনুষ্য জন্ম—দুর্ভাগ্য জন্ম;—ইহা অতুল—সর্ব জন্মের সার!”—এ পর্য্যন্ত সে ঠিক কিন্তু যখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে “এ জীবনের উদ্দেশ্য কি?” তখন সে মহা গোলে পড়িবে। সে নিত্য শুনিয়া আসিতেছে—সুখ-দুঃখ আকর্ষণ ভালবাসা জীবনের এ বৃত্তিগুলি যত, মায়ামুক্ত—মহা অনিষ্টের কারণ, আশার বিনাশ, অভিশাপের উৎপাতনই জীবনের কার্য—পুনর্জন্ম হইতে পরিজ্ঞানের উপায়! কাজেই জীবন তাহার নিকট তিক্ত,—সে অন্ধম হইলেও, আদর্শ-হিসাবে প্রার্থনা করে ইহা হইতে

পরিজ্ঞান লাভ করিতে। \* \* \* জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত—জাতি হইতে এ ভাবের বিরোধান বিধান। যে সাহিত্য জীবনের এই ক্রমাত্মক ধারণা বর্তমান তাহা কোনক্রমেই জাতীয় শিক্ষার পাঠ্য হওয়া উচিত নহে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় অমুরাগ কিন্তু যে ভাষার সাহিত্যে নীতি-গ্রন্থে এষ্ট অনিত্যবাদ মুখরিত, সে ভাষা আমার নতে কিছুতেই জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরের ভাষা হইবার উপযুক্ত নহে,—তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিফল ও পণ্ড হইবে নিশ্চিত! ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনে সংস্কৃত ভাষা অমূল্য! সংস্কৃত হইতে শব্দ অলঙ্কার চয়ন করিয়া দেশমাতৃক ভাষার (vernaculars) উন্নতি ও পুষ্টিসাধনে ইহা অতি মূল্যবান। পাণ্ডিত্য লাভে সংস্কৃত চর্চা অত্যাৱশ্যক কিন্তু সাধারণ কন্ম-জীবনে জনসাধারণের পক্ষে ইহা মূল্য নাই বলিলেই হয়। এ হিসাবে সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী বা পারসী ভাষা বরং গ্রহণীয়—এখনও এই দুই ভাষা একটু পরিবর্তিত আকারে অনেক স্থলের প্রচলিত কথা ভাষা! ইউরোপখণ্ডে গ্রীক ও লাতিন যেক্রপ ভারতের পক্ষে সংস্কৃত তদ্রূপ। সূচতুর ইউরোপ গ্রীক লাতিনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়াছে,—মাত্র বাহারা নিতান্ত সাহিত্য-বিসারদ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই হ'ল একজন উহার আলোচনা করেন। সংস্কৃত সম্বন্ধেও ভারতে তুল্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ভারত সম্বন্ধে যদি এষ্ট মহা-জীবনসঙ্কটের দিনে জয়যুক্ত কার্যবর ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মৃতভাষার অনুশীলনে, তাহার গৌরব গাথার ক্ষীণ হইয়া অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতে না দিয়া যেগুলি হাতেকলমে সম্পাদন করিলে জীবন সমস্যার সমাধান হয়, তাহাতেই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। অতীত গৌরবে মণ্ডল হইয়া থাকিলে, বাস্তব-জীবনে তাহাতে আর কি উপকার! ভবিষ্যতের সুফল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে মহা ধংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে ভারতের বাহ্য ভাষার নিজস্ব,—যেগুলির জন্য তাহার গরিমা,—রক্ষণীয় যাহা, শক্তি ও উৎসাহে উৎস যেগুলি নব শিক্ষার কার্য-বাসরে উন্নতি-সাধন মন্ত্রে সেগুলি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর জীবনকে স্বাস্থ্যময়—কন্মকর্ম করণ তুলিবার চেষ্টা সর্বপ্রাণে করা আবশ্যক। তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে বর্তমান যুগে নিখিল জগতের সাহিত্য ভারত কখনোভাবে সংবদ্ধ হইতেই হইবে! জগতের জাতি সমূহের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থান সংস্থাপন করিতে হইলে ভারতকে তাহার বুদ্ধিবিদ্যা, মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রভৃতির এমন সুপ্রয়োগ করিতে হইবে যে একটুকুও যেন তাহার অপব্যয় না হয়,—সখের অবসর ভারতের কোথা? সত্য, সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃত, সাহিত্য বন্দ্য-নীতি হিসাবে উহা অতুলনীয় কিন্তু জীবন আধাবে উহা অচল! ভাষা বিজ্ঞানে, পুরাতত্ত্ব অনুশীলনে, ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য গ্রীক লাতিন অদ্বীত হইবার উপযুক্ত হইলেও উহার যেনন ইউরোপ আমেরিকায় পবিত্র; ভারতের সংস্কৃতকে সেই স্থান দিয়া, ভারতবাসীর উচিত সেই সময়টা নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য আধুনিক প্রচলিত ভাষা (modern languages) শিক্ষায় ব্যয় করা। বুদ্ধিমান হিন্দুগণ এ কথা যে বুঝেন না তাহা নহে,—তাঁহাদের কার্যই হইবার প্রমাণ। --আমার হেতুক বংসরের অহিঙ্সতা হইতে বলিতে পারি,—যাঁহারা। সংস্কৃতের ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন জন্য ও সংস্কৃত পাঠ্য উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে) ডি. এ. ভি কলেজ স্থাপন করিয়া তাহার উন্নতির জন্য অকার্যতে শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহাদের তাঁহাদিগের সম্মানগণকে উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাসম্বন্ধে সংস্কৃত পড়াইতে পরামুখ, কতগুলি লোক সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে; মন্তব্য তাহাদের --“ও সময়টা যথার্থ ব্যয়িত হইয়াছে।”

ব্যক্তিগত ভাবে, আর্থ-ঋষিগণের প্রতি আমার সম্মান কাহারো অপেক্ষা কম নহে। সেই অতি-বুদ্ধগণের অহি-জ্ঞান, বিজ্ঞতার জন্য, আমরা যে তাঁহাদেরই, এ কথা স্মরণে আসিবা মাত্র হৃদয় স্নানীয় পূর্ব হয়। তাঁহারা



তৎকালে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে, আধ্যাত্ম-বিদ্যায়, নানা শাস্ত্রে, সমাজ নীতিতে ও সাহিত্যে অত উন্নত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাই আজ বর্তমান-জগৎ উন্নতি-মার্গে একুপ অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। বহুদর্শীতাই যদি জ্ঞান ও প্রাজ্ঞতার কারণ হয় তাহা হইলে বর্তমান-জগৎ সেকাল হইতে তিনশাজার বৎসরে অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই উন্নত শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বর্তমানে বৈদেশীক ভাষায় লিখিত। প্রত্যেক বৎসর, প্রত্যেক মাস—না, বৎসরের প্রত্যেক দিন ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ মতে কোন সমুন্নত বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ এক বৎসর পরেই অচল পুণ্যতন-মতবাদে পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাস্তব পক্ষে দেখা যায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে প্রাণ কাহার চায়? ওঠ, —জাগ—এইত জগতের নিয়ম, কে আর এই সকল উন্নতমুখ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি বিমুগ্ধ হইতে পারে? ফল তাহাতে কি? বৈদেশীক ভাষায় লিপিবদ্ধ বলিয়া যদি আমরা তাহার সঠিত পরিচিত না হই বা সেই ভাষায় অজ্ঞতা হেতু সে বারতা হইতে আমরা বঞ্চিত থাকি তাহা হইলে মন্ডা জগতে আমাদের আর স্থান কোথা? সুতরাং বৈদেশীক ভাষার আলোচনা আবশ্যিক। বিশেষতঃ আমাদের বিমুগ্ধ হইলে চলিবে না যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি জগৎ হইতে দূরত্ব মুছিয়া ফেলিতেছে। এখন যদি আমরা কেবল আমাদের নিজের আদর্শ অভিনাষ লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনটাকে গ্রহণ করিয়া জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চাই, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া একালে সম্ভব? বাণিজ্যব্যবসা ব্যপদেশে আমরা অন্য জাতির সঠিত সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য। এ সম্বন্ধ রাখা না রাখা আর আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এ বন্ধন অনিবার্য। বিদেশীয়র চক্ষু হইতে বাণিজ্যকে উদ্ধার করিয়া যদি ভারতবাসীকে নিজেই সে কার্যে ব্রতী হইতে হয়, যদি তাঁহারা তাহাতে সাক্ষ্য পাঠনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীর যতগুলি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল; শুধু বিদ্যালয়ে নহে বিদ্যা মন্দিরের বহির্ভাগেও সে শিক্ষায় বিরতি হইবে না। জাতির অধিকাংশকেই কৃষিকার্য্য, ও বাণিজ্য ব্যবসায় বাপৃত হইতে হইবে।—এই সকল কার্য্যে আধুনিক ভাষা জ্ঞান অত্যাবশ্যক। শিক্ষার এমত অবস্থায় আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ-আশা বালকগণকে যদি, বিদ্যালয়ে,—সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পথে,—সংস্কৃতের ন্যায় একটি অতি প্রাচীন, অপ্ৰচলিত, জটিল কষ্টসাধ্য ভাষা শিক্ষায় তাহাদিগের উৎসাহ ও অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি অসম্ভাবী। সুতরাং বর্তমান জীবনসমস্যার যুগে সংস্কৃত শিক্ষারূপ একটি সম্বন্ধে প্রশ্ন দিবার কাহারও অধিকার নাই। তদ্ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানার্জন এবং জাতীয় সাহিত্যকে শব্দ সম্পদে উন্নত করিবার জন্য অল্প সংখ্যক লোককেই উহার অধ্যয়ন নিয়োজিত থাকিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই প্রচলিত বৈদেশীক নানা ভাষা ও ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিও শিক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ্য কারবার ইচ্ছা রাখি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি কেবল দেখাইতে চাই—ভারতের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিসর কিরূপ হওয়া উচিত। জাতীয় সাহিত্য আলোচনা অন্তে জাতীয় শিক্ষা প্রণালীর আলোচনা করা যাক। আমাদের বলিতে হইতেছে, আমরা যদি আমাদের পূর্বপ্রচলিত শিক্ষা প্রণালীকে বর্তমান জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সে পুরাতনে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। পুরাতনকে ওরূপ ভাবে গ্রহণ অর্থেই প্রত্যাবর্তন,—অগ্রসর কিছুতেই নহে। স্কুলের বর্তমান শিক্ষারীতি ভয়াবহ; ইহা অপেক্ষা পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীও যে অনেকাংশে মঙ্গলকর। বুটীশ শাসনের প্রারম্ভে যখন বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী গৃহীত হয়, সেই সময়ে প্রাচীন প্রণালী তাহার বিশেষ হারাইয়াছে।

আমার মনে হয় প্রতীচোর প্রণালী যে পাশ্চাত্যপ্রণালীর কলাণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহাতে মঙ্গলই সাধিত হইয়াছে। পুরাতন প্রণালীর শিক্ষা আনাদিগের জাতীয়-জীবনে যে অবসাদ আনয়ন করিয়া তাহাকে পুরুষত্বহীন করিয়া ফেলিতেছিল তাহার তুলনায় পাশ্চাত্যপ্রণালী গৃহীত হওয়াই আমাদের মঙ্গলের কারণ,—বিষয়টি একরূপ বিস্তৃত ও ভটিল যে একরূপ প্রবন্ধের স্বল্প পারসরে ইহার আলোচনা একরূপ অসম্ভব, তথাপি কথটা পরিষ্কার করিবার জন্য দুই একটি মন্তব্যের অবতারণা করিতে হইতেছে।

পুরাকালের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরু ও চেলার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সৃষ্টি করিত, তাহা অনেকাংশে মঙ্গলকর হইলেও অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষার-বিরোধী; এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মানবোচিত সুকোমল প্রাণ-ধন্যকে উন্নত ও প্রসারিত করিত সত্য—আমরা তাহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে হারািয়াছি;—কিন্তু পুরাতন প্রণালীতে গুরু, চেলাকে তাহার চরিত্র গঠনের একরূপ কতকগুলি নিয়ম-কানুন ও অভ্যাসের সহিত বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন যে শিষ্যের মনকে সেগুলির দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা হইত। স্বাধীনতা ও অবাধ-চিন্তার স্থান তাহার আর থাকিত কোথা? শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে স্বাধীনভাবে তাহার ও সমাজের জন্য অবাধ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত করা। ‘গুরুকুল’ শিক্ষা-প্রণালীতে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইত কি? আমার মতে, না,—হইত না। ব্রহ্মা যাত্রাকালে শিষ্যকে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় ‘ও গুরু যে বাক্যে শিষ্যকে আশীর্বাদ করেন সেই মন্ত্রগুলি পর্যাণোচনা করিবেই, পুরাকালে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা প্রতীতি হইবে। শিষ্যের মধ্যে গুরুর আর একটি পূর্ণমাত্রা প্রকটিত করিয়া তোলাই ছিল সে শিক্ষার আদর্শ! প্রত্যেক পিতা-মাতা ও শিক্ষকেরই উচিত নহে কি যে তাঁহাদিগের সন্তান ও শিষ্যদিগকে নিজ নিজ প্রতিকৃতিতে পরিণত না করিয়া, তাঁহাদিগের অপেক্ষা বালককে আরও উন্নত উদার করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করা! আমার এ অভিমত যদি ভ্রমাত্মক হয় তবে কেহ সংশোধন করিয়া নিলে সুখী হইব।

তৎকালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল বড় কঠোর, পদ্ধতিপ্রাণ ও গতানুগতিক! ধর্মশিক্ষাও যাহা দেওয়া হইত, তাহাও ছিল সংস্কারে আচ্ছন্ন, আচার নিয়মে বদ্ধ, সঙ্গীর্ণ, ধর্মের উদার উদ্দেশ্য, চেলার হৃদয়ে মূর্তিমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা আদৌ হইত না। ব্যাকরণের সূত্র ও পাঠ্যগ্রন্থের মূল কণ্ঠস্থ করিতে বহু সময় অথবা ব্যয়িত হইত। উপনিষদের যুগে বরং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা বর্তমান ছিল কিন্তু সংহিতার যুগে তাহা সঙ্গীর্ণ হইয়া অগ্নি ও লৌহে পরিণত হইল! এ বিষয় ভারতকে একা দোষ দিলে চলিবে না, আরব, গ্রীক, ও ল্যাটিনেও এই দশা—শিক্ষা বিধিমান শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। শিক্ষাপ্রণালীর এই সমস্ত গল্টি সম্বন্ধেও মধ্যযুগে, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, আরব ও ক্যাথলিক গৃহানগণ-পরিবৃত্ত বিদ্যালয় হইতে উচ্চদরের কত পণ্ডিত, ব্রহ্মত বিদ্বান, দার্শনিক ও ব্যবহার-শাস্ত্রবেত্তার উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ নহে! মানুষের মন যে পারিপার্শ্বিক জগতকে অতিক্রম করিয়া আরও উর্ধ্বে উঠিতে সমর্থ,—দেশের কাষানিয়ন্তাগণের কঠোর অনুশাসন, পিতামাতাগুরুকুলের আদেশনিদেশের গণ্ডি, চির-উন্নত-গতি মানব-মনকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অসমর্থ—সেই মনোবিগণ তাহারই জীবন-দৃষ্টান্ত!

চরিত্রারে গুরুকুল-বিদ্যালয়, প্রতীচোর প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর, দোষ ও অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া উহা প্রবর্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু তাহার। এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রগণকে যেরূপ বিচ্ছিন্ন ও জনসাধারণ হইতে দূরে পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, পূর্বকালে তদ্রূপ করা হইত কি না সন্দেহ! ‘গুরুকুল’ এই নাম হইতেই মনে হয় শিষ্যগণ তখন গুরুগৃহে তাহার পরিবারভূক্ত হইয়া বাস করিত; প্রতি বিষয়ে শিষ্য সেই

পরিবারের সন্তানের জায় বিবেচিত হইত। অধ্যক্ষের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা অধিক হইবার কথা নহে। কিন্তু তৎকালেও সুবৃহৎ আশ্রম ও পারিষদও বিদ্যমান ছিল এবং গুরুগণও শিক্ষা অধ্যাপনায়, এক প্রণালীতে কার্য্যকরূপে মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ছাত্রগণকে যেরূপে পারিপাশ্বিক মানবসম্পদ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নভাবে রাখবার চেষ্টা ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? শিষ্যগণকে প্রতিদিন শিক্ষা গ্রহণে লোকালয়ে আসিতে হইত, মাতৃজ্ঞাতর সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবর্তা নিতাই ঘটিত—তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

সংহিতা যে শিক্ষা প্রণালীর নির্দেশ করেন তাহা সর্বসাধারণের মধ্যে কল্যাণ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে! আমার মনে হয় উক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ বালকগণের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল। যাচাই হউক না, বর্তমান ভারতের জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী পারকল্পনায় সেহ পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি সর্বজাতের শিক্ষা উদ্দেশ্যে আংশিকরূপেও গ্রহণযোগ্য নহে। বিশেষতঃ নিখিল জগতের সহিত সমভাবে উন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার জন্য আমরা আমাদের সন্তানসম্প্রতিষ্ঠার যেরূপ স্বভাব গঠন প্রয়াসী পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী তাহার বিরোধী! আমরা শীতাতপের ভয়ে সন্তানসম্প্রতিষ্ঠাকে বহুতাপ গৃহে (in hot house) মামুষ করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার পরিণাম যে সমাজের নেতৃ হইবার আশা রাখে, সেই সমাজের মধ্যে যাচাতে তাহার বদ্বিত ও শিক্ষিত হইবার অসর পায় তাহা বাবাহিত হইয়াই শেষ। ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা, প্রত্যেকেরই সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের পূর্ণ জ্ঞান আবশ্যক। তাহাদিগকে সর্ব প্রকার প্রলোভন হইতে উদ্ধার রাখিতে ইচ্ছা তাই বলিয়া তাহাদিগকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। প্রলোভন পরিপূর্ণ জগৎ! পৃথিবী আনন্দ সন্তোষের স্থান। যতক্ষণ লোকে নিজের ও সমাজের অপকার না করিয়া ‘ক্ষুধা’ করিয়া ফিরিতে চায়—তাহাকে অবাধে তাহা করিতে দাও! যে পর্য্যন্ত সমাজের প্রাতি তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও সমাজের তাহার দায়িত্ব জ্ঞান থাকিবে—সে পর্য্যন্ত তাহার সহস্র সমাজ নিরাপদ, জীবনটাকে সখের সুখের উপাদান ভাবিয়া কিছুতেই সে পাপাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না! বালকবালিকার মনে এই শ্রদ্ধা ও সমাজের প্রাতি তাহাদিগের দৃষ্টি যে শিক্ষার পূর্ণভাবে বাল্যকাল হইতেই জাগ্রত হয় তাহার ব্যবস্থা কর। বাল্যকালে তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই তাহাদিগকে জীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করা! পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূর দূরান্তরে কলেক্স, শূন্য ও বিষ্ণু!—বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাল-মনকে রূপিত হইতে লুক্কায়িত রাখিয়া, প্রাকৃতিক ক্ষণে তাহার চিত্তবৃত্তি বিতুষিত কারবার প্রচাস, অতি পুরাতন কালের কাল তাঁত দারণা, তাহা বর্তমান সভ্য জগতে সর্বোত্তমভাবে পরিভাজ্য, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহা মানিয়া লইবেন! শিক্ষার নব আদর্শের মূলই হইতেছে—বালকবালিকাকে, পরবর্তী কালে যেরূপ জীবনর, তাহার মধ্যে বাপন করিতে ইচ্ছা তাহাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও,—তাহাদের সমাজের পারিপাশ্বিক বস্তুর জীবনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ণ প্রয়োগ তাহার লাভ করুক! তাহার যেন একক, বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া প্রকৃত জীবনে, উহার উজ্জল ও অপকৃষ্ট অংশের সহিত অপরিচিত না থাকে,—তাহা না হইলে যে, তাহাদের জীবনে যদি এমন দিন আসে—এমন প্রলোভনের তাহাদিগকে সম্মুখীন হইতে হয় তাহারা তখন বহুদর্শিতার অভাবে কেবল পুথিগত শিক্ষার বিপদোদ্ধার হইতে পারিবে না! নরনারীকে এই জীবন-আহবে প্রয়াসী করাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে? আমরা তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বা দেশের শত্রু করিয়া গঠন করিতে ইচ্ছা কখন করি না।—অজ্ঞ বাহারা বালকবালিকা—তাহারাই কাল সমাজের স্বভাব,—

নগরের অধিবাসী। তাহাদের মধ্যে বাহাতে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ, দেশনাশক, কার্যাগ্রেগী আবিষ্কারক, বাণিজ্য ব্যবসারে সুদক্ষ, বিবেচনাক্ষম, বুদ্ধিচেতা ও দার্শনিক প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি। শিক্ষা সর্ব বিষয়ে বাস্তবজীবনের ও সমাজের উপযোগী হওয়া চাই। প্রত্যেক জীবন সমাজের,— ব্যক্তি হইয়াই সমাজ! বর্তমানের প্রত্যেক উদীয়মান ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সমাজ-নীতিজ্ঞের চেষ্টাই,—প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই শিক্ষার শিক্ষিত করা—বাহাতে সে ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা বলে ভালমন্দ হিতাহিত বিবেচনা করিয়া জীবনের প্রতি কার্যে অগ্রসর হইতে পারে।

আমার মতে বালক-বালিকাকে সন্মাসীতে পরিণত করিবার কল্পনা ঠিক নহে। তাহাদিগকে জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাট-প্রতিঘাট, প্রকার-পরিবর্তনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া ঠিক। বালককে বিচ্ছিন্নভাবে ও বালিকাকে পরদার অন্তরালে মানুষ করা হইলে তাহারা পরিণামে দুর্বল চিত্তের নরনারীতে পরিণত হয়। যখন তাহাদিগকে জীবনে কোন প্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয় তখন তাহারা কদাচিৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের জীবন অভিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার অভাবে পতিত হইয়া যায়, এ কথা আমি কল্পনা হইতে বলিতেছি না—ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। সাধারণতঃ স্কুল ও কলেজে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেও উন্নত-প্রণালী বলা যাইতে পারে না। অন্ততঃ সে শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকে না বাহাতে শিক্ষার্থীকে উদ্ভিষ্ট সামাজিক জ্ঞানে উন্নত করিতে পারে। তথায় বিদ্যার্জন হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে না। এ-সম্বন্ধে আমার বতটু হ অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে বলিতে হয়, যুবকগণের অর্জনের প্রবৃত্তি আকস্মিক জ্ঞানকেই বরণ করিয়া লয় বাস্তবের দিকে তাকাইবার অবসর আর তাহাদের থাকে না। বাহিরে বাহাই হোক চরিত্রের দৃঢ়তা এরূপ ক্ষেত্রে ভস্মিতে পারে না—অন্ততঃ তৎল দুর্বল থাকিয়া যায়। সংসারে বর্জিত ও অর্জনের বস্তু কোন্টি তাহার তুলনা করিবার ক্ষমতা না থাকায় দেশের শিক্ষিত সন্তানসন্ততি আত্মরক্ষার অনেক সময় অসমর্থ হইয়া পড়ে। তাই,—দেশের জননাশকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ ও সাজুনের অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয় যে তাহারা যেন বালকবালিকাদিগকে সংসার ও মানব-সত্য হইতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সেকালের আদর্শে শিক্ষিত করিতে প্রয়াস না পান। বালকবালিকাদিগকে আশ্রিত, অধীন, বা নিকৃষ্ট মনে না করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গীতরূপ যেন গ্রহণ করা হয়। আমরা পূর্ণপ্রাণে তাহাদের উপর যেন পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করিয়া সরলভাবে নির্ভর করিতে পারি এবং দ্রষ্ট্রী ও পুরুষকে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের মিলিত শক্তির সম্ভাবনাই যেন আমাদের কাম্য হয়। আমি জানি আমার এই মত, সর্বজন-গ্রাহ্য হইবে না, আমাদের দেশের চিরাগত রীতি-নীতি, বহু শতাব্দীর সংস্কার আমার এ মতের বিরুদ্ধে, কিন্তু দ্রষ্ট্রীপুরুষের সাহচর্য-মিলিত-শক্তিতে গৃহ ও বাহিরের কার্য্য করিবার শুভ সময় সমাগত প্রায়; আজ না ইউক কাল সে দিন আসিবেই আসিবে।

অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি আমরা উপকৃত না হই তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য! জগৎ বাহাতে উপকৃত, আমাদের তাহাই যদি বর্জিত হয়, তাহা হইলে এগতে আত্মরক্ষা কি সম্ভব,—কেবল প্রাণশক্তির অপব্যবহার নহে কি? নীতিজ্ঞান, তত্ত্বতা ও সুশীলতা সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিবর্তন আসিবেই আসিবে। আমাদের বালক বালিকা এমন বুদ্ধিত শিক্ষিত হইবে বাহাতে তাহাদের স্বাধীনতা সরলতা ও পরম্পরের মধ্যে নির্ভর ভাবকে বৃদ্ধি করিবে। অবিদ্যায় ও সন্দেহে অসরলতা আর তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কারণ অসরলতা হইতেই কপটতা নীচতা তোষামোদ প্রভৃতি প্রাণের ব্যাধির উদ্ভব হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষক ও তত্ত্বগণ তাহাদের

চির-অভ্যাস আদেশ ও কর্তৃত্বের সুর বজ্জন করিবেন। বালকবালিকা যে তাঁহাদের মনোমত পুস্তিকা গঠনোপযোগী কর্দম পিণ্ড নহে এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষার্থীর মধ্যেও যে তাহাদের গুরুদের মত মন প্রাপ আশা অভিলাষ আশ্রয়-আদর্শ বরাজ করিতেছে তাহা শিক্ষকগণ সর্বক্ষণের জন্য স্মরণে রাখিবেন। মানুষের জ্ঞান ও উচ্চভিলাষই তাঁহার পথ প্রদর্শক। সে জ্ঞানকে কেহ যদি কর্তৃত্ব বা আদেশবদ্ধ করেন, তাহা হইলে কি বালকবালিকাদিগের মানবিকতা পূর্ণভাবে বিকাশ হওয়া সম্ভব? যদি চিত্তাঙ্কিত কর্তব্যাকর্তব্যের চিন্তা পরিচালন কল্পনার অবসর না দিয়া তাহাদিগকে আদেশে কাষা করিতে বাধ্য করা যায় তাহার ফলে তাহারা দাসের মত বিচার-জ্ঞান-বিসর্জিত হইয়া কলের ন্যায় কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইবে না কি? উহাই হইয়া যাইবে তাহাদের স্বভাব। ঠিক কথা বলিতে গেলে কোমলমতি বালকবালিকাকে একেবারে আদেশমুক্ত করিয়া নিজভাবে কার্য্য করিতে দিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। মতিতে স্বাধীনতা দিতে হইবে কিন্তু তাহাদিগের গতির দিকে সর্বদা সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখা চাই। যদি তাহারা বিপথগামী হইতে চায় তখন গুরুর এই আদেশের অধিকার। আদেশে হুঁকি যা তাহা হইতে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াও বিপথগামীকে আবার সুপথে আনিয়া দাঁড় করাইতে হইবে, বাস্—এই পর্থাৎ! কিন্তু গুরুশিষ্যের ব্যবহার সর্বদা হইবে অতি কোমল, বন্ধুর স্নায়। পিতামাতা বা শিক্ষক, সর্বদা শিশুর মনোবৃত্তিকে মাত্ত করিয়া চলিবেন। কোন জাপানীহ বালকবালিকাকে কখনও প্রহার করে না অথচ জাপানের বালকবালিকার স্নায় কর্তব্যপরায়ণ ও আদব-কায়দা-ভূরস্ত কমই দৃষ্ট হয়। জাপানীরা তাহাদের সন্তানসন্ততিদিগকে কথামবাস্ত্য কার্য্যকলাপে যথেষ্ট সঙ্গম করিয়া চলে; তাহারা সন্তানদের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করে না। জাপানে শিশুশাসনে বেত্রের ব্যবহার একেবারেই নাই,—চর্য্যাকাণ্ড তথা। অন্তর্য্যক্ষে আবার জাপানীগণের জীবন কঠোর শাসনে শাসিত; নগরের অধিবাসীরাপে তাহাদিগকে বহুপ্রকারে বশতা ও কড়া শাসনের মধ্যে জীবন বাপন করিতে হয়। জাপানী সৈনিকগণ তাহাদের তীক্ষ্ণ কর্তব্যবুদ্ধি ও কর্তৃপক্ষের আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালনের জন্ত প্রসিদ্ধ। তাহাদের স্বদেশপ্রীতি ও শাসনকর্তার প্রতি অটুট ভক্তি তাহাদিগকে এরূপ কর্তব্যপাণ করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যকালে শাসিত ও ত্যাগিত হইলে তাহারা এরূপ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। সংক্ষেপতঃ যে শিক্ষা-প্রণালীতে মনুষ্য-স্বভাব ও গাতিমতির উপর শিক্ষকের বিধাণ নাই সেখানে প্রকান্তভাবে শিক্ষার্থীর উপর কর্তৃত্ব ও দণ্ডের ব্যবস্থা। নব্যভারতের কেহই নরনারী বালক-বালিকাকে সেই ছীনচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, যদি কেহ করেন তিনি কোন অতীত অন্ধকারের যুগে অন্ধ ও পশুচেতে পড়িয়া আছেন। আমি জানি শ্রীবুদ্ধা এনি বেণাস্ত নিশ্চরই সেই অতীত অন্ধকার যুগের পুনরাগমনের ইচ্ছা করেন না কিন্তু ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে যে ভারতে এখনও অনেক লোক আছেন বাহারা পুরাতনের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা যদি কোনও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বৈদেশীকর মুখে সেই শিক্ষার সুব্যাতি প্রবণ করেন তাহা হইলে তাহারা নির্বিকারে আনন্দে উৎফুর হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। \* \* \* বৈদেশীকর শিক্ষা-প্রশংসার আমাদের আনন্দ নিরানন্দের কোনও কারণ নাই, অতি বিনীতভাবে আমার স্বদেশবাসীর নিকট প্রার্থনা যে তাহারা যেন বৈদেশীক শিক্ষা-প্রশংসার দ্বারা কখনও চালিত না হন। বৈদেশীকগণ যে আমাদের গাতিতাকে প্রশংসা করেন তাহা স্মৃতঃ প্রশংসমান হইয়া নহে। তাহাদের নিজের প্রশংসার প্রতি তিক্তবিরক্ত ভাবই সে প্রশংসার আদিতে। তাহারা হুঁচটির মধ্যে বধোপবৃত্ত ফুলনা করেন না, এক চরম মত হইতে অন্ত চরমে আসিয়া পড়েন আর কতকগুলি লোক আছেন বাহাদের প্রশংসা কেবল ভ্রমভার মর্যাদা রক্ষার জন্ত। কতকগুলির আবার মনোবিশিষ্ট উদ্দেশ্য আমাদের অনিষ্ট সাধন, সুতরাং আমাদের পক্ষে তাহাদের শিক্ষা বা প্রশংসার আমল না দেওয়াই

শ্রেষ:। আমাদের এখন মহা জীবন-সমস্যা, প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদেরকে এক্ষণে অগ্রসর হইতে হইবে, অবস্থা বুঝিয়া অতি ধীরভাবে ব্যবস্থা করার কাল উপস্থিত,—অন্যের কথায় নাচিবার সময় আমাদের নাই !

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস ।

## বিরহলোক ।

— :\* :—

লাজ ভাণ অধিকার আরো কত মিথ্যা চলনার  
মুখে শুধু কহি নাই—সেথা ছিল বহু অন্তরায় !  
সেই হাতে ওগো বন্ধু আজি পূর্ণ দশ বর্ষ ধরে'  
রচিত্তেছি বালু-সৌধ আপনার সাস্তুনার তরে ।  
আশার অতীত দান প্রত্যাখ্যান গৌরব কোথায়  
আমি মুর্থ এত দিনে শিখিয়াছি যবে নিকুপায় !  
সে ফুলের সে বসন্ত, বাসনার সে আবির হোরি,  
সে মৃদু মেঘের মধু মাদিরার সে মিলন টোড়ি,  
সে মর্শ্বের নর্শ্বনট, পুরাতন সে কেলি কদম্ব  
সে আশা স্বপ্নের শোভা সমারোহ, সে অলিকরম্ব  
আজি স্তব্ধ শূন্য হাহা অপ্রকাশ আক্টনাদ ভরা  
গৌরব অছিল করি বহিতেছি ক্ষত রক্ত-ঝরা ।

হে বন্ধু বাঙ্কিত চির এখনো কি বোঝ' নি সে কথা—  
মুখের কথাই কি গো এত সত্য, জীবন-দেবতা ?  
মুখের বচন আছে নিমেষে সে করে তা' প্রকাশ  
বুকের কেবল শ্বাস মৃত্যু-সম স্তব্ধ বার মাস ।  
বলেছি যা' মুখ চেয়ে সত্য-ছলে আমি স্বার্থপর  
সে কথার অর্থ কি গো তব পাশে আছে অগোচর ?  
সে দিনের সেই বাণী আজ দেখি মিথ্যা মিথ্যা-হ'তে  
এ ছেন বিলম্বে আজ বুঝাইব বল কোন' মতে ?

অস্তুরবাসিনী হ'য়ে আজো যদি নাহি বুঝে থাক'  
তবে চিন্তামণি সম, এ জীবনে আর বুঝো' নাক' ।

এ চিন্ত-সরযু তীরে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন  
থাক' শূন্য, হে প্রবাসি, প্রাণারাম, তোমারি কারণ !  
উদগ্র এ বাহু মম শূন্যমানে রাজহুত্র ধরি'  
রহিবে তোমারি আশে ; তব স্তব-গাথা গান করি  
কণ্ঠ মোর র'বে তব বৈতালিক-চির নিশি দিন—  
তব প্রীতি স্মৃতি মোরে দিবে নব প্রাণ মৃত্যুহীন !  
জাগৃক্ আনন্দ রাকা নিত্য তব হৃদয় আকাশে  
মেঘুর মলয়ানিলে মুকুলিত নব মধুমাसे ।  
যেথা ইচ্ছা স্থাপি পীঠ, কর' দেবি স্বর্গ-বিরচন—  
উচ্চতর স্বর্গ আমি তব ধ্যানে করিব সৃজন ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## পয়লা এপ্রিল ।

—::—

বেন কাহার ভয়বিভাড়িতকণ্ঠে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; আমি চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া  
বসিলাম । ঘুমের অঙ্গন তখনও চোখে লাগিয়াছিল । নীচের বাগান হইতে হাসনাহানার ভারি গন্ধ জানালা  
দিয়া প্রবেশ করিয়া ঘরের নিস্তরূতাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছিল । গোল টেবিলের উপর টাইমপিস্টার  
টিক্ টিক্ শব্দ রাত্রি যে স্নগভীর হইতেছে তাহার সংবাদ দিতেছিল । স্তিমিত আলোকে দেখিলাম,  
বেড়টা । বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, তাহারই গায়ে বেন গাঢ়তর অন্ধকারের স্তম্ভ ছলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে । পরে  
বুঝিলাম উহা কিছুই নয় দীর্ঘ পত্র সমন্বিত নারিকেল গাছগুলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে । আর্দ্রবায়ু ঘরে  
চুকিয়া তজ্জালস নেত্রপল্লব মুদিয়া দিতেছিল । হাই তুলিয়া আবার শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছি, এমন  
সময় কাতর কণ্ঠে পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“ওরে আমি, দেখতে, বাবা, বিভূ এইমাত্র উঠে সিঁড়ি দিয়ে  
কোথায় গেল—কে বেন বিভূ বলে ডাকলে—আর সে ‘এই বে বাচ্চি’ বলেই ধড়মড় করে উঠে নীচে দৌড়ল—  
আমি নীচে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা—সেখানে কাউকেই তো দেখতে পেলাম না—দেখ্, দেখ্, ‘নিশিতেই’  
বুঝি বা ডেকে নিয়ে গেল—একবার সুরেশ বাবুদের বাড়ীটার কাছে দেখিস্—আমি কণীকে তুলে দিচ্ছি সেও  
একবার উঠে দেখে আসুক—”

আমি সে অবস্থাতেই বাহির হইয়া দ্রুতপদে সুরেশ বাবুদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিলাম। তাঁহাদের একাণ্ড কটক বন্ধ—সমস্ত নিস্তব্ধ। পার্শ্বের বাড়ী হইতে গভীর সুষুম্ভ-বাজক নিঃশ্বাসের শব্দই বাহা কিছু চঞ্চলতা ছিল। সব ঘেন ঘুমাইতেছে। গলিটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—প্রাণের কোন চিহ্নই যেন নাই। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ী হইতে আমার বাহির হইবার অবাবহিত পরেই বিভূতির ছোট ভাই—তাহার অপেক্ষা মাত্র দুই বছরের ছোট ফণী দাদার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, এখন ও ফিরে নাহ। বিভূতির বাড়ী হইতে যাইবার পর আধঘণ্টার উপর কাটিয়া গিয়াছে—ফণীও অনেকক্ষণ গিয়াছে। হুঁ ভায়ের আর দেখা নাই! পিসীমা পাগলিনীর মত ঘর বাহির করিতে লাগিলেন,—কখনও মস্তকে করাঘাত করিতেছিলেন, কখনও বা বন্ধ পুটাঞ্জলি হইয়া কালী-ঘাটের কালা ও মাতা মঙ্গলচণ্ডীকে তাহার সন্তানহয়ের বিপশ্রুতির জন্য সছাগবৎস ষোড়শোপচার পূজা দিবার অঙ্গীকার করিতেছিলেন। অন্যান্য দেবতারও পূজোপচার প্রাপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হন নাই! আমার মনটাও এই আকস্মিক ঘটনায় ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তথাপি মনোভাব গোপন করিয়া পিসীমাকে সাহস দিলাম যে—“ও কিছুই নয়, এক্ষণিতারা এসে পড়বে—তুমি ভেবো না, আমিই না হয় আর একবার বেরিয়ে দেখে আসছি—”

পিসীমা অগ্রহের সহিত বলিলেন, “তাই যা বাবা, একবার দেখেই আয়, শীগ্গির ফিরতে চাস্—”

আমি পুনর্বার বাহির হইতে যাইব এমন সময়ে গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরমুহূর্তেই দেখিলাম একখানি ঘোড়ার গাড়ী উচ্ছ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে। মনে হইল যেন কাছাকাছি কোথাও থামিবে না। কঠাৎ আমাদের দরজার সামনেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কোচম্যান এত জোরে বক্সা টানিল যে অশ্বিনীনন্দন দুইটী কয়েক সেকেন্ডে উর্দ্ধপাদ হইয়া রহিল। পরে অশ্চালকের অভদ্রতার প্রাত্যহিক স্বরূপ পেভ্লেমেন্টের উপর খুর চুকিয়া অগ্নিশূলঙ্গ বাহির করিতে লাগিল ও ঘনঘন মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল।

গাড়ী থামিতে না থামিতে বস্মাক্ত বিভূতি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভূমে লাফাইয়া পড়িল।

( ২ )

এই ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় খাবার ঘরে সুরেশ বাবুর অস্থল সন্ধ্যকে খুব একটা উম্মার সহিত আলোচনা চলিতেছিল। সুরেশ বাবু ও বিভূতিদের বাড়ীর মাঝখানে তিন চারিখানি বাড়ী। তিনি গ্রহণী রোগে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে কলিকাতায় সারপেন্টাইন লেনে তাহার নিজের বাড়ীতে চিকিৎসা হইতেছি। কিন্তু রোগের যখন কোনও উপশম লক্ষিত হইল না তখন ডাক্তাররা তাঁহাকে হাওয়া বদলাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের কথায় তিনি গিরিডি যান। সেখানে তিনি উদ্ভীনদৌর উপরেই একটি সুন্দর বাড়ীতে তিন মাস থাকেন। সদ্যপ্রস্তুত বনাশালপুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া নদীতীরকে ঈষৎ তরঙ্গায়িত করিয়া যখন বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করিল তখন তাহার রোগের আলা অর্ধেক জুড়াইত, ধীরে ধীরে তিনি সারিয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণিক—তাঁহার আয়ুঃ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। বর্ষার মাঝামাঝি তাঁহার রোগ খুব বাড়িয়া উঠিল। গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া পুত্র সুধীরচন্দ্র মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া পিতাকে কলিকাতার বাড়ীতেই ফিরাইয়া আনিলেন। তাহার পর দুই তিন মাস করিয়া অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি হইল। চিকিৎসায় কোন ফললাভ না হওয়ায় সুধীরচন্দ্র কলিকাতার খ্যাত খ্যাত কবিরাজদের শরণাগত হইলেন। শেষে কান্তনের একদিনে কবিরাজ মহাশয়



বলিলেন যে সুরেশবাবুর অবস্থা এখন তাঁহাদের শাস্ত্র ও ঔষধের অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন সর্বব্যাপিহর ভগবানের উপর শেষ নির্ভর তিনি যা করেন। এই নিদারুণ সংবাদ সুধীরের মাতাকে বিবদিত্ত শেলের ন্যায় বিদ্ধ করিল। সেই দিন হইতেই তিনি একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

সুধীরদের আত্মীয়েরা তাঁহার পিতার এই সুদীর্ঘ অসুখের সংবাদ জানিতেন। তাঁহার অবস্থা যখন উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছিল তখন তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত অমুক ডাক্তার অথবা অমুক কবিরাজকে একবার দেখাইবার জন্য তাঁহারা উপদেশ দিতেছিলেন। তাহার মাতাও বধীয়সী অনেক আত্মীয়ের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন যে তেরোল নামক একটা গ্রাম পাগলা কালীর উপাসিকা একজন চণ্ডালিনী আছে। সে অনেক রকম তান্ত্রিক আচার বিধি জানে—নিশি জাগাইতে, শ্মশান জাগাইতে, ও তদ্ব্যসন্ন নানাবিধ শাস্ত্রস্বস্ত্যয়ন করিতে সে অধিতীয়। জাগ্রত দেবতার রূপায় অনেকেই এইরূপ শাস্ত্রস্বস্ত্যয়নের ফল পাইয়াছে। যখন সুরেশ বাবুকে কবিরাজ ডাক্তারের জবাব দিয়াছেন, তখন একবার তান্ত্রিক শাস্ত্রস্বস্ত্যয়নের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় কি? বৈধব্যের আশঙ্কা শত শত মুঠ প্রেতের ন্যায় সুধীরের মাতাকে যেন ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতেছিল। তাঁহার অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে এঁটাই একটা ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ রেখা। সুধীরের এই সব তুচ্ছতাকে বিশ্বাস না থাকিলেও এই গুরু বিপদে মাতার সহিত একমত হইয়া তিনি তান্ত্রিক স্বস্ত্যয়নেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকরণের পক্ষে মঙ্গলবার ও শনিবার প্রশস্ত। সে দিনটা মঙ্গলবার অমাবস্যা। সকাল হইতেই অন্ন অন্ন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সুরেশবাবুদের দীর্ঘায়তন আশ্রিনায় সুবৃহৎ ত্রিপলের নিম্নে এই তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া চলিতেছিল। একপার্শ্বে দেখা গেল—নরকপালে খানিকটা সুরা, আর একটা আত্মপাত্রে কুম্ভাতিল, রক্তচন্দন, রক্তজবা, আর একখানি ক্ষুদ্র খড়্গ। অপর একটা পাত্রে তিনটা ডাব, কতকগুলি নীল অপরাঞ্জিতা ফুল, রাশীকৃত বিষপত্র। নিকটেই বৃষবদ্ধ বনকুম্ভ ছাগশিশু পাতা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া মা মা করিতেছিল।

পূজারিণীর আকৃতি শীর্ণ, ভীষণ কদর্যা, ঘোর মসীবর্ণ শ্মশান হইতে যেন সম্মুখ উঠিয়া আসিয়াছে। কেশপাশ আলুলায়িত, মস্তকে রক্তজবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের বৃহৎ ত্রিপুণ্ড্র, কালো কালো চক্ষু দুইটা অলু অলু করিতেছিল। হস্তে রুদ্রাক্ষবগ্ন, পরিধানে রক্তাধর। হোমকুণ্ডের পার্শ্বে ত্রিশূল হইতে একটা প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিতেছিল।

এই বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার তড়িতালোক বিচ্ছুরিত কলিকাতার বুকের উপর ঘোর কুসংস্কারপূর্ণ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভিনয় হইবে শুনিয়া ওহ গলির শিশু সুবা বৃদ্ধ অনেকেই ব্যাপারটা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব কার্যে গোলমাল বিঘ্নকর বলিয়া চণ্ডালনার আদেশে ফটক বন্ধ করিয়া রাখা হইল। যুবক ও বৃদ্ধগণ ইহাতে চটিয়া চলিয়া যাইবার পর বালকগণ রহস্য ভেদ করিবার জন্য বন্ধপরিবর্তন হইয়া তথায় রহিয়া গেল। কেহ কেহ পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া অতিকষ্টে ফটকের উপর দিয়া ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আর বাহারা ছোট, নাগাল পাইতেছিল না, তাহারা ফটকের তক্তার কাঁক খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক চোখ ফাটলে দিয়া আর এক চোখ বৃজিয়া বিশ্বয়াকুল লোচনে সেই অস্তিত্ব হোমক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা অনিশ্চিত ভয়ে সকলেরই বুকে টিপ টিপ করিতেছিল।

সেই হোমপ্রক্রিয়ার কথা লইয়াই বিভূতি ফণী ও বাড়ীর ছেলেরা মিলিয়া আলোচনা করিতেছিল ও ইহার ফলে সুরেশবাবুর উপর কিরূপ ফলিবে তৎসম্বন্ধে গবেষণা হইতেছিল। পিসীমা নিশি জাগান ও অশান জাগান কাহাকে বলে তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। ওই ডাবগুলি বড় ভয়ানক জিনিস। হোমাস্তে ভাবের মুখ কাটা হয়। তাহার পর “নিশিত” হইলে—ভোর রাত্রে—হোত্ৰী উঠিয়া লোকের দরজায় গিয়া কাহারও নাম ধরিয়া ডাকে। যদি স্বেথানে তিন ডাকে সারা না পায় তো অন্য জায়গায় চলিয়া যায়। কেহ যদি তিন ডাকে সারা দেয় তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। সাড়া দিবার পূর্বে ডাবের “মুখি”টা খোলা থাকে। সাড়া পাইলে ‘মুখি’টা বন্ধ করিয়া সেই ডাবের জল রোগীকে খাওয়ান হয়। রোগী ধীরে ধীরে সারিয়া উঠে। অপর ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর কবলগত হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ ছেলেদিগকে বাঁচিয়াছিলেন যেন রাত্রে কেহ ডাকিলে তাহার তিন ডাকে সাড়া না দেয়।

এই সব অশ্রদ্ধেয় কুসংস্কারপূর্ণ কথা শুনিয়া বিভূতির ভারি রাগ হইল। সে মাকে বলিল,—“এ সব আমি বিশ্বাস করি না—নিশি টিশি আমি মানি না। যদি আমাকে কেউ ডাকে তো আমি সাড়া দেব।” পিসীমা বিভূতির গৌ জানিতেন বলিয়া কিছু বলিতেন না, কেবল শূন্য হইলেন।

এই যে এত ঘটনা ঘটয়াছে আমি কিছুই জানিতাম না। এক সপ্তাহের পর সেইদিন সাড়ে দশটার সময় আমি জয়ধ্বং হারবার হইতে ফিরায়াছিলাম। কাজেই পিসীমা যে সুরেশবাবুর বাড়ীর দিকটা কেন দেখিতে বলিয়াছিলেন ও “নিশিতে ডেকে নিয়োগেছে” কেন কহিয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

( ৩ )

বিভূতি লাফ দিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিল। “ব্যাপার কিরে, গাড়ী কোরে কোথেকে এলি ?” জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল “ওপরে এস বলছি।” বিভূতিকে দেখিয়া পিসীমা বলিল উঠিলেন—“ফণী কোথারে, তোমাকে যে খুঁজতে বেরিয়েছে।”

বিভূতি বলিল, “ফণী কোথা তা’ আমি জানি না।—মা তুমি দেবী কোরো না—তৈরী হ’য়ে নাও—একুণি তোমাকে যেতে হবে—গাড়ী খুঁজতে এত দেবী হয়ে গেল আমি গাড়ী এনেছি—ভারি বিপদ—”

এমন সময় ফণী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—“মা, অনেক খুঁজলাম—দাদাকে তো খুঁজি—এই যে দাদা! দরজায় গাড়ী কেন মা ?”

কি জানি বাবা,—বিভূতি বলচে ভারি বিপদ, আমাকে যেতে হবে! কি হয়েছে রে বিভূ ?”

বিভূতি বলিল—“তুমি তো আর একটু হলেই বিপদ ঘটয়েছিলে—তোমার কথামত নিশি মনে করে যদি সাড়া না দিতাম তা’ হলেই তো চমৎকার হ’তো! মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট থেকে জামাই বাবুর ভাই অবিনাশ এই মাত্র সাইকেলে করে এসেছিল বলে মনোদিদির আবার হার্টফেল্ হবার মত হয়েছিল—রাত্রে খেয়ে দেয়ে শোবার পর ঘুমের ঘোরেই গৌ গৌ করে উঠোঁছিল—জামাই বাবু তাকে তুলে মুখে জলটল্ দিতে একটু সুস্থ হ’য়ে বলে যে তার বুকটা বড় ধড়ফড় করচে—এ বাড়ীতে একবার খবর দিতে বলে তাই তো অবিনাশ দৌড়ে এসেছিল। এত রাত্রে গাড়ী কি পাওয়া যায়, খুঁজতে খুঁজতে তো এত দেবী হ’য়ে গেল—তোমার কথা শুনে যদি সাড়া না দিতাম তো কি হ’ত বলতো ? ওদের তো ডাক্তার ডাকবার বা ওষুধ আনবার মত লোকই নেই।”

কনার অস্থখ শুনিয়া পিসীমা বিচলিত হইলেন। তিনি যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। ফণী বাড়ীতে রহিল। বিভূতি ও আমি পিসীমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। “জোরসে হাঁকাইবার” দরুন পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ী মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে নির্দিষ্ট বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার সব নিস্তব্ধ কোথাও সারাটুকু পর্য্যন্ত নাই! গাড়ীর ল্যাম্প ছাড়া আর কোথাও আলো নাই—চারিদিকে এ কি? একটা অনিশ্চিত ভয়ে পিসীমা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল তবে কি মনোদাদি আর নাই! সজোর কড়া নাড়িবার আর উচ্চ চীৎকার করিবার পর জামাই বাবু লণ্ঠন হাতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

“কে, এ, বিভূতি? এত রাতে যে এখানে? কোনও বিপদ-টিপদ হয় নি তো? সব ভালো তো? গাড়ীতে কে?”

এত রাতে ধাক্কাধাক্কি—ব্যাপার কি জানিবার জন্য মনোরমা উপরের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাকে। তাইকে এত রাতে গাড়ী করিয়া আসিতে দেখিয়া সে ভয়ে আঁতকাইয়া ইঠিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া স্বামীর পিছনে দাঁড়াইল।

বিভূতি বড় অপ্রস্তুত হইল। বলিল—“এই যে অবিনাশ এক ঘণ্টা আগে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়ে এল যে দিদির হার্ট-ফেল হবার মত হয়েছিল! আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বল্লে—আমি একা এসে কি করবো বলেই তো আবার গাড়ীটাড়ী ডেকে মাকে নিয়ে এলাম—”

জামাই বাবু ভয়ানক চটিয়া গিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“হতভাগা, অবিটার দিন দিন বাদরামি বাড়ছে—এক কাণ্ড সে করে বসলে—দিন দিন যেন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে—আমি একুণ তাকে শিক্ষা দিচ্ছি।” এই বলিয়া বাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মনোরমার আয়ত লোচনের শাসনেন্দ্রিময় কটাক্ষ তাঁহাকে অর্ধপথে থামাইয়া ছিল—অবিনাশ বৌদি’র ক্রুপায় সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল! মনোরমা আন্দাজ করিতেছিলেন যে ইহার মধ্যে কোন ছটামি আছে।

বিভূতি বলিল, “আপনাকে যেতে হবে না, জামাই বাবু, আমিই বাচ্ছি।”

মনোরমা ও জামাই বাবু পিসীমাকে লইয়া বাটার ভিতর গেলেন। কোচম্যান বিদায় হইয়া গেল। অবিনাশ নীচের একটা ঘরে পড়াশুনা করিত—সেইখানেই শুভ বিভূতি সেখানে গিয়া ধাক্কা দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ মুছিতে মুছিতে দরজা খুলিয়াদিয়া অবিনাশ বলিল—“কেহে এত রাতে ডাকাডাক করে ঘুম ভাঙ্গায়—আচ্ছা অভদ্র তো?” তাহার পর একটু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“আঁা একি, বিভূতি বাবু যে? ব্যাপারখানা কি?”

বিভূতি আর অবিনাশের ভণ্ডামি দেখিয়া ক্রোধ সঞ্চারণ করিতে পারিতেছিল না—তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপের স্বরে বলিয়া উঠিলেন “এত রাতে এখানে কেন? ব্যাপারখানা কি? ন্যাকামি কল্লেই হ’লো আর কি? খবর-টবর দিয়ে এখন জানেন না কিচ্ছ—সাধু! ইচ্ছে হচ্ছে যে এই ঘুম দিয়ে তোর নাকটা ভেঙ্গে দি—”

সে কথায় কান না দিয়া অবিনাশ বলিল—“বিভূদা তোমার বুক এখনও Somnum bulism সারে নি?—না, তোর ভোর মণি গুয়াক করতে এসেছো?”

বিভূতি ফৌস করিয়া উঠিল, বলিল—“লজ্জা করে না বলতে রাষ্ট্রল, মাও যে এসেছেন!”

এমন সময় বিছানা হইতে ফিঙ্ক করিয়া হাসির শব্দ হইল। সেখানে অবিনাশের ছোট ভাই মণ্টু শুইয়াছিল। মণ্টুর বয়স দশ এগার বৎসর। অবিনাশ তাকে সব প্ল্যানটা রাত্রে বলিয়াছিল। সে এই মজাতে খুব আমোদ পাইয়াছিল।

অবিনাশ কৃত্রিম বিনয়ের সহিত বিভূতিকে বলিল—“মাপ কর ভাই, এতে আমার কিছু দোষ নেই। দোষ সব এই মণ্টেটার। সে আজ সন্ধ্যা বেলায় বলছিল যে অনেক দিন তুমি এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দাও নাই... একদিন তোমাকে ডেকে নিয়ে আসতে বল্লে—তোমার কাছে ও নাকি গল্প শুন্তে চায়। তখন দেয়ালের দিকে চেয়ে আজ যে পয়লা এপ্রিল সেইটা হঠাৎ intuition হ’ল—আর মগজে চট্ ক’রে একটা ছষ্টু বুদ্ধি গভিয়া উঠিল—আমার প্ল্যান তৈরী—মণ্টুকে বললাম—আজই রাত্রে তোর বিভূতাকে আমি নিয়ে আসব তুই এই ঘরে তাকে দেখতে পারি। সে অবিনাশের হাসি হাসিল। সমস্ত রাত আর ঘুম হ’ল না। স’ একটার সময় বেরিয়ে পড়ে তোমাকে খবর দিলাম। তার পর তুমি যখন একলা না এসে মাকে শুদ্ধ নিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়ী খুঁজতে বেরুলে—তখনই আমার বড় ভয় হ’ল—এই রে, সেরেছ—এ কথাটা তো ভাবি নাই! যাকে এখন তো সেরে পড়ি, তারপর যা হয় হবে। নিশ্চয় ঘরে ঢুকে সুবুদ্ধি ছেলের মত বিছানায় এসে শুলাম—‘ন রইল রাস্তার উপর কখন গাড়ী এসে পড়ে। শেষ যখন তোমরা এলে তখন ভয়ে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। থাক দাদা, দিনের মর্যাদা রেখে একটু রসিকতা করে ফেলেছি—কিছু মনে করো না। তুমিও মাকে এনে আনাকে এপ্রিল ফুল বনিয়েছো—আমি কাল মায়ের পা ধ’রে ক্ষমা চাইব—তুমি রাগ করো না—”

বিপ্লবক বিভূতি অধর দংশন করিয়া কহিল—“এর শোধ আমি একদিন তুলবোই—”

শ্রীকালীপদ মিত্র।

## পতিতা।

—:~:—

চিরদুঃখিনী

হে হতভাগিনি নারি শত পদানতা,  
তোমার বাথার বলো কে করে গণনা ?  
রমণীর অজানিত দন্ধোদর ব্যথা  
শতগুণ করিয়াছে ত্রিতাপ যাতনা।  
অন্তর্গত ঘন ব্যথা হৃদয়ে বহিয়া  
নারীর অসাধ্য কার্য সাধিতেছ নিতি  
ফুকরি না পরকাশি দহিয়া দহিয়া  
উন্টা করিয়াছ তুমি রমণীর রীতি।

শুধু তাই নহে হায় নিভৃত নিবাসে  
 দুঃখেরই জীবন যাপা দিবা বিভাবরা  
 হাস্যে লাস্যে হাব ভাবে কৃত্রিম উল্লাসে  
 নিজেরে দেখাতে হয় সুখ-সহচরী ।

দুঃখ সও মূল্য লয়ে কর পর সেবা  
 অসীম দুঃখের তব মূল্য দেবে কেবা ?

### দুঃখের অপূর্ব প্রকাশ

ওগো বারনারী আমি জানিতাম আগে  
 দুঃখ শুধু কীদে খসে করে হালতাশ  
 সেও উচ্চ হাস্যে নৃত্যে স্বাবেভাবে জাগে  
 তোমারে হেরিয়া মোর হয়েছে বিশ্বাস

জানিতাম উচ্ছলিত হর্ষ কলতান  
 আরামের প্রকাশক বিরাম লক্ষণ  
 তোমারে হেরিয়া মোর হইল গেয়ান  
 ভ্রম বেদনারো হয় প্রকাশ এমন ।

আগে জানিতাম দুঃখ ধূসর মলিন  
 রুক্ষ কেশে জর্ণ বেশে শ্লান মুখে রাজে  
 তোমা হেরি মনে হয়, বিলাস সৌখিন  
 প্রসাধনে চাকচিক্যে জাগে মাঝে মাঝে ।

মনস্তত্ত্ব রীতি তুমি করি ব্যভিচার  
 অপূর্ব প্রকাশ তুমি দিয়েছ ব্যথার ।

### পূজার ব্যবসায়

আবালা দেবতা শত পূজিছিলে হায়  
 ভক্তিভরে পত্র পুষ্প ঢালি গঙ্গা জল  
 একে একে সব ছাড়ি গর্বিত হেলায়  
 কন্দর্পেরে করেছিলে হৃদয় সম্বল ।

যৌবনের অর্ঘ্য করে গেলে অভাগিনি  
তাজি গৃহ দেবাণয়, তাঁহার পূজায়  
তিনিও হলেন বাম, ঠেলিলেন তিনি  
তব পূজা উপচার নিতান্ত ঘৃণায় ।

তাঁর দয়া তুমি শুধু লভ না জীবনে  
বিশ্বের সবার তিনি পূরণ কামনা  
তোমারো নাহিক ভক্তি তাঁহার চরণে  
কোনো দেবতায় তুমি কর না অর্চনা ।

এখন তাঁহার পূজা তব ব্যবসায়  
প্রবঞ্চনা, ঘুচাইতে জঠরের দায় ।

শ্রীকালিদাস রায়।

## মাতামহু ।

—:~:—

বেদ-বেদান্তাদি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে চতুর্দশ জন মহুর নাম দেখা যায়—ইহা ছাড়াও আরও বহু মহুর সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—কিন্তু তাঁহারা সকলেই “পুরুষ মহু”। “মাতা মহু” আবার কোথা হইতে আসিল বা আসিবে ?

কথা এই রূপই বটে—কিন্তু যাহারা হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত রসজ্ঞ, তাঁহারা কখনই—“মাতা মহু”র অস্তিত্বে সন্দেহান হইতে পারিবেন না। আমরা পৃথিবীর কোনও অভিধানেই “দাশ” শব্দের অর্থ যে “ব্রাহ্মণ” তাহা দেখিতে পাই না। প্রাচীন কোনও কোষেই হিন্দুর নিত্য-ব্যবহার্য্য “ব্যাঙ্কতি” শব্দের পরিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যও উহার প্রকৃতার্থ লিখিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। বিশ্বকোষ এবং শব্দসার ও প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি সমগ্র বঙ্গীয় অভিধানাবলী উহার প্রকৃতার্থ প্রকটনে অসমর্থ হইয়াছেন।

‘যজ্ঞ এবং নাতি’

শব্দের অল্প এক একটা অর্থ যে স্বর্ণ ও উৎপত্তিস্থান, তাহাও কোন অভিধানে দেখা যায় না।

সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি

শব্দ যে তিনটা পৃথক্ জনপদবাচী শব্দ—তাহাও কোনও অভিধানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। স্মৃতরাং পৃথিবীর আর কেহ “মাতা মহু”র সত্তার উপলক্ষ করিতে নাপারিলেও সামাজিকগণকে ইহা মনে করিতে হইবে না যে—“মাতা মহু” একটা আকাশ-কুসুমবিশেষ। ফলতঃ আমরা এই বহুবৎসরের গভীর গবেষণায় জানিতে পারিয়াছি যে—“মাতা মহু” শব্দটি বেদ ও রামায়ণ মহাভারতের একটা প্রাক্কন পরিজ্ঞাত শব্দ।

কেন আমাদের মনে এই “মাতা মনু”র সত্য সমুদ্রের হইয়াছিল? আমরা শাস্ত্রপাঠকালে জানিতে পারিলাম যে—ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর দশপুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম “মরীচি”। ভারত-ভূমি ভগবান্ কৃষ্ণ-ঐশ্যায়ন বলিলেন যে—

“মরীচিঃ কশ্যপো জাতঃ

কশ্যপাতু ইমাঃ প্রজাঃ । আদিপর্ব ।

মরীচির পুত্র কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রজা সকল সমুদ্ভূত । তাঁহারা কাহার? তাঁহারা—

দৈত্য, দানব মানব, আদিত্য ( দেবতা )

বৈনতেয় এবং কাদ্রবেয় প্রভৃতি ।

অতরাং ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু—এই দৈত্য, দানব ও মানবপ্রভৃতি সকলেরই “প্রপিতামহ” বা বীজী পুরুষ । অতরাং এই—“মানব” শব্দ উক্ত পুরুষ মনু ( স্বায়ম্ভুব ) হইতে ব্যুৎপাদিত । কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে—

দৈত্য, দানব, ( দমুজ ) ও আদিত্যেরা

কেন “মানব” বলিয়া বিশেষিত হইলেন না? আমার মনে এই সংশয় ও জিজ্ঞাসা আসিয়া আমাকে সম্বুদ্ধিত এবং মুগ্ধরিত করিলে, আমি ইহার কারণ অব্ধেয়ণে প্রবৃত্ত হই । অনন্তর একদিন পুরাণ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বায়ু পুরাণে এই বচনটী দেখিতে পাই—

দিদৌকসাং সর্গ এষ

প্রোচ্যতে মাতৃনামাভিঃ ।

দেবতাদিগের এই যে সৃষ্টিকথা বিবৃত আছে, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহারা সকলেই মাতৃনামে পরিচিত । যেমন—

দিতির পুত্র—দৈত্য, দমুর পুত্র—দানব,

আদিতির পুত্র—আদিত্য এবং বিনতার

পুত্র—বৈনতেয় ও কাদ্রবেয় পুত্র—“কাদ্রবেয়” প্রভৃতি ।

তবে কেন কেবল মানবগণ, প্রপিতামহের নামে সমাখ্যাত হইবেন? কেন সন্তানেরা মাতার নামে বিকীর্তন? যেহেতু অতি পূর্ব কালে সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, অতরাং যে প্রকার বাচ্চরগুলি স্বপ্ন মাতা ধনী, কালী ও বৃদ্ধি প্রভৃতির নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তজ্জন সকলে মাতার নামে পরিচিত হইতেন । তৎপর যখন সমাজে বিবাহপ্রথার প্রবর্তন হয়, তৎপরও কিয়ৎকাল পর্যন্ত সন্তানেরা পূর্ব প্রথা অনুসারে মাতার নামেই পরিচিত হইতে থাকেন । যেমন—

দৈত্য-দানব আদিত্য প্রভৃতি

ইহারাও কশ্যপের সন্তান হইলেও মাতার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । ইহার কিয়ৎকাল পরেই

কশ্যপস্ত অপত্যং পুমান্ কশ্যপেয়ঃ

গর্গস্ত অপত্যং পুমান্ গার্গ্যঃ বা গার্গেয়ঃ

কিতাদি সংজ্ঞা হইতে অরক্ষ হয়। সুতরাং ইহা হিসাবে “মানব” শব্দটীও যে স্ত্রীমহুহতে ব্যাখ্যাদিত, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। কিন্তু হাজার প্রমাণ পাঠে এই বস্তু খাটয়া গেল। তৎপর যখন রামায়ণ অধ্যয়ন করি, তখন দেখিতে পাই যে উক্তাতে এই রূপ প্রমাণ বিদ্যমান—

প্রজাপতিস্ত দক্ষস্ত বভূবুরিতি বিপ্রতঃ।

যস্টী তীর্থাভরো রাম যশাস্বনো মহাবশঃ ॥ ১১

বশ্পপঃ প্রাতি জগ্রাত তাসামষ্টো সুনধ্যমঃ।

অদাতঞ্চ দিতিশৈব দমু মপি চ কালকঃ।

তাস্মাঃ ক্রোধাশাঞ্চৈব মনুষ্যপাননামপি ॥ ১২

মহুমুখ্যান্ জনয়ন্ত কশ্যপস্ত ন্যায়নঃ।

ত্র ক্ষান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাঞ্চ মহুর্জষভ ॥ ২৯, ১৪ সর্গ।

( অরণ্য কাণ্ড )

হে মহাবশঃ রাম ! প্রজাপতি দক্ষের ষাইট জন কন্যা, তাহারঃ অতি যশস্বিনী। কশ্যপ তাহাদের মধ্যে সুনধ্যমা আট জনকে ( পুরাণ ও মহাভারতের মতে ১৩ জন ) বিবাহ করেন। উহাদিগের নাম যথাক্রমে—

অদিতি, দিতি, দমু, কালক,

তাস্মাঃ, ক্রোধাশা, দমু ও অনলা।

এই সপ্তমী মহুঃ গর্ভে উক্ত কশ্যপের ঔরসে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কতকগুলি শূদ্র কন্যাগ্রহণ করেন। তাহারাই জগতে “মানব” নামের বস্তু হইল। আমরা পাণিনীর ব্যাকরণেও এইভাবে একটি সূত্র পাই যে—

মনোঅণ্ড্যন্তৌষক্ চ। ৪।১।১৬১

মহু শব্দের উত্তর অপভ্রাজ্যার্থে তৌ প্রত্যয় হইয়া যুক্ আগমে মহুয়া। মানুষ এবং মানব শব্দ ব্যুৎপাদিত। কিন্তু আচার্য্য জয়াদিত্য বামন ও ভট্টোজী দীক্ষিত স্বয়ং লেখনীহঁতে এমন একটি কথাও বাহির করেন নাই যে এই—মহু শব্দটী স্ত্রী-লক্ষ্য। কেন? হয় ত ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীমহুর অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় নাই। অথবা যে কশ্যপ, পার-লৌকিক দেবতাদিগের পিতা, তিনি কেমন করিয়া ভৌম মহুয়াদিগেরও জনয়িতা হইতে পারেন? একারণ তাহার পাণিনির মহুকে স্বায়ম্ভব মহুও বলেন নাই ও ইনি কে? তাহাও ধরা পড়িবার ভয়ে মুখে আনিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। কেবল ইহা নচে, ভৃগুপ্রোক্ত মহুসংহিতাতে ১৩৩—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ প্রভৃতি শ্লোকে ভৃগু দেবগন্ধর্ব্বপ্রভৃতির সমুল্লেক্ষ করিয়া মানবগণকে উভয়তোদন্তঃ বাবভালুকৈঃ এবং বানরাদির প্রকরণে ধারিয়াছেন! কাজেই মাতা মহুর কথা বোল আনাই চাপা পাড়িয়া গিয়াছিল। মানবেরা মানুষ, তাহার কি দেবতাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইতে পারেন? সর্ব্বনাশ সনাতন বিশ্বাস রসাতলে যায় যে!!

কেবল ইহাই নচে, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং ঋগবংশের প্রকাশকেরা পারলৌকিক দেবতাদিগের সংশ্রব এড়াইবার জন্য এই তিন গ্রন্থে যে কশ্যপের এক পত্নীর নাম “মহু” ছিল, উহা কাটিয়া উহার স্থানে “মুনী” বসাইয়া দিয়া তৎ পুত্রগণকে—

বিনতা কপিল্য মুনীঃ ॥ ১২।৬৫ অ

মৌনেয়াঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ। ৬৫ অঃ। আদিপর্ব্ব



বলিয়া দাগাইয়া দিয়া ছিলেন। কিন্তু এ সরস্বতীর ভাণ্ডারে কি “মৌনেয়ঃ” নামে কোনও জন্তু বিদ্যমান আছে? বলা বাঞ্ছন্য যে এই মাতা মমুর সন্তানেরাই ( ২য় বরুণ বা Uranas পভূতি ) মানব নামের বিষয়ীভূত—পরন্তু “মৌনেয়ঃ” নামের নহে। কিন্তু মহাভারতের ঐ স্থানের ৩৪টি শ্লোক পরেই—“অনবন্তাঃ মমুঃ” ৪৫।৬৬অ বাক্য বর্তমান, কৃত্রিম কঠোর চক্ষে ইহা পড়ে নাই। ঐ অনবন্তা মমু কি মেয়ে মানুষ ছিলেন না? এই কারণ আমরা মহাভারতের ত্রায় অথর্ব বেদেও বরুণকে মানুষ বলিয়া সংস্কৃতিতে দেখিতে পাই। যথা—

যোদোবো বরুণো যশচ মামুযঃ। ৬০৫ পৃঃ ১ম খণ্ড।

যে বরুণ ( Uranas ) দেবতাও বটেন, আবার মাতা মমুর সন্তান বলিয়া “মামুযঃ” অর্থাৎ মমুযাও বটেন। এই মানবগণ স্বর্গে দেবগণের সহায় ছিলেন। ইহারা উভয় দলই পরাভূত হইয়া স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করেন। তৎপর মমুযোরা ভারত হইতে আবার তুরুক ও পারস্তাদিতে চলিয়া যান। উক্তকৃষ্ণকৃষ্ণজুয়ি—

প্রাচীনবংশঃ করোতি দেবমমুযা দিশো বাভজন্তু,

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ। প্রতীচীং মমুযাঃ

উদীচীং বৃদ্ধঃ। ৩৬০ পৃঃ

স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দেবতারা ও মমুযাগণ চারিদিকে ঘাইয়া প্রাচীন বংশের পতন করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব দিকে বসায়; বৈবস্বত মমু, অত্রি এবং শম্ভু প্রভৃতি পিতৃলোক ( Father-land ) বাসীগণ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, কুরুগণ উত্তরে ( এ বহু পরের কথা ) এবং মাতা মমুর সন্তান মমুযাগণ পশ্চিমে তুরুক ও পারস্তাদিতে গমন করেন ( উত্তর ও বহু পরের কথা )। কেননা এ সময় উত্তরে সাহিবরিয়া এবং পশ্চিমে তুরুক আফ্রিকাদি স্থলে পরিণত হইয়াছিল না। মমুযোরা ভারতহইতে পশ্চিম গমন করেন। উক্তকৃষ্ণ—

মমুযান্ অন্তরীক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০৮ অঃ যজ্ঞঃ

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু মাতা মমুর সন্তান মমুযাগণকে অন্তরীক্ষ বা তুরুক, পারস্ত ও আফগানি স্থানে লইয়া যান।

যাহা হউক এতদ্বারা জানা গেল যে কৃষ্ণপের মমুনায়ীও এক স্ত্রী ছিলেন, মমুযা—মানুষ ও মানবগণ তাঁহারই সন্তান-সন্ততি। ভগবান্ মমুও বলিতেছেন যে—

যজুর্বেদন্ত মামুযঃ। ১২৪।১ অঃ

যজুর্বেদ মানুষ অর্থাৎ মমুযালোক তুরুকাদিতে প্রণীত। ( মামুযে মমুযালোকে ভবঃ—মামুযঃ )। এই যজুর্বেদীয় মমুযাগণই মুসলমানের ভয়ে তুরুক পারস্ত ও আফগানিস্তানহইতে পুনরায় ভারতে আগমন করেন। ঐ সময় পার্শ্বীরাও ভারতে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ফলতঃ ভারতের সামবেদীয় ও ঋগবেদীয় ব্রাহ্মণগণ দেবতা ও যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণই ( ব্রাহ্মণ ও বৈবস্বত )। তবে মমুযোরাও দেবতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে সামবেদীয় ঋষি ছিলেন।

আচ্ছা বেদেও সকল শাস্ত্রের আদর্শ, তবে বেদে কেন মাতা মমুর কোনও সন্তা দেখিতে পাওয়া যায় না? কেন দেখিতে পাওয়া যায় না? সামবেদীয় ঋগ্যেও পক্ষি আছে—

জাতঃ পরেণ ধর্মণা বৎ সৃষ্টিঃ সহাভূবঃ।

পিতা বৎ কণ্ডাস্ত্রায়ে ॥ শ্রদ্ধা দাতা নমুঃ কবিঃ ॥

৫১ পৃঃ জীবানন্দ সংস্করণ।

অগ্নি অগ্নিকদিগের দ্বারা অরনীসংঘর্ষে উৎপাদিত।—পিতা কষ্টপ ও শ্রদ্ধাবৃত্ত মাতা মনু উক্ত অগ্নির উপাসক ছি লন।

সায়ণ, মাতা'ক পৃথক্ করিয়া মনুকে পুরুষ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে মন্ত্র প্রণেতা ঋষি কেন কষ্টপের একটি পিতা-বিশেষণ দিবেন? ফলতঃ—

পিতা কষ্টপ ও মাতা মনু।

এরূপ অধ্যয় করিতে হইবে। অতঃপর আমরা ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বিষ্ণু, সূর্য্য ও “মনু জাত” শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই মনু জাত শব্দের মনুই মাতা-মনু বটেন।

তন্ময়ে বহুন্, রুদ্রান্, আদিতান্ যজ্ঞস্বরং জনং মনু জাতং। ১।৪।১ অ।

হে অগ্নে তুমি অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য এবং মাতৃ মনু প্রভব উত্তম যজ্ঞকারী মনুয়গণকে দান কর।

বেশ জানা গেল যে স্বয়ম্ভুব মনুর প্রপৌত্র আদিত্যগণ মানব বা মনু জাত নহেন।

আমরা ষষ্ঠা যাগ বলিগাম, তাহাতে আশা করি যে অতঃপর আর কেহ মাতা মনুর আবিকৃষ্টাকে কলহসের দ্বার পাদাভ্যন্ত করিবেন না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

## উজ্জ্বলিত।

—:~:—

আমি উজ্জ্বলিত কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের বরা ধান,  
আমার সাধা কোথা তাই করি গো মুক্ত করে দান  
নিগ্ন আমি বেড়াই পুঁজি  
জমনো কোথায় আমার পুঁজি,  
টাটকা বোঁটায় কোন কোটা ফুল হঠাৎ হ'ল স্নান  
উজ্জ্বলিত কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের বরা ধান।

( ২ )

সুদূর গীতের সুরের লাগি পেতেই থাকি কাণ  
আকুল করে ব্যাকুল করে বরা ফুলের ভ্রাণ।  
কোন তারাটি ফুটলো আগে  
সেইটা আমার চোখেই জাগে,  
পপড়ারাদের দেখছি শুধু আমার দিকেই টান  
উজ্জ্বলিত কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের বরা ধান।

( ৩ )

অঙ্ককারের দাপট সহি, হেরি আলোর বান,  
 আমি দুখের নিষাদ, সুখের বিষাদ নিত্য করি পান  
 চায় যে সদাই আমার পানে  
 কাতর ভাবে মলিন ম্লানে  
 দিনের চেয়ে সঙ্গী আমার সঙ্কী শ্রিয়মাণ  
 উজ্জ্বলিত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের করা ধান ।

( ৪ )

আমি নই ডুবুরি তুলতে নারি মুক্ত মণি-খান  
 উচ্চ তবু তুচ্ছ করি পাণ্ডুর দান ।  
 চকোর আমি মিটাই ক্ষুধা  
 পিণ্ডে শুধু তাঁদের সুখা ।  
 নইক আমি পিক পাপিয়া নাইক মিঠাগান ।  
 আমি উজ্জ্বলিত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠে করা ধান ।

( ৫ )

আমি স্বাধীন চাতক দেবের খাতক বন্ধুভরা মান  
 পারিজাতের পাঁপড়ি করা জলেই করি স্নান ।  
 বিশ্বদেবের চরণ ঘেমে  
 মন্দাকিনী আসেন নেমে,  
 আমার তৃষ্ণা ক্ষুধা দুঃখ ব্যথা হয় যে অবসান  
 আমি উজ্জ্বলিত্তি কুড়িয়ে বেড়াই মাঠের করা ধান ।

শ্রীকুমদরঞ্জন মহলিক ।

## শুণুরে পাণ্ড !

—:~:—

পথিক! তুমি সুদীর্ঘকাল ধরে অবিরাম গতিতে কি যেন একটা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ নর? আহা, আজ তুমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এস এস বন্ধু, আমার এই সাধের কুরুক্ষেত্রের অস্থল মূলে একটু বিশ্রাম কর। এস আজ মানব-জীবনের মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ করা যাক।

এই মানবজীবন—এই না বড় সাধের মানবজীবন একদিন শাস্তির পিপাসায় পঞ্চনদের শ্যামলতীরে জ্ঞানের পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিল, নদীদুপুরা শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশে প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা আনিয়াছিল, গয়াক্ষেত্রে বটমূলে বসিয়া স্নেহামল রাজতন্ত্রের বিনিময়ে ‘অহিংসা পরমোদ্যম’ লাভ করিয়াছিল, বীরপ্রসূ মহারাষ্ট্র ভূমে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তের বিজয় নিশান উড়াইয়াছিল, সাগরমেখলা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়াও চণ্ডালস্ব স্বীকার করিয়াছিল, অতিথিপূজার নিমিত্ত পুত্রশিরে খড়্গ হানিয়াছিল, ক্রশবদ্ধ হইয়াও হাসিমুখে ক্ষমা করিয়াছিল, সহস্র প্রকারে নির্যাতিত, লাঞ্চিত হইয়াও মানবমহামিলনমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু, শাস্তি মিলন কই?—প্রাণ জুড়াল কই?—সাপ মিটিল কই?

এই মানব জীবন—ভারতের তপোবনে দাঁড়াইয়া ধর্ম প্রচার করিল, মিশরের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিল, গ্রীসের উপত্যকায় দাঁড়াইয়া সৌন্দর্যের মহিমা ঘোষণা করিল, রোমের পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নীতিশিক্ষা দিল, ফরাসী প্লাজনে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতার ভেদী বাজাইল, পারস্যের উদ্যানে বসিয়া পবিত্রতার মূর্তি দেখাইল। কিন্তু, তা হ'ল কই ভাই?

এই মানবজীবন—প্রেমের সমাধিমণ্ডপে ‘তাজ’ নিৰ্ম্মাণ করিল, প্রেমময়ী পত্নীর স্বপ্ন সফল করিবার জন্য শূন্য উদ্যান রচিল, নখরদেহ রক্ষা করিবার জন্য পিরামিড সৃষ্টি করিল, শিল্পের পরাকর্ষ্য দেখাইবার জন্য পিস্তলের প্রতিমূর্তি, বিখ্যাত স্নানাগার, পম্পেয়াই নগর, পাথিনন, ভুবনেশ্বর মন্দির প্রভৃতি গঠন করিল, প্রাণের সখ মিটাইবার জন্য “উপবে জাহাজ চলে নৌচে চলে নর” সেই টেমস নদীর স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিল, শত্রুকে উপেক্ষা করিবার জন্য মহাপ্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিল। কিন্তু, তবু ভরিল না চিত্ত।

এই মানবজীবন—অমৃতের সন্ধানে উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ, জ্যোতিষ মণ্ডল, ভূমণ্ডল সব তন্ন তন্ন করে—অমূল্যলন করিল, বৃক্ষ হইতে আপেল পতিত হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গেল, ভ্রমর গুঞ্জন শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় পুষ্পাদ্যানে মধুপান জীলা উপভোগ করিতে গেল, রমণী ভুবনমোহিনী রূপের লালসায় সমুদ্রে বাণ দিল, কোকিলের কুহু শুনিয়া চকিতেই নায় চাহিয়া রহিল, গভীর গবেষণা করিতে করিতে ষড়দর্শনাদি বিবিধ তত্ত্বের দৃষ্টি করিল, গণিত বিদ্যার প্রভাবে পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে চাহিল, ঐশ্বর্যের উন্মাদনায় জগৎ জয় করিবার আশায় কত নরহত্যা করিল, গৌরীশঙ্কর হইতে রামেশ্বর, জেরুজালেম হইতে কামাখ্যা মন্দির পর্য্যন্ত কত তীর্থ পর্য্যটন করিল। কিন্তু, মিলল না—মিলিল না “পরশ-পাণ্ডর”।

ভাই পথিক, আরো দেখতে চাও? তবে দেখ। পুরাতনের চিতাভস্মের উপর বর্তমানের প্রজ্জ্বলিত চিতার পাশে শাস্তিবারি হাতে নুতনের বিশ্ববিমোহন ছবি দর্শন কর।

এই বর্তমান মানবজীবন কি কঠোর সাধনাই না করিল? ভাবিলেও চক্ষু স্থির হইয়া যায়। বিজ্ঞান বলে ত্রিলোক বিজয় করিল। বম্পরথ, বায়ুরথ, অণুব পোত, তার হীন বাকী, সৌদামিনী দূতী, হাওয়া গাড়ী সম্মোহন-কারা যুদ্ধ কোশল, বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালী, জলে স্থলে আকাশে অব্যাহত গতি, সমস্তই বিজ্ঞানের থেলা। সুসংস্কৃত রাজনীতি, নববিধানের সমাজনীতি, সমুন্নত বাণিজ্যনীতি ও সমাজিত শাসন প্রণালী এ সবই বর্তমানের কার্য—কঠোর সাধনার ফল। কিন্তু, কি ত'ল?

সুখের লাগিয়ে যে ঘর বাধিলু

অনশে পুঁড়িয়া গেল।

অমিয়া সাগরে সিনান করিতে

সকলি গরল ভেল ॥

যে শাস্তিবস্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য মানব এতদিন ধরে সামর্থ সংগ্রহ করিল, সে যজ্ঞের বাহিত্রি মঙ্গল লাভ হ'ল কই? সীমার মাঝে অনীমকে উপলব্ধি করিল কই! যা পেলে অপূর্ণ প্রাণ পূর্ণ হবে—থুঁজে মরা চুকে যাবে—পিঞ্জরের দ্বার খুলে যাবে—মুক্ত আকাশে স্বাধীন বিহঙ্গের মত পাখা মেলে ঘুরে বেড়াবে—তা পাওয়া গেল কই? ওগো, কবে ঘাটে বাধা শূন্য তরীতে সেই বাহিত্রিধন কাতারী সেজে এসে প্রেমের বাদাম তুলে দিয়ে মানবের মহামলনের সাগর সঙ্গমে ছুটে যাবে?

পণিক! এ দৃশ্য আর কি দেখা যায়? গর্ভাক্ত মানবের পাশবিক অত্যাচারে, পুতিগন্ধময় স্বার্থপরতার ও পৈশাচিক ঔদ্ধত্যে শাস্ত্র জগৎ বপয়ান্ত্র বিধ্বস্ত বিলোড়িত। কণধার হীন ক্ষুদ্র তরলীখানির মত পৃথিবী টলটলায়মান। ধর্ম্ম নির্বাক্ত। কর্ম্ম স্বার্থ চুটে, ছি! ছি! বর্তমান জগতের দৃশ্য দেখিলে প্রাণ কেঁদে উঠে। লজ্জার ঘুণায় রোষে হৃদয় অস্থির হ'য়ে উঠে। মনে হয় দ্বাদশ রুদ্রের তেজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বর্তমানকে ভষ্ম ক'রে তার উপর নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা করি, অথবা সেই দেশে চ'লে যাই যেখানে স্বজাতি বিদ্বৈষ নাই—দলাদাঁল নাই—মাছুষ মাছুষের উপর অত্যাচার করে না সবল দুর্বলকে পিশিয়া মারিতে চায় না—সতীকে বনবাস দিয়া বারাক্ষনাকে পাবত্র হৃদয় সিংহাসন বসায় না—ছুটে যনার পীড়ক লম্পটকে রক্ষা করিয়া অক্লান্ত আদর্শকে থক্ব করে না—সজ্জন সচ্চারিত্র অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষকে বাতুল বা Old fool উপাধি দিয়া অসচ্চারিত্র লম্পট গিণ্টী করা মাকাল ফলকে আদর্শে সিংহাসনে বসায় না। যেখানে আত্মোপসোন ভূতেষু লয়া কুর্কস্তি সাধবঃ সেই দেশে চ'লে যেতে সাধ হয়। বাদের আত্মজ্ঞান কাণ্ডজ্ঞান কিছুই নাই তারা আবার মাছুষ? যারা দারিদ্র্যত্ব উদ্যাপন করে না, কাঁটা বিধিলে কি বাতনা তা জানে না, হুঃখের দাবাবলে বিদগ্ধ ও বিগুহ্ন হয় নি তারা আবার মাছুষ? বাদের আত্মসম্মান বোধ নাই, যারা অগৃহে প্রবাসী, আত্মোন্নতির প্রয়াস বা প্রচেষ্টা বিচুই নাই তাদের মাছুষ বলিয়া সভ্য বলিয়া—গর্ব্ব করা শোভা পায় না। তারা যদি মাছুষ হয় তবে বনের পশু দেবতা।

তারা জানে না যে দিন দর্পণ আবিষ্কার করিয়া মাছুষ সর্বপ্রথমে নেত্র উন্মীলন করতঃ নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছিল আর জগতের পানে চাতিয়াছিল সেই দিন সে শুভ মুহূর্ত্তে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়—মানবজাতির ইতিহাসের (৩ম দিক গনেশ) লিখিতে হয়। সেই দিন আদি মাছুষ তার স্বরে মানবসমাজে ঘোষণা করিয়াছিল—

আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যাতি যো নরঃ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥

যেদিন ঐ মহাবাক্যের সত্যতা প্রত্যেক মানবহৃদয়ে তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে, যেদিন ঐ বীজ অকুরিত পল্লবিত হইয়া নির্ঝিল বিশ্ব চাউয়া ফেলিবে সেই দিন জগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৎপূর্বে নহে। যখন মানব বুঝিবে। বরাট মানব সমাজ নারায়ণের দেহ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উহারই এক একটি ফুলঙ্গ মাত্র, যখন বুঝিবে “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,” যখন বুঝিবে একের সাহায্য ব্যতীত অপরে হয়, অন্ধ নয় পক্ষ, যখন পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে সেইদিন, ওগো সেইদিন বিশ্বমানব-সভ্যতার স্বপ্ন সত্য হইবে। যদি সম্ভব হয়, প্রকৃত শান্তির হিলোল সেইদিন প্রবাহিত হইয়া জগতের ক্লীবতা, শঠতা, দীনতা, হীনতা অপহরণ করিবে।

পথিক ! বল দেখি। এই যে মানুষ, সূত্থের অন্বেষণে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে শত রুদ্রের তেজে কঠোর সংগ্রাম করিল তাহাতে কি লাভ হইয়াছে। ব্যক্তিগতের সন্ধান পেয়েছ কি ? বরং রাশি রাশি চুংথের ঝটিকা এসে তার সূত্থের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। কখন আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিছ হায় ; কখন—আরো চাই আরো আলো চাই ; কখন—জ্ঞান সমুদ্রের তীরে উপলব্ধি মাত্র সংগ্রহ করিতেছি ; কখন—মাছ মারা ত হ'ল না ভাই কাদা মাথা সার হ'ল ; কখন—উন্নত পতঙ্গ প্রায় অনলে পুড়িছ হায়, কখন—আর গুনিব না গুনিব না মধুপবকার—বালিয়া নৈরাশোর তপ্তশ্বাস ফেলিতে গুনিয়াছি।

পথিক ! এস। ভুলে যাও মানবসমাজ ; ভুলে যাও ভারত, গ্রীস, রোম, মিশর ; ভুলে যাও তাজ, ভুবনেশ্বর, পশ্চিম-অজান্তা গুহা ; মুছে ফেল স্মৃতিপট হ'তে বিশ্বক্ৰান্তের ছবি। একবার এসে নিজ্জন প্রান্তরে দাঁড়াও। চেয়ে দেখ,—প্রশান্ত নেত্রে চেয়ে দেখ মানুষ কি ক'ছে। মোহিনী মায়া মনোমোহিনী বেশে মায়া-মুরলী বাজিয়ে ব্যক্তির আগে আগে চ'লে যাচ্ছে—আর মানুষ মস্তমুগ্ধবৎ পেছনে পেছনে ছুটছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অনবরত ছুটছে—হাসছে—খেলছে, আর স্রোতের মুখে ত্বণের মত ভেসে চ'লে যাচ্ছে। শেষ নাই—অন্ত নাই। তাই নয় কি ?

ভাই পথিক ! আমিও ভেসে ভেসে যাচ্ছিলাম। ঠাঁও এখানে থেমে পড়েছি। কেন জান ? একটা স্বর, তেমন স্বর—তেমন মধুর স্বর আর কখনও শুনি নাই, জানি না কোথা হ'তে ভেসে এসে ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল মোর।’ আর যেতে পাল্লাম না। সে স্বরের অর্থ আছে। বলে যা সত্য ভাবছ—সে শুধু মায়া। তুমিও শুনি ঐ বাঁশী ক'ছে—

“দেবীহেমা গুণময়ী নন মায়া দূরত্যাগী।”

তাকে ধরলে তবে ঐ মায়াপাশ ছিন্ন হবে। ঐ শুন ভাই—

“মানব যে প্রপদাস্তে মায়া মেতাং তরুস্থিতে ॥”

র'লে বাঁশী আবার বাজছে।—যদি শুনতে চাও তিন কে, তাও শুনতে পাবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অবস্থান কর। ঐ শুন বাঁশী চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং—বলে আত্মপরিত্যগ প্রদান কচ্ছে। ওগো, তাঁকে খুঁজতেও বাঁশী দূরে যেতে হয় না। তিনি নিকটেই থাকেন। নবদ্বার অবরুদ্ধ ক'রে মাতৃশক্তিকে জাগাও। মার হাতে চাবী আছে। তিনি রত্নমন্দিরের দ্বার খুলে দেবেন। তখন দেখতে পাবে ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি। তিনি যে তোমার ফুলবাগানের মালা—জদয় বৃন্দাবনের বনমালা। মুরলী সদাসংসারী রাধা—রাধা বৃন্দে তোমার ডাকছেন। বিশ্বমোহিত তুমি আত্মবিস্মৃত হেতু সে ডাক শুনতে পাচ্ছ না।

পথিক জীব! তুমিই যে পরা প্রকৃতি রাধা। তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ যে—অপরেষমিতত্ত্ব নাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥—ভুলে গিয়ে বৃদ্ধি ভাব্ছ কবে কোন্ মাঙ্কাতার আমলে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণঠাকুর লীলা করেছিলেন। এখন তিনি পাষণ হ'য়ে গেছেন। না না তা নয়। তুমি যে তাঁর প্রাণ। তোমাকে না পেয়ে তিনি পাষণবৎ অবস্থান কচ্ছেন। “অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌরা রায়। কোন কোন ভাগাবানে দেখিবারে পায় ॥” তোমার দশা ভাবতে ভাবতে তোমার গৌরাঙ্গ কাঠ হয়ে গেছেন। তুমি রসময়ী। তোমা' ছাড়া শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হবে না। প্রেমময়কে ভাল না বাসলে তুমিও শাস্তি পাবে না। মায়ামরীচিকা তোমায় সতত দগ্ধ করিবে। তুমি আধা-শাস্ত—অপূর্ণ! প্রেমময়ের সহিত মিলন ব্যতীত পূর্ণ শক্তি লাভ করতে পারবে না। তোমার শূন্যল মোচনও হবে না।

পথিক! আর একটা কথা শুনে তুমি চ'লে যাও ভাই। তুমি যেন মনে করো না যে তিনি কাহারও নিকট স্থলভ কাহারও নিকট দুর্লভ হন। অনন্যচিন্তা হ'য়ে তাঁকে ডাকার মত একবার যে ডাকে তিনি তারই হন। হৃৎ সুচি, হৃৎ মেথর, হৃৎ চণ্ডাল এ আনন্দের হাটে আপন পর, ছোট বড়, বামুন চাঁড়াল নাই। সব এক দর। সমাজকে হয় ত দেখিবে—ঐ নীচ জাতিকে দেখে ঘৃণা কচ্ছে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। তুমি সে হীন আদর্শকে ধ্বংস করে অভিনব উন্নতিশীল আদর্শ সংস্থাপন করবে। মূর্খকে ডেকে বলবে ভগবানকে পেতে হ'লে ব্যাকরণতীর্থ হবার প্রয়োজন করে না। কেননা—মূর্খোবদতি বিষয়ে ধীরো বদতি বিষয়ে। দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দনঃ ॥ যারা সমাজের অতাচারে নিজকে অপবিত্রতা অস্পৃশ্য মনে করে, হীন হ'য়ে আছে—তাদের ডেকে ব'লে—ভাইরে, অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্বাবস্থায় গতোহপিবা। যঃ স্নরেং পুণ্ডরীকাকং সবাছ্য ভাস্তরং শুচিঃ ॥ সর্বদা মনে রাখিও জগতের ভবিষ্যৎ অধিকারী ঐ নীচ লাঞ্ছিত জাতি, আর একটি কথা মনে রাখিও ভাই—যদি কোন ভক্ত হঠাৎ পদস্থলিত হয় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিও “নমে ভক্তঃ প্রণম্যতি।”

পথিক! যাও ভাই এখন একবার তমসাবৃত মানব সমাজে যাও। আচণ্ডাল সকলকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করে বল গিয়ে—ক্লৈবাং মাংস গমঃ পার্থ নৈতৎত্ৰয়্যাপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়ং দৌৰ্বল্যং তাত্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ রে ভ্রান্ত জীব! তোরা উঠ। আর ঘুমাস্ নে। মোহ কালিমা ঘুচায়ে একবার নয়ন উন্মীলন কর্। চেয়ে দেখ্ দ্বারে কে। পথ ভ্রান্ত তোরা। তোদের পথ দেখাতে সনাতন শ্রীশ্রীপ্রভু আবার ভারতে অবতীর্ণ। তোরা প্রস্তুত হ'। রূপং দেহি জয়ং দেহি বলে মার চরণে আত্মসমর্পণ কর্। মায়াপাশ ছিন্ন করে মুকুরে স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর্। সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি কর। হৃদয়ের ধনকে উপলব্ধি না করলে তোর উদ্ধার বাসনা-সম্বন্ধে কখনই শাস্ত করতে পারবি না। পশুশক্তি দিয়ে প্রকৃতিতে বশ করা যায় না। পশুপতি হ'লে প্রকৃতি আপ্নি এসে ধরা দেয়। আত্মজ্ঞানী ব্যতীত প্রকৃতি-রমণ হওয়া যায় না। তোরা পশুপতি হ'। মাধ্ব হ'। আত্মানং বিদ্ধি। নানাঃ পন্থাঃ বিদ্যাতে অন্ননায়। ও শান্তিঃ ওঃ ॥

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

## চন্দ্রমণির জন্মকথা ।

—::—

( Ella-Wilcox )

সূর্য্য-কিরণ বাস্তু ভাল চন্দ্র-কিরণে—

উর্দ্ধে অধে ছুটতো পিছু পিছু ;

চন্দ্র-কিরণ আরক্ত মুখ, লজ্জা ভয়ে কম্পিত-বুক,  
পালিয়ে যেতো পাশ কাটিয়ে ঘাড়টা করে' নীচু ।

\* \* \* \*

সূর্য্য-কিরণ মনের কথা বলেই দিত খুলে,

প্রেমিক সে যে অসম-সাহসিক !

ঘিরে তাহার হৃদয়-ফাগুন জ্বলতো অমুরাগের আগুন,  
বুঝেও তাহা চন্দ্রকিরণ বুঝতো নাকো ঠিক ।

\* \* \* \*

পালাতো সে স্বপন-সম সামনে দিয়ে এর

কেশের গোড়ায় ঝরিয়ে তাম্রার জ্যোতি,

হায়—যদিরে ভাগ্য-বিধান, এদের মাঝেই এই ব্যবধান  
ঘুচিয়ে দিয়ে বদলে দিতে পারতো জীবন-গতি !

\* \* \* \*

এক গোধূলি-লগ্নে, যখন ক্লান্ত দিবসখান

পড়ছে লুটে সাঁজের অলিঙ্গনে—

শাকড়ে ফেলে বাজিতারে সূর্য্য-কিরণ হঠাৎ ভারে  
চাপতে গেল বুকের কাছে উল্লসিত মনে ।

\* \* \* \*

এদিকে ঐ বীর-প্রণয়ীর বাহুর বাঁধন-তলে

চমক খেয়ে লাফিয়ে উঠে লাজে—

প্রথম-প্রেমের পরশ লেগে, লাজুক মেয়ে দারুণ বেগে  
ছুটে গিয়ে লুকুলো এক গিরি-গুহার মাঝে

\* \* \* \*

\* একটি শিশুকন্যা, পক্ষান্তরে কবি কল্পিত চিত্রকান্ত মণি ।



সূর্য্য-কিরণ নাছোড়,—শেষে অনেক খুঁজে খুঁজে,  
 আন্লে টেনে বন্দিনীকে চিনে ;  
 সেই পাথরের বাসর ঘরেই ফেল্লে মালা বদল করে’  
 সাক্ষী রেখে মুমূর্ষু এক শ্রাবণ-সাঁজের দিনে ।

চাঁদের মতন কান্তি যে ঐ চন্দ্রমণিটী  
 ঐ যে মাণিক দীপ্তি-সমুজ্জ্বল—  
 তপন-প্রভা চন্দ্রমা আর, মিলে মিশে যেথায় সাকার  
 ঐটী তাদের দ্বন্দ্বশেষের সন্ধি-করার ফল ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

## বাঙাল বন্ধু ।

—:~:—

( ১ )

সে আত্র তিন বৎসরের কথা । আমি তখন সবেমাত্র ল’কলেজে ভর্তি হইয়াছি । দ্বারভাঙা বিত্তিংএর সিঁড়ি ভাঙতে তখনও অভ্যস্ত হই নাই ; তাহাতে তখন বেশ শ্রম বোধ হইত । ইত্নিংক্লাসেই এ্যাডমিশন্ লইয়াছিলাম । ল’ষ্টুডেন্টদের সনাতন ধর্ম্ম অমুসারে মাঝে মাঝে ক্লাসে বসিয়াই নাটক অভেল পড়িতাম । কখন কখন নোট টুকিতাম, আবার কখন কখন বা ওয়ার্ড বিত্তিং খেলিতাম । এজন্য মাঝে মাঝে নাম রেসপণ্ড করিতেও ভুলিয়া যাইতাম ; অধ্যাপকও সুযোগ বুঝিয়া বিবিধ বিশেষণে বিভূষিত করিতেন । কিন্তু আমরা ল’কলেজের ছাত্র—নির্দা প্রশংসার গভীর বাহিরে—তাহাতে আমাদের কিছুই আসিত যাইত না ।

সেনি কি জানি কেন নাটক অভেল, এমন কি একখানি ‘নাটক’ লইতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম । ক্লাসেও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলাম না । বিলম্ব হওয়ার একখানি খাড়ও মিলিল না । বাধ্য হইয়া লেকচার শুনিতে ইচ্ছুক হইলাম ; কিন্তু ভগবান বাদ সাধিলেন । লেকচারের বিষয়টির গুরুত্ব অসুভব করিয়া তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার আর ইচ্ছা হইল না, ক্ষমতাও হইল না । সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ছুই বন্ধুতে মিলিয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম ।

ছুই একটা কথার পর প্রমথ বলিল,—“হ্যা, ভালো কথা, তুই স্নরেন ঘোষ বলে কাউকে চিনিস্ বীক ?”

আমি চিন্তা করিলাম, “কেন বলত ?”

প্রমথ বলিল, “চিনিস্ কিনা তাহঁ আগে বল না ?”

একটু ভাবিয়া আমি উত্তর দিলাম, “সিটে এক সুরেন আমাদের সঙ্গে পড়তো বটে, কিন্তু সে তো ভট্টাচার্য। সুরেন ঘোষ ?”

প্রমথ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষ, ঘোষ ভট্টাচার্য নয় ! সুরেন ঘোষ, কবিতা টবিতা লেখে ?”

ঠিক এমন সময় অধ্যাপকের একটা বিশেষ বাক্য আমাদের প্রতিমূলে পৌছিল। বুলিলাম বাক্যটা লেকচারের বিষয়ীভূত নহে—এবং আমাদের সুরের ন্যূনা কিঞ্চিৎ চাড়া গিয়াছে।

তুই এক মিনিট গরুরোর মত এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া আমি বলিলাম, “আজকালকার কবিতা লেখার কথা ছেড়ে দে ভাই ! আমার এই মৌলিককার বউ—সেও কবিতা লেখে। ‘গঙ্গাজলে’ তার একটা কবিতা বেরিয়েছে, পড়িস্ নি ?”

মুখ হাসিয়া প্রমথ চিন্তা করিল, “তবি বেরোর নি ?”

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, “ছবি বেরবো ক রে ?”

প্রমথ উত্তর দিল, “কেন, আজকাল ত লেখক, অলেখক, সবারই ছবি বাঁর করা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে ! তা’রা চোর পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই ; তুইই দিস্ না, কেন ?”

প্রমথ তা সতে লাগিল।

আবার সে আমাকে প্রশ্ন করিল—“তুই তবে চিনিস্ না তাকে ? কি বলিস্ ? আচ্ছা, যখন তোরা মৈমনসিংহে ছিলি—”

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই আমি আনন্দে বলিয়া উঠিলাম “হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এইবার ! বেশ মনে পড়েছে ! সুরেন ঘোষ ত ? আমার দু’নোঁ ঘে একসঙ্গে পড়তুম্। আমাদের দুজনার খুব ভাব ছিল ! সেইই আজকাল কবিতা টবিতা লিখেছে নাকি ?”

প্রমথ বলিল—“খুবতো ভাব ছিল, অথচ চিন্তেই তো পারছিলি না ?”

আমি বলিলাম, “সাত আট বছর আগেকার কথা ভাই, ভাই ভাল মনে পড়ছিল না। কিন্তু তুই তাকে কি করে চিনিলি প্রমথ ?”

প্রমথ বলিল, “আমরা এক মেসে থাম যে ! কাল সে আমাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিল। তুই খুব বোটা হয়েছিস্ বলে’ প্রথম প্রশ্ন সে তোকে ভালো চিন্তে পাঠে নি। তাঁর বাবা সবজজ শুনেই তাঁর সন্দেহ দূর হয়েছে !”

আমি বলিলাম, “বাবাতো সেখানে মুস্কল ছিলেন !”

প্রমথ বলিল “তা’ সে জানে। সেইরকম এতদিন হয়ত তিনি সবজজ হয়েছেন। চ’না, ছুটির পর আমাদের মেস হয়ে যাবি ! তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। তাঁরও এই কাষ্টাইয়ার ; ই সেক্ষণে পড়ছে।”

আমি বলিলাম “না ভাই, আজ একটু কাজ আছে ; আজ আর হবে না। কাল বরং সুরেনকে নিয়ে একটু সকাল সকাল আসিস্। লাইব্রেরীতে দেখা হবে।”

( ২ )

সুরেনের সহিত দেখা হইবার পরই আমার কৈশোর স্মৃতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। সেই নদী তীরে সাক্ষা-  
জ্ঞমণ, পাণ্ডৗ মশাইর সেই কোমল কণ্ঠার অত্যাচার, সুরেনের মাতার সেই অনাবিল স্নেহ একে একে সবহ মনে  
পড়িতে লাগিল। বাণ্যকালের স্মৃতি বিশেষতঃ তখন হইলেও তাহা যে বড় মধুর—বড় আনন্দদায়ক !

পিতৃদেব যে বৎসর মরমনসিংহে বদলি হইয়া যান, আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। দিটিস্কুলে পড়িতাম।  
তখন হইতেই সুরেন আমার সতর্প ছিল। এদিকে সুরেনের পিতা, পিতৃদেবের অসীনস্থ কর্মচারী ছিলেন।  
এছাড়াও আমাদের পরস্পরের বাসাবাটী নিকটে হওয়ায়, আমাদের মেলামেশা ক্রিবার সবপ্রকার সুযোগ  
ঘটিয়াছিল।

ক্রমশঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি জন্মিতে লাগিল। পিতৃদেব কিন্তু নিরন্তর কর্মচারীর পুত্রের  
সহিত তাঁহার বংশধরের অতটা আত্মীয়তা পছন্দ করিতেন না। বাঙাল ছেলেরা নোংরা, অশিষ্ট, কেশ কেশে বহ্ন  
নাই, ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে জানেন না ইত্যাদি—তিনি সন্দেহা আমাকে বুঝাইতেন। কিন্তু যুক্তিতর্কের মধ্য  
দিয়া আপনাকে অগ্রসর করান তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার লালকণ্ঠই যে তাহার একমাত্র কারণ  
ছিল তাহা নহে; সুরেনেরা মাতা পুত্র আমাকে চুখকের মত আকর্ষণ করিয়া লইত। তাহাদের সহিত না  
মিশিয়া থাকিতে পারি, তখন আমার এমন সাধ্য ছিল না।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার মনের আর একটা গোপনীয় কথা আমি জানিতে পারিলাম। পিতার দৃঢ় বিশ্বাস  
ছিল, বিপ্লববাদীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙাল; তাহাদের সহিত মেলামেশা করিলে আমারও যে মতি গতি  
পরিবর্তিত হইবে না তাহাই বা কে বলিবে? বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে আসিয়াছি একথা যদি ঘুণাকারে প্রকাশ  
হইয়া পড়ে, তবে যে শুধু আমার উন্নতির পথ গর্নমেন্টে বন্ধ করিবেন তাহা নহে, পিতার চাকুরী লইয়াও বিষম  
গোল বাধিতে পারে। পিতা সন্দেহা আমাকে এ সব কথা বুঝাইতেন—কিন্তু আমি তাঁর একমাত্র সন্তান তাহাতে  
আবার শৈশবে মাতৃহীন; কাজেই আমাকে তাহার মনের মত গড়িয়া তুলিবার জন্য অত চেষ্টা স্বত্বেও  
আমাকে কণ্ঠার শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারিতেন না।

এ সব কথা যে একেবারে না বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু তবুও উপায় ছিল না। অবসর পাইলেই সুরেনও  
আমার কাছে ছুটিয়া আসিত—আমিও তাহার কাছে ছুটিয়া যাইতাম। কিন্তু কেন যে তাহাদের সঙ্গে শুধু আমার  
অত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুতেই তখন বুঝি নাই।

যে স্নেহলতার সুরেন আমাকে বাধিয়াছিল, তাহার বীজ সে তাহার মাতার নিকটই লাভ করিয়াছিল।  
আপনার জননীকে তেমন ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও তাহার জননীতে আমি মাতৃরূপ দেখিয়া ধন্য  
হইয়াছি। অমন স্নেহীলা রমণী আমি আজ পর্যন্ত আর ছুটি দেখি নাই। পরের সন্তানকে যে কেমন করিয়া  
আপনার করিয়া লইতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। মাতাকে কোন্ শিশু-প্রাণ উপেক্ষা করিয়া  
দূরে থাকিতে পারে!

একবারকার কথা আমার মনে পড়ে, বসন্ত রোগে আমি ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। সুরেনের কাছে  
আমার অবস্থা অবর্ণ করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমার কক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, আমার তখন মনে হইয়াছিল,

বিশ্বজননী যেন আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। ক্রমাগত কয়েক রাত্রি আমার শিয়রে জাগিয়া তিন আমাকে কালের কবল হইতে মুক্ত করেন।

স্বপ্নের মাতার এইরূপ স্নেহবারি সিক্তে আমরা বদ্ধিত হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে এমন একটা বন্ধন পড়িল, যে একের ক্ষণিকের অদর্শনও অন্য সহ্য করিতে পারিতাম না।

বাবা কিন্তু মাঝে মাঝে বলিতেন, “বাঙালদের ফাঁদে পড়ো না বাবা! ওরা বড় dangerous লোক! মন মুখ কখনও ওদের এক হ’তে দেখলুম না! আমি ত কম বাঙালের সঙ্গে কাজ করিনি—ওরা যে দেশ ছেয়ে ফেলেছে—ওদের যা কিছু কাজ কর্ম—শুধু উপরওয়ালাকে খুশী করবার জন্য! নিজের কাজ গুছোবার চেষ্টা! যাতে মাইনে বাড়ে, যাতে প্রমোশন হয়, ওরা শুধু সেই সব কাজ করে! স্বার্থের জন্য সব কর্তে পারে! কাজ কর্তে কর্তে ঘুণ হয়ে গেছি—আমার সঙ্গে চালা! আর কলকাতার লোক আমরা, চাল মারা যে আমাদের traditional; বাঙাল আজ আমার ওপর দিয়ে চাল মারতে চায়! হাসিও পায়! হুংগুং হয়!”

পিতৃদেব যাহাই বলুন না কেন আমি কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে আপত্তিজনক কিছু দেখি নাই। তাহার সরল উদার হৃদয়খানি আমার কাছে মুক্ত করিয়া তাহার হৃদয়ের নিভৃত অংশও সে আমাকে মে দেখাইয়াছিল! তাহা তো স্বচ্ছ, নির্মলই দেখিয়াছি! স্বপ্নেরও সত্য ব্যতীত আর কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতাম না। স্মরণে অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; জানিবার প্রয়োজনও ছিল না।

একদিন বাবাকে লুকাইয়া স্বপ্নকে সব কথা বলিয়াছিলাম। “তোরা এমন ভাই, ছিঃ আর তোদের সঙ্গে মিশ’বো না।”

স্বপ্নের শুনিয়া মুছ হাস্য করিয়া বলিয়াছিল “বেশ।”

কিন্তু সে আজ সাত বৎসর পূর্বের কথা। কালের আবর্তনে জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে পরিবর্তন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

( ৩ )

কয়েকদিন মেলামেশার পর বুঝিতে পারিলাম, স্বপ্নের পরিবর্তন হইয়াছে সত্য কিন্তু সে পরিবর্তন সুন্দর, বাঞ্ছনীয় এবং প্রার্থনীয়ও বটে। তাহার হৃদয় আরো প্রশস্ত—মন আরো উন্নত হইয়াছে। বিশ্বমানবকে সে আপনার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। তাহাদের পারিবারিক অবস্থাও কতক কতক জানিতে পারিলাম। তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে পিতা আবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখন তাহারা চারিটা ভাই—একজন আই.এ. এবং আর কয়েকটা স্কুলে পরিতোছে। নিজে এখনও বিবাহ করে নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া স্বপ্নের বহরমপুর কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজা বাহজুরের অর্থসাহায্যে চারি বৎসর সেখানে পড়িয়াছে। এবার বি, এস, সি, পরীক্ষার যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ল’ পড়িতে কলিকাতা আসিয়াছে।

নিজ পরিবারে ক্রমশঃ অর্থের অশুচ্ছলতা বাড়িতেছে বলিয়া পিতার নিকট হইতে কোন প্রকার নিয়মিত সাহায্যের আশা তাহার ছিল না। এক মাতুলের আশায় ভরসায়ই সে পড়িতে আসিয়াছে।

সে-দিন সন্ধ্যায় আমরা সমাজ-সমস্যা লইয়া একটু আলোচনা করিতেছিলাম। উত্তেজিত স্বরে সুরেন বলিতে লাগিল “তুমি বল কি ভাই, এট যে সে দিন হরেন মিত্রের ঘাট সত্তর বছরে বিয়ে করলে, কই, সমাজ তার কি কর্ত্তে পেরেছে? সমাজের হাত ততদূর পৌছায় কৈ?”

আমি উত্তর দিলাম “সে গাঁয়ের জমীদার, তার সঙ্গে কে লড়তে যাবে বল?”

সুরেন সমানভাবে বলিতে লাগিল,—“ঐ ত মজা! আজকালকার সমাজের কাবই হচ্ছে গরীবের টুটি চেপে ধরা, অত্যাচারের প্রতিকার করা তো তাদের ক্ষমতায় কুলোয় না! শাহা, বেচারি একে খেতে পায় না, তাতে ছ’ছোটো মেয়ের বে কোথেকে দেবে বল দেখি? তারই শেষে ধোপা নাপিত বন্ধ! সমাজে সেই একঘরে হ’ল! এ-সব কথা বলিই বা কাকে আর শুনবেই বা কে? আর হবেন বুড়ারই বা কি আকল ভাই? নিজে ত নিমন্তলায় সিট রিজার্ভ করেছে—বাড়ীতে পিথবা মেয়, এখনও ছমাস পোরে নি—আর এরি মধ্যে অন্নান চিতে একটা বিয়ে করলে—তাও বালিকা! উঃ, কি ভীষণ!”

আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

সুরেন তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল “পাশের ঘবে বাপ মাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করছেন, মদ-মাংসের সন্ধ্যাবহার চলছে—উপরে ঠেকেটিক্ আলো জ্বলছে—আর আর তারি মধ্যে ১২ বছরের বিধবা সংঘম শিখছে! কি চমৎকার আদর্শ! কি চমৎকার বন্দোবস্ত! এমনি আর কত কথা তুমি শুনে চাও ভাই?”

আমি তখনও কোন কথা কহিলাম না। সে আবার বলিতে লাগিল “মেয়েকে যদি সংঘম শেখাত চাও, তাকে যদি তপস্বিনী কর্ত্তে চাও, তবে তোমার বাড়ীশানিকে তপোবন করে তোলা দেখি? সবাই মাছ মাংস ছাড় দেখি? মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মতনই সবাই মিলে একাদেশী কর দেখি? পারবে?”

আমি বলিলাম “তা কি Practically সম্ভব?”

সুরেন বলিল “তবেই ভেবে দেখ দেখি? তোনশ পুরুষ শিক্ষিত হয়েছ, কলেজে প্রফেসরি, হাইকোর্টের জজ হয়ে কত কঠিন কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করছ, তোনাদের পক্ষে যদি তা’ অসম্ভব বোধ হয় তবে এক সামান্য বালিকার পক্ষে তা যে কত কঠিন তা কি তুই বুঝিস না ভাই?”

সুরেন আমাকে নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিল, “এ তোমাকে স্বীকার কর্ত্তেই হচ্ছে ভাই, যে আমাদের মেয়েদের উপর আজকাল বড় অত্যাচার হচ্ছে—আর তা’ চুদিক থেকে—এক পারিবারিক আর এক সামাজিক!”

আমি বলিলাম—“কথাটা ঠিক তা নয়—তার চেয়ে বরং ঐ বলতে পার যে পুরুষেরা তাদের কর্ত্তব্যের গাঙার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের প্রতিরোধ কর্ত্তে কে? হিন্দু বিধবার সংঘ ও ত্যাগীলতা হিন্দু নারীর সত্য ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখনও যে আমাদের সমাজের ভিত্তি অটুট রেখেছে। নইলে আমাদের আর আছে কি ভাট?”

সুরেন বলিয়া উঠিল, “সেই জন্যই ত হিন্দু নারীর অসম্মানে, তার প্রতি অত্যাচারে আমি অত আঘাত পাই! আর তাই ত তোর যেনু আজ এতক্ষণ ধরে ঝগড়া করছি!”

আমি বলিলাম “সত্যি ভাই, কিন্তু বলত সুরেন,—আমরা ত বুঝি সব, জানি সব, তবু এর প্রতিকার হচ্ছেনা একটুও কেন, বলতে পারিস্?”

সুরেন এবার হত্যাশের হাসি হাসিয়া বলিল “নিজেদের দিয়েই ত বুঝতে পারি বৌরু, আমরা পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাশ হয়ে শিখছি যে কেবল কথা,—কেউ বা পুরাতনের ধ্বজা ধরে, কেউ বা নব্য সভ্যতার চরমে উঠে—জোর গলায় তার প্রচার করে নিজকে জাতির করতে চেষ্টা পাচ্ছে বৈ ত নয়! অধিকাংশ বাঙ্গলা কাগজ খুললেই এ কথাটা স্পষ্ট হবে—এই এ-দিনেই একজন বিজ্ঞ সমালোচক নারীর সম্মান দেখাতে গিয়ে—আমাদের সমাজে তাঁদের অতি উচ্চ স্থান ছিল ও আছে সেটা বুঝতে বসে নিজেই, কোন মহিলাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করবার প্রবৃত্তিটা ছাড়তে পারেন নাই, এতে কি প্রকাশ পায় বগত? ঐ হৃদয়টা;—শিক্ষা শিখিয়েছে কথা—প্রাণটার উন্নতি হয় নি,—তাঁর চোকে কথা কহতে চাইলেও সময় সময় অজ্ঞাতে উদগার উঠে পেটের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে; এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল নাই ভাই! উচ্চ শিক্ষার যাকে শোধরাতে পারে নি, কথা কাটাকাটি করে কি তা শোধরায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম, সত্যি!—“উঃ, কি তর্কটাই হ’ল, লিখলে যে একটা প্রবন্ধ হয়ে যেত।”

এমন সময় হঠাৎ প্রমথ আনিয়া উপস্থিত হইল। সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “কি রে কবিতা আড়াছিন্ন বুঝি?”

আমি বলিলাম, “হ্যাঁ, ভালো কথা শুরু! তোর কবিতা ত আজকাল দেখতে পাই না। তবে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ টবন্ধ দেখি বটে। কবিতা লেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?”

সুরেন বলিল, “লিখলে কি হবে! ছাপে না যে! ওই যে প্রবন্ধ বেরোয় দেখ ওকি ভালো হয়েছে বলে বেরোয়? না, তা নয়? কেন শুনবে? একে ত গদ্য রচনায় অনেকটা জায়গা কভার করে, তাতে আবার সম্পাদকেরা গদ্য রচনা কম পান। কাজেই বাধা হয়ে ছাপতে হয়। এখন বুঝলে? আর কবিতার সৌভাগ্য কি ভূভাগা বলতে পারি না—প্রতিদিন গড়ে অন্ততঃ পাঁচটা কবিতা ‘গঙ্গাজল’ অফিসে যায়! second class এর ছাত্র থেকে সাবডেপুটী পর্যন্ত কবি! একবার ভেবে দেখ দেখি ব্যাপারটা!”

প্রমথ গিজ্ঞাসা করিল “literature এ যখন তোর test আছে তখন তুই Arts পড়লি না কেন ভাই? কত ভালো ভালো বই পড়তে পারিস্?”

সুরেন উত্তর দিল “Science পড়লি কি আর literature এ test থাকতে নেই? এই তোরা ত arts পড়েছিস্,—আমার চেয়ে খুব বেশী বই পড়েছিস্ কি? আমার তো তা’ মনে হয় না!”

প্রমথ উত্তর দিল “বেশী? তোর অঙ্কে ক বই আমি পড়িনি! কি করে এত পড়িস ভাই? ছোটবেলায় শুনেছিলাম, বাঙালরা চাঁল চিঁড়ে বেঁধে বাড়া গেছে বেরোয়, পড়াগুলো একেবারে শেষ করে তবে বাড়ী ফেরে। এখন তা চোখে দেখছি। কি ক’রে অত পড়িস বলত?”

সুরেন বলিল “আমরা যে গরীব! একবার ফেল কলেই পড়াশুনা শেষ! পাশ যে কর্তেই হবে! তাই বাধা হয়ে পড়তে হয়।”

প্রথম বলিল—“ল’ বই তুই কি এত পড়িস্? monotonous লাগে না? ভালো বা দুদিন মাঠে বেড়িয়ে এলি, দু এক দিন থিয়েটার বায়োস্কোপে গেলি, তা না হ’লে ভালো লাগবে কেন? Stimulant পাবি কোথায়?”

সুরেন বিনয়ের সহিত বলিল “গরীবের আবার stimulent কেন ভাই? যারা খেতে পড়তে পার না, তাদের আবার বায়োকেমপ থিয়েটার!”

প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—“তা আমি আগে থেকেই জানি! বাঙালদের প্রাণে কোন সখ নেই! আশ্চর্য্য!”

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করিয়া থাকার পর সুরেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “আমি সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম তার কি হ’ল ভাই? আমি যে বড় বিপদে পড়েছি!”

আমি বলিলাম, “চেষ্টা করছি কোন একটা খোঁজ পেলেই তোকে জানাব!”

সুরেন বলিল “খোঁজ পেলে জানাব বললে হবে না ভাই, আমাকে সংগ্রহ করে দিতেই হবে।”

প্রমথ বলিল “কিরে বীর!”

আমি উত্তর দিলাম “এই একটা কাজকর্ম, টিউসনী ফিউসনী।” প্রমথ সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “তোদের বাঙালদের আলায় যা হয়। আর কি টিউসনী পাবার যো আছে? সেদিন কি কাণ্ড হয়েছে শোন বীর! এক ভদ্রলোক শুনে দিন খুঁজতে এসেছেন আমার কাছে গ্রাজুয়েট টিউটার; ফিফথ ক্লাসের ছুটি ছেলেকে পড়াতে হবে—রাতিরে দু ঘণ্টা করে, মাইনে শুনেছিস্ আট টাকা। আমরা ত শুনে সব অবাক! তিনি বলেন এতে অবাক হবার মত কিছু নেই মশাই! ল’ কলেজের কত ছেলে পাওয়া যাবে দেখবেন! এই এর আগে যিনি ছিলেন তাঁকে ত সাত টাকা করে দিতুম, তিনিও ত বি-এ। আমি বলুম, তা পেতে পারেন, বাঙালেরা নিতে পারে। যাদের আর পাঁচটা আছে তাদের পোষাবে। তবে আপনার ছেলের কিছু হয় কিনা তাই ভাববার বিষয়। খোঁজ নিয়ে দেখেচেন কি, মাষ্টার কিছু পড়ায়? না “পড়ে পড়ে লেখ” আর “লিখে লিখে পড়” বলেই মাস শেষে টাকা ক’টা হিসাব করে নেয়! ভদ্রলোক আপন মনে কি বকতে বকতে চলে গেলেন। এই ত ব্যাপার! টিউসনীর বাধ্যতায় তোরাই ত মাটা করলি সুরেন—কেন অত কম মাইনেতে স্বীকার করিস্ বল দেখি? তোদের কি একটুও Selfrespect নেই?”

“গরীবের আবার Selfrespect কি ভাই?”

প্রমথ একটু রাগিয়াই বলিয়া উঠিল “আচ্ছা অত যে ‘গরিব গরিব’ করিস, সেদিন তবে অত নবাবী চাল চাললি কেন? চেনা নেই, পরিচয় নেই, টিকিট হারিয়েছে কিনা, তারও কোন ঠিক নেই, তার কোন খবর তুই রাখিস না অথচ অস্বাভাবিক বদনে, টাকা ছোটো ফেলে দিলি? আমার নিষেধ না হয় নাহি শুন্লি, একবার নিজেও ত ভেবে চিন্তে দেখতে পারতিস্।”

সুরেন হাসিয়া বলিল “বুড়ো বয়সে কি আর এই সামান্য জন্ম সে মিথ্যা কথা বলেছে ভাই?”

প্রমথও ব্যঙ্গস্বরে বলিল “সেটুকু ধরবার বুদ্ধি থাকলে তোদের আর বাঙাল বলবে কেন?”

সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া সুরেন তাহার করুণামাথা মুখখানি দিয়া আমার কাছে এক বিনীত আবেদন জানাইল। আমিও তাকে যে কোন একটা কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম বলিয়া উঠিল—“ওরে চ চ। ন’টা বাজে যে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট যে কড়া, আবার হয় ত গেটবুকে নাম লিখতে হবে।”

সুরেন বলিল “চল যাই”। পরে আমাকে বলিল “আসি ভাই”। সেদিনকার মত তাহার বিদায় গ্রহণ করিল।

( ৪ )

তুই তিন দিন পর একদিন মাঠে হঠাৎ ক্রমখের সহিত দেখা। আমি তাহাকে সুরেনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল “তার কথা আমার জিজ্ঞাস্য করো না ভাই! ঘরে বসে কি করে না করে সেই জানে। একটু বেড়াবে না—কোথাও বেরুতে চায় না।” বাঙাল কিনা, শুধু লেখা পড়া নিয়েই ব্যস্ত!”

আমি বলিলাম “কেন? আমার ওখানে ত প্রায়ই যায়!”

প্রমথ একটু চাপা গলায় বলিল “তাও বড় ভালো নয় ভাই! অবশ্য তোমার দিক থেকে দেখতে গেলে।”

আমি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম “সে কি রে?”

প্রমথ তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল—“বল্ছি শোন। কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি, তুইও ভেবে দেখ। বাঙালদের সঙ্গে মেশা মেশা একটা কিছু নয়। ওদের যে নাম ডাক কি জানি ভাই কখন কি কাণ্ড বেধে বসে। ওর জন্য শেষে সবাই মারা যাবো?” আমি তাহাকে বলিলাম “তুই সে ভয় করিস্ না প্রমথ! ওকে আমি যেমন চিনি, আর কেউ ত তেমন চেনে না। আমি বল্ছি তোকে তুই বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে তেমন সন্দেহের কিছু নেই।”

প্রমথ বলিল “তা না থাকুক, বেশী নেলামেশার দরকারই বা কি? একে বাঙাল ছেলে, তাতে সায়েন্স টুডেন—তারপর আজকাল আবার ঘেরকম গীতা পড়তে আরম্ভ করেছে আমার ত ভয় হয় ভাই, কোন দিন বা সি. আই. ডি এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়।”

আমি বলিলাম “এ তোর কেমন যুক্তি প্রমথ? সায়েন্স পড়া একটা অপরাধ নাকি? ইন্টারেস্ট আছে, পড়েছে; কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই! আর গীতার কথা যা বল্হিস, গীত পড়তে ছোট বেলা থেকেই পড়ে। ওর বাবার যে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল, গীতা না পড়লে কেউ জল খেতে পারত না! আমার চেয়ে ত তুই ওকে বেশী জানিস্ না! আমাকে আর তুই নতুন কি বলবি?”

প্রমথ বলিল “আমরা বামুন হয়ে পৈতে সন্কোর খোঁজ রাখি না—আর ও কায়েত কি না ওর ধর্মজ্ঞানটা কিছু টুন্টনে! আবার এদিকে ডিম মাংস টাংস কিছু খায় না, তা জানিস্ বীক?”

আমি বলিলাম “সে আর নতুন কথা কি; সে সব তো ও কোন দিনই খায় না।”

প্রমথ বলিল “এই সভা যুগে বিশেষত: কলেজে পড়ে, বারা মটন চপ, ফাউল কারীর আশ্বাদ পায়নি তাদের তুই মানুষ বলিস্? সে দিন ওকে বল্লুম, চমুক, দেলথোস কাবিন থেকে ছাঁকপ চা খেয়ে আসি, তাতে কি বল্ল শুন্বি—বল্লে যে ওসব খাওয়া দাওয়া এ দেশে পোষায় না,—ওখানে কত রকমের লোক,—এক টেবিলে ব’সে, যা’তা’ খায়, ওখানে কি খেতে আছে? আমার ত ভাই শুনে চক্কাহির! কায়েতের ছেলে হয়ে বামুনকে ধর্ম শেখাতে আসে? তুই দেখিস্ বীক, আমি বলে রাখ্ছি, ও ঠিক একজন anarchist—ধর্মের কল নিশ্চয়ই একদিন বাতাসে নড়ে উঠবে!”

আমি মনে মনে তাহার শেষ বাক্যটির প্রতিধ্বনি করিলাম এবং ভগবানের কাছে তাহাই প্রার্থনা করিলাম।



সকালের অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিল। আমাকে বিশেষরূপে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া প্রমথ বিদায় গ্রহণ করিল। আমিও সুরেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিলাম।

বাস্তব ঘটনার উল্লেখ এবং যুক্তির অবতারণা দ্বারা প্রমথ যতই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন, আমি কিছুতেই সুরেনকে ভিন্ন চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। তাহার ব্যবহার, তাহার কার্যাবলী আমার কাছে চিরদিনই আনন্দদায়ক ছিল।

( ৫ )

প্রিয়জনের সামান্য উপকার করিয়াও হৃদয়ে যে একটা আনন্দ অল্পভূত হয় তাহাও ত কম প্রার্থনীয় নহে! অনেক অল্পসন্ধানও যখন সুরেনের জন্ত কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না, তখন পিতার সহিত যুক্তি করিয়া এক পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। তিনি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু আমার প্রার্থনা কিছুতেই নামঞ্জুর করিতে পারিলেন না। কিন্তু সুরেন নিজে গোল বাধাইল। পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সে কিছুতেই আমার মামাতা-মাইকে ( ছেলেটি আমাদের বাড়ীতেই থাকিত ) পড়াইতে স্বীকৃত হইল না। পড়া ছাড়িতে হয় তাহাও স্বীকার, তন্মূলে আমাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কথাটা শুনিয়া প্রমথ বলিল “বাঙ্গালদের আর কত বুদ্ধি হবে ভাই! গ্রাফা পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন তাতে লজ্জাই বা কি আর দোষই বা কি! কিজানি ভাই সে কি মনে করে যে তা’ সেইই বলতে পারে!”

কয়েক দিন পর সোভাগ্যক্রমে এক সুযোগ মিলিল। এলিজাবেথ স্কুলের একজন গণিত শিক্ষকের প্রয়োজন। আমি বন্ধুর বিজয়কে ধরিয়া বসিলাম। বিজয় উক্ত স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ছিল। স্কুলে ও সেক্রেটারীর নিকট তাহার যেক্রপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তাহার অহরোধ কখন ব্যর্থ যাইত না। বাঙাল বলিয়া বিজয় প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট তাহার শিক্ষা ও হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া বিশেষতঃ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জানিয়া সানন্দে প্রতিশ্রুত হইল। আমিও আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

ভগবানের দয়ার মহামায়া ঘোষণা করিয়া এবং আমার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সুরেন যথাসময় নিজকার্যে যোগদান করিল।

পৌষ পনের লইয়া ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম সুরেনের কর্মপটুতায় ও ব্যবচারে তাহার ছাত্র ও সহযোগীগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বন্ধুবরের এ প্রশংসায় আমারও বক্ষ ক্ষীত হইতে লাগিল।

এমান করিয়া ধীরে ধীরে ৮ পূজাবকাশ ও বড়দিনের ছুটি চলিয়া গেল।

( ৬ )

তিন চার দিন হইল সুরেনের সহিত আমার দেখা হয় নাই। প্রত্যাহ না পারিলেও প্রায়ই সে আমাদের বাড়ীতে কিন্তু কষ্ট এমন ত কখন হয় না! আমি সম্মুখে যেন একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিতে পাইলাম! বক্ষ তরু-তরু কাঁপিতে লাগিল।

প্রিয়জনের চিন্তায় অমঙ্গলের দিকটাই সর্বাত্মে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে! ভাবিলাম নিশ্চয়ই সে পীড়িত হইয়াছে। প্রমথও কলিকাতায় নাই, তবে আজ ফিরিবার কথা, তাহার সহিত দেখা হইলেই সব জানিতে পারিব! যদি প্রমথের দেখা নাইই পাই তবে বাড়ী ফিরিবার মুখে সুরেনের মেসে খোঁজ করিয়া আসিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কলেজে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ বিজয় আসিয়া উপস্থিত। তাহার মুখচোখের ভাব দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম! বিজয় বলিতে লাগিল “খুব friendকে recommend করেছিলে বীরা! না জেনে, না শুনে কি কখন এমন কাজ কর্তে আছে? এখন কি কাণ্ডখানা করে বসেছে, বল দেখি! সেক্রেটারীকে যে আমি মুখ দেখাতে পরছি না! তিনি শুধু বলছেন, বিজয় বাবুর জন্মই স্কুলটার দুর্নাম রটে গেল। নইলে বাঙালকে আমি কাজ দেই!”

একটা অনঙ্গল আশঙ্কা করিয়া আমার বগ্ন কাঁপিয়া উঠিল! উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম “হয়েছে কি বিজয়?”

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল “কেন তুমি জান না? সুরেন ঘোষকে যে পুলিশে arrest করে নিয়ে গেছে! anarchistদের ভেতর সে নাকি এক জন বড় চাই! এই দেখ না আজকার কাগজেও বেরিয়েছে—

কম্পিত হস্তে বিজয়ের নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া দেখিলাম—

আবার ধরপাকড়

পটলডাঙ্গায় খানাহল্লাসী

ছাত্রাবাসে বমাল ছাত্র ও শিক্ষক গ্রেপ্তার

ইত্যাদি পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। বন্ধের স্পন্দন থামিয়া গেল! ক্রমাৎ মুখ ঢাকিয়া ইজিচেয়ারে লুটাইয়া পড়িলাম।

বাবার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমথ বলিতে লাগিল “আমি বীরা’কে ক’দিন মানা করেছি জেঠা বাবু ও-তা’ কিছুতেই শুনত না। বলত না না সুরেন তেমন নয়, ওকে তোমরা চেন না কে কাকে চেনে এখন দেখ নি ত বীরা! হাজার ভাল মানুষ হোক বাঙাল ত!”

অনেক কষ্টে আমি প্রমথকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে গলা চড়াইয়া কহিল “শুন্বি আর কি—কালী মিত্রের ঘর যখন search হচ্ছিল বন্ধমানের সেই ছোকরারে—সুরেশ তখন করেছে কি দুখানি চিঠি ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে গিয়েছে! কিন্তু বাবা! সি, আই, ডি, দেব ত ফাঁকি দেবার যো নেই। তারা তা’ টের পেয়ে ওর তোরঙ্গ-ফোরঙ্গ সব search করে কতকগুলি যুগান্তর একটা পিস্তল আরো কি কি সব পেয়েছে! তারপর আর কি একেবারে স্বস্তরালয়ে! কেমন আমার কথা ফল্গ ত?”

বিজয় বলিল “দেখতে ত দিবা ভাল মানুষটা ছিল! কথা বার্তায় তো কিছু বোঝবার যো ছিল না! তলে তলে এত? ধনি যা হোক! বাঙালরা সবাই এমনি নাকি?”

সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ বলিয়া উঠিল—“সব—সব! ও খাড়া বাচ্চা কাউকে বিশ্বাস নেই! এই যে বীরা’র সঙ্গে ওর এত ভাব ছিল, বীরা’ই কি জানত যে ও এমনধারা লোক? আবার তেজ কত জানেন? ইন্স্পেক্টর যখন জিজ্ঞেস করলে যে এসব আপনি কোথার পেলেন? তখন বলল, “সে কথা বলতে ত আমি বাধ্য নই। সন্দেহ জনক জিনিষ পেয়েছেন—arrest করুন না! অত কথায় কাজ কি? তবে এটা ঠিক যে আমি নিরপরাধ।”

প্রমথের এই কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলেন। আমি যেন শত বৃষ্টিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল—“হ্যাঁ নিরপরাধ যে তাতো বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে! বীরা’কে চুপ করে রাখিলে!”

পিতা বলিলেন—“ও আর কি কইবে? আমার কথা তো শুনবে না! তা হ’লে কি আর আজ এমন হয়? থাক্ যা হবার হয়েছে। এখন শিখলে ত বীর? প্রাণ থাকতে আর বাঙ্গালদের ছায়া মাড়িও না! ওরা সর্ব্বশেষে লোক! ওরা সব কর্তে পারে! বুঝলে?”

আমি আর কি বলিব? কি বুঝিব? কিন্তু ওগো, তোমরাই কি বুঝিবে আমার বক্ষে তখন কি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে! সুরেনের এ বিপদের জন্য যে আনিই দায়ী! আমিই যে একদিন বিপদে পড়িয়া পিতৃগণী ও যুগান্তর-গুলি তাহার ওখানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম! ওগো, তোমরা কি বুঝতে, সে আমার কত নিষ্পাপ, কত নিম্মল, সে আমার কেমন বাঙাল বন্ধু!

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। ধীরে ধীরে সবাই উঠিয়া পড়িলেন। আমি তেমন অবস্থায় গোফায় পড়িয়া রহিলাম।

( ৭ )

সমস্ত রাত্রি যে কিরূপ উদ্বেগে কাটাইলাম তাহা বর্ণনাতীত। নানা ভ্রূশিচক্কা শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল। একটুও ঘুম আসিল না। কখন যে রাত্রি প্রভাত হইল কিছুই টের পাইলাম না।

বখন ঘুম হইতে না—না, শব্দ্য ভাগ করিয়া উঠিলাম, তখনও চিন্তাস্রোতের বেগ কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। বয়ঃ উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমারই অসাবধানতার ফলে এক অকলঙ্ক চরিত্রে আজ কলঙ্কের রেখা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এক নিদোষ ব্যক্তি আজ বিপ্লববাদী বলিয়া শাস্তি পাইতে বসিয়াছে! উঃ কি ভয়ানক! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল!

আহ! সে যে বন্ধু আমার! তার কর্তব্য সে ত যথেষ্ট পালন করিয়াছে। কিন্তু হায়! যা’র জন্য সে এত করিয়াছে, যা’র সমস্ত অপরাধ সে আজ নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, সে অকৃতজ্ঞ তাহার কতটুকু প্রতিদান দিয়াছে! মনের ভিতর হইতে কে যেন একজন পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নের আঘাতে আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল!

মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, যাই, সব কথা প্রকাশ করিয়া বন্ধুকে বিপদ মুক্ত করি! কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন একটা দৌর্ভাগ্য আসিয়া আমার হৃদয়কে কাপুরুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। সত্য কথা বলিবার সাহসও আমার হইল না। তখন আমি এমনি অপদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

ক্রমাগতঃ ঘাতসংঘাতের পর শেষে কর্তব্যাস্থির করিবার অবসর পাইলাম। কথা পুলীশের সমক্ষে প্রকাশ করিব স্থির করিয়া বাটার বাহির হইয়া পড়িলাম।

তখন বেলা প্রায় দশটা। হারিসন রোডের মোর অবধি আসিতে না আসিতে হঠাৎ একি দেখি! সুরেন যে! বিস্ময় ও আনন্দে আমার বর্জরোধ হইয়া আসিল। নিজের চক্ষুকেও যেন বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

সে ছুটিয়া আসিয়াই আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “ভগবান খুব রক্ষা করেছেন ভাই, বিশেষ কোন প্রমাণ না পেয়ে—ওকি তুই অমন কচ্ছিস কেন? ছিঃ, তুই কি পাগল হলি নাকি? তোর কি দোষ? হঠাৎ একটা মা হয়ে গেছে তা গেছে। না—না অমন করিস্নে ভাই! আমি তা হ’লে বড় হুংখিত হব।”

“আমি এখনও মেসে ফিরেনি; সংবাদ দিতে আমি তোদের ওখানেই যাচ্ছিলাম! চল, সব বলতে বলতে যাচ্ছি!”

এই কথা বলিতে বলিতেই সে আমাকে টানিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

হায় বন্ধু! কৃতজ্ঞতা জানাইবার এমন কি মার্জনা ভিক্ষারও অবসর দিলে না! ভাই! দেবতারা তোমাদের চেয়ে কত বড়?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

## একসূর।

—:~:—

( ১ )

এঁকেছি কতই সুন্দর ছবি, গেয়েছি কতই গান,  
শেষে কোন্ কথা বলিতে চাহিয়া আকুল করেছে প্রাণ ?  
ছাপায়ে আমার দুঃখ বিপদ, অশ্রুকালাহাসি,  
বাজে ফিরে ফিরে না জানি কি সুরে “শুধু আমি ভালবাসি।”

( ২ )

বিবিধ ছন্দে গাঁহিয়াছি আমি, বন্দনা নিতি নব,  
কোন্ বাণী তার আসি বার বার বেজেছে শ্রবণে তব  
চারি পাশে ঘিরে কোন্ কথাটির রচিত বাক্যরাশি;  
প্রাচীন সে কথা, নিত্য নূতন “শুধু আমি ভালবাসি!”

( ৩ )

সঙ্গীত শেষে নীরবমন্ত্রে কোন্ সে গানের সুর,  
উঠে কাঁপি কাঁপি যন্ত্রীর হৃদে আনন্দে ভরপুর—  
কোন সুরে তার হৃদয়ে সবার পলকে ফেলিছে গ্রাসি’  
ছন্দ বিহীন নীরব সে গীতি “শুধু তোরে ভালবাসি!”

( ৪ )

কলতান তুলি’ সরিৎ যেমন বহিছে সাগর-পায়  
চঞ্চল করা নৃত্যমুখরা আপন পতির চায়।  
মোর যতগান, যত কল্লোল, তেমনি প্রবাহি’ আসি’  
চরণে কাহার জানাইতে চায়, “শুধু আমি ভালবাসি।”

শ্রীজিগুণানন্দ রায়।

## পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বহু প্রাচীন পুথি এ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলাভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুইখানি পুস্তক বাস্তবিকই বাঙ্গলা কিনা—এ সম্বাদ আমার দ্বারক সন্দেহ আছে। ইহার একখানি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত “বৌদ্ধ দোহা ও গান” অপরখানি শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “নেপালে বাঙ্গলা নাটক।”

“বৌদ্ধ দোহা ও গান” যে “গাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা” এ সম্বন্ধে সাধারণের ত সন্দেহ থাকিবেই স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়েরই প্রথমে সন্দেহ ছিল। তিনি মুখবন্ধে লিখিয়াছেন “ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাক পুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি বকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গলা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।” এই ভাষায় লিখিত “সুভাষিত সংগ্রহ” নামক যে পুস্তক বেণ্ডল সাহেব ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তিনি এই ভাষাকে কোথাও “একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা” কোথাও বা “বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা” বলিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় মুখবন্ধে তৎপরে বলিয়াছেন। “আমার বিশ্বাস ধারা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গলা ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণে প্রভেদ, তথাপি সমস্তই বাঙ্গলা বলিয়া বোধ হয়, এখানেও শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই যে, এগুলি ঠিক পুরাণ বাঙ্গলা, “বোধ হয়” কথা ব্যবহার করিয়াছেন। আর বাঙ্গালী হইলেও যে ভিন্ন দেশে বাস করিয়া তদ্দেশ-ভাষায় রচনা করিতে পারে তাহার প্রমাণ এখানেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালী, হিন্দী ও উর্দুতে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্বে ছন্দ লইয়াই প্রথমে বিচার করিব। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ছন্দে সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। খ্রীষ্টোত্তরন্যাদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গলা ভাষার গানে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভেদ ছিল না। তাহার দুই প্রমাণ আছে,—শূন্য পুরাণ ও চণ্ডীদাসের রচনা। চণ্ডীদাসের বর্তমান পদাবলীর ভাষা পরিবর্তিত হইলেও ছন্দের রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ভাষার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। সেখানেও হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভেদ দেখি না। শূন্যপুরাণে ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রধানতঃ দুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,—পয়ার ও ত্রিপদী। অন্য দুই এক প্রকার ছন্দও চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে” আছে বটে কিন্তু সর্বত্র ছন্দ “অক্ষরমাত্রিক”। খ্রীষ্টোত্তরন্যাদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্তন গুণিত্তে ভালবাসিতেন। উভয় স্থলেই “মাত্রাবৃত্ত” ছন্দের ব্যবহার আছে। মহাপ্রভুর সহচরগণের মধ্যে অনেকে এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আবার অনেকে “অক্ষরমাত্রিক” পয়ার ত্রিপদীতে রচনা করিয়াছেন। সেগুলির ভাষা ও বানান মুখে মুখে ও লিপিকার এবং মুদ্রাকরের দোষে পরিবর্তিত হইলেও ছন্দের পরিবর্তন ঘটে নাই। এমন কি এক পদকর্তাই দুই প্রকারের মাত্রাবৃত্ত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে “অক্ষরমাত্রিক” পয়ার ত্রিপদী ছন্দ সেখানে ভাষা বাঙ্গলা এবং যেখানে “মাত্রাবৃত্ত” ছন্দ সেখানে ভাষা মৈথিলী বা ব্রজবুলি অবশ্য

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এখন যেমন পয়ার বা ত্রিপদীতে অক্ষর গণনার বাঁধা-বাঁধি, পূর্বে তেমন ছিল না। পয়ার কখন কখন ১৪ মাত্রা পার হইয়া ১৬।১৭ পর্য্যন্ত যাইত কিন্তু গানের সময় তাহা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিয়া তাল রাখা হইত। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিতেছি,—

শূন্যপুরাণের পয়ার— উল্লুকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।

” ত্রিপদী—ঐধর্ম্যচরণে শুনে, শ্রীযুত রামাই ভনে, হই কবি অনাদ্যর দাস।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পয়ার—বারতা পুছিউ রাখা সব জন থানে।

” ত্রিপদী—হেন মনে পড়িহাসে, আক্ষা উপেক্ষিঅঁ রোমে, আন লঅঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।

বলরাম দাসের ব্রজবুলির পদ ( মাত্রাবৃত্ত )

॥ ।। ॥ ।। ।। ।। ।। ।।  
গোরিক থোরি, ব । দন বিধু হেরইতে,

।। ।। ।। ।। ॥ ।।  
পঁছ ভেল আন ন্দে ভোর—

বলরাম দাসের বাঙ্গলার পদ ( অক্ষরমাত্রিক )

এক কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি  
আর তাহে দিল হেন পিরোতি বেয়াধি।

বৈষ্ণব পদকর্তারাও কেবল পয়ার ও ত্রিপদীতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রধানতঃ এই দুই প্রকারের ছন্দ আছে। অথচ এই “বৌদ্ধ দোহা ও গানে” প্রধানতঃ দুই প্রকারের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—দোহা ও চৌপাই। তুলসীদাসের রামায়ণের সর্বত্রই চৌপাই, মধ্যে মধ্যে দোহা ও শোরঠা। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সেকালের দেশভাষায় গানের রচয়িতা বা লেখকের ভুলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিত।

“বৌদ্ধ দোহা ও গানের” দোহা—

।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।  
বহগিরি শিহর উতুঙ্গ মুনি শবরে বাহি কিঅ বাস

তুলসীদাসের দোহা—

॥ ।। ॥ ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।  
বন্দউ সন্ত সমান চিত হিত অনহিত নহি কোউ

দোহার ১ম পাদে ১৩ ও ২য় পাদে ১১ মাত্রা। দোহাছন্দ বাঙ্গলাদেশে আদর পায় নাই।

বৌদ্ধ দোহা ও গানের চৌপাই বা চতুস্পদী—

।। ॥ ।। ।। ।। ॥ ।।  
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী আগঅ

॥ ।। ।। ।। ॥ ।। ।।  
কানেট চোর নিল কা গই মাগঅ

তুলসীদাসের চোপাই :—

॥ । । । । । । ॥ । । । । ॥  
বন্দ উ প্রথম ম হী সুর চরণা

॥ । । । । ॥ । । । । ॥  
মো হ জনিত সং সয় সব হরণা

মিথিলা এবং যুক্তপ্রদেশে “অক্ষর মাত্রিক” ছন্দের কোনকালেই ব্যবহার নাই।

এইবার বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আমার একটি অসুমানের কথা বলিতে চাই। মুসলমানেরা যখন বিহারে প্রথম আগমন করে, তখন বৌদ্ধ বিহারগুলিকে হুর্গ এবং ভিক্ষু ও শ্রমণদিগকে মোক্ষা ভাবিয়া বিহারগুলিকে ধ্বংস করে। সেই সময় বহু বৌদ্ধভিক্ষু পুঁথিগুলি লইয়া নেপাল ও তিব্বতে পলায়ন করে। মগধে কেবল বিহারগুলিই বিদ্যাশিক্ষার স্থান ছিল। ইহাতে খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত, পালি ও তখনকার প্রাকৃত ভাষায় শিক্ষাদান কার্য চলিত। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা তখনকার মগধের প্রাকৃত বা দেশ ভাষা। বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসের পরে মগধে আর বিদ্যাচর্চার কোন স্থান ছিল না তাই মগধি (মাগধী) ভাষার কোন সাহিত্যের নিদর্শনও নাই। সুতরাং তৎপরে বা তৎপূর্বে মগধের দেশ ভাষা কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মিথিলায় হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় চর্চা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের দেশীয় ভাষায় লিখিত পদাবলীর সহিত আমরা পরিচিত। তিনি মৈথিল কাবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একসময়ের লোক। অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহাদের আবির্ভাব কাল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী ও বিদ্যাপতি মৈথিল। বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষার সহিত বিদ্যাপতির যত সাদৃশ্য চণ্ডীদাসের (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের) ভাষার সহিত তত সাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধ দোহা ও গানের কতকগুলি প্রাকৃত কথা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই পাই। কিন্তু এমন কতকগুলি কথা আছে যাহা বর্তমান হিন্দীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গলায় পরিবর্তিত আকারে ছিল আর কতকগুলি কোনরূপে কোন কালে ছিল না। তবে তিন চারিটা কথা এমনও আছে যাহা হিন্দী বা মৈথিলে নাই কিন্তু বাঙ্গলায় আছে। ইহা হইতে এমন অনুমান করা চলে না যে, ভাষাটা বাঙ্গলা। এমনও সম্ভব যে, পদকর্তা বাঙ্গালী বলিয়া সে সময়ের ছই একটা বাঙ্গলা কথা পদে ঢুকিয়াছে।

বৌদ্ধ দোহা ও গানের শেষে অকারাদি ক্রমে শব্দহ্রী ও অর্থ দেওয়া আছে। আমি তাহা হইতে আকারাদি ক্রমে শব্দ তুলিয়া প্রথমে দেখাইব বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষার সহিত হিন্দী ও মৈথিলের সাদৃশ্য কত বেশী।

(১) অইস, অইসন, অইসেঁ, অইসো—সং ঈদৃশ বা এতাদৃশ। সং ঈদৃশ স্থানে প্রাকৃত এরিসো হইবে। তাহা হইতে হিন্দী মাগধী এইসা, এইসন, অইসন, প্রভৃতি রূপ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সহচর ও পরবর্তী পদকর্তারা যখন ব্রজবুলি ধরিয়াছিলেন তখন এই “স” কে পূর্ববঙ্গের দ্যস্ত “ছ”য়ে পরিণত করিয়া “এঁছন” লিখিতেন কারণ “স” এর প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলাদেশে পূর্বে ছিল না।

(২) অছ, অছই, অছউ, অছহ, অছসি, অছিলেঁ, অছ প্রভৃতি—সং অস্ ধাতু হইতে এগুলির উৎপত্তি। প্রাকৃত প্রকাশের ১২।১৯ সূত্রে আছে শৌরসেনী ভাষায় অস্ ধাতু স্থানে অছ আদেশ হয়। এখন শৌরসেনী ভাষার দেশে (মথুরা প্রদেশ) ইহার প্রয়োগ নাই, সেখানে হো, রহ্, থা (হা) ধাতু তৎ স্থানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিথিলার এখন পর্যন্ত এই ‘অছ’ রূপে চলিত আছে। আর চণ্ডীদাসে ‘আছ’ রূপ ধরিয়াছে। বিদ্যাপতিতে ‘অছ’ রূপ পাই।

५२०-१७



চণ্ডীদাসে নাই।\* করিহ—বাং করিও এই রূপ এখনও মগধ ও মিথিলার চলে, চণ্ডীদাসেও ছিল। প্রথম পুরুষের করউ—সং করত, বাং—করক্, এ রূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়। ‘করক্’র সহিত মূল পুস্তকে ‘ম’ আছে, টীকার অর্থ আছে ‘ম করিহ্মি’, ইহা অমুক্তায় সংস্কৃতের লোটের ‘হি’ হইতে পারে। এ রূপ দেশভাষার কোথাও কোন কালে ছিল বলিয়া জানিতে পারি নাই। প্রাকৃতের ভাষায় কালে ধাতুর উত্তর হি হইত বলা—তসু ধাতুর মধ্যম পুরুষের বহুবচনে হোহিহি ও হোহিহা এই দুই রূপ হইত।

‘করে’ এই অর্থে ‘করম্’ চণ্ডীদাসে নাই বিদ্যাপতিতে আছে। সং করো ত স্থানে ‘করই’ মিথিলায় এখনও চলে, চণ্ডীদাসে নাই। ‘করন্ত’ পদের শাস্ত্রী মহাশয় অর্থ দিয়াছেন ‘করিতেছে’। কন্ত পদটি বাস্তবিক সমাপিকা ক্রিয়া নহে। কর ধাতুতে শত্ প্রত্যয় করিয়া করং হয় (প্রাকৃতে) তাহার বহুবচন ‘করন্ত’। একবচনেও প্রয়োগ ক্রিয়াতে মৈথিলী ভাষায় এখনও চলে, যথা—দেখাইং ছি = বাং দেখিতেছি। মগধ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধপ্রদেশ পর্যন্ত সমস্ত স্থানে একবচনের প্রয়োগ আছে যথা মগধে—‘বাং কা’ = বাইতেছি, হিন্দী বা ঝা হৈ = যাতেছে। হিন্দীতে বহুবচনে ‘বার্তেহে’ হয়। বহুবচনের রূপ ক্রিয়ার উড়িয়া ভাষায় আছে যথা ‘আমি দেখিতাম’ এত অর্থ ‘দেখন্তি’। উড়িয়া ভাষায় প্রথমপুরুষের বহুবচনের ‘দেখন্তি’ শূন্যপূরণেরও সেইরূপ ‘দেখন্তি’ সংস্কৃত ও প্রাকৃতির ‘অন্তি’ বিতক্তি বাত। ‘করন্ত’ রূপ বিদ্যাপতিতে নাই, চণ্ডীদাসে ‘করন্ত’ ও ‘করন্তি’ আছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথিতে ‘করন্ত’ রূপ দেখা যায়। অনন্তরার্থে সংস্কৃতের ক্তা স্থানে শোরসেনী প্রাকৃতে ইচ্চ প্রত্যয় হইত। তুলসীদাস ও বিদ্যাপতিতে ‘করি’ ‘করিও’ দুইরূপই পাই। চণ্ডীদাসে ‘করি’ ‘করিঅ’ (বৌদ্ধম বাবুড়ার অনুমানিক) দুইরূপ আছে। বৌদ্ধ দোহা ও গানে ‘করি’ ‘করিঅ’ ও ‘করিআ’ এই তিন রূপের প্রয়োগ আছে।

‘করিঅই’ ও ‘করিঅই’ = সং ক্রিয়াতে; দুই খাঁটি প্রাকৃতির রূপ। ইহার অমুরূপ কিছু প্রাচীন বাঙ্গলা বা মৈথিলীতে নাই। ‘করিব’ ও ‘করিবে’ এই দুই রূপের অর্থ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ‘করিব’। ‘করিব’ কথাটা পুস্তকের দুই স্থানে আছে (১) প্রথম স্থান ‘করিব নিবাস’ অর্থে টীকার আছে ‘অস্তাভিনিবাসঃ করণীঃ’। ‘করিবে’র সহিত ‘ম সাজ = ময়া অভিব্যঙ্গঃ কর্তব্যঃ’। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই ‘করিব’ বা ‘করিবে’ বর্তমান বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎকালের সমাপিকা ক্রিয়া ‘করিব’ বা ‘করিবে’ নহে। এই ‘করিব’ বা ‘করিবে’ ক্রদন্ত বিশেষণ। কর্ ধাতু + তব্য (প্রাকৃতে ত লোপে ও বা স্থানে বব হইলে) = করিব বা করব এই দুই রূপ ক্রমে করিব বা করব হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলায় তাই প্রথমে আমি, তুমি, সে ‘করিব’ হইত। (২) আর একটি স্থানে গানে ছাপান আছে ‘শাখি করিব’ টীকার প্রান্তে আছে ‘শাখি করিতাদি’। ইহা হইতে অনুমান হয় গানে হয়ত ‘শাখি করি’ এইরূপ ছিল। টীকার অর্থও দেওয়া আছে সাক্ষিণঃ কৃষা।

সমস্ত কথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে পাঠকের খেয়ালচ্যুতি ঘটবে স্তব্ধতা আর কতকগুলি কথা তুলিব সেগুলি বিহারে অর্থাৎ মিথিলা ও মগধে এখনও প্রচলিত আছে (কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে)। প্রথমে দোহার কথা, বঙ্গনী মধ্যে বিহারের রূপ ও পরে বাঙ্গলা অর্থ দিব।

কবড়ী (কোড়া) করি, কাপুর (কাপুর) কর্পূর, কা (কা) কি, ক্রি (হিন্দী ক্রিয়া) (সং) কৃত, কুরাড়া (কুচানি, কুচানি) কুড়ুল, কো (হিন্দী কো) কে, ঘরহি (মৈ: ঘরহি) ঘরে, চক (চকা) চাকা এই (বিদ্যাপতি জ্যৈ) বদি. আব (বিদ্যাপতি আব) বাবং, টুটি (টুটি) ভাঙ্গিয়া নাম (নাও) নৌকা, তসু (বিদ্যাপতি তসু) তাহার, তোহার (তোহার) তোয়, ধাবই (ধাবয়ে) নৌড়ে, গোখি (গোখি) পুখি, পিবই (পিয়ে) পান করে,

পাণিআ (পানিআ, পানি) জল, পুহ (পুহ) শুধাও বা জিজ্ঞাসা কর, বহুড়ী (বহুরী) বো, ভণথি (বিদ্যাপতি ভণথি) ভণে, ভলি (হিন্দী ভলি ভাঁতি) ভাগ রকমে ভাগেগ (ভাগন্) পালাইল, মাগঅ (মাগে) চাহে, মুখা (মুখা) ইহু রুখর (রুখ হইতে প্রাকৃষ্ট কহু ও রুখু ভগত হিন্দীতে এখনও রুখু চলে। গাছের পতবাল (পতোরাং) হা'ন, বগু (বস্তি) রাড, লাক (লাঙ্গ) নাক্‌টা, বইঠা (বইঠা) উপবিষ্ট, বটুই (বাটে) বর্জতে, বি (ভি) ও. বিহনি (বিহান) সফাল, বোণই (বোণে) বনে, শাসু (বিদ্যাপতি শাসু, শাস্) শান্তরী, স্যামার (সামার) চাক, সকই (সকে) পারে, সাচ (সাত) সতা, সুহুরা (শুভর অর্থে সুহুরা) শান্তরী সো (হিন্দী সো) সে, স্নিন (ভুগদাস স্নিনি) যেমন, অবণা গবণা (অনা জনা কিছু দ্বিরাগমন অর্থে গণা) আসা যাওয়া গোণ (নোন) মুন, বাঙ্গালী (বাঙ্গালী) বাঙ্গালী, কুহু (কুহু) কিছু।

তাই এক স্থলে প্রাচীন বাঙ্গলার সতিত সাদৃশ্য পাইতেছি। (১) 'করিআ, করিব' রূপে মৈথিলী ভাষায় পাই না প্রাচীন বাঙ্গলায় ছিল। 'করন্ত' রূপ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। 'নাচন্তি' পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গলার ছিল মৈথিলীতে নাই। (২) 'চড়ি' বিহারী ও হিন্দীতে 'চড়ি' বাঙ্গলার 'চড়ি' রা, 'খাকী' বাঙ্গলার 'খাকিয়া' একরূপ ক্রিয়া বিহারী বা হিন্দীতে নাই, 'খা' আছে। 'ঘুমই' ক্রিয়া বাঙ্গলার পূর্বে ছিল না, অর্ধাচীন বাঙ্গলার চলিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলার 'নি'ন্দ' ছিল (শব্দকোষ দ্রষ্টব্য)। বিহারী ও হিন্দীতে নি'দ আছে। বৌদ্ধ দোহা ও গানে 'নি'দ' আছে। 'জীবন্তে' বা জীবন্তে' পদের অরূপ কিছু হিন্দী বিহারীতে নাই। বাঙ্গলায় 'জীবন্ত, চলন্ত' চলে। পূর্বে বলিয়াছি এগুলি শত্ প্রভারান্ত শব্দের বহুবচন।

বৌদ্ধ দোহা ও গানে পাঁচ রকমের ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। যথা—তসু (তার) করহ (করিব) রুখের (গাছের) হরিণার, ছান্দক (ছন্দের)। ইহার মধ্যে 'তসু' কথাটাই বিদ্যাপতিতে আছে, বিদ্যাপতিতে সর্বনামে 'স' পাওয়া যায় কিন্তু বিশেষ্য পদে কেবল ক, কিন্তু চণ্ডীদাসে কেবল ক, এর, র এই চারিটি বিভক্তিই আছে। বৌদ্ধ দোহা গানে ত, তি ও এসপ্তমীর এই তিন বিভক্তি আছে। ইহার মধ্যে হি ও এ বিভক্তি বিদ্যাপতিতে আছে এবং ত ও এ বিভক্তি চণ্ডীদাসে আছে। চণ্ডীদাসে অবশ্য তে বিভক্তিও আছে। এখন পাঠক বিচার করুন ইহা ভাষার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা কিনা।

এইবার 'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' প্রকৃতই বাঙ্গলা এবং নাটক কি না তাহার আলোচনা করিব। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা; কিন্তু আমরা যাহাকে নাটক বলি, এ সরূপ নাটক নয়, একটি ছুটি পাত্র প্রবেশ করিতেছে, আর এক একটি গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে।' কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। মিথিলায় নাটকগুলি সংস্কৃতে লেখা হইত এবং তাহার গানগুলি দেশভাষায় রচিত হইত। 'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' সম্পূর্ণ নাটক নহে, নাটকের গান মাত্র। এই পুস্তক হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ১৯ পৃ: আছে 'বকরাঙ্গসোক্তি—যুদ্ধ ॥ কব্ধি ॥ মেপু ১ ৯॥' তৎপরে 'ভৌমোক্তি—যুদ্ধ ॥ কব্ধি ॥ মেপু ১১ ৯॥' এখানে কোন গান নাই, তবে উক্তি কোথায় গেল? তত্ত্বির শুধু বার চৌদ্দটা গান (তাহার মধ্যে আবার অধিকাংশই দুই চার পংক্তির) এক দিবসের পক্ষে যথেষ্ট নহে। গানগুলি পড়িলেও বুঝা যায় মাঝে মাঝে কঁাকা পড়িতেছে।

'নেপালে বাঙ্গলা নাটক' পুস্তকে চারিজনের গান সঙ্কলিত হইয়াছে (১) কাশীনাথ কৃত বিদ্যাবিলাপ (২) কৃষ্ণদেব কৃত বিদ্যাবিলাপ (৩) গণেশ কৃত রামচরিত (৪) ধনপতি কৃত মাধবানল—কামকন্দলা। সম্পাদক মহাশয় বলেন 'ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানি যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। ইহাদের ভাষা কৃষ্ণরাম কবি, বনমালী দাস, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভাষারই মত, তবে একটু যেন পুরাণ ছাঁদে;

ছই একটা বিদেশী কথাও আছে।' আমার মতে কেবল তৃতীয় গ্রন্থকারের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা। অপর তিনজন খাঁটি মৈথিল কবি এবং তাঁহাদের ভাষাও খাঁটি মৈথিলী।

(১) বৌদ্ধ দোহা ও গানে “থাক্” ধাতু থাকায় আমি ইহাকে বাঙ্গলার “থাক” ধাতুর সঙ্গে সাদৃশ্য বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন মৈথিলে “থাক্” ধাতু ছিল কিন্তু বর্তমান মৈথিলে হিন্দী “থক্” ধাতু (শ্রুতি অর্থে) আসিয়াছে।  
বিদ্যাপতি পরিষদের পুস্তক ২০১ পৃ:— গরু অকুস্ত সির খির নহি থাকএ।

(২) নেপালে বাঙ্গলা নাটকের ১৭ পৃ: সম্পাদকীয় পাদটীকা আছে—‘তকরা’ অর্থবোধ হয় না। বোধহয় কাতরা পাঠ হইবে। সম্পাদক মহাশয় মৈথিল ভাষা বোধহয় তেমন জানেন না। মৈথিল সাধুভাষার হমস্ব কিন্তু কথিত ভাষার হমস্ব, হম্বা দুই হয়, সেহরূপ তাহার অর্থে বর্তমান দক্ষিণ মৈথিলে “তেকরা” শব্দ প্রচলিত আছে। তদ্বশত্বে সধকবাচক কের বা কর করিয়া তাকর বা তকর কথিত ভাষায় ‘তকরা।’ উহার অর্থে ওকর, ওকরা দুই হয়, সুতরাং “দেখথক মন ভেল তকরা” বাক্যের অর্থ হইবে—তাৎকালে দেখিতে মন হইল।

গানের শেষে নেবার (‘নেপাল’ এর অপভ্রংশ ‘নেওয়ার’ বা ‘নেবার’) রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁহার পুত্র রণজিৎ মল্লের ভণিতা আছে। সুতরাং গানগুলি তাঁহাদের রাজত্বকালে লেখা। ভূপতীন্দ্র মল্ল ও তাঁহার পুত্র ১৭০০ খ্রী: হইতে ১৭৬৮ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং গানগুলি বড় জোর দুইশত বৎসর পূর্বের রচিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬০ বৎসরেরও কিছু অধিক পূর্বের রচিত। সম্পাদক মহাশয় ভারতচন্দ্রের ভাষার সহিত কি সাদৃশ্য দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারতের মধ্যে ‘একটু পুরাণ ছাঁদ ও বিদেশী কথা’র গন্ধ পাইয়াছেন কিন্তু আমি ধনপতির রচনাতেও মৈথিলীর ছাঁদ দেখাইতেছি:—

১১২ পৃ:—পহিরিঅ ভলে ভাতি বাধক ছাল।

উহার মধ্যে পহিরিঅ = পরিধান করিয় ‘ভলে ভাতি = ভালরূপে’ বাধক = বাধের মৈথিলীতে প্রচলিত। ‘ভলে ভাতি’ বর্তমান হিন্দীতে চণ্ডিত।

১২৩ পৃ:—শিব শিব অবে অপনে রচব কওন উপায়।

অবে = এবে, এখন, অপনে = আপনি, রচব = রচিবে, কওন = কোন্ এমনস্ত কথাই মৈথিলী। মৈথিলী ভাষার পদান্তে অ শিঘ্রা ই উচ্চারিত হয় না কিন্তু কবিগায় উচ্চারিত হয়। তাই কবিতার রচব = কথিত ভাষার রচব।

ছন্দ সম্বন্ধে সেই কথা। দীর্ঘ দন্ত মাত্রা হ্রস্ব এক মাত্রা। বিদ্যাপতিরও সর্বত্র দীর্ঘ ছই মাত্রা নয় (সম্ভবতঃ গান বলিয়া)। এ গানগুলি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তবে বাঙ্গালীর গানে দীর্ঘ ছই মাত্রা সাধারণ নিয়ম নহে ব্যতিক্রম স্থল বধা—

পয়ার (তিন জন মৈথিল কবির গানে চোপাই হইয়া পড়িয়াছে)

।।।। ।।।।	।।।। ।।।।	
স্বরস্বর তুর পদ	পংকজ সেব—	
।।।। ।।।।	।।।। ।।।।	
মোর মনোরথ	পূরহ দেব—	(মহাভারত ২২১ পৃ:)

।। ।।।। ।।।।	।।।। ।।।।	
চলু ভায়ি জায়ব	মুপতি সমাজ—	
।। ।।।। ।।।।	।।।। ।।।।	
ছহ মিলি লর কহ	মৃগয়াক সাজ—	(ধনপতি ২৩৭ পৃ:)

ইহার সহিত বাঙ্গালী কবির পয়ার তুলনা করা যাক—

রাবণে দিলেক চুখ বিধিকে কহিবো ।

সেখানে এখনে গিয়া আনি আনাইবো ॥ (রামচন্দ্রি)

এইবার কতকগুলি শব্দ তুলিয়া দেখাওব যে সেগুলি শুধু প্রাচীন মৈথিলী ভাষার নয় বর্তমান মৈথিলী ভাষায়ও প্রচলিত আছে । এমন কি অনেকগুলি শব্দ বিহারের অন্যান্য স্থানেও চলে ।

সর্কনাম—তমে ( আমি ), হমরাকে ( আমাকে ), হমর, হমরা ( আমার ), অপন ( আপনার ), হিনক ( ইঁহার ) তোহে ( তুমি ), তোরা ( তোর ), তোহর ( তোমার ), তহিক ( তাঁহার ), তকরা ( তাহার, এই শব্দটির অর্থ সম্পাদক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই ) তোহ সনি ( তোমার সমান ), ঈ ( এ ), একর ( এ'র ) কঙন ( কোন ), কোনেপরি ( কোন পথে, কোন উপায়ে ) ।

ক্রিয়া—জায়ব ( অকারান্ত—যাইব ), দেখল ( দেখিলান ), আবথি ( আসিতেছে ), পঙলহ পাইলা ), চল ( চলি অতুজা ) জাখিছি ( যাইতেছি ), দেলছি ( উচ্চারণ—দেখিন্ বা দেলাই=দিশেম ); ছপায় ( হিং ছিপান= গোপন করে ), তোড়ব ( ভাঙ্গব ), কঠে ছম ( কাহিতেছে ), উগল উদিত হইল ), লেচ ( লও ), বচহঁ ( বাঁচলাম ) জোহব ( খুঁজিব ), ফুলল ( গাছে ফুল ফুটিল ইহা বিহারের বাক্তব্দী—নাম ধাতু ) ।

কারক—শিহরি ( শিরে ), সুরপুরতত ( সুরপুর হইতে ), বহিনিক ( বহিনের, ভগিনীর ), তস্ব ( ভক্ত ) ।

অন্যান্য শব্দ—নিক্রে ( স্নানর রূপে ) সগরে ( সকল স্থানে বা সকল লোকে এই অর্থে বিধারে বহু স্থানে চলিত ), ভলে ( ভাল রূপে যথা হিন্দুস্থানী ভিখারীর গানে “ঠাকুর ভলে বিরাজ হো” ), ভসম ( ভস্ম ), লগ ( নিকটে ), সুপ ( কুলো ), জঞো ( যদি ), জহু ( যেন না—ছাপড়ায় শুনিয়াছি “যাইহ জউন” = যেন যেও না ), সরাপ ( শাপ ), ভগত ( ভক্ত ) ।

সর্কনাম ক্রিয়ার রূপ সর্কত্র মৈথিলী ভাষায় প্রমাণ বখেষ্ঠ দিয়াছি, ইহাতেই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইল । সম্পাদক মহাশয়ের আর দুইটি কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব । তিনি ভূমিকার বলিয়াছেন ( ১০ পৃঃ ) “নেপালীরা ‘ক’ স্থানে ‘গ’ ও ‘ল’ স্থানে ‘র’ লিখিয়া থাকে । নেপালীদের কাতে ‘সকলে’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।” উপরে বলিয়াছি ইহার অর্থ সকল স্থানে বা লোকে । শুধু ‘সগর’ শব্দ এই অর্থে বিহারের পশ্চিমাংশে প্রচলিত । ইহা নেপালীদের দোষ নয় । বিদ্যাপতিও ‘সকল’কে ‘সাগর’ করিয়াছেন যথা—( ১ ) সগর শরীর ধরয়ে কত ভাতি ( ২ ) অমুখন সগর নগর ভ্রম চোর । তিনি ১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকার বলিয়াছেন “নেপালীরা ‘ব’ স্থানে প্রায়ই ‘খ’ লিখে ।” কারখীতে একই অক্ষর ‘খ’ ও ‘ব’এর কাজ করে, আমাদের জনৈক মৈথিল ছাত্র ( সংস্কৃত কাব্য ও জ্যোতিষে মধ্যম পরীক্ষা পাশ করিয়াছে ) ‘ব’ স্থানে ‘খ’ উচ্চারণ করিত । মৈথিলার সর্কত্র ‘ব’ উচ্চারণের এই নিয়ম ।

শ্রীরাখালরাজ রায় ।

## সে কোথায় ?

সে কোথায়—গেছে কোন্ দূর দূরান্তরে—  
রহস্ত সিদ্ধুর পারে স্বর্ণমেঘময়  
বিচিৎ্র সে পুরী,—দিন শেষ হলে পরে  
শ্রান্ত দিনমণি বখা লয় গো আশ্রয় !  
সেথায় না পশে ধরণীর কোলাহল,  
কেবলি বিশ্রু শান্তি বিরাজে সে পুরে !  
রবিশশী তারকাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল  
করিলে আরতি নিশিদিন ঘুরে ঘুরে,  
অমর সঙ্গীতে পুরী সুখরিত করি !  
নন্দনের পারিজাত পরিমলবাহী  
অনিল উল্লাসভরে—মেঘগুলি, মরি,—  
নাচার ছলার ধীরে ! সেথা পথ চাহি,—  
একাকী সে আছে বসে মেঘনীড়ে, হার,  
মোর সনে মহা মিলনের প্রতীক্ষায় !

## দুরন্ত !

ওরে, মনোবন পাখি ! দিবস রজনী  
আড়াল হইতে আমি শুনি তোমার ধ্বনি ।  
কি কহিস্—কলকণ্ঠে কি যোগাস্ গান,  
বুঝি না ত, মুগ্ধ হরে করি শুধু পান !  
মাথা থাম্, পাখি, তুই একবার থাম্,  
গলাটি বাবে যে ভেঙ্গে ডেকে অবিরাম !  
বাসা তোমার যেথা ঘন পল্লব মাঝার,  
সেথাই মাথাটি রেখে ঘুমা' একবার !  
নিস্তরু নিশীথে—সারাদিন ঘুরেফিরে,  
ঘুমায়ে সবাই যবে নিজ নিজ নীড়ে,—  
চঞ্চল অনিল সনে ঘুমার কুসুম,—  
দুরন্ত ! তখনো তোমার চোখে নাই ঘুম !  
জাখ্, মুঢ় ! তোমার দোষে—জাখ্, আঁখি তুলে,  
যোগালনে যোগীবর মন্ত বান তুলে !

## চিঠি ।

ঘুম ভেঙে আজি তার গেরেছি লিখন !  
বিরহবিধুরা বালা মিলনের তরে  
হরেছে কাতরা ভতি—মুগ্ধ গুপ্ত স্বরে  
বহি আনে এ বারতা দক্ষিণ পবন !  
শশি পঙ্কজে যবে বিবশা শর্করী—  
অবগুষ্ঠন খানি পড়িবে খসিয়া  
কবরী সীমান্তে তার ; খুলিবে গো হিরা  
বিলাতে অনিলে মধু ফুলবধু, মরি ;—  
পতিস্বস্তি মাত্র সাথী রমণী অবলা—  
পরশলালসে এলায়িত তম্বুলতা,—  
নিদাঘে জ্বলদ অরি শৈবলিনী বখা,—  
বিজন বানসবনে জাগিবে একলা !  
আজি তাই মন নাহি লাগে কোন কাজে,  
রহি রহি হিরা মাঝে সে আনন্দ বাজে !

## অভিসার !

এমন দুর্বোধ্য রাতে তার অভিসার !  
গগন সঘন, ধরা ঘোর অন্ধকার,  
শুধু সে চপলা চমকিছে বারবার  
দিশি দিশি ;—হেন নিশি অভিসার তার !  
যেমেছে নিকুঞ্জ গেছে বিহঙ্গ-কুঞ্জন,  
মধুলুক, মধুপের মধুর গুঞ্জন ;  
শুধু সে পূর্ব বার ঘর খোলা পেয়ে,  
হা হা করে উল্লাদের মত আসে ধেরে !  
তখন সে স্তম্ভিত কোন্ নদী পারে,  
সঙ্গীহার্য পথহার্য গহন কান্তারে,  
দৃষ্টিহার্য স্তম্ভিত কোন্ অন্ধকারে,  
হইতেছে পার, ওগো, মোর অভিসারে !  
মেঘ ডাকে, বায়ু হাঁকে, স্বরে বারিধার,—  
হেন ঘোর রজনীতে তার অভিসার !

# কোচবিহার-সাহিত্য-সভা ।

সাপ্তাহিক অধিবেশন ।

ল্যান্সডাউন হল, ১৩২৬ সন ২৯ এপ্রিল সোমবার পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা ।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ।

কার্য্য-বিবরণ ।

১। সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হয় ;—

বিভাস

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে  
জাগরে ধীরে—  
এই ভারতের মহা-মানবের  
সাগর-তীরে ।

হেথায় দাঁড়ারে হু-বাহু বাড়ারে  
নমি নর-দেবতারে,  
উদার ছন্দে পরমানন্দে  
বন্দন করি তাঁরে ।

ধান-গম্ভীর এই যে ভূধর,  
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,  
হেথায় নিত্য হের পবিত্র  
ধরিত্রীরে,  
এই ভারতের মহামানবের  
সাগরতীরে ॥

ইমন

কেহ নাহি জানে কার আস্থানে  
কত মানুষের ধারা  
জ্বাংস শ্রোতে এল কোথা হ'তে  
সমুদ্রে হ'ল হারা ।

হেথায় আর্ধ্য, হেথা অনাৰ্য্য  
হেথায় দ্রাবিড়, চান,—  
শক ছন-দল পাঠান মোগল  
এক দেহে হ'ল লীন ॥

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,  
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,  
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে  
যাবে না ফিরে,  
এই ভারতের মহামানবের  
সাগরতীরে ॥

\*\*

\*\*

বেহাগ

এস হে আর্ধ্য, এস অনাৰ্য্য,  
হিন্দু মুসলমান ।  
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,  
এস এস খৃষ্টান ।

এস ব্রাহ্মণ, গুচি করি' মন  
ধর হাত সবাকার,  
এস হে পতিত, হোক অপনৌত্ত  
সব অপমানভার ।

বিভাস

মা'র অভিষেক এস এস স্বরা,  
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা  
সবার পরশে পবিত্র-করা ।  
তীর্থনীরে  
আজি ভারতের মহামানবের  
সাগরতীরে ॥

(গীতাঞ্জলি)

২। শ্রীযুক্ত রাণী নিকুপমা দেবী মহোদয় বিবচিত্র নিম্নলিখিত উদ্বোধন কবিতা সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় পাঠ করেন ;—

## উদ্ভিষ্ট কাগজ

—:০:-

তুমি ভগবতের হৃদয়ে লুকায়ে মুক্তা করিছ নাশ,  
নবজীবনের সৃষ্টির মাঝে শক্তি হু প্রকাশ।

রজনী আঁধার করি নিঃশেষ  
নবজীবনের নব উন্মেষ;

দিকে দিকে তুমি জাগাইছ সাড়া  
প্রাণের অভ্যাস,

অমৃত অব অমৃত !

বাহারা ঘুমায়ে ছিল এতদিন মেলেছে সকলে চোখ  
নব উৎসাহে মত্ত করেছে তোমার পুণ্যলোক !

স্বাধীনতা অ'র কাতীরতা বীজে

নব প্রাণ রনে উঠিয়াছে ভিত্তে

আপনার পায়ে ঐ ডাকে শিখেছে।

আপনার পরে ভ',

ভয় চির নির্ভর।

সজীবনের মন্ত্র তোমার ফুকারিছে যেই ভেরী,  
বসিতেছে সবে “উঠ উঠ কাগ নাহি দেবী নাহি দেবী।”

কেহ নাহি জানে কি যে হবে আজ

করিতে হইবে কার কোন কাজ,

রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় বাঙিতেছে সেই গান

ভয় নিখিলের প্রাণ।

কিছু করে নাই কিছু মরে নাই

কিছু হয় নাই তারা,

সৃষ্টিদিনের প্রথম হইতে

বহিছে একটি ধারা !

যা ছিল তখন এখনও তা আছে,

আমরা বাঁচিলে তাহারাও বাঁচে,

আমরা রাঁখিলে আদিমের যুগ

হয় পুন অক্ষয়,

অমৃত অমৃত অমৃত !

৩। ১৩২৬ সনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়।

৪। নূতন সদস্য নির্বাচিত হয়।

৫। সম্পাদক কর্তৃক সভার ১৩২৫ সনের কার্যবিবরণ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব সম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন ;—

হিন্দু রাজার রাজত্বকাল

ভাতিছে আবার মনে

কোন বিদ্যায় বণী ছিল তারা,

ধনী ছিল কোন ধনে !

গড়েছিল কি যে কীর্তির লাগি

লিখেছিল পুথি বশ-অনুরাগী

জানী ছিল তারা গুণী ছিল তারা

শিল্পের গুরু সেরা

মহাবিদ্যায় বেরা !

আমরা তাঁদের পুণ্য মহিমা

তুলিব আবার ধরে,

তাঁদের জীবনকাহিনী আবার

বর্ণিব প্রচার করে !

আঁকিব তাঁদের জীবন খাতায়

পদাঙ্ক লেখা ধরিব নাথায়

শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁদের সমান

হইব আবার সবে

সে দিন আবার হবে !

আমাদের এই মরা বৃকে আজ

দাও তুমি নব-প্রাণ

কণ্ঠ পুরিয়া গাহিব আবার

নবজীবনের গান !

কিসে মোরা হীন ছোট মোরা কিসে

বড় হব মোরা বড় সাথে মিশে,

উঠিব জাগিব কি ভয় মোদের

তুমি আমাদের পিতা

‘জনয়িতা পালয়িতা !’

GENTLEMEN,

I trust you will forgive me addressing you a few words before the conclusion of to-day's programme, and give me your attention for a few minutes.

Let me welcome you all to this the 3rd Annual Meeting, and I would feel obliged by anyone pulling me up, should I be wrong in what I say, or on any point for discussion. You have heard the Annual Report read out by the Secretary, and that will give you all the information you require about the last year's working.

The number of members, whose names have been struck off the list owing to non-payment of subscription seems high, in proportion to the total number of members, but gentlemen you must not forget that all the rules were drawn up by yourselves. If the non-payment of subscriptions is due to its being too high, you have yourselves to blame and no one else. The hands of the Executive Committee are tied. They are bound by the rules. The matter is distasteful, so perhaps I should not have dilated upon it at the Annual General Meeting. But I feel I cannot restrain myself from speaking on one subject—it has been in my mind for months past and to-day it is the first opportunity I have had of speaking about it. It is this—I sincerely deplore the lack of interest taken by the members of the Sava generally. The names of members who take real interest can almost be counted on the fingers of the hands. We have ample funds, towards which His Highness has contributed most generously, what is it you would want. When the Maharaja of Mysore visited us I told him that the Sava was originally started with the idea of Research Work, but if the members will kindly look up the rules and refer to Nos. 3, 4 and 13, they will find that Sub-Committees may be formed for the other Arts and Sciences. To those members, who have any inclination to any art or science, I would feel much beholden, by their helping to start Sub-Committees as soon as possible. But I appeal to you all to take a greater interest. Let there also be more healthy arguments, which is good for mind, body, and soul. By healthy I do not mean heated arguments, which generally lead to unpleasantness—that must be averted at all costs.

It may interest you to know that a Museum in London has approached this State through the Government of India for all Archaeological Reports and Works of historical interest. As you know the State has no such departments, but it shows us that there is a great field for work.

The History of Northern and North-Eastern Bengal is practically unknown to the general public, so in conclusion I am glad to announce that His Highness has sanctioned the publication of an authenticated History of the State. The task of collecting all material and writing up preliminaries has been left in the capable hands of our able Secretary Khan Chowdhuri Amanatulla Ahmed. I ask all members for their cordial help, and I am sure none will be more thankful than Khan Chowdhuri himself.

## বঙ্গানুবাদ ।

ভ্রমহোদয়গণ,

অদ্যকার সভার কার্য শেষ হওয়ার পূর্বে আমি আপনাদিগকে ছুটচারিটি কথা বলিতে চাই এবং আশা করি যে আপনারা আমার এই কথা কয়টি একটু মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন ।

সভার এই তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি সমাগত সভ্যবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি । আমি যে কথা বলিতে গাইতেছি, যদি তাহাতে কোন ভুলভাষি থাকে, তাহা হইলে আপনাদিগের মধ্যে কেহ কৃপা কারয়া



আমার ভ্রমের সংশোধন করিয়া দিলে কিম্বা তৎসম্বন্ধে আবশ্যক আলোচনা করিলে, আমি অনুগৃহীত বোধ করিব। সভার সম্পাদক এই মাত্র যে কার্যাবিবরণ পাঠ করলেন, তাহা আপনারা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে গতবৎসরে সভার কি কাজ হইয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

বকেয়া টাকা দেওয়ার জন্য, যে সকল সভার নাম সভাভালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সভার মোট সভাসংখ্যার তুলনায় অধিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু মহোদয়গণ, আপনাদের বিস্তৃত তত্ত্বাভিচিন্তা নহে যে সভার নিয়মাবলী আপনারাই প্রণয়ন করিয়াছেন। যদি আপনাদের বিবেচনা হয় যে সভার টাকার হার অতিরিক্ত হওয়াতেই অনেকে দিতে পাবেন না, তাহা হইলে সে ক্রটি আপনাদেরই;—যেহেতু কার্গ-নির্বাহকসমিতি এ সম্বন্ধে নিরুপায়, কারণ তাঁহারা সভার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন কার্যে বাধ্য। তবে, এই অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া, সাধারণ সভার আর অধিকতর আলোচনা করা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু, একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার মনের কথা বাক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; ইহা অনেকদিন হইতেই আমার মনে রহিয়াছে এবং আজই আমার পক্ষে এই কথা বলিবার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সে কথাটি এই :-সাধারণতঃ সভার কার্যের প্রতি সভাগণের আন্তরিক অনুবাগের অভাব দেখিয়া আমার মনে প্রকৃতই কষ্ট হইয়াছে। সভাসদ্বর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মনপ্রাণের সহিত সভার কার্য করেন, তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের উদারতার ফলে আমাদের সহবিলে যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে। আপনাদের এ সম্বন্ধে প্রকৃত অভিলাষ কি, তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হয়। শ্রীশ্রীশুক মহাশয়রাধিপতি বাহাদুর যে সময়ে আমাদের এখানে পদার্পণ করেন, তৎকালে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে প্রধানতঃ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যই সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সভার নিয়মাবলী তৃতীয়, চতুর্থ, এবং ঊনবিংশ দফার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সভাসদগণ দেখিতে পাঠবেন যে, যে কোন বিশেষ বিশেষ শিল্প অথবা বিজ্ঞানের অনুশীলনের নিমিত্ত সভা হইতে সবকমিটি নিযুক্ত হইতে পারে। সেই জন্য সদস্যগণের মধ্যে বাঁহাদের মনে কোন বিশেষাশিল্প অথবা বিজ্ঞানের বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাঁহারা যদি সেই সেই বিষয়ে যত্নশীল সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন সবকমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব। আমি সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সভার কার্যে অধিকতর মনোযোগী হউন। বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় লইয়া উপযুক্তভাবে অনুশীলন এবং আলোচনা হউক, —তাহাতে আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিবিধ উন্নতির সম্ভাবনা। তবে এই সব আলোচনা অবশ্য সরল এবং সাধুভাবেই হওয়া উচিত শুধু অথবা কলহ পূর্ণ বিতণ্ডা করিয়া মনোমালিন্যের উৎপাদন করা কখনও কর্তব্য নহে,—বরং সেরূপ তর্ক অথবা কলহ সর্বতোভাবে নিবারণ করাই উচিত।

আপনারা শুনিয়া হয় ত স্তম্ভী হইবেন যে লণ্ডনের কোন একটা মিউজিয়ম আমাদের কোচবিহার রাজ্যের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সম্বন্ধে বিবরণী এবং পুস্তকাদির জন্য ভারতগবর্ণমেন্টের যোগে আমাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যের দক্ষত্রে এরূপ কোন বিভাগ নাই; তথাপি, ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের কর্মক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর এবং পূর্বোত্তর ভারতের প্রকৃত ইতিহাস এখনও সাধারণে অবিজাত রহিয়াছে। এতদ্রূপলক্ষে আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত তথ্য পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ সম্পন্ন একখানি উপাদেয় ইতিহাস প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই ইতিহাস প্রণয়নের নিমিত্ত যাবতীয় আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ এবং খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার আমাদের সুদক্ষ সম্পাদক খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি সভ্যমহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে সম্পাদককে সানন্দে সহায়তা প্রদান করুন এবং আমার বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইলে তিনি অতিশয় আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রবণ করিবেন।

১৭। শ্রীশ্রী সীতেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীশ্রী রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সমর্থনক্রমে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

শ্রী আমানতউল্লা আহমদ।

সম্পাদক।

শ্রীভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ।

সভাপতি।

# কোচবিহার-সাহিত্য-সভার তৃতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী ।

সন ১৩২৫

কোচবিহারাধিপতি মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর ও শ্রীশ্রীমতী মহারানী আইদেবতীর অনুমতিক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিতোন্দ্র নারায়ণ মহোদয় ১৩২২ সনের ১৩ই পৌষ তারিখে এই সভা স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর অমুগ্রহ পূর্বক ইহার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়া সদস্যবৃন্দের উৎসাহ ও সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১। আলোচ্য বর্ষে নিম্ন লিখিত সদস্যগণ কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালক ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিতোন্দ্র নারায়ণ,—সভাপতি।

„ „ লেপটনান্ট হিডেনারায়ণ ও } সহকারী সভাপতি।  
„ দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন বি.এল., বার-এট-ল; }

„ শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম.এ. বি.এল., ইত্যাদি, সর্বাভিসনাল অফিসার, দিনহাটা;—পত্রিকা সম্পাদক।

„ খান চৌধুরী আমানতউল্লাহ আহমদ, জমিদার;—সম্পাদক।

„ প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, জমিদার;—সহকারী-সম্পাদক।

সভা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল.,—সিভিল ও সেশন জজ।

„ জানকীবল্লভ বিশ্বাস, সহকারী-সম্পাদক—“পরিচারিকা”।

„ নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ,—অধ্যাপক-ভিক্টোরিয়া কলেজ।

„ মনোরথধন দে, এম.এ., „ „

„ মোলবী আবদুল হালিম, শিক্ষক—জেন্সিস স্কুল।

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী, লাইব্রেরিয়ান—ষ্টেট লাইব্রেরী।

„ ইন্দুভূষণ দে মজুমদার, বি.এ., এম্.এস্.সি.,—এসিস্টেন্ট সেটলমেন্ট অফিসার।

„ অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ,—স্পেশাল এসিস্টেন্ট মহারাজের অফিস।

„ নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,—পুলিস ইনসপেক্টর।

২। ১৩২৫ সনে কার্যনির্বাহক-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল।

৩। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

বিশিষ্ট সদস্য :—

১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, সমুদ্রাগমচক্রবর্তী, নাইট, সি.এস্.আই., এম্.এ., ডি.এল., ডি.এস্.সি., এফ্.আর্.এ.এস্., এফ্.আর্.এস্.ই., এফ্.আর্.এস্.বি. কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী এম্.আর্.এ.এস্.. এফ্.আর্.এ.এস্., গৌহাটী।

## সংসদ সদস্য বর্ণমালাক্রমে।

১।	শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, কোচবিহার।	৪৩।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ঘোষ, কোচবিহার।
২।	,, অধঃচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহার।	৪৪।	,, ঠাকুর কৃষ্ণমোহন সিংহ, মেঘলীগঞ্জ।
৩।	,, অন্নদা প্রসাদ রায়, কোচবিহার।	৪৫।	,, কৃষ্ণবিনোদ সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
৪।	,, অরুণ সেন, বি.এ., বার-এটল, ৮০ লোহার সাকুলার রোড, কলিকাতা।	৪৬।	,, কেশরনাথ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৫।	,, অশ্বিনীকুমার পাল, বি.এ., কোচবিহার।	৪৭।	,, কেশরনাথ বিশ্বাস, কোচবিহার।
৬।	,, আজিজুর রহমান, কোচবিহার।	৪৮।	,, কেশরনাথ সিংহ, কোচবিহার।
৭।	আকিম উদ্দিন আহমদ, বড় মরিচা পোঃ।	৪৯।	,, কৈলাসচন্দ্র সেন, কোচবিহার।
৮।	আদিত্যচন্দ্র কায়ো, কোচবিহার।	৫০।	,, ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম, কোচবিহার।
৯।	আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ঐ	৫১।	,, ক্ষেত্রলাল সাহা, এম.এ., কোচবিহার।
১০।	আনসার উদ্দিন আহমদ, বি.এ., ঐ	৫২।	,, বঙ্কেন্দ্রনারায়ণ পাটয়ারী, আদাবাড়ী, গোসানীমারী পোঃ, কোচবিহার।
১১।	জে এন অপকার, দিনহাটা।	৫৩।	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, কোচবিহার।
১২।	আদিত্য উদ্দিন আহমদ, কোচবিহার।	৫৪।	গঙ্গা প্রসাদ দাস গুপ্ত, বি.এ., কোচবিহার।
১৩।	গান চৌধুরী আমানত উল্লাহ আহমদ, ঐ	৫৫।	কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, এম.আর. এ.সি., কোচবিহার।
১৪।	আমিনত উল্লাহ আহমদ, ডাক্তার ঐ	৫৬।	গণেশচন্দ্র গুহ, কোচবিহার।
১৫।	আমীর উদ্দিন মোহাম্মদ, ঐ	৫৭।	গণেশচন্দ্র রায়, কোচবিহার।
১৬।	আমীর উদ্দিন মোহাম্মদ, মেঘলীগঞ্জ।	৫৮।	গিরিজামোহন রায়, কোচবিহার।
১৭।	আমীর উল্লাহ আহমদ, তুফানগঞ্জ।	৫৯।	গিরিজাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
১৮।	আলাম মোহাম্মদ, কোচবিহার।	৬০।	রায় সাহেব গুরুচরণ দত্ত, কোচবিহার।
১৯।	মৌলবী আবদুল হালিম, কোচবিহার।	৬১।	গুরুচরণ রায়, ভোগড়াবরী, চিলাহাটি পোঃ, রঙ্গপুর।
২০।	অজিতোষ দত্ত, বি.এ., বি.এস্.সি., এম্.এস্.সি., কোচবিহার।	৬২।	গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কাব্যাবাকরণতীর্থ, কোচবিহার।
২১।	ইন্দ্রকুমার দেবজয়দার, বি.এ., এম্.এস্.সি., কোচবিহার।	৬৩।	গোপালগোবিন্দ গুহ, কোচবিহার।
২২।	ইন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কোচবিহার।	৬৪।	গোবিন্দবল্লভ রায়, কোচবিহার।
২৩।	ইন্দ্রনারায়ণ সরকার, মধ্যাহ্না।	৬৫।	চূর্ণালাল মুখোপাধ্যায়, এম.এ., ,
২৪।	সেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, কোচবিহার।	৬৬।	জগদ্বন্দ্ব বিশ্বাস, এম.এ., বি.এল., কোচবিহার।
২৫।	রায় চৌধুরী জ্ঞানচন্দ্র দাহিড়ী, বামনহাট পোঃ, কোচবিহার।	৬৭।	জগদীশচন্দ্র সেন, বি.এ., কোচবিহার।
২৬।	উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্.এ., কোচবিহার।	৬৮।	জলধর মিত্র, এল. এম্. এস., কোচবিহার।
২৭।	উপেন্দ্রনাথ রায়, এম্.এ., কোচবিহার।	৬৯।	জানকীবল্লভ বিশ্বাস, কোচবিহার।
২৮।	উমানাথ দত্ত, বি.এল., মেঘলীগঞ্জ।	৭০।	জাকির আলি সরকার, দিনহাটা।
২৯।	উমেশচন্দ্র সরকার, কোচবিহার।	৭১।	জিতেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, বি.এস. সি., কোচবিহার।
৩০।	উমেশচন্দ্র সিংহ, কোচবিহার।	৭২।	জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার।
৩১।	এমদাদ আহমদ, বড় মরিচা পোঃ, কোচবিহার।	৭৩।	জ্ঞানশঙ্কর বাগচী, কোচবিহার।
৩২।	এসরাইল উদ্দিন চৌধুরী, কোচবিহার।	৭৪।	ভারকুমার সেন গুপ্ত, বি.এল., মেঘলীগঞ্জ।
৩৩।	কদর উদ্দিন আহমদ, বড়মরিচা পোঃ, ঐ	৭৫।	ভারপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ১২০২১ নং দিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৪।	কলিন উদ্দিন আহমদ, বলাহরহাট পোঃ, কোচবিহার।	৭৬।	রায় চৌধুরী তারিণীচরণ চক্রবর্তী, কোচবিহার।
৩৫।	কাজিম উদ্দিন আহমদ, কোচবিহার।	৭৭।	তারিণীমোহন দাস, কোচবিহার।
৩৬।	কান্তিকচন্দ্র গুপ্ত, কোচবিহার।	৭৮।	ত্রিগুণচরণ চক্রবর্তী, দিনহাটা।
৩৭।	কামাখাপদ মুস্তফা, গৌবরাহাড়া পোঃ।	৭৯।	ঐক্যলোকনাথ সিংহ, মেঘলীগঞ্জ।
৩৮।	কামিনীকুমার রায়, কোচবিহার।	৮০।	দক্ষিণারঞ্জন ধর, বি.এল., তুফানগঞ্জ।
৩৯।	কালীপ্রসাদ সাহা, কোচবিহার।	৮১।	দীনেশানন্দ চক্রবর্তী, এল.এম.এস., কোচবিহার।
৪০।	কাশীমোহন পাল, কোচবিহার।	৮২।	দুর্গাচরণ সরকার, ,
৪১।	কিশোরীমোহন বড়ুয়া, দিনহাটা।	৮৩।	দুর্জননাথ চক্রবর্তী, গুড়িয়াহাটা ,
৪২।	কুমুদবল্লভ বিশ্বাস, ঐ	৮৪।	দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বি.এ., ,

৮৫।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বড়ুয়া,	কোচবিহার।	১২৯।	শ্রীযুক্ত বিনলাচরণ সেন গুপ্ত,	কোচবিহার।
৮৬।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী,	,,	১৩০।	,, বিষ্ণুচরণ মজুমদার,	ঐ
৮৭।	,, নগেন্দ্রনাথ রায়, এম.এ., বি.এস.সি.,	,,	১৩১।	,, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী,	ঐ
	এ.সি.জি. আই, জি.এম.আই.ই.ই.,	কোচবিহার।	১৩২।	,, কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ,	ঐ
৮৮।	,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.,	ঐ	১৩৩।	,, বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য, এম.এ.,	ঐ
৮৯।	,, নরসিংচন্দ্র ঘোষ, এম.এ. বি.এল.,	ঐ	১৩৪।	,, বীরেশ্বর সেন,	কৃষ্ণনগর।
৯০।	,, নরেন্দ্রনাথ সেন, সি.এল., বার-এট-ল,	ঐ	১৩৫।	,, বেচারান দত্ত,	কোচবিহার।
৯১।	,, নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি.এ.,	ঐ	১৩৬।	,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র নিয়োগী,	ঐ
৯২।	,, কুমার নলিনীন্দ্রদেব রায়কত,	ঐ	১৩৭।	,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস,	ঐ
৯৩।	,, নবদ্বীপচন্দ্র দে,	ঐ	১৩৮।	,, ভবাজি কমল সেন,	ঐ
৯৪।	,, নিঃসঙ্গোপাল বিনোবিনোব,	ঐ	১৩৯।	,, ভবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,	ঐ
৯৫।	,, প্রিন্স ডিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ,	ঐ	১৪০।	,, ভানুনাথ বিহারদু,	ঐ
৯৬।	,, নির্মলচন্দ্র মুস্তফা, বি.এল.,	দিনহাটা।	১৪১।	,, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল.,	ঐ
৯৭।	,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য,	কোচবিহার।	১৪২।	,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,	ঐ
৯৮।	,, নিবারণচন্দ্র রায়,	মেগলাগঞ্জ।	১৪৩।	,, মথুরানাথ রায়,	ঐ
৯৯।	,, নিবারণচন্দ্র রায় চৌধুরী,	কোচবিহার।	১৪৪।	,, মনোজনাথ রায়, এম.এ.,	ঐ
১০০।	,, নিগাহর বর্ম্মা প্রামাণিক,	মেগলাগঞ্জ।	১৪৫।	,, রায় চৌধুরী মনোমোহন বর্ম্মা,	ঐ
১০১।	,, নুসিংপ্রসাদ ভট্টাচার্য,	কোচবিহার।	১৪৬।	,, মনোমোহন সানাল,	ঐ
১০২।	,, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,	,,	১৪৭।	,, মনোমোহন চক্রবর্তী,	ঐ
১০৩।	,, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা, এম.এ. বি.এল., এম.বি.ই.,	,,	১৪৮।	,, মনোরথধন দে, এম.এ.,	ঐ
	নবাবগঞ্জ পোঃ, রংপুর।		১৪৯।	,, মনোজনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ
১০৪।	,, পদ্মনাথ ইশর, কোচবিহার।		১৫০।	,, কর্ণেল মহিমচন্দ্র হাকুর, পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা।	
১০৫।	,, পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, ঐ		১৫১।	,, মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	কোচবিহার।
১০৬।	,, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি.এল., জুজাইগুড়ি।		১৫২।	,, মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মা অধিকারী,	ঐ
১০৭।	,, প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফা,	কোচবিহার।	১৫৩।	,, মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী,	ঐ
১০৮।	,, প্রফুল্লরঞ্জন ধর, এম.এ.,	ঐ	১৫৪।	,, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, বি.এল.,	ঐ
১০৯।	,, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৫৫।	,, মোদনাথ স্মৃতিরত্ন,	ঐ
১১০।	,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ. বি.এল.,	ঐ	১৫৬।	,, যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, মাথাভাঙ্গা।	
১১১।	,, প্রমদানন্দ রায়,	ঐ	১৫৭।	,, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি.এল., দেবীগঞ্জ পোঃ,	
১১২।	,, রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বর্ম্মা,	ঐ		জলপাইগুড়ি।	
১১৩।	,, প্রবোধচন্দ্র সেন,	ঐ	১৫৮।	,, যতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত,	কোচবিহার।
১১৪।	,, প্রবোধচন্দ্র মিত্র,	ঐ	১৫৯।	,, যতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত,	ঐ
১১৫।	,, প্রিয়ভূষণ রায়, বি.এ.,	ঐ	১৬০।	,, যতুনাথ নিয়োগী,	ঐ
১১৬।	,, প্রিয়দীপ ঘোষ,	ঐ	১৬১।	,, যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি.এস.সি.,	
১১৭।	,, ফকির দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ.,	ঐ		এ.এম. আই.ই.এস., এম. আর. আই.,	ঐ
১১৮।	,, ফণীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.,	ঐ	১৬২।	,, যোগেন্দ্রনাথ ভিষ্মপ্রভ,	ঐ
১১৯।	,, বজ্রলর রহমান, সরকার বি.এল.,	মাথাভাঙ্গা।	১৬৩।	,, যোগেন্দ্রনাথ দাস	ঐ
১২০।	,, বলরাম পাল,	কোচবিহার।	১৬৪।	,, যোগেন্দ্রনাথ বর্ম্মা, কক্সবন্দ সমিতি রংপুর।	
১২১।	,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৬৫।	,, রজনীকান্ত ভৌমিক, এম.এ. বি.এল., মাথাভাঙ্গা।	
১২২।	,, বাণীনাথ নায়ককানন,	ঐ	১৬৬।	,, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, বি.এ., কোচবিহার।	
১২৩।	,, ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.,	ঐ	১৬৭।	,, রমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কোচবিহার।	
১২৪।	,, বিনয়কুমার ঘোষ,	কোচবিহার।	১৬৮।	,, রমেশনারায়ণ চৌধুরী, কোচবিহার।	
১২৫।	,, বিনোদবিহারী দত্ত, বি.এল.,	ঐ	১৬৯।	,, রসিকলাল মুখোপাধ্যায়,	ঐ
১২৬।	,, বিপ্লবভঞ্জন ভট্টাচার্য,	ঐ	১৭০।	,, হাপালচন্দ্র বণিক, বি.এ.,	ঐ
১২৭।	,, বিভূতিভূষণ বসু,	ঐ	১৭১।	,, রাধননারায়ণ পোদ্দার,	ঐ
১২৮।	,, বিভূতিভূষণ দে,	ঐ			

১৭২।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,	কোচবিহার।	১২৪।	শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীসতীশচন্দ্র মুখুপাধ্যায়,	কোচবিহার।
১৭৩।	,, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায়, বি.এল.,	ঐ	১২৫।	,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এল.,	ঐ
১৭৪।	রাধাগোবিন্দ রায়,	ঐ	১২৬।	,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী,	কোচবিহার।
১৭৫।	রামরতন চক্রবর্তী,	ঐ	১২৭।	,, সতীশচন্দ্র দাস, ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গা, রংপুর।	
১৭৬।	রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,	ঐ	১২৮।	,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত,	কোচবিহার।
১৭৭।	লক্ষ্মীকান্ত দাস বড়কায়েরত,	ঐ	১২৯।	,, সারদাচরণ মজুমদার,	ঐ
১৭৮।	লাটুগোপাল মুখোপাধ্যায়,	ঐ	২০০।	,, সীতানাথ রায়,	ঐ
১৭৯।	লোকেনাথ দত্ত, এল.সি.ই.,	ঐ	২০১।	,, সীতেশচন্দ্র সান্যাল,	ঐ
১৮০।	শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, এম.এ.,	ঐ	২০২।	,, স্বরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি.এল.,	ঐ
১৮১।	শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম.এ. বি.এল.; সরস্বতী, কাব্যতীর্থ,		২০৩।	স্বরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী,	ঐ
	বিদ্যাবূষণ, ভারতী, দিনহাটা।		২০৪।	স্বরেন্দ্রচন্দ্র গুহ,	ঐ
১৮২।	শরৎকুমার দেব বস্তু, কোচবিহার		২০৫।	স্বরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক,	ঐ
১৮৩।	শশধর সিংহ, বি.এল.,	বেংলীগঞ্জ।	২০৬।	রায় চৌধুরী স্বরেন্দ্রচন্দ্র মুখুপাধ্যায়,	ঐ
১৮৪।	শশীভূষণ সেন,	কোচবিহার।	২০৭।	স্বর্জীতকুমার চক্রবর্তী, এম.এ.,	ঐ
১৮৫।	শশিমোহন বসু,	ঐ	২০৮।	স্বর্জীনাথ গুপ্ত,	ঐ
১৮৬।	শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২০৯।	হরকান্ত দে,	ঐ
১৮৭।	,, শৈলেন্দ্র ঘোষ, বি.এ.,	ঐ	২১০।	হরনাথ সরকার,	ঐ
১৮৮।	,, শৈলেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার,	ঐ	২১১।	হরিনাথ সেন গুপ্ত এম.এ.,	কোচবিহার।
১৮৯।	প্যাঁচাচরণ তালুকদার,	ঐ	২১২।	হরিনাথ বসু, বি.এল., খুলনা	
১৯০।	প্রীনাথ রায়,	ঐ	২১৩।	হরেন্দ্রনারায়ণ দাস,	কোচবিহার।
১৯১।	শ্রীশচন্দ্র রায়,	ঐ	২১৪।	মহারাজকুমার লেপ্টেন্যান্ট হিতেন্দ্রনারায়ণ,	ঐ
১৯২।	সতীশচন্দ্র রায়,	ঐ	২১৫।	হেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি.এল.,	ঐ
১৯৩।	সতীশচন্দ্র গুহ,	ঐ			

৩। আলোচ্য বর্ষে সভার নিম্নলিখিত ৮টি অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ববৎসরে ৬টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

তারিখ	অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ ও সংক্ষিপ্ত কার্যাবিবরণ।
১লা বৈশাখ	.. বার্ষিক	১৩২৪ সনের বার্ষিক কার্যাবিবরণ গ্রহণ।
৩১শে বৈশাখ	বিশেষ	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারানী সুনীতি দেবী সি.আই. মহোদয়া কর্তৃক “মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সাহিত্যিক জীবন” বক্তৃতা।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ	বিশেষ	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারানী সুনীতি দেবী সি.আই. মহোদয়া কর্তৃক কণকতা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা ভঙ্গ, বলরামের ভক্তি, শিবধ্বজের আত্মদান ও সতীর উপাখ্যান শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন রায় লিখিত “বহির্দেহ ধর্ম” প্রবন্ধ ও স্থানীয় নাট্যসমাজকর্তৃক “কমলাকান্তের দণ্ডার” অভিনয়।
১৬ই আষাঢ়	বিশেষ (বহিঃস্থ স্থতিসভা)	

তারিখ	অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণ
২৬শে প্রাবণ	সাধারণ	... শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল বিনোবিনোদ লিখিত “ভাষার পঙ্খ” প্রবন্ধ ও উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি- নিদি নির্বাচন।
১৫ই অগ্রহায়ণ	সাধারণ	... শ্রীযুক্ত খান চৌধুরী আমানতউল্লাহ আহমদ লিখিত “কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা” প্রবন্ধ।
৩রা ফাল্গুন	বিশেষ	... মহীশূরাদিপতির সম্বর্ধনা।
১৬ই ফাল্গুন	সাধারণ	... সভার নিয়মাবলী সংশোধন। ১৯২৬ সনের সম্ভাব্য আয় ব্যয় অবধারণ ও উক্ত সনের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন।

৪। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি মহীশূরাদিপতি শ্রীশ্রীমৎ মহারাজ সার কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার বাহাদুর জি.সি.এস.আই., মহোদয় কোচবিহার নগরে স্তভাগমন করায় ৩রা ফাল্গুন তারিখে সভার এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে সম্বর্ধিত ও নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল বিজ্ঞাবিনোদ বিদ্যচিহ্ন

বিবিধবিজ্ঞাবিনাস-রস-রসিকশেষকৌতুকুশল-

ক্ষত্রকুলশিখামণি-মহীশূর-মহী-মহীন্দ্র-শ্রীশ্রীমৎসার কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার,

মহারাজ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, মহামুভব

অভ্যর্থনা-প্রশস্তিঃ।

এহেহ রাজক্যগণাগণ্য,

এহেহ বিদ্বৎপ্রগড়প্রবণ।

এহেহ ভূমণ্ডলসর্বমাত্ত,

এহেহ সাহিত্যকলাতিধন্য ॥ ১ ॥

তবার্চনায়োগ্যপদার্থহীন-

কর্দাসনং কল্পিতমাসনায়।

গৃহগ চিত্তার্থমথাপাচ্ছাং

হর্ষাৎক্রতং ভক্তিশুগন্ধিপুষ্পম্ ॥ ২ ॥

বিজ্ঞা ধনং ধর্ম ইহৈকলোকে

তিষ্ঠন্তি নৈবং হি চিরপ্রসিদ্ধিঃ।

ভবন্তুমাসাচ্ছ গুণৈর্বরিত্তং

সার্থপ্রবাদোহপি নিরর্থকোহভূৎ ॥ ৩ ॥

স্বং শীলবান্ ভীষ্ম ইব প্রশস্তঃ,  
 স্বং ধৈর্যবান্ শৈল ইবা প্রশস্যঃ ।  
 স্বং জ্ঞানবান্ জীবসমো যশস্তঃ,  
 স্বং ধর্ম্যবান্ ধর্ম্মসুতেন তুলাঃ ॥ ৪ ॥  
 ঔদার্য্য-গান্ধার্য্যমহত্-শৌর্য্য-  
 চারিত্র-সৌজন্যগুণৈর্বিশিষ্টৈঃ ।  
 'দিক্ পালমাত্রাঘটিতো নরেন্দ্রঃ'  
 শাস্ত্রীয়বাদং সফলীকরোষি ॥ ৫ ॥  
 দেশেষু চ স্থাপয়িতা প্রজানাং  
 বিজ্ঞানয়ানাং মতিবর্দ্ধনার্থম্ ।  
 সাধূপকারেষু সদাসুরক্তঃ,  
 দুষ্টিগ্নিগৃহাসি তথৈব যুক্তঃ ॥ ৬ ॥  
 বিজ্ঞাবীৰ্য্যপ্রথিতবিভবে কৌন্তির্মহির্গরিষ্ঠে  
 ভাতঃ শ্রীমানখিলগুণভূঃ ক্ষত্রবংশাবতংসঃ ।  
 প্রাজ্যং রাজ্যং সকলসুখদং সৈন্দ্ৰ্য্যগৈশ্চ বিধৎসে  
 কুল্যাসেতুপ্রভৃতি-করগৈর্ধাতুবিজ্ঞাবিধিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥  
 মধুর-মধুর-মুষ্টিঃ প্রীতিবিশ্রান্তধামা,  
 করুণহৃদয়-দৃষ্টিঃ রূপলাবণ্যসীমা ।  
 প্রকৃতিষু স্ততবুদ্ধিঃ রাজ্যভবৈকলক্ষ্যঃ,  
 জয়তি জয়তি নিত্যং কৃষ্ণরাজো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥  
 খবেদবস্বিন্দুমিতে শকাংকৈ সৌরিবাসরে ।  
 গুণমে ফাঙ্কনে সৌরে সদস্তৈর্বিনয়ান্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥  
 কোচবিহারসাহিত্যানুশীলনীসমিতিরিয়ম্ ।  
 মহীশূরমহীন্দ্রায় প্রশস্তির্দীয়তে মুদা ॥ ১০ ॥

### অভ্যর্থনা প্রশস্তির অনুবাদ ।

১। হে রাজন্যকুলতিলক, হে পণ্ডিতমণ্ডলীপ্রীতিবর্দ্ধন, হে ভূমণ্ডলবাসিমানববৃন্দবরেণ্য, হে কাব্যনাটক ও সুকুমার কলাবিদ্যার বিচক্ষণ, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম উদৈর্য্য অমুগ্রহপূর্ব্বক এই সাহিত্যসভার শুভাগমন করুন ।

২। আপনার ন্যায় মহামহনীর মহাজনের অভ্যর্থনার উপযুক্ত উপকরণহীন, কুচবিহার সাহিত্য-সভার দীন সদস্ত (আমরা) আপনার পবিত্র উপবেশনের নিমিত্ত হৃদয়সমন্বিত পাতিয়া দিচ্ছি । আপনি কৃপা করিয়া আমাদের মানস অর্ঘ্য, হর্ষবিগলিত অশ্রুপাণ্ডা ও তত্ত্বিকরূপ সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণ করুন ।

৩। বিদ্যা, বিত্ত ও ধর্ম এক ব্যক্তিতে অবস্থিতি করে না, ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত জনপ্রবাদ। কিন্তু ঐ তিন বস্তু অধুনা আপনার ন্যায় গুণগৌরবশালী অসাধারণ পাত্র লাভ করিয়া ঐ চির প্রচলিত প্রবাদকেও বার্থ করিয়াছে।

৪। আপনি ভীষ্মের ন্যায় প্রশস্ত চরিত্র, অচলের ন্যায় অবিচলিত ধৈর্য্য শোভিত, বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানমণ্ডিত এবং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তুলা ধার্মিক।

৫। মহুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ পার্থিব নরপতিকে দিকপাল মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আপনি দয়া, দাক্ষিণ্য, ধীরত্ব, মহত্ব, বীরত্ব, সাধুচরিত্র, শিষ্টতা প্রভৃতি অনন্যসুলভ অতিমানবগুণাবলীতে বিরাজিত থাকিয়া এই শাস্ত্রীয় বাক্য বর্ণে বর্ণে সার্থক করিয়াছেন।

৬। আপনি প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান বিস্তার মানসে দেশমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনি যেমন সাধুদিগের হিত সাধনে সর্বদা বদ্ধপরিকর, তেমনই অসাধুদিগের দমনে নিরন্তর তৎপর রহিয়াছেন।

৭। হে মহারাজরাজেশ্বর! আপনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বীরত্ব ও শৌর্য্যমণ্ডিত কীর্ত্তিময় পূর্ব-পুরুষগণ কর্তৃক গৌরবিত কত্রিয়বংশের শিরোভূষণরূপে নিখিল গুণের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ধাতুবিদ্যা, খনিজবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার বিলাসভূমি। আপনার সুবিশাল রাজ্য শাসনসৌকর্য্যে ও কুলাধীন, সেতুবন্ধন, রথ্যা নিৰ্ম্মাণ আদি পূর্ত্ত কার্যের অগুণ্যসায় দিন দিন প্রকৃতি পুঞ্জের বিপুল সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছে।

৮। হে নৃপেন্দ্রচূড়ামণি মহীশূরেশ্বর কৃষ্ণরাক্ষস! আপনি অতীব প্রিয়দর্শন, মানবমাত্রেই আপনার প্রীতি ও বঁধাসের পাত্র, আপনার হৃদয় দয়ার্জ ও দৃষ্টিকারুণ্য-ববিণী; জগতে আপনার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অতুলনীয়। আপনি পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করেন, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষাই আপনার জীবনের মূলমন্ত্র। মঙ্গলময়ের রূপায় সর্বত্র আপনার বিজয়চন্দ্রভি মিনাদিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

( ৯—১০ )। কোচবিহার সাহিত্য সভার সদস্যবৃন্দ অতি বিনীত ভাবে ১৮৪০ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের তৃতীয় দিবসে শনিবারে মহীশূরাধীশ্বরের করকমলে হৃষ্টচিত্তে এই অভ্যর্থনা প্রার্থনা উপহার দিতেছেন।

## কোচবিহার সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্স্ ভিক্টর্ নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মহোদয়ের অভিভাষণ।

YOUR HIGHNESSES AND GENTLEMEN,

I deem it an honour and a privilege to be able to say a few words today.

Before I proceed any further, let me, on behalf of the Executive Committee and members of the Cooch Behar Sahitya Sava, offer His Highness the Maharaja Bahadur of Mysore a hearty welcome. It is seldom indeed we get an opportunity of welcoming so great a personage in our midst. Your Highness, through the munificent patronage of our beloved Ruler, this Sava was started 4 years ago with the primary object of historical Research, and a lesser degree the Arts, Sciences and Literature. Although there are probably hundreds of volumes written on the history of other parts of India, little or next to nothing is known to the outside world of the ancient history of these parts. It is one of our duties therefore, to collect material, and place before the world a true and authentic history of Cooch Behar and neighbouring territories. Before I close, allow me to thank Your Highness for kindly sparing us a few minutes of your valuable time and affording us the opportunity of welcoming you in our midst.



## অনুবাদ।

অন্যকার সভায় কিছু বলিতে সক্ষম হওয়ার আমি গৌরবান্বিত ও অনুগৃহীত হইয়াছি।

বিশেষ কিছু বলিবার পূর্বে আমি কোচবিহার-সাহিত্য সভার ও কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যগণের শ্রদ্ধা হইতে মহীশূরাধিপতিতে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। একপ মহামুভব ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ আমরা কদাচিত্ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের লোকপ্রিয় মহারাজের উদার অভিভাবকতার চারি বৎসর পূর্বে এই সভা স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং তৎসহ শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অত্যাশ্চর্য্য প্রদেশ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শত শত ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও এতদঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বহির্জগতে একরূপ অজ্ঞাতই রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ দ্বারা কোচবিহার ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের প্রকৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস জগদ্বাসীর সম্মুখে স্থাপন করা আমাদের কর্তব্য। আমি আমার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু তিনি বহু মূল্য সম্বন্ধে কায়ক মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহীশূরাধিপতির উত্তর—

শ্রী

## কুচবিহার সাহিত্যানুশীলন সমিতিং প্রতি ইয়ম্ উক্তিঃ

অয়ি মহারাজ ভো ভোঃ পণ্ডিতবর্ষাঃ সভাসদঃ

কুচবিহার-সাহিত্যানুশীলন সমিতিঃ সন্দর্শনাৎ অভাগ্নাবাক্যাক্ষ আনন্দপরবশে ভবাম্যদা।

ভবদীয়পশুপ্তিগচনে ময়ি ময়ান্ প্রেমতাবঃ প্রকটীকৃতঃ তদর্থং তত্ত্বদবতো ভবতো বন্ধে।

অম্মদীয়বাক্যে প্রজ্ঞানাং হিতায় বিজ্ঞানভাগ্যায় চ যে যে প্রযত্নাঃ কৃত্যঃ তে সর্ব্বেষুপি ভবন্তিঃ সমাক্ বিদিতা এবোতি নিত্যায় মোদেহম্। অনাদিকালং সমুপাগতান্যঃ ধর্ম্মাদিনিখলপুরুষার্থবোধিনাঃ গীর্ষঃপবাণাঃ পরিপোষণার্থং বিশেষতঃ প্রচারার্থং চ প্রবৃত্তাঃ অস্তাঃ সনিতৈঃ প্রীতের্ম্ম পাত্রতা সমজ্ঞানীতি অমন্দানন্দমুদামুখৌ নিমজ্জামি।

জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরিতি বরন্যকৃত্য অত্র মহারাজস্য সমাবলম্ব্যং ইয়ং সমিতিঃ সংস্কৃত-বিজ্ঞাপ্রচারস্ত প্রধানভূতা সত্য ইতোহপাধিকং খ্যাতিমেঘ্যতীতি অহং দৃঢ়তয়ং প্রোতামি। আর্থোভ্যাঃ অম্মদীরেভ্যাঃ পুরাতনোভ্যাঃ ক্রমাদনুপ্রাপ্তমিমং বিজ্ঞানিধিঃ অপ্রমত্তরা রক্ষিতুং দেশোন্নতিহেতোঃ প্রাচুর্য্যমাপাদয়িতুং চ ভবদীয়া সমিতিঃ ইয়ম্ অতীব সহকারীগীতি মন্তে।

অয়ং ভবতাং পরম-প্রেমস্পন্দীভূতো মহারাজঃ ভবদীরুশলঃসুবেগার্থং প্রতিকল্পমুচায়মানোৎসাহঃ বর্ত্ততে ইতি জানে। কিং চাস্ত মহারাজস্ত অমূল্যবরঃ মহারাজকুমার বিক্টর নারায়ণাভিঃ যম্মদ্যাক্ষপাদমলং কৰোতি আয়ুস্মন্ তন্মাদিরং সমিতিঃ অতিশয়েন বৃদ্ধিমেবাশীতি দৃঢ়তয়ং প্রোতামি।

শিবং ভবতু।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রী

## কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতির প্রতি এই উক্তি—

মহারাজ ও স্তম্ভিত সভাসদগণ! আজ কুচবিহার সাহিত্যানুশীলনী সমিতি সন্দর্শনে ও অভ্যর্থনা-বাক্যে আনন্দিত হইয়াছি।

আপনাদের প্রশস্তি বচনে আমার প্রতি বিশেষ প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এত জন্ত আপনাদের অভিনন্দন করি।

আমার রাজ্যে প্রজাদের হিতের জন্ত ও বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত যে সকল প্রযত্ন করা হইয়াছে তাহা সকলই আপনাদের সুবিদিত জানিয়া আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনাদিকাল হইতে আগত ধর্ম্মাদি সমস্ত পুরুষার্থ বোধিনী সংস্কৃত বিজ্ঞার পরিপোষণ ও বিংশযতঃ প্রচারণের জন্ত প্রবৃত্ত এই সমিতির প্রীতির পাত্র হইয়াছি বলিয়া আমি প্রগাঢ় আনন্দস্থানাগরে নিমগ্ন হইতেছি। জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর নামাঙ্কিত এই মহারাজের অভিভাবকতার এই সমিতি সংস্কৃত বিজ্ঞা প্রচার বিষয়ে সর্বপ্রধান হইয়া ইহার অপেক্ষাও অধিক খ্যাতিলাভ করিবে ইহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমাদের পুস্তকীয় পূর্ব পুরুষগণের নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত এই বিজ্ঞানিধি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে এবং দেশের উন্নতির জন্ত বহুল প্রচার করিতে আপনাদের এই সমিতি অত্যন্ত সহায় হইবে ইহা আমি মনে করি। আপনাদের পরম প্রেমাস্পদ এই মহারাজ আপনাদের কুশলের জন্ত প্রতিকল্প বর্ধমান উৎসাহের সহিত বিজ্ঞমান তাহা আমি জানি। বিশেষতঃ মহারাজের অনুজবর মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ যখন ইহার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন তখন এই সমিতি যে অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করিবে তাহা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

মঙ্গল হউক—শ্রীকৃষ্ণ।

মহীশূরাধিপতি সভার হিতার্থে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রদান করেন। কার্যানির্বাহক

সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাকে নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতা প্রশস্তি প্রদত্ত হয়।

বিদ্যাবিজ্ঞানবিশারদ শ্রীমন্ মহীশূর মহীপতেঃ কৃতজ্ঞতাপ্রশস্তিঃ

- ১। জয়তু জয়তু রাজন্ রাজ-রাজন্য বন্ধো
- নয়-বিনয়-চরিত্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-সিন্ধো।
- জনহিত-রত-চিন্ত-প্লাঘ্যশীলৈকনিষ্ঠ
- মুকুর-বিমল-বুদ্ধে দেশমাতুর্বরেণ্য ॥

- ২। প্রকৃতি-বিভব-পৃথ্বী রাজ্যভূতৈ চ সম্যক্  
পরিহৃতসুখভোগো রাজ-কার্যৈক-চিত্তঃ ।  
অগণিত-তমু-পাতং মন্তসিকৌ নিযুক্তঃ  
অগতি বিপুল-কৌত্তি-খ্যাতি-শাস্তী-লভস্ব ॥
- ৩। বিহারসাহিত্যসভাং নিরীক্ষ্য  
ত্য়্যাপিতা হৃদয়দা সহস্রম্ ।  
মুদ্রা বয়ম্ মুগ্ধ-হৃদঃ সদস্যঃ  
গৃহীমহে সোম্য ! সসাধুবাদম্ ॥
- ৪। পূতাক্ষা বিবুধাশ্রয়ো গুণবতাম্ শ্রেষ্ঠঃ শরণ্যঃসতাম্  
সংসঙ্গী শ্রুত-শৌচ-নির্ম্মলমনা বিজ্ঞান্দিপারং-গমঃ ।  
শাস্ত্রালাপসুখী কলাসু কুশলো বিদ্যার্থি-কল্পদ্রুমঃ  
সৎসাহ-বলোজ্জিতোবিজয়তাং শ্রীকৃষ্ণরাজোন্মুখঃ ॥
- ৫। দ্যুমণোকলসং প্রাপ্তে শনৌ নেত্রমিতে দিনে ।  
নভোযুগাছি-শুভ্রাংশুমিতে শাকে সমর্পিতা ॥

হে রাজ-রাজেশ্বর-মিত্র, হে বিনয়, চরিত্র, রাষ্ট্রনীতি, প্রজ্ঞা ও বিবেকের আধার, হে জন-কল্যাণ-নিদান, হে নিকলঙ্ক-কুলশীলসম্পন্ন, হে দর্পণ তুণ্য স্বচ্ছবুদ্ধি স্বদেশ-মাতৃকার বরণ্য সন্তান ! সর্বত্র আপনার জয়ধ্বনি বিঘোষিত হউক । ১।

আপনি অপ্রিত জনমণ্ডলীর বৈভব বুদ্ধিও রাজসমৃদ্ধির শ্রীবুদ্ধির জন্য ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া, ‘মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন’ মূলমন্ত্র করিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সতত অলক্ষ্য সাধনে ভাগরূক আছেন। বিধাতার করুণায় আপনি ধরাতলে অসীম যশ কীর্তি ও সুখশান্তি ভোগ করুন । ২।

আপনি অদ্য কোচবিহার সাহিত্য সভা ভবনে শুভাগমন করিয়া ইহার কার্য কলাপ দর্শনে প্রীত হইয়া সংকৃত সাহিত্য-চর্চায় উন্নতিকল্পে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আপনার এহাদৃশ অসম্ভাবিত বদান্যতা দর্শনে বৃদ্ধ হৃদয় সভার সদস্যগণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অজস্র ধন্য বাদের সহিত এইসাংখ্যিক দান গ্রহণ করিতেছেন । ৩।

হে ছাত্রসমাজকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণরাজ নৃপেন্দ্র ! আপনার মন অতি উদার ও অতি পবিত্র। আপনি বাগবজ্রের অমৃতাণের দ্বারা দেবতাদিগের ও শাস্ত্র-প্রসঙ্গ দ্বারা সুধীসমাজের আশ্রয়স্থল। গুণিগণগণনার অগ্রগণ্য, সদাশয়দিগের পালক, সংসঙ্গে নিরত, পবিত্রতা ও জ্ঞানায়িতে আপনার মনোমালিন্য নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনি অপার বিদ্যাপারাবারের অধিতীয় পারদর্শী। আপনি উদীপ্ত উৎসাহ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও মনোবিত্তা প্রভৃতিগুণ রাশিতে সতত দেদীপ্যমান । ৪।

দ্যুমণি ( সূর্য্য ) কুন্তরাশিস্থ হইলে ( ফাল্গুন মাসে ) শনিবারে ৩রা তারিখে ১৮৪০ শকাব্দে এই কৃতজ্ঞতা প্রদত্ত হইল । ৫।

সভার পক্ষ হইতে প্রদর্শিত নিম্ন লিখিত ঐতিহাসিক বস্তু মহীশূরাধিপতি সন্দর্শন করেন ;—

ভূতপূর্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহুহর বিরচিত কয়েক খণ্ড প্রাচীন পুথি, প্রাচীন পুথির চিত্রিত পাট, সাচীপাতে লিখিত প্রাচীন পুথি, কাপড়ে লিখিত ১৭শ শতাব্দীর মূল সনদ, আকবরসাহের নামাঙ্কিত তরবার, নৌযুদ্ধের পুরাতন কামান, নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা, মোগল ও পাঠান বাদসাহগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা গুপ্ত ও কুষাণরাজগণের স্বর্ণমুদ্রা ।

মহীশূরাধিপতি অনুগ্রহ পূর্বক সভায় এক সহস্রমুদ্রা সাহায্য প্রদান করিয়া সভার প্রতি আন্তরিক অমুরাগ, প্রকাশ করিয়াছেন ।

৫। আলোচ্যবর্ষে ঢাকা নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের\* একাদশ অধিবেশন হইয়াছিল । সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ত্রীমুখ নিত্যগোপাল বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন ।

৬। ভূতপূর্ব কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদিত ও বিরচিত যে ১২ খানা পুথি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্গীত ও ক্রিয়াযোগসার পুথি দীর্ঘকাল হইল সভা মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । নানা প্রতিবন্ধক হেতু তাহা এপর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই । আগামীবর্ষে উক্ত দুই খণ্ড পুথি সদস্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে, এরূপ আশা করা বাইতেছে । মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাভুরের বিরচিত সঙ্গীত পুথি ও তাঁহার সহধর্মিণী মহারানী বৃন্দেবরী আই দেবতী বিরচিত “বেহারোদত্ত” নামক পুস্তকের মুদ্রণকার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে ।

৭। ত্রীমুখমহারাজ ভূপ বাহাভুরের নিজের অধিকারে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা গুলির পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে । ইহা সম্পূর্ণ হইতে অনেক সময়ের আবশ্যক হইবে ।

৮। আলোচ্যবর্ষে সভা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ক্রম করিয়াছেন ;—

১। হিতোপদেশ	৩১। কাঞ্চন মালা	৬০। বর্তমান জগৎ ( ৩য় ভাগ )
২। পঞ্চতন্ত্র	৩২। দুর্দানল	৬১। পুরাতন প্রসঙ্গ
৩। প্রাচীন লেখমালা ( ১ম ভাগ )	৩৩। বড়বাড়ী	৬২। চ'রষে বিষাদ
৪। প্রাচীন লেখমালা ( ৩য় ভাগ )	৩৪। ময়ূখ	৬৩। গোড় লেখমালা
৫। কালীনাথ	৩৫। সত্য ও মিথ্যা	৬৪। দিনি
৬। বিরাজ বো	৩৬। সোণারপদ্ম	৬৫। ছোট ছোট গল্প
৭। শ্রীকান্ত	৩৭। লাইকা	৬৬। পালি প্রকাশ
৮। বিন্দুরছেলে	৩৮। আলেয়া	৬৭। রূপের বালাই
৯। মেতদিদি	৩৯। বেগমসমক	৬৮। পদ্মপুরাণম্, ( ব্রহ্ম খণ্ডম )
১০। পরিণীতা	৪০। বিদ্যবল	৬৯। পদ্মপুরাণম্, ( ভূমি খণ্ডম )
১১। বৈকুণ্ঠের উইল	৪১। হালদার বাড়ী	৭০। পদ্মপুরাণম্, ( পাতাল খণ্ডম )
১২। বড়দিদি	৪২। মধুপর্ক	৭১। পদ্মপুরাণম্, ( স্বর্গ খণ্ডম )
১৩। দেববাস	৪৩। লীলার স্বপ্ন	৭২। পদ্মপুরাণম্, ( উত্তর খণ্ডম )
১৪। পণ্ডিত মহাশয়	৪৪। সুখেরঘর	৭৩। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণম্, ( বঙ্গাব্দবাদ )
১৫। অরুণগীয়া	৪৫। মধুমল্লী	৭৪। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণম্ ( মূল )
১৬। পল্লীসমাজ	৪৬। রাসের ডায়ারী	৭৫। মৎস্য পুরাণম্
১৭। চরিত্রহীন	৪৭। ফুলেরতোড়া	৭৬। গরুড় পুরাণম্
১৮। নিকৃতি	৪৮। ফরাণী বিপ্লবের ইতিহাস	৭৭। লিঙ্গ পুরাণম্
১৯। চন্দ্রমাথ	৪৯। বাদ্যালার বেগম	৭৮। বিল হরিবংশ
২০। মহাভারত	৫০। পাগালা ঝোরা	৭৯। বিল হরিবংশ ( মহাভারতের পরিশিষ্ট )
২১। যমুনাগুলিনের ভিখা-	৫১। গোড় রাজমালা	৮০। বায়ুপুরাণম্
	৫২। প্রাচীন মুদ্রা	৮১। দিব্যপুরাণম্
	৫৩। বাদ্যালার ইতিহাস ( ১ম ভাগ )	৮২। কালিকা পুরাণম্
২২। মোতি কুমারি	৫৪। বাদ্যালার ইতিহাস ( ২য় ভাগ )	৮৩। রামায়ণম্
২৩। বাসিকুণ	৫৫। দ্বিতেন্দ্রলাল	
২৪। কর্মযোগের টীকা	৫৬। রবিরানা	
২৫। অন্নপূর্ণার মন্দির	৫৭। নেপালে বঙ্গনারী	
২৬। মহানিশা	৫৮। বর্তমান জগৎ ( ১ম ভাগ )	
২৭। বাগ্‌দস্তা	৫৯। বর্তমান জগৎ ( ২য় ভাগ )	
২৮। উকা		
২৯। অভাগী		
৩০। ধর্মপাল		

৮৪। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)	১০৯। স্বন্দপুরাণম্ (আবস্তা খণ্ডম্)	১৩৭। ৬দাশরথিরায়ের পাঁচালী
৮৫। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	১১০। স্বন্দপুরাণম্ (নাগর খণ্ডম্)	১৩৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
৮৬। অদ্ভুত রামায়ণম্	১১১। স্বন্দপুরাণম্ (প্রভাস খণ্ডম্)	১৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমত্রয়িনী
৮৭। অধ্যাত্ম রামায়ণম্	১১২। স্বন্দপুরাণম্ (কাশী খণ্ডম্)	১৪০। ব্রজস্বায়ের পাঁচালী
৮৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্	১১৩। Letters of Aurangzebe	১৪১। বাঙ্গালী চরিত
৮৯। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (বঙ্গানুবাদ)	১১৪। যৌতুক	১৪২। গোবিন্দমঙ্গল
৯০। দেবী ভাগবতম্ (মূল)	১১৫। অভিমানিনী	১৪৩। বঙ্গভাষার লেখক
৯১। দেবী ভাগবতম্ (বঙ্গানুবাদ)	১১৬। তিথিতত্ত্বম্	১৪৪। প্রবোধচঞ্জিকা
৯২। শ্রীমহাভাগবতম্	১১৭। মলমাসতত্ত্বম্	১৪৫। পুরুষ পরীক্ষা
৯৩। মহাভারতম্ ১ম ও ২য় খণ্ড	১১৮। শ্রাদ্ধতত্ত্বম্	১৪৬। শিবায়ণ
৯৪। বামন পুরাণম্	১১৯। উদ্ভাহতত্ত্বম্	১৪৭। কোতুক বিবাস
৯৫। অগ্নিপু্রাণম্	১২০। আকিক তত্ত্বম্	১৪৮। রাজাবলী
৯৬। বরাহ পুরাণম্	১২১। শুদ্ধিতত্ত্বম্	১৪৯। কলীন কলসর্বস্ব
৯৭। বিষ্ণুপুরাণম্	১২২। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্	১৫০। শ্রীভক্তমালগ্রন্থ
৯৮। কুর্মপুরাণম্	১২৩। মনুসংহিতা	১৫১। বৈষ্ণব পদলহরী
৯৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণম্	১২৪। উনবিংশতি সংহিতা	১৫২। শ্রীরাম রসায়ণ
১০০। কল্কি পুরাণম্	১২৫। কবিকঙ্কণচণ্ডী	১৫৩। বঙ্কিম ভীবনী
১০১। সৌরপুরাণম্	১২৬। জগৎমঙ্গল	১৫৪। ফেরদৌসীচরিত
১০২। দেবী পুরাণম্	১২৭। ৬ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী	১৫৫। মহর্ষি মনসুর
১০৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণম্	১২৮। শ্রীচমৎকারচঞ্জিকা	১৫৬। পাষণের কথা
১০৪। বৃহদ্রথ পুরাণম্	১২৯। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	১৫৭। শংকুনির্মাণ
১০৫। ব্রহ্মপুরাণম্	১৩০। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	১৫৮। আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষ
১০৬। স্বন্দপুরাণম্ (মাহেশ্বর খণ্ডম্)	১৩১। শ্রীশ্রীভক্তিরসাবলী	১৫৯। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থা- বলী ৬খণ্ড
১০৭। স্বন্দপুরাণম্ (বিষ্ণু খণ্ডম্)	১৩২। বৃহৎসংহিতা	১৬০। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত
১০৮। স্বন্দপুরাণম্ (ব্রহ্মখণ্ডম্)	১৩৩। মহানির্কাণ তত্ত্বম্	১৬১। পরগাহা
	১৩৪। শ্রীধর্মমঙ্গল	১৬২। উষসী
	১৩৫। মনসামঙ্গল	১৬৩। এক পেয়াল চা
	১৩৬। জগদ্বন্দ্বমঙ্গল	১৬৪। বৈজ্ঞানিকী
		১৬৫। সচিত্র কামাখ্যাত্তর
		১৬৬। বাসুদেব

১৬৭। স্রোতেরকূল	১৮০। দুইতার	১৯৩। চারিজন ধর্ম্মনেতা
১৬৮। পাঠান রাজবৃত্ত	১৮১। অমুপমা	১৯৪। এমাম হুস ও হোসয়ন
১৬৯। নববধের স্বপ্ন	১৮২। স্পর্শমণি	১৯৫। মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপরিবর্তিত ইসলামধর্ম্ম
১৭০। শ্রীকান্ত ( ২য় ভাগ )	১৮৩। তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত	১৯৬। তত্ত্ব সন্দর্ভালা
১৭১। বিদ্যাপতির পদাবলী	১৮৪। ঋগ্বেদ সংহিতা ( ১ম ও ২য় খণ্ড )	১৯৭। মান চেতন
১৭২। বজ্রমণি	১৮৫। ভামাকের চাষ	১৯৮। ময়নামতীর গান
১৭৩। বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য	১৮৬। গোড়ের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )	১৯৯। সত্য মোক্ষ
১৭৪। ভিক্ষুপতিমোক্ষ	১৮৭। অভিধানপ্লনীপিকা	২০০। মোক্ষ সভাতার ইতিহাস
১৭৫। স্বামী	১৮৮। কবীর ( ১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড )	২০১। নবীন সনের স্বাবলী
১৭৬। অশোক-মুশাসন	১৮৯। হাফেজ	২০২। দস্তা
১৭৭। চণ্ডীদেবী কীৰ্ত্তন	১৯০। মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবন চরিত	২০৩। প্রাণ ও চরণ
১৭৮। সরস্বতী শঙ্কা ( ১ম ও ২য় খণ্ড )	১৯১। হাদিস পূর্ব বিভাগ	২০৪। ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি
১৭৯। ভাষাতত্ত্ব ( ১ম ও ২য় খণ্ড )	১৯২। হাদিস উত্তর বিভাগ ৪খণ্ড	২০৫। ধর্ম্মপদ

৯। নিম্নলিখিত দাতৃগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বের লিখিত গ্রন্থ ও মুদ্রা উপহার প্রদান করার সভা তাহা ধন্যবাদের সতি গ্রহণ করিয়াছেন।

উপস্থিত বস্তু	পরিচয়	দাতারনাম
১। সরল বাঙ্গলা অভিধান	বাঙ্গলা, মুদ্রিত	শ্রীশ্রীমতী মাতামহারানী সুনীতি দেবী সি.আই.
২। The message of Universal Peace	ইংরেজী, মুদ্রিত	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক
৩। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	বাঙ্গলা, মুদ্রিত	
৪। সত্য অগমোহিনী দেবী	"	
৫। বিজয় বসন্ত	"	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৬। কৃষ্ণকালী লীলা	"	
৭। বাউল সঙ্গীত	"	
৮। দরদরাজ বংশাবলী	"	" হেমচন্দ্র গোস্বামী
৯। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১১শ (চাকা) অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ	"	" নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ
১০। এই এই অত্যাধুনিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	"	"

উপকৃত বস্তু	পরিচয়	দাতার নাম
১১। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ ১ম, ২য় পৃষ্ঠা	বাংলা, মুদ্রিত	শ্রীযুক্ত কুশলচন্দ্র অধিকারী
১২। শ্রীশ্রীরাসগীতা		"
১৩। অঙ্কুতাচার্যের রামায়ণ		"
১৪। লরা সখি	আসামী, মুদ্রিত	
১৫। নমাজ শিক্ষা	বাংলা, মুদ্রিত	
১৬। কালকাবিলাস পুঁথি	চন্দ্রলিখিত, বাংলা	
১৭। মুকল	বাংলা, মুদ্রিত	শ্রীযুক্ত জ্ঞানকৌবল্লভ বিশ্বাস
১৮। উচ্ছ্বাস		" এদংনাথ সিংহ
১৯। মনোবাগধক		" যোগেন্দ্রনাথ রায়
২০। রীমা		" কণ মহিমচন্দ্র ঠাকুর
২১। শাকগাথা		
২২। শ্রী		
২৩। কণিকা		
২৪। Jhon	ত	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ
২৫। An Address to my young Friends		
২৬। All India Theistic conference		
২৭। শুভ জন্মাংশ	বাংলা, মুদ্রিত	" অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ
২৮। Memoirs of Babar	হংকী, মুদ্রিত	" মহারাজকুমার ভিক্টর নিতোন্দ্র নারায়ণ
২৯। History of Nepal		"
৩০। বিদ্যাপতি	বাংলা, মুদ্রিত	" সতীশচন্দ্র দাস
৩১। ৩টা রোপ্য মুদ্রা	১। চতুর্কোণ, আকবর সাহের নামাঙ্কিত ২। গোলাকার, আমীর আবদর রহমানের নামাঙ্কিত ৩। অপরিত	
৩২। ২টা রোপ্য মুদ্রা	১। চতুর্কোণ, আকবর সাহের নামাঙ্কিত ২। গোলাকার, সাহজাদা বাদসাহের নামাঙ্কিত, করকাবাদ টাঁকশাল	প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৩। ১টা রোপ্য আধুলি	কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের নামাঙ্কিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব দেব রায়কত	

১০। আলোচ্যবর্ষে সভা ৬টা মুদ্রা ও ২৪৭ খানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগৃহীত গ্রন্থ মধ্যে সমস্তই মুদ্রিত ১ খানা হস্তলিখিত। পূর্ববৎসরে সভার গ্রন্থাগারে ২৪২ খানা গ্রন্থ ছিল। আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে সভার গ্রন্থসংখ্যা সর্বমুদ্র ৪৮৯ ও মুদ্রার সংখ্যা ৭৮১



নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি বাঁধাই হইয়া উপরোক্ত গ্রন্থসংখ্যা ভুক্ত হইয়াছে ;—

১। ভারতবর্ষ ২ খণ্ড ৫ম বর্ষ	৮। বামাবোধিনী ১১শ বর্ষ ২ ভাগ
২। মালঞ্চ ৪র্থ বর্ষ	৯। সাহিত্য ২৭শ বর্ষ
৩। সবুজপত্র ৪র্থ বর্ষ	১০। আলএসলাম ৩য় ভাগ
৪। ব্রহ্মবিজ্ঞা ৬ষ্ঠ বর্ষ	১১। প্রবাসী ২ খণ্ড ১৭শ ভাগ
৫। ভারতী ৪১শ বর্ষ	১২। প্রতিভা ৭ম বর্ষ
৬। কৃষিসম্পদ ৮ম বর্ষ	১৩। সৌরভ ৫ম বর্ষ
৭। নব্যভারত ৩৫শ খণ্ড	

১১। সভাপতি মহোদয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী নিরুপমা দেবী মহোদয়া অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহার সম্পাদিত “পরিচারিকা” পত্রিকার প্রকাশ ভার সভার প্রতি নাস্ত রাখায় সভা বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছেন। উক্ত পত্রিকা তাহার উচ্চ আদর্শের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সভার বার্ষিক কার্যাবিবরণী পরিশিষ্টস্বরূপ পরিচারিকায় মুদ্রিত হইয়া থাকে।

১২। সভার পাঠাগারের দ্বার পূর্কায় ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা ও অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্যন্ত সদস্যগণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখা হয়। আলোচ্যবর্ষে “সদস্যগণ ২৭ টাকা জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক গৃহে লইয়া যাইতে পারিবেন।” এইরূপ নিয়ম প্রণীত হওয়ায় ২৫ জন সদস্য ৫০ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ জন স্বীয় জমা টাকা তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরোক্ত নিয়মাবধানে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ৫০৯ খানা পুস্তক সদস্যগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্ষশেষে ৭ খানা পুস্তক প্রত্যর্পিত হয় নাই।

১। গল্প ও উপস্থাপন ৪০৬	৫। মাসিক পত্রিকা ৩৪
২। ধর্মপুস্তক ৬	৬। সাহিত্য ১২
৩। জীবন-চরিত ১৯	৭। ইতিহাস ২৬
৪। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ৪	৮। কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞান ২

১৩। আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সভা ক্রয় করিয়াছেন ;—

মাসিক

ভারতী, সবুজপত্র, সাহিত্য ও ভারতবর্ষ।

সাপ্তাহিক

হিতবাদী, সঙ্গীতবীণা, মোহানন্দী ও বসুমতী।

পরিচারিকা সম্পাদিকা মহোদয়া অনুগ্রহ পূর্বক নিজের সম্পাদিত “পরিচারিকা” ও নিম্ন লিখিত বিনিময় পত্রিকাগুলি সভার পাঠাগারে বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন, এজন্য সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

মাসিক

প্রবাসী, মানসী ও ধর্মবাণী, নব্যভারত, মালঞ্চ, সৌরভ, প্রবর্তক, আলএসলাম, বামাবোধিনী, নারায়ণ, আনুর্বেদ, সাহিত্য-সংবাদ, প্রতিভা, কৃষিসম্পদ, ঢাকারিভিউ, ব্রহ্ম ও বিজ্ঞা ও উদ্বোধন।

## ত্রৈমাসিক

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

সাপ্তাহিক

রঙ্গপুর সপ্তর্গ

১৪। সভার অভিভা ক মহামহিম শ্রীশ্রীঃ রাক ভূপ বাহাদুর অমৃত প্রসাদ সত্কার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আদেশ গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করা হইত। সম্প্রতি তিনি স্বদূর ইয়োরোপে বাস করিতেছেন। এজন্য তৃতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি সভার হিতার্থে আলোচ্যবর্ষে ৫০০ শত টাকা এককালীন দানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং মাসিক ২৫ টাকা হারে সাহায্যদান করিতেছেন। তাঁহার এতদূর অমুরাগ ও অমুহুরতা সভা ক্রমশঃ কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছেন।

১৫। আলোচ্য বর্ষের সমস্ত হইতে মাননীয় শ্রীশ্রীমতী মাতা মহাশয়ী স্বনামি দেবী সি. আউ মহোদয় কৃপাপরশ হইয়া সভার হিতার্থে মাসিক ১০০ টাকা হারে সাহায্য দান করিতেছেন এবং তিনি সভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনে সার্বভৌম উপদেশ দান করিয়া সদস্যগণকে উপকৃত করিয়াছেন।

১৬। সভার দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীমহা রাক ভূপ বাহাদুর সভার গৃহভাব মোচনে চেষ্টা করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৭। আলোচ্য বর্ষে ২০০ টাকা যেতেন একজন অসহায়ী বর্ষচরী সভার লেখক নিযুক্ত ছিলেন। ৮০ টাকা বেতনের একজন ভূগোল সভার অন্যান্য কর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে।

১৮। ১৩২৫ সনে সভার কার্যালয় হইতে তিন ভিন্ন স্থানে ৮১ খানা পত্র প্রেরিত ও ৯৮ খানা পত্র কার্যালয়ে আগত হইয়াছে। পূর্বে বৎসরে ১১০ খানা পত্র প্রেরিত ও ১১৯ খানা আগত হইয়াছিল।

১৯। আলোচ্য বর্ষের নিমিত্ত সভা সভাব্য অয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রস্তুত হইয়া পরে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বৎসরের সভাব্য অয়ব্যয়ের হিসাব সহ নিম্নে প্রস্তুত হইল;—

আয়—

প্রকার	১৩২৪	১৩২৫
১। পূর্বে বৎসরের আয় (যোগ্য বাকী) ...	২০০।০০	৫০.
২। সমস্ত পত্রের দৈর্ঘ্য ...	৫২৫.	৬৯১।০
৩। শ্রীশ্রীমহা রাক ভূপ বাহাদুরের সাহায্য ...	৩০০.	৩০০.
৪। পূর্বে বৎসরের তহবিল ...	১০০.০০	...
৫। ব্যাঙ্ক ও মা টাকার সুদ ...	...	৫৫.
৬। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ ...	...	১৮৭.
	১১২৮।৬	১২৬৩।০

ব্যয়—	১৩২৪	১৩২৫
১। বেতন ... ..	২০৬.	৩৪২।/২
২। বাজে খরচ ... ..	৫০.	৭০.
৩। আলো ... ..	২০.	২০.
৪। পত্রিকা ক্রয় ... ..	২০.	৪৪।০
৫। গ্রন্থ ও যন্ত্রা ক্রয় ... ..	১০০.	৩০০.
৬। পুস্তক বাধাই ... ..	৬০.	৩০.
৭। ফটোগ্রাফ ... ..	৩৬.	১৫.
৮। আলমারী ... ..	৩০.	৮১.
৯। গ্রন্থ প্রকাশ ... ..	৫০০.	৩৬০।০
১০। খাতা পত্র ... ..	৫.	...
১১। অনান্য ও অনপেক্ষিত ... ..	১০১।/৬	...
	<hr/> ১১২৮।/৬	<hr/> ১২৬৩।/২

২০। ১৩২৫ সনে সভার প্রকৃতপক্ষে যে ব্যয় ও বায় হইয়াছে তাহা ১৩২৪ সনের প্রকৃত আয়ব্যয় সঙ্কে  
নিম্নে লিখিত হইল ;—

আয়—

প্রকার	১৩২৪	১৩২৫
১। পূর্ববৎসরের তহবীল	১০৩।০৬	৫৫
২। সদস্য গণের নিকট প্রাপ্ত টান	৬৮।০/০	৩৬৮।০
৩। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বহাদুরের সাহায্য	১০০.	৩০০.
৪। শ্রীশ্রীমতী মাতা মহারাজী আই দেবতীর সাহায্য	...	৭০.
৫। গচ্ছিত	...	৪৬.
৬। ব্যাঙ্কে জমা টাকার সুদ	...	৩০০/৬
৭। ব্যাঙ্ক হইতে উদ্ধৃত	২৬/০	৪২৮/০
৮। অগ্রাণ	১/০	৩.
	<hr/> ১০৭১।/৬	<hr/> ১২৫১।/০

ব্যয়—	১৩২৪	১৩২৫
১। বেতন	২০৮১৮/০	৩২৮১/৯
	টিকিট ও পোষ্টকার্ড—২১১৩	
২। বাজেঞ্চরচ	৫২১/৩	৬৮১/৯
	কালী, কলম, পেন্সিল ও কাগজ—১৪১৮/৬	
	অন্যান্য— ২৪১৮/০	
৩। অ'লো	২২১/৩	২৩৮/৯
৪। পত্রিকাক্রয়	২৭৮/০	৩২৮/০
৫। গ্রন্থ ও মুদ্রাক্রয়	১১০৮/০	২৬০৮/০
৬। গ্রন্থ প্রকাশ	৩৪৫১৮/৩	২৪১/৯
৭। পুস্তক বাঁধাই	২৮১/০	২৮৮/০
৮। অন্যান্য-আলমারী	২৮/৯	৭০/৯
৯। মহীশূরবিধিতির সংস্করণ		১৭৮/০
১০। ফটোগ্রাফ	৩২/৯	৭০০০
১১। খাতাপত্র	১১/০	৭০০০
১২। শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা বাবদ হাওলাত—	২০৯৮/০	৭০০০
১৩। হস্ত মজুর	৮৮/৯	১১৮/৯
	১০৭১৮৮	১২৫১৮/০

এই হিসাব বিস্তৃত বিবরণী পরিদৃষ্ট হইল।

শ্রীমদনোরঞ্জন দে,

হিসাব পরীক্ষক।

তারিখ ২ই বৈশাখ, ১৩২৬ সন।

২১। ১৩২৪ সনের কার্যবিবরণীতে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভ্যর্থনার ব্যয় ২০৯৮/০ অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে হাওলাত লিখা হইয়াছিল। কার্য নিবাহক সমিতি উক্ত হাওলাত ২০৯৮/০ ব্যয়ের অঙ্ক ভুক্ত করা অব্যাহত করিয়াছেন।

২২। ১৩২৪ সনের কার্যবিবরণীতে বাকী চাঁদার পরিমাণ ১৩১৮/০ আনা। তন্মধ্যে ২২৮০ আনা আদায় হইয়াছে। ১৩২৫ সনে ২৫৮ জন সদস্যের নিকট প্রাপ্য চাঁদা ৫৮৫৮/০ আনা। পূর্ববৎসরের ১৩১৮/০ সহ মোট প্রাপ্য ৭১৭৬/০ আনা আলোচ্যবর্ষে চাঁদা আদায় ৩৬৯৬/০ আনা। বাকী ৩৪৮০ আনা। আদায়ী চাঁদা মধ্যে শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমারবর্মার প্রদত্ত ১৪০/০ টাকা। অন্যান্য সদস্যের দেয় ৪৭৭৬/০ মধ্যে ২২৯৬/০ আনা আদায় হইয়াছে।

২৩। সভার নিয়ন্ত্রণসারে চাঁদা আদায় হেতু ২৫ জন সদস্যের নাম সবস্য তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৩২৫ সনের শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের নিকট সভার প্রাপ্য ৯০৮/০ আনা, ইহা উপরোক্ত বাকী ৩৪৮০/০ মধ্যে বাদ দিয়া অবশিষ্ট ২৫৭/০ আগামা বৎসরে আদায়ের চেষ্টা করা হইবে।

২৪। আলোচ্যবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মাতা মহারাজীর স্বীকৃত ১১০/০ টাকা মধ্যে ৭০/০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

২৫। বর্ষণেবে কোচবিহার ব্যক্তি করপোয়েশনের চলতি কমার হিসাবে ১০৬৫৮৬ পাই ও ছয় মাস চুক্তির হিসাবে ৫০০/০ টাকা মোট ১০৬৫৮৬ পাই সভার তহবীল গচ্ছিত রাখিয়াছে।

শ্রীআমানতউল্লাহ আহমদ

সম্পাদক।

শ্রীভট্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ,

সভাপতি।



কাজিহাৰ ৰাজকীয় পুস্তক ৰৱ  
 ৰাজেন পাটাৰ এক পুস্তক

[illegible]

কাচিনিহার রাজকৈষ্য পুতুকগং রয় প্রাচীন "উড়কাত্ত  
 ধর কুয় পাটার এক পুত্

કચ્છ      નિઃક      સામુક પ્રાચીન      વળતિ )

ପ୍ରକାଶିତ ଶାଳି  
 “କିନ୍ତୁ ନା ତେ  
 ଜାଣିବ ହରି  
 ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର କହଣ  
 କାମେ ବନିବ  
 । ସେ ଆଜି



# পরিচাৱিকা

( নব পাৰ্শ্যায় )

“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে ব্ৰতাঃ ।”

৩য় বৰ্ষ ।

আষাঢ়, ১৩২৬ সাল ।

৮ম সংখ্যা ।

নূতন দেশের নবীন প্রভাত ।\*

( ক )

দৃষ্টিসীমার চতুর্দিকে রাত্রি শেষের ঘোর কুয়াসায়  
পথহারাণো পথিক একা দাঁড়িয়ে গেছি ধোয়ার তলে ;  
থম্কে আছে ভোরের আলো আকাশ-পারের কোন্ অসীমায়,  
বিশ্বভুবন গুটিয়ে যেন বিষু-নাভি-পদ্মদলে !

কোন্ কামনার কনক-আভা চম্কে গেল স্তম্ভি টুটে,  
উষার পুরী-প্রবেশ-ভেরী উঠলো বেজে কাকের ডাকে ;  
দীর্ঘ করি' ব্যোমকে যেন 'ব্রহ্মপুত্র' উঠলো ফুটে  
সকল-জোড়া বাপ্পরেণুর জমাট-বাঁধা ধূমের ফাঁকে ।



জনম লভি' জলের কোলে বাতাস অধীর ; আকাশ ফুঁড়ি'  
পরক্ষণেই দীপ্ত অনল পূরব কোণে কিরণ-মেঘে ;  
রশ্মিতে তার মিলিয়ে এল আবছা-ঘন জলের গুঁড়ি,  
অবাক-করা স্থিতি হঠাৎ আঁখির আগে উঠলো জেগে !

সত্য না এ স্বপনপুরী,—লভায় পাতার শিশির-করা  
'আইভি'-ঢাকা হাজার কাঁচে সোনার বলক উথলে পড়া !

( খ )

রূপায় মোড়া নদীর চড়ায়, বুনো ঝাড়ুয়ের ধূসর বেলায়,  
শিশু-গাছের কুচো পাতার আড়াল-জোড়া নীল-কুচিতে ;  
আলোক-ছায়ার উন্মি-খেলায়, দিবস-নিশার মিলন-মেলায়,  
এমন করে ছড়িয়ে কে গো গড়িয়ে এলে হৃদয়টাতে ?

বালির চরে চূর্ণ হীরক, উন্মিশিরে জ্বলছে মানিক,  
পথের বাঁকে শালের ফাঁকে এমন সাজে কে আজ এ'লে ?  
দাঁড়াও ওগো সকল ভুলে মউল-মূলে দাঁড়িয়ে খানিক  
চোখ বুলিয়ে মন ভরে নিই তুলির বালাই গুঁড়িয়ে ফেলে

কুণ্ডলিকার অণুর কণায় ছুলিয়ে দিলে এই যে পুরী  
কোন দিকে এর তাকাই বল, কোন সখাকে দেখাই ডাকি !  
সজ্জিত এই চিত্রশালার যে-পথ দিয়ে যতই ঘুরি,  
হতাশ হয়ে যাই যে ততই, কোন্টা রাখি, কোন্টা আঁকি !

নূতন দেশে, নবীন বেশে, দাঁড়িয়েছো আজ মধুর হেসে,  
! বভোর হয়ে দেখছি চেয়ে নিনিমেষে, নিনিমেষে !

( গ )

হেথা, বাংলা-সারির মুক্তামালা পল্লীপ্রিয়ার বন্ধদেশে  
 ছলিয়ে দিয়ে নগর-বঁধু উল্লাসে তার হাত ধরেছে ;  
 আধেক সোহাগ আধেক লাজে পল্লীরাণী মধুর হেসে  
 হাওয়ায় দোলা কানন-মালা হৃদয়-রাজের গলায় দেছে !

\* \* \* \*

হেথা, লক্ষ্যসবুজ 'আইল'-পেড়ে গাঢ়হলুদ বসন কাহার—  
 মুক্ত মাঠের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সর্ষে ফুলে ;  
 ক্রোটল-মূলে ঢেউ খেলানো বিচিত্র-রং গাদার বাহার,  
 মে'দির বেড়ায় বেলের কুঁড়ি মুছমুছ হাওয়ায় দোলে !

\* \* \* \*

ওগো, 'কৃষ্ণচূড়া' পরায় হেথায় নিম্বশাখায় মিলন-রাখি,  
 জল-পাহাড়ের পাষাণ-বুকে আছড়ে পড়ে স্রোতের ধারা ;  
 কানন-কোলে কুজন তোলে লক্ষ-তরুর কণ্ঠ-পাখী,  
 তাল-সুপারীর কুঞ্জছায়ে নিটোল-গঠন কলার চারা !

\* \* \* \*

হেথা, রৌদ্র-পারদ-লিপ্ত পথের মুকুর 'পরে গুবাক-ছায়া  
 আর, মধ্যে কবি জড়িয়ে ধরি' ছড়িয়ে-থাকা আপন মায়া !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

## অন্তরীক্ষে দেবাসুরে যুদ্ধ ।\*

ধাঁহারা 'অসুর' অর্থাৎ 'অহরো—মজদার' উপাসক, তাঁহাদিগের নাম 'অসুর' ।

অসুন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ

বিনি অসু অর্থাৎ প্রাণ দান করেন, তাঁহার নাম 'অসুর' । বেদে এই অর্থই অসুর শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।  
 যক্ষ, অগ্নি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি ষেবগণও অসুর বিশেষণে বিশেষিত হইতেন । পক্ষান্তরে বৃদ্ধ ও বলপ্রভৃতি দেবতা বা  
 আৰ্য্যগণও অসুর ছিলেন । কেন ?

\* এই প্রবন্ধের প্রমাণাদি সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহিত বক্তব্য থাকিলে, তাহা প্রসংগত ভাষায় প্রবন্ধাকারে প্রেরণ করিলে আমরা  
 আলোচনা হিমাণে সন্মানে প্রকাশ করিব ।

ভারতের একদল লোক মন্ত্রপান এবং দেবোপাসনা করিতেন, অত্র দল (যাঁহারা ভারতীয় দেবগণেরই স্বজাতি) মন্ত্রপানে বিরত ছিলেন এবং তাঁহারা জ্ঞাতি দেবতাদিগের উপাসনা “নরোপাসনা” বলিয়া উহা না করিয়া— অশুরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পান ভোজন এবং উপাসনা লইয়া ভারতে কলহ উপস্থিত হইলে, নরোপাসক মধ্যপার্বীরা অশুরোপাসকদিগকে ‘অশুর’ বলিয়া গালি দেন, উহার বিনিময়ে অশুরোপাসকগণ দেবোপাসক সুরাপার্বী গণকে ‘সুর’ অর্থাৎ মাতাল বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করেন। উক্তঞ্চ রামায়ণে—

সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিক্রতাঃ ।

অপিচ যখন নরোপাসক দেবগণ মৃতগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে বসিতেন, তখন অশুরেরা আসিয়া ঐ সকল পিণ্ড খাইয়া ফেলিতেন। ইহাতেই ভারতে দেবতা ও অশুরগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ক্রোধাক্ষ দেবগণ বলিতে লাগিলেন—

কুণোত ধূমং বৃষণং সখাঃ ।

অশ্বেধস্ত ইতন বজ মচ্ছ ।

অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুরাঃ ।

যেন দেবাসো অসহস্ত দহ্মান্ ॥ ৯২৯সূ।৩ম

হে বজ্রগণ, আর দেবতা আমরা এই দহ্মাদিগের অত্যাচার সহ করিতে পারি না, সকলে উঠ, প্রস্তুত হও, বর্ষণযোগ্য ধূম বা grass প্রস্তুত কর। প্রাণের ভয় পরিত্যাগ পূর্বক কেহ আমাদেরকে হিংসা করিতে পারিবে না, এই সাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এই মহাবীর অগ্নিদেব আমাদের সেনাপতি হইবেন।

এই প্রকারে দেবতা ও অশুর সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতীয় দেবগণের আহ্বানে ইন্দ্র ও বিষ্ণু পুনরায় ভারতে আগমন করিলেন। ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের সহিত ভারতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উক্তঞ্চ—

ন অশ্বে বিত্ত্বং ন তত্ত্বতুঃ সিবধে,

ন যাং মিহ মকিরং হ্রাহ্নিঞ্চ ।

ইন্দ্রশ্চ যৎ যযুধাতে অহিশ্চ

উতা পরীভ্যো মথবা বিজিগ্যে ॥ ১৩১৩২।১ম

মঘবান্ ইন্দ্র ও অহির ঞ্চায় ক্রুরচেতাঃ বৃত্রাসুর পরস্পর পরস্পরের প্রতি —

বিদ্যাদ্ঘটিত অস্ত্র, তত্ত্বতু, ( grass )

বরুণাস্ত্র ( জলবর্ষণ ) ও বজ্র ( কামান )

নিষ্কেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতে মঘবান্ ইন্দ্র বৃত্রকে পরাভূত করিলেন।

তৎপর কি হইয়াছিল ? তৎপরই বৃত্রাদি অশুরগণ ( পার্শ্বদিগের পূর্বপুরুষ ) ভারতবর্ষ হইতে অন্তরীক অর্থাৎ পারস্ত ও তুরুকে পলাইয়া যান। উক্তঞ্চ—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যা নিঃশশা অহিং । ১৪০।১ম

হে বজ্রধারী ইন্দ্র ! তুমি তোমার বাহুবলে সর্পের ঞ্চায় খল বৃত্রাসুরকে পৃথিবী অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে নিঃশারিত করিয়াছ। তথাহি—

অর্বাঞ্চঃ সূর্যদে বলং ৮।১৪।৮ম

ব্রতাসুরের ভ্রাতা বলকে ও ইন্দ্র ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তথাহি—

শূরো নিযুধা অধমং দম্বান্। ৮।৫৫।১০ন

ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দম্বা অর্থাৎ ব্রতাদি অসুরগণকে তাড়াইয়া দিলেন। কোণাশ ?

যৎ বি বৃত্তং পর্বশো কুজন্

অপঃ সমুদ্রং ঐরয়ং। ১৩।৬।৮ম

যেহেতু ইন্দ্র ব্রতাসুরকে পর্বে-পর্বে বেদনা প্রদান করিয়া জলপ্রধান সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষে প্রেরণ করিলেন।

মূলে ত 'অপঃ' ও 'সমুদ্র' পদ আছে? ইহার অর্থ জলপ্রধান অন্তরীক্ষ হইল কেন?

অপ্ শব্দ দ্বিতীয়ার বহুবচনে "অপঃ" হইয়াছে। নিবন্ধু অপ্ (আপঃ—প্রথমা বহু) ও সমুদ্র এই উভয় শব্দই অন্তরীক্ষ—পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (নিবন্ধু—১৯ পৃঃ) একারণ আমরা অপঃ সমুদ্রং পদদ্বয়ের অর্থ—জলময় অন্তরীক্ষ করিলাম।

কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষিগণ ত বলিয়া থাকেন যে আমরা পার্শী বা অসুরগণকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মিঃ ম্যাকডোলেন সাহেব ত তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে তারস্বরেই বলিতেছেন যে It is impossible to avoid the conclusion that the Indian branch must have separated from Iranian only a very short time before the beginning of Vedic-literature and can therefore have hardly entered the North West of India even as early as 1500 B.C. (P. 12.)

যেহেতু ভারতীয় আৰ্য্যগণ ইরাণীয়গণকে ইরাণে রাখিয়া তবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (উঃ পঃ প্রদেশে) সে আঙ্গ ৩৪০০ (১৫০০+১৯০০) বৎসরের কথা। আর্য্যোরা ভারতে প্রবেশ করিয়া তবে বেদ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সে বেদের বয়স পৃষ্টে পূর্ব ১৫০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

ইা ম্যাকমুলার ও ম্যাকডোলেন প্রভৃতি এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের যুবকবৃন্দও ইহা গলাধঃ-  
করণ করিয়া এম-এ, ঘি-এ, পি-আর-এস. পাস করিতেছেন। কিন্তু ইহার মূলে বা আশে পাশে কি কোনও সত্য  
বিনিহিত আছে? এতৎ সমুদয়ই সাহেবদিগের কল্পনা মহাসাগরের ফেন-বুদ্ধ। তাঁহারা কোন প্রমাণে বলিতেছেন  
যে খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ বৎসর হইল আমরা ও ইরাণীয়গণ পৃথক হইয়া বেদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম?  
আর আমরা যে ইরাণীয়গণকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম—এ কুঃস্বপ্নই বা সাহেবেরা কি  
প্রকারে দেখিলেন? ইহার প্রমাণ কোণাশ? কেবল I think so; He thought so; Perhaps it may be so  
আমি এরূপ মনে করি. তিনি এরূপ মনে করিয়াছেন, হয় ত ইহা এই রূপেই হইতে পারে, ইহা ভিন্ন সাহেবেরা  
এসকল বিষয়ে কি কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কি কেবল—  
assumed. supposed. ইহা ছাড়া তাঁহারা কি আর একটি প্রমাণও দিয়াছেন? হিন্দুরা সে মৈত্রেয়গণের  
নিকট হইতে অক্ষর ও লিখনপ্রণালী পাইরাছেন, ইহাও যেমন ষোলআনা মিথ্যা কথা, তদ্রূপ ভারতীয় আৰ্য্যগণ  
পার্সীদিগকে ইরাক্ষে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—ইহাও তদ্রূপ ষোলআনা মিথ্যা কথা।

হে ভারতীয় যুবকগণ! Paradise lost হইলে যখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ (আৰ্য্যগণ নহে, তখন আৰ্য্য নাম হয় নাই)  
ভারতে প্রবেশ করেন, তখন এ ভূমণ্ডলে—

ইরাণ, পারস্ত, তুর্কক, আরব ও আফ্রিকা

কোথায়? ইউরোপ (হরিয়ুপীয়া)ই বা তখন কোথায় ছিল? ফলতঃ তখন আফগানিস্থানের পূর্বপ্রান্তে কেবল একটা রেখার স্থায় পথ দেখা দিয়াছিল। তাই মহামাত্রা ঋগ্বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে -

মহী জ্বা বা পৃথিবী জ্যোষ্ঠে

বিস্তীর্ণ জ্বা বা মঙ্গলিয়া এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবী বা ভারতবর্ষই এই ভূমণ্ডলের মধ্যে ব্যোজ্যোষ্ঠ জনপদ।

এই জ্বা বা মঙ্গলিয়ারই নামান্তর স্বঃ এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষে নামান্তর ভূঃ। তখন জগতে ভূঃ ও স্বঃ ভিন্ন অত্র কোনও লোক বা জনপদ ছিলনা। ইহার পরই পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয়।

উক্তঃ—

ততঃ সমুদ্রঃ অর্ণবঃ। ১।১৯০।১০ম

তত্র সাগরভাষাম্.....ততঃ তস্মাদেব ঈশ্বরাং অর্ণবঃ অর্ণবা উদকেন যুক্তঃ সমুদ্রশ্চ অভ্যায়ত। সমুদ্র শব্দঃ—  
অন্তরীক্ষোদধোঃ সাধারণ হাত।

ঈশ্বরের সেই উৎকট তপস্তা হইতে ( অর্ণব অধি ) পশ্চিম সমুদ্রগর্ভে সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষের ( তুরুক, পারস্ত আফগানিস্থানের ) উৎপত্তি হইল।

এই অন্তরীক্ষেরই নামান্তর নভঃ বা ভুবলোক, তজ্জাত ইহার পরই লোক সংখ্যা তিনটি হয়। ভূঃ ভূবঃ—স্বঃ। এই ভূভূবঃ স্বঃই ত্রিভুবন বা ত্রৈলোক্য। যখন গায়ত্রী পঠিত হয়, তখনও এই ভূভূবঃ স্বঃ ভিন্ন অত্র কোনও লোক ( আফ্রিকা ও ইউরোপ প্রভৃতি ) ছিল না। তাই গায়ত্রী পাঠ কালে বলা হইয়া থাকে—

ও ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবশ্চ

ধীমাহি ধियोযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ১০।৬২।৩ম

যে সবিতা বা দিবাকর ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, এই তিন লোকের প্রসবকর্তা, যিনি আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার সেই বরণীয় ভর্গঃ বা ত্ত্বের ধ্যান করি।

ফলতঃ দেবতা বা ব্রাহ্মগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একবারেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরুক, পারস্ত ও আফগানিস্থান বা আফ্রিকা প্রভৃতি সাগরগর্ভে নিদ্রিত ছিল। তৎপর ব্রাহ্মণাখ্য দেবতার ভাৱে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর অন্তরীক্ষ বা তুরুক, পারস্তাদি স্থলে পরিণত হয়। স্থলে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ হইতে বরুণ, বায়ু ও ছাতান ( Teuton ) যাহা অন্তরীক্ষে উপনিবিষ্ট হইলেন। যথা—

ত্রিতো বিভক্তি বরুণং সমুদ্রে

ত্রিতো নামক দেবতা বরুণকে ( Uranas ) ভারত হইতে সমুদ্র অর্থাৎ অন্তরীক্ষে লইয়া যান। তথাহি—

অথ ছাতানঃ পিত্রোঃ সচাস

অমমুত গুহং চাক পুশ্নেঃ।

মাতুঃ পদে পরমে অন্তিমযৎ। ১০।৫।৪

অন্তরীক্ষ স্থলে পরিণত হইলে, ছাতান ( যিনি পিতা স্বর্গ হইতে আসিয়া মাতা ভারত ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন ) পুত্রি মাতা অন্তরীক্ষের ( পুত্রিঃ অন্তরীক্ষঃ সারণঃ—১। ৬৬ম। ৬ম ভাষ্য ) অন্তে পশ্চিম প্রান্তে একটা রমণীয় গুপ্ত স্থান পছন্দ করিলেন।

এই গুপ্ত স্থানই ব্যাবিলোনিয়া ও মেসপটেমিয়ার আধার তুরুক জনপদ এবং এই ছাতানই জর্জাণ ও ইংরাজ জাতির পূর্ব পিতামহ Teuton. অহো তথাপি অর্বাচীন বালকেরা সাহেবদিগের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে

বদ্ধপরিষ্কর ও বদ্ধকটি, যে জগতে ব্যাবিলোনিয়া মেসপটেমিয়া ও মিশর, আদি ও অকৃত্রিম সভ্যজগৎ এবং আমরা ঐদিকল স্থান হইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আফ্রিকার ইথিওপিয়ানগণ কৃতজ্ঞদ্বয়েই বলিয়া গিয়াছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race compelled to leave India, for the impurity contracted by slaying a certain monarch to whom they owed allegiance. ( P. 205 )

ফাইলোষ্ট্রাস একজন ব্রাহ্মণ আচার্যের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে ইথিওপিয়ানগণ মূলতঃ ভারতীয় আৰ্যাসন্তান। কিন্তু একজন রাজাকে সম্মানের পরিবর্তে ব্যাপাদিত করাতে তাঁহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin,

Indian in Greece ( P. 205 )

প্রত্যেক মিশরবাসী ইহা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বাপ দাদার কাছে ইহা শুনিয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষের লোক সকল সর্বাঙ্গপেক্ষা জ্ঞানী এবং ইথিওপিয়ানগণ ভারতবর্ষ হইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা এখনও সেই ভারতীয় জ্ঞান এবং আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।  
✓ পাঠক ইহা পোকক (Pocoak) নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিজোক্তি। ইনি সত্যবাদী ও ধর্ম ভীরু বলিয়া ইহাঁকেও ইউরোপে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

যাহা হউক আনার সনির্বন্ধ নিবেদন এই যে, হে ব্রাহ্মণ! বাঙালি সম্মান ও ভক্তি কর, তাঁহার আদেশ ন্যায় হউক, অন্যার হউক, অবনত মস্তকে মাথা পাতিয়া লও। কিন্তু রাজার দেশে পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়া এবং বলিয়া থাকেন, তাহা পড়িয়া মুগ্ধ করিয়া এম এ, বি এ, পি আর এস, পাশ কর পরন্তু তৎসমুদয় সত্য ভাবিখা গলাধঃকরণ করিও না। ফলতঃ বাঁহাদিগের দেশে বেদ নাই, যাঁহারা বেদ পড়িয়া বুঝেন নাই কিংবা বেদ গ্রাহ্য করে না, তাঁহাদিগের কথা—

সহসা বিদধীত নক্রিয়াং।

সহসা প্রাণে দিও না। বেদ পড়, উপনিষৎ পড়, শাস্ত্র পড়। দেখ উহাতে কি কি আছে। হে ব্রাহ্মণ রাজা থাকিতে কোতওয়ারের দোহাই কেন? বেদই জগতে এই সকল বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ।

যাহা হউক বৃত্ত ও বল প্রভৃতি অমুরগণ ত অস্তরীক্ষে পালাইয়া গেলেন তৎপর কি হইয়াছিল? ✓  
বেদ বলিতেছেন যে—

অমিত্রাসি বৃত্তহা বাস্তরিক মতঃ ও.মা। ৩।১৫৩।১০ম।

হে ইন্দ্র তুমি বৃত্তবধকারী, তুমিই বাহুবলে অস্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলে। (অস্তরীক্ষে বাতির—  
উত্তীর্ণবান্।) তথাহি—

সপ্তাপো দেবীঃ সুরগা অমুক্তাঃ,

যাতিঃ সিদ্ধ মতঃ ইন্দ্র পুণ্ডিতঃ।

নবতাং স্রোতাঃ নব চ অবন্তীঃ,

দেবেভ্যা গাতুং মনুষ্যে চ বিল্লঃ ॥ ৮।১০৪।১০ম।

হে শক্রপুংগবদেবী ইন্দ্র! তুমি সুরক্ষিতা বিপাশা ও শতদ্রুপ্রভৃতি সপ্ত নদী এবং পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া নবইটা স্রোতস্বতী নদী অতিক্রম করিয়াছিলে। দেবতা ও মনুষ্যাগণের গমনের জন্য তুমি পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে! তথাহি—

ভৌমো বিবেষ আয়ুর্থেতি রেয়াং

অপাংসি বিশ্বা ঋগ্যাদি বিধান্।

ইন্দ্রঃ পুরো ভরুধাণো বি দূধোং ;

বি বজ্রহস্তো মহিমা চ যান ॥ ৪।২১।৭ম

সেই ভৌমবিক্রম ইন্দ্র কিসে জনসাধারণের কল্যাণ হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি দেবগণের প্রভাবে বজ্র হস্তে অশুরদিগের অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিলেন (অপাংসি বিবেষ—স—লিপিকর প্রমাদ।) শক্রগণের বিনাশে হৃষ্টচিত্ত সেই ইন্দ্রের অন্তরীক্ষ প্রবেশে অশুরনগর সকল যেন কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দ্র নিজ বাজ্রবলে অশুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন।

সপ্ত বিপ্রা বিশ্বা মবিন্দন্ পথ্যাং। ৫।৩১।৩ম।

সপ্ত বিপ্র সমগ্র অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিলেন। সপ্ত বিপ্র কে কে? ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি ও ত্রিত প্রভৃতি সাতজন বীরপুরুষ যে তুরক পারস্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা অন্যান্য মন্ত্রেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাহা যেন হইল। কিন্তু মন্ত্রে ত অন্তরীক্ষে প্রবেশের কথা নাই? আছে—

পথ্যাং অবিন্দন্

এবং সাধারণ উক্ত পথ্যাং পদের অর্থ করিয়াছেন—

পথ্যাং যজ্ঞস্য মার্গে সাধুকৃত্যঃ।

কিন্তু এখানে যখন নিকটত্বে “অক্ষা” শব্দ অন্তরীক্ষ পর্যায়ে (১৯ পৃঃ) দেখিতে পাই, তখন এখানেও এই “পথ্যা” শব্দে অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় বুঝিয়া লইতে হইবে। যাক ও দেবরাজ যজ্ঞাও বলিতেছেন যে—

পথ্যা স্বস্তিঃ—পস্থা অন্তরীক্ষং তন্নবাসাং (পথ্যা)। ৩৪৬ পৃঃ। ঐ ২য় ভাগ।

পদাতে তং স্থানিভি রিতে পস্থা,

অন্তরীক্ষং তত্র ভবা পথ্যা। ৩৭৯ পৃঃ। ১ম ভাগ নিকট।

কিন্তু এখানে যদি স্বার্থে প্রত্যয় করা যায়, তাহা হইলে পথ্যা শব্দের অর্থও অন্তরীক্ষ হইতে পারে।

আচ্ছা স্বীকার করিয়া লইলাম যে—ইন্দ্র অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ত অপর বা পশ্চিম সমুদ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করিতেছিল। ইন্দ্র কি প্রকারে সমুদ্র পার হইয়া পারস্যাদিতে প্রবেশ করিলেন?

দেবতারা স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন কালে এই সমুদ্র পার হইয়াই ভারতে প্রবেশ করেন। এবারও সেই অর্ণবধান যোগে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। উক্তক—

যাস্তে পৃষন্ নাবো অন্তঃ সমুদ্র,

হিরণ্ময়ী রন্তরীক্ষে চরন্তি। ৩।৫৮।৬ম।

বস্ত্রানুবাদ.....হে পুষা! তোমার যে সমস্ত হিরণ্যমী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অস্তরীক্ষ মধ্যে সঞ্চরণ করে।

আমাদিগের মতে ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই যে 'হে পুষন্! সমুদ্রের মধ্যে তোমার যে সকল লৌহময় নৌকা ( অর্ণবধান ) অস্তরীক্ষে যাতায়াত করিয়া থাকে।'

ইক্ষের এক ভ্রাতার নাম পুষা তাঁহার কতকগুলি লৌহনির্মিত অর্ণবধান ভারতবর্ষ ও অস্তরীক্ষের মধ্যে ছিল। উহার ফেরী নৌকার কাজ করিত। ইন্দ্রাদিও উহাদিগের সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া অস্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন।

উত স্ম তে পরুক্ষ্যামূর্ণাঃ বসত শুদ্ধাবঃ।

উত পণ্যা রথানাং অত্রিং তিন্দন্তি ওজসা ॥ ৯।৫২।৫ম।

কেবল ইন্দ্র নহেন, তাঁহার সৈনিক ( তে ) মরুদগণ উক্ত অর্ণবধানসাহায্যে পরুক্ষী নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকট বাহিত বজ্র বা কামানদ্বারা অস্তরীক্ষস্থ নগর ও পর্বতাদি বলক্রমে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

বজ্রেন বজ্রী নিজধান শুষ্কং। ৯।৩২।৫ম।

বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্র প্রহারে শুষ্ক। সুরকে বধ করিলেন।

উর্দ্ধোহি অস্থ্যং অধি অস্তরিক্ষে,

অধা বৃত্রায় প্রবধং জভার।

জঘান আয়ন্ আপঃ। ৭।৩৩।৩য়।

বৃত্রাসুর অস্তরীক্ষের উর্দ্ধ অর্থাৎ উত্তরদিকে ( আর্ধ্যায়ণে ) ছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র সেই অস্তরীক্ষে বাইয়া ( আপঃ—আয়ন্ গচ্ছন্ সন্ ) বৃত্রকে বধ করিলেন।

ইন্দ্রো বৃত্রং হন্ বিকুনা সচাবনঃ। ২।২০।৩ম।

ইন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকুর সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রকে বধ করেন।

বি অস্তরিক্ষ মতিরং ইন্দ্রো

যং অভিনং বলং। ৭।১৪।৮ম।

ইন্দ্র অস্তরীক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে বাইয়া বৃত্রাহুজ বলকেও বধ করিলেন।

ইন্দ্রো অস্তরিক্ষং বিভেদ বলং।

ব্রুহুদে বিবাচঃ অভবৎ দমিতা

অভিক্রতুনাং। ১০.৩৪।৩ম

ইন্দ্র অস্তরীক্ষে বাইয়া বলকে নিহত করিলেন, অপভ্রষ্টভাবীদিগকে তাড়াইয়াদিলেন, এবং বজ্রবিরোধী অনুরাদিককে দমন করিলেন।

ইন্দ্রো বজ্রী ভিনং বলস্য পরিধীন

ইব ত্রিভিঃ। ৫।৫২।১ম

ইন্দ্র ত্রিভিঃ দেবের ন্যায় বলের রাজ্যের পরিধি ভেদ করিলেন।

ইন্দ্র যং বিপ্রোভিঃ বি পণীন্ অশায়ঃ। ২।৩৩।৩ম

পণিগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া অস্তরীক্ষে প্রবেশ করেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে নিহত করেন।



অনিজ্জা হতা অমিত্রাবৈল স্থান মশেরন্ । ১।১৩৩।১ম

এই প্রকারে ইন্দ্রবিরোধী অশুরগণ নিহত হইয়া শাসনে শয়ন করিল ।

ঘোষো দেবানাং জয়তাম্‌স্থান্‌ ৷ ৯।১০৩।১০ম

দেবগণের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল ।

হত্বা দেবা অশুরান্‌ যদায়ন্‌ দেবা

দেবত্বমভিরক্ষমাণা । ৪।৫৭।১০ম

দেবতার। অন্তরীক্ষে অশুরগণকে বধ করিয়া যখন ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের দেবত্ব রক্ষা পাইল ।

এখন পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, এই অন্তরীক্ষটা শূন্য গগন, না একটা মহাজনপদ ।

অন্তরীক্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্য সমুদ্রে লৌহময় অর্ণবধান থাকিত । উগাহারা পার হইয়া যাইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণ পারশ্বের উত্তরভাগে আৰ্য্যায়ণে স্থিত বৃত্তকে বধ করেন । আৰ্য্য বৃত্ত, ভারত হইতে যাইয়া পারশ্বের উক্ত আৰ্য্যায়ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহা “ইরাণ” নামের বিষয়ীভূত ।

তদীয় ভ্রাতা বলাসুর অন্তরীক্ষের একদেশে যে রাজ্য বিস্তার করেন, উহার নামই Asseria । ইন্দ্র তথায় যাইয়া বল ও তদনুচর পণি বা ফিনিসীয়ানগণকে নিহত করেন । বল্‌ যে এছিরিয়ার রাজা, তাহা Arian witness পাঠেও জানা যায় ।

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuni form inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rig Veda, was the Belus or Bel of the Inscription — that the lofty capital of Vala in the Rig Veda, was the lofty citadel of Bel, in the Inscriptions that the Asuras, Panis ( Sanskrit Panayas ) of the Veda were identical with the Phinides of classical history. P. 62.

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন কেন এসিরিয়ার বেল ও ফিনিসীয়ানদিগের সহিত ঋক বেদের বল ও পণিদিগের সমতা ঘটিতেছে ?

যেহেতু ইন্দ্র-বিতাড়িত বৃত্ত—পারশ্ব ও তদনুচর বল—দক্ষিণ তুরুঙ্গে এবং বলানুচর পণিরাও ভারত হইতে দক্ষিণতুরুঙ্গে প্রবেশ করেন । ইন্দ্র যাইয়া উহাদিগকে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ পারস্য ও তুরুঙ্গে নিহত করেন ।

সুতরাং তুরুঙ্গ, পারস্য ও আফগানিস্থান যে অন্তরীক্ষ, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে । আমরা আরও শত শত মন্তব্যেরা তুরুঙ্গ ও পারস্যাদির অন্তরীক্ষের সপ্রমাণ করিতে পারি—বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল ।

তবে ইন্দ্র যে অন্তরীক্ষে ভারতের ইন্দ্রাদি দেবোপাসনা ব্যাবিলোন ও মেসপটেমিয়াতে প্রবর্তিত করেন, তদ্বারাও তুরুঙ্গাদিই যে অন্তরীক্ষ, তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে । যথা—

ইন্দ্র প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানাং ।

অপি কৰ্ত্ত মবৰ্ত্তয়ো অযজ্যন্‌ ॥ ১৩।১২১।১ম

হে ইন্দ্র ! তুমি নববই নদীর পরপারে যজ্ঞহীনদিগের মধ্যে কৰ্ত্তব্যের অর্থ্যাৎ দেবোপাসনার প্রবর্তন করিয়াছ।

তাই মেঘপটেমিয়ার মিতানি জাতিদিগের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যের উপাসনা প্রচলিত হয়। জ্যেষ্ঠোবি সাহেব দগ্ধ ইষ্টকে লিখিত সন্ধিপত্রে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সন্ধি খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্বে সম্পন্ন হয়।

অতএব যে অন্তরীক্ষে তুরঙ্গ, পারস্য, আফগানিস্থান, ব্যাবিলোনিয়া ও মেঘপটেমিয়া প্রভৃতি বিদ্যমান, বাহাতে অর্ণবঘানে গমন করা যায়, যেখানে নব্বইবা নদী বর্তমান, উহা শূন্য গগন হইতে পারে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিহারত্ব।

## বাঁচা।

—ঃঃ—

বাঁচা শুধু বাঁচা নহে তন্দ্রাসম নিশ্বাসে প্রশ্বাসে  
অথবা বিহঙ্গসম উড্ডয়নে আকাশে বাতাসে  
বাঁচা শুধু বাঁচা নহে পশুসম আহারে বিহারে  
অথবা উদ্ভিদসম বৃদ্ধি লাভি আকারে প্রকারে।  
বাঁচা নহে অন্ধকূপে যে জীবন যাপিছে পের্চায়  
বাঁচা নহে শুক যথা বেঁচে থাকে খাঁচায় খাঁচায়  
ব্যর্থ বাঁচা ভোগীদের ভোগপক্ষে লালসা-বিলাসে  
ব্যর্থ বাঁচা জড়তায় মূঢ়তায় অলস-উল্লাসে।  
ধর্ম্যে বাঁচা কর্ম্মে বাঁচা মর্মে-মর্মে দেশের জীবনে  
জ্ঞানে বাঁচা ধ্যানে বাঁচা বেঁচে থাকা দেহে-প্রাণে-মনে  
সকলের মধ্যে বাঁচা সকলকে বাঁচাইয়া বাঁচা  
অপুষ্করে পুষ্ট করি ডাঁটো করি যত কচি কাঁচা  
তাহাই প্রকৃত বাঁচা—হৃৎস্পন্দনে জঠর জ্বালায়  
বাঁচিয়া রহিলে শুধু বেঁচে থাকা নাহি কহি তায়।  
বাঁচা চাই হস্তে পদে বাঁচা চাই আকাঙ্ক্ষা আশায়  
শ্রবণে নয়নে মনে বাঁচা চাই কঠোর ভাষায়  
মহামানবের মাঝে বাঁচা চাই আপনা বিস্তারি  
মরণান্তে বাঁচা চাই দেশ দেশ চিন্তা অধিকারি'।

শ্রীকালিদাস রায়

## বিবাহ ।

—:~:—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ত্রিযুক্ত তপনমোহন চক্রবর্তী আমহার্ট'ষ্ট্রীটে একখানি বিতল বাড়ীর একতলার একটি কক্ষে তাঁকরা মাথায় দিয়া বিছানার উপর শয়ন করিয়াছিলেন। বেলা তখন তিনটা। তাঁহার পাশে দুই তিনখানা বই ও একখানা খবরের কাগজ পড়িয়াছিল। একটা 'হাওয়ার্ড' সিগারেট ধরাইয়া টান দিতে দিতে ধূমপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধূমরশ্মির মতই ভটিল চিন্তা সকল তাঁহার মনের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল।

তপনমোহন বি-এ পাশ করিয়াছেন। সংসারে আর কেহই নাই। দেশ বলিয়া এককালে একটা বোধ হয় কিছু ছিল, কারণ মধ্যে মধ্যে তাঁকের সময় 'আমাদের দেশে এই রকম ঘটে' বলিয়া তপনমোহন নজীর দেখাইতেন। কিন্তু সে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আর নাই। সেখানকার জমীদারী বা বাড়ী হস্তান্তরিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কলিকাতার একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতেই ইনি উপস্থিত বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শোনা যাইত তাঁহার গৈরীক কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজও নাকি আছে। তবে তাহার পরিমাণ কত সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ ছিল। ঘটকের মুখে তাহা ত্রিশ, চল্লিশ হাজার বলিয়া বিবোধিত হইত।

তপনমোহনের এ যাবৎ বিবাহ হয় নাই। কথাটা বিস্ময়ই অদ্ভুত শুনাইতেছে। বি-এ পাশ করা ছেলে, কলিকাতার বাড়ী, নগদ টাকাও আছে। খাটিয়া খাইতে হয় না। এ হেন অষ্ট বজ্র মিলনেও যে তপনমোহনের ভাবী বধূরূপিনী উর্ধ্বলী এ যাবৎ উদ্ধার হন নাই, ইহা বিশ্বাসের কথা সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা যে বৎসর খানেক হইতে বহুবিধ ঘটক ঘটকী আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তপনমোহনও নভেল পাঠের পর অবসর পাইলে চক্ষু বুজিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে এই সকল কন্যার রূপগুণচিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকেন।

সেদিনও তাঁহার মনে ঐ চিন্তাই উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন "তাইত, এ মাসে আবার ত বিয়ে হবার ঘো' নেই। এ আবার কি বিধান বাপু? বছরের মধ্যে আবার কয়েকটা মাসের সঙ্গে বিবাহের এমন অহিনকুল বিরোধের কারণ কি তা' ত বুঝতে পারা যায় না। এ সব ভট্টাচার্য্যদের বুজুক কি আর কি? তাই বা বলি কি করে? এ'তে ত তাদেরই লোকসান। সম্বৎসর ধরে বিবাহ চালালে ত তাদেরই সুবিধা। এক এক মাসে আফিসের মেলডের মত খাটুনি খাটতে হয় না। হয় ত এত বেণী জায়গার ডাক পড়ে যে দু চারটে হাঙ ছাড়াও হয়ে যায়। এই বন্ধ মাসগুলো পুরুতদের Vacation ছিল হয় ত। এখন এ ভেকেসানের ঠেলার পড়ে যে আমায় মহা মুখিল তার উপায় কি? আজ ত ঘটকী আসবার কথা আছে। ক'নে দেপাতে নিয়ে যাবে। কাপড় চোপড় গুলো ঠিক আছে কি না কে জানে? ওরে বিত্ত—"

"আজ্ঞে" বলিয়া বিশ্বনাথ ওরফে বিত্ত আসিয়া হাজির হইল। রন্ধন ভিন্ন তপনমোহনের সর্ববিধ কার্যের তারই বিত্তর উপর। গৃহিনী, চাকর, ঝি, বাজার সরকার সবই এই বিত্ত। বিত্ত ও জনক নামধারী এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, তপনমোহনের সংসারতরঙ্গীর মাঝি ও ঝি।

বিশু আসিলে তপনমোহন বলিলেন “জরিপাড় কাপড়খানা কুঁচিয়ে রেখিছিস্ ত ?”

বি। আজ্ঞে হাঁ।

ত। জুতোটায় বুরুস করেছিস্ ?

বি। আজ্ঞে, সব ঠিক আছে।

ত। ঠিক না তোর মাথা আছে। পুরোণো কালীটা দিয়ে বুরুস করেছিস্ বুঝি ?

বি। আজ্ঞে না, নতুন এক কোটো কালী কিনে এনেছি।

ত। এই দোকানটা থেকে বুঝি ?

বি। আজ্ঞে না। আপনি যে বলে দিয়েছিলেন সেই বড় রাস্তার চৌমাথার দোকান থেকে। ছ’ আনা দাম নিয়েছে।

ত। এই ব্যাটাকে ঠাকিয়েছে। ছ’ আনা কি রে ? চার আনা করে কোটো। দেখি কি এনেছিস্ ?

বিশু কোটা আনিতে গেল। অনতিবিলম্বে এক কোটা লইয়া আসিল। তপনমোহন দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন “এই যা বলেছি তাই। ব্যাটা এতদিন বাজার করছে, একদিনও যদি একটা জিনিস ঠিকমত আনতে পারে। যা ফিরিয়ে দিয়ে আয় গিয়ে। বল্গে যা, এর চার আনা দাম।”

বি। আজ্ঞে এর খানিকটা খরচ করে ফেলেছি যে, জুতোয় মাখিয়েছি—

ত। কে তোকে মাথাতে বল্লে ? আগে আমায় দেখাতে পার্‌লি নি ? না হয়, আজ পুরোণো কালীটাই লাগতিস্। ব্যাটা খালি লোকসান করাচ্ছে আমার—

এই সময় “বাবু আছেন নাকি গো।” বলিয়া থান কাপড় পরিধানে কাঁধে একখানি গামছা বামী ঘটকী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তপনমোহন বিশুকে বলিলেন “যা ব্যাটা, কোটোটা নিয়ে যা।” বিশু সরিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য কান্ধীর ছই আনা পরসে সে নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছিল, কারণ সে আনিত যে ধরা পড়িলেও তপনমোহন খানিক গর্জন ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না।

বিশু চলিয়া গেলে তপনমোহন একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন “কে ঘটক-ঠাকরুণ ? এদিকে এস।”

বামী ঘটকী দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল “চলুন তবে।”

ত। শ্যামবাজারে ?

বা। না, সেখানে আজ যাওয়া হবে না। মেয়েটির অসুখ। আজ আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।

ত। আবার কোথায় ?

বা। বেশী দূর নয়। এই দর্জিপাড়ায়।

ত। এ আবার নতুন কথা এসে পড়ল যে। আগে কথাটাই শুনি। মেয়ের বাপ কি করেন ?

বা। মেয়ের বাপ নেই। এক মামা আছেন। তিনি সবজ্ঞ। তাঁর ছেলেপুলে নেই। তিনিই মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছেন।

ত। দেবে খোবে কি রকম শুনি ?

বা। তা চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করবে।

ত। মোটে চা-র-পাঁ-চ হা-জা-র। এই না বল্ছ সব্‌ জ্ঞ। ও সব তা’ হলে বাজে কথা। কোথা বিদেশে চাকরী বাকরী করে বোধ হয়। বলে দিয়েছে সব্‌ জ্ঞ।

বা। ওগো না গো বাবু তা নয়। তাঁর মুখের দাপোটি কি ? বাড়ী কাঁপতে থাকে। চাকরদের অমন গলাই হয় না। আমরা কত দেখে বেড়াছি। আমাদের ভুল হ'তে পারে না।

ত। (স্বগতঃ) বুড়ো বাটা খুব রূপণ ত ? নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই শুন্দি—ভাগ্নীর বে' দেবে তাতে মোটে চার পাঁচ ছাঙ্কার টাকা খরচ করবে ? বাটা যকের ধন রেখে যাবে নাকি ? তা যা হোক আর একটা সুবিধা হতে পারে বোধ হয়। যদি চেষ্টা করে ডেপুটি টেপুটি একটা করে দেয়। যাওয়াই যাক না একবার। (প্রকাশ্যে) তা হ্যাঁ--মেয়েটি কি রকম ?

বা। খাসা মেয়ে। অমন মেয়ে কিন্তু মেলা ভার এ আমি বড় গলা করে বলে যাচ্ছি। গেলেই দেখতে পাবেন।

ত। তা আতকে হঠাৎ এরকম বলা কওয়া নেই--গিয়ে পড়ব।

বা। বলা আছে বৈকি ? আমি বলে এসেছি। মেয়ের মামা আবার একধরনের মানুষ। তিনি বলেন, সাক্ষ্য গোজাব আবার কি ? যখন পুণী দেখিয়ে নিয়ে যেও। জ্ঞান এখন ছুটি নিয়ে ভাগ্নীর বিয়ে দিতে এসেছেন কি না ? মাঘ মাসের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে।

তপনমোহন খানিকটা ভাবতে লাগলেন :—“সব্জজ লোকটা। একেবারে গিয়ে পড়ব। কথা ছিল শামবাজারে হরিশবাবুর মেয়ে দেখতে যাবার--তা হরিশবাবু আপীসে চাকরী করেন তাঁর বাড়ী যেমন তেমন পোষাক পরে গেলেই চলত। এ একেবারে সব্জজ। আর ডেপুটি টেপুটি হ'তে গেলে প্রথম থেকেই একটা ভাল খারণা জন্মে দেওয়া চাই।”

প্রকাশ্যে বলিল “সব্জজ বাবুর বয়স কত ?”

বা। বয়স অনেক হবে। চুল পেকে গেছে। ত ব বেশ জোয়ান শরীর, অপর্যবসিত হয়ে পড়েন নি। পশ্চিমে থাকেন কি না।

ত। (স্বগতঃ) বাঙ্গলা বেহার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বোধ হয় বেহারে গিয়ে পড়েছে। বুড়ো যদি হয় তা হ'লে নেহাৎ ফচকে ছোঁড়ার মত যাওয়াটা ঠিক নয়। একটু গম্ভীর ভাবে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) তা দেখ, আর একদিন না হয় যাওয়া যাবে। এ-ই, আসছে রবিবারে--কি বল ?

বা। কেন, আজই চলুন না। ও আর দেরী করে লাভ কি ?

ত। আজ কি জ্ঞান ? শরীরটা তত ভাল নেই--আর হঠাৎ কথাটা হ'ল--দেপি একটু ভেবে।

বা। ভেবে আর কি দেখবেন ? আগে দেখেই আসবেন চলুন। আজ ত এক জায়গায় যাবার কথাই ছিল।

ত। (স্বগতঃ) আজ আর যাওয়াটা হয় না। পাঞ্জাবীর হাত ছুটো গিলে করে রাখতে বসেছিলুম--তা এ নীতকালে ওরকম পাঞ্জাবী দেখলে বুড়ো নিশ্চয়ই চটে যাবে। একটা কোট টোট্ পরে শাল গায়ে দিয়ে গম্ভীর চালে যেতে হবে। কাশ্মীরী কোটটা কোথা আছে কে জানে ? খুঁজে দেখতে হবে। আর ও ষ্ট্রাইপ্ দেওয়া সিকের মোজাও মানাবে না। পাঞ্জাবীর সঙ্গে না হয় চলত। এক জোড়া কালো উলের মোজা আনাতে হবে। আর জরিপাড় কাপড়খানাও সুবিধে হবে না। এক খানা কালাপেড়ে পরে গেলেই হবে। (প্রকাশ্যে) নাঃ আজ আর যাওয়া হয় না। বুঝলে ?

এই বলিয়া তপনমোহন শয্যায় শুইয়া পড়িয়া একমনে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

ঘটকী মনে মনে যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাহার অগ্রসর মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল। আর তাহারই বা দোষ কি? আজ তিনমাস ধরিয়া হাঁটাইটি করিতেছে, কত মেয়েই দেখাইয়াছে, কিন্তু কোথাও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ\*ঃ—

যখন তপনমোহন ঘটকীর সঙ্গে পূর্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন তখন বিস্তৃত সদয় দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তার দিকে চাহিতে হঠাৎ সে একজনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল “কি গো দাদাবাবু, ভাল ত? এতদিন ছিলেন কোথা?”

আগন্তুক সেই বাড়ীর দিকেই আসিতেছিল। দাঁড়াইয়া বলিল “কে? বিস্তৃত? বাবু কোথা?”

বিস্তৃত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল “বৈঠকস্থান আর আছেন।”

আগন্তুক ‘তপন, তপন,’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

তপনমোহন তাহার ডাক শুনিয়া বলিল “কে ললিত নাকি?”

আগন্তুক বলিল “হাঁ—ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন—ইনি কে?” বলিয়াই ধপ্ করিয়া বিজ্ঞানায় বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল।

আগন্তুকের আবির্ভাবে তপনমোহনের হৃদয়বিবাদ উপস্থিত হইল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া হর্ষ ও বিবাহের কথা শুনিবে বিদ্রোহের আশঙ্কা এই উভয় প্রকার ভাব হইতেই এই প্রকার অবস্থার উদয়। ললিত বিবাহের ধার ধারে না। এম্-এ, বি-এল, পাশ করিয়া নুঙ্গেরে ওকালতী করিতেছে। তপনমোহনের সহিত ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়াছিল। কিন্তু তপন বারকতক আই-এ, ও বি-এ, ফেল হওয়াতে ললিত তাহাকে আগাইয়া গিয়াছিল।

তপনমোহনের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল “ঘটক ঠাকুরণ।”

ল। এঁয়—বিবাহের সঙ্গ হইছে নাকি? বাঃ—বাঃ—

“ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাঙ্গা বিকারি চ ঘোবনম্”

ললিত সংস্কৃত আওড়াইতে বড় ভালবাসিত। এজ্ঞা বহু যুগসই বলি সে মুখস্থ করিয়াছিল।

ঘটকঠাকুরণের দিকে ফিরিয়া ললিত বলিল “কোথা সঙ্গ হইছে ঘটকঠাকুরণ? আমি ঘরেরই লোক, যে-সে লোক নই, স্বয়ং বরকস্তা। তপনের ত আর কেউ নেই। কি বল হে? তারপর কাব্যটাব্য লেখা চলছে কি রকম? বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, প্রতিভা কোরকাবস্থা থেকে প্রস্তুতি হ’ল কি না তাও জানতে পারি নি। বিশেষ তুমিত আর মাসিকে কবিতা পাঠাও না, পুস্তকাকারেও ছাপ না। Economically খুব ভাল বলতে হবে। যশ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই! যাক্ বিয়ের কথাটাই আগে শুনি। একটু গম্ভীর হ’তে হবে—ব্যাপারটা ত

সোজা নয়। ( কৃত্রিম গাভীরোর সহিত ) তা' ঘটকঠাকুরগণ, গৃহস্থঘরের মেয়ে ত আর আলমারীতে সাজিয়ে রাখা না। যেমন-তেমন হলেই হবে। কিন্তু এদিকে বুঝেছ ত—দেনা-পাওনার দিকটা বেশ ভারী হওয়া দরকার। ( তপনের দিকে চাহিয়া ) কেমন, ঠিক বলি নি ?

তপন, ললিতের গা টিপিয়া বলিল “যাঃ—কি ছেবলামি আরম্ভ করলি ? সকলের সঙ্গেই তোঁর সমান—”

ল। কেন কি মন্দটা বলেছি। তুমি ত এই কথাটাই আমার—

“কর্ণে লোলঃ কথয়িতুম্”

ঘটকী একটু মুছ হাসিয়া বলিল “মেয়ে খুব সুন্দরী গো বাবু। আশ্র দেবেও পাঁচ ছয় হাজার।”

ল। বটে, এ একেবারে ‘স্বর্ণসুযোগ’। এক দিকে “তদ্বী শ্রাশা শিখরিদশনা পকবিষাধরৌজী” অন্য দিকে “অক্ষযাস্তর্ভবননিধয়ঃ”। তবে আর দেবী কিসের ? পাত্রী দেখা হচ্ছে ?

ঘ। না। আজ বাবুকে দেখাতে নিয়ে যাব বলে এসেছি।

ল। তবে ত ঠিক সময়ে এসে পড়েছি—“বিধি পরিতুষ্টে ন ভবন্তি কিংবা ?” কপালের জোর আছে বলতে হবে। তা নাও,—উঠে পড়।

ঘ। বাবু আজ যেতে চাচ্ছেন না।

ল। কেন ? বাবুর আবার হ'ল কি ? এও কি একটা কথা ? এতক্ষণ জল খাবার সাজান হচ্ছে বোধ হয়। নিশ্চয়ই খেজুরে গুড়ের অথবা কমলালেবুর সন্দেশ এসেছে, কপি কড়াইওঁটি দিয়ে গল্দাচিংড়ি ত আছেই—সুতরাং এহেন বিষয়ে আপত্তি কি ?

ত। থাম, থাম, পেটুক কোথাকার। খাওয়াটাই বৃষ্টি আসল ?

ল। তা' আমার পক্ষে তাই বৈ কি ? তুমি না হয় “ত্রিভুবনমপি তন্নয়ম্” ভেবেই শ্রিয়্যার অধর-পেরালায় চা ও গঙ-গেলাসে সরবৎ পান ক'র। আমরা সাধারণ লোক “মোদক-খণ্ডিকটয়ৈ স্নগ্ধীতো জনঃ।”

ঘটকী দেখিল, বেলা যায়। বলিল “তা হ'লে চলুন আপনারা—বেলা যে গেল।”

ল। ওঠ হে—

ত। না হে আজ আর থাক্—

ল। তুমি বড় জালালে দেখছি। নেহাৎ ব্রাহ্মণকে আজ বঞ্চিত করবে ? এমন সুখের যাত্রার আপত্তি কি ? অথবা—

“অজমপি শিরস্ত্রকঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোতাহি-শঙ্করা।”

তব্ব নাই ওঠ। হরখ্যান ভক্তের আয়োজনে আমাদের মতন মদনেরই তব্ব হওয়ার সম্ভব। তোমার বিপদ ত কিছু দেখি নি।

এই বলিয়া ললিত ঠেলিয়া তপনমোহনকে তুলিয়া দিল। তপন অগত্যা চটি জোড়াটা পারে দিয়া বিতলে চলিয়া গেল।

ললিত ঘটকীকে বলিল “তুমি দাঁড়াও। আমি আসছি।” বলিয়া সেও উপরে উঠিয়া গেল।

তপন উপরের ঘরে গিয়া ললিতকে বলিল “তোমার কি বুদ্ধিভক্তি লোপ পেয়েছে ? তামাসার একটা সময় এসবই নেই।”

ল। তাও ত বটে! বিয়ের সময় তামাসা কি অন্যায়! তা' নাও একটু চটু-পটু করে সাজ-গোজ করে।

ত। আজ কি করে যাওয়া হয় বল দেখি—এই শীত কাল—

ল। তাতে কবিশ্বের বাঘাতটা কি? 'চোখের বাগী'তে মোতালার বারান্দায় মিষ্টান্ন ভক্ষণ সহ পাত্রীদর্শনেও 'রোমান্স' নষ্ট হয় নি, আজও নষ্ট হবে না।

ত। দেখ্ দেখি এখন কাপড়-চোপড় ঠিক নেই।

ল। নে না বাপু একখানা ফর্সা কাপড় পরে, একটা জামা গায়ে দিয়ে। মিছে ভোগাস্ কেন? না হয় তোকে বয়ের পিস্তৃত ভাইয়ের শালা বলে পরিচয় দেব এখন! "লজ্জা গুণী—পরবশো আত্ম।"

তপনমোহন অগত্যা সাজ-গোজ আরম্ভ করিল। ট্রান্স খুলিয়া কাপড়, জামা, কলার, কোট, শাল চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। এটা পছন্দ হয় ত ওটা হয় না, কলারটা ভাল ইস্ত্রী নাট, ডবল-ব্রেস্টের বুকের কাছটার একটু কুঁচকিয়া গিয়াছে, মাফ্লার না হ'লে বুকখোলা কোট পরি কি করে প্রভৃতি বহুতর সমস্তার মীমাংসা করিয়া ললিত, তপনমোহনকে হইয়া নৌচে নামিয়া আসিল। বিগু বলিল "একখানা গাড়ী ডেকে দেব কি?"

তপনমোহন বলিলেন "যাক। হেঁটেই যাব এখন।"

ললিত বলিল "হাঁ—ক্ষমাবোধ কর চাই।"

যখন ঘটকঠাকুরগ, ললিত ও তপনমোহন বাহির হইয়া পড়িল তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ললিত "ধেনুবৎস-প্রবৃত্তিঃ বৃষগজতুরগান" ইত্যাদি আওড়াইতে আরম্ভ করিতেই তপন বলিল "ও রকম কর ত যাবই না বলছি।"

ল। না না।—চল, চুপি চুপিই যাচ্ছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্জিপাড়ার পরলোকগত রায় ধুর্জটিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত সখল লইয়াই ঘটকঠাকুরগ তপনমোহনের বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া ধুর্জটিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরঞ্জনর অনেক স্ত্রীদ্ব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নিরঞ্জন পূর্বে ইহাদের চক্ষেও দেখে নাই। বাড়ীর কাহারও কাছে ইহাদের নামও শুনে নাই। এখন ইহারা পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেহ নিরঞ্জনর বাপের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িয়াছিলেন, কেহ তাঁহার রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, কেহ সম্ভ্রায় বহুমুদা জমী ও বাড়ী কিনাইয়া দিয়াছিলেন, কেহ বা বৈষয়িক পরামর্শ দিয়া পরলোকগত রায় বাহাদুরকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িত। বয়স তাহার উনিশ বৎসর। ঠাণ্ডা এতগুলি নিঃস্বার্থ বন্ধুর অযাচিত উপদেশ লাভে সে যে নিজেই খুব সহায় সম্পদশীল বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। তবে এই সকল বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া তাহাদের সহিত নিরঞ্জনর সেরূপ মিল হইল না। বন্ধুর দল তাহাতে যে একটু ক্ষুণ্ণ হইল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। কারণ রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহার। যে রকম ইয়ারকি দিয়া আসিয়াছিলেন নিরঞ্জনর সহিতও সেইরূপ ইয়ারকি দিতে তাঁহাদের বিন্দু মাং দ্বিধা ছিল না। বয়স তাঁহার। স্পষ্টই বলিলেন "আমরা মনখোলা লোক। অত ঘোর প্যাচ বুঝি না।" কিন্তু নিরঞ্জন কিছুতেই নিজেকে তাঁহাদের ইয়াররূপে কল্পনা করিতে পারিল না, কাজেই ব্যবধান একটু কেন, অনেকটাই রহিয়া গেল।



কিন্তু তা থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে সে এই বন্ধুদের উপদেশ না শুনিয়াই পারিল না। মহেন্দ্রবাবু বুঝাইলেন, তাকিয়া, ফরাস, গালিচা, ঝাড়লঠন, দেওয়ালগিরি এ সব আসবাব সেকলে হঠয়া গিয়াছে। আজিকার দিনে এ সব দেখিলে লোক উপহাস করে। মহেন্দ্রবাবুর সন্ধানে খুব সস্তায় আধুনিক কতকগুলি আসবাব বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এ একজন বড়দের সাহেবের ছিল। কিনিসগুলি আনকোরা নূতন, অথচ সাঠেব বিলাস্ত যাইতেছে বলিয়া এগুলি অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হঠয়া যাইতেছে। এ সুযোগ ছাড়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। আর রায় বাহাদুরের পুরাতন আসবাবগুলি কিনিবার একজন খরিদদারও মহেন্দ্রবাবু ঠিক করিয়াছেন। তাহাতে কিছু টাকাও পাওয়া যাইবে। এমন যুক্তির সহিত মহেন্দ্রবাবু এ কথা পাড়িলেন, যে খরচের পরিমাণটা শুনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিলেও নিরঞ্জন আর 'না' বলিতে পারিল না।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নিরঞ্জনের বৈঠকখানার চেহারা ফিরিয়া গেল। কার্পেট, চেয়ার, মার্বেলের টেবিল, কোচ, কাচের ফুলদানি, ফটো ফ্রেম, জানালায় দরজায় পরদা, আর কত কি আসিল। বিহারীবাবু একদিন মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন “ওহে আমার ছুটো দেওয়ালগিরি দিলে না?” মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন “যেয়ো একদিন আমার বাড়ী। পছন্দ করে এনো।”

রজনীবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন “সব ত হইল। কিন্তু এ আসবাবের সঙ্গে টানাপাখা আর কেরোসিনের আলো মোটেই খাপ খায় না।” হরেন্দ্রবাবু অমনি বলিলেন “যা বলেছেন। ইলেকট্রিক্ ফিট না করলেই নয়। আর এতে খরচই বা কি? আজকাল ত মুদীর দোকানে পর্যাস্ত ইলেকট্রিকের আলো। যদি বলেন ত আমার ডাইপো শৈলেনকে বলে দিই। সে বেশ ইলেকট্রিকের কাজ শিখেছে। খানকতক পাখা ও গোটাকতক আলো লাগিয়ে দিয়ে যাক্।”

রজনীবাবু বলিলেন “হাঁ। এতই যখন হ'ল তখন ও সামান্য খুঁতটুকুই বা আর থাকে কেন?”

অগত্যা নিরঞ্জন ত্রুটি সংশোধনে মন দিল। মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ীর ঘরে ঘরে বৈজ্ঞানিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা হইয়া গেল।

শ্যামবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন “ওহে, বড় সস্তায় একখানা মোটরকার বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। হাজার আষ্টেক টাকা হ'লেই হয়। এ রকম মেসিন্ বাজারে দেখতেই পাওয়া যায় না।”

রজনীবাবু বলিলেন “কিনে ফেলগে হয় না? ও পুরোণো জুড়ীতে আর আজকাল মান থাকে না। কলিকাতার মত সহরে বড়লোকদের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া একরকম উঠেই গেছে।”

শ্যামবাবু বলিলেন “কি বল নিরঞ্জন, দেখে না কি?”

নিরঞ্জন একবার বলিল “অত টাকা?”

শ্যামবাবু বলিলেন “একবার দেখেই আসবে চল না। না হয় কিছু কমান্বার চেষ্টা করা যাবে।”

নিরঞ্জন গেল, কিন্তু সাহেব দোকানদারের মহা খাতিরের পাল্লার পড়িখা সে দাম কনাইবার কথা শু মুখেই আনিতে পারিল না, অধিকন্তু প্রায় অতিরিক্ত হাজার টাকার সাজ সবজাম ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়া আসিল।

রায় বাহাদুরের বন্ধুগণ এইরূপে নিরঞ্জনের স্ত্রীবাণী ও মঙ্গলাকাজ্যের অতোরহ ঘরিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাজারে, দোকানে, নীলামে কোন্ ভাল জিনিষটি বিক্রয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিবার জন্য তাহার আহার

নিজা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতেন “আগা নিরঞ্জন—ছেলেমানুষ। ওকে দেখে না? ওর বাপ যে আমাদের কত ভালবাসত। আমরা থাকত ওকে ঠিকিরে নেবে?”

পিতা বর্তমান থাকিতেই নিরঞ্জনের বিবাহ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর একবৎসর পরে তাহার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। মেয়েটি অতুলনীয় সুন্দরী। নাম রাখা হইল—রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর জন্মাংসবে বাড়ীতে কত উৎসব হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। নহবৎ বসিল। যাত্রা, থিয়েটারের অভিনয় হইল। খ্রীতিভোজ, গার্ডেন পার্টি আদি কত কি? নিরঞ্জনের বন্ধুর দল এক একজনে এক এক কাজের ভার লইলেন। কি চমৎকার যশোবশ! কি সজ্জা! সহরের লোকেরা অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু উৎসবান্তে খরচের টাকার হিসাব লইয়া যখন বাড়ীর বুড়া সরকার নীলকমল নিরঞ্জনের কাছে উপস্থিত হইল তখন নিরঞ্জনের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এত খরচ কিসে হইল? একবার মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল “অপন র ভাত দিয়ে যে খরচটা হল তার একটা ফর্দ দেবেন কি?”

মহেন্দ্রবাবু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। পরে নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন “সে কি কথা? দেব বই কি। পাবের টাকা খরচ করেছি, পাট পয়সাটি পরীক্ষা মিলিয়ে দেব।”

কণাগুলি এমন সুরে বলা হইল, যেন নিরঞ্জন মহেন্দ্রবাবুকে সন্দেহ কবিরূপে বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। নিরঞ্জন অতিশয় লজ্জিত হইল। মহেন্দ্রবাবু হিসাব দিলেন না। নিরঞ্জনও চক্ষুলাভার পাতিরে আর সে কথা পুনরাবৃত্তি করিতে পারিল না। বুড়া সরকার নীলকমল একবার বলিল “বাবু হিসাবটা চেয়েছিলেন কি?” নিরঞ্জন জরাজীর্ণ করিয়া বলিল “যাও। ও মোট খরচ লিখে রাখ গে।”

এইরূপে দশবৎসর কাটিয়া গেল। রাখবাছাড়ের বন্ধুবর্গ এমন উৎসবের পর উৎসবে নিরঞ্জনকে মাতাইয়া রাখিলেন যে এই দীর্ঘদিন যেন আমোদময় স্বপ্নের ভ্রাম্য কাটিয়া গেল। ষ্টামার পাট, বাচখেলা, ঘোড়দৌড়, সে কত কি ব্যাপার? দশ বৎসর পরে নিরঞ্জনের চমক ভাঙ্গিল।

একদিন প্রায় রাত্রি বারটার সময় নিরঞ্জনের মনিকতলার বাগানে নাচগান চলিতেছিল। এমন সময় সরকার নীলকমল সেখানে উপস্থিত হইল। বাহির মহেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন।

ভিতরে তখন মজলিস জমিয়া গিয়াছে। নীলকমলকে দেখিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন “কিহে, এত রাত্তিরে এখানে কেন?”

নীলকমল কাঁদ-কাঁদ শব্দে বলিল “আজ্ঞে বাবুকে নিতে এসেছি। বো ঠাকুরপুত্রের কলেরা হয়েছে।”

নীলকমল বহুদিনের লোক। নিরঞ্জনের স্বাক্ষকে নোঠাকুরপুত্র বনিয়াই সে সম্বোধন করিত।

মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন ও নিরঞ্জনের কানে-কানে এই সংবাদ দিলেন। নিরঞ্জনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল “গাড়ী এনেছ?”

নীলকমল বলিল “আজ্ঞে হাঁ।”

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে চড়িল। নীলকমলও উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে নিরঞ্জন কোন কথা বলিল না। তাহার মনে তখন অনন্ত চিন্তার উদয় হইতেছিল। তাহার পত্নী সাংখ্যাতক রোগাক্রান্ত। না জানি কি হইবে? নেশা অনেকক্ষণ ছুটিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া নিরঞ্জন দেখিল, রোগিণীর গৃহের বাহিরে একজন ডাক্তার বসিয়া আছেন। দাসদাসীরাও সহজে কেহ ভিতরে ঘাইতে চাহিতেছে না। নিরঞ্জনের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা রাজলক্ষ্মীই ডাক্তারের নির্দেশ মত ঔষধ খাওয়াইতেছে। একজন মাত্র দাসী ভিতরে রহিয়াছে।

নিরঞ্জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল “কি রকম দেখছেন?”

ডা। তত সুবিধা নয়। ভয়ের আশঙ্কা আছে।

নি। আর কোনও ডাক্তার ডাকাব কি?

ডা। আমি দরকার মনে করি না। তবে সে আপনার হজ্ঞা—

নীলকমল এই সময় ডাক্তারবাবুকে রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্নগুলি শুনিয়াই ডাক্তার বাবু বলিলেন যে নীলকমল এই রোগের লক্ষণ ও ধারাবাহিক গতি বেশ বোঝে। তিনি উত্তর দিতেই নীলকমল বলিল “হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটা একবার করালে এ-অবস্থায় বোধ হয় উপকার পাওয়া যেতে পারে। যদি বলেন ত শশাঙ্ক ডাক্তারকে ডাকি।”

শশাঙ্ক সে পাড়ার একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নিরঞ্জন বলিল “ডাকি।”

নীলকমল ছুটিয়া গেল। নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজলক্ষ্মীর মাতা তখন শয্যার উপর পড়িয়াছিলেন। ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন “এসেছ? আমার ক’টা কথা বলবার ছিল। আমি বড় সুখেই যাচ্ছি। আর কিছুদিন থাকলে তোমার কষ্ট দেখতে হত। ভগবান্ আমায় তা হ’তে রক্ষা করেছেন। তুমি আমার একটা কথা রেখ—মেয়েটার মুখের দিকে চেও। ওর আর কেউ রইল না। সরকার মশায়ের কাছি শুনোঁছ বিষয় সম্পত্তি নাকি সবই গেছে। তুমি জাননা, তোমায় বলি নাই—বখনই তোমার টাকার দরকার হয়েছে তখনই আমি আমার এক একখানা গয়না বেচে টাকা দিয়েছি। সরকার মশায় সবই জানেন। তোমার মেয়ের জন্য আর কিছুই নাই। যা আছে তা জানতেই পারবে। আর যা কর, মেয়েটার ভাল জারগায় বিয়ে দিও। ও যেন সুখী হয়।”

কথা শেষ হইল না। নীলকমল ডাক্তার লইয়া আসিয়া পড়িল। নিরঞ্জন বাহিরে ঘাইবার উদ্যোগ করিল।

নিরঞ্জনের পত্নী বলিলেন “একটু পারের ধুলো দাও। বল আমার কথাটা রাখবে?”

নিরঞ্জনের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। বলিল “এতদিন এ কথা আমার বল নি কেন? তোমার গয়না ছুঁনি কেন দিতে গেলে? আমি ত চাই নি।”

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর হইল “তোমার দরকার—এর উপর আর কথা কি আছে? সে জন্য আমার কিছু হুঃখ নাই। কেবল অমুরোধ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে।”

নীলকমল বাহির হইতে ডাকিল “বাবু! ডাক্তার বাবু এসেছেন।”

নিরঞ্জন বাহিরে গেল। ডাক্তার রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন “আপনার মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যান। রোগটা ভাল নয়।”

রাজলক্ষ্মী বাইতে চায় না। নিরঞ্জন তাহাকে লইয়া বাহিরের ঘরে গেল। নীলকমল রোগিণীর গৃহমধ্যে বসিয়া জল গরম করিতে লাগিল, ঔষধ ঢালিতে লাগিল। সেই দাসীও সেই ঘরে রহিল। সে রাজলক্ষ্মীর বাপের বাড়ীর ঝি।

নিরঞ্জন বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শৈশবেই সে মাতাকে হারাইয়াছিল। যতদিন না তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত প্রচুর অর্থব্যয় সত্ত্বেও সংসারে কি বিশৃঙ্খলাই না ছিল! ঠাকুর, চাকর, ঝি যে যেদিকে পাইত চুরি করিত। বিশ্বাসী সরকার নীলকমলের সতর্ক দৃষ্টিও সব সময় তাহা রোধ করিতে পারিত না। কিন্তু নিরঞ্জনের বিবাহের পর হইতেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। এই মুহূর্ত্তাধিনী চৌদ্দবছরের বধূটির যে এতাদৃশ শাসন ক্ষমতা ছিল তাহা আগে কে জানিত? ধীরে ধীরে সংসারে সকল বিষয়েই যে এই বালিকাটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল বিশৃঙ্খলতা সংশোধনে সর্বদাই সজাগ ছিল তাহা অল্পদিনের মধ্যেই দাসদাসীরা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধ রায়বাহাদুর তাই আদর করিয়া বলিতেন “এতদিন লক্ষ্মীছাড়া হয়েছিলুম। মা লক্ষ্মীর আগমনে আজ সংসার উথলে উঠেছে।”

সেই বালিকা কালচক্রের আবর্তনে যখন গৃহিনী ও জননী হইয়া উঠিল, তখনও তাহার বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। এতটা মৌনতা, এতটা সঙ্কোচের মধ্যে যে এতটা তেজ ও এতটা শক্তি থাকিতে পারে তাহা কাহারও কল্পনাতেই ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এত অপব্যয় সত্ত্বেও যে নিরঞ্জনের সংসার এতদিন চলিতেছিল, ভিতরের নিদারুণ অভাব যে বাস্তবিক কোনও নিদর্শনে প্রকাশ পায় নাই তাহার মূলে এই রমণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নীলকমলের অসাধারণ কাৰ্য্যপটুতা গুপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই জায়গা ভরমী বন্ধক পড়িলেও, অলঙ্কার বিক্রীত হইলেও নিরঞ্জন যেরূপ প্রতাহ বহু সুভোজ্যে অভ্যস্ত ছিল তাহার একটিরও অভাব এ যাবৎ অনুভব করিতে পারে নাই। আমোদ প্রমোদের জন্য টাকা চাহিয়া কখনও বিফলমনোরণ্যও হয় নাই।

নীলকমল যদি কখনও বলিত “বো ঠাকুর! এ রকম করে আপনি কতদিন যোগাবেন? বাবুকে বুঝিয়ে চাক্ষা বলুন না কেন?” তখন রাজলক্ষ্মীর মাথা উত্তর করিতেন “আমার বলবার দরকার কি? যাঁর বিষয় তিনি যদি না দেখেন ত আমি কথা ক’বার কে?” নীলকমল বুঝিত না এই কথাগুলির মধ্যে কতখানি অভিমান, কতখানি খেদ লুক্কায়িত ছিল। তাহার স্বামী সে অনায়াস করিতেছেন, রাজলক্ষ্মীর মাতার কথাবার্ত্তার হাবভাবে তাহার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও কখনও ফুটিয়া উঠিত না। নীলকমল ছুই একবার খরচের বাহুলা প্রভৃতির কথা নিরঞ্জনের সম্মুখে বলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু নিরঞ্জন তাহাতে বড় একটা কান দিত না। অধঃপতন যখন হয় তখন এই রকমেই হইয়া থাকে।

এত কথা নিরঞ্জন জানিত না। সে মুহূর্ত্তাধিনী সংসারানভিজ্ঞা ধীরস্বভাবা রমণীরূপেই পত্নীকে চিনিয়াছিল। যেন সংসারের কাজ ও মেয়েকে আদর করা ছাড়া রাজলক্ষ্মীর মাতার আর কোনও কর্তব্যই ছিল না। নীলকমলই কেবল এই নারীর চরিত্রের অপর দিকটি জানিত। আজ তাই মৃত্যুশয্যা শয়ানা পত্নীর বাক্যাগুলি যেন সহসা যবনিকার একপ্রান্ত তুলিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত দৃশ্য তাহার নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিল।

রাজলক্ষ্মী ছটফট করিতেছিল। কেবল বলিতেছিল “লাবা! মার কাছে যাব।” নিরঞ্জন বহুক্লেশে তাহাকে ভূশাইয়া রাখিতেছিল।

রাত্রি যখন তিনটা তখন অন্তঃপুরে যোদন ধ্বনি উঠিল। ডাক্তার বিষম্মুখে বাহির হইয়া গেলেন। নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে নিরঞ্জনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজলক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল। নিরঞ্জন তাহার দিকে খুঁকিয়া পড়িয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। আমোদ প্রমোদ থামিয়া গেল—কারণ হাতে আর টাকা নাই। হিতৈষিগণ এই সময় জমীদারী ও বাড়ী বন্ধক দেওয়াইবার জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়াছিলেন কিন্তু শুনিলেন যে তাহা বহু পূর্বেই বন্ধক পড়িয়াছে। তখন শোনা গেল মহেন্দ্রবাবু কাশী গিয়াছেন। রজনীবাবুর ভ্রাতৃক অসুখ—বাঁচেন কি না সন্দেহ। বিহারীবাবুর দেনার সর্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শ্যামবাবুর দেশের সম্পত্তি লইয়া কি মামলা বাধিয়াছে তাই তিনি দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

## বিরহী ।

—:~:—

আমার লাগিয়া একেলা কে জাগে রাতে ?

জল ছল ছল দুখানি আঁখির পাতে !

অমন জোছনা তাইতে হয়েছে স্নান,

নয়ন আসারে যেন সে করেছে স্নান,

ভিজ্জে শাড়ীখানি তনুয়া জড়ায়ে ধরে'।

বরণের আভা দিয়েছে মলিন করে'।

কেবলি অচল আকুল চাহিয়া আছে,

নিরালা আমার রুদ্ধ জানালা কাছে !

নয়ত উদাস, বাতাস পাগল পারা,

জানালা ধরিয়া কেবলি দিতেছে নাড়া,

খুলে দিতে দেবী সহেনা সহেনা আর,

ভেঙে আসে বুঝি, এমনি আকার তার !

ওঠে পড়ে বুক, তবুও সাহস মানি

খুলিতে পারিনা অদূর জানালাখানি,

সজল নয়নে জোছনা তেমনি রয়

পাগল বাতাস তেমনি সজোরে বয় !

ঐপ্রিয়ম্বদা দেবী।

## সত্যনিষ্ঠা ।\*

—\*—

সত্যনিষ্ঠা শাস্তির প্রিয়সহচরী। যথায় পবিত্র সত্যনিষ্ঠা, তথায় আনন্দময়ী শান্তিদেবীর শুভ অধিষ্ঠান। সংসারের দুঃখ-কোলাহল, পুঙ্খলত্নাদির জালাময়ী বিরহবেদনা, ব্যাধিদারিদ্র্যের ভীষণ নিষ্পেষণ হইতে দূরে আত্মরক্ষা করিয়া শাস্তির শিশির-শীতল ক্রোড়ে সুখসুপ্তিভোগের বাসনা থাকিলে সত্তার অর্জন করিতে হইবে। সৌরভহীন কুসুম, বোধহীন বিদ্যা, অপ্রাণ দেহ, অফল বৃক্ষ, অধাঙ্গিক মানবের ন্যায় অসত্যনিষ্ঠ জীবন একান্ত জঘন্য ও অকর্ম্মণ্য। সত্তোর উজ্জ্বল কিরণে হৃদয়-সরসী সমাগোপিত না হইলে মনুষ্যত্বকমলকোরক সুবিকশিত হয় না। উদার হইতে চাও, সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মহানু হইতে চাও, সত্য সত্তোর আজ্ঞাপালন করিবে। অসত্যপ্রিয় মানব কপটাচার হয়। কপটতা ধর্ম্মভাবের চিরশত্রু। অধর্ম্মাচার দুঃখদৈন্যের ও অধঃপতনের মূল প্রস্রবণ। কি পারিবারিক ব্যবহারে, কি সামাজিক আচারে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানক্ষেত্রে সফলতা ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে সত্যনিষ্ঠ আশ্রয় ও যত্ন সহকারে সত্যনিষ্ঠার অভ্যাস করিতে হইবে। অসত্যসেবী গৃহী স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট সত্য অবিখ্যাসী ও সন্দেহভাজন হন। সত্যব্রষ্ট মানব সত্যসমাজে ছেয় ও নিন্দনীয়। ব্যবসায়ী ও বণিক্ তিলমাত্র সত্যচ্যুত হইলে তাহার উন্নতির আশা ছরাসায় পরিণত হয়। মলিন দর্পণের ন্যায় অসত্য কল্প হৃদয় কখনও ধর্ম্মের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। ঘনাক্ষরে বিজলী-বিকাশ, মরুদেশে স্রোতস্বতীর স্বচ্ছ প্রবাহ, নিদাঘতাপিত ভূখণ্ডে সুর্য্যসম্পাত ও সাধুভক্তের হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয়ের ন্যায় দুঃখদগ্ধ ধরাধামে অকপট সত্যনিষ্ঠা মানববৃন্দের প্রাণে নববলের সঞ্চার ও সজীব উৎসাহের অল্পর উৎপাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্যতা লাভ সুবিকশিত করে। সত্যনিষ্ঠা স্বর্গীয় সামগ্রী। ইহা লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিক সাধনার আবশ্যক। পাক্কন স্কন্ধতির বলে বাঁহারা ইহার একনিষ্ঠ সেবক কেবল তাঁহারাই ইহার বিমল প্রসাদ লাভ করিয়া ইহজগতে পুঙ্খ ও মহীয়ানু এবং পরজগতে অক্ষয় সুখসম্পদ লাভের অধিকারী হন। জনৈক পাশ্চাত্য মনোবী ঘোষণা করিয়াছেন ;—“Truthfulness, a deep, great, Genuine truthfulness is the first characteristic of all men in any way heroic. A great man cannot be without it. The merit of originality is not novelty, it is truthfulness. Every son of Adam can become a truthful man, an original man, in this sense, no mortal is doomed to be a lying man.” ( Carlyle ) প্রগাঢ় অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠাই মহাজনগণের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ ; কোন মহাপুরুষই এ লক্ষণে বঞ্চিত নহেন। নূতনত্বের ভিতর মৌলিকতা নহে, সত্তোর মধ্যেই মৌলিকতা। প্রত্যেক মানব সম্ভানই সত্যনিষ্ঠ ও অকপট হইতে পারে ; এইভাবে প্রত্যেক মানবের মধ্যেই মৌলিকতা থাকিতে পারে। অসত্যনিষ্ঠ হওয়া কাহারও নিয়তি হইতে পারে না। উদ্ধৃত মহাবাক্য হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, কুপাময় বিধাতা আমাদের সৃষ্টি বিধান করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে যে সকল সদ্গুণের বীজ নিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্যনিষ্ঠাই প্রধান। প্রিয় হইতে হইলে, অন্যের নিকট প্রজ্ঞাভক্তির দাবী করিতে হইলে, প্রথমতঃ নিজে বোলমানা সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। মনে ও বাক্যে অলমঙ্গল ব্যক্তিকে কেহই বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তি অভূল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কিংবা বিবিধবিদ্যায় পারদর্শী,

অথবা কোপীনসম্বল সন্ন্যাসী হইলেও মণিভূষিত ফণীর ন্যায় সকলেই ভীত ও আতঙ্কিত চিত্তে তাহার সঙ্গ বর্জন করিতে প্রয়াস পায়। চিররোগী ধনী হইতে সুস্থ সবলকায় দরিদ্রের ন্যায় সত্যাত্ম্যগী হইয়া স্বর্গবাস অপেক্ষা সত্যাপূত হৃদয়ে নরকে বাস অনন্তগুণে শ্রেয়স্কর। অসত্যানিষ্ঠ মানব প্রতারণার সাহায্যে মনুষ্যাগণকে বঞ্চিত করিয়া নিজে অশুষ্কণ প্রতিপত্তিশালী হইতে যত্নবান হয়। কিন্তু সত্যামিথ্যার বিচারপতি অমৃত্যুমানী ভুবনস্বামীর ধর্মরাজ্যে অসত্যের আশ্রয়ে কেহ কখন বিফল হইতে পারে না। অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আপাত সুখ উপভোগ করিলে স্বকৃত দুঃখের জন্য পরিণামে অবশ্যই ক্ষুণ্ণতাপ্ত ও দুঃখিত হইতে হয়। সত্যের জয় ও অসত্যের ক্ষয় নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। অস্ ধাতুর শত্ প্রত্যয়ে “সং” শব্দের উৎপত্তি। উহার ( সং ) শব্দের পর ভাবার্থে “য” প্রত্যয় যোগে সত্য শব্দ নিষ্পন্ন। অতএব সত্যশব্দের মৌলিক অর্থ নিত্য। আমরা সর্বদা যে সকল বিষয় মনন করি, যে সকল কথা উচ্চারণ করি, যে সকল কর্ম সম্পাদন করি, ত্রিচিন্তা, বাক্যা ও কন্মসমুদয় যদি চিরকাল সজীব থাকে, তাহা হইলে সেগুলি সত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। যুধিষ্ঠিরাদির বাক্য যেরূপ সত্য, শ্রীরামচন্দ্রাদির কর্ম যেরূপ সত্য, দানবরাজ বলি প্রভৃতির চিন্তা ( দান সঙ্কল্প ) যেরূপ সত্য, যথার্থ সত্যানিষ্ঠ হইলে তাহাদের মন বাক্য কর্ম তদ্রূপ সনকরূপ হইয়া থাকে। সর্বদা মন মুখ ও কাণ একরূপ রাখার নাম সত্যানিষ্ঠা। জন্মক্ষণ হইতে মাতৃস্বনা পানের ন্যায় আজীবন সত্যের অনুশীলন কর্তব্য। বিনা অধ্যয়নে যেমন কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না, অনুশীলন বা অভ্যাস ভিন্ন তদ্রূপ সত্যানিষ্ঠ হওয়া যায় না। যোগাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধি সহকারে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রাতি যম, নিয়ম ও ভূতি আট প্রকার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম উপায় যম অগ্নিসাদিভেদে পাঁচ প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার যমের নাম সত্য। এই সত্যতত্ত্ব অনুশীলনের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে বস্তুতত্ত্ববিষয়ে ধারণা জন্মে। এইরূপে নিরন্তর যথার্থ ও হিতকথনের দ্বারা বাক্য কেবল সত্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। সত্যতত্ত্ব অনুশীলনের দুইটী স্তর। প্রথম স্তরের মানব “বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের সমক্ষে, তীর্থক্ষেত্রে, বৈশাখাদি পুণ্য মাসে, জীবিকার ও অমিত্যা বলিব না” এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও উদ্দেশ্যের গুণ্ডার ভিতর থাকিয়া সত্যের অনুশীলন করেন। আর দ্বিতীয় স্তরের উচ্চ অধিকারীরা “কোনও ব্যক্তির নিকট, কোনও দেশে, কোনও কালে অথবা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির মানসে কদাপি অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ কারিব না” এইরূপে “জাতি, দেশ, কাল ও উদ্দেশ্যের সীমা বহির্ভূত হইয়া নিয়ত সত্যের অভ্যাসে তৎপর থাকেন। অতুল্য পবিত্র ক্ষেত্র পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে রীতিমত কর্মিত ও প্রস্তুত হইলে উহাতে যেমন পদ্যাপ্ত শস্ত্র উৎপন্ন হইয়া ক্ষেত্রপতির দুঃখ নাশ করে, তদ্রূপ সত্যানিষ্ঠার গুণে চিত্ত হইতে রাগ, দ্বেষাদি আবর্জনারাশি অপসারিত হইলে, ইহাতে জ্ঞান-মহীকূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এত অপার সংসার-পারাবারে জীবন-তরঙ্গী পরিচালনার পক্ষে সত্যানিষ্ঠা দিগ্‌নির্ণয় শলাকা। ইহার অভাবে প্রতিপদে বিপদের সম্ভাবনা। বাল্যে অসত্যপ্রায়ণ বালককে সতপাঠিগণ অবিশ্বাস করে। তাহার দুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না। সে বিপদে পড়িলে কেহ সাহায্য করে না। যৌবনে মিথ্যাবাদী স্বামীকে পত্নীও মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী-গণ সতত তাহার উপর বিরক্তির ভাব পোষণ করে ও তাহার সংশ্রব দূরে পরিহার করিতে চেষ্টাবান্ হয়। একরূপ হতভাগ্যের পরকালেও অনন্ত নরক। এতাদৃশ অসত্যাসক্তের গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়াই যেন সর্বসংসার ধরিয়াও সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া থাকেন। কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্ককে ছদ্মস্ত শাদ্দুল যেরূপ ভীতি ও উদ্বেগজনক, অসত্যপ্রিয় মানবও ত্রিক্ সেইরূপ সকল সময়ে জগতের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়। অমূল্য সত্যরত্নের অধিকার-লাভ দেশ কাল পাত্রের আবদ্ধ নহে; পরন্তু নূতন পাত্র-লয় রেখার ন্যায় সুকুমার শিশু হৃদয়ে

ইহার প্রভাব সমধিক। ছাপরের শেষে বিরাটকুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সত্যাবতার যুধিষ্ঠিরের বিন্দুমাত্র সত্যচ্যুতি হইতে ভারতের যে অধঃপতনের সূক্ষ্ম সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ তাহা শুদ্ধকন—প্রজ্বলিত অনলে ঝটিকা সংযোগের দ্বারা সর্বগ্রাসী হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভাগ্যবিপর্যায় ও বর্তমান চঃখ-দৈন্তের মূলে ঐ দুর্নীতি অসত্য-নীতিই প্রবলরূপে দণ্ডায়মান। অসত্য-স্রোতে গাঢ়ালা দিয়াছে বলিয়াই ভারত আজ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। ভারতে কোনও যুগে সত্যের এরূপ অকথা অবমাননা ঘটে নাই। সত্য এইরূপে অবজ্ঞাত হইতেছে বলিয়াই, অধুনা পিতা পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, পতি পত্নী, এমন কি কোথাও কোথাও গুরু-শিষ্য পর্য্যন্ত মিথ্যা অভিযোগ লইয়া রাজদ্বারে বিচার-ভিখারী। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সত্যকে অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের উপরে স্থান দান করিয়াছেন। অরণ্যভীত কালের অগ্ন্যায়োপদেশ-পূর্ণ ইতিবৃত্ত পাঠে দেখিতে পাই,—বনবাসিনী দাসী জবালা বিদ্যাল্যভার্থ প্রবাসোত্তর বালক-পুত্রকে অসঙ্কোচে অকপটহৃদয়ে আত্মপরিচয় দান করিতেছেন; “প্রিয় বৎস! আমি তোমার জনকের নাম অজ্ঞাত; ঋষিদের আশ্রমে দাসীপুত্রি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম। আমার নাম জবালা। আমি তোমার কুলপরিচয় সম্বন্ধে এই মাত্র জ্ঞাত আছি।” সরলমতি বালক জননীর মুখে এইরূপ আত্ম-জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বেদবিৎ আচার্য্য-সভায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রশ্নমত মাতৃমুখস্থত স্বজন্ম বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিলে ঋষিগণ অজ্ঞাত—কুলশীল দাসীপুত্র বলিয়া উহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অমত করিলেন। কিন্তু সত্যের দ্বার সুপ্রশস্ত। উহা আকাশের দ্বারা সর্বত্র উন্মুক্ত। যে তথায় আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করিতে চায়, তাহার সকল বাধাশূন্য জলস্রোতে ভগ্ন সৈকত-বন্ধের দ্বারা দূরে ভাসিয়া যায়। তাই সেই ঋষিসমাজে জনৈক উদার-হৃদয় মহাপ্রাণ মহর্ষি বিদ্যার্থী দাসীপুত্রের ব্রহ্মবাদি-বদনোচ্চারিত সূক্ষ্মতার বেদধ্বনির দ্বারা তেজোগর্ভ সত্যবাণী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া আনন্দপরবশ, হৃদয়ে তাহাকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে ধরিলেন। ঘন ঘন শিরশ্চুসন করিলেন। এবং অশেষ বিশেষ প্রকারে ঐ বালকের দৃঢ় সত্যানিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া “সত্যাবাকাই ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) লক্ষণ, সত্যরাজ সত্যবাদী এই বালক নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-নন্দন ইহা স্থির করিলেন। জবালানন্দন দীর্ঘকাল তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া বিবিধ বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলে রূপালু গুরুদেব সত্যাপ্রিয় সেই বালকের “সত্যকাম” এই নূতন নামকরণ করিয়া জগতে সত্যের উজ্জ্বল মহিমা প্রচার করিলেন। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ) ধন্য মাতা সত্যপ্রাণা জবালা; আর শত ধন্য তাঁহার গুণাভিরাম পুত্র সত্যকাম। কত যুগযুগান্তর কালের বিশাল কুক্ষিতে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে, কিন্তু নভোমণ্ডলে চিরস্থির ধ্রুকের দ্বারা তাঁহাদের পবিত্র কীর্তিকাহিনী অত্মাপি ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হায়! সে সকল দিন ভারতের কি সুদিন ছিল; যে দিন বনবাসিনী অনাথা পরিচারিকা ব্রহ্মবাদিনী ঋষিসমাজস্থিতির দ্বারা অগ্নান-বদনে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে সত্যদ্বয়ের দীক্ষিত করিয়া তদ্বদনী ঋষিকুলে আত্মতত্ত্ব শিক্ষালাভার্থ পাঠাইয়া নিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠা বোধ করিতেন না। বালকের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক জনক-জননীর অপুষ্টি শিক্ষার বিরুদ্ধ আদর্শে আজ ভারতসমাজ মূমূর্ষু। একমাত্র সত্যসঞ্জীবনীসুধা ইহাকে বাঁচাইতে ও পূর্ব্বগোরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। সত্য বিসর্জন দিয়া আত্মোন্নতি বা দেশাত্মদয়ের চেষ্টা ছিন্নমূল তরুর শাখা-সেবনের দ্বারা পণ্ডিতমাত্র। সত্য অশেষ গুণের আকর। পুণ্যলোক ভীষ্মদেব সত্যবাদী ছিলেন বলিয়াই বীর ও জিতেন্দ্রির রূপে আজও সকলের সম্মান পাঠিতেছেন। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের ও নিত্যকর্তব্য ভীষ্ম তর্পণ ইহার অকাটা প্রমাণ। সত্যব্রত আচরণের পূর্ব্বে দেবব্রত বা ব্রহ্মচর্যের অভ্যাস করিতে হয়। যে মানব প্রথমে ব্রহ্মচর্যরূপ আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যথারীতি সত্যব্রতের অমল্যভান করেন, অস্তে তিনি ভাগ্যরূপ পূর্ণাঙ্গতি দিয়া মুক্তিদল লাভের অধিকারী হন। সত্যবাদীর হৃদয় যুগপৎ



মবনীত-কোমল ও শাগিত—সুরধারীতীক্ষ্ণ। একজ্ঞ দেবব্রত হইয়াও “ভীষ্ম” পৃথিবীর অকলাণকারীদের পক্ষে করাল কৃতান্ত সদৃশ ছিলেন। সত্যবাদী বীর। পৃথিবী রসাতলে যাইলেও তিনি সত্য-রক্ষার্থ দৃঢ়বদ্ধপরিবর। সত্যাবীর রামচন্দ্র অদ্যাপি আমাদের মানস-পটে সজীব আলোখ্য রূপে শোভিত হইতেছেন। সত্যবাদী বাক্‌সিদ্ধ, তাই আমরা বহুধাধি তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও আশীর্ষাদের কথা এখনও শুনিয়া থাকি। কবিবর ভবভূতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য “উত্তর চরিতে” ঋষীগণ পুনরাদ্যনাং বাচমর্থোহুধাবতি।” বলিয়া দৃঢ়কর্ত্তে ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। সত্যের মহিমা কীৰ্ত্তনে পাশ্চাত্য সুধী সমাজও মোম্বী নহেন। একজন মহাত্মার উক্তি ;—

“Tying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight.”

“মিথ্যাবাদী ঈশ্বরের স্বগার পাত্র, আর সত্যবাদী তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন”। যে কার্য্য করিলে ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে পরম পিতার অরূপ-ভাজন হইতে হয় তাহা সর্বথা পরিতাজ্য। পক্ষান্তরে যে কাজ করিলে জীবিত কালে মানব সমাজ প্রীত ও পরকালে সর্ব-জীব-সুদয়বিহারী শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা যে সর্বথা কর্তব্য ইহা সর্বজন-স্বীকৃত। তাই পুনরুজ্জীৱিত করিতে বাসনা হয়, দুদিনের জন্য এ ভব ভবনে আসিয়া যদি যথার্থ সুখী, জ্ঞানী, মুক্ত বা ভক্ত হইতে চাও কার্য্যমনোবাক্য এক করিয়া অক্ষুণ্ণ সত্যানিষ্ঠার অনুশীলন কর। মনে এক ভাবিয়া, মুখে এক বলিয়া, কর্ম্মে অন্যাক্ষপ করিয়া অপরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রতারিত হইও না। অসত্য উপায়ে অত্মকে প্রবঞ্চিত করিলে নিজেই প্রবঞ্চিত হইতে হয়। একটু ভাবিয়া দেখ; তুমি, আমি, সে, সমস্তই এক। একই মৃত্তিকা হইতে প্রাসাদ, প্রাচীর, ঘট, মঠ সবই নিম্মিত। ভিতরে ঢুকিয়া দেখ, হৃষ্টক ও মৃত্তিকা, তন্ময় প্রাসাদ ও মৃত্তিকা; কেবল পরিবর্তন, রূপান্তর বা বিকার ভ্রান্ত কল্পিত নাম রূপের সাহায্যে ভিন্নাকার বিকাশ মাত্র। এইরূপ তুমি, আমি, সে, সকলেই পঞ্চভূতের বিকার বা রূপান্তর। আমি যেমন তাহাকে “সে” তোমাকে “তুমি” বলিতেছি; ঠিক সে ও তুমি সেইরূপ আমাকে “সে” বা “তুমি” বলিতেছে। অতএব তুমি, আমি, সে, এ সকলই অন্তঃসারহীন শব্দাঙ্কুর মাত্র। সত্য কেবল “আমি।” আমি যেমন আমাকে “আমি” বলিয়া বুঝি; তুমি এবং সে ঠিক সেইরূপ তোমাকে এবং তাহাকে “আমি” বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাক। বেনী দূর যাইতে হইবে না, নিত্য চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছ, দালান কোটা ভাঙিলেই মাটি, ঘর ভাঙিলেও মাটি, ঘট ভাঙিলেও মাটি। সেইরূপ আমি (দেহ) মরিলেও বা, তুমি বা সে মরিলেও তাহাই। ইহাতে কেশাগ্রমাত্র পার্থক্য নাই। একই আকাশে লাল নীল নানারঙের মেঘের খেলার ন্যায় এক আমার (আত্মার) উপর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। সর্বজগীতাকার ব্রাহ্মণ, সারমেয় ও শূকর দেহে একই ব্রহ্মের চৈতন্যময়ী মূর্ত্তির উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রশিষ্যেরই বেদান্তেরও সার উপদেশ, “একমেব দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” “অধিষ্ঠানাব-শোষোহি নাশাঃ কল্পিত—বস্তুনঃ”, অর্থাৎ, কল্পিত পরিদৃশ্যমান নামরূপময় জগতের বিপক্ষে অধিষ্ঠান সত্তা এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সাধকবর রামপ্রসাদ ও গাহিরাছেন, “বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে।” জিকাল সত্য এ সকল সার সত্যোপদেশ ভোজবাজীর মজ্জ মাত্র নহে। ইহাকে খাঁটি সত্যাবোধে জড়াইয়া ধরিতে হইবে। “তাবের ঘরে চুরিকরা” মহাপাপ। ইহাতে আপনি মজ্জিবে, পরকেও মজ্জাইবে। একরূপ অসত্য পিছল পথে চলিলে পদে পদে পদস্থলনের অবগুস্তাবনা। যাহা ভাবিবে, যাহা বলিবে, যাহা করিবে সর্বত্র যেন ভাব ঠিক থাকে। ভাবহারা হইলে অভাব কিনা সর্বনাশ। একজ্ঞ পাশ্চাত্য কবিকেশরী সাবধান করিয়া দিতেছেন ;

“My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go.” “আমার (প্রার্থনার) শব্দগুলি বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছে; আমার মনের ভাবরাশি কিছু নীচেই পড়িয়া

আছে। ভাষ-বিরহিত শব্দ কখনও ভগবানের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না।” এরূপ ভাবে ভাবহারী হওয়াতেই আধুনিক ধর্মযাজকগণ গগনভেদী গলগর্জন করিয়াও অতীষ্ট লাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। যে বিষয় আমার নিজের অনুভূতির বাহিরে, অথচ সে বিষয়ে উপদেশ দিতে যাক্তয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মিথ্যার প্রেলোভন অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাহস। উহার আপাতমনোহারিণী মূর্তি দৈবীমায়ার ত্রায় মন্দবুদ্ধি মানব-মনকে ভুলাইয়া তাহাদের দ্বারা কতই না অকার্য্য কুকার্য্য সাধন করিতেছে। নিদামমধ্যাহ্নের মার্শ্বেতাপতপ্ত কোমলাঙ্গ হরিণবৃন্দ পিপাসার শুষ্কতালু হইয়া মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাপুঞ্জে প্রতিফলিত সৌরকরনিকরের প্রতি জলজলে ধাবিত হইয়া জলাভাবে যেমন প্রাণতাগ করে, মিথ্যার আপাতমানাহর রূপে আকৃষ্ট ক্ষণিক সুখ-পিপাসু নরগণও তদ্রূপ প্রতিবুদ্ধিতে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করে। সত্যের পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ হইলেও লক্ষ্যস্থল সুকোমল—কুসুমাস্তৃত। অপর দিকে অসত্যের পথ অবন্ধুর ও নিকটক হইলেও ইহার গম্যস্থল অতলস্পর্শ নিরয়। উহাতে একবার পড়িলে কল্মষান্ধারেও উদ্ধার লাভ অসম্ভব। যাহাতে আমরা স্বপ্নেও অসত্যের ছায়া স্পর্শ না করি তৎপ্রতি সতত সতর্ক থাকা উচিত। অসত্য বহুরূপী। পলাপুর ত্রায় উহার কেবল রূপসর্বস্ব আবরণ (খোসা) সার। ক্রমশঃ ঐ আবরণগুলি সরাইয়া ফেলিলে উহার কোনও স্থিরতর রূপ বা সার অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যের কোনও বাহ্য বেশভূষা নাই। ইহা খাঁটি পদার্থ। ইচ্ছাকাণ্ডের মত ইহার ভিতর বাহির সমস্তটাই রসে ভরপুর। চর্য্যাধিক্যে মাধুর্য্যানুভূতি বাহুল্যের ত্রায় অনুশীলনের উৎকর্ষে সত্য নিষ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রূপ বাহিরের জিনিষ। যে পদার্থে বাহ্য রূপের যত চটক সে পদার্থ ততই অসার। ইহা নানাছাঁদে পতঙ্গাকর্ষিণী মোহিনী অগ্নি-শিখার ত্রায় অসংযত বিষয়লম্পট্ মানবের দলকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। আর যাহা রূপাভূষ-হীন তাহা কার্য্যকারী ও ফলোপধারী। সত্য জগৎ যন্ত্র পরিচালনের শক্তিশালী চক্র বলিয়াই তাহার স্থান অতি উচ্চতর। খাঁটি সত্য সর্বদা একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা সত্য ও অসত্য উভয়ে একত্র ভ্রমণে বর্হিগত হইয়া পথিমধ্যে একটা রমা সরোবর দর্শন করিল। তাহারা দুইরনে কাকচক্ষু স্ফুট সলিল ঐ সরোবরে সম্ভরণমানসে নিজ নিজ পরিচ্ছদ উন্মোচন পূর্বক তীরদেশে রাখিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিল। বিবিধ জলকেলিরত অনাবৃত-অঙ্গ সত্য ও অসত্য সহসা সেই সরোবরের তীরবাহী পথ দিয়া সেই দেশের নরেশকে যাইতে দেখিয়া সমস্তমে জল হইতে উখিত হইল। চতুর অসত্য ক্রিপতার সহিত সত্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপের ত্রায় আত্মগোপন করিল। এদিকে ধীর গম্ভীর সরলতার প্রতিচ্ছবি সত্য তীরে উঠিয়া নিজের পরিচ্ছদ মিথ্যার হস্তগত ও মিথ্যার পোষাক তথায় পতিত দেখিয়া তৎস্ব-লুপ্তিত সাধুর পরদ্রব্যো সহজ উপেক্ষার ত্রায় উহা স্পর্শ করিল না। তদবধি সত্য নগ্নবেশে ও অসত্য সত্যের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিগঞ্জ ধুস্তের মত জনসমাজে বিচরণ করিতে লাগিল। এটি রূপকথা, হইলেও ইহার ভিতরে বেশ একটু সত্যের আভাস আছে। সত্য নগ্ন বা উলঙ্গ, আর অসত্য রমা-পরিচ্ছদ-পরিহিত বলিকার তাৎপর্য্য বোধ হয়, একটা আসল আর একটা নকল। আসল বস্ত্র জগতে চিরদিন সমভাবে আদৃত হইয়া থাকে। সত্য বাহ্য বেশ-ভূষা-শূণ্য হইলেও উহা চরিত্র-ভূষণ সজ্জনের ত্রায় স্বভাবতঃ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। কুরূপা পতিব্রতা পত্নী, মেগাধার নিরাভরণ পুত্র, বিজ্ঞানদেবীর চীর-বসন সাধক, কোপীন-শোভী যোগী, দৈন্ত-বিনয়-মণ্ডিত ধূনি-লুপ্তিত ভক্ত, শিশিরসিক্ত নৈসর্গিক কুসুমদাম যেমন সকলেরই প্রাণে বিমল আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়, প্রকৃত সত্যও তেমনই সকল সময়ে নিরাবিল সুখের স্রোত বহাইয়া হৃৎযতাপ-তপ্ত ভূমণ্ডল সুশীতল করে। যাহা সৎ তাহাই নিত্য, নির্মল, পবিত্র, শাস্ত ও মধুর। স্বভাব-সুন্দর পুরুষের অলঙ্কার নিরপেক্ষতার ত্রায় স্বতা

মধুর সত্যের পরিচায়ক কোনরূপ বেশ ভূষার আবশ্যক হয় না। শুড় মিষ্ট করিতে যেমন গুড়েরই প্রয়োজন, সত্যের উৎকর্ষে তেমনই উত্তরোত্তর সত্যনিষ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধির আবশ্যক। যে সকল বস্তু সহজ-সুন্দর, স্বতঃ কান্ত ও নিসর্গমধুর, তাহাদের সৌন্দর্য্য, কান্তি ও মাধুর্য্য বর্ধনে অগ্রদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কবিকুলভিলক কালিদাস তাঁহার কাব্য কোমলর অভিজ্ঞান শকুন্তলে ইহার সমর্থক প্রমাণ দিয়াছেন;—“কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকুতীনাং”। যে বস্তু যত মিথ্যার আবরণে আবৃত সে ততই অসার অপবিত্র ও তুচ্ছ। উগা আপাততঃ সরস, সুন্দর, ও মধুরূপে প্রতীত হইলেও পরিণামে বিরস ও তিক্ত হ্রাদে পর্য্যবসিত হয়। বিচার কিংবা পরীক্ষা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। অগ্নিদংশযোগে শ্রমিকা-মলিন-সুবর্ণখণ্ডের মলহানির ত্রায় পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইলেই অসত্য অংশ অপসৃত হইয়া শাণোজল মণির মত সত্যের সর্বমোহন রূপরাশি শোভিত হইতে থাকে। অসত্যবাদী ভীকৃষোদ্ধার মত আত্মশক্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সত্য পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া থাকে। সত্যবাদী মন্ত-মাতঙ্গ-প্রিগীর্ষ কেশরী-কিশোরেকের ন্যায় সর্বত্র আত্মশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিজয় লক্ষীর স্বয়ম্বর মণোর অধিকারী হন। সত্য-বিশ্বের অবস্থিতির সন্ধার পাইলে অসত্য-শৃগাল তথ্যইতে সুদূরে প্রস্থান করে। ফলতঃ আতপ ও চায়া, আগোক ও অন্ধকার, শীত ও বসন্ত, সূর্য ও চন্দ্র, ধর্ম ও অধর্ম, কাম ও শ্রমেয় ত্রায় অসত্য ও সত্যের সহবাস একান্ত অসম্ভব। যে ব্যক্তি অসত্যের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে হৃৎপিণ্ড জাত গলিত ত্রণের যাতনা-ভোগীর ত্রায় নিয়ত অশেষ ক্লেশের মুখ্যরূপে দহনে দহমান হইয়া থাকে। দূষিত গৃহবায়ু ও চুষ্টললিল যেরূপ বহু পুঙ্ক গৃহ ও তড়াগ হইতে নিঃসারিত করিয়া না দিলে গৃহস্থ, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, তদ্রূপ হৃদয় হইতে অসত্যবিশ্ব সদৃশরূপ উপদেশ, সাধুসঙ্গ প্রতিষ্ঠা উপায়ে নিষ্কাশিত করিতে না পারিলে অকাল-মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। অসত্যবিশ্ব পীত পারদ ও কৃত পাপের ন্যায় কদাপি জীর্ণ হয় না। ক্ষীরপূর্ণ কলসে বিন্দুমাত্র গোমূত্রপাতের ত্রায় আজীবন সত্যের সেবা করিয়া নিমেষাক্ষণও যদি অসত্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ অদঃপতন অনিবার্য্য। এজন্ত বিশ্বহতেপদেষ্ঠা পূজাপাদ মহাভারত প্রণেতা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের দেহান্তে “হত হিতগজ,” এই বাক্যভঙ্গের নিমিত্ত নরক দর্শন করাষ্টয়া পাপকঙ্কর মানব সংকে সতর্ক হস্তে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সর্বমঙ্গল নিদান স্বয়ং ভগবান্ ও সকল শাস্ত্রে “সত্যং পরং ধীমহি” ইত্যাদি মহাশ্লোকো সত্যস্বরূপে স্তূয়মান হন। সর্বনিয়ন্তা কালের ত্রায় একমাত্র সত্যেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মুক্তি পথান্ত সাদিত হয়। সত্যবৎসল সাধুর দল সত্যবলে সত্যরূপী ভগবানের কৃপা, মুক্তি ও ভক্তি লাভে চরিতার্থ হন। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ “মাত্রাক্ষন্তে” একই অদ্বিতীয় ভগবৎসত্যের বিকাশ রূপ মহাসত্য মর্মে মর্মে অন্বেষণ করিয়া অগ্নিদর্শ-সলিলাদি-সমুত্ত যাবতীয় পার্থিব চুঃখের মন্তকে সবলে পদাঘাত করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজ ও ভক্তমুকুটমণি রূপে কীর্ষিত ও অর্চিত হইতেছেন। ভাগ্যী গোতন “অহিংসা পরনোদর্শঃ” রূপ মহা-সত্যের ক্ষীর সাগরে অভিষিক্ত হইয়া অত্মপি জগতে “বুদ্ধ” নামে প্রসিদ্ধ ও পূজিত হইতেছেন। জ্ঞানগুরু শঙ্কর প্রতি দেহ-মন্দিরে জীবরূপী সদাশিবের নিত্যাবিষ্টান সত্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এখনও “জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য” নামে অভিহিত ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে নিত্য আরাধিত হইতেছেন। প্রেমিক শ্রীগোরাঙ্গ ভালবাসাই জীবের পরমার্থরূপ প্রেমের মহাসত্যে আত্মসংসর্গ করিয়া আসিছে হিম্মচল ভারতে যে প্রেম-বৈজয়ন্তী উদ্ভূত করিয়া গিয়াছেন; আজ তাহার মহতী পতাকার নীতল ছায়ায় বসিয়া পত শত পালী তাপী পথভ্রষ্ট পতিত মানব সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছেন ইহা চক্ষুমান ব্যক্তির নিকট অপ্রত্যক্ষ নহে। সত্যই সর্বসাধনার কেন্দ্রভূমি বলিয়া হিন্দুগণ “সত্যনারায়ণ”, যবন সম্প্রদায় “সত্যপীর”, এবং মুসলমান

অপরূপ জাতিগণ নানা নামে, নানারূপে ও নানাভাবে এই বিশ্বের সত্যদেবের উপাসনা করেন। বাহ্য হৃদয়ের ধন, অস্থবের সামগ্রী, সাধনার বস্তু তাহাকে কুল দেবতার ত্রায় মনের মন্দিরে ভক্তি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেম কুসুমদামে অবিরত অর্চনা করাই বেদবিধিসিদ্ধ। নিরন্তর হৃৎখের দাস আমরা যেন হরন্তু অসত্যের অঙ্গুলি ছেলনে চালিত হইয়া হৃদয়েশ্বর সত্যদেবের উপাসনা হইতে কদাপি বঞ্চিত না হই। শৈশবের পাঠ্য “শিশুশিক্ষায়” অসত্যবাদী রাখালের কথা, সুপ্রাচীন উপাখ্যান গ্রন্থ এবং ভারতাদি অগ্রাগ্র শাস্ত্রপুণ্য সমূহে সত্য সম্বন্ধে আমরা যে সকল অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছি,—সে সকল কি বিজ্ঞ বনজাত উপেক্ষিত কুসুমের ন্যায় দৈনন্দিন জীবনে কার্যগত করিতে পারিব না? পত্রিকার উল্লিখিত শত আটক জলের কথা শ্রবণমাত্রই কি দ্রোণের দারুণ পিণ্ডাসার নিবৃত্তি ঘটিবে? মধুময় হৃৎখের নাম শুনিলেই কি শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া আরামদায়িনী নিদ্রার সঞ্চার করিবে? বীরাবান্ কুণ্ডল নাম নির্ঝাঁকিত হঠলেই কি রুগ্নের দেহ হইতে রোগ ভয়ে পলায়ন করিবে? এ সকল “প্ৰশংসিত” বিজ্ঞায় এ যাবৎ কোন ফল ফলে নাই, ফলিবার সম্ভাবনাও নাই। কার্যক্ষেত্রে “হাতেকলমে” কাজ করা চাই। “দুগ্ধ মধু” ইহা যেমন দুগ্ধপায়ীর রাসন-প্রত্যক্ষ, “আগ্ন দাহ করে” ইহা যেমন ভুক্ত-জ্বলীর স্বাচ-প্রত্যক্ষ, সত্য ত্রিকাল সত্য ও ভুক্তি মুক্তি ভক্তিপ্রদ; এ মহান সত্যও তদ্রূপ অমূল্য, অত্যাশ ও সাধনাবোধ্য। সাধনায় সিদ্ধি, বিনা সাধনায় কেহ কোনও দিন সিদ্ধির প্রকল্প ছবি দর্শনে স্তম্ভী হইতে পারে নাই। সর্বদা অসত্যের পরিহার ও সত্যনিষ্ঠার অভ্যাসই সত্যের প্রধান সাধনা। সত্যানুষ্ঠি সম্বন্ধে ভট্টনৈক মহাত্মার সারগর্ভ উপদেশ;—

“Oh 't is a lovely thing for youth  
To walk betimes, in wisdom's way  
To fear a lie, to speak the truth  
That we may trust to all they say.”

যথা সময়ে প্রজ্ঞার পথে বিবরণ, মিথ্যা কথিতে ভয়, আর সর্বদা বিশ্বাসজনক সত্যকথনের অভ্যাস, এই গুণগুলি যুবকগণকে জন সমাজের প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র করিয়া তোলে। অসত্যদর্শী কবির কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, কেবল শাস্তির ভয়ে মিথ্যা বলিতে বিরত থাকিলে চলিবে না, প্রাণ মনোবলের সহিত সত্য কথিতেও অভ্যাস করিতে হইবে। অসত্যের বর্জন ও সত্যের গ্রহণ এই দুইয়ের সাধনে তবে পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সফলতা লাভ হইবে। পাপে ভয় ও পুণ্যের অন্ত্যস্তান দুইটি যেমন পুরুষার্থ লাভের প্রাতি হেতু, অসত্য ত্যাগ ও সত্যগ্রহণ এ উভয়ও তদ্রূপ সত্য সাধনায় গুরুতর প্রয়োজনীয়। পুঞ্জীকৃত সুবর্ণ ভার হইতে ক্ষুদ্র তুণ্ডী দলের ভারাদিকোর ত্রায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ধনরত্নাদির বিনিময়ে সত্যরত্ন অনন্ত গৌরবময় ও মূল্যবান্ ইহা মনে রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে নিয়ত পদক্ষেপ করিতে হইবে। সত্য পথই কষ্টের পথ, সত্য পথই যোগের পথ, সত্য পথই জ্ঞানের পথ, সত্য পথই ভক্তির পথ, সত্য পথই একমাত্র শাস্তির পথ। ধর্ম্মরাজ বমের আদেশ, “সত্যেন পুষ্ठा: বিততো দেখান।” পরিণামে, “সত্যমেব জয়তে নানুং ॥”

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

## অনুরোধ ।

—:~:—

( রাগিণী—ইমন কলাণ )

আমারে কর'গো তোমার কানন মালাকর—

নিত্য গাঁথিয়া নব নব মালা

দোলাব তোমার গল্প পর ।

আমার প্রাণের আকুল এ ফুলগুলি

বি'ধি বি'ধি দিব তোমার কণ্ঠে তুলি'

আমার

সকল ত্রিয়াস যতন প্রয়াস

পাবে

ক্ষণিকের তবু সমাদর ।

হে দেবি, আমায় কর'গো তোমার সভাকবি

নিত্য গাঁথিয়া নব নব গীত

করিব রচনা তব ছবি ।

নকৌ তোমার কিবা গাবে জয়গান

আমার কণ্ঠে ধ্বনিবে সকল প্রাণ ।

আমার

জীবনে যা' কিছু ! হয়েছে বিফল

মম

গান হবে তারি মধুকর ।

কর মোরে প্রিয়ে তোমার শালিকা-চিত্রকর

নিত্য আঁকিয়া নব নব ছবি

বসাব' আমার চিত্ত 'পর ।

তুমি শুধু থেকো বিছায়ে এমনি মায়া

আমার নয়নে ভুবনে আলোক ছায়া

আমি

গড়িব মনের মহা মাধুরীতে—

তোমার

মোহিনী মূর্তি ধরা 'পর ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## প্রায়শ্চিত্ত ।

—:~:—

পরিবর্তনই হ'ল জীবনের স্রোত, এই গতিশক্তি যদি না থাকত তবে জীবনটা যে ক্রম মরণের নামান্তর হয়ে উঠত সে সত্য কিন্তু আমার স্বভাবের এতখানি পরিবর্তনের একটা ত্রায়সঙ্গত কারণ পৃথিবীর সমস্ত কার্যাকারণ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না ! বন্ধুবা বলে “কি হে তুই যে নতুন মানুষ হয়ে গেলি, ব্যাপার কি ?” আমি শাস্তমুখে হাসি কিন্তু সে হাসির আড়ালে যে কতখানি চোখের জল চল-চল করে তা অস্থগামিই জানেন ! মানুষ প্রকাশে পাপ করলে এখন ফাঁসি হয়, আগেকার দিনে মাথা কাটা যেত ; আর আমি গোপনে পাপ করেছি তাই আমি যে দণ্ড বহন করছি এর মত ভয়ানক মুহূর্ত আর নাই ! তাই আমার সে নিষ্ঠুর স্বভাব একেবারে মরেছে, লক্ষবার তার শিরচ্ছেদ হয়েছে,—লক্ষবার তার গলায় ফাঁসি লেগেছে, মৃত্যুর আর কিছু বাকি নেই তার ! পুণ্যকে জাহির করা চলে, পাপকে চলে না, কিন্তু আমার পাপ যে আমি গোপন করেছি, এই কষ্টকর চিন্তা অহনিশি আমার যাতনা দেয়, আমি অধীর হয়ে আজ তা প্রকাশ করছি এই আশায়—যদি এ-বেদনা কিছু লাঘব হয় !

যখন আমি শিশু তখনই আমার রাগ দেখে বাবা বলতেন “ছেলেটা বড় গুণ্ডা হবে !” শরীরেও অস্থিরের মত বল ছিল, মা আমার যে কত অত্যাচার বহন করেছেন,—তাকে কোন মতেই যেত দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না ! ভাইবোনের সঙ্গে খেলা করা আমার পোষাক না, তারাও তাদের অত্যাচারী ‘দাদার’ কাছে বড় একটা বেসুত না ! আমি একাই পাড়া মাং করে রাখতাম, আমার দৌরাছো সে পাড়ার কাকুর গাছে ফল পাকতে পেত না, পাড়ায় এমন বালক কেউ ছিল না যে আমার ভয় না করত ! আমার রাগ হলে ডোটবড় বিচার করতাম না, একদিন একটা ঘুড়ি নিয়ে ঝগড়া করে একটা ছোট ছেলেকে আমি যে বিষম ঘৃসি চাপড় মেরেছিলাম তার জন্ত তার মায়ের কাছে অকথা গালাগালি ও বাড়ীতে পিতার কাছে আমার গুরুতর দণ্ড বহন করতে হয়েছিল, কিন্তু আমার স্বভাবের কোন পরিবর্তনই লক্ষিত হ'ল না । আমার মনের বড় একটা কোঁক ছিল, যখন কিছুর জন্ত আমার রোখ চাপ্ত তখন আমার ঠেকিয়ে রাখে পৃথিবীতে এমন কেউ ছিল না ! যতক্ষণ আমি আমার ইঙ্গিত কাজ না করতাম ততক্ষণ আমার মনে শান্তি থাকত না ! আমার পিতার বংশে কিম্বা মাতার বংশে কেহই এমন ছিল না, আমি যে কোথা থেকে স্বভাবের এই দৃঢ়তা লুপ্ত করেছিলাম তা জানি না ।—আমি মনে মনে এর জন্ত খুব গর্ব অনুভব করতাম কিন্তু এজন্ত আমার গৌরব একেবারেই বাড়ে নি বরং অগৌরবের ভাগ বৃদ্ধি হয়েছিল ! বাবা বলতেন “ও অবাধা ছেলেটা কোন দিন মানুষ হ'তে পারবে না !” মা আমার বড় কোমল স্বভাবা ছিলেন, তাঁর কাছে আমি কখনও তিরস্কার পাই নি । আমি জানতাম, আমি যতবড় অপরাধই করি, মা আমার আড়াল আছেন পিতার ক্রোধ থেকে আমার রক্ষা করার জন্ত মার কাছে একটি স্নেহাবরণ আছে ! আমার নাম ছিল “ডাকু” ; বাল্যকাল থেকে আমার স্বভাব দেখে মা আদর করে আমার এ নাম দিয়েছিলেন, আমি যে সত্যই একদিন একটি নিরপরাধীর জীবন হরণ করব তা কে জানত !

তখন আমি আট বছরের ; একদিন পিতার এক পুরাণ বন্ধু আমাদের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছিলেন। আমার ভ্রাতাভগ্নিরা তাঁর কাছে গিয়ে আদর-আশীর্বাদ নিয়ে এল, আমি কিন্তু একেবারে রান্নাঘরের ঘরের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করলাম । পিতা তাঁর গভীর গলায় ডাকলেন, “ডাকু, এস ত বাবা” আমি কিন্তু তার উত্তরমাত্র

দিলাম না। তারপর আমার ভ্রাতা ভগ্নিরা অব্যবহিত বাহির হ'ল, ক্রমে মা এলেন, তাঁর দৃষ্টি আমি এড়াতে পারলাম না। তিনি আমার যখন দুই বন্ধুর মাঝে আলিঙ্গন করে বললেন “বাও ত লক্ষ্মীধন আমার” তখন আমি নত মস্তকে তাঁর আঙা পালন করলাম; কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে মনে মনে আমার বড়ই রাগ হ'ল! আমার না দেখলে কি এই ভদ্রলোকটির চলছিল না? তারপর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “তোমার নামটি কি?” আমার মনে হ'ল আমার নাম যাই হক্ তোর তাতে কিরে বাপু? আমি উদ্ধত স্বরে বললাম “কি আবার নাম, ডাকু!” তিনি তাঁর কাঁচা পাকা পৌফদাড়ির ভিতর থেকে বড় করুণভাবে হেসে উঠলেন, আমার কিন্তু মনে হ'ল তিনি আমার বিক্রপ করছেন, তাই আমার রাগ আরও বেড়ে গেল! তারপর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি কি বই পড় বাবা?” তখন আমি রাগে উত্তর দিতে পারলাম না; বাবা কিন্তু তখনি বললেন “কিছু না,— কিছুর না!” আমার মাথার ভিতর কিম্ কিম্ করতে লাগল, বাবা কি না এই অপরিচিত লোকটির সামনে এমন করে আমার নিন্দা করলেন! তখনি আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর খেলা নয় এবার আমি পাঠে মন দেব, এই প্রতিজ্ঞা আমার পাগলা ষোড়ার মত এক দোড়ে পরীক্ষাশ্রেণীর ভিতর থেকে বাহির করে আনতে পেরেছিল! সরস্বতী আমার প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখলেন, বিভাগয়ের প্রাত পরীক্ষার আমি সর্বোচ্চ স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিলাম! এই বিভাগভেদে অনবসরে আমার ক্রোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল, ভয়াবৃত আশ্রয় যেমন অসাবধানে গৃহ দাঙ করে আমার ক্রোধও তেমনি ক্ষণকালের জন্ত শাস্ত্রমুহি গ্রহণ করেছিল। এমনি আদরে তিরসকারে আমার তিক্ত-মধুর শৈশব- কৈশোর যৌবনে এসে পড়ল। আমার দেহ মন যে কখন বিকশিত হয়ে উঠেছে তা আমি জানতে পারি নি, তারপর যেদিন কলেজের সব কয়টি পরীক্ষা পাশ করে আমি মুক্ত পেলাম সেদিন দেখলাম প্রাণের ভিতরে বসন্তের হাওয়া দিয়েছে, জীবনের সমস্ত কতা-বিতান ফুলে ফুলময় হয়ে গেছে! অবকাশের ভিতরে এই জীবনটাকে এত বেশী স্মন্দর, এত বেশী মধুর বোধ হ'ল যে আমি একে কেমন করে উপভোগ করব তা ভেবে পেলাম না। পিতা আমার চাকরীর জন্ত অনীর হ'লেন, মাতা আমার বিবাহ দিয়ে বড় আনবার জন্ত ব্যাকুল হলেন! এই দীর্ঘ ছাড়াছাড়ির পর যখন আমি পিতামাতার স্নেহ থেকে ফিরে এলাম তখন সেই বালাকালের অসঙ্খ্যের কথা একেবারেই চাপা পড়ে গেল, আর আমিও সে কথা স্মরণ করবার অবকাশ পেলাম না! পিতা সরকারী চাকরী করতেন, তাই অনেক উমেদারী অনেক ছুটাছুটি করে আমার জন্ত একটি সামান্য আয়ের চাকরী জোগাড় করলেন। তবু তিনি যেদিন এসে প্রথম সংবাদ দিলেন যে আমি একটি কাজ পেয়েছি সেদিন তাঁর মুখে যে আনন্দ দেখেছিলাম, ঐ আনন্দ আমি ভীবনে দেখি নি।

মাতা আনন্দে উৎকুল হয়ে সেদিনই হরিয়লুট দিলেন। তারপর মনে পড়ে আমার বিয়ের রাত্রি। চল্লনের কোঁটা-কাটা, নোলকপরা, লাগে চোলেতে আবৃত চতুর্দশ বর্ষের রাণী আমার পার্শ্বে জড়সড় হয়ে বসে আছে! তারপর যখন তার নরম হাতখানি আমার হাতের উপর এসে পড়ল তখন আমি সে স্পর্শের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করতে পরলাম—কতখানি বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা তার ভিতরে রয়েছে, তখন কি সে বুঝেছিল যে আমি তার সমস্ত বিশ্বাসকে এমন করে প্রতারণা করব? যেখানটিতে তার আঘাত লাগে সেখানেই সব চেয়ে বড় দরদ দেব!

রাত্রে যখন বাসরঘরে নীপ নিভিয়ে শয়নের উদ্যোগ করছি তখন রাণী শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করে কইল, আমি ধীরে ধীরে তার হাত দুটি ধরে বললাম “এস রাণী—শোবে!” এতটুকু আদরে সে যেন গলে গেল। তার প্রাণের ভিতরে এক জারজার সমস্ত দুঃখটা বেন বরকের মত জমাট হয়ে ছিল, আমার এতটুকু স্নেহের তাপে

তার চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ল! আমি অতিমাত্র অদীর হয়ে তার অশ্রু মুছিয়ে বার বার তিজ্ঞাসা করলাম “কেন কঁাদছ রাণি! কি হয়েছে?” সে কিছুই উত্তর দিল না শুধু বেঁসে বেঁসে আমার বুকের কাছটিতে সরে এল। আমি বুঝলাম এ স্থথের অশ্রু, এত স্নেহ সে জীবনে পায় নি, মাতৃহারা হয়ে বিমাতার শাসনে শুধু দগ্ধিত হয়েছে। বাড়ির রাত্রি এট পক্ষীশাবকটি যে আমারই ঘরের নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এই বোধটি আমার মনের ভিতরে সমস্ত করুণাকে উৎসারিত করে দিলে! তাকে প্রফুল্ল করবার জন্ম আমি কথা পরিবর্তন করে বললাম “আচ্ছা রাণি তুমি খুব সুখী হচ্ছে?” সে শুধু ধীরে ধীরে তার বাড়ি নেড়ে সম্মতি জানালে, তার মথা এসে আমার বুকে ঠেকল! তারপর সব নিস্তক, কোন কথা বললে যে সে অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলবে তা আমি বুঝতেই পারলুম না! আমি ধীরে ধীরে তার হাতখানি আমার মূঠির মধ্যে তুলে নিয়ে বললাম “তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে?” সে মুচুস্বরে বললে “আমার পুত্রই কষ্ট হবে কিন্তু তার মাঝেও আমি এতটুকু সান্না পাচ্ছি যে তিনি আমার ভাষা থেকে মুক্তি পেলেন!” এ-কথায় আমি বড়ই বাথিত হ’লাম, বললাম “না রাণি, সম্ভান কি কখনও পিতামাতার ভার হয়?” রাণী বললে “যত দিন মা বেঁচেছিলেন তত দিন হই নি! নতুন-মা আসার পর থেকে বাবার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয়েছি!” তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, আমি তার সর্বাঙ্গে হাত বুলায়ে দিতে লাগলাম! তারপর কখন যে নিদ্রা এসে আমাদের দুজনকে তার শাস্তিময় কোলে তুলে নিলে তা আমরা বুঝতেও পারি নি। আমাদের বাড়ী এসে ছ’এক দিনে যখন প্রথম-পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটল তখন এক দিন রাণী ভয়ে ভয়ে বললে “তোমায় একটা কথা বলব—রাগ করবে কি?” আমি হেসে বললাম “না গো না, রাগ করবো না, কি কথা শুনি?” সে তখন মুচুস্বরে বললে “তুমি জান না বোধ হয় আমার একটা ছোট আপনার ভাই আছে; তাকে আমি এক দণ্ড চোখের আড়াল করতাম না! সে আমার ছেড়ে কেমন করে আছে জানি না! মা মারা যাবার পর থেকে আমিই তাকে বুকে কোলে করে মানুষ করেছি, সে এই সবে ছয় বছরে পড়েছে। সে যদি আমার কাছে থাকে তা হলে তুমি কি—” আর বলা হ’ল না, রাণী ভয়ে সঙ্কোচে আমার দিকে তার বাথিত চোখ দুটি তুলে! আমি তার কপালের চুলগুলি সরিয়ে নিয়ে বললাম “বেশ ত রাণি, আজই তাকে আমি নিয়ে আসব!” রাণীর মুখ আশাতীত আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল, কি মনে করে সে আমার প্রণাম করলে! আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বললাম “আ...ছি তুমি কি কর?”

সেই দিনই আমি তার পিত্রালয়ে গেলাম। ছোট একটি ছেলে দৌড়ে এসে বললে “জামাইবাবু দিদিকে আনলেন না?” আমি তাকে কাছে টেনে বললাম “না, দিদিকে আনি নি, দিদি যে তোমায় ডেকেছে!” সে যেন কত দিনের আশ্বাসের মত আমার কোলের উপর আপনার স্থানটুকু দখল করে বললে “কেন দিদি এলেন না? দিদি ত ভারী হুঁটু হয়েছেন!” বলতে বলতে বাবকের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে উঠল! আমি হেসে হেসে বললাম “বেশ ত দিদিকে তুমি খুব করে বকে নিও!”

তার পর যত কিছু অবাস্তব অসম্ভব কথা বলে আমাদের বেশ ভাব জমে উঠল। শেষে গাড়ীতে উঠে সে বলে “দেখুন জামাইবাবু, নতুন মা আমার বড় বকেন! ছোট থোকাকে কোলে করেছিলাম বলে মা আমার কাল মেরেছেন। দিদি থাকলে আমি কখনই মার খেতাম না। বাবাকে বললাম, তিনি আমার বলেন ‘তুমি যদি থোকাকে মেরে দিতে, লাগিয়ে দিতে—তখন কি হ’ত হুঁটু ছেলে!’ আমি বললাম—‘না বাবা, আমি যে থোকাকে ভালবাসি!’ বাবা সে কথা বিশ্বাস করলেন না।” এমন করে আমার মস্তবোর কোন অপেক্ষা না রেখে সে ক্রমাগতই তার ছোট জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ বর্ণনা করতে লাগল! আমি তাকে বললাম “হ্যাঁ থোকা,



তোমার নাম কি তাই যে এখনও শোনা হয় নি !” সে আমার হাতের মাঝে মুখ লুকিয়ে বলে “আমার নামটা কিন্তু ভাল নয় জামাইবাবু—হাস্তে পাবেন না ! আমার নাম হারাণ !” আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম “আর আমার নামটা বুঝি বড় ভাল ? আমার নাম যে ডাকু !” সে তার বালা-মধুর কণ্ঠে ‘খল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে বলে “বেশ হয়েছে জামাইবাবু, আমরা ছই জনে বন্ধু হলাম—কেমন ?” আমি লাগ্রহে তার সরলতা দেখছিলাম, আর মনে মনে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম—এই মাতৃহারা বালক এই বন্ধুহীন পৃথিবীতে আমার সখ্যতার কত সুখী হয়েছে !

গাড়ী গৃহদ্বারে দাঁড়াতেই হারাণ তার দিকিকে দেখবার আগ্রহে নাম্বার জন্তু অধীর হয়ে উঠল ! আমি তাকে কোলে করে শরনঘরে রাণীর কাছে গিয়ে বললাম “এই যে তোমার দিদি, হারাণ, এইবার দু’জনে গল্প কর !” সহাস্তে রাণীর দিকে চেয়ে আমি গৃহের বাহির হয়ে এলাম কিন্তু ভ্রাতাভগ্নির মিলনানন্দ দেখবার লোভ সঘরণ করতে না পেরে দ্বারের কাছে দাঁড়ালাম । রাণী হারাণকে কোলে বসিয়ে “হারু হীকু বলে বার বার চুশন করতে লাগল ! হারাণ দিদির গলা জড়িয়ে বললে “দিদি আর তুমি আমার ছাড়তে পাবে না ।” রাণী বললে “না ভাই, আর আমি তোকে ছাড়ব না !” আমি আর দেখতে পেলাম না, মুগ্ধ, বিহ্বল হয়ে বাহির বাটীতে চলে এলাম ।

তারপর আমার কর্মস্থানে যেতে হ’ল, রাণী ও হারাণকে সঙ্গে নিলাম । যাবার সময়ে মা মাথার দিবা দিয়ে বলে দিলেন “বোমাকে যেন কখনও বকিস্ নে, সুখে থাকিস আর সুখে রাখিস্ !” আমার মনের ভিতরে আসতে লাগল যে মা এখনও আমার বালা কালের স্বভাবের কথা বিস্মৃত হন নি ! আর বিস্মৃত না হবার কারণও হয়েছিল, কয়দিন আগে আমি আনাদের পুরাণ দায়কে সামান্য কারণে এত তিরস্কার করেছিলাম যে সে মার কাছে গিয়ে হুং করে অনেক কঁদেছিল ! পাশের ঘর থেকে শুন্লাম মা বলছেন “থাক থাক আর কঁাদিস্ নে দাই, জানিস্ ত ওর স্বভাবে ঐ একটা দোষ আছে ! বড় হয়েছে এখন আর কি বলব বল ? ছোট বেলায় ত ওর অনেক অত্যাচার হয়েছিল, আজ বড় বেলায় এ অবিচারও পেরে নে !” আমি জানি মা এমন করে অত্যধিক স্নেহে আমার প্রাণ দিয়ে এসেছেন ! মার কাছে কখনও তিরস্কার পাই নি, তাই যাবার দিনে মার ঐ উপদেশটিও যেন আমার কর্ণে তিরস্কারের মত বাজল ! আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম । মা কিন্তু সে দিন বলবার জন্তু কৃতসঙ্কর হয়েছিলেন তাই আমার পিঠে হাত রেখে বলেন “দেখ বাবা তুমি যদি এই স্বভাবটি ছাড়তে পার তবে আমি সত্যিই সুখী হব !” আমি দেখলাম মার চোখে অশ্রু ছল্ ছল্ করছে, যাবার দিন মনটা ব্যথিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার উপরে আর অমুরোধে স্থিতি না করে আমি মার চরণ ছুঁয়ে বললাম “এই যে তোমার পা ছুঁয়ে বলছি “মা, আমি এতদূর ছাড়ব, আমি তোমার সুখী করব !” মা আমার মাথা বুকের কাছে ধরে কপালে চুশন করলেন !

যে গ্রামে আমার চাকরী হ’ল তার নাম মহাদেবপুর । সেখানে গিয়ে নতুন করে সংসার পাতলাম, স্বপ্নবস্ত্রের মত আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল ! ছ’ বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল, ইতিমধ্যে একবার শিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছি । তখন রাণী বালিকাস্থলত লজ্জা ত্যাগ করে অজ্ঞাতে গৃহিণীর পদ গ্রহণ করেছে ! হারাণ আট বছরের ছেলে তার দিকিকে অচনিশি সঙ্গ দান করে ।

এক দিন আকস্মিক থেকে প্রত্যাগমন করে আমি বস্ত্র ত্যাগ করছি এমন সময়ে হারাণ এসে বলে “জামাইবাবু দেখি তোমার ঘড়ি, ক’টা বেজেছে !” আমি তখন ক্রোধ ত্যাগ কাতর ; বললাম “না হারাণ থাক,” তবু সে বলে “তোমার কষ্ট হবে জামাইবাবু ! আমি খুলে দেখি !” আমি অনমনস্কভাবে তার কথার উত্তর দিলাম না, সে

নিষিষ্ট মনে আমার কোটের পকেট থেকে ঘড়িটিকে বাহির করতে লাগল। আমি যখন হাতমুখ খোবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে হঠাৎ হারাণের হাত থেকে ঘড়িটি মাটিতে পড়ে চূরমার হয়ে গেল। হারাণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখখানি ভরে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি চড়া গলায় বললাম “এ কি করলি?” সে ভীত কণ্ঠে বলে “হাত থেকে ফস্কে গেল জামাইবাবু!” আমি তার ছোট হাত দু’খানি ধরে নাড়া দিয়ে বললাম “ফস্কে গেল! কে নিতে বলেছিল?” সে নীরবে অশ্রুপূর্ণ চোখে আমার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। এমন সময়ে রাণী ঘরে ঢুকে বলে “কেন গো কি হয়েছে?” আমি রাগতঃ স্বরে বললাম “কি আবার হবে? দেখনা তোমার ভাই কি কীত্তি করেছে!” রাণী মিনতিপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে “আমি থাক্ ছেলেমানুষ শুকে মাপ কর!” তার চোখে মুখে মার আদেশটা যেন ফুটে উঠেছে, আমি তাড়াতাড়ি তখন হারাণকে বললাম “আচ্ছা মাপ করলাম এবার, কিন্তু খবরদার আর যেন এমন না হয়।”

তারপর থেকে হারাণের ছোট ছোট ক্রটিগুলিও খুব গুরুতর অপরাধ বলে আমার মনে হতে লাগল। শাসনও সেই সঙ্গে বেড়ে চলল। রাণী বাধা দিলেই আমি বলতাম “তুমি দেখছি নাই দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খাবে!” রাণীও আর বাধা দিত না; তার উভয় সঙ্গী, — সে যদি ভাইয়ের পক্ষ নেয় তবে স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন, আবার আমার পক্ষ নিলে ভাইকে কষ্ট দিতে হবে, সেখানে যে রক্তের সম্বন্ধ! তাই আমি যখন হারাণের শাসনের ভার গ্রহণ করলাম তখন রাণী নিরপেক্ষভাবে সরে গেল, হারাণ কিন্তু তত বেশী করে তার দিদির আশ্রয় খুঁজতে লাগল। হঠাৎ আমি হারাণকে খুব বড় করে তুললাম, তার জীবনে এতগুলি বছরের পরও যে এই সব চাঞ্চল্য, ছুরত্বপূর্ণ যে কতদূর অশোভন, আর এয়ে রাণীর প্রাশ্রয়ে এত বছরেও সে তাগ করতে পারে নি, এই কথাই আমি রাণীকে বুঝিয়ে দিলাম। রাণী ‘হাঁ না’ কিছুই বলত না, নির্বাক হয়ে আমার কথা শুনত, তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেত!

একদিন আমি বললাম “রাণি, হারাণের ত কিছুই লেখাপড়া হচ্ছে না, এখানে ইস্কুলও নেই, যে দেব। আমি বলি আমি ওর পড়ানর ভার নিচ্ছি, অফিস থেকে ফিরে ওকে পড়াব।” এর পর রাণীর ‘না’ বলা শোভা পায় না; সে মুহূর্ত্তে বলে “বেশ্ ত তোমার কাছে পড়লে ও খুব ভালই শিখবে।” কিন্তু রাণীর মুখে কালিমার ছায়া পড়ল। আমি হারাণের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলাম। আমি যখন ছোট বারাণ্ডায় হারাণকে পড়াতে বসতাম তখন রাণী ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকত। হারাণের ভার আমার উপরে দিয়ে সে কোনমতে নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহকাজ করতে পারত না। যখন হারাণকে আমি তিরস্কার করতাম, সে কাতর চোখে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করত, দিদি যে ওর কাছাকাছি কোথাও আছে এই চিন্তাই তাকে আশ্রয় করত! একদিন হারাণের পড়া কেবলি ভুল হতে লাগল, আমি প্রথমে কোন রকমে বৈধা ধারণ করে সংশোধন করে দিতে লাগলাম, কিন্তু ক্রমে আমার ধৈর্যচ্যুতি হ’ল, ক্রোধ জাগ্রত হ’ল, আমি ক্রোধে উন্মত্ত হলাম। আমি প্রতিজ্ঞা বিষ্মত হয়ে হারাণের গণ্ডে গণ্ডে চপেটাঘাত করলাম, তার কোমল গণ্ডে আমার নিষ্ঠুর আঙ্গুলের ছাপ এঁকে নিলে, তখন তা আমার ক্রোধের মত রক্তবর্ণ হয়ে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তার দিদি ঘোড়ে এসে ব্যাথিত ভাইকে বুকের ভিতর টেনে নিলে, আর আবার প্রতি যে করুণ ভীত কম্পিত দৃষ্টিতে চাইলে সে দৃষ্টি এখনও আমার বুকে বিধে আছে! সেই দিনই হারাণের অরবিকার হ’ল, ত্রাতাভয়িতে একটি কক্ষ আশ্রয় নিলে, আমি প্রবেশ করলে রাণী ভীত হরিণীর মত দ্রুত হয়ে উঠত। অনুশোচনায় আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। একটুখানি আত্মসংযমের অভাব আমি যে এতখানি বিজ্ঞাত বাধিয়েছি, এ আমি দিনে রাত্রে কোনমতে ভুলতে পারছিলাম না। সেদিন রাত্রে পার্শ্বের ঘরে

শয়ন করে শয্যা আমার অসহ্য বোধ হ'ল ; হারাণের প্রলাপ শোনা যাচ্ছিল—“ও জামাইবাবু, আর না !” আমার মনে হ'ল প্রতিজ্ঞার কথা—মার কাছে সেই প্রতিশ্রুতি, মার সেই আনন্দ, মার সেই স্নেহচুষন ! অত পবিত্র চুষনের অপমান করলাম ! আমার হৃদয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল, মার স্নেহের অপমান করোঁছ, এই চিন্তা আমায় অতিষ্ঠ করে তুললে। আমি রোগীর ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম—হারাণ দুই বাহু দিয়ে রাণীর বক্ষ আঁকড়ে পড়ে আছে, রাণী এক হাতে তাকে আলিঙ্গন করে অন্ত হাতে বীজন করছে ! হারাণ প্রলাপের ঘোরের যতই ‘মা মা’ বলে চীৎকার করছিল, রাণী বার বার তার উদ্ভৃষ্ট ললাটে চুষন করে বলছিল—“এই যে আমি তোরা মা !” তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল ! আমায় দেখে রাণী যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি বললে “তুমি কেন এলে ? হাত জাগলে যে শরীর খারাপ হবে !” আমি মিনতির স্বরে বললাম—“না রাণি, আমার শরীর খারাপ হবে না, হারাণের জর কি বেড়েছে ? ডাক্তারকে একবার ডেকে পাঠাই, কি বল ?” রাণী তখন বললে “এখনি তাঁকে ডেকে পাঠাও, আমার বড় ভয় করছে !” আমি ডাক্তারের কাছে সংবাদ দিয়ে রোগীর ঘরে ফিরে এলাম। আমি রাণীকে বললাম—“আমি হারাণের কাছে বসি তুমি একটু খুনিয়ে নাও ! রাণী কাতর-কণ্ঠে বললে “না না না আমি ঘুমতে পারব না ! ওকে ফেলে আমি এক দণ্ড নিশ্চিন্ত হতে পারব না !” আমার মনে হ'ল রাণী আমার উপর বিশ্বাস করতে না পেরে এমন কথা বলছে, আমার বুকে শেল বাজল ! আমি ব্যথিত স্বরে বললাম—“না রাণি, আর আমায় ভয় করো না ! এই আমার শেষ অপরাধ !” রাণী নিশ্চল নির্বাক হয়ে বসে রইল ! হারাণ আবার জরের ঘোরের চীৎকার করে উঠল—“ও জামাইবাবু আর মেরো না !” রাণী তাকে বুকের কাছে দোণ দিয়ে বললে “কে মারবে যাহু, এই যে দিদির বুকে রয়েছে !” আমি অসহ্য বেদনায় ঘরে পান-চারণা করছিলাম ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি করে অতীত হয়ে যাচ্ছিল ! হঠাৎ হারাণ তার রক্তবর্ণ চক্ষুটি বিস্ফারিত করে বললে—“কই দিদি যাই তবে যাই !” আমি দৌড়ে গিয়ে হারাণকে রাণীর কোল থেকে টেনে নিলাম ! হারাণের প্রাণহীন দেহখানি আমার বাহুর উপরে ঝুলে পড়ল, রাণী তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে স্থির হয়ে আছে ! আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম “হারাণ বাবা আমার ফিরে আস ফিরে আস !”

বডিতে ঢং-ঢং করে চারিটা বাজল, দ্বারের কাছে ভূত্যের কণ্ঠ শোনা গেল “হজুর ডাক্তারবাবু এলেন !”

## মুড়ি

—:~:—

তোমরা বিস্কুট খাও করে টিণে ভরা

বছরের পুরাতন পরশন দুধী,

কচুরী সিঙারা লুচি দোকানের গড়া

খাও সবে তোমাদের যার মত খুসী।

আমি চাই কড়কড়ে টাটকা ও মুড়ি  
 যতনে গুহিতে ভাজা, ধবধপে সাদা,  
 কমলার বাগানের যুগিকার কুঁড়ি  
 তেলমাখা সাথে তার কুঁচি কত আদা।  
 মুলা, কি মটরশুটী শশা কি কাঁকুর  
 লক্ষা কি মরিচ সাথে আরো লাগে মিঠে,  
 কি মধুর মতিচূর দিয়েছ ঠাণ্ডা—!  
 প্রিয় যেন আপনার পৈত্রিক ভিটে।  
 চিরদিন দিতে পারি এই করো নাথ  
 অতিথিরে যেন আমি মুড়ি আর ভাত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

## বঙ্গলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার।

বঙ্গলা ভাষার সংস্কৃত অংশে শব্দাদির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্গলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির নিকট যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনেক সময়ে হার মানিতে হয় তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। কতকগুলি শব্দ মূলতঃ সংস্কৃত হইলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উপেক্ষা করিয়া ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও এগুলিকে সাধারণ গ্রহণ করিয়া ইহাদের মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতে পাইতেছি যে এক সম্প্রদায়ের লেখক ও সমালোচক এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভাষা হইতে বহিস্কার করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্থল কলেজে পাঠ্য ব্যাকরণগুলিতেও এই পন্থা অবলম্বিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহারা বঙ্গলা ভাষার কর্ণধার, তাহাদের বোধ হয় ধারণা এই যে, বঙ্গলা সংস্কৃতের কন্যা, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে বঙ্গলাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় ভাষার সমূহ অনিষ্টই করা হইতেছে। পূর্বেও আমি একাধিকবার এই কথা বলিয়াছি। আজ প্রথমে কয়েকটি তথাকথিত অন্তর্ভুক্ত শব্দ লইয়া আলোচনা করিব। সেগুলিকে যে প্রকৃত পক্ষে অন্তর্ভুক্ত মনে করিবার কারণ নাই, এবং শুধু কথিত ভাষার নর—লিখিত ভাষাতেও যে সেগুলিকে চালাইতে পারা যায় তাহাষ্ট দেখাইতে অগ্রসর হইব।

ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে, ইতিবসরে—এই শব্দগুলিকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বরণান্ত করিয়া ইহাদের স্থলে ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্বে প্রভৃতি বাহাল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং কেহ কেহ ইহা কার্যে পরিণতও করিতেছেন। কিন্তু

‘ইতি’কে ‘ইতঃ’র অপভ্রংশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হানি কি? কথিত ভাষায় অপভ্রংশ প্রয়োগ অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বাগ্‌ভটালঙ্কারেই বচন আছে—

‘অপভ্রংশস্ত যচ্ছব্দং তত্তদ্রূপেণৈব ভাষিতম্।’

প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্ততঃ অর্থে ‘ইতিউতি’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ‘পাগলের ন্যায় কভু ইতিউতি চায়।’ গোবিন্দ দাসের করচা ( শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয়, বঙ্গভাষা সাহিত্য ৩১০ পৃষ্ঠা ) বৈষ্ণব পদাবলীতেও ইতিউতি পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে ভাষা চর্চাতে বিতাড়িত করিয়া ইতঃপূর্বে, ইতিমধ্যে চালাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই এই সকল ‘অশুদ্ধ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, বঙ্কিমচন্দ্রে, ‘তুমি যে মিথ্যাবাদিনী তাহা আমি ইতিপূর্বেই শুনিতে পাইয়াছি।’— ( মৃণালিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ )।

সশঙ্কিত, সক্ষম—এই সকল শব্দের গোড়ায় স সৌন্দর্য সবারূপ প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত ‘সভসা সাদেশঃ’ নয়, কিন্তু উত্তম, অত্যন্ত, বিশেষরূপে প্রভৃতি অর্থবাহক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অব্যয় ‘সু’র বিকৃত রূপ; অর্থাৎ ‘সক্ষম’, ‘সশঙ্কিত’ প্রকৃত পক্ষে ‘সুক্ষম’ ( বিশেষ রূপে ক্ষম বা সমর্থ ), ‘সুশঙ্কিত’ ( বিলক্ষণ শঙ্কিত )। ‘সঠিক’ শব্দ ( ঠিক সংস্কৃত না হইলেও ) এই জাতীয়। যোগেশবাবু তাহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে ‘বক্ষ্যমাণ পদগুলি উক্তরূপে নিম্পন্ন করিয়াছেন। ( বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ২৩৫ পৃষ্ঠা )। এবং ইহাতে দোষ ধরিবার কিছুই দেখিতে পাই না। সুতরাং এই সকল শব্দ অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই। শুধু তাহাই নহে। ‘সশঙ্কিত’ বলিয়া আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তাহা ‘শঙ্কিত’ শব্দে বাক্ত হয় না।

মনান্তর, মনসাধ, মনান্তন,—এই সকল সমাসবদ্ধ শব্দে সংস্কৃত অস্ ভাগান্ত মনস্ শব্দের বিসর্গ ঘনিয়া গিয়া বাঙ্গালায় বিসর্গহীন মন শব্দ হইয়াছে। অতঃপর সমাসে মনান্তর, মনসাধ হইতে বাধা নাই। এইরূপ উস্ ভাগান্ত চক্ষুঃ আয়ুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গের লোপ হইয়া সমাসে চক্ষুরজ্জ্বা, চক্ষুরোগ, আয়ুক্ষর, আয়ুধীন প্রভৃতি সমস্ত পদ নিম্পন্ন হইয়াছে। এসব শব্দ অশুদ্ধ বলিলে চলিবে না।

একত্রিত—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এই শব্দটি অশুদ্ধ। যোগেশবাবু বলেন, ‘সং একত্রীকৃত হইতে বাৎ একত্রিত’ ( বাৎ বা, ১৫২ পৃষ্ঠা )। কিন্তু সংস্কৃতে ‘একত্রীকৃত’ পদ কি শুদ্ধ? অব্যয় ‘একত্র’ পদের উদ্ভব কোন প্রত্যয় চলে কি? আমরা বলি, সংস্কৃতির দোহাই দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ‘একত্রিত’ শব্দটি বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত, সুতরাং ইহাকে তাড়াইতে পাণ বাইবে না।

ক্টিয়া, বশব্দ, সম্বাদ—যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ক্টিয়া, বশব্দ, সম্বাদ ইত্যাদি বানানই শুদ্ধ, তথাপি যদি কেহ প্রচলিত বানান অনুসরণ করে তাহা হইলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যোগেশবাবু বলেন, ‘আমরা এই সকল শব্দ ম দিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, অতএব ম লেখা বরং শুদ্ধ।’ ( বাৎ, বা, ২১৩ পৃষ্ঠা )।

কেবলমাত্র সদাসর্বদা, সমতুলা—এই সকল স্থলে একাধিবোধক দুইটি শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ ব্যবহারে আর মনোগত ভাবটিতে যে একটু জোর ( emphasis ) দেওয়া হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্থানবিশেষে এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ বলা যায় না। বিশেষ্য পদেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, বলহবিবাদ, স্বাদবিস্বাদ, বিপদআপদ, ভোক্তাঙ্গম, ( বাবনিক ) ইত্যাদি।

কাজ—প্রাকৃত কজ্জ হঠতে উৎপন্ন, সং ‘কার্ধ্য’ হইতে নহে, স্মৃতিরূপে শুদ্ধ।

স্বপ্ন—সাতিতো খুব প্রচলিত; স্মৃতিরূপে ইহার বিস্তৃতি সঘনক্কে আপত্তি করিলে চলিবে না। সর্জন অসহ।

বাহ্যিক—মৌখিক ভাষায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সাতিতোও চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতে অশুদ্ধ বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় চালাইলে দোষের হয় না, কারণ বাঙ্গলা সংস্কৃত নহে।

আবশ্যকীয়—বাঙ্গলায় ‘আবশ্যক’ শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতেও সম্ভবতঃ হইয়া থাকে। স্মৃতিরূপে আবশ্যকীয় অশুদ্ধ নহে।

সাধাণীত ও আরম্ভাণীত—এসব স্থলে সাধা, আরম্ভ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গলায় যে যাহা লিখিবে তাহাই শুদ্ধ। আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাই যে বাঙ্গলায় যে-সকল শব্দ বহুকাল হঠতে চলিয়া আসিয়াছে ভাষায় সেগুলির একটি চিরস্থায়ী অধিকার কামিয়া গিয়াছে। এখন সংস্কৃত ব্যাকরণের নজির দেখাইয়া সেগুলিকে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করা অসঙ্গত। এবং তাহা হইলে প্রাক্ত অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে। কারণ তাহা হইলে ‘কৃষক’ ও ‘পর্য্যটক’ পর্য্যন্ত টিকিতে পারে না। ‘কৃষক’ ও ‘পর্য্যটক’ আমদানি করিতে হয়। কিন্তু যাঁগরা সংস্কৃতের অজ্ঞতাবশতঃ বা ‘তা’ লিখিবেন তাঁহাদিগকে ভাষাভ্রমণী কন্যা কহিবেন না। ভাবার্থ বাচক ক্ষাপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর পুনরায় তা-প্রত্যয় বর্ণা - সৌভূত্যা, বাহ্যাত্যা, অধিকাত্যা প্রভৃতি; সন্ধির বা ব্যুৎপত্তির শাক্ত-সম্পাদন বর্ণা, মনোবাক্ত, সন্তোপ্রাক্তি, সন্তত, ইয়ত্যা প্রভৃতি; পুংলিঙ্গ বা ক্রীবে লঙ্গ শব্দের ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ, যথা—অমৃতনিজ্জন্মিনী প্রবক্ত, মোহনৌ সঙ্গীত, মহতী মতিমা, (‘রাজ কুমারী, রামার মেয়ে, মহতী তব মতিমা’—‘অপরাজিতা’ ৫৬ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি।\* সমাসে বা তদ্ধিৎ প্রত্যয়ে ইন্ ভাগান্ত শব্দগুলি ঈকারান্ত করিয়া লেখা, যথা—গুণীগণ, মনোহারীত্ব, ধনশালীতা ইত্যাদি,—এই সকল এবং এই প্রকারের অশুদ্ধ প্রয়োগ কখনই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ইংরাজিনবীশেরা আর এক প্রকারে ভাষার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক সময়ে একরূপ শব্দ ও বাক্য ইংরাজি হইতে অনুবাদ কবিয়া বাঙ্গলায় চালাইয়া থাকেন যেগুলি সম্পূর্ণ ইংরাজিগন্ধী। ইংরাজিতে অনতিজ্ঞ বাঙ্গালী সেরূপ বঙ্গলা বুঝিতেই পারিবে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব ইংরাজি ওয়ালাদের লক্ষ্য করিয়া একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

“একদল ‘চন্দ্রাহত’ সাহিত্যিক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা ‘শুশ্রূষাবনে’ ‘অভ্যাসের দাস’ হইয়া ‘লেখনীর লাগাম খুলিয়া দিয়া’ ‘সাধারণ আত্ম’ (public spirit) দেখাইয়া ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার সাধনা করিতেছেন, এবং ‘স্ববর্ণময় সুবোগ’ পাইয়া ‘চা-বাটিতে তুফান তুলিয়া’ ‘অশুকুল গাওয়ায় পাল খাটাইয়া’ নিতান্ত ‘লোহচেতা’ হইয়া ভাষাটাকে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্ত মহাযাত্রা করিয়াছেন।”

এই জাতীয় ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার আরও দু’একটি উদাহরণ নিয়ে দিতেছি:—

গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম যে টেবিলের উপর ‘একখান চিঠি আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে’।

‘আনি সত্যের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া’ এই কথা বলিতেছি।

\* কিন্তু ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ব্যক্তিবাচক না হইলে বিশেষণ ত্রীলিঙ্গে নাও হইতে পারে, যথা—উদর প্রকৃতি

রজনীনাথ 'আপনার সময়ে' উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।— পোদ্দুপুত্র ।

যখন হাত্তরস উদ্দেশ্যের জন্য একপ ভাষা ব্যবহৃত হয় তখন অবশ্য তাহা দৃশ্যীয় বলা যাইতে পারেনা ( যদিও সকলের তাহা বোধগম্য না হইতে পারে ) । যথা—তিনি চীৎকার করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিলেন, 'অন্ত স্থানে আপনারা ঢালের অন্ত দিক দেখিবেন।' ( নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন', প্রথম ভাগ, ১৪৯ পৃঃ )! নটরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার কোন কোন প্রহসনে একপ ভাষার সাহায্যে যথেষ্ট হাত্তরসের অবতারণা করিয়াছেন ।

প্রবন্ধান্তরে আধুনিক নব্য সাহিত্যিকগণের বিচিত্র রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব ।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ।

## স্বরলিপি ।

—:~:—

ইমন ভূপালী (?)—তেওরা ।

বাদল এল উদল গারে

আজি বরিষায়

নুপুর ধ্বনি বাজল যেন কাহার পায়ে পায় ।

নিঝুম্ দিবা নীরব রাত্রি

নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের ভাতি—

এই যে এল এলোকেশে

আজি এ ধরায়

পথিক হেন আসে ধীরে সজল চোখে চার

গান ও সুর—শ্রীউমিটান গুপ্ত ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ।

॥ সা' সা' ১ | না- ধা | ধা- পা I পধা পা -১ | জা- গা | গা- রা I যগা গা রা |  
বা দল্ . এ . ল . উ দল্ . গা . যে . আ জি .

| রা- না | না- রা I সা -১ -১ | -১ -১ | ১ ১ I সা রা -১ | গা -১ | গা -১  
ব . রি . বা . . . . . নু পুর . ধ্ব . নি .

I গা -১ গা | গা- রা | গা -১ I গা গা -রা | গা- রা | গা সা' I সা' -১ -১ |  
বা জ্ ল যে . ন . কা হা র্ না . যে . পা . . .

-১ -১ | -১ -১ II

I {সা সা -১ | সা -১ | সা- না I গনা না না | ধা -১ | পা -১ I সা সা সা  
 নিঃ স্ত্র / ম্ দি • বা • নো র ব রা • তি • নি বি রে  
 রা -গা | গা -১ I গা গা গা | গা -১ | গা -১ I I { গনা- পা-১ | পা- জ্ঞা  
 দি • রে • চা দে র ভা • তি • এই • যে এ •  
 | পা- জ্ঞা I জ্ঞা পা-১ | জ্ঞা -গা | গা -১ I গনা না -১ | ধা -১ | পা -১  
 ল • এ গো • কে • শে • আ বি • এ • ধ •  
 I গগা -১ -রা | -সা -১ | ( পা -১ ) I } -১ -১ I সা রা -১ | গা -১ | গা -১  
 রা • • • • ( • র ) • র প ধি ক • হে • ন  
 I গা গা -রা | গা রা | গা -১ I গা গা -রা | গা -রা | গা -১ | গনা -১ -১ | -১ -১ | -১ -১ II  
 আ সে • ধী • রে • স জ ল্ চো • শে • চা • • • • র •

## সম্মিলনের যাত্রীর ডায়রী ।

এবার বৈশাখ মাসের পরলা তারিখে রাত্রিতে খাইবার সময় একটা ব্যাঘাত ঘটয়াছিল তাই বৈশাখে সম্মিলনে বাইব কিনা ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম । অভ্যর্থনা সমিতির সাহিত্য-শাখার সম্পাদক কীৰ্ত্তিক গিরিজানাথ বসু মহাশয়ের আস্থানে প্রথমে কোন প্রবন্ধ দিতে স্বীকৃত হই নাই কারণ সম্মিলনে দুইবার প্রবন্ধ দিয়া দেখিয়াছি বক্তব্য বিষয়ের কিছুই পড়া হয় না অথচ সভাপতি মহাশয়ের ঘণ্টা পড়ে । শেষে গিরিজাবাবুর অনুরোধে প্রবন্ধও লিখিলাম এবং বাকীপুর স্বহস্ত পরিষদের বহু ব্যক্তি প্রতিনিধিরূপে নাম ছাপাইলেও কেহই বাইতেছে না দেখিয়া আমি আমার জন্মবারে ( বৃহস্পতিবার ) বেলা সাড়ে দশটার ট্রেনে চৃতীয় শ্রেণীতে রওনা হইলাম । মনে কেমন একটা খটকা লাগিয়াছিল—ভাবিতেছিলাম কোনরূপে হাওড়ার উপস্থিত হইলেই বাঁচি । সমস্ত রাত্রি ট্রেনের বাহিরে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বসিয়াছিলাম । কেবল রাত্রিতে খানিকক্ষণের জন্য রোলান বিহানার একটু শুইয়াছিলাম ।

১ম ও ২য় সম্মিলনের কথা জানিতাম না বা নিরত্ন পাই নাই, ৩য় সম্মিলনে বাইতে ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের বর্ধমানের জুলে ৮সংস্কৃতি পুজার জন্য বাইতে পারি নাই । ৪র্থ সম্মিলনের স্থান দূর বলিয়া বাই নাই । তৎপরে পঞ্চম সম্মিলন হইতেই আমি সম্মিলনের রীতিমত যাত্রী, তবে ঢাকার খাইবার খুব ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাচক্রে বাইতে



পারি নাই। এক চুঁচুড়া সন্মিলনে ভিন্ন অন্য সমস্ত সন্মিলনে যোগদানের ফলে অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিতে হইয়াছিল। যে যে সন্মিলনে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছি সেইখানেই “অর্ধচন্দ্র”কে নীরবে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে, তথাপি সন্মিলনে যোগদান করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু এবার আমার ভাল করিয়া সাধ মিটিয়াছে—দোষ কাহারও নহে, আমার কর্মফলেই একরূপ ঘটিয়াছে।

পূর্বে অধ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখি “ধাইতেছি।” পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্র পাইয়া লিখি “গুরুবার প্রাতঃকালে ১৮ ডাউন ট্রেনে ৫টা ৫৭ মিনিটের সময় হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইব। যদি এদিন প্রতিনিধিদের আহ্বারের ব্যবস্থা না থাকে, জরুরী হইলে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া সংবাদ দিলে আমি কলিকাতায় বাইব।” এই পত্রের সঙ্গে আমার ২য় প্রবন্ধ পাঠাই। স্টেশনে গিয়া দেখি কোন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত নাই। পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি গিরিজাবাবুকে লাহিড়ী মহাশয় কোন প্রবন্ধও দেন নাই।

বিধানার বাণ্ডুলিট বগলদাবা করিয়া বাগটি হাতে লইয়া একটু ভাবিলাম কি করি, কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম হাওড়া স্টেশনের উত্তর দিকে তেতালা বাড়ীতে প্রতিনিধিদের থাকিবার স্থান হইয়াছে। সেই বাড়ীটাতে কোন মাড়োয়ারীর নাম লেখা দেখিয়া আমি ভাবিতাম এটা ধর্মশালা। তাই খ নিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া যখন দেখিলাম কোন স্বেচ্ছাসেবক আসিল না তখন একজন কুলিকে বলিলাম—আমাকে ধর্মশালায় নিয়ে চল। সে যখন উত্তর দিকের তেতালা বাড়ী ছাড়াইয়া চলিল তখন জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেটা ধর্মশালা নয়। তৎপরে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম তেতালায় উপরের ঘর সভার জন্য লওয়া হইয়াছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া তেতালায় ঘরগুলির দিকে চাহিয়া দেখি, সেগুলি জনমানব শূন্য। তখন ধর্মশালায় ফিরিয়া গেলাম। সেখানে একটি ঘর খুলিয়া দিলে জিনিষগুলি রাখিয়া দিয়া যখন ঘরের চাবি চাছিলাম, তখন চাবিওয়ালা বলিল, “এক চাবিতে অনেক তালা খোলে সুতরাং এ চাবি আপনাকে দিত পারি না। আপনার নিজের তালা চাবি বাহির করুন।” আমার ধর্মশালার সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানে থাকিতে হইবে জানিলে তালা লইয়া বাইতাম। কি করি, শেষে বিধানা দরোয়ানের ঘরে রাখিয়া বাগটি হাতে করিয়া হাওড়ার নয়দান খুঁজিতে চলিলাম। হাওড়া স্টেশনের যে গভারব্রিড্জের উপর দিয়া ট্রামলাইন গিয়াছে তাহার উপরে একটু গিয়া ছয় জন স্বেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ পাইলাম। আমি বাঁকীপুর হইতে আগত প্রতিনিধি, একথা জানাইলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাকে হাওড়া ময়দানের পথ দেখাইয়া দিয়া স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিলেন। আমি ময়দানে গিয়া মণ্ডপের বাহিরে জনকয়েক বালক ও যুবককে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিলে জনৈক বালক আমাকে সঙ্গে করিয়া মণ্ডপের মধ্যে একস্থানে বসাইয়া কোন কর্মচারীকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিল। আমি ঘরটিব একদিকে দেখি স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি নানারূপ উপদেশ দিয়া হুকুম জারি করা হইয়াছে যথা “যে সকল স্বেচ্ছাসেবক হাজিরা লইবার সময় বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকিবে, তাহাদের নাম স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে।” অন্য এক স্থানে দেখি অনুপস্থিতির জন্য ১৩৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহির হইয়া দেখি মধ্যে প্রকাশ্য মণ্ডপে বৈদ্যাতিক আলো ও পাখা খাটান হইয়াছে, মণ্ডপের একদিকে টেবলের মত বিস্তীর্ণ মঞ্চ। মণ্ডপ নানারকম রত্নবেরঙের কাপড় দিয়া সাজান হইতেছে। চারিদিকে সারি সারি করিয়া যোগলার, ঢোলার প্রদর্শনীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধ। কোন কোন কক্ষে প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তখনও অধিকাংশ কক্ষ শূন্য।

একটু পরে স্বেচ্ছাসেবক বালকটি আসিয়া আমাকে একখানি ঘোড় গাড়ীতে বসাইয়া ধর্মশালায় চলিল। সেখান হইতে আমার বিজ্ঞান লাইব্রারীতে ফুল উপস্থিত হইল। স্কুলের অধিকাংশ ঘর নতুন হইয়াছে, গৃহটি দোতালার। প্রতিনিধিদের বাসের জন্য বৈচিত্র্যিক আলো ও পাথার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁইবামাত্র “৬১” দিবস আজ্ঞা হইলে আমি সবিনয়ে জানাটলাম “ও বস্তুটা আমি খাই না।” আমার সঙ্গে একটা কুজো ছিল। জল আনাইয়া হাঁকার পুরিয়া তামাক সাজিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম। তখন বাসটিতে আমি একমাত্র প্রতিনিধি। খানিকক্ষণ পরে মেদিনীপুরের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলেন। তিনিও টেশনে কোন স্বেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎ না পাইয়া কিছু সুস্থিরে পড়িয়াছিলেন। পূর্ণদিন বেলা ৯টার সময় ভাত খাইয়াছিলাম, রাস্তার তেমন হিদে পাও নাই, সামান্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়া দিবসের অবশিষ্ট ভাগ কাটাষ্টয়াছি। স্তত্রায় ক্ষুধার তাড়না যখন অসহ্য হইল তখন জজার মাথা খাইয়া নিঃশব্দে জলখাবার চাহিলাম। আধ ঘণ্টা পরে ৪টি রসগোল্লা ও ৪টি সন্দেশ আসিল। চটপট করিয়া সেগুলি উদরসাৎ করিলাম। তাৎপরে ঘানের বোগাড় করিতেছি। গায়ের কাপড়চোপড় খুলিয়া বসিয়া আছি। ডাক্তারবাবু আসিলেন। হঠাৎ শরীরের দিকে তাকাইয়া দেখি পেটে একটা ছোট ফোঁস। মনে পড়িল রাত্রিতে মাথায় একটি ও গোঁফে একটি ব্যারের নতুন হইয়াছে। ডাক্তারবাবু ক সেগুলি দেখাইলাম। আমার গারে হাতে বাথ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, সে সব কিছু নাই। বৈকালে আবার দেখিব বলিয়া ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে মেদিনীপুর হইতে ৬৭ জন প্রতিনিধি আসিলেন। কেবলমাত্র পূর্ণদিন বসার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আহারে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল কিন্তু উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিনিধিদের আহারের ভার লইয়াছিলেন স্তত্রায় কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। যে কয়দিন প্রতিনিধিরা ছিলেন, দুইবেলা চা, জলখাবার, দিনে ভাত, রাত্রে লুচি, তামাক, সিগারেট, চুরুট, পান এবং চাকর ও স্বেচ্ছা সেবকদের সেবা প্রতিনিধিরা যথারীতি পাইয়া ছিলেন। শুনিলাম বাঁটরায় একটি অনাথবন্ধু সমিতি আছে তাহাতে বহু অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য করা হয়। এখানকার স্বেচ্ছাসেবকগণ অধিকাংশই সেই সমিতির জন্ত তিস্তা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিখাখালা লাইট রেলওয়ের জংসন ষ্টেশন করমতলা বাঁটরা স্কুল হইতে আঁত নিকটে; চারিটার সময় দেশপূজা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রদর্শনী খুলিবেন বলিয়া আমরা কয়জন প্রতিনিধি ট্রোপে করমতলা হইতে হাওড়ার ময়দান ষ্টেশনে আসিলাম। যথাসময়ে বক্তৃতার পরে প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইল। একটি কৃত্ত জিনিষের প্রতি আমার দৃষ্টি গেল। ফরিদপুর জেলা হইতে আগত জনৈক মুসলমান-শিক্ষা দুই প্রকারের নিব আনিয়াছিল। পিতলের নিবগুলিতে বেশ সজ্জা লেখা হয়, বিলাতী ‘জি’ (G) নিবের মতন এবং ষ্টিলের নিব ‘জে’ (J) নিবের মতন। আমি নয় পরমা দিয়া এক ডজন পিতলের নিব কিনিলাম। সেই নিবে আমি কয়েক দিন হইতে চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি লিখিতেছি, সুন্দর লেখা হইতেছে। “রেড ইক” নিবের মত নরম নয়, বেশ কঠিন, সহজে খারাপ হয় বলিয়া মনে হয় না। শিল্পী বলিল “আমি যেকোন গতিক দেখিতেছি তাহাতে আমার বাস্তবায়িত ও আহাৰ্য্য বাবত যে খরচ হইবে তাহা নিব বিক্রয় করিয়া পাইব না। আমি কাল থাকিব না, কলিকাতায় দোকানদারদের নিকট আমার জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিব।” আনি বলিলাম “কাল বহুলোকের সমাগম হইবে, কাল থাকিলে তিনিদের প্রচার হইবে।”। কৃত্ত পরদিন দেখি শিল্পীর কক্ষ শূন্য।

প্রদর্শনী দেখিরা কলিকাতা গেলাম। মানসী-কার্যালয়ে একবার দর্শন দিয়া প্রসিদ্ধ সাংগীতিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিরা আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্তা বলিরা রাত্রি প্রায় ১০টার সময় বাসায় ফিরিরা আসিলাম। মেদিনীপুরের প্রতিনিধিগণকে পরিবহনের শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া সংযুক্ত মুচ্ছকটকের অভিনয় দেখিবার জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য বাসায় আসিয়া দেখিলাম আরও কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়াছেন। শরীরটা বড় ক্লান্ত বলিরা কাহারও সহিত তেমন আলাপ করিলাম না। আহা রাস্তাে শরন করিলাম। সমস্ত রাত্রি কফ উঠিতে লাগিল, মাথা ভার বোধ হইতে লাগিল, তাবিলাম বৈদ্যাতিক পান্যর নীচে শুইয়া আছি বলিয়াই একুণ হইতেছে।

সকালে আরও কয়েকজন প্রতিনিধি আসিলেন। সকলকে চা দেওয়া হইতে লাগিল, আমার গলাটাতে কেমন ব্যথা বোধ হইতে লাগিল বলিরা আমি একটু গরম দুধ চাহিলাম। সম্ভবতঃ জমাটহু দিয়া চা তৈরি হইতেছিল, তাই দুধ চাহিলে বাজারে দুধ কিংবার জন্ত লোক জেরিত হইল। পাঁচ আনা সের দরে খাঁড়ি দুধ আসিল। আমাকে একটা কাপে করিয়া দুধ দেওয়া হইয়াছে, আমি খাইতেছি; অপর একজন প্রতিনিধিকে অবশিষ্ট দুধ, তিনি সংযোগে দেওয়া হইল। জনৈক ভদ্রলোক আমার দুধ স্মরণ করিবার জন্ত সেই তিনি মিশ্রিত দুধ কিঞ্চিৎ আমার পাতে ঢালিয়া দিলেন। খাইয়া দেখি তাহা চিনি নহে, লবণ। অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া পানী দেখিতে ফাহির হইলাম। শ্রীমসিপদ (বানানটা ঠিক জানিনা) মল্লিক নামক জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক আমাদের নেতা হইলেন। নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা বাহাচরণ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। টান জনৈক সঙ্গতিপর বাবুসাহী। অসিবাবু বলিলেন “এই বাড়ীতে আপনাদের জন্ত অপেরার গান হইবে, জন্ত প্রহর করিয়া শুনিতে আসিবেন।” আমি বহুদিন অপেরার গান শুনি নাই বলিরা আমার একান্ত ইচ্ছা হইল গান শুনিতেই হইবে। আমার অদৃষ্টবিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হাসিলেন।

বাসায় ফিরিয়া দেখি আরও অনেকগুলি প্রতিনিধি আসিয়াছেন তন্মধ্যে আমার পরিচিতও কয়েকজন আছেন। পূর্কদিন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় সাহিত্য শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়ের সহিত আলাপে বুঝিয়াছিলাম আমার প্রথম প্রবন্ধ “অভীতে ল” পাইয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধ “বাজলার বাচাস্তর” পান নাই। সেটা সাধারণ সম্পাদক লাহিড়ী মহাশয়ের নামে পাঠাই। সেই প্রবন্ধের সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলাম আমি কোন্ টেপে হাওড়ার পৌছিব। প্রবন্ধও পৌছে নাই, বেজ্যাসেবকও পৌছে নাই। বাহা হউক গিরিজা বাবু আমাকে পূর্কদিন সন্ধ্যার প্রবন্ধ চাহিয়া ছিলেন কিন্তু আমি রাত্রি দশটার ফিরিব বলিরা প্রবন্ধ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে গিরিজা বাবুর নিকট ঘাইতে উদ্ভত হইলে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বলিলেন “ব্যাটরা হইতে শিবপুরে গিয়া গিরিজা বাবুর বাসা চেনা আপনার পক্ষে চকর হইবে।” কাজেই নিরস্ত হইতে হইল। তাই তাড়াতাড়ি আহা করিয়া আমি একাই সাড়ে দশটার টেপে কদমতলা হইতে মণ্ডপে আসিয়া গিরিজা বাবুকে প্রবন্ধ দিলাম ও বলিলাম “এ-প্রবন্ধ আমি পড়িতে চাই না হতা পঠিত বলিরা গৃহীত হইবে।” তিনি প্রবন্ধটি পকেটস্থ করিলেন। পরে তিনি প্রবন্ধের নাম লিখিয়া লইলে “ইহার নকল রাখি নাই আপনাকে নকল করিয়া দিব” বলিরা প্রবন্ধটি ফিরিয়া লই।

বাসায় কনসার্ট বাস্ত ও দুইটি গানের পরে বধারীতি প্রস্তাব ও সমর্থন হইলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। আমার মনে একটা খটকা লাগিল। সভাপতি নির্বাচন করিবার অধিকার যখন অভ্যর্থনা-সমিতিরই

আছে তখন সাধারণ সভায় আবার প্রস্তাব সমর্থনের প্রয়োজন কি? যদি সাধারণ সভায় সভাপতির নিয়োগ সম্বন্ধে এক দল আপত্তি করে তাহা হইলে উপায় কি? বাহা হটক সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে যথার্থীতি কবিতার স্রোত বহিল। সভাপতির অভ্যর্থনা পঠিত হইল ইত্যাদি। তৎপরে সাহিত্য-শাখার অধিবেশন আরম্ভ হইল। ইচ্ছাতেও কিছুক্ষণ কবিতার স্রোত বহিয়াছিল, তৎপর প্রথম প্রবন্ধ—বাল্মীকি দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের বর্ণনা—ইহা অর্থনীতির প্রবন্ধ, ইতিহাস শাখায় গেলেই ভাল হইত বলিয়া বোধ হইল। বোধহয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় প্রবন্ধ “রায় বাবিনী” উপজ্ঞানের বিজ্ঞাপন রূপে ভূমিকা। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আবহুল গফুর সিদ্দিকি মহাশয় ইহাকে ইতিহাস শাখার প্রবন্ধ বলিয়া পাঠ স্থগিত রাখিতে প্রস্তাব করিলে সভাপতি মহাশয় জীবনোপযোগী ইহাকে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠক বা লেখক মহাশয় এইটুকু প্রবন্ধ পড়িলেন। বোধহয় পঞ্চম প্রবন্ধ আমার “অতীতে ল”। আমি প্রবন্ধটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছিলাম। তাহার উপর আবার পার্শ্বে লাল কালীর দাগ দিয়া আরও সংক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সারটুকু পড়িলাম। আশা ছিল কিছু আলোচনা হইবে। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে বলিয়া আলোচনা দূরে থাকুক, সমস্তটাও পড়া হইল না। যখন প্রবন্ধ পাঠ করি তখন আমার অরতাব হইয়াছে। আমি প্রবন্ধ পাঠের পরে কলিকাতায় মানসী ও প্রবাসী কার্যালয় হইতে ঘুরিয়া আসিয়া প্রায় ষেটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। তখন শরীর আর চলে না, আমি জনৈক প্রতিনিধির সহিত বহুকষ্টে একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। রাত্রি আটটা পর্যন্ত সভার অধিবেশন চলিবে বলিয়া মণ্ডপেই প্রতিনিধিগণের জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। আমি সেইখানেই জলযোগ করিয়াছিলাম।

কলিকাতার সম্মিলনে প্রথম শাখা বিভাগ করিয়া এক সময়ে চারি শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। মফস্বলের অধিকাংশ সভ্যের সহিত আমি ইহার বিরুদ্ধে ছিলাম। বর্তমান সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি ত্রীশূল হারেন্দ্রনাথ দত্তের উপদেশমত বাক পুর অভ্যর্থনা সমিতি চারি শাখার গোটাকতক বাহা প্রবন্ধ সভায় পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ সভাপতি এক দিনের অধিক থাকিতে পারিবেন না বলিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। বহুদিন ধরিয়া চারি দিক হইতে এক সময়ে চারি শাখার অধিবেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি শোনা যাইতেছিল কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার প্রতিবিধান হয় নাই। তাই এবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে শুনিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়াছিলাম কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমার সব আশায় ছাই পড়িল।

বাসায় ফিরিয়া আসিবার আনন্দ ছই ঘণ্টা পরে বাসার প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আবহুল গফুর সিদ্দিকি, মোলবী মহম্মদ কে চাঁদ প্রভৃতি মুসলমান সাহিত্যসেবী, পরিষদের রামকমল বাবু, নলিনী-বাবু প্রভৃতি কংগ্রেস জন সাহিত্যসেবী বিদেশাগত প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি রাত্রি কালে শরীর অসুস্থ বলিয়া, রুটি খাইলাম। অল্প সকলের জন্ত লুচি হইল। সন্ধ্যাকালে দুই তিন বার ডাক্তার বাবুকে সন্ধান করিলাম। স্নেহাসেবকেরা উত্তর দিলেন “ডাক্তারবাবু আসিতেছেন।” কিন্তু ডাক্তারবাবুর দর্শন পাওয়া গেল না। তবুও একে অরের মত বোধ হইতেছে আবার পেটে একটা ফোটকের মত। সন্ধ্যা হইল চন্দ্র পানিবসন্ত হইয়াছে। তাই যে ঢালা বিছানার আমার বিছানা পাতা ছিল সেখান হইতে সরিয়া আমি পার্শ্বের একটা ঘরে আমার বিছানা লইয়া গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রিকালে ঘুম ডাকিয়া গেলে দেখিলাম বেশ জ্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কফ উঠিতে লাগিল, গলায় বাধা বোধ হইল। তখন আর সন্দেহমাত্র রহিল না যে, আমার পানিবসন্ত হইয়াছে। যদি সন্ধ্যাকালে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া একথা বলিতেন, তাহা হইলে রাত্রি দশটার ট্রেনে বাকীপুর চলিয়া আসিতাম।

সকালে (রবিবার ২০শে এপ্রিল) উঠিয়া দেখি মুখে হাতে গলায় পেটে এককথার শরীরের সর্বস্থানে পাণিবসন্ত বাহির হইয়াছে। তখন হইতে বিদেশাগত প্রতিনিধি ও স্থানীয় অভিযর্থনা সমিতির সভাগণ আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন “আপনি রেল চড়িয়া ঝাঁকীপুর যান।” আমি উত্তর দিলাম “যাহা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ তাহা করিতে মনও সেরে না, বিপদও অনেক। যদি হাওড়া ষ্টেশনে ধরিতে নাও পারে, তথাপি রাস্তায় কেন ষ্টেশনে ধরি। আমাকে নামাইয়া দিলে আমি কি বিপদে পড়িব! তন্নিম্ন আমার সংস্পর্শে অল্প আরোহীরও বসন্ত হইবার আশঙ্কা।” একবার মনে হইল আমার বর্দ্ধমানের বাসায় যাই। সেখানে বন্ধুবান্ধব ভ্রমণ না থাকিলেও বাসায় পড়িয়া থাকিব, পাড়ার লোকে দয়া করিয়া পথ্য রান্নিয়া দিতেও পারে। কিন্তু আবার মনে হইল, পাড়ার লোকে ভীতও হইতে পারে এবং আমার যাইবার পরে যদি কাহারও পাণিবসন্ত হয় তখন আমাকে পথ্যের পরিবর্তে অভিশাপ দিবে। যখন ভগবান আমাকে সংসার পথে নিঃসঙ্গ পথিক করিয়া তুলিলেন তখন ভাবিয়াছিলাম ভালই হইল বিধাতা “মোরে লিখি দিল, বিশ্ব নিখিল, ছবিবার পরিবর্তে।” কিন্তু আজ মনেতেছি আমার মাথা ঝাঁজিবার ঠাই নাই এবং লুকোচুরি খেলায় চোর ধরার মত আমি যাহাকে আপনার করিতে গিয়াছি সেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক আমার মত লোকের জন্মই ত ইংরাজরাজ নগরে নগরে হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন, তবে আর ভাবনা কিসের? যদিও হাঁসপাতালের নামে হৃৎকম্প হইতেছিল, তথাপি অভিযর্থনা-সমিতির সভ্যদের বলিলাম “দেখুন রেলের আমার যাওয়া হইবে না। হয় কাহারও বাড়ীর দূরস্থিত পৃথক কক্ষে রাখিবার ব্যবস্থা করুন, এ টুথানি জল-টল দেবেন, পড়িয়া থাকিব, নয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।”

এই দিন সকালে বড় তর্ক উঠিল। জনৈক প্রতিনিধি বলিলেন “আমি প্রায় সকল সম্মিলনে গিয়াছি কোথাও আমাকে ফি দিতে হয় নাই, কোথাও কেহ ফি চাহেন নাই। আমি জানিতাম না সুতরাং টাকাও সঙ্গে লইয়া যাই নাই! দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি তাহার একখানিতে ফি’র কথা উল্লেখ নাই, অপরখানিতে আছে বটে কিন্তু তাহা হইতে এমন বুঝি নাই যে, টাকা না দিলে প্রবেশ করিতে পাইব না। আমি যেরূপেই বসবস করুক অপমানিত হইয়া টাকা ধার করিয়া প্রবেশাধিকার পাইয়াছি। ইহার কিছু বিহিত করা হউক।” বাসার প্রতিনিধিদের সভা বসল, হুর্গাদাস দাদা (মুসিলাবাদ জেলার অন্তর্গত মির্জাপুরের প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীহুর্গাদাস রায়) সভাপতি হইলেন। প্রস্তাব হইল “যাঁহারা প্রতিনিধির ফি দিবেন না, তাহাদিগকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক এবং ভোটের অধিকার দেওয়া হউক। যাঁহারা ফি দিবেন, তাঁহারা রিপোর্ট পাইবেন।” আমি প্রথমে পৃথক কক্ষ হইতে সভাগৃহে মূখ বাড়াইয়া বলিলাম, বর্দ্ধমানে ফি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং যশোহরে প্রথম ফি আদায় করা হয়। সেখানে আমার উপর ফি আদায়ের ভার পড়িয়াছিল। মোট ৭৫ জন ফি দিয়াছিলেন। যাঁহারা দেন নাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিনিধিরূপে আসি নাই, নিমন্ত্রিতরূপে আসিয়াছি। কলিকাতার শ্রীবুদ্ধ প্রবেশদ্রষ্ট চট্টোপাধ্যায় এম,এ, মহাশয় বলিয়াছিলেন “সাহিত্য পরিষদের অত্যন্ত সদস্যই অন্যান্য সভার সদস্যের ন্যায় প্রতিনিধি সুতরাং তাঁহারা ফি দিতে বাধ্য।” যাঁহারা কোন সভাসমিতির সদস্য নহেন অথচ সাহিত্যসেবী অভিযর্থনা সমিতি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা ফি দিবেন না। যাঁহারা ফি দিবেন তাঁহারা কেবল রিপোর্ট পাইবার অধিকারী হইলে ফি দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না।” অন্যান্য ২৪ জন প্রতিনিধির বক্তৃতার পরে ভোট গ্রহণ করা হইলে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এইখানে একটা কথা বলি। কাশিমবাজার, রাজসাহী ও ভাগলপুরে সম্পূর্ণ কার্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, যে সকল প্রতিনিধি এই সকল সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন, কার্যবিবরণ পাইবার জন্য বতঃই তাঁহাদের একটা আগ্রহ

কিন্তু কোথায়ও কি করিলে যে কার্যাবিবরণ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তজ্জন্য চট্টগ্রাম সম্মিলনে ছই এক জন প্রতিনিধি বলেন “বদি কার্যাবিবরণের মূল্য স্থির হয় আমরা মূল্য দিয়া কিনিতে পারি।” বরমনসিংহ, চুঁচুড়া চট্টগ্রাম ও কলিকাতা সম্মিলনের কার্যাবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সভাপতিদের সম্ভাবণ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য বর্ধমান সম্মিলনে আবার সম্পূর্ণ কার্যাবিবরণ ছাপাইয়া মূল্য নির্ধারণের কথা উঠে। সম্মিলন পরিচালন সমিতি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, এবার একটা প্রস্তাব করা যাইবে, প্রতিনিধিদের ২ টাকা করিয়া ফি হউক। সংগৃহীত অর্থে সম্পূর্ণ কার্যাবিবরণ ছাপাইবার সাহায্য হইবে, যাঁহারা ফি দিবে, তাঁহারা বিনামূল্যে পাইবেন, অপরে ২ দিয়া ক্রয় করিবেন। এই প্রস্তাব বর্ধমান সম্মিলনে গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতিও তৎ-প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদের বলেন “এবার আমরা সম্পূর্ণ কার্যাবিবরণ প্রকাশ করিব ও কিছু মূল্য নির্ধারিত হইবে।” তখন সকলেই ক্রয় করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। বর্ধমান সম্মিলনের যেরূপ সর্বদ্রুত কার্যাবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। মোট হাজার পৃষ্ঠার উপর, ৩৫ খানি ছাপাটোন ছবি আছে, ছই তিন খানি মানচিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ মূল্য মাত্র ২ টাকা। যশোহর-সম্মিলনে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে পাঁচ ছয়খানি মাত্র বিক্রীত হয়। ইহার পরে আর ছই চারখানি বিক্রীত হইয়া থাকিবে। যশোহরে ফি হইতে ১৫০ টাকা আদায় হয় কিন্তু সম্পূর্ণ কার্যাবিবরণ প্রকাশ করিতে অন্ততঃ ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে। খুব সম্ভব নগদ বিক্রয় একখানিও হয় নাই। বাঁকীপুরে ১৯০ টাকা ফি হইতে আদায় হয়। কার্যাবিবরণে একটা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় নাই। সভাপতিদের অভিভাষণ ও কার্যাবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। তিনিয়াছি মুদ্রণ ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় ৪০০ টাকা। প্রত্যেক কার্যাবিবরণ ডাকে পাঠাইতে আরও ৮ ডাক ব্যয় পড়িয়াছে। টাকার কি গ্রহণ করা হয় নাই, কার্যাবিবরণও মুদ্রিত হয় নাই। হইলেও অভ্যর্থনা সমিতির ক্ষতি হইত। গল্প উপন্যাস না থাকিলে বাঙ্গলা দেশে কোন পুস্তকের বেশী কাটতি হইবে, বাঙ্গলার এমন অবস্থা এখনও হয় নাই।

অথচ সম্মিলনের ব্যয়বাহু্য দেখিয়া অনেকেই সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেছেন না। সম্মিলনের প্রধান ব্যয় পাঁচ প্রকারে হয়—(১) মণ্ডপ (২) প্রতিনিধিদের আহার ব্যয় (৩) চিঠিপত্র ছাপান (৪) ডাক ব্যয় (৫) প্রতিনিধিদের যানবাহন। ডাক ব্যয় ও মুদ্রণ ব্যয় কমান্বার প্রস্তাব একবার বাঁকীপুর সম্মিলনের আন্দাজ ছই মাস পূর্বে আমি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিকট করি; বর্ধমান সম্মিলনের অনেক কাজ আমি স্বয়ং করিয়া দেখি যে, পরিষদের ২৫০০ সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিতে মুদ্রণ ও ডাক ব্যয় অনেক পড়ে। বর্ধমান হইতে মোট ৩০০০ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়। যশোহরে থামের পরিবর্তে পোষ্টকার্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক ডাকব্যয় কমাইয়া ফেলা হয়। আমি বাল “পরিষদের সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিবার নিয়ম না থাকিলেও পরিষদ, সান্মিলন পরিচালন সমিতির সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন বলিয়া আমি সে দাবী মানিয়া লইতেছি। কিন্তু প্রত্যেককে পৃথক নিমন্ত্রণ না করিয়া অন্যরূপে কার্যসিদ্ধ হইতে পারে। কোন বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ীর কর্তাকেই বলা হয়, তিনি সকলকে সংবাদ দেন। বাহার ইচ্ছা সে ব্যয়। সেইরূপ অভ্যর্থনা সমিতি পরিষদের সম্পাদককে বলিবেন, সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল। পরিষদের সম্পাদক কোন মাসিক অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্রে অভ্যর্থনা সমিতির নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—পরিষদের কোন্ কোন্ সদস্য সম্মিলনে প্রতিনিধি হইতে চাহেন। বাহার নাম পাঠাইবেন, অভ্যর্থনা সমিতি কেবল তাঁহাদেরই সম্মিলনসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রযোগে জানাইবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে তিন হাজার স্থলে সাত আট সত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপান ও তাহার ডাকব্যয় হইতে অভ্যর্থনা সমিতি নিস্তার পাইবেন। আয়ার এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

এবার সম্মিলন পরিচালন সমিতির নিকট অল্প এক প্রস্তাব করিয়া পাঠাই। অভ্যর্থনা সমিতিতে সাধা করািবার অন্য এক উপায় আছে। প্রতিনিধিরা অনেকেই ফি দিতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেস ও কনফারেন্সে প্রতিনিধিদের প্রায় সর্বত্র আহার ব্যয় দিতে হয়। চট্টগ্রামে সাহিত্যসম্মিলনে প্রতিনিধিদের ১ টাকা করিয়া আহার ব্যয় হির করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে যোগদানকালে যাহারা অভ্যর্থনা সমিতির আতিপা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের আহার ব্যয় ২ টাকা করিয়া দিতে হইবে। এ প্রস্তাব সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয় কিন্তু সম্মিলনে গৃহীত হয় নাই। আমি স্বয়ং বাইতে পারিব না বলিয়া শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দীকী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম “একটা দৃষ্টান্ত দিবেন। হিন্দুর বিবাহ শ্রদ্ধ প্রভৃতিতে আত্মীয় স্বজনে লৌকিকতা দিয়া কর্তৃকর্তাকে সাভাষ্য করেন। ইহা হইলে নিউচুয়াল ফ্যামিলিফণ্ড প্রভৃতির জন্য হইয়ছে।” কিন্তু কি হইয়াছিল ঠিক জানি না। অবশ্য ২ টাকা ব্যয়েই অভ্যর্থনা সমিতি নিস্তার পাইতেন না, আরও কিছু খরচ করিতে হইত।

যাক এবার নিজের কথা বলি যে সকল স্থানীয় ব্যক্তি প্রতিনিধিদের আপ্যায়িত করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঁটোরার প্রশংসা করিয়া বলিতেন “এখানে আমাদের একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় একটা বালিকা বিদ্যালয় ও একটি অনাথবন্ধু সমিতি আছে।” রবিবার দিন সকালে উঠিয়াই আমি সেই ভদ্রলোকের খোজ করিলাম। বহু চেষ্টার পরে অপরাহ্নে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আমার নিবেদন জানাইলাম যে, আমাকে একটা পৃথক স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু আমার ন্যায় অনাথের অদৃষ্টদোষে অনাথবন্ধু সমিতিও কুপাদানে কুপণতা করিলেন। হেতমপুরের অধ্যাপক অনিলবরণ বাবু অভ্যর্থনা সমিতির বহু সদস্য এবং জনৈক ধনীব্যক্তির পুত্রকে (নাম করিবার প্রয়োজন দেখি না) বলিয়াছিলেন “তাহঁত শেষে ভদ্র লোককে হাঁসপাতালে বাইতে হইবে। ইহাতে অভ্যর্থনা সমিতির কি কলঙ্ক হইবে না?” তখন যেটা সোজা উত্তর তাঁহার তাহাই দিলেন কেন, তিনি ত বাঁকাপুর বাইবেন?” অনিলবাবু শেষে কখন একবার আমার বলিয়া দিলেন “না, সে কি পারে মশায়? আপনাকে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে।” এই রবিবার দিনই একজন বলিয়া উঠিলেন “এটা একটা পাবলিক ইনষ্টিটিউশন। বুজতেহঁত পার্চেন।” ভাবিলাম, আজ বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া এ জ্ঞানটুকুও লোকে আমার দিতে আসিতেছে।

বাধা হউক সোমবার সকাল হইতেই আমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার জোগাড় চলিতে লাগিল। বাঁটরা হাঁসপাতালের ডাক্তার আসিয়া শাল্কে হাঁসপাতালের ডাক্তারের উপর এক চিঠি দিলেন। আমার গলার ভিতর আজ বড় ব্যথা। আমি খয়ের আনাইয়া মধ্যে মধ্যে একটু করিয়া খাইতে লাগিলাম। তিন খানি পত্র লেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। পরদিন পাটনার সেসন কোর্টে জুরিতে ডাক পড়িয়াছে। সুতরাং সেসন জজকে একখানি, টি কে ঘোষের একাডেমির প্রধান শিক্ষককে একখানি এবং আমার পাণিত পুত্রকে একখানি পত্র লিখিতে বলিলাম। যিনি সেসন জজকে পত্র লিখিবার ভার লইলেন তিনি আমাকে একটা উপরি নিমন্ত্রণ করিলেন “আরোগ্যলাভ করিলে একদিন এখানে থাকিয়া বাইবেন।” এরূপ নিমন্ত্রণ পাইয়া আমার মানসিক বা শারীরিক কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। পরে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি দ্বিতীয় পত্রখানি দেওয়া হয় নাই। বিছানাটা স্বয়ংই বাঁধিয়া কেলিলাম, আর সঙ্গে একটি ব্যাগ। বেলা প্রায় ১০টা, গাড়ী প্রস্তুত দেখিতে পাইলাম। রাজিতে হুখ ভিন্ন কিছু খাই নাই, খিদের পেট জলিয়া বাইতেছে, হাঁসপাতালে গেলেই কিছু আমার জন্য পথ্য নাই বলিয়া থাকিবে না। সুতরাং বখন দেবিল্যাম আমার



খাইবার কথা কেহই কিছু বলিতেছে না, আমার কোনরূপে বিদায় করিবার জন্যই বাস্তব তখন লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম “আমার গোটা চারেক সন্দেশ আনিয়া দেন।” জনৈক স্বেচ্ছাসেবক সন্দেশের উপরে ৪টা রসগোল্লা পর্যাস্ত আনিয়া দেন।” গলায় বাথা, তবুও মাঝে মাঝে জল খাইয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। দুই জন যুবক আমার সঙ্গে গাড়ীতেই বসিলেন। গাড়ী হাঁসপাতাল অভিমুখে চলিল।

যাঁহারা আমার সঙ্গী হইলেন তাঁহারা হাঁসপাতালটা কোথায় ঠিক জানিতেন না। বহু অতুসন্ধানে হাঁসপাতাল আবিষ্কৃত হইল কিন্তু ঠাঁই নাই। তখন সঙ্গীদ্বয় একবার বলিলেন “ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে যাই।” আবার বলিলেন “না! প্যাণ্ডালেই যাই, নতুবা লাহিড়ী মহাশয় বলিতে পারেন, কেন আমাকে না জানাইয়া ক্যাম্বলে গেলে।” স্মরণ্য গাড়ী মগুপে গেল। তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। আমি রাস্তার গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলাম। খানিক পরে একটা কথা মনে হইল “যদি কাহাকেও দিয়া জানাইতে পারি যে, আমি একজন প্রতিনিধি এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি তাহা হইলে সম্মিলনে আগত হাওড়া ও কলিকাতার বড় বড় লোকের মধ্যেও এমন দয়ালু কেহ থাকিতে পারেন। যিনি আমাকে হাঁসপাতাল যাওয়া স্থগিত করিয়া পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন।” তখন আমি জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে বলিলাম মঞ্চের উপরে সবুজপত্র আপিসের পবিত্রকুমার গাঙ্গুলী রিপোর্ট লেখকের পাশে বসিয়া আছে তাহাকে ডাকিয়া দেন।” আশ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, স্বেচ্ছাসেবকের দেখা নাই। এটা বোধহয় ভালই হইয়াছিল। নতুবা আমার আবেদনের ফলে যদি বিফলমনোরথ হইতাম তাহা হইলে কলিকাতাবাসীদের সম্বন্ধে যে একটা মহত্বের ধারণা আছে, তাহা জাগ্রিয়া যাইত। তার পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি এক বিষয়ে বিদ্যাপতি মস্ত মুখ ছিলেন। তিনি বলেন “সিদ্ধ নিকটে যদি কণ্ঠ শুণ্যত, কো দূর করব পিয়াসা।”, তিনি কখনই সিদ্ধর জল খাইয়া দেখেন নাই, তাই এমন কথা বলিয়াছিলেন। আমরা জানি সিদ্ধর জল অপেক্ষ, নর্ষাকালে বড় নদীর জলও প্রায় তাই, আমাদের মত দরিদ্র লোকের পক্ষে দরিদ্রের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীতে যে দরিদ্র ভিক্ষার পরিবর্তে অর্দ্ধচন্দ্র পায়, তাহা বিদ্যাসাগর জীবনীতে ভাল করিয়াই পড়িয়াছি, যাক আমার সঙ্গীদ্বয় আসিয়া দুজন বালক স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম “শালুকে হাঁসপাতালের মত সেখানেও যদি স্থান না থাকে তাহা হইলে কি হইবে?” তাঁহারা উত্তর দিলেন “লাহিড়ী মহাশয় চিঠি দিয়াছেন, সে ভাবনা নাই।”

বেলা ১১টার সময় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন “এতো চিকুন পক্ষ, আপনি কি হাঁসপাতালে থাকবেন?” তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, আমার থাকিবার স্থান আছে। আমি উত্তর দিলাম “যাঁহাদের অতিথি হইয়াছিলাম তাঁহারা যখন আশ্রয় দিলেন না, তখন আর কোথায় যাই? রেলের তো যাইতে দিবে না।” তখন ডাক্তার বাবু আমার ব্যাগের জিনিষের তালিকা শুনিয়া বলিলেন “অত খুচরা জিনিষের দায়িত্ব আমরা লইতে পারি না। ওসব ফেরত দেন।” আমি বলিলাম “তামাকের সরঞ্জাম রাখিতে পারি কি?” ডাক্তার বাবু কিছু চটিয়া বলিলেন “আপনাকে তামাক সাজিয়া কে দিবে?” “আজ্ঞে আমি আপনি সাজিয়া লইব।” “না ওসব হবে টবে না, তা হলে আপনার হাঁসপাতালে থাকা চলিবে না।” তখন ৩০টা সিগারেট রাখিয়া সব জিনিষ হাওড়ায় ফিরিয়া পাঠাইলাম। আমার সঙ্গে ১৫৯/০ ছিল তাহার মধ্যে ১৫



টাকা হাঁসপাতালে জমা থাকিল। আমি হাঁসপাতালে ভর্তি হইলাম। আমার গায়ের জামা, খুতি, উড়ানী, জুতা মোড়া ও চাতা প্রভৃতির তালিকা করিয়া লওয়া হইল।

আমি ম্যাকেঞ্জি ব্যারাকের ইনফার্মেরী ওয়ার্ডের একটি কক্ষে একখান খাট পাইলাম। এইখানে হাঁসপাতালের একটু বিবরণ দিই। হাঁসপাতালটি শিয়ালদহ স্টেশনের ঠিক পূর্বে, পুলিশ কোর্টের পশ্চাতে ও লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অবস্থিত। মধ্যে একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোক ও পুরুষের দুইটি সাধারণ বিভাগের ব্যারাক। উত্তর দিকে ম্যাকেঞ্জি ব্যারাকের পশ্চিমাংশে স্ত্রীলোকদের সাধারণ বিভাগ নং ২, পূর্বাংশে ইনফার্মারী অর্থাৎ অন্ধ, থল, বোবা, পাগল, পক্ষাঘাত, রোগীদের স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিভাগ। মধ্যে একটি কক্ষে ৬ খানি খাট থাকে, ইহাতেই পাণিবসন্তের রোগী রাখা হয়। পূর্বদিকে মধ্যে মেডিক্যালস্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষাগার, দুইপার্শ্বে স্ত্রীলোক পুরুষদের অস্ত্রচিকিৎসাগার। এগুলি মোতাল্লা আর পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণদিকের ব্যারাকগুলি খোলা ছাউনী, দুইপার্শ্বে খুব চওড়া বারান্দা। রোগীর সংখ্যা বেশী হইলে কখন কখন বারান্দাতে পর্যন্ত রোগী রাখা চলে। ইচ্ছা-বসন্ত ও কলেরা রোগীদের স্থান হাঁসপাতালের এক ধারে, পূর্বদিকে।

খাটগুলি প্রায় লোহার স্প্রিংএর। তাহার উপর নারিকেল ছোবড়ার তৈরিক ও চাদর, একটি করিয়া নারিকেল ছোবড়ার বালিস। বালিসে ওয়ার দেওয়া। শীত করিলে গায়ে দিবার জুতা একখানি করিয়া কষল। প্রায় সমস্ত কষলই লাল রঙের ও হুতি। আমার ভাগ্যে কিছু পড়িল একখানা দেশী কাল কষল আবার তোষক-খানির তিন দিক উঁচু এক দিক নীচু। ইহাতে শুইতে বড় কষ্ট হইত। পরে কষল ও তোষক বদলাইয়া লইয়া ছিলাম। আসবাবের মধ্যে একটি দোখাক ছোট টেবিল ও একটি এনামেলের মগ বা জলের পাত্র।

আমি যখন গেলাম, তখন কক্ষের এক অংশে চারের স্থানে ছয়খানি খাট ও অন্য অংশে দুইখানি ও বাহিরে বারান্দায় তিনখানি, মোট এগারখানি খাটে পাণিবসন্তের রোগী ছিল। ইহাদের পরিচয় এইরূপ, একজন হিন্দুস্থানী বালক, প্রকৃতপক্ষে ইহার পাণিবসন্ত হয় নাই, প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল ইচ্ছাবসন্ত হইয়াছে, পরে সন্দেহ হয় হাম হইয়াছে তখন ঠিকাকে এখানে আনা হয়। ছেলেটির অর ও নিউমোনিয়া হইয়াছিল। (২) একজন শিখসৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় ১৪ মাস থাকিয়া ২ মাসের জুতা দেশে আনিয়াছিল। ছুটির শেষে পাচশত সৈন্যের সহিত রেশুন যাইতেছিল সেখান হইতে শিশুর দাহবার কথা। কলিকাতায় আসিয়া পাণিবসন্ত হয়। (৩) জনৈক কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্র (৪) জনৈক মেডিক্যাল মেসের মেম্বর। এফ-এ ফেল করিয়া কাজকর্মের চেষ্টা করিতেছে। (৫) কোন মফস্বলের ডাক্তারের পত্নীর চিকিৎসার্থ কলিকাতায় সাথী হইয়া আসিয়াছিল এমন একজন যুবক। (৬) একজন বালক দপ্তরী (৭) একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীদের পাচক বালক (৮—১১) ষ্টিমারের একজন বয় ও তিনজন খালসী।

এইবার হাঁসপাতালের কর্মকর্তাদের বিবরণ প্রদান করি। সর্বোপরি কর্মচারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তিনি সাহেব, মধ্যে মধ্যে রোগীদের দেখিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাঁহার অতীত কি কাজ জানি না, তবে রোগীর অভিযোগ করিলে তিনি তাহার প্রতিকার করেন। তৎপর রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান, তিনি প্রত্যহ আমাদের ওয়ার্ডে ৯—১০টার সময় আসিতেন। তিনি কোন কোন রোগীকে দেখিতেন। ইনি “স্বর্ণলতার” গ্রন্থকার স্বর্গীর তারক গাঙ্গুলির পুত্র, নাম শ্রীলালবিহারী গাঙ্গুলী। সাধারণ বিভাগের অপর রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানও আছেন, ইহার পরে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার। ইনি মাব্‌ এসিষ্ট্যান্ট সার্জন, নাম শ্রীনাথ দাস। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছেন। ইনি দুইবেলা সমস্ত রোগীকে দেখিতেন। কোন কোন

দিন তিন চারি বারও আসিতেন। ইনি প্রাতঃকাল সাত আটটার সময় আসিয়া প্রত্যেক রোগীকে দেখিয়া সেই দিনের ঔষধ ও পর দিনের পথ্য টিকেটে লিখিয়া দিতেন। নাস' আসিয়া প্রত্যেক রোগীর পথ্য ও ঔষধ লিখিয়া লইত এবং ডায়েট-সরকার প্রত্যেক রোগীর পথ্য লিখিয়া লইয়া গিয়া পরদিন হিসাবনত প্রতি বিভাগে পথ্য পাঠাইত। কম্পাউণ্ডার ঔষধ ঠিক করিয়া রাখিত, ছাত্রেরা ডিউটি মত ঔষধ খাওয়াইত।

বলিতে ভুলিয়াছি, প্রত্যেক রোগীর, আসবাবের মধ্যে আর একটি জিনিষ ছিল, একটা বড় পিতলের গামলা। ইহাতে খুঁ ফেলা, মুখ ধোয়া সবই চলে। সকলে দুই জন মেথর আসিয়া সেগুলি লইয়া গিয়া মাজিত, ঘণ্টা দুই পরে ফিরাইয়া দিত। তৎপরে মেথরদের কাজ,—ঘর ঝাঁট দেওয়া ও ধোয়া। ধোয়া বলিলে ঠিক বলা হইল না, বারন্দাগুলি জল দিয়া ধোয়া হইত কিন্তু ঘর নিকান হইত। কতকগুলি তাঃ হাত লম্বা ছেঁড়া কাপড় মাঝখানে দড়ি দিয়া বাঁদিয়া ফেনাইল ও ভলে ভিজাইয়া দড়ি ধরিয়া এপাশ ওপাশ করা হইত। ইহাতেই নিকান হইয়া যাইত। পাণিওয়ালা থাইবার জল ও পথ্য দিয়া যাইত। একজন সকালে রোগীর বিছানা ঝাড়িয়া ভাল করিয়া পাতিয়া দিয়া যাইত। তদ্বিন্ন ৫৬ জন চাকর ছিল তাহারা নাসের আজ্ঞামুসারে নানা কাজ করিত।

রোগী যে কাপড়-চোপড় পরিয়া আসে, তাহা টিকেটে লিখিয়া রাখিয়া জমা করিয়া রাখা হয় এবং রোগীকে হাসপাতালের জামা কাপড় পড়িতে হয়। কাপড় ৩ গজ লম্বা ১ গজ চওড়া খুব মোটা। এই ক্ষুদ্র ধুতি পাইয়া আমি প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই যে, কাছা দিয়া পরিব কি কোঁচা দিয়া পড়িব, দুই এক সপ্তে হইতে পারে না, শেষে কোঁচাই রাখিতাম। তদ্বিন্ন একখানি করিয়া গামছার মত বস্ত্রখণ্ড পাওয়া যায়, ইহা দেড় গজ লম্বা ও পোনে এক গজ চওড়া। জামা, কাপড়, গামছা, বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়ারে “ক্যাথেল হাসপাতাল, ১৯১৬ বা ১৯১৯” এইরূপ ছাপ থাকে। ইহাতে কতৃপক্ষ বুঝিতে পারেন কোন সালের কাপড় কি রকম টিকিল। প্রতি মঙ্গলবারে ধোপা কাপড় লইয়া আসে, তখন এ সমস্ত বদলাইয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালের এই কাপড় জামাগুলির একটি বিশেষ গুণ আছে, ইহাতে ভদ্রাভদ্র বাক্তি এক শ্রেণীতে পড়িয়া যায়। আমাকে যখন ডাক্তারবাবু প্রথমে দেখিলেন তখন বোধহয় বেশভূষা দেখিয়া “আপনি” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন কিন্তু দুই চারি দিন পরে যখন এই পুরুকেশ বুদ্ধকেও ছাত্রেরা আসিয়া “তুমি” সম্বোধন করিত, তখন প্রথমে ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতাম না।

আমি যে ব্যাথকের কক্ষে ছিলাম, তাহার উত্তর দিকে মলমূত্রত্যাগের স্থান ও স্নানাগার। কলিকাতার সাধারণ স্নানাগারে গঙ্গার অপরিষ্কৃত জল থাকে, কিন্তু এই স্নানাগারের জল পরিষ্কৃত। হাসপাতালের অল্প রোগীই নিত্য স্নান করে, সাধারণতঃ রোগীরা গামছাখান পরিয়া স্নান করে এবং এক ধুতিই ব্যবহার করে। আমি যখন স্নান আরম্ভ করি তখন দুইখানি ধুতি চাওয়া লইয়াছিলাম।

আমি ২১শে এপ্রিল বেলা ৩টার সময় আমার শয়নের স্থান পাই। আমি গেলে কক্ষের ভদ্র বাঙ্গালী রোগীরা আমার পরিচয় লইলেন। ১৯শে এপ্রিল হইতে প্রত্যহ বেলা একটার সময় আমার জ্বর হইত এবং প্রাতঃকালে ছাড়িত। সেদিনও জ্বর হইয়াছিল। আমি শুইয়া পড়িলাম। পাণিবসন্তের সকল রোগীই একটা তেল মাখিতে লাগিল। এই তেলকে ডাক্তারেরা বলেন “বডি অয়েল”। আমাকেও সকলে তেল মাখিতে পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারের আদেশ না পাইলে মাথা উচিত কিনা স্থির করিতে পারিলাম না। স্নাত্তিতে পথ্য আসিল,—শর্করাবিহীন মগ ভরা দুধসাপ্ত। ঔষধ গেলার মত কোন রকমে খাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমার খাটখানি ছিল ঠিক রুজু দরজার পথে। খাটের উপর দিয়া বেশ বাতাস বহিতেছিল। অরের জন্য একটু শীত লাগিতেছিল। কখন গায়ে দিয়া দেখি কুট কুট করে। তাই প্রথমে উড়ানিখানি গায় দিয়া তার উপরে কখন গায়ে দিলাম।

প্রাতঃকালে ডাক্তারবাবু আসিয়া ঔষধ পথ্য লিখিয়া দিয়া গেলেন। সম্ভবতঃ এইদিন সকালেই মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহের সহিত পরিচয় হয়। ইনি উড়িয়াচিত্রের গ্রন্থকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের পুত্র ও প্রাচ্যবিদ্যা মহাশয় মহোদয়ের জামাতা। ভগবান বোধ হয় আমাকে অনাথ দেখিয়া এই বন্ধুটিকে আমার নিকট দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় এ সময়ে আমার দুইজন কুটুম্ব ছিলেন এবং বোধ হয় শতাধিক পরিচিত (তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকে বন্ধু মনে করি) লোক আছেন। আমি অনাথ ভাবে হাঁসপাতালে পড়িয়া আছি এ কথা তাঁহাদের জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তজ্জনা দুই তিন জনকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যেন সংবাদপত্রে এইভাবে একটা সংবাদ দেওয়া হয় যে, হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে আগত বাঁকীপুরের প্রতিনিধি শ্রীরাখালরাজ রায় পাণিবসন্তের চিকিৎসার জন্য কায়েল হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। পৃথকভাবে পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধুবর্গকে পত্র দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ দেখিয়াছি রোগশয্যায় নিকটে আসিতে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। তাহার উপরে হাঁসপাতালে, যেখানে ব্যাধির ভীষণ মূর্তি প্রকট, শত শত রোগী রোগ বহুণায় ছটফট করিতেছে! আমার আবার পাণিবসন্ত হইয়াছে, এটা একটা সংক্রামক রোগ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের “পুরাতন ভৃত্য”এর কথা মনে পড়িল। স্মরণ্য কে আমার জন্য এই বিপদসঙ্কুল স্থানে আসিবে? বাহাদুরের বন্ধু মনে করিয়াছি, তাহার সংবাদ পাইলেও যদি না আসে তখন যে ভুলচক্র ভঙ্গিয়া যাইবে। যদি কাল্পনিক বন্ধুতে স্মৃতি নাই, সেও ভাল। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া একজনকে মাত্র সংবাদ দিয়াছিলাম। সে সবুজপত্র আফিসের শ্রীমান্ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সে এখনও সংসারচক্রে ভাল করিয়া পড়ে নাই, তাই আশা ছিল সে আসিতে পারিবে। সে আসিয়াও ছিল। কলিকাতার অধিকাংশ লোক অর্থোপার্জনে বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে নিযুক্ত। তাহার উপরে তাহাদিগকে ঘরকন্নার কাজ ও ছেলেপিলের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। স্মরণ্য তাঁহাদের অবসরই বা কোথায়?

তবু মন মানিত না। ভাবিলাম, অহা যদি কেহ কোনরূপে সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসে, তাহা হইলে আমার হাঁসপাতাল বাসের যন্ত্রণার কিছু উপশম হয়। দক্ষিণদিকের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া লোয়ার সাফুলার রোডের দিকে চাহিতাম। রাত্তা দিয়া ট্রাম, মোটর, গাড়ী, সাইকেল, কত লোকজন চলিয়া যাইত ঠিক যেন বায়োস্কোপের দৃশ্য। অগচ্চ বায়োস্কোপ দেখিয়া যেমন আনন্দ হয় ইহাতে সেরূপ হয় না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান সহজে হয় নাই। আনন্দ বোধ হয় মনের সৃষ্টি। আমি হাঁসপাতালের মার্কামার পাণিবসন্তের রোগী। স্থপারিটেণ্টেণ্ট মহোদয় কথায় বার্তায় আমাকে ইংরাজী জানা ভদ্রলোক জানিয়া বলিয়াছিলেন “আপনি ঘরে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। গায়ে ঢাকা দিয়া বাহিরে বারান্দায় বসিতে পারেন।” তিনি একথা নাসদেরও বলিয়াছিলেন। তৎপূর্বে নাসরা কোন পাণিবসন্তের রোগীকে বাহিরে যাইতে দিত না। স্মরণ্য আমি এক প্রকার কারাবাস ভোগ করিতেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ কোন অলঙ্ঘ্য চক্রের আবর্তে পড়িয়া আমার কর্মস্থান হইতে বহুদূরে এই নিবান্ধব অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িলাম ভাবিয়া মনের অবস্থাও তত ভাল নহে। হয় ত এই কারণেই আমার কিছু ভাল লাগিত না।

যে আসিয়া যখন শুইতাম তখনও সহজে ঘুম আসিত না। পুরুষ বিভাগে কয়জন পাগলা ছিল। একজন দ্বানাগারের টিনের বেড়া বাঁজাইয়া কখনও ৫।৭ ঘণ্টা ধরিয়া একাদিক্রমে গান করিত, আবার কখনও রাস্তারদিকে চাহিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত। আর একজন পাগলকে চাকরেরা একটু উত্যক্ত করিলে সে মিহিসুরে অনর্গল বকিয়া যাইত। এক বুড়ো অন্ধ জীলোক উত্যক্ত হইয়া কান্না জুড়িয়া দিত। অনন্ত্যাসের ফলে রাস্তার ট্রামের শব্দে বড়ই বিরক্তি জন্মাইত। একজন পক্ষাঘাতের রোগী মাঝে মাঝে মধুরস্বরে গান করিত। আমি এই সব শুনিতাম আর বিছানায় শুইয়া শুইয়া তাহাদের একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতাম। একদিন বেলা ১০।১১টার সময় বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম। স্বরে বুঝিলাম বালক ; শুনিলাম জলাতঙ্ক ব্যাধি। খানিক ক্ষণ পরে সব চূপ। পরদিন শুনিলাম সে মারা গিয়াছে। পিতা পুত্রকে রাখিয়া কোন কারণে বাহিরে চলিয়া যাইবার ১০ মিনিট পরে ছেলেটা মারা যায়। গৃহে কেহ মারা গেলে শোকে কত ক্রন্দনের রোল উঠে। কিন্তু এখানে সব রকমের ধ্বনি উঠিলেও ওটির নাম গন্ধ নাই। হাঁসপাতাল একটা বৃহৎ হৃদয়হীন যন্ত্র। ইহার যে দ্বার দিয়া রোগী প্রবেশ করে, কিছুদিন পরে হয় সে সেই দ্বার দিয়া বাহির হয়, নয় যমের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হয়। দ্বিতীয় দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিবার সময় কাহারও চক্ষে একবিন্দু অশ্রুও দেখা দেয় না। হাঁসপাতালের কর্মচারী ও চাকরেরা পাষণে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছে (অবশ্য নিজের জীপুত্রের বেলা সে কথা খাটে না।) যাহা হউক আমার মনে হইত, সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারেই হৃদয়হীনতা আছে। যে রাজা নরহত্যার জন্য কত কঠিন শাস্তি বিধান করেন, তিনিই আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কত নরহত্যার পথ মুক্ত করিয়া দেন। দুই চার জন বজ্রবান্ধকে খাওয়াইলে আমরা কত যত্ন করিয়া খাওয়াই কিন্তু বিবাহ বা শ্রাদ্ধের ভোজে হৃদয় জিনিষটার সম্ভাবহারের পথ থাকে না। কলিকাতা একটা বৃহৎ কর্মস্থল। এখানেও সদয়তার অবসর খুব কম।

আমি যেদিন গেলাম, তাহার পরদিনই দপ্তরী ছুটি পাইল। আমি তাহার খাটে গেলাম। তৎপর দিন মাত্রাসার ছাত্র ও মফস্বলের ডাক্তারের লোকটি ছুটি পাইল! তৎপর দিন ষ্টিমারের খালামীর ও বয় ছুটি পাইল। বয়ের বাড়ী কলিকাতা কড়েরার বাজারে। সে ষ্টিমার হইতে হাঁসপাতালে প্রেরিত হইবার সময় বাড়ীতে সংবাদ দিতে পারে নাই। এখানে আসিয়া সংবাদ দেওয়ার, তাহার ছুটি পাইবার পূর্বদিন তাহার চাই সহোদর আসিয়া উপস্থিত হইল। সহোদরের মুখে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ এবং কিছুদিন পরে মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিন ভাই কাঁদয়া উঠিল। ভ্রাতৃদয় বিনায় লইলে, বয় সমস্ত দিন মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিত। সেদিন দুই একবার ভাত মুখে দিয়া ফেলিয়া রাখিল। আমি তাহাকে মধো মধো সান্ত্বনা দিতাম। তাহার পিতা ৩০।৬৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে। এখন আমার ৫ জন থাকিলাম, মেডিক্যাল মেসের মেধর শ্রীহরমোহন মিত্র, আমি, হিন্দুস্থানী পাচক-ব্রহ্মণ, শিখ সিপাহী ও হানে পীড়িত বালক। আমার যাইবার ৪৫ দিন পরে বজ্রবজ্র হইতে পানি-বসন্ত পীড়িত এক বালক কনুইবেল আসিল। তাগকে ৬ দিন থাকিতে হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সে হৃদ ভিন্ন কিছু খায় নাই। সে যে দিন হৃদ না পাইত সে দিন তাহাকে আমার হৃদ দিতাম, কখনও বা বাজার হইতে চিনি মিছরী আনাষ্টরা দিতাম। ইহার কারণ ঢোকা অর্থাৎ পাকশালা হইতে দূরে ভাত বা রুটি আনিয়া দিলে সে খাটবে না বলিল। কিন্তু ডাক্তার বাবুরা বলিলেন পাণিবসন্তের রোগীকে পাক-শালার নিকটে যাইতে দিতে পারি না। সুতরাং তাহার ভাত রুটি খাওয়া হইল না। সে অবশ্য লুকাইয়া ২।৩ দিন বাজারে গিয়া পুরী খাইয়া আসিয়াছিল। তাহার একটু সুবিধাও হইয়াছিল। আমাদের যেমন

কাপড় জামা কাড়িয়া লইয়া হাসপাতালের মার্কামারা কাপড় দেওয়া হইয়াছিল এই কনষ্টেবলটির তাহা করা হয় নাই। তাই সে নিজের কাপড় জামা পরিয়া স্বচ্ছন্দে বাহিরে বাইত। তাহার মুখে একটীও বসন্ত বাহির হয় নাই, আমি রাত্রিকালে রাস্তায় নামিয়া একদিন পারচারি করিতেছিলাম এমন সময়ে একজন দাসী হাঁকিল “কাজের মাং যাও।” আমি বুঝিলাম আমি নজরবন্দী।

আমি ২১এ ২২এ ও ২৩এ এপ্রিল রোগীদের সচিৎ কণোপকথনে সময় কাটাইলাম। মাঝে মাঝে আমার অপ্রত্যাশিত হাসপাতাল-বাসের কথা ভাবিতাম। ২৩এ এপ্রিল বেলা ১১টার সময় পবিত্রকুমার দেখা করিয়া আমাকে মাতন জিবছোলা আনিয়া দিল এবং তৎপর দিন একথানা রুসিয়ান নভেলের টংরাভি অনুবাদ আনিয়া দিল। এখানি ফুরাইলে ক্রমে ক্রমে আরও দুখানি বই আনিয়া দিয়াছিল। শ্রীমান সুরেন্দ্র মোহন ও তাঁহার পিতার “ভূগঙ্গা” ও “তোড়া” আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। আমি প্রায় সমস্ত দিনই মাঝে মাঝে এই সব বই পড়িতাম। দিনে আঠারের পর একটু ঘুমাইতাম। রাত্রে শব্দ ঘুম আসিত না। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক লাইট আলিয়া পড়িতে বসিতাম। কোন দিন কাছারপোকা মারতাম। প্রথম প্রথম শরীর অস্থস্থ বলিয়া রাত্রি ১টা ২টা পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতাম। তবে যে দিন বুষ্টি হইত সেদিন বেশ ঘুমাইতাম।

পবিত্র সব দিন কাজের ভিড়ে আসিতে পারিত না। বট ফুরাইয়া গেলে কেমন করিয়া সময় কাটিবে ভাবিয়া কখনও কখনও অল্প অল্প করিয়া বই পড়িতাম। এই যে তারিখে সকালে সব বই পড়া শেষ হইল। সেদিন পিঞ্জরাবদ্ধ শাখীর মত সমস্ত দিন ছুটফুট করিয়াছি। সন্ধ্যাবেলায় বাট্টার নিতাইবাবু আসিলেন। তাঁহাকে বলায় তিনি একখানি খাতা ও একটা কলম আনিয়া দিলেন। জনৈক ছাত্র আমার টোঁবলে একটা দোয়াত রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা হইতে ওবদ লিখিতে বসিয়া গেলাম। কিন্তু এক সঙ্গে অধিকক্ষণ লিখিতে পারিতাম না, কারণ তখন শরীর বড়ই দুর্বল, এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিত।

আমার পূর্বে ধারণা ছিল যে, নার্সরা (Nurse) বোধহয় রোগীকে বহুস্তে ঔষধ পথ্য খাওয়ার। কিন্তু ২১ দিনের মধ্যেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। দেখিলাম নার্সরা ওয়ার্ডের এগ্জিকিউটার বা কর্মকর্তা। নার্স মহোদয়রা খাতা দেখিয়া বলেন “অমুক নব্বরের রোগীকে সাগু দাও।” পাণিওয়াল তাহাকে দিয়া আসিল। বলিতে ভুলিয়াছি প্রত্যেক রোগীর খাটের একটা করিয়া নম্বর আছে। নম্বরটা এনামেলের অক্ষরে দেওয়ালে আঁটা আছে। রোগীর টিকিটেও এই নম্বরটা লিখিয়া দেওয়া হয়। নার্স চাকরবাকরেরা প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানী বলিয়াই হউক বা বাঙ্গালা জানে না বলিয়াই হউক নার্স মহোদয়রা প্রায় হিন্দিতেই কথা বলেন। অবশ্য এ হিন্দী বিশুদ্ধ নহে। কারণ হিন্দীর ক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ কর এ জ্ঞান ইংল্যান্ডের নাই। রোগীর চলিত নাম এখানে “সিক্‌মান” (Sickman)। ইহার হিন্দী বহুবচন দাঁড়াইয়াছে “সিক্‌মানোঁ”। নার্স ও চাকরদের মধ্যে এই রকমের কথাবার্তা চলে,—

নার্স। পাণিওয়াল, পচাশ্ ছ (৫৬) সিক্‌মান্‌কো দুধ দিয়া ?

পানি। জী মামা। লেকিন্‌ সিক্‌মান্‌ চিনি মাস্ত হৈ। চিনি দিজিয়ে।

নার্স। ইউ সোয়াইন্‌! তোম্‌ চোরি কর্তী হৈ। হাম্‌ দোসরা নোকরসে ভেজ দেঙ্গে।

পানি। জো খুদী কিজিয়ে, বাবা।

চাকররা নাস'দের কখনও 'মামা' বলে, কখনও 'বাবা' বলে। তুটীই বাঙ্গলার পুলিশ। বাস্তবিক দেখিলাম এট নাস'দের কাজ পুরুষ-জেনোচিভ। চাকরদের গালাগালি দিয়া বকিয়া, তুটী হইলে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইয়া কাজ লইতেছে। মাঝে মাঝে দৃঢ়ভাবে তাহাদের ডাকিতেছে। এ কাজ যে কোন কম্পাউণ্ডার পারে অথচ কম্পাউণ্ডারকে এ কাজ না দিয়া নাস'দের দেওয়া হয় কেন ইহার কারণ বুঝিলাম না। নাস'দের পোষাক সাদা, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত সাদা কেবিসের। কাহারও কাহারও আন্ত্রীনে একটা রেড্ ক্রশ পিন দিয়া আঁটা। সাদা রংটা বোধ হয় করুণাবাজক। কিন্তু নাস'দের মধ্যে একটা বাঙ্গালী রমণী ও একটা বয়স্কা খেত-মহিলা বাতীত আর সকলগুলিই কর্কশভাষিণী। এক এক জন যখন চাকরদের গালাগালি দেয়, তখন অনেক রোগীর রোগযন্ত্রণা বাড়িয়া উঠে। আর বাঙ্গালী রমণীট এমন মধুরভাষিণী ছিলেন যে, তিনি কথা কহিলে মনে চটত যেন কোন সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আর একটি নাস'ের চেচারা ঠিক নিগ্রোদের মত। আমার মনে হইত ইহাকে অন্ধকারে বা মুহু অলোকে দেখিলে অনেক রোগী ভয়ে আঁতকাঠিয়া উঠিবে।

যাত্রা হটক নানা কারণে এট নাস'দের সঙ্গিত যেন আমার ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে পিপাসার চটকট করিতে লাগিলাম, খাইবার জল নাই। যে মগে পাণিওরলা জল দিয়াছিল, ওয়ার্ডে কতগুলি মগ আছে তাহা গণিবার জন্য ছোকরা কুলি (বলিতে ভুলিয়াছি, চাকরদের 'কুলি' বন্ধিয়া ডাকা হয়) সেটি লইয়া গিয়া নাস'ের আফিসে হাজির করিল। আমি তখন জানিতাম না কে জল দেয় সুতরাং ২১ জন কুলি আসিলে তাহাদের একজনকে জল দিতে বলিলাম। সেদিন জিনিষপত্র গুলিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ একবার কবল গুলিতেছে, কেহ বালিশ গুলিতেছে। আমি যাহাকে জল দিতে বলিলাম সে রাগিয়া উত্তর করিল "আপকে লিয়ে নোকরী য়ায়েগা।" "পঁরতিস্, পঁরতিস্।" ভাবটা এই যে, যদি জিনিষগুলি ঠিক মিলাইয়া দিতে না পারি তাহা হইলে আমার কাজ যাইবে। সে লোকটা কবলের সংখ্যা গুলিতেছিল তাই অনামনস্ক হইলে ভুলিয়া যাইবে বলিয়া সে পঁরতিস্, পঁরতিস্ (৩৫) বলিতেছিল। রাত্রিকালে কেহ খাইবার জল দিয়া যায় নাই। জরে অত্যন্ত পিপাসা পাইতেছিল। উঠিয়া একজনের টেবিলে জল পাইলাম। সেই জল ২১ বার পান করিয়া বাঁচিলাম। পরদিন গাঙ্গুলী মহাশয়কে এই পানীয় জলের অভাবের কথা জানাইলে তিনি ছোটবাবুকে বলিলেন "উপটিসুপারি-টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করুন।" সম্ভবতঃ ইহার জন্য নাস'দের সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

সুরেন্দ্রমোহন ডাক্তারবাবুরের জানাইয়া দিলেন, "তিনি (আমি) একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।" (অবশ্য একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছিল)। আমার প্রথম অসুবিধা দেখিয়াহ সুরেন্দ্রমোহন ডাক্তারবাবুরের অসুরোধ করেন "ইংলান্ডে ইলিয়ট ওয়ার্ডে পাঠান হটক।" এখানে ছাত্রেরা অসুস্থ হইলে আশ্রয় লয়, ছাত্রেরাই সেবকের কাজ করে। স্থানটিতে বাসের সুবিধা খুব। কিন্তু ইচ্ছাবসন্ত ও কলেরাবিভাগে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার লোকজনের একান্ত অভাববশতঃ তাহা করা হয় নাই।

প্রথম দিন রাত্রিতে শর্করাবিহীন দুধসাপ্ত খাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিন অনেক ছাত্রকে বলিলাম যেন আমাকে দুধ ও সাপ্ত পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। বেলা ১০টার সময় তিন ছটাক আন্ডাজ দুধ পাইলাম। সাপ্তর কথা বলিলে নাস' উত্তর করিল "ও সাপ্ত খাবে না বলার উত্তাকে কেবল দুধ দেওয়া হইয়াছে।" আর সাপ্ত চাওয়ার গুলিলাম পাইব না। রাত্রিকালে আবার সেই শর্করাবিহীন দুধ সাপ্ত। খানিকটা খাইয়া আর পারিলাম না। তখন অবশিষ্ট সাপ্ত রাখিয়া বলিলাম "আচ্ছা থাকিল, কাল ডাক্তারবাবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেমন

করিয়া বিনা চিনিতে সাগু খাওয়া যায়।” হরমোহনবাবু দয়া করিয়া নাসকে চিনির কথা বলিলে নাস বাজার হইতে চার পরসার চিনি আনাইয়া দিলেন। পরসার দিতে গেলে লইলেন না। এই নাসটির সহিত হরমোহনবাবুর পূর্বের পরিচয় ছিল। হরমোহনবাবুর প্রমুখ্যৎ আমার পরিচয় পাইয়া পরে ইনি আমার সহিত বড় সদ্‌ব্যবহার করিতেন। আমি কেমন আছি, আমার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না প্রভৃতি কথা ইনি নিজের ডিউটীর সময় জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু চিনি আনিয়াছিল অন্য কারণে। পরে শুনিয়াছিলাম, যাহাকে দুধ দেওয়া হয় তাহার জন্য ভাণ্ডার হইতে এক আধ ছটাক করিয়া চিনি আসে। পরে কখনও দুধের সঙ্গে আমাকে চিনি মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কখনও পৃথক্ চিনি পাইয়াছি কখনও একেবারেই পাই নাই।

ক্যাথল হাঁসপাতালে রোগীর পথ্যপথ্য বিষয়ে যেমন ব্যবস্থা আছে, তাহা বোধ হয় এক মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল ছাড়া, অন্যত্র আছে বলিয়া শুনি নাই। রোগীর অবস্থা বিশেষে প্রত্যাহ আধসের করিয়া খাটি দুধ তাহার সঙ্গে চিনি, রোগীর পথ্য ফল, চা ও অভ্যাস থাকিলে আফিম পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। খুব সরু পুরাণ চাউলের ভাত, যুগের ডাল ও সব রকম তরকারী দেওয়া হয়। কিন্তু তরকারীগুলির খোসা না ছাড়াইয়া একসঙ্গে রাঁধা হয়। আমি যখন খাইতাম তখন দেখিতাম, রান্ধা আলু, গোল আলু ঝিঙ্গে পটোল ঝিলাতী কুমড়া সবই এক সঙ্গে আছে। ২৪টা পেঁয়াজের টুকরাও দেখিতাম। ইহা বোধহয় মশলারূপে দেওয়া হইত। সমস্ত তরকারী মিলিয়া ঝোল ঝোল একটা অপূর্ব জ্বা হইত। ইহাকে বাঙ্গালীর রান্নার কোন শ্রেণীতেই ফেলা চলে না। ডালনা নয়, চাচ্চরী ত নয়ট, ঘণ্টা নয়, রসা ঝোলও নয়। তন্নির বড় একটুকরা মাছভাজা রোগীরা পায়। আমি নিরামিষভোজী, পেঁয়াজও খাই না। কিন্তু কি করি, পিঁয়াজ পাইলে ফেলিয়া দিতাম। অবশ্য একুপ তরকারী রাঁধার জন্য কর্তৃপক্ষের দোষ দেওয়া চলে না কারণ ৭০০ রোগীর না হউক ৩০০১৫০০ রোগীর জন্য শুকনো ডালনা রান্ধা করা বড় সহজ কথা নয়।

একজন রোগীর দুই পায়ের আঙ্গুল কাটিতে হইয়াছিল। তাহার জন্য ১১ টাকা দিয়া বুট কিনিয়া দেওয়া হইল। শুনলাম সে নিঃস্বল বলিয়া তাহার রাহা খরচও দেওয়া হইবে।

আমি প্রথম ৩ দিন দুধসাগু খাইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম দিন দুধ কুটি খাই। এইবার চিনি পাইতাম। পঞ্চম দিন পথ্য লিখিবার সময় ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “দুধকুটি খাইবেন?” সেই দিনকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাবিয়া আমি বলিলাম “হঁ।” ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের কাজ ছিল রোগীদের অবস্থা লেখা, কয়েকজনের কাজ ছিল দিনে তিন বার করিয়া ঔষধ খাওয়ান। আমাদের দিকে যে রোগীদের অবস্থা লিখিত সে আমার সে দিন জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কি কাল ভাত খাইবেন?” আমি বলিলাম “কাল নিশ্চয়ই।” তখন সে ডাক্তার বাবুর লেখা “দুধকুটি ও অতিরিক্ত আধসের দুধ” কাটিয়া লিখিয়া দিল “মিশ্রপথ্য” অর্থাৎ “ভাত ও কুটি”। ছাত্র চলিয়া গেলে দেখিলাম দুধের কথা একেবারেই লেখে নাই। ডায়েট সরকার ও নাস আসিলে আমি বলিলাম “ডাক্তার বাবু আমার অতিরিক্ত দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু ছাত্র ভ্রমক্রমে দুধের কথা লেখে নাই।” ভাষায় কেহ উচ্চবাচ্য করিল না। দুই দিন দুধকুটি দিবার সময় কখনও কম দুধ দিত কখনও ঠিক দুধ দিত। একবার অত্যন্ত দুধ পাইয়া ডাক্তার বাবুকে দেখাইলাম। তিনি নাসের নিকট হইতে আবার দুধ আনিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবুকে ষষ্ঠ দিন প্রাতঃকালে দুধের কথা বলিলে ডায়েট সরকার ও নাসকে বলিয়া আমার দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যথাসময়ে সাড়ে ৯টা কি ১০টার সময় দুধ পাইলাম। ভাত খাইব বলিয়া সুরেন্দ্রমোহন ১টা লেবু কাটিয়া আনিয়া দিয়াছেন। পার্শ্বওয়াল

দ্বিজ দেখিয়া তাহাকে বলিলাম “তুমি ভাত দিলে খাইব। অন্যে যেন না ছোঁয়। আর আমাকে মাছ দিও না আমি মাছ খাইব না।” সে তথাস্ত বলিয়া চলিয়া গেল। আমার হাতে “বডি অয়েল” লাগিয়াছিল বলিয়া আমি কলে হাত ধুইতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, নাস’ বুট-পর্য্য গাউন-পর্য্য অল্পপূর্ণাক্রমে মগে করিয়া থালায় থালায় অন্ন পরিবেশন করিতেছে।

দেখিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। আমি পাণিওয়ালাকে বলিলাম “আমায় ভাত দিবার পূর্বে কেন ইহাকে ছুঁইতে নিলে?” সে বলিল “কি করিব? মামা আমার কথা শুনিল না।” তখন ইংরাজীতে নাসের সঙ্গে আমার বচসা আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম “তুমি ছুঁইয়া নিলে, আমি খাই কেমন করিয়া? সে বলিয়া উঠিল “সবাই খায় তুমি কেন অপত্তি করিবে?” আমি বলিলাম “আমি হিন্দু, তোমার ছোঁওয়া ভাত খাইতে পারি না। “সবাই খায় তাহাতে আমার কি?” কথাটা এই—এ বিভাগে যে সকল হিন্দু আছে তাহাদের অধিকাংশই ভিখারী শ্রেণীর। অনেকে চিকিৎসার্থ আসিয়া আর যাইতে চাহে না। তাহারা ছুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইলে বাঁচিয়া যায়, তা যে দিক না কেন। যে ছুকেজনের আপত্তি আছে তাহারা ভরে কিছু বলিতে পারে না, ভাবে হাঁসপাতালের ব্যাপারই এইরূপ, আপত্তি করিলে শুনিবে কে?” কাজেই নাসদের কেহ কখনও কিছু বলে নাই। আবার যাহারা উদ্ভিষ্টে পারে না, তাহারা জানিতেও পারে না বারান্দায় কি হইতেছে। পানিওয়ালা বা কুলি রোগীর নিকট গিয়া ভাত দেয়। তাহাদের গায়ে জামা থাকে সুতরাং তাহারা কি জ্ঞাত তাও রোগীরা সহজে জানিতে পারে না, জানিতে চাহেও না। অপর পক্ষে নাসরা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছে। হাঁসপাতালে যে সকল দরিদ্র হিন্দু রোগীকে দেখিতে পায় তাহাদের সকলকেই নিজেদের চাঠিতে ক্ষুদ্র ভাবে। সেই ক্ষুদ্র যে দর্প করিয়া বলিবে “আমি তোমার ছোঁওয়া ভাত খাইব না”, ইহা নাসদের পক্ষে অসহ্য। ভাই যদি কেহ কোনকালে আপত্তি করিতে থাকে তাহা হইলে তাগা অগ্রাহ্য করিয়া সেই ক্ষুদ্র হিন্দু রোগীর দর্প নাসমহোদয়রা হয় তো চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকিবেন। নাসরা এখানে সর্ব্বদায় কর্ত্তী। চাকর বাকরও রোগীদের সম্মুখে আমি ছোঁওয়া ভাত খাইতে আপত্তি করায় তাহাদের আত্মস্তম্ভিতায় বোধ হয় একটু আঘাত লাগিল। সে দলিতা ফনিগীর ন্যায় ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল “তোমরা চামারের হাতে খাইতে পার, আর আমি কি চামার হইতে উঁচু জাত নই?” “চামারের হাতে আমি খাই না” বলিয়া আমি বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকিলাম। পরে আর একবার বারেন্দায় গিয়া নাসকে বলিলাম “বদি রান্নাঘরে ভাত থাকে আমাকে আনাইয়া দেও।” সে একটা ক্ষুদ্র “না” উচ্চারণ করিয়া ভাত পরিবেশন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ১০।১৫ মিনিট পরে সে এক চাকরকে ভাত দিয়া অথ দ্বার দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। চাকর আমার টেবিলে ভাত রাখিতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কোথা হইতে আনিলে?” সে বলিল বাবুজিখানা হইতে।” আমার কেমন সন্দেহ হইল, এই নাস’ বলিল রান্নাঘরে ভাত নাই। আবার কোথা হইতে আসিল। আর রান্নাঘর হইতে এত শীঘ্র যাতায়াত অসম্ভব। সে চলিয়া গেলে হিন্দুস্থানী বালকটী বলিল, “বাবু ওকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি ও কি জাত?” আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম “তুমি কোন্ জাত?” উত্তরে শুনিলাম—চামার। “তুমিহারা দেশে যিশ্কা জনেউ গৈ, উয়া তুম্‌হারা ছুঁয়া ভাত খাও হৈ?” উত্তর “নেহি”। “তব্ তুম্ কেঁও মেয়া লিয়ে ভাত লায় হৈ?” “মাযাকে জুম্‌মে”। রাগিয়া বলিলাম “উঠাও ইহাসে”। টেবিলটা জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলাম।



জুৎপরে লেবুর রস দিয়া চিনির সরবৎ করিয়া খাইলাম। দুধটুকুও খাইলাম। এইরূপে আমার প্রথম দিন অন্ন-পথা হইল।

বৈকালে ছোট ডাক্তারবাবুকে সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। তিনি আমার অভিযোগ ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানাইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া আমার এজাহার লইলেন। আমি সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলাম “দেখুন কেহ আপত্তি করে না এই ভুল ধারণায় নাস’ যে ভাত ছুঁইয়া দিয়াছিল ইহাতে আমি তাহাকে দোষ দিই না কিন্তু সে যে পানিওয়ালাকে রান্নাঘর হইতে আবার ভাত আনিতে না পাঠাইয়া, চামার কুলিকে পাঠাইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতেছে সে আমার নবন দুঃখ দিব্যর জ্ঞান এই পরিহাস করিয়াছিল।” সেইদিন রাত্রে শুনিলাম এই নাস’টির বন্দী হইয়াছে।

দুধকটি বা দুধসাগু পথা সকালে সাড়ে ৯টা দশটার সময় ও ভাত প্রায় এগারটার সময় দেওয়া হয় এবং বৈকাল ৫টার সময় ভাত রুটি ও রাত্রি সারে সাতটা আটটায় দুধ বা দুধসাগু প্রভৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং বৈকাল ৫টার মেনিন রুটি ও তরকারী খাইলাম। ডাল লইলাম না, মাছ আমি খাই না। বড় পাতলা রুটি ৪ খানি করিয়া পাইতাম ইহার মধ্যে ৩ খানি খাইতাম, একখানি খালায় রাখিয়া দিতাম, কোনদিন বা কাহাকে বিলাইয়া দিতাম। সেদিন ভাত ও রুটি দুই বেলা খাইলাম কোন গোল হইল না।

অষ্টম দিনে প্রাতঃকালে সেই নাস’টি আসিয়া আমার প্রতি নানা প্রকার অশুভ্রহ দেখাইতে লাগিল। বড় ডাক্তার বাবু নাস’টিকে আমার ঘরে পাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন “তোমরা ভাত ছোঁও কেন? তোমরা দেখিবে যেন রোগীদের পথা দেওয়া হয়।” নাস’ আম্তা আম্তা করিয়া কি একটা উত্তর করিল। তাহার পরে ষত দিন ছিলাম, এই নাস’কে আর আমাদের ওয়ার্ডে’ দেখি নাই।

এই দিন আমরা শ্রান করিয়া ঘর বসিয়া আছি। সাধারণতঃ বেলা ১১টার সময় আমাদের খাওয়া হয়, আজ ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ভাত রাখিয়া পানিওয়ালা ডাল-তরকারী আনিতে গিয়াছে। ইহার মধ্যে এক নাস’ আসিয়া ভাত ছুঁইয়া দিলে, আমি বারান্দায় আসিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার পরে কথোপকথনটা এইরূপ চালিল,—

নাস’। তুমি হুকুম করিবার কে? আমি ছুঁই না ছুঁই তাহাতে তোমার কি?

আমি। আমি খাইব, আর তুমি দেখিবে। আমি বলিব না ত বলিবে কে?

উদ্ভিন্ন ডাক্তার বাবু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে ভাত পরিবেশন করা বা ছোঁয়া নাস’দের কর্তব্যের মধ্যে নহে; তাহার দেখিবে যে, যাহারা ভাত খায় তাহারা ঠিক পাইতেছে কিনা।

নাস’। এত বেলা হইয়াছে, সিক্তমানেরা ভাত পাইতেছে না, আমি সেই জন্ত ভাত ছুঁইয়াছি।

আমি। তুমি ভাত ছুঁইয়া কি কাজ বাড়াইলে?

নাস’। চুপ্ কর—

আমি। তুমি চুপ্ কর।

নাস’। কি আমার অধীন হইয়া আমাকে চুপ্ করিতে বলা!

আমি। কেন বলিব না? আমি ভদ্রলোক (অবশ্য রেলের বিধান মতে নই)। তুমি আমাকে প্রথমে চুপ করিতে বলিলে আমি ছাড়িব কেন?

তখন নাস' মহোদয়, যেমন চাকরবাকরদের উপর কথায় কথায় রিপোর্ট করেন, সেই রূপ আমাকে ভয় দেখাইয়া গেলেন যে আমার উপর রিপোর্ট করিবেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, “যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হই, তাহা হইলে স্কুলের ছাত্রের মত আমার জরিমানা হইবে, না পথা বন্ধ হইবে?” খানিকক্ষণ পরে নাস' ফিরিয়া আসিয়া ভাত পরিবেশন করিতে লাগিল। আমি আবার বারান্দার গিয়া বলিলাম “আজ তুমি আমাদের তিনজনকে উপবাসী রাখিলে।”

বলিতে ভুলিয়াছি যে, ইহার পূর্বে যেদিন ভাত ছোঁয়া হয় সেদিন আমাদের ঘরের সকলে পূর্বেই ভাত লইয়া ছিল। আজ আমাদের ঘরে আমাদের লইয়া পাঁচ জন রোগী, শিখ সিপাহী ও ব্যারাকের পাচক ব্রাহ্মণ নাসের ছোঁয়া ভাত খাইল না। আবার দুইজন তখন ভাত খাইত না। নাস' দেখিল যে, তিন জন রোগী ভাত না খাইলে তাহার দোষ হইবে। সে তখন পানীওয়ালাকে বলিল “দেখ যদি রান্না ঘরে ভাত থাকে আনিয়া দাও নতুবা উহার আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবে।” পানীওয়াল শিখ সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ভাত আনিয়া দিল। ভাল ভাত পাইলাম কিন্তু তরকারী নাই, তরকারী বোধহয় ফুরাইয়া গিয়াছিল। নাস' একবার আমার বলিয়াছিল, “আমায় বলিলে না কেন যে আমার ছোঁয়া ভাত তোমরা খাইবে না?” আমি তখন উত্তর দিয়াছিলাম “আমি কেমন করিয়া জানিব যে তুমি ভাত ছুঁইয়া দিবে?” তাই ভাবিলাম যে, আর এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া কাজ নাই। কিন্তু ছোট ডাক্তার বাবু নাসের রিপোর্ট পড়িয়া স্বয়ং ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সমস্ত ব্যাপার জানান। শুনিলাম তিনি ইহার পরে স্বকুম দেন যে, সমস্ত হাঁসপাতালে নাসের বা কোন ইতর জাতীয় কুলী ভাত ছুঁইতে পাঠবে না। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য আমি ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডাক্তার শ্রীলালবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়কে পৃথক পৃথক পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই।

ইহার পরে ভাত আসিলেই পানীওয়াল আমাকে পাহারায় বসাইয়া রাখিয়া ডাল তরকারী আনিতে বাইত। নাসদের নিজেদের বা আত্মীয় স্বজনের দুই চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়াছিল। কারণ যে সকল খাদ্য দ্রব্য আমি হাত দিয়া নাড়ি নাই তাহা কাগজের ঠোঙা হইতে মাঝে মাঝে তাহাদের হাতে ঢালিয়া দিতাম। তালের মিছরী তাহার মধ্যে ছিল প্রধান দ্রব্য। একজনকে দিতেই সে গিয়া আর সকলকে ডাকিয়া আনিত। তাহার পরে প্রত্যহ দুই বেলা আমাকে কাছে তাহারা আসিয়া ফল ও তালের মিছরী খাইত। কখনও কখনও পয়সা দিয়া তালের মিছরী চাহিত। একদিন দেখি, বড় ছেলেটি কতকগুলি বিকুট ও লজ্জস্ব আমার জন্য আনিয়াছে। আমি স্বস্ত্যবাদ দিয়া বলিলাম “ওসব জিনিষ আমি খাই না।” সে দুঃখিত হইয়া সঙ্গীদের বলিল “এঁর জাত যাবে।” (It will break his caste) আমি বলিলাম “ঠিক তা নয়, আমি ওসকল বড় পছন্দ করি না।” এই ছেলেগুলি কখন হিন্দীতে; কখনও বা ইংরাজীতে কথা বলিত। বারান্দায় ভাত পাহারা দিতে বসিলে, ইহারা এক একখানি প্লেট হাতে করিয়া হাজির হইত। নাসদের নিকট আমার কথা বোধহয় সব শুনিয়াছিল, তাই বড় ছেলেটি ইংরাজীতে সঙ্গীদের একদিন বলিতেছিল “ইনি একজন ভদ্রলোক” (He is a gentleman)। ছুঁয়ে না (Don't touch)। ইনি খাইবেন না (He won't eat)। ইহার পরে আর খাইবার পক্ষে কিছু গোলাযোগ হয় নাই।

১লা মে শিখ সিপাহী ও দুইটি হিন্দুস্থানী রোগী ছুটি পাইল। সকলেই যাইবার সময় আমার নমস্কার করিয়া শিখ সিপাহী আমাকে ছাড়িয়া যাইতে যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিল “বাবু সাহেব, কয়দিন আপনার সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটাইয়াছি। আপনাকে একক ফেলিয়া আমরা চলিলাম ইহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু বাস্তবিক মুক্তি

পাইয়া অ'জ আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। মেসোপোটেমিয়ায় পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে ঠিক এমন পড়িয়াছিলাম। যেদিন আমার টিকিটে লালকালীতে লিখিয়া দেওয়া হইল 'টু ইণ্ডিয়া' ( To India ) সেদিন যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আজ আমার ঠিক সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। আপনারও সেইরূপ আনন্দ শীঘ্র হউক।" ইহার পরে আমার গৃহের সঙ্গী থাকিল হামরোগে পীড়িত বালক।

আমি যখন প্রথম হাঁসপাতালে আসি, তখন এ বালকটি মধ্যে মধ্যে বিকট চীংকার করিত। লোকে এক আনন্দে বা যন্ত্রণায় চীংকার করে। উভয় সময়েই অপরকে ভাগ দিতে চায়। তবে যন্ত্রণার চীংকারে সাহায্য প্রার্থনা করে এই পার্থক্য। যেখানে সাহায্য প্রার্থনা করে না, সেখানে শৈশবের সাহায্যকারী অনুপস্থিত মাতা বা পিতার উদ্দেশ্যে চীংকার করে। আমি প্রথম প্রথম ইহার চীংকারের অর্থ বুঝিতাম না। পরে একদিন থাকিতে না পারিয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বালক বলিল "আমি মলত্যাগ করিব কিন্তু আমি উঠিতে পারি না, মেথরকে ডাকিয়া দেন।" ইহার পরে যখনই সে চীংকার করিত, তখনই আমি গিয়া তাহাকে আমার কুজো হইতে শীতল পানীয়জল দিতাম কিংবা মেথরকে ডাকিয়া দিতাম। তাহার চীংকারে অল্প কয়েক বড় কর্ণপাত করিত না। আমি ৬ই মে মুক্তিলাভ করি। সেদিন তাহাকে ডালভাত পথা থাইতে দেখিয়াছি এবং স্বয়ং উঠিয়া পায়খানা বাইতে পারিত। সে যখন বলিত "বাবু সাহেব, আজ বহুত্ আনন্দসে থাখা;" তখন তাহার মুখে হাসি দেখিয়া আমারও বড় আনন্দ হইত।

আমি যেদিন হাঁসপাতালে বাই তাহার পরদিন বৈকালে হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চুর্ণাদাস লাহিড়ী মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন "আমি সভার কার্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম। আমি কিছুই জানি না যে, আপনাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসিতেছে। আমাদের উচিত ছিল আপনাকে হাওড়াতেই পৃথক্ বাসাতে রাখা। বাধা হউক, আপনাকে কিছু টাকা দিয়া বাইতেছি বাহা প্রয়োজন হইবে তাহা আনাইয়া লইবেন। একটা লোক এখানে বসাইয়া রাখিব, আপনার কাজ করিয়া দিবে। আর ডাক্তার শ্রীচরীলাল বসু মহাশয়কে বলিয়া আপনার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব।" আমার টাকা জমা ছিল, ছুটি না পাঠিলে তাহা ক্ষেপত পাইব না : অথচ একদিনেই বুঝিলাম আমার কাছে যে দশ আনা পয়সা আছে তাহাতে কিছুই হইবে না। কাজেই আমি ছুটি টাকা চাহিয়া লইয়া সুব্রহ্মমোহনকে রাখিতে দিলাম। তৎপরদিন বেলা ১০টার একটা লোক আসিল। আমি তাহাকে বাহিরে বসিতে বলিলে সে উত্তর করিল "আমি বসিবার জায় আসি নাহ, আপনি কেনন আছেন লাহিড়ী মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন।" সুতরাং আমি ভাল আছি জানাইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। তৎপরদিন বৈকালে বাঁটরার শ্রীমতীচরণ পাল আমার সংবাদ লইতে আসিলেন ও আমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়া গেলেন। ইনি প্রত্যহ চাঁদনার শ্রীঅখিলচন্দ্র পালের দোকানে কাজ করিতে আসিতেন সুতরাং প্রায় প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতেন। লাহিড়ী মহাশয় আর একদিন আসিয়াছিলেন।

নিতাইবাবু আমার কথা মত পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া ২৯এ এপ্রিল তারিখে আমার পালিত পুত্র বাঁকীপুর হইতে আসিয়া বাঁটরার নিতাইবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যাকালে আমার দেখিতে আসিল, তাহার ইচ্ছা ছিল সে আমার বন্ধমানের বাসায় লইয়া গিয়া সেবা গুরুত্ব করিবে। কিন্তু ট্রেনে যাওয়া নিষিদ্ধ জানিয়া সে অভিশ্রম তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। আমি বলিলাম "এখন আমার কোন অসুবিধা নাই। বসন্তের ফোটক প্রায় শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধহয় পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিব।" সে সেরাতি কলিকাতায়

থাকিয়া পরদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার উপদেশ মত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল। তাহাকে কলিকাতায় রাখিলে আমার হয় ত অনেকটা সাহায্য হইত। কিন্তু ভাবিলাম বিধাতাই যখন আমাকে আমার কর্মস্থল হইতে টানিয়া আনিয়া নির্বাহক অবস্থায় হাঁসপাতালে ফেলিয়াছেন, তখন আর অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? আজ হাঁসপাতালের তরকারী রান্নার কথা মনে করিয়া আমার ঘৃণা হইতেছে। আমি নিরামিষভোজী বলিয়া তিন চার রকমের নিরামিষ তরকারী নইলে আমার খাওয়া হয় না। অথচ আমার জনৈক ছাত্র (সে আবার মেডিকাল স্কুলের ছাত্র) বাস। হইতে তরকারী আনিয়া দিতে চাওয়ার আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। ভাবিতাম বিধাতা যখন আমার এমন স্থানেই ফেলিয়াছেন, তখন আমার সংঘম শিক্ষারই পরিচয় লইবেন। তাই চাঁদ মুখ করিয়া সেই অপূর্ণ তরকারী খাইতাম, ডালে হুন কম হইলেও একদিনের জন্য হুন আনিয়া রাখিবার কথা আমার মনে হয় নাই। মাহুষ কোনরূপ দুঃখকষ্টে পড়িলে সাধ্যমত অপরকে ভজ্ঞন্য দোষী করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, অভাবে বিধাতা বা অদৃষ্টপুরুষের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয়। এমন কি ইংরেজেরা এখানে বলে accident আমরা সেখানে বলি 'দৈবাত' অর্থাৎ দেবতা করিয়াছে। আমি পীড়ার কথাটা দশ জনের মত একটা সাময়িক প্রোপা বলিয়া ধরিয়া লইলাম কিন্তু এটা ঠিক বুদ্ধি উঠিতে পারিলাম না যে, কেমন করিয়া এমন ঘটনা ঘটিল বাহাতে আমার কর্মস্থলে কিরিয়া যাইবার উপারটি পর্য্যন্ত থাকিল না। আরব্য রজনীর দৈত্য যেন ঠিক আমার সময় মত আনিয়া হাঁসপাতালে ফেলিয়া দিয়া গেল। যেন একজন পাকা দাবা খেলোয়াড় পূর্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে কয়তালে এবং কোন্ কোন্ বলের কিস্তীতে মাত করিবে এবং সময় হইবামাত্র এমনই উপযুক্ত প্যারি কিস্তি দিল যে আমি ভাবিবার চিন্তিবার অবসর পাইলাম না। যে অদৃষ্টবিধাতা আমাকে লইয়া এই দাবা খেলা খেলিতেছিলেন, তিনি যে ধরে আমাকে মাং করিবেন বলিয়াছিলেন যেন ঠিক সেই ঘরেই মাং করিলেন।

একটি ঘটনার কথা এখানে বলি। আমি রাত্রিকালে একা আমার কক্ষে শুইয়া আছি। আর তিনখানি খাট শূন্য। গরমে ঘুম হইতেছে না, রাত্রি তখন বারটা। হঠাৎ আমার বাহিরের কক্ষে আলো জলিয়া উঠিল। এই কক্ষে দুইখানি খাট, একখানিতে হামে পীড়িত বালক থাকে অপরখানি শূন্য ছিল। এই খাটখানিতে চাকরেরা চাদর পাতিয়া গেল। একটু পরে একখানি স্ট্রেচারে করিয়া একটি লোককে লইয়া আসিয়া এমন নিশ্চম ভাবে হাত পা ধরিয়া টানিয়া খাটে ফেলিল যে, তাহা দেখিয়া আমার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। এই কুলিরা এমন স্তব্ধমুখ যে, তাহারা জীবিত ও মৃতের শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না। খানিকক্ষণ পরে ছোট ডাক্তারবাবু আসিয়া জল গরম করিয়া আনিতে বলিলেন। আরও কি ঔষধপত্র ও ঠাণ্ডা জল আসিলে রোগীর হাত পা কাপড় দিয়া খাটের সঠিক বিন্যাস হইল। তৎপরে একটা নলের একদিক মুখ দিয়া খানিকটা অম্লনাশীর মধ্যে দেওয়া হইল অপর মুখের একটা বাটার মত পাতে জল ঢালা হইতে লাগিল। জল পূর্ণ হইয়া গেলে সে মুখ খাট অপেক্ষা নীচে ধরিতেই পেটের সমস্ত তরল পদার্থ নীচে পড়িতে লাগিল। এইরূপে কয়েকবারে পাকায় ধোয়া হইলে বস্তুতে কি ঔষধ ভেজ্জেশন কর হইল। এই রোগীর স্ত্রীকেও নারীবিভাগে ঠিক এইরূপ করা হইলে রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় ওয়ার্ড হইতে ডাক্তার বাবু ঘরে গেলেন। পর দিন বৈকালে লোকটির জ্ঞান হইলে শুনিলাম সে কানপুরে এক দেবালয় স্থাপন করিয়াছে তাহার ঐশ্বর্য পত্নীকে সঙ্গে লইয়া। ডাক্তার কলিকাতায় বেড়াইয়া বেড়ায়, রাত্রিকালে গঙ্গার ঘাটে শুইয়া থাকে। এক দিন সন্ধ্যা কালে (মঙ্গল বার) কোন হিন্দুস্থানী আসিয়া ইহাদের খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া বাইতেছিল। ইহাদের একবার আহাং হইয়াছিল বদীয়া আহাং

তেমন ইচ্ছা ছিল না, তাই খানিক দূর গিয়া লোকটি ইহাদিগকে এক নির্জন স্থানে বসাইয়া দোকান চটতে খাবার আনিতে গেল। সেই খাবার খাইয়া ইহারা স্ত্রীপুরুষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং ইহাদের সঙ্গে অলঙ্কার ও ৩৪টি টাকা অপহৃত হয়। ডাক্তারেরা বলেন ইহাকে ধুতুরা খাওয়ান হইয়া'ছিল। ইহার ২৪ দিন পরে বেলা ৩টার সময় একজন মুচিকে এই বিধানায় আনা হয়। ইহাকে এক জোড়া নূতন জুতা লেভে কালীঘাটে কেহ বেলা ৮৯টার সময় ধুতুরা খাওয়াইয়াছিল। এই সকল রোগী রেডক্রস সোস ইটিং এম্বুলেন্স মোটরে আনীত হয়। কাম্বেল হাসপাতালে একখান ইহাদের মোটর থাকে, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগীকে এখানে পঠাইতে হইলে সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র বিনামূল্যে এই মোটরে তাহাদিগকে আনা হয়। অন্য প্রকার রোগীকে আনিতে ভাড়া লাগে। কাল পাত য এইরূপ তিন চারি খান মোটর কাজ করে বলয়া শুনিয়াছ।

এইবার আমার মুক্তির কথা বলিয়া এই সুদীর্ঘ বিবরণ শেষ করিব। এলা মে পর্যন্ত বড় ডাক্তারবাবু পেভাল আমাদের কক্ষে আসিতেন, তাঁহার সঙ্গে একজন, বড় তালের পাখা লইয়া বাতাস করিতে থাকিত। কারণ ক্রিজাসায় শুনিলাম সমস্ত রেসিডেন্ট বড় ডাক্তার সম্মুখে এইরূপ নিয়ম, যাহাতে রোগীর কক্ষের মাছি ডাক্তার বাবুর গায়ে বসিতে না পারে তজ্জ্বত বাতাস করা হয়। কিন্তু সুপারিন্টেন্ডেন্ট বখন প্রথমদিন আমার কক্ষে আসিয়াছিলেন তখনও তাঁহার সঙ্গে পাখা ছিলনা, তাহার পরে উপষাপরি ৪দিন আসিয়া আমার সহিত কথা বলিয়া আমাকে অন্তর দিয়া গিয়াছিলেন তখনও তাঁহার সঙ্গে পাখা ছিলনা। ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার কক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গেও পাখা দেখিনাই। ছোট ডাক্তারবাবু, নার্স, ছাত্র, চাকর বাকর প্রভৃতি কাহারও সঙ্গে পাখা নাই। ভাবিলাম ইহাদের সকলের জীবনের অপেক্ষা কি বড় ডাক্তারবাবুর জীবনের মূল্য অধিক? যাহা হউক ২রা ও ৩রা মে বড় ডাক্তারবাবু আমার কক্ষের দিকে যথ বাড়াইয়া চলিয়া গেলেন, ৪ঠা আমাদের ওখানে তিনি আসিলেন না। এইম্নে আমার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনে হইল এইরূপ অবস্থায় তিনি অনেককে মুক্তি দিয়াছেন, আমাকেও দিতে পারেন কিন্তু তিনি আমার কক্ষের দিকে চাহিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি একটি ছাত্রকে বলিলাম, আমার নিবেদনটা জানাও। উত্তরে শুনিলাম ডাক্তারবাবু বলিলেন “আরও দু'একদিন থাক।” শুনিয়া আমি দমিয়া গেলাম। ছোট ডাক্তার ত্রীনাথবাবু কি কারণে পূর্কদিন আসেন নাই। তিনি সকালে আমার দেখিয়া মুক্তির কিঞ্চিৎ আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের জ্ঞান বড় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছিলেন না। বৈকলে আসিলে তাহাকে বলিলাম “যদি বৃহস্পতিবার নাগাদ মুক্তি না পাই তাহা হইলে আমার জারি মুক্তি হইবে,” তিনি বললেন “আমি আলিপুরে বদলী হইয়াছি নতুবা আমিই বড় ডাক্তারবাবুকে সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। আপনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলে তিনি বিবেচনা করবেন।” পরদিন দেখি ছোট ডাক্তারবাবু সকালে আসিলেন এবং বড় ডাক্তারবাবু আসিলে তাঁহাকে আমার মুক্তির কথা বলিলেন। তিনি আমায় দেখিয়া মুক্তির আদেশ দিলেন। পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন তখন আমার কি আনন্দ হইল। প্রথমেই মনে হইল, বারান্দায় বসিয়া যে রাত্তার আমি প্রত্যহ গাড়াপোড়া ও স্বাধীন মানুষ চলিয়া বাইতে দেখি আজ আমি সেই রাত্তার চলিতে দ্বিরিতে পারিব। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আমার কাপড়চোপড় আনিতে বলিয়া স্নান করিতে গেলাম। কাপড় আনিতে পরিয়া বাহিরের মুক্ত জীব হইলাম, এখন আমি কেহ আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিবে না তবুও হাতা ছাড়াইবার পূর্ক পর্যন্ত আমার সম্পূর্ণ আশঙ্কা গেল না। এক একবার মনে হইল, হয়ত কোন ছুতানেতা করিয়া আবার আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। আমি প্রথমেই, আপিসে জমা করা টাকা আনিতে গেলাম। আপিসের বাবু এক ঘণ্টা পরে আসিতে বলিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া আহার

করিয়া আবার গিয়া টাকা লইলাম। তৎপরে রাস্তায় গিয়া টাকা ভান্জাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। জিনিষপত্রগুলি বাঁধিয়া লইয়া বক্শীস ও ভিক্ষায় ১৮/১০ খরচ করিয়া হাসপাতালটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া ৩৬নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোডের মেসে গেলাম। এখানে স্বরেন্দ্রমোহন থাকেন, তাঁহার নিকট ঘড়িটি রাখিয়াছিলাম। আজ তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিকের পরীক্ষা। দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত মেডিকাল কলেজে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সুতরাং প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি আসিলে, তাঁহার পরীক্ষা সম্বন্ধে হইলেও তিনি যে, প্রত্যাহ একবার কোন কোন দিন দুইবার পর্য্যন্ত আমার খবরাখবর লইয়া আমার হৃৎকণ্ঠ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির অভিমুখে চলিলাম। অবশ্য আমাকে টামে চড়িয়েই যাইতে হইল। এখানে বাইবার প্রধান উদ্দেশ্য পদবল্লভর ২য় ভাগ ক্রয় করা। কার, শেষ সংখ্যা পরিষদ পত্রিকার পদকল্পত্র ২য় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম।

মুক্তি পাইয়া প্রথম যখন বাহিরে চণ্ডিতে লাগিলাম তখন মনে হইল, বনের পাখীকে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিলে সে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পালাইবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষে বুঝিতে পারে তাহার পালাইবার উপায় নাই; তৎপরে তাহাকে খাঁচার বাহিরে ছাড়িয়া দিলেও সে ঠিক বুঝিতে পারে না যে, সে মুক্ত এবং বহুদিন অনভ্যাসের ফলে সে উড়িতে গেলেও ভালরকম উড়িতে পারে না। আজ আমারও সেই দশা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম চলিতে পাঁকাপিতে লাগিল, জোরে চলিতে পারি না—আমার মনে হয়, হয় ত কেহ দোঁখিয়া বলিতে পারে “না তুমি এখনও নির্ব্যাধি হও নাই।” খানিকটা ঘুরিতে ফিরিতেই মনে হইল, আমি বড় দুর্বল হইয়াছি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিতেছে। হাসপাতালে থাকিতেই শেষ দিকটায় আমার মাথা ঘুরিত, সেইজন্য কিছু কিছু ফল খাইতাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনের প্রাসঙ্গিক সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও বহুদিন রোগ ভোগের পরে সেইদিনই পরিষদে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার “অতীতে ল” প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা হইল। “অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব” নামক এক প্রবন্ধ পরিষদে কেহ পড়িয়া ছিলেন কি পরিষদে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এরূপ একটা ধারণা আমার ছিল। বাঁকীপুরে কোথাও সমস্ত পরিষদ পত্রিকা বাঁধান পাইবার উপায় নাই। আমার নিকটে ১৫৫ পাঁচ বৎসরের আছে। কাজেই একটা সন্দেহ ছিল, হয় ত সেই প্রবন্ধ লেখক আমাকে চোর মনে করবেন। শেষে মিলাইয়া দেখি, তাঁহার ও আমার মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদকল্পত্রক বাঁধাটতে দিগাছে, পাইলাম না। প্রায় ছটার সময় চাঁদনীতে শ্রীঅখিলচন্দ্র পালের দোকানে গেলাম। এইখানে শ্রীনিতাইচরণ রায় প্রত্যাহ কার্যোপলক্ষে আসেন। পূর্বে বলিয়াছি, তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ লইতেন এবং আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া দিতেন। আমার মুক্তির সম্ভাবনা আছে জানিয়া তিনি আমার বিদ্যনা ও বাগ বাঁটরা হইতে দোকানে আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি গেলে তিনি দোকানের বাসায় শীঘ্র শীঘ্র আমার আহ্বানের ব্যবস্থা করিলেন। বাঁটরার বামাচরণ বাবুর ঘরের গাড়ী প্রত্যাহ কার্যোপলক্ষে এই দোকানে আসিয়া থাকে। নিতাই বাবু ও বামাচরণ বাবুর সহোদর দ্বারা করিয়া এই গাড়ীখানি আমার জন্য কিছুক্ষণ রাখিয়া ছিলেন। পরে আমার আগার হইলে আমাকে হাওড়া স্টেশনে লইয়া গিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিলেন।

ইহা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, রাত্রি দশটায় হাওড়া ছাড়ে ও পরদিন বৈকাল সাড়ে ছটার বাঁকীপুরে হাজির হয়। আমি প্রায় সাতটার সময় বাসায় পৌঁছিয়া আয়নার মুখ দেখিলাম। গায়ে কোথাও দাগগুলিতে গর্ত নাই—মুখের দাগগুলিতে বেশ গর্ত হইয়াছে। এগুলির নাম রাখিলাম “সম্মিলনের দাগ।” আমার গুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে প্রবন্ধ লেখাইবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়া ছিলাম। তিনি প্রবন্ধ লেখেন নাই। সাক্ষাৎ হইলে আমার বলিয়াছিলেন, “বাপুহে, সম্মিলনে আমাকে বেশ করে দেগে দিয়েছে, আবার কি আমি সম্মিলনে প্রবন্ধ লিখি?” আমারও আজ ঠিক সেই কথা মনে হইল। আমার গুরু কেবল মনেই দাগা পাইয়াছেন আর আমি মনে ও মুখে দাগা পাইয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয় দুইবারে সুরেন্দ্রমোহনকে আমার জন্য নগদ চার টাকা দিয়াছিলেন এবং নিতাই বাবু কতকগুলি জিনিস কিনিয়া দেন। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন তাহার জন্ত ধন্যবাদ দিয়া আমি জানিতে চাহি তাঁহার কত টাকা আমার জন্য খরচ করিয়াছেন। এটাকা আমি মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে চাহি কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় পত্রের কোন উত্তর দেন নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির আমাকে হাঁসপাতালে পাঠান ঠিক হইয়াছে কিনা ইহা লইয়া বর্ধমান ও বাঁকীপুরে দুই প্রকার অভিমত গুলিলাম। বাঁকীপুরের সুহৃদ-পরিষদের সদস্যরা বলিল “আমাদের এখানে সম্মিলনে যদি কোন প্রতিনিধির একরূপ ব্যারাম হইত, তাহা হইলে আমরা প্রাণ ধরিয়া কিছুতেই তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে পারিতাম না। আমরা তাঁহাকে পৃথক ঘরে রাখিয়া নিজেরাই সেবা করিতাম।” বর্ধমানের একজন নবীন উকীল বলিলেন “সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতি ঠিক কাজই করিয়াছেন। কংগ্রেসে ও বোধ হয় এইরূপ ব্যাপার হইত। ইহা ইংরাজী কার্যদা।” একজন প্রবীণ উকীল বলিলেন “কংগ্রেস ও সম্মিলনে পার্থক্য আছে। কংগ্রেস টাকা লইয়া খাইতে দেয়, সম্মিলন খাইতে দিয়া অতিথি সংকার করে। সম্মিলন কংগ্রেসের জায় পাশ্চাত্য অনুকরণ হইলেও এই অতিথি সংকার রূপ হিন্দুমানী বজায় রাখিয়াছে।” আমি গোড়ায় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি

দোষ কারু নয় গো মা,

আমি স্বথাত সলিলে ডুবি মরি শ্রামা।

তবে আমার গুরু দাগা পাইয়া সম্মিলনে প্রবন্ধলেখা বন্ধ করিয়াছেন আর আমি মনেও মুখে দাগা পাইয়া স্থির করিয়াছি “একালো মুখ আর সম্মিলনে দেখাইব না।” সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠের সাধ মিটিয়াছে। সম্মিলনের কার্য্য বিবরণীতে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে যত লোক পড়ে, যে কোন মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক পড়ে। সুতরাং সম্মিলনে প্রবন্ধ দিলে চতুর্ভুজ হইব না। সম্মিলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈরূপ মিলন হয় তাহাও আমার বৃত্তিতে বাকী নাই। যে পারিচয় লোককে আমি সত্ববৎসর ধরিয়া পত্র লিখিয়া সংবাদ লই নাই, তাহাকে সম্মিলনে যখন সুহৃদরীয়ে দেখিয়াও ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করি “কেমন আছেন?” তখন কি সেটা নিতান্তই পরিহাস হয় না? অথচ এই পরিহাসের অভিনয় আমরা প্রতি সম্মিলনে করিয়া থাকি। আর বড় বড় সাহিত্যিকেরা বহুবার পরিচয় লস্কও যখন চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করেন “আপনার সঙ্গে কোথায় যেন আলাপ হইয়াছে। বাঁকুড়ায় কি?” তখন মনে হয় মা বহুজ্ঞরা কুমি বিধা হও আর এই সম্মিলন তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। অথচ এই সব করিতেই প্রচুর অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মিলনে যাওয়া।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

## খেয়ালী ।

আমার মন মানে না যুক্তি ।  
 ও আপন খেয়ালবশে উপহসে বেদ পুরাণের উক্তি ।  
 উধাও-ধাওয়া ভাবের ঝোঁকে  
 চলছে কেবল পাগলা-রোথে,—  
 দিগ্‌বিদিক্ তার নাইকো চোখে,—  
 জ্ঞানবিবেকের সঙ্গে কভু করবে না সে চুক্তি ।  
 চরণে সে বাঁধন বাঁধে  
 আপন হাতে, আপন কাঁধে  
 ভূতের বোঝা সাধে সাধে  
 তুলছে টানি দিবানিশি চায় না সে যে মুক্তি ।  
 নিভায় সদা আলোর মালা,  
 ভেঙ্গে ফেলে ভোগের থালা,  
 সরায় ঠেলে প্রেমের ডালা,  
 মাড়ায় পায়ে সকল সাধের স্মৃতি-সোহাগের ভুক্তি ।  
 কে জানে ও কিসের খোঁজে  
 আছে সদাই, কি যে বোঝে  
 কে বলবে তা, কুড়ায় ও যে  
 কোন্ কল্প-স্বপ্নের সাগর-তীরে সোণার রেণু শুক্তি ।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ।

## আত্মকর্ষণ

-:~:-

আত্মকর্ষণ বা চরিত্রগঠনই মনুষ্য লাভের একমাত্র উপায় । সংশিক্ষা, সংদৃষ্টান্ত ও প্রেরণামূলক কল্প-  
 সাধন প্রচেষ্টা—আত্মকর্ষণে অবশ্য-প্রয়োজনীয় । সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল হৃদয়ক্ষেত্র, শিক্ষার অমৃতধারা সিঞ্চে সিক্ত  
 ও ধোত না হইলে হৃদয়নিহিত সদ্‌বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটন সম্ভবপর নহে । শিক্ষায় প্রাণশক্তির বিকাশ, যে শিক্ষায়  
 আমরা আপনাকে খুঁজিয়া পাই তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । আপনার শক্তি আপনাতে অনুভব করিতে না পারিলে,



বাহ্যিক বিজ্ঞানাভে পারিপার্শ্বিক জগতের উপদেশ উদাহরণ কার্যাকরী হয় না। তাহাতে মনুষ্যের লাভের আশা সর্বৈব বৃথা! সর্বাগ্রে আপনাকে জানিতে হইবে, আত্মবোধ হইলে স্বজাতি, স্বদেশ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখুঁৎ প্রাণশক্তির অনুভূতি স্বতঃই আপনাতে জাগ্রত হইবে, তবেই না দেশাত্মবোধের অমর প্রেরণা, আমাদের প্রত্যেক মায়ুতন্ত্রাতে আপনাই সাড়া দিয়া উঠিবে। সে শিক্ষা কেবল গুরুর উপদেশে বা শিক্ষকের শিক্ষায় হয় না, লাভ হইবে উহা—স্বতঃপ্রণোদিত স্বভাবের মুহূর্ণ আকর্ষণে। গন্তব্য স্থির রাখিয়া—কর্মক্ষেত্রের পাষণ্ড ঘর্ষণে আপনাকে ঘষিয়াপিষিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে কোন্ট কষ্টবা,—কোন্ট অকষ্টবা। স্মৃতি মলয়ান্দোলিত উপবনের পরিবর্তে পুতিগন্ধ অন্ধকূপে বাস করুক সেই, যে আপনাকে কর্মমুখে উৎসর্গ করিতে ভয় পায়, অনন্ত শাস্ত্রের বোঝা মাথায় আচার্য্যের পশ্চাতে ধুরিয়া মরুক তাহারাই,—যাহাদের হৃদয়ে এই আত্ম-বোধ বর্ণমালার রেখাপাত মাত্র হয় নাই।

কোনও টোলে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে বা দুর্গম প্রদেশে নয়—আত্ম-হৃদয়ই শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। শ্রদ্ধা তাহাতে বীজ, বীৰ্য্য ( উৎসাহ বা বহু ) তাহাতে অঙ্গুর, স্মৃতি তাহাত শাখা, সমাধি ( চিন্তের একাগ্রতা ) তাহাতে পুষ্প এবং প্রজ্ঞা তাহাতে ফলরূপে উৎপন্ন হয়।\* এই প্রজ্ঞা যদি পাইতে হয়—পাওয়া বাইবে তাহা নিজের হৃদয়ে—অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে,—অন্যতের আহত সঙ্কেতে। কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কিরূপে ক্ষতি সহিয়া লইতে হয়, প্রাণের মায়া কোথায় পরিত্যাগ করিতে হয়, উৎসর্গের প্ররোচনায় কখন ধন-জন স্ত্রী-পুত্রের মায়া বিসর্জন দিতে হয়,—আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত যিনি অন্তর্য়ামী মহাপুরুষ† তিনিই তাহা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিবেন। মঙ্গল আমাদের কোথায়, শ্রেয়ঃ আমাদের কোন্টী সেই সর্বজ্ঞ দেবতা অপেক্ষা তাহা আর বেশী কে জানে! নতুবা ধনজন স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগই ধর্ম নহে—বরং মনুষ্যের হৃদয়ত ধর্মের বিরোধী। তাহাদের ত্যাগে জগত পরিবারে মিলিত হইবার শুভ মুহূর্ত্ত কখন—সেত আত্মস্থ মহাপুরুষই জানেন। বিশ্ব-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে; তাহা না হইলে মুখে বিশ্ব-প্রেমের কথা—নরনারায়ণের কথা বৃথা—কেবল গর্কেরই কারণ—মনুষ্যত্ব নাশের হেতু,—মনুষ্যত্ব লাভের উপায় কিছুতেই নহে!

স্মৃতরাং এশিক্ষা স্বহিরের কোন কিছু পাওয়া জিনিষ নয় বা বাহিরের কোনও একটা কাটিয়া ছাঁটিয়া থাপ্ থাওয়াইয়া বাহ্যদুরী দেখানও নয়—অন্তর্য়ামী মহাপুরুষের চেতনা না হইলে আত্মপ্রতিভা খেলিয়া উঠিবে কেন? যদিও অন্যের হাত ধরিয়া চলিলে পতনশঙ্কা খুব কম কিন্তু তাহাতে চলচ্ছক্তি দৃঢ় হয় কৈ? আত্ম-শক্তিতে আস্তা জন্মে কোথায়? সেই প্রকৃত চলিবার শক্তি লাভ করিয়াছে—বিপথে-অপথে চলিয়া শত সহস্র বার পদাশ্লন হইয়াও যাহার চলচ্ছক্তি স্বাধীনতা হারায় নাই।

আমাদের মস্তিষ্কজাত সম্পত্তি অপেক্ষা হৃদয়জাত সম্পত্তি আহরণ সমধিক কষ্টসাধ্য। যে পরিমাণ মস্তিষ্কজাত শক্তি প্রয়োগে মেধাবীগণ—বাচস্পতি, পঞ্চানন, বা স্বয়ং সরস্বতীর আসনে সমাসীন হইয়া থাকেন; হৃদয়জাত সমৃদ্ধি ভাণ্ডারের একটা মাত্র রত্ন-কণিকা অর্জন করিতে চাই তাহার শতগুণ সংযম—সহস্রগুণ নিষ্ঠার বিনিময়।

\* শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেযাম্ ॥ পাতঞ্জল দর্শন, সং: পা: ২০ শ্লোক।

স্বপুরুষান্যাতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাত্বং সর্বজ্ঞাত্বঞ্চ ॥ পাতঞ্জল দর্শন, বি: পা: ৫০ শ্লোক।

আমাদের আত্মবিধৃত মহাপুরুষের কত যুগযুগান্ত সঞ্চিত শুভ সম্ভাবনীয়তাগুলি বিকাশ পায় শুধু হৃদয়জাত সঙ্কল্পের সমাক্ষ অমুশীলনে। পরের দেওয়া অস্বাভাবিক শিক্ষার ফলে যদি কখনও সাফল্যের মুখদর্শন ঘটে— তাহাতে দীপ্তি পাইবে সেই উপদেষ্টারই অমুকুতি মাত্র!—কিন্তু তার অভ্যন্তরে আর একটা জীবন্ত শক্তি, যাহা বিকাশ পাইবার জন্য আজন্মকাল ধরিয়া কত উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে তাহা উহার নীচে পড়িয়া নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

‘আমাদের জীবনটা কেবল খেলা—কেবল হাসি-কান্নার মহাকালাহল।’ বৈরাগ্যের নৈরাশ্য-ব্যাঞ্জক এই অভিব্যক্তি কর্মসাধনার প্রধান অন্তরায়। শত কোলাহলের মধ্য হইতে সংযমের সাহায্যে অতি সম্ভূর্ণগে গুনিয়া লইতে হইবে কর্তব্যের গভীর প্রণব ধ্বনি! মনুষ্যসংকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের—আর আধার পরিত্যাগ করিয়া আধেয়ের সন্ধান একই কথা! ‘জীবন’ প্রকৃতই খেলা,-- কিন্তু সে যে জীবনের খেলা!—কোন! শত এ জগতে না খেলিয়া মানুষ হইতে সমর্থ হইয়াছে? মহাকবির উক্তি সত্যই—

“হোক খেলা এ খেলায় যোগ দিতে হবে।

আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে! •

সব ছেড়ে মৌন হয়ে কোথা বসে রবে

আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!”

মানব-মন এক দিকে যেমন নবনীত কোমল—সংযম রসায়ন বোগে উহাই আবার তেমনি ব্রহ্মাদপি কঠোর পরিশ্রুত হয়। সংযত মানব-মন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয়ে সমর্থ! ইহার প্রসার যে যতদূর বাড়াইতে সক্ষম হইবে সে ক্ষণেকে ততই স্তম্ভিত করিয়া তুলিবে। জগৎ এই শক্তিকে লুকাইয়া রাখিতে চাহে না—রাখিতে পারেও না।—তাই নূতন নূতন ঘটনা ঘটাইয়া, নূতন নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া পরিবর্তনশীল রূপে কত নব নব বেশে সজ্জিত হইতেছে। কালের গতি আনুকলো এই শক্তি অর্জনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শক্তি লাভ করিতে হইলে খাটিতে হয়, লালসা বিসর্জন দিতে হয়,—জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা করিতে হয়। শুধু সংসার-সৈকতে বসিয়া সুখ সমীরণ সেবন জীবনের উদ্দেশ্য নহে—লক্ষ্য তাহার শত বঙ্গা অতিক্রম করিয়া শত উত্তাল তরঙ্গ সঞ্চল সাধন সমুদ্রের পরপারে উপনীত হওয়া।

আমরা বালাকাল হইতে বিপদের নাম গুনিয়া চমকিয়া উঠিতে—অপমানের আভাস পাইয়া সরিয়া পড়িতে অভ্যস্ত। কিন্তু যদি বুদ্ধিতাম বিপদেরও একটা দান আছে—অপমানেরও একটা মান আছে, তবে কি আলস্য রাক্ষসটা অষ্ট পাশে \* আমাদিগকে বাঁধিয়া বৃকের উপর দস্তুর মত চাপিয়া বসিতে পারিত, না—শিক্ষার দৈন্যে বিদ্যাদায়িনী বোণাপাণি আমাদের দীনা বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন!

আমাদের আত্মশক্তি বর্তমানে স্তিমিত অর্ধমৃত জ্ঞানহারা!—দলাদলির ভীষণ ঘৃণাবর্ডে,—অহং জ্ঞানের বিকট আফালনে সমাজশক্তি ও আদর্শ তাহাতে পাওয়া দুষ্কর সুতরাং আত্মগত প্রাণস্বার মহাভাগবত পুরুষই আমাদের একমাত্র আদর্শ বস্তু। উদার উন্মুক্ত হৃদয়কে বহু বিচিত্র রূপে ফুটাইয়া জানিতে হইবে তাহাকে, সেই যখন

খুণা শব্দা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।

কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ভৈরব যামল।

আপনার ভাব, আপনার পথ আপনার লক্ষ্য হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিবেন তখনই প্রকৃত ঐক্য—প্রাণ শক্তির প্রকৃত সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। সেই মুহূর্ত্তেই—

“ভ্যালোক চাহিয়া সে লোকসিদ্ধ

বন্ধন পাশ নাশিবে,

অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে

অঙ্গে তুলিয়া হাসিবে।

উর্দ্ধি-লীলায় সূর্য্য কিরণ

টিকরি উঠিবে হিরণ বরণ,

বিস্ব বিপদ দুঃখ মরণ

ফেনের মতন ভাসিবে।”

দৃষ্টান্তের অস্ত্র নাই। আদর্শ দর্শনের জগৎ ইতস্ততঃ ছুটিছুটি করিতে হইবে না। সমগ্র বিশ্বত্রুক্ষাণ্ডে যতগুলি দৃষ্টান্ত অপ্রকাশ বা সুপ্রকাশভাবে বিद्यমান, তাহাদের উৎপত্তি একটি অতিক্রান্ত বিন্দু পরিমিত স্থানে। বিভূদত্ত মহাদান সেই স্থানটুকু আমাদের প্রত্যেক হৃদয়ে বর্ত্তমান। আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয়-গ্রন্থ উন্মোচন করিলে শত শত দৃষ্টান্ত—সহস্র সহস্র আদর্শ দর্শনপথে আপনিই প্রতিকলিত হইয়া উঠিবে। ধৈর্য্য সহকারে স্বকীয় জীবন-বেদের পাতা উন্টাইয়া দেখিলে তাহার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পরাবিচার কত স্পষ্ট সঙ্কেত আপনা হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িবে। অধ্যাত্মসাধন-প্রসঙ্গের উপক্রমণিকার জানিয়া রাখা উচিত,—মনের আবেগ, প্রাণের বাসনা, দেহের কর্ম্ম—বিকৃত অবস্থা হইতে বিমুক্ত বিযুক্ত হইয়া আনন্দময় সবার সঙ্গিত সংযুক্ত করা। ঘটনা-তরঙ্গের উদ্ধাম তাণ্ডবে আত্মহার্য্য হইয়া অন্তরকঃ-শক্তির উত্তেজনায় বক্ষের শোণিত ক্ষয় করিলে এ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জগতের ঐতিহাসিক নজির টানিয়া আমাদের জীবন গঠন প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা চাই দেবজীবন। সম্ভ্রাবনী মহামন্ত্রের সম্যক পুরস্চরণ! অক্ষমের বক্ষে চাপিয়া আত্ম-ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া বা দেশের অকল্যাণ করিয়া স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে—অক্ষমকে রক্ষা করিয়া, দেশের শক্তি-সামঞ্জস্ত্রে আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া মহামানবসত্ত্বের বিমল আনন্দে অবস্থান করাই আমাদের জীবন গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু—

‘উপায়েন হি সিদ্ধান্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।’

যে কোনও উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে বিবিধ উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত হইতে হয়। অভ্যস্ত না হইয়া—আপনাতে কার্য্যাশক্তি সঞ্চয় না করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে সিদ্ধি লাভ ত দূরের কথা, পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। কলে নিমজ্জিত হইয়া অভ্যস্ত না হইলে সম্ভরণ প্রয়াস যেক্রপ বাতুলতার পরিচায়ক, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে, পূর্ব-সাধন আয়ত্ত্ব না করিয়া সিদ্ধিলাভের প্রয়াস ও তদ্রূপ। আমি অধম, আমি অযোগ্য ভাবিয়া জড়সড়ভাবে সরিয়া পড়িলে বা ‘মহাজ্ঞানো যেন গতঃ স পস্থাঃ’র পদার্পণ করিয়া অতি সম্ভ্রপে চলিলে সিদ্ধিলাভের আশা সুদূরপর্য্যন্ত। সহস্রশীর্ষ পুঙ্খ সহস্রাঙ্গ ধারণ করিয়া আমাদের সহস্রারে বিরাজিত যিনি—ছুটিতে হইবে তাঁহারই নির্দেশিত শতধা-বিশুদ্ধ পথে; পূর্বাপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া ব্যাকুল না হইয়া অবিশ্রান্ত নন্দ প্রেরণায় কর্ম্ম পথে ছুটিলে স্বীয় গম্ভ্য পথ আপনিই সূগম হইয়া পড়িবে।

আমাদের সম্মুখে যে কর্মব্যগ সমাগত, তাহার ভাব স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র, মেহের আহ্বান তাহার বিভিন্ন প্রকারের । বাহিরে নগ্নগা, নীরবতা, নিরজীবতা অল্পমিত হইলেও হৃদয়ে তাহার যে হোমাগ্নিশিখা ধিক-ধিক জলিয়া উঠিয়াছে তাহা আর নিভিবার নহে !—শত-শত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কর্তব্যাকর্তব্যের আন্তরণ ভেদ করিয়া তাহাতে যে বিভূদত্ত স্নাতাহতি বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে তাহাতেই কালে উহা সত্য-স্বপ্রকাশরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে । তাহারই পূর্ণা-শিখায় অবিস্তৃত অন্তরাখ্যা সুরভিত হইয়া উঠিবে, ভিতরের তড়িৎ-প্রবাহ বাহিরের জগৎ-ঘটার গুরু-গর্জনে ভেদ করিয়া ছুটিবে সেই অনন্ত প্রেম-প্রতিষ্ঠানের শিরশ্চূষিত অক্ষয় সূচী অভিমুখে । পরক্ষণেই বজ্র-নির্দোষে বিধোষিত হইবে—

‘সদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং ।’

মাহেন্দ্রকণ উপস্থিত—প্রস্তুত হও, উঠ, জাগ ! আত্মার আদর্শে, আত্মবোধের ঐক্যতানে জীবনবীণা বাধিয়া লও,—বিশ্ব সুর তোমার, প্রেমের সুর তোমার, আনন্দময় তোমার দেবতা—প্রাণারাম—প্রিয়তম,—জননী জন্মভূমি, তোমার স্বর্গাদিগরীয়সী—আত্মস্থ হ’ক—মাতৃসেবার প্রস্তুত হও—মাহুয, মাহুয্য লাভে জয়যুক্ত হও,—শত্রুতায় যে প্রাণ নাই—মৈত্রীতে প্রাণের আনন্দ । অসুরা শত্রু তোমার প্রাণ-শক্তির বলে অবশ্য পরাজিত হইবে, প্রেমের হৃদয় শক্তিতে—তুমি বিশ্বজয়ী হইবে !

আমাদের বিষয়-বিভব, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের গৃহ-পরিজন, সমস্তই যোগ—সমস্তই সাধনা । সঙ্গাগরা ধরণী আকর্ষণ করিয়াও এ সাধনার সিদ্ধি-সীমায় উপনীত হওয়া অসম্ভব—যদি না আত্মোৎসর্গের পরমী-করণ মুদ্রায় অভ্যস্ত হই । উদ্যম হইবে তাহাতে পাদপীঠ, ধ্বতি তাহাতে আসন, স্মৃতি—জপমালা, সম্মতি—অর্ঘ্য, এবং সংযম হইবে তাহাতে ভূতাপসরণের হুর্ভেদা গভীরেখা । আত্ম-কর্ষণপ্রয়াসী সাধক বসিবেন অসীম গগনমণ্ডপ-তলে, অনন্ত কর্মসমুদ্রের ধু-ধু সৈকতবক্ষে—পীঠবন্ধ প্রজ্ঞা-সিদ্ধাসনে । শোভা পাইবে ললাটে তাহার—বিজয়-তিলক, গলে—নিষ্ঠার উত্তরীর । সাবধানী যাজ্ঞিক, কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্মব্যজ্ঞের প্রথম সঙ্কল্পেই উৎসর্গ করিবেন আপনাকে, যজ্ঞেশ্বর যিনি—সচ্চিদানন্দ আত্মগত মহাপুরুষ, এ যজ্ঞের ফলভাগ গ্রহণ করিবেন স্বয়ং তিনি—কর্ষিত কৃৎ যজ্ঞক্ষেত্র পরিশেষে সিদ্ধ হইবে তাঁহারই প্রেমপয়ঃধারা সিঞ্চে । তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাতেই নিবৃত্তিলাভ করিবে—তাঁহারই জীবাখ্যা—তাঁহারই পরমাখ্যায় যুক্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে—মাহুয, মহা-আনন্দের অধীকারী হইয়া সার্থক হইবে—সাকল্য লাভ করিবে—আত্মকর্ষণ ফলে আত্মার আত্মাকে লাভ করিয়া ভুলিয়া যাইবে সে আত্মকে !—কেবল আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে বাহ্য অন্তর প্রকৃতিতে ধীর উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হইতে থাকিবে বিশ্ব-প্রেমের ঐক্যতানবাত্ত । বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিবে আনন্দে,—মানবের মহা-জীবনযজ্ঞের অমৃত ফল—অণুপরমাণুতে স্বরূপে প্রকাশ পাইবে ! তখন—

“সখন অশ্রুস্রবন হস্ত

জাগিবে তাহার বদনে ।

প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি

ফুটিবে তাহার নয়নে !

দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র

অনন-রগন স্বর্ণ তন্ত্র,

কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র

‘নন্দ্য নীল গগনে ।’

ঐজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

## নারী ।

সমুদ্র মন্থনজাত দেবেন্দ্রবাহিত  
জরা মৃত্যু ভয়হারী, দেবভোগ্য সুখা,  
দুঃসন্ত দানববৃন্দে করিয়ে লাক্ষিত,  
মিটায়েছে দেবতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ।  
মানব চাহেনি, তবু হয়নি বঞ্চিত ।  
পূরাইতে তাহাদের অমিয়া পিয়াস  
নারী হৃদে সুধানিধি রয়েছে সঞ্চিত,  
মাতৃ স্নেহে, পত্নী প্রেমে তাহার বিকাশ ।  
ওগো নারি ! বিশ্বে তুমি বিশ্ব জন্মনোর—  
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পুণ্য প্রতিচ্ছবি;  
ধরে যথা ক্ষুদ্র দেহে নিশির শিশির—  
প্রভাতের স্নমহান দীপ্ত রবি-ছবি ।  
মানবের চিরারাম্য! দেবী তুমি নারি !  
রোগে পথ্য, শোকে অশ্রু, পিপাসায় বারি ।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার ।

## মহেন্দ্র-গিরি ।

—:~:—

মহেন্দ্র হইতে হাওড়া আসিবার পথে মাণ্ডাসারোড ( Mandasa road ) নামক ষ্টেশন হইতে তের মাইল উত্তর পশ্চিমে, মহেন্দ্রগিরি নামক পর্বত । রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে এই পর্বতের নামোল্লেখ আছে, কালিদাসের রথুবংশেও ঠহার বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিলালিপিতেও এই পর্বতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, স্মরণ্য এই পর্বত যে বহুদিন হইতে বিখ্যাত সে সন্দেহ কোন নাই । এই পর্বতে চারিটি পুরাতন মন্দির অবস্থিত, তন্মধ্যে একটি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অপর তিনটি মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে । ( ১ )

উক্ত মন্দির চতুষ্টয় কাহার দ্বারা, কোন সময় নির্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহার সঠিক মীমাংসা হয় নাই । কোন ইতিহাসেই এই মন্দির সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় নাই । ফারগুসনের ইতিবৃত্তে, ( Fergusson's

( ১ ) See the Reports of the Archaeological Society of Deccan Circle. 1915-16.

History of Indian Architecture ) বা ক্যানিংহামের ইতিবৃত্তে ( Cunningham's Reports of the Archaeological Survey of India ) এই মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা কোন সময়ে, কাহার দ্বারা নির্মিত তাহা এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

যে মন্দির তিনটি এখনও বিদ্যমান আছে, উহাদের একটির নাম, “যুধিষ্ঠির মন্দির,” দ্বিতীয়টির নাম “ভীমমন্দির” ও তৃতীয়টির নাম, “কুন্তীমন্দির।” ইহাদের এইরূপ নাম করণ কেন হইল, সে সম্বন্ধেও ইতিহাস নীরব। মন্দির ত্রয়ের মধ্যে, ভীমমন্দির সর্বাপেক্ষা ছোট, ইহার উচ্চতা প্রায় বাইশ ফুট, সমচতুর্ভুজ আকারে প্রস্তুত। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর উপর্যুপরি স্থাপিত করিয়া, এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে, শীর্ষ দেশে একটি চক্রারের গম্বুজ, প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের কোন চিহ্নই এই মন্দিরে নাই, সাধারণ ভাবেই নির্মিত। লক্ষ্যহট্ট সাহেবের মতে, এই মন্দির নবম শতাব্দীতে প্রস্তুত, এবং ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার শৈবীক মূল্য সম্বন্ধে কোন বোধ হয় না। মন্দিরটির নির্মাণ প্রণালী দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উহা অসম্পূর্ণ নহে, সুতরাং লক্ষ্যহট্ট সাহেবের উক্তির কোন মূল্য নাই। খুব সম্ভব ইহার মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাতে কোন লিপি না থাকায়, ইহা কাহার দ্বারা প্রস্তুত তাহা জানা যায় নাই।

যুধিষ্ঠির মন্দিরও দেখিতে কতকাংশে ভীমের মন্দিরের মত, তবে ইহা ভীম মন্দির অপেক্ষা কিছু বড়, এবং ইহার গাত্রে সুন্দর কারুকার্য খোদিত, মন্দিরের ভিতর একখানি শিলালিপি আছে, কিন্তু লিপিখানি কেহ পাঠ করিতে পারেন নাই, উহা কোন ভাষায় লিখিত, তাহাও কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। প্রবেশ দ্বারের উপরে একাদশ শতাব্দীর একখানি শিলালিপি আছে। সেই লিপিতে তাজোরের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের কলিঙ্গ বিজয়ের উল্লেখ আছে। এইরূপ লিপি জয়ন্তস্তুই লিপিত হইত, এই মন্দিরে বা ইহার নিকটবর্তী স্থানে, এমন কোন প্রস্তর নাই, যাহাকে জয়ন্তস্তু বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, উহা কোন একটি জয়ন্তস্তুই লিখিত হইয়াছিল। মন্দির নির্মাণ কালে উক্ত লিপি এই স্থানে ছিল না, মন্দির নির্মাণের পরে উহা এই স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। এই লিপি অনুসারে লক্ষ্যহট্ট সাহেব ইহার নির্মাণ কাল, একাদশ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন সম্ভাব্যজনক প্রমাণ নাই।

অন্যটি কুন্তী মন্দির, ইহা প্রায় যুধিষ্ঠির মন্দিরের অনুরূপে প্রস্তুত, কিন্তু এই মন্দিরটি অন্য দুইটি মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও দেখিতে সুন্দর, ইহার গাত্রস্থ শিল্পকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার মধ্যেও কোন বিগ্রহ নাই, খুব সম্ভব ইহার মধ্যে বিষ্ণুমূর্তি ছিল। এখন ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর মূর্তি পড়িয়া আছে। এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া লক্ষ্যহট্ট সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন। এই মন্দির ত্রয়ের নির্মাণ কাল, লক্ষ্যহট্ট সাহেব বিভিন্ন শতাব্দীতে নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই মন্দির ত্রয় একই সময়ে, একই নাক্তির দ্বারা নির্মিত এবং যতদূর বিশ্বাস নবম শতাব্দীতে প্রস্তুত। তিনটি মন্দিরই দেখিতে প্রায় একরূপ এবং নামেরও বেশ মিল আছে। এই মন্দির তিনটির সহিত, মহাবলীপুরের কয়েকটি রথ মন্দিরের অদ্ভুত সোসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইতে ধারণা হয় যে, মহাবলীপুরের রথ-মন্দিরগুলি যাহা দ্বারা নির্মিত হয়, এই মন্দিরগুলিও তাহার দ্বারা, উক্ত রথ মন্দির নির্মাণের কিছু পূর্বে বা পরে নির্মিত হইয়াছিল।\* মহাবলীপুর হইতে দুই মাইল দূরে উক্ত রথ মন্দিরগুলি অবস্থিত। উহার মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রোণদি গড়তির মন্দির উল্লেখযোগ্য

\* একজনের দ্বারা উহার নির্মিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা নিরাপদ নহে—একের অনুরূপে অন্য মন্দির নির্মাণের সম্ভাবনা আছে। সং।

এবং প্রায় মহেশ্বরগিরির মন্দিরের অঙ্করণে প্রস্তুত, এই সকল মন্দির শ্রেণীর মধ্যে যে শিলালিপি আছে, তাহা পাঠ করা কঠিন। যে ছ'একখানি শিলালিপি অমুবাদিত (২) ও পঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নাম ও সময়ের উল্লেখ না থাকায়, উহা কাহার দ্বারা কোন সময়ে নির্মিত, তাহার সঠিক মামাংসা হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসকারগণ এই ২৭ মন্দির সম্বন্ধে, আপনা আপন স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ফারগুসনের মতে,—এই ২৭ মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত। (৩) ইলিয়টসাহেব, (Sir W. Elliot) ইহার প্রস্তর গাত্র-লগ্ন তাম্রলৌহ পিপি, একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত সাগভান কুপানের (Saluvan Kuphan) মতে উঠা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত সংস্কৃত লিপিকুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফারগুসন বলেন যে, এই ২৭ মন্দিরগুলি অধিকদিন নির্মিত হয় নাই, এ গুলি আধুনিক এবং বুদ্ধ মন্দিরগুলির অঙ্করণে প্রস্তুত। (৪)

অমুমানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিকান্তে উপনীত হওয়ায়—নানা বিপদ, বর্তমান কালে প্রত্নতত্ত্বিকগণের যেকোন অধ্যবসায় ও চেষ্টা পরিণামকৃত হইতেছে, তাহাতে আশা হয় কালে এ সকল মন্দির সম্বন্ধে স্বাধীন তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

## গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রী শ্রী রাসগীতা।—প্রকাশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী। কুচবিহার। পকেট এডিসন। পৃষ্ঠা ২৮  
মূল্য ৮০ আনা। ছাপা ভাল। স্তোত্র; সুখপাঠ্য। কবি—

“রাধিকা রূপিণং কৃষ্ণং রাধিকাম্ কৃষ্ণরূপিণীং।

রাস যোগাভাসারেণ রাধাকৃষ্ণং ভজ্যমাচ্চং।”

সুগল-রূপ নানস-চক্রে প্রত্যক্ষ করিয়ঃ ধন্ত হইয়াছেন; কিন্তু গীতায় রাস-রস তাদৃশ একট হয় নাই। রচনাও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

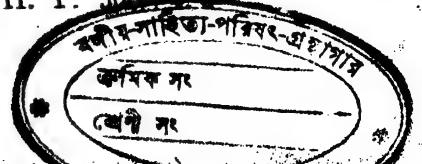
উচ্ছাস।—কেদার রচিত। ১৬ পংঃ ডিমাই ১ ফর্ম্যা। মূল্য ৮০ আনা। ছাপা ভাল।

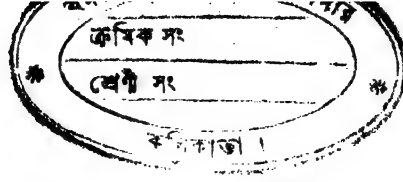
দশটি কবিতায় সাধন-কথা বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিষ্কৃত হয় নাই। তৎকথার চলিত বুদ্ধীতে চুক্কোষ। রচনা গতিহীন। ছন্দ-মিল ও ভাবের সহিত যখন কবির সম্ভাব নাই, তখন সরল গল্পে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে দোষ ছিল কি?

(২) A copy and translation of Sanskrit inscriptions at Mahabalipur. by Dr Arthur Burnell will be found in the Appendix of the Descriptive and Historical papers relating to the seven pagodas on the Caromandel Coast. Edited by Capt M. W Carr.

(৩) See Mr. Fergusson's History of Indian Architecture. Vol II. P. 502.

(৪) Although these Rathas are comparatively modern and belong to a different faith, they certainly constitute the best representations now known of the forms of the Buddhist Buildings. Mr. Fergusson's Hist of Arch Vol II. P. 500.





# পরিচারিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

আবণ, ১৩২৬ সাল।

৯ম সংখ্যা।

নাবুঝ।

—:~:—

দিনের বেদনা নিশীথ বোঝে না তারে,  
সে বহিয়া আনে আপন বেদনা ভারে,  
জমা হতে থাকে কেবলি নূতন ব্যথা,  
নিশা ভাবে মনে দিনের এমন আলো  
লেখা নাই কোথা একটি আখর কালো,  
এত হাসি তার, অলৌক দুখের কথা,  
দিবা ভাবে বুঝি এমন শাস্তি যার  
নিতল নীরব শীতল অন্ধকার,  
এত আঁখি-তারা রয়েছে যে মুখ চেয়ে,  
সাজে না তাহারে এমন বিলাপ করা ;  
শিশির ধারায় কাদিয়া ভিজান ধরা,  
আকুল নিশাসে সারাটি ভুবন চেয়ে।  
একে চাহে আলো, অপরে অন্ধকার  
ভাইতে বোঝে না কিসের বেদনা কার !

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।



## বাসন্তী ।

—:~:—

নারী-ভাগ্যের বাহা শ্রেষ্ঠ স্বখ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া বাসন্তীর সমস্ত জীবন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা এই বাসন্তী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাহাদের আজন্ম সঞ্চিত সমস্ত বাৎসল্য যেন বর্ষার পূণ্যধারার মত অনাহত অজস্র ধারায় তাহার জীবনের প্রথম কম্বুটি বর্ষকে একটি নব প্রসুতিত পুষ্পমালার মত বয়ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাহাদের হৃদয়-স্বর্গের এই পাণ্ডিত্য মাল্যটি উপযুক্ত কণ্ঠে অর্পিত হয়, তাই পাত্র নির্বাচনের অভাব হয় নাই, কিন্তু যিনি এই বাসন্তী মাল্যটিকে গ্রহণ করিলেন তাহার কণ্ঠে দূরে থাকুক সে চরণেও স্থান পায় নাই,—স্থান পাইয়াছিল শুধু গৃহের এক কোণে!

যে চিরকাল অনাদরের মাঝে পাণিত, তাহার এই একটি লাভ যে অনাদরের বেদনাবোধ তাহার চলিয়া যায়। বাসন্তীর ভাগ্যে তাহাও হইতে পায় নাই; পিতামাতার অযাচিত স্নেহ তাহার জীবনটিকে পল্লবিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময়ে যখন খর রৌদ্র তাহার জীবনের নব কিশলয়গুলিকে দগ্ধ করিতে বসিল তখন এক বিন্দু স্নেহ বৃষ্টির জন্ম তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল! যখন সে জ্ঞানহীনা তখন সে পিতামাতার স্নেহ পাইয়াছিল যেদিন তাহার তৃষ্ণা জাগিল সেদিন তাহার পিতামাতা তাহাকে কাঁদাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন! সে সমস্ত বেদনা দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল কিন্তু মেঘমুক্ত আকাশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? অশ্রুভারাকুল দৃষ্টি নামাইয়া সে ভাড়াভাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল! ভিক্ষা চাহিয়া ভিক্ষা না পাওয়ার মত এমন দুঃসময় আর নাই।

বাসন্তী যে কেন তাহার স্বামীর মনোমত হইতে পারিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না! রূপ বাহাকে বলে তাহা ঠিক তাহার ছিল না, তথাপি সমস্ত তরুণতা বিরিয়া একটি বসন্ত-বল্লরীর মত কল্যাণক্রীড়া হাহাকে মাধুর্য্য দান করিয়াছিল। শ্রানবর্ণা তরী, এই বাসন্তী সেবা ও করুণায় যেন নত হইয়া পড়িতেছে! শুভদৃষ্টির সময়ে সে লজ্জার ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই তাই যখন সে বিবাহের পর লজ্জা ভাঙ্গিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল তখন শুভক্ষণ বহিয়া গিয়াছে! সেই অশুভ ক্ষণের প্রভাবই যে তাহাদের জীবনের উপর দিয়া ঘাইতেছে বাসন্তীর এই বিশ্বাস কিন্তু ভাগ্যদেবতা যেখানে কোতুক করিয়া ভুল করেন সেখানে মানবেও কি সাধ্য তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে! এ ভুল যেন পশুমের বোনার মত, একটি ঘর ভুল হইলে আর তাহা সংশোধনের উপায় নাই, তাহাকে সারা জীবন টানিয়া চলিতে হইবে। বাসন্তীর স্বামী, পত্নীর যে আদর্শ মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল তাহার সহিত বোধ হয় বাসন্তীর মিল হয় নাই তাই সে এমন প্রথম হইতে চটিয়াছিল। ভাগ্য যে সর্বদা মনের মত কিনিষ জোগায় না মাঘযকেই যে তাহা মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে হয় এই বোধটুকু বুঝিবার মত ধৈর্য শক্তি বাসন্তীর স্বামীর ছিল না। ছোট বেলা হইতে রূপের নেশা এমনি করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে কলেজে তাহার বন্ধুদের সহিত ইহা লইয়া কতবার মনান্তর হইয়া গিয়াছে। শৌন্দর্য্যকে ভালবাসাই যে উন্নত হৃদয়ের লক্ষণ এই যুক্তির উপর যে কোর তর্ক করিয়া আপনার দিক বন্ধায় রাখিয়াছে! বন্ধুরা বলিয়াছে “বেশ বেশ, সুন্দরকে না হয় ভালবাসুন তাই বলে অসুন্দরকে ঘেঁরা করতে হবে এমন কিছু কথা আছে?” সে বলিয়াছে সুন্দরের উপর

আকর্ষণ হইলেই কুৎসিতের উপর বিরাগ আসিবেই! বন্ধুঃ তখন ঠাট্টা করিয়াছে “আরে রেখে দে তোর সুন্দর; যদি একটি কাঁলা কুচ্ছিত মেয়ে হোর বৌ হয় তখন দেখে নেব রাগ বিভাগ! তারপর যখন একদিন তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ সুরেন, তুমি এখন বড় হয়েছ, রোজগার করছ, আমার ইচ্ছে তুমি বিয়ে করে ঘর-সংসার করা।” তখন সে বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে কথা মাত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পিতা বলিলেন “ঐ যে ও পাড়ার হরিহর মুখার্জীর মেয়ে তার সঙ্গেই আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই, ওর বাপ বড় মানুষ না হুক, শুনেছি টাকা বাড়ির টানাটানি নেই, আর মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী আর সেখাপড়াও জানে। সুরেন যেন তখন কনে দেখার কথা তুলিয়া একটু কিছু বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াই পিতা বলিলেন “না বাবা ঐটে আমি পছন্দ করিনে। আমরা পোট, আমরা যাকে ভাল বলছি তাকে গ্রহণ করতে তোমরা দ্বিধা কর কেন? আমার বেলা কি আর আমি তোমার মাকে দেখতে গিয়েছিলুম? তা ত নয়, তোমার ঠাকুরা ঠাকুমা ঠিক করে ছিলেন তা বলে আমি কি কিছু ঠকে তিলুম?” তাহার পর আর কোন প্রতিবাদ করাই চলে না, বিশেষ সে তাহার পিতার তিনটি কন্ডার পর বড় আদরের পুত্র! সে পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট হইতে ভাবী পত্নীর নামটি উদ্ধার করিল, বাসন্তী! নামটির মাঝে যে একটি মাধুরী আছে তাহারই উপর তাহার সৌন্দর্য্যপ্রিয় মনটি সৌন্দর্য্যের স্বর্গ রচনা করিতে লাগিয়া গেল! বাসন্তী যাহার নাম তাহার গায়ের বর্ণ যে ঐ মধ্যদিনের রবিকরের মত হইবে, তাহার নাসিকা চক্ষু অধর যে তুলির লিখনের মত হইবে তাহাতে আর তাহার কেন সন্দেহ রহিল না। সে আপন হৃদয়ের কল্পনার রং দিয়া সেই কল্পনায় বাসন্তীর রক্তাভ কপোলের উপর আঁখি পল্লবের ছায়া ফেলিল, স্বপ্ন সুন্দর করিয়া ভুরুর টানটি টানিয়া দিল; হাসির হিল্লোলে অধরের পাশে ছোট একটি টোল খাওয়াইতে সে তুলিল না! তাহার কল্পনার সৌন্দর্য্য প্রতিমা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে যখন একদিন বাস্তবের বাসন্তী তাহার সাদাসিধা লাবণ্য লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সুরেনের হৃদে চক্ষুর দৃষ্টি যেন দৃষ্টির পদাঙ্কিত করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে চাহিল! তাহার সর্বপ্রথম বা লাগিল আশ্চর্য-অভিমান। স্বার্থের উপর বা পড়িলেও মানুষ সহিতে পারে কিন্তু অভিমানের উপর আঘাত সহে না! এতদিনের মতকে যে ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছে তাহাকে সে কোনমতেই ক্ষমা দিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিল না, ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় ক্রোধে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ত তাহাকে ডাকিয়া লয় নাই, পিতা ডাকিয়াছেন তাই সে পিতার ঘরে থাকিবে মাত্র। বাসন্তীর স্বামী যদি তাহাকে বক্র বক্র মারিত ধরিত তাহাও সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত কিন্তু এই যে দিবারাত্রি একত্র বাস অথচ স্বামী তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতেছেন, এ যেন তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবহেলা হইতে যে আঘাত শতগুণে ভাল। স্বামী যদি বলিতেন কি তাহার মনোনীত হয় নাই তবে সে যে প্রাণ দিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারিত, কিন্তু কঁটা কোথায় বিঁধিয়াছে না জানিলে সে কেমন করিয়া কঁটা তুলিবে? প্রথম প্রথম সে বড় কাঁদিত, পিতা তাহার উপর মনে মনে রগ করিত কিন্তু ক্রমে সহিয়া আসিল। আঘাতই মনুষ্যকে সংযম বান করে। মেয়ে মানুষ ভাগ্যকে দোষা করিতে পাইলে আর কাহাকেও দোষী করিতে চাহে না। সে কোন পক্ষে দোষারোপ না করিয়া অনির্দিষ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া পুরুষ সহকৃত্যের সহিত বেদনা বহন করিতে পারে। দুর্বলতার শব্দই এই। যখন সে বলশাল্য উপর প্রতিশোধ লইতে পারে না তখন সে নিজের উপরই সমস্ত শোধ তুলিয়া লয়।

(২)

বিবাহের পর অষ্ট বৎসর এমনি করিয়া কাটিয়া গেল; আর যদি বিবাহ তাই না সাধিতেন তবে বাকী জীবনের বাকী কয়টা আট বৎসরও এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইত কিন্তু ভাগ্যদেবতা এবার নূতন কোটুক আরম্ভ করিলেন! সুরেনের মনের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসা তাহাকে লইয়া ঘেঁড়দোড় শুরু করিয়া দিল। এই বন্দীশালার মাঝে এতখানি বাসনা নইয়া বন্ধ হইয়া থাক! তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পুরাতন বন্ধুসমাজে মুখ দেখান তাহার ভার হইল, একবার যেখানে করপতাকা উড়ান যায়, পরমুহূর্ত্তে সেখানে গিয়া অবনতি স্বাক্ষরের মত লজ্জা আর নাই! তাই সে বাছিয়া বাছিয়া নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিল এবং সে মেয়ে পুরুষের বিচার রাখিল না। তাহাদের রূপ যে পরিমাণে ছিল, গুণ সে পরিমাণে ছিল না। পুত্রকে এমনি করিয়া বিপণ্যগামী হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার অশান্তির অবধি হইল না; কিন্তু বঁধু যখন ভাঙ্গে তখন সত্বপ্ৰদেশ ও সংপরাশ্রম তুচ্ছ তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া যায়! বধূন্যতার মুখের দিকে তিনি ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিতেন না; তিন বুঝতেন যে নিজে এত দুর্বল, এত পরমুখাপেক্ষী, এত স্নেহভিক্ষু সে নয় হইবার আকস্মিক হইতে পুত্রকে বাঁচাইতে পারিবে না, এই ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। মানুষের শরীর আর কত সহিবে! এত অত্যাচার এত রাত্রি জাগরণে সুরেনের স্বাস্থ্য ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল সে বসন্তীও বুঝিয়াছিল কিন্তু বুঝিলেও ঠেংগা রাখিবার শক্তি কোথায়? তাহার হৃৎকোর সেবা গ্রহণ করিতে সুরেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিত; সে ঘরে প্রবেশ করিলে সুরেন ত্রস্ত হইয়া উঠিত। একদিন বাসন্তী একাশা ঘরের ভিতরে স্বামীর জুতা কাপড় ঝাড়িয়া রাখিতেছিল এমন সময়ে সুরেন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অন্য দিন হইলে বাসন্তী কাঠের অঙ্কিয়ার গৃহস্তরে চলিয়া যাইত কিন্তু সেদিন সে স্থির করিয়াছিল স্বামীকে বাড়ির বাইরে দিবে না তাই সে বলিল “কোথাও যচ্ছ না কি?” সুরেন বলিল “একবার বাইরে যেতে হবে,—কাজ আছে! বাসন্তী বুদ্ধিত বাজ শুধু ছলমাত্র, বলিল “তা হুকুম থাক।—”

সুরেন সে কথা কণপাত মাত্র না করিয়া গায়ে চাদরখানি ফেলিয়া—দ্বারাভিমুখী হইল; বাসন্তী ঘরের কাছে গিয়া বলিল “ওন্ট? আজ থাক কাল কাজ হবে এখন!” বাধা পাইয়া সুরেনের রোখ চড়িয়া যাইতেছিল, সে উত্তর না দিয়া বাসন্তীকে ঠেলিয়া হুন্ হুন্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বাসন্তীর চোখ দিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া জল পড়িল, সে বুঝিল যেখানে অধিকার নাই সেখানে জোর খাটান কত বড় বিড়ম্বনা! তারপর হইতে আর সে কখনও কিছু বলে নাই! মানুষ যে মানুষের এত কাছে থাকিয়াও এত অপরিচিত থাকিতে পারে তাহা তাহার ধারণার অত্যন্ত ছিল। মেয়ে মানুষ দুর্বল বলিয়াই একটা কিছুর আশ্রয় না পাইলে বাঁচেনা। সেবাবৃত্তি তাহাদের এতখানি প্রবল যে সেবার একটা উপলক্ষ্য না পাইলে তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বাসন্তীর জন্মের অবরুদ্ধ প্রেমটি একদিকে আঘাত খাইয়া অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। মানব প্রকৃতির উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল না, সমস্ত বিশ্বজগতের তাহার কাছে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যখন মানুষ চিনিবার অবকাশ হইল তখনই সকলের চেয়ে নিকটের মানুষটি সকলের চেয়ে দূরে গিয়া পড়িল তাই সে বুঝিল প্রেমের মর্যাদা মানুষ রাখিতে জানে না। বাড়ীর গল্প বাছুরগুলির সহিত ও বাগানের তরুলতার সহিত তাহার অন্তরের ঘনিষ্ঠতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, মানুষের চেয়ে তাহারাই তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিল। তাহার তাহার সেবা না পাইলে বিষম হইয়া

ভুঠে, তাহার চাতের ঘসনা পাইলে গরুগুলি চীৎকার করে, খাঁচার ভিতরের টিয়া পাখীটা ফলনা পাইলে ডাকিয়া ডাকিয়া কর্ণ বধির করিয়া দেয়, বাগানের গাছগুলি তাহার হাতের জলনা পাইয়া শুখাইয়া ওঠে! মানুষ ত এমন করিয়া তাহার দেবার অপেক্ষা রাখিত না, তাই সে স্বামীর ঘরে এটী এক জায়গায় শুধু গোরব অসুত্ব করিত। দূর যখন দূর থাকে তখন সে তত ভয়ানক নহে - যত ভয়ানক নিকট যখন দূর হয়!

একদিন সুরেনের অর হইল, পিতা বলিলেন ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়াছে কিন্তু বাসন্তীর হৃদয় এক অজানিত আশঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অর ক্রমে অধিক হইল, তাহার সহিত অন্ন কানী ও বৃকের বেদনা বাড়িল। ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিলেন, তারপর বলিলেন নিউমোনিয়া হইয়াছে, অবস্থা সাংঘাতিক। সুরেনের তিন দিদিই আপনাপন স্বস্তরালয়ে বিদেশে ছিলেন, নিকটে সংবাদ দিবার মত ছিলেন শুধু সুরেনের এক বিধবা পিসি। তাঁহাকেই ডাকান হ'ল, ঔষধ পথ্য চিকিৎসা লাগিল, সেবা শুশ্রূষার অভাব হইল না। সুরেন অধিকাংশ সময়ই চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া থাকিত, বাসন্তী শিয়রে বসিয়া পাখা করিত, পথ্য জোগাইত, পিসি দিবারজনী সেবার নিযুক্ত থাকিতেন। বৃদ্ধ পিতা ভয়ে ভাবনায় অধীর; পিসি একবার গিয়া ভাইকে সান্ত্বনা দিতেন, একবার রোগীর কাছে ছুটিয়া আসিতেন, একবার বা বৌকে বুঝাইতেন। ডাক্তার ক্রমেই আশাহীন হইতে লাগিল। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে পিসি বলিলেন “তুমি সুরেনের মাথায় হাত বুলাও বৌ, আমি একবারটি দাদার কাছে থেকে ঔষধটা নিয়ে আসি!” বাসন্তী ধীরে ভয়ে ভয়ে গিয়া তার সেবাকোমল হাতখানি স্বামীর কপালে পাতিয়া দিল, সুরেন তখন অর্ধচেতন অবস্থায় ঘুমাইয়া ছিল। পিসি ঔষধ ঢালিয়া বাসন্তীর হাতে দিয়া বলিলেন “সুরেনকে খাইয়ে দাও, বৌ দাঁড়াও আমি ওকে জাগাই! ওঠ বাবা একবারটি ওষুধ খাও” বলিয়া পিসি সুরেনের গায়ে হাত দিলেন। সুরেন চক্ষু খুলিল কিন্তু কিছুক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বাসন্তী যখন মুখের কাছে ঔষধ ধরিয়া বলিল “খেয়ে ফেল ওষুধটুকুন” তখন সুরেনের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার রোগপাশু মুখখানা মনের উত্তেজনায় স্রবৎ লাল হইয়া উঠিল, হুটী হাতে সে বাসন্তীর হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল “ওকে যেতে বল পিসি।” মাসগুল ঔষধ সশব্দে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল, বাসন্তী জড়পুস্তকের মত পাশের ঘরে চলিয়া গেল! তাহার বৃকের ভিতর যেন ফাটন! যাইতেছিল কিন্তু সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া ঢেলা পাকাইয়া তাহার গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিতেছিল তাই আঘাতের বেদনা যেন নিষ্ফলনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কাদিলে পাছে স্বামীর কুমল হয় তাই সে কাদিতে পারিল না, শুধু জানালার কাছে গিয়া সেই সন্ধ্যা আকাশের দিকে তার বেদনাভরা চোখ দুটি তুলিয়া হুটী হাত বৃকের উপর জোড় করিয়া আজ প্রথম দিন বলিল “হা ভগবান, একদিনের জন্যেও রূপ দিলে না কেন?” পিসির কানে সে কথা গিয়াছিল বৃষ্টি, তিনি পিছন হইতে বাসন্তীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন “অরের ঘোরে কি বলতে কি বলেছে তা বলে মন খারাপ করো না মা! আমি ওর কাছে আছি, তুমি গিয়ে সাবুটুকুন করে আনো।—” এটী একটি কাজের উপলক্ষ্য পাইয়া বাসন্তী যেন বাঁচিয়া গেল। পিসি মুখে বলিলেন বটে ও অর বিকারের কথা কিন্তু মনে মনে সমস্ত অবস্থাটি একরকম আঁচ করিয়া লইতে পারিলেন। বাসন্তীর জন্য তাঁর হৃদয় স্নেহে তরিয় উঠিল, তাঁর একমাত্র কন্যা সুরমা যে আজ সবে দুই বৎসর হইল তাঁকে কাদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। একটি কন্যা লটমাই যে পিসি বিধবা হইয়াছিলেন, তারপর সেই মেহপুস্তনী যখন বড় হইল, তখন সকলেই বলিল “মেরে ডাগর হ'ল আর কতদিন খুঁড়ি করে রাখবে!” পিসি সে কথা কানে তুলেন নাই তারপর যখন পাড়ায় নিন্দা আরম্ভ হইল, সকলে মিলিয়া জুড়াকে খোঁচা দিতে লাগিল তখন অগত্যা পাত্র খুঁজিত হইল। পাত্র জুটিল, সকলে বলিল “এমন পাত্র ছাড়্জে

ঠকতে হবে!” তখন পাচক্রনের পরামর্শে তাহারই হাতে তিনি কন্যা সমর্পণ করিলেন। জামাই সেই যে মেয়েকে লইয়া গেল আর পাঠাইল না। মেয়ে মাকে দেখিবার জন্য কাঁদিয়া খুন হইত; কত সাধা সাধনা করিত কিন্তু জামাইয়ের মন গণিত না।—সে বৎসর পূজার সময়ে পিসি জামাইকে হাত জোড় করিয়া লিখিলেন একবার যেন মেয়েকে পাঠাইয়া দেন, দুদিন ভাল খাওয়াইয়া ভাল পরাইয়া, তিনি মনে শান্তি পাইবেন, সে পত্রের উত্তর পর্যন্ত আসিল না। তারপর কোথায় কিছু নাই চঠাৎ একদিন শুনিতে হঠাৎ সুরমা যক্ষাকাশে মাথা গিয়াছে, জামাই অস্থূতের সংবাদ পশ্যন্ত দেয় নাই! পিসি সেইদিন যেন আবার নূতন করিয়া বিধবা হইলেন। বুকের এই পুরাতন ক্ষত হইতে নূতন করিয়া এক বলক রক্ত উঠিল; সুরমা যে তাহার কোলেই আসিতো চাহিয়াছিল, তিনি যে তাহাকে কোলে লইতে পাহেন নাই, সে কোল যে এখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ছই বৎসর পরে সে শূন্য স্থানের একটু আজ বাসন্তী পূর্ণ করিয়াছিল।

( ৩ )

দ্বারের বাহির চটতে কে ডাকিল “বৌ”; ভিতর হইতে কোন সাক্ষা পাওয়া গেল না! পিসি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন “বৌ বোমা”, অন্ধকারে কিছুই ভাল করিয়া ঠাকর হয় না। দ্বারের কাছে নিটু নিটু করিয়া একটা প্রাণীপ অলিতেছিল, তার সেই ন্নান আলোটি বাসন্তীর থান কাপড়ের উপর পড়িয়া বড় ভীষণ রকম সাদা দেখাইতেছিল। বাসন্তী আঁচল পাতিয়া কানালার কাছে নাটিতেই গড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর যেন আপনাকে কৃত্রিম ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হুঃসাধ্য! এ তাগর শুভ হহলাক অশুভ হহল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! সে অনেক চেষ্টা করিয়াও চোখে এক ফোঁটা জল আনিতে পারিল না, এত অশ্রুচান বেদনায় যেন তাহার বুকের ভিতর অবধি ধুঁ ধুঁ করিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই সন্ধ্যার মিল্ক বাতাস যেন শীতল বিক্রপের মত তাকে ঠেলা দিয়া যাইতেছে, এই সন্ধ্যা আকাশের উজ্জল তারারা যেন কঠিন বিক্রপের হাসি হাসিতেছে তার আলো যেন একটি তীক্ষ্ণ তীরের মত তার ঝুক গিয়া বিপল, সে ছই হাতে চোখ ঢাকিল! তার মনে হইল তার সমস্ত জীবনটা যেন আগাগোড়া বিধাতার বিক্রপ! যে সুযোগকে দ্বার হইতে বিদায় করিয়া দেয় তার মত হতভাগ্য আর কে আছে? একটি মাহুষের প্রেমের জন্য আর একটি নূতন সংসারকে মাহুষ অনাগ্রাসে আপন হাতে আপন করিয়া লইতে পারে কিন্তু তাহার ভাগ্যে সে প্রেম ত জোটে নাই! যে প্রেমের অমৃত পান করিয়া মাহুষ অমর হয় সে অমৃত সে জীবনে এক ফোঁটাও পায় নাই! তার প্রাণ যেন পাগলের মত চাঁৎকার করিয়া উঠিল “না না না এ আগাগোড়া সব মিথ্যা!” এমন সময়ে পিসি আসিয়া বাসন্তীর মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন “বৌ, মনকে স্থির করতে চেষ্টা কর মা, মনকে সংযত করতে চেষ্টা কর! এই ত সময় এসেছে, বৌ, সুখে ত মাহুষের মতিভ্রম হয়, সুখ ত আমাদের অন্ধ করে রাখে, হুঃখই যে চাই মা, তু নইলে মন বসবে কেন?” বাসন্তী পিসির কোল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল, কথা তাহার মুখে আসিল না, সে একথা বুঝাইতে পারিল না যে একদিনের জন্যও যদি সে প্রেম পাইত তবে আজ মনস্তির করা কত সহজ হইত! পিসি আবার বলিতে লাগিলেন “দেখ বৌ, হুঃখকে ভালবাসতে শেখ, হুঃখ যে আমার এম্বাবারে ঘরো জিনিষ তাই আমি তাকে কোন মতেই ভয় করতে পারিনে! যখন আমি ভাল করে সংসার চিনি নি, তখন থেকে হুঃখকে চিনেছি তাই সংসারকে আর আমার ভয় করা হ’ল না। সুখ ত অর টেক্তে পেল না, আমা চোখের সম্মুখে দিয়ে কোথায় চলে গেল।” বাসন্তী বাধা দিয়া বলিল “আচ্ছা পিসি, তবে তুমি টেকে আছ কেন?

করে, তোমার রইল কি?" পিসি বড় করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন "কি রইল মা? যা থাকবার তাই রইল! সত্যি রহলেন আর আমি রইলাম। সুখের তরকারি নেই আমাদের, যেটুকু পাই তাই যে যেথেষ্ট বো!" বাসন্তী একবার যেন বুঝিতে পারিল এই কথাটির মাঝে কি গভীর বেদনা! পিসি বলিলেন "দেখ বো, ছঃখ যখন প্রথম আসে তখন মনে হয় কি ভয়ানক, কি ভীষণ, কি অন্ধকার কিন্তু ঐ ভিতরে ঢোকবার সবুট চাই তারপর একেবারে আলোয় আলো হয়ে যায়, অঃ কি সুন্দর সে!" পিসি অনেক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন বাসন্তী মন দিয়া ছঃখ-সুন্দরকে ভাবিতে চেষ্টা করিল কিন্তু একটি ধারণাও ধরা দিল না।

পরদিন বাসন্তীর খবর পিসিকে ডাকাইয়া বলিলেন "দিদি, আমার ভাগ্যে যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন বৌটার জন্যই ভাবনা হয়! এই সমর্থ বয়সে, ছেলেপুলে নেই, শুধু থাকবে কি নিয়ে? আমি বলি ও আমাদের গুরুঠাকুরের কাছে মন্ত্র নিক, যা হক্ একটা উপলক্ষ্য হবে।" পিসি শুনিলেন, বলিলেন "আচ্ছা আজ বলে দেখ" কিন্তু মন তাঁর বলিল "নয় নেওয়া ত মুখের কথা নয়, মনের ভিতর থেকে যে চাওয়া চাই, তা নইলে মন্ত্র যে আগাগোড়া মিথ্যা হবে।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাসন্তী সংসারের কাজ সারিয়া পিসির কাছে আসিয়া বসিল, বলিল "পিসি একটা কথা বলিতে মায়! তুমি আমায় বো বল ঐটে আমি কোন মতে সহ্য করতে পারি নে! তোমাদের এই বাড়ীর বৌটুকুনের দ্বিতর ছাড়া আর কি আমার কোথাও অস্তিত্ব নেই? আর, যে যা বলুক তুমি আমায় বো বলতে পাবে না।" পিসি ধীরে ধীরে বাসন্তীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তবে আমি তোমার নাম ধরেই ডাকব মা!" বাসন্তী বলিল "নাম ধরে ডাকলে আমার কি মনে হয় জান পিসি? আমি এই জগতের ঘবের লোক আর বো বললে মনে হয় তোমাদের এই বাড়ীর ক'থনা দেয়ালের বাইরে আমার আর স্থান নেই! নিজের নামের ঐত্তরও যেন একটা মুক্তি আছে, সেই মুক্তির সুখটি আমি তোমার কাছ থেকে পেতে চাই পিসি!" বাসন্তীর মন হঠাৎছিল যার জন্য সে এই বাড়ীর বো হইয়াছে তার কাছে সে ত কোন অধিকার পায় নাই, তবে সে ঐ নামটুকুর অধিকারইবা লইবে কেন? প্রেমের মুক্তিই যদি সে না পাইল তবে এত দাসত্বের বন্ধন! যেখানে সে শুধু অবহেলা পাইয়াছে সেখানে যে তার জীবনটি একেবারে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, তার মনের ভিতরে যে এক জায়গায় সত্য ছিল এই মিথ্যাকে কোন মতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না! পিসি সমস্ত বুঝিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না শুধু তাঁহার করতলের কোমল স্পর্শে যেন বাসন্তী একটি সহামুভূতি ভরা উত্তর পাইল।

আকাশময় তখন তারা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। বাহিরে হিম পড়িতেছিল, সেই পাতলা সাদা আবরণের আড়াল হইতেও তারাগুলি যেন অশ্রুপূর্ণ একদৃষ্টে তাঁহাদের দেখিতেছিল! পিসি তাঁহার বিবাসভরা চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলিতেই সন্ধ্যাতারার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অতি বড় দূরকে যেন বুকের কাছে পাওয়া গেল, তিনি মনে মনে সেই সত্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "বড়কে যে বড় বলে মানতেই হবে মা, তা নইলে যে আমরাই ঠকব। সে তোমার মাঝেই হন্, আমার মাঝেই হন্ যেখানেই তাঁকে দেখব সেখানে যে মাথা নীচু কর্তেই হবে!" বাসন্তী যে কখনও সেই বড়কে পায় নাই, তাই সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন পূজা সারিয়া আসিয়া পিসি বাসন্তীকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন "দেখ মা, তোমার খবরের ইচ্ছা তুমি গুরুঠাকুরের কাছে মন্ত্র নাও; তা নইলে পাঁচদশনে পাঁচরকম কথা বলবে!" তখন

বাসন্তী হাসি রাখিতে পারিল না। অদৃষ্টের মার যে খাইয়াছে, বিপদের চোখরাজ্যনিকে সে কি আর ভয় করে? পিসি ধীরে ধীরে বাসন্তীর হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন “দেখ বাসন্তী, এ জোরের কথা নয়। আমি তোমার কিছু আদেশ করছিলাম না, নিজের মন বুঝে দেখ, যদি ভিতর থেকে সাড়া পাও তবেই এ পূজার ভার নিও তা নইলে শুধু কষ্ট পাবে!” বাসন্তী বলিল “তবে পিসি, ও আমার দ্বারা হবে না। আমি যে মোটে ভগবানকে ডাকতেই জানি না, পূজা করব কেমন করে?” পিসি বলিলেন “ডাকলেই ডাকতে শিখবে মা, এ ত শেখাবার কাজ নয়!” বাসন্তী বলিল “আচ্ছা পিসি, তুমি কি নাম দিয়ে তাঁকে ডাক?” পিসি বলিলেন “ডাকতে কি আর জানি মা? নতুন নাম কোথায় পাব বল? ঘরের লোককে যে নামে ডাকি সেই নাম দিয়ে তাঁকেও ডাকি?” বাসন্তী বলিল “আচ্ছা তুমি উত্তর পাও পিসি?” পিসি বলিলেন “হঁ। বাসন্তী, যে নামে ডাকি সেই নামেই সাড়া পাই!” বাসন্তী পিসিকে ছই হাতে জড়াইয়া বলিল “আমি সে মানুষকেই পাই নি পিসি, ভগবানকে পাব কেমন করে?” পিসি বলিলেন “মানুষ নন্ বলেই তাঁকে পাবে বাছা, মানুষকে মানুষ এমন করে পার না!” এ যে কেমন করিয়া হইতে পারে বাসন্তী কিছুই বুঝিতে পারিল না! যাহাকে সে হির হইয়া ধ্যানও করিতে পারে না তাঁহাকে কি পূজা করা যায়? সে ত তাঁহার নিকট হইতে মুখ পায় নাই, দয়া পায় নাই ওবে সে কেমন করিয়া তাঁহাকে ভাবিবে? সে যে তাঁহার নিকট হইতে রূপও পায় নাই, একদিনের জন্যও স্বামীর মন পায় না, এত বড় নিষ্ঠুরকে সে ডাকিয়া করিবে কি? সে বলিল “না না পিসি ও আমার দ্বারা হবে না। পূজার ঘরে বসে আমি যদি তাঁকে ভাবতে না পারি সে কি বিজী হবে। না না না তুমি বাবাকে বলা পূজা করতে আমি পারব না!” পিসি বাসন্তীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন “অত শীঘ্র উত্তর দিও না মা, মনকে বুঝে দেখবার সময় নাও! ভাল করে ভেবে দেখো মন যদি রাজি হয় তবেই নিও।” তিনি বুঝিতেছিলেন এমন করিয়া মানুষের জীবন কাটিতেই পারে না! স্বামীহারা ভগবানকে না পাইলে বাঁচিবে কেন? তিনি আপনার মনে বলিলেন “মানুষের মন ত, বদলাতে কতক্ষণ! কখন কি হয় বলা যায় না।” সেদিন একাদশী ছিল বন্যা কাকের তাড়া ছিল না, দিনের খণ্টা কমতি যেন ক্ষুণ্ণিত রাক্ষসের মত বাসন্তীকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল! পিসির কথাগুলি তাহার মনের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে কিছুতেই ম্যামাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! জীবন যে এমন করিয়া কাটিতে পারে না তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিতেছিল কিন্তু ভগবানকেই যে পাইতে হইবে এ কথা সে কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না! সে যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, মনে শান্তি পাইতেছে না তাহা পিসি লক্ষ্য করিতেছিলেন তবু তিনি একবার ত সাস্তুনা দিলেন না, তিনি মনকে কঠিন করিয়া বলিলেন “অস্থির হওয়াই যে চাই। কাঁচক একবার তবেই ও শান্তিময়কে পাবে!” বাসন্তী সেদিন সকাল পাঁচটাতে গেল।

সে দেখিল যেন তাহার শিরের কাছে ভগবান দাঁড়াইয়া আছেন, এত রূপ সে জন্মে দেখে নাই! কিন্তু সে রূপের মাঝে যেন জ্যোৎস্নার মত শিথলতা আছে তাহা সে বতর্ক দেখিতে লাগিল ততই যেন তাহার শরীর মন জুড়াইয়া যাঁতে লাগিল! এমন করিয়াই সময়টুকু কাটিয়া যাইত কিন্তু বাসন্তী অবাক হইয়া গুলিল ভগবান কথা বলিতেছেন, সে এক যেন কত দূর হইতে আসিতেছে, ঠিক সেই পশ্চিমাকাশের উজ্জল তারাটির বুক হইতে--আবার যেন কত নিকট হইতে আসিতেছে, ঠিক এই শব্দ্যার শির হইতে! সে গুলিল ভগবান বলিলেন “তুমি কি চাও তাই আশ্বন নাও মা!” সে যেন সমস্ত হৃদয় খুঁজিয়া দেখিল কি তাহার অভাব আছে! শেষে যেন হাত জোঁক

করিয়া বলিল “আমি যে রূপের অভাবে স্বামীর প্রেম পাই নি,—এ খেদ আমার গেল না ! আমি যেন রূপ পাই, তাই করো ভগবান !” তিনি যেন হাসিলেন, তেমন হাসি বাসন্তী কখনও দেখে নাই—কখনও না ! তারপর যেন পরম করুণার সহিত বলিলেন “আমার প্রশ্নাম করতে শেখ মা, অনন্ত রূপ পাবে !” তারপর বাসন্তী যেন তাঁহাকে প্রশ্নাম করিল, তাঁহার চরণ দু’খানি যেন বাসন্তীর মাথায় ঠেকিল ! সে যেন পদ্মগন্ধ পাইল, এই আনন্দের অমুভূতি সে এত স্পষ্ট করিয়া অমুভব করিল যে তাহাতেই তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল !—এক মুহূর্ত সে কিছুই ঘুমিতে পারিল না, ঘর একেবারে অন্ধকার শুধু জানালার ভিতর হইতে কক্ষপক্ষের একাদশীর ক্ষীণ চাঁদের ম্লান স্রোৎস্রা তাহার গায়ে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে ! তাহার মনে হইল এখনও তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, খুব কাছে,—খুব কাছে ! সে তাহার নব জাগ্রত সমস্ত চেতনা দিয়া বলিয়া উঠিল “তুমি এত সুন্দর হরি ! হে সুন্দর, আজ আমি তোমায় দেখ্‌লুম, আমি বাচ্‌লুম ।”

আলো জাগিবার দেৱী সহিল না, পূর্বাকাশ একটু উজ্জ্বল হইতেই সে পিসিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল তাহার ইচ্ছা হইল সে বলে—আজ সে তাঁহাকে দেখিয়াছে—তিনি কি অপূর্ণ সুন্দর ! তাঁহাকে পূজা মা করিলে সে যে সুন্দর হইতে পারিবে না, যে রূপের অভাবে সে স্বামীর অনাদর পাইয়াছে সেই রূপ যে সে সেই অরূপের নিকটেই পাইবে, তা ছাড়া আর যে উপায় নাই ! তাহার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না, সে শুধু বলিল “আজ্ঞে গুরুঠাকুরকে ডেকে পাঠাও মা, আজি আমি মন্ত্র নেব, আর দেৱী সইছে না !” এই বলিয়া সে পিসিকে প্রশ্নাম করিল । পিসি দুই বাহু দিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কপালে চুষন করিলেন ।

## প্রভাতী ।

—:~:—

তোমারি দুয়ারে      বাতায়নে আজ  
প্রভাতের রবিধানি ;

রাঙিয়া উঠেছে      গগন ভুবন  
পুলক মগন প্রাণী !—

খোল খোল দ্বার      কে ঘুমাও আর—  
প্রভাতের সাড়া      প্রাণে নাই কার—  
কেগো ও এখন      স্বপনে মগন

অলস শয্যা টানি ;

জাগ ওগো আজ      তোমারি দুয়ারে,  
প্রভাতের রবিধানি ।



সারাটি বিশ্বে মহা জাগরণ,  
 করম সাধনে সকলে মগন  
 সকলেই চায় স্থাপিত আসন  
 সাধনে সিদ্ধি আনি ;  
 রাঙিয়া উঠেছে, নবীন তপন  
 পুলক মগন প্রাণী !  
 উচ্চলক্ষ্য সাধনে আসিয়া  
 কে চায় মোহেতে সব পাশরিয়া  
 অলসের দ্বারে চির রহিবারে  
 জীবন চপল জানি  
 ওঠো ওগো আজ ছুয়ারে তোমার  
 প্রভাতের রবিধানি ।  
 তুমি কি এখনো রহিবে শয়নে ?  
 ছুটিবে না দলি' বিশ্ব চরণে ?  
 ক্ষিপ্ত পরাণে লক্ষ্য সাধনে  
 এস আজ মহাবাণী,  
 আর কেন ওঠো বাতায়নে তব  
 প্রভাতের রবিধানি ।

শ্রী—

## কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা ।\*

এই সভার ১৩২৪ সনের ১৪ই আশ্বিনের অধিবেশনে ভূতপূর্ব সিভিলিয়ান জে, ডি, এণ্ডারসন সাহেবের এক পত্র পঠিত হইয়াছিল। পত্রখানা কোচবিহারের প্রাচীন ভাষার তত্ত্বাসন্ধান সম্পর্কে লিখিত। এণ্ডারসন সাহেবের জ্ঞান বঙ্গভাষাবিদ ব্যক্তি বঙ্গীয় ইংরেজ সমাজে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ভাষাবিদ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষার প্রকৃতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণেরও অভাব নাই। তিনি এখন বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাঁহার জন্মভূমি জর্ডুর ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গের ভাষা আলোচনার আগ্রহ তাঁহার এখনও বিনুণ্ড হয় নাই। এক্ষণে তিনি আমাদের বক্তব্যদের পাত্র। নামতঃ এণ্ডারসন সাহেবের পত্রের আলোচনার জন্ত, কিন্তু

\* কোচবিহার সাহিত্য-সভার তৃতীয় বার্ষিক ২য় অধিবেশনে পঠিত।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। সদস্য-পণের মধ্যে কেহ কেহ পত্রের লিখিত বিষয় অনবগত থাকিতে পারেন, এজন্য তাহার আবশ্যকীয় অংশের পুনরুল্লেখ করিতেছি ;—

“That the মাতৃভাষা of the State ( Cooch Behar ) is not Bengali but Koch. It is dying-out, of course, as the Gaelic speech has died out in Cornwall. But we must remember that the Koch Kingdom extended all over Eastern Bengal and Assam and even into Bhutan, and at that time the Koch language was spoken all over that area. The Kachari or Kochari of Darrang is a survival of that period. Now when a language is destroyed by a greater and more copious language it nevertheless affects and modifies that language. We must remember that the ancestors of most of the people in Eastern Bengal and Assam spoke, not Bengali or Assamese but some dialect of the Koch or ( বড় ) Language, which has transmitted tricks of উচ্চারণ and idiom to people who now use the Bengali vocabulary”

অর্থাৎ কোচবিহারের মাতৃভাষা বাঙ্গলা নহে, কোচভাষা। কর্ণওয়াল গ্যালিক ভাষা যে প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোচভাষাও তদ্রূপ বিলুপ্ত প্রায়। আমরা দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোচরাজ্য এক সময় পূর্ববঙ্গ আসাম এমন কি ভূটান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই সময় এই স্থানে কোচভাষা কথিত ভাষা ছিল। তাৎ এখন মাত্র দরঙ্গের কাছারী বা কোছারী জাতির ভাষা বলিয়া পরিচিত। কোন ভাষা কোন প্রবল ভাষা দ্বারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা প্রবল ভাষার উপর কার্য্য করে ও তাহার রূপান্তর সাধন করে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীর পূর্বপুরুষগণের বাঙ্গলা অথবা আসামী ভাষা কথিত ভাষা ছিল না, তাহারা কোচ অথবা বদো মূলক কোন ভাষাতে কথা বলিত। বর্তমান বাঙ্গলাভাষাভাষীগণের রীতি ও উচ্চারণ-কৌশলের মধ্যে তাহার আভাস রহিয়াছে।

বক্ষ্যমান আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে একটা নূতন আলোচনা নহে। এণ্ডারসন সাহেবের পূর্ববর্তী ভাষাবিদ অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক এণ্ডারসন সাহেবের বক্তব্য এই যে এতদঞ্চলে কোচভাষা নামে একটা ভাষা ছিল, যাহা এখন বিলুপ্ত প্রায়। সুপণ্ডিত জন বিমস সাহেব তাঁহার Outlines of Indian Philology ( P. 14. ) গ্রন্থে কোচবিহার, বঙ্গপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার কথিত ভাষার “কোচভাষা” নামকরণ করিয়াছেন। ডাঃ গ্রিয়ারসনের মতে সমগ্র বঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সুদূর লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ভূভাগে Indo-Aryan ভাষা প্রচলিত। কিন্তু তাঁহার Linguistic Survey of India গ্রন্থে এতদঞ্চলের কথিত ভাষার ( dialect ) “রাজবংশী-ভাষা” নাম দৃষ্ট হয়। বঙ্গপুরের জরেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে থাকা কালে তিনি এতদঞ্চলের কথিত ভাষার এক ব্যাকরণও সংকলন করিয়াছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ অত্যন্ত ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও প্রসঙ্গাধীন এতদঞ্চলের কথিত ভাষার কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অমুসরণে দুই এক জন বাঙ্গালীকেও এখন এই পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

কোচভাষা নামে কোন ভাষা অথবা তাহার স্থিতি এতদঞ্চলে কোথাও আছে শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জনশ্রুতির অভাব তাহার অস্তিত্বের বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নহে। “কোচভাষা”র অমুসন্ধান করিতে হইলে অতীতের

মধ্যেই তাহার অঙ্গসন্ধান করিতে হইবে এবং বঙ্গের অন্ত্যন্ত অঞ্চলের ভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে এতদঞ্চলের বর্তমান কথিত ভাষা বঙ্গের অন্ত্যন্ত অঞ্চলের কথিত ভাষার তুলনার বিরূপ, গ্রিয়ারসন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাহার নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। একটা গল্প বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথিত ভাষার (standard dialect) এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে :—

কলিকাতা—

কোন এক ব্যক্তির ছুটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটা তাহার পিতাকে কহিল—“পিতঃ, বিষয়ের বে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দিন। তিনিও উহাদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই কনিষ্ঠ পুত্রটি সমস্ত একত্র করিয়া এক দূর দেশে যাত্রা করিল, এবং তথায় অপরিমিত আচারে তাহার বিষয় অপচয় করিয়া ফেলিল। যখন সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সেই দেশে বিষম দুর্ভিক্ষ হইল, এবং তাহার অভাবের সূত্রপাত হইল।

মেদিনীপুর—

এক লোকের দুটো পো থাইল। তারেকার মাঝু কোচ্যা পো লিজের বাফুকে বল বাফুহে! বিবৈ আশৈর বে বাঁটা মুই পাব সেটা মোকে দ্যা। সে তারেকার মাঝু বিবৈ বাঁটা কোর্যা দিল। ভোং দিন বাইলি কোচ্যা পো জুমচ্যা শুটি লিয়া ভোং দূরে এক গাঁয়ে চোলা গ্যাল। সেঠা সে আকুস্তা খচাপতর্ কোর্যা লিজের বিবৈ-আশৈ একা-দমে ফুকা-প্যাল। য্যাংকে তার জুমচ্যা ফুরাইল সেঠা এক বড্ড আকাল পল। তার বড্ড দুখ হোলা।

বাথরগঞ্জ—

একজন মানুষের দুগুণা পোলা আছিল। তারগো মদ্যে ছোটুগুণা হের বাপরে কইল বাবা বিস্তের বে ভাগ মুই পামু তা মোরে দেও। হেতে হে হেরগো মদ্যে বিত্ত ভাগ করিয়া দিল। দিন হতো বাদে ছোটুগুণা পোলা বেবাক একত্তর হরিয়া দূর দেশে মেলা হরিল। হেথানে হে লুচ্চামি হরিয়া তার বিত্ত বেসাদ উড়াইয়া দিল। হে হকল খোয়াইলে পরে হে দেশে ভারী আহাল হৈল, হেতে হে মুস্কিলে (টৈল)।

কোচবিহার—

একজন মানুষের দুই কোনা বেটা আছিল। তার মদ্যে ছোট জন উয়ার বাপোকে কইল, বা, সম্পত্তির বে হিস্য মুই পাইম তাক্ মোক্ দেন। তাতে তাঁর তার মালমাস্তা নোনা বাটাঙ্ক বাটিয়া চিরিয়া দিল। চেইল দিন নাই যাইতে ছোট বাটা কুলে মালমাস্তা গোটেয়া নিয়া হুরাস্তর এক দেশোত্ গেইল। সেটে লুচ্চামি শুভামী করিয়া কুলে টাকা কড়ি উড়িয়া দিল। পাচোং বেলা কুলে খরচ করিয়া ফেলাইল সেলায় অতি ভারী মজা নাগিল। ঐ আকালোত্ উয়ার বড় নান্হানা হবার ধরিল।

ঢাকা—

র্যাক জনের দুইভী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈন্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে বে বিত্তি ব্যাসাদ্ পরে তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তান্ বিষয় সম্পত্তি তাগো মৈন্দে বাইটা দিল্যান্। তার্ পর্ কিছু দিন পরেই ছোট ছাওয়ালডি তার সগল টাকা করি র্যাকাত্ কইরা র্যাক্ দূর দ্যাশে চইলা গ্যালো। সেখানে গিয়া তার্ বা কিছু আছিলো তা বদখ্যলী কৈরা উরাইয়া দিলো। তার্ পর্ তার্ বা আছিলো তা যখন সব্ খোয়াইলো তখন সেই দ্যাশে বর আকাল্ পোইলো।

গোহাটী—

এটা মাছুহর ছটা পুতাক আছিল। তাহাঁতর ভিতরত সুরুটো পুতাকে বাপাকক্ কলাক; বাপা! মই বি বস্তুর ভাগ পাম তাক মোক দি। তাতে সি তাহাঁতর ভিতরত বস্তুর ভাগ করি দিলাক। অলপ দিনর পাছত সুরুটো পুতাকে সুনদায় খেনি বস্তুর লগ করি লই দূর দেশক লাগি গেল আর তাত যাই ঢাংখিলা করি আপোনার বস্তুর খেনি নষ্ট করিলাক। সি তার গোটাই খেনি বস্তুর খরছ করি ফেলোবার পাছত সেই দেশত এটা বড় ডাঙার আকাল হল। আর তার খাবালবার নহোবা হবা ধরিলাক।

মালদহ—

ম্যাক্ কোন্ মাছুসের ছটা বাটা আছলো। তার ঘোর বিচ ছোটকা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, বাব ধনকরির যে হিস্যা হামি পাম, সে হামাক্ দে। তাৎ তাই তার ঘোরকে মালমাত্তা সব বাটা দিলে। বহু দিন না বিংতে, ছোট ছেল্যা সব ম্যাক্কে কর্যা বিদেশ্ চলা গ্যালো। আর সে বদচালে আপ্নার মালমাত্তা সব খুইয়া দিলে। যখন সব সে খেচ্ কর্যা ফেলে, তখন সে দেশে বারা আকাল হোলো, আর সে বারা কঠিনে পোলো

( Vol. V. Part I )

সুপণ্ডিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ একশত বৎসর পূর্বে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত বহু গ্রন্থের সংবাদ আপনারা অবগত আছেন। তন্মধ্যে রামায়ণের অন্তর্গত স্কন্দরাকাণ্ডের স্থল বিশেষের ভণিতা এ অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বিবর্ণ হয়ছে স্বর্ণ বর্ণ অঙ্গ তার,	অতি কষ্টে অস্পষ্টে সীতার সন্নিধান,
হিমস্তাগমনে পদ্মবন যে প্রকার।	জায়া তথা পায় এক বৃক্ষ বিছামান। ৭৮
রাবনত রত মন নহে তার রাম,	রাম নাম মুক্তি ধাম বদ সভাসদ,
মরণে নিশ্চয় করিয়াছে মনকাম।	শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভনে রামায়ণ পদ।” ৪৮

এই সময় দক্ষিণ-বঙ্গে পদ্য রচনার কুরুপ ভাষা ব্যবহৃত হইত তুলনার নিমিত্ত তাহার নিদর্শন উদ্ধৃত হইতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্তী সমসাময়িক ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অনুবাদিত কাশীখণ্ডের ভণিতা লিখিত আছে :—

“কাশীবাস করি পঞ্চ গঙ্গার উপর,	ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ,
কাশী গুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর।	এইখানে সমাপ্ত করিল বিবরণ।
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি,	তাহার আদেশ ক্রমে কিতাব করিয়া,
ইহার সহায় হয় কাহারো না দেখি।	রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া।
মিত্র শত চৌদ শক পৌষমাস যবে,	সেহি বহি দৃষ্টি করি নকল নবিসী,
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে।	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী।”

... ..

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৬৪ পৃঃ )

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্গত জয়ন্তীয়ার রাজা রাজেন্দ্রসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত গ্রাম্য গীতি রচিত হইয়াছিল ;—

“মুই কই যাউম রে—কোথায় গেলে তরি,  
হাকিম হৈলা হুকুমদার পেদা প্রাণের বৈরী ;  
—রে মুই কই যাউম রে।

বাটি, কুটি, ইন্দ্র ( রাজেন্দ্র ) সিংরে মুখে রেখা দাড়ি,  
বন্দি করি থৈল নিয়া মুরারী চান্দ্রের বাড়ী,  
—রে মুই কই যাউম রে।”

শ্রীহট্টের ইতি: ১ম—২ভাঃ, ৪র্থ, ৩৭ পৃঃ

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়নের রাজত্ব কালের কোচবিহার অঞ্চলের গদ্য রচনার নমুনা একখণ্ড অপ্রকাশিত প্রাচীন দলিল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। অনাবশ্যক বোধে দলিলের পরিচয় পরিত্যাগ করা গেল ;—

“...তুমি ভজুরে আর্দ্রাশ করিলা যেমোর কদম ব্রহ্মোত্তর ভোগ বাবদ...জনী...তালুকত আছে। তাহার ওয়াক্কা...হাঙ্গামত বাসা লুট গৈছে ৬ জার হুকুম হৈলে পুনশ্চ ব্রহ্মোত্তর ওয়াক্কা পাম...ইত্যাদি

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কৃত পঞ্চ ক্রিয়াযোগ-সার পুথির স্থল বিশেষে লিখিত আছে :—“এই অবধি আমার কৃত পদ এই হুনে শেষ ভাগ ঋপুঞ্জর বড়কায়েতের করা আমার ভাগের ভুলচুক লেখাতে জে হৈছে তা সারা স্তরা একপ্রকার করিলাম ঐ থণ্ড পুথি দেবানন্দ শর্ম্মাক দিয়া লেখা ও তার অক্ষর ভাল শব্দ বোধ আছে চাষা নয় ইতি”

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়েই দক্ষিণ বঙ্গে বাঙ্গলাভাষার নবযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় কৃত গোড়ীয়াভাষা ব্যাকরণ এই সময় সঙ্কলিত হয়। এই ব্যাকরণ বাঙ্গলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বাবিংশ সংস্করণ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী তাহা মুদ্রিত করেন। এই ব্যাকরণের ভূমিকার স্থলবিশেষের ভাষা এইরূপ :—

“এ কারণ স্কুল বুক সোসাইটীর অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় ঐ গোড়ীয়া ভাষা ব্যাকরণ তত্ত্বায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরন্তু তাহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুনর্দৃষ্টিও সাবকাশ হয় নাই।”

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ৭১২ পৃঃ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে “সংবাদ-কৌমুদী” পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে :—

“তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ-পথে গমন করিয়াছেন। কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কাণ্ড। পূর্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিদ্যমানীয়রূপে গণিত ছিল সে বিষয় এতৎকালীন বিজ্ঞা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যজ্ঞ দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশ যাত্রা হয় তাহার নাম খেলুন।”

সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকা ১৩০২

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র যে দণ্ডবিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার স্থল বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“উপরে যে সকল লিখা গিয়াছে তেদের কথা ইহাতে  
যদি ঐ সকলের পতন হয় তবে রাজ্যতে ৬২১০ সাড়ে-  
বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।”

“মারণেতে যদি মারিত বাক্তি মৃত হয় তবে তাহাকেহ  
রাজা প্রতি বদল শূলাদি দ্বারা মারিতে হয়—”

“কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেহ যদি কোন বাক্তিয়ে  
প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে  
পাচনা করিব ত্রাক্ষণের মারণাস্তিক শাস্তি নাই—”  
হেরম্ব রাজের দণ্ডবিধি

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাধরগঞ্জের এলাকায় সম্পাদিত এক খণ্ড দলিলের ছায়াচিত্র হইতে গৃহীত ষথায় ষ বর্ণবিন্যাস  
যুক্ত প্রতিলিপি এইরূপ ;—

“শ্রীদুর্গা

শ্রীকৃষ্ণগাণ ন্যায়ভূষণ—

সাকিম চান্দসি যুচবিতেষ

শ্রীরামদাস দাস সাকিম বাটাজোড়

পরগনে বাসরোড়া অস্যা লিখলং আগে

শ্রীমতি কুঞ্জমালা জগজে রামকন্দ ১৫ সাকীম

শিপীলাকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার

কন্যা শ্রীমতি মহামায়া এই দুই জন সেইছা পূর্বক

আপনার স্থানে থাও বিক্রী হইল এহার ঘর দুই জনকে

আনি আনীয়া দিলাম এহার ভাত্তর শ্রীরামরায় তৈ

ইসাদ করেণ ২ দুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার নাম

কওয়ালায় লিখাইয়া দিব যদি না লীখাইয়া দিতে

না পারি তবে এই তৈন্যো কিছু খেসারত আপনার

হয়ে তাহার নিসা আমি করিব ইতি সন ১১৯৫

তারিখ ১৪ অগ্রান”

সাহিত্য পত্রিকা ১৩২০ ভাদ্র ৪৩৫ পৃঃ

( — চিহ্নিত অক্ষরের পাঠ সন্দেহজনক )

এই সময়ের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কোচবিহারে রচিত নারদীয় পুরাণান্তর্গত গঙ্গামাহাত্ম্য নামক  
অপ্রকাশিত গ্রন্থের ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি:—

“রূপভূপ অমুরূপ গুণর নোকর, বাহার অমুরূপ গুণবন্ত,  
উপেন্দ্র নরেন্দ্র তাত হৈল কলাকর। খজানারায়ণ নাম পরম শ্রীমন্ত । ১  
সজ্জনের নয়ন কুমুদ বিকসিত, তার অমুরূপ পায় অতি অল্প মতি,  
যার কীর্তি চন্দ্রিমা বন্ধিত নীতে নীতে। নারায়ণে পুরাণ পয়ার নিগদতি । ৭  
যার বাক্যামৃত কর্ণপথে করি পান, তার আজ্ঞাপায় ক্ষিপ্রে নারায়ণ নাম বিপ্রে  
আশ্রিত সকলে করে স্বর্গকো বিজ্ঞান। ভনে পুরাণক ছন্দবন্দে ।” ৯

মহারাজ উপেক্ষানারায়ণের সমসাময়িক একজন নারায়ণ পুরোহিতের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার ঋংশধরেরা এখন কোচবিহার রাজ্যের ইছামারী গ্রামে বাস করিতেছেন \* এই সময়ের অর্থাৎ ১৭৩৯ খৃঃ একখানা অপ্রকাশিত প্রাচীন দলিল হইতে কোচবিহার অঞ্চলের গদ্যরচনার নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

“...তুঞি যে আর্দ্রাশ করিলো মুঞি বেভাতি খেজমত করো মহারাজার হুকুম হৈলে পেটভাতাত জমি খানিক পাম এতকে...পলাম তার বাবদ বাড়ী পঞ্চান্না সহিত ছুই বিষের জমী তোক পেটভাতাত হুকুম করিল...” ইত্যাদি

দক্ষিণ বঙ্গে এই সময় বঙ্গসাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রী যুগ। স্বনামখ্যাত রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের লেখনী যাহা অমর করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রশংসিত যুগের পদ্য রচনার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। গদ্যের নমুনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতে পারে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমার কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার স্থল বিশেষ এইরূপ :—

“...অতএব তুমি এসময় কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল। ইহা মকরর মকরর জানিবা। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন স্মলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।”

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৩২ পৃঃ )

১৬৫৮ শকে ( ১৭৩৬ খৃঃ ) কাছাড় রাজ সরকারের সম্পাদিত এক খণ্ড দলিলের ভাষা এইরূপ :—

“বড়খলার চান্দগন্ধর বেটা মণিরাম উজির গং...প্রতি আর আমার বংশের জত দিবস রাজ্য সম্পদ আছে অত দিবস জদ বুনিয়াদ বংশাবলি হাফিম ইতি জমিধারি তুমারে দিলাম এতে তুমার আইল শিমাউ বিসএত জে হিংসা করে তার প্রাণ রৈক্ষা না করিমু আর আমার বংশে তুমার বংশেরে পালন করিব মহা অপরাদ পাইলে শাঠা অপরাদ খেমিআ উচিৎ দণ্ড করিমু আর আমার বংশে তুমার বংশেরে অপনিআয় শাস্তি না করিমু তুমার বংশে আমার হুন বেকবুল করে...এই খাতিল জমাত না ভুলিমু সত্য এতেরিক্তে খাতিল জমা পত্র দিলাম ইতি শক ১৬৫৮ তারিখ ২৯ ভাদ্রস্য

ত্রিহট্টের ইতি: ১ম উপসং ১০৪ পৃঃ

\* ১৭৩০ খৃঃ ত্রিহট্টের ভুবনেশ্বর বাচস্পতি বিরচিত “নারদী রসামৃত” গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ :—

“হরিশ্ৰবনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।

ষোলশত বায়ান্ন শাকেতে হৈল লিখন ॥

তান্মধ্বজ মহারাজ ছিল মহাভাগ।

সর্ব লোকে সদা যারে করে অমুরাগ ॥

তানপুত্র শূরদর্প রাজা মহাশয়।

চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয় ॥

কবি বাচস্পতি তান বাক্য অমুরারে।

নারদী রসামৃত রচিলা পন্থারে ॥”

ত্রিহট্টের ইতি: ২য়—পরি: ১১ পৃঃ

ইহঁদেরও প্রায় শত বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এতদঞ্চলের গদ্য ও পদ্য রচনার নমুনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। তাত্‌কালিক কোচবিহারাধিপতি মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত হস্তলিখিত আদিপর্বে লিখিত আছে :—

“মহারাজ কাব্য সঙ্গীতের দীক্ষা গুরু,	বিহার কামতানাথ প্রাণ মহীপাল,
দরিদ্র জনার জ্ঞাঞ বাহা করতরু। ৫২	সংগ্রামত বিপক্ষ জনার যমকাল। ১৪৬
রত্ন পৃষ্ঠে মহারাজ প্রাণনারায়ণ,	প্রাণ মহীপাল গুণমন্দির,
জন্ম জন্ম যাক বলে সর্বজন।	বিদগধ জন মুকুটধীর।
মেদনৌ মদন দেব ভোগে পুরন্দর	নরপতি দেব বীর সুজন,
বিশ্বসিংহ কুল কুমদিনী দিবাকর। ১১৯	তান আজ্ঞাপায়া শ্রীনাথে গান।” ১৩১

শ্রীনাথ তাঁহার পিতামহ ভবানন্দের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে দ্রোণপর্বে লিখিয়াছেন :—

“মল্ল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর,	তাঁহার পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ,
গুরুধ্বজ নাম দেব ভোগে পুরন্দর।	কামরূপ দ্বিজকুল কুমদিনী চন্দ্র।”

শ্রীনাথের সমসাময়িক ( ১৬৮৭ খৃঃ ) দক্ষিণ-বঙ্গের নিমতা নিবাসী কবি কৃষ্ণরাম “যগ্গীমঙ্গলের” হল বিশেষে সপ্তগ্রামের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

রাঢ় গোড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল,  
গয়া পৈ-ইরাগ কাণী নিষধ নেপাল।  
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ,  
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ।  
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল,  
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কুল।

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সং, ২০৫ পৃঃ )

শ্রীনাথের সমসময়ে কোচবিহার রাজদপ্তরে কিরূপ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাঁহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। বলা বাহুল্য যে এই সময় রঙ্গপুর জেলার উত্তরার্দ্ধ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৭৬ খৃঃ তাত্‌কালিক কোচবিহারাধিপতি মহারাজ মোদনারায়ণ সম্পাদিত একখণ্ড হস্তলিখিত হালিলের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ :—

“কাকিনিঞা চাকলার চাকলাদার শ্রীহরিনারায়ণ চক্রবর্তীক ও পাছা যে অধিকার হয় তাবাক এতনুপ্রতি সমাদেশঃ প্রয়োজনাক্ষ.....শকে স্বর্গীয় ৮৮র আজ্ঞা রুজু.....যখন যে অধিকার হয় তাবাক.. যে জীবিকা দিছি সে জীবিকার ভূমিত হুতি গ্রাম ছরবিশ ভূমি ব্রহ্মোত্তর দিছে...পাত্রক...শকে...তাত বাপা আদিশ করিল স্বর্গী বাপা অনেক ব্রহ্মোত্তর দিছে তার সমান মোঞ নহো সে জোথো সন্তাবন নাহি এতকে মোঞ হই গ্রাম ছরবিশের ভূমি ব্রহ্মোত্তরত...পাত্রক দিছো এতকে ৮৮র আজ্ঞার আমার অভাবে আমার দত্ত ব্রহ্মোত্তরতে ভোগ হবেক এতকে হকুম দিহু...” ইত্যাদি।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের থানাদার মতিউল্যা সিরাজীর আহবান প্রতিনিধির বরাবর লিখিত পত্র এহলে উদ্ধৃত করিতেছি:—



“পরবর্ত্ত সমাচার এহি। প্রীতপত্র এথা আমি শুভক্বে পছছিল। বে রূপ নিমকহারাম জয়ন্তা ও কাছ'রীর কারণ লিখিলা সেরূপ হৈব। প্রাচীন আমার পিতা নবান নাথুল থা সিরাজী কোচবিহার ও রাজ্যমাটির সুবা আছিল, তাতে তোমার ঠাই অধিক প্রীতি আছিল। এখন পত্র পায় আমার অন্তঃকরণে অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইল, পরস্পর প্রীতি প্রতিপালন উচিত। আপনি লিখিয়াছিল বাননিয়ার খাঁর যোগে রাজ্যমাটির পথক্রমে ৩নবাব সঙ্গে প্রীতি হইয়াছে। এবে ৩ কারণ এই ক্রমে আগত অধিক প্রীতি হইবে। ৩ অধিক প্রীতিতে অনেকরূপ কার্য্য হইবে। অল্প দিবস হয়, আমি এথা আসিয়াছি। থানার কাণ্ডাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দূঢ় করিয়া সেই দিগের থানাত ফৌজ পাঠাইতেছি।” ইত্যাদি। শ্রীহট্টের ইতি: ২ ভা: ৪ খ: ১২ পৃ:।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর সন্ধিকালে কোচবিহারে রচিত কিরাতপর্ক নামক পুথির ভণিতায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন;—

“নাহি শাস্ত্র জ্ঞান আমি কাব্য না পড়িছি,  
জনমে অধীন নরনাথেরে সেবিছি।  
কাব্য কোষ অলঙ্কার না পড়ি বিশেষ,  
ভারত পুরাণ নাহি শুনি স্যবশেষ।

তথাপি রাজ আজ্ঞা লাগে পালাগাক,  
এতেকে অধিক দোষ না দিবা আমাক  
বেদময় বেদবাস্য দেবের বচন,  
প্রবণর মন তহু তারণ কারণ।

সিদ্ধ পক্ষ বাণ বিবু শকের সময়,  
মকরত দেব দিনকরের উদয়।

গুরু দিন শ্রীপঞ্চমী পক্ষ পরধান,  
কাননে কুম্মাকর করিল প্রস্থান।

সুগন্ধ সমীর দশো দিশে সঞ্চারিল,  
মনমথ বাক মনে মনোজ মিলিল।

জন্মে জন্মে বীর নারায়ণ নরেশ্বর,  
যদি জন্ম নরতহু বিহার নগর।  
ভবানন্দ নানে চন্দ্রসেনের নন্দন,  
নিজ ধন্যে কত নিজ কুমের মণ্ডন।  
হেন মহাশয়ের তনয় অল্প মতি,  
বোলারাম কৃষ্ণ কবি শে র বদতি।

\*

\* \*

তার আজ্ঞাপরনানে ভারত ভাষায়,  
বোলারাম কৃষ্ণ কবি শেখর কহয়।

\*

\* \*

হেন মহারাজের সেবক শিশু মতি,  
বোলারাম কৃষ্ণ কবিশেখর বদতি। ৪

১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টের ষ্টেশান নাগর কৃত অষ্টদ্বৈপ্রকাশের ভণিতায় লিখিত আছে—

যে পড়িছ যে শুনিছ কৃষ্ণদাস মুখে,  
পদ্মনাভ শ্যামদাস কহিলা যে মোকে।  
পাপ চক্ষে যে লীলা মুগ্ধ করিছ দর্শন,  
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিছ বর্ণন।  
চৌদশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে,  
লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈলু শ্রীলাউর ধামে।”

( শ্রীহট্টের ইতি: ২ ভা: ৩ খ: ১২ পৃ: )

লাউর শ্রীহট্টে অবস্থিত, ঈশান শ্রীহট্টের অধিবাসী হইলেও তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা শাস্তিপুত্রই সম্পন্ন হইয়াছিল ।  
ঈশানের স্বদেশবাসী ও সমসাময়িক বংশীদাস বিরচিত পদ্মপুরাণের ভূমিকায় লিখিত আছে—

“জলধির বামেতে ভূবন মাঝে দ্বার ( ১৪৯৭ )

শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ।”

( শ্রীহট্টের ইতি : ২—৪ভ : ১০৩পৃ : )

বৃন্দাবন দাস, গোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতিও প্রায় এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন । গোচন দাসের  
“চৈতন্যমঙ্গল”এর ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ ভগ্নতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম, মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে,  
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম । ধনা মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে ।  
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা, মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত,  
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি দাতা । সর্বস্বার্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত ।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে কামরূপ রাজ নরনারায়ণের দরবার হইতে আহম্মদদরবারে প্রেরিত একপত্র পত্র আসামের  
বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক আবিস্কৃত হইয়াছে । ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আসামবস্তী  
পত্রিকা হইতে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম ।

“স্বস্তি সকল দিগদন্তীকর্ণতালান্ধালসমীরণপ্রদলিতহিমকরঃরহরহাসকাশকৈলাসপাস্তুর যশোরাসীবিরাজিত-  
ত্রিপিষ্টপত্রিশতরশ্মিনীসলিলনির্মলপবিত্রকলেবরশীশনদীরধৈর্যামণ্যাদাপারাবারসকলদিক্কাশিনীগীর্য়মানগুণসন্তান  
শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ড প্রতাপেশু—

“লেখলং কার্গাঞ্চ । এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি । অখন তোমার আমায়  
সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্করিত হইতে রহে । তোমার আমার  
কর্তব্যবাসে বাক্তিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক । আমরা সেই উদ্যোগতে আছি । তোমারো এগোট কর্তব্য  
উচিত হয় । না কর তাক আপনে জ্ঞান । অধিক কি লেখিম ।.....” ইত্যাদি ।

দক্ষিণ-বঙ্গের সমসাময়িক রূপ গোস্বামীর কারিকার গদ্য রচনা এইরূপ—

“শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয় । অথ বস্ত্রনির্ঘণ । প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ঘণ । শঙ্কগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ,  
স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ । এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে ।” ইত্যাদি

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২

১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের যে সমস্ত নিদর্শন উপস্থিত করিলাম তদ্বারা কোচবিহার অঞ্চলের লিখিত ভাষা  
দক্ষিণ-বঙ্গের লিখিত ভাষার সহিত তুলনায় কিরূপ ছিল, বিচারের সুবিধা হইতে পারে । মহারাজ নরনারায়ণ ১৬শ  
শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহার রাজবংশে বিদ্যমান ছিলেন । তাঁহার অন্যতম সভাপণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ  
কর্তৃক অনুবাদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও ১০ম স্বল্প ভাগবত কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত  
আছে । মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের হস্তলিপি । ভাগবত গ্রন্থখানা নষ্ট প্রায় ও অসম্পূর্ণ । আসামের অন্তর্গত  
বঙ্গের রাজা গঙ্গারামনারায়ণের বংশাবলী ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত । তাহাতে লিখিত আছে সিদ্ধান্তবাগীশ

তরুণক কর্তৃক গোড় হইতে আনীত ।- সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত উক্ত ছই পুথিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই ।  
মার্কণ্ডেয়পুরাণের ভণিতার লিখিত আছে—

“মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে,      একারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার,  
তার পুত্র ভোগে তুলা নহে পুরন্দরে ।      নিজ দেশভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার ।  
একদিন সভা মাঝে বসি যুবরাজ,      বেদ পক্ষ বাণ আর শশাঙ্ক শকত,  
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাষ ।      আরম্ভ করিলো মার্কণ্ডেয় কথা যত । ১  
পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছর,      কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমানে,  
পণ্ডিতে ব্যয় মাত্র অন্যো না ব্যয় ।      কহে পিতাম্বর নারায়ণ পরশনে । ৪৮

দশম স্কন্ধ ভাগবতে লিখিত আছে :—

“দশম স্কন্ধের কথা পরম সম্পদ,  
কৃষ্ণ জন্ম কর্ম শুন চর্যো নিশবদ ।  
অতি সুরপুর সেজে কামতানগর,  
..... বিশ্বসিংহ নৃপবর ।  
তাহার তনয় যে সমরসিংহ নাম,  
কৃষ্ণের লীলাত তাঞ অতি অভিরাম ।

শিশু মতি পিতাম্বর তাহার সমীপে,  
কৃষ্ণের লীলার পদ রচিলো সংক্ষেপে । ৭৮

পিতাম্বর যে স্থানের অধিবাসী হউন না কেন পুথির রচনার ভাষাই যে যুবরাজের নিজ দেশভাষা ছিল তাহা  
“নিজ দেশভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার” আদেশ হইতে জানিতে পারা যাইতেছে । অধিকন্তু রচনার এতদঞ্চলের  
বিভক্তিচিহ্ন, সর্জনাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—শকত, লীলাত, তাঞ, কহিলন্ত ইত্যাদি ।  
কহিলন্ত, করিলন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার এতদঞ্চলে অন্ত্যান্ত প্রাচীন পুথিতেও দৃষ্ট হয় । প্রাচীন কালে বঙ্গের অন্ত্যান্ত  
অঞ্চলেও এই সমস্তের ব্যবহার ছিল । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক  
স্থলেই ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । পরমেশ্বর কবীন্দ্র রূত মহাভারতে লিখিত আছে ;—

“দ্রোপদী বোলন্ত সৈরিকী মোর নাম ।”

“তান হক সেনাপতি হওন্ত লঙ্কর ।”

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪০, ১৪১ পৃঃ )

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত বৌদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্যে ভগন্ত, নাচন্ত, করন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার  
আছে । চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে মুছিলান্ত, খোজন্তি, গেলান্তি ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এতদঞ্চলে বিরচিত যে সমস্ত প্রাচীন পুথির ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে অনেক মতের নিম্নলিখিত  
সর্জনাম, বিভক্তি চিহ্ন ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে । যথা—তাতে ( তাহাতে ) যাক ( যাহাকে ) জাঞ ( যে, বিনি )  
জাঞ ( তিনি ) ব্যরণত ( ব্যরণে ) স্বীর্থক ( স্বর্ণে ) পুরাণক ( পুরাণে বা পুরাণকে ) সংগ্রামত ( সংগ্রামে ) জায়া

( যাইয়া, গিয়া ) পারা ( পাইয়া ) ইত্যাদি । এতদঞ্চলের কথিত ভাষায় এখনও এই সমস্তের অবাধ ব্যবহার রহিয়াছে । মারিবা, ধরিবা পদের উত্তর নিমিত্তার্থে ক প্রত্যয় যোগ এখন পশ্চিম কামরূপে আর প্রত্ন হয় না । প্রাচীন কালে ছিল যথা—

“তথাপিত রাজআচ্ছা লাগে পালিবাক ।” কিরাত পর্ব ।

কৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ প্রয়োগ আছে যথা—

“মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ।”

শ্রুতপুরাণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

“দেবতা দেহার্য্য ন ছিল পূজিবাক দেহ ।”

এতদঞ্চলের প্রাচীন ‘পাম’ ক্রিয়া এখন পাও ( পাই ) হইয়া গিয়াছে । পূর্ব কামরূপে এখনও ‘পাম’ শুনিতে পাওয়া যায় । তদঞ্চলে আমি শব্দের রূপান্তর ‘মই’ বহুবচনে ‘আমি’ হইয়া থাকে । বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের প্রাচীন বাঙ্গলা গানে একবচনে ‘মই’ ও বহুবচনে ‘আমি’ বা ‘আম্‌হে’ শব্দের ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা—

“এবে মই বুঝিল সদগুরু বোহে”

“ভগই লুই আম্‌হে মাণে দিঠা”

বৌদ্ধ গান ও দোহা, চর্যাচর্যা বিনিশ্চয় ১—২ ।

বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত এতদঞ্চলের বাঙ্গলা পুথিগুলিতে সংস্কৃত গদ, বদ, ভব ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল যথা—

“রাম নাম মুক্তি ধাম বদ সভাসদ” ( ক্রিয়াযোগ সার । )

“নারায়ণে পূরণ পয়ার নিগদতি” ( গঙ্গা মাহাত্ম্য । )

“অহে বিশ্বস্তর ভব প্রসন্ন আমাক” ( ক্রিয়াযোগ সার । )

এতদঞ্চলের মুঞি, মোর, আমাক, তুঞি, তোর, তোমাক, তাঞে, তার, তাত ইত্যাদি সর্বনাম ও বিভক্তিচিহ্ন প্রাচীন কালে সমগ্র গৌর দেশেই ব্যবহৃত হইত যথা—

“এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা,  
তোরে আমি কত্যা দিব আপনি কহিলা ।”

\* \* \*

“তবে মুঞি নিষেধিহু শুন বিজবর;  
তোমার কন্ঠার যোগ্য নাহি মুঞি বর ।”

চৈতন্যচরিতামৃত, সাক্ষীগোপাল বিবরণ ।

“শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঞে দেখিবারে,  
বিপ্রগৃহে বসিয়ছে দেখিল তাহারে ।”

\* \* \*

“প্রভুর আগমন তেই তাহাঞি শুনিলা,  
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তার ইচ্ছা হৈল ।”

চৈতন্যচরিতামৃত, দক্ষিণ ভ্রমণ । )

“হেতে ফাল দিয়া চক্র নৈয়া হাতে,  
ভীষক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে।”

“শিখণ্ডক দেখিয়া পাইয়া মনস্তাপ।”

—পরমেশ্বর কবীন্দ্র কৃত মহাভারত, (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪৩ পৃঃ)

সহস্র বৎসর পূর্বের বাঙ্গলা রচনায়—

“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেবী,  
হাতীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।”

(বৌদ্ধ গান ও দোহা, চর্যাচর্যা বিনিস্চয় ১-৩৩)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—“অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের বহু-সংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে।” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২২৬ পৃঃ) কামরূপের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ যে তিনি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহাতে প্রাপ্ত হইতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “বৌদ্ধ গান ও দোহার” ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

“সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গলা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গলা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। ..... ইহার জন্য তাঁহা দিগকে (অহুসন্ধানকারীগণকে) তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে! তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে। কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সিলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে।” ইত্যাদি (৩৬ পৃঃ)

শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত উপরোক্ত বৌদ্ধ বাঙ্গলা গান ও দোহার সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণীতে লিপিত হইয়াছে—“উহাতে বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া অসিতোছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ জাত, তাহাণে তাহার প্রমাণও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধ গান ও দোহা এবং অন্য আপনাদের নিকট প্রদর্শিত ত্রিকুণ্ড কীটন সেই অবকাশের অনেকটা পূরণ করিবে। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সম্বলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।” ইত্যাদি

বৌদ্ধগান ও দোহার একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিন্যাস অনেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—“নিজল,” “নাব,” “নাতি” শব্দে ‘ন’ ও ‘ব’। “যেন” শব্দে ‘ন’ ও ‘ব’ এবং ‘জ’ ও ‘ষ’। “রূপ” শব্দে ‘খ’ ও ‘ক্ষ’ এবং ‘ন’ ও ‘ণ’। “সম” ও “সংজ্ঞ” শব্দে ‘স’ ও ‘ষ’। “শিয়াল” শব্দে ‘শ’ ও ‘ষ’। “শশি” শব্দে ‘শি’ ও ‘ষী’ বাতীত দুইটিই ‘শ’, কোথাও একটি ‘শ’ ও একটি ‘স’ আবার কোথাও দুইটিই ‘স’। “দোষ” শব্দে ‘ষ’ ও ‘স’। “শূন্য” শব্দে ‘ন’ ও ‘ণ’ এর ব্যবহার ইত্যাদি অনেক নিদর্শন প্রদত্ত হইতে পারে। খণ্ডে, গণে, কঁহি, গলে ইত্যাদি চতুর্বিধ গুরু শব্দেরও অভাব নাই। নব প্রকাশিত কৃষ্ণকীটনেও এই প্রকারের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কোচবিহার ও আসামের প্রাচীন পুথিগুলিতে বর্ণবিন্যাসের এই প্রকার সামান্যতাব অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ বঙ্গের প্রাচীন পুথিগুলির প্রকৃত বর্ণবিন্যাস ব্যবসায়ী প্রকাশকগণ

আধুনিক নিয়মে সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। এই উপায় প্রাচীন পুথিগুলি ক্রমশঃ অপ্রাচীনে পরিণত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের উপায় রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে প্রাচীন পুথির বর্ণবিন্যাসের এই প্রকার ঐক্যভাব “প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় ক্রমপরিণতির প্রাচীনাবস্থার সমীর্ণ লক্ষণ” (বাঙ্গালাভাষার অভিধান ভূমিকা ১৯ পৃঃ)। ইহা গ্রন্থকারের অজ্ঞতা অথবা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া আধুনিক নিয়মে সংশোধন করিলে পুথিগুলি ঐ “সাধারণ লক্ষণ” হইতে বঞ্চিত হইবে। অন্ততঃ পক্ষে এই “সাধারণ লক্ষণ” লইয়া আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

বিগত ভাদ্র সংখ্যা “নারায়ণ” পত্রিকায় জনৈক লেখক এই আলোচনা উপলক্ষে প্রস্তাব করিয়াছেন যে তিনশত বৎসরের প্রাচীন পুথিগুলির বানান বখাষ রক্ষা করিয়া পরবর্তী রচনাগুলি গ্রন্থকারের স্থলিখিত না হইলে তাহা আধুনিক নিয়মে সংশোধন করা আবশ্যিক। আইন বিহারদ সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তমাদী আইনের এই প্রস্তাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, প্রাচীন পুথি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, অনেক পুথিতে লিপিকরের প্রসঙ্গ থাকে না, অথচ অস্বাস্থ্যসারে তাহা গ্রন্থকারের স্থলিখিত নহে বলিয়া মনে কবিবার যথেষ্ট কারণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। লিপি বিজ্ঞান বিদ্যার আশ্রয় বাতীত অনেক পুথির সময় নির্ণয়ও অসম্ভব বিবেচিত হয়। যাহারা তিনশত বৎসরের প্রাচীন অথবা অপ্রাচীন সময় লিপিকর প্রমাদের যুগ বলিয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর, নিদর্শনগুলি তাহাদেরই স্বমত সমর্থনের জন্য যথাযথ রক্ষিত হওয়া আবশ্যিক।

ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতের রূপ ও বর্ণবিন্যাসের সহিত বাঙ্গালায় সম্পর্ক বিচার না করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বর্ণবিন্যাসের ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে। প্রাকৃতে ‘ন’ স্থানে সর্বত্রই ‘ণ’ হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী প্রাকৃতেও ‘ন’ সর্বত্র ‘ণ’ হয়। পৈশাচী প্রাকৃতে ‘ন’ স্থানে ‘ন’ এর প্রয়োগ বিবিধ সঙ্গত। পালিতে ‘ন’ ও ‘ণ’ দুইই প্রয়োগ হইতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালায় ‘ক’ ‘কিণী’, ‘মাগব’, ‘অঙ্গণ’ প্রভৃতি শব্দে ‘ন’ অথবা ‘ণ’ বিন্যাস হইতে বাধা নাই। “ফাঙ্গনে গগনে কেনে গহমিহঁতি বর্ষিণী” শাসন বাক্য কাহারও সম্বন্ধে উক্ত হইলে সর্বত্রই বঙ্গীয় কোষকারগণ লক্ষ্য স্থানীয় হইবেন। মাগধী প্রাকৃতে সারারণত সংবৃত্ত ‘শ’ অন্যান্য প্রাকৃতে ‘স’ প্রয়োগ হয়। পালিতে ‘শ’ ও ‘ষ’ এর প্রয়োগ মোটেই নাই। বাঙ্গালায় ‘শ’ ও ‘ষ’ প্রয়োগ হইতে পারে একরূপ শব্দের অভাব নাই। যথা শৃগাল, কলশ, কাশ, কংশ ইত্যাদি। ‘শ’ অথবা ‘ষ’ প্রয়োগ হইতে পারে একরূপ শব্দও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—‘বেশ’, ‘কোশ’, ‘কুশাশ্ব’ ইত্যাদি। ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’, এর যেকোন একটি বিন্যাস হইতে আপত্তি নাই একরূপ শব্দ যথা শি, মুশল। শালা, বশিষ্ঠ, শূকর শব্দ প্রাচীন কালে ‘স’ দিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হইত। প্রাকৃতেও প্রভাবে ‘শ’, ‘স’ এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাকৃতে ‘জ’ দি ‘হ’ ‘ষ’, ‘জ’ হয়। মাগধীতে ইহার বিপরীত প্রয়োগ আছে। বাঙ্গালায় যবন, ভান্ডা লিখিত দুই কুল রক্ষা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় বহু শব্দের একাধিক রূপ কোষকারগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা পরিবর্তনর অস্বস্ত্য বাতীত আর কি হইতে পারে? যথা শৃগাল—শৃগাল, রং—বঙ্গ, তরঙ্গ—তরু ইত্যাদি। শব্দের মধ্য বা শেষাঙ্করে ‘অ’ প্রয়োগ প্রাকৃতে আর একটা ক্ষণস্থিতি। বঙ্গীয় কোষকারগণ ইহা গ্রহণও ভাগ করিতে পারেন নাই। যথা—গোআলা, কুআশা, কুআ, যেআলা ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অনেক শব্দ এখনও ‘ি’ অথবা ‘ী’ দিয়া লিখিত হইতে পারে। যথা নন্দি, মুষিক, ছুরি, চুল্লি, চুর্টি, কঁরাটি ইত্যাদি। ‘ু’ অথবা ‘ূ’ দিয়া লিখিত হয় একরূপ শব্দেরও অভাব নাই। যথা কুন্দি, কুণ্ড, শবুদ, কাষুমান, তুহু ইত্যাদি।

তুণ, কুমি শব্দ ঋ কার দিয়া অথবা 'ঋ' কার ও 'ঋ' কার দিয়া নির্মিত অঙ্ক হয় না 'ঋ' লিখিতে 'ঋ' অথবা 'ঋ' বিন্যাস হইতে পারে। গাইত্র, কক্ষা, মগ্ধ, মতীর্থ শব্দে 'ঋ' কার দেওয়া না দেওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। পুণ, ছব লিখিতে একটি অথবা দ্বি "ত" এর ব্যবহার অশাস্ত্রীয় নহে।

বঙ্গভাষার ইতিহাস অনুশীলনে প্রাচীন "বৌদ্ধগান ও দোহা" ও চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণকীর্তন" আমাদের সম্মুখে এক নূতন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পুণি তুটীনা যথাযথ মুদ্রিত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকীর্তনের অদর্শ পুথির ভাষা ও অক্ষর ১৪ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয় ভাষা টীকা, কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সহিত প্রাচীন পরিপার্শ্বিক কবি বিদ্যাপতি, মাধবকন্দলী, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতির ভাষার সাদৃশ্য প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাতলা ভয়ে তাতার উল্লেখে বিরত হইলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণকীর্তনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি নাম ও ক্রিয়াপদ যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া কয়েকটা বাক্য রচনা করা গেল। ইহারা কোচবিহার অঞ্চলের বিংশ শতাব্দীর কথিত ভাষার সহিত পরিচিত, তাহাদিগকে কামরূপের প্রাচীন কবি মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেবের ভাষার অনুসন্ধানে আর শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। এই বাক্যাবলী, ১৮শত বৎসরের প্রাচীন পশ্চিম বঙ্গের ভাষার সহিত, কোচবিহার বা কামরূপের বর্তমান ভাষার সাদৃশ্য অনায়াসে তাহাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিবে।

"দেবতা চিআইল, নম্রা আন পাইলো, তুণি আগত জা, তোর দোহ মোঁই নহো। কালি পূজা হৈবে, কোর'দী আজ কিসক আহল, হোর খোঁপাত বউল ফুল পিকিআঁ নাএ। গোমাণি বহল তিরী লোক ঘরত থাকে, তাক পরক দেখিবারে নাদে, এতাত খাঁখার হৈবে! মোঁই জুআ, কিছুই না জানো, এতাক দেখিঞা মোর মন বুারে। মোর জলানী ছাওয়াল তাক দেখি কচাল ঘরিলেক, বেখাকুল হআঁ কান্দে, সেজা আউলাইল। রে বজ্জার সোয়াদ ভাল, নে থাআ। খোপত চিনিী আছএ, চোথ থমাআ থাএ। আই আজলী হৈল, ভাত ওলাএ, থাআঁ নিন্দা খাউক। হের ওপত থাআঁ মুখ পুড়ি গেল। পাণি পিআ থাআঁ। বদিআ ওড় কুল দিলেক তাত বিস পালাইল।"

কেবল ভাষা বদলাই নহে। কৃষ্ণকীর্তনের যে লিপিচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এতদঞ্চলের বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন অক্ষরও প্রাপ্ত হইতে পারি।

এগারদশ সাহেবের বক্তব্য এই যে যে সময় কোচশাসন পৃথিবী ও আসামাদি দেশে বিস্তৃত ছিল, সেই সময় এতদঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষা লোকের কথিত ভাষা ছিল না, কোচভাষা মূলক কোন এক ভাষাতেই লোকে কথোপকথন করিত। ইতিহাস পাঠে ১৬শ শতাব্দীর অধ্যায়ে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচরাজ্যের তাদৃশ বিস্তৃত ভাষার নিদর্শন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। এখন কথিতভাষার উল্লেখ করিতে গিয়া আপনাদের কিছু সময় নষ্ট করিব।

ক্রমণ: —

শ্রীআমানতউল্যা আহাম্মদ।

## ভুংখের রাজ্য

—:~:—

১

সেথা রবি উঠে নাক পড়ে যায় বেলা রে  
 হয় না'ক বেচা কেনা ভেঙ্গে যায় মেলা রে।  
 সেথা বনে কাঁদে সীতা  
 জ্বলে সতী জ্বলে চিতা,  
 গান্ধুরের নীরে ভাসে  
 বেহুলার ভেলা রে।

২

সেথা ধায় আখিনীর গিরিশির গলায়ে  
 সেথা যায় ভুখারীর পোড়া 'শোল' পলায়ে  
 সেথা উঠে হাহা-বাগী  
 শ্মশানেতে রাজারাগী  
 সেথা শুধু উৎসব  
 নব চিতা জ্বালায়ে।

৩

সেথা আগে দুর্বাসা কপিলের সহিতে  
 অভিষাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।  
 সেথা ভৌভৌ বাজে শিঙা  
 ডোবে মাঝি ডোবে ডিঙা  
 সেথা গিলে অঙ্গুরী  
 তীর্থেরি রোহিতে।

৪

তবু স্বরধুনী নামে সে দেশেরি লাগি রে  
 চীর পরি যুবরাজ তারি অমুরাগী রে।



সেথা থামে আনাগোণা  
পায়ে তরী হয় সোনা  
পাষণ মানবী হয়ে  
উঠে স্বরা জাগি রে ।

৫

তারি ডাকে ভগবানে হয় শুধু আসিতে  
নাশিতে শাসিতে অরি তারে ভালবাসিতে !  
সেথাকার আঁখিজল,  
যমুনায় আনে ঢল,  
সেই দেয় নব স্তর  
কৃষ্ণের বাঁশিতে ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ।

গুরুদেব ।

—%:—

( চিত্র )

প্রথম অঙ্ক ।

[ বিধবা বিনুবাসিনীর গোষ্ঠ্যপুত্রগ্রহণোপলক্ষে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবে । তত্পলক্ষে পূর্ব দিন পূর্বাঙ্কে  
সপুত্র গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত । গুরুদেবকে দেখিয়াই তাঁহার স্বামীশোক উথলিয়া উঠিল । তিনি উচ্চৈঃস্বরে  
কন্দন করিতে লাগিলেন ]

গুরুদেব । ( সহানুভূতিসূচক স্বরে ) কেঁদে আর কি করবে মা ? কেঁদে ত আর তাকে ফিরিয়ে আনতে  
পারবে না । তার চেয়ে শেষ ক'টা দিন ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দাও—শান্তি পাবে । সংসারে কে  
জান মা ?

কী তব কান্তা কন্তে পুত্রঃ  
সংসারোহ্মমতীব বিচিত্রঃ  
কন্তুঃ স্বং বা কুতঃ আয়াতঃ  
তদ্বৎ চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ।

—সবই মারা! সবই মোহ! সবই সেই লীলাময়ের লীলা! এসব তবু তুমি আমি কি বুঝবো মা! হরি নারায়ণ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

[পরস্পর কুশল প্রদানাদির পর]

গুরুদেব। ই্যা, তা হলে বিজয় বাবুর ছেলেকে নেওয়াই ত ঠিক হল? তা বেশ! ছেলেটি বেশ! অপুত্রক থাকটা কিছু নয়! পূর্বপুরুষের জলপিণ্ডের ত একটা ব্যবস্থা কর্তে হবে! আর তা ছাড়া বিষয়সম্পত্তি দেখতে তো একটা লোক চাই। নইলে যে বার ভূতে উড়িয়ে দেবে! শাস্ত্রে আছে—

অপুত্রেন স্মৃতঃ কার্যো যাদুক তাদুক প্রযত্নতঃ।

পিণ্ডোদক ক্রিয়া হেতোনামি সঙ্কীর্ণায় চ॥

অর্থাৎ যারা অপুত্রক তারা কর্তে কি না পোষা নেবে। কেন নেবে? না অন্তোষ্টিক্রিয়ার জন্ত। আর কেন? না তাদের নাম রাখবার জন্ত আর তাদের জলপিণ্ডের যোগাড় করবার জন্ত! বুঝেছ মা? ই্যা তা যাক এখন এদিকে কাজকর্মের ভার কার উপর দিয়েছ মা? শরৎবাবুর উপর? বেশ, বেশ, তিনি কাজের লোক বটেন! আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতেও তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা আছে বটে! তা যা হোক এদিকে কিন্তু ব্যবহৃত্য কিছু করো না মা! একটু বুঝিয়ে চলো! জান ত এসব কাজে দশজন দশকথা বলবে। তাতে কান দিও না! তাদের কি? তারা ত বলেই খালস! এদিকে ত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্তে হবে! দশ গায়ের লোক নাই বা খাওয়াইলে? তাতে কি আসবে যাবে? ওকি ভিখারীদের কাপড় দেবার ব্যবস্থা করেছ দেখছি? না—না তা কর্তে যেও না! তা পেরে উঠবে কেন? কাপড়ের দাম শুনলে মাথা ঘুরে যায়! কি সর্বনেশে যুদ্ধই বেধেছে! তার চেয়ে খাইয়েদাইয়ে চারটি করে পয়সা দিয়ে বিদেয় করো! সুবিধে হয় পরে দিলেই চলবে। কি বল?

[বিন্দুবাসিনী গুরুদেব ও গুরুকুমারকে প্রণাম করিলেন]

গুরুদেব। শুধু হাতে কি কখন গুরুদর্শন কর্তে হয় মা? ওতে বে বড় পাপ হয়। শাস্ত্রে আছে দেবতা গুরু রাজা এঁদের কখন শুধু হাতে দর্শন কর্তে নেই!

[বিন্দুবাসিনী যথারীতি প্রণামী দিয়া গুরুবন্দনা করিলেন।]

গুরুদেব। তোমাকে আর কত বুঝিয়ে বলব মা? আমি না হয় বছরে দশ বার আসছি যাচ্ছি, কোন কথা নেই কিন্তু গুরুকুমার ত তোমার এখানে আর কখন আসেনি মা? সে এই সবে তোমার এখানে পদধূলি দিচ্ছেন, তাঁকে রূপো দিয়ে প্রণাম করাটা কি ভাল হ'ল মা? সোনা হ'লেও বা যা হোক হ'ত! তা যাক বা দিয়েছ দিয়েছ, ঐ সঙ্গে একজোড়া বস্ত্র দিলেই বেশ মানাত। এমন কাজটা তোমার মত মায়ের পক্ষে ভাল হয় নি মা! 'যাবার সময় দেবে' কি বলছ? শে'ত বিদায়ী বস্ত্র! সে কথা ত হচ্ছে না। প্রণামী বস্ত্র কই? আনা হয় নি বুঝি? তা বেশ, আনিয়েই দিও। এখনি না দিলে ত আর ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না! আর তোমারই বা দোষ কি মা! একলা মানুষ, ক'দিক দেখবে? যাঁরা কাজকর্মের ভার নিয়েছেন, তাঁদেরও ত একটু দেখতে শুনতে হয়।

[ইতিমধ্যে জনৈক ভৃত্য জল লইয়া উপস্থিত]

গুরুদেব। না—না—। এর মধ্যে পা ধোবার জল নিয়ে এসেছ কেন? একটু চা খেতে হবে যে! হু পেরালা চা' আনতে বল ত মা। একটু বেশী করে হুখ দিতে বরো! আর না হয় তুমিই বাও! যা'র তা'র

হাতে ত আর ধেতে পারি না। দাঁড়িয়ে রইলে যে? সঙ্কোআহিক হয় নি বলে ভাবছ! তাতে কি? চা যে একটা নেশা, পানতামাকের মত। ও ত মা যখনতখনই খাওয়া যায়! তাতে কোন দোষ নেই। তুমি যাও, নিয়ে এস। হ্যাঁ, দেখ, আর এক কাজ করো। কিছু জল গরম করে রেখ। ঠাণ্ডা জলে আজ আর নাইব না; শরীরটে বড় ভাল নেই। আর গুরুকুমারেরও কাল বিকেল থেকে একটু সদি করেছে।

[ স্নানাদির পর জলযোগের আয়োজন দেখিয়া ]

গুরুদেব। ওঃ, এ যে অনেক আয়োজন দেখছি! এত বেলায় এত সব না দিলেই পার্বে! কি বলছ? ঠাকুরভোগের দেবী আছে? ও, তাই বল, তা হ'লে এক কাজ কর মা, আরো গুটীকয়েক করে ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস। আর শুধু তাতেই বা চলবে কেন? খানকয়েক লুচি ভাজিয়ে আন না! খাবনা বলে আননি? কেন, খাবনা কেন? দিনে দুবার অন্ন গ্রহণ কর্তে নেই বলে? লুচি ত অন্ন নয় মা। সে সব যে সিদ্ধ অন্নের কথা; লুচিতে কোন দোষ নেই। আর দেখ, বেশ ভাল করে একটু আলুর দম করে, কয়েকখানা বেগুনও ভাজিয়ে এন! একটু শীগগীর শীগগীর কর মা!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:~:—

[ যন্ত্রাগার ]

গুরুদেব। ( ক্রুদ্ধ স্বরে শরৎবাবুর প্রতি ) এই কি বরণবস্ত্র নাকি? বলি, স্থতী কাপড় কখন গুরুবরণে ব্যবহার? তোমাদের সব কেমন আক্কেল হে? এ গায়ে কি কেউ ভদ্রলোক নেই? বামুন পণ্ডিত নেই? তাদের কারো ঘটে কি বুদ্ধি নেই? গাঁটা কি এমন উচ্ছন্ন গেছে! উঃ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমরা যে আমাদের অবাক করলে দেখছি! কি, 'এখন এই নিন' কি বলছ? না—না—ও সব ফাঁকি জোচ্ছুরি চলবে না? একি, বাজে বামুন পেয়েছ যে যা হাতে করে দেবে, তাই নেব? তোমরা শুধু টাকাই দেখ, গুরুর শ্রম মৰ্যাদার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখ না! পাড়ার লোক তোমরা, তোমাদের আর কত বুদ্ধি হবে! যাক যা হবার হয়েছে, যখন আনা হয় নি, তখন আর উপায় কি? এখন মূল্য ধরেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে, পরে টাকাটা দিয়ে দিও। দশ টাকা কি বলছ? রেশমী কাপড় কখন কেন নি বুঝি? হাত দিয়ে জল গলবার উপায় নেই। তোমরা কিনবে রেশমী কাপড়! কি আর বলবো! আজ কালকার বাজার দরতো জান না? পঁচিশ টাকার কমে হবার ঘো নেই। কি! সস্তায় কিনে দিতে পার? বেশ ত, সে ত তোমাদের লাভ। তাইই দিও। আমার তাতে ক্ষতি কি? হরি, নারায়ণ!

[ ইতি মধ্যে ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গুরুদেবের জন্য মাংস রান্না হইবে কি না? ]

গুরুদেব। না—না, এ বেলা আমার মাংস খাবার ঘো নেই। মা যে আজ আমার পাতে প্রসাদ পাবেন। আবার যে কবে এদিকে আসতে পারব তার ত ঠিক নেই! এ বেলা শুধু গুরুকুমারের জন্য রাঁধতে বলগে, আমি থাই তু ও বেলা খাব এখন। আর দেখ, আমার জন্য বয়ঃ ঐ খাশীটা রেখে দিও, বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাব, বুঝলে? তারপর কি বলছিলাম, হ্যাঁ, গুরুকুমারের 'বরণ' কই? না—না, শুধু প্রণামী বস্ত্র দিলে চলবে কেন?

‘বরণ’ কই ? বিদ্যায়ী ধরেই বা হবে কি ক’রে ? কি যে বলছ তার ঠিক কেই ? সে ত সকল বামুনেই পাবে । গুরুমার তো আর তাদের সমান হ’তে পারেন না ? এতে এত ভাববার কি হ’ল শরৎবাবু ? কাজের যা’ যা’ অঙ্গীশ, তা’ না দিলে চলে কেন ? কি বলেন ভট্টাচার্য্য ম’শায় ? আনা না হ’য়ে থাকে, আনিয়ে দিও, তার আর কি ? হরি, দীনবন্ধু !

[ এই খন্ড উপলক্ষে গুরুদেবকে যে সব দ্রব্যাদি দান করা হইয়াছে, সে অনুসর্য দর্শনাশ্ত্রে ]

গুরুদেব । এঃ, এ কি করেছ ? এ কি নশারি দিয়েছ ? কেন, নেটের দিতে পারনি ? সূজনি কই ? তোয়ালে চাদর দিয়েছ বলে কি আর সূজনি দিতে নেই ? বাবিশের তোয়ালে কই ? ঝালর দেওয়া গুয়াড়ে ত আর তোয়ালের কাজ চলবে না ? গনি তোবক ত দিয়েছ দেখছি ! কিন্তু সতরঞ্চ কই ? এত টাকা খরচ করে অগ্নের জন্যে আর কেন একটা গুঁই রেখে দিয়েছ, বস দেখি ? আরে দেখোতি তোমার কপাল ! কিন্তু কখন তো আর সতরঞ্চ নয় ! ও কি, মিড়ি ? হ’লই বা কাঠাল কাঠের ! হা—হা—হা, তোমরা বড় হাসালে দেখছি । হাল ফাসনে কি আর কেউ মিড়ি দেয় তে ? কর্পেটের আসন দিতে পার নি ? কনসা তিনটে যে বড় ছোট ! ওতে আর ক’সের কল ধরবে ? বাটীয়াস ত কতগুলো দিয়েছ দেখছি ? কিন্তু এমন বেটক কেন ? দেখতে ত ভাল নয় ! পরশাত যখন খরচ করলে তখন খাপড়া থেকে আনায়েই পারি । লোকেও বলত, হ্যাঁ, জিনিষের মত জিনিষ বটে ? থানা ক’খানা এত হাসা কেন হে ? এ কি শ্রাদ্ধবাড়ী যে নমোনো করে কাজ সাধবে ? নাঃ, এতটা ভাল হয় নি ; সব দিকে এত সংক্ষিপ্ত করলে চলবে কেন ? চটাইতো ? সে কি ? বলি গোসাইগোবিন্দ মাতৃধ বলে কি আমরা মোক্ষা-জুতা পরতে জান নে ? না, তাতে আনাদের ভাত যায় ? তোমরা আমাদের কি মনে কর বল দেখি ? ছাতার ডাঁটিটাও তো দেখতে ভাল নয় । কী যে তোমাদের পছন্দ, তা তোমরাই জানো । যাঃ ! এ কি ঘড়ি ? ও গুরুমারের সেই ঘড়ি বুঝি ? তা’ ওরকম ঘড়ি তো শুঁব আছেই । হাতে বাঁধবর একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন ! অনর্থক কতগুলো টাকা নষ্ট হল । তা’ এমন ওইই থাক, যখন পার সুখের মত আর একটা আনিয়ে দিও । বেশী বড় দরকার নেই । যত ছোট হয় তাই ভালো ।

### তৃতীয় অঙ্ক ।

—❦—

[ প্রভাতে চা পানিতে গুরুদেব বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ]

গুরুদেব । তা হ’লে আনাকে বিদায় কর না । আর বুঝা বিনয় করে লাভ কি ? ( পাকী বেহারাদের প্রতি ) ওরে নে—নে । তোরা শীঘ্রীর জলটন খেয়ে নে । কি বীত না ? আনাদেরও জলখাবার তৈরী । জাইশ, গুরুমারকে থাইয়ে দাওগে যাও । আমি ত এত সকালে কিছু খাইনা মা । না—না, সঙ্গে আঙ্গিক হ’লে কি হবে । আমি তো সকালে কিছু খাইনা মা ? ( প্রকৃত কথা বলিতে গেলে গত রাত্রিতে অতিরিক্ত ভোজনে ও সুরা পানে তাঁহার শরীর অস্থির ছিল না ) কি বিপদ ! তুমি আমার কথা বুঝ না কেন মা ? আচ্ছা তা হ’লে এক কাজ কর, খাবারগুলো আমার পাকীতে তুলে দাওগে যাও । দই ফাঁরের হাড়ি ছুটোও দিয়ে দাও । না—না, আবার কতক রেখে যাচ্ছ কেন ? হ’লই বা আলুর দম । ও সব দিয়ে দাওগে যাও । কেন, আপত্তি কিসের ? বেহারাদের জন্য ? আমরা যে ওদের হাতে চল খাইমা ! তা বইলে কি আর শুধু শুধু বলছি !

চাট্টে সরু চিঁড়ে দিলে হ'ত না ? তোমাদের দৌলতপুরের চিঁড়ে বড় ভাল। সেই, সেবার দিয়েছিলে, তোমার গুরুমা সেই চিঁড়ে পেয়ে কত সুখাত করলেন। দিচ্ছে ? তা দেবে বই কি ! মাকে আমার কিছু বলতে হয় না। মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনই বুদ্ধিমতী। কি বলছে ? খরচের কথা ভিজ্জেস করছে ! তা বলবে বই কি ? মার আমার সব দিকে লক্ষ্য থাকে ! মার গুণাই ত সংসার জলজল্ করছে। ইয়া, তা হ'লে এই যাওয়া আসার পাকীভাড়া ত্রিশটাকা, আর বেহারাদের খোরাকী ৬, ছয়টাকা—এই ছত্রিশ টাকা, থেয়া খাট আর মুটেমজুর টাকা দেড়েক এই সব শুদ্ধ সাড়ে সাত্বিশ টাকা,—ও চল্লিশটাকাই ধরো। তার পর পণে আমাদের ছজনারও জলটল খাওয়া আছে—আর তা ছাড়া পুরো খরচও টাকা ছাঁতন হবে। ও গড়পড়তায় পঞ্চাশ টাকাই দিতে বল মা।

[ গুরুমাতার ভনা একখানি শাড়ী, এক ঘোড়া শাঁখা ও সিন্দুর অনিয়া, বিন্দুবাসিনী গুরুদেবের নিকট অর্পণ করিলেন ]

গুরুদেব। এত শিষ্যসেবক আমার ! রাগী ভনীদারও ত কত আছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি মা, এমন গুরুভক্তি আমি আর কারো দেখি নি ! অশীর্বাদ করছি গুরুভক্তি তোমার অক্ষর হোক, পায়ের তোমার অচলা মতি থাক। তা এখন এসব না দিলেই পার্বে মা। মাসখানেক বাদেই ত শীতের 'বার্ষিকী' নিতে আসছি তখন দিলেই হ'ত ! তা যা সোক এখন এর সঙ্গে যে কিছু প্রণামী দক্ষিণা দিতে হয় মা ! এই যে তাও এনেছি দেখছি ! বেশ, বেশ ! (একটু পরে) এদিকে যে বেলা বাড়ছে মা ! আমার বিদায় প্রণামীটা দিতে বল।

[ এক ঘোড়া করিয়া বস্ত্র ও যথ ক্রমে দশটা ও আটটা টাকা দিয়া, বিন্দুবাসিনী

গুরুদেব ও গুরুকুমারকে প্রণাম করিলেন ]

গুরুদেব। (ক্লান্ত স্বরে শরৎ বাবুর প্রতি) কী ! দশ টাকা দিয়ে গুরুবিদায়—বামুন পণ্ডিতদের সমান !  
শ্রী : তোমরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ দেখছি !

[ গৃহভাস্তর হইতে কে বলিয়া উঠিল, বামুনপণ্ডিতের সমান হ'ল কি করে ? তাঁদের ত চারটাকা করে বিদায় দেওয়া হয়েছে ]

গুরুদেব। (সুরা দেবীর রূপায় এবং ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্জন করিয়া) চোপরাও ছুঁচো, আমার কথার উপর কথা ! গুরু মূল্য তোরা কি বুঝি পাজী— ! থাকত যদি বাদব, তো সে আমার মূল্য বুঝত ! এত আশ্পর্কী তোদের ! দাতার দানে তোরা বাধা দিতে আসিস ! মাকে ত আমার চিন্তে বাকী নেই। এসব তোদেরই জোচ্ছুরি ! এত পরের উপকর করা নয়, তার সর্বনাশ করা ! না বলকের সংহারটা তোরাই লুটে-মুটে খাবি দেখছি !

বিন্দুবাসিনীর এক বোনপো সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কলেজে শিক্ষিত—গুরুদেবের এই অন্যায় অত্যাচার ও অভদ্র ব্যবহার তাহার কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিলে, ক্লান্ত স্বরে সে যেন কি বলিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী অম্মন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “চুপ, চুপ ! ওসব কি কিছু বলতে আছে বাবা ! গুরুদেব ! সাধু্য নারায়ণ !” পরে তিনি উপযুক্ত প্রণামী দিয়া গুরুদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—আর বলিতে লাগিলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

শ্রীমতিশ্রী নাথ বসু।

## বর্ষা-বরণ ।

—\*—

( ১ )

ভুবন ভরি'            পড়িছে বরি'  
 বাদর-ধারা    অবিরল,  
 সজল বায়ে            বায় মিলায়ে  
 কেওকো-যুথী-পরিমল ;  
 নিখিলে আজি আন গো নব  
 ভরসা,  
 এস গো ভব-ভবনে, অয়ি  
 ভুবনময়ী বরষা !

( ২ )

জীবন মাঝে            নবীন সাজে  
 এসেছ আজি,—একি ছল ?  
 করকা-ভাতি            দিবস-রাতি,  
 বরিছে নিতি আঁখি-জল !  
 এ মরুভূমি কর গো কর  
 সরসা,  
 এস গো মেঘ-স্বপন বহি'  
 জীবনময়ী বরষা !

( ৩ )

মরণ-বঁধু            ডাকিছে, 'বধু,  
 এস গো এসো নীপ-তল,  
 আজি বাদলে            যমুনা-জলে  
 উঠিছে ঘন কল-কল !'  
 এস গো চির-মধুর খর-  
 পরশা,  
 ভুবনময়ী            জীবনময়ী  
 মরণময়ী বরষা !

শ্রীকৃষ্ণদাস বসু ।

## চিত্র ও চিত্ররসি।

—:~:—

একবার একটি শিশু ছানার দ্বারা বসে সজ্জাবেশায় আকাশে নানান রঙের মেঘের ভিতর বিভিন্ন ছবি দেখে এতদূর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে সে থাকতে-না পেরে কোথ থেকে একটা সেউ পেনসিল এনে আপন মনে সেই বিধাতার গড়া মেঘের ছবি নকল করতে লেগে গেল। সে বার বার মেঘের ছবি আঁতে চেষ্টা করচে কিন্তু প্রতিবারেই পারেনা—পুঁছে ফেলচে—আবার নতুন করে আঁকচে। কিছুতেই সেটাই করা যিগীট। যে নেউলের পিছনে ভাড়া করেছে, একে উঠতে পারলে না। ছবিটাও দেখতে দেখতে আকাশে মিলিয়ে গেল। এমন সময় তার মা পাঁচ বংগরের শিশুটির কাণ্ড দেখে ভিজ্ঞান্য করতেই বাসক গ্রেট্ট মাটিতে রেখে বিষমভাবে বলে “আকাশে যে সাং ছবি দে-চি—মা, আমি তো কৈ এমন আঁকতে পারচি না?”

এই কথাটাই হচ্ছে এখন আমাদের আর্ট সম্বন্ধে ভাববার কথা। ভগবানের সৃষ্টির জন্ত নকল করবার স্পৃহা ছেলেটির মনে যেমন এসেছিল আমাদেরও মনে হাতীর সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শিল্পকণ্য প্রকাশ করতে তেমনি আকৃষ্ট-বিকুলি হওয়া অশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই যে ভগবানের শেনেটের মত করে ছবি আঁকার অক্ষমতা সেটা শুধু বালকের নয় প্রত্যেক শিল্পীরই সেই অক্ষমতা। ভগবানের সৃষ্টি গুরুত্ব নকল চিত্র কৃতিত্বের সব শিল্পী হার যেনেচেন। তবে শিশুটির রাজা মেঘের রাজা ছবি দেখে যে আনন্দ, শিল্পীর বিধাতার সৃষ্টি সৌন্দর্য্য দেখেও সেই আনন্দ। কিন্তু শিশুর মত বিধাতার সৃষ্টির গুরুত্ব নকল করবার চেষ্টা যেন না করা।

শিশুর কাছে আমাদের এখানে শেখবার আছে তার অতীতক আনন্দ। সে যে আপন মনে বিস্ময়চনা দেখে আপন খেয়াল-খুসী রচনায় মেতে গিয়েছিল, লাভান্যভের কোন ধরই ধারে না। একবার জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে সাংবেদ্য লণ্ডন ইনস্টিটিউটে একটি চুম্বক দ্বারা কেমন করে বিজ্ঞাত জ্ঞান্য যায় দেখাচ্ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন খ্রীগোক পরীক্ষার ব্যাপ-রটা বুঝতে না পেরে ভিজ্ঞান্য করেছিল “ফ্যারাডে মহাশয় আপনি যেটা দেখালেন সেটা প্রমাণ হ’ল কিন্তু তাতে কি কাজে আসবে?” তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন “মহাশয় আপনি কি বলতে পারেন সদ্যোজাত শিশুটি কি উপক রে আসতে পারে?”

আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত শিল্পী রোঁদা বলেছিলেন “The word ‘artist’ in its widest acceptation means the man who takes pleasure in his work.” আমরা কাবির পুন্ডরীক ত্রিভুজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে তিনি অল্প বয়সে কবিতা রচনা করে শুধু একবারি ডাঙপেয়েই সমস্ত দিন জগত হয়ে কবিতা র-পর-কবিতা রচনা করে গেছেন—তার এই রচনা কার্যের আনন্দ তাঁহার আহাৰ বিহার ভুলিয়ে দিতো। রচনায় আনন্দ যদি না পোতেন শুধু কোন ব্যক্তির দ্বারা আদর্শ হয়ে যদি কবিতা লিখতে বসতেন, তাহলে কি তাঁর মত প্রতিভার পরিচয় জগত আজ পেতে পারতো?

প্রত্যেক দেশের এক একটি জাতীয় ভাব এক এক দেশের শিল্পের ভিতর প্রকাশ পাবে—সেটা না হ’লে তার বিশেষ লোপ পায়। জাপানের ছবি এবং চীনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির যেমন এটা জাতীয় রীতি-পদ্ধতিতে আঁকা এবং তাদের দেশের শিল্প বুঝতে হলে একটা বিশেষ শিক্ষা ও সহানুভূতির প্রয়োজন, আমাদের দেশে যেখানে খুঃ পুঃ ১ম থেকে ১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিত্রশিল্প পাশ্চাত্যের গুহার গায়ে যোগল দরবারে চলে এসেছিল

সেখামকার শিল্পকলাতেও একটা বিশেষত্ব নেই, একথা বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না। চীম জাশান প্রভৃতির মত আমাদের চিত্র-শিল্পেও রেখা ও বর্ণসমাবেশ প্রধানভাবে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা প্রকৃতির ছবির ভাষার উদ্দেশ্যে Perspective, Anatomy, Shade and light, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায় সকল উদ্ভাবন করেছেন।

ছবির প্রধান কাজ হচ্ছে চিত্ররঞ্জন করা এবং সজ্জা। এই কাজে আমাদের দেশী শিল্প ইউরোপীয় শিল্প অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো হয় নি। বরং আমাদের দেশী ছবিতে চিত্ররঞ্জক সজ্জাই (decorative treatment) বেশী থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য্য-সজ্জা আছে, সেটা প্রকৃতির বুকেই ভালরূপে প্রকাশ পায়, তাকে আলাদা করে ছিন্ন করে দেখতে গেলেই, তাকে মানুষের পোষাকী করে তুলতে গেলেই পক্ষ করা হয়। তাই তখন তাকে মানুষের মনের দরবারে পেশ করতে হলেই তাতে একটু বেশী রঙ (colour) বেশী চও (pose) দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির বুকের সাহায্যে ভাবটা একটু হৈয়ালিতে পরিণত করতে পারলে মানুষের তখন স্তম্ভ থাকে না। তাই প্রকৃতির ছবির Photo Colour-photograph হলেও তাতে আঁকা দূরের পাহাড়ের বেগুনী বড় মাননে পুস্ক রঙের কুয়াসা, ঝাপসা ঝাপসা দূশা চিত্রখানিই আমাদের দেশী মনকে আকৃষ্ট করে। Photoটি সেখানে তুলে হলেও তাতে আঁকা ছবিটির অতিরঞ্জন ভাবটিই মোটের উপর আমাদের লাগে ভাল। এ বিষয় দেশী বিলাতি নেই, সব ছবি সম্বন্ধে একথা খাটে। আমাদের শিল্পীরা মানুষের মনের এই খবরটি বরাবরই জানতেন বলে আমাদের মনে হয়। তাই অজস্র, বাব প্রভৃতি পর্বত গারের চিত্রগুলিতে এত বেশী রঙ (colour) চও (pose) ছড়াছড়ি, আর মোগল দরবারের ছবির কাদীকুরী যেন মীনের মিশ্রী সূক্ষ্মকাজ চোখে সামনে ধরে চুল চিরে দেখে দিতে হয়। মোগল বা অজস্রের শিল্পীদের চিত্র ভাল করে দেখলে বোঝা যায় তারা ইচ্ছা করলে অন্যায়সে প্রকৃতির দৃশ্যের কাছ-ঘেঁসা ছবি ভালরূপেই আঁকতে পারতেন কিন্তু তবুও যেন সব ছবিতেই ইচ্ছাকৃত একটা অতিরঞ্জন, রেখার, বর্ণে সবেসই ভিতর বিরাম করচে। ইউরোপীয় শিল্পীরা যে যতই স্বভাবের ছবির নকল করতে বরপরিচর হয়ে বসতেন না কেন শেষে দেখা যায় কোথা থেকে তাঁর অতিরঞ্জন স্পষ্ট ছবিখানিকে প্রকৃতির রঙগুলি অপেক্ষা বেশী রঙিয়ে দেয়। আর আমাদের দেশী শিল্পীরা প্রকৃতির মধ্যে কোণার অতিরঞ্জন (decorative) ভাবটি আছে সেইটী ভালরূপে জেনে তবে মনের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে চিত্র রচনা করেন। প্রকৃতিতে আছে ফুল ফল বর্ণবন্ধের অপর্যাপ্ত বিকাশ! কিন্তু যতক্ষণ না কবি বা চিত্রকর সেটিকে তার মানস-কল্পনার ভাষায় তুলে দর্শনের জন্যে ডালি সাজিয়ে তুলছেন ততক্ষণ সে সবই ব্যর্থ, সবই লোকের মনের বাইরেই প্রকাশ পেয়ে লোপে পাবে। তাই কবি গেয়েছেন :—

“ফুলে যে রঙ ফুলের মত লাগল

আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল”

শিল্পীর এইখানেই মহত্ব। সকলেই চাঁদের আলো দেখে, ফুল দেখে, সঙ্গীত শোনে কিন্তু শিল্পী যতক্ষণ না সেই সব জিনিষের রস তাঁর রচনায় মানুষের সামনে ধরে দিচ্ছেন ততক্ষণ আর—

“এমন চাঁদের আলো

শরি যদি সেও ভাঙে

সে মরণ স্বরগ সমান”



এ কথা কেহ বলতে পারেন না। Oscar Wilde এবিষয় বলেছেন :—

“To look at a thing is very different from seeing a thing. One does not see anything until one sees its beauty, then, and then only, does it come into existence. At present, people see fogs, not because poets and painters have taught them the mysterious loveliness of such effect. There may have been for centuries in London I dare say there were but no one saw them and so we do not know anything about them. They did not exist until art had invented them.” সাধারণ লোকে চিত্রকলা বাস্তবপ্রধান হলেই সন্দেহ হয় কিন্তু শিল্পীর রচনা স্বার্থক হয় যখন তার আর্ট প্রকৃতির বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে উঠে মানুষের মনে একটা অলৌকিক ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। শিল্প অনেক সময় শিল্পীরও দূরবিগম্য হয়ে পড়ে শিল্পীর শিল্প রচনা অনেক সময় তাঁর অবর্তমানে কয়েক শতাব্দির পর উপযুক্ত রূপে ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়। এমার্সন গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে একস্থলে যা বলেছেন, শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই ঝাটে : “One man shall not be able to bury his meaning so deep in a book, but time and like-minded men shall discover it.” Schiller বলেন “An artist may be known rather by what he omits.”

এখন আমাদের দেশে আর এক গুরুতর সমস্যা এই যে এখন অনেকেই আর্টের উপকারিতা কি তা জানতে চান। এ বিষয় একবার কোন ট্রেনের সহযাত্রী একজন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলুম যে তিনি নাকি রবিবাবুর স্বরেবাইরে গল্পটির সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাতে ঐ গল্পটির উপকারিতা সম্বন্ধে নবিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে একদা রবিবাবুর সাক্ষাৎ হওয়ায় এক পণ্ডিত মহাশয় তাঁর সমালোচনার প্রশংসা উত্থাপন করার রবিবাবু ‘হাস্য করে’ বলেছিলেন :—“এইবার থেকে স্থির করেচি উপকারী কবিতা রচনা করবো—কুইনাইনের উপর কবিতা লিখবো—বলবো “হে কুইনাইন! তুমি তিন বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রকোপিত বাঙলায় তোমার মত সুন্দর আর কে আছে ইত্যাদি।” রবিবাবু বুঝেছেন আমাদের দেশে পণ্ডিতরা আর্ট চায় না, চায় উপকারিতা। অতএব বাঙলার চিত্র-শিল্পীদের ও ম্যানেজিং মিউজারের কাইলের ছবি আঁকা ছাড়া গতান্বয় কোথা!

ছবির কাজ মনের স্নান রসাহুত্বটিটুকু জাগিয়ে দেওয়া। এই উপকার খুব ক্ষুদ্র দেখতে হলেও আধ্যাত্মিক জগতে এর মূল্য বড় কম নয়। সঙ্গীত, কাব্য, কলা মানুষকে যে রস যোগায় তা কোন বাহ্যজগতের সাধ্য নাই মানুষকে কেহ দিতে পারে। এগুলি মনের ভিতর থেকে প্রকাশিত হয়ে মনেরই ধোরাক যোগায়।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

## জুলেখার রূপ ।

—:~:—

( জামী )

বয়ান তাহার ইরাম বাগের মত  
 নানা বরণের গোলাপের যথা বিভা  
 ভোমরার মত যেন মধুপানে রত  
 কালো তিলগুলি তাহাতে শোভিছে কিবা ।  
 রক্তের কুপ চিবুকের টোল তার  
 জীবনের রস সঞ্চিত যাহে রয়,  
 লভিয়া কেবল শীকর গন্ধভার  
 ঋষিরো নয়ন স্নিগ্ধ পাবন হয় ।  
 নিকটে আসিলে ঐরাবতের প্রায়  
 ঘূর্ণীর পাকে কোথায় ভাসিয়া যায় ।  
 দ্বিরদের রদে রচিত কণ্ঠখানি  
 নয়নের তার বিশ্বে মাহিক তুলা  
 হরিণ শিশুরা অর্ঘ্য বহিয়া আনি  
 বার বার চুমে অর চরণের ধূলা  
 এক বার চেয়ে কাস্তি নেহারি তার  
 গোলাপ বালারা মাথা হেঁট করি কুরে  
 বুল-বুল করি গুলবাগ্ পরিহার  
 তাহার কেশের আরতি করিয়া ঘুরে  
 নিখিল নিকষ মেনে চির পরাজয়  
 পরষ করিতে আপনিই পূত হয় ।  
 উরসিজ-শুগ সরসিজ, নীর-ধূত  
 মনসিজ তায় পূজিছে কৃতিবাসে  
 কাকুরের রস বিশ্ব হইতে পূত  
 আলোক গোলক হৃদি নভে যেন ভাসে ।

অথবা যেন তা শোভিছে কুঞ্জছায়

একটি বৃন্তে দুইটি আনার ফল

চক্ষুতে কভু পরশ করিবে গায়

বাসনা-শুকের নাহি হেন বৃকে বল ।

ভক্ত সাধুর হৃদয় মুকুতা রাজি

মণি-শ্রেণিতে সদা তার উঠে বাজি ।

শ্রীকালিদাস যায় ।

## মেঘের দিনে ।

—ঃ—ঃ—ঃ—

অন্তগামী তপনের লান কিরণ বখনই সঞ্চিত মেঘের উপর বিখাদের তুলিটা দুলাইয়া দেয় তখনই অতীত যৌবনের  
একটি দিনের করুণ স্মৃতি বহুমানকে ভূলাইয়া দিয়া স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় ।

• • • • •

বহু দিনের কথা । এম্-এ পাশ করিয়া চাকরীর উন্নয়নী করিতেছি । পরীক্ষাগুলি উত্তরোত্তর সম্মানের  
সহিত পাশ করিবার সময় নিত্য নূতন বণ্ ফলাইয়া কল্পনাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়যুগ্মে পরিণত করিয়াছিলাম । আর  
আমারই সৃষ্ট ইন্দ্রজালের অন্তরালে অপূর্ণ সৌন্দর্য নির্মাণ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেছিলাম । সহ-  
পাঠীদের অবিরত প্রশংসাবাক্য শুনিয়া শুনিয়া আর পরীক্ষা-বারিষির ছোট বড় তরঙ্গ হেলায় অতিক্রম  
করিয়া একটা উত্তেজনায় পড়িয়াছিলাম—নিজের গুজন ভাল বুঝিতে পারি নাই ; তাই মোহময়  
অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম । কিন্তু এ মোহ, এ স্বপ্ন টুটয়া গেল, যখন আমি তখন পরীক্ষা-বারিষির অপর  
পারে । ~~কিন্তু~~ আরে থাকিয়া যে ইন্দ্র বসু দেখিয়াছিলাম, অপর পারে দৃষ্টি-বিন্দু কটিয়া যাত্রাঘাতে দেখিলান বনকম্ব  
শৈব—তড়িৎগর্ভ, বজ্রপাত হস্তে বোধ দেবী নাই ! সমস্ত পাশ করা শেষ হইয়া যাওয়ায় অকস্মাৎ যেন কস্মৎ  
ছিন্ন হইয়া গেল—সংসারের—আবজ্ঞনায় হৃৎকট ধাইয়া পড়িয়া গেলাম । মনন হঠাৎ পুরাণ অঙ্গন যেন কাটিয়া  
গেল । কখন যে ছাত্রজীবনের কাব্য শেষ হইয়া গিয়াছে জানি না । একদিন সবিশেষে আবিষ্কার করিলাম যে  
কোনও একটা মেসের প্রকোষ্ঠে বসিয়া সারাদিন ধারিয়া নানাবিধ ইংরাজী খবর-কাগজের কন্ডখালির বিজ্ঞাপন  
মহন করিয়া চলাচল ভ্রমণাচ্ছি, আর তাহাই পান করিয়া হৃৎকট হইয়াছি !

আবেদন পত্র লিখিতে লিখিতে ও প্রশংসা পত্র -কল করিতে করিতে হাতে বাখা ধরিব, আঙ্গুলে কড়া পড়িল ;  
কিন্তু দেখিলাম সব চিঠিপত্রেরই একতরফা লেখা হইতেছে, ভূমিচাও কেন তাহার উত্তর দেয় না । কয়েক স্থানে  
অয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হইয়াছিল । সে কি ভীষণ প্রতীক্ষা ! দেখা করিবার পূর্বে কত আশা, কত  
উৎসেগে হৃদয় আন্দোলিত হইত, তাহা বলিতে পারি না । স্কুলের কত মাষ্টারি খালি হইল, পূর্ণ হইল ; আবার  
খালি হইল, পূর্ণ হইল, কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না । সকলেই অভিজ্ঞতা চায় ; হায় ! বিশ্ববিদ্যালয়ে

যদি একটি অভিজ্ঞতার পরীক্ষা থাকিত তাহা হইলে বোধহয় তাহা পাশ করিয়া অভিজ্ঞতার একটি ডিগ্রী লইতে পারিতাম! এই সময় আমার তুই একজন বন্ধু উপদেশ দিল যেন আমি ছেলে পড়ানর অসুসন্ধান করিতে বিরত না হই। তাহার পরদিনই প্রাতে উঠিয়াই এ স্কুল, সে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে, রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফ অথবা ট্রামকারের তারের স্তম্ভে “Wanted”এর সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। কোনখানে হাতে লেখা Wanted দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া গিয়া পড়িতাম। চাকুরীটা হইতে পারে এই আশায় আনন্দ অহুত্ব করিতাম, কিন্তু হায় তাহা ফণিক! যে অংশে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানাটা ছিল তাহা লুপ্ত, কোথায় আবেদন করিতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই! কতবার যে ভগ্নমনোরথ হইয়াছি তাহা আর বলিয়া কি হইবে? একবার একটি চাকরি পাইয়াও ভাগ্যদোষে তাহা পাইলাম না।

একদিন একটি গৃহশিক্ষকের পদের নিমিত্ত স্বয়ং দেখা করিতে গিয়া লাঞ্চিত হইলাম। প্রাতে দশটার সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিয়োগকর্তার অসুসন্ধান করিতেই বাড়ীর চাকর বাহির হইয়া বলিল—“বাবু, আপুনি কি মাষ্টারির জন্য এসেছেন?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি ক’বে জানেন বাবু?” সে হাসিয়া উত্তর করিল—“আজ সকাল থেকেই তো দাবু মেস্টারির জন্য আসছে—তাই আমি মনে করলাম—আপুনিও বুঝি সেই জন্য এসেছেন—কিন্তু বাবু বাড়ীর ভিতর গেছেন—এখন তে’ দেখা হবে না।” এই বাপারে আমি বড় ব্যথা অনুভব করিলাম—আজ নয় দশমান তটতে অবিরত চেষ্টা করিতেছি—হায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, উপযুক্ত সুপারিশের অভাবে তুমি কি একমুঠে অরেক্ষ সহ্য করিতে পার না?

মেনে ফিরিয়া আসিয়া বিজ্ঞানায় শুটয়া নিজ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় নীচে ঠং করিয়া শব্দ হইল। বুঝিলাম ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া গেল। হন্টলি পানারের বিস্কুটের বাক্সকে পত্রাধার করা হইয়াছিল। দেখিলাম সেই অভিনব পত্রাধারে আমার নামে একখানি চিঠি রহিয়াছে। খুলিয়া পড়িলাম—

তিনধারিয়া

১৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রিয় প্রবীণ,

কোন চাকরী মিলিল কি? কয়েক দিন তোমার চিঠি না পাইয়া ভাবিতেছিলাম রেখুন কিম্বা পূজার চলিয়া গিয়াছে—তাই পত্র পাইতে দেরী হইতেছে! যদি কোথাও না গিয়া থাক, একবার এখানে আসিলে ভাল হয়—আমার এখানে বড় একা একা বোধ হইতেছে। বোগীর নাড়ী টিপিয়া টিপিয়া তিত্ত বিরক্ত হইয়াছি। তোমার চাকরী অসুসন্ধানের বিষয় হইবে না—এখানেও তুই তিনখানা ইংরেজী কাগজ আসে। তোমার দরপাশ করার কোন অসুবিধা হইবে না। একবার আসিয়া হিন্দুদের দৃশ্যটা দেখিয়া যাও। কবে আসিতেছ লিখিবে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ইতি—

তোমার

ধীরেন।

ধীরেন আমার সহপাঠী ছিল। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাশ করিয়া তিনধারিয়ার রেলওয়ে হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার হইয়াছে। কলিকাতা আর ভাল লাগিতেছিল না। সাত আটদিন পরে তিনধারিয়া আসিলাম।

বর্ষকোলাহল মুখরিত কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর চং-চং—চং-আ-চং ঘণ্টার শব্দ, ছাচকাড়া গাড়ীর অবিরত ঘড় ঘড়ানি, আমার ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল। এই শাস্ত্র স্থানটীতে আসিয়া সেই সব উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বেশ একটুকু আরাম অনুভব করিলাম। রোজ রোজ সকালে উঠিয়া দরখাস্ত করার পাঠ ঘুচিল—এমন বেজার একঘেরেই হইতে অব্যাহত পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচিলাম। এই প্রথম পাহাডে আসিয়া যেন একটা নূতন আনন্দের আনন্দ পাইলাম। ধীরে ধীরে সহিত সকালে বিকালে খুব এক চোট বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার যখন কাজের ভিড় থাকিত তখন একাই বাহির হইয়া পড়িতাম। প্রথম প্রথম কাট রোড ধরিয়া বেড়াইতে শুরু করিলাম। পরে পাহাড়িয়ারদের দেখাদেখি উঁচু জায়গা হইতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া আসিতাম। প্রথম প্রথম মাথা বড় কিম্ব-কিম্ব করিত, পরে অভ্যাস হইয়া গেলে উক্ত উপায়ে উঠানামা সোজা হইল। একেলা এই রকম চড়াই-উৎরাই করিয়া ধীরে ধীরে বাসা হইতে অনেক দূর গিয়া বেড়াইতাম। সেখানে একটা বসিবার জায়গা ছিল। তথায় বসিয়া বসিয়া গাড়ীর গভীরতা দেখিতাম। উদ্ভগানী চলন্ত এঞ্জিনের সামনে একারের উপর নুঁকিয়া পাহাড়ী খালসীদ্বয় যখন রেল লাইনের উপর বালি ছড়াইয়া চলিত তখন সাহসের জন্য মনে মনে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারিতাম না। রিভার্সের সাহায্যে অনেকখানি রাস্তা সংক্ষেপ করিয়া যখন গাড়ীখানি ঠাণ্ডা খুব উজ্জ উঠিত তখন আমার বিষয় বিগুণিত হইত।

এই স্থানটী আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এক দিন এইখানে রেজিমেণ্ট হইতে অবসর-প্রাপ্ত একজন বৃদ্ধ পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তাহার হাতে একটা ক্রারিওনেট ছিল। রেজিমেণ্টে থাকি কালীন যে গল্পগুলি শিখিয়াছিল, তাহা একে একে বাজাইত—আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিলাম। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাও একটা প্রাণপন্থী করণ পাহাড়িয়া গীতে বৃদ্ধ আমাকে মগ্নিত করিয়াছিল। তাহার বাঁশী শুনতে শুনিতে আমি তন্ময় হইয়া পড়িতাম—সমস্ত সংসার ভুলিয়া যাইতাম—আর মনে হইত যেন কোন সূদূর মাঝার দেশে চলিয়া গিয়াছি। কি যেন অজানা ভূমিতে সন্ময় ভরিয়া উঠিত। তাই প্রায়ই এইস্থানটীতে আসিতাম।

একদিন এখানে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলাম একজন ভদ্রলোক আর স্ত্রীপাত্রী একটা মহিলা আমার আসনটী দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাহাদিগের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া আর একটু দূরে বেড়াইতে গেলাম। অল্প দূরে করিয়াছিল—পশ্চিমে গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতে ছিলেন। পাহাড়িয়া মেঘকে বিশ্বাস নাই—অতীত তখন যে যখন হইয়া গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। বৃষ্টি পাতের ভয়ে তাই তাহাদের চিত্ত ফিকিত হইল। বসিবার জায়গাটীর নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম তাহারা ও উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মহিলা বড় ক্লান্ত, মুগ্ধমুগ্ধ বিবর্ণ, যেন অনেকদিন রোগে ভুগিয়াছেন। তাহাদিগের নিকট দিয়া বাতীতেই ভদ্রলোকটী ডাকিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তা জানিলাম যে অল্প দূরেই একটা বাগানে তিন চারি দিন হইল তাহারা আসিয়াছেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে কসাঁং কিংবা লাক্ষ্মিনগর যাইবেন। অল্প সময়ের ভিতরই আমাদের প্রথম সন্মিলন কাটিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। আমাদের পিছনে তাহার স্ত্রী আসিতে লাগিলেন।

কিন্তু আসিয়া পাহাড়িয়ারদের একটা বাড়ীর কাছাকাছি হইয়াছি এমন সময় মেঘ হইতে বড় বড় বিন্দু পড়িতে লাগিল। আমরা যতদূর সম্ভব গতি ক্রম করিলাম। সহসা আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া বিজয়ী চমকিয়া উঠিল—চোখে অন্ধকার দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া বজ্রধ্বনি হইল।

চীৎকার করিয়া মহিলাটী শুন্যে কি যেন ধরিতে যাইতেছেন এইরূপ বাস্তব প্রসারণ করিয়া সেইখানে পড়িয়া গিয়া মুচ্ছিত হইলেন। তাঁহার স্বামী ভয়চকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—“এ মুচ্ছা! অন্নকণের মধ্যে ভাজিবে না, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন ধরাধরি করিয়া লইয়া যাউ।” আমি বলিলাম—“এই বৃষ্টিতে এই অবস্থায় আপনাদের বাসা পর্য্যন্ত যাওয়া সুবিধা হইবে না। চলুন ওই পাহাড়ীদের বাড়ীতে গুকে লইয়া যাই। এইখান দিয়া যাতায়াতে উহাদের সঙ্গে আমার একটু আধটু জানাওনা হইয়াছে। পরে উহাদের সাহায্যে ডুলি করিয়া আপনাদের বাসা পর্য্যন্ত অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইবে।”

কোনও রকমে মহিলাটীকে পাহাড়ীদের ঘর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের আকস্মিক বিপদে সরল পাহাড়িয়া রমণীদের হৃদয় করুণাসিক্ত হইয়া উঠিল। রোগিণীর এইরূপ অবস্থার কারণ পুণঃ পুণঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের ঔৎসুক্যের পরিচয় দিল। কেহ কেহ রোগিণীকে মুচ্ছবস্থায় হাত পা ইত্যন্তঃ সঞ্চালিত করিতে দেখিয়া বলিল যে রোগিণী সম্ভাবিষ্ট হইয়াছে—একটু বাড় দাঁক করিলে “দেও” ছাড়িয়া যাইতে পারে। রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা কি ইহাদিগকে তাহা বুঝাইবার অনর্থক প্রয়াস না পাইয়া তাহাদিগের নিকট একটা ডুলি প্রার্থনা করিলাম। উহাদের মধ্যে কি একটা ছুঁপোখা কথাবার্তা হইল। ফণেকের মধ্যে দুইটা সবলকায় বালক ক্ষুদ্র একটা ডুলি লইয়া আসিল। বৃষ্টি ধারা ক্ষান্ত না হইতেই সেই ডুলিতে তাঁহাকে কোন প্রকারে স্থাপিত করিয়া তাহাদের বাংলাতে লইয়া আসিলাম।

আমাদিগকে এই অবস্থার আসিতে দেখিয়া বাংলাতে যিনি ছিলেন অক্ষুট আশ্বসিনি করিয়া তিনি ছুটয়া আসিলেন। পরে অতি সম্ভরণে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া ডুলটাকে বারান্দার উপরে উঠান হইল। বারান্দার এক পার্শ্বে অসামান্য রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন গৌরান্দী দশম বর্ষীয়া একটা বালিকা “মায়ের কিটু কখন হ’ল বাবা? মা কেমন আছে?” বলিয়া কুক্ৰিয়া কাদিয়া উঠিল। পূর্বে কোথাও যেন বালিকাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু—কিন্তু সে তো আর এখন এ জগতের নয়! তবে কি ছায়া দেখিলাম—না, বজ্র ধ্বনির পর আমার মস্তিষ্কের কিছু উলটু পালাটু হইয়া গেল? চশমার কাঁচের উপর সঞ্চিত চূর্ণ বৃষ্টি-বিন্দু সযত্নে মুছিয়া লইয়া পুনরায় যখন চাহিলাম, তখন ডুলি গৃহ মধ্যে অন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে। বালিকার কাপড়ের প্রস্ফুটন মাত্র দেখা গেল। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিলাম। মিনিট তিন চার পরে ডুলিবাহক বালকহুটি বাহির হইয়া গেল।

প্রায় অন্ধবন্টা পরে সেই ভদ্রলোকটী বাহরে আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর মুচ্ছ ভঙ্গ হইয়াছে। এমন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, আশংক্যে তাঁহার সমস্তরূপ সংজ্ঞা তানাইয়াছেন। এই সময় বিতীর্ণ ভদ্রলোকটী বালিকার সহিত প্রবেশ করিতেই তিনি introduce করিয়া দিয়া বলিলেন—“ইনি আমার ভাই” আর আমাকে দেখাইয় বলিলেন—“ইনি সুশীল বাবু।”

আমার পক্ষে এই পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কারণ ৪৫ মাস আগে গৃহ শিক্ষার কর্ষের অঙ্ক-সঙ্কানে তাঁহার সঙ্গেই একদিন দেখা হইয়াছিল—তবে উনি আমাকে চিনিতে পারিলেন কিনা সন্দেহ। বালিকাকে ভাল করিয়া দেখিয়া আমার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। আমি ইহারই শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু প্রথম দিন পড়াইতে অসমর্থ হইলাম যে তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে! অনেক করিয়াও এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম যে আমার ভুলও হইতে পারে। সেই জন্য নানাক্রমে অতুল প্রতিকূল যুক্তির দ্বারা সত্যকে চিত্ত বিকৃত হইলেও বশাস্তব হৈর্য্য অবলম্বনে আশ্রয় প্রকাশ পাউতে দিলাম না।

এমন সময় তিনি বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন—“দেখ তো মা লিলি, চা হোল কি না ?”

লিলি! আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি, নামের ও যে আশ্চর্য্য মিল!

লিলি বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল—পিছনে বেগ'এ চায়ের জিনিসগুলি লইয়া আসিল। লিলি তিনটা কাপে চা ঢাঙ্গিয়া দিল। তাহার পিতা আমাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন, চায়ে তো আপনার কোন আপত্তি নেই ?”

আমি বলিলাম—“অজ্ঞে, না।”

“কিন্তু আপনাকে চা দেবার পূর্বে এমটা কথা বলিতে চাই—, আমরা নেটিভ খ্রিষ্টান। আমাদের হাতে চা খেতে হয় তো আপনার সঙ্কেচ হতে পারে।”

বাস্তবিক এ বিষয়ে আমার কোনও ‘প্রেজুডিস্’ ছিল না। তাই তখনই বলিয়া উঠিলাম—“কিছু না, কিছু না আপনি কোন সঙ্কেচ করবেন না।” তাহার হাত হইতে কাপটা লইয়া চামচ দিয়া নীচের চিনিটা বেশ করিয়া নাড়িয়া লইলাম। তাহার পর মুখ ভিত্তেই অধরে বিশেষ উষ্ণতা অনুভব করিলেও সপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে চায়ের বাটীটা সশারের উপর রাখিয়া দিলাম।

চা পান করিতে করিতে লিলির পিতা বলিলেন—“আমরা সবাই আপনার নিকট বড় কৃতজ্ঞ। আপনি না থাকিলে আজ বড় বিপদই হ'তো।”

আমি মাথা ঈষৎ নত করিয়া সম্যগোচিত বিবরণ দেখাইলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন—“যখন আমরা বেড়াইতে বাহির হই এতদিন মেঘ করিয়া এমন কাণ্ডটী যে ঘটিব তাহা ভাবি নাই। তবু আমি ভয়ানক অনায়ে করিয়াছি। আজ বহু মাস থেকে আমরা স্বীর এই রথম ফিট হইতে আরম্ভ হইয়াছি। এই যে আমার মেয়েকে দেখিতেছেন একে ভগবানের দ্বিতীয় দান বলিয়া আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। খুব ডেলেবেকায় লিলির একবার ফিট হয় তখন প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল তারপর সে দিন বালিগঞ্জে—চার পাচ মাস আগে—সিড়ি হইতে ঠোং পড়িয়া গিয়া নান্যায় সাংঘাতিক চোট লাগিয়া মৃত্যু হইয়া পড়ে। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে brain concussion হইয়া Syncope হইয়াছে। অনেক রকম প্রক্রিয়া করিয়াও তিনি লিলির চেতনা সঞ্চার করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল—নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন পাইলাম না। সমস্ত দেহ নিশ্পন্দ হইল সজীবতার সকল লক্ষণই তিরোহিত হইল। ডাক্তার বাহির হইয়া গিয়া বলিলেন যে ‘মরেটী মারা গেছে’। গাড়ীতে উঠিবার আগে আমার ভাইকে Death-certificate লিখিয়া দিয়া গেলেন। লিলি যখন মারা গেল তখন অপরাহ্ন। পশ্চিমে বেশ মেঘ করিয়াছিল—আর নাকের মাঝে বিদ্যাহংসরণ হইতেছিল। ডাক্তার বাহির হইয়া যাওয়াতেই আমার স্ত্রী বুঝিলেন যে মেয়ের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্দগড় ভাবে ছুটিয়া আসিয়া সিলিকে কোলে করিয়াই মৃত্যু হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে তাহার মৃত্যু ভাঙ্গিল। তাহার পর হইতে কোন দিন বিকাল বেলা মেঘ করিয়া বিদ্যাহংসরণ হইলেই তাহার ফিট হইবার যৌক হয়—আর হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকে। আজও সেই আশঙ্কা করিয়া ভাড়াভাড়ি করিতেছিলাম।” এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময় লিলি মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া তাহার কাকার সহিত চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল।

পুলরায় তিনি বলিতে লাগিলেন—শোচনীয় মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। এই বাপারে আমার স্ত্রী এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে তাঁকে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তখনও আমাদের উপর একটা রুঢ় কর্তব্যের গুরুভার ছিল—মৃত্যুর অস্বৈষ্টি ক্রিয়া। কিন্তু গৃহে শবাধার লইয়া আসিতে পারিলাম না। শবাধারের আবরণ বন্ধ করিবার সময় যখন পেরেক ঠোকা হইবে, তখন সম্মানহারা মাথের বৃকে প্রত্যেকটা পেরেক কি শৈশবের মত গিয়া বিধবে না? হাতুড়ীর প্রত্যেকটা ঘা কি তাঁর শূন্য বৃকের পাক্সর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে না? না, না, হতভাগিনীকে আর নূতন যাতনা দিতে ইচ্ছা হইল না। ঠিক হইল যে অ্যাথুলান্স্ গাড়ী করিয়া মৃত্যুকে নিকটস্থ সমাধি ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে। আমার ভাই সন্ধ্যার কিছু আগেই গাড়ী লইয়া আসিল। সেখানে লইয়া যাইতে বেশ অন্ধকার হইবে। যখন কফিন আনা হইল তখন রাত চটা। কক্ষচারী বলিলেন যে এতরাত্রে কেকুন্কে পাওয়া যাইবে না সমাধি আগ্র আর হইতে পারে না। পার্শ্বের ঘরে কফিনে শবদেহ রাখিয়া আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখা হউক। পর দিন প্রাতে কফিন বন্ধ করিয়া শব সমাহিত করা হইবে। তাঁহার কথা মত এক ঘরে কফিন রাখিয়া আমি পার্শ্বের ঘরে শুইলাম, উভয় ঘরের মাঝখানে দরজা—এঘর ওঘর করা যায়! আমার ভাইকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

“এই আকস্মিক বিপদে আমার মায় বড় উদ্বেজিত হইয়াছিল—ঘুম আসিল না। থাকিয়া থাকিয়া মেঘের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। ছুই একবার উঠিয়া কফিনের কাছে গেলাম। শেষে ক্লান্ত হইয়া প্রায় ওটার সময় আমার তক্তা আসিল। সেই তক্তায় শ্রম দোষলান যেন লিগি অতি শীর্ণ পাণ্ডু মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া বলিতেছে—“বাবা, বাবা, আমি কোথায়?” দেখান গগনপ্রান্তাধলয়ী চঞ্জের স্নান রাশি খোলা জনালার ভিতর দিয়া ঘরের নেক্ষেয় আসিয়া পড়িয়ছে আর সেই স্নান আলোকে—দেখিলাম—আমার মেঘের শীর্ণ ছায়া মুক্তি! পাণ্ডু মুখখানির আধখানি শবাচ্ছাদনে ঢাকা। কালো চাদটা পিঠর উপর দিয়া গিয়া মেঘের উপর ষানকটা তরুণকর বিছাইয়া দিয়াছে। তখন আমি জ্ঞান হারাইয়া ছা। প্রেতমুষ্টি হইলেও মেয়েকে যে অপ্রত্যাশতভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি এই আনন্দেই উৎসাহ হইয় ছুটিয়া গিয়া লালিকে বৃকে ধরিলাম। দেখিলাম যে গা বেশ গরম, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ভগবান, ভগবান, অপার করুণা তোমার, দয়া করিয়া কি ছুখার ধনকে ফিরিয়া দিলে, দয়াময়? নতরাত্ত হইয়া লালিকে লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম।

এই সময় লালি একটু কাতরধ্বনি করিতেই ঘরের ধারে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। সে ঘুমাইয়া পড়িল। অবার বুঝি ফাকি দিয়া পলায়ন সে ভাব তাহাকে চোঁকি দিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ ঘরে ঘরে পূজাবাশ অরুণ রঙে রাঙা হইয়া আমার প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া গিল।—কক্ষচারী সেদিকে আসিতেই আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি মনে বহিলেন যে, বন্য়ার শোকে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি—অস্বস্ত প্রলাপ বকিতেছি। পরে ভিতরে আসিয়া নিদ্রিত র শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া আর গায়ের তাপ অনুভব করিয়া আশ্চর্য হইলেন। পরে এমটা ভাল গাড়ী ডাওয়াইয়া আনিয়া লালিকে তাহাতে সন্তর্পণে উঠাইয়া দিয়া আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিলেন। লালিকে দেখিয়া আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন—আনন্দের আতিশয্যে আবার তাঁহার ফিট হইল। ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া একটু লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তখনই আবার সপ্রতিভ হইয়া এই পুনর্জীবনপ্রাপ্তির চিকিৎসাশাস্ত্রমত অনেক উদাহরণ শুদ্ধ দিলেন। ঔষধপ্রয়োগে লালি অনেকটা সুস্থ হইয় উঠিল। ভগবানের এই অসীম অমুগ্রহের জন্য নত-জান্ন হইয়া আমরা উপাসনা করিলাম। এই হইল আমার বন্য়ার ইতিহাস। আমার স্ত্রীর আত্মা কিন্তু তখন



হইতেই হাসিয়া গিয়াছে—মেষের দিনে এই রকম ফিট হইব বর মত হয়। এই স্ত্রীর্যক মিনী বলিয়া বোধ হয়—  
আপনাকে বড় বিবর্ত করিলাম।”

আমি বলিয়া উঠিলাম—“না, না, আপনি সঙ্কট হবেন না, বরঞ্চ আমারই এমটা সন্দেহ ছিল—সেটা  
কাটির গেল?”

“কি রকম?”

“আমি আপনার কন্যা গণেশকে নিযুক্ত হইয়াছিলাম—আপনার ভাই বোম্বের আমাকে চিনিতেন পারেন  
নি। তিনিই আমাকে নিয়োগপত্র দেন।”

লিলি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“আমি তো আপনারই কথা কাকাকে বলিয়াছিলাম—আমিও আপনাকে  
চিনতে পেরেছি—কাকাও চিনতে পেরেছেন?”

আমি বলিলাম—“ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমার ছাত্রী প্রাণ ফিবে দিয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যার সময়  
আমার প্রথম পড়াতে আস্বাদ কথা সেদিন বাড়ীতে এসে এই শোচনীয় ঘটন। শুনেই মর্মান্বিত হয়ে আমি সেখান  
থেকে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলাম।”

লিলির পিতা বলিলেন—“সে চাবরী আপনাকেই আছে—অদৃশ্য যদি আপনি অনুগ্রহ করে সেটা নেন।  
আমরা কিছুদিন দাঙিলাড়ে কাটাব। আপনি যদি যেখানে যান আমাদের সঙ্গেই চলুন—সানিটেরিমে  
থাকবেন—থরচপত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই—অর আপদ না থাকে তো আমাদেরই সঙ্গে ছুটো দিন থাকতে  
পারেন। পরে কলিকাতা গিয়ে যেখানে চাকা স্থিতি হয়, থাকুন।”

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। পরে উভ্যদের নিকট বিদায় লইয়া সন্ধ্যার ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে ধীরেনের  
বাসায় ফিরিতেই একমুখ হাসি হাসিয়া ধীরেন পৃষ্ঠদেশে একপ্রকার চপেটাঘাত করিয়া বলিল—“Hullo, man,  
I congratulate you. Here is your appointment letter— এই দেখো বাবুরঘাট স্কলের সেক্রেটারীর  
জ্ঞাপনাদি পত্র—এই নাও পড়ে দেখ।”

ধীরেনকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া আমি বলিলাম—“ডটার আগাততঃ দরকাব নাই—আমার চাকরী মিলেছে,  
আমি পরন্তু দার্ক্জিডিঙ দাছি।”

প্রেক্ষপ্শন ও ঔষধের নামে ভরা ধীরেনের মতিষ্ক প্রবশই করিল না যে এই ভজ্জলে আমি কি করিয়া  
চাকরী কুড়াইয়া পাইলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

## প্রতিবাদ।

—\*—

( E. W. Wilcox )

“ He travels the fastest who travels alone.”

R. Kipling.

একলা যে জন পথ চলে গো উপর পানে নজর রাখি,  
ফুল্ল-মনে দিন কাটালেও রাত্রে দাঁড়ায় সিন্ত-আঁখি;  
অস্ত-তপন যায় যে নিয়ে প্রাণের সকল সাহস হরি'  
রাস্তা চলার শ্রাস্তি যখন একাই গো সব বহন করি।  
যতই কেন স্ফূর্তি করে' চালাও না পা,—ছুথের পাঁকে  
শেষকালেতে ডুববে সখা,—প্রেম যদি না পার্শ্বে থাকে।

\* \* \* \*

একলা সে জন পথ চলে গো বন্ধুবিহীন, প্রেমিক হারা,  
শুনো তাহার যাত্রা স্তব্ধ, শূন্যদেশেই যাত্রা সারা;  
হোক না তাহার লভ্য বিপুল, হোক না তাহার লক্ষ্য উঁচু,  
জ্ঞানে সে জন দেউলে এবং প্রাণে সে জন নেহাৎ নীচু।  
এই জীবনের অদ্বিতীয় দানটা কভু পায় নি যে সে  
ভ্রমণ-পথে প্রণয় হেসে দাঁড়ায় নি যার সামনে এসে!

\* \* \* \*

শব্দ কিছু নয়কো ধরায় এগিয়ে যেতে ছটকটানি,  
হৌচট্ খাওয়ার কথাও তবু দোষ কি ভাবায় একটুখানি!  
জীবন-গীতিকাব্যগুলি পড়তে হবে মত্তে অতি,  
আনন্দ কি মিলবে, মুচ, বাড়িয়ে দিলেই চলার গতি?  
ব্যর্থ তাহার চেপ্টা এবং অবজ্ঞায় স্পর্দ্ধাবর্ণি  
দোলায় নি প্রেম গলায় যাহার অশ্রুর্মণির মালাখানি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

## সাধুভাষা ।

—:~:—

সাধুভাষা বলিয়া যে কথাটী আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই তাহার অর্থটা যে ঠিক কি তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই । সাধারণতঃ ইহা চলিত ভাষার বিরুদ্ধবাক্যক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যে ভাষা নিম্ন-বন্ধিৎ সংস্কৃতমূলক সম্ভবতঃ তাহাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু এক্ষণে ভাষা এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; এমন কি বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন ও ভূতি সংস্কৃতগম্ভী লেখকগণের রচনাবলীতেও প্রচুর সংস্কৃতের শব্দের উদাহরণ পাওয়া যায় । পক্ষান্তরে, চলিত ভাষার প্রাদেশিকতাটুকু বাদ দিয়া তাহাকে এতটুকু মার্জিত করিয়া লইলেই আমরা প্রায় সাহিত্যের ভাষার কাছাকাছি আসিয়া উপস্থিত হই । এই ভাষাকে কেন সাধুভাষা আখ্যা দেওয়া হইবে না এবং যাহা একেবারে বাঙ্গলাই নয় তাহা ঐ মর্যাদা পাইবে কেন বুঝিতে পারি না । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশুদ্ধ সুন্দর ও ভাবপ্রকাশক ভাষা অর্থে ‘সাধুভাষা’ শব্দ ব্যবহার করিব । সুতরাং এই ব্যাপক অর্থ অনুসারে ‘সাধুভাষা’ বনাম চলিত ভাষা’ রূপ সমস্তা উঠিতেই পারে না । কারণ প্রাদেশিকতা বর্জন করিলে চলিত ভাষার সহিত সাধুভাষার কোন বিরোধ থাকে না, ইহাই আমরা মনে করি । মোট কথা, ইংরাজিতে যাহাকে good, elegant style বলে তাহাই আমরা সাধুভাষা নামে সংজ্ঞিত করিতেছি ।

এখন, এই সাধুভাষার কি কি গুণ থাকা দরকার এবং কোন্ কোন্ দোষ বর্জন করিতে হইবে তাহাই আমরা আলোচনা করিব । ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা । সুতরাং যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে মনোভাব প্রকাশ ক্রিতে পারা যায় সেইরূপ ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় । এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিতেছেন তাহা সকলেরই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য । তাহার মতে, ‘রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা । যে রচনা সকলে বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা । তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য ; সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে । প্রথমে দেখিব, ভূমি যাহা বলিতে চাও কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয় । যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও সুন্দর হয় তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে ? যদি সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে । যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই । নিম্নপ্রয়োজনতাই আপত্তি ।

এক কথায়, ভাষা ভাবের উপযোগিনী হওয়া চাই । ইংরাজিতে good style-এর আদর্শ হইতেছে তাহাই যাহাতে the proper word in the proper place- যদ্যপানে ঠিক শব্দটী ব্যবহৃত হয় । গুরু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় ভাষাও স্বভাবতঃই গুরু গম্ভীর হইয়া পড়ে ; আবার যেখানে গুরু যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে হইবে সেখানে ভাষাও অনাড়ম্বর হওয়া প্রয়োজন । শব্দচয়নে বিশেষ অবহিত না হইলে রচনা প্রোজ্ঞ ও সুমিষ্ট হয় না । সকল প্রকার শব্দই পাশাপাশি ব্যবহার করিতে পারা যায় ; তাহাকে ভাষার ‘সাধুতা’ নষ্ট হয় না । সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গলা শব্দ ত চলিতেই পারে, প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহারেও বাধা নাই ; তবে, নৈপুণ্য থাকা চাই এ কথা বলাই বাহুল্য । বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান পথ-

প্রদর্শক। তিনি ‘সিদ্ধ সৌরভযুক্ত সোণ’ ‘প্রাচীন গীত কোট করিয়া’ প্রভৃতি শব্দ বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যে সকল সংস্কৃতপন্থী বাঙ্গলার পদে পদে গুরুচণ্ডালী দোষ আবিষ্কার করেন তাঁহাদের মত এখন আর গৃহীত হইতে পারে না।

স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা রচনার দুইটা প্রধান গুণ। ভাষা স্বাভাবিক বা স্বচ্ছন্দ গতি না হইলে আড়ষ্ট ও নীরস হইয়া পড়ে। সে ভাষার অন্যান্য গুণ আজকালও তাহা পাঠে আনন্দ পাওয়া যায় না। আর আন্তরিকতার অভাবে ভাষা প্রাণহীন শব্দ সমষ্টিতে পরিণত হয়। হৃদয় হইতে যে কথা বাহির হয় তাহা পাঠক বা শ্রোতার প্রাণের তাহে গিয়া আঘাত করে, এবং অবিলম্বে অভীষ্ট সাধন করিয়া তাহা সার্থক হয়। কিন্তু ভাষাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে বলিয়া যে চলচ্ছন্দাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার প্রসাধনের অবশ্যকতা নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হইলে ভাষার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, এবং স্বাভাবিকতাও নষ্ট হয় না। শুধু দেখিতে হইবে যে, অনাবশ্যক বাগ্যঙ্কুরে ভাষা যেন ভারাক্রান্ত না হয়।

ভাল রচনার কি কি গুণ থাকা চাই তাহা মোটামুটি বলা হইল। এইবার দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। ব্যাকরণ দোষ। ভাষা যে ব্যাকরণ সম্বন্ধ না হইলে বিশুদ্ধ হয় না তাহা নূন কবিরা আর বলিত হইবে না। তবে বাঙ্গলার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে মতভেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এ বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি। এখানে এষ্টমাত্র বসিবেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের আইন কানুন না মানিলে ভাষা যে অশুদ্ধ হইয়া যাইবে একরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। কথিত ভাষা মাত্রই শুধু ব্যাকরণ দোষ মুক্ত হইলে চলিবে না, সেই সঙ্গে idiomatic বা রীতিবিশুদ্ধ হওয়া চাই। অনেক সংস্কৃতশব্দ বাঙ্গলার এমন সম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাহা সংস্কৃত অভিধানে নাই। এখন কেহ যদি বাঙ্গলার প্রচলিত অর্থ কণ্ঠস্থ করিয়া সংস্কৃত অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেরূপ বাঙ্গলা কেহ বুঝিবে না। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আড়ম্বর অর্থে ‘সমারোহ,’ ভ্রুংখ প্রকাশ অর্থে ‘আক্ষেপ,’ রোগের পরিচর্যা অর্থে ‘শুশ্রূষা,’ বিখ্যাত অর্থে ‘আশ্রয়,’ বাঙ্গলার প্রচলিত কিন্তু সংস্কৃত এ সকল শব্দের একরূপ অর্থ নাই। কিন্তু যদি কেহ সংস্কৃত অর্থ অনুসারে বলেন বালকটি বৃক্ষোপরি সমারোহ করিয়া হস্তপদাদি আক্ষেপ করিতে লাগিল তাহা হইলে কোন বাঙ্গালীর সাধা নাই যে একরূপ বাঙ্গলা বোঝে। আবার যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলার একেবারেই প্রচলিত নাই সেগুলিকে যদি জোর করিয়া ভাষায় টানিয়া আনা যায় তাহা হইলেও কল কতকটা এইরূপই হয়। ক কগুলি সম্পূর্ণ অপ্ৰচলিত ক্রমট সংস্কৃত শব্দ একত্র সংযোজিত করিলে তাহা যে কিরূপ একটা উৎকট হেঁয়ালীতে পরিণত হয় তাহার উদাহরণরূপ নিম্নলিখিত পরিচিত উদ্ভট শ্লোকটির উল্লেখ করিতে পারা যায়—ঈশাঙ্কের ঈশান্দুদে মারা গেল মার। নাকেতে নিষ্করগণ করে হাহাকার। পণ্ডিত মহাশয়গণ যখন বাঙ্গলার প্রতি রূপা কটাক্ষপাত করেন তখন তাঁহাদের ভাষা প্রায়ই কতকটা এইরূপ হইয়াই দাঁড়ায়। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিত ‘কালিদাস’ নামক পুস্তকের যে কোন পৃষ্ঠা খুলিলেই আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধ হইবে। ‘বিদূষক রাজার সন্নদ্ধ হইলেন’—এখানে ‘সন্নদ্ধ’ এই অপ্ৰচলিত শব্দ না লিখিয়া নিকটবর্তী লিখিলে কি কতি হইত? সূতের বিষয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিতরাজ যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় যে বাঙ্গলা লেখেন তাহা একেবারেই সংস্কৃতবহুল নহে, সকলেই সে ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

যে সকল ইংরাজি শব্দ বাঙ্গলার বিকৃত আকারে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে বিপুল ইংরাজি আকার দিতে গেলেই রীতিবিরুদ্ধ ( Unidiomatic ) হইয়া দাঁড়াইবে। ডাক্তার, হাসপাতাল, রসীদ, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি স্থলে যদি কোন ইংরাজিনবীস ডক্টর, হস্পিটাল, রিসিট, টেবল, বক্স লেখেন, তাহা হইলে সে ভাষা আদৃত হইবে না। ইংরাজি হইতে বাঙ্গলার অনুবাদ করিবার সময়ও ভাষার এই রীতিবিরুদ্ধতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইংরাজিগন্ধী বাঙ্গলা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় দোষ প্রাদেশিকতা। নাটক উপন্যাসের কথোপকথনের ভাষার ব্যতীত অন্য কোথাও প্রাদেশিকতার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। ভাষা সর্বজনবোধ্য করিতে হইলে প্রাদেশিকতা বর্জন করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে চক্রেবিন্দু স্থান নাই এবং ড ও র প্রায়ই স্থান বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া রচনার দাঁত, চাঁদ, আড়ঠ না লিখিয়া দাঁত, চাদ, আঠ লিখিলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আবার পূর্ব পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থলে ফোঁড়া, বাঁকী, কাঁচ, হাঁসি, আঁব, কুঁড়েমি প্রভৃতি শব্দে চক্রেবিন্দু প্রয়োগ প্রাদেশিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে যাহা একস্থানের লোক বুঝিবে, অন্য স্থানের বাঙ্গালী বুঝিবে না। এই সকল শব্দ লিখিতভাষায় অবশ্য বর্জনীয়।

এই কারণেই রচনায় মৌখিক ভাষার প্রচলন আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মৌখিক ভাষাকে কখনই অশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে প্রাদেশিকতা প্রায়শ পাণ্ডুর সন্ধাননা বড় বেশী। যাহারা বলেন যে কলিকাতার মৌখিক ভাষা বঙ্গদেশের সকল স্থানের ভাষার সমন্বয়ে গঠিত, সুতরাং এ ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহারা বোধ হয় জানেন না কলিকাতার গেলুম থেলুম শুধু পূর্ববঙ্গে কেন পশ্চিম বঙ্গেরও অন্যান্য স্থানবাসীদিগের কিরূপ শ্রুতিকটু। তবে এ কথাও সত্য যে মৌখিক ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তিটা প্রধানতঃ ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়াপদগুলি প্রাদেশিকতা দোষণী হইলে মৌখিক ভাষার আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। একটা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

একই স্থলে মৌখিক ও অমৌখিক ভাষার সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বয়ং বক্তৃতাচক্রেই এ সম্বন্ধে সর্বত্র তাল টিক রাখিতে পারেন নাই, অন্যো পরে কা কথা। উদাহরণ—

“শ্রীশঙ্কর তখন কহিলেন, ‘তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুর যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?’

কমলমণি। তোমার যেন আমি একা থাকিতে সাধুতেছি। আমিও যাব,—তুমিও যাবে। তা যাও, লকাল সকাল আপিস সারিয়া পাইস, আর দেরি কর ত, সত্যাংশে আমাতে হৃদিকে ছুঁকেন কাঁদতে বসবো।”

( বিবৃদ্ধ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ )

তৃতীয়, গুরুচণ্ডালী দোষ। সংস্কৃত শব্দের সহিত সাধারণ বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার আমাদের মতে দৃশ্যনীয় নহে এবং এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের একত্র সমাবেশকে যাহারা গুরুচণ্ডালী দোষ বলিবেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া শব্দ প্রয়োগে যথেষ্টাচ্ছাদিতা কেহ মার্জনা করিবে না, আর সন্ধি সমানে এক শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার না করিয়া সংস্কৃতের সহিত চলিত বাঙ্গলা সংযোগ করিলে তাহা সাধারণজ্ঞঃ ‘শব্দপোড়া’ বা ‘মড়াধোঁর’ ন্যায় অভিহিত হইবে। ‘উপযুগ্ম’ চলে, কিন্তু উপযুক্ত অচল। এইরূপ অনেক

উদাহরণ দিতে পারা যায়। কিন্তু এখানেও একেবারে বাধাবোধ নিরম খাটিবে না। দেশত্যাগী, দেশছাড়া হইই শুদ্ধ। এইরূপ, মাতৃহীন, মাতৃহারা; গ্রন্থকীট, কেতাবকীট প্রভৃতি।

কৃত্রিমতা ও বাহ্য-দোষ। ভাষাকে সহজ ও স্বাভাবিক না করিতে পারিলে তাহা প্রাণহীন শব্দ সমষ্টিতে পরিণত হয় একথা আগেই বলিয়াছি। এইরূপ ভাষার চেষ্টার লক্ষণ সকলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে কৃত্রিম বলা হয়। একখানি সুপরিচিত উপন্যাস হইতে এইরূপ ভাষার উদাহরণ দিতেছি।—

‘এমনি করিয়া জুংথের যে ভারী মেঘখানা অগ্নান পুষ্পকোরকের মত ক্ষুদ্র বক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়া আবার আনন্দের স্নিগ্ধ আলোটুকু যখন তরুণ হৃদয়ের একটি প্রান্ত দিয়া সবেমাত্র মুক্ত দ্বারপথে উঘালোকের স্নিগ্ধ মধুর হাস্যচ্ছটার মত তাহার হৃদয়প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে একটা আসন্ন ঝটিকায় সজোরে সেই দ্বারখানা সব আলোটুকু চাপিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল’।

(পোষ্যপুত্র)

এরূপ ভাষার ‘চাপে’ পাঠকেরও নিশ্বাস ‘রুদ্ধ’ হইয়া আসে অর্থ বোঝা ত দূরের কথা। ভাষা বত আড়ম্বরশূন্য ও বাহ্য-দোষবর্জিত হয় ততই তাহা ফলোপনায়ক হয়। ভাবকে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া ঘাহারা ভাষার গোলকধাঁসার মধ্যে ফেলেন তাহার পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে আবশ্যকমত ভাষাকে কেহ ‘ওরু-গস্তীর’ করিতে চেষ্টা করিবেন না। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে শব্দ-মস্ত্রে সিদ্ধহস্ত লেখক ব্যতীত কেহ ভাষা হইতে হৃদয়োন্মাদী গস্তীর নির্ঘোষ বাহির করিতে পারেন না। একটা উদাহরণ দিতেছি—

জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধন-সম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখনি হে রুদ্ধ সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি-- এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারে অবিশ্বাস করিয়া জড়তা দৈন্ত ও অপমানের মধ্যে নিজীব অসার হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন হুঁক্ষ মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে কুহিমজ্জার কম্পাঘিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ হৃদয়কে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—আবিরাধর্থে এমি।

(রবীন্দ্রনাথ; ধর্ম ১৩১ পৃষ্ঠা।)

এখানে শব্দের স্রোত কেমন তরতর বেগে বহিয়া গিয়াছে, কোথাও একটু বাধে নাই, কোথাও একটু ঘূর্ণপাক ঘায় নাই; পাঠকও সেই স্রোতে আপনি ভাসিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে ইহার মেঘমন্ড-ধ্বনি তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়মন আলোড়িত আকুলিত করিয়া তোলে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

## গায়ে হলুদের গান ।



( মুণ্ডাদের গান হইতে )

পতির স্নেহে পত্নী স্নেহী, পতির দুখেই দুখী,  
পত্নী যদি স্বামীর সাথে থাকে মুখে মুখি ।

স্বামী যাবে মাঠে, তার

পত্নী রবে সাথে—

পথ হারালে বাটে, তারে

আনবে তুলে মাথে ;—

বসিয়ে দেবে তাঁর ধনুকে, আনবে মরা ‘বোরা’  
বেঁটে বেঁটে সারা পাড়ায় রাখবে নিজের থোরা ।

মেঘের উপর করবে যখন দৈত্য শিশু খেলা  
শাল মছলের তিনির যখন হবে নিবিড় মেলা

কড়্‌কড়িয়ে হাসবে, যখন

ফুটবে তড়িৎ লেখা

মড়্‌মড়িয়ে অলিবে, আর

বনটি যাবে দেখা—

ত্রস্ত ব্যাকুল ছাওয়ালগুলি বক্ষে এঁটে ধরে

বঁধুর কাছে বসবে বধু পূর্ব পুরুষের ঘরে ।

গন্দ লোকে বলবে কত শুনো না ও-কথা

‘বোঙ্গা’ আছেন শালের তলে, রাগলে নেবে মাথা ।

গভীর নিবুম বাতে, মোদের

বাপ মা’রা সব এসে

খোঁজ নে’ ফেরেন্‌ যা’তে, থাকে

সবাই ভাল বেসে ।

পত্নী ক’বে “মাথার মণি” শতেক চুমো খেয়ে

কইবে পতি “বুকের রাণী” হাজার চুমোয় চেয়ে ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

## প্রাচীন ভারতে বিবাহপ্রথা।

অতি পূর্বকালে মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোনও জনপদ ছিল না।

মহী ভ্রাবাপৃথিবী জ্যোষ্ঠে। ঋক্।

বিস্তীর্ণ জ্যো ( মঙ্গলিয়া ) ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ জ্যোষ্ঠ বা প্রাচীনতম। তখন এই দুই মহা-জনপদে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। তজ্জন্ত সন্তানেরা কন্যাদিগের নামে পরিচিত হইতেন। উক্তঞ্চ মহর্ষি বায়ুনা—

নিবৌকসাং সর্গ এব প্রোচাতে মাতৃনামভিঃ।

এই যে দেবগণের সৃষ্টিকথা বলা যাইতেছে—ইঁহার নাম মাতৃনামে পরিচিত। যেমন—

দিতির পুত্র—দৈত্য, দমুর ( ত্রিমহু ) পুত্র—দানব, মমুর পুত্র—মানব, অদিতির পুত্র—আদিত্য, বিনতার পুত্র—বৈনতেয় প্রভৃতি।

ইঁহাদিগের পিতা কশ্যপ, কিন্তু তাঁহার নাম পরিচয়হলে গৃহীত হইত না। ফলতঃ যেমন গাতীর বাছুর সকল মাতৃনামে ( ধনী, কালী, বৃদী, রাস্তী ) পরিচিত হয়, তদ্রূপ দেবতার ও মাতৃনামা ছিলেন। কালে পিতার নামেও পুত্রগণ পরিচিত হইতে থাকেন। যেমন—

গর্গস্ত অপত্যং পুমান্ গার্গ্যঃ ; কশ্যপস্ত অপত্যং পুমান্ কাশ্যপেয়ঃ।

গর্গের পুত্র—গার্গ্য ও কশ্যপের পুত্র—কাশ্যপেয়।

আচ্ছা তবে কেন স্বয়ম্ভুব মমুর পুত্রেরা মাতৃনামে পরিচিত হইলেন না? যথা—

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাসঃ, পুণ্ড্র, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভৃগু ও নারদ।

হাঁ ইঁহার নাম পিতার নামে পরিচিত ও না ইঁহার মাতার নামে পরিচিত। ইঁহার মমুর মানস-পুত্র। খুব সম্ভব স্বয়ম্ভুব মমু মানস বা ইচ্ছা করিয়া কোনও বা কাতপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করেন। এবং বোধ হয় মমু স্বাধীনভাবে ইঁহাদের নাম রাখেন। তৎপর সন্তানেরা মাতার নামে পরিচিত হইতে থাকেন। তখনও বিবাহ ছিল। কিন্তু সে সময়ের কাহারও নাম আমরা অবগত নহি।

স্বয়ম্ভুব মমু, দক্ষ, ধর্ম ও শিবের ( নকুল ) কে বাপ ও কে মাতা, তাহা কেহ অবগত নহেন। কিন্তু কশ্যপাদির সময়ে বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হইলেও লোক সকল পূর্বপ্রথা অনুসারে মাতার নামে পরিচিত হইতেন।

যাহা হউক অতি পূর্বে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎপর যখন উহার প্রবর্তন হয়, তখনও উহাতে কোনও অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হইত না, পুরোহিতও লাগিত না। পুরুষেরা যে যাহাকে পছন্দ করিয়া পাণি বা হস্ত ধারণ করিতেন—তিনিই তাঁহার ধর্মপত্নী হইতেন। তাই বিবাহের নাম—“পাণিগ্রহণ” বা “পাণিপীড়ন”।

এখনও আসামের কোনও কোনও স্থানে উক্ত প্রাচীনতম প্রথা প্রবর্তিত আছে। কন্যার পিতা প্রকাশ্য সভাতে কন্যাকে আনয়ন করিলে পর, বর যাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কন্যার পাণি বা হস্ত ধারণ পূর্বক বাটীর মধ্যে লইয়া যান, অমনি শব্দ বাজিয়া উঠে। কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। আমরা প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও ইঁহার সমর্থক একটা মন্ত্র দেখিতে পাই—



গভ্রামি তে সৌভাগ্য হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্ট্রির্থাসিঃ । ৩৮। ৮৫। ১০ম

আমার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার সহিত জীবনের শেষকাল পর্যন্ত একত্রে থাকিয়া বাক্ক্যে উপনীতা হও।

এই সময়ে জগতে বালাবিবাহ প্রচলিত ছিল না। ফলতঃ কলিকালের প্রভাত কালেও যে ভারতে বালাবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহা দ্রোপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা প্রভৃতির বিবাহেও সপ্রমাণ করে।

যে পরমারাধা সাবিত্রীর নাম লইয়া সকলে কন্যাদিগকে আশীষ্যাদ করিয়া থাকেন—

“সাবিত্রীসদৃশী ভব”

তিনিও পূর্ণযৌবনে সত্যবানকে বরমালা দান করিয়াছিলেন, উহাতে ঘটক তিনি স্বয়ং, পুরোহিত ও কন্যাকর্ত্তাও তিনি নিজে ছিলেন। এই সময়ে বিবাহের মন্ত্র ইহাই ছিল—

“হৃদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।” পারস্কর।

যা মম তনুরেবা সা ঔষি,

যা তব তনু রিয়ং সা ময়ি। কৃষ্ণ যজুঃ।

আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার, তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার। আমার এই যে দেহ তাহা তোমাতে, তোমার এই যে দেহ তাহা আমাতে। সূত্ররং ইহা বালক-বালিকার বিবাহ ছিল না।

অথর্ব বেদও বলিতেছেন যে—

“ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং।”

কন্যাও পুত্রদিগের ন্যায় গুরুগৃহে যাইয়া বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞী হইয়া তবে যুবা পতিকে বরণ করিবেন।

একালের মহানির্বাণ তন্ত্রও বলিতেছেন যে—

“কন্যা পোব পালনীয় শিষ্ণীয়াতি যজ্ঞতঃ।

দেয়া বরায় বিজ্ঞে, ধনরত্নসমম্বিতা ॥”

পিতা ও মাতা পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত করিয়া পরে ধনরত্ন সহ বিদ্বান্ বরে সমর্পণ করিবেন।

মহানির্বাণ একরূপ কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে—পিতা ও মাতা প্রভৃতি কখনও অজ্ঞাতপতিমযাদা ও অজ্ঞাত-পতিসেবা কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। কেন দিবেন? ইহাতে ক্ষতি প্রভূত!

কে এক সময়ে লজ্জা ও সরস্বতী এই উভয় দেবতার আরাধনা করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ সুবকগণের অকালে কেশপকতা এবং বাক্ক্য আসিয়া তাহাদিগকে অকম্পা করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ অল্পবয়সে বিবাহের ভার পিতা মাতার হস্তে পতিত হয় বলিয়া অনেক সময়েই একরূপ খট্টিয়া থাকে যে পাত্র ও পাত্রী কেহ কাহাকে পছন্দ না করিয়া উদ্যোগগামা হইয়া পড়ে। বালাবিবাহের এই বিষময় ফল দ্বারা কত প্রকৃত দেবতা অমুরে পরিণত হইয়া যাইতেছেন ও খিয়াজেছেন এবং শত শত সাক্ষী রমণী আজীবন শ্রিয়মাণা হইয়া ছুঃখে ও ক্ষোভে জীবন কাটাইতেছেন।

ফলতঃ পূর্বকালে কোনও ব্যক্তিই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পাঠ্যনাস্থির পূর্বে কাহারও পাণিগ্রহ করিতেন না।

ভগবান্ মহু বলিতেছেন যে—

বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাৰিশেৎ ॥

লোক সকল তিন বেদ ছই বেদ, কিংবা এক বেদ সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্য সমাপ্তির পর দারপরিগ্রহ পূর্বক গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিবেন। তথাহি—

ষট্ ত্রিংশতাদিকং চর্য্যং গুরো ত্রৈবেদিকং ব্রতং।

তদদিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেববা ॥ ১। ৩৯

ব্রাহ্মণবালক গর্ভাষ্টমাসে উপনীত হইয়া ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিবেন। যদি বুদ্ধি প্রথর হয়, তাহা হইলে ৮, ৯ বা ১০ বৎসরে পাঠ সমাপ্ত হয় (যেমন ৫। ৬। ৭) তত্ ৩৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু কেহই ২০। ২৫ বৎসরের ন্যূনে তিন বেদ সমাপ্ত করিতে পারিতেন না। বাক্সিমা এই শঙ্করাচার্য্য ছিলেন না। তিনিও ৩২ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। সুতরাং অনেককেই ৪৪ হইতে ৪৫। ৪৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পঠদশাতেই থাকিতে হইত ও তৎপর তাঁহারা বিবাহ করিতেন। ভগবান্ সুশ্রুতও বলিতেছেন যে—

উনষোড়শ বর্ষায়াং অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিঃ।

যদ্যাপত্তে পুমান্ গর্ভং কৃষ্ণিহঃ স বিপদাতে ॥

জাতো বা ন চিরং জীবৎ জীবৎ বা বিকলেন্দ্রিয়ঃ।

তস্মাৎ অত্যন্তবাল্যায় গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ অনুবাদ নিম্নরূপে।

মনুও বলিতেছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষোবহৎ কন্যাং দ্বাদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

চাষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধাম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥

ত্রিংশ বৎসরের পুরুষ, দ্বাদ্য দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার এবং চব্বিশ বৎসরের পুরুষ, অষ্টবর্ষীয়া পানি গ্রহণ করিবে।

সুতরাং মনুর সময়েও ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে ?

না—একথা ঠিক নহে। মনুর এই শ্লোকটা বোধ্য হয় না ও পুরুষের বয়সে কত তফাৎ থাকিবে তাহা বলিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। যদি সে অর্থ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—

“এই শ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত”

কেননা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে মনুর ৯০।৯ অঃ শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে। মনুর সময় ত অতি দূরের কথা—কলির প্রথমেও কি, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতির বিবাহও কি ভরা যৌবনে হইয়া ছিল না? অদ্ভুত-রামায়ণে আছে যে—

“বদ্রাস্তব্রাজিত স্তনী”

সীতার যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার স্তন, বস্ত্রের ভিতর দিয়া ব্যঞ্জিত হইতেছিল। কুমারপাঠে জানা যায় যে ভগবতী উমা শিবের জন্য বনে যাইয়া তপস্যা করেন ও তাঁহাকে দেখিয়া শিবের ধ্যানভঙ্গ হয়, সুতরাং এই গৌরী ও জানকী কেহই অষ্টবর্ষী ছিলেন না।

আমরা আমাদের শাস্ত্রে আটটা বিবাহের সত্তা দেখিতে পাই। যথা—

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আহুয়, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম বিবাহ কাহাকে কহে? ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে—

আচ্ছাণ্ড চার্চায়ত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।

আহুয় দানং কস্তায়াঃ ব্রাহ্মোদ্যমঃ প্রকৌত্তিভঃ ॥ ২৭

কন্তার পিতা বেদবিৎ ও চরিত্রবান্ বরকে আস্থানপূর্বক বস্ত্রালঙ্কারসমলঙ্কৃত ও অর্চনা করিয়া কন্তা দান করিবেন ।  
এই বিবাহের নামই “ব্রাহ্ম বিবাহ” ।

যজ্ঞে তু বিততে সমাক্ ঋত্বিজে কৰ্ম্মকুৰ্ব্বতে ।

অলঙ্কৃত্য সূতাদানং দৈবং ধৰ্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ২৮

ঋত্বিক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া কৰ্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকেই যে অলঙ্কৃত কন্তা দান, উহারই নাম “দৈব” বিবাহ ।

একং গোমিথুনং হে বা, বরাং আদায় ধৰ্ম্মতঃ ।

কন্তাপ্রদানং বিধিবৎ আৰ্ষো ধৰ্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ২৯

বরের নিকট হইতে ধৰ্ম্মানুসারে এক ঘোড়া বা দুই ঘোড়া গো গ্রহণপূর্বক যথাবিধি কন্যাদানকে “আৰ্ষ” বিবাহ কহে ।

সহোভৌ চরতাং ধৰ্ম্মং ইতি বাচামু ভাষ্যচ ।

কন্যাপ্রদান মভ্যচ, প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০

তোমরা উভয়ে ধৰ্ম্মাচরণ কর, বর কন্তাকে এই উপদেশ দিয়া অর্চনাপূর্বক যে কন্যাদান, ইহার নাম “প্রাজাপত্য” বিবাহ ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যাটৈ চৈব শক্তিভ্যঃ ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যং আশুরো ধৰ্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩১

কন্যার পিতা, মাতা বা ভ্রাতাদিগকে এবং কন্যাকেও যথাশক্তি ধনদানপূর্বক যে কন্যাদান, উহার নাম “আশুর” বিবাহ ।

ইচ্ছয়োহনোনা সংযোগঃ, কন্যাস্য চ বরস্য চ ।

গান্ধর্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ, মৈথুনাঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩২

বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছানুসারে উভয়ের যে মিলন, উহার নাম গান্ধর্ববিবাহ । ইহা মৈথুনা ও কাম সম্ভব ।

হত্বা ছিত্বা চ ভিষ্ট্বা চ ক্রোশন্তীং রুদন্তীং গৃহাৎ ।

প্রসহ কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিক্রচ্যতে ॥ ৩৩

কোনও কুমারী-কন্যাকে বলপূর্বক গৃহ হইতে আনয়ন করিয়া যে বিবাহ, ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ । ইচ্ছাতে প্রয়োজন হইলে যে চীৎকার ও অর্ন্তনাদ করিতেছে, তাহাকে বধ করিয়া বা সেই বাধাপ্রদানকারীর হস্তাদি ছেদন কিংবা তাহার দেহের কোনও স্থল ভেদ করিয়া রোদন পরায়ণা কন্তার হরণ করিতে হইত ।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা, রহৌ যজ্রোপ গচ্ছতি ।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ৩৪ । ৩৫ ।

কোনও কন্যা নিজায় অভিভূত আছে বা মদ্যপান করিয়া মত্ত বা প্রমত্ত হইয়াছে--এই অবস্থায় কন্তার অজ্ঞাতে পোপনে যে মিলন তাহা পৈশাচ বিবাহ উহা অষ্ট বিবাহের মধ্যে অধম ।

বেশ জানা গেল যে—ইহার একটাও বালা বিবাহ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মন্ড্রে “কন্যাদান” শব্দ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা একালের ব্রাহ্ম সমাজের যৌবন বিবাহে কন্যাকর্তার অনুমোদনের ন্যায় অনুমোদন মাত্র। কেন না—

“স্বাধীন মনুষ্যের দান ও বিক্রয় হইতে পারে না”

একালের হিন্দুদিগের যে বিবাহ হয়, উহা এই “ব্রাহ্ম” বিবাহ বলিয়া কথিত। কিন্তু সে কেবল কথার কথা মাত্র। যেখানে বরপণ বা কন্যাপণ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে “ব্রাহ্ম” বিবাহ হইতে পারে? বরপণ গ্রহণ ত দমুতাবিশেষ?

দেবতার। যে প্রকারে বিবাহ করিতেন, উহার নাম “দেব বিবাহ।” উহা সহজ ব্যাপার।

আর্য বিবাহ ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাতে যে বর হইতে গো গ্রহণ করা হইত, উহা কন্যার শুদ্ধ বিশেষ বলিলে অত্যাধিক হইবে না। ফলতঃ ইহাও আশুর বিবাহের একদেশ মাত্র।

আশুর বা পার্শীগণ কন্যার পিতৃপুত্রটিকে ধন দান করিতেন। পূর্বে বহুপণ লইয়া কন্যা ক্রয় করার প্রথা এদেশে ছিল। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে এ কন্যা সর্বস্বাস্থ্য হইতে হত। এখনও নবশাব প্রভৃতির মধ্যে এই প্রথা বর্তমান। কন্যাকে ধনদান, মুসলমানদিগের কাবিনের প্রকারান্তর মাত্র।

প্রজাপতির। যে বিবাহ প্রথায় অনুবর্তী হইতেন—উহা প্রাজাপত্য বিবাহ। ইহাও বালাবিবাহ নহে, বালক বালিকার। ধর্ম্মাচাট্টান কি করিবে? এই বিবাহও কন্যাদিগের অনুমোদনবিশেষ।

গান্ধববিবাহ গন্ধবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহা সুবক সুবর্তীর সংমেলনবিশেষ। ক্ষত্রিয়গণ ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই প্রকৃত বিবাহ। শতশ্রুতা ও শ্রুতদ্বা প্রভৃতির বিবাহ ইহার উদাহরণ স্থল। অবশ্য মত ইহাকে “নৈখুম্য” ও “কামসম্বন্ধ” বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু—

“দারকশ্মণি মৈথুনে”

ইহার দ্বারা মৈথুনের সত্তা কি প্রাক্কাদি বিবাহের প্রসারিত হয় নাই? “প্রজার্থ গৃহ মেধিনাং”, বিবাহ সম্ভানলাভের জন্যই। রাক্ষসেরা অসৎকন্যাদিগকে বরপূর্বক বিয়া বিবাহ করিতেন। সেই জনাই রামরাক্ষসের যুদ্ধ। সৌত্রতপণ বর্তমান রামায়ণ অকারণ প্রবোধিত। দ্বায়রা দেখিলেন যে অসৎদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপে কন্যা সংগ্রহ করিতেছেন কাজেই ইহাও শেষ বৈদ্য বলিয়া মজুর করিয়া লইবেন। অনেক অর্ধাস্তান পিশাচ (নেপালবাসী) দিগের ন্যায় নিম্নিত্ত কুমারী নারীদিগের স্ত্রীত্ব নাশ করিত। কিন্তু উহাকে অন্য আর কেহ বিবাহ করিবে না, এ জন্য তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়া উহাও বৈদ্য বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

ইহার পরই সমাজে কলিযুগের প্রারম্ভে বালাবিবাহ প্রবর্তিত হয়। পূর্বে যৌবনবিবাহে কচিং বা গোলযোগ হইত, কানীন পুত্র ক্ষয়িত, একারণ একালের ঋষিরা সমাজে উহার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ইহার মতন অধর্ম্ম ও কুপ্রথা আর জগতে নাই। বালাবিবাহ শাস্ত্রস্বারে সিজ্ঞও হইতে পারে না।

অশ্বিন্ দ্রবো মংস্বত্পরিত্যাগ

পূর্বকং অস্যা স্বয়ং জায়তাং

ইতি জ্ঞানপূর্বকং সমর্পণং দানং।

কিন্তু কন্যার উপর পিতার পিতৃ স্বত্ব ভিন্ন অন্য স্বত্ব নাই। “আমার এই কন্যা আজ হইতে তোমাকে বাবা বলিয়া ডাকিবে” পিতা কি ইহা বলিয়া সম্প্রদান করেন? সুতরাং স্বাধীন মনুষ্যের দান ও বিক্রয় অসিদ্ধ।

কলিতঃ বাল্যবিবাহের এই অবৈধত্ব নিরসন জনাই হিন্দুসমাজে পুনর্বিবাহ প্রথার প্রবর্তন। কেন না কুম্ভমতী কন্যা ও তদ্বরোজোষ্ঠ বরের দান ও গ্রহণে অধিকার জন্মিয়া থাকে। কন্যা আপনাকে দান করিতে পারে, পিতা নহে। মুসলমানদিগের মধ্যেও বাল্যবিবাহ আছে কিন্তু—তাহারাও প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া উকিলের সে “এজীন” নামজুর করিতে পারে।

এইক্ষণ ব্রাহ্মসমাজে গান্ধর্ববিবাহ ও বৈদিক ব্রাহ্মবিবাহের সমবার সমুখ প্রথাবিশেষের প্রবর্তন হইয়াছে। আমরা আশা করি, অভিভাবকগণ চরিত্রবতী পুরুষ ও প্রবীণ পুরুষগণকে মধ্যবর্তী রাখিয়া যুবকযুবতীকে দেখা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ করিতে দিবেন।

আর আমাদের সর্বিনর প্রার্থনা এই যে কুলীনদিগের ন্যায় ব্রাহ্মভ্রাতৃগণও যে কন্যাদিগের ঘোষনান্ত বিবাহের প্রবর্তন করিতেছেন, ইহার যেন গতিরোধ হয়। আর যেন ইহাও আমাদের কর্তব্যকে, প্রবেশ না করে যে ব্রাহ্মগণও অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

## ত্রিধারা।

—\*—

মন্দাকিনীর ত্রিদিব ধারাটী

নেমেছে জননী তোমার বুকে,

আপন রুধিরে বাঁচায়ে রেখেছ

সন্তানে তব, কত না সুখে।

তোমার স্তন্যে স্নাতক, জননী,

হেরিসু প্রথম বিশ্বভূমি,

—অস্থিমজ্জা, চেতনা আমার,

আমার ধরম সাধনা তুমি।

বেদনামরুর উষর বক্ষ

জ্বলিছে যেথায় দিবস-যামী

ভগিনী, তোমার স্নেহ ভাগিরথী,

জুড়াতে এ ভবে এসেছে নার্মি।

কল্যাণী তুমি চিনেছ যাহারে

যেমন মায়ের পেটের ভাই,

এমন দরদী কে আছে তাহার,

ভুবনে তোমার তুলনা নাই।

মর্মপাতাল ফুঁড়িয়া উঠেছে

ভোগবতী, তব বিমল ধারা

হে প্রেয়সী মোর শাস্তিরূপিনী,

বিলায়ে দিয়েছ আপন হারা।

এ দেহ পামাণ-প্রাচার টুটিয়া

এ কোন্ জগত দেখালে মরি!

চির-সুশীতল, মন-অভিরাম—

আজিকে পরাণ উঠেছে ভরি।

হেথা ত্রিবেণীর অমিয়-পুলিনে  
দাঁড়িয়ে রয়েছি যুক্ত-পানি,  
সঁপিতে অর্ঘ্য জ্ঞান-সবিতায়,  
লভিতে দেবের আশীষ-বাণী।

শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত।

## দিদি। \*

—:~:—

( আলোচনা )

অজ্ঞানকার রশ্মিকৃত বাজে উপচাসের উপর আমাদের কাছে যখন 'দিদি' আসিল তখন বুঝিলাম, বঙ্গ-সাহিত্যের ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু। ভারতবর্ষের নারীজন্মের স্বচ্ছ স্রোতটিকে লেখিকা এমনি একটি সহজ অথচ সরল গতিতে ভঙ্গিমা দান করিয়াছেন সে, যেখা আশ্চর্য্য বইয়া যাউতে হয়। বইখানি খাঁটি বাংলা দেশের মর্ম্মের কথা। সেই জন্মই 'দিদি' গ্রন্থটি যদি ইংরাজিতে তর্জমা করা যায়, তবে বাংলা 'দিদি' শব্দের পরিবর্তে 'sister' এর মতই, ইহার মর্ম্মকথাটি একটা কিশু-কিম্বদন্তির বিলাতি বেশে সাতিয়া হাজির হয়। এই 'দিদি'কে বাংলা দেশের গঙ্গার স্নানে, কাশীর বিশ্বেশ্বরের আরতি সভার, সংসারের সুখতৃপের মধ্যে খুঁড়িয়া পাইতে বিলম্ব হয় না কিন্তু একেই যদি বিলাতি গাউনে সাজাই ত ইতাকে একেবারে Puck-এর মতই সাংঘাতিকরূপে Translated করা হয়। কহি তাবিত্তেছিল ম আমাদের দেশের রমণীর এই আশ্চর্য্য জন্ম, লেখিকার কাছে কি সত্যরূপেই ধরা পরিষাচ্ছে। ভারতবর্ষ ছাড়া 'দিদি'কে অত্র কেহই আদর করিতে পারবে না; কারণ এই 'দিদি'র রমণীজন্মের যে শক্তিপূজ্য ভাষা একমাত্র ভারতবর্ষেরই নদীর স্রোতে প্রাণিত, ভারতবর্ষেরই গৃহে গৃহে জ্যোৎস্নালোকে তাহা দীক্ষিত। এই 'দিদি'র পটুবাস ভারতবর্ষেরই পূণ্য-সমীরণ চঞ্চল এবং তাঁহার কল্যাণময়ী দৃঢ়তা ভারতবর্ষের বর্ণে বর্ণে বিদ্যোষিত।

গল্পের প্রাণটা খুব বড় নহে। অমর নামক এক মাতৃহীন ধনীসন্তান দেবেন্দ্র নামক এক দরিদ্র যুবকের সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। দেবেন্দ্রের মা বর্তমান ছিলেন। তাহার কলিকাঠায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়িত। ধনী বলিতে যে অতিমাম বুঝায় অমরনাথের তাহা মোটেই ছিল না। বিলাস-বিবর্জিত, সরল প্রাণ সুবন্ধু অমর দরিদ্র দেবেন্দ্রের একান্ত আত্মীয় ছিল। অমরনাথ এফ আর দেবেন্দ্রের বাড়ী বেড়াইতে গেল—ইহা দেবেন্দ্রেরই অনুরোধে। হঠাৎ

এক দিন নবাগত অমরনাথ দেবেন্দ্রের সহিত তাহাদের এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর গৃহে একটি মুমূর্ষু বালিকাকে চিকিৎসা করিতে গিয়া দুই বন্ধুর জন্ম বিগলিত হয় কারণ বালিকাটি ঐ বৃদ্ধা বিধবার একমাত্র কন্যা। নাম চারু। চারুকে ভাল না দেখিয়া এবং ভাল না বাসিয়া অমরনাথ আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না। পরিশেষে চারু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার পর অমরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। দেবেন্দ্রের বাড়ীতে অমরনাথের এই প্রথম যাত্রা।

দ্বিতীয় যাত্রা, শারদীয় পূজার ছুটিতে। তখন অমর ও দেবেন্দ্রের ডাক্তারী পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেছে। দুইজনেই এক স্বকম নিশ্চিন্ত। অমরনাথ স্বগৃহের শারদীয় পূজার বিরাট আয়োজন উপেক্ষা করিয়া বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের অহুরোধে তাহার গৃহে পূজা দেখিতে আসিয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় উভয়ের বন্ধুত্ব কত গভীর। এই বন্ধুত্ব ছাড়াও সুন্দরী বালিকা চারুর কথা অমরনাথ একেবারে ভুলিতে পারে নাই। সেই চারু যখন বিজয়ার প্রণাম করিতে অমরনাথ ও দেবেন্দ্রের নিকট আসিল তখন অমরনাথ গৃহে প্রত্যাগমনের জন্ত বাস্ত! চারুর মতো বৃদ্ধা, চারুর মুখ দিয়া দেবেন্দ্রকে বিজয়ার দিনে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া দেবেন্দ্র, অমরকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধার জীর্ণ গৃহে উপস্থিত হইয়া বিজয়ার আশীর্বাদ লইয়া আসিল।

বৃদ্ধার জীর্ণ গৃহ ত্যাগের পর, অমরের সহিত দেবেন্দ্রনাথের চারু-বিবাহক যে আলোচনা হইরাছিল তাহার স্মারক এই যে চারুকে সংপাতে দিবার জন্য বৃদ্ধা একান্ত বাস্ত। যদিও চারুকে বরস এগারো তথাপি “হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর কত দিন রাখা চলে?” অমরনাথকে দেবেন্দ্র এই অহুরোধ জানাইল যে, সে যেন চারুর জন্য একটি ঘর পাত্র খুঁজিয়া রাখে। আজকাল টাকা ছাড়া যখন তথাকথিত সংপাতের খোঁজ মিলে না, তখন ইহার জন্য চেষ্টার আশ্রয়। অমরনাথ সন্দের এই মুহূর্ত্ত ব্যবহারে ব্যস্ত হইয়া মোহনসাহেব বসিয়া উল, “বল কি দেবেন্দ্র? তোমার এই বুঝা এত দিনের শিকার ফল! জগতের সর্বত্রই কি ঐ এক নীতি।” অমরনাথকে এত উৎসাহী দেখিয়া দেবেন্দ্র কহিল, “বিশেষ বড় লোকদের ঘরে! গরীব ভদ্রলোকের বা এক জায়গায় মল্লমাত্র দেখিয়ে থাকে কিন্তু বড় লোকদের ঘরে ঐ নীতি আবহমান কাল চলে আসছে।”

অমরনাথ হয়ত বড় লোকদের অর্পে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বসিয়া কি মনে করিল, তাহা প্রতিকই কল্পনা কবিত্তে পারেন। যদিও দেখিকা স্পষ্ট করিয় জানান নাই যে, অমরনাথের চলন্ত গাড়ীর চাকার শব্দে দেবেন্দ্র অমরের কি একটা কথা শুনিতে পায় নাই, তথাপি পাঠকগণের কল্পনা করিতে দোষ নাই যে, অমরনাথ নিজেই সেজন্য প্রস্তুত ছিল।

বাড়ী গিয়া অমরনাথ স্বরমার কথা ভুলিতে পারে নাই, অথচ কল্যাণগঞ্জের জমীদার জীয়াধিকিশোর ঘোষের একমাত্র ছতিতা স্ত্রীলক্ষণা, সুপ্তিমতী জমিনী স্বরমার মৃত স্ত্রীর অমরনাথের বিবাহ হইয়া গেল। স্বরমার সহিত অমর কল্যাণগঞ্জ পাটের একপার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইল। অমর কোনো দিনও মুখ খুলিয়া স্বরমার সহিত ব্যাক্যলাপ করিল না।

এখন বিবাহিত অমর বন্ধুবর দেবেন্দ্রের অহুরোধে তৃতীয় বার তাহাদের গ্রামে গেল। অমর যে সত্ত্ব বিবাহিত একথা দেবেন্দ্র বা তাহার বাড়ীর অপর কেহই জানিত না। পুনর্বার সেই বৃদ্ধা বিধবার জীর্ণ কুটারে গিয়া দেখিল যে বৃদ্ধা আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় শয্যাশায়ী। “মান, আরক্ত-মুখ-চারু”র ক্ষুদ্র হাতখানি লইয়া বৃদ্ধা, অমরের হস্তে স্থাপন করিয়া অদ্বৈচ্ছারিত স্বরে বলিলেন “তোমাকে দিয়ে গেলাম, আমার চারুলা তোমার হ’ল! ভগবান

তোমাদের সুখী করুন।” বুঝা এই শেষ বাক্য বলিয়া চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। “বিস্মিত, ভস্মিত, ভীত” অমরনাথ যে বিবাহিত, তাহা বুঝার আর ইহকালে কর্ণগোচর হইল না।

খেলার পুতুলের মত নব্য চিকিৎসক শ্রীমান অমরনাথ ভাবী বধু চাককে লইয়া কলিকাতাতে উপস্থিত হইল। ইচ্ছা, ভাল পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিবে কিন্তু ইতিপূর্বেই যে চাক, অমরনাথের চরণে নিজেই নিবেদন করিয়াছিল তাহা অমরনাথ প্রথমটা না জানিবার ভাণ করিলেও শেষে উভয়ই উভয়কে ধরা দিল। বিবাহিত সুশিক্ষিত, সুসভা, নব্যযুবক মাতৃহীন অমরনাথ পিতার অসাক্ষাতে ও বিনামূল্যে চাককে বিবাহ করিয়া বিবাহের পূর্বে অমর চাককে তাহার প্রথম বিবাহের কথা সমস্তই পুলিয়া বলিয়াছিল কিন্তু চাক তথাপি অমরকে পতিরূপে বরণ করিয়া লইল।

অমরনাথ, তাহার পিতা হরনাথ বাবুকে ও প্রথম পত্নী সুরমাকে এই সংবাদ দিয়া উভয়েরই অশ্রুজ্বালাজন হইয়া উঠিল। হরনাথ বাবু তথাপি পূর্বকে তজ্ঞাপূত্র করিলেন না, তাহার জন্ম মাসিক একশত টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন কিন্তু পিতাপুত্রের মুখ দেখাদেখি রহিল না।—স্বামীস্বীতেও নয়। অমরের প্রথমা পত্নী সুরমা অধিকাংশ সময়ই স্বত্তরাণ্যে থাকিত, সে প্রদীপ্ত তেজের সহিত তাহার স্বামীর এই অদ্ভুত ভাঙকে কদাপি ক্ষমা করিল না। সুরমার অল্প বয়স হইলেও তাহার চরিত্রে সত্যের এমন একটি তেজ প্রজ্জ্বলিত ছিল যার কাছে সে নিজেই ত দগ্ধ করিতে পারিতই এবং আর কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারিত না। হীরকের ন্যায় তাহার অন্তরের এই ঠিকরিত জ্যোতিতে, সুরমা তাহার স্বত্তরাণ্যের সমস্ত ব্যবস্থা এমনি সহজ করিয়া উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল যে, সুরমা ব্যতীত হরনাথ বাবুর সংসার চলিত না।

সুরমা মনে মনে কদাপি অমরকে ক্ষমা করে নাই এবং সে নিজেই তজ্ঞা ক্ষমা করা দূরে থাকুক—প্রতিদিন চরণের স্তুতি অনলে দহন করিয়া মারিতেছিল।

অমরনাথ কলিকাতায় বসিয়া হঠাৎ একদিন এই মর্মে একখানি তার পাইল যে, হরনাথ বাবু মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; অমরনাথ ও চাককে একবার দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অমরনাথকে বাধা হইয়া চাক সহ স্বগৃহে আসিতে হইল। মরিবার সময় হরনাথ বাবু, পুত্র অমরকে ক্ষমা করিয়া গেলেন এবং সুরমাকে বলিলেন:—“মা, তুমি হয় তো অমরকে ক্ষমা করো নি; কখনো করতে পারবে কিনা জানি না, সে অনুরোধ তাই আমি সহসা করতে পারিলাম না। কেননা আমার চেয়ে তোমার কাছে তার অপরাধ ঢের বেশী! মা, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, যে ক’দিন আমি থাকি, আমার সম্মুখে তুমি যেন তাকে ক্ষমা করেছ, এমনি ভাবে চল।”

হরনাথের মৃত্যুর পর অমরনাথকে পিতার সংসারের কর্তা হইতে বাধা হইতে হইল। হতভাগিনী সুরমা কিছুতেই নিজের স্বত্তরাণ্য বলিয়া এই গৃহকে আর দেখিতে পারিল না কারণ চাকই যে অমরনাথের পত্নী। চাককে সুরমা কখন সপত্নী বলিয়া ভাবিত না। নিজের ছোট বোন্টির মতই দেখিত। চাকও সুরমাকে “দিদি” বলিয়া ডাকিত। এই “দিদি” নামে লেখিকা উপন্যাসের নাম-করণ করিয়াছেন।

অমরনাথ সুরমার নিকট কখনো স্বামীরূপে ধরা দেয় নাই কারণ সুরমা যে প্রকাশ্যে অমরনাথের কাছে, অমরনাথকে ক্ষমা করিতে পারে নাই!

অমরনাথ অনেকবার সুরমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল কিন্তু সুরমা প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায়, অমরের সে আকাঙ্ক্ষাকে ত্ত্বীভূত করিয়া কেহিয়াছিল। অমরের মনেও এই অভিমত ছিল যে, যে আমার ক্ষমা করিতে



পারিল না তাহার কাছ হইতে ভিক্ষুকের মত প্রেমাকাজী এ জীবন থাকিতে হইবে না। এই হইয়ের দ্বন্দ্ব শিশুপুত্রসহ বেচারী চাকুর জীবনটি বড় করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুরমার হৃদয়ের জলন্ত অঙ্গার অমরনাথের কঠিন লোচার মনকে একটুও নরম করিতে পারে নাই। সুরমা এই অভিমান করিয়াছিল যে, আমি যদি রমণী হই ত অমরকে পরাজিত করিবই এবং অমর ভাবিয়াছিল, আমি পুরুষ হই ত সুরমা পরাজিত হইবেই। অপরাধিতা সুরমা ও পরাজিত অমরনাথের দ্বন্দ্বের টানে উপন্যাসখানির মধ্যভাগ সুরমার হস্তা, লেখিকার রচনার অশ্রুতা কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা কথা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, সুরমা বাহিরে এত সূদৃঢ় হইলেও তাহার ভিতরের শান্তপূজাটুকু জমাট রাখিয়া উঠে নাই। পৃথিবীর আদিম অস্থির মতই সুরমার মনটার উপরে একটা কঠিন বৈরাগ্যের গেরুয়া-আস্তরণ সঞ্চিত হইলেও, তাহার ভিতরে তখনো একেবারে কঠিন আঁকর লাভ করে নাই। কারণ সুরমার বয়স অল্প। তাহার হৃদয়ের ভিতরটা জলন্ত অগ্নিরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল।

সুরমার এই অগ্নিময়ী মনের পরিচয় সুরমার পরিচিত নাহেই অনুভব করিত এবং পাঠকপাঠিকাগণও হয় ত তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। অমরের প্রতি সুরমার যে গভীর প্রেম তাহা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশিত হইলেও সুরমা, সূদৃঢ়ভাবে সেই প্রেমকে ভয়াঙ্কাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। মনের সহিত সুরমার এই সংগ্রাম এত সুপারফুটভাবে লেখিকার তুলিকা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মনস্তত্ত্বে লেখিকার স্থান বহু উচ্চে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুরমার এই সংকল্প দৃঢ় ছিল যে তাহার স্বামী নাই—সে বিধবা। কিন্তু হায়! যে পূজারিণী প্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকেই আরতি বলিতেছে সে কেমন করিয়া চোখ বুঁজিয়া বলিতে পারে যে, প্রতিমা বিসর্জিত। সুরমার চরিত্রের এই দৃঢ়তা একস্থানে স্পষ্টরূপে ফুটিয়াছে। সুরমার পিতালনে তাহারি আত্মীয় এক বিবধা বালিকা থাকিত, তাহার নাম “উমা।” উমা সুন্দরী ছিল, ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। প্রকাশ নামক সুরমারই এক আত্মীয় বৃদ্ধ উমার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছিল। সুরমা ইহা বুঝিত পারিয়াছিল এবং তাহার ভীরের ন্যায় সূতীক কণ্ঠবাণী, উমা ও প্রকাশের মধ্য দিয়া, যে সূত্রের বাচ্ছদ অঙ্কিত করিয়া অল্প অল্প করিয়া ছুটিয়া গেল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রকাশকে জোর করিয়া নিষ্ঠুর সুরমা অমরনাথের এক আত্মীয় মন্দাকিনীর সহিত বিবাহ দিল। “মন্দার” সহিত প্রকাশের বিবাহ হইলেও বেচারী প্রকাশচন্দ্র উমাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। উমারও ইহা জীবনে প্রকাশকে ভুলিবার সাধ্য আর রহিল না। প্রকাশের সহিত মন্দার বিবাহে প্রকাশ নিজে ত অসুখী হইলও অধিকন্তু মন্দাকিনীকে সে ভালবাসিতে পারিল না।

বিবধা উমাকে সুরমা সঙ্গে লইয়া কাশীভ্রমণে চলিয়া গেল। সুরমার কল্পিত বৈধব্যের কঠিন ব্রতে, যথার্থ বিবধা উমার মিলন মনে হয় যেন ঠিক হয় নাট। কারণ ইহা সত্য যে, উমা বালবিবধ কিন্তু সুরমা?—সে ত বিবধা নহে; এই ছুই রমণীকে একই শ্রেণীতে দিলে আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

তাহার পর গল্পটা অমর ও চাকুরে লইয়া একটানা চলিয়াছে। ঝড়কণ্ঠা, অমুকুল ও প্রতিকুল বায়ুতে তাহাদের জীবন তরলীখানি সংসার নদীপথে ছলিতে ছলিতে চলিল। যখন থাকিয়া থাকিয়া সংসারের ভীরের বিপ্লব, ধূসর বাসুকারাশিতে তাহাদের জীবনভরা আটকাইয় যায়, তখন একমাত্র সুরমাই তাহাকে টানিয়া আবার নিপুল শ্রোতে ছাড়িয়া দেয়। সেই জন্যই সুরমাকে প্রায়ই অমরের গৃহে চাকুর আস্থানে আসিতে হয়। কিন্তু

অমর ও সুরমা উভয়েই পূর্বের ন্যায় অচল অটল রহিল। অমর ও চাকর জীবন হইতে সুরমার সম্বন্ধ একপ্রকার অবিচ্ছিন্নই হইয়া রহিল। সংসারের তীরে তীরে তাহাদের জীবন-তরণীকে লক্ষ্য করিয়া সুরমা, উত্তপ্ত, ধূসর মক্ষবালুকার উপর একাকী চলিতেছিল। সংসারে চাকর ও অমর পাছে দৃষ্টি পায়, সুরমার সেদিকে প্রথর দৃষ্টি ছিল।

সুরমা এই তরুণ যাত্রীদ্বয়ের নৌকার বতিদ্বারে দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া এক একবার অমরের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে লজ্জায়, কণ্ঠবাবুদ্বির তাড়নায়, কাশীর বিবেকবরের মন্দিরে গিয়া, সেই প্রেমকে আচ্ছাদিত দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

একদিন কাশীর বিবেকবরের মন্দিরে পট্টবাসে সুরমা যখন আরতি দেখিয়া, দেবতাকে নত হইয়া প্রণাম করিতে বাইবে, চোখ মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে অমরনাথ। অমর দৈবক্রমে কাশীভ্রমণ করিতে গিয়া ঐ একদিনে বিবেকবরের মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়া সুরমাকে দেখিয়া চিনিলা। দুইজনের দ্বিতীয়বার চারিচক্ষে মিলন হইল। সুরমা লজ্জায় মরিল অমরনাথ কাশীর ভাড়াটে বাড়ী আসিয়া চাকর কাছে সুরমার সন্নিহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের কথা কিছুই বলে নাই। পরে, সুরমাকে চাকর তাহাদের বাসায় আসিতে চাহিলে, সুরমার চিরপ্রথাযুগ্মায়ী সে বাইতে অস্বীকার করিল না।

সুরমার সন্নিহিত অমরনাথের এই মন্দিরের ভিতর পরস্পরের সাক্ষাতের পর হইতে সুরমার মন ফিরিল। সুরমা অমরনাথের সন্নিহিত একদিন স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং তাহার পত্নি, অমরনাথের চরণে তাহার নারীহৃদয়ের সত্যকে একমুহূর্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া, তাহার গর্জয় অভিমান ও কাটিনোর অবসান করিয়া দিল। সুরমা যে কি মুষ্টিতে অমরনাথের নিকট প্রকাশিত হইল তাহা “দিদির” পাঠকপাঠিকাগণ জানেন। অমরনাথও এক নিমেষে তাহার হৃদয় দান্তি তাকে বিসর্জন দিয়া সুরমার হাত ধরিল, চারিচক্ষের তৃতীয়বার মিলন হইল। এইখানেই গ্রন্থকর্ত্ত উপন্যাস শেষ করিয়া দিয়াছেন।

কাশীর বিবেকবরের মন্দিরে অমর ও সুরমার এই অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য্য সাক্ষাতে লেখিকা কতকটা অলৌকিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। মনে হয় যেন, লেখিকা অমর ও সুরমার হৃদয়কেও এই ভায়গায় একটা অলৌকিক শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন। বিবেকবরের মন্দিরের এই ঘটনাই “দিদি” উপন্যাসের গতিকে হঠাৎ নূতন পথে গতি দান করিল। সুরমা যখন তাহার ভাবের চক্ষে গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না, তখন যেন সে একটা আশ্চর্য্য শক্তিতে তাহার ভুলটা বুঝিতে পারিল। বিবেকবরের পাদপদ্মে যখন সুরমা তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে উৎসর্গ করিয়া, আরতি আস্তে প্রণাম করিতে বাইবে, চক্ষু মেলিয়া সে দেখিল সম্মুখে অমর। পট্টবাসে ধিবার বেশে সুরমা; সংসারী সম্মুখে অমরনাথ। দুইজনেই মনে শান্তি পাইবার জন্য বিবেকবরের মন্দিরে আসিয়াছিল এবং দুইজনেই হৃদয়ের আরাধাকে নিঃশেষে দেখিলেও, সুরমার শুধু চৈতন্য হইল, অমরনাথের নহে। অমর অত বড় একটা শিক্ষিত বুবা, সে কি জানে না যে তাহার কণ্ঠব্যক্তি। এবং সুরমাও কি বুঝিত না যে, তাহার ভক্তি বস্তুর। যদি তাহারা পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রীরূপে পাইতে চাহে তবে সেই পথে সুরমার যে বাধা, তাহা তা সে নিজের সাধনা দ্বারা জয় করিতে পারিত। অমরনাথও কি তাহার হারানো শক্তিকে আবার লাভ করিবার একেবারে অল্পপথ ছিল? মানুষের এই হারানো শক্তিকে এমন অলৌকিকতা দ্বারা সচেতন করানো, নিদ্রিত রাজকুমারী সোনার কাটির স্পর্শ জাগরণের কথা মনে করিয়া দেয়। এই সোনার কাটির স্পর্শ সুরমা যেন এতটা আশ্চর্য্য এবং অস্বস্তি শক্তিতে একমুহূর্তে লাভ করিল। সুরমা যে পথে বাইতেছিল তাহা

কুল হইলেও তাহা সুরমার স্বাধীন বিচার-গ্রন্থত। তাহার সেই বিনিমুক্ত, স্বাধীন বিচার বুদ্ধি, তাহার নারীজগৎকে কঠিন সাধনাকে একমুহূর্তে খুইয়া মুছিয়া দিয়া, প্রেমের এই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ, তাহার নিজস্বকে, তাহার “আমি”কে কি একেবারে বি-ষ্ট করিতে পারিল?—এই সুরমা কি সেই “দিদি” সুরম যে উমাংকে উপদেশ দিয়াছিল? যে প্রকাশের জীবন মন্দির সহিত জোর করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সুদৃঢ় কর্তব্যের পরিচয় দিতে একদিন গিয়াছিল? যে, জীবনের দারুণ শেকড় পর্বতের মত অটল ও অবিকলিত থাকিতে পারিয়াছিল? লেখিকা কি ইহাই বলিতে চান যে, যে হিন্দুরাণী জীবিত স্বামীকে সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সেই প্রেমকে সিদ্ধির জন্য অর্পণ করিতে চান—সে হিন্দুরাণীরও হৃদয়ে যথার্থ শক্তি নাই, সাধনার তেজ তাঁহাতেও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে নাই? সুরমা যদি নিজের মনে কর্তব্য বলিয়া অমরের কাছে প্রণাম করিতে যাইত তবে সুরমার সমস্ত সাধনা সফলতর মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিত কিন্তু এই অলৌকিকতা দ্বারা সুরমার এত বড় কঠিন সাধনা, এত কঠিন মনন শক্তি লেখিকা এমন করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন!

কাশীর মন্দিরের সাক্ষাতের পর, সুরমা অমরের কাছে গিয়া ধরা দিল এবং অমরও তাহা স্বীকার করিয়া লইল এই সত্যটি খুবই সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুরমাকে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে টানিয়া আনিয়া লেখিকা সুরমার দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। কারণ এই মিলন আমাদের মনে হয় যেন বহিরের একটা আশ্চর্য্য শক্তিতে ষটিল, যে শক্তির উপর সুরমারও হাত নাহি, অমরনাথেরও তথৈবচ। যে সুরমার এত তেজ, এত জ্ঞান, এত আভিমান, এত সংঘম সেও কি পরিশেষে নিজেই অলৌকিকতার ধাঁপিয়া গেল?

অমরের কাছে সুরমার এই পরাজয় আমরা আশা করিয়াছিলাম কিন্তু অন্যরূপে,—সুরমার আপন সাধনার পথে। যা হোক, সুরমা প্রেমকে যখন যথার্থরূপে দেখিল তখন অমরনাথকে কহিল “নারীর দর্প, তেজ, অভিমানে কিছু নাই, আছে কেবল—” তখন সুরমা সমগ্র ভারত রমণীর কথাকেই বলিয়াছিল। ভারতের দূসর গেকরা-বাসের সঙ্গে সঙ্গেই যে পার্শ্ববর্তী শ্যামাঞ্চল শোভিত! কঠিন সাধনার মধ্যেই, শক্তি ও সিদ্ধি পূর্ণকুন্তের ন্যায় ভারতের লক্ষ কোটি নরনারীর তৃষ্ণা বিদূরিত করিতেছে। সুরমা একদিন নিজেকে একমুহূর্তে সেই কাঠিন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভাবিয়াছিল, অমরকে কহা সে কিছুতেই করিবে না। তাহার সিদ্ধি সে একদিন পাইলই। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যে দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া সে আরতি অশ্রু প্রণাম করিতে যাইতেছিল, সেই পরম দেবতাই সুরমার সাধনার সফলতা প্রদান করিলেন।

সুরমা চরিত্রে কাঠিন্যের এই আদর্শ থাকিলেও তাহা সমভাবে ছুটিয়া উঠে নাই এবং অপরাধে সে নিজের চরিত্র দিয়া আকর্ষণ করিতে পারিত না। উমাকে সে জোর করিয়াই প্রকাশের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সে কি এমন কোনো আদর্শই ধরিতে পারিল না, যাহা দ্বারা তাহারা নিজেরাই সত্যের সন্ধান হইতে পারে? সুরমাকে কিনা তাহার নিজের ধর্মটাকেই অপরের কাছে preach করিতে হইল? এই জন্যই মনে হয়, সুরমার সমস্ত সাধনাটা একটা ভুল পথে বেগমান ছিল এবং তাহাই যে সত্য তাহা লেখিকা পরে দেখাইয়াছেন। সুরমার সাধন-পথ যে ভুল, তাহা প্রকাশ দৃঢ়ভাবেই একবার সুরমাকে বলিয়াছিল। সুরমা যদি যথার্থ-পথে যাইত তবে প্রকাশ তাহার মুখের উপর বলিতে সাহস করিত না যে;—“সকলে তোমার মত নর সুরমা—তুমি সব পার।” কেন পার তাও বলতে পারি। তুমি কখন সে বিষের আশ্বাদ জ্ঞান নি—তুমি জেনেছ কেবল, আবেগহীন শুদ্ধ দয়া আর মায়া; আর কর্তব্যোত্তর্য অহঙ্কারপূর্ণ দৃঢ় অভিমান। তুমি এ ছাড়া আর কিছু

জাননি, তাই এমন হাতে পেরেছ। যাক—যা হবার তাত' হয়ে গেছে, আর ফিরবে না। এখন মন্দা কিসে ফেরে বল। সে আমার সুখী দেখে নি বলে মরতেও প্রস্তুত নয়,—আমি যেন সত্যই তাকে সেই মৃত্যুর কোণেই না ঠেলে দি! বল কিসে সে ফিরবে?”

পুরুষের নিকট হইতেও যে সুরমা এমনভাবে তিরস্কৃত হইল পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারেন সেই সুরমার ক্ষমার কতদূর কঠিন ছিল অথচ পেমহীন ছিল না। প্রকাশ সুরমার কাছে হার মানিয়া বলিয়াছিল “ক্ষমা কর, সুরমা ক্ষমা কর।” কিন্তু সুরমা ক্ষমা করিল না। সুরমা উমাকে প্রকাশের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সুরমা ছাড়া আর কাহারো নিকট হইতে প্রকাশ মন্দাকে পিবাহকরূপে প্রাপ্তিকৃতকে বহন করিতে পারিত না। প্রকাশের গুরু সুরমা পরিশেষে এমন একটা দৃষ্টান্তভাবে অমরনাথের চরণে প্রণাম করিতে বাধ্য হইতেও পারিল দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য লাগিতে পারে কিন্তু অমরের উপর সুরমা কঠিন শক্তি দ্বারা বিভ্রমণী হইলেও তখনো সে রমণী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদ্ধতা, আভমানিনী সুরমার অমরের উপর জয়যাত্রী দিয়া ইংরাজি নভেল হইলে উহা তাহার চরম পিণ্ডাত হইত কিন্তু লেখিকা পরিশেষে সুরমার দর্পকে চূর্ণ করিলেন ও তাহাকে প্রেমে অভিযুক্ত করিয়া দিলেন। সুরমার কঠিন স্বভাবের এই পেননাভিমেক কাহার নিবেদনের মন্দিরের অরাত অশ্রু এক মুহূর্ত্তে হইয়া গেল। সুরমা অতঃপর রমণীয় হইল, রমণী হইয়া উঠিল। সুরমা তখন কোন্ প্রদীপ হইতে স্নিক্তরসিকালে অমরকে উজ্জ্বল করিয়া দিল—অমর মনা হইল। সুরমাও কঠিন সাধনার সিদ্ধি পাইল।

আর একটি কথা বলিয়া আলোচনা শেষ করিব। সুরমার জীবন পরিবর্ত্তন প্রকাশ ও উমা উভয়েই বর্ণিত সাহায্য করিয়াছিল। বলিতে গেলে তাহারই সুরমার পথকে দিরাইল; কোনো অলৌকিক শক্তি দ্বারা অভিভূত সুরমা মন্ত্র চালিতের ন্যায় নিজের সাধনার পথ পরিবর্ত্তন করিল। প্রকাশের স্বপ্নময়ের দর্পণে, সুরমা নিজের যে বাস্তব কাঠন্যের প্রতিচ্ছবি দেখায় তাহা হইয়া উঠিয়াছিল তাহা লেখিকা একস্থানে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা নিজে লেখিকার সেই লিপি উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

“প্রকাশ যাহা বলিল তাহা কি সত্য? সত্যই তাহার (সুরমার) আর কিছু নাই, আছে কেবল অহঙ্কার আর অভিমান? সত্যই কি তাহার কিছুই নাই? তবে কিসের এ জ্বালা-যাহা অনিবার্য্য রাবণের চিতার মত ধীরে ধীরে আজ কত বৎসর হইতে অলিতে আরম্ভ করিয়াছে? প্রথম প্রথম তাহার দাসিকা শক্তি তত অল্পভূত হয় নাই, কিন্তু তারপর? সেই কাণীর আগানের মতই যে কেবল জ্বল রব। এ কি অগ্নি তাহা বুঝা বড় কঠিন। প্রকাশ যাহা তাহাতে (সুরমাতে) নাহ বলিল,—প্রেম যার নাম—সে বস্তু কি এমনই অগ্নিময়? তাহা কি শাস্ত্র সিন্ধু দীপ্ত বারিপূর্ণ প্রভাতের জাহ্নবী-স্রোতের মত অনাবিল অনাবর্ত্তিত্ব দীর শাস্তিময় নয়? সে যে জীবনে কখনো একদিনের নিমিত্তও এ ধারায় অভিযুক্ত হয় নাই! কোথা হহতে হইবে? কে দিবে? শৈশব হইতেই যে তাহার জীবন মরুভূমি। মরু-বালুকায় যে সেই স্রোত-সর্পস্র প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব। দেহ প্রাণদ প্রেমকে সে কখনো চিনে নাই, তাই চিরদিন তাহাকে মর্যাদাকা বলিয়া উপহাস করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বনাথ একদিন তাহার সম্মুখে এই প্রেমমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিগেন কিন্তু সে চিনে নাই; প্রণাম করিতে জ্ঞানে নাই। চিনিব কিরূপে—সে যে চিরদিন অন্ধ! (দিদি, ৪০১ পৃষ্ঠা)

উমা ও মন্দাকিনীর কথা লেখিকা ছই একস্থানে উল্লেখ করিয়া তাহাদের বিসর্জন দিয়াছেন। “শকুন্তলা”র অল্পহুয়া ও প্রিয়বদার নায় “দিদি-”র এই উমা ও মন্দাকিনী আমাদের কাছে দেখা দিয়াই পলাইয়া গেছে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

## তাজমহল ।



সাজ্জাহার প্রিয়তমা

ওগো রাণি ওগো মমতাজ !

মরণের পারে গিয়ে

পরেছ কি অমরের সাজ ?

অন্দের অন্ধতাকে

খর্ব্ব দেখি করেছ গো আজ

সূর্য্য যারে স্পর্শে নাই

তারো দেখি ভেঙে গেছে লাজ !

পাথরের গুণনেতে ঢাকা তুমি রাখনি সরস

প্রকাশিছ শতকণ্ঠে যেন শত প্রণয়ী মরম !

\* \* \* \*

ধরণীর স্নায়ামল করপর্ণপুটে

শিশিরের মত তুমি আছ সদা ফুটে

দিতেছ বিলায়ে হেন প্রেম কণিকায়

যুগে যুগে জনে জনে অকাতরে হায় !

ধরণীর সেরা ধন

পুষ্পতির চারু-কারু-কাজ

মর্ম্মরে মর্ম্মরি

মরণের গীতি গাহে তাজ !

\* \* \* \*

ওগো মমতাজ !

আজি তোর নাহি কোন লাজ ।

কোমল হৃদয়ে আর কঠোর প্রস্তুরে

অরমের লেখা তব হয়েছে মর্ম্মরে

এই তব সাজ

লুকাতে নারিবে কভু যুগ যুগান্তরে

লুকানো যা ছিলে রাণি রাজার অন্দরে

সবি দেখি তাজ

ঘোমটার বাহিরেতে আজ—

গোপন প্রণয় কথা—হৃদয়ের বাণী

রাজরাজেশ্বরী প্রেম ! অনন্দের রাণী ।

\* \* \* \*

ওগো মমতাজ

( আজি তব নাহি কোন লাজ )

বরষায় করে জল জোছনায় সুখা

ধরণীর ঋতু তব মিটাইছে ক্ষুধা

সাজ পেশোয়াজ

আজ তব নাহি কাজ ;

নানা ফুলে ফলে

শিশিরের মণিমালা তারা স্নলমলে

সদা তোরে তাজ

সাজাইছে ; দেখাইছে । সমস্ত জগৎ

দেখে আজি শিখিতেছে প্রণয় মহৎ

শুভক্ষণে তাজ

প্রণয় ধরম তরে তব প্রাণনাথ

তব নামে রেখে গেছে চির সাথে সাথ ।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত ।

## কামাখ্যাধাম দর্শন ;

—:~:—

কর্মান্বয়ের প্রবল টানে সেদিন হিমালয়ের প্রান্তবর্তী বঙ্গের একমাত্র করদমিত্র হিন্দুরাজ্য কোচবিহারে কর্ণ লইয়া আসিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীকামাখ্যার পবিত্রধাম দর্শনের বাসনা বড়ই বলবতী হইয়াছিল । বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে পূর্বাহ্ন ১১টার গাড়ীতে মাতৃধাম কামাখ্যাধাম দর্শনান্ভিলানে যাত্রা করিলাম । পথিমধ্যে আসাম গৌরীপুরের রাজকুমারের অভিভাবক অধ্যাপক মাতৃভক্ত সন্তান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ও আমার ভূতপূর্ব কতিপয় স্নেহাস্পদ ছাত্রের সাদর আহ্বান মক্ষা করিতে তিনদিন অপেক্ষা করিতে হইল । সেই তিনদিন বিশেষ আনন্দের অতিবাহিত হইয়া গেল । কারণ আশুবার

মত উদার ধর্মোন্মত্ত ভক্তের সঙ্গলাভ, প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দের প্রীতিময় সহবাস, জগন্নাথ রাজদর্শন, ও সুযোগ্য রাজমন্ত্রী সহিত সন্মিলন; একসঙ্গে এতগুলি শুভ সংযোগ মানুষ দীন ব্যক্তির পক্ষে বড়ই মৌভাগ্যের পরিচায়ক। বিশেষতঃ বিলাসপ্রধান এই বিংশশতাব্দীতে গৌরীপুরের প্রিয়দর্শন রাজাবাহাদুরের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি, স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুস্তকক্ষেত্র মুক্তহস্ততা, এবং গীতবাদ্যো পারদর্শিতা, উহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃত্তিভোগী হিন্দুস্থানী ওস্তাদ রফা, প্রজাসাধারণ ও আশঙ্কক অভাগতের সহিত অবাধ সাক্ষাৎকার এবং সদয় কথোপকথন, আর সর্বোপরি বহুবিভবশালী নরপতি হইয়াও অনাড়ম্বর জীবন বাপন প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুরাজগুণগুলি আমরা অন্যত্র বিরল-দর্শন বলিয়াই মনে করি। ইংগারা পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ। বহুপূর্বে ইংগার কোন পূর্বপুরুষ কার্যতঃ আসাম অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তদবধি এ স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। আমি প্রাচ্য প্রথামত তাঁহাকে নিম্নোক্ত শ্লোকে আশীর্বাদ করিলাম।

বিদ্যা বিনয় সৌজন্য কৌর্টিচারিত্র মণ্ডিতঃ।

শ্রীমৎ প্রভাতচন্দ্র স্বং বিজয় স্ব নিরন্তরং ॥

বিনয়ের খনি নরমণিও অবনতশীর্ষে প্রাক্ষণের আশঙ্কান্বিত স্বীকার করিলেন। অতঃপর আশুবাবুল বাসার তাঁহার অভ্যাসমত ত্রিগুহ পাঠ ও সন্ধীর্ষ্টনানন্দে দিন ত্রয় সানন্দে কাটাওয়া দিয়া গম্ভ্যব্যাপ্য অবলম্বন করিলাম। পরদিন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ৭টার সময় গৌহাটীপানী মেলে চড়িয়া মধ্যাহ্ন ১২টার সময় আমিনগাঁও স্টেশনে পৌঁছিলাম। গাড়ী এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় কত কত নদ নদী পাহাড় পর্বত পশ্চাতে ফেলিয়া স্বাভিমত স্থলে উপনীত হইল। মধ্যে মধ্যে অল্পভেদী গিনিগুস্ অন্তঃ নানিময় জাকাশের গাত্রে স্বীয় গাত্র মিশাইয়া ভুলোক, ছালোকের সংযোগ স্থলে শান্ত নরের অনন্ত নরোত্তমের সাত্ত্বিক রূপে মিলন ও সাগুণ্য লাভ ঘটনা থাকে তাঁহার সঙ্কেত করিতেছে। কোথাও কোথাও বা দ্বন্দ্বকোলাহলময় সংসার হইতে কিয়ৎকাল নীরব নিস্তক শান্ত স্বিধ্ব বিজন বনে নিভৃত বিহার সুখ কামনায় প্রকৃতি যেন নিবিড় অরণ্যানী সফল স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিরল জনপদ আসামের এই অঞ্চলে লোক সংঘট্টব তেমন কোন ঘটা দেখিলাম না। মধ্যে মধ্যে বোধ হয় হাটের জন্য দু'দশজন পাহাড়িয়া দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কোথাও বা সরলা মাঁওতালবালা আকর্ণদীর্ঘ তৃণতন্তুর অন্তরালে দাঁড়াইয়া বনচারিণী হরিণীর ন্যায় অভিরাম জীবন্তী সহকারে ক্রান্তম কটাক্ষ বজ্রিত সরল দৃষ্টিপাতে আরোহণের মনে কবিবর ওয়ার্ডগওয়ার্ণের হাইগ্যাণ্ড বাসী তরুণীবৃন্দের বর্ণনা, 'For never saw I mien or face.'

In which more plainly I could trace ;" ইত্যাদি মধুনয়ী কবিতার সুমধুর ভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। গাড়ী আমিনগাঁও স্টেশনে পৌঁছিলে আরোহণ অবতরণ করিয়া ষ্টামার যোগে নীলাচল পাদবাহী তরঙ্গভঙ্গসঙ্কুল সুপ্রসঙ্গ ব্রহ্মপুত্র পার হইবার জন্য প্রস্তুত সহকারে স্ব স্ব দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া হাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে কামাখ্যাদেবীর রূপমাতে পাণ্ডা ব্রাহ্মগণ যাত্রী ধরিবার বা আত্মার্থনা করিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশে, সমবেত হিন্দেন। ইংগারা সকলে গৌরান্দ, সভ্য পরিচ্ছদসম্পন্ন ও পুষ্পমণ্ডিত শিখাধারী। ক্ষুধাত্তের আহাৰ্য্য দর্শনের ন্যায় দেবীর বরপুত্র পাণ্ডাগণ যাত্রীগণকে দেখিয়া ললবাস্তে যিনি বাহাকে পান, তাঁহাকে বংশ পরম্পরায় "বজ্রমান" করিতে উদ্যত হইলেন। অপরাপর ভীর্ণ পাণ্ডার ন্যায় বাবসারী হইলেও ইংগারা একেবারে "কশাই" পাণ্ডা নহেন। ইংগারের সহিত আলাপে ও ব্যবহারে বুঝিলাম, ইংগারা "খার বুঝিয়া কোণ" মাঝিয়া থাকেন; অর্থাৎ যাত্রীর অবস্থা বুঝিয়া—

প্রণামীর ব্যবস্থা করেন। সুখের-বিষয় পূর্ক হইতেই একটি শিষ্ট পাণ্ডার নাম (শ্রীযুক্ত শান্তিরাম শর্মা) সংগ্রহ করায় এই যাত্রীধরা বিভ্রাটে আমাকে বড় বেগ পাইতে হয় নাই। ছ'একজন্যর নিকট একটু আধটু কৈফিয়ৎ দিবার পরই উক্ত শান্তিরামের কিশোর বয়স্ক ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ ধর্মদাস আমার নিকটবর্তী হইয়া তাহার স্মৃতি সজ্ঞায়ণে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন। লেখা বাহুলা, এই সুদর্শন লাক্ষণবালক তাঁহাদের অবস্থানসমারে আমার তথায় অবস্থান, দর্শন, ভোজন ও পূজনাদির—যেব্যপ্ত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে পৌঁছিলে ধর্মদাসের কথামত গাড়ী কামাখ্যা দেশে পৌঁছিতে কক্ষিৎ বিলম্ব হইবে বুঝিয়া উহার সহিত পাণ্ডু বাট হইতে পদব্রজে কামাখ্যা শৈল আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কাঠার মধ্যাহ্নের গ্রন্থর রৌদ্রে প্রায় দুইমাইল প্রস্তর কঙ্করনয় বন্ধুর অনভ্যস্ত শৈলপথ অতিক্রম করিতে বিন্দ্রি, অক্লান্ত, অবশিষ্ট, লাক্ষণের যেব্যপ্ত কষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে “কষ্টে নহিলে কষ্টে নহিলে” এই প্রাচীন প্রবচনের তাৎপর্য্য বেশ জ্বলন্ত হইয়াছে। অগ্রণামী পথপ্রদর্শক ধর্মদাসের অকুইবিক্রিয়াজ্ঞক নিবেদন সত্ত্বেও ক্লান্তি ও অবসাদ বিনোদনের জন্য পথিমধ্যে একাদিক বার বিশ্রামান্তে অপরাহ্ন তিনটার সময় আত্মদম্বিরের বহির্দ্বারোপান্তে উপস্থিত হইলাম। একপ ক্রিষ্ট অবস্থাতেও তথার উঁচাটান পাণ্ডার নাম ধাম ও বংশাবলি পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। তথা হইতে শান্ত ও প্রণামত পাণ্ডাভক্তে দেবীবাড়ী অতিক্রম করিয়া পাণ্ডা মহাশয়দের নিবাস পরীতে দারুময় এক দ্বিওল গৃহে আশ্রয় লাভ করিলাম। তাঁহাদের আগ্রহ সত্ত্বেও সৌন্দর্য্য দেবী দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। মাতৃমন্দিরের অবাবহিত উত্তর দিকস্থিত শৈলসমূহাবর ‘সৌভাগ্য কুণ্ডে’ স্নান করিয়া তাঁহাদের পাঠিত তর্পণ মন্ত্রে উদ্ধাধঃ একবিংশতি পুরুষের মস্তান্তর সন্ধান পাইয়া ক্লান্ত হইলাম। অনন্তর যথালক্ষ্য আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সর্বসম্প্রদায়হারিণী নিদা মহাচারণী স্তবনয়ী শয্যার কোণে বিপ্রাম ভাঙ করিলাম; বিশ্রামান্তে ইত্যন্তঃ একটু ভ্রমণ করিয়া সাংস্কৃত্যাদি সমাপন পূর্বক নৈশ ভোজন সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। পরদিন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, শৌচাদির পর প্রাতঃস্নানান্তে পাণ্ডা ঠাকুরের দ্বারা দেবীর পূজোপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ হইলে বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই সময় মনের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এখন আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কারণ আজন্ম যদি কেহ হৃদয়ের অন্ততলে অদৃষ্টপূর্ব প্রিয় দর্শনের প্রবল আশা পোষণ করেন, আর শুভাদৃষ্ট ক্রমে যদি তাহার ঐ আশা কোন দিন ফলবতী হয়, তাহা হইলে সে সময় ঐ প্রিয়দর্শীর মনে কি অপূর্ব ভাবের উদয় হয় উহা অপরকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা অদ্যাপি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। পরে পাণ্ডাঠাকুরের আদেশমত যথাক্রমে মায়ে ও মন্দিরস্থ অন্যান্য দেবীর অর্চনা, মন্দিরভিত্তিপোদিত দেবদেবী এবং মহাপুরুষগণের মূর্ত্তি দীপালোকের সাহায্যে দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে কোচবিহার রাজবংশের পূর্বতন তুইজন মহাপুরুষ পূর্বকালে দেবীর ভগ্ন মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়া মায়ের অপার রূপায় সশরীরে সাগোকা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষনিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান দেখিলাম। তাহার ক্ষণভঙ্গুর ভৌতিক দেহভাগ করিলেও কীর্ত্তিময় দার্শনিক মূর্ত্তিতে মাতৃভক্তসম্মানরূপে মায়ের শ্রীমন্দিরে সন্মানলভে বিরাজ করিতেছেন। আমি ইহাদেরই কুলপ্রদীপ কোচবিহার মহারাজাধিরাজের বৃত্তিভোগী সামান্য কৰ্ম্মচারী বলিয়া কামরূপথগুর অথবা অথগু ব্রহ্মের শিরোরত্ন স্থানীয় কোচবিহার রাজবংশের এই কাণবিজয়িনী কীর্ত্তিচিহ্ন নেত্রগোচর করিয়া মনে মনে বড়ই সগর্ভ গোঁরব অনুভব করিলাম। অনন্তর যথাবিধি শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ৮ কামাখ্যা তীর্থে বিশিষ্ট ফলপ্রদ কুমারী পুজাদিতে মধ্যাহ্ন অতিত হওয়ার বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে



৮ কামাখ্যা দেবীর যোগিনীবর্ণ কালীতারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার পীঠস্থান, কামেশ্বর মহাদেব, ভৈরবী কুণ্ড প্রমুখ ত্রৈলোক্য স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরী মন্দির সর্বোচ্চ শৈলশৃঙ্গে বিরাজিত। উহার উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে পাদবাহী ব্রহ্মপুত্রবক্ষে ভাসমান বাম্পদান ও নৌকাগুলিকে ছোট ছোট কলার “ডোকার” মত, দূরবর্তী শৈলশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বড়র নিকট ছোটর ঈদৃশ ছরবহা সর্বত্রই সমান এই প্রমাণ এখানেও প্রত্যক্ষগোচর হইল। এ স্থানে একটি হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী দেখিলাম। তিনি অপর একটি গৈরিক পরিহিত যুবক সন্ন্যাসীর সহিত হিন্দী ভাষায় ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করিতেছিলেন। মন দিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে একটু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হিন্দী ভারতী দেবীর অরূপাবশতঃ উহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। যতটুকু বুঝিলাম তাহাতে বেদ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে বলিয়া মনে হইল। সন্ন্যাসী মধ্যবয়স্ক, দাড়ি ও চসমাধারী। রূপার “আলবোলায়” তামাকু সেবন করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় সন্ন্যাসীটিকে উহার মর্ম বুঝাইয়া দিতেছিলেন। ইহার মূর্তিতে তেজস্বিতার লক্ষণ অস্বাভাবিক। “Application” প্রভৃতি দুইচারিটা কথার পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ইহার পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হইল। আমি দূরে হইতে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন কালে সন্ন্যাসীর আবাস কুঠীতে বিস্তৃত বায়ুচর্ম, ধূনী, মশারি আবৃত শয্যা দেখিয়া শৈল হইতে অবতরণ করিলাম। ৮ কামাখ্যাধামে হই একটি পীঠস্থান নিম্ন সর্বত্রই কোন মূর্তি দেখিলাম না। প্রণাম মন্দিরের প্রায় সকলগুলিরই শেখাংশে “যোনিস্মৃদেনমোহন্ততে” এই বাক্য সন্নিবেশিত। অবশ্য কালিকা পুরাণাদিতে এই মহাপীঠের উৎপত্তির যেরূপ বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে মূর্তি থাকিবার কোন যুক্তিবদ্ধ কারণ দেখা যায় না। মন্দির মধ্যস্থিত পীঠস্থান সমূহ কিঞ্চিৎ নিম্নভূমিহ ও অন্ধকারময়। অন্ততঃ আটদশটা ক্ষুদ্র আরতন প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিয়া আলোকের সাহায্যে ঐ সকল ধাম দর্শন করিতে হয়। কামরূপভূখণ্ডের তীর্থক্ষেত্রের ইহাও একটা বিশিষ্টতা যে, প্রায় সর্বত্রই প্রজ্জ্বলিত দীপ রক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি যে কয়টা ধাম দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, কোথাও ইহার বাতিক্রম দেখি নাই। এইরূপে সেদিন দিনমণি অন্তগত হইলে সাংস্কৃত্য আদি সারিয়া মায়ের আত্রিক দেখিলাম। পরে মন্দিরের পূর্বদিকবর্তী গৃহে পাণ্ডা মহাশয়গণ ও দুই চারিটা যাত্রী লইয়া একটি ছোটখাট সভায় কিছুকাল তীর্থ ও দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ে মৌখিক কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এই রূপে সেদিনের কার্য সমাপ্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলাম। পরদিন ৩২শে জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যবে প্রাতঃবানাদি সন্মাধ্য করিয়া শ্রীশ্রীউমানন্দভৈরব ও অশ্বকান্তা দর্শন ভিলামে গৌড়াতি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উমানন্দ পূর্বতটী ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। উহার চারিদিকে খরতর প্রবাহ প্রবহমান। নৌকা যোগে ঐ স্থান দর্শন করিতে হয়। যাত্রীদের জন্য নৌকার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত দেখিলাম না। এইজন্য “কাছারীর ঘাটে” অদেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘাটে প্রোট বয়স্ক গৌড়কান্তি বাক্সালী একটি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বিদ্যাচল হইতে কয়েকদিন মাত্র কামাখ্যায় আসিয়াছেন। তিনিও আমার ন্যায় উমানন্দদর্শনার্থী। কিছু পূর্বে ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। ভাবিলাম, পায়ে বাইতে হইলে সন্ন্যাসীরও আমাদের ন্যায় গৃহীর মত নৌকার দরকার হয়। ধনা কলিকাল! তোমার আমলে সব “এতাকার” হইবে ভনিয়াছি, ইহাই কি তাহার পূর্ব লক্ষণ? বাহা হউক, তিনি তো সন্ন্যাসী; সর্ব্বথ্যাগ করিয়া পারের আশায় ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; নৌকা একদিন মিলিবেই মিলিবে। এক্ষণে আমার উপায় কি? দেহরূপ অর্থ বল নাই, তাহাতে একাকী একখানি নৌকাভাড়া করিয়া বাসনা পূর্ণ

করি। অথচ পশুর গিরিজাম্বনের প্রয়াগের ন্যায় তীর্থ দর্শনের সাধটুকু পুরাপুরী বিদ্যমান। এইরূপ নানা চিন্তায় আন্দোলিত চিত্ত হইয়া বিমনাতাবে সম্মানী ঠাকুরের সহিত পারে বাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় বোধ হয়—

“কণমিহসজ্জন সঙ্গতি রেকা।  
ভবতি ভবান্বব তরণে নৌকা॥”

এই মহাবাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য, কণমাত্র সাধুসঙ্গের কলে জীবের সকল বাসনা কলবতী হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য যেন অন্তর্যামী ভগবান্ হু' একখান ইলিশ মৎস্যধারী মৎস্যজীবীদের “জেলে” ডিঙ্গি পাঠাইয়া দিলেন। অনেক দরদস্তরের পর শেষে একখানি আট আনার ভাড়া করিয়া—

“রাজেন্দ্র সঙ্গমে—

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দর্শনে”র—

নায় সাধুসঙ্গে উভাল-তরঙ্গ-সঞ্চল ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া উমানন্দধামে উপনীত হইলাম। তথায় প্রায় আধঘণ্টা থাকিয়া দর্শনাদি করিয়া নৌকাযোগে পুনরায় এ পারে আসিলাম। সাধু মহাত্মা গোহাটী সহরের মধ্যে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। আমি তথা হইতে ফিরিয়া স্টীমার যোগে অশ্রুক্রান্ত দর্শনান্তে পুনরায় “ডোঙ্গার” কুপার ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। ঐ দিবস রবিবার। গোহাটীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন। আমি পূর্ব্ব দিবস ঐ সভার জনপ্রিয় ও গবর্ণমেন্ট সমাদৃত সম্পাদক গোহাটীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সভায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করার তিনি সানন্দে উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের দ্বারায় যথারীতি শ্রোতৃ সমাগমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন রোদ্রে নানা স্থানে ঘুরাঘুরি করিয়া শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে, ও বহুদিন হইতে শ্রুত ঐ সভার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তৃপ্তি লাভের আশায় শরীরে না কুলাইলেও কেবল মনের ভোরে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার রোদ্রের উগ্রতা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে কামাখ্যা শৈল হইতে অবতরণ করিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে একমাইল ঘাপী শৈল হইতে নামিতে বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু উঠিবার সময় হীনবল ব্যক্তি সেরূপ আয়াস ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, যা যেন পাপভারগ্রস্ত তীর্থ যাত্রীকে তাঁহার পুণ্যধাম হইতে সরাইয়া দিবার মানসে অনায়াসে নামাইয়া দেন। সে পুনরায় তাঁহার ধামে উঠিতে চাহিলে “অধঃপতন কত সহজ, উত্থান কত কষ্ট সাধ্য” এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। সভায় আমার এটার সময় উপস্থিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ৫১০টার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারি নাই। পহুঁছিয়া দেখিলাম একজন কামরূপ প্রদেশীয় শ্রমের পণ্ডিত মহাশয় ব্যাসাসনে আসন গ্রহণ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-শিরোরত্ন শ্রীমদভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ পুরজ্ঞান উপাখ্যান বাখ্যা করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত পদস্থ ধর্ম্মপ্রাণ সদস্যের সমাগম হইয়াছে। ধর্ম্মসভার গৃহটী দারুণ। বহুবিধ মনোরম দৈব আলেখ্য বিলম্বিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত। নিন্দকতা, রম্যতা ও পবিত্রতার গুণ সম্মিলনে গৃহটী প্রকৃতই ধর্ম্মভাবে উদ্দীপন করিতেছিল। আমি তথায় প্রবেশ করিলামাত্র সময় অতীত হওয়ার সম্পাদক মহাশয় পাঠ স্থগিত রাখিবার ইঙ্গিত করিয়া পাঠকের আসন সরাইয়া তথায় কালোপযোগী বস্তুতার আসন “টেবিলের” আবির্ভাব করাইলেন। তিনি আমার কাণে কাণে আগমনের বিলম্ব হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া “We are anxiously waiting for you.” বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক কর্তব্য অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি অবিলম্বে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত “আত্মপ্রেম বা ভালবাসা” বিষয়ক দীর্ঘায়তন সম্বর্ত্তী বক্তব্যে পড়িয়া প্রায় দেড় ঘণ্টার

মধ্যেই স্বকর্তব্য নিঃশেষিত করিলাম। তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। অপরিচিত স্থানে অন্ধকারময় বিজন পর্বতে আরোহণ অতি কষ্ট সাধ্য হইবে বিবেচনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি তথা হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শৈলসোপান অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন সন্ধ্যার ছায়া পর্বতগাত্রসমুদায় পাদপ পল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া সোপানপথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বৃক্ষের অনিবিড়তা বশতঃ অন্ধকারের গাঢ়তা কিছু কম একূণ অবস্থায় একাকী পর্বত আরোহণ করিতে মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু নিরুপায় বিশেষতঃ নিরাশ্রয়, পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ী কিরূপা ঘাইতে না পারিলে আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের কোনই সংস্থান নাই। কাজেই সাহসে ভর করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাতৃনাম গরন পূর্বক উঠিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের প্রভাব অদ্ভুত, কিন্তু দয়া প্রত্যক্ষ ও অসীম। স্মরণে অন্ধকারের মধ্যে জনহীন রক্তুর পার্শ্বতাপণেও দেখিলাম, সবসময় ভগবতী গাভীগণ আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছেন। আমি অবিশ্বাসী ধর্ম্মাঙ্ক সংসারী মানব। গীতাময়ীর রাজ্যে নিয়ত কত যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না। তন্মাত্রেরীণ সংস্কার, সংসর্গ, শিক্ষা, দীক্ষাও প্রারম্ভের অদম্য প্রভাবে মন এতই বিকৃত ও কলুষিত যে জন্মি রাক্ষস বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজেকে খাট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভীত ও সঙ্কচিত হই। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্ম ভ্রমী প্রবন্ধে দেখিতে পাই, তরঙ্গ-কল্লোলমালিনী চকুলগ্নাবিনী ধনুনা তরঙ্গগীর পারগানী দৃষ্টিতে বহুদেবের অত্র অগ্রে এই মহামায়া কামাখ্যাই শিবাক্রমে পদপ্রদর্শিনী হইয়া গোতুলে স্বীয় প্রিয়তমাকে লইয়া গিয়া আনন্দনয়ণী হাট পতন করিয়াছিলেন। জানিনা, আজ তিনিই কিনা পানাগবাসিনী হইয়াও করুণাময়া সাক্ষাৎ ভগবতী গাভীরূপে নীলাচলযাত্রী তীর্থদর্শী পাথককুলকে আমার নায় প্রত্যহ পথ দেখাইয়া প্রধান লইয়া যান। মাতুলীলা রহস্যের এ জড়িল তত্ত্ব উদ্বেদ করিবে কে? আমি বাবন হইয়া চাঁদ পরিবার প্রয়াস জন সমাজে উপহাস্য হইবার সাহস রাখি না। ধীরতঃ তিনিই বুকাইবেন, আমি ব্যক্তিগত ঘটনার মত উল্লেখ করিলাম মাত্র। এইরূপ দেবীধামে ত্রিরাত্রী বাস করিয়া গত ১লা আষাঢ় বেলা প্রায় ১টার গাড়ীতে কামাখ্যা ষ্টেশনে উদ্দিয়া পরদিন ৯টার সময় স্বকল্পক্ষেত্র কচাবহায়ে ফিরিয়া স্বীয় পণকুটারে পুনরায় “যে তিনিরে সে তিনিরেই” ডুবলাম। সঙ্গী ও তথ্যবলের অভাবে বশিষ্ঠ শ্রম প্রকৃতি ত্রুটি ছরবর্তী পুণ্যক্ষেত্র দর্শন ভাগ্যে ঘটয়া উঠে নাই। প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। মা যদি জীবনে আর একবার এ অধম সন্তানকে কৃপা করিয়া দর্শন দেন, তাহা হইলে এ আশাও ফলবতী হইতে পারে। মায়ের রূপা ও মেহে সম্ভানের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না। এই রূপা লাভ করিতে ধনজন, শক্তিসামর্থ্য, কুলামান, বিদ্যাবুদ্ধি, কিছুই আবশ্যক নাই, চাই কেবল শ্রদ্ধাভক্তি। তাই আন্তভাবে মাতৃপদযুগলে নিরন্তর প্রার্থনা করি;—

নার্থ কামৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কামাখ্যে দেবি কাময়ে।

কেবলাং তব পাদাঙ্গে দেহি ভক্তি মকৈতবাং ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥

ঐনিত্যাগোপাল বিভাবিনোদ।

## বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ ।

—:~:—

সাহিত্য-তপোবনের কণ্টক আমরা, উনবিংশ শতাব্দীর একটা দ্রাব্য আদর্শের সংঘাত-জনিত কর্কশ বাদামুর্বদে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তপোবনের শান্তিকে ফুর করিতেছিলাম, সেই সময়ে বাঙ্গলার চারিদিক হইতে কি দারুণ হ হাক বের তপু শ্বাস আসিয়া আমাদের কাছে আসিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী অনেক দিন হইতেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনমতে জীবনধারণের জন্য, অতি কাহ্নক্বেশে যে একমুষ্টি অন্ন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে আজ তাহাও জুইতেছে না। বাঙ্গলার আজ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রতি গৃহে গৃহে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুধার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে; পুড়িতেছে—পুড়িবে, মরিতেছে—মরিবে। সোনার বাঙ্গা শ্মশান হইয়া যাইবে। কোটি কোটি বাঙ্গালী আজ ক্ষুধার তাড়নায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে—উর্দ্ধে—নিম্নে চারিদিকে ফাল্-ফাল করিয়া তাকাইতেছে, কে তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিবে? খাইতে না পাইলে যে মৃত্যু বাঁচেনা! ইহারা কাহার দ্বারে গিয়া হাত পাতিরে? রাজদ্বারে? শ্মশানে? কোথায় যাইবে?

অমাবসয়ার নিশীথনী,—অন্ধকারের অন্ধ,—এ শ্মশানে কে জাগে? একটা জাতি বহুদিন খাইতে না পাইয়া, যে জীর্ণ কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া আসিতেছিল, আজ আর সে তাহাও পারে না। অস্থিচর্মসার কোটি কোটি বৃদ্ধ পড়িয়া পড়িয়া পুঁকিতেছে, পতিপনকে কোনরকমে আধপেটা খাওয়াইয়া ঘরে ঘরে বাঙ্গলার গৃহলক্ষ্মীরা সমস্ত শ্রম অনাহারে খাওয়া চকের জন্য অঁচলে মুচিতেছে,—দুখ দুটিয়া কিছু বলিতেছে না, কেহ দেখিতেছে না,—কেহ জানিতেছে না,—দিনে দিনে শুকাইয়া মরিতেছে। এ শ্মশানে কেহ জাগে? কেহ জাগে না? একটা জাতি ক্ষুধার বদণায় ছটফট করিয়া মরিয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না? বলিবে অদৃষ্ট? কে গড়িয়াছে? কেহ কি ভাঙিতে পারে না? বলিবে তাহা ভাঙিয়াই দিয়াছে। কেহ কি গড়িতে পারে না?

বহুদিন বাঙ্গলার মানুষ জন্মে নাই। কিন্তু আরও দেৱী সহ্য হইবে না। এ যে যায় যায়। আকাশের উপর যদি ঈশ্বর থাক, বাঙ্গলা দেশকে একটা মানুষ ভিক্ষা দাও।

ইংরেজী কেরানের অর্থ-বিজ্ঞানের সব দরমুলাগুলি নিঃশেষে পড়িয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে তাতে মরিতেছে, এ সমস্তার উত্তর তাহাতে ত মিলে না। সহাই—এ—অ—দৃষ্ট।

বলিবে—অজন্মা হয়, অনাবৃষ্টি হয়,—এর প্রতিকার কে করিবে? বলিবে—জমির উৎপাদনের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, জমিতে সার দেওয়া হয় না, কৃষক ভাল চাষ করিতে জানে না,—সে দোষ কাহার? বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক অমিতব্যয়ী, কাজেই ধার করে, শোধ দিতে পারে না, সুদের দায়ে জমির শক্তি উড়িয়া যায়। বলিবে, বাঙ্গালী কৃষক জীর জন্ত রূপার পৈঁজা তৈয়ার করে, মাটিতে টাকা পুঁতিয়া রাখে, কাজেই না খাইয়া মরে। আরও যা যা বলিয়া আসিতেছে, এবং বলিতে চাও, তা সচি জানি। কিন্তু শুনিলে হয়ত বিশ্বাস করিবে না,—বোধ হয়, এ সকল কথাই উপরেও কিছু বেশী জানি। বলি না কেন? বলিতে দেও না। আর এ ত শুধু কথা কাটাকাটির ব্যাপার নয়। কথার মত কাজের ব্যবস্থা নাই, হইতে পার না, হইতে দেও না। যাহা কাজের কথা—তাহার পশ্চাতে যদি কাজ না থাকে, তবে সে হয় শুধু কথার কথা। তাহা বলিয়া লাভ কি? বাঙ্গলার নব্য ছায় লইয়া যে বিতণ্ডা

(Speculation) একদিন অনায়াসে চলিয়াছে, বাঙ্গলায় অর্থ নৈতিক সমস্তা লইয়া আজ তাহা চলিতে পারে না। কেন না, অর্থ-বিজ্ঞান—তা সে বাঙ্গালারই হউক, আয়লণ্ডেরই হউক, শুধু বিতণ্ডা (Speculation) নহে।

আমরা যাহার দেশের দুঃখ ও দুর্গতি লইয়া বক্তৃতা করি, তাঁহাদের মুখে সম্প্রতি বাঙ্গালার এই অর্থনৈতিক সমস্তার কত কল্পনা জন্মন ও বিতণ্ডা শুনিয়া শুনিয়া চরম হইয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা যৌত-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই এই দুর্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে,—শুনিয়াছি নাকি, জাতি ভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেই এই সমস্তার সমাধান হইবে,—শুনিয়াছি পাশ্চাত্য Industrialism এর দ্রাব্য আদর্শে বিভ্রান্ত না হইয়া কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রচলন করিতে হইবে, সস্তর ছাড়িয়া পরীবাসী হইতে হইবে, নূতন ছাড়িয়া সনাতনে ফিরিতে হইবে; ইত্যাদি।

কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কেন গেল, সে কণার উত্তর ইতিবৃত্ত মুখ লুকাই কেন? এত যে অগ্রকষ্ট, তব রাশি রাশি অল্পের বিদেশে রপ্তানী কেন? হেটাকা জাতি একদিন দার লহিয়াছিল, এই মুখের গ্রাস তাহার সুদ যোগ্য-বার জন্য পাঠাইতে হইবে? উত্তর। কিন্তু কত দিন? যাবৎ না এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটা—, কে জানে, কে বলিবে ভবিষ্যতে কি লেখা আছে?

আজ একটা জাতির মুখের গ্রাস, কি পাপে জানি না, বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি, জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, মরণোন্মত। এই অগ্রকষ্ট কে বলিতে পাবে, জাতির স্বভাবদগ্ধ শিথিল হইয়া পড়ে নাই? কে বলিতে পাবে, একটা প্রাচীন সভ্যতার উদ্বোধনকারিগণ ক্রমে পশুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে কি না? দেশের এ হেন অবস্থায়, সান্ত্বিত্যের কি ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়? ধর্ম যদি দাবণই করিতে না পারিল, তবে, সে ধর্ম কি? সমাজ যদি এই জাতীয় মুক্তার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিল, তবে স্বাতির আদেশ রঘুনন্দন দিলেও এবং সম্ভবদ্ব হইয়া তত দিন এত চাপে তাগা মানমা চলিয়াও যাহা কি?

এ কি মুক্ত? না হত্যা? না আত্মহত্যা?

‘নারায়ণ’—আঘাত।

## শ্রীযুক্ত রোমেন রোলাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথের পত্র।

করাসীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রোমেন রোলাণ্ড ও আমাদের কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মতোদয়ের মধ্যে সম্প্রতি যে পত্র বিনিময় ঘটয়াছে, তাহা বর্তমান জুলাই মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; নিয়ে তাহার সার সঙ্কলিত হইল।

রোলাণ্ড লিখিয়াছেন,—মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তির উপর প্রায় বিশ্বব্যাপী উৎপীড়ন ও দাসত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে,—কতিপয় স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিয়া মানব মনের সেই মহা অনিষ্টকারী দাসত্ব ভাব বিদূরিত করিতে লিখিল মানব সত্ত্বের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণায় কৃতসম্মত হইয়াছেন! আপনি কি অমুগ্রহ পূর্বক এই সত্ত্ব ঘোগদান করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিবেন? আমার বিশ্বাস—আপনার মতবাদ হইতে

আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন নহে,—মূলতঃ এক। আমরা হেনরী বারবেস, চিত্র-শিল্পী পল সিনে, ডাক্তার দেডারিক-ভ্যানুইডেন, অধ্যাপক জর্জ ফ্রি নিক্সি, হেন্‌রী ভ্যালম্‌য়ার ভেগ ও স্টিফেন জেউইগের সম্মতি লাভে কৃতার্থ হইয়াছি; এবং বাট্টাণ্ড রাসেল, সের্মা গেজার, আপটন্‌ সিন্‌ ক্রেয়াং, বেন্‌ড্রিটো ক্রোস প্রভৃতি মনীষীগণের সহায়কৃতি শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। আমাদের অভিলাষ—সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক দেশ হইতে প্রথমতঃ এক এক জন জ্ঞানবৃদ্ধ লেখক, কবি ও শিল্পীকে সদস্যরূপে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের স্বাক্ষর সম্বলিত ধোষণপত্র প্রত্যেক রাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্ঞানীর নিকট প্রেরণ করা। আপনি যদি ভারবর্ষের, জাপান ও চীন হইতে একরূপ কোন নাম সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমরা বিশেষ ভাবে বাধিত হইব। আমার আশা, ভারতীয় প্রতিভা ইউরোপীয় ভাব-রাজ্যে অচিরে স্বামী প্রভাব বিস্তার করিবে। প্রতীতি ও পাশ্চাত্যের আশা, ভারতীয় প্রতিভা ইউরোপীয় ভাব-রাজ্যে অচিরে স্বামী প্রভাব বিস্তার করিবে। এই সময়ের সাধন সংকল্পে আপনি অন্য অপেক্ষা বহু প্রবন্ধ বলবার প্রকাশ করায় আপনার প্রতি আমার আন্তরিক প্রশংসা অসীম। উপন্যাসে ইহা বলিলে অত্যাধিক হইবে না, আপনার জ্ঞান, মনীষা ও রচনাশৈলী আমার প্রশংসা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অঙ্গগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।

রোমেন রোল্যান্ড।

পুনশ্চ—

যুদ্ধ কালে আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে,—তাহার একটিতে আমার ১৯১৬ সনে টোকিও নগরে প্রদত্ত বক্তৃতার কতিপয় অংশ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। উহা প্রেরিত হইল, আপনার বাক্যের ফরাসী অনুবাদ স্পষ্ট হয় নাই। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও পাঠাইতেছি, উহা এমন একজন ইউরোপীয় মনীষীকে উৎসর্গ করিয়াছি যিনি আপনার ন্যায় আমার চিত্তরাজ্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, আপনিও তাঁহাকে পছন্দ করিবেন আশা! পুস্তিকার মর্ম—

হে আমাদের সহকামী একান্ত দাতব্য! আপনারা এই পঞ্চবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপদেশে নানা কার্যে নানা ভাবে বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আজ যুদ্ধ অবসানে সমস্ত বাধা বিঘ্ন মুক্ত হইয়া, আমরা আবার অধিকতর অনুরাগে, দৃঢ়তার সহিত আপনাদের সাহায্য দাবী করিতেছি, তাহা সর্ব্বত্ৰ ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

যুদ্ধ আমাদের পূর্ন দল বিছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! বহু জ্ঞানী তাঁহাদের জ্ঞান গবেষণা, কলা-কৌশল, বুদ্ধি বিবেচনা ও মানসিক শক্তি দ্বারা গবর্ণমেন্টের সেবা করিয়াছেন! আমরা মানুষের দুর্দলতা ও তুল্যরূপে সমষ্টি-শক্তির প্রভাব অবগত আছি,—অকস্মাৎ সমবেত শক্তির নিকট ব্যক্তিগতকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে; কারণ পূর্বে উহার প্রতিকার চেষ্টা আদর্শেই করা হয় নাই। এক্ষণে যে প্রতিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে লাভবান হইব।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে কিরূপ ভাবে মানবোচিত মানসিক বৃত্তিগুলিকে অবজ্ঞাত করিয়া পৃথিবীতে পশুবল কতদূর প্রাধান্য লাভ করিতেছে,—প্রাতিভাশালী ব্যক্তিগণ পর্যাপ্ত পশুবলের পদে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশে মনোযোগী হইয়াছেন—সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা। যে মহাব্যাধি ইউরোপীয়গণের দেহ ও আত্মাকে পীড়াগ্রস্ত পশু করিয়া ফেলিতেছে তাহার উগ্রতা বর্ধনে কবি ও শিল্পীগণ তাঁহাদের সমগ্র-শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাহারা আরও মানবিকতাকে অপমানিত কলুষিত করিতেছেন। পূরা কালের

ও আধুনিক ন্যায়, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা এই বিষেষ বহি প্রধুমিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, মনুষ্যের সচিৎ মনুষ্যের যে সম্ভাব ও আভাবিক প্রীতিবন্ধন তাহা ছিন্ন করিতে ইচ্ছা চেষ্টিত। • • • মহাসমরে তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার না করিলেও, সকলেই আপনাদের কুক্ষিতির বিসময় কল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর কেন! হে ভ্রাতৃবৃন্দ! জাগ্রত হউন, আসুন, আমরা আত্মাকে আমাদের অন্তরের গুপ্ত প্রদেশে নিহিত এই দাসত্ব কলঙ্ক, অপমান হইতে মুক্ত করিয়া দেই! আত্মা ত কাহারও দাস নহে, আমরাই আত্মার দাস—আত্মশক্তি বাতীত মানুষের অত্ম প্রভু আর কে থাকিতে পারে? (মোহ কেবল আমাদের অত্ম ভাবে আচ্ছন্ন করে।) • • • সত্যকে জীবনের ধ্রুব কর,—জীবনের অমানিশাতে—অশান্তির অন্ধকারে হে ভোগলিপ্সু ব্যক্তিগণ ধ্রুব নক্ষত্রে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হও!—মাৎস্যগণের এস্থান নহে—সমস্তই অসার, বর্জ্যনীয়। মানব—সত্যের সেবক, সত্য—স্ব ধীন, তাহার অভিযুক্তি অনন্ত,—সে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় কিছুই স্বীকার করে না। নিখিল মানবের অংশ,—সকলেই ভ্রাতা ভগিনী। এই বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব সূত্র ধরে উত্থান পতনের মধ্যে দিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে, আমরা বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বভাব জাগ্রত করিতে আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তর—

বিগত মহাসমরের মহোচ্চ আদর্শ নীতি বার্ষিক করিয়া জনসাধারণ কেবল ফ্রেঞ্চ ও বিদ্রোহকেই চিরন্তন করিবার চেষ্টায় সংসারকে দ্রুত ধ্বংসমুখে অগ্রসর করিতেছে দেখিয়া আমার মন যখন ধোরতর দুর্ভাবনার অন্ধকারে নিমজ্জিত এমন সময়ে আপনার পত্র আশার বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রাণিত করিল। সত্য-পক্ষই আমাদের জীবনরক্ষক—একথা অতি অল্প ব্যক্তিই উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছে;—উত্থাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে অনেকেই! যে বাতাই করুক, সত্য যে বার্ষিকতার মধ্যে দিয়াও পরিণামে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। কদর্যা স্বার্থকোলাহল মুগ্ধরিত রাষ্ট্রনৈতিক বাকবিত্তার মধ্যেও যে ইউরোপীয় অতি উচ্চ বিবেকবুদ্ধি, কতিপয় স্বাধীন আত্মাব ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে—ইহা আমার পক্ষে আশাভীত বারতা! নিখিলমানব আত্মার স্বাধীনতা বিঘোষণা পারিপন্থী সেই স্বাধীনচেতা মহাত্ম্য গণের আহ্বান বানন্দে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আমি তাঁহাদের দলভুক্ত হইলাম।



# পরিচাৱিকা

( নব পৰ্য্যায় )

“তে প্রাপ্তবাস্তু মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

ভাদ্র, ১৩২৬ সাল।

১০ম সংখ্যা।

## পল্লীর গৰ্ব।

—:~:—

মুখ গরিব গোয়ার ছেলে ফেলবো কোথায় থাকুক কাছে,  
বিধান এবং ধনাঢ্যেরা সহর পেয়ে ভুলেই আছে।  
পুত্র যে সব বিদেশ গেছে বিত্তা ধন ও জ্ঞানের আশে,  
অনিচ্ছাতে রয় যে দূরে, অন্তরে গ্রাম ভালই বাসে।  
কতক গেছে সখের পাছে স্নেহের আঁচে সহর তলে,  
হালকা ছেলের পলকা মাথা বিগ্নে দেছে কলের জলে।  
স্বদেশ-প্রেমিক, দেশের নেতা, ত্যাগ করেছেন ‘দেশের’ মায়ী,  
রাজোচ্চানের ‘পাইন’ তরু, পাইনে তাদের ফল কি ছায়া।  
ছড়ায় পাষণ-বজ্রোঁ তারা বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের আলো,  
বন্ধে আমার সাজবে কেন? ভয় ভিটায় প্রদীপ ভালো।  
কর্দম এবং ধানের ধূলা, রক্তন এবং ‘গোয়াল কাড়া’  
বোরা আমার কন্ঠা ধনীর কোন্ প্রাণেতে সইবে তারা।



নখর চিকণ শ্যামল শোভা, বসন্ত ফুলের মধুর স্রোতে  
 বর্ষা কালের বসন্ত জলের আতঙ্ক যে সদাই প্রাণে।  
 পিতার পিতার বাস্তু হেরি' হস্ত করেন নিত্য মাতি,  
 কুঁড়ের মাঝে সাজবে না যে ব্রহ্মদেশের শুভ্র হাতী।  
 সঙ্গে আনেন চাকর-বাকর বসন ভূষণ বচন রাশি,  
 বিরক্তি, আর রোগের ভীতি, বিদ্রূপ এবং ঘৃণার হাসি।  
 কর না গ্রামের দুখের কথা নিজের বড়াই নিয়েই রত,  
 পুঁথির বুলি আউরে চলে, সজীব গোমোক্ষোনের মত।  
 দিনেক থেকে বিরক্ত হয় সহর যেন পেলেই বাঁচে,  
 মূর্খ গোঁয়ার গরিব যারা রয় ত তারাই আমার কাছে।  
 দেশের 'বালাম' লওগো সহর, যা থাক আমার তাহাট সেনা  
 আমার থাকুক 'মড়াই' ভরে 'দুধ্‌কল্মা' ও আউস নোণ।  
 ফেলনো কোথায় আমার 'নোড়ো' রুম্ম হউক আমার 'তরা'  
 বর্ষা দিনের ভরসা আমার বিপুল ক্ষুধার সুধায় ভরা।  
 লও গো সহর কিয়ৎভাগ ও ন্যাংড়া ভাদুই ফজলি আগে  
 কাঁচমিঠা টক্‌ কদ্মে জোয়ান তারাই থাকুক আমার ভাগে।  
 তোমার থাকুক গোলাপ ক্রোটন অকিড এবং আইভি লতা  
 আমার থাকুক বকুল চাঁপা যুঁই জবা আর অপরাজিতা।  
 তোমার সালার্ড, টোমাটো বাট গাজর এবং কপির ফালি  
 আমার বেগুন কুমড়া ডাঁটা পুঁই কচু লাউ খেঁড়ের জালি।  
 তোমার ডেভিল কাটলেট কারি মটন চপেই পীযুষ চালে  
 গরিব আমার তৃপ্তি কেবল মাছের টক্‌ আর কলাই ডালে।  
 তোমার যে চাই গোলা, গজা, ভীমনাগ এবং ঢাকাই পুরী  
 আমার থাকুক মতির মিঠাই চাষের গুড় আর মুড়কী মুড়ি।  
 সহর তোমার ক্রান্তি হরক্‌ তাড়িত-পাখায় সোড়ার জলে  
 ঘাম যে আমার নিত্য মুছায় দখিন বাতাস গাছের তলে।  
 তোমার থাকুক ক্রিকেট টেনিস্‌ বিলিয়ার্ড এবং 'কারোম' খেলা  
 ছকা পঞ্জা দশপঁচিশেই কাটবে আমার অলস বেলা।  
 থাকুক তোমার ব্যাণ্ড 'লোবোর' ব্যাগপাইপ আর ভেঁপুর রাশি  
 আমার থাকুক রসানচৌকী, ডোল কাশি আর শানাই বাঁশি।

সিনামাতেই তুষ্ট তুমি, তপ্ত তুমি ডুয়েট শুনে,  
সন্ধ্যা আমার স্নেহেই কাটে হরিনাম আর রামায়ণে।  
ধনের রাজা, স্ত্রণের রাজা, সখের রাজা বটেই তুমি,  
কলের ফুলের ধানের গানের প্রাণের আমিই জন্মভূমি।

শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক।

## বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-গৌরব।

—:—:—

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারত ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় ভারতে বৌদ্ধ প্রাধান্যের কাল। সে যুগে ভারতে রাজশক্তি, ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা একাধারে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে অশোকের রাজগৌরব ও মর্ম্মনিষ্ঠার চেষ্টা, ভারতে বৈদেশিক পরিব্রাজক মেগেস্থেনিস ও টিউন সাহের আগমন, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মহা-মেলা সংস্থাপন ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপণ্ডিত শিলাদিত্যের অধ্যাপনার জ্ঞান বিস্তারের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা এককল বৌদ্ধ গৌরবের স্মৃতি আজিও সাধারণ পাঠকের মনে জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু সে যুগে ইহা অপেক্ষা যে গৌরবময় কার্য্য বৌদ্ধরাজগণের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা প্রচলিত ইতিহাসে প্রায়ই স্থান লাভ করে না। বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে জাতি বিভাগের চেষ্টা যে দৃঢ়তা ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগ যেরূপ বিশিষ্টতা লাভ করে, তাহা দেখিয়া বৌদ্ধযুগের রাজনীতিতে আপামর সাধারণের জন্য যে সকল উন্নত ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার আভাস লাভ করা কঠিন।

বৌদ্ধযুগের আখ্যান সকলে দেখা যায় যে কোনও এক ক্ষত্রিয় কুমার ক্রমে কুস্তকার, স্তম্ভধর, মালাকার, পাচক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সেবা করিয়াও জাতিচ্যুত হন নাই। অপর এক রাজপুত্র ভগিনীকে নিজ অংশ দান করিয়া ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও অখ্যাতিভাজন হন নাহ; মৈত্রিক ব্রাহ্মণ ব্যবসা দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া এবং অপর ব্রাহ্মণ এক ভীষ্মদ্বয়ের সহায়তা কার্য্যে এবং তৃতীয় ব্রাহ্মণ পুত্র শিকার ও চাকা নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও জাতি হারান নাই। প্রায়সঃই ব্রাহ্মণগণ কৃষিজীবী এবং গোপালক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহ ব্যাপারে জাতি বিভাগ স্থল বিশেষে প্রাধান্য সে যুগেই লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে বিবাহ অপ্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে যে সে যুগেও স্থাপিত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক এক অবিস্মৃত আখ্যাজাতি ভারতে কোনও যুগেই ছিল কিনা সন্দেহ। যেমন আইবিরিয়ান (Iberian) কেন্ট, সেক্সন, ডোনস্, নরম্যান্ জাতির মিশ্রনে এক ইংরাজ জাতি গঠিত, তেমনি ভারতে কেলারিয়ান, ড্রাবিড় ও আখ্যাজাতির সংমিশ্রনে এক নব জাতি প্রাচীন কালেই গঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই মিশ্র জাতির ভিতরে পরকালে শ্রেণীবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয়। আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য, খেত ও কৃক, লতা ও অলতার বর্ত্তমান পার্থক্য ও পরস্পর বিভিন্ন ভার সে যুগেও বা এত প্রকল ছিল তাহা বলা যায়।

না। ক্ষত্রিয় ও বিজিত আর্ঘ্যের মধ্যে যে বিবাহ ঘটে নাই : এমনও নহে। সর্বাঙ্গপেক্ষা বৈশ্বের কথা এই যে ব্রাহ্মণগণের কোথাও কোথাও নিম্ন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত তুলনার ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য যে বৌদ্ধযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক উচ্চস্থান লাভ উত্তর-ভারতে কোথাও ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদিগের লিখিত পুস্তকেও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের কাল বৌদ্ধযুগের পরেই নিশ্চিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী কুরু ও পাঞ্চালই সেকালের বরেন্দ্র স্থান। কাশী ও কোশল তখন নগণ্য। জৈন গ্রন্থ সকলে পুরোহিত জাতি রাজপুত্রের নিয়ে স্থান লাভ করে দেখা যায়। অপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের পালক ও পোষক। পুরোহিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ চরিত্রগুণে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহারা ইউরোপের মধ্যযুগের পৃথিবাদী আবট বা বিশপদিগের তায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের জাতিবিভাগ তৎকালীন ইটালী ও গ্রীশের জাতিবিভাগ হইতে শ্রেষ্ঠতর হয় নাই।

এ বিষয়ে ভাণ্ডারকারের ( Professor Bhandarker ) ভ্রাম্য পণ্ডিত ও উচ্চকুলজ ব্রাহ্মণের অভিমত গ্রামাণ্য-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার কোনও বিশেষ প্রবন্ধে লিপি সকলের লিখন হইতে যে সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ লোকের নিকট হইতে সেবোত্তর ভূমি ইত্যাদি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে ক্রমে ভূমিদান প্রচলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে শুষ্ঠ রাজগণের রাজত্ব কালে বহু ব্যয়সাধ্য যোগযজ্ঞ সকল এমন কি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃঃ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে কোনও ভূমি দানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্বে যে দান প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণকৃত পূজা ইত্যাদির জন্য প্রদত্ত হইবার প্রমাণ নাই।

যে সকল পরবর্তী কালের দানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার ভাষা সংস্কৃত তৎ পূর্বে পালিভাষায় লিখনে স্বেচ্ছা দানের বর্ণনা নাই। প্রফেসর ভাণ্ডারকার তাই লিখিয়াছেন “যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি ( খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী শেষ ) সে সময়ের মন্দির ও হনু্যাদিতে ব্রাহ্মণা ধর্মের কোনও চিহ্ন নাই। ব্রাহ্মণ জাতি তখনও ছিলেন কিন্তু তেমন প্রবল এবং সাধারণের ধর্ম উপদেষ্টা রূপে নহে কারণ রাজা হইতে সামান্য মজুর সকলেই সে সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল।”

ভাষা বিকাশের ইতিহাস আলোচনা দ্বারাও এই মতের পোষকতা হয়। সংস্কৃত ভাষা যে কালে প্রচলিত ভাষা মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করি। সে সময়ে ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১ম দ্রাবিড়, কোলিয়ারণ ও আর্য্য অধিবাসীদিগের ভাষা; ২য় স্তরে প্রাচীন বৈদিক ভাষা; ৩য় স্তরে আর্য্যজাতির উত্তর ভারতের প্রাকৃত ভাষা; ৪র্থ স্তরে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা; ৫ম স্তরে গান্ধার হইতে মগধ পর্যন্ত প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; ৬ষ্ঠ স্তরে কোশল প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষা ৭ম স্তরে মধ্য ভারতের প্রচলিত সাহিত্যিক পালি ভাষা; ৮ম স্তরে অশোকি প্রাকৃত ৯ম স্তরে অর্দ্ধ মগধ ১০ম স্তরে কেশ প্রাকৃত ১১ম স্তরে উচ্চ সাহিত্যিক সংস্কৃত ১২শ স্তরে ভারতের প্রচলিত ৫ম শতাব্দীর পরবর্তী প্রাকৃত ভাষা। পূর্ণরূপ ভাষার শ্রেণী হইতে দেখা যায় যে ভাষার কেন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিয়াছে। প্রথমে সে কেন্দ্র পাঞ্জাবে ছিল, তৎপর কোশল, তৎপর মগধ তৎপর সংস্কৃত ভাষা পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। লঙ্কার প্রাকৃত ভাষা বহুকাল আপনার স্বাভাব্য রক্ষা করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা পর সময়ে ধীরে ধীরে সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবা-ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতের কাকিপুর ও টাঞ্জুরে পালি ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন

চলিয়াছিল উত্তর ভারতেও ব্রাহ্মণ ধর্মের পূর্ণ জয়লাভ ও প্রতিষ্ঠা। কুমারিগ ভট্ট ও শঙ্করের কালের ( ৭০০—৮৩০ খ্রি:) পূর্বে ঘটে নাই। এই উত্তর প্রচারকই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী।

সে সময় যে ব্রাহ্মণ ধর্মের অভ্যাস হইল তাহা সকল প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান পরিহার করিল; কেবল অবৈত-  
শাসনের মতই তাহাতে স্থান পাইল বেদের ক্রিয়া কলাপ। আলোচনাও বিলীন হইল; প্রকৃতপক্ষে একটা  
সম্বন্ধের অভ্যুত্থান ঘটিল। রাজপুত ও ব্রাহ্মণ রাজা ও পুরোহিতে যে বিবাদ চলিতেছিল ইউরোপের পোল ও  
রাখার যুদ্ধের ন্যায়—তাহার মীমাংসা হইল। সাধারণ ব্রাহ্মণ ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধ-ভারতে পালি সাহিত্যের ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতের যে প্রচার ঘটয়াছিল তাহা কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষে  
আবদ্ধ ছিলনা। বৌদ্ধ-সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত থাকিলেও কোশল  
ঐতিহ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যের কেন্দ্রে জ্ঞান বিস্তারের কোনও নির্দিষ্ট সীমা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে  
সময়ে উক্ত শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরুষ ও নারী মধ্যে জ্ঞানালোচনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে লিখিত  
ভাষায় প্রচলন অল্পই হইয়াছিল অধিকাংশ বিষয়ই স্মৃতিশক্তির ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া আবৃত্তি ও  
আলোচনা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিতে হইত; কোনও কোনও বিষয়ে লিখিত বিবরণও সামান্যরূপে  
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক-সংস্কৃত উপনিষদের দর্শন হইতে উচ্চাঙ্গের না হইলেও তাহা  
যথেষ্ট মূল্যবান। খ্রী পূঃ ৩য় শতাব্দীতে নির্মিত বৌদ্ধ ধর্ম্মাদির গাত্রে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞাপক নক্সা অঙ্কিত দেখা  
যায় তাহাতে সে কালের পূর্বে যে বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; সে সাক্ষ্যে  
“ধর্ম্মকথিকা,” “পেটিকা,” “সুতানটিকা,” “সুতাস্তাবকিনী” শব্দের উল্লেখে বিবিধ বৌদ্ধ গ্রন্থ বুঝায়। কেবল তাহাই  
নহে রাজা আশোক তাহার ভব্রলিপিতে ( Bhabra edict ) বৌদ্ধ সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়া, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী  
এ সাধারণ নরনারী সকলকে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের বাক্য চিন্তা ও গালন করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে  
বৌদ্ধধর্ম্মের সকল শ্রেণীর নরনারীর জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের অধিকার স্বীকৃত দেখা যায়। বাস্তবিক বৌদ্ধরাজগণের  
শাসনে ভরতবর্ষে যে ধর্ম্মনৈতিক রাজশাসন ( Theocratic Government ) প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার  
ভিত্তি প্রজাসাধারণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধান। বর্তমান কালেও আংশিকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মানুগিণের  
সাধা সকল খ্রীমতী মিস্‌ডেভিস্‌ জায়াস সংগ্রহে ( Misses Dhys Davids ) যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে এবং  
খ্রীষ্টীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অনুবাদে ফেরীশাখা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধযুগের কেবল জাজ্ঞাতির  
উন্নতির যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গৌরবের এক অংশ।

বৌদ্ধযুগের অপর মহাগৌরবের বাহিরে, রাজশাসনে ধর্ম্ম অস্তরে নীতির শাসন দ্বারা—কবিকল্পিত নহে—  
কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মসিংগা, ধর্ম্মকলহ পরিশূনা শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। জীবনের গৌরব দানে তাগে সহিসুতার ও  
নীতি পালন এই বার্তা দেশময় প্রচারিত এবং লক্ষ লক্ষ জীবনে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ধর্ম্মনৈতিক শাসন  
যে জগতে স্থায়ী হয় না তাহা বৌদ্ধগৌরবের আসামের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে; অল্পসংখ্যক লোকই  
ঐক্যনীতির বহন সহ্য করিতে পারে, সাধারণের পক্ষে কেবল নীতির শাসনই যথেষ্ট নয়। বর্তমান ভারতে স্বাধীনতা  
শিক্ষাশূন্য ও বহুকাৰ্য্য হইতে দূরে গৃহে আবদ্ধ। বৌদ্ধ ভারতের উচ্চপদস্থা সেবারতা শত শত জ্ঞানবৃদ্ধা ক্ষেত্রী  
দিগের চিত্তখানি তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপ্ত করা যায় বিষয়ে মন পূর্ণ হইয়া যায়। প্রশ্ন করিতে হয়—এ জ্ঞান  
যোত কোথায় শুকাইয়া গেল। ভারতের সে গৌরবময় চিত্তখানির মত দ্বিতীয় একখানি চিত্র ভারত-ইতিহাসের  
কোনও যুগে অঙ্কিত করিবার সুযোগ আসে নাই। বুদ্ধ প্রাণ আজ ভারতে নাই—ইহাই ভারতে বিশেষ কতি।

শ্রীমুনীজনাথ রায়।

## দিন যায়, মাস যায় ;

—:~:—

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় চলে,  
বাদল আঁধার বুকে কখনো আঁচলে

সাজা পুষ্পরাশি

পূর্ণিমার হাসি

পড়ে আসি, পথ-ধোঁজা আকুল নয়নে  
তারার আখর আঁকা স্বপন চরণে,

তমসায় মিশি,

যায় সারা মিশি ;

দশদিশি জাগে যবে উষার ইঙ্গিতে  
বৈতালিক বিহঙ্গের আনন্দ সঙ্গীতে :

যেন পরশাসে,

আঁধি মুদে আসে,

তুষ্টি আশে ; জগতের জাগরণ গান

নিদ্রিত হৃদয় তার পায় না সন্ধান !

কোন দিন জেগে যদি ওঠে অসময়ে

মধ্য দিনে, লুপ্ত ছায়া মুখর আলয়ে

অসহ্য আহোকে

তবে এই লোকে

কোন চোখে, চাহিলে সে কিসের সন্ধান

অবারিত প্রচ্ছন্নীল আকাশের পানে !

যেথা কোন রেখা

লেখে নাই লেখা,

আলো একা অনিমেয় উদ্দীপ্ত নয়ান,

গুপ্ত কথা লয়ে ছায়া কোথায় প্রয়াণ !

তার চেয়ে ভালো এই মায়া কুহেলিকা,

কালো মেঘ আলো করা বিজুলির শিখা,

খুজিবার স্তম্ভ,  
পরান উৎসুক,  
রুদ্ধ বুক, যার ঘারে আসি ফিরে ফিরে  
আশা করে', মিনতির মৌন আঁখি নীরে !  
তার চেয়ে ভালো  
আধখানা আলো,  
যে "ফুরাল বলে" আমি চাই এত করে,  
ঘর ছাড়ি, যার লাগি' ফেরা ঘরে ঘরে ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

## দেবতা ।

— ৫:—

আজকাল তো আনাদের ঘরের পুরুষেরা প্রায় পনেরো আনার ভাগই বতনিয়ম কিছুই মানেন না অনেক আবার ঠাকুরদেবতা পর্য্যন্তও মানিতে চাহেন না । হুঁপাতা ইংরাজী বই মূখ্যস্ত করিয়া তাঁরা এই না-মানাটাই নিজেদের উন্নতি মনে করেন । কিন্তু মেয়েদের তো না মানিয়া উপায় নাই, তাঁরা এ ছত্র পুরুষদের হাসি বিজ্ঞপ সজা করিয়াও তাঁদের কলুব কলা করাইয়া লটবার স্তম্ভ স্তব স্তুতি আরও বাড়াইয়া ফেলিতেছেন । অনেক স্থানে বাবুদের স্তম্ভ বাবুজি এবং স্ত্রীদের স্তম্ভ শিখাতিপকধারী বামুন ঠাকুরের ব্যবস্থা আছে, ইহাদের তো সহধর্ম্মিনী বল্য স্ত্রীতিসম্মত হটেবেই না,—সহধর্ম্মিনীও নছেন । এই হুত্রে অনেক স্ত্রীরা অনাচারী স্বামীর পাতে খাওয়া ছোঁওয়া পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলেন ; যাক্ সে অনধিকার চর্চ্চা ! এ হেন যুগেও আনাদের বাড়ীর নিয়মকানুন ছিলুসেকলে, পিতা আমার একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত । নবদ্বীপেব সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শচীনাথ বেদান্তবাগীশের নাম এ অঞ্চলে সকলেরই সুপরিচিত । অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি কলিকাতা বাস আরম্ভ করেন নাই । দেশেই বাস করেন । বাড়ীতে ৮পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাখানাথ স্থাপিত আছেন তাঁহারই পূজার্চনা করিয়া বাবার দিন কাটিত । শৈশব হইতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিই পূজার সমস্ত উপকরণ সাজাইয়াছি । ঠাকুরের উপর আমার টান দেখিয়াই ঠাকুমা আমার নাম রাখিয়াছিলেন মীরা । দিদির নাম ছিল ধীরা । আজকালকার সভ্যরা তো গোব্রী দান মানতেই চাহেন না, কিন্তু আমার ঠাকুমা বাবা এঁরা খুব মানিতেন, তাই দিদির ঠিক আট বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল । এবং আমার বয়স আট ছাড়িয়া নয় বৎসরে পড়িতেই সকলে বাস্ত হইয়া উঠিলেন, পাত্র না কি মনের মতম জুটিতেছিল না, আমিও তখন দিদির মত মাথায় বোমটা দিয়া বউ সাজিবার স্তম্ভ কম বাস্ত হই নাই । হায়, আমরা পোড়া কপাল ! তখন কে জানিত আমার পিছনে এমন গ্রহ বর্তমান ছিল । নয় বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত উকীল ৯নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পুত্রের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল । আমার

আমি তখন হঠাৎ খাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। আমি বিবাহের পর কয়েকদিন মাত্র খণ্ডর বাড়ী খাকিয়া আবার খাকিয়া বাড়ী কিরিয়া আসিলাম। নয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার বাপের বাড়ীতেই কাটিয়াছিল। এই নয় বৎসর আমার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিক্রিগুলা দখল করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালীর সেবার নিবিষ্ট, আর আমি ছিলাম রাধানাথের সেবার নিবিষ্ট। বাবা আমার ভক্তি দেখিয়া খুব খুসী হইতেন চারিদিকের লোকে ধনা ধনা করিত, উৎসাহে আমি দশখানা হইয়া কাজ করিতাম। বুঝিতাম না যে এত আমার রাধানাথের কাজ হইতেছে না, আমারই অহঙ্কারের গর্কের পূজা হইতেছে এই যে আপনাকে ভুলাইয়া দেবতার সঙ্গে প্রতারণা, ইহার ফল যে রাধানাথের বন্ধমুষ্টিব ভিতর নিঃশব্দে সঞ্চিত হইতেছিল ইহা তখন কে জানিত? কিন্তু এই যে শাস্তিতে আমার শাসন করিয়াছ রাধানাথ, এর জন্যও আজ তোমায় ভাষা তীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। ইহাই যে আমার উপযুক্ত উচিত পাওনা ছিল। দিন কতক পরেই বাবা আমার এ সংস্কারের মারা কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সেই শোকে ঠাকুরা অর্দ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। বাবা থাকিতে বাবা নিজেরই রাধানাথের পূজা করিতেন, বাবার অভাবে নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইল। বৈদিকপাড়ার সার্সভোম ঠাকুরের পুত্র মুরারীকে পুরোহিত করা হইল। এই সময়ে আমারও খণ্ডর বাড়ী হইতে তলব আসিল, আমাকে ঘাইতেই হইবে। আমার বর্তমানে যে রাধানাথের সেবার জটা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই তাই রাধানাথের ছয়ারে অনেক চোখের জল ফেলিয়া নির্দিষ্ট দিনে খণ্ডরবাড়ী যাত্রা করিলাম। সারা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে গেলাম। রাধানাথের সেবা না করিয়া দিন আমার কাটিবে কেমন করিয়া? অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কন্যা আমি, তবু রাধানাথ যে শুধু এই মন্দিরটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নন, এই সহজ কথাটা যে এ মাথায় তখন কেন চুকিল না তাই ভাবি।

( ২ )

খণ্ডর ছিলেন না, বিধবা শান্তী, তিন চারিটা দেবর, একটা বিধবা জা এইগুলি লইয়া আমার স্বামীর সংসার। স্বামী অধ্যাপক। কলেজে পড়াইয়া যা বেতন পান সমস্ত আনিয়া মায়ের হাতে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। নিজে চব্বিশ ঘণ্টা চারিপাশে উঁচু বইএর থাক সাচ্চাইয়া সেই পুস্তক দুর্গে বাস করেন। সমুদ্র তুলা উদার প্রশান্ত তাঁর কান্তি, স্কোন ঝড়ঝাপটাতে তাকে বিন্দুমাত্র বিক্ষিপ্ত বিচলিত করিতে পারে না। তিনি স্বল্পভাষী, কখনই কিছুতে বেশী কথা বলেন না, মুখে সর্বদা প্রসন্ন শিথল হাসি, অন্তর স্নেহ-কোমল হইলেও কষ্টবো সত্যায় তাঁর অটল দৃঢ়তার তাঁর আর সব আমার কাছে মন্দ না লাগিলেও আমি দেখিলাম তিনিও একজন কিছু না-মানা সভ্য। সকল রকম হিন্দুর অখাদ্য মাংস স্নেহের পৃথক জল সবই তিনি বিধাধীন ভাবে খান। ঠাকুরদেবতা মানেন কিনা জানি না কিন্তু কখনো ত পূজার্চনা কিছু করিতে দেখি নাই। তিনি দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফিলজফির প্রফেসর তাঁর সকল কিছু পাণ্ডিত্য কলেজে ছাত্রমহলে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তিনি পবন শ্রদ্ধাপ্রদ। আমি কিন্তু চিরদিন যাহা ঘণা করিয়াছি অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। তবে ভাগ্যের কথা এই যে তিনি সকল কিছু খান বটে তাই বলিয়া নিয়মিতও নয় বাড়ীতেও বাবুজি খানসামাও রাখেন নাই পাইলে যে কোন বাধা মানেন তাও মানেন না, যে কোন জাতির বন্ধু নিমন্ত্রণ করিলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। আমার ত ঘণা বিতৃষ্ণার সারা মন ভরিয়া উঠিল। যে মাহুষ এমন স্নেহ, তার উচ্ছ্রিত খাইলে আর কি আমার ছোঁয়া দেবা রাধানাথের চলিবে? তা রাধানাথ তখন কেন বুঝি নাই যে যে পাতের প্রসাদ আমার কত জন্মের তপস্যার ফল! প্রথম প্রথম দিন কয়েক আমি তিনি খাইয়া গেলে ইচ্ছা

করিয়াই পাতে বিড়াল লাগাইয়া দিতাম। শাশুড়ী এক একদিন বলিতেন “হাঁ বৌমা দাঁড়িয়ে থেকে পাতে বেড়াল তুলে দিলে গা?” একদিন কথাটা তাঁর কানেও বুলি গিয়াছিল; পরদিন আশারের পর সবুজ থাণের উপর বিড়ালকে দুপমাথা ভাত খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন, আমি বাঁচিয়া গেলাম। এমনি তাঁর কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনি বিড়ানার উপর রাশি রাশি বই শিশুজল ভাবে ছড়াইয়া বই পড়িতেন আমি সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখিয়া বিড়ানা বাড়িয়া নিজের জায়গা করিয়া লইতাম, সেদিন দেখিলাম তিনি সেই বিড়ানায় একখানা ভোট বই হাতে করিয়া উঠিয়া আছেন। আমি বিড়ানার বইগুলো টেবিলে রাখিতেছিলাম তিনি আমার দিকেই চাহিয়া আছেন দেখিয়া কহিলাম “কি দেখছো?” তিনি তীক্ষ্ণ আমাকে নিকটে টানিয়া আমার মুখের উপর মুখ নত করিতেই আমি সরিয়া গেলাম, নিদারুণ ঘৃণায় আমার দেখানো আঙঠি হইয়া গেল, তাকে যে কতখানি বাথা দিলাম তা আর কিবিতা দেখিলাম না। এ ঘটনার পরও আমার দিনগুলো বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল কিন্তু রাধানাথের সেবার পরিবর্তে সংসারের কাজকর্ম করিয়া আমার মনে হইতেছিল যে এ দিনগুলো আমার একেবারে অনর্থক ব্যয় হইতেছে তাই স্বস্তি পাঠিতেছিলাম না। একদিন স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কহিলাম “যে আমার একটা বার পাঠিয়ে দাও।” তিনি আপত্তি মাত্র না করিয়া কহিলেন “আচ্ছা”, আমি এত সহজে অনুমতি পাঠবার আশা করি নাই। ঠিক পরদিনই মেজ দেড়র আমার বাপের বাড়ী রাখিয়া গেল। ভয় করিতেছিলাম যে শাশুড়ী হয়ত আপত্তি করিবেন কিন্তু কই তিনি ত কোন আপত্তি করিলেন না। স্বামী যে উত্তাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার মত লইয়াছেন তাহা পরে জানিয়াছিলাম। যাত্রার সময় একবার আমার সঙ্গে সাফল্য করিতে গেলাম দেখিলাম তিনি ঘরে নাই, সুনীলান বাহির হইয়া গিয়াছেন, এটা তাঁর বেড়াইতে যাওয়ারই সময় বটে! তিনি প্রত্যহ এই সময়ে বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকেন আজ আমি যাইতেছি বলিয়া তো তাঁর যে কাজের যে নিকট সময় তার এক চুলও এদিক পড়ি হইবে না। বড় জা আমাকে কহিলেন “বউ কবে আসবে?” আমি উত্তর দিব্যর পূর্বেই শাশুড়ী কহিলেন “বউ জোর মাস ছ’একের বেশী ত নয়ই, তবু ম মারলেই অগাধ যোনিয়ে আসবে” বুঝিলাম তিনি মাকে বুঝাইয়াছেন যে আমার মায়ের অসুখ বলিয়াই আমায় যাইতেছি কিন্তু একথা ত আমি তাঁকে বলি নাই। আমার মায়ের শরীর যথার্থ অসুস্থ ছিল বটে কিন্তু সেজন্য মা তো আমাকে লইয়া যাইতে চাহেন নাই।

( ৩ )

আজ প্রায় এক বৎসরব্যপ্ত বৈরাগ্য আমি বাপের বাড়ী আছি। আমাকে যন্ত্রণা বাড়ী লইয়া বাহবার জন্য আজ পর্যন্ত কোনও চাহিদাও আসে নাই। আমায় ইচ্ছা করিয়া আনিয়াছি ইচ্ছা করিয়া যাইতে না চাহিলে যে কেহ লইয়া যাইবে না তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম। নিশ্চয় আশ্রম মনের সাধে রাধানাথের সেবা করিতে-ছিলাম। কিন্তু এখন এ সেবা আমার দে পূজার স্থান হইতে হইয়াছে ত দেব কথা আমাকে দেখিলেই পাঁচজনে পা টেপাটুপি করিয়া কি একটা অস্বস্তিক ইঙ্গিত করে। দেখিয়া শুনিয়া ত কই রাধানাথের দোহাই দিয়া সব বাড়িয়া ফেলিতে পারি না, উপরন্তু মনের ভিতর বিজ্ঞাতর হৃৎকার মত তাঁক্ষ একটা বিবাক্ত শাস জমিয়া ওঠে। বাস্তবিক তখন বুলি নাই, আশ্রম প্রায় দিয়াই না পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কহিতে হয়, তাহা না পারিলে পুতুল খেলা মানুষের কখনই ভাল লাগে? এই সময় দিদি ও গোনাইদা অর্থাৎ আমার ভ্রূপতি আসিলেন। আমি দিদির সে অষ্টপ্রহরের সাজসজ্জা আর গোনাইদার দাসীগিরি পছন্দ করিতাম না, আমি আপন মনে ঠাকুর ঘরেই সারয় থাকিতাম।



অনেক দিনের রৌদ্রদগ্ধ ধূসর মাটির উপর সেদিন রাতে ছ পশলা বৃষ্টি হইয়া গাছপালার শিথ শ্যামলত্বী যেন চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছিল। রাধানাথের সুসুখের বাগানটার ঘাই মল্লিকা আর দোপাটী ফুলের গাছগুলো যেন নান করিয়া সজীব হইয়া ডালপালা মেলিয়াছিল। ধূলামাথা ফুলগুলোও শুদ্ধকোমল বর্ণ বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল। ভিজা মাটির সৌধা গন্ধ আর বকুলতলার ঝরা বকুলের গন্ধে মিশ্রিত সুগন্ধ বাতাস আমার রাধানাথের শিথিপাখা দোলাইয়া বাহিতেছিল। আমি গঙ্গা স্নান করিয়া মাথার রস্ম ভিজা চুলগুলোর আগায় গিট দিয়া বসিয়া ছন্দা বাড়িতেছিলাম। মেঘভাঙ্গা শিথ বোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। পাশে যেখানে আতপ চ'ল ধুইয়াছিলাম সেখানে একআদটী চাউলের দানা পড়িয়াছিল ছইটা কাক তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। একটা সুপুষ্ট গাভী আমার একটু দূরেই নতুন তুল খেরা কমিটুকুতে চরিতেছিল। ঠাৎ হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া দেখি দিদি ও গোসাঁ দা আমারই দিকে চাতিয়া হাসিতেছেন, আমি রস্ম কণ্ঠে কহিলাম “কি ?” দিদি কহিল “কি আবার !” “হাসচো যে!” “কখন আবার হাসিচ, দেখছি তুই কি কর'চস ? দেখলেও দোষ ?” “দেখচো তো ঢেরো তুলুই” এবার গোসাঁইদা হাসিয়া কহিলেন “মিছে কথা, তুমি বায়সদম্পতি দেখছো” রাগ করিয়া ও হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম “দেখছিলাম না গোসাঁইদা এখন দেখলাম। মনে পড়িল ছোট বেলায় আমার গৌরবণ দিদির হিংসার সামগ্রী ছিল। এই কথায় দিদি অভিমান করিয়া বাবাকে কহিত “আমি কালো মীরা সুল্লর তাই তুমি ওকে বেশী ভাল বাস।” বাবা হাসিয়া বলিতেন মীরা মায়ের রংটাই তো আমার দীরা মাকে অনীরা করে তোলে। এই সময় দিদির নজর পড়িল আমার মাথার উপর, সে চমকিয়া কহিল মীরা তুই সিঁদুর পরিস্নে নাকি ? ওসব প্রসাধনের আদিই ত ! সুতরাং ওসব আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াই ছাড়িয়াছিলাম। দিদির কথার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কেবল মাত্র কহিলাম না” দিদি শিথরয়া উঠিল কহিল “ওমা ওবে স্নোয়ামীর কল্যাণ” গোসাঁইদা গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন “সে যেখানে গিয়েছে সেখানে শুভাশুভ কিছুই ঠিক নেই, তার কল্যাণ প্রার্থনা করা তোমার উচিত মীরা” আমি অর্থহীন দৃষ্টিতে তার মুখ পানে চাছিলাম “কোথায় গিয়াছেন তিনি ?” গোসাঁইদা কহিলেন “অপূর্ণ যুদ্ধে গিয়েছে তাকি তুমি জাননা ? সে যে ফ্রান্সে পৌঁছে গেছে এতদিন !” হায় হায় তিনি যে যুদ্ধে গেছেন তা আমি প্রায় বছরখানেক পরে আজ শুনিলাম ! ভিতরকার নারীর বুক ভাঙিয়া একটা তুফান হয় তো ফেনাইয়া উঠিতেছিল সেটাকে দমন করিয়া দিদিকে কহিলাম “তার জন্যে সিঁদুর পরে কি হবে ?” আমার কতখানি অশোভন স্পন্দা বাড়িয়াছিল তাই একবার দেখ ! মন যে নালুকের সঙ্কট, মনের অগোচর যে পাপ নেই নিজের মনকে ছাপিয়েও আমার উদ্ধত অহঙ্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিদি কহিল “জানিস বেণ্ডারিশ মালের ওপর সিঁদুর হচ্ছে—ঘরে নে ওয়ারীশেব নামের ছাপ মারা লেবেল” তাকুলা ভরে ছোট ফুলাইয়া কহিলাম “আমার ওয়ারীশ হচ্ছেন একমাত্র রাধানাথ” সতীলক্ষ্মী দিদির কণ্ঠটা কতখানি সত্য তা না বুঝিয়াও উত্তর করিয়াছিলাম কারণ প্রাতিবাদ তো করা চাই। গোসাঁইদা কে কহিলাম যে, কে আপনাকে খবর দিলে যে তিনি যুদ্ধে গেছেন ?” গোসাঁইদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন “আমি নিজে গিয়ে তাকে টুপে তুলে দিয়ে এসেছি যে!” আমি তখন শুদ্ধ হইয়া রহিলাম।

রাধ নাথের মন্দিরের ঠিক পাশ দিয়া একটা রাস্তা গিয়াছে। সেই দিকে কয়েকটা ঘুলঘুলি ছিল, সেই ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া আমি রাস্তাটার সবই দেখতে পাইলাম। একদিন মুরারি ঠাকুর পূজা করিতেছিল আমি ঘুলঘুলি

দিয়া রাস্তা দেখিতেছিলাম। জন কয়েক ফাজিল ছোকরা বাঁশ ঝাড়ের নীচে বসিয়া উৎকটগন্ধ চুর্কট খাইতেছিল, শাঁথারীদের বিধবা ভগ্নি সহ কাঁথের কলসীর মুখে গামছা চাপাইয়া স্নান করিতে যাঁহঁতেছিল তাহাকে দেখিয়া ফাজিল ইতরেরা কোনও একটা অসম্বন্ধের কথাই বলিয়া থাকিবে আমি ভাল শুনিতে পাইলাম না কিন্তু সহ হঠাৎ থমকিয়া পড়িল একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমাদেব বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এই যুবতীটি বালবিধবা ও সন্দরী হইলেও ইহার স্নান যথেষ্ট ছিল। বান্ধবপণ্ডিতেরাও ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মন্ত্র পর সেই পাথে ধোপা বউ হুহুন্ করিয়া চলিয়া যাঁহঁতেছিল তাহাকে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে চলিয়া গেলে কে একটা কহিল “চণ্ডিপোপার বণচণ্ডী! চণ্ডেটা কি গোয়ার!” যুবরী হাসিয়া কহিল “মীর কি দেখ্ছো?” একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম “না কিছু না” সে কহিল “তোমার মন ভাল নয় বুঝি?” আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিলাম সে এখন পূজা আরম্ভই করে নাই; দেখিলাম আমার আয়োজনই আজ যোলআন ভুল! অপ্রতিভ হইয়া সারিতে বসিলাম বারবারই ভুল হইতেছিল ভাগো যুবরীর অনীম দেখা তাই রক্ষা! সে বসিয়াই রহিল। অনেকক্ষণ পরে বাহির হইয়া শুনিলাম মা দিদিকে বলিতেছেন “সোমও মেয়ে তাকে একা ঠাকুর ঘরে থাকুতে দেওয়া যে অত্যাচার তা কি আমি বুঝি নে মা কিন্তু ওর যে রাধানাথ অস্ত্র প্রাণ!” দিদি বিরক্ত হইয়া কহিল “মেয়ে মানুষের আবার রাধানাথ অস্ত্র প্রাণ!” সোয়ামীগত প্রাণ তবে সেই না কত ভাগি। রাধানাথের কাজে যে ভুল করিয়াছি তাহাতেই মন আমার অমৃতপ্ত ছিল, দিদের কথায় বাগে চুপে চক্ষে জল আসিয়া পড়িল! কি অপরাধ করিয়াছি তাই আমার এ দুঃখনি? তখনও টের পাই নাই যে অপরাধের বোকাই আমার অসীম। এই কি আমার আজন্মের রাধানাথ সেবার ফল? মদ্যাক্ত মত্ততায় আপনায় পূজাই করিয়াছি নিদ্রিত কন্ডেবা অবলো করিয়া নিজেই যা ভাল লাগিয়াছে তাই করিয়াছি এখন ফলের বেলায় রাধানাথের দোহাই দিলে কি হইবে? তাই তো বলিতেছি শ্রী কেবলমাত্র সন্তানের গর্ভধারণী, নারী নয় মাতা হইলেও হয় না—সেও একটি জীব, সংসারধয়ে তার স্বামীর সহধর্ম্মিণী হওয়া চাই। এত দিন লক্ষ্য করি নাই এখন দোষভেদিতা, ঠাকুরা, দিদি এরা আমায় কি চক্ষে দেখিতেছে। সকলকার অতি সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমায় পাহাড়া দিয়া ফেরে। নিজের এই অপমানে রাধানাথে অতি ভক্তিমতি আমি ত কই “তুলা নিন্দাস্তোতি মৌনী সন্তোষে যেন কেনচং।” হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলাম। মা প্রায়ই শোনাতে লাগিলেন যে—“পুত্রে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই।” বেঁথা দিলাম, পরের ঘরে চলে গেল দায় নিশ্চন্দ! তা নয়, সোমও মেয়ের আনন্দের উপর আগলে বসে থাকা, এও ত কম অধর্ম্মের ভোগ নয় না?” এসব কথার জবাব আমি দিলে যে দিতে পারিতাম না তা নয় কিন্তু একটা সামান্য মাত্র জবাব দিবামাত্র সকলে মিলিয়া যে ভাবে কতকগুলি কুৎসিত, অলীকতর কথা আনিয়া ফেলিবেন সেগুলি শুনিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, তাই সব নিঃশব্দে সহিয়া যাঁহঁতাম। দেশ ছাড়িয়া রডিয়াছিল—স্বামী আমার স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া দূর খেদাইয়া দিয়াছেন এবং সেই ঘৃণায় নিজে যুদ্ধে গিয়াছেন। যাক, আমার এ পুরস্কার উচিতই হইয়াছে যা চাহিয়াছিলাম তাই পাইয়াছি, চাহিবার সময়ে যদি নিজেই ভুল করিয়া থাকি তো সে কার দোষ দিব? আমার হইল “যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।”

(৫)

ফুলনের পুণিমা। বৈকালে রাশি রাশি ফুলের মালা ফুলের গহনায় রাধানাথকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়া ফেলিলাম, সময় মত ধুই, বেল, চামেলি, গন্ধরাজের ননোরম গন্ধে, আর পুণিমার স্নান শুভ্র জ্যোৎস্নায় ফুলন উৎসাহিল

চমৎকার ! আজ আমি ঠাকুর ঘরে একা নই, মা দিদি সকলে আমার সঙ্গে আছেন ঠাকুমাও জপের মালার ঝুলিটার ভিতর হাত পুরিয়া মুহু মুহু ঝাঁকানি দিতেছিলেন। তিনি কোনও কাজ না করিলেও বয়সের গুণে প্রত্যেক কথায় ফোড়ন দিতেছিলেন, সে ফোড়ন এমনি ঝাঁকালো, যে মানুষের বক্ষ হালু পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তখনও আমরা কীৰ্ত্তনের অপেক্ষা করিয়া ঠাকুরের ঘরেই ছিলাম, মুরারীর কীৰ্ত্তন গাহিতে হইবে তাই সে পূজা সারিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। পূজার দালানে জ্যোৎস্নায় বসিয়া মা দিদি প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন সেই সময় এক দল কীৰ্ত্তন আসিয়া রাধানাথের স্তম্ভের ছোট প্রাঙ্গণটুকুতে দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিল। গানটা বৃষ্টিতে পারি নাই—সুরটা বেশ মিষ্টি তাহা মনে আছে। প্রত্যেকের গলায় তপসী ফুলের মালা, কাহারও কাহারও আবার হাতেও এক বোঝা মালা জড়ানো। কীৰ্ত্তন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া ভূমিষ্ট হইয়া রাধানাথকে প্রণাম করিল। কেহ কেহ বা গাতের ফুলের মালা রাধানাথকে পরাইয়া গেল। আমি রাধানাথের পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম। কে একটা লোক সন্দেশে মন্দিরে ঢুকিয়া এক ভড়া মালা রাধানাথকে পরাইয়া দিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া তারপর তার নিজের গলার মালা খুলিয়া বুপ্ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিয়া মুহু-মুহু বাহির হইয়া গেল। লোকটা যে কে তাও বুঝিতে পারিলাম না। প্রচণ্ড বেগে উদ্ভ্রম রক্তশ্রোত আমার আপাদ-মস্তকে বিছাৎ খেলাইয়া গেল। অন্তরের প্রত্যেক শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত বড়ো গাছের শিকড়ের মত বেদনায় টুটু করিয়া উঠিল। রাধানাথের পায়ে কাঁচের মুখ গুঁজিয়া পড়িতে পড়িতে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। আর নয় ! এখানে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আর রাধানাথের পায়ে অপবাদের বোঝা বাড়ান না। হৃদয়ের অন্তস্তল লক্ষ্য করিলাম আর সেখানে কোনও বল, কোনও মঙ্গল নাই। আমার ভিতরে যে না, যে বোন, যে স্ত্রী যে কণ্ঠা, যত কিছু নারী ছিল সবলে মিলিয়া এই অপমানে আতত হইয়া গাঞ্জিয়া উঠিল। রাধানাথ আমার রক্ষা-কর্ত্তা ! নানা ভুল, এ বিষম ভুল ! তাহা হইলে রাধানাথের পবিত্র মন্দিরে তাঁর পাশে আমার এ অপমান ! না প্রভু বেশ করিয়াছ, এই যে কণ্ঠাখাত করিয়াছ ইহাতেই না এ ভ্রান্ত মনোরথ আমার কণ্ঠবাপথ চানিয়াছে। মাকে বলিলাম “মা আমি গুপ্ত বাড়ী যাবো।” মা মুখ বাকাইয়া কহিলেন “তোমার তো যেমন আসার ছিঁর, তেমনি যাওয়ার ছিঁর !” স্বস্তরবাড়ী পত্র লিখিয়া দিলাম। পত্রপাঠ মেজ দেওর আসিয়া আমাকে লইয়া চলিল। এখন আমি স্বস্তরবাড়ী, আমার শূন্য ঘরখানা দিনরাত সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁরই প্রতিমার পথ চাহিয়া আছি। কায়মনোবাক্যে বুদ্ধিরাছি নারীর অস্ত্র ধর্ম্ম, অস্ত্র দেবতা, তীর্থ পূজা, কিছু নাই, আছে কেবল ভূমি আমি, ভূমি রাধানাথ ! মহাসমরের তো অবসান হইয়াছে, আর কত দিনে তিনি ফিরিবেন ?

শ্রীমাহারবালা দেবী।

## পরশমণি ।

—ঃঃ—

আমার, দুঃখ তোমার চরণ ছোঁয়া  
তাই সে এমন পরশমণি  
বুকের মাঝে গড়ে তুলে  
অমূল্য এ সোণার খনি ।

তাই সে যেমন এল প্রাণে  
ডুবিয়ে দিল ভক্তি বানে  
মৌন পিকের কণ্ঠে জাগে  
হৃদয়ের কুতূহল  
এ যে আমার পরশমণি ।

দুঃখ আমার তোমার বুকের  
অমূল্য কোন্ সোহাগ ঢালা  
তোমার দুটি অধর ছোঁয়া  
চুম্বনেরই কণ্ঠমালা ।

এ যে অতুল এ যে অতুল  
ছাপিয়ে এবার গেল রে কূল  
সকল হারা হয়ে তোমার  
সোহাগ ধনে হলাম ধনী  
এ যে তোমার পরশমণি !

## কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা ।

এতদ্ব্যতীত গীত, গীতগুলি এদিকের খোলাখানা রথের নিজস্ব। উহা নিরক্ষর গ্রাম্য কবি দ্বারা কেবল কথিত ভাষার সাহায্যে মুখে মুখে রচিত এবং সারিন্দা, দোতারা, কেরেঙা প্রভৃতি যন্ত্রযোগে গীত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত গীতের মধ্যে “ঘুগীর গীতের” নাম স্বতন্ত্র উক্ত হইতে পারে। ঘুগীরগীত অল্প দিন হইল গিপিবন্ধ

হইয়াছে। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও এই গীত শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা ও পঞ্জাবাদি অঞ্চলেও রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত রহিয়াছে। এই গীতের নায়ক ও নায়িকাগণের জন্ম ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এতদঞ্চলের সুপরিচিত মেচপাড়া (ধুবরী) পাটিকা-পাড়া ও শ্রীকলার হাট (রঙ্গপুর) করতোয়া প্রভৃতি স্থান ও নদীর নাম যুগীরগীতে শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের ডোমার স্টেশন হইতে পাক্কাপুর্ পর্যন্ত স্থানে অবস্থিত অনেক ক্ষণশেষের সহিত এই গীতের নায়ক গোপীচন্দ্র ও তাহার মাতা ময়নামতীর নাম জড়িত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও ডাঃ গ্রিয়ারসন সাহেব এই যুগীর বা ময়নামতীর গীত লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই গীতের মূল ভাগ মুসলমান আগমনের পূর্বে রচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে ইহার আলোচনা পাঠ করিয়াছি। যুগীর গীতের এক এক অংশ মানিকচাঁদের গীত, গোপীচাঁদের গীত ও ময়নামতীর গীত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুখে মুখে গীত, এই যুগীরগীত তাহার প্রাচীন রূপ রক্ষা করতদূর সক্ষম হইয়াছে বলা কঠিন। সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের লোকের হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়া এই গীতের প্রকৃত রূপ যে অনেক স্থলেই বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত প্রকৃত উচ্চারণ সহ মুদ্রিত গীতের কিছু পরিচয় প্রদানের চেষ্টা পাইব।

রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণে উদাত্ত হইলে রাণীগণ তাহার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করায় রাণীগণের উক্তি :—

“কাণ্ড কয় ইগ্ণা কতা কাণ্ড আর পাইতায়  
সে যামার সতে গেহলে তিরিক বাঘে থায়।  
এমন ছটা বনের বাঘ তির পুরুষ বাড়িয়া বেড়ায়।  
সে থানত বনের বাঘ থাইবে ধরিয়া।  
নিশ্চয় করি পানের পাঁচ মোক পালাইস ছাড়িয়া।

মেচ জাঁতির বর্ণন উপলক্ষে গীতে আছে :—

“এক ব্যাটা মেচ আছে হেমাঈ পাড়র,  
মননশেক দান শুকায় পিটির উপর।  
তার ছোট ভাই আছে বাঁও ঠেঙ্গত খোদ,  
হাস্তি বোড়া চাগ যায় গোদের না পায় বোদ  
তার ছোট বহন আছে নাই তার কৌক,  
নও হাড়ি পত্তা যায় দশ হাড়ি তপত।  
তার ছোট বহন আছে নাম ভুঁমতানি,  
অশি মন্দে পাড়িয়া কিলায় নাই চউকত পানি।

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় যুগীরগীতের সঙ্গ এই বিদ্যমান। তথাপি মুসলমান আধিপত্য কালের আগ্রস্বে যে ইহার কোন কোন অংশ রচিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যথা :—

দক্ষিণ হাতে আইল বাঙ্গাল নম্বা নম্বা দাড়ি।  
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত কৈল্যে কড়ি।

মূলক আরবী শব্দ। মৌলক অর্থে রাজ্য, দেশ। বাঙ্গাল অর্থে মুসলমান বুঝাইতেছে। তাহা লম্বা লম্বা দাড়ির জ্ঞান নহে। মুসলমান মংশ্রবের প্রারম্ভে এতদঞ্চলে বাঙ্গাল বলিতে মুসলমান বুঝাইত। ক্রমশঃ দক্ষিণ হইতে আগত ব্যক্তিগণই বাঙ্গাল নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্বারা তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। এতদঞ্চলের ভাষা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া অনেক শব্দ এখন আসামী ভাষার কল্যাণে তথায় গিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। তন্মধ্যে এই ‘বাঙ্গাল’ শব্দ একটা। এখনও আসামে বঙ্গদেশবাসীগণকে, বিশেষ ভাবে মুসলমানগণকে বাঙ্গাল বলা হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয়গণকে পর্য্যন্ত “বঙ্গা বঙ্গাল” অর্থাৎ সাদা বঙ্গাল বলা হয়।

এতদঞ্চলের “গোরক্ষনাথেরগীত” আর একটা অতি প্রাচীন গীত। ইহা খৃষ্টাব্দেও অপেক্ষা কোন অংশে অপ্রাচীন নহে। এই গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহুদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে “গোরক্ষনাথ” ব্যক্তি বিশেষের নাম না হইয়া বোদ্ধ-যোগীগণের একটা উপাধি বলিয়াই মনে হয়। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে গোরক্ষনাথের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আনাদের এতদঞ্চলে গারোহিলের গোরক্ষনাথের পাহাড়, রঙ্গপুরের গোরক্ষমণ্ডপ, দিনাজপুরের গোরক্ষনাথের মন্দির ও গোরক্ষকুঠ, বগুড়ার গোরক্ষনাথের মন্দির যোগী গোরক্ষনাথের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। গোরক্ষনাথেরগীত রচনা কালে ধর্মরূপী বুদ্ধের পূজা, মেচজাতির প্রভাব, রাজা জলেশ্বরের স্মৃতি এতদঞ্চলের জনসমাজে বিদ্যমান ছিল। পরে পাঁড়ুয়ার পঞ্চপীর গাতে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। ১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পাঁড়ুয়ার পঞ্চপীর গোড়দেশে প্রান্ধিনাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের গীতে আছে :—

“পূর্বঘাটে যায় কন্যা দিল দরশন  
সেও ঘাটে ছিন্নান করে ধ্যানব্রায়ণ  
উত্তর ঘাটে যায় কন্যা দিল দরশন  
সেও ঘাটে ছিন্নান করে মেচপাড়ার মেচনী  
পশ্চিম ঘাটে যায় কন্যা দিল দরশন  
সেও ঘাটে ছিন্নান করে পাঁড়ুয়ার পঞ্চপীর  
দক্ষিণ ঘাটে যায় কন্যা দিল দরশন  
মেচ ঘাটে ছিন্নান করে রাজা জলেশ্বর।

গোরক্ষনাথের জন্ম বিবরণ এইরূপ :—

“দে দে ধর্মরাজঠাকুর পুত্রবনের বর  
পুত্রবনের বর না দিবু যদি কাটারিক করিম ধার।  
পাঁচাকলা আতপ চাউল ধর্মক বাড়ি দিল  
যারে যা গোয়ালের নারী তোক সে দিলাম বর  
তোমার ঘরে জন্ম নিবে গোরক্ষনাথ ঠাকুর।  
একথা শুনিয়া কন্যা হরষিত হৈল  
আপন মন্দির বলি গমন করিল।

বাস্তব দেবতা সোণারায়ের গীত ও যাগের গান এদেশীয় নিরক্ষর কবির মৌখিক রচনা। এই সমস্ত গীত অতি প্রাচীন কালে রচিত হইয়া থাকিলেও ইহাতে মুসলমানী ভাব ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে।

কামদেবের পূজা উপলক্ষে গীত.—যাগের গান কত প্রাচীন এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ আলোচনা হয় নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দশম-বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে ইহা স্মরণাতীত কালের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাগের গান দুই ভাগে বিভক্ত, আসল ও শুকল। আসল যাগে আদিরসের পূর্ণ অবতারণা। সোজা কথায় বলিতে ইহা কল্পনার অতীত অশ্লীল। এই কারণেই এতকাল লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। পরিষৎ পত্রিকায় কিছু যাগের গান মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা আসল নহে, শুকল। শুকল যাগ কৃষ্ণলীলা বিখ্যক। তাহাতে আসল যাগের ন্যায় খোলাখুলি কোন কথা নাই। ভাবার আবরণে অশ্লীল ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যাগের গীতের সমস্ত অংশ কখনই প্রাচীন নহে। এই গীতে স্থানীয় ইতিহাস প্রক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। তাহাতে পরশুরাম ও ইসমাইল গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা নীলাধর, নরনারায়ণ, পরীক্ষিত, মানসিংহ ও দিল্লীর বাদ-সাহেব সংক্ষিপ্ত অথচ খাঁটি বিবরণ আছে। ১৮শ শতাব্দীর পরবর্তী বিবরণ কোন যাগের গীতে আছে কি না অবগত নহি। দেবীসিংহের রঙ্গপুর-অগ্ন্যচারণা ইহার শেষ ঐতিহাসিক বিবরণ। ঐতিহাসিক বিবরণ ক্রমশঃ বিরচিত বলিয়া মনে হয়। ৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত অংশ রচিত হইয়া থাকিলে এতটা শুদ্ধ হইতে পারিত না। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত এতদঞ্চলে যে কয়েক খণ্ড ইতিহাস পুঁজি আছে এই গীতের ঐতিহাসিক অংশ তদপেক্ষা বিস্তৃত।

যাগের গীতের রাসপূর্ণিমার চিত্র আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি :—

“আশিন গেইচে কাতির আইছ গেল আদেক দিন  
আন্তরকোণা একটু বাইড্‌চে পাওয়া না যায় চিন  
গাদলা নাই ঝড়ি নাই কাশিয়ার ফুল ফুটে,  
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জনগুলা ইত্তি উত্তি ছুটে  
নদীর জল টল টল দেখা যায় বালা,  
মাথার উপর আকাশখানি খালি সব নীলা  
রাস্তা বাটত কাদো নাই খালি পায়ে যাও  
আনিতে হৈবেনা জল ধুবায় নাগে না পাও  
শীত গিরিম কিছুই নাই বড় মজার দিন  
মাছি নাই মোশা নাই করে না পিন পিন  
সাঁজের বেলায় পূবের দিকে ঝলক দিয়া চান্দ  
আকাশের গায় উঠে ঐ কেমন তার চান্দ  
গাছের উপর পড়ে জোনাক রূপার গাছ করি  
পাতের উপর জোনাকের খাটে না কারিকুরি  
নদীর জল জোনাক পায়্য করে ঝক ঝক  
বালায় চরে কাশিয়ার ফুল করে চক চক

জোনাকত ভরিয়া গেল সমস্ত পিখিমি  
 আকাশত তারা গুলা করে ঝিমি ঝিমি  
 সিংহাঙ্গারের দুলে দুলে ঢাকিয়া গেল বন  
 সুবাস পায়া ঘরে থাকির কারো না হয় মন ।  
 সব ঠাই ছাড়ায় বাস দুরকরা বায়  
 লাখে লাখে ভোমরা উড়ে যাত দুলের গায়  
 এমন সময় নদীর কূলে বংশতে দিল শান  
 গলে মালা চিকনকালা রাধা হাদা গান ।”

এতদঞ্চলে কোচভাষার অস্তিত্ব ধরিয়া লইলে কথিত কোচরাজের কালের মধ্যে তাহার অল্পসন্ধান কতদূর ফলপ্রসূত হইবে বলা কঠিন। এণ্ডারসন্ সাহেবের মতে পূর্বীক্ষ ও আসামবাসীর পূর্বপুরুষগণ কোচ বা বদোমূলক ভাষায় কথাবান্ধি বলিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বি. এইচ. হুডসন্ সাহেব প্রণীত “Essay the first on the Koch, Bodo and Dhimal tribes” নামক পুস্তকে কোচ, বদো ও ধিমাল ভাষার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “I must begin with the remark that I do not propose to say anything of the Koch Grammar, which is wholly corrupt Bengali. The reason which have induced me to give the Koch vocabulary are stated elsewhere” ( P.105 ) অর্থাৎ “কোচব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাই না। উহা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত বাঙ্গালা ভাষা। কোচভাষার শব্দকোষ লিখিবার কারণ অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত শব্দকোষের মধ্যে কাগজ, তমসুক, নালিস, জুওয়াব, তজবীজ প্রভৃতি আরবী ও পারসী এবং জ্যোতিষ, পণ্ডিত, মন্ত্রী, ষম্মাধিকারী, গোসাই প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোচ, বদো ও ধিমাল ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে এক্রূপ ভাষার সংখ্যা অতি সামান্য। অল্পসন্ধান করিলে তাহারও ভিত্তি স্থির থাকে না। হুডসন্ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্যের পরেই লিখিয়াছেন যে “I have failed to get at the original and true speech of this race, whose ancient tongue is fast merging in Bengali” অর্থাৎ এই জাতির মূল এবং প্রকৃত ভাষা সংগ্রহে অকৃতকার্য হইয়াছি। ইহাদের প্রাচীন ভাষা দ্রুত গতিতে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইতেছে।

উন্নত ভাষার চাপে অন্তরত ভাষার বিলোপ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কামরূপের ঐতিহাসিক যুগে তাহার প্রমাণভাব দৃষ্ট হয়। কথিত কোচরাজ্যেব তিনশত বৎসর পূর্বে এতদঞ্চলে মুসলমান সংশ্রবের প্রবর্তন। মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশে সর্বশ্রেণীর লোকের সমুদ্রে শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। মুসলমান শাসন যন্ত্র পরিচালনের নিমিত্ত লেখাপড়ার বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। লিখিত পত্রিতের সাহায্যে ধর্ম প্রচারের ঐসলামিক প্রথা এ দেশে প্রবর্তিত হইতে কণামাত্র কঠিন হয় নাই। তাহার প্রভাব ক্রমশঃ হিন্দু সমাজেও কার্যকর হইয়াছিল। রাজ্যকার্য বাস্তবীকরণের প্রয়োজনেও লোকে লেখাপড়া শিক্ষা করিত। এই সময় বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতীত মুসলমানী বাঙ্গালা অর্থাৎ আরবী ও পারসী বহুল বাঙ্গালা গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (২৩ ভাঃ ৩য় সং) ৮৩২খানা গ্রন্থের সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৪৩৬খানা বটতলার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি। গ্রন্থকারগণের মধ্যে হিন্দুরও অভাব ছিল না। অন্যদিকে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের পূর্ব সমাজের পাখিই নব সমাজ স্থাপন করিয়াছিল।



এই শ্রেণীর মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুর অমুকরণে সতাপীর, গাঙ্গী, একদিল, সাহ সোলতান প্রভৃতি মোসলেম সাধুগণের চরিত্র রচিত হইয়া এতদঞ্চলে পীরের গীত প্রচার হইয়াছিল। ইহা ইসলাম শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও গীত হইতে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু মুসলমান বলিয়া তাহাতে কোন প্রভেদ ছিল না। বরং অনেক স্থলে হিন্দু গায়ক দৃষ্ট হইত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গোঁড়ের হিন্দু রাজা গণেশ কর্তৃক একবার ধর্মসম্বন্ধেরও চেষ্টা হইয়াছিল। যাহার ফলে আজ “হিন্দুর নারায়ণ আমি মোসলমানের পীর, ছই কুলে লই সেবা হইয়া জাহির” সতাপীরের গীত অথবা পাঁচালীতে শুনিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান সংশ্রবের ফলে প্রাচীন কামরূপের ভাষায় যে সমস্ত আরবী পারসী শব্দ প্রবেশিত হইয়াছে, বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তাহার পরিমাণ নূন্য নহে। তাহার পরচয় প্রদান অতি সহজ। এত সংশ্রব সত্ত্বেও কথিত ভাষায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহারে হিন্দুরা তেমন অভ্যস্ত নহেন। মুসলমানের নিন্দা ব্যবহার্য্য “কাল্লা,” “আনাজ,” “চেরাগ,” “গোস্ত,” “নাস্তা,” “খানকাবর,” “জবহু,” “জ্যাক,” প্রভৃতি শব্দের স্থলে হিন্দুর মুখে “মাথা,” “তরকারী,” “পদ্মীপ,” “মশ,” “জলপান,” “ডারীঘর,” “কাটা,” “নেমখন” শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানের “নানা,” “চাচা,” “খালু”কে হিন্দুরা “জাজু,” “কাকা,” “মাইসা” বলিয়া থাকে। ইহা বাতীত বহুশব্দে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উচ্চারণ-বৈষম্য শুনিতে পাওয়া যায়। অল্প কথায় বলিতে হইলে শত শত বৎসর বাপ্পী মুসলমানী ভাষা ও চালচলনের এক প্রবল বন্যা বঙ্গদেশের উপবদ্বীপ প্রাবলীভূত হইয়া গিয়াছে। যাহার ফলে আজ অন্ধ্রের অধিক মুসলমান। কিন্তু এত সহজেও বঙ্গভূমি আরব, পারস্য, অথবা তুর্কীজানে পরিণত হয় নাই। বরং আরব, পারস্য ও তুর্কীস্তানবাসীরা এখানে আদিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে।

এতদঞ্চলের তেলঙ্গা, বাদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি কতকাল ধারণা এদেশে বাস করিতেছে তাহা বলিবার উপায় নাই। ইহাদের নিজের এক একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। তাহা আপনাদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। নিম্ন আসামে স্থানে স্থানে কাছাড়ী জাতির বাস দৃষ্ট হয়। তাহারা পূর্বেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আসামী ভাষায় কথাবার্তা কথিয়া থাকে। অথচ তাহাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। লিখিত পদ্ধতির বহুল প্রচার দ্বারা ইহঁদের ভাষা আত্মপ্রকাশ করিতে ও অন্তর্য্য ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। কেবল কথিতভাষার সাহায্যে আরবী, পারসী ও ইংরেজী শব্দগুলি ভারতে এমনভাবে শিকড় গাঢ়িতে সক্ষম হইত না। আমাদের নিজের কথাই ধরা যাউক না কেন, বিগত ৫০ বৎসরে কোচবিহার রাজ্যের ভাষায় যে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালীর কথোপকথনের ফল নহে। মদনমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের লিখিত পুস্তক-গুহে গৃহে পঠিত না হইলে ইহা শত বৎসরেরও সম্ভব হইত না।

মোসলমান সংশ্রবের বহু পুণ্ড্র বৌদ্ধপদ্ধতি কালের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ৭ম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজক Hsien Tsiang (হিউয়েন সাঙ) এর লিখিত চীনা ভাষায় Ni-yu-kiর প্রফেসর Samuel Beal অনুবাদিত “Buddhist Records of the western world” গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

“The letters of their alphabet were arranged by Bramhadeva, and their forms have been handed down from the first till now. They are forty-seven in number, and are combined so as to form words according to the objects and according to circumstances ( of time or place ) : there are other forms ( inflexions ) used. This alphabet has spread in different

directions and formed divers branches, according to circumstances ; therefore there have been slight modifications in the sounds of the words ( spoken language ) ; but in its great features, there has been no change. Middle India preserves the original character of the language in its integrity. Here the pronunciation is soft and agreeable, and like the language of the Devas. The pronunciation of the words is clear and pure, and fit as a model for all men. The people of the frontiers have contracted several erroneous mods of pronunciation ; for according to the licentious habits of the people, so also will be the corrupt nature of their language."

অর্থাৎ তাতাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলি লক্ষ্যদেব কর্তৃক শৃঙ্খলিত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত অক্ষরের আকার পূর্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বর্ণমালার সংখ্যা ২৭টি। তাৎকালিক আবশ্যক ও অবস্থানুযায়ী ( স্থান ও সময়ের ) অক্ষরগুলি সংযোজিত হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দ রূপান্তরেণ ( শব্দ বা ধাতুর বিভক্তিকরণ ) ব্যবহৃত হয়। সময় ও অবস্থানুসারে এই বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বিস্তৃত শাখায় পরিণত হইয়াছে। সেই জনা শব্দের ( কথিত ভাষার ) উচ্চারণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার বৃহদাক্ষর কোন পরিবর্তন হয় নাই। মধ্যভারত, ভাষার আদি অক্ষরগুলি সম্পূর্ণভাবে ও সর্বতোপ্রকারে রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানেই উচ্চারণ কোমল ও শ্রুতিমধুর এবং দেবভাষার অনুরূপ। শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট এবং শুষ্ক ও মনুষ্য মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। উহা আদর্শ-স্বরূপ। সীমান্তপ্রদেশবাসীরা কতকগুলি লম্বাঘ্রক উচ্চারণপদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু লোকের মন অভ্যাসানুযায়ী তাতাদের ভাষাও মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অগ্ন্যবর্তের মধ্যভাগটী middle India নামে অভিহিত হইয়াছে। কানাকুলেশ্বর অধিবাসীগণের সম্পর্কে লিখিত আছে :— "They apply themselves much to learning, and in their travels are very much given to discussion ( on religious subjects ). ( The fame of ) their pure language is far spread" P. 207. অর্থাৎ তাহারা অধিক মনোযোগ জ্ঞানার্জন করে এবং লম্বন কালে ( ধর্মাবিসয়ক ) আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া থাকে। তাতাদের বিশুদ্ধ ভাষার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। কামরূপের অধিবাসীগণের প্রসঙ্গ পরবর্তীক বর্ণনাছেন :— "Their language differs a little from that of Mid-India" P. 196 অর্থাৎ তাহাদের মধ্যভারতের ভাষার ন্যায় পার্থক্য সামান্য।\*

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে এম শব্দাদির উত্তর ভাষার ভাষার মোশিমুটি অবস্থা আমরা অবগত হইতেছি। ঐ সময়ে মধ্যভারতের ভাষার উচ্চারণ দেবভাষার অনুরূপ ছিল। দেব ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত বা তীত আর একটি ভাষা। এই সময় উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, নাগ উত্তর ভারতের তাৎকালিক আদর্শ ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। কামরূপের ভাষা সেই ভাষার প্রায় অনুরূপ ছিল। কেবল দূর ও প্রান্ত দেশবাসীর ভাষা বলিয়া উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য ছিল। হিউয়েন সাং এর আগমনের পরে কামরূপে বৌদ্ধ মতের রীতিমত প্রচার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে কয়েক শতাব্দী কাল বৌদ্ধ পাল রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালশাসন কালে এতদঞ্চলের ভাষা ও সমাজদেহে যে সমস্ত পরিবর্তন প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। কথিত আছে তাতাদের কর্তৃক বর্তমান বঙ্গাঙ্গরেও জননী কুটিলাক্ষরের কামরূপ প্রচার হইয়াছিল।

\* "Their speech differed a little from that of Mid-India" Translated by Thomas Watters II P. P. 185, 186.

জন বিম্‌স সাহেবের মতে বঙ্গদেশে পশ্চিম ভারতের অনেক পক্ষে মুসলমান সংশ্রব আরম্ভ হওয়ার, এই সুযোগে বঙ্গভাষা সংস্কৃতির ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান সংশ্রবের আরম্ভ ও তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষার অবস্থা আলোচনা করিলে এই মত গ্রহণ করিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ কীৰ্ত্তন, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ।

ডাঃ গ্রিয়ারসন্ প্রমুখ ইয়োরোপীয় ও তাঁহাদের অনুসরণকারী চই একজন বাঙ্গালী কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দ নির্কর চনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোন অঞ্চলের কথিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে অস্বস্ত না করিয়া কেবল শব্দ সংগ্রহ দ্বারা তাহা র পৃথকত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস কখনও নির পদ বিবেচিত হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী সম্ভ্রাদায় ও স্থান সমূহের কথিত ভাষা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আবশ্যক। ১৯শে ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া একজন লেখক কোচ ভাষার শব্দ নির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে এতদঞ্চলের ঝিং, চাকুলা, ডেকু, ত্যারাংকাটাং, আনু, ছাকা, প্রভৃতি শব্দ কোচ ভাষার। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে এই সমস্ত শব্দ রূপান্তরিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। যথা—ঝিং—নিম্বন, ডেকু—দাঁড়া, ত্যারাংকাটাং—তেড়াবেড়া, চাকুলা—গুলি, আনুবাবনু—বোনাই, ছাকা—ছাঁকা।

এতদঞ্চলে “বাহে” বলিয়া একটি সম্বোধন আছে। সাধারণতঃ সম্ভ্রামখেই তাহা ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের প্রবাসীগণ এই উপলক্ষে এতদঞ্চল “বাহেরদেশ” ও অধিবাসীগণকে “বাহের” বলিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ইহারা “বাহে” শব্দের উৎপত্তি বা মূল অবগত থাকিলে অথবা অবগত হইবার চেষ্টা করিলে এই সংস্কৃত ধাতুজাত শব্দটির অসম্মান করিতেন না। “বাপুহে” অথবা “বাবাহে” সম্বোধনের মধ্যাক্ষর বিলুপ্ত হইয়াই এই “বাহে” সম্বোধনের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষাজগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে “বাপা” ও “বাপু” সম্বোধন অজানিত নহে। ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

“সোণা রূপা নয় বাপা এ বেঙ্গা পিতল

যমিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জল।”

বাঙ্গালীর গো, লো, রে, হে, বাপুড়ী প্রভৃতি সম্বোধনের ব্যবহার অন্ততঃপক্ষে সহস্রবর্ষ পূর্বেও ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে গো, রে, হে সম্বোধনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কোন শব্দ অবোধা ও অশ্রুতপূর্ব হইলে ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মামুসারে তাহা উপেক্ষিত না হইয়া বয়ঃ আলোচনার অন্তর্গত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞানের অভাবে “একদেশের বুলি, আর দেশের গালি”তে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে, —চাকা অঞ্চলে “মাইয়া” বলিতে কন্যা বুঝায়, কোচবিহার ও মানভূমে স্ত্রীকে “মাইয়া” বলে, “বো” কথাটি বহু শব্দের অপভ্রংশ,—অর্থ—ভাৰ্গ্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদি। দক্ষিণ বঙ্গে “রামের বো” বলিলে অনেক স্থলেই “রামের স্ত্রী” মনে করা হয়। এতদঞ্চলে বিশেষভাবে “রামের পুত্র বধূ”ই বুঝাইয়া থাকে। কোচবিহার অঞ্চলে Idiom অর্থাৎ রীতি গইয়া পরিষৎ পত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলেই অর্থ যথোচিত হয় নাই। ডাঃ গ্রিয়ারসনের গ্রন্থেও Idiom এর অর্থে প্রমাদ দৃষ্ট হয়। তিনি “বাউদিয়া” অর্থে “Bereaved lover” করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ ভবঘুরে। “ঠেলা” অর্থে Threatening, “ঘোপা” অর্থে—Sheltered nook ইত্যাদি অনেক শব্দ ও তাহার অপ্রকৃত অর্থ তাহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। “ঠেলা” শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাতে গালমন্দ প্রদান ও বুঝায়। অভিধানে “ঠেলন”

দেশজ শব্দ; অর্থ হেল্প, অমান্যকরণ, দুরীকরণ ইত্যাদি। কোন নদীর সংলগ্ন স্থান বিস্তৃত স্রোতহীন ভাগে এতদঞ্চলে “বোপা” নামে অভিহিত।

এণ্ডারসন্ সাহেব “কোচাড়” ও “কাছাড়” একই শব্দ মনে করিয়াছেন। আধুনিক কোষকারগণ সংস্কৃত “কচ্ছরম্” শব্দ হইতে “কাচড়া” শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। অর্প মণি-ম্, কৃষি-ম্। কিছুকাল পূর্বে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণের নিকট এতদঞ্চল “কোচাড়দেশ” বলিয়া পরিচিত ছিল। “কাচাড়” শব্দটি কোচের “আড়া” অর্থাৎ বসতি হইতে উৎপন্ন কি না বিবেচ্য। বঙ্গোত্তর ভিন্ন ভাগে “আড়া” শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলেও “আড়া” শব্দটি সুপরিচিত। অর্প—গুচ্চ বা কাড়। ইহা “আছড়া” শব্দের রূপান্তরও হইতে পারে। “কাছাড়” শব্দের অর্থ সম্ভব পৃথক। অল্প বনবিপ্লব আবান যোগ্য ভূমি “কাছাড়” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক শ্রমজীবিয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এইরূপে স্থানের অধিবাসী বলিয়াই আসামের সম্প্রদায় বিশেষ “কাছারী” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কোচবিহার অঞ্চলে নদীর পাড়ের নাম “কাছাড়”। “কাছাড়” সংস্কৃত “কচ্ছ” শব্দজাত। কচ্ছ: শব্দের অর্থ সিংহনাং স মাধ্ব প্রাণভাগঃ, জগাশয় প্রাণভাগঃ, নদীপাশভূমি সমাপম্। ( শব্দ মল্লক্রমঃ ) ব্যবহারেও বনুশী কচ্ছ, নদীকচ্ছ প্রাপ্ত হওয়া যায় ( পাণি পঃ ৩৭ পৃ )।

সাদৃশ্য দর্শনে দুইটি শব্দ এক মনে করা সর্বত্র নিয়মিত নহে। এই এক কোচবিহারের সম্পর্কেই তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ এতদঞ্চলের বৃহৎমান বসগণ্যের “ননা” উপাধি উল্লেখ করিতে। কোন না কে কখন সংস্কৃত “ননৈ” শব্দ হইতে এই “ননা” উপাধির সৃষ্টি প্রচার করিয়াছিলেন। পুরনো ননৈ বসগণ “ননৈ” অর্থপ্রাণে “ননা” উপাধি বসগণ্যের বাবণ করিয়া থাকেন, “ননা” উপাধির নানাক্ষর বসগণ্য করিতে পারেন। ইহা বসগণ্যের বিচ্ছিন্নতা আরও বৃহৎমানই এখন এই উপাধি প্রচলিত হওয়া প্রকাশ করা হইল। এতদঞ্চলের বৃহৎমানদের মাসারবসগণ্য শ্রম শ্রেণীর নাম আছে। ১ম বিশ্রাম আনবী বসগণ্য—আনবী ননা, হাবিবী ননা। ২য় বিশ্রাম আনবী বসগণ্য—কুনিম উল্যা, হন মহাম্মদ। ৩য় স্থানীয় নাম—কাণটু, কোলকু ইত্যাদি। ৪ম বসগণ্য শ্রেণীর নাম বৃহৎমান করিয়াছে। স্থানীয় নাম অর্থাৎ কাণটু, কোলকু হিন্দু বসগণ্যের দ্বারা প্রচলিত হওয়ার বসগণ্যের বসগণ্যের বৃহৎমান পরিচালক “ননা” উপাধি যুক্ত হয়। অর্থাৎ ননৈ আনবী বসগণ্য পলাই বাসগণ্যের দ্বারা হইয়া থাকে। “ননা” ননৈ শব্দজাত হইলে ভদ্রারা ননৈবর্ম্মী অর্থাৎ পতিত বসগণ্যের বৃহৎমান বৃহৎমানের কোন কারণ দৃষ্ট হইল। এতদঞ্চলের মেধন ও বাধাবর ( মেধন ) শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত উপাধি লোক দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে “ননৈ” বা “ননা” উপাধি ব্যবহার প্রথা নাই। একটা বসগণ্যের অধিকতর বসগণ্যের পক্ষান্তে পলাই বসগণ্যের বৃহৎমান ছিল, তাহারা এইরূপ একটা অর্থাৎ অধিকতর অমান্যকরণ উপাধি বহনে গোচাতে সম্মত হইয়াছিল, বিশ্বাস করিতে সম্ভব উৎপত্তি হয়। নবধর্ম্মীকে সাদরে বসগণ্যের সমাজের অধীভুক্ত করাই ইসলামের নিমিত্ত। কাছাড়: তাঁহী হইয়াও থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত গোড়া বসগণ্য শাসন কালে “গয়গণ্য” নাম এক শ্রেণীর বৃহৎমান ছিল। নতুন বসগণ্যকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। গয়গণ্য বা গাশিল আনবী শব্দ; অর্থ—ধোঁহ। আনবীতে “ননা” ও “ননা” দুইটি শব্দ আছে। “নু”, “সিন”, “ওয়াও” অক্ষর যোগে “ননা” ও “নু”, “সিন”, “আনবী” অক্ষর যোগে “ননা” গঠিত হইয়াছে। উভয় শব্দই “ননা” শব্দ হইতে উৎপন্ন। শব্দ দুইটির অর্থ প্রায় একই কথা—অমান্যকরণ করা, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, নতুন অমান্যকরণ করা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দের রূপ নির্ণয়ে বাঁহারা শ্রম স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত (তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ) এই উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই উদ্যম যতই কেন প্রাণসমন্বী হউক না নির্ধারণ কখনও শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীগুরু রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে অধিকাংশ দেশজ শব্দের মধ্যে সংস্কৃতির গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। মানবজাতি পরামর্শ করিয়া ভাষা সৃষ্টি করে নাই। স্বভাবঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহার ধাতু নির্ণয় কতকালে সম্পূর্ণ হইবে কে বলিতে পারে? ভাষাতত্ত্ববিদ মেজর কণ্ডর এমুন ৭০টা ধাতু আঁকার করিয়াছেন যাহা পৃথিবীর ভাষা সমস্ত উন্নত ভাষার মধ্যে দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত, পাণিণি প্রাকৃত, (শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি) ভাষার মধ্যে স্বয়ং নির্ণয় লইয়া বাগ্‌বতভা ক্রমশঃ বাড়িয়া চালাইয়াছে। এই সমস্ত পণ্ডিতী সমস্যার প্রতি আমাদের “কান্দা ফান্দা চাইরা” থাকা বাতীত উপায়ভর নাই। এই অবস্থায় কোন বিশেষ ভাষার মাপকাটি লইয়া বঙ্গের ভাষাকে পরিমাপ করিবার যোগ্যতা নেহাত সাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কোন সম্প্রদায় বিশেষের ভাষা বলিয়া বাঙ্গালার কোন অক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত প্রাদেশিক শব্দ পরিচিত করিতে অগ্রসর হওয়া তদদেশক। কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

কোচবিহার অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রতিবেশী ভাষার শব্দ সমাগম অন্বীকৃত হইতে পারে না। বরং তাঁহার সম্ভাবনাই অধিক। পূর্বে ও উত্তরে গারো, ভোই, মেচ, নোয়াণী প্রভৃতি জাতিগুলি এতদঞ্চলের দখলি প্রতিবেশী। অজানিত কাল হইতে বিগত শতাব্দী পূর্বাত্ৰাদেশবাসীগণের মতিত তাঁহাদের ব্যবসায়ের আদান প্রদান ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্যবসায়ী ভূমীয়া জাতির কক্ষক্ষেত্র কামরূপ অতিক্রম করিয়া গোড় ও মগধদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সমসাময়িক আয়ুর্কারগণের পুস্তকে তাঁহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতিঃ সীহত বঙ্গদেশবাসীর সংস্রবের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সেই সংস্রবের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষার গেজেট, গিঞ্জ, পান্স, গ্যাস, পিত্তন প্রভৃতি শব্দ এখন ক্রমশঃ বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীন কালে শক, হুন, কুশান, পার্শীয়া, গ্রীক ও মোঙ্গল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়া ভারতবাসী হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভাষাতত্ত্ব অবস্থায় এদেশে আগমন করে নাই। এতদঞ্চলবাসীগণ অথবা কোচ নামে অভিহিত সম্প্রদায় এতদঞ্চলে কোন আশঙ্কক জাতি হইলে ইহাদেরও একটী ভাষা ছিল মনে করণে হইবে। ভাষার আলোচনার জাতিতত্ত্বের (Ethnology) আলোচনা সংগ্রহী আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বনামধন্য পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ভাষার সাহায্যে জাতি নির্ণয় প্রেষঃ বলিয়া মনে করিতেন। ভাষা স্বয়ংকার এই আলোচনার জাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য সত্যও সম্ভাব্য এবং আপনাদের খেঁজার উপর যে কন্মার্জ্জনীয় অন্বেষণের করা হইয়াছে তাঁহা স্মরণ করিয়া নিরন্ত হইলাম।\*

শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ।

\* “কামরূপের ইতিহাসের একাংশ” প্রবন্ধে (“সাহিত্য” ১৩২৫ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা) এই জাতি সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

## কাঁদে গো পরাণ কাঁদে।

—ঃঃ—

কাঁদে গো পরাণ কাঁদে  
 না জানি কিসের ছলে,  
 আঁখি জল ছাপিয়ে উঠে  
 নিশিদিন হিয়ার তলে ;  
 সঁকোর এ আঁধার আলো  
 আমার এ বুক ভরালো,  
 বেদনার পরশ দিয়ে  
 বার বার আঁখির জলে।  
 আঁধারের বুকের মাঝে  
 আমার কাঁদন বাজে,  
 আমারি কাঁদন-ধারা  
 গগনে বয়ে চলে।  
 ও আমার নিষ্ঠুর প্রিয় !  
 দিয়ে গো আঘাত দিয়ে,—  
 সে যে মোর মাথার মণি,  
 সে যে মোর মালা গলে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

## ঐক্য

—ঃঃ—

এবার যখন গ্রীষ্মাবকাশে পুরী বাওয়া স্থির হইল তখন আর আমার উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না, কারণ ইহার পূর্বে আরো দুইবার পুরীর সমুদ্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপের মাঝে হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তরে কেবলি সমুদ্রের চিরস্বপ্নময় সুপ্ত স্থিতি জাগরিত হইয়া আমার আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়েই পুরীতে লোকসমাগমের আধিক্য, সেডনা বহু চেষ্টার পর একখানি বাড়ী পাওয়া গেল কিন্তু সেই সঙ্গে বহু আত্মীয়-স্বজনের ভয়প্রদর্শন ও বাধা অগাছ করিয়া বাওয়া স্থির করিলাম কারণ কিছু দিনের জন্য সংসারের পুরাতন ভাবনাচিন্তা বিষ্মত হইতে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। যাত্রা করা

গেল। গ্রীষ্মধিক্যে পথে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা বহুদিন স্মরণ থাকিবে। কলিকাতায় এক রাত্রিও না কাটাইয়া সেই সন্ধ্যার আবার আমরা চারজন যাত্রী সপরিবারে বহু মালপত্র লইয়া পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। কোনরূপে অর্দ্ধ নিদ্রায় রাত্রি যাপন করিবার পর যখন প্রভাতে পুরী আসিয়া পৌছিলাম, দেখিলাম আমাদের ভ্রাতারা অথবা পরিচিত কেহই স্টেশনে আসে নাই, তাই কোনরূপে আপনারাই সকল বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া করিলাম। স্টেশন হইতেই দুইজন পাণ্ডা আমাদের অহুসরণ করিল এবং অন্য একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর তাহাদের মুখে শুনিলাম যে তাহারা ই আমার শ্বশুরবংশের পাণ্ডা অর্থাৎ “বিহার মহারাজের পাণ্ডা!” পথ হইতেই সমুদ্র দর্শন করিলাম, মনে হ'ল কত দিনের পুরতান বন্ধুকে দেখিলাম এবং বহুদিন পরে বন্ধুদর্শনে হৃদয় যেরূপ আলোড়িত হয় সমুদ্রের হৃদয়ও সেইরূপ ঘন ঘন আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, নৃত্য করিতেছে। মনে হইল যেবার প্রথম সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলাম, দেখিয়া দেখিয়া মনে যে উচ্চ ভাবের উদয় হইয়াছিল, যে উদার মুক্তির আশ্বাস লাভ করিয়াছিলাম, যেরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম—সমুদ্র সেইরূপই আছে! সেই গর্জন, সেই নঠন, সেই তরঙ্গের পর তরঙ্গমাণ, সেই ফেনার অজস্র-প্রকাশ!—কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র মানব, সংসারে আবদ্ধ জীব, জীবনের তুচ্ছ আখ্যাত-অভিধাতে আমাদের জীবন-স্রোতে কি পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।

বাহা হউক আমাদের বাড়ীটি সমুদ্রের খুব নিকটে; অবিরান জলকল্লোল শুনা যায় এবং প্রতি কক্ষ হইতেই সমুদ্রের অবাধ বিস্তৃতির অতুলনীয় শোভা দেখা যায়, সমুদ্রের নিম্নল মূল্য বাতাস উপভোগ করা যায়। এই সে সমুদ্র—ইহার বর্ণনা কি ভাষায় সম্ভবে? শব্দের আধার এই সমুদ্র, ইহার নিকট সকল ভাষাতে যে মৌন মুক হইয়া যায়। তথাপি জগতে এমন ভাষা বোধ হয় নাই, এমন সাহিত্য বোধ হয় নাই—যাহাতে সমুদ্রের বর্ণনা নাই; বনে পড়িল,—

“হে ছনিবার মুক্ত উদার  
হে পূর্ণ অক্ষরস্তু  
চেয়ে দেখি ঐ বিপুল উরসে  
অসীমের ভাষা অস্তুরে পূর্ণ  
হেরি নেপথ্যে অন্তবিশীন,  
কল্পলোকের দারুণ।  
খেলিছ এমনি লীলাউদ্বেগ  
অনলিন ম... দীপ্ত  
কত না ভাবুক তব পাশে আসি  
এমনি হরষে আলোড়ি উছাসি  
সংগেহেন তোনা অনন্ত-অখ্য  
বিভোর অপরিভৃপ্ত!

কত জল কত ভাবে কত কথাবিন্যাসে ইহাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু যে এক বার হৃদয়ে দেখিয়াছে সে বুঝিয়াছে, সব চেষ্টাই বতদূর ব্যর্থ! কোন চিত্রকরের রঙ্গীণ রেখাপত, কোন কবির কাব্যসৃষ্টি ইহাকে কোন দিন প্রকাশ করিতে পারিবে না, এ সমুদ্র এমনি প্রাণময় অনন্তের রূপ, এমনি অনির্বচনীয় স্থলর!

এ বাড়ী হইতে পুরীর ঞ্চান ঘাট দেখা যায়; যেমন গভীর তেমনি সুন্দর দৃশ্য, ইহা এক দিকে যেরূপ ভয়াবহ অপর দিকে তেমনি প্রাণপ্ৰাণী! যেদিন প্রথম দেখিলাম—রাজির নিবিড় অন্ধকারে, জনশূন্য সমুদ্র-সৈকতে চিত্তাব অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার রক্তিমভা সমুদ্রের ফেণার উপর পড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া তটের উপর ভাসিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে! ঐ ত জীবনের সমাপ্তি, ঐ অনন্ত আকাশের তলায় অনন্ত সমুদ্রের ধারে এই নখর মানব জীবনের অবসান; এক মুহূর্তের মাঝে প্রাণে কি অনন্তের ছায়া পড়িল। মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার এই সংমিশ্রণ, ইহাতে বিভাবিকা কোথায়? পরম ভয়ানক আজ পরম সুন্দর পরম মধুর হইয়া প্রতিভাত হইল। এই ঞ্চান ঘাট হইতে কিয়দূরে ইহার অধিকারী যে বিগ্রহ আছেন তাহার নাম 'শ্রীমান মহাবীর', ইনি ঞ্চানবাসী ছুতপ্রেতগণের প্রহরী। শুনিতে পাওয়া যায় বহুদিন পূর্বে পুরীর এ অঞ্চলে জনমানবের বাস ছিল না, এমন কি দ্বিপ্রহরে লোক আসিতে ভয়বিহীন হইত, কিন্তু এখন এত লোকালয় হইয়াছে যে ক্রয় করিতে চাহিলেও জমি পাওয়া দুস্কর!

সমুদ্রে স্নানের কথা অনেকে হয় ত অনেকভাবে লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই কিন্তু এবার সমুদ্রস্নানে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লিখিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পুরীতে যেমন সমুদ্রে স্নান কারবার সুবিধা—তেমনি আনন্দ। এখানকার তটভূমি সমতল, কোনখানে চোরা বালি নাই, কোমরজল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিলেও ডুববার সম্ভাবনা নাই। প্রকাণ্ড বড় চেউগুলি যখন ফেণার মুকুট পরিয়া তটভূমিতে ছুটিয়া আসে তখন যুগলং হৃৎকম্প ও হর্ষ উপস্থিত হয়। আবার চেউটি মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেলেই আর কোন ভয় নাই। তবে পূর্ণিমার সময়ে সমুদ্রের স্রোতের যেরূপ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হয় তাহাতে একা স্নান করিতে যাওয়া নিগাপদ নহে। চেউয়ের উপর চেউ আসিয়া, ফেণার ফেণায় আঘাত লাগিয়া, ফোয়ারার মত উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া সহস্রবারায় করিয়া পড়িতে থাকে। পুরীতে এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়, তাহাদের নাম 'মুলিয়া', ইহারা ই যাত্রীদিগকে সমুদ্রে স্নান করায়। ইহারা এবং ইহাদিগের সন্তানেরা জলজন্তুর মত সস্তরণপটু, অক্লেশে বড় বড় চেউগুলির ভিতর দিয়া বহুদূর পথান্ত সস্তরণ করিয়া যায় ও চেউয়ের মাঝে পরস্পর নিক্ষেপ করিলে নানারূপ কৌশলে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে পারিতোষক আদায় করে।

এখানকার মৎস্যধরণও বিচিত্র, একটি করিয়া বড় চেউ আসিলেই মৎস্যজীবী বালকগণ জাল লইয়া ছুটিয়া গিয়া জালের দুই পার্শ্বের খুঁটি বালির ভিতর চাপিয়া ধরে, আবার চেউ চলিয়া গেলেই তীরে জাল টানিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন আরও দুই প্রকারের মাছ ধরা দেখিয়াছি। প্রত্যহে মৎস্যজীবীগণ নৌকা বা ভেলার চেউয়ের সীমা পার হইয়া বহুদূরে চলিয়া যায়, তার পর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্তন করে। এক একটি বড় চেউয়ের আঘাতে ঐ নৌকা উল্টাইয়া গিয়া আরোহীগণ জলে পড়িয়া যায় আবার তৎক্ষণাৎ দ্রুত কোশলে দুইজন দুইদিকে লাফাইয়া উঠিয়া বসে, ইহা দেখিতে বড়ই প্রীতিকর। আবার রজ্জুগাত্রে বঁড়শি লাগাইয়া মাছ ধরিতেও দেখিয়াছি, চেউয়ের উচ্ছ্বাসের মাঝে প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ধরিয়া থাকে, তারপর মাছ পড়িয়াছে বুঝিলেই টানিয়া তোলে। সন্ধ্যার সময়ে সমুদ্রের ধারে যাত্রীদিগের জনতা, তাহাও বেশ দর্শনযোগ্য! কেহবা বাসুকা লইয়া ঘর বাঁধিতেছে কেহবা ঝিঝু কুড়াইতেছে, কেহবা গল্পগুজব করিতেছে, কেহবা সর্কাদে ভয়মাখিয়া পুঞ্জায় বসিয়াছে, কেহবা চেউয়ের সহিত খেলা করিতেছে। ছোট ছোট শিশুগুলির আনন্দের শেষ নাই, তাহারা সমুদ্রের মুক্ত বাতাসের মাঝে ছুটিয়া খেলিয়া ফেণার সহিত দৌড়িয়া হাসিয়া বালির উপর সূঁটাপুটি করিতেছে।



আর একটি জিনিষ দেখিয়া বড় আনন্দ হয়—সে বাকালী মেয়েদের স্বাধীনভাবে বিচরণ। চির অবশ্রুতনবতী অক্ষুণ্ণা মহিলারা এখানে খেঁজার বেড়াইতেছেন, সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতেছেন, শোভা দেখিতেছেন! তীর্থস্থানের এই অবাধ স্বাধীনতাটুকু আমার চক্ষে বড়ই মধুর বোধ হইল।

পুরীতে এত মঠ বিদ্যমান যে সবগুলির সংখ্যা নিরূপণ করাই একরূপ অসম্ভব। রামানুজ ও চৈতন্যপন্থী-সম্প্রদায়ের ৭৫২টি মঠ আছে। কেবলমাত্র তার যে কয়টি উহার মাঝে প্রধান এবং আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার মাঝে জটীরা-বাবার আশ্রম (অর্থাৎ বিষ্ণুকৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ) সর্বাঙ্গাঙ্গীন্দ্র সুন্দর! এই মঠটি নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ফলফুলের বৃক্ষাচ্ছাদিত ছায়াশ্রুণীতল নির্জন স্থানটিতে ৮বিষ্ণুকৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি নির্মিত হইয়াছে। সমাধিটির সম্মুখে তাঁহার বসিবার চৌকি ও তাহার পার্শ্বে তাঁহার একটি বৃহৎ ছবি রক্ষিত। একটি জিনিষ দেখিয়া মনে বড়ই আঘাত পাইলাম তাঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিবার সূত্রপাত হইতেছে, তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। যিনি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান কালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে তাঁহার ভক্তদিগকর্তৃক পুঞ্জিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অবতার-বাদের সূত্রপাত হইতেছে তাঁহাকেই আজ তাঁহার মৃত্যুর পর অবতার রূপে পূজা করা হইতেছে ইহা হইতে পরিভ্রাণের বিষয় আর কি আছে? পুরীতে সর্বস্থানে এই অবতারবাদ এতদূর প্রবল এতদূর বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে যে প্রকৃত ধর্ম বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ভক্তি গোড়ামিতে পরিণত হইয়া প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করিতেছে।

বাহা হউক এখানে তিনবার ভোগ হয়। সকালে চা, মধ্য ফলমূল, অপরাহ্নে মহাপ্রসাদ। এই খাদ্যই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার সমাধির নিকটে তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ মহাভারত ও গ্রন্থসাহেব পঠিত হয়। এই আশ্রমে তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম নির্মিত আছে, এবং এই আশ্রমের এক সৌম্য একটি অত্যন্ত পুরাতন অখণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান, ইহার নিম্নে চৈতন্যদেব আসিয়া উপবেশন করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই মঠ হইতে প্রতিদিন একশত ভিক্ষুককে অন্ন দান করা হয়। এইখানে প্রথম ভূজ্য বৃক্ষ দেখিলাম।

ঐযং শঙ্করাচার্যের মঠ,—

এখানে শঙ্করাচার্যের একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত মৌলিকালের সুন্দর প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে। এই মঠের অধিকারী ন্যায় দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া শুনা যায়। এখানে প্রতিদিন বেদ পঠিত হয়।

নানকপন্থী মঠ,—

এখানে শিখ কর্তৃক নানকের চিত্র পুঞ্জিত হয়। এই মঠে শিখদিগের বাক্যালাপ অন্যান্য মঠের পাণ্ডাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে ভদ্রোচিত। এক পার্শ্বে জগন্নাথের চিত্র ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে। এখানে শিখদিগের গ্রন্থসাহেব পঠিত হয়; এই মঠে একটি ‘ভাস্কর-ভাদ্রব্য’ নামক কূপ আছে, ইহা এমনভাবে নির্মিত যে দুই ব্যক্তি একই সময়ে জল তুলিলে পরস্পরকে দেখিতে পাইবে না, একজন উপর হইতে জল তুলিবে অপর জন মূর্তিকার নিম্নে বেসোপান আছে সেখান হইতে জল লইবে।

রাধাকান্তের মঠ—

এখানে তান্ত্রিকদের উপর চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্তি ও তাঁহার ব্যবহৃত কহার ছিরাংশ ও একটি কলহাদি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ইহা ভিন্ন যে খড়ম আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে।

অমর মঠ,—

এখানে রঘুনাথ মূর্তি রক্ষিত আছে, ইহা অন্যান্য মঠ অপেক্ষা বৃহৎ, ইহার অধিকারী বোহল অভ্যন্তরীণ ধনী ইহার বোহল জুড়িগাড়ী ইত্যাদি আছে।

কবীর মঠ,—

এখানে মহাত্মা কবীরের কাঠপাত্রকা ও জপমালা আছে। এতদ্বির তাঁহার অন্যান্য ভক্তদিগের সমাধিও নিশ্চিত আছে। এখানে এক ব্যক্তি একটি 'মুড় কাঁটা' লইয়া দর্শকদিগের মন্তকে মারিতেছে। শুনিলাম ইহা কবীরের কাঁটা; এই কাঁটার উৎপত্তি যে কোথা হইতে হইল তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। অনেক পুণ্যের প্রলোভন সত্ত্বেও উড়িয়া পাণ্ডার হাতের সম্মার্জনী গ্রহণে স্বীকৃত হই নাই।

সিদ্ধাবকুল—

এটি চৈতন্যদেবের সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে যে বকুলগাছ বিদ্যমান তাহার একদিক ভগ্ন বকুলসার হইয়াছে তথাপি সেনিকে বৃক্ষে রস চসিচলের কোন শাখা নাই। প্রবাদ আছে,—এক বৎসর জগন্নাথের রথের চাক্ষু প্রস্তুতের জন্য পুরীর রাজা ঐ বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ করেন কিন্তু প্রাতঃকালে আসিয়া সকলে দেখিল বৃক্ষটি অশূন্য শূন্য হইয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। তখন হইতে ঐ অবস্থার বিদ্যমান আছে। এখানে একটি বড়-ভূজ চৈতন্য মূর্তি আছে।

হরিদাস মঠ—

ইহা ভক্ত হরিদাসের সমাধি। প্রবাদ আছে,—চৈতন্যদেব স্বয়ং ইহার শবদেহ বহন করিয়া এই স্থানে প্রোথিত করেন। ইহা যদি প্রকৃত হয় তবে বুঝিতে হইবে প্রায় চারি শতাব্দী পূর্বেও সমুদ্র ঠিক এই স্থানেই ছিল কারণ এই সমাধিটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে একটি চৈতন্যদেবের একটি নিত্যানন্দের ও একটি অষ্টমতের মূর্তি আছে, তিনটিই অবিচ্ছিন্ন একরূপ।

ইহা ভিন্নও পুরীতে অন্যান্য বহু মঠ আছে।

একদিন আমরা জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম। তাবিয়া গিয়াছিলাম,—ভাল করিয়া মন্দিরের কারুকাণ্ড দর্শন করিব, কোন্ School of Art তাহা অস্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করিব কিন্তু সাধ্য কি আছে দাঁড়াইয়া দর্শন করি? যেমন যাত্রীদিগের জনতা তেমনি পাণ্ডাদিগের এবং ভিক্ষুকদিগের চীৎকার, মনোনিবেশ করিয়া দেখিবার অবকাশমাত্র দেয় না। মন্দিরে প্রবেশ করিবার চারিটি তোরণ, পূর্বদিকের তোরণের নাম সিংহদ্বার, দক্ষিণ দিকের তোরণের নাম অশ্বদ্বার, উত্তর দিকের তোরণের নাম হস্তীদ্বার ও পশ্চিম দিকের তোরণের নাম খণ্ডদ্বার।

মন্দিরের সমুখস্থ রাজপথ অত্যন্ত প্রশস্ত, এই পথ দিয়া জগন্নাথের রথযাত্রা হয়। জগন্নাথের মন্দির ও মূর্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে অনেকরূপ মতভেদ আছে। A. C. Mukherjee's Short History of the Indian people নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে উড়িষ্যার.....গঙ্গাবংশীয় চোলাগঙ্গাদেব নামক এক মরপতি উড়িষ্যা ভ্রম করেন, তাঁহার উড়িষ্যা ভ্রমের স্মৃতিচিহ্নরূপ এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

আবার কেহ বা বলেন ইহা বৌদ্ধমঠ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন, মহাজন ও বীনজন। বীনজনগণ বুদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া সংসার ত্যাগী

হইতেন, এবং মহাজনগণ সংসারে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিতেন। ইহারা কালক্রমে বুদ্ধদেবের ধর্মের উচ্চ আদর্শের ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করেন ও সেই সকল মঠে বিগ্রহ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরে বর্তমান হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। সেই সময়ে বৌদ্ধ উৎসব ও বৌদ্ধ দেবদেবীগুলি হিন্দুরা ক্রমশঃ আত্মস্থ করিয়া লন। জগন্নাথ বিগ্রহ ও তাঁহার উপাসনাও এই সময়েই হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়। কিন্তু পাণ্ডারা এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহারা বলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের বহু পূর্বে হইতে জগন্নাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পূজিত হইত। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের সময়ে ঐ হিন্দু মূর্তি বৌদ্ধমূর্তিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন কিন্তু পুনরায় বৌদ্ধধর্মের পতন হওয়ার ঐ মূর্তি হিন্দুরা গির্জিয়া পান। এ কথা তেমন বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা ভিন্ন আর একটি মত প্রচলিত হয়। প্রবাদ আছে জগন্নাথ দেবের বক্ষের অভ্যন্তরে একটি কৌটার মাঝে প্রাণপুরুষ বিদ্যমান আছেন, ছাদশ বৎসর পরে জগন্নাথদেব যখন কলেবর ত্যাগ করেন তখন ঐ প্রাণপুরুষকে ও কলেবরান্তরিত করা হয়। কিন্তু উহা নাকি বুদ্ধদেবের দন্ত অথবা পঞ্জব সঙ্কে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রতি বৎসরে দ্বাদশমাসের সময়ে অত্যন্ত গোপনে ঐ দন্ত বাহির করিয়া ধোত করা হয়। ইহা শুনি কলেবরে স্থাপনকালে পাণ্ডার চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। আবার একপণ্ডিতনাথ যার যে গ্রন্থকার এই মন্দিরটি অধিক দিনের নহে, ইহার নির্মাণকাল আট নব শতাব্দীর অধিক নহে। পাণ্ডার বলে 'এ মন্দির এক প্রস্তরে নির্মিত' কিন্তু দেখিলে তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে এটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যে রূপভাবেই প্রস্তুত হউক না কেন ইহা মুকোশলে নির্মিত হইয়াছে, যে কোন ক্ষত্রে যে কোন প্রহরে সূর্য্য যে ভাবেই থাকুক না কেন ইহার ছায়া চত্বরের বাহিরে পড়ে না। এমন সুন্দর কারুকাষা খোদিত প্রস্তর-মন্দির কেমন করিয়া দাঁড়া করান হইল তাহা বলে আশ্চর্য্যাবিত হইতে হয়। জগন্নাথের মন্দিরের চতুর্দিশে প্রকাণ্ড চত্বর, তাহাতে যে সকল প্রধান প্রধান দেবদেবীর মূর্তি আছে তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিমলাদেবী (শক্তিদেবী)—ইহার মঠ মন্দির অভ্যন্তরস্থ ভূমির নৈঋত কোণে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরী (শক্তিদেবী)—মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত।

ক্ষেত্রকালী (শক্তিদেবী)—ইহা বায়ুকোণে অবস্থিত।

মহালক্ষ্মী (বৈষ্ণবদেবী)—মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত।

উত্তরায়ণী—মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। ইনি তান্ত্রিক মতে পূজিত হইয়া থাকেন।

শীতলা,—ইহার বৈষ্ণব মতে পূজা হয়।

ঈশানেশ্বর মহাদেব—ঈশান দিকে অবস্থিত, ইনি জগৎকুর গুরু বলিয়া কথিত হইলেন।

বিষনাথ পতিতপাবন—পূর্বে দ্বারপথে অবস্থিত। যে সকল হীনজাতিকে মন্দির অভ্যন্তরে ঠাকুর দর্শন করিতে দেওয়া হয় না, তাহারা দ্বার পথে দাঁড়াইয়া এই পতিতপাবন মূর্তি দর্শন করিষ্ঠা যায়।

কল্লবীট—কল্লেশ্বর মহাদেব—

বটমঙ্গলা, বালমুকুন্দ—ইহারা সকলেই অগ্নিকোণে অবস্থিত।

ক্ষেত্রপাল, রোহিণী কুণ্ড মধ্যে ভূবতীকাক—দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

ইহা ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক দেবদেবী আছেন। এইরূপে সূত্র হইতে সূত্রাদিপি মন্দিরের পাণ্ডাও কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে, সকলেই চীৎকার করিয়া বাত্মীয়গকে পুণ্যের প্রলোভন দেখাইতেছে

ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় না। এ যে নিজেকেই স্বয়ং বঞ্চনা করা! ধর্মের বেশ পরিয়া অর্থলান্সা প্রকাণ্ড ক্ষুধিত পিশাচের মত আমাদের ভারতবর্ষের পুণ্য-লোভাতুর ব্রহ্মচারিণী বিধবানিগের যথাসর্বস্ব শেষণ করিয়া থাকতেছে। একস্থানে দেখিলাম কতকগুলি ব্রাহ্মণ টিফি নাড়িয়া, উড়িয়া ভাষায় কথাবার্তা কহিতেছে, আমরা যাইবামাত্র সমস্তের ভিড়ের আবেদন জানাইল। পরে শুনিলাম ইহাদের পূর্বপুরুষগণ বহু বৎসর পূর্বে সমস্তপ্রকার শাস্ত্রবিধারদ ছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে অন্য সকল কার্য নিষিদ্ধ ছিল কেবলমাত্র ঐ স্থানে বাসরা সপাদিনব্যাপী জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রালোচনা ও কুটতর্কেরও যৌমাংসা সমাধান করিতেন। সে জন্য সে অর্থদণ্ড এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুরুষাত্মকনে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করার প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু সেক্ষেপ শাস্ত্রালোচনা ইত্যাদি কিছুই হয় না শুধু অর্থলান্সার প্রবল আধিপত্য!

আর এক স্থানে দেখিলাম এক ব্যক্তি, আর এক ব্যক্তির মস্তকে একটি পা স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। তীক্ষ্ণাঙ্গা করিয়া জানিলাম যে পা রাখিয়াছে সে ব্রাহ্মণ, এবং হাতের উপর রাখিয়াছে সে কোন হীনজাতি অপধর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছে তাই ঐ ব্রাহ্মণ তহার মস্তকে তীক্ষ্ণর রাখিয়া অপরাধ ক্ষলন করিয়া আশীর্বাদ করিতেছে! পূর্বকালে যে ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিতে সমর্থন্যাত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইত সেই ব্রাহ্মণের আজ সর্বগুণ তিরোহিত হইয়া শুধু ঐ ব্রাহ্মণত্বের দম্ভটুকু অবশিষ্ট রাখিয়াছে! তাহার গুরু জগন্নাথ দর্শন করিবার সময় আসিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকার ও গৃহতল ভলময়, হুঁ একটি প্রদীপের ক্ষীণালোকে অতি সন্তপণে চাহিতে হয়। তখন জগন্নাথ বলরাম ও হুঁতার নিতানৈমিত্তিক বেশ পরিবর্তন ও চন্দনলেপন হইতেছিল। ব্যতীর হইতে বহুলোকের সমস্তের বন্দনা গীতি ও তিরের চন্দন ও ফুলের গন্ধ মনে ভক্তিরসের সঞ্চার করে। জগন্নাথ মূর্তি ওঁকারের অন্তরকরণে নিম্মিত কিন্তু এই জগতের প্রভু যিনি, সকল কল্লনার কেন্দ্র, সকল সৌন্দর্যের সৃষ্টকর্তা, সকল পোষের আবার, জগতের নাথ যিনি তাহার মুখাবয়ব যে কেন আরো সুন্দর করিয়া গঠন করা হয় নাই! আমরা অনভিজ্ঞ তাই বেদমুখ ভাবি যখন তাঁহাকে কলেবর দান করা হইল, আকৃতি দান করা হইল, প্রতিদিনের মানবোচিত বেশভূষা আগার ব্যবহারের গভীর মাঝে বদ্ধ করা হইল, তখন কেন আরো সৌন্দর্য্য দিয়া আরো দাম্পূর্ণ্য দিয়া গঠন করা হইল না? সে যাহা হউক হিন্দুধর্মের এমন যে পবিত্র পূজার স্থান সেখানকার ব্যবহার দেখিয়াও মন্যমত হইয়াছি। যে সকল ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরের প্রতি-দ্রব্য গ্রহণ করিবার পূর্বে হস্ত শুদ্ধ করিতেছে তাহারাই আগার মহাপ্রভুর প্রণামীর টাকা লইয়া জগন্নাথের চরণতলে দাঁড়াইয়া বিবাদ করিতেছে; কাড়া কাড় করিতেছে। চণ্ড অপাবিত্র করিতেছে।

শুনিলাম ঠাকুরের ফুলের মালা রাখিবার জন্য আটতন ব্যক্তি বেতন দিয়া রক্ষিত হইয়াছে, তাহার সারানিন ধরিয়া মালা গাঁথে। ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিবার যে পথ আছে তাহা এত সক্ষীর্ণ যে হুঁ জন লোক পাশাপাশি যাইতে পারে না। যতরূপ শ্রম করা আছে সকলের মূলে অর্থ আদায়, ধর্মের অর্থপণ্ডনের এই দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। ঠাকুরকে সমস্ত দিনে পাঁচটি ভোগ দেওয়া হয়, 'দকাল ধূপো' সকাল ৮টায়, বালাভোগ ১০টা, মধ্যাহ্ন ভোগ অথবা 'ছপার ধূপো' মধ্যাহ্ন ১টা, 'সাঁক ধূপো' রাত্রি ৯টায়, বড় শ্রাদ্ধ ভোগ রাত্রি ১টা ৫৫ এই পাঁচ বারে ৫৬ প্রকার ভোগ দেওয়া হয়।

এই ৫টি ভোগ ছাড়া আর একরূপ ভোগ আছে, রাজবাড়ী ব্যতীত সম্প্রসাধারণ যে ভোগ দেয় তাহাকে ছত্র-ভোগ বলে। পুরীর রাজার পক্ষ হইতে দৈনিক ৩৩০ টাকার ভোগ দেওয়া হয়।

ভোগ রন্ধনের সময়ে ও জগন্নাথকে নিবেদন করিবার সময়ে পাণ্ডারা নাগিকা ও মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে,—পাছে ঘ্রাণে অন্ধভোজন হয়। যত ভোগ প্রস্তুত হয় তাহার তিন চতুর্থাংশ বিক্রয় হইয়া রাজার তহবিলে যায়, অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ হইতে পাঁচটি ভাগ করা হয়, ভাষা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। এক থালা মন্দিরবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য, এক থালা পাণ্ডাদের জন্য, এক থালা ব্রাহ্মণদের জন্য, এক থালা রাজবাড়ীর জন্য ও এক থালা রন্ধনবাটী সম্পর্কীয় সকল কন্ঠারীদের জন্য। এই ভোগ ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিবার কোন প্রথা নাই, তাহাদের নিকট ঠাকুরের এই ভোগ মূল্য লইয়া বিক্রয় করা হয়। এই প্রকৃত উপযুক্ত গাভ্রদিগকে কেন যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় না জানি না যিনি একবার এখানকার জরাজীর্ণ ও রোঃপ্রাপ্ত অসংখ্য ভিক্ষুককে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই হৃদয়ে কি গভীর বাথা অনুভব করিয়াছেন।

প্রাতে ষটার সময়ে মঙ্গল আরতি শ্রদ্ধার; ‘কুলা’ ‘মুখধৌত’ ‘দন্ডধাবন’ ‘ভিহ্বামার্জন’ ইত্যাদি হয়। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক ভোগের পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শ্রদ্ধার হইয়া থাকে। সপ্তাহের ৭ দিনে ৭ রংএর বস্ত্র পরিধান করান হয়।

জগন্নাথের ১২০ জন দেবদাসী আছে। ইহাদিগকে উড়িয়াবাসীগণ “সাহরী” বলে। মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভিক্ষুকদিগের যে ভয়ানক উৎসাহ সহ করিলাম এরূপ বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নাই। আমরা দ্বারের ভিতর হইতে দুই হাতে কেবলি পয়সা ছড়াইতে লাগিলাম তবু নিস্তার নাই, কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। আমাদের গাড়ী আটক করিয়া তাহারা পরস্পরে যেক্রম বিবাদ ও মারামারি আরম্ভ করিল জাহাতে আমরা দুই জন মার জ্বালোক গাড়ীর ভিতর হইতে রীতিমত ভীত হইয়াছিলাম। দুইজন আহত হইল তবু নিরস্ত হইল না, কোনরূপে গাড়ী হাঁকাইয়া যখন তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিলাম তখন মনের মাঝে চাতিয়া দেখিলাম এরূপ ভাবে দান করিয়া একবিদু পরিচরিত লাভ করি নাই। ইহাদের মাঝে কুষ্ঠ ও গোদগ্ৰস্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক, ইহা ভিন্নও অনেক উপবৃত্ত পাত্র আছে তাহাণি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সব হতভাগ্যগণ যে মন্দিরের মহাপ্রসাদ বিনামূল্যে পায় না ইহাই পরিতাপের বিষয়। মন্দিরের চুড়ার নীলচক্রের উপর ধ্বজা টাঙ্গাইবার পদ্ধতি আছে। ১০ হইতে ৩০০০ টাকা পর্য্যন্ত দিলে দাতার নামে ধ্বজা টাঙ্গান হয়। ৩০০০ টাকা দিলে নীলচক্র দ্বহতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ধ্বজার স্বেদী বিস্তৃত করা হয়। নীলচক্রে হইতে খেতগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে ৭৫০ ও নীলচক্র হইতে চরণামৃত কুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে ১২৫ হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

জগন্নাথদেবের রথের কাঠ আটমলিক ও দশপাল্লার রাজা দেন ইহা ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য পুরীর রাজা দিয়া থাকেন। রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে ঐ রথ বিক্রয় হয় তাহার মূল্য রাজার তহবিলে যায়। মন্দিরের আগ বন্ধ প্রকারে হইয়া থাকে। প্রসাদ বিক্রয়ের অর্থ, প্রণামীর অর্ঘ্য ও রথ বিক্রয়ের অর্ঘ্য ভিন্নও অন্য অনেক প্রকারে অর্থ সংগ্ৰহ বুদ্ধি পায়। সে সকল যাত্রীগণ ঠাকুর দর্শন কালে অন্যান্য দর্শকদিগকে মন্দিরের বাহিরে রাখিতে চাহেন তঁাহারা পাণ্ডাদিগকে অধিক পরিমাণে অর্থ দিলেই ইহা সম্ভবপর হয়। সেবাহিত নিয়োগ কালও নজর লওয়া হয়। এই সকল আয়ের অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পন্ন হইয়াও ২০১২৫ হাজার টাকা উদ্ধৃত থাকে।

পুরীতে রামকুমার ধোরেকার, বংশীলাল মারওয়ারী ইত্যাদি ধনশালী ব্যক্তিগণের নিয়মিত ১৪১৫টি ধর্মশালা আছে। এই সকল ধর্মশালায় বাকীগণের অবস্থানের অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত।

আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। নরেন্দ্রসরোবর—ইহার জল অতি নিখল, এই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি নাটমন্দির নির্মিত আছে। এই সরোবরে নৌকা করিয়া ভগ্নাথদেবের নৌবিহার হইয়া থাকে।

আঠার নালী নদী—অষ্টাদশটি থিহানে বাধান সেতুর তল দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে ইন্দ্রহার রাজ্য অষ্টাদশটি আগুন পুত্র বলিদান করিলে এই নদা সপ্তষ্ট হইয়া সেতু বান করিতে দেন। কিন্তু সেতুর অবস্থা দেখিলে তৎ পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহা হইতে কিছু দূরে ইন্দ্রহার সরোবর এই সরোবরের এক পার্শ্বে রাজার এবং অপর পার্শ্বে রাণীর মূর্তি আছে। এই সরোবরের নিকটেই গুণ্ডাবাড়ী (ভগ্নাথের মাসীর বাড়ী)। রথযাত্রার সময়ে ভগ্নাথদেবকে মন্দির হইতে এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উড়িয়ার যে সকল ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করে তাহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর উড়িয়া ব্রাহ্মণ আছে তাহারা বলভদ্র গোত্রীয় শাস্ত্রান নামে পরিচিত, ইহারা মোটবহন, শকটচালন ও অন্যান্য শ্রমসম্পাদ্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণদিগের আচার ও বৈবাহিক সম্পর্ক নাই। ইহাদের এবং বৈশ্যদিগের মাঝে সাধারণতঃ চান বৎসর বয়সের কন্যার বিবাহ প্রচলিত, অন্যান্য জাতির মাঝে ইহাপেক্ষা অধিক বয়স্ক কন্যার বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের নিম্নে মহাস্ত্রী বা করণ জাতি (কাহলু) ইহাদের মাঝে কন্যার বিবাহের পর কন্যাকে পিতৃদ্বয়ে আনিবার প্রথা নাই। যদি কেহ বিবাহকল্পে বাতসম্পাদ্য সকল অর্জন করিতে পারে তাহা হইলে কন্যাকে পিতৃদ্বয়ে আন সম্ভবপর হয়। ভানাতাও শস্ত্রান্নয়ে গমনের ঐক্যই প্রথা। ব্রাহ্মণেরতর জাতির মধ্যে বিবাহকালে কন্যার সতি যান বত অধিকসংখ্যক দাসী প্রেরণ করিতে পারেন সমাজে—তাহার ততই প্রতিষ্ঠালাভ হয়। এই সকল দাসীর গর্ত্তজাত সন্তানেরা সগবৎসবা নামে অভিহিত হইয়া এক পৃথক জাতিতে পরিগণিত হয়।

হজাভয় গুড়াকর (গুড়িয়া বা মরো) গোপ ও ভাঙারী (নারিত), কতাইত বা তবা (চাষা) পাটরা (দোকানদার), পদান উড়িয়া, রহনী (ভাঁণী) এই সকল জাতি কনাচরণীয়। ইহাদের মাঝে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। শকর জাতি বহু শোভিত শিল্পক, ইহাদের কতক গুণী শৌন ও অস্পৃশ্য জাতিও আছে। এখানে জোতথী নামে একটি পৃথক জাতি আছে, তাহারা সাধারণ বঙ্গদেশের জোতথীদিগের মত ব্রাহ্মণ নহে।

এখানে উচ্চাশ্রমীর হিন্দুদিগের মাঝে স্থাপন অত্যন্ত গহিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের মাঝে মহিলাদিগের অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশের ভাদ্রবধু স্বামীর কোঠা নগরকে স্পর্শ করে না, কিন্তু এখানে স্বামীর কোঠা জাতের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত স্পর্শ করা ভাদ্রবধুর পক্ষে নিষিদ্ধ।

এখানে ধান্য চাষি প্রকার উৎপন্ন হয়। বৈশাখ মাসে ‘মাস্ত’ ও ‘বড়ধান’ বপন করা হয়, আশ্বিন মাসে ভাদ্রনাশ ও বড়ধান অগ্রগারণ বা গোয়ে বপন করা হয়। ‘ছোটমগু’ ধান্য (আমন) শ্রাবণ মাসে রোপণ করিয়া কাঠিকে কাটা হয়। ইহা ভিন্ন ভাড়ু নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে তাহা অগ্রগারণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে বপন করা যায়। এই ধান্য সাধারণতঃ ৬০ দিনে স্পষ্ট হয়।

বাঁশ প্রচুর পরিমাণে হয়। পাট ও সুপারীর চাষ অতি সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। নারিকেল এখানে অপ্রচুর, সর্ব্বত্রই নারিকেল বৃক্ষ লক্ষিত হয়। পূর্বে এখানে কোনরূপ শাকশবাজ উৎপন্ন হইত না কিন্তু এখন অন্যান্য স্থানের অধিকরণে এখানেও সর্ব্বপ্রকার ভরিতরকারির চাষ হইয়া থাকে।

এ বৎসর ভারতবর্ষব্যাপী যে ভীষণ হুড়কি দেখা দিয়াছে তাহা ভীষণতর রূপে উড়িয়ার প্রকাশমান। এ দেশে যে কত দরিদ্র তাগ স্বচক্ষে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। অস্থিকঙ্কালসার ভিক্ষুকদলের কক্ষ চীৎকার শ্রিঃ শ্রিঃ বৃদ্ধিলাভ করিতেছে অনাগারে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। গভর্ণমেন্ট হইতে ইহার প্রতিকার না হইলে অল্প উপায় নাই। গৃহে গৃহে রক্তনশালার নদীনা হইতে অন্নের ফেণ পান করিয়া ক্ষুধিত ভিক্ষুকদল প্রাণহারণ করিতেছে।

এখনে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াই চিকিৎসালয় ব্যতীত সরকারী ডাক্তারখানাও আছে তবে কঠিন রোগের ঔষধ পাওয়া কষ্টকর। এতবড় হীরাহানে চিকিৎসার আরো সুবন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন। এখানে ষালকদিগের স্কুল আছে কিন্তু কলেজ নাই। এখনকার সাধারণ পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও হীনাবস্থাপন্ন। অল্প কয়েকটি পথ ভিন্ন মোটর চালান একরূপ অসম্ভব। পুরীতে সাধারণতঃ অন্যান্য তীর্থস্থান সকল দর্শন করিবার রেলপথ ছাড়া অন্য উপায় নাই, যেখানে রেলপথ নাই সেখানে গোশকট অথবা পাহাড়ী পথ আছে। সমুদ্রতীর দিয়া দুই তিন ক্রোশ পথ পশ্চিমাভিমুখে পদব্রজে গমন করিলে ভ্রমণ দৃষ্ট হয়। শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই স্থানে গিয়া মৃগাদি শিকার করিয়া থাকেন। সমুদ্র তীরপটী সকল স্থানে কলিকাতাবাসী ধনশাণ্ডী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইষ্টানিঃ বাটী নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন।

আমাদের পুরী অবস্থানের কাল ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ষ্টেশনভিমুখে যাত্রাকালে সমুদ্রের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য হৃদয়ে-অতৃপ্ত বাড়াইয়া দিতে লাগিল। অনন্তের উদার সুন্দর ছবি জলয়ের চিত্রপটে নানা বর্ণ ভঙ্গিমায়, প্রভাতাকরুণপূর্ণ রোপাশুভ্র ফেণেচ্ছুরের ও পৌর্বাশী রংনার চন্দ্রকরোদীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল তদঙ্গ বক্ষেপেব অতুলনীর সৌন্দর্য্য-সম্ভার ছবির চিত্রপটে অঙ্কিত কারয়া বিচ্ছেদ-বেদনার সচিত্র পুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

—\*—

## পাণ ১

( শব্দের উচ্চ হেণ্ডা চাপায়ে প্রাতি— )

—\*—

জাগো বন্ধু জাগো ভাই হে তরুণ ভীষ্মের আশা  
আনো তব দুঃচিন্তা উদ্ধাপনা প্রেম ভাণ্ডারী,  
এখনও দারিদ্র্যে রচনিক তান আপ্যারী  
সংসারের পুন্যবস্ত্রে হওনিক ভ্রান্ত দিশাহারী  
এখনও চিত্ত তব হয়নিক কি বন্ধ কঠিন  
গাও মুখে ভাসিতেছে এখনও রক্তধার স্রাব।  
জননী জাতির বাথ্য ভের ভের স্নেহের মাঁ ক,  
ন্যায় সত্য লুটে পুণে ক্ষিপ্ত মৃগ দাঁড়াও অধিক।  
করণকে ছুবদলতা এখনো বলিতে শিবনি'  
পাষাণের পাদমূলে দাসবৎ এখনো লেখনি'।

পিতৃকল্ম খশুরের অস্থিচর্মে টানিয়া ছিড়িয়া  
 রচিয়া দামাধা কাড়া বাজাবে কি স্বগৃহে কিরিয়া ?  
 তাঁর বক্ষ রক্ত নিয়ে বক্ষুগণে করি নিমন্ত্রণ  
 পৈশাচ উল্লাসে তুমি মাতিবে কি সহ প্রিয়জন ?  
 সর্বস্বান্ত করি তাঁরে হাস্যস্থখে তাঁরি গৃহে ফিরে  
 গ্রহণ করিবে অর্ঘ্য মৃত্তিকার পাত্রে অস্থিনীরে ?  
 তথা জননীর করে শঙ্খ, শিরে সিন্দূর সন্মল  
 ভুমি কি ছুলাবে তথা দর্পভরে সুবর্ণ শৃঙ্খল ?  
 হেরিবে, ভ্রাতায় তথা আলিঙ্গিতে, বক্ষ ক্ষত হায়  
 তোমারি কৃপাণে ঝরা রক্ত তার তোমারে তিতার  
 রক্তশ্রোতে অস্থিপুঞ্জ আহতের করুণ চীৎকার  
 ভারমাঝে সিংহাসনে দুর্গনের করিবে প্রচার ?

প্রেম দেউলের দ্বার খুলিবে কি স্বর্ণকুঞ্জী দিয়া ?  
 হেলা ফেলা ক্রুর খেলা প্রেয়সীর প্রাণটুকু নিয়া !  
 এ'-ত তব প্রেম নহে—এ যে তব শিকার নিষ্ঠুর  
 শাঞ্চকে বিধিয়া তুমি মৃগশিশু ধরিবে চতুর ?  
 বেচিতে এসেছ তুমি ভব হাটে হৃদয়ের প্রেম  
 ভব প্রেমপুরোহিত শূদ্র বৈশ্য রৌপ্য আর হেম ?  
 জানিনা রক্তবৃষ্টি প্রেমপুষ্প ফুটিবে কেমনে !  
 ভক্তি দিবে প্রেম দিবে তুলানিতে স্বর্ণের ওজনে !  
 মাঝে যদি নাহি ছলে কণ্ঠহার সুবর্ণ শৃঙ্খল  
 দিবে নাক প্রেয়সীরে চির কাম্য পরশ শীতল ?  
 সুবর্ণের অসিপত্র ব্যবধানে দুইটি হৃদয়  
 অশিথল পরিরস্ত লাভিবে না কখনো নিদয় ?  
 দিবে নাক ফুলহার কণ্ঠে তার, বিনা মুস্তাশালা ?  
 ভিষক দর্শনী বিনা জুড়াবে না তার বক্ষোদ্ধালা ?

প্রিয়া কি গো লীলাযষ্টি মুঠে ধার সুবর্ণবেষ্টনী ?  
 গৃহসজ্জা দ্রব্য মাত্র ? পত্নী কি গো ধাতুর রমণী ?  
 ইন্দ্রিয়ের অর্ঘ্য সে কি বিকৃত্যাত শত অর্ঘ্য সনে ?  
 শ্রেষ্ঠ ভোগ্য-বাহিনী কি অম্বা বহু পশ্যারিণী গণে ?



রাজস্ব ভেটের সনে ক্রীতদাসী তোমার সেবিকা  
পত্রিকার কোণে যেন সর্ব্ব শেষে তার নাম লিখা !  
বিস্তে কি করিবে বিয়া নারীচিস্তে ঠেলিয়া চরণে ?  
যৌতুক-বাহীরে কি গো বক্ষে নিবে বধূর বরণে ?

জননীর নেত্রজল জনকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস  
মূর্ত্তি ধরে' বধূরূপে আসিবে যে তোমার আবাস ।  
কাতরা করুণাপাত্রী,—ভক্তি কোথা ? চিস্তে শুধু ভয়  
চাহিতে তোমার পানে ডরে তার কাঁপিবে হৃদয় ।  
অঙ্গে তার কণ্টকিত স্বর্ণীভূত ভ্রাতৃরক্ত সার  
মায়ের কলিজা,—ছোট ভগিনীর মুখের আহ্বান ।  
পিতৃবক্ষস্নায়ুপাশে বন্দী হয়ে হেরিবে কেবল  
পিতৃরক্তে পাতা গৃহে শুধু মা'র আঁখি চলছিল ।  
সে কি শাস্তি ! ভেবো না কি ক্ষুদ্রা বলি স্নে গো চিন্তহীন  
অক্ষুট বেদনা সে যে রক্ষোগৃহে জানকী মলিনা ।

পিতৃদৈন্ত-কুণ্ঠানতা সঙ্কুচিতা ভয়ে বেদনায়  
সে কেমনে হবে শিষ্যা নর্সসখী ললিত কলায় ?  
ভূধরের বক্ষ ক্ষত নদী কভু পারিবে ভুলিতে ?  
শব তট-বাহু-পাশে বেদনায় রবে গুমরিতে !  
হারাইবে মুক্ত প্রেম হাস্ত-সুখা বিশ্বাধরপুটে ?  
করো হৃদি বিনিময় বাধাহীন ধাতু-বঁধ টুটে  
তুচ্ছ স্বর্ণরৌপ্য-নাগি হারাও না পরশ-মানিক  
তুজগে চন্দন তরু জড়াও না তরুণ প্রেমিক ।

বুঝ নি বধুর হৃদি—কত দামী ভাবিতেছ তাই  
লামাণ্য পরীক্ষা-পাশে উচ্চ মূল্যে কিনিতেছ তাই,  
শত শত ডিগ্রী লাভে ভূসম্পদে রূপে উচ্চ কুলে  
তার যোগ্য মূল্য নাই কিছু পরে বুঝিবে সে ভুলে ।  
তখন ভাবিবে বন্ধু, যে দিয়াছে পরম রতন  
জীবনে সর্ব্বশ্ব দিলে তার ঋণ হয় না মোচন ।

“প্রীরঙ্গং দুকুলাদপি” শুচিশীল দীনগৃহ হ’তে  
শাক্তপুর মত ভাই আনো বহি’ হৃদয়ের রথে  
করে মৃণালের বালা কণ্ঠে বার বনফুল-মালা  
পতিভ্রতা ‘শকুন্তলা’ তব গৃহ করুক উজালা ।  
নিষ্কলঙ্ক কর প্রেমে হে প্রেমিক হ’য়ো না কঠিন  
কুল-দেবতার অর্ঘ্য কর পণ-আমিষ বিহীন ।

হর্ম্য নহে অর্থ নহে—নহে তুচ্ছ ভূষণ-সম্ভার  
বিবাহ করিতে হবে কুমারীর হৃদিটী, কুমার  
এসত্য না বুঝ যদি ব্যর্থ হবে পু’থি-বন খোঁজা  
কুবেরের উপাসনা, গ্রন্থ হবে—গর্দভের বোঝা  
ব্যর্থ সে শোণিতপাত হবে ভ্রাতঃ গণিত তোমার  
ইতিহাস—উপহাস, বিজ্ঞান সে অজ্ঞানতাভার  
সার হবে দৃষ্টিক্ষণ, ব্যঙ্গ হবে—উপাধির মালা  
ব্যর্থ হবে অর্থব্যয় ছাত্রাবাস হবে পণ্যশালা ।  
এই শিক্ষা নাহি পেলে, বিদ্যা তব বিফল ভূতলে  
কুট মিথ্যা শাঠ্য শিখি’ শুধু সত্য সাধনার ছলে ।  
গুণুক টাকার থলি গৃহে বসি বিগত-যৌবন  
হে প্রেমিক তুমি আগো—ভবিষ্যের আশা-নিকেতন ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

## আমাদের কথা ।

—:~:—

যে বই বসুক, আমরা যে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি, তাতে আর সন্দেহ নেই । এই চলার পথে  
আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক নতুন সমস্যার উদয় হয়েছে । সেগুলো বাস্তবিকই যদি সমস্যা হয়ে থাকে  
তবে আর সমাধানের চেষ্টা করা যে কর্তব্য তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না । তাই ‘ব্যক্তি বাস্তববাদ’-  
টীকে একটা সমস্যা মনে করে নিয়ে তার সন্ধে দু’চারটা কথা বলতে চাই ।

আমাদের পক্ষে এ জিনিষটা নূতন হলেও আসলে খুব নূতন নয়। ইউরোপে এই Individualism এর চর্চা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ যখন এ বিষয়ে প্রথম আলোচনী শুরু করেন তখন তাকে খুবই বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছিল। একদল লোক বলেছিলেন “রবিবাবু Individualism এর theory টা বেলাত থেকে বেমানাম ধার করে এনেছেন। এদের যুক্তি, ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদ বলে একটা কিছু আমাদের দেশে কোন কালে ছিল না। এটা বিজাতীয়; সুতরাং এর আলোচনার দেশের উপকার নেই—অপকার আছে। যা পূর্বে ছিল না, তা যে পরে আর হতে পারে না, এটা অবশ্য কোনো যুক্তি নয়, তবে ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদ কোনো জাতি বা দেশ বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিনা সেটা বিবেচনার বিষয় বটে।

প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হিসেবে যেমন কতগুলো কর্তব্য আছে তেমনি কতগুলো অধিকারো আছে। কারণ অধিকার যেখানে নেই দায়িত্বের কথা সেখানে উঠেই পারে না। ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে সব মানুষই সমান। তা সে করাসী হোক, ইংরেজ হোক, আর ভারতবাসী হোক। স্বাধীনতা যেমন জাতি মাত্রেরই জন্মগত অধিকার, ব্যক্তি-স্বাভাব্যতার উপরেও তেমনি মানুষ মাত্রেরই জন্মগত দাবী আছে। সুতরাং ব্যক্তি স্বাভাব্যতার কথা হচ্ছে বিশ্ব-মানবের কথা। সেটাকে কোনো জাতিবিশেষের গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে ভুল করা হবে।

তবে সমাজকে বাদ দিয়ে এ বিষয়ে কোন আলোচনা চলতে পারে না। কারণ সমাজ আর যাঁহি হোক—একজনও এবং প্রথমতঃ কতকগুলো মানুষের সমষ্টি। আমাদের সমাজ বেতাবে গঠিত তাতে মনে হয় ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্তির উপরেই তার ভিত্তি। কাজে কাজেই সম্পূর্ণ বাইরের এই তিনিষটাকে সমাজের মধ্যে জোর করে ঢোকানোর ফলে শুধু অশান্তিই বেড়ে চলেছে। যা নাট এবং যার দরকার নাই এমন কোনো জিনিষকে ডেকে আনা অবশ্য বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। কিন্তু চক্ষুমান্ ব্যক্তিমাতেই বল্লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্যই সমাজের শাস্তিভঙ্গ হয়েছে, এবং যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে এই অশান্তি আজ শুণ্ডপাতার হয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের বাবর্গারিক জগতে এবং মনোজগতে যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, তার কলে আজকের এই সমস্যা। একশ বছর পূর্বে আমরা যা ছিলাম আজ তা থেকে অনেক বদলে গিয়েছি। আমরা মনজনে যদি বদলে থাকি, তবে আমাদের দশজনকে নিয়ে যে সমাজ তা তেমনিই থাকবে কেন? অনেকদিন অন্ধকারে ডুবেছিলাম তাই আলো আর সহ হয় না। একটা নূতন কিছু উপস্থিত হ'লেই আমাদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হয়ে পড়েন। যুগযুগান্তব্যাপী “নিশ্চিন্ত আলস্য এবং নিষ্কর্ম নৈরাশ্য” বসে থেকে খুঁজবার এবং চলবার আনন্দ অনেকেই হারিয়েছেন। কিন্তু যটা বাড়ার ওপর এসে পড়েছে, “ওটা কিছু নয়, কিছু নয়” বলে চোখ বুজে রইলে তো সেটা “কিছু নয়” হয়ে যাবে না।

ব্যক্তি স্বাভাব্যতার জন্ম বিলেতের মাটিতেই হোক আর যেখানেই হোক, আমাদের পক্ষে এখন আর তা বিদেশী বা বিজাতীয় নয়। চোখটা একটু খুলে চাইলেই দেখা যাবে আমাদের “বার বাইরে” এ সমস্যা দিনের পর দিন স্পষ্টতর হয়ে আসছে। এ কথা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা করে না। কাজেই কোন Idealistic কবির কল্পনার খেয়াল মনে করে এবং দেশের জল মাটির সঙ্গে সংগ্রব হীন ভেবে যদি ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদকে দূরে সরিয়ে রাখি তবে অপরোক্ষভাবে সমাজেরই অকল্যাণ করা হবে।

কোন জিনিষই এই পৃথিবীতে নিখুঁৎ নয়; ব্যক্তি-স্বাভাব্যবাদেরও একটা খুঁৎ আছে। শুধু নিজেকে নিয়েই হাঙ্গির দিন কাটে না। কাজেই সমাজ বলে একটা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে “সকলে আমরা সকলের করে”—“Each for all and all for each” দেখানে দেওয়া নেওয়াই চিরন্তন সিরদ। প্রত্যেক হাঙ্গির

উপরই দেশ এবং সমাজের প্রচুর দাবী আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই দেশ এবং সমাজ যখন তাদের ন্যায্য দেনাপাওনা নিয়েও বেশীর জন্য অনায়াস করে জুলুম করতে চায়, তখন তার হাত থেকে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। “ত্যাগ” বড় না “ভোগ” বড়, এটা যে অনেকদিনের পুরাণো তর্ক। হতে পারে মানুষের মনুষ্যত্ব আত্মত্যাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়; কিন্তু এটাও ঠিক যে যারা ভোগ করতে জানেন তাঁরাই শুধু ত্যাগ করতে পারেন। মানুষ অন্তর থেকে যা করে না, সে কাজ কোনদিনই ঠিকমতো হয় না। ত্যাগ ভাল, অতএব গোড়া থেকে যদি আর সমস্ত হতে নিজেকে বঞ্চিত করে ত্যাগের চেষ্টা করা হয় তবে পাখীর শেখানো বুলীর-মতো সেটা একান্তই প্রাণহীন হবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তো এই কথাই বলতে চায় যে ত্যাগ কর। ত্যাগ না করলে কেউ বড় হয় না। কিন্তু তুলে বেওনা যে হুমি “মানুষ,” যন্ত্র নও; তোমার প্রাণ আছে আর স্বাধীনতা সেই প্রাণেরই জিনিষ। পরার্থে ত্যাগকে ততক্ষণই শ্রেয়ঃ বলে মনে করবে যতক্ষণ না তার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে গিলে ত হতে না হয়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠলে প্রথমতঃ স্বামী জীর অধিকারের তর্ক উপস্থিত হয়। বহু শতাব্দী ধরেই পুরুষ নারীর উপর অবাধ প্রভুত্ব চালিয়ে এসেছে। তাই আজ বহুদিনের প্রচলিত পথ ছেড়ে নারীদের নিজেদের সমান বলে মেনে নিতে তাদের বড় অপত্তি। পুরুষ নিজের বেলা উচ্চ গলায় আপত্তি তোলেন—নিশ্চয় পেষণে মনুষ্যত্ব গেল। অথচ আশ্চর্য্য এই, তাঁহাদেরই দারুণ চাপে নারীর নারীত্ব কুটে উঠবার অবসর পাচ্ছে না। এবিষয় পুরুষেরা শুধু গানের জোরেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকেন। তার প্রমাণ তাদের স্বপক্ষে বলবার কিছুই নেই। অথচ নারীদের এই নারীগত আত্ম-অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য তাঁরা লজ্জিত নন। তাঁরাচ নাকি নারীদের ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিতাবক, একথা এখনো এবেশের লোকেরা বড়-গাংরি বলে থাকেন।

এই যে হিন্দু বিশ্বাস,—এতে পাদপ ত্রী উভয়েরই তো ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। দুই প্রাণী জীবন-জন্মে নিজ নিজ স্বধনুঃখের বেলা বইবে আর তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধী বাছাই করে দেবে অন্য লোক।

কতকগুলো গোত্রের সমষ্টিতে এন্টা জাতিব গঠন। এবং সেই লোকের সমষ্টি জীপুরুষে বিভক্ত কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখি জাতীয়জীবনে জী জাতির কোনো অধিকার নেই। কারণে আমরা জাতীয়-জীবনে অর্দ্ধপক্ষ।

অনেকে বলেন যে ঈশ্বরের এটা অভিপ্রায় নয় যে নারীজাতি পুরুষের সমান অধিকার পাবে। তাই তিনি পুরুষকে নারী অপেক্ষা বর্ধিতর করে গড়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে নারী কেবল ‘child producing machine’ তাদের সমাজে কোন অধিকার থাকবে না। এটা নেহাৎ গোঁড়া materialistic idea সুতরাং উচ্চজগতে এর স্থান নেই।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা গুলো দেখতে পাই, আমরা নারীজাতীর প্রতি দৃষ্টি দেইনি তা নয়, কিন্তু সেদৃষ্টিতে সম্মানের চেয়ে দয়ার ভাবটাই বেশী ছিল। “জীহত্যা মহাপাপ” এ বিধি শুধু জীজাতি চর্কণ বলে; এটা তাদের নারীত্বের গৌরব রক্ষা করার জন্য নয়। তবে রাষ্ট্রব্যাপারে যে তাদের অধিকার একেবারে ছিল না তা সত্য নয়, কারণ প্রথা ছিল রাণী ব্যতীত রাজ্যাভিষেক হতনা, তাই রামচন্দ্রকে স্বর্ণীতা পড়তে হয়েছিল।

শাস্ত্রের দে'হাই দিবে আশো আমরা সেই পুরাণের বিধিব্যবস্থা সজোরে আঁকড়ে ধরে রয়েছি। শাস্ত্র বলেন 'পতি দেবতা'। ব্যবস্থাটা শুধু পুরুষেরই স্বপক্ষে কেননা যিনি শাস্ত্রকার তিনি ছিলেন পুরুষ। স্ত্রীর তারি জয়। যে দেশে শাস্ত্রকার বসেছেন "অঃস্বানং সন্ততং রক্ষং মনৈরপি নারৈঃ পি—অর্থাৎ খন ও দারা বেন সমান কিনিব। চটোই শুধু স্ত্রীর সময় ভোগের, দুঃখের সময় ভ্যাগের। শিক্ স দেশের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারকে, শিক্ সে দেশের পুরুষ জাতিকে।

পুরুষ মদ্যপ হোক, মূর্থ হোক, তিনি দবশী, আর স্ত্রী দেবী হোক, বিহ্বলী হোক, সে দাসী। পুরুষ উপাস্য, স্ত্রী উপাসিকা; পুরুষ বক্ষক, স্ত্রী রক্ষিতা, এদেশের এই মনাতন নিয়ম। জানি না স্ত্রীজাতি যদি শাস্ত্রকার হতেন তবে তাঁরা একপ অজ্ঞাতাগে সমর্থ হতেন কি না, তাঁরাও পুরুষের মতো ভোগের দিকেই দৃষ্টি দিতেন কি না, এবং আধুনিক বিধি সম্পূর্ণ বিপরীত হত কি না।

অমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিলুম, পাশ্চাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও সে দেশের এ সভ্যতা দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা বলল তাঁরাই হচ্ছেন স্বাধিকারের রক্ষক। কিন্তু স্পষ্টবাদী বণবৈন যে ধর্মের স্ত্রীজাতি এখনো আমাদের চেয়ে বেশী উঠতে পারেননি। যদিও আচারব্যবহারের পার্থক্য সাময়িক অধিকারের কতক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মূলে উভয়েই সমান। সেখানেও পুরুষের জয়ময়কার। তাঁরা বলেন "Woman is the mistress of the house" কথাটা শুনে বড় বটে কিন্তু এটাও আমাদের "গৃহলক্ষী" বগাটারই মতো ফাঁপা। স্বাধিকার কি শুধু নাচতে গাইতে ও উপভোগের সামগ্রী হতে এ পৃথিবীতে এসেছে? রান্নাকর ও বাসন মাজাই কি তাদের একমাত্র কাজ? তারা কি শুধু অজ্ঞতার অন্ধকারেই চিরকাল ডুবে রইবে? তাদের কি কোন উচ্চতর কর্তব্য নেই, জীবনের মার্থকতা নেই? পুরুষ কি চিরকালই তাদের জয়গত অধিকারের পথে জড়না প্রচরের মতন দাঁড়িয়ে থাকবে? এর উত্তর কোণায়?

মানবের সভ্যতা অগ্রগত হচ্ছে স্বীকার করি কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার থাকিলে এর চেয়েও বিশৃঙ্খল বেগে কগ্রসর হতে পারত। এই মেনিনও বিলেতে স্বাধিকারের ভাট দিবার অধিকার নিয়ে কতনা কাণ্ড মচাটে গেল। এটা কি ইংরাজ পুরুষদের লজ্জার বিষয় নয় যে আশো তাঁরা চক্ষু খুলে নারী জাতির অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। দৃষ্টি নেওয়া দু'খ থাকে বাক্যরূপে দণ্ডায়মান হচ্ছেন! democratic বলে যাঁরা গর্ক করেন তাঁদের এটা মহৎ অশোভন। আর আমাদের দেশের তো কথাই নাই। যে দেশে সামান্য স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন উপস্থিত হতেই একদল লোক ক্ষেপে "ধর্ম গেল, সমাজ গেল" বলে চোঁমেটি আরম্ভ করে দেশ সে দেশের উন্নতি শুধু হুদূরপ্রান্ত নর, করনারো কতীত। এখন এদেশে 'অবাক কাণ্ড' 'খাসদখল' এর মতো কুৎসিত মাতৃজাতির নিকাশূর্ণ বই বা'র হয় তাই, লিখে গ্রন্থকার বাহাজুরী পান। এরা আবার চার জাতীয় অধিকার।

আমেরিকা আজ কেন এত উন্নত? কারণ তাঁদের দেশে স্ত্রীজাতি আছেন যাঁরা সুপ্ত প্রণব করেন, আমেরিকাতেও বখন প্রথম নারীর অধিকারের আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন যে খোলযোগ হয়নি তা নয়। একদল লোক বলেছিলেন যে নারীজাতি পুরুষের অধিকার পেলে সম্মান পালনের এবং অজ্ঞাত গৃহকাণ্ডের বিলুপ্তি উপস্থিত হবে কিন্তু ফলে তা হয়নি। আজ আমেরিকার নারীজাতি সুপ্রসারিত স্বাধীন প্রবৃত্তির সমভাগী এবং সুসভ্যরূপে সম্মানের মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত বলেই সেদেশ দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে বছে এবং এখন সব লোক জন্মাচ্ছে যারা জাতির গৌরব দেশের গৌরব ও পৃথিবীর গৌরব বলে পরিগণিত হচ্ছেন।

অনেকে বলেন নারী দুর্বল, তারা বোঝা বহিতে পারবে কেন? কিন্তু দুর্বল তো তাদের পুরুষেরাই করছে। অন্য থেকে যে মেয়েকে লেহাং জুতো পরান হয় সে মেয়ে খোঁড়াই হয়। ছেলেদের মেয়েদের শেখানো হয় ‘পতিদেবতা’। জীভেষ্ঠের সমস্ত বিসর্জন দিয়ে কায়মনোবাক্যে পতিপূজা করতে হবে। তার জীবনে যে অর্থ কে ন সার্থকতা নেই। সে যে নারী এই ‘বশাল পৃথিবীর’ অর্ধেকটা কুড়ে আছে, সে সব তাকে বন্ধ করে ফুলতে হবে। পরার্থে এ কেমনতা! অস্ব স্বাগ? এ তাংগের মহত্বই বা কোথায়? চন্দ্রাবধি সকল কথিকার নির্মমভাবে কেটে ছেঁটে িনিনিষেধের গভীর মধ্যে পুরে, মনটাকে ছোট করে দেওয়ার ফলে মেয়ের! এখন আর নিজেদের দাসী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না। ডিম কেটে বার হওয়া অবধি যে পাখী পিঞ্জর বই জানে না, সে কেমন করে মুক্ত আকাশে আপন মনে উড়ে যাবে!

এই যে নারী জাতিটাকে তাদের নারী অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত করে রেখেছি এতটাই আমাদের এই অধঃপতন। পুরুষ ও নারী যেদিন সমভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জীবনপথে চলতে পারবে সে দিন দিনের আলোর মতো সমস্ত ধাঁবা এক নিমিষে ঘুচে যাবে; স্বত্বাপত্তের সমস্ত বাধা আপনা হতে সরে যাবে; জীবনের সমস্ত অবসাদ করে পড়ে সত্যই বড় মধুসর হয়ে উঠবে।

এতো গেল নারী জীবন কথা। ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার গভীর এখানেই শেষ নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের যেমন শেখানো হয় “কায়মনোবাক্যে পতি সেবা করো” ছেলেদেরো শেখানো হয় “পিতার প্রীতিগাপনে শ্রীরক্ত সর্বদেবতা” আমরা সবাই জানি পরশুরাম পিতৃঅজ্ঞান মাতৃহত্যা করেছিলেন আমাদের আপনারা ভুল বুঝবেন না। ছেলে পিতৃভক্তি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার ধ্বংস করে বেড়াবে, এটা আমার বিশ্বাস নয়। কিন্তু এই যে মাতৃহত্যা ব্যাপারটা। এটা আমাদের দেশের পিতৃভক্তির অলস্ত দৃষ্টান্ত। পরশুরাম পিতৃভক্তি দেখাতে গিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে বিদায় দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস এই অক-পিতৃভক্তি তাঁর একটা মহাকলঙ্ক। অজ-তিনি জগৎ-সমক্ষে মহা অপরাধী।

এখন ভিজ্ঞাস্ত হচ্ছে, পিতৃভক্তিতে এবং মনুষ্যত্বের সংঘর্ষ উপস্থিত হলে কার স্থান উপরে হবে। ধরুন, ছেলে বিবাহে বরণের ঘোর বিপক্ষে, পিতা ছেলেকে না জানিয়ে কয়েক হাজার টাকার লোভ সঞ্চার করতে না পেরে কোনো “দরলা ননিবালার” সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করলেন। তারপর গভীরভাবে আদেশ দিলেন “অমুক তারিখ তোমার বিয়ে। সময় মতো উপস্থিত হয়ে।” ছেলে আদেশ পেয়ে বিয়ে করে দিলে এল। বহুবর্গ দ্বিজ্ঞাসা করে উত্তর দিল “আমার বিয়েতে তো আর আমার হাত নেই। আমার তো মোটেই টেছে ছিল না কিন্তু কি করো, বাবা বললেন তার কথা এ আর ফেলতে পারিনে।” ছেলে কিন্তু ভুল গিয়েছিল যে বিয়েটা তারই—তার বাবার নয়। তার ব্যক্তিও বলে এটা জিনিষ আছে, তারও বিবেক-বুদ্ধি আছে মনুষ্যত্ব আছে; পিতা যদি ঘরে আস্তন দিতে বলেন তবে সে তাই করবে? বাবা তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ছেলের ব্যক্তিস্বত্ব ভুলতে পারেন কিন্তু তাই বলে কি ছেলেও নীরব হয়ে সমস্ত সহ্য করবে, যে হেতু পিতা চোকের দল পায়ে কেলে আমাদের পালন করেছেন শুধু সেই জন্যই কি আমাদের আত্মত্বকে বিচার দিয়ে তাদেরই জন্য চীরন বহিতে হবে? তা হলে আর তিনি আমাদের শিক্ষা দেন কেন? কন্যার মতো পুত্রকেও অজ্ঞানতার চির অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে “আমি কে, আমার মূল্যই বা কি, শক্তিই বা কি” এ সব সত্য তবু বুঝবর অবকাশ দেওয়া উচিত নয়। তাকে পিতার আজ্ঞাবহ বহুচালিত ভূত্যা করে গড়ে তোলা উচিত।

আজকালকার লেখাপড়া লেখানোর পদ্ধতির ভেতর কি আছে না-আছে জানিনে, কিন্তু সেখানে বাকি-স্বাভাব্য চরিত্রীকায়িত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকই একটা বিরটি কারখানা। সেখানে কলে সব কাজ হয়। সেখানে মনুষ্যত্বের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনো বারবার নেই। তাই দেখতে পাই সেখান থেকে যারা বার বার হন, তাঁদের মধ্যে গোটা মানুষ খুব কমই থাকে; দেশবিদেশে আজ “নববিদ্যালয়ের” সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার দীক্ষার মানুষকে খাঁচা মানুষ করবার জন্য সকল দেশের লোকই আজ বক্রপরিচয় কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কলের পুতুল তৈরী করে আজও তৃপ্ত। এটাকি মাটীই গুণে?

আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি। আমাদের কঠোর করবার আছে; আমাদের ক্ষমতা কত বড়; কিন্তু শিরস্কম আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে সে সব আমাদের ভুলতে হয়। আমাদের দুই আনা ব্যক্তিত্ব পিতৃভক্তিতে, দুই আনা মাতৃভক্তিতে আর চারি আনা বর্তমান শিক্ষার পায়ে বাঁগ দিয়ে, বেকতে না বেকতে ধর্ম ও সমাজ মনু ও পরামর্শ, তাদের বিধানবোধের বিপুল বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেন। তখন বাকি আট আনা মনুষ্যত্ব তাদের নিয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে জীবনযাত্রার পথে বেরিয়ে পড়ে। আমার ধর্ম থাকতে পারে, সমাজ থাকতে পারে, বাবা মা, গুরু থাকতে পারেন—তাদের প্রতি আমার মহান্ কর্তব্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমি মানুষ এইটেই সবচেয়ে বড় জিনিস। এবং সেই মনুষ্যত্বই আমার পিতৃভক্তির কর্তব্য নির্দেশ করে দেবে। অন্য জনের দেবার কাজ নেই।

আজকের দিনে বিশ্বের ব্যাপ্তাপণে আমরা চারকো লাখ জনকণা পিছিয়ে পড়েছি, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ব্যক্তিত্ব যেখানে লাহিত, মনুষ্যত্বকে যে প্রতি সম্মান করে না, সে প্রতি জীবন্ত হতে বাধ্য। মানুষ যে শক্তির বলে বড় হয় সেই মনুষ্যত্বকে নির্মমভাবে পেষণ করা হচ্ছে, কবির প্রাণ তাই বেখে আজ বেদনার ভরে উঠেছে; তিনি ব্রহ্ম বীণার ডাক দিয়ে তাঁর দেশকে বলছেন “সব অচলারতন ভেঙে ফেল; সব বাঁধন কেটে দাও।” মানুষ মান্তেরই মহান্ কর্তব্য আছে, সে কাজ তাঁকে করতে দাও। বাধা দিও না ভুল করে কলক, ভুলের ভিতরেই সে এক দিন সত্যকে খুঁজে পাবে।

আজ আমি আমাদের যুবক বন্ধুদের এই কথাই বলতে চাই। তাঁরা পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি বা দেহান্তে হয় দেখান; তাঁরা তাদের শিক্ষা ধর্ম সমাজ নিয়ে গোরব করতে চান, করেন;—কিন্তু যেন ভুলে না যান তাঁরা মানুষ। আমাদের কবি বাথায় সুরে গেয়েছেন “সে দিন আগত ত্রি, ভারতে তবু কই? সে কি রইল স্মৃতি আজি সবজন পশ্চাতে? লউক বিশ্ব ধর্মভার মিলি সবার সাথে।”

এ ডাক শুনে আর স্থির থাকলে চলবে না। বিশ্বের মিলন মন্দিরে আমাদেরও স্থান আছে। তাই আমাদের মনুষ্যত্বকে কেবল বাঁচিয়ে রাখােই তো চলবে না। তাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে। তাঁর জন্য চাই কায়মনে বাক্যে ব্যক্তিব্যক্তির প্রতিষ্ঠা। অনেক দিনের জড়ত্বর চাপে আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে আজ আর শাস্ত্রের বচন শুনবার অবকাশ আমাদের নেই। তাঁর “স্বপ্ন বিচার পাণ্ডিতে করুক, আর গোময় লিপ্ত গভীতে নসাদানী নিঃশব্দ করুক।” আমরা আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে চলব। প্রাচীর ভেঙে দেব, লোহার দরজা খুলে দেব, এবং কর্মজগতের যথাস্থানে বেরিয়ে পড়ে নব-জীবন লাভ করণে। তখন সমস্ত বাধা, সমস্ত বিষ কেটে যাবে। উন্মুক্ত আকাশে শরতের জ্যোৎস্না ছাড়িয়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর দাস শুভ।

## বিশ্বরাজ ।

—:~:—

( রাগিনী—কানাড়া )

ভিন্ন তুমি নহ ত' প্রভু পৃথিবী হ'তে পৃথিবী-নাথ  
তবুও কেন টুড়িছে লোকে 'তয় করি দিবস রাত ।

ধরণীরূপে ধরিছ বৃকে, সলিলে দিছ প্রাণ  
বাকু হয়ে জ্বলিছ আলো আঁধার করি ম্লান  
পবন হথে শ্রান্তিহীন, ঘুরিছ সদা সঙ্গলীন

কে বলে তবু তোমারে পেতে করিতে হয় পরাণপাত  
ধরণী হ'তে তুমারে যদি থাকিত অন্য-লোক  
রাজনহীন রাজ্যে তব হইত অরাজক ;

অত্যাচারে সূর্য্য-সোমে, সোহাগে প্রেমে বায়ুতে বোমে . .

হাসে মহা দ্বন্দ্ব হ'ত বিশ্ব মহা ভঙ্গ্য যাত !

তাই ত' ভাবি রয়েছ তুমি জগত জুড়ি' জগন্নাথ

ধরণী ছাড়ি' তোমারে খোঁজা মিথ্যা সে যে ব্যর্থ সাধ ।

শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায়

## প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথার প্রতিবাদ



পরিচালিত আয়ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বাধীন; চিন্তাপ্রসূত “অমৃতীক্ষে দেবানুরবুদ্ধ” নামক প্রবন্ধ এবং প্রাচ্যে “প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথা” নামক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি স্বকপোল-কল্পনা সাহায্যে বৈদিক শাস্ত্রসমূহের অর্থার্থ কল্পনা করিয়া অমৃতীক্ষ শব্দে পারস্ত, তুরস্ক প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভারতময় মহামণ্ডলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ স্বামী “আর্য্যজাতি” নামক পুস্তকে এই সমস্ত মত উপাধন করিয়া সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। সুতরাং বর্তমানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা নিম্পয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশ্য এই প্রবন্ধ যদি বিদ্যারত্নপদসম্বলিত মহোদয়ের না হইত তাহা হইলে অন্যান্য প্রবন্ধের ন্যায় উপেক্ষিত হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আমরা বিশেষরূপে জানি। তিনি দেশের মঙ্গল কামনাতেই সর্বদা সচেষ্ট।



বর্তমান হিন্দুশাস্ত্রের উপরে যেক্রপ বিলোল কটাক্ষের পূর্ণ প্রকাশ পতিত হইতেছে—আশঙ্কায় উপরে আশঙ্কা উদ্ভিত হইতেছে তাহার যথারীতি সমাধান করিবার জন্যই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এত প্রয়াস। অবশ্য তিনি সমাধান করিতে গিয়া মূলেই তাল ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুধর্মের অধঃপতন হইলেও হিন্দুশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বলিবার শক্তি অনেকেরই নাই। যিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি ভুলিয়াছেন—তিনি পতিত হইয়াছেন। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ মনোদ্বাটন করিয়া অগতের সমক্ষে না ধরিয়া তাহার ক্রটিার্থ কল্পনা দ্বারা কত ছাঁটিয়া, বাহিয়া অনার্থ করিতে গেলে সত্যের অপমান করা হয়। সেইজন্য তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি প্রমাণের যথাসম্ভব মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইতে হইল। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে অন্য কোনও জনপদ ছিল না। একথা বলিয়া তিনি—প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও লোকান্তরের অস্তিত্বই নাই। পৃথিবী ভিন্ন ভূঃ ভূগঃ স্বঃ, মঃ জনঃ, তপঃ সত্যঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের কথা কে বেদে পাওয়া যায় না? এই সমস্ত মন্ত্র কি বৈদিক মন্ত্র নহে? পৃথিবী ভিন্ন স্বর্গ বাল্মীকি যদি লোকান্তর না থাকিত তবে শাস্ত্রে—

“সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গচ্ছত সুরভিসুখা”

স্বর্গে পবনদেব সর্বদা সুখ প্রদান করিতেছেন সুন্দর গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে আবার মীমাংসা শাস্ত্রে—

যন্ন হুঃখেন সং তিগ্নং ন চ গ্রাস্ত মনস্তরং

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বস্পদাস্পদম্ ॥

স্বর্গে—ইচ্ছাসারে সুখলাভ হয়। সেখানে হুঃখের লেশমাত্রও নাই ইত্যাদি গীতার ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন—

হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং কিম্বা বা ভোক্ষ্যসে মমীন্ ।

যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর। কিম্বা যুদ্ধে জয়ী হইয়া পৃথিবী ভোগ কর। মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের উপদেশ পাওয়া যায়। স্বর্গ যদি পৃথিবীতেই হত তাহা হইলে মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের উপদেশ হইত না। এবং শাস্ত্রে স্বর্গের যেক্রপ বর্ণন পাওয়া যাইতেছে পৃথিবীর কোনও স্থলে কোনও প্রদেশে যেক্রপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে না। অতএব পৃথিবীতেই স্বর্গ কল্পনা করা সম্পূর্ণ ন্যায়াবরুদ্ধ। বেদে সৃষ্টিবর্ণন এসঙ্গে—

আকাশাদ্যুর্বাষ্মোরমিরপ্রোপঃ আপঃ পৃথিবী চোৎপদাতে ।

আকাশের দশমাংশে বায়ু—বায়ুর দশমাংশে অগ্নি—অগ্নির দশমাংশে জল, এবং জলের দশমাংশে পৃথিবীর সৃষ্টি। অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা তনুলোক দশগুণ বড়—তনুলোক হইতে আগ্নেলোক দশগুণ বড়। এবং আগ্নেলোক হইতে বায়ুলোক দশগুণ ও বায়ুলোক হইতে আকাশলোক দশগুণ বড়। অতএব পৃথিবী তনুলোকের পঞ্চলোক আমলা স্বভঃই অসুভব করিয়া থাকি। এতদ্বিরোধ আমাদের শাস্ত্রে নবগ্রহের নবটি প্রত্যেকের কথাও পাওয়া যায়। বর্তমান সায়েন্সের দ্বারা আরও দুইটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন লোকের পরিচায়িত্ব তাহাও প্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। এক একটা সৌরজগৎ এক একটা প্রমাণ। সৌরজগতে সূর্যই কেন্দ্র এবং একমাত্র জ্যোতির্মান। বুধগ্রহ সূর্যের অতি নিকটে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তার পর সূর্যের পরে তার পর পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিশ্চর ইয়ুরেন্স নেপচুন প্রভৃতি অনেক গ্রহ অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থান করিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ

করে। এ ছাড়া আরও অনেক উপগ্রহ আছে। - বর্তমান সময়েও সৌরপরিবারে সর্বসমেত প্রায় ৩০০ তিন শত গ্রহ উপগ্রহ আবিস্কৃত হইয়াছে। গ্রহগণের মধ্যে আরতনে পৃথিবীই প্রায় সর্কাপেক্ষা ছোট। এই সৌরজগৎ একটা ব্রহ্মাণ্ড। হিন্দুশাস্ত্রে কেবল একটা ব্রহ্মাণ্ডের কথা নয়, মহানারায়ণোপনিষদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে যথা—

“অন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমস্ততঃ দ্বিতানোতাদৃশানানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রকল্পতি।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে অবস্থিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে। অতএব পৃথিবীর মধ্যেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্তব্য করিত যাওয়া বেদশাস্ত্রের অপলাপ করা মাত্র।

(খ) পূর্বে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। যেহেতু সন্তানগণ মাতৃনামে পরিচিত হইতেন।

মাতৃনামে পরিচিত হইতেন বলিয়াই বিবাহ বন্ধন ছিল না। ইহা কোনও যুক্তি নয়। গীতার-সৌভদ্র, দ্রৌপদেয়, গান্ধের প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে সূতদ্বার সহিত অর্জুনের দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরাদির গন্ধার সহিত শান্তনুর বিবাহ হইয়াছিল না। ঋষি কণ্বপের সহিত দিতি অদিতি প্রভৃতি জীগণের বিবাহ হইয়াছিল—পুরাণাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন প্রমাণিত হয়; বিবাহ প্রথা ছিল না এক্ষণ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যে স্থলে একজনের বহু পত্নী থাকিত সেস্থলে পিতার নামানুসারে নানকরণ হইল—সকলকেই বোকা যাইত। তাহাদের মধ্যে বিভেদ থাকিত না। এই বিভেদ স্পষ্টীকরণের জন্যই পূর্বে মাতৃনামে পরিচয় দিতে হইত। ইহা দ্বারা বিবাহবন্ধন ছিল না— ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

(গ) মরীচি অত্রি; প্রভৃতি ঋষিগণ মনুর মানস পুত্র। খুব সম্ভাব্য মনু মানস বা ইচ্ছা করিয়া কতিপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করেন।

মানস পুত্র যে হইতে পারে বিদ্যাকর মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। অথচ তিনি বেদের দোহাই দেন প্রতি পদে পদে। বেদ হইতেই আমরা জ্ঞাত হই যে ভগবানের মানস হইতেই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রথমে মৈথুন সৃষ্টি ছিল না। সে সময়ে মানসিক সৃষ্টিই হইত। বেদ বলেন—

“সদেকমেত্মা হৈনমমগ্র আসীৎ”

জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক সংস্কর্যই বর্তমান ছিলেন।

“স তদা ঐক্যত বহুস্যাথ প্রজায়েম ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।

তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন।

সোহুবাফ্য নানাদাতমনোহপশ্যৎ ॥ “স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ॥

বৃহদারণ্যক ॥

তিনি আত্মা ভিন্ন কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন। যেমন ইচ্ছা হইল সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইল। ভাগবত বলেন—

অথাভিধায়তঃ সর্গঃ দশপুত্রঃ প্রকল্পিতঃ।

ভগবচ্ছক্তি ব্রহ্মস্যা লোকসন্ত ন তেতবঃ।

মরীচ্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

ভৃগুর্বাশিষ্টৌ দক্ষশ্চ দশমন্তত্রনারদ।

লোক বৃদ্ধির জন্য তিনি ধ্যান করিয়াই মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ধ্যানের দ্বারা যে সৃষ্টি হইতে পারে পুরাণে এ সবক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ঋষি যখন সুরভী হরণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন সুরভী নিজ অঙ্গ হইতে সহস্র সহস্র সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। সুরভী সাধারণ গো ছিলেন না, তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এবং বিশ্বামিত্র ঋষিই করুণা দ্বারা মানব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উষ্ট্র প্রভৃতি বহু জীব সৃষ্টিও করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য নারায়ণী সেনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্ণ হহতেই মূল জগতের সৃষ্টি। হৃন্দনীর সিদ্ধিসম্পন্ন ঋষিগণ অমাহুযিক যোগপ্রভাবের দ্বারা মানসিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন ইহার আর আশংকা কি? রামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করেন, ভরদ্বাজ মুনি যোগবলে কল্পে তাঁহার আতিথ্য সংকার করিলেন? পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অতএব মনু কোনও বা কতিপয় কন্যার গর্ভে এই সকল সন্তান উৎপাদন করিয় ছিলেন এক্ষণ অপসিদ্ধান্তের প্রচার করিতে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রবিগর্হিত।

(ঘ) প্রাচীনকালে পুরোহিতের আবশ্যক হইত না। কেবলমাত্র পাণিগ্রহণ হইত। ইহার সমর্থনের জন্য তিনি ঋষিদের প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে :—

“গৃভ্রামি তে সৌভগস্য হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টমথসঃ।”

(ইহার অর্থ) আমার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্তগ্রহণ করিতেছি—তুমি আমার সহিত জীবনের শেষকাল পর্যন্ত একত্রে থাকিয়া বার্কিক্যে উপনীত হও।

এই প্রমাণের দ্বারা পাণিগ্রহণই ছিল বিবাহ সংস্কার ছিল না এক্ষণ প্রমাণিত হয় না। কারণ এই প্রমাণটি বর্তমান সময়ে বিবাহ মন্ত্রে পঠিত হয়। পাণিগ্রহণ বিবাহ সংস্কারের একটি অঙ্গীভূত সংস্কার। বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব পাণিগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্কার হইয়া থাকে, প্রাচীনকালেও তাহাই হইত। প্রাচীন সময়ে যে অন্যান্য সমস্ত সংস্কার হইত না—তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ মহাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে হিন্দুর কোনও ক্রিয়াই অমঙ্গলক হয় না। সমস্তক সনস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব প্রাচীনকালেও সমস্তক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

(২) এই সময়ে জগতে বাল্যবিবাহ ছিল না।

বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন দেশহিটৈষী লোক। জানি না, বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ করিবার জন্য তিনি কেন এত উষ্ণতা পড়িয়া লাগিয়াছেন। ঋষিগণের বিরুদ্ধে বলিয়া তিনি কি কখনও দেশের উন্নতি করিতে পারিবেন? তিনি—

ত্রিংশবর্ষোদ্ধেৎ কন্যাং দ্বাদশ বর্ষাবধিকীং।

ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্তরঃ॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার এবং চল্লিশ বৎসরের পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া পাণিগ্রহণ করিবেন। ভগবান মনু এই শ্লোকটিকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজ মত পোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বীকার করিলাম এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু—দেবল বলেন :—

উক্তং দশাব্দায়া কন্যা প্রাগ্রজো মর্শাহুতুসা।

গাঙ্কারী স্যাৎ সমুদাহা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা॥

সংবর্ত্ত সংহিতার লিখিত আছে :—

অষ্টবর্ষা ভবেদগৌরী নববর্ষাতু রোহিণী  
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা ।  
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তথৈব চ ।  
ত্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাং ॥  
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নরমুত্তমী ভবেৎ ।  
বিবাহেহষ্টম বর্ষায়াঃ কন্যায়াস্ত্ব প্রশসাতে ॥

অতএব রজস্বলা হইবার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত । যম সংহিতার লিখিত আছে :—

প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি ।  
মাসি মাসি রজস্বল্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ।  
প্রযচ্ছন্নয়িকং কন্যা নূতু কালভয়াৎ পিতা ।  
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠত্যাং দোষঃ পিতরমুচ্ছতি ॥

মহর্ষি গৌতম বলেন :—

“প্রদানং প্রাপ্তোত্তরপ্রযচ্ছন্ দোষী”

মহর্ষি আশ্বলায়ন বলেন—

অদৃষ্টরজসে দত্তাৎ কত্মায়ৈ রক্তভূষণম্ ॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ক্রণহত্যা মৃত্যুবৃত্তৌ ।

মহুও স্থানান্তরে বলিয়াছেন—

প্রদানং প্রাপ্তোত্তোঃ স্মৃতম্ ।

এই সমস্ত প্রমাণেরই অর্থ—ঋতুকালের পূর্বেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য । মনুর একটা বাক্যকে এক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কিন্তু এই সমস্ত ঋষিবাক্য অস্বীকার করিবার উপায় কি ? তিনি যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সকল স্থলেই কত্যা শব্দের প্রয়োগ আছে যথা—“ব্রহ্মচর্য্যেন কত্যা” “কত্মাপোষ পালনীয়া” “আত্মর দানং কত্মায়া” “কত্মা প্রদানং বিধিবৎ” “কত্মা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাৎ” ইত্যাদি । হিন্দুশাস্ত্রে কত্মার লক্ষণ করিয়াছেন— অষ্টম বর্ষ বয়স্কা বালিকা কত্মা । বালিকার বয়স আট বৎসর হইলে তাহাকে কত্মা বলা যায় । তন্ত্রশাস্ত্রে কত্মাদান গোত্রীদানের বিশেষ বিশেষ ফলশ্রুতিও দোষিতে পাওয়া যায় । তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পুরুষের অনান পঞ্চ-বিংশতি বর্ষের মধ্যে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে । ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে যথারীতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানার্জন করিলে অবশেষে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য । এবং জ্যোগোকে পক্ষে অষ্টম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই বিবাহ দেওয়া উচিত । \*

\* \* \* \*

\* বর্ত্তমানের উচিত অমূল্যচিন্তের সমস্ত সমাধানের স্থান এ প্রবন্ধে নাই, কারণ বিস্তারিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন ; তাহার বিবরণে যাহা বলিবার তাহাই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে বক্তব্য । স্থান কাল শিক্ষাদি গণনায় আনিয়া বাণ্যবিবাহের সপক্ষে বা বিপক্ষে বহু কথা বলা যায়,—সে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপকরণ ; “অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইলে কত্মা ঋতুকালের কেমন আপন হইয়া যায়” ইত্যাদি যুক্তি ও উক্তি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল ।

সঃ ।

তবে প্রাচীন কালে যে একেবারে অধিক বয়সে বিবাহ হইত না তাহা নহে। পুরাণে ছই একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, যথা—দ্রোণদ্রী, সাবিদ্রী, সীতা প্রভৃতি। তবে তাহারাই অত্যধিক বয়স্ক ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ ভগবান রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে ধর্মুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সীতারও বয়স সেই সময়ে দ্বাদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। সাবিদ্রী, দময়ন্তী সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। দ্বাদশ বর্ষ বয়সেও কাহারও কাহারও অনোদ্যম হইয়া থাকে। সেই সময়ে—

“বদ্রাস্তবীজিত তনৌ”

বলা যাইতে পারে।

নিয়ম সাধারণতঃ তিন প্রকার ;—অসাধারণ, সাধারণ ও বিশেষ। অসাধারণ নিয়ম কোনও কোনও হুদে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ—সর্বত্র প্রযোজ্য। ছই এক জনের দৃষ্টান্তে জগতের নিয়ম হইতে পারে না। সর্ব সাধারণকে লটয়াই সাধারণের নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। অতএব ছই এক জনের বিবাহ অধিক বয়সে হইলেও সর্ব সাধারণের পক্ষে সে নিয়ম চলিতে পারে না। অতএব বালাবিবাহ সর্বথা পুণি-শাস্ত্রানুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত। অলমতি বিস্তরণ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী।

উত্তর।

—:—

( E. W. Wilcox )

১

বিদায় তবে,—যাচ্ছি অন্যদিক ;

‘হঠাৎ ?—হ্যাঁ, তা’—হয়তো বা তাই ঠিক ;

তবু এ মোর গোপন মানস-মূলে

এমন সে-এক সত্য গেছে খুলে

কালকে গভীর রাতে ;

এক নিমেষেই জীবন-মরণ

চমকে গেছে যাতে !

কি সত্য সে, শুনতে চাহ ? না, না, কচ্ছি বারণ ;

বিদায় চাহি, সহজ কথা—বল্‌বো নাকো কারণ ;

২

‘সংক্ষেপে’ ?—বেশ, চাইছি যেতে সমরভূমি ছাড়ি’

শত্রুরে মোর পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া ।

প্রহেলিকা ? ভাবছো এটা কৃতব্রতা ভারি

আমার প্রতি সদয় ছিল যখন তোমার হিয়া ?

সত্য সবি, তবু যখন অমন করে শুধুও

ঝাড়িয়ে পড়ি আনত মুখ,—জবাব যে হয় উধাও ।

৩

ভেবো নাকো, লক্ষ্য করি’ সেবায় কোনো ক্রটি

ভগ্ন আশায় এই অতিথি যাচ্ছে হঠাৎ ফিরে ;

যত্ন তোমার কাঁটার মতন বক্ষে আছে ফুটি’

সারাজীবন তাহার স্মৃতি রাখবে আমায় ঘিরে ।

৪

‘তবে কেন এমন হঠাৎ’—চাও কি তুমি জানতে ?

জবাব,—কোন দার্শনিকের আবিস্কৃত তথ্য

পরীক্ষিত হচ্ছিল এই নীরব-হৃদয় প্রান্তে,

প্রমাণ হয়ে গেল এবার, নয়কো তাহা সত্য ।

হয়তো তুমি থাকবে শুনে প্লেটোর কোনো যুক্তি

আমার মুখের বক্তৃত্যে থাকতো তত্ত্বা তত্ত্বা ;

এতদিনে বুঝে নিলুম—যদ্বিষয়ক উক্তি

তদ্বিষয়ে বিশেষ রকম অজ্ঞ ছিলেন বক্তা ।

৫

ভাবছো—আমি বলছি এমন সৃষ্টিছাড়া বাক্য

অর্থ বাহার যায় না বোঝা চিন্তা করেও অনেক ?

লও গো তবে নয়ন পাতি আমার চোখের সাক্ষ্য

কম্পিত এই হস্তে তোমার হাতটি রাখ ক্ষণেক ।

শোনো, আমি পালিয়ে যাচ্ছি সামনে হেরি সর্প,

পালিয়ে যাচ্ছি উদ্ধত তার ফণার প্রসার দেখি ;

পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমার পরাণ-মনের দর্প

পড়ছে গলে ভালবাসায়,—আর তা,—না, না, এ কি !

দেখতে দেখতে সর্বশরীর কাঁপছে তোমার রাগে,  
 আগেই জানি, ইহাই শেষে হবে ;  
 খুঁটিয়ে কেন কারণ চাহ এমন ভাগে ভাগে,  
 অতিথ এসে বিদায় মাগে যবে !

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

## বন্যার ।

—:~:—

( ১ )

তিন বৎসর আগে যখন আমার কন্যা কমলা বর আলো করল, সে কথা কখনো ভুলব না । জানি না, কত  
 ভগ্নসার ফলেই তা'র মত মেয়ে পেয়েছিলাম ; কারণ তা'র জন্মের পরই আমার সংসারের শ্রীবুদ্ধি আর 'তার'ও  
 পদোন্নতি । তাই, দেখে শুনে নাম রাখলাম কমলা ।

এমন মেয়ে, এমন রূপ, এমন গুণ, এমন সরলতা ; এত সুলক্ষণ দেখে' কোন মায়ের প্রাণে আশা হয় না ?  
 তাই, একদিন কমলার হাত দেখালাম । গণক বলে "মেয়ে বড় সুলক্ষণ—রাজরাণী হবে ।" প্রাণ নেচে উঠল ।  
 তা'বেলাম, এমন মেয়ে যদি তাই না হয়, তবে আর হবে কে ? খুশী হ'য়ে ছ'টাকা 'বিদায়' দিলাম । গণক আশীর্বাদ  
 করতে করতে চ'লে গেল ।

মেয়ে মানুষ কিনা,—তাই অত বুঝি নাই । আশায় ও আনন্দে কমলাকে বুকে তুলে নিলাম । কমলা আমার  
 কোলে মাথা গুঁজে বলে "মা, ও কি বলে ?"

আমি তার কোঁকড়ান চুলগুলি কপাল হ'তে সরাতে সরাতে বল্লম, "ও বলে, তুই রাজরাণী হবি ।"

"রাজরাণী কি মা ? চাকরাণী ? তুই সেদিন বল্ছিলি আমাদের চাকরাণী বিন্দি বড় ভাল মানুষ—খুব কাজ  
 করে ? আমিও তা'র মত খুব কাজ করব !"

আমি তা'র মুখ চুষন ক'রে বল্লম "ঘাট্ মা, এমন কথা বলতে নেই ।"

( ২ )

সেই একদিন, আর এই একদিন । কত তফাৎ, অথচ সেই ঘাট, সেই মাঠ, সেই ঘর, সেই বাড়ী । তবু কি ফেন  
 নাই—সে আমার কমলা । দ্রুত দামোদরের বাণে আমার প্রাণের ধন ভেসে গিয়েছে । হায়, কেন আমি তাঁকে  
 একা একা নাইতে পাঠিয়েছিলাম !

এখনও সেই গণনার কথা মনে পড়ে,—আর একটি বিজ্ঞপের অটহাস্যে প্রাণ কেঁদে উঠে। “কমলা রাজরাণী হবে।” না, অবিবাহিত ত’ মনে স্থান পায় না, বুঝি যমরাজ্যের স্বর্গ হ’ল, তাই তিনি কমলাকে আপনার রাজরাণী করতে নিয়ে গেলেন।

তার’পর এক বৎসর কেটে গেল। আমার কুটীর দালান হ’ল, বড়লোকের বন্ধু বলিলে যা’ বুঝায় তা’ও হ’ল, কিন্তু যা’ গিয়েছে তা’ হয় নি—তাই সব শূন্য,—সব ফাঁকা!!

দামোদরে আর আমি স্থান করিতে যাই না। কেন বাব? বাড়ীর পাশেই সিঁড়ি বাধান পুকুর কাটিয়ে নিয়েছি। ঠিক ক’রেছি, পোড়া দামোদরের মুখ আর দেখব না।

রাক্ষসী দামোদরে একদিন বান ডাকল, কি প্রবল জলোচ্ছ্বাস, প্রলয়করী বন্যায় লোকজন জীবজন্তু গৃহহীন আশ্রয়হীন প্রাণহীন করে প্রাণহীন রাক্ষসীর কি তাও বন্যতা—আমাদের গৃহ হইতে সে ভীষণ বন্যার স্রোত-শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনটা যে কি হয়ে গেল।

“মা এক জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি—শিগুগীর আগুন করে সেক দাও—”

বাড়ীর চাকর হরিচরণ আমার সম্মুখে হস্তপ্রসারিত করে একটি দুটু-মুঠে শিককন্যা দেখিয়ে বললে—দেখুন কি জুল্লার মেয়ে বন্যায় ভেসে এসেছে।

বিস্মিত হ’য়ে চেঁচিয়ে উঠলাম “সর্বনাশ এ কার মেয়ে,—এখনি যে ঠোঁট নড়ছে—আগুনে সেক দে।”

সেবা শুশ্রূষায় মেয়েটা ভাল হয়ে উঠলো—নেই তাকে কোলে তুলে নিলেম—বুক হতে তাকে আর বড় নামাই নাই। সময় সময় ভর হত—যদি এর মা বাপ এসে একে দাবি করে—আবার মনকে প্রবোধ দিতেম—কত মেয়ে সে সময় ভেসে গিয়েছে—কে কার খোঁজ করে—কে জানে কারটি বেঁচেছে আর বেঁচেই বা কোথায় আছে?

ভগবান ওকে রক্ষা কর।

( ৩ )

কুড়ান মেয়ে—স্নেহের ধন—ওর নাম রাখলাম স্নেহলতা।

স্নেহ এখন বড় হ’য়েছে—কার মেয়ে জানি না—কিন্তু সে আমার সম্পূর্ণ আপনার। সে কমলার স্থান অধিকার ক’রেছে। আজ যদি কেহ এসে বলে—‘এ আমার মেয়ে—তা’ হ’লে কি কিরিয়ে দেব?—না!—কখনই না! আর স্নেহলতা? আমার আদরে, আমার স্তন্যে পালিত হ’য়ে সে কখনই অন্য লোকের আশ্রয়ে যেতে চাইবে না—না,—সে এত কঠোর, এত নিশ্চয় হ’তে পারে না। হাঁ, সে ত আমার মা ব’লে ডাকে—এমনি ক’রে আমার কমলাও ত’ আমাকে ডাকত।

যে বারের বানে স্নেহলতা ভাসিয়া আসে, তেমন ভীষণ বান দামোদরে বোধহয় আর হয় নি! কতজন ভেসে গিয়েছে, আবার কতজন গৃহহীন হ’য়ে অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হ’য়েছে।

এইরূপ কতকগুলি লোক আমাদের গ্রামেও এসেছে। কেউ বা ডিন্কা ক’রে, কেউ বা মাহুঘের কাজ ক’রে খায়। বানে ভেসে আসা এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে সম্প্রতি আমার বি বিলি খুব তাব ক’রে নিয়েচে। তাদের বধো সূত্বহঃখের আলোচনা প্রায়ই হ’ত। শুনেছি একদিন সেই বানের কথা উঠলে বৈষ্ণবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন আলোচনা নামে তার এক মেয়ে সেই বানে ভেসে গেছে।



বিন্দী বঙ্গল স্থলোচনা মেহলতা নয় ত ? তারপর দেখল কতকগুলি শারীরিক চিহ্ন অবিকল মেহলতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তখন সে সব কথা খুলে ব'লে। মেহকে একদিন ভিক্সাচ্ছলে দেখে আস্তেও বলতে ছাড়লে না।

বৈষ্ণবী কান্দতে লাগল। সে কোন উপায় দেখল না। বিন্দী সহানুভূতি ক'রে বলে “দিদি, চুপ ক'র না। পুলিশ ছাড়া এ কাজের উপায় নেই। তুমি পুলিশে ঠিকঠাক প্রমাণ দিতে পেলোই মেয়ে পাবে, নতুবা চক্ষুণ্ণে ধামোদরের বান ডাকলেও কিছু হবে না—হবে না—হবে না।”

পরদিন বৈকালে আমি মেহলতার চুল বেঁধে দিচ্ছি এমন সময় “হরেকৃষ্ণ” ব'লে এক বৈষ্ণবী ভিক্সা চাইল। আমি মেহকে ভিক্সা আনতে বললাম। তাড়াতাড়ি সে অত দেখে নি, বাবার সময় তেলের শিশিটা পায় লগে পড়ে গেল। সোরতে চারিদিক আমোদিত হ'ল বটে; কিছ'কি বেন অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠল।

( ৪ )

হরিচরণ কান্দতে কান্দতে এসে আমার কাছে চুপ ক'রে ঝড়িয়ে গেল। কিছু বুঝতে না পেরে আমি বললাম—“কি রে হ'রে,—কি হয়েছে, কান্দিছিস কেন ?”

হরি কিছু বলে না, নিশ্চলভাবে কান্দতে লাগল। আমি আবার বললাম—“হ্যাঁ রে, হয়েছে কি ? এমন ক'রে কান্দিছিস যে ?”

এই বার সে কথা কইল “বা হবার হয়েছে—বে ভর করেছিলেম অবশেষে কিনা হ'ল তাই—তোমার মেয়েকে নিতে এসেছে।”

“আমার মেয়েকে নিতে এসেছে ? কে ? এমন আশ্চর্য্য কার ? তুই কি বলতে কি বলছিস ?”

হরি চোখ মুছতে মুছতে মুখ নামিয়ে বলে “না মা, আমি ঠিকই বলছি। কোন বৈষ্ণবী নাকি গুর মা,—পুলিসে প্রমাণ দিয়েচে, তাই ....”

আমার হৃদয় জলে' যেতে লাগল। অবিশ্বাসের কারণ না থাকলেও মন কিছুতেই হরির কথা মানতে চাইল না। তাই আবেগে বলে ফেললাম—“গুর মা কে ? আমিই ত' গুর মা। কোথায় সেই সর্পনাশী, রাক্ষসী,—আমার মেয়েকে চুরি ক'রে নিতে এসেচে ! আমি জানি, কুচরিত্রা জীলোকেরা এইরূপে কত মেয়েকে কুপথে নিয়ে যায়। না, না, আমার মেহকে যেতে দিব না—হৃদয় খুলে দেখাব—কার স্নেহ অধিক—আমার না সেই রাক্ষসীর, সেই প্রমাণে যদি সে মা হয়, তবেই মা—নইলে নয়।”

বিষাদে ও বিষয়ে হরিচরণ কান্দতে কান্দতে চ'লে গেল।

আমার গলা শুনে মেহলতা ভিতর হ'তে দৌড়ে এল। আমি ভাব-গোপন করতে গেলাম, কিন্তু তার চক্ষু এড়াতে পারলাম না। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে “মা, তোর চোখে জল কেন ? তোর কি হয়েছে বলনা ?”

আমি তাকে আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম “ও কিছু না। আজ্ঞা মেহ, আজ যদি আর কেউ তোকে তোর মা বলে পরিচয় দেয়, তা'হলে তুই আমার ছেড়ে তার কাছে যাবি ?”

সেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাগ হলে সে অশ্রু নিঃসৃত। বলল “তোমার কি সব কথা মা বুঝতে পারি নে। তুমিই ত’ আমার মা আবার কে মা হ’তে বাবে, ছিঃ, এমন কথা বলে আমার বড় রাগ হয়।”

আমি সঙ্গেহে তার মুখচ্যুত করলুম।

( ৫ )

এমন সময় আমার স্বামী ঘরে ঢুকলেন। কোনরূপ গোলমাল তাঁর সহ হ’ত না।

সেই ইতিমধ্যে দৌড়ে তার খেলার ঘর সাজাতে গিয়েছিল। স্বামী বিনা আড়ম্বরেই ব’লে উঠলেন “কি গো তোমার কুড়ান মেয়ের জন্ত আমাকে জেলে বাইতে হয় যে?”

আমি নিঃস্বরে বললুম “কেন?”

“আদালত থেকে হুকুম এসেচে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুলোচনাকে বিদায় দিতেই হবে। না দিলে হাতে কড়ি।

“সুলোচন’ কে? শু নামে ত আমাদের বাড়ী কেউ নাই।”

“নাও আর তাকামি ক’র না। সুলোচনা যে তোমার সেই ছাড়া কেউ নয়, সে বিষয়ে আদালত নিঃসন্দেহ।”

বাক্য মাথার পড়লেও অধিকতর স্তম্ভিত হইতাম না। সমস্ত পুণ্ড্রী আমার চোখের সাথে ঘুরতে লাগল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা হলে দেখলুম স্বামী ঘরে নাই। কি জানি কেন আমার প্রাণ ঝালি ঝালি লাগছিল। ভাবলুম, অনেকক্ষণ সেইরকম দেখি নি, একবার দেখে আসি। ধড়ফড় করে উঠলাম, কৈ সেই ত আমার ঘরে নাই। সে কি খেলার এত মেতেছে যে আমার কথা তার মনেই নাই? এঘর সেঘর খুঁজলাম—কোথাও ত নাই! সব শূন্য! তবে নিশ্চয়ই সে খেলার ঘরে আছে। ঐ ত সে পুতুলগুলি বিছানার শুইয়ে কোথায় উঠে গেছে। তাই ত’ কোথায় গেল? পুকুরের ধারে, বাগানে, ছাদে দেখলাম—নাঃ, কোথাও ত’ আমার প্রাণের পুতুল নাই! বিন্দু বাসন মাগছিল, তাকে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম। সর্বদীনী সব জান্ত—জেনেও আমার ছাঁড়ালে। সে বাসনের দিকে দৃষ্টি রেখেই, যেন কিছু জানে না, এইভাবে বলল—“এইমাত্র দরওয়ান তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে।”

ধিরকির, দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাগলীর মত ছুটলাম। যে আমি পুরনারী কোন দিন ঘরের বাইরে পা দি’ নি—সেই আমি আজ রাজপথে ছুটে চ’লেছি। কোন্ দিকে চ’লেছি কিছুই জানি নে। অবশেষে এক বিপুল নদী আমার গতিরোধ করল। চিন্তে আর বাকী রইল না—এই সেই চিরপরিচিত ভীষণ রাক্ষসী দামোদর!!—যান ডেকেছে—আমার কমলাকে ধরেচে—সেহকে দান ক’রে প্রতারণা ক’রেচে—এখন আবার আমাকে গ্রাস করার জন্য গতিরোধ ক’রে দাঁড়িয়েচে!!! আর আমার বেঁচে লাভ কি? আর সহ্য হ’ল না, রাক্ষসীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লুম—কমলা যেখানে, সেইখানে জুড়াতে! সঙ্গে সঙ্গে কে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! স্বামী! আমার বুক করে টেনে তীরে তুললেন।

পাগলীর মত বললাম “কেন বাচালে?—আমার বুক যে শূন্য!”

তিনি কি সুন্দর স্নিগ্ধ প্রেমভরা দৃষ্টিতে কেবল একবার আমার চোখে চাইলেন।

কি অপার্থিব দৃষ্টি! সব ভুলে এখন মনে হ’ল—“আমার সব আছে ওই দৃষ্টিতে!”

## লগ্নহার।

—:ॐ:—

বিজ্ঞান নিশীথে কবে করিখা শয়ন  
হেরিলাম ঘুমঘোরে মধুর স্বপন,—  
কহিছে দেবতা গোর—‘হে ভক্ত আমার !  
কি দিয়া পূজিবে মূর্তি প্রাণ-দেবতার ?’  
—কিছু নাই ! নাহি অর্ঘ্য কুসুম-চন্দন,  
ফিরিষু কুসুম থুঁজি বন উপবন ;  
আনমনে শোভা হেরি শেষে অবেলায়  
উত্তরি মন্দির-দ্বারে দেখিলাম হায়,  
সুদৃঢ় আগলে বাঁধা রহিয়াছে দ্বার,  
লেখা আছে তরুপরে—লগ্ন নাহি আর !

কুমারী স্নেহলতা চন্দ্র।

## শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনথ।

কবিবরের শান্তিনিকেতন বোলপুরের ভূবনভাঙ্গা নামক ডাক্তার উপরে। মফস্বতীর মধ্যে একটু রেষসিগের মত দেখা যায়। জায়গাটি তাঁহার যাত্রা ও উপস্থিতিতে প্রকৃতই মনোরম হইয়াছে। নানাবিধ বৃক্ষাদি, অসংখ্য মালতীর লতার মধ্যে ছোট ছোট গৃহগুলি আশ্রমের মতই হইয়াছে। কিন্তু সর্দাপেক্ষা দ্রষ্টব্য দ্রব্য কাঁচ নিজে। আমি যখন বৈকালে গেলাম তখন তিনি একটি বিতল গৃহের নিম্নে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সেই বাড়ীর উপর তলার একটি ঘরেই তিনি থাকেন। বেখানে বাসকা লিখেন, সে জায়গাটি ছোট, ছোট জায়গা ভিন্ন লিখিতে মন বসে না। আমি সে দলের মধ্যে গিয়া দেখা কহিতে ইচ্ছা না করার শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে (ইনি এসিষ্টেণ্ট উপনাসিক ও শ্রীশচন্দ্রের পুত্র এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক আমেরিকার বি এসসি) সে কথা বলিলাম। তিনিই কবিগুরু উঠিলেন এবং সেই আশ্রমের মালতীর মত শুভ্র মুহূর্ত হাস্যে ‘তুমি আসিয়াছ’ বলিয়া যে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতেই প্রাণ ভরিয়া গেল, একটু হাসিতে এত আদর থাকিতে পারে তাহা ইহার আগে জানি নাই। তার পর আমি প্রণাম করিলে আনন্দের পৃষ্ঠে হাত দিয়া যে আদর করিলেন তাহাই মূর্ত আশীর্বাদে মত আমার মনে হইল। তার পর হইলেন ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। কত কথা, কত আলোচনা সেই একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টার

বে হইল তাহা বলিতে পারি নে। প্রত্যেক কথাতেই তাঁহার অনধিগম্য গভীরতা ও অসাধারণ হৃদয়ঙ্গম প্রকাশ পাইতে লাগিল। আর আমি আমার স্বল্পজ্ঞান লইয়া, হিমালয়ের নিকট হৃৎকার সেই উঁচু চিপিগুলির মত ঠাড়াইয়া রহিলাম। Art, Personality, প্রভৃতি লইয়া গল্প হইতে লাগিল। ঠিক গল্প নয় তাঁহার বক্তৃতা উপদেশ তুলিতে লাগিলাম এবং মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অভিভূত করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনেরই একটা ‘বিশ্ব ভারতীর’ সঙ্কীর্ণের ছাত্র আমাদের নিকট আসিয়া কবিগুরুকে, তাঁহার নিজের কবিতা সংশোধন করিয়া দিবার কথা বলিলেন। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ত বুড়া হইলেও না তাই আবার ছেলে হইয়াছেন, তিনি সে যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন না। রবীন্দ্রনাথকে যে একজন এখনো কবিতা সংশোধন করিয়া দিবার জন্য অহুরোধ করিতে পারে তাহা আমার জ্ঞানে ছিল না। তাঁহার সময় এত প্রচুর নহে যে ঐ সব নূতন লেখা দেখিয়া কাটিয়া দিবার অবসর তাঁহার আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নন দেখিলাম। বলিলেন “বাপু তোমার কবিতা আমি ত অনেক দেখিয়া দিয়াছি, তা এখনো কবিতা হয় নাই, এখন কেটে লাভ নাই। যুবকটা তাহাতে বলিল “আমি না লিখিয়া পারি নে, ভাবে আমার বিভোর করে” রবীন্দ্রনাথ বলিলেন “দেখ, কবিতা যখন হবে তখন তুমিও জানতে পারবে লোকেও জানতে পারবে, সেটা আলো, জলে উঠলেই বুঝতে পারবে, কিন্তু যতক্ষণ না জলে ততক্ষণ কবিতা হবে না। দিৱেশলাই আমি অনেকক্ষণ ধরেছি বললেই আলো হয় না।” আর ও-জিনিষটা দেখিয়ে দিলে হয় না, আমি বহু বহু লেখা দেখে দিয়েছি তাতে কেউ কিছুই লাভ করতে পারে নাই। যাঁহক যুবকটা ত বিদায় হইল। আমি বলিলাম “আলা ত আপনার কম নয়?” তাতে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন “কি করি বল? এ রকম অনেক করতে হয়।”

তার পরে মেঘদূত ও মেঘের কথা উঠিলো। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন “কুমুদ, মেঘ দেখলে যে আমি কি করে বাই তোমার কি বলবো আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে, ওই ঘরেই বসে মেঘ দেখে আমি ‘মেঘদূত’ কবিতাটা লিখেছিলাম।” আমি শুনিয়াছিলাম, উর্দুশী নামক কবিতাটা পদ্মা-তীরে কোন স্ত্রীলোক দেখিয়া লেখা কিন্তু তাহা নহে, তিনি বলেন, “উর্দুশীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম বটে তবে সেটা আমার কল্পনালোকে। পৃথিবীর ঘটে ঘটে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তবে কোন বিশেষ ঘটে নয়।” তার পরে নানা কথা কহিতে কহিতে দুইজনে ফিরে গেলাম। রাতে তিনি ব্রাউনিং Browning পড় ইবার একটা ক্লাস করেন, তাহাতেও বোগ দিয়া আনন্দ পাইলাম। রবীন্দ্রনাথ একটা সাদা ইঞ্জের ও সাদা জামার উপর একটা সামান্য চোগা পরিধান করেন। তিনি ক্ষুভা ব্যবহার করেন অন্য কেহ করেন না। নিকটের সাঁওতাল ও ভ্রমণকারীর ছেলেরা তাঁহাকে দেখলে মজা পার, সবাই পরসা চায়, তিনি পরসা সঙ্গে রাখেন না, দোয়ানী দেন, আর বলেন “তোরা কত ক্ষুটেছিঁস্ রে, আর পারি নে।” রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকের সমস্ত আয় আশ্রমে দান করিয়াছেন এবং এই আশ্রমের তিনিও একজন শিক্ষক, তিনি একটা ক্লাসে translation পড়াইতেছিলেন আমিও ক্লাসে গেলাম, আমাদের পড়ানই পেশা, তবু তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া অবাক হইলাম, প্রত্যেক ছেলেকে এক কথা যে কতবার বলিতেছেন, তাহা বলা যায় না। একজন পাঠশালার গুরু মহাশয়ও বৃত্তি পরীক্ষার ছেলেকে এত কষ্ট ও আগ্রহের সহিত পড়ান না। কেউ একটা প্রশ্নের লজ্জার দিলে, “বাঃ তুই যে পণ্ডিত রে,” এবং না বলতে পারলে, “তুই বাপু বড় অনামনস্ক, তোকে আর পারি নে দেখছি,” প্রভৃতি বলিয়া ঘণ্টা শেষে correction এর জন্য কতকগুলি খাতা লইয়া গেলেন। অবকাশ সময়ে সেগুলি দেখিবেন। আমি এখনো তাঁহার সামান্য কাব্যে এত উদ্যম, এত আগ্রহ দেখিয়া অবাক হইলাম—

অতিক্রম কর্তব্যটিও সম্পাদন করা চাই। এ বেন সেই Wordsworthএর Skylarkএ "True to the kindred points of heaven and home".

যে দিন রাত্রে গান রচনার ত্রুটি হন সেদিন আর ঘুমও নাই, রাত জাগিয়াই আনন্দে কাটিতেছে। গান তৈয়ার করিব বলিয়া বসেন না, যখন গীত তাঁহাকে ছাড়ে না তখনই এস্রাজে সুর দেন। হারমোনিয়াম আশ্রম হইতে নির্কাসিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অল্প বয়সে বিকশিত হইয়া এত দিন স্থায়ী যে তাহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও বিরল। ভগবান তাঁহাকে ধনে, রূপে, গুণে, কণ্ঠে, প্রতিভায় সর্বাংশেই নিম্নের মনেরমত করিয়া গড়িয়াছেন। গত বৎসর আমি বীরভূমে মহাকবি চণ্ডীদাসের পাট 'নারুরে' গিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এবার বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নিকট গিয়াও তেমনি আনন্দ অমূল্য করিলাম।

আমার কবিতা সম্বন্ধে তিনি যা বলিলেন তাহাতে আমার আশাতিরিক্ত প্রাণশ্রী, হয় ত তিনি সেটা স্নেহবশতই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই হাসি সেই স্নেহ সেই আদর সেই প্রাণশ্রী দেখিয়া ও শুনিয়া তখন আমার তাঁহারি সেই কবিতাটি মনে হইতে লাগিল—

“প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্র ধীন  
কুটিয়াছে ছোট কুল অতিশয় ধীন  
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই  
স্বর্ঘ্য উঠি বলে তারে—ভাল আছ তাই।”

শ্রীকুমারদত্ত সঙ্গিক।

## পূজনীয়া স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু উপলক্ষে—

দীপ্ত ঋজু হৃদয়ের স্নিগ্ধ জীব-জ্যোতি  
নিভিল গঙ্গার তীরে। অঙ্গের বিভূতি  
লভিল বঙ্গের মাটি! এই হ'ল শেষ?  
কে বলিল শেষ ইহা? তোমারি স্বদেশ—  
অন্তঃপুরে আত্মহারি ছিলে মর্ত্য্য মাকে,  
আজি চরাচর ব্যাপি' তব সঙ্গা রাজে।

চির-পুণ্য হৃদয়ের উর্দ্ধশিখাখানি  
সযত্নে অঞ্চল দিয়া ঢেকেছিলে জানি;  
সে প্রদীপে কত দীপ পেয়েছে পরাণ,—  
কত অন্ধকারে আলো করি' গেলে দান;

বাক্যহীনা, কৰ্ম্মময়ী হে ভারতনারি !  
 এক দোপে শত দীপ এ শুধু তোমারি !  
 ভরঙ্গিত স্রোতস্বিনী, ভেদি' নিজ কারা,  
 প্রবাহি' প্রসন্ন চিত্তে দিলে প্রাণ-ধারা !

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় ।

## মণিপুর চিত্র

### অতিথি-সংকার ।

মণিপুরে অতিথি-সংকার এক শোভনীয় ব্যাপার । অতিথিকে যদি সংকার করিতে হয়, তাহার জন্ত বন্দোবস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে আমি বাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না । আজকাল আমরা অতিথি-সংকার জন্ত Garden-party, Evening-party, অথবা Dinner-party, প্রভৃতি Partyর উত্তোগ করিয়া থাকি, কিন্তু এই Happy valleyতে অতিথি-সংকারের জন্ত 'কীৰ্ত্তন' দিয়া থাকে । সেই কীৰ্ত্তন আমাদের যাত্রা-কীৰ্ত্তন অথবা বাউল-কীৰ্ত্তন প্রভৃতি বিরাট আয়োজন নহে । আমি এবিষয়ে একটি কীৰ্ত্তনের কথা উল্লেখ করিব । জনৈক মণিপুরী ব্রাহ্মণ আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত তাঁহার কস্তার 'সইয়ালা' পাতাইয়া দিয়াছিলেন; যখন এই ব্রাহ্মণ আগরতলা-বাসী ছিলেন, ঘটনাক্রমে মণিপুরে আসিয়া তিনি দুই মাইল দূরে বাস করেন । এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমার দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং আমার দর্শনাভিলাষ তাঁহার কর্ণগোচর হয় । আমি শকটারোহণে এই দুই মাইল পথ বাইরা দেখি তাঁহার বাটিতে লোকারণ্য ! বাটির প্রান্তনে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে একটি চৌকীতে বসাইয়া আমার পাদপ্রক্ষালন করিলেন । ইহাই পাণ্ডুর্বা বলা যায় । পাণ্ডুকা ত্যাগ পূর্বক এই স্বাগত অতি-বান্দন গ্রহণ করিয়া আমি নগ্ন পদে একটি নাটমন্দির-ঘরে প্রবেশ করিলাম । এখানে দেখিতে পাইলাম বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে । ব্যাপারখানা কি জানিতে অভিলাষ হইবামাত্র কতকগুলি মণিপুরী লোক অগ্রসর হইয়া আমাকে "বার্ত্তন" • করিয়া বসিল । এই 'বার্ত্তন' করার প্রথা মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত । একখানা থালে পান, সুপারী, পুস্পমালা এবং চন্দন লইয়া আমার নিকট নত শিরে উপস্থিত হইল । ইহাই অতিথির স্বাগত অতিবান্দন । চন্দনের টীকা দান করিয়া, পুস্পমালা গলায় ঝুগাইয়া তাড়ুগছারা আমাকে স্বাগত করিল ।

• "বার্ত্তন" আর এখানকার "পান দেখান" প্রায় একই জিনিষ । "বার্ত্তন" বুঝে সমস্ত বস্তু শব্দের অপভ্রংশ, ইহা "নিমন্ত্রণ" করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অত্যাগতকে যে পান দেওয়া হয় তাহাকে "পান পিবা" "পান দান" বলা হয় । পানদেখা প্রথমেই দেওয়া হয় ভৎপয় আসন গ্রহণ করিয়া পর "সেই চন্দন" অর্থাৎ পুস্পচন্দন দান ও তাড়ুগ দান দ্বারা অত্যাগতের অভ্যর্থনা করার নিয়ম । ইহা ছাড়া বড় সঙ্গ ব্যাপারেই নিমন্ত্রিত অত্যাগত ব্যক্তিকে করা হয় । ইহা ঐহিক অভ্যর্থনার অঙ্গ পূর্ণ হয় না ।

আমি দীনবেশে কুটুমসমাগমে গিয়াছিলাম এই বিরাট আয়োজন করার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং আমি আশাও করি নাই। আমি রাজপারিষদরূপে এ বাড়ীতে কখনও উপস্থিত হই নাই এবং ইহা আমার উদ্দেশ্যও নয় তবে এ রাজসিক আয়োজন কেন; এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুটুমকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন জানিতে পারিলাম তিনিও আমাকে কুটুম ব্যতীত রাজ-পারিষদরূপে গ্রহণ করেন নাই। দূরদেশাগত কুটুমকে যে উপায়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন এই অভ্যর্থনাও সেইরূপ। মণিপুরের প্রথা,—এমন কি পরগাজো মণিপুরবাসীগণ এই প্রথাই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতিথিকে এবং কুটুমকে তাহার দেবতা বলিয়া জানেন। প্রত্যেক মণিপুরী পল্লীতে একটি করিয়া নাটমন্দির বৃহৎ চালাবর থাকে। ইহা গ্রামবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। এখানেই তাহাদের আমোদ-প্রমোদ অভ্যর্থনা এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয়। গ্রাম-সম্পর্কে উপস্থিত অতিথি, সকলেরই সম্পর্কে সম্পর্কীভূত হইয়া পড়ে; কাজেই গ্রামের একটা আনন্দোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে নির্বাচন করিয়া এই অতিথি অভ্যর্থনার লোক ঠিক করা যায়,—অতিথি-সংকার ব্রতে কে কে কোন্ কাজ করিবে। মণিপুরে জাত্যভিমান নাই। উচ্ছিষ্ট পরিবার পর্য্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি করিয়া থাকে। আমার আগমনে গ্রামের লোকেরা এই সম্মিলন-সভার আয়োজন করিয়াছেন। ইহাতে খরচের বিড়ম্বনা নাই, গ্রামের লোক সকলের ঘর হইতে যে যে রকম সাহায্য করিতে পারেন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। খোল করত ল লইয়া বাদকবৃন্দ আসরে নামিয়া বাস্তবাজাইতেছেন আর গায়কগণ জয়দেব গান গাইয়া বাইতেছেন। এই জয়দেব গান মণিপুরী রা গণিতে গীত হইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক এক জন লোক উঠিয়া গায়কগণের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট গান গাইতে পারিতেছেন তাঁহাকে সাতাঁক প্রণিপাত পূর্বক তাহুল দানে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাতে বালক বৃদ্ধ ভেদ নাই। ইহা গায়কের প্রাপ্য সম্মান। বয়সের সঙ্গে তাহার ভারতমা হয় না। এ প্রথাও আমার নিকট বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কোমল কলাপাত এমন বিচিত্র রকমে কাটা হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মণিপুরের শিল্পচাতুর্যের তারিকনা করিয়া উপায় নাই। যখন কীৰ্ত্তন শেষ হইল, তখন পরস্পর কোলাহোলি এবং অতিথির নিকট আসিয়া আবার বার্ত্তন করিয়া সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তারপর জলযোগ, তাহাতেও আড়ম্বরশূন্য। খইয়ের নোয়া, তিলের পিষ্টক এবং গ্রামের ফল দ্বারা অতিথির ভোগ দিলেন এবং সকলে তাহা আশ্বাদন করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া Happy-valleyর অতিথি-সংকারের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম। এই আড়ম্বর শূন্য ব্যাপার অগৎ আত্মরিকতার পরিপূর্ণ একটি উৎসব। গ্রামে গ্রামে এই প্রথা আবহমানকাল হঠতে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গ্রামে দূরাগত অতিথিকে আশ্বর্ষণ করিয়া অতি নিকট-আত্মীয় করিয়া লইতেছেন।

এইরূপ এবং পুরুষ সমাগমে এই অতিথি-সংকার পূর্ণ হইয়াছিল এবং আমিও অতিথ্যে পরম প্রীতিলভ করিয়াছিলাম, আমি কুটুমসমাগমে গিয়াছিলাম কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক আমার সম্পর্কীভূত হইয়া পড়িল। তারপর মহিলা-মহলের রসিকতা, পুরুষ মহলের রসের কথা আমাকে রসস্থ করিয় দিয়াছিল। মেয়ে পুরুষ মিলিয়া আমাকে এবং আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে বয়সের সুবিধানুসারে সম্পর্ক পাতাইয়াছিল এবং এ উপলক্ষে রসিকতা প্রচুর হইয়াছিল। এই কুটুমসমাগমে যে কয় ঘণ্টা বিমল আনন্দে কাটায়াছি, তেমন সুখ আমার জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

## পরস্পর ।

—:~:—

( বাইবেলের ছায়া )

কা'র কথা !—কা'র স্বর !—শোনো লো সখী,

অই বুঝি নেচে গেয়ে

অই বুঝি আসে ধেয়ে !

—দেখ নিরখি—

পার হয়ে' নদী-গিরি

বনে বনে খুঁজি ফিরি,

অই বুঝি বঁধু মোর—দেখ না লখি—

অই বুঝি আসে পিয়া—দেখ লো সখি !

সাধের কুরঙ্গ মোর চপল গতি !

এ নব যৌবন-বনে

রসালস-বিলসনে,

বভসে অতি,

রহিবে না দু'টা দিন ?

আঁখি-জল দুখ-চিন্

মুছিতে বারেক বড় ব্যাকুল-মতি !

সাধের কুরঙ্গ মোর চপল গতি !

বুধাই কি নিতি নিতি শয়ন রচি ?

তুলি নব কিশলয়

বিকশিত ফুলচয়,

মুকুলে খচি,

জ্বালি নিতি দীপ-ভাতি

জেগে থাকি সারা রাত্তি,

পাতাটা নড়িলে চিত পড়ে মূরছি ?

বুধাই কি নিতি নিতি শয়ন রচি ?



( ২ )

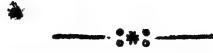
ওঠ ওগো কথা কও মধুর হাসি,  
 প্রিয়া-সখী-সু-ভাষিণী,  
 সু-কুসুম-সু-বাসিনী,  
 রূপের রাশি,  
 দেখ প্রিয়া দেখ চাহি,  
 শীতের কুয়াসা নাহি,  
 আকাশ হাসিছে আজ আলোকে ভাসি !  
 ওঠ ওগো কথা কও মধুর হাসি !

আকুল আঙুর বন ফলের ভারে !  
 লতায় লতায় ফল  
 ঝলমল টল্ টল্  
 হৃদের পারে !  
 নবীন মুকুল ফুল  
 তরুণলি নিরাকুল,  
 সে শোভা-সৌরভ-ভার বহিতে নারে !  
 আকুল আঙুর বন ফলের ভারে !

এস এ কাননে আজি প্রেয়সী মম !  
 কপোত কূজন করে  
 বিরহ-বেদন-ভরে ;—  
 কোমল-কম  
 অমল সমীর বয়,  
 মানস অবশ হয়  
 স্মরিয়া পরশ তব সরসতম !  
 এস এ কাননে আজি প্রেয়সী মম !

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ।

## শ্রমশীলতা ।



প্লিনোয়ার মার্কুইন্স, সার হোরাস্ ভিন্নারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আচ্ছা সার হোরাস্, কিসে আপনার ডাই মারা গেলেন?” হোরাস্ উত্তর করিয়াছিলেন—“কিছু করবার না থাকাতাই তিনি মারা গেছেন।” মার্কুইন্স বলিয়াছিলেন “কাকো মারবার জনো ওই কারণটিই যথেষ্ট বটে।” এই কথা কয়টির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। আমাদের বিশ্বাস যে বেশী কাজ করাও সম্ভব। আমরা জানি যে সাধারণ রকম পরিশ্রম সে সকলেই প্রায় করিতেছে। বেশী কাজ করিলে যে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন শক্তি কমিয়া যায় সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। শ্রমশীলতা হইতে অলসতাই যে বহু লোকের মৃত্যুর কারণ ইহা নিতাই দেখা যাইতেছে। শারীরিক শক্তি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য শ্রমশীলতা ভগবানদত্ত জিনিষ। শারীরিক মানসিক এবং নৈতিক ক্ষমতা বাড়ানো পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করে, অলসতার উপর নহে। শেষোক্তটি ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু, ভেঁড় করিয়া দেয়, শ্রমে মনুষ্যস্থ আনে, অলসতার কখনও নহে। যে চাৰিটি সৰ্ব্বদা ব্যবহার করা যায় সে যেমন উজ্জ্বল থাকে—অব্যবহার্য্যটিতে মরিচা ধরিয়া যায়, শ্রমবিমুখ জনেরও ভেঁমনি ভিতর বাহির মরিচা পড়ে।

বোষ্টন সহরের একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের একদিন রাত্ৰায় দেখা হওয়ার বন্ধুরা তাঁর শারীরিক অসুস্থতা লক্ষ্য করিয়া বিষয় প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন “প্রায় এক বৎসর হ’ল আমি ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিলাম—নিশ্চিন্ত আসলোয় জীবন কতই না সুখের হবে, কিন্তু এখন দেখছি আমার মত হতভাগ্য আর জগতে নেই। আমি এখন মেইনের দিকে চলেছি একটা ফ্যাক্টরি কিনবো মনে করে, কারণ এমনি ভাবে আর কিছুদিন জীবন চললে আমি মারা যাব। এই ‘কিছু না করিবার প্রলোভন’ তাঁর পুষ্ট স্মৃতিতে দেহটিকে প্রায় পঁচিশ সের কমাইয়া দিয়াছে—এবং মৃত্যুভয়ও দেখাইতেছে। শুধু কৰ্ম্ম,—ডাক্তারদের এ ব্যাধি সারাইবার ক্ষমতা নাই।

মানসিক দৃঢ়তা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় মন যখন পূর্ণ হইয়া ওঠে—শ্রমশীলতা ইহাদের সঙ্গে আসিবেই আসিবে। মানুষ অবশ্যই কাজ করিবে। ওই সব গুণাবলীর সঙ্গে ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সিডনিবলির বাল্যকাল এমন দারিদ্র্য কাটিয়াছিল যে শীতকালে ঋণালি পায় তাহাকে কৰ্ম্মগৃহে যাইতে হইত—দিবসে ঘোল ঘণ্টা শ্রম করিতে হইত, তাহার শিক্ষাবোধ অবস্থার। কালে ইনিই নিউইয়র্ক শহরের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, মেয়র এবং দেশ-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। পরিশ্রম করার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া প্রত্যেক যুবকের পক্ষেই একান্ত কর্তব্য ইহাই আমরা মনে করি। কার্য্যারম্ভে ইহার বশেই সে কৃতকার্য্যতার দিকে অগ্রসর হইবে। যদি তাহার প্রতিভা থাকে পরিশ্রম ইহা উন্নত করিবে, যদি না থাকে অক্লান্তশ্রম সেই স্থান পূর্ণ করিয়া লইবে। প্রতিভা শ্রমকে কখনও তুচ্ছ মনে করে না, অতি প্রতিভা সম্পন্ন লোক যারা তাঁরাই সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী। টাণ্ডারকে তাঁহার কৃতকার্য্যতার গুপ্ত কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন “কঠোর পরিশ্রম—এ ছাড়া গুপ্ত কারণ আর কিছু আমার নাই। এই গুপ্ত কারণটিই অনেকে মনেও শিখিতে পারে না তারা কৃতকার্য্যও হয় না—কারণ তারা এ শেখে না। শ্রমই হচ্ছে সেই প্রতিভা যাতে বিশ্বের কদম্বিকা বুচিরা তাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তোলে, অভিশাপ

যর হয়ে দাঁড়ায়।” ওয়েবেষ্টার বলিয়াছেন—নিজকে কার্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা—এবং ওই কার্যে সফলতা লাভ এই ছিল তার প্রতিভা এই ছিল সর্বস্ব।

বিশ্বে ধাঁহারা ধ্যাতি অর্জন করিয়া গেছেন তাহারা কেহই এই গুণটার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। কৃতকার্যতা লাভের একটি অতাবশ্যকীয় উপকরণরূপেই ইহাকে তাহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন তাহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ‘বাণী’ লিখিয়া গেছেন—যথা—“তুমি জীবনকে অবশ্যই ভালবাস ? তবে সময় বুঝা নষ্ট কোরো না কারণ জীবন উহা দ্বারা ই রচিত।”

“সময় যদি সব জিনিসের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়—সময় নষ্ট করাই তবে সব চেয়ে ক্ষতিকর।”

“অলসতা সব জিনিসকেই কঠিন বানায়, কিন্তু শ্রমশীলতায় সব সোজা হয়ে যায়।”

“যে বেশী বেলা করে ওঠে রাত্রেও সে কচিং কাজের নাগাল পায় ; অলসতা এত মধুর গতিতে চলে যে দারিদ্র্য শীতাই তাকে ধরে ফেলে।”

“যারা কাজ করে খায় ক্ষুধা তাদের দ্বারে উঁকি মারিলেও ঢুকিতে সাহস পায় না।”

“আজকার একদিন আসছে দু’দিনের সমান।”

“বিশ্রাম চাও তো ভাল করে নিজের সময় খাটো, এবং যে পর্যন্ত না একমিনিট সম্বন্ধেও তুমি নিশ্চিত — ততক্ষণ এক ঘণ্টা বুঝা যায় কোরো না।”

একজন বুঝ বাবসায়ীকে তিনি লিখিয়াছিলেন “মনে রেখো সময়ই টাকা, যে পরিশ্রম করে দিনে দশ শিলিং রোজগার করতে পারে সে যদি আলস্যে কিংবা অপর কোন আশ্রমে মাত্র ছয় পেনী খরচ করে দিনের অর্ধেক কাটায় তো মনে কোরো না সেই সামান্য ছ’ পেনী মাত্রই তার খরচ হয়েছে, সে বাস্তবিক খরচ করেছে অথবা বুঝা নষ্ট করেছে ওর উপরেও পাঁচ শিলিং।”

তাহার আশ্রমচারিতে তিনি যে ভ্রাতার নিকট শিক্ষা-নবীশ ছিলেন তাহার নিকট হইতে অধ্যয়নের জন্য বেশী সময় করিয়া লওয়ার বন্দোবস্তের উল্লেখ আছে।

“আমি আমার ভাইএর কাছে প্রস্তাব করিলাম যে, তিনি সপ্তাহে আমার আহারের জন্য যত ব্যয় করেন তাহার অর্ধেক যদি আমাকে দেন তবে আমি নিজের আহারের বন্দোবস্ত নিজে করিয়া লইতে পারি। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, আমি দেখিলাম আমাকে তিনি যাহা দিতেন তাহার অর্ধেক আমি বাঁচাইতে পারিতাম। এতে আমার বই কিনিবার আরও একটা অতিরিক্ত তহবিল হইল—এবং আমি আরও এক সুবিধা পাইলাম, আমার ভাই এবং আর আর সকলে আহারের জন্য ছাপাখানা থেকে বাইরে গেলে আমি আমার সামান্য জলখাবার একখানা বিক্টি কিংবা এক টুকরো রুটি ও একগ্লাস জল খেয়ে বই নিয়ে বসিতাম—মিতাহারে মাথা বেশ পরিষ্কার থাকে, তাই আমার পাঠও দ্রুত অগ্রসর হইত। বাজে কাজের বোঝা কমিয়ে সময় যথাসম্ভব কাজে লাগানোর এ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত—এবং তাহার সফলতা লাভেরও একটি কারণ।”

প্রতিভার কথায় একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন “Is but Capability of Labouring intensely; the power of making great and Sustained efforts”,—এ সম্বন্ধে কিটো তাহার একজন বন্ধুর কাছে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—“আমার কোন বিশেষ প্রতিভা নাই এবং নে চাইও না। আমি শুধু জানি আমার কিছু শ্রম করিবার ক্ষমতা আছে—এবং সেই ক্ষমতা ঠিক পথে লাগাতে পারাতেই আমার যে একটু সফলতা লাভ হয়েছে।”

গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডিও কিতোর সম্বন্ধে এই কথাই লিখিয়াছেন—“যা কিছু তিনি করিয়াছেন নিজ ক্ষমতাই করিয়াছেন, এ কোন ইচ্ছাজাল সাহায্যে কিছু করা নয়—শুধু ধৈর্য্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমেই এ হইয়াছে। তিনি সিংহের মত তার শিকারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়েন নাই কিন্তু তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাজ বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে করিতেন, কিন্তু সব সময়ই কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকিতেন।”

পাঠকগণ এই সব উদাহরণ হইতে অবশ্যই দেখিতেছেন যে শ্রমশীলতাই কৃতকার্যতার পথ সুগম করিয়া দেয়, এমন কি অতি অলস প্রকৃতির লোক যে সেও ইহার মূল্য অস্বীকার করিতে পারে না। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন একজন নবীন ব্যবসায়ীকে লিখিয়াছিলেন “ভোর পাঁচটা কিয়া রাত্রি নয়টায় তোমার হাতুরীর শব্দ যদি তোমার পাওনার শোনে তো সে ছয় মাস শাস্ত হইয়া থাকিবে, তাগিদ দিবে না—কিন্তু কাজের সময় তোমায় যদি সে কোন তাসের আড্ডায় কিম্বা শুঁড়ির দোকানে দেখিতে পায় তো সেইদিনই সে তোমায় তাগিদ আরম্ভ করিবে ও সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারা পর্য্যন্ত তাগিদে চোটে উত্তাক্ত করিয়া মারিবে।”

পরিশ্রমী লোকের যেরূপ সহায় ও বন্ধু জোটে অলসের তেমন জোটে না, অলস লোক কাহারও নিকট সম্মান বা বিশ্বাস পায় না। আর সবদিকে তার চরিত্র সুন্দর হইলেও অলসতাই একটা মত্ত কলঙ্ক। সাধারণ তাহাকে সন্দেহের চোখে দেখে, সে অর্থ, জ্ঞান, বা ধর্ম্ম কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সব বিষয়েই সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

হৃদয়বান ব্যক্তির পরিশ্রমীকেই সাহায্য করিতে অগসর হন, অলসকে নহে। কারণ শ্রেয়োকৃতির সাহায্য করিয়া কোন ফল নাই, অলসকে সাহায্য করাও বা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়াও তাই। সাহায্য পাইলে অলসের অলসতা আরো বাড়িয়া চলে। অলসতার প্রশ্রয় কোনরূপে দেওয়া মহাভুল, সমাজ ও জাতির অহিতকর। এই জন্য আমেরিকার অধিকাংশ সহরেই তাহাদিগকে সংশোধনাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। অভিজ্ঞতার জ্ঞান যার কোনরূপ সাহায্য পাইলে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, ধনী হউন, শিক্ষিত হউন, ভদ্র হউন—অলস প্রকৃতির সকল লোকদেরই ঐ এক পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

শ্রম করিয়া যাহারা নিজের জীবিকা অর্জন করে তাহাদের লাজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই—তাহারা রাজার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত।

বৃকদিগের কখনো ভুলিলে চলিবে না যে—পরিশ্রমই ঐশ্বর্য্যের জন্মদাতা, অলসতা কখনো কোন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা কোন জাতির এক পয়সাও বাড়াইতে সক্ষম হয় নাই। পরিশ্রমেই বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এ সুখ সৌভাগ্যের এক কণাও অলসতার দান নহে। এই স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান মন্দির, রেল রাস্তা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সবই পরিশ্রমের দান। ইহাদের কোন একটিও স্বামীত্বের জন্য অলসতার নিকট খণী নহে। প্রাসাদ নহে—কয়েদখানা, শিল্প-সৌন্দর্য্য নহে—অকৃৎস্নের কোণ, শিক্ষা ও বিজ্ঞান নহে—শুধু মূর্থতা এইগুলিই হইতেছে সর্ব্বদেশে অলসতার দান।

শোনা যায়—পাঁচডলার দামের সাধারণ লোচা, ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরী হইলেই তার দাম হয় দশ ডলার, ছুরি তৈরী হইলে তার দাম হয় একশ আশি ডলার, ছয় হাজার অটশ' ডলার দাম হয় হুঁচ তৈরী করিলে, ঘড়ির স্প্রিং তৈরী করিলে দাম হয় দুই লক্ষ ডলার—হেয়ার স্প্রিং তৈরী হইলে দাম হয় চারি লক্ষ ডলার। এই হিসাব ঠিক সত্য কিনা জানি না—কিন্তু পরিশ্রমে যে মূল্যের এইরূপ আকাশ পাতাল ভারতম্য হয় ইহাতে সন্দেহ

করিবার কিছু নাই। কৃষাণ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে স্বপ্ন, কিন্তু সেই বীজ ফলানোর জন্য জমীর উপর সে ঐক্য অসাধারণ পরিশ্রম করে ভগবানের অনুগ্রহে রৌদ্র বৃষ্টি সমন্বিত মত হলে সে বীজের কত গুণ ফসল লাভ করে তার শ্রমের সার্থকতা লাভ করে। শ্রমের মর্যাদা বুঝতে হইলে এই চিন্তা সব সময় মনে করা দরকার। জগতের অর্ধেক লোক যদি শ্রম না করে তবে অপরাধি যে তাহার ফলে অনশনে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি শ্রমই সকল ঐশ্বর্যের স্রষ্টা তবে শ্রমীরাই জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড, শ্রমী বলিতে বাহারা হাতে খাটে আমা গুণু তাহাদিগকেই বুঝিতেছি না, বাহারা মাথা খাটাইয়া পুস্তক রচনা করিতেছেন, শিক্ষা দিতেছেন, বলুতা দিতেছেন, কাগজ চালাইতেছেন সকলের হিতের কার্যো নিযুক্ত আছেন তাহারাও শ্রমী। ইহাতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও এই পর্যায়ে পড়িবেন, কৃষাণ, বণিক, অধ্যাপক কলওয়াল সকলেই পাশাপাশি দাঁড়াইবেন। একজন অতি হীন অবস্থার কলাবিন্দু তাহার দেশের ঐশ্বর্য বাড়াইতে ও দেশ সেবা করিয়া থনা হইতে পারেন তাহার দেশবাসী চারিঘোড়ার গাড়িওয়াল স্বন্দর গোভনায় পোষাক পরিত লক্ষপতির চেয়ে। কয়লার খনির একজন ইঞ্জিন ফায়ারম্যানই লকমোটিভের (locomotive) স্রষ্টা। একজন ক্ষেত্রের যন্ত্র নির্মাতাই স্টিমইঞ্জিন (Steam Engine) তৈরী করিয়াছিলেন। আরো বহু অশিক্ষিত শ্রমজীবীরা ভগবানের সন্তানতা বদ্বনের জন্য তাহাদের সমস্ত জীবনের শ্রম উৎসাহ অকাতরে ব্যয় করিয়া গেছে। হোরাস্ মান্ বাবুজী বলেন—“সুবকেরা স্বরণ রেখো, জাতির উন্নতির জন্য যেমন কোন কাজই হোক না কেন তাহার মধ্যে দীনতা বা হীনতা বিদ্যমান নাই। যে লোক চেষ্টা করে সেও একদিন ওয়াশিংটন হইতে পারে। যেমন কাজই হোক না কেন মনের উচ্চতা চাই—মনের প্রশান্ততা থাকা চাই।”

শ্রমে যেমন আস্থা ও উদ্ভীপনা আনে এমন আশ কিছুতেই নহে। অসমিহিত সকল স্তম্ভ ক্ষমতাকে জাগাইয়া কার্যে প্রয়ুক্ত করাই প্রকৃত শ্রম। ৫৫ বৎসর বয়সে প্রবিন্স লঞ্চ সার্ভিসে জবাস্টারশিপে তাহার প্রকাশকদের দোষে খুব বেশী ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন, পরিশ্রমে হারিয়াও সাবন করিতে পারেন এতটুকু বিশ্বাস তাঁহার ছিল, তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন ঋণের শেষ কাড়টার বাহ্যিক পরিচোধ করিতে হইবে। সেই শ্রম ক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি কলম ও খাতা লইয়া বসিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইয়া এমন কি নিদ্রার সময় পর্যন্ত সংক্ষেপ করিয়া বাতের ন্যায় একাগ্র সাধনার তৎপর হইলেন। শরীর, মন, ঋণ শোধের জন্য সব যেন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর পর প্রচণ্ড গড় ব্যয়িত হইতে লাগিল। (ইহার মধ্যে কয়েকখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) শ্রমের ফলে মহৎ কার্যোব জন্য তাঁহার প্রতিটি ভদ্রী যেন সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর ওইরূপ অকাত্ত পরিশ্রম করার পর তিনি যখন নিজস্ব শোধ দিলেন। এই কঠোর পরিশ্রমের পর অল্প দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন—দেশসেবক যখন দেশের জন্য জ্ঞান দেয় তিনিও সাহিত্যের সেবায় জীবন বিসর্জন দিয়াছেন।

অসমতা নানারূপ ঘন্য দোষ ও অপরাধের মূলভূমি, শরতান আর সকলকে প্রলোভিত করে কিন্তু অলস যে সেই শরতানকে প্রণয়ন করে। এই শ্রেণী সাধারণতঃ ভাস, পাশার অভাব, পিয়েটার প্রভৃতি পছন্দ করে। “ফল লাভের শরতানের কারখানা।” খেলাধুলা করিবার লোভ, উচ্চ অর্থ আশ্রমের মোহ এই সব অলস মুহূর্ত্তই মনে ধাগে। এই সব লোকদ্বারাও শরতান কাজ করাখরা হয়। একজন ইংরেজ কারাধ্যক্ষ বলেন—“বহুপ্রকার অপরাধীদের সতর্কভাবে পথাবেক্ষণ করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে প্রায় সকলপ্রকার অসাধু চরিত্রতার কাজেই অজ্ঞতা, মত্ততা কিম্বা দারিদ্র্য হইতে নহে, কিম্বা সহরের অসন্তব জনবাহুল্য চারিদিকের ঐশ্বর্যের লোভ—কিম্বা অপর কোন কারণের জন্যই নহে—সাধারণ পরিশ্রমের চেয়ে অতি অল্প পরিশ্রমে কিছু প্রাপ্তির প্রবৃত্তি হইতেই এই সব অপরাধের বাহুল্য দেখিয়াছি। তাহাবলি ভাঙ্গা কিম্বা অতি নীচ অসাধুতার যে সব কাজ, এ প্রায়ই অলস শ্রেণীর দ্বারা হয়। এবং এ টাকার অধিকাংশই—মদ, বেতালম, নর্সকী প্রভৃতির জন্যই ব্যয়িত হয়।

সকল দেশেরই সংশোধনাগারের লোকের আশ্রয়দানী হয় এই অলস শ্রেণী হইবে, অলসতাই সকল রকম অনাচার ও ভিক্ষাবৃত্তির স্বারস্বরূপ। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ব্লকি তাঁহার 'Self culture'এ লিখিয়াছেন,— এই মানুষের মস্ত রক্ষাকবচ যখন সে বলিতে পারে আমার কোনরূপ বাজে কাজের সময় নাই, নানা আবশ্যকীয় কাজেই আনন্দ—এবং এর পর যুথের বিশ্রাম উপভোগ করিয়া আবার নতুন উদ্যানে নবীন কার্যে প্রবেশ করিতে হইবে।”

পরিশ্রমে এবং পরিশ্রমলব্ধ অর্থে যে একটা মানসিক ট্রান্স ও চাপ্তিলাভ হয় তেমন তৃপ্তি ধনী তাহার মূল্যবান মণিরত্নাদিপূরিত ধনভাণ্ডারের এক কোণ উজাড় করিয়াও পাইতে পারে না। পরিশ্রমেই আত্মসম্মান ও আত্ম-বিশ্বাস পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবি সভার সপ্তদশ বার্ষিক কার্যবিবরণ।—গ্রন্থের বিষয় বাঙ্গলা জুড়িয়া একটা

জাগরণের সভা পড়িয়াছে, আলোচ্য সভার কার্যকলাপ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সভা বারুজীবি জাতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ হিতকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পরোক্ষ স্বদেশের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। স্বনামধন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় ঘটনাথ মহোদায়র বাহাদুর, তাহার বক্তৃতাব একরকম বলিয়াছেন—“তত্ত্বদর্শীর নিকট হিন্দু মুসলমান সনান। \* \* গোড়ামা মঙ্গলদায়ক নয়। \* \* ভগবান বিশ্ববাপী, তাহার ঠিক মন্দির গড়া যায় না। কারণ তিনি অনন্ত ও অব্যাহত সনানসোপোচর। আমরা আমাদের শক্তি সাধ্যমত তাঁহাকে ‘ছোট’ করিয়া লইয়া তাঁহার উপাসনা করি। \* \* যে যেভাবে উপহাস, সে সেইভাবে তাঁহাকে ভাবে ষ্ট্রী উপাসনা করে। চিন্তা করিতে গেলে মুক্তি চাই। মনের ভাব প্রকাশ করিবার নামো পথ। \* \* বর্ষ লইয়া দলাদলি কেবল অজ্ঞতা-বশতই হইয়া থাকে। বারুজীবি সভার এ উদ্যোগ অক্ষয় হইক। এখানে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে দশকে রক্ষা করিতেই হইবে। সরকারের সহিত সড়ান না রাখিলে কখনো শেষ রক্ষা হয় না, স্বার্থরক্ষা পায় না, অকালে ব্যক্তিবিশেষের অপরিণতদর্শিতার, মোতে আত্মসম্মান সংসারে স্বার্থ তুচ্ছ নহে পরিণামে যাহার আত্মোন্নতি, ঐশ্বর্য্যে উন্নতি পরোক্ষের পরের উন্নতি নষ্ট হয়। ভগবতের সকলেই এই স্বার্থ অক্ষয় রাখিতে বাস্তব নিজের উন্নতির সহিত দেশকে ধন ঐশ্বর্য্যে বিদ্যাপ্রদায়ক ভূমিত করিয়া সকলেই শ্রমোত্তান লাভ করিতে প্রাণপণ করিতেছে, আমরাই কেবল সংসারের গভীর হইয়া, নিজের ও পরিবারের ক্ষণিক স্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়া সমগ্র জাতির, স্বদেশবাসীর স্বার্থ হারা বাহাদুর হাজার শক্তি ব্যক্তি হইবে তাহার মুখে কুঠারঘাত করিতে উদ্যত! বারুজীবি সভা আমাদের এই ব্যতীর কলহ—আমাদের একতাহীন স্বার্থ দৌখকার্য্য করণের অন্তরায় যদি অন্ততঃ নিজের মধ্যে দূর করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব। ইহারা বিলাত প্রত্যাগতগণকে সর্ব সম্মতি-ক্রমে সমাজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যে উদ্যোগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অমূল্যবায়ী!”

সভা, বারুজীবিরণের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রকে অর্থ ধার দিয়া শিক্ষা সৌকর্য্য করিতেছেন। ক্রমেই উচ্চশিক্ষা প্রদেশে যেরূপ মহার্ঘ্য হইতেছে তাহাতে মধ্যবিত্ত কেন শ্রমীর পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্ত্তি, এত সফটের দিনে শিক্ষায় জাতির সমবেত চেষ্টা অত্যাবশ্যক। একাল পর্য্যন্ত, ইহাদের সাহায্যে ১৮৫ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহীত সাহায্যের টাকা সভাকে আংশিক প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরিশোধনীয় ঋণ পরিশোধে আরও কত নৃত্যকৃত্ত বিদ্যালয়ে সমর্থ হইবে। এমনি ত হওয়া চাই। কিন্তু হুথের কথা, বিবরণে প্রকাশ অনেকি এই ঋণ পরিশোধে উদ্যোগী! এইখানেই শিক্ষার ব্যর্থতা, শিক্ষিত জাগ্রত হউন আপনার ঋণ

অপরিশোধিত রাখিবেন না, আপনার মেজের জ্ঞান-বহিকা উজ্জ্বল হ'ক। একটী দেশে পরস্পর মিলিত হইলে যে গভাস্তর নাই,—সামাজিক জীবনে শিক্ষিতের তাহাই সাধনার লক্ষ্য হউক।

(প্রাপ্ত)

**সারনাথের ইতিহাস**—রঙ্গপুর কারনাইকেল কলেজের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম.এ. সম্প্রদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১।।০ টাকা।

মহামোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনবাবু সারনাথের ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠি সাধন করিয়াছেন। সারনাথের বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হওয়া এই প্রথম। সারনাথ বারাণসীক নিকট অবস্থিত। ইহা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্যসহস্রাধিক বৎসরের মুষ্টিমান সাক্ষ্য। গৌতম বুদ্ধের লাভ করিয়া এই স্থানে সনৎপ্রথম ধর্মসমাজ গঠন করেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের চারি তীর্থের মধ্যে সারনাথ অন্যতম। পরবর্ত্তী কালে সম্প্রদায় গঠন, তান্ত্রিকতা ও দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি যে সমস্ত পরিবর্তন ও মতবাদ বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার সংবাদ সারনাথে আবিষ্কৃত লিপি ও মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতীয় শব্দ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও চৌদি রাজগণের আধিপত্যের প্রমাণও সারনাথে বিদ্যমান আছে। সারনাথে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী ও গুপ্ত লিপি এবং দেবনাগর ও বাঙ্গালা লিপিগুলি ভাষাতত্ত্ব আলোচনার অতি উৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পের অবস্থা এক্ষণে দর্শন করিতে হইলে এই সারনাথে আগমন করিতে হইবে। সমসাময়িক গ্রন্থ বাতীত বৈদেশিক ভ্রমণকারী কাহিয়ান (৪র্থ শতাব্দী), হিউয়েন সাঙ, ইচিঙ্গ (৭ম শতাব্দী ও তাইসং (৮ম শতাব্দী) এর লিখিত পুস্তকে সারনাথের প্রাচীন সমৃদ্ধির অবস্থা বিবৃত আছে। সারনাথ দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ অথবা মুসলমানগণের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পণ্ডিত দয়্যারাম সাহনী, ডাঃ ভিনিস, ডাঃ ভোগেল, মিঃ মার্সাল, মিঃ কিটো, জেনারেল কানিংহাম প্রমুখ ইয়োরোপীয় ও দেশীয় পাণ্ডিতগণ সারনাথের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাবু কেবল পুস্তক পড়িয়া ইতিহাস লেখেন নাই। তিনিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে সারনাথের ইতিবৃত্ত, সমৃদ্ধি ও আবিষ্কৃত বস্তুর পরিচয় গাঢ়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থে ৬ খানা মাজি দৃষ্টব্য চিত্র আছে। কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে বাঙ্গালী পাঠক ঘরে বসিয়া “ঘোলে ছুঁধের সাদ” নিটাইতে পারিতেন। এই গরের বাজারে এই শ্রেণীর পুস্তক বিক্রয় করিয়া গ্রন্থকার লাভবান হইবেন, আশা করি না। এই জন্য মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিলাম। গ্রন্থের ভাষা উত্তম। তথাপি ছুই এক স্থান অপভ্রংশের বলিমা মনে হইল। যথা—২য় পৃষ্ঠার (গহ্বাকারের নিবেদন) ৯ম ও ১৬শ পংক্তি, ২য় পৃষ্ঠার ২১শ পংক্তি, ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠার প্রাক্রমে ৩য় ও ১৪শ পংক্তি ইত্যাদি।

শ্রীকালিদাস রায়।

—\*—

## ভ্রম সংশোধন।

অনবধানতা বশতঃ গত প্রবেশ সাধ্য পরিচালিকায় ‘সাপ্তভাষা’ নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভুলগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, যথা—

৫৯৮ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তিতে ‘সংস্কৃতের শব্দের’ স্থলে ‘সংস্কৃতের শব্দের’, ৫৯৯ পৃঃ ১ম পংক্তিতে ‘বিশ্বাস’ স্থলে ‘বিশ্বাস’ উক্ত পৃঃ ৫ম পংক্তিতে ‘আজকালও’ স্থলে ‘থাকিলেও’, ৬০০ পৃঃ ৯ম পংক্তিতে ‘পূর্বপশ্চিম বঙ্গের’ স্থলে ‘পশ্চিম বঙ্গের’ এবং ৬০১ পৃঃ ২৩ পংক্তিতে ‘আবিরাধর্মে’র স্থলে ‘আবিরাবীর্ষ’ হইবে।

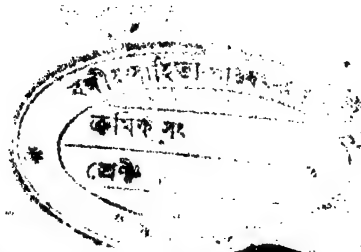
—\*—



মৃৎর আলোকে







# পরিচাৱিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“তে প্রাপ্তবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

আশ্বিন, ১৩২৬ সাল।

১১শ সংখ্যা।

জ্ঞান জননী।

—:—

মাগো তোমারি চরণ জ্যোতি শলাকায়  
ফুটাও তাদের আঁখি।  
যারা শুধু ভান করে চিনেনা তোমায়  
স্বার্থ আঁপারে থাকি।  
ভুমাৱে বাহাৱা চরণে ৱেলিয়া  
বিরাট মহান রুদ্রে ফেলিয়া  
তুচ্ছ ক্ষুদ্রে উচ্চ গণিছে  
নাচিছে মাথায় রাখি।  
পূৰ্ণেৱে যাৱা জানিতে চাহেনা  
খণ্ডেৱে ভাবে পূৰ্ণ  
আঁকড়ি ধরিতে না পাৱি সমূহে  
করিবাবে চায় চূৰ্ণ

শাশ্বত ধ্রুবে দূরে পুরিহরি  
 অনৃত অধ্রুবে রয়েছে তাঁকড়ি  
 তেয়গি সত্যে, ভূষণ করেছে  
 ভূয়ো তণ্ডামি ফাঁকি ॥  
 বিধাতার হতে পরম বিধাতা  
 ভাবে নিজেদের নিত্য,  
 ঋষি কবন্ধে চাগের তুণ্ডে  
 পূজে ইহাদের চিত্ত।  
 তুমি যে জননী নিখিল জননী  
 নহে নিজ দেশই অখিল অবনী  
 মহামানবের অরাতিগণের  
 একথা বল মা ডাকি ॥

শ্রীকালিদাস রায় ।

## সেবান্তত ।

—:—

এই যে ছোট একটি সেবানগুনী আজ আমার আদর করিয়া ভাকিয়া আনিয়া বলিবার অধিকার দিয়াছেন তাহার মাঝে এই কথাটিই আমার বিশেষ করিয়া আনন্দ দান করিতেছে যে তাঁহারা আমাকেও এই সেবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করেন নাই, সেবার সৌভাগ্য দান করিয়া আমাকেও গৌরবান্বিতা করিতেছেন। তাঁহারা আমায় কেবলমাত্র সামাজিক অথবা লৌকিক অন্তর্জনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই, তাঁহারা এই কস্ম-জগতের কস্মক্ষেত্রেও আমার সহজভাবে ডাক দিয়াছেন। এই বিশাল জগতের অনন্ত দুঃখ বেদনা আন্তর্জনে ইহারা ধেরূপ বিচলিত হইয়াছেন আমাকেও সেই ধ্বনি শুনাইয়া সেইরূপ করুণাধারায় আদ্র করিতে চাহিয়াছেন। ইহারা কেবলমাত্র আমার দৈহিক শক্তি চাহেন নাই, স্বেচ্ছায় সহায়ত্ব ও সমবেদনাপূর্ণ অঙ্গ চাহিয়াছেন, সেজন্য আমি সতাই আজ কৃতজ্ঞ হইতেছি, সুখী হইতেছি ও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি! এই বিস্তৃত কস্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন ফাঁকিই চলিবে না, কেবলমাত্র বাক্যের আভ্যন্তর নহে প্রতিজ্ঞার সাধকেও নিয়োজিত করিতে হইবে। আজ যদি কেহ বলেন আমরা নারী আমাদের সাধা কত কুদ্র এবং এই পৃথিবীর দুঃখ কত বৃহৎ, তবে আমরা বলিব সে কথা সত্য বটে তবে তোমরা কিসে হীন? তোমরা শক্তিরূপা জগন্মাতারই অংশ, তোমরা যে শক্তির আধার সে কথা কি আজ ভুলিয়া যাইবে? একবার ভাবিয়া দেখ,—কি শক্তি তোমাদের নাই, তোমরা জগৎকে পালন করিতেছ, রক্ষা করিতেছ, সর্বনাশ হইতে উদ্ধার করিতেছ। তোমরা পিতামাতার সেবা করিয়াছ,

ভ্রাতৃত্বকে ভাল বাসিয়াছে, শত্রুরালয়ের সকল আত্মীয়কে আপন করিয়াছে, পাড়া-প্রতিবেশীকে স্নেহ দিয়া মুগ্ধ করিয়াছে, বোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে তোমরা হীন কিসে? আজ কি তোমরা একথাও ভুলিতে বসিবে যে তোমরা জননী; তোমরা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতেছ, অঙ্গে লইয়া মানুষ করিতেছ, আপনার রক্তধারা দিয়া পে য়ন করিতেছ; এই যে মাতৃস্নেহের অসাম শক্তি ইহা হইতে আরো শক্তি কিছু কি জগতে আছে? এই সেবকমণ্ডলী যে আজ সোমাদের সেই শক্তিই ভিক্ষা চাহিতেছে, আজ তোমরা কণ্ঠিত হইও না, এটা বিশ্বের রোগী, রোগগ্রস্ত সন্তানদিগের জননীর স্থান অধিকার করিয়া একবার বসো! এখানে কেহ দীন নহে, হীন নহে, কেহ ধনী নহে, মানী নহে, সকলেই এক কার্গো ব্রতী; সকলেই সকলের সহকারিণী—সকলেই সেবিকা। এখানে সকলের কার্গোর মাঝে যেমন একটি ঐক্য পাকা; প্রয়োজন তেমন ছদ্ময়ের মাঝেও। তাই এটা আত্মানে আমার প্রাণের তাহে যে একটি ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমার বাহুল্য করিয়া তুলল, আমার আর আপনাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে দিল না, সকল অনৈক্যের বিরুদ্ধে করিয়া এই পৃথিবীর ধূলির উপরে দীন হইতে দীনের সহিত সমান আসনে দাঁড় করাইয়া দিল।

এই ঐক্যটি চি, আজ একবার ভাবিয়া দেখি। যেমন অন্যান্য ক্ষমতাবৃত্তি স্বয়ং উৎসারিত হইয়া আমাদের কক্ষ প্রবৃত্ত করে এই সেবাবৃত্তিও সেইরূপ। ইহাকে তর্ক অথবা ব্যক্তির দ্বারা প্রবৃত্ত করিতে হয় না, শাস্ত্রের শাসন দিয়া ইহাকে বুঝাইতে হয় না। এটা সেবা-বৃত্তি সকলের মধ্যেই অস্বাভাবিক পনিমানে নিহিত আছে নহিলে মাতৃস্নেহ আত্মীয়স্বজনদের জন্য স্বাভাবিকভাবে কাঁচা করে না। তবে যে-কেহ ইহাকে প্রাধান্য দেয়, যে-কেহ ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, যে-কেহ এটা সেবা-বৃত্তিকে আত্মীয়ের গভীর বাহিবে এই জগতের অনাচার ফেঁদে প্রসারিত করিতে পারে সেই দনা; যে না পারিল সে জীবনের প্রদান আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইল। এখন বিজ্ঞাসা হইতে পারে :—যে-কাণ্ডো মানুষের স্বার্থ নাই সে-কাঁচা মানুষ করে কেন? কি লোভে, কি আশায়? ইহার একমাত্র উত্তর আনন্দ! আনন্দেই ইহার উৎপত্তি আনন্দেই ইহার লিলা। আনন্দই ইহার একমাত্র কারণ এবং উদ্দেশ্য। যে আনন্দ হইতে এই জগৎ সৃষ্টিত হইয়াছে, যে আনন্দের কথা উল্লিখিত বর্ণিত হইল, 'আনন্দাশ্চৈব বলিমুনি ভূতানি জায়ন্তে'—আনন্দ হইতেই এটা ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যে আনন্দে জীবসকল জীবন ধারণ করিয়া আছে, সেই আনন্দ যদি কেহ উপলব্ধি করিতে চাহেন তবে সে বিশ্বের সেবায়।

রাজা রামমোহন রায় বলিয়া গিয়াছেন স্বার্থ এবং পরার্থ দুই-ই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই উভয়ের সামঞ্জস্যের উপর ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করে। জ্ঞানোন্মত্ত, কষ্টেন্দ্রিয় ও অশ্রুৎকরণকে একত্রে নিয়োগ করিবে যাহাতে আপনার বিয় ও পরের অনিষ্ট না হয়। স্বীয় ও পরের অশ্রুতি ভাঙে। এখানে তিনি স্বার্থ ভাগ করিয়া পরার্থ সাধন করিতেও বলিতেছেন না; শুধু এমন কাঁচা যন্ত্রাঙ্গ আপনার এবং সেই সঙ্গে অপরের মঙ্গল হয়, ইহাও সেবাধর্মের অঙ্গগত।

আমরা আজ এটা সেবার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার আলোচনা করিয়া দেখি কতরূপে এটা কার্গা সম্পাদন করা হইতে পারে। সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান—জ্ঞানদান, বিদ্যাদান। যে বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা সকল ভ্রাতৃদের সকল দারিদ্র্যের অবসান হয়, যে জ্ঞানোন্মত্ত দ্বারা মানবের এক চক্ষু নাচতার সন্নির্গত পলি স্থান তুচ্ছ করিয়া অনন্তের পথ দেখিতে পায় সেই জ্ঞানদানের তুলনা কোথায়? বলাই বাহুল্য তবে ইহা যে সকল স্থানে সম্ভব নয় সাধারণতঃ লম্ব অথবা প্রয়োজনও নাই। তাই সেবার বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে, অবস্থাবিশেষে তাহার কোনটিই হীন নহে;

মরণাপন্ন রোগীর সেবাশ্রদ্ধাও যেমন,—ভুক্তিপীড়িত ব্যক্তিদিকে অন্নদানও সেইরূপ, অসহায় বিধবার প্রতিপালনও সেইরূপ আবার পুত্রকনার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতাকে সাহায্যও সেইরূপ ! কোনটিকে উচ্ছেদ আবার কোনটিকে নিয়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারবে না। সেবামাত্রই পুণ্য, সেবামাত্রই অবশ্যকরণীয়। ভগবান এই যে একটি পবিত্র জন্মবৃত্তি দিয়া আমাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সকল পশু কীট পতঙ্গ হইতে উচ্ছেদ স্থান দিয়া আমাদের বুদ্ধিগতিকে আগ্রহ করিয়া এই পবিত্র জন্মবৃত্তিকে যদি আমরা অবহেলা করি সেও কি ভগবানের আদেশ অমান্য করা নহে? সেও কি অবস্থা সন্তানের কাণ্ড নহে?

যে রূপ সকল কার্যের সাধনা প্রয়োজন সেইরূপ এ কাণ্ডেরও সাধনা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে আমরা গর্হ করিয়া এ কথা বলিতে পারি—আমরা ভারতবর্ষের নারীস্বাধীনতা, আমাদের সেবামাত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে না, সে দীক্ষা জ্ঞান সঞ্চয়ের সহিতই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, বাল্যকালেই তার ‘হাতে থড়ি’ হইয়া গিয়াছে এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত সাধনার প্রয়োজন। যে বিদ্যা আমরা অধ্যয়ন করিতে চাই তাহা যে রূপ আমাদেরকে প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, কিছু দিনের অনভ্যাসে তাহা যে রূপ আমরা পূর্বের মত অবলোলাক্রমে সম্পন্ন করিতে পারি না, এই পরম্পরপরতাও অনেকটা সেইরূপ, ইহাকে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে অভ্যাস না করিলে কখন ইহা অন্যান্য বিদ্যার মত আমাদের জন্মগত হইবে না। যদি আমরা পরোপকারকে অভ্যাসগত করিতে না পারি তবে যে মুহূর্ত্তে আমরা দানভোগের উপকার করিব সেই মুহূর্ত্তেই সুনাম ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা হইবে, আমরা আপনাদের মনে দস্তে পরিপূর্ণ হইয়া উপকারের পাত্র ও পাত্রীকে দয়ার চক্ষে দেখিব, অর্গত এক কথায় আমরা করুণা করিয়া সুখপ্রার্থী হইব কিন্তু ইহা যদি একবার আমরা জন্মদায়ক করিতে পারি যে সেবামাত্র আমাদের ধর্ম্মেরই অন্তর্গত তাহা আমাদেরই জৈব-নির্দ্ধারিত কর্তব্য, তাহা হইলে আর সুনামের লালসা থাকিবে না, এবং বিশ্বপ্রেমের পরিবর্ত্তে করুণারও উদ্বেক হইবে না। ইহাও আমাদের দৈনন্দিন কন্ডেরই অন্তর্গত হইয়া পড়িবে, আমাদের স্বার্থ আমাদের জীবন, আমাদের একান্ত সচজ নিঃস্বাসপ্রশ্বাসের মত সেবাও আমাদের জীবনে সরল ও সহজ হইয়া আসিবে। এই যে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মের কথা বলিতেছি ইহাই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন—( ৪ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক )

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কাংখ্য কর্ম্ম করোতি যঃ।

স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিচাক্ষিঃ ॥

যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গৃহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, নিরগ্নি অথবা অক্রিয় এতদ্ব্যয়ের কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন। আবার আর এক স্থানে শ্রীভগবান বলিতেছেন—( দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক )

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং তাক্রুণ ধনঞ্জয়।

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সঙ্গোভূতা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥

“হে ধনঞ্জয় কর্তব্যভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতাধারণ ( চর্চাবিদ্যাদেশ ) হইয়া যোগস্থ ( জৈব পরায়ণ ) হইয়া কর্ম্ম কর, সনতই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।” গীতার কত স্থানে যে এই আকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

“কর্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা কলেষু কদাচন”

কর্ম মাত্রে তোমার অধিকার, কর্ম ফলে কদাচ অধিকার নাই। ইহা মুখে বলিতে ও কর্ণে শ্রবণ করিতে যত সহজ, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমরা বহু সময়ে মুখে বলি বটে যে আমি আকাঙ্ক্ষার বশে এ কার্য করিতেছি না কিন্তু সত্যি কি এ কথা ঠিক? ফলাকাঙ্ক্ষা বিবজ্জিত হইয়া যদি আমরা সত্যি সকল কার্য করিতাম তবে অপবাদে আমরা বেদনা অশ্রুতব করি কেন? তখন আমরা এ কথা বলিয়াও আপন হৃদয়কে প্রবোধ দিয়া থাকি যে আমি ত সুনামের আকাঙ্ক্ষা করি নাই, ইহারা যদি সুনামও না দিত তথাপি মতামত ব্যক্ত করিল কেন? ইহাপেক্ষা ক্ষীরবে থাকিলেও ভাল হইত। কিন্তু তখন আমরা এ কথা কেন বলিতে পারি না যে ফলাকাঙ্ক্ষা যদি করি নাই তবে মন্দ অপবাদে আমার দুঃখ কেন? আমার ত সুশ্রেণে আনন্দ অথবা অপবাদে দুঃখ হইবার কথা নহে, কারণ আমি যে ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবজ্জিত কর্মী! এইরূপ কর্ম যেদিন আমরা করিতে পারিব সেইদিনই প্রকৃত সেবার অধিকারী হইব। আমরা স্বার্থ-বিজ্ঞিত সংসারের জীব এরূপভাবে সঙ্গীর্ণতার আবরণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি যে স্বার্থশূন্য কর্মের ধারণাও আমাদের করনা বহির্ভূত! বর্তমান যুগে যদি কদাচ ছ'একটি এরূপ কর্মীর দেখা পাই তথাপি আমরা সহজে এ কথা বিশ্বাস করিতে রাজি নহি যে লোকটি প্রকৃতপক্ষেই নিঃস্বার্থপর, প্রকৃতপক্ষেই পরসেবাপ্রায়ণ অথবা আত্মত্যাগী! আমরা সে উচ্চমার্গে পৌঁছাইতে পারি নাই তাই নীচু হইতে শুধু উচ্চ ও মহৎ চরিত্রের ভ্রব অবশেষে নিযুক্ত হই, এবং শেষে যদি তাহাও না পাই তবে করনাগ্রহত অপবাদে শুভ চরিত্রের মনিনতা দান করিতে পশ্চাত্তপদ হই না! এইরূপে আমরা সেবাধর্মের পণকে আরও কণ্টক সমাকুল করিয়া তুলিতেছি, সহায়তা দূরে থাকুক, মহৎ চরিত্রে দোষারোপ করিয়া নিজেরা স্মৃণিত হইতেছি।

সে বাহা হউক একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের বর্তমান সামাজিক স্থান ও অধিকারের ভিতর দিয়া আমরা কতদূর এ-ব্রত পালনে সক্ষম। আমাদের চির অবরোধ প্রথা যে, এ-কার্যের অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ নাই তবে ইচ্ছা থাকিলে অবরোধপ্রথার ভিতর দিয়াও যে জগত-সেবা করা অসম্ভব নহে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বিদ্যমান। সেবা দুই প্রকার, এক স্বয়ং দেবার কার্যে নিয়োজিত হওয়া অন্যটি অপরকে দিয়া করান। পরোপকারিণী রমণীগণ ঐ শেষোক্ত প্রকারে সেবা করিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্রামের সময়ে আপন আপন সাধ্যানুরূপ শ্রমসাধ্য শিল্প কার্যাদি করিয়া লাভার্জিত অর্থ এই সকল সংকার্যে দান করিতে পারেন। ইহাতে এক পক্ষে যেমন উপকার অপর পক্ষে আবার তেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। তবে জীবনে একবার সেবাধর্ম গ্রহণ করিলে তখন আর কার্যের মাঝে গভী টানিয়া রাখিলে চলে না, অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরে সেবাপ্রার্থী ব্যক্তি আসিলে সেবা পাইবে কিন্তু গৃহের বাহিরে যদি সেবার অভাবে কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে তথাপি আমার সেবা পাইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে তবে এরূপস্থলে কি করা কর্তব্য? আমার মতে এইরূপ সেবার কার্যে যদি সামাজিক প্রথা কিছু ভাল হয় তাহাতে ক্ষতি নাই; বর্তমান কালের সহিত ত আমাদের জীবনকে মিলাইয়া চলিতে হইবে। পুরাতন প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবনের গতিকে পঙ্কু করিয়া রাখিলে ভ চলিবে না; নানাদিক দিয়া হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, সেবার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরের অভাব দুঃখবেদনাকে নিজের দুঃখ ভাবিয়া তাহা দূর করিবার জন্য সংসারপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমরা কি নিত্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি না—ইউরোপীয় মিশনারীগণ কত শত যোজন দূর হইতে আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া কি দারুণ দৈন্য স্বীকার করিয়া কি গভীর পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন, আত্মীয়বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আশ্রিত দৈন্যগীড়িত প্রদেশে তাঁহাদের সকল সাধ্য প্রয়োগ করিয়া শুধু পরোপকারের

মহান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন? আমরা আমাদের দেশের হুঃখ বুঝি না, আমরা ঐ সকল জাতিকে স্বগা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, সমাজের সহিত ইহাদের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি আর সেই হুঃখ গিয়া বাজিল কাহাদের বুকে? যাহারা আমাদের স্বধর্মী নহে, আমাদের জন্মভূমির সহিত সংযুক্ত নহে, যাহাদের আকারপ্রকার আচারব্যবহার নিয়মপ্রথা সকলই আমাদের হইতে বিপরীত তাহারা আসিল আমাদের পতিত জাতিকে উদ্ধার করিতে, বিদ্যাশিক্ষা দিতে, ধর্মের কথা শুনাইতে, তাহাদের সুখেহুঃখে সহানুভূতি জানাইতে, আপনাদের অঙ্গের গ্রাস তাহাদের মুখে তুলিয়া দিতে! সব দেখিব, সব বুঝিব তবু একবার লজ্জিত হইব না, তাহাদের মহৎ বলিয়া স্বীকারও করিব না আমাদের কি সত্যই এত অধঃপতন হইয়াছে? যদি আমরা সত্যই মিশনারীদিগকে ঘৃণা করিতাম, আমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতাম তবে বহুপূর্বে আমরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইতাম, আশ্রম সেবাস্থান দেখাইয়া তাহাদের লজ্জা দিয়া তাড়াইতাম কিন্তু তাহা নহে আমরা নিষ্ক্রিয়, আমরা স্বার্থ কেলিয়া পরের জন্য খাটিতে জনি না, কঁাদিতে জানি না, প্রাণ দিতে জানি না। তাই আজ অপর দেশের আদর্শ দেখিয়া শিথিতে হইবে,—হায় লজ্জা!

এ কথাও উঠিবার সম্ভাবনা যে সেবাস্থানমাত্রই ব্যয়সাপেক্ষ। যাহার অর্থবল নাই তাহার পক্ষে এ পথ একেবারেই বন্ধ! কিন্তু সকলেই জানেন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়ার ও সাগর ছিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে কেহ ক্ষণকালও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই, শোনা যায় একবার তিনি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর হইয়া খাইতে বসিবেন এমন সময়ে একজন অনাহারী ভিক্ষুক আসিল তখন তিনি তাহাকে আপনার 'বাড়া'ভাত' খাইতে দিলেন সেদিন আর তাঁহার নিজের আহার হইল না; থই ও জল খাইয়া উদর পূরণ করিলেন। একরূপ দৃষ্টান্ত একবার নহে ইহা তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটয়াছে, শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তিনি পরসেবার দান করিয়াছেন। শুধু অর্থ দিয়াই বা বলি কেন একবার তিনি পথিমধ্যে এক সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে চলচ্ছক্তি রহিত দেখিয়া আপনার গৃহে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন! আপনারা বহু মহৎব্যক্তির জীবনের আলোচনা করিয়াছেন, তবু আজ একটি জীবনের কথা বলি। ইহার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিতে পারেন কিহা নাও শুনিয়া থাকিতে পারেন। ফাদার ড্যামিয়ান, ফিলিপ্‌স দ্বীপপুঞ্জে একটি কুষ্ঠাশ্রমে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, একদিন দুইদিন নহে চিরকাল শুধু কুষ্ঠরোগীর গলিত দেহ নিজ হাতে ধোত করিয়া ঔষধ প্রলেপ দিয়া সেই সকল হতভাগ্যদিগের মাঝে তিনি জীবন কাটাইয়া ছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে তিনি স্বয়ং ঐ ভয়াবহ ছরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কর্মক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা ভিন্নও সিটোর ডোরা, মহারানী স্বর্ণমন্ত্রী, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ইহাদের নাম সেবা ও দানের ইতিহাসে চির অমর হইয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে আর্থিক বলে বলীয়ান ছিলেন তাহা নহে, দৈহিক শক্তিতে ও মনের জোরেই তাঁহারা অগতের পরিচর্যা করিয়া গিয়াছেন। একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে সেবার ইচ্ছা ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই এই সেবাস্থানের প্রাণ! ঐ ইচ্ছা যাহাতে আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হয় তাহার জন্যই এত সাধনা! বাল্যকালে মার কাছে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা বলিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেছি না। "এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে জীবনে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই—এজন্য তাহার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর পর তাহাকে মৃত্যুদূত আসিয়া যখন স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেল, সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এক মহাশয় এখানে ত আমার কোন অধিকার নাই" তখন দূত শুধু জানাইল এখানে আনবার জন্য সে আদেশ পাইয়াছে। তারপর ভগবানের নিকটও সে যখন ঐ কথা

জিজ্ঞাসা করিল, ভগবান বলিলেন “তুমি কি ভুলিয়া যাইতেছ যখন তোমার অমুক ধনী-প্রতিবেশী পাঁচ শত দরিদ্রকে কাঙাল ভোজন করাইয়াছিল তখন তুমি মনে মনে হুঃখ করিয়া ভাবিয়াছিলে হা কপাল আমার যদি অর্থ থাকিত আমিও ঐরূপ কাঙাল ভোজন করাইতাম, তাই ঐ পাঁচ শত কাঙাল ভোজনের পুণ্য তোমার এই স্বর্ণলাভ !” এই গল্পটি হইতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় ইচ্ছাটুকুই সকল দানের সার, এবং অন্তর্যামী ভগবান শুধু সেই ইচ্ছাটুকুই দেখিতেছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ সভাসমিতির দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। এক অপরের মঙ্গল এবং অন্যটি নিজের কল্যাণ! সেবা জিনিষটিরও সেইরূপ দুইটি দিক আছে। দান করা বা সেবা করা তাহাদের অপেক্ষা এক পক্ষে আমার নিজের জন্যই অধিক প্রয়োজন! তাহাদের বাঁচাইব কি আমি যে নিজেই উহাতে বাঁচিয়া যাইব—বর্ত্তিয়া যাইব !

সেবাব্রত যে সর্ববাদীসম্মত ও সর্বধর্ম ও সর্বশাস্ত্রানুমোদিত এখন একবার তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। বাইবেলে একস্থানে লিখিত আছে,—

Thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as Thou hast given him.

যে কেহ আমাদের মধ্যে উচ্চ হইতে চায় তাহাকেও যে সকলের সেবক হইতে হইবে একথাও বাইবেলে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

Whosoever will be chief among you, let him be your servant ;

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরাণসরিতে একস্থানে লিখিত আছে যাহারা আপন সম্পত্তি ঈশ্বরের কার্যে ব্যয় করে, এবং যাহারা সে কার্যের উল্লেখ করিয়া গ্রহীতার মনে আঘাত দান না করে তাহারা প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে, এবং তাহারা কখনও হুঃখ পাইবে না। ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে দান লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে করা হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ। আবার এই দান করিবার সময়ে হৃদয়ে ভাব কিরূপ হওয়া উচিত? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্মযোগ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন দান করিবার সময়ে সাধারণতঃ হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। কেহ কেহ ভাবেন পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে, দানের পুণ্য অনন্ত স্বর্ণলাভ কিন্তু এই ক্ষুদ্রভাব স্বার্থ-প্রণোদিত। আর একরূপ ভাব আছে তাঁহারা বলেন পাপপুণ্যের গূঢ় তত্ত্ব বুঝি না, তবে সকল ধর্মে যখন দান ও পরোপকারের গুণ কীর্তন করা হইয়াছে তখন তাহা পালন করাই কর্তব্য কিন্তু ইহাও একরূপ অন্ধবিবাস। কেহ কেহ আবার হুঃখীর হুঃখে করুণার্জ হইয়া দান করেন ইহাও আদর্শ দান নহে। তবে আদর্শ দান কি? তিনি বলিতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাহাই যে দানের একমাত্র উদ্দেশ্য অহেতুকী আনন্দও শুধু কেবল তাহাই নহে ইহার সহিত মনে মনে একটি কৃতজ্ঞতার সঞ্চারও হওয়া উচিত। যে সকল দানের পাত্র বা পাত্রী এই দানের সুযোগ দান করিয়াছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য; তাঁহারা যদি উপস্থিত না হইতেন তবে ত আমি দান করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতাম না এইরূপ ভাব! কি উচ্চ আদর্শ!

এখন দেখিতে হইবে এই দানের ও সেবার পাত্র বা পাত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি? ইসলাম ধর্মগ্রন্থে আছে সর্বপ্রথম নিকট, তারপর দূরাত্মীয়, তারপর পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও তারপর অনাত্মীয় গ্রামবাসী ও তৎপরে অন্তান্ত দেশবাসী ও তৎপরে বিদেশীয়। এই আদর্শ যে কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে তাহা একবার খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে দেখিতে হইবে। খৃষ্ট বলিয়াছেন এই যে প্রেমের অন্ত সেবাব্রত ইহার বিচার নাই, যে আমার বন্ধু তাহাকে দিব,



যে আমার অনাত্মীয়, অপরিচিত তাহাকে দিব আবার যে আমার শত্রু তাহাকেও বঞ্চিত করিব না। কি সুন্দর কি প্রাণস্পর্শী কথা,—

Love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again,  
—Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another,—

তোমার শত্রুকে ভালবাস, উপকার কর, ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া দান কর।

পরস্পরকে স্নেহান্তঃকরণে দয়া ও ক্ষমা দাও।

Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

ঈশ্বর যদি আমাদের এত ভালবাসিয়াছেন, আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

আমাদের আর কি করা কর্তব্য? খৃষ্ট বলিতেছেন,—

We ought to lay down our lives for the brethren.

আমাদের ভ্রাতাভগ্নীর জন্ত আমাদের জীবন দান করা উচিত।

বুদ্ধদেবও ঐ সর্বজীবে দয়ার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আমাদের হিন্দু পৌরাণিক গল্পে ত দান ও সেবার দৃষ্টান্তের সন্ধান নাই। সে সকল গল্প ত আপনারা জানেন তাই আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সেবাব্রতে দীক্ষা লইবার সময়ে আমাদের আজ অন্তর দিয়া এই কথা স্বীকার করিতে হইবে—

“আমরা তাহারি সব নরনারী  
কেহ নহে কারো পর;  
এক ব্রহ্মরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে  
অলিছে নিরন্তর!  
তবে আর কেন ভাই  
ভাই ভাই ঠাই ঠাই  
এস প্রেমে গলে এক হয়ে যাই!”

কত কাজ যে বাকী রহিয়াছে, জগতের এই কর্মক্ষেত্রে সকলেই এক একটা ব্রত লইয়া আসিয়াছি সে কথা ভুলিয়া আছি তাই বড় হুঃখ হয়, জগতের হুঃখদারিদ্র্যের ক্রন্দন শুনিয়াও পাষাণের মত অটল রহিয়াছি, ভোগলুপ্তে মত্ত রহিয়াছি তাই মহাত্মা কেশবচন্দ্রের একটি প্রার্থনা মনে পড়িতেছে :—

“পিতা প্রেমময়, তোমাকে ভিজ্ঞাসা করি—কি করিব? তুমি বল, বলিলে তুই যে করিসনে। পিতা চের কাজ বাকী রহিল, লোকের মঙ্গলের জন্য যত ভাবা উচিত ছিল, লোকের যত ভাল করা উচিত ছিল তাহা করি নাই। তুমি যাচা করিতে বলিয়াছ তাহা করি নাই। তোমার আদেশ শুনি নাই। পিতা, কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে প্রভুভক্তি দাও, আনুগত্য দাও।” \*

## রূপের পরশ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন ।

রূপের পরশ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন,  
সাজায়ে বরণ-ডালা করেছ বরণ !  
অশোক-কিংশুক-রাগে, চম্পক-কনকে,  
অপরাজিতার নীলে, জবা-অলন্তকে,  
চূতমুকুলের পীতে, পল্লব প্রবালে,  
কাঞ্চনের আকিঞ্চনে, শিমুলের লালে,  
নবাকুর স্নিগ্ধ-শ্যামে, দাড়িম্ব হিঙ্গুলে,  
বরণের ভঙ্গীমায়, অরুণ অঙ্গুলে  
কেড়ে নিয়ে গেলে মন, হ'ল পরিচয়,  
প্রণয়ে জাগিল প্রাণ তোমাতে তনয় !

তুমি জ্বালাইলে দীপ তারায় তারায়,  
ঢালিলে সুরভি বারি বাদল-ধারায়,  
সূক্ষ্ম উর্গাতস্তমস কুহেলিকা জালে,  
টেনে দিলে লাজ-বাস শুভ-দৃষ্টি-কালে,  
হেমস্তের দীর্ঘ রাতে নিস্পন্দ তিমির  
আনিল নিকট করি সুদূর বাহির ;  
স্থির হ'ল আঁখি শুধু তোমারি নয়ানে  
পুলকিত কিশলয়ে, বসন্তের গানে  
অকস্মাৎ মুখরিয়া ফুলের বাসর  
আপন করিলে, সরমের অবসর  
দিলে না আমারে তুমি এতটুকু আর,  
সেই হ'তে এ মিলন তোমার আমার ।

শ্রীপ্রিয়স্বদা দেবী ।

## মতিয়া ।

—:~:—

শ্রীকৃষ্ণপুরের বৈকুণ্ঠ শিরোমণি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণের অচার নিয়ম, তিনি শাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া কত রকম নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন । অবস্থা স্বচ্ছন্দ সচ্ছল । পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি যাচা আছে তাহাতে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সমেত একটা সংসার চাচিবার পক্ষে অপূর্ণ্যাপ্ত । গ্রামে সুবৃহৎ বসতবাড়ী, বাড়ীর সংলগ্ন দেবালয়, পুষ্করিণী বাগান ও বাহিরে গোমস্তার কাছারীঘর পরিপূর্ণ । শিরোমণি কলিকাতার গৌসাইদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । স্বগ্রামে ভাল স্কুল না থাকতে একমাত্র পুত্রকে কলিকাতায় তাহার মামার নিকট রাখিয়া ছিলেন । কিন্তু অকৃতজ্ঞ পুত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি পাইয়া পিতার একান্ত অনভিমতে বিলাতে গণ্যমান করিলে পর, শিরোমণি মহাপুত্র পুত্রকে তাজাপুত্র করিতে মনস্থ করিলেন । কিন্তু কমলার কৃপাক্ষেত্রে মা যষ্টির কৃপা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে, এস্থলেও বংশের ভিতর শিরোমণি মহাশয়ের একটা ভাই বা ভ্রাতৃপুত্র এমন কি একটা ভাগিনেরও কেহ ছিল না,—যাহাকে পুত্রস্থানীয় করিতে পারেন । একটা নয় বৎসরের ভ্রাতৃক বালিকা কন্যা মাত্র ছিল । গৃহিণী চিরকথা হওয়াতে এমনি পশ্চিম দেশীয়া স্ত্রীলোক তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল, সেই নাম রাখিয়াছিল মতিয়া । পুত্রের উপর প্রবল বিরাগ বশতঃ শিরোমণি অবশেষে স্থির করিলেন যেমন করিয়াই হউক মতিয়ার বিবাহ দিয়া তাহাকেই নিজের উত্তরাধিকারিনী করিয়া যাইবেন । প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার আবারো স্বচ্ছন্দ মৃত্যুঞ্জয় রায় আনিয়া নানা বিষয় আলাপের পর সাংসারিক কথাবার্তাও অবতারণা করিলেন । একদিন অসিয়া স্থিতমুখে কহিলেন “ওহে আমার চাকর আজ পাশের খবর এসেচো।” অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া শিরোমণি নিজের মনোগত সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন । মৃত্যুঞ্জয় অনেক বুঝাইলেন । অনেক ইতস্ততঃ করিলেন কিন্তু নিজ সঙ্কল্পে চিরদিনকার অটল শিরোমণি, স্থিরভাবে শাস্তবশে কহিলেন “এতে তোমার ইতস্ততঃ কোরবার কিছুই নেই, কারণ তুমি ত চাকর আবার বিয়ে দেবেই, তবে মতিয়ার একটা সত্তার রেখে বাতাই হউক আমার অভিপ্রায় । সে ছেলেটা তার নিজের ইচ্ছামত স্বেচ্ছাই হোক, আর যাই কেন হোক না, তার যে কোন একটা উপায় সে করে নিতে পারবে নিশ্চয় । কিন্তু মেয়েটার ওপর যে বিধাতার বিড়ম্বনা, ওকে কিছু না দিলে কে গ'ছবে বল দেখি ? এব চাকরকেই যে দিয়ে যাচ্ছি সেও আমার একটা ভূঁপু, কি বল ?” চাকর বারাকপুর স্কুল হইতে এণ্ট্রাস পাশ করিয়াছে । চৌদ্দ বৎসর মাত্র বয়স । তখনও বোলস আইন উঠে নাই । এই সময়ে একদিন গোবিন্দপুর সন্ধ্যায় যথেষ্ট সাংগোহ করিয়া মতিয়ার সহিত চাকর বিবাহ হইয়া গেল । মৃত্যুঞ্জয় রাগের ইচ্ছা ছিল না যে এতটা বৃদ্ধমান হয়, কিন্তু শিরোমণি পুত্রের উপর প্রচুর অভিমানের নিগূঢ় বেদনার ঝোঁকে সাতগ্রামের লোক এভাবে করিয়া কলিকাতা হইতে বা না জানাইয়া ভ্রাতৃক কন্যার বিবাহ দিলেন । কন্যার মাতার অভিমত যে এই উপলক্ষ যথেষ্ট কোলাহলে উৎসাহ না করিলে জীবনের এই মহা অন্তঃসান্নিধ্য মতিয়া অনুভব করিতে পারিবে না । কিন্তু এই বিবাহের পর চাকর আর কখনো এই স্ত্রী বা স্বস্তরের সংবাদ কটবার সুযোগ পায় নাই । কলিকাতা হইতে এল-এ, পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজ প্রবেশ করিবার পর তাহারই গ্রামেই সে আর আসে নাই । ইতি মধ্যে শিরোমণি কর্তৃক হরণ করিলে তাঁহার পরিতাজ্য পুত্র দেবেন্দ্র কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিয়া মাতা ও ভ্রাতার উদ্ধাবধান করিতেন । গৃহিণী ও পুত্রের সাহায্যে বিষয়কর্মও একরূপ চলিয়া যাইতছিল ।

( ২ )

রায়েদের কৃতীপুত্র চাক, ডাক্তারি পাশ করিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই ডিস্পেন্সারী খুলিয়া বসিয়াছিল। চাকর জী ইন্দুও এই সময়ে ঘর করিতে আসিল। চাক নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামেই চিকিৎসা করিতে যাইত। দেশের ধারে গ্রাম। যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে গ্রামবাসী ভ্রমকালো। শ্রাবণের কজ্জল ঘন মেঘে দিম্বেশল আচ্ছাদিত। স্নিগ্ধগভীর মৃৎ মেঘনির্বোধে বাষ্পসিক্ত বায়ুস্তরকে স্পন্দিত করিতেছিল। এলায়িত নিবিড় কেশরাশির মত অচ্ছিন্ন জনদলকে চিরিয়া-চিরিয়া স্থতীর বিচ্যুতবেধা দিগন্ত বলসিয়া অগ্নিয়া উঠিতেছিল। ঘরের ভিতর সমুপের নুতন জানালার বাতির পানে চাহিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল। জল খাবারের রেকাবী নিঃশেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে চাক উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল “আঃ এ বৃষ্টি যে ছাড়বেই না দেখ্‌তি।” ইন্দু মেঘান্তরিত স্নান অকাশের অজস্র ধারাপাতের পাংশু উচ্ছে যেখানকার নিম্নগামী জল ধারাকে আর জল বলিয়া দেখা যায় না সেইখানে চাহিয়া ছিল। মুখ ফিরাইয়া কহিল “আমার হুকুম না পেলে কেমন কে রে ছাড়বে বল।” চাক সবিনয়ে কহিল “ওঃ তবে অনুগ্রহ কোরে হুকুমটা হ'য়ে যাক্‌না” ইন্দু কৌতুকমিত্ত মুখে কহিল “ওমা তাকি হ'তে পারে গো, আমার গাল দেবে যে” “আমি তো জোড়া পাঁটা দেব খেও এখন, শীগ্গির হুকুম কর, দেখি ক্ষমতার দৌড়।” ইন্দু মুখ টিপিয়া চক্ষু হঠাৎ বিফারিত করিয়া কহিল “আমি বুঝি রক্ষেকালাী?” চাক নিতান্ত বেচারা বলিয়া গিয়া কহিল “আমি কখন তা বল্‌লাম?” “বল নি? এই মাত্র জোড়া পাঁটা দেবে বল নি তুমি।” “ওঃ এই জনো,—তা জোড়া পাঁটা তোমায় দেব তো বলি নি তবে তুমি যদি ঘাড়পেতে নাও কথাটা, তা আমি কি কোর বা বল?” ইন্দু রাগ করিয়া কহিল “ঘরে মন টেক্‌চে না বেড়াতে যেতে পারাচন্‌ না তাই শেষটা আমার সঙ্গে কৌদল আরম্ভ কর্‌চন্‌—আচ্ছা বেরোও না কেন?” তোমার অবার ঝড় বাদল কি?” চাক হাসিমুখে ইন্দু কথ্য মানিয়া লটল, কহিল “তা সত্যিই ত! ডাক্তার মাঝ্‌ষর আবার ঝড়বাদল কি? জুতার ভিতর পা গলাইয়া দিয়া নিষ্কামনের জন্য পা বাড়াইতেই ইন্দু বাগ্র হইয়া কহিল “হ্যাঁগা সত্যি সত্যি তুমি এই এই চর্য্যাগে বেরাচ্‌চা?” জুতার ফিতাতে ফাঁস দিতে দিতে চাক কহিল “কি রকম মনে হয়?” ইন্দু প্রবল অভিমানে মুখ ফিরাইল। অগত্যা চাক ফিরিয়া জীকে একটু আদর করিয়া ভূলাইয়া বাতির হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ তাহার একটা অপরিচাধ্যা নেশার মত ছিল। গথে শিরোমণিবাড়ীর ভূতা পাঁচু তাহাকে ধরিত। “হ্যাঁ ডাক্তারবাবু একবারটা চলুন; নলিন ডাক্তারবাবুকে তো আজ পেলামই না শুদিকে মা ঠাকুরান বড় নেতিয়ে পড়েছেন।” চাক বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সে পাঁচুকে চিনিত না, পাঁচুও যে তাহাকে খুব চিনিত তাহা নয়, তবে চাক যে ত্রীকৃষ্ণপুরের ডাক্তার তাহা সে জানিত। কিন্তু ত্রীকৃষ্ণপুরে ভাল পাশ করা ডাক্তার আবিভাব সহজেও যে শিরোমণি গুচিগীর চিকিৎসা পীথবাসীর নলিন ডাক্তারের দ্বারা হইত সেটা পাঁচুর মতে ত্রীকৃষ্ণপুরের চাক ডাক্তার নিতান্ত ছোকায়া বসিয়া। আপাততঃ নলিন ডাক্তারের অর হওয়াতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে ফিরিতে সে বুদ্ধি খাটিইয়া সমুখে যে ডাক্তার পাইল তাহাকেই গ্রেপ্তার করিল। চাক বিরক্ত হইয়া কহিল “দেখ্‌চা যে রক্তম দিন, আজ আমি অন্য কোথাও যেতে-টেতে পারবো না বাপু” পাঁচু হাত জোড় করিয়া বলিল “যদি মায়াই যান্‌ তিনি, বাড়ীতে আর একটা মনিষা নেই, বাবু আসবেন্‌ তা সেই রাত্তির দুপুরের টেরেণে, এই তো গাঁ ছাড়িছে বেরিয়েছেন বাবু, আর একটু চলুন।” চাক নতুন ডাক্তার, কিছু কৌতুহলও হইল সে পাঁচুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বর্ষাবিকশিত নীপকুঞ্জের মৃদু মধুর গন্ধান্বিত ঘন কোণের ভিতর একটা ঢালীর

বাল্লার বারান্দার আসিয়া চাক্র জলসিক্ত ছাতিটা মুড়িয়া ফেলিল। নীমাহারা ঘেষের নীচে নীচে তখন দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। চাক্র বারান্দার উঠিবামাত্র একজন দামী মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার বাবু বলিয়া ডাকিয়া চাক্র মুখপানে চাহিয়া থমকিয়া গেল। বেহস্তিত বৃষ্টিবিন্দুগুলি ক্রমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে চাক্র পাঁচুর সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিল। তিনটা চারটা ঘরের পরে যে আলোকিত কক্ষে তাঁহারা থামিল সেখানে চাক্র সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়িল,—সামনের কুলুঙ্গির উপর রক্তিমকান্তি সিক্তিদাতা গণেশের মুখের মূর্তির উপর। তারপর বড় একখানা পালঙ্কের উপর শায়িতা, ক্রম্বার পার্শ্বে উপবিষ্টা তরুণীর উপর। যেন ছাঁচে ঢালা একখানি নিটোল মোমের পুতুল। নিজের আশেপাশের লুটায়িত কেশের গুচ্ছ হাতে করিয়া নাড়িতেছিল। জুতার শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবনীত-কোরল জ্বল জ্যোৎস্নার মত দেহলতাটির পশ্চাত্তাগে রাশি রাশি রেশমের মত তরঙ্গিত চুলে জাহ্নু পর্য্যন্ত ঘিরিয়া আছে। ক্রম্বা চক্ষু মেলিয়া কহিলেন “কে?” পাঁচু কহিল “হামাঠান্ নলিন্ ডাক্তারকে পেলাম না তাই এই ‘ছিরকেটোপুরের ডাক্তার বাবুকেই নিয়ে এসেছি’ ক্রম্বা বাস্তবসম্মত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিলে “কে চাক্র?” চাক্র কেমন বিমূঢ়ভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁচু একখানি চেয়ার দিয়া কহিল “বহ্নন বাবু।” তারপর কিছুমাত্র ডাক্তারি না করিয়াই রীতিমত আহারের পর শিরোমণিদের গাড়ী করিয়া চাক্র বাড়ী কিরিয়া গেল। চাক্র চলিয়া গেলে পর মতিয়া মাতার বুকের উপর পড়িয়া শ্রম্ন করিল “মা, ও কে মা?” মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্নান মুখে কহিলেন “কেন, ওই পাঁচু তো বলে।” মতিয়া সন্দিগ্ধ মনে কহিল “পাঁচু তো বলে ঐকেটোপুরেরই ডাক্তার, তা আমাদের কে হয়, তুমি যে খুব কোরে খাইয়ে দিলে!” মাতা কহিলেন “ওমা, রাত্তা থেকে আমার জন্যে পাঁচু ধরে আনলে বাছাকে, আর এই ভযোগো। শুধু মুখে শুধু পায়ে কি করে পাঠাই?” বাড়ী কিরিয়া চাক্র নিজের প্রতি কি একটা অকারণ বিতৃষ্ণায় কাহাকেও কোন কথা না বলিয়াই শুইয়া পড়িল। দিন চারেক পর তেমনি ভরা বর্ষার শ্রাবণের জলধারা বর্ষণরত আসন্ন সন্ধ্যায় শিরোমণিদের ঘোড়ার গাড়ী আসিল ডাক্তার লইবার জন্য—সঙ্গে সেই পাঁচু। চাক্র প্রথমটা যাইতে স্বীকার করে নাই, তারপর হির করিল যে এক্ষেত্রে আমি ডাক্তার, রোগী দেখিব, ঔষধ দিব, এজন্য আমার আবার ইতস্ততঃ কেন? ভাবিয়াচিন্তিয়া চাক্র গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতেই মনস্থ করিল। ঠেথেসকোপ, থার্মোমিটার, ঘড়ি সমস্ত শুছাইয়া লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। এ গাড়ী গ্রামের আবালবৃদ্ধের সুপরিচিত। কারণ পল্লীগ্রামে অবস্থা সচ্ছল হইলেও গাড়ী ঘোড়া কেহ রাখেনা, কিন্তু দেবেস্ত্র শিরোমণির যখন-তখন ম’ ও ভগ্নির তবাবধানের জন্য আসা যাওয়া করিতে হয়, কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতে হয় ষ্টেশনের দূরত্বও নিতান্ত অল্প নয়। এ জন্য তিনি গ্রামেই গাড়ী করিয়াছিলেন। বিশেষ মতিয়ার বিষয়ের আয়ের তুলনায় ব্যয় খুবই সামান্য। দেবেস্ত্র স্বয়ং যথেষ্ট উপার্জনক্ষম, এবং কোন্ এক লক্ষপতির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র বিদূষী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি ভাগ্যবান। সুতরাং মতিয়ার ধনসম্পত্তি হইতে ব্যয় কুঠার কোনও কারণই ছিল না।

( ৩ )

চাক্র গাড়ী হইতে নামিতেই দেবেস্ত্র সহাস্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। ঘরে ঢুকিবামাত্র হিল্লোলিত লতাটির মত মতিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেবেস্ত্রের হাত জড়াইয়া ধরিল। গম্ভীর প্রকৃতি পিতার পরই এই সন্ধানন্দ মেহশীল দাদাটিকে সে অন্ত্যস্ত ভালবাসিত। বয়সেও উভয়ের অনেক পার্থক্য ছিল। দৈবকূর্ত শিরোমণির প্রথম সন্তান দেবেস্ত্রের জন্মের বহু পরে বৃদ্ধ বয়সে এই অধর্মের ভোগটুকু জন্মিয়াছিল। একটা

চেয়ারের উপর বসিয়া দেবেন্দ্র কহিলেন “মায়ের কাছে শুনলাম পাঁচু নাকি একদিন তোমায় ধরে এনেছিল, যদিও তোমায় বিরক্ত ক’রতে ইচ্ছে কোনও দিনই করি নি, তবু এত নিকটে থেকে এমন স্নেহের জ্বিন্বে একটু টান দেবার লেভ কিছুতেই চাড়তে পারলাম না ভাই।” চারু নত মুখে প্রশ্ন করিল “মা কেমন আছেন? দেবেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিলেন “ভালই।” মতিয়া নিঃশব্দে প্রশ্নোত্তরগুলি শুনিতেছিল মাত্র। আগন্তুক যে তাহারই স্বামী, সে ইহার বিন্দুমাত্রও জানিত না। বোধ করি ভাঙ্গিয়াচুরিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে ঠিক বুঝিতে পারিত না। তাহার বিবাহরাত্রির ব্যাপার তাহার অতি অস্পষ্ট মনে ছিল এবং তা ছাড়া পৃথিবীর সারধন দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিতার নিকট স্বামী পদার্থ সম্বন্ধে, যাহাকে বলে দেখিয়া শুনিয়া লাভ, এরূপ স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং আনুসঙ্গিক লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই থাকবার সম্ভাবনা ছিল না। চারু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল “মা ভাল আছেন, তবে অসুখ কার?” দেবেন্দ্র হাসিলেন “অসুখ বার্তারেকে তোমাদের আগমন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নাকি?” চারু অপ্রতিভ হইয়া কহিল “না, না, তা কেন, তবে আমায় অসুখের কথাই বলা হয়েছিল কিনা? অতএব, একজনের অসুখ হওয়া চাইই, আচ্ছা, হাঁবে মতি তোর কোনও অসুখ-টসুখ কছে না তো রে?” চারুর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মতিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রসন্ন হাস্যরঞ্জিত মুখে কহিল “যাঃ আমার কেন অসুখ হ’তে যাবে, না ডাক্তার বাবু আমার কিছুই হয় নি।” চারু মুখ তুলিয়া তাহার মুখ পানে চাহিল। মতিয়ার কণ্ঠস্বর সে প্রথম শুনিল। দেবেন্দ্র চারুর মুখ পানে চাহিয়া মতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন “আমি ত সব সময়ে আসতে পারি নে, তাই এই ডাক্তার বাবুকে এবার ভার দিয়ে যাচ্ছি, ইনি সদা সর্দাদা এসে তোদের দেখে শুনে যাবেন, কেমন চারু তুমি পারবে তো?” চারু বিব্রত কুণ্ঠিতভাবে মৃদু আপত্তি করিল। দেবেন্দ্রের ভাস্কোজ্বল মুখের শিথুদীপ্তি অকস্মাৎ নিভিয়া গেল। “পারবে না? কেন চারু, যার কিছু নেই তার নিকটের লোক চলেও কি তাকে দূরে সরে যেতেই হয়? বাবা যখন এই সমস্ত ভার তোমাকেই দিয়েছিলেন, তখন আমি খুদীই হয়েছিলেম, ভেবেছিলেম তুমি তোমার কণ্ঠবা গ্রহণ করবে।” তখন আমার মনে হয়েছিল যে ভগবান আমার দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে আমায় হালকা করে দিলেন। আর কিছু আমরা চাইনে, কিন্তু একগ্রামে থেকে দূর আত্মীয়ের মত এইটুকু উপকারও কি তুমি ক’রবে না? ভেবে দেখ, সবই ত তোমারি।” স্নগ্ধীর ভয়প্রীতিতে দেবেন্দ্রের কণ্ঠ কম্পোচ্ছ্বাসে ধারণা আসিল। এ স্নেহের সীমা ছিল না। মতিয়া বিবহের কোন কথাই জানিত না বুঝিতও না সহজ সরলভাবে কহিল “কেন দাদা শুকে তুমি বিব্রত ক’র’চো, তুমি যেমন দেখ’চো শুন’চো এই ত বেশ হচ্ছে” দেবেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কহিলেন “না রে আমি বিব্রত, বিরক্ত ক’র’চিনে, শুধু ঠার কাজের ভার “শুকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছি তবে উনি যদি দয়া করেন।” মতিয়া হাসিল। আরক্ত ওষ্ঠে প্রভাতের অগোকে মত শিথোজ্বল মণির হাসি মুখে কহিল “শুঁর বুঝি দয়াই নেই?” কথাটা চারুর অঙ্করে স্তম্ভীকৃত খোঁচা দিল। সত্যই ত কিসের জন্য সে এখানে এমন অপরাধ-শঙ্কিত হইয়া থাকে। তাহার কণ্ঠাই বা কাহার জন্য? কেন সে দেবেন্দ্রের মতই আপন হইয়া এই করুণার পাত্রে মেঘটী সহায় হইতে পারিবে না? স্থির করিল স্নেহীল বন্ধুর মত, ভ্রাতার মত অকুণ্ঠিত চিত্তে সে এই কণ্ঠব্যভার গ্রহণ করিবে।

( ৪ )

একত্রে দুই ভাই বসিয়া আহার করিতেছিল। বড় ভাই বিরজানাথ পূর্বেই আহার করিয়া গিয়াছেন। নিকটে চারুর মাতা বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে ছেলেদের খাওয়াইতেছিলেন। দালানের অপর এক পাশে

একটু অন্তরালে হিন্দু পান সাক্ষিতেছিল। চাক্র কহিল “জান মা আমি কোথায় গিয়েছিলেম।” মাতা উৎসুকভাবে কহিলেন “কোথায়?” “আমার স্বগুরবাড়ী” বলিয়াই চাক্র একটু ম্লান হাসিল। হিন্দু উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল বৃষ্টি তাহারই পিতৃালয় সম্বন্ধে? চাক্র কনিষ্ঠ সুবোধ কহিল “কিরকম?” “কিরকম আবার! আমার তো বাপমায়ের রূপায় স্বগুরবাড়ীর অভাব নেই, যেখানে আছি সেখানেই স্বগুরবাড়ী।” মাতা হাসিলেন “কি যে বলিস্ বাপু।” চাক্র মুখখানাকে আরক্ত করিয়া কহিল “কি আবার বলি, বাপ তো স্বগুরবাড়ী গিয়েছিলেম কেন দেখ নি নাকি? আর এ গাঁয়ে গাড়ী ঘোড়া কার আছে?” বলিতে বলিতে নিজের ভালরূপ জ্ঞানসঞ্চারের দায়ীত্ববোধ হইবার পূর্বেই তাহার প্রতি যে বিষম অবিচার হইয়া গিয়াছে ইহাই মনে করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতা স্নেহবিশিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন “কি হয়েছে তাতে,—গ্রামশুদ্ধ রোগী দেখে বেড়াস্, না হয় সেখানেও এক দিন গিয়েছিস্ তাতে হয়েছে কি তাই অমন করছিস্?” চাক্র তেমনি অভিমানের বেদনায় ক্লেশবরে কহিল “কি আর হবে কিছুই না, তবে এক দিন শুধু রোগী দেখতেও নয় মা, বাড়ীর কণ্ঠার অভাবে তাঁর যত কান্না ঝোড়া ঘাঁকিছু আছে সেই সব কিছুই তত্ত্বাবধান করতে যেতে হবে আমার” মাতা শান্তকণ্ঠে কহিলেন “হলই বা, সে তো ভাল কথা, তাতে কি তোরা অপমান হয়েছে না কি?” হিন্দুর মনটা ধারাপ হইয়া গেলেও তাহার সপত্নীভীতির কোনও সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না, বিশেষ চাক্র যখন তাহার আকর্ণ-টানা চক্ষুতটী নির্দেশ করিয়া কহিল “যমের বাড়ীর তাগাদা হইতেও সে ছুটি পাখাড়া তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং হিন্দুই যতটা সন্তোষ প্রকাশ করেই উচিত। দিন কয়েক পরে চাক্র আপনা হইতে গিয়া অপ্রত্যাশিতরূপে শিরোমণিদেবী বাস্তুবিক চাক্র বৃন্দা দিল। সেখানে দেবেস্ত্রের শুল্কতাতে সম্পর্কীয় নীলগুড়ো নায়েবী করন। তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাহার তত্ত্বাবধানে আসিয়া পাঁচু দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া গৃহীণীকে সংবাদ দিল। চাক্র ভাগ্যক্রমে সে যখন আসিয়াছিল তখন শরতের আসন্ন আগমন সম্ভাবনার সুনীল আকাশে ছ’এক টুকরা ছিন্ন পীতাম্বু মেঘ এদিক ওদিক সমস্তরূপ করিতেছিল। কিন্তু পৌছিবার ক্ষণকাল পরেই তেমনি অন্তরাত্মের শেষ রৌদ্রচ্ছটার উপর বড় বড় কলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল এবং উভয় দিক হইতে একখানা কালো মেঘও দীরে দীরে দেহ প্রসারিত করিয়া অগসর হইতেছিল। মতিয়া তখন খোলা রোয়াকের উপর বসিয়া গতকালকার সমাপ্ত ইতিহাস কাহিনী এবং চক্ষু উৎপাটিত হওয়ার পর কুনাল যে চিরপ্রার্থিত ভগবানের করুণাধারা ফেনন করিয়া অনুভব করিয়াছিল দেবেস্ত্রের নিকট তাহাই মুগ্ধচেত্রে শুনিতেছিল। রূপিতে দেবেস্ত্র মতিয়াকে লইয়া ধরে ঢুকিতেই অপ্রত্যাশিতরূপে চাক্রকে দেখিয়া দেবেস্ত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। আজ মতিয়াই প্রথমে প্রশ্ন করিল “আপনি কি খুব ভিক্ষে গেছেন ডাক্তার বাবু?” চাক্র বিপদে পড়িল। সে জানে যে মতিয়ার সহিত তাহার কি সম্পর্ক। কিন্তু মতিয়ার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পায় না। তাহা ধরিলে ভোঁট ভাতা বা মাতার সম্মুখে স্বামীর সহিত অনবশুণ্ডনে ব্যাক্যলাপ কোনও হিন্দু পরিবারেই এমন নিঃসঙ্কেচে চলিতে পারে না। তবে কিনা দেবেস্ত্র “বিলাত ফেরত” কিন্তু সাহেবীয়ানা তো তাহার অন্য কিছুই নাই। তবু সে মতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে দেবেস্ত্রের সুখ পান্নে চাহিয়াই কহিল “না ভিক্ষা নি তো? কিন্তু যে গরমে ভাজা-ভাঙ্গা হাঁচ ভিজলেও একান ক্ষতি হত না।” “হু” সে ক্ষতি হোত বৃষ্টি আমাদের, আপনি কিনা ডাক্তার।” চাক্র একটু হাসিয়া কহিল “ডাক্তার যে হয় সেও ততো মানুষ্যই।” দেবেস্ত্র সহাস্যে কহিলেন “আমরা তা মনে করি নে, তা ছাড়া তোমরা যে সব স্বাভাবিক আওড়ার, তোমার বাড়ী থেকে বেরোন সত্যিই আশ্চর্য্যের।” চাক্র কহিল “আপনাদের বৃষ্টি আর ও পাট নেই।” মতিয়া কহিল “কাল যখন আমরা কথকতা শুনে যাচ্ছিলাম—” চাক্র সোৎসুক বলিল “কোথায়?” “সে আমাদের

এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে।” “তারপর! কেমন লাগলো।” “খুব ভালো, ঞ্জবের উপাখ্যান থেকে কথকতা, হচ্ছিল, চোখে জল এসে পড়ে” চাকু, মতিয়ার এই প্রসঙ্গ তৃপ্তির আভাসে প্রীত হইয়া কহিল “ভক্তিরসের আবল্যো?” মতিয়া হাসিল “ভক্তিরসে? কই আর তা হ’ল, তা হ’লে ত এই রিম্-রিম্ রিম্-রিম্ বৃষ্টির শব্দে আর এই যে ফুলের গন্ধ আসচে এই নিয়ে—ঐ তাঁর পদশব্দ আর ঐ তাঁর অঙ্গস্বাস বলে পাগল হয়ে বাঁপিয়ে পড়তে পারতাম।” দেবেন্দ্র কহিলেন “কিন্তু যে তাঁর অভাব অনুভব করে সে যে তাঁকে ছাড়া থাকতেই পারে না।” মতিয়া শ্রিত্বকণ্ঠে কহিল “সত্যি, দাদা মনে হয় তাঁকে পোঁজা করিয়ে গেলে বাঁচাই মুশ্কিল। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে খোঁজাই মুখ।” চাকু শুনিয়াছিল শিরোনগি মহাশয় মতিয়ার বার্ষ্য জীবনটার কিছু পরিমাণে সার্থকতা দানের জন্য এই পথই চিনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতক পরিমাণে হইয়াও ছিল। চাকু আর, একবার কি একটা উত্তর করিবার জন্য মুখ তুলিয়া মতিয়ার পানে চাহিতে গিয়া ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সে যেন নিপুণ ভাস্কর-নির্মিত স্তম্ভ মন্দিরমূর্তি মাত্র। ইহার কোনওখানেই যেন কোন দৈন্ত নাই, ইহার প্রতি যে চাকুর নিজের কোন কর্তব্য আছে বা থাকিতে পারে ইহা যেন সে ধারণা করিতে পারিল না। মনের ভিতর নিজের প্রতি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া চাকু উঠিয়া দাঁড়াইল দেবেন্দ্র কহিলেন “একি চল্লে নাকি?” মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়া সে বাতির হইয়া আসিল। রাত্রি হইয়া গিয়াছিল কিন্তু দেবেন্দ্রের সাহসের প্রকাশ্যে গাড়ীর জন্য দাঁড়াইল না। বাতিরের খদ্যোৎস্কুল জমাট অন্ধকার দেখিয়া কণেক থমকিয়া মুছপদে পড়িতেই চাকুর পদ পড়িল। অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই শুনিল মতিয়া গাহিতেছে :—

“তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে এস গন্ধে, এস গানে—”

ঘরের কোণের অর্গণটা সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র বাজাইতেছিলেন। চাকু কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে চলিয়া গেল।

( ৫ )

গ্রামের সীমান্তে শিরোনগিদেব বাড়ী। সেখানে গৃহস্থের আবাস অপেক্ষা চারিদিককার আবাদের মাঠে মা লক্ষ্মীর স্তুতিও অঞ্চলের মত হরিৎ-শস্যক্ষেত্র। এমন কি গ্রামের সমস্ত ঘনিষ্ঠতা তাহাদের আঁত অন্নই ছিল। বাড়ী কিরিয়াও সহস্র আর কোনও কথা মনে না পড়িয়া চাকুর অন্তরে কেবলি ভাগিতে ছিল সেই চির আলোক-বিকিরিত স্তম্ভকোমল বক্ষে জীবনের সকল সম্পদই যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। না থাকিলে কেন? উহার অভ্যন্তরে তো চাকুর নিজের মত, ইহাদের মত, একই রকম আশা আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ উজ্জ্বল পিপাসাপূর্ণ একখানি হৃদয় আছে, তা হউক না সে বিকার-বিক্ষেপ হীন। সে যে সাধারণ হইতে কতখানি স্বতন্ত্র, তাহার ভ্রমোন্ময় মনোমন্দিরে যে কি পদার্থ কতটুকু সঞ্চিত আছে ইহাই হইয়া একটু নাড়াচাড়া করিবার কোমল চাকুর যেন দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয় ভ্রমিমাটা তো চাকুর দেখিবার বস্তু নহে,— ষ্টেথোস্কোপেরও কাম্য নহে কেবল মাত্র। দিয়াই হৃদয় গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলে তারও তো একখানি হৃদয় আছে এবং বাহ্য দৃষ্টির অভাবে তাহা অন্যের অপেক্ষা অধিক সুতীক্ষ্ণ সুতরায় সেও তো সেই মনের দ্বারা অপরের মনোভাব অনুভব করিতে পারে? তাহা হইলে? চাকুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ছি ছি সেকি ইতর হইয়া গিয়াছে একি অনধিকার হীন তাহার! যে বিধিবিধিতার অশ্রুট চিন্তাবৃত্তি সকল প্রচ্ছন্ন স্তম্ভাবস্থায় আছে তাই নাড়িয়া দিয়া বিশ্বের কক্ষের পাত্তী যে, তাহাকে বাধা দিবার অকরণ প্রবৃত্তি তাহার কোথা হইতে আসিল? হুই একদিন পরে তাহার প্রাণ্যবদ্ধ বতীন, তারক, সত্য ইহাদের তাদের আড্ডায় প্রবেশ পথে চাকু শুনিল বিদ্রূপ ব্যঙ্গের সহিত



তাহার বন্ধুবান্ধব তাহারই আলোচনা করিতেছে “হ্যাঁ কি বলছিল সত্যদী, চাককে আর সন্ধ্যা বেলা মোটেই পাওয়া যায় না—” তারক মুখ কৃষ্ণিত করিয়া কহিল “তার এখন পুরোণ সম্বন্ধ চাণ্ডের উঠেছে” সত্য কহিল “ওহে চাকুদা! আমাদের নির্যাস নয়, কানাই বল আর যাই বল বিষয়সম্পত্তি তো সব তারই।” আর একজন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল “তোরা বুঝি হিংসে হয় রে?” সত্য মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল “হ’লেও হ’তে পারে—তবু এও একটা কবিত্ব।” “কবিত্ব? কিসে রে কানার আবার কবিত্ব আর নৌদর্গা কিসে?” বাঃ বন্ধিম বাবুর শচীন্দ্র কি কানাতেই কিছু পান নি, আর অমরনাথ?” সমস্যা চাকুর আবির্ভাবে সকলেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল, কেবল যতীন সহ্যসো বলিল “কি হে চাকু যে! আরে এস এস এই মাত্র তোমার কথাই শুধিল আমাদের।” চাকু বসিয়া পড়িয়া বলিল “জঁ কি কথা হচ্ছিল, আবার হোক না তাত্ত্বন, সব থেমে গেলে কেন?” যতীন মুখ ফিরাইয়া কহিল “ডাক্তারের বইতে মাথা ঘামিয়ে, মাথা বুঝি গোল্লায় গেছে, তা নইলে এও বুঝতে পার না, যে জ্বতিবাদ কারো সামনে করতে নেই—যতকণ দেখা না পাও স্তবস্তুত কর।” চাকু কহিল “তারপর! দেখা পেলে?” যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল “বাস্ বরপ্রার্থনা।” চাকু রাগ করিয়া কহিল তবে বুঝি দ্বাই চুপ কোরে বসেই থাকবি?” যতীন কহিল “তা কি কোরবে? তোমার যে ‘সারং স্বস্তুরমন্দিরম্’ হয়ে উঠেছে, তোমার কি পাত্তা পাওয়া যায়?” চাকু বন্ধুর পিঠের উপর মৃদু আঘাত করিয়া কহিল “তোমার মস্তক। আনার হয়েছে সারং রোগীদের মন্দিরম্।” “রোগীদের, না রোগী বিশেষের?” চাকু গম্ভীর মুখে দীরকণ্ঠে কহিল “থামো, কি নিয়ে তামাসা করচো ভেবে দ্যাপ যতীন।” যতীন কৃষ্ণিতভাবে কহিল “তোরা লাগেচেনাকি রে?” গম্ভীর চাকু বাথাই লাগিয়াছিল। সেই অমান্ত শুভ্র কন্দলিটির মত নিখিল নিদগ্ধ অন্ধ ভীষটিকে লইয়া প্রসঙ্গ, আলোচনার কল্পনা সাহায্যে আপন আপন মত টাকাটিপ্লনি সহ যে ইহার বিজ্ঞপ্তি বহিবে ইহা চাকুর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সেই দিনই শয়নকক্ষে প্রবেশ মাত্র ইন্দু হাসিমুখে কহিল “তোমার যে বদনাম বেরিয়ে গেল” চাকু কহিল “কি?” “তুমি নাকি—” বলিয়াই ইন্দু হাসিয়া ফেলিল। চাকু কহিল “ওকি, থামলে কেন? বল আমি নাকি কি? খুঁটান হয়ে যাচ্ছি, না গেচি?” ইন্দু নতমুখে টেবিলের উপরকার দন্ধ ঘোমের ভাট বিন্দুশুলা নখে খুঁটিয়া তুলিতেছিল। একটু কৃষ্ণিত সন্ধ্যাচ কহিল “না তা নয়।” তা নয় তবে কি? বলিয়া চাকু একপাট দরোজা ভেঙাইয়া ঘরের ভিতরকার একটা চৌকীর উপর বসিল। নিগিষে ঘণকাল ইন্দুর নতমুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া তাতাকে নিকটে টানিয়া লইল। কোমল কণ্ঠে কহিল “শোন, নিপো কষ্ট পাচ্ছে কেন?” বলিয়া তাতাকে বুকাইয়া দিল যে—যে অন্ধ অসহায় পরনিভির জীব, তার উপর মানুষমানুষেরই একটা স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চার নিত্যই স্বাভাবিক। ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতির লেশ মাত্র নাই।” ইন্দু মুখ হাসিয়া কহিল “থাকলেও আমি ভয় করি নে।” “না, কর না বৈ কি, সে আমি মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।” ইন্দু সরিয়া গিয়া আরক্ত মুখে কহিল “তা বৈ কি, কক্ষণো নয় তোমারই মুখ ভার দেখে আমি চুপ করেছিলাম।” চাকু সহ্যসো কহিল “জঁ বিশ্বাসের ভুলে গিয়েছিলে তা-না?” ইন্দু হজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া কহিল “ওমা! সত্যিই ত গো তোমার খাবার আনি নি যে! দাঁড়াও স্থানি” বলিয়া দ্রুতপদে গিয়া গেল।

( ৬ )

মতিয়া নিজের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটা লোহার বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। তাহার দাসী তাতাকে একটা সুবৃহৎ সুবতি গোলাপ তুলিয়া দিয়াছিল সে পরম প্রীত মনে তাহারই সুবাস গ্রহণ করিতেছিল। দাসী সাপানের

অল্প প্রান্তে আমড়া কুড়াইতে গিয়াছিল। বন সরিষিষ্ট মেহেদী ঘেরের আড়ে এক পাল গরু ছাড়িয়া দিয়া ডোবার  
তীরে বসিয়া দুই জন রাখাল স্মৃষ্টি বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছিল। একটা কুবককড়া স্নানসিক্ত কাপড়ে  
ডোবার পুষ্টিত কল্মীলতা হইতে শাক তুলিতেছিল। পারদ-প্রকৃতির মুহু আন্দোলিত শ্রামাকুলের উপর হেমাঙ্ক  
কিরণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সেফালি-বাসিত প্রভাত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি বাক্যতা কিছুই দেখিতে না পাইলেও  
“যচ্চক্ষুনা ন পশ্যতি,—যে ন চক্ষুঃ পশ্যতি” সেই অতি নিগূঢ় একটা স্থানে সকল কিছুই অতি অশূট অমুভব সে  
করিতে পারে। দেবেন্দ্র কলিকাতায় ছিলেন স্মরণ্য চারু বাজিরে আর কাহাকেও না পাইয়া বাগানের ভিতর  
চুকিয়া পড়িল। বাগানের ভিতর মুষ্টিমতী কবিকল্পনার মত অচঞ্চল লাবণ্যশ্রী মাধুর্য্যময়ী তরুনীকে দেখিয়া সে  
মুগ্ধ চিত্তে একটু দাঁড়াইল। পৌত রোদ্রাধরা প্রকৃতির বক্ষশোভনা শান্তোজ্জ্বল মুষ্টিখানি দেখিয়া তাহার মন হইতে  
প্রশ্ন জাগিল “তুমিই কি এই মুষ্টিমতী? লালিত্য মাথা নয়নরঞ্জন দর্শনীয় বস্ত্রমাত্র? চারু কখনও কবিত্বের  
কোনও সন্ধান করে নাই। বোধ করি সে সময়টা কোন্‌ ঋতু তাহাকে প্রশ্ন করিলে তাহাও তাহাকে হিসাব  
করিয়া বলিতে হইত। কিন্তু অকস্মৎ একটা অনির্দিষ্টমাত্র হিরোলে তাহার আকাশ বাতাস এমন কি পদতালর  
হরিত তৃণান্তরণ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সেই মনোময় প্রাণ-শরীর নেতার নেতৃত্বে মনের ভিতর একটা চমক  
পুলকাবেশ জাগাইয়া দিল। চারু নিঃশব্দে গিয়া বেঞ্চটার পাশে দাঁড়াইল। কোন্‌ উপলক্ষে যে নিজের আগমন  
বাক্তা মতিয়াকে জ্ঞাপন করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। ক্ষণেক পরে মতিয়া অল্প-মনে বেঞ্চটার গায়ে হেলিয়া  
পড়িতেই চারুর হস্ত স্পর্শ চকিতে তড়িত স্পৃষ্টের মত সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—“দাদা” চারু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল  
“আমি।” ত্র্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে মুহু কর্তে কহিল “ও! আপনি!” তাহার ক্ষুদ্র ললাটের কুঞ্চনরেখার সুস্পষ্ট  
বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া চারু অপ্রতীত হইয়া নিজের সাক্ষাতে যে তাহার কি অধিকার তাহারই কৈফিয়ত দিতে বাইতে  
ছিল কিন্তু মতিয়ার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া পামিয়া গেল। মতিয়া বাস্তব-কর্তে কহিল “দয়া কোরে  
কালী দিদিকে ডেকে দিন না” চারু কোমল কর্তে কহিল “কেন?” “আমায় মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন” “তা চল  
না আমিই নিয়ে যাচ্ছি” বলিয়া হাত বাড়াইয়া মতিয়ার হাত স্পর্শ মাত্র বারংবার শিহরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মতিয়া  
বসিয়া পড়িল। চারু আশ্চর্য হইয়া কহিল “ও কি হ’ল তোমার?” মতিয়া প্রায় রুদ্ধ কর্তে কহিল “কি বিশ্রী  
হাত আপনীর, আমার হাত আপনি ধ্বংসে গেলেন কেন?” কালী দাসী আসিয়া কহিল “কি হ’ল গো দিদিমণি?”  
মতিয়া উত্তর করিল না, চারু কহিল “হয়নি কিছুই, তুমি নয়ে যাও।” কিছুই যে হয় নাই কালী দাসীও তাহা বিশ্বাস  
করিতে পারিল না, পূর্ণ সন্নিহিত চক্ষে চারুর প্রতি চাহিতে চাহিতে সে মতিয়াকে লইয়া গেল। চারু অনামনকে  
বাগানের এক নিকে একটা বিশিষ্ট স্থলপদ্মের অন্নান কোমল পল্লবের উপরস্থিত সুকল্ল ভ্রমরের দিকে আবিষ্টের  
মত চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সেটা উড়িয়া গেলে চোখ তুলিয়া দেখিল ফুলের ভিতরকার ক্ষীণ কোমল  
পাপড়িটা কীটদণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; হায়, সৃষ্টি ক্ষতি এই দংশনক্ষত সহ্য করিবার ক্ষমতাই কি  
পুষ্পক্ষে এমূর সৃষ্টি করিয়াছেন! আবার তাহার মনে পড়িল মতিয়ার সেই শরীরত মূগীর মত সে কি বাথার্ড  
স্বাকুলতা, কেন সে অন্নান শুভ্র পবিত্রতায় এ মলিন বাবা মাখাইতে গেল! দৃষ্টির অভাব হইলেও অপরিচিতের  
অসম্ভাব্য হস্ত সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সে তাহার বিখ্যাত পিতার মতনই অতি নিদার দ্বিতীয়  
স্বাকুলতা, তাহা চারু শুনিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া মতিয়া মায়ের নিকট একটা নূতন তথ্য সেই দিনই প্রথম শুনিল।  
তাহার স্বর্গগত পিতা এতদিন তাহাকে বাহা শিখাইয়াছিলেন বুঝাইয়াছিলেন এখন তাহার বিপরীত দেখিয়া তাহার  
মনের ভিতর কেমন একটা বিতৃষ্ণা ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মতনই দেহধারী জরামরণশীল আগমের

নিঃসম্পর্কীয় কোনও একটা মানুষকেই না কি এতটা ভালবাসিবার দরকার আছে যাহাতে এক বস্ত্রের সঙ্গিনীও কেহ হইয়াছিল। নখর দেহের অবশ্য বিনাশ জানিয়াও ছুঁদিনকার অগ্রপশ্চাৎও অসহ্য মনে করিয়া একের চিতাবন্ধে অপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বাহারা পড়ে তাহারাই মত নারী! মানুষ মানুষকে আত্মসমর্পণ করিবে কেন? যিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, তিনি তো কিছুমাত্র ছিন্নভিন্ন নন। মতিয়া পিতার মুখে ভগবানোক্তি শুনিয়াছে যে তিনিই—

“পুরস্তাদথ পৃষ্ঠিতস্তে এবং সর্বত এব সর্বঃ।

অনন্ত বীৰ্য্যামিত বিক্রমঃ সর্ব সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব”।

তবে কিসের জন্য কোন অভাবে মানুষকে মানুষে ভালবাসিতে যাইবে? জীবন স্বাদ উৎসর্গ করিতে হয় তবে সেই একমাত্র গতিপ্রদ চরণারবিন্দে। সে নিজের জীবনকেও এত দিন তাহাই ভাবিয়া আসিয়াছিল। যেদিন মায়ের মুখে শুনিল সেও পি ঠাকুরক মানবে উৎসর্গীকৃত। তাহার সমস্ত মন সেদিন ক্ষোভে, দুঃখে ভরিয়া উঠিল। নিদারুণ সত্যটাকে কাল্পনিক মিথ্যা আবরণে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টায় সে কহিল “তার তো আবার বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে। মা তবুও” মাতা শুক নীরস কণ্ঠে কহিলেন “হ্যাঁ মা, তবুও;—তবু তুমি তারই।” মতিয়া হতাশ হইয়া কহিল “তা হ'ক্ গে, যাক্ মা আমি মানুষের সেবাভক্তি করতে পারবো না।” বেদনাধিক্ত মলিন হাস্তে মা কহিলেন “ভগবানি কি তোমায় সেই শক্তিই কিছু দিবেচেন যে কাউকে সেবাভক্তি করতে পারবে?” মতিয়া মাথা নাড়িয়া তেমন শাস্তকণ্ঠে কহিল “আমার ভগবান যা দিবেচেন তা সব আমি তাঁকেই উৎসর্গ করেচি। অতঃপর চাক আসিয়া আর কোনও দিনই মতিয়ার লুপ্তিত অঞ্চলের একটু প্রান্তভাগও দেখিতে পাইত না। বড় ঘরে বসিয়া শাড়ী ও নীল-খুড়ার সহিত বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে ঠাকুরঘরের অভ্যন্তরস্থিত মতিয়ার স্তব আবৃত্তি শুনিয়া ফিরিয়া আসিত। এই ব্যাপারে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া গেল। মতিয়ার স্বাধার বন্ধেও তবে এমন কিছু আছে যাহাতে এই সামান্যটুকু উপলব্ধ করিয়া সে আপনাকে প্রব্রুত করিল। অথবা এত দিনে যাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল তাহাই জানিয়া ফেলিয়াছে তাই। দেবেশ্বর বাড়ী আসিলে যেদিন চাক সাক্ষাৎ করিতে গেল সেদিন মতিয়া রীতিমত মাথার কাপড় দিয়া দাদার পাশে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছিল। পরস্পর মুখের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে সে ইচ্ছা করিয়া আসে নাই। দেবেশ্বরের মুখ কোতুকান্ধ, তিনি চাককে আহ্বান করিলেন, চাক নিকটে আসিয়া কহিল “তবু আহ্বানের লোক যে এক জন পাওয়া গেল, বাঁচলাম!” দেবেশ্বর সত্যন্তে বলিলেন “আর যখন প্রথম এ বাড়ীতে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া বরণ করা হয়েছিল, তখন আমি কোথায় ছিলাম জান তো? বিলাতে।” সে দিন আর দেবেশ্বরের সামনেও মতিয়া একটা বারও মুখ খুলিল না দেখিয়া চাক অত্যন্ত বাধিত হইল। একটু একটু করিয়া সে অনেকখানি কর্তব্যই উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল মতিয়াকেও দেবেশ্বরের মত উত্তাপ হীন স্নিগ্ধ সোদরের মত বিতুষ্ট অনাবিল প্রীতি স্নেহ দিয়া সুখী করিবে। কিন্তু বিধির বন্ধন একই ফাঁসে বাঁধা, তাই চাক ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি তাহাদের পরস্পরকে সেই একই দাম্পত্যক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতেছিল— তা সে স্থান, কাল, পাত্র যত ক্রতীই থাকুক না কেন? বাড়ী ফিরিলে ইন্দু যখন স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সোচ্চক্ষে প্রব্রুত করিল “আজ এমন কোরে রয়েছ যে! কি হয়েছে?” চাক শ্রান্তভাবে চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িয়া বৃহৎ কণ্ঠে কহিল “কেমন?” ইন্দু নিকটে আসিয়া কপালের উপর হাত দিয়া কহিল “তাই তো জিজ্ঞেস করছি?” চাক চোখ মেলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল “কেন তোমার এ পাহারা ছুঁটা বুঝি আর পেরে উঠছে না? অস্ত্র বায়না-টারগা খুঁজে নেয় নি তো?” ইন্দু নিতান্ত রাগিয়া কহিল “বে যেমন, সে বিষণ্ণ সবাইকে

তেমনি দেখে কি না।" তার পর কিছুক্ষণ স্বামীর মুখপানে নিনিমেষে চাহিয়া প্রসন্ন হাসি মুখে কহিল "যেখানে জয়ই নেই সেখানে পাহারার দরকার তো কিছু দেখি নে আমি।" আর কোন প্রত্যাশার না পাইয়া সে সরিয়া আসিয়া সমস্ত স্বামীর সিঁথির ছই পাশের চুলের থাক হাত দিয়া গভীর ননোযোগের সহিত সাঙাইতে লাগিল।

( ৭ )

বৎসরখানেক ক'টিয়া গিয়াছে। পাটনার ওহদিকে কোন্ একটা সরকারী হাঁসপাতালে চাকুরী পাইয়া চাকর সেইখানেই এক বৎসর কাটাওয়া সম্প্রতি ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। হিন্দু সঙ্গে যায় নাই সে তাহার পিত্রালয়ে ছিল, সেখানে তাহার নবগত খুকাটি তাহার প্রথম উচ্চারিত ভাষায় কেবল তাহার প্রবাসী পিতাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছে। হিন্দুর পত্রে এই সংবাদ পাইয়া চাকর বাড়ী আসিয়াছে। তাহার আগমন সংবাদে তাহার দুইজন পরীষদ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চাকর নিকট পশ্চিমের কাহিনী শুনিতেছিল। যতীন ইতিপূর্বে চাকরকে এ মে আসিবার জন্য অস্বরোধ পত্র দিয়াছিল, উত্তরে চাকর লিখিয়াছিল যে গ্রাম্য তাহার নিকট অত্যন্ত একঘেরে হইয়া গিয়াছে, অতএব সেখানে আর সে শীঘ্র ফিরিতেছে না ইত্যাদি... বর্তমান প্রসঙ্গে সে কহিল "কি হে সহরে বাবু, এখনই যে বড় ফিরলে? এবার হার ম্যাজিষ্টার তলব কিনা?" চাকর লজ্জিত-হাস্যে কহিল "তবে তোমার ইচ্ছে যে চলে যাই?" যতীন হাসিয়া উঠিল "কোথায়? খন্ডর বাড়ী তো? মতলব তো একমাত্র তাই, তার জন্য অত ভনিতার কোনও দরকার নেই তো!" আর একজন কহিল "তা বৈ কি তোমরা তো ডা'নে বায়ে!" চাকর কনিষ্ঠ সুরোধ কহিল "মেজদা তো বলেন যে ওর খন্ডর বাড়ীর..." চাকর ধমক দিয়া কহিল "ওরে থাম চুপ কর তোর আর রসান দিতে হবে না।" সুরোধ ছটামি করিয়া আরো একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময়ে গ্রামের সর্বজন পরিচিত গাড়ীখানা আসিয়া ঘারে থামিয়া পড়িল। যতীন কহিল "ওই দ্যাখ্ চাকর মনে মনে টেলিগ্রাফ করেছিল।" গাড়ীর ভিতর হঠাৎ বাহির হইয়া মথার হাটুটা কক্ষতলে চাপিয়া দেবেস্ত্র সোকা-সুজি বিরজানাগের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বিরজানাগকে প্রণাম করিলে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তিনি দেবেস্ত্রকে চিনিতেন না। চাকর চিনিল সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখে তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া দেবেস্ত্র কহিলেন "এই যে! ভাল তো?" চাকর মস্তক হেলানিয়া উত্তর দিল। দেবেস্ত্র কহিলেন "তুমি এসেচ শুনেই আসুচি, চল একবার, তার অস্ত্রখ করেচে যে।" বিরজানাগ দেবেস্ত্রের বাক্যের ভাৎপর্ঘা না বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলেন "কার?" "মাতর" চাকর মাতার শয্যার নিকটস্থ হইয়া সবিষ্ময়ে দেখিল এই সুদীর্ঘ কালেও মতিয়া চাকর পদশব্দটাও ভুলে নাই। চাকর পদশব্দ শুনিবামাত্র সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বস্ত্র ভ্রমে বিছানার চাদরটা টানিয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে মাথার তুলিতেছিল। চাকর তাড়াতাড়ি কহিল "থাক থাক।" দেবেস্ত্র সেইমাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন তাই মাতা তাহার আহ্বারের উদ্যোগে মতিয়াকে চাকর কাছে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাকর ঐষধ আনাইবার জন্য প্রেস্কপশ্যান লিখিতে বসিল। ঐষধ আসিলে সেই কটু ঐষধটা মতিয়া অসম্ভবতঃ মুখে গিলিয়া ফেলিল, চাকর কহিল "একটু সুপুতী টুপুতী-কিছু লাগবে না?" মাতা কহিলেন "না, ঐষধ খেতে ওর কোনও আপত্তি নেই, আপত্তি ওজর যত পথের বেলা," মতিয়া মুহু হাসিয়া কহিল "আমার শ্রাচ্ছে পুণ্য স্বাভাব দিও মা, থাকো।" মাতা সজল চক্ষু চলিয়া গেলে মতিয়া সহসা অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কহিল "আমার শ্রাচ্ছটাও তোমাকেই করতে হবে নয়?" চাকর শান্তকণ্ঠে কহিল "না আপাততঃ তার দরকার হবে না।" সম্ভবতঃ জ্বরক আগার মতিয়া উত্তপ্ত কপালের উপর নিজের হাত দুখানি দিয়া টিপিয়াছিল। চাকর এক হাতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া অপর হাত কপালের উপর স্থাপন মাত্র মতিয়া অসহিষ্ণুভাবে আরক্ত মুখে মাথাটা লবেগে সরাইয়া

লইল। দেবেজ্ঞ আসিয়া চেয়ার সরাইয়া বসিবার শব্দে মতিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল “দাদা এঁর ভিজিট!” চাকর যথের দীপ্তিটুকু দপ্ করিয়া নিভিয়া সমস্ত মুখখানি মলিন হইয়া গেল। দেবেজ্ঞ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন “ভিজিট! ভিজিট দেবো কাকে মতি ওষে চাকর।” দেবেজ্ঞ বুঝিলেন যে অরের মোহে বুঝি মতিয়া চাককে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু মতিয়া তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল “হসেনই বা, তুমি কি রেগী দেখতে ডাকার ডেকে আন নি? উনিই কি আপনা হতে এসেছিলেন?” দেবেজ্ঞ নতমুখে উঠিয়া গেলেন। মতিয়ার প্রচ্ছন্ন অভিমান-সিক্ত কণ্ঠে কেহই যথার্থ অলুত্ব করিতে পারিলেন না। চাক কিছুক্ষণ শুক পাکیয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল “আর না হোক, তেঁয়ার তাক্ত কর্বো না, আমি যাচ্ছি, দাদাকে ভেঁকে দিয়ে যাচ্ছি।” চাক চলিয়া গেল। মতিয়া তার অসার চক্ষের শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া অসহিষ্ণুভাবে চিন্তা করিতেছিল। মা বলেন কিনা এই স্ত্রীলোকের সর্বোত্তম সার পদার্থ। আঃ স্পর্শ যার এমন তীব্র মধুর উত্তেজক, আগুনের মত উত্তপ্ত বাষ্পে যে হৃদয় মন ভরাইয়া দেয়, সেই নাকি আবার সুখ-শান্তির আশ্রয়। চিরদিন শৈশব হঠাতে আরম্ভ করিয়া প্রতি প্রভাতপন্দোবে ঠাকুরঘরে বাসিয়া মতিয়ার নিষ্ঠাবান পিতা এই হতভাগিনী কন্যাটিকে যে ঐখ্যের অধিকারিনী করিবার চেষ্টার স্রগলীর আগ্রহ যে অনাদি অনন্ত অপচল জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিঃবিন্দু মহিমোজ্জ্বল রেখাকারে সেই অম্মান অঙ্গ হৃদয়ের প্রতি স্তরেস্তরে আঁকিয়া দিয়াছেন একি তাহার সেই জাগ্রত হৃদয় দেবতা? না তাহা তো নয়। সে করুণা স্নিগ্ধ, হৃদয় ময়কারী অমৃতের প্রাবন স্বরূপ। আর এ যে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত একের প্রতি অন্যের তীব্র আকর্ষণ। এই বুঝি সব চেয়ে প্রবল।

চাকর প্রবাস যাত্রার পূর্বেই দেবেজ্ঞ চাকিয়া গিয়াছিলেন। শুই একটা বৈদ্যিক কাজ চাককে নিষ্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। অফিস ঘরে কাজ দারিয়া চাক অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল এই প্রত্যয়ে আর কেহ কোথাও নাই; কেবল পূজার ঘর মুক্ত দ্বার, এবং অভ্যস্তর হঠাতে মতিয়ার মধুর কণ্ঠের স্তোত্র আবৃত্তি শুনা যাইতেছিল “একং নিতাম্ বিমলমচক্ষুঃ সন্দাদা সাক্ষীভূতম্ ভাবাতীঃম্ ত্রিগুণ রহিতম্ সঙ্গুতম্ স্বং নমামি” নগ্নপদে চাক ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। একখান তরুণ উষার শোভিতভাসের মত রক্তাধরা মতিয়ার শুভ্র গৌরদেহের চারি পাশে সত্ত্ব স্নানসিক্ত কেশরাশি এলারিয়া। তাহার সপ্তমীর ইন্দুরেখার মত চাকরই অহস্তপ্রদত্ত সেতু কুশলি হাঁচকু, নিশাশেষের শুকতাগার মত উজ্জল সিন্দূরবিন্দু। সত্ত্বঃ রোগমুক্তা মতিয়া তখনো ছন্দল ছিল। নতজানু হইয়া দেবপ্রণাম করিয়া উঠিবার সময় একটা ছোট চৌকীর গায়ে লাগিয়া পদস্থলন হইয়া সে একেবারে ছিটকাইয়া চাকর নিতান্ত সন্নিকটে গিয়া পড়িল। চাক ক্ষিপ্ৰগতিতে তাহার পতনোন্মুখ ক্ষুদ্র দেহখানা নিজের বুক দিয়া ধরিয়া ফেলিল। দৃষ্টিহীন মনে করিল বুঝি তাহার সমুখস্থ প্রণমা দেবতাই ভ্রাহাকে শিশুর মত লুফিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। তাহার সমস্ত দেহমন হুঃসহ পুলকাবোগে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অন্তর ভরিয়া সে ক্ষুদ্রতর করল এই তো স্বর্গ। এত পুণ্যময়ী এত ভাগ্যবতী সে! তাহাকে এত মধুর আবেশে ঘুম পাড়াইবার জন্য তাহার অন্তরের চির নূতন বীণা অকস্মাৎ মধুর স্ফূর্ত্যায় মৃত বন্ধারে বাজিয়া উঠিল। এই এক পলক মধ্যেই তাহার মনে হইল সে এইখানেই মিলাইয়া যাইবে আর স্থলিলাঙ্কিত পৃথিবীর ভীষ তাহাকে হঠাতে হইবে না। চাক যখন দীরে দীরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল “পাড়ে মারা যেতে, তাই এই এই দুঃখ-টুকু তোমায় ভোগ করতে হ’ল।” তখন সে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িল। ‘হায় ভগবান মানুষের বুকে আজ তার স্বর্গ জ্ঞান হইল!’ মতিয়ার পবিত্র পুষ্পভূলা অন্তর ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া গেল। “একি অশ্রমান ঘটিল তাহার—হে ঠাকুর তোমারই পদ-প্রান্তে! এও কি তোমারি দান? তবে কি তাঁই সত্য! মানুষকে যাহা দিয়াছ তাহা তো মানুষেরই জন্ত, তবে তুমি শুধু হে অন্তরদর্শী কেবলমাত্র সৌরভ প্রণকারী নিখ্যালোর স্কুলের মত!”

( ৮ )

মতিয়াকে তাহার পিতা মাতা দ্বারা ইহারা বহু যত্নে বহু আদরে তাহার যে পদার্থের অভাব তাহা যতদূর সম্ভব অপর সুখস্বচ্ছন্দ্য দিয়া পূর্ণ করিয়া আসিতেছিলেন। মুখে মুখে অনেক কাহিনী, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শুনাইয়া অনেক শিক্ষাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল কেবল স্বামীর মন্যশিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাকে তাহার মাতা। চাকুর বাজার পর প্রতি প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মতিয়ার সব-সতক শ্রবণেন্দ্রিয় অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। কই আর যে সে জুতার শব্দও তাহার ভাগ্যে জুটে না। চির আরাধনার দেবতাও যে অনেক ক্রমে তাহাকে এখন দেন। আর তো সে পূজার নিকট পূজারিণী আহুসমাহিতা আত্মহারা হইতে পারে না, নিজের সেই শূন্যলবঙ্গনের নিকটই ঘুরিয়া মরে। যেন দেবতা তাহাকে বুঝাইতে চাহেন যে মানুষের রক্তমাংসের দেহ, তাহার আত্মমানিক যাগা কিছু তাহা বাহিরের বলে দমনীয় নহে। মতিয়া বসিয়া নিজের কর্তৃত্ব ভ্রান্তির সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চিন্তা করিতেছিল; সেদিন—শুধু সেই একটা দিনই মাত্র সে জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। আর কতকাল সেই আকস্মিক শব্দ শুনিতে পায় নাই, তা নাই বা পাইল এই না পাওয়াই যেন তার পরিপূর্ণ হইয়া অক্ষর প্রাপ্তি সংঘটন করে। বাহিরে একটা গুমিষ্ট চর্যকাকণী শুনিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাসতুতো বোন আশা, কয়েক দিন পরে গম্ভীরবাড়ী হইতে আসিয়া মাসীমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহারই নূতন খোকাটির হসির লহরে আকৃষ্ট হইয়া মতিয়া বাহির হইয়াছিল। আশা, নূতন মাসতুতের গৌরবে সলাভপ্ত হামিমুখে মতিয়াকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিতেই খোকা মতিয়ার চুলের গোছা ধরিয়া বদনে অপণ করিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল। এই শিশু-চিনিষটী মতিয়ার নিকট হৃৎস্পন্দ সম্পদ! সে আগ্রহ ভরে সেই পুষ্পস্তবকের মত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরল। খোকাও পরমোৎসাহে মতিয়ার নাসিকাগ্র মুখে পুরিয়া মুখের লাল মাখাইয়া দিতে লাগিল। এবং তাহার ভাষার অপ্রাপ্ত বঙ্গরে সকলের কথা ডুবাইতে লাগিল। মতিয়া প্রফুল্লমুখে কহিল “তুই সমস্ত দিনরাত একে আদর বারসু নম্র আশা?” আশা হাসিয়া কহিল “ত্যা আমার তো আর কোনও কাজ কম নেই কিনা? শুধু এর কাজ নিয়ে চাবিধ বন্টা থাকি তবু আর অন্ত নেই, কম বিরক্ত করে ও।” মতিয়া শিশুটিকে বুকের ভিতর চাপিয়া কহিল “এ না কি আবার বিরক্ত করে।” “করে কি না-করে তা একরাত্রি রাখলে বুঝতে পারো, সারা রাত্রি ঘুমতে দেয় না” মতিয়া কহিল “একে পেলে আমি না ঘুমিয়েও থাকতে পারি।” আশা চিনিয়া গেলও মতিয়ার হৃদয়ে বিগত বসন্ত স্মৃতির মত শিশুটির মিষ্ট লাগিয়া রহিল। এবার যেন পৃথিবীর লুকানো সম্পদ একটু একটু করিয়া তাহার জীবনকে স্পর্শ করিয়া দোলাইয়া যাইতেছে। অক্ষ বনিয়া দয়া করিয়া আর কিছুতেই ছাড়িয়া চানিতেছে না। ইহার উপর যেদিন শুনিল তাহার দাদারও একটা খোকা আছে কিন্তু বোদিদি কোনমতেই গ্রামে আসিতে চাহেন না তাহার মাতাও অনুমতি দেন না, আর চাকুরও তো একটা খুঁকী আছে, তাহাও মতিয়া পায় না। নিজস্বনে বসিয়া এক একদিন মতিয়ার অক্ষ লগনে বন্ধ-বন্ধ করিয়া অশ্রু ধরিয়া পড়িত। মহাবিশুব সংক্রান্ত উপলক্ষে গ্রামে একটা গঙ্গাস্নানের হুজুক উঠিয়াছিল মতিয়ার মাতাও গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া মতিয়াকে রাখিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু মতিয়া স্বীকার করিল না, সেও সঙ্গে যাইবে। অতি সতর্ক মতিয়াকে স্নান করাইয়া মা মতিয়াকে তীরে তুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই মতিয়া কহিল আর একটু থাকি মা বেশ লাগছে।” আবার স্নানার্থীদের করত্যাড়িত প্রভাত-স্নিগ্ধ গঙ্গার তরঙ্গগুলি মতিয়ার বুকে গিটে মুহু আঘাত করিতেছিল। কেহ কেহ গঙ্গাস্তব কবিতাছিলেন, কেহ

বা আসন্ন উদয়ের আরক্তচ্ছটা বিভাসিত পূর্নদিকে চাহিয়া অজ্ঞানিপূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া অর্ঘ্য দিতেছিলেন। কে একজন চাকরের আশ্রীয়া গঙ্গামানে আসিয়াছিলেন। মতিয়ার মাতা তাঁহার সহিত আলাপে সংবাদ পাইলেন যে, চাকর সন্ধ্যা পুরী গিয়াছে, কন্যার শরীর অস্থির হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য। মতিয়া উৎকর্ণ হইয়া কথাগুলি গিলিতেছিল।

( ২ )

পূর ছুটিতে কোট বন্ধ হওয়ায় দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার মা এই সময় পূজার উপচার আনাহঁতে ও সাজাইতে বিব্রত ছিলেন। মতিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরিয়াছিল কিন্তু তাহার তো এমন শক্তি ছিল না যে মাতার কাজের সে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। তাই দিয়ার আসিয়া নিতের ঘরে বসিয়াছিল। দেবেন্দ্র আসিয়া কহিলেন “চল গরে গিয়া বসি।” দেবেন্দ্র জানিতেন মতিয়াও অন্ধের স্বাভাবিক মিষ্ট শব্দ শ্রুতিতে বড় ভালবাসিত। তাহারই পরিতোষে জন্য মিষ্ট আশ্রয়ের সকল যত্ন সে গৃহে বর্তমান ছিল। মতিয়া কহিল “তুমি বন্ধি বা না নিয়ে বসতে চাও? আমি এখন ও সব পারবো না, তুমি একটা গল্প বল, কিংবা বই পড় শুনটি।” দেবেন্দ্র কহিলেন “তোমার যেমন গান করতে চাচ্ছে করচে না আমারও তেমনি বই পড়তে চাচ্ছে করচে না।” মতিয়া কহিল “আচ্ছা তবে গল্প বল।” “কোনটা বলবো? আর যে মনে হয় না।” তোমাদের নবেলের গল্প একটা কর তাই শ্রুতিতে ভাল লাগে, আচ্ছা দাদা গল্পও আমার মত কাণা মাতুব থাকে? কই কাণার গল্প তো বল না কখনো। “বলি নি বাঃ, যতগল্প তো অন্ধ ছিলেন।” “ওঃ তিনি তো গল্প নন তিনি তো সত্যিই ছিলেন। আর গল্পে অন্ধ মেয়ে মাতুব থাকে না? দেবেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন “হাঁ রজনী অন্ধ ছিল, তা সে গল্প তোকে আর একদিন শোনাব।” অধীর আগ্রহে মতিয়া কহিল “আর একদিন আবার কবে শোনাবে; তুমি ত চলে যাবে।” “চলেই যদি যাই, তুই আর কারোকে দিয়ে পড়িয়ে শুনিস।” পৃথিবীর সচরাচর ওচলিত মহৎ হইতে ছোট, উদ্ভট হইতে অদ্ভুত সকল প্রকার বিষয়বস্তু মতিয়াকে জ্ঞাপন করা তাহার না ও দাদা অবশ্যাক মনে করিতেছিলেন। তাহার স্বর্ণ-পদিল সংসারে শুভাশুভ জ্ঞানশেষমাত্র বজ্জিতা অন্ধ যুবতীর বিপদাশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আত্মরক্ষার মহাসংগ্রাম, বিশেষ মাতার অবস্থামানে মতিয়ার একান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িছে অধিক সম্ভাবনা। এইরূপে সংসারের নূতন তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ মতিয়ার গুণসূচ্য বাড়িয়া দিতেছিল। পরদিনই প্রভাত হইতে না হইতে বাড়ীর শেফালিগাছের তলায় একদল বালিকা ফুল কুড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিল। শুভ্রকানন দলের নীচে আরক্তরক্ত ফুলের রাশি যেন গালিচার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ মৃদুস্বাসে সাগরবড়ী ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও স্বাস লক্ষ্য করিয়া মতিয়া দীপদে গাছে নীচে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পদতলে পড়িয়া ফুলগুলি পিষিয়া গেল দেখিয়া বালিকারা ব্যস্ত হইয়া কহিল “ও দিদিমণি তুমি সর্ব ফুলগুলি মাড়িতে দিখো যে! তুমি আর এদিকে এসো না আমরা তোমার ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছি। মতিয়া পদদলিত ফুলকয়লা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া অপ্রতিভভাবে কহিল “আচ্ছা, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তেদের মাথা স্নুফু আছে? স্নকুনারী কহিল “আজি! কেন? তুই বাড়ী গিয়ে বিয়ুকে পাঠিয়ে দিস্তো রে, বলিস্ বড় দরকার, বাড়ীর কাজকর্ম যেন সেরে আসে।” মতিয়া ছুই পদ পিছাইয়া যেখানে তুলসীমঞ্চের নিকটে তাহার পিতার শানবীধানো বসিবার বেদী ছিল সেইখানে গিয়া বসিল। মেয়েরা

কোড়ে তরিকা ফুল লইয়া ফিরিতেছিল। মতিয়া কহিল “তোরা ফিরচিস্ যে বড়, আমার ফুল দিলি নে?” মেয়েরা পরস্পর চাহিল। অর্থাৎ সকলে নিজ নিজ অংশ হইতে দিতে স্বীকৃত কি না? মতিয়া বসিয়াছিল যে এই ফুলের মালা আর ঠাকুরের কণ্ঠে দিতে হইবে কারণ যদি অন্যায়সে ফুলকটি পাওয়া গেল তবে একটুখানি আগসোর জন্য অসার্থক কেন হইবে। ছথানা কচুর পাতায় করিয়া সুকু তাহাকে কতকগুলি ফুল দিয়া গেল। মতিয়া কহিল “তোর কাপড় ছাড়া তো? এ ফুলের মালা ঠাকুরকে দেব বুঝে দিস্, তোরা আকাচা কাপড় হয় তো তুই ফুল নিয়ে যা।” নিজের বস্ত্রের শুদ্ধতা প্রমাণ করিয়া দিয়া সুকু চলিয়া গেল। সুকুর বোন্ বিহু ঘোড়নী। দেবেন্দ্রর অনুপস্থিত কালে মতিয়াকে অনেক পুস্তক পড়িয়া সেই শুনাইত। অবশ্য সে বাগা শুনাইত তাহা হয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ না হয় কোনও উপন্যাস এই রকম কিছু একটা হইত। ইগা ছাড়া ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত মহাশয় মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে গীতা ভাগবত ইত্যাদির অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। সহস্রবার শুনিয়া শুনিয়া সে সকলের প্রত্যেক শ্লোক মতিয়ার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। বিহুর মুখে মতিয়া রজনী শুনিতোছিল। এমন করিয়া তাহার নিজের অন্তরূপ অন্ধের সুপ্তঃ প্রহণ করিয়া আর কোনও কল্পনা-কাহিনী তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার মতনই শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধময়, তথাপি আলোকচ্ছটায় পরিপূর্ণ সুখমাময়ী প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাচক্র তাহাকে অন্ধ বলিয়া এতটুকুও সন্নিবেশিত বাবধান রাখিয়া চাণ্ডিবে না। মতিয়া নিমগ্ন হইয়া শুনিতোছিল। যে মতিয়া নল-দময়ন্তীর অন্ধবাস গ্রহণকে নিষ্পৃহিতার পরাকাষ্ঠা মনে করিত এবং মাহুসে মাহুসের জন্য কেমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া অত ভাল বাসিতে পারে ইহারই প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া সমস্যার পড়িত; আজ আর সে মতিয়া ছিল না। এখন সে বুকিতে পারিয়াছিল মাহুস তো দূরের কথা মাহুসের পায়ের তুচ্ছ বিনামার মুহুঃ স্পর্শে বকের নিদ্ৰিত কেন্দ্রে কি প্রচণ্ড তিলোল বহিয়া যাইতে পারে। কতদূরী-সম্ভব কুরঙ্গের মতই সে আপনার সদ্যবিকশিত সুদৃপ্তের মধু-নাদকণ্ঠের অর্গহীন ভাবে বিভোরা। মতিয়া তো শুনিয়েই যাইতেছে, তাহার ক্লাস্তি নাই। পাঠিকা বিহু চকল হইয়া অফুট দ্রুত কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়ই পিয়নের প্রাত্যহিক ডাক বিলির সময়। সে উচ্চস্বরে পিয়নের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে আর সময় মত উপস্থিত হইয়া চিঠিখানি গ্রহণ করিতে না পারিলে বোধি হইতে কাকী পর্যন্ত মিলিয়া নিশিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিবে এবং যখন তখন এক আশঙ্কিত বাহির করিয়া বিহুকে কাদাইয়া ছাড়িবে এই আশঙ্কায় সে প্রতাহ ডাকের সময় সুকুকে পাঠাইয়া ছানিয়া লয় যে—“যাতো সুকু দেখে আর না ভাই পিয়ন আসছে কিনা” সেই অভ্যাস মত সুকু তাহার পছন্দ মত একটা সুরহং পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া প্রশ্ন করিল “দেখে আস্বেদিদি পিয়ন আসছে না কি।” বিহু নির্দোষ সুকুর বুদ্ধিহীনতার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া কহিল “দ্যোং না” মতিয়া কহিল “কি?” বিহু বইখানা মুড়িয়া কহিল “কিছু না ভাই মতিদি সুকুটা বড় বোকা। আজ এই পর্যন্ত থাক্ আবার কাল এসে শোনাবখন। আজ যাই মতিদি?” মতিয়া মুহুঃ হাসিয়া কহিল “না, না, যাবি কি? এখন তোরা কোনও কাজ তো নেই? বোস্ আর একটু শুনিয়ে যা ভাই “বিহু অনিচ্ছায় একটু বসিল। অতি দ্রুতকণ্ঠে একটু পড়িয়া আবার উঠিল “যাই ভাই মতিদি, রাগ কোর না আমার বড় দরকারী কাজ আছে, কাল সকাল সকাল এসে তোমার সমস্তটা শুনিয়ে দিয়ে যাব।” অতি প্রথর বুদ্ধিমতী মতিয়ার বিহুর বিপন্ন অবস্থা বুকিতে বিলম্ব হইল না সে মুহুঃ হাসিয়া বিহুকে ছুটি দিল। বিহুকে বিদায় করিয়া দিয়া মতিয়া নিজে শুক হইয়া বসিয়া রহিল।



( ১০ )

চারু পুরী হইতে সপরিবারে স্বস্থানে কিরিয়া আসিয়াছে। বেলা দুই প্রহরে চারু স্নানান্তে আহায়ে বসিয়াছিল। ইন্দু তপ্ত দুধ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে করিতে কহিল “বউঠাকুর কি লিখেচেন গো?” “কি আর লিখবেন; পুঙ্খোর সময় তোমার নিয়ে বাড়ী যেতে লিখেচেন।” ইন্দু হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল “তা বেশ তো, চল না নিয়ে।” “বটে! রেণুর শরীরটা সবে মাত্র একটু সারতে আরম্ভ করেছে, এখন গায়ে গিয়ে যদি আবার খারাপ হয়?” “কিন্তু মা যে ওকে দেখতে চেয়েচেন।” চারু কহিল “তা কি-কোরে এখন হ’তে পারে, উপায় নেই।” ইন্দু অভিমানে মুখ আরক্ত করিয়া কহিল “তুমি পাঠাবে না তাই বল?” চারু মুখে তুগিয়া ইন্দুর মুখপানে চাহিয়া কহিল “ওঃ তুমি দেখুচি বাস্তব হয়ে উঠেচ যাবার জন্যে?” ইন্দু কহিল “উঠেচি তো! আমাকে রাখতে হলেই তোমার আর একটা কারোকে এনে রাখতে হবে। একা আমার ফেলে তুমি বেরিয়ে যাও, না-আছে আসবার ঠিক, না-আছে থাবার ঠিক, আমি পারি নে আর একা থাকতে।” অদূরে একটি মাদুরের উপর মল্লিকাশুভ্র দুর্লভাস্তি রেণু বসিয়া একটা কাকের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়াছিল। চারু স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তারার পানে চাহিয়া কহিল “আমার মাটিরটা থাকে কেমন কোরে?” ইন্দু হাসিয়া কহিল “হ্যাঁ উনি ত আরো তুখোর। আচ্ছা সে না হয় তোমার যা খুসী করো। আর একখানা চিঠি কার?” চারু অনামনস্তভাবে কহিল “দেবেন বাবুর।” “কি লিখেচেন?” “সে অনেক কথা” চারুর উৎকণ্ঠিত মুখ পানে চাহিয়া ইন্দু মুহূর্ত্তে কহিল “কোন খারাপ খবর?” চারু কহিল “খারাপ আর কি? দাদা গাঁ-গুজু দেনা কোরে কোরে ঋণ ক্রমশঃ বাড়িয়েই তুলছেন, তার মন্ত বড় ভরসা আমার এই চাকরী, কি যে আমি হাজারবারোশো রোজগার কচ্ছি তা তো বোঝেন না।” “ইন্দু কণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল “তিনিই লিখেচেন, এসব কথা?” চারু কহিল “হ্যাঁ তিনিই এসব শোধ করে দিতে চান, আর কি?” “তা মন্দ কি? তোমারই তো সে সব ও।” “হ্যাঁ, তিনিও তাই লিখেছেন। লিখেচেন গায়ে গিয়ে থাকতে কিন্তু এসব কি মুক্তিসম্মত কথা?” “নয় কেন? সে বিষয়সম্পত্তি তো পড়েই আছে, তোমার নিজের জিনিষ।”—চারুর মুখ কটিন হইয়া উঠিল “ছি, সে আমার জিনিষ কেন হ’তে যাবে, সে তাঁদেরই; আমি আর কিছু পারবো না কেবল সম্পত্তির কর্তা হ’তে যাব?” আহায়াস্তে পান মুখে পুরিয়া চারু রেণুকে লইয়া বসিল। রেণুতির থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা জানাইয়া পিতার উচ্ছিন্ন থালাটার প্রতি মতৃকনয়নে চাহিয়া বুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। সহসা মায়ের হাতে দুধ দেখিয়া সে অকস্মাৎ নিতান্ত শাস্ত হইয়া পিতার বুকের ভিতর গিয়া লুকাইল। ইন্দু সঙ্গস্যে চারুর হাতের ভিতর দিয়া রেণুর পিঠে হস্তার্শ্ব করিয়া কহিল “বড় যে লুকিয়ে আচ্ছিস, দুধ খেতে হবে না?” অত্যন্ত নিকটে একটা পত্রবিরল জিউলির গাছে একটি শূকর পাক্ষী মিষ্ট কণ্ঠে কহিল “খোকা খোক, খোকা খোক।” স্বানীন্দ্রী সকৌতুকে গাছটার পানে চাহিয়া হাসিল। ইন্দু হাসিতে হাসিতে কহিল “দূর হতভাগা, মাদুর কোরে দিবি তুই?” “এসে খাইকৈ দিয়ে যান এই দুধটুকু।” চারু সঙ্গস্যে কহিল “তা যাইহোক গলাটি মিটি।” গলাটি যে বাস্তবিকই মিষ্ট তাহা মনে মনে স্বীকার করিলেও ইন্দু কহিল “ছাই।” “ছাই বই কি? তা হলে এক্ষেত্রে তোমার কান দুটোই বিগড়ে গেছে বলতে হবে।” ইন্দু প্রোচ্ছন্ন হাসিতে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল “হবে না তো কি? তোমার কপাল যেমন কারু বা ঢোক নেই, আর কারুর বা কান নেই।” চারু কহিল “না তা নয় কান নেই, এমন কথা তো আমি বলি নি, বলেছি যে কান বিকৃত।” ইন্দু হাসিয়া কহিল “ও এক কথাই হল।” “হল

তো হ'ল।" বলিয়া চাকু বাহিরে চলিয়া গেল। ইহার পর আরো কয়েক বার ইন্দু বাড়ী যাইবার জন্য চাকুকে অনুরোধ করিল। কিন্তু অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদির অছিলায় চাকু তাহা কানেই তুলে নাই। অবশেষে ইন্দু যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিল তখন একদিন চাকু আসিয়া কহিল "চল ইন্দু বাড়ীই যাই।" ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি হল? হঠাৎ মন বদলে যাবার কারণ?" চাকু অনামনস্বভাবে কহিল "কি জানি বুঝতে পারচি নে যে! জ্ঞান হ'য়ে অবধি প্রতি বিজয়ায় মাকে প্রণাম কোরে আস্চি, তাই মা'ই হয় তো তলব ক'রছেন।" ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া কহিল "বেশ তো, আমিও যেতে পেলেই বাঁচি।" চাকু কহিল "বাঁচ? আচ্ছা এবার তোমায় রেখেই আসবো।" ইন্দু মুখ ফিরাইয়া কহিল "তা বৈ কি, তবে তুমি একাই যাও।" চাকু হাসিয়া কহিল "নাও যা গোছাবার সব শুছিয়ে নাও, সময় খুব বেশী পাওয়া যাবে না, আমি ছুটির চেষ্টায় যাই।"

( ১১ )

বিজয়ার শুভ মিলন রাত্রি। বালক বালিকা ও যুবকের দল পরম উৎসাহে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথা নত করিয়া মিষ্টমুখ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের পুলকোচ্ছ্বাসিত হাস্য ও উচ্চ গল্পে সারা পথ মুখরিত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের ধারে বসিয়া একজন পল্লীবালক বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিল :—

“উমা কেমন ছিলে হরের ঘরে ?

শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।

একদল যুবক উচ্চৈশ্বরে কহিল “দূর বোকা, বিজয়ার দিনে আগমনী গাইচিস্।” দূর হইতে বিসর্জনের সঙ্কল্প সহান-মন্ত্র শ্রুত নিম্নলিখিত জ্যোৎস্নাহাসিত গ্রামখানির বক্ষ কাঁপাইতেছিল। দেবেন্দ্র আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। মা ও মতিয়া তখন ঠাকুর ঘরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। তখনও আরতির দীপ নিভে নাই। মুক্ত দ্বারপথে আলোকোচ্ছল পুষ্পাভরণ-সাজিত বিগ্রহমূর্তি দেখা যাইতেছিল। মা কহিলেন “এখানে গুর সামনে আ-য় প্রণাম করলি দেবু, ঠুকেও কর।” দেবেন্দ্র যুক্তকরে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। মতিয়া উষ্ণিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া মাকে প্রশ্ন করিলেন “কি বোলে আশীর্বাদ ক'রতে হয় মা?” “বল জন্মায়তী হও।” “আর? ওকেতো বেঁচে থাকা বলা হল না।” “হ'ল বই কি। মেয়ে মানুষের স্বামীর কল্যাণই সব, তা নইলে আবার বেঁচে থাকা, আচ্ছা বল দাবিত্রী সমান হও।” মতিয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল “হয়েছে লাড়া হয়েছে।” দেবেন্দ্র সেই রাত্রেই কলিকাতা ফিরিবেন। মতিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বিজয়ার দিন স্বামী-প্রণাম করিতে না পাইলে তাহার বৌদিদি কাঁদিয়া, উপবাস করিয়া অনর্থ করিবে। সুতরাং দেবেন্দ্রকে যাইতেই হইবে। মতিয়া যখন ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া আনতমুখ-খানি শুঁজিয়া অকারণ অশ্রুপাত করিতেছিল তখন তাহার সেই চিরতমসাবৃত মনোমন্দিরে সেই দিনকার সেই ধাত্তারি প্রার্থনা করিতেছিল বুকি। মনে মনে বলিতেছিল আর কোন ত শক্তি আমার দাও নাই ঠাকুর—তা নাই বা দিলে ভগবান, কিন্তু প্রণাম করিবার শক্তি তো আছে, তবে আজকার এমন দিনে এ শোভাতুর কাঙ্গালচিত্তকে কেন এমন বঞ্চিত কর ঠাকুর।” বন্দনাশেষে মাথা তুলিতেও তাহার ভরসা হইতেছিল না। সেই কলিত স্বর্গের গোপন বাহ্য যদি নিঃশেষ হইয়া ফুয়াইয়া যায়। অনেকক্ষণ পরে মনের উচ্ছ্বাসিত

কোন্ডের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে পরে মতিয়া শাস্তভাবে মাথা তুলিয়া বসিল। সহসা অসহনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় লাফাইয়া উঠিয়া ক্রততালে নাচিয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষিত পদধ্বনি! প্রত্যক্ষ অন্তর্যামী বটে। বুড়ুর মত মতিয়া সামীর পদপ্রান্তে পুষ্পাজলি হইয়া লুটিয়া পড়িল। চারু সুগভীর বিষয়ে নির্বাক হইয়া কণেক চাটিয়া রহিল। মতিয়া অনেক দিনকার সঞ্চিত দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ বহুকষ্টে দমন করিয়া কহিল “আঃ আমিও তাই ভাবছিলাম।” চারু সর্বস্বই কহিল “কি ভাবছিলে?” মতিয়া মুছ হাসিল, প্রসন্ন-মুখে কহিল “সে হয়েছে, সার্থকই হ’য়ে গেছে। তুমি কবে এলে?” চারু সংশয়াকুলকণ্ঠে কহিল “কি সার্থক হয়ে গেছে আগে বল।” মতিয়া একটু কি ভাবিয়া মুছকণ্ঠে কহিল “কিছুই না, এই বিজয়ার প্রণামের কথা ভাবছিলাম তাই।” “কাকে? আমাকে প্রণামের কথা ভাবছিলে? কেন? তোমার আবাল্যের ঠাকুর দেবতায় আর মন ভরে না? মতিয়া নিঃশব্দে হাসিলমাত্র, কোনও উত্তর দিল না। চারু কহিল “আমি বাড়ী এসেছি, একথা তুমি জানতে না কি?” “না আমি তা কি কোরে জানবো, কেউ বলে নি তো।” “তবে তুমি আমার দেখতে—” মতিয়া বাধা দিয়া কহিল “দেখতে তো আমি পাই নে।” চারু অপ্রতিভ হইয়া কহিল “আমার প্রণাম করবার কথা ভেবেছিলে কেন?” এবারও মতিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিল না প্রসঙ্গান্তর চেষ্টায় কহিল “আর একটু আগে এলেই দাদার সঙ্গে দেখা হ’ত।” চারু কহিল “তিনি নেই বাড়ী?” “না তিনি এই একটু আগে বেড়িয়ে গেছেন, ক’লকাতা গেলেন।” “হ্যাঁ আমার আসতে রাত হয়ে গেল যে।” মতিয়া কহিল “রাত বুঝি অনেকটা হয়ে গেছে।” চারু বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল অমান-শুভ্র স্ফোৎসাময়ী রাত্রি। নীল-নির্মল আকাশে সমুদ্রগণীল শঙ্খতুষার দশমীর চন্দ্র। পাপিয়ার করণ মধুর স্বরলহরীতে দিগ্দিগন্ত প্রাবিত। মুছকণ্ঠে কহিল “তা হয়ে গেছে বই কি।” মতিয়া বাগ্র হইয়া কহিল “তোমায় যে ঠাণ্ডা লাগ’চে, এতখানি যেতে হবে আবার।” চারু কহিল “না বেশী ঠাণ্ডা লাগ’চে না; মা এলে তাঁকে প্রণাম কোরে যাই।” মতিয়ার সমস্ত ধমনীতে উৎকট শোণিত-স্রোত বহিয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছিল দুই হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্পর্শদ্বারা পরিপূর্ণরূপে স্বামীকে,—স্বতির সেই স্বর্গমুখকে, অন্তর ভরিয়া অমৃতভব করিয়া নেয়, কিন্তু স্বাভাবিক দ্বিধাভরে তাহা পারিল না। দুর্গোৎসবের অবশিষ্ট পদ্মরাশির মাঝে প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

( ১২ )

দেবেন্দ্র গ্রামে না থাকায় ও পূজার পরই চারুর ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া আসায় এবার চারুকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। গ্রামের পরিচিত আত্মীয়দিগের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ের অল্পতায় এবং বন্ধুদের সদাসমাগমে ইচ্ছাসংকটে সে আর একবার মতিয়াদের নিকট গিয়া বিদায় লইয়া আসিতে পারে নাই। সে যে চলিয়া গিয়াছে এ-সংবাদ মতিয়ার মাতা অবশ্য পাইয়াছিলেন কিন্তু মতিয়াকেও জানান বোধকরি আবশ্যক মনে করেন নাই। মতিয়া আশা করিয়া করিয়া তারপর হতাশ হইয়া সঠিক সংবাদ পাইবার জন্য মারের কাছে গেল। কিন্তু আর তো সে সেই মুক্ত হৃদয় শিশুটির মত উদার প্রাণের অধিকারী নাই তাই কি একটা প্রবল বেদনাকুষ্ঠিত সঙ্কোচে তাহার মুখ চাপিয়া ছিল একটা প্রশ্ন ও সে করিতে পারিল না। মনটা ভারাক্রান্ত ক্লিষ্ট বোধে নিজের এই অপ্রীতিকর ভাবনাচিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিজের বলিবার ঘরে গিয়া হাত বাড়াইয়া বসিবার একটা কিছু খুঁজিতেছিল। পাশেই খোলা জানালার সংলগ্ন কলস্তরা পেয়ারা গাছের তলার পাড়ার চাষাভ্রুদাদের ছেলেরা পেয়ারা পাড়িয়া খাইতেছিল।

শুক পত্রের মচমচ শব্দে এবং লুক্ক বালকদের কলকলারে মতিয়া সরিয়া আসিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। একটা বালক কহিল “দিদি ঠাকুরণ একটা পেয়ারা নেবে?” মাথা নড়িয়া অস্বীকার করিয়া সে জানালা ছাড়িয়া একটা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। হাত বাড়ি হাতেই খোলা অর্গাণটা পাইয়া সে আরো একটু সরিয়া বসিল। ‘মিষ্টান্নে আকৃষ্ট বালকদল একে একে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে বিহু আসিয়া হাসিয়া কহিল “বেশ সময়ে এসে পড়েছি মতিদি থামিয়ে না ভাই, একটা গুনিয়ে দাও” মতিয়া অলস মধ্যাহ্নের দুঃসহ স্তব্ধতার মাঝে এই রকম একটা সঙ্গীই খুঁজিতেছিল। হাসিয়া কহিল “কিন্তু আমার পছন্দ মত গান তো তোরা পছন্দ হয় না বিহু।” “না তা কি কোরে হবে ভাই তুমি যদি ধর ‘শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ’—তবে সেটাও আমি কেমন কোরে পছন্দ করি বধ তো?” মতিয়া হাসিল “তুই তাহ’লে কোন্টা পছন্দ করিস?” “আমি, তোমার ওইটের ঠিক পালটা পছন্দ করি:—

“স্বায় রে বসন্ত ও তোরা কিরণ মাথা পাখা তুলে।”

“তবে দে তোরা পছন্দ মতই একটা খুঁজে দে শীগগীর।” বিহু আলমারী হইতে “গান” খানা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠা হইতে দেখিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক নিঃশব্দে দেখিয়া কহিল “এমন একটা পছন্দ করি, যা তোমারও মনে লাগবে আর আমারও মনে লাগবে।” মতিয়া কহিল “আচ্ছা তাই।” বিহু কহিল “যদিও আমার হৃদয় ডয়ার বন্ধ রহে গো কভু।” মতিয়া বিরক্তি না করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল। মতিয়ার শিক্ষাশুঙ্ক দেবেত্রের সকল শিক্ষা হইতে এই বিন্দ্যার শিক্ষকতা মতিয়া সার্থক করিয়াছিল। মতিয়া ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল:—

“বাদ কোন দিন তোমার আস্থানে

সুপ্তি আমার চেতনা না মানে

বজ্র বেদনে জাগাও আমায়

ফিরিয়া যেও না প্রভু।

যদি কোনও দিন তোমার আসনে

অপর কারেও বসাই যতনে

চির দিবসের হে রাত্রি আমার

ফিরিয়া যেওনা কভু।”

মতিয়া থামিলে বিহু কহিল “আর একটা মতিদি, আর একটা।” মতিয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিল “আর পাচ্চিনে ভাই।” কিছুক্ষণ পরে বিহু মুহূর্ত্তে কহিল “হাঁফ ছাড়া চ’ল তোমার।” মতিয়া সহাস্যে কহিল “হ’ল” বিহু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল ওই ব্যয়গাটা তোমার খুব ভাল লাগে নয় মতিদি?” মতিয়া কহিল “কোন্খানটা?” বিহুর এই সামান্য প্রশ্নেই মতিয়া মনে মনে বিরত হইয়া উঠিয়াছিল। বিহু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল “জানিস বিহু, ওটা মানুষকে নিয়ে তৈরী নয়, ওটা ভগবানকে লক্ষ্য করেই লেখা।” বিহু প্রশ্নের গুরুত্ব কিছুমান্ত্রণ প্রশ্রয় না দিয়া কহিল “তা হ’লই বা, আমরা তো মানুষের চেয়ে ভগবানকেই বেশী ভালবাসি নে” “হুঁ, ভগবান না হলে মানুষ পেতে কোথা থেকে?” বিহু মুগ্ধকণ্ঠে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল “ঠাণ্ডা হও মতিদি, আমি নাস্তিকতা করছি নে, তোমার সঙ্গে শাস্ত্রের তর্কও করতে বসি নি, তুমি তোমার মনকে চাবুক মেরে মেরে

ছত্রিশ ছরোর বন্ধ কোরে ভগবান ভজাও গে—আমি বারণ কর্চি নে; কিন্তু আমার মনে হয় যারা নিজের শরি না বুঝে ভগবান বুঝতে যায়, তারা তাদের মনকে শুদ্ধর বদলে শুধু কষ্টই করে।” “তা হলে মানুষে ভগবানকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে না, এই তো বলচিস্?” বিহু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল “অন্ততঃ তুমি আমি ত নইই।” “তবে তুমি আমি সবচেয়ে ভাল বাসি কাকে?” বিহু মুখ নামাইয়া হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। “কণেক উত্তরে প্রত্যাশার নীরব থাকিয়া মতিয়া বিহুর নিকটে সরিয়া আসিল, কহিল “বিহু উত্তর দিচ্চিস্ নে যে!” “কি উত্তর দেব বল?” মতিয়া বিরক্ত হইয়া তিক্তস্বরে কহিল “বা জিজ্ঞাসা কর্ছি।” “ও কথার উত্তর মানুষ আপন আপনিই পেয়ে থাকে তুমিও তাই পাবে।”

( ১ )

মতিয়ার মনটা উদাস হইয়া গেল। গানবাজনা থামিয়া যাওয়ায় ঘরের ভিতর শিশুর দল অধৈর্য্য হইয়া কহিতেছিল “আর বাজাবে না?” সহসা নীলুর দ্রুতভাল চাটর শব্দে সকলেই চমকিয়া উঠিল। নীলুর মণীষ মুখে আরক্ত শিরাবহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু ছটীকে ভয় করিত না এমন বালক পাড়ার কেহ ছিল না। হরন্ত শিশুদেহ ছাওয়াইবার জন্য তাহাদের মাতার একমাত্র অবার্থ কৌশল নীলুর নামটী মাত্র। এ হেন নীলুর সশরীতে আবির্ভাবে দ্রুত শিশুর দল নিমেষে অন্তহিত হইল। অসময় নীলুর আগমনের হেতু নির্ণয়ে মতিয়াও উৎসুক হইয়া কান পাতিয়া রহিল। গৃহিণীর ঘরের সম্মুখের দ্বারে গিয়া নীলু ডাকিলেন “বোঠান্।” ঘরের মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া সত্বর মা একমুখ পানদোস্তা ঠাসিয়া পরম আরামে বিমাইতেছিল। নীলুর কণ্ঠস্বরে ধড়মড় করিয়া উঠি যকের নীচে গিয়া থানিকটা পানের পিক ফেলিয়া মুখ বিবর হালকা করিয়া লংগা কহিল “মঠান্ ঘুমি পেড়েছেন।” নীলু ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হস্তস্থিত টেলিগ্রাফের লেফাফার উপর দৃষ্টি করিয়া কহিলেন “একবার আগিয়ে দিতে পারিস্ সত্বর মা, বড় জরুরী কাজ আছে।” সত্বর মায়ের আস্থানে তদ্রাস্ত্রা গৃহিণী নীলুর হাতে দিকে চাহিয়া আশঙ্কায় বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করিলেন “ওকি ঠাকুরপো টেলিগ্রাফ? দেব ভাল আছে তো?” নীলু শশবাস্তে কহিলেন “সেকি ভাল আছেন বৈকি, এ অন্য কাজের কথা” এই সময় নীলুর শিঠের কাছে মতিয়া নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলু দ্বার ছাড়িয়া ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন। মতিয়াও মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। গৃহিণী কহিলেন বল ঠাকুরপো তোমার কি কাজের কথা,—টেলিগ্রাফ কে করেছে?” “বাবাজী করেচেন। বলিয়া তিনি টেলিগ্রাফের মস্মার্থ গৃহিণীকে শুনাইলেন। গৃহিণী কহিলেন “এই দেনার জন্যেই চাক চাকরী আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আমাদের জানায় নি। বিরজানাথ যে বেহিসাবী লোক তাতো আমরা বরাবরই শুনে আস্চি নীলু কহিলেন “তবে এখন আমাদের কি করা উচিত মনে করেন?” “দেবু টাকা দিতে বারণ করেছে?” “হঁ তাই বৈকি? বলিখেচেন না চাইলে দিও না” গৃহিণী একবার কন্যার পানে চাহিয়া কি ভাবিলেন তার প স্থিরকণ্ঠে কহিলেন “ওটা দেবুর চাকর ওপর অভিমানের কথা, সে যাই বলুক তুমি মোকদ্দমার দিন ওটাকাগুলো শোধ কোরে এস ঠাকুর পো” “আমায় যা বলেন তাই করবো, তবে বিরজাবাবুর এই সাহস দেখে অবাক হচ্চি তিন তিনবার লোকসান হয়ে গেল, তবু আবার সেই ব্যবসা। আর আগাগোড়াই তার দেনা” গৃহিণী স্নান হাফে কহিলেন “কপালের গেরো তাই এ দুর্ভিক্ষ। “আচ্ছা চাক-বাবার কি উচিত ছিল না যে বাবাজীকে একবারটা খবর দেওয়া?” “তাদের কি উচিত ছিল না-ছিল, তা দেখাবার ত সময় আর নেই, আমাদের যা উচিত তা করোগে, যদি মহাজন নিজে এসে আমাদের না জানাতেন তা হলে তো আমরা কিছুই জানতে পারতাম না” মতিয়া নিস্তক হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। নীলু চলিয়া গেলে সেমাকে কহিল “এ শুণো কি ধার মা, তোমরা শো

দ্বিচো ?” “আমরা আর কি দিচ্ছি মা, তাদেরই তো সব,—চারু বোঝে না তাই, তা বলে চারুর টাকা থাকতে বিরজার অপমান হয় এ কি কোরে দেখি ?” তারই তো সব, সত্যি তো সমস্তই তার। তবে কেন সে গ্রহণ করে না ? দূরে দূরে থাকে কেন ? সে কি কেবল এই বিড়ম্বিত অন্ধকার জীবনটুকুর ব্যবধান ? এই দুর্ভাগ্যই হইতে যেখানে বাহা কিছু পাওয়া যায়, সেইখান হইতে সে এড়াইয়া চলে—তবু তারি সব। এই গুরুভার বার্থ জীবনটাও পরতে পরতে ভারই। বহুক্ষণ মতিয়া নিশ্চেষ্টে শুক্ক হইয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে মায়ের আহ্বানে মায়ের কাছে গিয়া বসিল। তাহার স্বভাব-সঙ্কোচের উপর চিরদিনকার হাস্য-কোমল-স্নিগ্ধ মুখচ্ছবির ভাবান্তর, মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু তাহার চিন্তাধারা যে কোন অভিমুখী, তাহা তাহার মাও অনুভব করিতে পারিলেন না। মতিয়া নিঃশব্দে অব্যক্ত-বেদনা-ভারে নিবিড়ভাবে ডুবয়া রহিল।

মাসখানেক পরে স্নাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ফোঁটা নিতে দেবেন্দ্র বাড়ী আসিলেন। মতিয়া কহিল “তুমি আজ-কাল আর বাড়ীই আস না, যদি বা কালে-ভদ্রে আস তো সেই দিনই যাই যাই কর। সহান্ত্রে দেবেন্দ্র কহিলেন “শুধু শুধুই কি করি রে, আমার খোকত কাজ” “তুমি আজই কি চলে যাবে ?” দেবেন্দ্র স্নিগ্ধ-হাস্তে মতিয়ার মাথার হাত দিয়া কহিলেন “না আমি কাল যাবো। আমার সঙ্গে তুই যাবি কলিকাতায় ?” “আমি ? না। এখানকার ঘরবাড়ী বাগান পর্য্যন্ত আমি চিনি, একা বেড়িয়ে আসতে পারি, সেখানে তো তা হবে না।” “সেই জগুই তো তোকে আমি কোথাও নিয়ে যাই নে, কিন্তু আমার যে কাজ আমার এখানে যে একটা সপ্তাহ থাকবারও সময় নেই। অগচ্ তোদের ফেলে আমিই কি স্বস্তিতে থাকি ?” মতিয়ার ধারণা ছিল যে তার বৌদিদি অবিকল তার দাদারই অনুরূপা হইবেন। দাদারই মত তাহার কদ্বালোক-তামস চিন্তের সহিত একান্ত নিবিড় পরিচিত। অমন ঘনিষ্ঠ আপনার লোকেরও অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ লাভে যে সে বঞ্চিত, ইহা সে সকলের সহিত সমান নয় বলিয়া, অন্ধ বলিয়া। তাই ক্ষুব্ধ অভিমানে কহিল “আমাদের জগু তো তোমার ভারি অস্বস্তি। আচ্ছা, বৌদিকে আনতে তোমায় কতবার বলেছি, তুমি তবু তাঁকে আনো না, তার মানে আমি তাঁকে তো দেখতে পাব না ? আমি মরে গেলে হয় তো আসবেন কিন্তু—” মতিয়ার শিশুকণ্ঠ বাষ্পাচ্ছাদিত ধরিয়া আসিল। দেবেন্দ্র সম্মুখে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন “ওকি বল্ছিস রে, তখন এ বাড়ীটা কার হবে তা জানিস্ ?” “কার ?” “তাদের, চারুর।” মতিয়া একটু চমকিয়া ক্ষণেক নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল “যদি তাঁরা এখনই এ বাড়ী এসে থাকেন ?” “মন্দ কি ? সে তো খুব ভালই হয়।” “তাহলে তোমরা আর কেউ আসবে না ?” “কেন আসবো না, মা তো সর্বদাই তোকে দেখতে আসবেন।”

মতিয়া অকস্মাৎ শঙ্কিত আত্মকণ্ঠে কহিল “মা থাকবেন না ? আমি কার কাছে থাকবো ?” দেবেন্দ্র কহিলেন “কি পাগল ! কতকগুলো মিছে ভয় পাচ্ছিস, দেখা যাচ্ছে চারুর সে মতলবই নয়।” মতিয়া প্রত্যুত্তর মাত্র না করিয়া ভীতিব্যাকুল শিশুর মত মাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। দেবেন্দ্র কহিলেন “মাকে জড়িয়ে ধরলি ? হাঁগরে মতি, আমরা যদি না থাকি তো তুই কি চারুর কাছে থাকতে পারবি নে ? চারুকে তোর ভাল লাগে না ?” মতিয়া মুহু হাসিল। “হাসলি যে” মাতা এই পরনির্ভর অক্ষম সন্তানটাকে নিঃশব্দে টানিয়া প্রগাঢ় স্নেহে কহিলেন “এও আমার এক শান্তি ! প্রাণ, দেহ ত্যাগ করতে গিয়েও হা হা করে উঠবে যে, মা ছেড়ে যে থাকতে পারে না।” মতিয়া কহিল “মরণ অত নিষ্ঠুর নয় মা, আমার কাছে থেকে তোমায় সরাবে না।” দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন “তা মন্দ নয় তোমার কল্যাণে মা অমর হয়ে থাকুন।

( ১৪ )

সুখরমা সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর মুক্ত জানালা দিয়া মজ্জা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অষ্টমীর অপূর্ণ চন্দের  
 মূহুর্মি আসিয়া শুভ্র শয্যার উপর পড়িয়াছিল। গাছের অন্তরালে শিশুটাদের হাসিমাখা কনককাস্তি দেখা  
 যাইতেছিল। একটা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নারিকেলশীর্ষে বিরহ-বাকুল পাখিয়া সক্রপণ শ্রিয়তম আস্থানে দিগদিগন্ত  
 কাঁপাইতেছিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে শুইয়া চাকু নিঃশব্দে চক্ষু মুদ্রিয়াছিল। সম্মুখে ফুটন্ত হাসনাহানা  
 ফুলের মাদক-সুশ্বাসে চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইন্দু, রেণুকে ঘুম পাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া মুহূর্তে  
 চাকুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চাকু যেমন মুদিত চক্ষে শুইয়াছিল তেমন রহিল, বোধকরি ইন্দুর পদশব্দ সে  
 শুনিতেনই পায় নাই। ইন্দু চেয়ারের গায়ে হেলিয়া দীরে দীরে মাথা নামাইয়া চাকুর কপালের উপর নিজের কপাল  
 স্থাপন করিল। চাকু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বেঠন করিয়া ধরিতেই ইন্দু হাসিয়া উঠিল “আচ্ছা, যদি আমি না  
 হতাম?” চাকু চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া কহিল “আর আমিও যদি আমি না হতাম?” “আমি ত আর চোখ বন্ধ  
 করে ছিলাম না যে দেখতে পাব না” চাকু সহাস্যে কহিল “ওঃ চোখ ততো বন্ধ থাকলেই বুঝি—ইন্দু স্বামীর বাহু  
 বেঠন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আরক্ত মুখে কহিল “তা কেন? আমরা চোখ বুজেও মানুষ চিন্তে  
 পারি।” “আর আমরা পারি নে?” ইন্দু হাসিমুখে কহিল “তোমাদের কি বল, ইচ্ছে হ’ল চিন্তে, না হল নাই  
 চিন্তে, ইচ্ছে বই ত নয়।” চাকু কহিল “বটে!” “হ্যাঁ, তা নয় তো কি! তুমি ঘরে যাবে না?” উঠিয়া বসিয়া  
 চাকু কহিল “হ্যাঁ চল যাই শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না মনটাও নয়।” ইন্দু বাস্তব হইয়া কহিল “তাই এমন  
 করে চোখ বুজে গুয়েছিলে? ওঠো, ওঠো, বলচো শরীর ভাল নেই শেষটা অসুখ বিষুখ হ’য়ে পড়বে।” চাকু  
 উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। কহিল “তাই তো! অরই বুঝি হ’ল, দাদাও সংসারের দেনাপত্রের  
 গোলমালে আছেন, এই সময় অসুখ হয়ে পড়ে থাকলেই তো মৃদিল।” ইন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। চাকু  
 চিরদিনই সুস্থ সবল। ইন্দু বিবাহের পর একদিনের জন্যও চাকুকে সামান্য অসুস্থও দেখে নাই। চাকুর  
 অসুখ যে কি রকম হইবে তাহা ভাবিয়াই ইন্দু ভয়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সেই রাত্রেই চাকুর প্রবল অর  
 আসিল। কোন রকমে রাত্রি কাটাওয়াই ইন্দু ভয়ে আশঙ্কায় কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আশ্রয়স্বজন-  
 হীন প্রবাসে, বিশেষ সেই বাঙালীবিরল পশ্চিম দেশের পল্লীতে কেবলমাত্র দাসদাসী সহায়। হাঁসপাতালের  
 কম্পাউণ্ডার স্থানীয় যুবক বিখনাথ ও বুদ্ধ বাঙ্গালী প্রসন্নকুমার ইঁহারা দুইজন চাকুকে দেখিয়াশুনিয়া পরিচর্যায়  
 ভারগ্রহণ করিলেন। ইন্দু ইঁহাদের সম্মুখে স্বভাবমঞ্চোচে অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। চাকু প্রবল অরে  
 অর্দ্ধচৈতন্য হইয়াই থাকিত, তাহার মুখপানে চাহিয়া আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় ইন্দুর চোখে দিনের প্রথর আলোক ও  
 রাত্রের গাঢ় অন্ধকার এক হইয়া নেদিয়া-মুছিয়া গিয়াছে। যদিও বিপদে বিকল হওয়া অত্যন্ত দুর্বলের কাজ এবং  
 সেই দৌর্বল্য আবার সমধিক বিপদ ডাকিয়া আনে তথাপি ইন্দু একটুও সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। উপরন্তু  
 তাহার এই অদীরতায় অনিয়ম ঠাণ্ডা লাগিয়া রেণুরও সন্ধি হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর ইন্দু, চাকুকে বাতাস  
 করিতেছিল প্রসন্নকুমার চাকুর মাথায় আইসবাগ বন্ধ দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, রেণুকে তাহার দাসী খোজা গারে  
 লইয়া ঘুরিতেছিল জানালা দিয়া মাঝে দোঁখিয়া রেণু কাঁদিয়া উঠিল। প্রথমে ছ’ এক বার “মা মা” করিয়া  
 তারপর “বাবা বাবা” করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাকুর কানে সে ডাক গিয়া তাহার তন্ত্রার মোহ ভাঙিয়া গেল, সে  
 আরক্ত চক্ষু মেলিয়া ইন্দুর পানে চাহিল। বিখনাথ উঠিয়া পাখা লইল, কহিল “আপনি ওখর থেকে খুকীকে ঘুম  
 পাড়িয়ে আনুন” ইন্দু রেণুকে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। অত্যন্ত সন্ধিতে রেণুর কচি মুখখানি ফুলিয়া

উঠিয়াছিল। রেণুকে বকে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া অন্তর আশঙ্কায় সমস্ত বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। চাকর অরের বিরাম না দেখিয়া ইন্দু বিরজানাথকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল কিন্তু তিনি দেনা-দারের তাগাদায় ও মোকদ্দমায় উদ্ভাস্ত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ছ' এক জনের কাছে নিজের কিছু পাওনা ছিল তাহাদের নিকট আদায়ের জন্যও ঘুরিতেছিলেন, অবশেষে নীলুর মারফত টাকা পাইয়া দেনা মিটাইয়া তিনি যাকে লইয়া কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীতে স্রবোধ ছিল টেলিগ্রাফ তাহারই হস্তগত হইল। সে টেলিগ্রাফের উত্তর দিয়া নিজের যাত্রার জন্য আফিসে ছুটি প্রার্থনা করিতে গেল। রেণুকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে বিশ্বনাথ তাহাকে টেলিগ্রাফের উত্তর বাহা আসিয়াছিল তাহা জানাইল। ইন্দু যেন কতকটা আশা পাইল।

( ১৫ )

স্রবোধকে পাইয়া ইন্দুর উদ্বেগ অনেকটা লঘুতর হইয়া গিয়াছিল। তার কারণ স্রবোধ বুঝাইয়া প্রবোধ দিয়া তাহাকে অনেক সুস্থ রাখিত। রোগী সম্বন্ধে তাহার নিজের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প। প্রায় এগার দিন অরের প্রকোপে অচেতন থাকিয়া চাকর দুই দিন মাত্র জ্ঞান হইয়াছিল। সে চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে স্রবোধের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। অর তখন খুব অসুস্থ ছিল, ছাড়িয়া যাইবে আশা করিয়া স্রবোধ ও ইন্দু দুই জনের মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়াছিল। চাকর স্রবোধকে সেই দেনা, মোকদ্দমা ইত্যাদির বিষয় প্রশ্ন করিতেছিল। স্রবোধ কহিল “সে টাকার কথা শিবু সেন নিজেই গিয়ে শিরোমণি বাড়ী বলে এসেছিল তাঁরাই মিটিয়ে দিয়েছেন।” চাকর অপ্রসন্ন মুখে ক্ষণেক নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল “তাঁরা দাদাকে কিছু বলেছিলেন?” “না, দাদার সঙ্গে তাঁদের দেখাই হয় নি।” “দাদা পশ্চিমে গেলেন কবে?” “সেই মোকদ্দমা মিটে গেলেই।” “দাদা আমার কোনও খবরই জানান নি কেন?” স্রবোধ হাসিয়া কহিল “তুমি ত দাদাকে জান, তা ছাড়া দাদা খবর দিলেও তুমি হয় তো তা পাও নি।” ইন্দু কহিল “ওই তো এক বোঝা চিঠিপত্র পড়ে আছে কতকাল খোলাই হয় নি।” চাকর কহিল “নিয়ে এস এদিকে স্রবোধ পড়ে শোনাক।” স্রবোধ কহিল “আজ থাক্ আর দুদিন থাক্ তার পর শুনো।” চাকর বাগ্ন হইয়া কহিল “তুই পড়, আমি শুনি, তাতে আর আমার কোনও কষ্ট হবে না।” ইন্দু ডাকের চিঠি কয়খানা বাছিয়া আনিল। তিন চারিখানি পত্র দেবেদ্বের ও তাঁহার মাতার ছিল। তাহার চাকর কোন সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়াছেন। কার্ডে শিরোমণিগৃহিণী নীলুকে দিয়া লিখাইয়াছেন “তোমার শারীরিক সুস্থ সংবাদ যত শীঘ্র সম্ভব জানাইয়া আমাদের নিরুদ্বেগ করিও। নতি পর্যন্ত তোমার অসুস্থতার অবস্থা অনুমান করিতেছে,—অকারণ মনশ্চঞ্চলতার জন্য আমরা তোমারই জন্য চিন্তিত আছি। সমস্ত সংবাদ দিবে, ইত্যাদি। কার্ডখানি চাকর নিজেই পড়িয়াছিল এবং সেই প্রাতিষ্ঠিতে অবসর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে স্রবোধ ঐষ খাওয়াইবার জন্য তাহার মাথায় হাত দিতেই সে মহস্মা প্রাপ্ত করিল “দিলি টেলিগ্রাফ করে?” বিস্মিত স্রবোধ কহিল “কোথায়?” “কোথায় আবার!” বলিয়া চাকর ধমকিয়া উঠিল। স্রবোধ কহিল “কি লিখ্বে?” “লিখে দে খবর ভাল, অনর্থক তাদের ভাবনার দরকার কি?” স্রবোধ আর কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু স্রবোধ ও ইন্দু বাহা আশা করিয়াছিল তাহা হইল না। চাকর অর আবার বাড়িয়া উঠিল এই অর তাহার দেড়মাস পরে ছাড়িল। চাকর পথ্য পাইয়া যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল তখন বিরজানাথ সংবাদ পাইয়া আসিলেন। চাকর অল্পমাত্র সুস্থ হইবার পরই ছয়মাসের ছুটি লইয়া তাহার গ্রামে আসিতেই হইল। কারণ



বিদেশে সকলে থাকিলে চলে না। সুবোধ অনেক চেষ্টায় দুইমাসের ছুটি পাইয়াছিল, তারপর বাধ্য হইয়া তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে। এত কথা ছাড়িয়া দিলেও তখন সংসার ও রোগীর খরচ চালাইবার মত আর্থিক সাচ্ছল্যও ছিল না। চাকুরী কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবার ইচ্ছা বিরজানাত্ধের ছিল। কিন্তু টাকার কথা তুলিয়া চাকুরী তাহাকে নিরস্ত করিল। তিনি ক্ষুব্ধ মনে অগত্য সকলকে লইয়া গ্রামেই ফিরিলেন। চাকুরী তখনো অত্যন্ত দুর্বল ছিল। বাড়ী ফিরিয়াও সে শয্যার আশ্রয়ে থাকিয়া দিন কাটাইত।

( ১৬ )

বেলা দশটার সময় চাকুরী একাকী বিছানায় শুইয়াছিল। নিকটে রেণু বসিয়া খেলিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে পিতার আদর চুম্বনে বিভ্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরটা অগুপ্ত ও বাহিরের মধ্যবর্তী। বাহির হইতে প্রবেশদ্বার আছে এবং ভিতর দিকেরও দ্বার আছে, বন্ধুরা সাফাং করিতে আসে সেজন্য ভিতর দিকে দ্বারে পরদা দেওয়া আছে। সুবোধ বা বিরজানাত্ধ কেহই বাড়ী ছিলেন না, চাকুরী মুক্ত জ্ঞানালা দিয়া চাওয়া চাহিয়া জনবিরল পল্লীপথে দেখিতেছিল। পথের পাশে গোটাকয়েক ছাগল শীতের মিষ্ট রোদ্ধ উপভোগ করিতে করিতে পরম আরামে কাটালের পাতা চর্বণ করিতেছিল। ছ'একটা থল্লন পাখী পুষ্প দোলাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। কামারদের গৌরী তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে ও কোঁচড়ে মুড়ী লইয়া ক্রন্দনরত ভাইকে শাস্ত করিবার জন্য একটা গোবৎসের গায়ে হাত বুলাইতে গিয়া সহসা তাহার নির্দোষ মাতার শিং সমেত মৃতক আন্দোলন দেখিয়া সত্ৰাসে পলায়ন করিতেছিল। অনতিদূরে কেমার কৈবর্তর বাড়ীর সম্মুখের ভেরেঙা ঘেরা স্থানটুকু কচি সরিষার গাছ ইন্দ্ৰিয়ক্ষেত্রে পরিণত। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চাকুরী শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল এবং বালিশের পাশেই যে অসমাপ্ত বইখানি ছিল তাহাতেই মন দিল। ক্ষণকাল পরে জুতার শব্দে চক্ষু ফিরাইয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ এই সময়ে দেবেজের আগমন প্রত্যাশা সে একেবারেই করে নাই। এবং দেবেজের সঙ্গে সঙ্গে মতিয়াকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল কিন্তু কোনও অভ্যর্থনা করিবার পূর্বেই রেণুকে কোলে তুলিয়া দেবেজ মতিয়ার কোলে দিলেন, মতিয়া তাহাকে অত্যন্ত তৃপ্তিভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল। একটা ঘেরাটোপ আবৃত সিন্ধুকের উপর মতিয়াকে বসাইয়া দেবেজ চাকুরীর নিকট আসিয়া বসিলেন; চাকুরী কোন কথা বলিবার পূর্বেই কহিলেন “তোমার অসুখ হয়েছিল শুনলাম কিন্তু তুমি আমাদের তো কোনও সংবাদ দাও নি? আমরা কত চিঠি দিয়ে চ তার জবাবই দাও নি, কিন্তু আপন আপন মঙ্গল অমঙ্গল মাহুষের মনই জানতে পারে।” চাকুরী অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিল “আমার অসুখ আমি নিজে প্রথমটা সিরিয়াস্ বলে মনে করি নি” “তা আমি সবই শুনলাম অবশ্য তোমার এখানে আসার পর শুনেছি; ডঃখিত হলাম চাকুরী, যে তুমি আমাদের একটুও প্রশ্রয় দিতে চাও না।” চাকুরী কুণ্ঠিত-সঙ্কোচে অধোমুখে কহিল “না হোক আপনাদেরও কষ্ট দেওয়া হ'ত উদ্ভিগ্ন হয়ে থাকতেন, এখানে এলে ভেবেছিলাম একদিন গিয়ে,— দেবেজ সঙ্কোচে কহিলেন “শরীরটায়? শরীরটায় আর আছে কি? উঃ কি ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে চাকুরী দেখলেও —” মতিয়ার ভয়াবহ বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া দেবেজ কথাটা চাপিয়া গেলেন। পরদার ভিতর ‘দকে বাড়ীর মেয়েরা অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে পরদা একটু সরাইয়া দেখিতেছিলেন। দেবেজ চাওয়া দেখিলেন, কহিলেন “আমার বোনটী ত তার স্বপ্নর বাড়ী এসেচে, তা ওকে একবার বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাবেন নাকি কেউ?” চাকুরী নতমুখে কহিল “যদি ইচ্ছা করেন” মতিয়া ত্রস্তপদে আসিয়া দেবেজের পাশে চাকুরীর পদতলে বসিয়া পড়িয়া কহিল “না দাদা।” দেবেজ মলিনহাস্যে কহিলেন “কেন এলি তবে?” বিরজানাত্ধ ঘরে ঢুকিতে গিয়া ধমকিয়া

পড়িলেন। দেবেন্দ্র উঠিয়া প্রণাম করিতেই তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন “এস এস একটু বসো।” দেবেন্দ্র উত্তীর্ণ পায় মধ্যাহ্ন দেখিয়া মৃত আগন্তু করিলেন কিন্তু বিরজানাথ তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। মতিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অচল হইয়া চাকুর পদতলে বসিয়াছিল, চাকু সসঙ্কোচে পা টানিতে গেলে মতিয়া ব্যগ্র আগ্রহ ভরে তাহা চাপিয়া ধরিল। চাকু কোমলকণ্ঠে কহিল “কেন তুমি কষ্ট করে এলে? একটু সারলে আমি নিজেই যেতাম।” মতিয়া ক্ষণেক নিঃশব্দে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, পরে উচ্ছ্বসিত আর্জ কণ্ঠে কহিল “আমি কাণা বলে তুমি মনে কর যে আমি আর একটা মানুষ নই?” চাকু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ অভিযোগ তাহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ইহাকে নিশা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার নিজের শত ব্যবহার এই কথাই প্রমাণ স্বরূপ। আর বাস্তবিকই এত দেবোৎসর্গ শুদ্ধ হৃদয় মন্দের প্রতিমার মত নারীটিকে সে স্বীকরণে মনে মনে কোন দিনই মানাইতে পারে নাই। শিশিবিশুদ্ধ কামিনী ফুলটির মত একান্ত স্পর্শ-অসহিষ্ণু এই সুনির্মল সুপবিত্র ফুলটিকে সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে সত্য তবু ইহাকে নিজের উপভোগ্য ভাবিতে পারে নাই। এই রকমই কি যেন একটা গুঢ় আভাস একদিন মনের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি দিয়াছিল। সে দিন সে অত্যাগ্রে আত্মগম্বীতে উদ্ভূত হইয়া উইহাতে তাহার নিজস্ব দন ইন্দ্রকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বেঁচিয়াছিল। চাকুর মনে পড়িল গত বিজয়ার দিনও সে মতিয়ার এই অভিনব ভাবেচ্ছাস দেখিয়াছিল, কিন্তু যাহার চক্ষে দৃষ্টি নাই, কটাক্ষ নাই, নব ভাবের উন্মেষ-আলোক যার নেত্রের উপর খেলিয়া যায় না, চক্ষুযানের নিকট তাহার তিমিরচ্ছন্ন হৃদয়গুহানিহিত চৈতন্যস্রোত অল্পমাত্র নাই। তাই চাকু এখন বুঝিতে পারে নাহি চেষ্টাও করে নাই। এবং যদিও বুঝিত তথাপি মতিয়ার ঐশ্বর্যের অবলম্বনে থাকা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র সম্ভব ছিল না। মতিয়ার প্রতি জীব উপযুক্ত কর্তব্য পালনও তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ইহার মনে ব্যথা দিবার প্রবৃত্তিও তাহার কোন দিনই হয় নাই। মতিয়ার অস্তিত্বকণ্ঠে বাধিত হইয়া চাকু স্নিককণ্ঠে কহিল “একথা বল্চো কেন? আমি তোমার মানুষ মনে করি বা না করি এ নিয়ে বিচলিত হওয়া তোমার স্বভাব নয়। তা’ছাড়া আমি তোমায় মানুষের জন্যে ঠোঁট মানুষ মনে করি নে সত্যে,—অমলিন নিম্মাগোর ফুলের মত মনে করি।” মতিয়া মনে মনে কহিল “এই আমার বংশেষ শাস্ত্রনা” কিন্তু অন্তরে প্রকাশ করিবার মত অপরিণাম ভাষাও সে জানিত না। নত হইয়া বর্মীর পায়ে উপর মস্তক স্থাপন করিল। অস্থিকঠিন পায়ের স্পর্শে তাহার মনে হইল সে হাত বুলাইয়া দেখবে তাহার পানী কতখানি রোগ্য হইয়া গিয়াছেন। যে স্রাণ তাহার জীবন মরুতে মন্দাকিনী হইয়া আছে, দক্ষ বনে সুরভি দেবসম্পদ মন্দার তুল্য হইয়া আছে তাহা শুধু কি সরস সে কি চিনিতে পারিবে না? মতিয়া তাহার সুকোমল পদসম্মেলনের মত হাতপানি লঘুগতিকে চাকুর সমস্ত গায়ে বুলাইয়া দেখিতেছিল। চাকু ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া কহিল “কি করচো?” মতিয়া হাত সরাইয়া মুহুর্তে কহিল “কিছু না” চাকুর মনে পড়িল একদিন এই নারীই তাহার হস্ত স্পর্শে সর্পাঘাতের মত শিহরণ উঠিয়াছিল। অসাম মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমার আকাশ-বক্ষস্থ অদৃশ্য সুধাকরের অতি স্নান জ্যোৎস্নালোকের মত আজ সে জাগ্রতা,—প্রকৃতির অব্যর্থ প্রভাবে সদা স্রোতোথিত প্রাণ তাহার ক্ষুধিত তৃপ্ত! উভয়ের মৌনভাবে অস্তিত্ব হইয়া রেণু “মা যা” করিয়া ডাকিতেই ইন্দু পরদা সরাইয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মাত্র স্বামীস্বধূপানে চাহিয়া চাকুর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া ইন্দু মুহুর্তে কহিল “বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাই” চাকু তেমনি মুহুর্তে কহিল “না দরকার নেই।” ইন্দুর কণ্ঠস্বরে মতিয়া অকারণ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া চাকুর চোকের উপর মাথা গুঁজিয়া কক্ষতলে মস্তক সিমেন্টের উপর বসিয়া পড়িল।

( ১৭ )

মাস তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্রের অব্যবহিত এলোমেলো বাতাসে গ্রামের মেটে রাস্তার উপরকার গরুর গাড়ীর চাকা ঘর্ষণে ধূলা রাশি উড়িয়া উড়িয়া গাঢ় হরিষ্রণ গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত ধূলধূসরিত। ঘোড়ানিম, সাজনার ফুল, আত্র মুকুলের অকালপতনে ৫ বৃ চূত শুষ্ক পত্র চারদিকে আবর্জনা হইয়া পড়িতেছে। বাতাবী নেনুর ফুলের মাদক সুবাসে পল্লীপথ, গৃহস্থের আশ্রয় স্তম্ভিত। বসন্তের উদ্দাম বাতাসের দৌরাডো অগ্নিভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী সম্মত। বিন্দুনাথ অগ্নিকুলিঙ্গের ভয়ে গেলোয় আর সাকাল দেওয়া হয় না। রামনবমীর উপবাস করিয়া মতিয়া ও তাহার মাতা বসিয়া কলা শুনিতেছিলেন। মতিয়ার মায়ের ইচ্ছা ছিল না যে মতিয়াও উপবাস করে কিন্তু মতিয়া মায়ের উপবাস তিনিয়া জেদ করিয়াই উপবাস করিয়াছিল। পুরোহিত যখন কথা শুনাইতে বসিয়া দশরথোক্ত আত্মজি কাব্য বলিতেছেন—

“অদ্য মে সফলং জয়া অদ্য মে সফলং বিয়া”

সেই সময় বিণু আসিয়া দাঁড়াইল। কথা শেষে পুরোহিত বিন্দর গ্রহণ করিলে বিণু কহিল “মতিদিও উপোস করেচে নাকি?” মতিয়া কহিল “এবার করলাম” বিণু সমাসে কহিল “তুমি মরে আর মানুষ হয়ে জন্মাবে না, আমার কি কোন ব্রত নিয়ম করতে দেবে না।” মতিয়া কহিল “কে দায় না রে? তুই কখনই পারিস?” বিণু স্তম্ভ হানিয়া কহিল “অধুমতি না পেলে ব্রত সিদ্ধ হয় না যে, তা জান হো?” মতিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল “সিদ্ধ হয় না? কে বল্লে আমি তো করলাম, আমারটাও অসিদ্ধ হ’ল তবে?” বিণু একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল “আমি কি অত জানি, তবে তাই ত শুনি।” মতিয়ার মনে কিছু বিণুর সামান্য কথা কয়টাই তড়িত-যেধার মত স্পর্শ করিল। সে অসুস্থ বলাইক এক প্রবল এক বিবাহ। এই শৃঙ্খলের আকর্ষণ কত মধুর কত তীব্র! কোন্ সুদূরের ছুটি পুষ্প প্রাণী এই গ্রন্থিতে কি নির্বিড়ভ বেষ্ট না মিলিয়া যায়? বিণু মতিয়াকে নী ব দেখিয়া কহিল “কি ভাবচো মতিদি, আমার কথায় রাগ হ’ল নাকি?” মতিয়া স্নান হাসো কহিল “না রে তোরা সব দেখিস্ শুনিস্, তোদের কথায় কি আমার রাগ হয়?” “বৎ কিছু শিখাই পাঠ” “কই কি ভাব্জি, কিছুই ত ভাব্জেনে” “ভাব্জো নই কি নিচয় ভাব্জো কিন্তু তা বশে ভগবানকে ভাব্জো না তুমি—তা আমি বলতে পারি। একজন দামী আসিয়া কহিল “বরে গিয়ে বসো দিদিমণি, মাতান্ ডেকেন” মতিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল “না কি খেবার ঘরে নাকি?” দামী জানাইল “হ্যা, তাঁর শরীর পারাপ হইতে তিনি ডরই পরেচেন” মতিয়া জুগুপসে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল। মায়ের পাশে বসিয়া হাত বাড়িয়া মায়ের দেহস্পর্শ করিয়া কহিল “কি হয়েচে মা?” তাহার করুণকণ্ঠে সত্যকিত হইয়া মা গুটি হাত ভাঙার সুখপানি বুকের উপর তানিয়া গইয়া মদিন হাসো কহিলেন “এই দেখ, ভয় পেলি? কি হয়েচে আমার! কিছুই ত ভেবন হয়নি।” “কহনি ভো কি মা তোমার গা যে খুব গরম, নীলু কাকাকে ডেকে বল না মা, ডাকার ডাকতে।” নিজে ভাবনা করিয়া শুক্লর না বুঝিলেও মতিয়ার মাতার অর প্রবল হইয়া উঠিল। সন্তানদন ও সারা রাত্রির অরে শেষ রাত্রে তিনি অচেতন্য হইয়া পড়িলেন। বিন্দু মতিয়ার সফল মা ডাকের শব্দ উত্তরও আর পাওয়া গেল না অতরাং মতিয়া উৎকণ্ঠায় ভয়ে ফল প্রায় হইয়া উঠিল।

( ১৮ )

দেবেজ এই সময়ে একজন পুরাতন সন্ন্যাস মন্ডনের অঙ্গনে এসাভাবাদ গিয়াছিলেন। স্তত্রাং মায়ের শীড়ার সংবাদ তাঁহার নিকট যথা সময়ে শোঁছিতে পারিল না। নীলু সর্বপ্রায় চারুকেই সংবাদ দিয়াছিলেন।

চারু আসিয়া দেখিল রোগীর স্বাভাবিক দুর্বল শরীরে জ্বরের তাড়না অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বল হৃদয়ের অতি দুর্লভ স্পন্দন সহসা থামিয়া বাওয়ার অত্যধিক সম্ভাবনা। মতিয়া আশঙ্কায় ম্লান মুখের উপর আশায় দীপ্তি লইয়া সাগ্রহে কহিল “মা সেরে যাবেন নয় ? চারু আশা দিয়া কহিল “হ্যাঁ, সেরে যাবেন বই কি শিগগীরই সেরে উঠুন।” তিন চার দিন হইয়া গেল, রোগের বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। মতিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া শুকমুখে তাহার যতদূর শক্তি মায়ের সেবা করিতেছিল। কিন্তু সে দৃষ্টিহীন, শুষ্ক কণ্ঠে তৃপ্তি পাইবার উপায় তো তাহার ছিল না। কেত উদয় চাকিয়া তাহার হাতে দিলে তবে সে মাকে খাওয়াইতে পারে। কিন্তু চৈতন্যহীন রোগীকে ঔষধপত্রা দেওয়া সহজসাধ্য নহে স্বতরাং চারু তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিত না। চারু তথাপি মতিয়ার অক্লান্ত প্রত্নিত পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তাহার শক্তি বাথাতুর ম্লান মুখ দেখিয়া চারুও বেদনা অনুভব করিতেছিল। উত্তর পায় না তবুও অশ্রুসিক্ত ভগ্নকণ্ঠে ঘুরিয়া ফিরিয়া ডাকে “মা, মাগো” মতিয়া জানিত কতদিন তাহার আর্জ্যকণ্ঠে মাতার প্রগাঢ় স্তুতি চকিতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেই মা যে আজ তাহার বুক ফাটা আফ্রানে প্রভাতের মাত্র দেন না, এ বাথা যে কি অসহনীয় তাহা সেই অনুভব করিতেছিল। এমনি করিয়া পাঁচদিন কাটিয়া গেল। সর্বলোকবিদিত কথা যে নিশাণের পূর্বে প্রদীপ হাসিয়া উঠে। সব স্থানই ইহা অনাস্থ্যরূপে ফলিয়া যায় কি না তাহা কে জানে ? এই পাঁচদিন পরে মায়ের ক্রীণ কণ্ঠের শুনিয়া মতিয়ার মুখ হর্ষোচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল। নিশাণে প্রভাতের মত তাহার সকল আশঙ্কা নিমিষে ঘুচিয়া গেল। সর্বপথ্য জ্ঞানদাতার পর না তাহার, তাহাকেই বুকে টানিয়া চুষন করিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত মুখ দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছে “হয় তো অভাগী কিছু থায় নাহ। কোন্টো কোন্টো নিমিষ, কোন্টো ত তার ভাতের কাছে, কোন্টো তাহার কোলের কাছে, এ কথা মা না বলিয়া দিলে অফ্রানে মতিয়ার খাওয়া হইত না। মা সন্মুখে কন্যার মাথার ছাত দিয়া প্রণী করিতেছিলেন। চারু প্রশস্ত কণ্ঠের অন্য এক কোণে ইন্দি চেয়ারে বসিয়া একখানি বিকস্মাদময় পুস্তক পড়িতেছিল। ছোট কদম্ব নাই স্বতরাং কাঁজের অভাবে এই বইগুলি তাব সদল ছিল। এই মতিয়া সে ঘড়ির দিকে চাফিচা গোয় চারিটা। পশ্চিমের নুত জালালা দিয়া সুদূর পশ্চিমাংশে লোহিত সমুদ্র দেখে যাইতেছিল। স্বপ্নাত্তের বজ্রিৎ রশ্মি ঘরখানার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমার আফ্রানে চারু নিকট হইলে তিনি নিজে। পথ পথ দেখাইয়া কহিলেন “গোদ বাবা ছোটো কথা বলি।” চারু আর একটা চেয়ার বিজ্ঞানের নিকটে টানিয়া আনিয়া বসিল, কহিল “কিন্তু কথা বলতে এখন কষ্ট হবে আপনাব।” শুক মুখ মুচ হাসো কহিলেন “না না হবে না, কিন্তু বাবা তুমি অল্পখ থেকে উঠেছ নাহ, কেন এখন এখন পরিশ্রম ক’রো ? অন্য ডাক্তার আনলেই পারতে—চারু কহিল “তার জন্যে আপনি বাস্ত হবেন না—” “না বাবা বাস্ত হবার যে কত কারণই হইবে আশার, সন্তিতে হবার মত ভাগ্য করে ত আমি ন” রোগপুত্র মুখ জন্তুসদমার দ্বিঃ পেণায় রেণায় হুঁটয়া উঠিল। চারু কহিল “কষ্ট হচে আপনার। বজ্রাম তো যে আপনি এখনো সকল কথা বজ্রার চোঁ ক’র’ব না।” ফলেক নীরব থাকিয়া একটা রুদ্ধ শ্বাস প্রবল জোরে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ডাকিলেন “মতি,—মতি” চারু কহিল “এই যে আপনার পাশেই, ফিরে চেয়ে দেখুন—” “আমি ? আমি আর কি দেখবো বাবা, আমার দেখা শেষ হয়ে গেল চারু, এখন থেকে তুমিই দেখ বাবা,—আমার কৃতার্থ করে, শান্তিতে ছুঁছু বজ্রতে দাও।” মায়ের বিগলিত-কণ্ঠ শুনিয়া মতিয়া হুঁহাতে মায়ের কণ্ঠ বেটন করিয়া ডাকিল “মা” চারু অত্যন্ত বাস্ত হইয়া কহিল “ওকি ওর বে কষ্ট হবে” মাতা হুঁহাতে কন্যার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন “জড়িয়ে ধ’রস ! হায় হতভাগী, তুই ধরে রাখতে চাস ? কিন্তু আর আমার কেন

মা ?” বলিয়া নিজের শীর্ণ হাত দিয়া চারুর হাতের উপর তিনি মতিয়ার হাত দুখানি অর্পণ করিয়া কহিলেন “জড়িয়ে ধরু মতি,—একেই জড়িয়ে ধরু, আমার নিরুতি দে, ম’রতে দে।—ওকি শুধুই বুঝি কাঁদচিস্ ?” দুই হাতে অব্যাহত অশ্রুশ্রবণ মুছিতে মুছিতে মতিয়া কহিল “তুমি কি সব বলচো যে মা” “কি বলচি মা, এই যথার্থ কথা বলচি, আবার তুইও আস্বে ওকি মা আবার কান্না কেন ?” উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে কহিল “কার কাছে থাকবো মা আমি ?” মা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিল “চারুর কাছে। চিরকাল কি মা বাপের কাছে কেউ থাকে ?” মতিয়া কাঁদিয়া কহিল “আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতেও পারবো না, এটা থাকতেও যে পারবো না মা” কন্যার অশ্রুসিক্ত মুখপানে অপলক নেত্রে ফণকাল চাহিয়া চাহিয়া অবসাদক্লিষ্ট চক্ষু তিনি মুদিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া ব্যথিতা কন্যার লুক্কিত মস্তকের উপর স্নেহাশীর্ষাদভরা হাতখানি রাখিয়া তিনি কহিলেন “আশীর্বাদ করি মা আমার এ চৌদপুরুষের ভিতরে যেন তুই আলোর বেগাড রেখে সার্থক হ’তে পারিস্।” মতিয়া এ আশীর্বাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, উঠিয়া বসিয়া কহিল “আমিও তো মরে যাব মা।” ইহার পরই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে গুরু মুখে দেবেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এলাচাবাদু হইতে ফিরিয়াই টেলিগ্রাফ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। দেবেন্দ্র যে কলিকাতায় ছিলেন না চারু এ সংবাদ জানিত না এ জন্য সে কলিকাতার ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। অতি প্রত্যয়ে, তখনো উষার রক্তিমভাস ভাস করিয়া জাগে নাই। পূর্ব দিগন্তে কেবল স্নিগ্ধকোমল পিঙ্গলচ্ছটা তরল মেঘস্তরের অভ্যন্তরে দেখা যাইতেছিল। সুদূর কোন পল্লী হইতে সদাজাগ্রত কুকুরের রব মাত্র শুনা যাইতেছিল। নীল, চারু ধরাধর করিয়া ভূগঙ্গী বেদী মূলে মুক্তাছারালগ্ন দেহ নামাইলেন। মায়ের বুক হইতে যখন তাহাকে সরাইয়া মাকে স্থানান্তরিত করা হইল তখন মতিয়া বুকিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

( ১৯ )

প্রাক চুকিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্র একরাত্রি বাতীত সে বাড়ীতে থাকেন নাই। মতিয়ার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্যই বোধ হয় তিনি সরিয়া গিয়াছিলেন। মতিয়াও ঠাঁহাকে থাকিবার জন্য অমুরোধ করিল না। অতি আঘাতে তাহার অন্তর যেন পাষাণে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তার আর জাগ্রত চেতনার স্পন্দন যেন কিছুমাত্রই ছিল না। আজ তাহার মা নাই, তাহার দাদা নাই; বাড়ীতে উৎসবের মত কল্মকোলাহল কিন্তু কেহ তাহার আপনার নাই। সে এ হতেও একটুও চঞ্চল নহে। সকালে উঠিয়া যেখানে বসে সারাদিন প্রাপ্ত প্রতিমার মত শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া নিষ্পন্দ নীরবে সেই একাসনেই কাটাইয়া দেয়। তাহার এই স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া চারু এইবার নিজের আগের সঙ্কট বুকিল। এই অসহায় অন্ধ তরুনীকে একাকী রাখিয়া যাওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সম্ভব নহে, কিন্তু ইহারই পৈত্রিক বিষয় বৈভবে ইহার সপত্নী প্রতিপালন,—তাহাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? কি করা যে কর্তব্য তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহার নিজের মা এই সময়ে দেহান্তে শিবলোক কামনার কাশীবাস করিতে ছিলেন সুতরাং কোন সুপরামর্শদাতাও পুঞ্জিয়া পাইতেছিল না দুই প্রহরে মতিয়াকে আহ্বার করাইয়া চারু বাড়ী বাইবার জন্য বাহির হইতেছিল। মতিয়ার পুরাতন দাসীকে মতিয়ার নিকট রাখিয়া বাহির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখিল যতীন আসিয়া পাঁচুর নিকট তাহারই খোঁজ করিতেছে। বাস্তবাবে বাহির হইয়া কহিল “ব্যাপার কি হে?” যতীন সহাস্যে কহিল “বড়ই গুরুতর, আজকাল এখানেই অবস্থান হচ্ছে নাকি? চারু সংক্ষেপে কহিল “আপাততঃ। যাক্ কোন ও কণী টুগীর জন্যে আগনি তো?” যতীন কহিল “না, তুমি

কোথাও বেরোচ্ছ ?” “হ্যাঁ বাড়ী যাচ্ছি, চল।” যতীন ও চাকর দুইজনে পথে আসিলে চাকর যতীনকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া পরামর্শ চাহিল। যতীন কহিল “তোমার ঘরের মন্ত্রীটিকে আগে জিজ্ঞাসা কর কি বলেন ?” “সে কিছুই বোঝে না, সে ত একবার বলেছিল ওই বাড়ীতে বাস কর্তে।” যতীন কহিল “তবে তাই,—যে ক’দিন ছুটি আছে থাক তো, তার পরে যা হয় করো। তোমার এ রাজকন্যোটা কেমন ?” চাকর একটু ক্ষুব্ধ ভাবে কহিল “কেমন আর ভগবান যেমন করেচেন তেমনি, অসহায় অন্ধ জীব বলেই দয়া হয়, ওর রাজত্বের জন্যে আমি লালায়িত নই তা কেনো।” যতীন প্রতিবাদ করিয়া “আমি ও-ভাবে কোনও কথা তো বলি নি, আমি বলছি যে মাতৃগোকে বড় অধীর নাকি ?” “কিছুমানও না। এত অধিক স্থির যে সেইটেই আমার খারাপ মনে হয়।” যতীন স্বপ্নে ক’কি ভাবিয়া সহাস্য কহিল “আমাদের এক একটা তাই অসহ্য ভাবনা, আর তুই তাই চটোর ভাবনা ভাবিস ? আমি তো এখানে তোমার কনিষ্ঠার পরামর্শ গ্রহণই সুযুক্তি মনে করি, তাই করো।” চাকর এ যুক্তি নিতান্ত অসার বুঝিয়া তাক্কল্যভরে কহিল “ভাল পরামর্শদাতাই ধরে ছিলাম, এই পরামর্শ দিতে তুই ও বাড়ীতে গিয়েছিলি ?” যতীন কহিল “আমি বুঝি পরামর্শ দিতে গিয়েছিলাম ? দেখতে গিয়েছিলাম তুই কেমন আছিস।” “কি দেখলি ?” যতীন সহাস্য মাথা নাড়িয়া কহিল “দেখতে পেলাম না, একাসনে লক্ষ্মী সরস্বতী সংযুক্ত নারায়ণ মূর্তি দেখতে দিলি নে।” যতীনের হাসি দেখিয়া চাকর রাগিয়া উঠিল, কহিল “আচ্ছা এমন শোচনীয় প্রসঙ্গে ও তোর হাসি আসে ?” যতীন তেমনি হাসি মুখে কহিল “কেন আসবে না, শোচনীয় এর কোথায় ? তুমি যদি শোচনীয় করে হোস তার আর কথা কি ?” “কিছুই না,—তোমার কাছে পরামর্শ করে কোন লাভ হল না।” কথায় কথায় চাকর নিজের বাড়ীর ছায়ায়ই পৌঁছিয়াছিল। যতীন পথে দাঁড়াইয়া কহিল “না, যাও পাকা পরামর্শ করে এস।” চাকর একটু হাসিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার চিন্তার আর অন্ত ছিল না। কতটুকুই বা সে বাড়ীতে থাকিবে ? সন্ধ্যার পরই আবার তাহার সেই নিঃসঙ্গ শোক-স্তব্ধ প্রগাঢ় মৌনতার ভিতর রাশি যাপন করিতে যাইতে হইবে।

( ২০ )

যে শয়ন কক্ষে মতিয়া নাতার কোলে শুইয়া থাকিত সেই ঘরে সেই খাটেই মতিয়া নিঃশব্দে একাকী শুইত। ঘরের পরপার্শ্বে একখান ছোট ক্যান্ডিসের খাটে শয্যার বন্দবস্ত করিয়া চাকর শুইয়াছিল। খুব বড় একটা টেবিলল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে ঘরখানা আলোকিত। অনেক রাত্রি অবধি পুস্তক লইয়া কাটাইয়া তাৎপর আলোর দম কমাইয়া চাকর শুইয়া পড়িল। চাকর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বাহিরের চাকরদের কোলাহলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল তাহার শয্যার একান্ত নিকটে দাঁড়াইয়া, মতিয়া তাহার আরক্ত কপোলের উপর দিয়া মুক্তানিদ্র মত অশ্রমালা। চাকর লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া বসিল, সবিস্ময়ে কহিল “কি হয়েছে ?” মতিয়া উত্তর দিব র পূর্বেই বাহিরের উচ্চকণ্ঠে সে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। দূরে অধিকাংশে সেদিকের আকাশ উজ্জ্বল লোহিত আলোকে প্রদীপ্ত, এমনি প্রখর যে এত দূরেও চক্ষু বলসিয়া যায়। বিকট এক একটা ফুল্লিঙ্গ হাউহুএর মত প্রকর শব্দ সেই অগ্নি তরঙ্গের ভিতর দিয়া উচ্চ উঠিতেছিল। অক্ষুণ্ণ হাহাকার নিশিথের লুপ্ত বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেছিল। চকিতে একবার নিদ্রাভঙ্গিত চক্ষু দুইটা মার্জনা করিয়া চাকর উজ্জ্বল ছুটিতে গেল। মতিয়া আসিয়া স্বামীর হাত ধরিল। সিক্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল “বাদ দরকার হয়, তাঁদের তোমার এই বাড়ীতে নিয়ে এস, এখন তো এও তোমারই বাড়ী।” চাকর ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলু আসিয়া কহিলেন “মা যদি একটু থাক তা’ হলে আমিও একবার

বাই দেখে আসি বাপারটা কি রকম ?” মতিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল “হ্যাঁ বান কাকা, গাড়ীখানাও বলে বান্, যদি সেই বাড়ীই সত্যি হয় তো বাড়ীর সবাইকে এই বাড়ীতে আনবেন।” মতিয়ার সতর্ক দাসীর তরল নিদ্রা এতক্ষণে ভাঙিয়াছিল তার কারণ ছুই দিককার খোলা দ্বার দিয়া অনেকগুলি লোকের ভীতিব্যাকুল কণ্ঠ একসঙ্গে ঘরে আসিতেছিল। সে উঠিয়া বসিয়া নিদ্রাগত-জড়িত কণ্ঠে কহিল “কি গা দিদিমণি উঠেচ কেন ? শোও শোও” নীলু কহিলেন “এতক্ষণে তোর ঘুম ভাঙলো, বেরিয়ে একবার বাইরের কাণ্ডটা দেখ্গে যা”—দাসীটা আশ্চর্য হইয়া কহিল “এখনো যে রাত রয়েছে, বাবু কি হয়েছে কি ?” নীলু চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়াই একটা মূহুর্তকাল করিয়া বকিতে বকিতে ঘরে আসিয়া কহিল “ওমাগো—দিদিমণি, বাপুকে আকাশ একেবারে লাল লাল হয়ে গেছে আশুপের কি ফুলকা,—ভামাই বাবুদের বাড়ীতে না হ’লে বাচি, সেই দিকটাট তো বোধহুচে গো !” মতিয়া তেমনি কাঠের মত তার আলোকবাক্ত শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাসী বলিতে লাগিল “আহা ঘরের মেয়েছেলে ঝিবোরেরা কোথায় যে দাঁড়াবে আহা হা !” মতিয়া কহিল “কেন রে তাঁরা এই বাড়ীতে আসবেন।” দাসীর হুই চক্ষু কপালে উঠিল “এই বাড়ীতে ? হ্যাঁ দিদিমণি কি যে বল তুমি, কি ছঃখে সেই সতীন কাঁটা নিয়ে ঘর করিতে যাবে গো,—সে হাজারই ভাল মাথুষ হোক না কেন বাপু হ্যাঁ সতীন সহিতে ? ওঃ সে দেবতারও পারেন নি।” মতিয়া মুহূর্তে কহিল “কেন কি করবে সে ?” “ওমা কি করবে নাকি ? সোয়ামীর ভাগীদার এ নাকি কেউ সহিতে পারে ? এরপর উঠতে বসতে তোমাকেই খোয়ার করবে, সে বালাইতে কাজ নেই বাপু।” মতিয়া সাগ্রহে সরিয়া আসিল। তাই কি সে দিন সেই নীর পুতুল রেণুর যে মাতা তারই আবির্ভাবে মতিয়ার সমস্ত মন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল ? বুঝি যখন তাহারই স্বামীর উপর প্রচণ্ড অধিকার লইয়া সে পিপাসিত মনের তৃষ্ণায় চক্ষুর অভাবে হাত দিয়া দেখিতেছিল কত শার্ণ হইয়া গিয়াছেন, সেই সময়েই হয় তো সে আসিয়াছিল এবং নিদাকণ বিতৃষ্ণায় অন্তর্য চাতিয়া দেখিয়াছে। মতিয়া দাসীর কাছে আসিয়া কহিল “আজ্ঞা, যদি আমি তার স্বামীর ভাগীদার না হই, তবু সে রাগ করবে ? তার স্বামীর কিছুই তো আমি নিচ্ছি নে ?” দাসীটা মতিয়ার সে প্রশ্নের উত্তরেও কিছুমাত্র আশা দিল না, কহিল “তবু তো সতীন বটে, সোয়ামী যদি একটা হেসে কথা কয় তবু গা জলে মরে, ওই তো ফেলু ভাণ্ডারির ছটে বউ, যে দিব্যান্তির চুলোচুলি কোরে মরে, কোন্ দিন নাকি বড় বোটোর হাতে ঢেঁকি পড়ে হাতটা ধোঁতলে গেছিলো তাই দেখে ভাণ্ডারী ব্যাধি একবার তার হাতখানা ধরে আহা বলেছিল, তাইতে ছোট বোটো তেরান্তির ভাল খায় নি, শুন্লে ?” মতিয়া শিহরিয়া উঠিল। পৃথিবীতে কাহারও সহিত তাহার মত অগাধা জীবেরও এমন একটা সম্বন্ধ আছে, সে তো ইহা কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই। এখন এখানে কিছুই সহিবে না। অথচ মায়ের শেষ আশীর্বাদ ছিল যে সে যেন তার এই ভিতায় স্বামীর বংশ-প্রদীপ স্থাপন করিতে পারে। মতিয়া কহিল “হ্যাঁ রে বিধু, আমি তো কিছুই দেখতে পাই নে, তোরা আমার ওই ঠাকুর ঘরের কাছে যে ঘরটা আছে, এই বড় ঘর সন্ধ্যার সময় আমরা যেখানে ছিলাম সেই ঘরটার রেখে দিস্। মা বলতেন সেখানে থাকলে বাড়ীর কারকে দেখা যায় না, আমি সেইখানে থাক্কা, ঠাকুরবাড়ীর উঠানে নাম্বো। তোরা এখানেও যেমন আমার কাছে থাকিস্ সেখানেও তেমনি থাকবি, আঃ কাউকে যেতে বারণ কারিস্, কাউকে নয়—বুঝলি ?” এই বিশেষ করিয়া কাউকে কণাটা দাসী বুঝিল, কহিল “ভামাইবাবুকেও না ?” “না, তা’হলেই তো সে রাগ করবে, তোরা আমার কাছে থাকিস্, আর তো’মা নেই,—” বলিয়াই মতিয়ার কণ্ঠ বাষ্পোজ্জ্বলিত রোধ হইয়া গেল। গাড়ী ফিরিয়া আসিবার শব্দ ও সঙ্গের লোকজনের হা-হুতাসে জ্ঞাতা মতিয়া ব্যাকুলভাবে বিধুকে কহিল “ওই

ওরা আস্চেন, আমর দেখে রাগ কর'বন না তো?" বিধু ততক্ষণে অভাগতদের বসাইবার জন্য একটা আলোর সন্ধানে গিয়াছিল। ভীতিবিহ্বলা মতিয়া কেবল কঠবানিদ্ধাবশে অসহায়ভাবে সেই কক্ষতে বসিয়া কাঁদিতেছিল। একথ নি স্নেহনীড়ের অভাবে শূণ্য বায়ুর চাপও যেন তাহাকে চাপিতেছিল। আজ আর কোথাও তার ঝাঁপাইয়া পড়িবার স্থান নাই।

মেয়েদের পাঠাইয়া দিয়া কয় ভাই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উদ্ভ্রান্ত মনে বিক্ষারিত নেত্রে পিতৃপিতামহ সঙ্কিত জিনিষপত্রের শোচনীয় ধ্বংস চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। একটা সিঁদুক ও কয়েকটা ট্রাক বাহির করা হইয়াছিল। সেগুলিকে বাহিরে একটা গাছের নীচে রাখিয়া সেই সিঁদুকের উপর কিসের বসিয়া বিত্তমুখে বাড়ীর পানে চাহিয়াছিল। যাহারা দর্শক হইয়া আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়াছিল তাহারা সকলেই আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেলে বিরজানাথ সজোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "চাক, তুই চলে যা, সারা রাত্রির হিম তো লাগলই আবার—" চাক কহিল "আর বসে থেকেই বা কি হবে? উঠুন না আপনিও চলুন।" বিরজানাথ কথা কহিলেন না, বেদনাত্ত ম্লান দৃষ্টিতে দক্ষাবশেষ বাড়ীখানার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মায়াপাশাত্মক মানবায়ী বুদ্ধি এমনি করিয়াই দেহান্তের পর দক্ষীভূত দেহের পানে চাহিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে যখন শিখার পর ধূম, ধূমের পর অগ্নি পর্য্যন্ত নিভিয়া আসে,—যখন সমস্ত অস্তিত্বের অবসানে মুষ্টিমেয় ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন আবার শূন্য হইতে শূণ্য পিঙ্গর অবশেষে ছুটিয়া যায়। তেমনি দেহবন্ধনচ্যুত আত্মার মত বিরজানাথ চাহিয়া রহিলেন।

নীলু গাড়ী করিয়া মেয়েদের আনিয়া বাহির দিকের একটা ঘরে রাত্রির মত বসাইয়া ছিলেন। তাঁহার নিদ্রাঘীন রাতিটুকু কোন ঘরে কি ছিল এবং কত কিই বে গেল তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন। বেগকে একটা চৌকীর উপর শোয়াইয়া ইন্দুও শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িয়াছিল। মতিয়ার শব্দন কক্ষ হইতে এই ঘর তিন চারিটা ঘরের বাবশন একনয় মতিয়া কোনও কথাই সুস্পষ্ট শ্রবণে পাইতেছিল না।

বিরজানাথের উদ্ভিন্ন ভাডায় সমস্ত বিনিদ্র রাত্রির দেহতরা ক্লান্তি হইয়া চাক যখন ফিরিল তখন প্রায় উষা সমাগত। আসন্ন প্রভাতের মিশ্র-শীতল বাতাসে নেবুল ও সজিন ফুলের মধুর গন্ধ বিকাশ করিতেছিল। ধূপ ভরা পা তুখানা ধুইবার জন্য চাক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বারান্দার পা ধুইয়া অনামনস্ক ভরে বাইবার জন্য পা তুলিতে গিয়া মুক্ত বিষয়ে দেখিল চৌকাতের উপর মাথা লুটাইয়া দিয়া অনাবৃত কক্ষ হলে পড়িয়া মতিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মাতার চতুর্থী পালনে চুলগুলি যেরূপ হইয়াছিল আর তাহাতে তেল পড়ে নাই। আজানু বেটিত সেই রেশমের মত কোমল চুলগুলো চারিদিকে লুটাইয়া পড়িয়াছে। যেন ঠিক পূর্ণ দিগন্ত প্রান্তে-উদর আসন্ন ভবাকুসুমের আভারঞ্জিত তরল মেঘস্তরের মত। স্থপিতে তাহার সঙ্গ নিগ্রহের মূল অক্ষ চক্ষু ঘন পলবে আবৃত। অতি খর্ব্ব মোমের মত শুভ্র মুকুমার বেশভাষা, চাপিয়া ধরিলে বৃকের সতিত দিলাইয়া যায় এমনি কোমল। মল্লিকা-মালার মত শুভ্র হাতখানি ও আবদ্ধ করতল চৌকাতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। তরুণ অরুণ-রশ্মি যেন সূক্ষ্ম স্বর্ণজাল ভেদিয়া তার মুখের উপরে ও স্থলপদ্মের দলের মত আরক্ত অশরে প্রথম হাসা-বেধা ফুটাইয়া দিতেছিল। সৌরীন যুবকেরা যেমন কোটের বোতামে একটা মাত্র ফুলের সংক্ষিপ্ত তোড়া পরেন, তেমনি বিবৃত কেশরাশির উপর একটা ফুলের মতনই সে শোচনীয়। কক্ষ বায়ু কারাগারের বন্দীকে একটা মাত্র দ্বার মোচন করিয়া যদি নন্দন উদ্যানে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তেমনি নিমেষে চাকর সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি যেন ছুড়াইয়া গেল। তাহার বিরল



তক মন কোথা হইতে প্রচুর স্নেহে শিক্ত হইয়া উঠিল। সে সেই ঘরদ্বারে চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িল। এই ছ'এক সপ্তাহ মাত্র পূর্বে বাহার শিরের জানালার ছিদ্র থাকার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে বা তার অস্থির হইয়া উঠিতেন, আজ আজ সেই স্নেহের ঘনই, সম্ভবতঃ জীবনে সর্বপ্রথম এমনি করিয়া ধূলায় লুপ্তিতা! আর উদ্বেগে আশঙ্কার বাবুল হইবার তার কেহ নাই। এই অসহায় ভবিষ্যতের আশাতেই না পিতামাতা তাহার বিবাহ দিয়া ভবিষ্যত জলপিত্ত হুল পুত্র সম্বন্ধে দৈনন্দিক বাস্তব হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। একটা কাক উচ্চ কাকা রবে উড়িয়া প্রভাত-বার্তা জানাইয়া গেল। চাক মতিয়ার মুখের উপরকার এঁটী মাত্র চুল সরাইবার জন্য স্পর্শ করিবামাত্র মতিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। চাক যিক্‌হুঁঠে কহিল “এমন করে মাটিতে পড়েছিল কেন মতি?” মতিয়া ভাতি কুটিলকণ্ঠে কহিল “তুমি? ওয়া সবাই এসেচেন?” চাক মলিন হাস্যে কহিল “এসেচেন বই কি, না এসে আর উপায় কি?” স্বপ্ন চুলের রাশি হাত দিয়া জড়াইয়া বাধিতে বাধিতে মতিয়া কহিল “সকলেই হয় তো ক্রান্ত আছেন, কাকাকে ডাকিলে সব বা দরকার হয় বলা। হ্যাঁ খুকু?” চাক কহিল “খুকু খুমুকে হয় তো, তুমি কোথায় থাক?” মতিয়া উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

( ১১ )

অসহনীয় বিষম বেদনা মনের মধ্যে অভ্যুত্থিত হইয়া উঠিয়া মানুষকে যখন বিকল করিয়া দেয়, সেই বেদনাক্রান্ত প্রাণটাকে খাড়া করিয়া রাখিবার একটা আশ্রয় যখন চুস্তাশা হইয়া উঠে, তখনই পুরাতন অনাদিকালের তিব নতন বহুটা প্রাণের সকল আবর্জনা ঠেকিয়া বাহির হইয়া আসেন। তাহার করুণা-বিগলিত হাসিটুকু সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ হাপ পুষিয়া দিয়া প্রভাত সূর্যের মত বলমল করিয়া সারা প্রাণে পুলাকাবশ জাগিয়া দেয়। মতিয়ারও নিরবগম বাধাশ্রী পাণ তাই আজ ঠাকুর ঘরে আত্মনিবেদন করিবার জন্য উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছিল—সেই পূর্বের মত, যখন সে নিজের বিবাহের কিছুই জানিত না সেই সময়ের মত বাহিরের সকল বস্তু মিটাইয়া চুকাইয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে আত্মস্থ হইয়া, সমস্ত মনেপ্রাণে সেই অপাদিত মিত্র শাস্তিদারা গ্রহণ করিতে। চিত্তের একমাত্র তিনিই প্রাণনীয় হইয়া উঠিলেন, একাধারে বাঁহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী সকল কিছু বর্তমান। বিব্রাহের চরণোপাঙ্গে সে নিঃসঙ্গ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পুরোহিত আসিলেন। যথারীতি পূজা সাজ হইয়া গেলে পরও তিনি সার্বস্বরে দেখিলেন মতিয়া তেমনি স্পন্দনহীনভাবে বসিয়া আছে। তিনি নৃদকণ্ঠে কহিলেন “মা দেয় বন্ধ কনুতে গলে ঘে!” মতিয়া সচকিত হইয়া পরক্ষণেই শাস্তকণ্ঠে কহিল “বাড়ীর ভিতর দিককার ছায়ার বন্ধ থাক, আমি এরি পাশের ঘরে থাকবো।”

তিন চারি দিন মতিয়া সেইখানেই কাটাইল। নীলু আসিয়া সেইখানেই তাহার তত্ত্ববধান করিয়া যাউতেন। ঠাকুর ঘরের উপর যে মতিয়ার আবাল্যের আকর্ষণ আছে একথা সকলেই জানিত। বাল্যকালে মাথা ঘারলেই মতিয়া ঠাকুরকে জানাইতে ছুটিত, আর আজ এত বড় বিয়োগ-ব্যাপ্তির চিত্ত লইয়া সে যে ঠাকুর ঘরেই আসন পতিবে টকা বিছুসায় বিচরে নহে। তাহাকে এ অবস্থায় উদ্ধাক্ত করা কেবল কষ্ট দেওয়া বৃথাই কেহ কোনও বাধা দিলেন না। বাড়ীর ভিতর কেবল চাকরই পরিবারবর্গ মাত্র, সর্বত্র নিরুপদ্রব শাঙ্কলা। চাক নীলুর নিকট কইতে মতিয়ার সংবাদ লইত কিন্তু যে নির্জন স্থান লাভের জন্য সরিয়া গিয়াছে তাহাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিল না। দুই গ্রহের প্রথর রৌদ্রে যখন চারিদিক বলগিত। কচিং বকুলের পত্রবহুল শাখার ভিতর হইতে তুহিত চাকরকে স্কন্ধে চাঁৎকারে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। প্রথর রৌদ্র তাপাকুল গাভীগুলি

বৃক্ষভূলে বিশ্রামে যোগদান-রত। এমন সময়ে নীলু আসিয়া চারুকে ডাকিয়া বাহির করিলেন। চারুর কোলে রেণু ছিল, সে রেণুকে লইয়া বাহির হইতেই নীলু তাহার হাতে এক খণ্ড পত্র দিয়া রেণুকে প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন “কচি ছেলে মা আমার বড় ভালবাসেন, তাই নিয়ে যাচ্ছি, যদি একটু মুখ খোলেন, দেখনা বাবাজী কি কোরে চিঠিখানা লিখেচেন, প’ড়ে দেখ,—” চারুর কোল হইতে রেণু কোনও মতেই নীলুর কোলে বাইতে চাহে না। চিঠির শূন্য খামের লোভে যদি বা গেল তখনই নীলুর শিশুজ্ঞাসকর মুখখানির পানে চাহিয়াই টোট ফুলাইয়া কাদিয়া উঠিল! চারু রেণুকে কোলে লইয়া কহিল “আপনি যান্, ভিতর দিকের ছয়ের খুলে দিন্গে আমি একে পাঠিয়ে দিচ্ছি।” ইন্দুকে ডাকিয়া চারু কহিল “রেণুকে ওই ঠাকুর ঘরে দিয়ে এস।” ইন্দু হাসিল “আমি? আমি গিয়েই বুঝি সর্বপ্রথম বিরক্ত ক’রবো?” একথানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িয়া চারু দেবেজের পত্র খুলিল। প্রথমতঃ হুই এক কথায় চারু গৃহদাহের জন্য দুঃখ করিয়া তারপর প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর একান্ত পরমুখাপেক্ষী বোনটির কথা। তাহার প্রতি করুণা প্রকাশের জন্য সকাতির মিনতিপূর্ণ পত্র। “তোমার আমার সবই আছে, তাহার কিছুই নাই। বার্থ জীবন বলিয়া তাচ্ছল্যের ফলে যেন আমাদের অত স্নেহের ফুলটা শুকাইয়া না যায়। পরিশেষে লিখিয়াছেন যে আমি জানি মতিয়া তোমাকে ভালবাসে, হয় তো তুমি জান না বা বুঝিতে পার নাই, কিন্তু তুমি সামান্য মাত্র স্নেহ প্রকাশ করিলেই তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে এ ভরসা আমি করি।” চারু পত্রখানি ইন্দুর হাতে দিল কহিল “রেণুকে পাঠিয়েচ?” “হ্যাঁ পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি শোবার ঘরে নেই বোধ হয় পূজোর ঘরেই আছেন, তাই রেণুকে ফিরিয়ে এনেচে।” “ফিরিয়ে এনেচে?” “হুঁ, তা কি আর ক’রবে।” চারু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল “পড়লে চিঠি? কি করা উচিত?” ইন্দু হাসিয়া কহিল “একটু স্নেহ প্রকাশ করা, আর কি?” চারুও হাসিল “তা করনা কেন, বা ক’রতে হয়।” “আমি কি কোরবো, আমাকে কিছু ক’রতে তো বলেন নি, বলেচেন তোমাকে, তুমি কোরবে, যা ক’রতে হয়, কর।” “কেন তুমি পৃথক নাকি?” ইন্দু কহিল “না, পৃথক তো নই সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে যে যে সম্পর্ক, আমার ত সাহসই হয় না, তা না হলে আমার আটকাত না।” চারুর মুখখানা একটু আরক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল বাবাই হটক না কেন তাহার সংসার এমনি করিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মুখে একটু হাসিয়া কহিল “কেন সঙ্গে আর কি?” ইন্দু কহিল “আর কিছুই না বন্ধু! তো প্রীতিকর সম্পর্ক নয় বলেই—” “বড় অপ্রীতিকর? কারণ—” ইন্দু আরক্ত মুখে কহিল “কক্ষণো নয়, ও কারণ কখনই নয়, আমি বুঝি এই বড়ো বয়সেও ওই সব ভয় করি? বাস্তবিক গে না কেন তোমাকে ভাল, আমার ত তে কি, আমি ভয় করি বিরক্ত হবেন বলে? বুঝলে?” দিন কয়েক পরে ইন্দুকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবার জন্য চারু কলিকাতায় গেল। সেখানে দেবেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, দেবেজ মতিয়া সম্বন্ধে শত শত প্রশ্নে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিলেন। এই প্রশ্নের মধ্যে তিনি একবার প্রশ্ন করিলেন “মতি এখন কোন্ ঘরে শোয়?” চারু কহিল সেই ঠাকুরবাড়ীর খালি ঘরটার।” দেবেজ কঠিন স্বরে কহিলেন “কেন, বাড়ীর অতগুলো ঘরের মধ্যে তার জন্যে একটা ঘরও খালি ছিল না?” চারু নম্রকণ্ঠেই কহিল “আপনি বুঝি রাগ ক’রচেন, তা নয়, নিজে হ’তে বাড়ীর সঙ্গে সব স্নেহ ছুটিয়ে সেই ঘরে বাস কচ্ছে, আমাদের কারো সেখানে যাবার অধিকারই নেই যে আমরা অনুরোধ ক’রবো।” দেবেজ গাঢ় স্বরে কহিলেন “অধিকারই নেই, কার? এমনও কখনো শুনেচ তুমি চারু, যে জীর উপর স্বাধীন অধিকার নেই,”—চারু মুখ নত করিল। দেবেজ পুনরায় কহিলেন “তোমাদেরই ভুল হয়েচে চারু সে যে কখনো অচেনা লোকের কাছে থাকে নি, নিজেকে সাধারণের বাহিরে জেনেই সে সরে গেছে, ভয় পেয়েই সরে আছে,

তুমি গিয়ে তাকে ঘরে এনো তাই, অমন করে থাকলে যে ম'রে যাবে।" চাক্র কুণ্ঠিত সঙ্কোচে কহিল "আপনি একবার যাবেন না?" দেবেন্দ্র ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন "আমিও যাব বই কি চাক্র, কিন্তু আর যে মা নেই বাড়ীর কাছে থেকেই মা বলে ডাকতাম, তাই আর বেতে ইচ্ছা করে না তা ছাড়া আমি যে সমাজচ্যুত।" "কিন্তু সমাজের বাহিরের মানুষ বাড়ীতে গেলেই ত জাতি নাশ হয় না, মা থাকতে যেমন যেতেন তেমন গেলে আমরা সুখী হবো।" দেবেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না। চাক্র কহিল "বাড়ীতে সকলেই আছেন কিন্তু আপনি না গেলে কেউ বোধ হয় সাহস ক'রে সে পূজোর ঘরের ভিতর যেতে পারবে না।" বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া দেবেন্দ্র কহিলেন "কেন তুমি? তোমার এটুকু সাহস থাকে উচিত চাক্র এ সাহসের বল তো নয়, এ ঘোচের জোর, তুমি গিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেও আর বলো যে আমি ছুটি পেলেই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসবো।" চাক্র নত হইয়া তাঁহার পদখুলি গ্রহণ করিল।

( ২২ )

চাক্র যখন কলিকাতায় ইন্দুকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি নটা। বাড়ীতে আসিয়া আহ্নার সারিয়াই সে ঠাকুরবাড়ীর সদরদিকের প্রাচীরসংলগ্ন ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল ত হা রীতিমত তালাবন্ধ স্তম্ভরাং ভিতরদিকের দ্বার না খুলিলে প্রবেশ সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়া বন্ধ-ঘারে আঘাত করিয়া ডাকিল "বিধু" কিন্তু বিধু তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। কেহ উত্তর দিল না অগত্যা চাক্র গিয়া শুইয়া পড়িল। ইন্দু নাই—রেণু নাই ঘরখানাকে বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল। নিশীথ রাত্রে বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে বাড়ীখানি স্তব্ধ। সেই রাত্রে দ্বার খোলার শব্দে চাক্র উঠিয়া বসিল। গ্রীষ্মের তরল নিদ্রা চকিতে ছুটিয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইয়া সবিষ্ময়ে দেখিল পুষ্কার ঘরেরই দ্বার খোলা। দ্রুতপদে অন্ধকার ঘরের ভিতর গিয়া ডাকিল "মতিয়া" অক্ষুণ্ণ প্রত্যুত্তর শুনিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হইয়াই নগ্ন পায়ের উপর মতিয়ার কোমল করস্পর্শে থামিল। সে কোমলকণ্ঠে কহিল "দরজা খুলে এখানে কেন প'ড়ে আছ মতি?" অক্ষুণ্ণ মৃদুকণ্ঠে মতিয়া কহিল "বড় গরম, তাই একটু হাওয়ার জন্যে।" চাক্র বুঝিল ওদিকের দ্বার বা জানালা খুলিবার সাহস হয় নাই বলিয়াই মতিয়া গ্রীষ্মাপিকো একটু বাতাসের জন্যে অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছে নতুবা অন্ধকারে আর কতি কি? তাহার তো দিবারাত্রি সকলই চির অন্ধকার? চাক্র নত হইয়া দেহস্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। মতিয়ার বাহুমূল আগুনের মত উত্তপ্ত। চাক্র গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল "তোমার কি জ্বর হয়েছে?" মতিয়া উত্তর দিল না। চাক্র আর বিন্দুমাত্র ইতস্তস্ত: করিল না, তাহার আপাদমস্তকে যেন একটা তীব্র চাবুকের আঘাত লাগিয়া সচেতন করিয়া দিয়াছিল। দুই হাতে মতিয়াকে তুলিয়া লইয়া মুক্ত দ্বার দিয়া পাশের ঘরে মতিয়ার শয্যার উপরে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। ঘরখানি অন্ধকার। চাক্র শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া কহিল "তোমার জ্বর হয়েছে কবে?" কোন প্রত্যুত্তর না পাষ্টয়া শিথিল হাতখানি তুলিয়া নাড়ী দোঁখতে দেখিতে আরম্ভ করিল "কই বললে না, কবে জ্বর হয়েছে।" মতিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া জাগিল, কহিল, "কিছু বোল্চ?" "হ্যাঁ, বলচি, তোমার জ্বর কবে হয়েছে?" মতিয়া দ্রুতনিঃশ্বাসে কহিল "আজ চারদিন বোধ হয়।" চাক্র আবেগের সহিত কহিল "তবে কেন তুমি মাটিতে গিয়ে ঠাণ্ডায় প'ড়েছিলে? বিকে ডাকলেই ত বাতাস দিতে পার্ভো। কেন তা ডাক নি?" মতিয়া নিঃশব্দে পাশ ফিরিয়া শুইল। চাক্র তাহার বিকে ডাকিয়া তুলিল,—তাহাকে দিয়াই জল আনাইয়া মতিয়ার জ্বর তপ্ত কপালের উপর জলপটী বসাইয়া দিল। সেই বিয়ের হাতে পাখা দিয়া সে নিজে মতিয়ার পাশে

বসিয়া অরের উত্তাপের পরিমাণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। থার্মোমিটার উঠাইয়া দেখিল ১০৫ ডিগ্রি তখনো রহিয়াছে। মতিয়ার নিটোল দেহখানি যে কতখানি শুকাইয়া গিয়াছে আজ চারু তাহা ভাল করিয়া দেখিল। হয় তো এই চার দিন অর সমভাবে আছে, বাড়ীর কেহ এ সংবাদ পায় নাই। ঝিগুলা কি কেহ একবার কোনও কথা কাঠাকেও জানাইতে পারে নাই? ক্ষোভে বিরক্তিতে অধীর হইয়া নিফলক্রোধে অগ্নিদৃষ্টিতে ঝিয়ের পানে চাহিল। তুষার মতিয়ার ওষ্ঠাধার শুকাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু তথাপি সে জল প্রার্থনা না করিয়া শয্যা হইতে নামিতে যাইতেছিল। চারু ধরিয়া ফেলিল। মতিয়া শিথিল দেহখানি অবসরভাবে শয্যার উপর এলাইয়া দিয়া ক্রীণকণ্ঠে কহিল “জল” “জল”। মতিয়ার জলের জন্য চারু বাধা হইয়া পূর্বদিকের একটা জানালা খুলিয়া ফেলিল। সমস্ত গ্রামখানি নিদাঘের ধূসর আকাশের অগণ্য নক্ষত্র দেউটীর নিম্নে স্তব্ধস্থি স্তব্ধ। কোথাও কোনও শব্দ নাই। চারু শুককণ্ঠে কহিল “এঁকে এতদিন কি খাইয়ে রেখেচ ঝি, ভাত না আর কিছু?” ঝি চারুর ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল কহিল “অরের উপর কি ভাত কেউ খায়, দুধ খেয়েচেন।” বাস্তবিক মতিয়া কেবল জল ছাড়া আর কিছুই খায় নাই। সমস্ত রাত্রি মাথায় জল দিয়া চারু মতিয়ার নিকট বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দেহের উষ্ণতা বিন্দুমাত্রও কমিল না। বরং অত্যন্ত চঞ্চলতায় মতিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একটু বরফের জন্য চারু প্রভাতের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া রহিল।

( ২৩ )

প্রত্যুষেই নীলু আসিয়া ডাকিলেন “না।” চারু উত্তর দিল “আহুন, ঘরের ভিতরই আহুন।” তথায় চারুকে দেখিয়া নীলু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন, একটা কিছু ঘটয়াছে বুঝিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মতিয়াকে দেখিয়া উদ্ভিগ্নমুখে প্রশ্ন করিলেন “একি; কি হয়েছে বাবা?” চারু বিরসকণ্ঠে কহিল “এই ত যা দেখছেন, আপনি কি একদিন কোনও খোঁজ-খবর করেন নি? আমি জান্তাম যে আপনিই সব খোঁজ রাখেন।”—অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া নীলু কহিলেন “আজ কদিন থেকে মা ঘরে থেকেই উত্তর দিয়ে বিদেয় করে দিতেন, তাই বাবা কিছু জান্তাম না আমি; মা যে এমন করে কাকি দেন তা আমি একটুও বুঝতে পারি নি।”—অপরোধের বেদনার বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। চারু কহিল “একটু বরফের দরকার; কোথায় পাওয়া যাবে জানেন কি? গ্রামের এক একজন নিকর্যা সুবক মধ্যে মধ্যে দোকান খুলিয়া বসে তেমনি একজন এই গ্রীষ্মের দিনে লাভের আশায় সোড়া লেমনেড্ বরফের দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল। সেইখান হইতে বরফ আনাইয়া চারু ব্যাগ ভরিয়া লইল। চারুর সমস্ত মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল, দেবেদ্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ মনে পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে তিনি, এমন কি গ্রামের আত্মীয়বন্ধু প্রভৃতি সকলেই চারুকে যে কতখানি অপরাধী স্থির করিবেন সেই লজ্জার সে অন্তরে প্রচুর বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই মতিয়ার চরম অমঙ্গলে লোকচক্ষে চারুর যে কত বড় মঙ্গল, তাহা তো কাহারও অবিদিত ছিল না। এই সব চিন্তাতেই চারুর চিত্ত উৎক্লিষ্ট হইয়া ক্রীড়া দিতেছিল। চারু মতিয়ার শয্যাপাশেই দিনরাত্রি বসিয়াছিল, মতিয়া নিশ্চেষ্টভাবে মুদ্রিত চক্ষে পড়িয়াছিল। নিকটে কেহ আছে কিংবা নাই, এ সম্বন্ধে তাহার যে কোন সংজ্ঞা আছে তা প্রকাশ পাইতেছিল না। মধ্যাহ্নে বিরজানাতের স্ত্রী আসিয়া চারুকে স্নানাহারের জন্য উঠাইয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া চারু যখন মতিয়ার বিছানার কাছে দাঁড়াইল তখন অকস্মাৎ মতিয়া সবেগে পাশ ফিরিয়া ছুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া চারুর বৃকের উপর মুখ ঝুঁজিল। এমনি অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বেগে সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল যে চারু পড়িয়া যাইতে যাইতে

বসিয়া সামলাইল। বিরজানীথের দ্রী গভীর বিষয়ে চাকর মুখপানে চাহিলেন। যে আজন্ম দৃষ্টি বঞ্চিতা সে যে নিজের স্থান এমন করিয়া অনুভব করে কোন্ শক্তিতে—এই টুকুই বিশ্বের কথা! চাকর বসিয়া স্নেহে মাথাটা বুকের তিতর চাপিয়া মতিয়ার তপ্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। মতিয়াও তাহার সেই স্বর্গে, স্বামীর উন্মুক্ত বুকের তিতর, পরম তৃপ্তিতে শব্দ হইয়া চক্ষু মুদিল। সেদিনও সমস্ত দিন সমভাবেই চলিয়া গেল। চাকর দেবেদ্বকে সংবাদ দিয়া তাহার পণ চাহিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন আর তিনি আসিলেন না। রাত্রি হইয়া গেল। রোগী যদি যন্ত্রণার চাকল্য প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল গুণ্ণবায় মাহুবে সজাগ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু নিস্তরু রাত্রি একাকী আগিতে হইলে সুগভীর মৌনতায় প্রায়ই চক্ষু তন্মোহিত হইয়া ওঠে। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। চাকর মতিয়ার বালিশটা একটু সরাইয়া রাখিয়া ওষধের জন্য উঠিয়া গেল। মতিয়া অত্যন্ত ত্রস্তে চমকিয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া চাকরকে ধরিতে গেল। চাকর মুখ নামাইয়া দৃষ্টকণ্ঠে কহিল “একটু থাক আমি ওষুধটা আনি” মতিয়া প্রাণের মত উচ্চকণ্ঠে কহিল “না, না, যেও না, যেও না, তুমি এইখানেই থাক, ওগো তুমি চলে যেও না, যেও না।” চাকর মতিয়ার কথায় মনে মনে কহিল “চ’লে যে যাচ্ছ তুমিই,” কণেক পরে আবার চমকিয়া আরক্ত মুখে মতিয়া চাকরকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার কণ্ঠ আর্দ্র-গভীর প্রবল বিকারে জড়িত। সহসা সজেরে চাকরকে ঠেলিয়া দিয়া মতিয়া উঠিয়া খাট হইতে নামিতে গেল। চাকর ধরিতে গেলে কহিল “মা ডাকছেন, যে ছেড়ে দাও তুমি ছেড়ে দাও, মায়ের কাছে যাই।” চাকর কম্পিতকণ্ঠে কহিল “না তুমি শোবে, এখন কোথাও যাবে না শোও।” নেশার মত্ততার মত অরের মোহে মুহূর্তে তাহার দেহখানা শিথিলভাবে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল কহিল “যাবো না?” তবে, তবে কি করবো,—বলে দাও কি করবো? “চাকর তুমার-শীতল জল হাতে করিয়া তাহার মাথা ভিটাইয়া দিয়া কহিল “কি করবে? গল্প কর, হাস, গান কর।” অদূরে একটা মাহুর পাতিয়া নীলু নিদ্রিত। দাস ব’সীয়া প্রায় সকলেই নিদ্রিত। পাহাড়ের মত অপ্রিয় কঠোর রাত্রি যেন আর শেষ হইতে চাহে না। মতিয়া তেমনি আবেগে কহিল “কি করবো? গান? হ্যাঁ কর্চি।” মৌন গভীর নিশিথের স্থপ্ত বক্ষে দুঃসাগত বাণীর মত মুচ্ছনা চলিয়া ক্ষীণ উদাসকণ্ঠে মতিয়া গাহিয়া উঠিল:—

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি মহাসঙ্গীত ভেসে আসে

কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে আর চলে আর

ওরে আর চলে আর আমার পাশে।

বলে আর রে ছুটে আর রে তোরা,

হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,

(হেথায়) বাতাস গীতি-গন্ধ ভরা চির সিন্ধু মধুমাংসে

চির শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে।”—

ছকে ছকে ওপারের ডাকের প্রতিধ্বনিই ধ্বনিত হইতেছিল,—যাহা অন্তরের তিতর দিয়াই অন্তর স্পর্শ করে। অনন্তপথের যাত্রীর এই শেষ গান, ক্লান্ত শ্রান্ত পথিকের উৎসাহিত আশ্বাস বাণী। বাহিরে বড় উঠিয়া প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রবীণ কবিরাজ ও নলিনী ডাক্তার কক্ষান্তরে ঘুমাইয়া ছিলেন। নীলু আসিয়া তাঁহাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। চাকর মতিয়ার গুত্র কোমল হাতখানি তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল “দেখুন তো একবার নাড়ীটা, হাত পা তো খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, আর বুঝি আসা

নেই।” ভোরে ঝড় বৃষ্টির অবসানে বৈশাখের মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতি ঝলসিয়া উঠিল। নিম্নলি রৌদ্রপাতে ধারারাত গাছগুলির নিম্ন শ্যামলশ্রী উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। মাজা রূপার ঝক্ ঝক্ তৈরসের মত লম্বা ভুবন-ভরা শুভ্র জ্যোতির মাথামাথি। শ্যামল প্রকৃতির বক্ষে এক দুঃসহ আবেগ যেন ঝাঁপিয়া কাঁপিয়া মৌন বজ্রের মূহ মধুর মুর্চ্ছনা স্পন্দিত হইতেছিল। মতিয়ার অর অতিক্রমত কমিয়া আসিতেছিল মতিয়া তার কণ্ঠনিক্ত নীতল হাত দিয়া চাকুর পা চাপিয়া ধরিণ, কহিল “সকাল হ’য়ে গেছে না?” চাক উত্তর দিবার পূর্বেই আবার কহিল “ওগো কথা কও, কথা কও, আমি যে দেখতে পাইনে—শুনতে পাই, চুপ্ ক’রে থেকো না, বল সকাল হ’য়ে গেছে কি?” চাক অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল “হ্যাঁ রোদ্ উঠে গেছে।” যুব উজ্জ্বল করিয়া মতিয়া কহিল “খুব আলো হয়েছে তো খুব বেশী আলো, যাতে সব দেখা যায়;” “হ্যাঁ, আজকের মত আলো প্রায় হয় না।” মতিয়া দুইহাতে চাকুর কণ্ঠ বেঠন করিয়া কহিল “তুমিও আজ আমার দেখতে পাচ্ছ কি? আমি আজ এই ছালোর এইখানে মিলিয়ে যাব। ঘোড়ানিমের ফুল বিছানো তুলসী মঞ্চের নীচে মতিয়াকে রাখিয়া সেই অগ্নান মুখপানে চাহিয়া চাক যখন তার ভূষারশীতল হাত দুখানি নিজের পদতল হইতে সরাইতেছিল সেই সময়ে বা হর হইতে অশ্রুবিকৃত করুণ কণ্ঠে দেবেঙ্গ ডাকিলেন “মতিরে?” কোঁচার খুঁটে অশ্রু মুছিতে মুছিতে নীলু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

## কালো ছেলে।

—:~:—

( একটা বেহ রাদের ছেলে, কালো কুচ-কুচে ছেলেটা সর্বদা হাতে তীরধনুক লইয়া গুরিত  
এবং সর্বদাই তাহাকে একটী কুল গাছের তলায় দেখিতাম। )

তুই কি রামের গৃহক মিতা, শ্যামের সুবল ভাই  
একেবারে বদলেছ সাজ, ধরার উপায় নাই।  
বাহক যে তুই আনন্দেরি, আয় রে কাছে আয়,  
তুই কি সাতায় আনলি ব’য়ে সুখের অযোধ্যায়?  
গোরা এনে করলি আলো গিরিরাজের পুর,  
স্বপ্নে করে কৃষ্ণে বনে ঘুরলি বহুদূর।  
জীবন্ত তুই কষ্টি-পাথর, মূর্ত মধু মাস,  
শ্যামের দেওয়া রঙটা তুঁহার হরের দেওয়া হাস।  
কার বদনে কুল দিবি তুই, কুল কুড়িয়ে খুন  
কুদ্র করে কাহার তরে কিন্ছে ধনু তুণ?

এমন ধনুক কোথায় গেলি, এমন খাসা তীর  
করবি শিকার কোন বনেতে ওরে নিষাদ-বীর।  
জ্যেতায় বুঝি ক্রোধ-মিথুন বিধলে তোরি বাণ  
অমর ব্যাঘ্র করলে আকুল মহাকবির প্রাণ।

শ্রীকুমারচন্দ্র মলিক।

## মণিপুর রাজ্যের চিত্র।

রসিকতা ও রসের কথা।

—:~:—

মণিপুর আমাদের কুটুম্বরাজ্য। বহুদিন যাবৎ এ রাজ্য দর্শনের ইচ্ছা ছিল এবং সেই রাজ্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব এই ইচ্ছাও ছিল। মণিপুর বলিতে গেলে, আমাদের কুটুম্বিতার তীর্থ-স্থান। কারণই তীর্থে যাইতে গেলে,— “রাজেন্দ্র সম্মানে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দীনবেশে মণিপু্রে প্রবেশ করি নাই কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদ রূপে আমাদের মহারাজার সহিত। মণিপুর-অধিপতি একবার আমাদের রাজঅতিথিরূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সে স্বর্গীয় রাধাকিশোর মালিকের আনন্দে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রতিদর্শন বর্তমান মহারাজা মণিপুর রাজ্যে যাইয়া আদায় করিয়াছেন। এ উপলক্ষে মণিপু্রে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে রাজকীয় আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই; কারণ, আমি চিত্রকর। চিত্রেই সাহিত্যিকগণের নিকট দিবার ইচ্ছা।

মণিপুর রাজ্যের কাহিনী অনেক শুনিয়াছি এবং অনেক কুটুম্বের নিকট মণিপুরের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম সে কাহিনী বেন স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মত বোধ হইত, তাহা যেন একটা Happy valley চিত্রের মত মনে হইত। বাল্যস্মৃতির কাহিনী বলিতে গেলে বাল্যকালের স্বপ্নের ন্যায়। এখন মণিপু্রে—সেই স্বপ্নের সাগরও নাই, কাহিনীও নাই। এখন মণিপুর দেখিলে মনে হয়,—

“সে স্বপ্ন সাগর দৈবে শুকাইল।”

মণিপুর ইমকাল নদীর পারে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্রায়তন নদী দেখিয়া আমার মনে হইত,—

“বসন্তে এই কি ভূমি সেই বসুনা-প্রবাহিনী?”

সে সব দুঃখের কাহিনী বলিবার এখন অবকাশ নাই। অতীতের গর্ভে মণিপুরের কাহিনী লুপ্ত হইয়াছে। আছে মাত্র স্মৃতি। সে স্মৃতিও কালে বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মণিপুরে গিয়া একটি মাত্র কার্য আমার ছিল,—সে রাজ্যের কাহিনীর সত্যতা অনুসন্ধান করা। মণিপুর দুইটিনার পর যে সব কাহিনী লুপ্ত হইয়াছে, তাহার বাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই হাতড়ান।

মণিপুরে আছে দুর্গ মধ্যে প্রাচীন রাজবাড়ী। বর্তমান, রাজবাড়ী অন্যত্র প্রস্থত হইয়াছে। রাজপথ উত্তীর্ণা গিয়াছে কিন্তু সেই দুর্গ এক্ষণে ( ১৯১২ সালে ) ইংরেজ সৈন্যবাস, অস্ত্রাগার প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ গোবিন্দজীর দেবারতনে অর্সেনেলের কাজ করিতেছে এবং তথায় ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিতেছে। মণিপুরীগণ গোবিন্দজীউকে সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই এবং তথায় আর দেবকর্তা সম্পাদিত হয় না। রাজবাড়ী তোপের গুলিতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং দেবিলাম সেই রাজবাড়ীতে পতিত ভিটা বাহা দেখিলে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় এই মণিপুরীরাগণের বিলাস আরামের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। ইম্ফাল নদীটা উত্তর হইতে দক্ষিণ বাহিনী। এই নদী দুর্গের উত্তরদিক হইতে টেকে-বেকে ঘুরিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালে দুর্গের পরিখা ইম্ফাল নদীর তলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তথায় মণিপুরীদের রক্তমবেরকমের জলকলী হইত। ইহাই বেন মণিপুরের প্রধান আমোদপ্রমোদ। দুর্গের উপরিভাগে রাজার বসিবার স্থান এবং তলকলী দেখিবার একটি সুদৃশ্য বেদিকা। বখন ইচ্ছা হইত অতি অল্প সময় মধ্যে ইম্ফাল নদী বিধিয়া দিয়া পরিখাপূর্ণ হইলে দুর্গ নিরাপদ হইত এবং আবশ্যক হইলে নৌকা দৌড়ের আমোদ হইত। সমস্ত পরিখা পদ্মবন-সুশোভিত ছিল। এই পদ্মবনের শোভা এখন নাই। সে আমোদ প্রমোদও এখন নাই। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিতে গেলে সেই চিত্র মানসনয়নে প্রতিফলিত হয়; মণিপুর বঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় নগর। আমরা গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে একথা শুনিয়াছি।

মণিপুরীগণ প্রচুর আমোদী,—ইহা আমি জানি। কিন্তু আমোদপ্রমোদ কাহাকে বলে, মণিপুরের পূর্বকাহিনী শুনিয়া এবং বর্তমান সময়ে তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া ইহা মনে হয় যে, এই Happy valley বাস্তবিকই আমল কানন ছিল। মণিপুরে বাহা দেখিলাম এবং বাহা শুনিলাম তাহাতে এতাদৃশ বৈশ্রুত আমোদী তাহা বেশ স্মৃতিতে পারিলাম। মণিপুর জীবাধীনতার দেশ। পথে—যাত্রা—বাজারে মণিপুরবাসিনীদের একচাট্টা গতিবধি—তাহারা যেমন রসিকা, তেমনি সরস আমোদী। মণিপুরে কোন আমোদপ্রমোদই জীলোক ছাড়া হইবার জো নাই। পদে পদে রসিকতা ইহাদের—আয়ত্বাধীন। মণিপুরের বাজারের নাম 'সোনার বাজার'। সেই বাজারে গেলে, দেখা যায় বেন গোলাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। এ বাজারে জীলোকই গ্রাহক, জীলোকই বিক্রেতা। এই বাজারে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, যদি কোনক্রমে পুরুষ তথা উপস্থিত হয়, তবে তাহার অন্তরে প্রচুর সরস লাঞ্ছনা-অভিসম্পাত লাভ অনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গীর কোন এক কুমারবংশীয় লোক এই বাজার দেখিবার জন্য গিয়াছিল,—বেচারীকে অপর্ণব হইতে হইয়াছিল। ললনামূলক রসিকতার এবং কটাক্ষপাতে তাহার প্রায় মৃত্যুপাত হইয়াছিল। আমরা মণিপুরী ভাষা জানি, কাজেই রসিকতা করিতে মণিপুর-বাসিনীগণ ক্রটি করেন নাই। একটি মণিপুরী জীলোক বাজারে পুরুষ আগমন দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হে সুলভ পুরুষ। তুমি আমার ছেলেকে কোলে কর আর তুমি আমার বোনাতির ব্যবসা কর।" আর আমাদের সে বাজারে দাঁড়াইতে হয় নাই—ছুটিয়া পলাইয়া আসিবারও জো ছিল না, কারণ, সুলভীগণ আমাদের পথ আগলাইয়া সমস্ত বাজারময় তাহালা করিতে



করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা যোড়হাতে কমা ভিক্ষা করিয়া বাড়ির হইলাম। এটো বাজারে সমস্ত রকমের জিনিষই বিক্রয় হয়। মাছ পর্যন্ত বিক্রী করিতে মণিপুরী হিন্দুরাও পশ্চাৎপদ নহেন।\* বাবলা মাছই হারা কারণে পারে—কারণ, মণিপুরবাসিনী জানেন “বাংলায় বসন্ত লক্ষ্মী,” কিন্তু আমরা জানি চাকুরীতে লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকে। মণিপুরে প্রচুর হান হইয়া থাকে। সস্তাও ভেঁটনি সে বছর চাউল চৌদ আনা করিয়া মন বিক্রী হইত; ইহা আমি দেখিয়া আসিয়াছি, কারণ, এই Happy valley সমস্তই ধান্য ক্ষেত্র এবং এই ধান্য জনাত্ম রপ্তানি হইবার উপায় নাই। কারণ, রেলওয়ে স্টেশন ১৩৭ মাইল দূরে। মণিপুরীগণ জানেন “তদক্ষিণ কৃষিকার্যে” লক্ষ্মী বাস করেন। কাজেই কৃষিকার্য এখানে প্রধান কার্য।

সকালে মণিপুরীগণ কৃষি ক্ষেত্র বীতিমত পরিদর্শন করে কিন্তু ঠিকাকালে ইহারা সুসজ্জিত হইয়া নগর ভ্রমণে অগবণ আমোদ প্রমোদ স্থানে গতিবন্দি করে। মাথায় উকীষ, পরণে ত্রিকচ্ছ বসন এবং একখানা ধপ্পে সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। প্রায় সমস্ত মণিপুরী জাতির এই পোষাক। পোশাক খেলা চলেতেছে। ১০,০০০ মণিপুরী স্ত্রী পুরুষ পলো ফিল্ডের চারিদিকে আড্ডা করিয়া বসিয়াছে এবং বাজি রাখিতেছে; কোন দল খেলা জিতেছে। এত জনতার মধ্যে চুৎ শব্দ নাই। কেবল মাঠ খেলার রকম নকম বেশিয়া এক প্রকার তাহাদের উচ্চকণ্ঠের হাসাধ্বনি শুনা যায়। আর দলবিশেষ ভিত্তিতে Betting লইয়া তোল পাড়—উপস্থিত হয়। রাত্তাঘাটে মণিপুরীদের একে অন্যকে আভাব দেন একটা বৃহৎ ব্যাপার ইহারা জাপানীদের মত প্রচুর আমোদী এবং সাদর অভিবাদন ইহাদের স্বাভাবিক দায়। সকলেই পরিচিত, সকলেই আত্মীয় এবং কটু হইতে পারে। স্ত্রীলোক বেশির ইতার বিশেষ নাই। অভিবাদন করাত সেন তাহাদের আর এক রকমের আমোদ। আমি দেখিয়াছি একটা অজীত বংশবীর বৃদ্ধ রাজপুত্র প্রথম দণ্ডবৎ পাঠতে পাঠতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়াছেন তবুও বৃদ্ধ রসিকতা চাঙেন নাই; একটা স্ত্রীলোক কচকগুলি সম্মান সন্ততি লইয়া চলিতেছে; বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ মহাসা বদনে বলিয়া বলিলেন, “তোমা ক দেখিলে আমার পোষে পাহের কথা মনে পড়ে।” অর্থাৎ সম্মানগুলি যেন বৃদ্ধীকে বেড়িয়া আছে। আর স্ত্রীমহল চলেতে উচ্চ হাসি উল্লিখিত হইল। যুবতী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া রাত্তা দিয়া চলিতেছে। যুব গণ আসিয়া ঠাঠাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে “তৈ সুন্দরী, তোমার গায়ে মেলা মোমাছি বসিয়াছে; ফুলের গন্ধে।” যুবতী উত্তর করিল—“এই মোমাছি ফুল ফুঁসে না তোমার ভয় নাই।” আর রাত্তাময় কেবলই হাসির চড়াছড়ি পড়িয়া যায়; তহা মণিপুরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটা বয়স লক্ষ্য করিয়া আমি অবাধ হইয়া গিয়াছি।

\* “সোনার বাজার” যদি আট ঘটিকা পর্যন্ত কেনাবেচা শেষ করিয়া ভাঙ হইয়া থাকে। সন্ধ্যা আগত হইবামাত্র ‘সোনার বাজার’ দীপমালায় আলোকিত ও তহা হাসিতে থাকে। ইহাকে যদিও দীপমালা বলা বাহ্যেতে পারে না; কেন না মণিপুরে পাইন বৃক্ষ প্রচুর, এই কাজাপাইন টুকরা অগ্নি সংযোগে জ্বালাইয়া কেনাবেচা চলিয়া থাকে। দূর হইতে দেখিতে গেলে মনে হয়, আলোর আর অগ্নির মত, এই আলোকসুমুষ্টি বাজারের খুরিতেছে। সে কি চমৎকার দৃশ্য! যেন শত শত জোনাকী ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া কেড়াইতেছে—সে দৃশ্য বড় মনোরম—বর্ণনায় তাহা চিত্রিত করা অসম্ভব। যখন বাজার ভাঙে তখন রাত্তাময় দীপমালায় আলোকে আলোকিত হয় তখন রাত্তার সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, রাত্তাময় গোলাপের চড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। “সোনার বাজার” হইতে পরীক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছে। এখন “সোনার বাজার” শুদ্ধ এবং জন প্রাণীশূন্য।

প্রত্যেক আমোদপ্রমোদের জনতার মধ্যে স্ত্রীলোকের জনতাই অধিক। আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতে গেলে অশ্লীলতা বৎসরের বৃদ্ধ ও আসিবে এবং কোলের দুগ্ধ পোষাটীও মাতৃপৃষ্ঠে চড়িয়া সমাগত হয়। মনিপুরীগণ জাপানীদের মত শিশুদের পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লয় এবং এ দরুণে কার্য্য সৌকর্য্য্য হইয়া থাকে কিন্তু কোন শিশুই কাঁদিয়া সভাভঙ্গ করে না। বিষয়টা আমার অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইল। শিশুর ক্রন্দনে কলিকাতার থিয়েটার দেখা যেমন দার হইয়া পরে, মনিপুরে এই উৎপাত নাই কেন? এই শিশুরা কি কাঁদিতো জানে না? জানে কিন্তু “নট অপারগ।” অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম তাহারা সঙ্কটে পড়িয়াছে। মা তাহাদের মুখের মধ্যে কাঠের গুলি পুরিয়া দিয়া স্ত্রুতার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কাণের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে। চাঁৎকার করা তাহাদের অধিকার মাত্র নাই। মা যখন দুগ্ধ ভার সহিতে না পারেন তখন শিশুটিকে পিট হইতে নামাইয়া প্রমোশন দিয়া কোলে আনিয়া পীষুবপূরিত স্তন শিশুর মুখে পুরিয়া দেন। শিশু পীষু খাইয়া তৃপ্ত হইতেছে এবং মা উপস্থিত দৃশ্য দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা একটা দৃশ্য বটে। আমি ভরসা করি, কলিকাতা থিয়েটার কোম্পানী ইহার অনুকরণ করিবে এবং বিজ্ঞাপন দিবে, ভবিষ্যতে আর দর্শক এবং অভিনেতার কান ঝালাপালা হইবেক না। Flirtation স্ত্রী স্বাধীন দেশে প্রচলিত আছে ইহার বাঙ্গলা কি হইতে পারে, আমি জানি না। বাঙ্গলার অবরোধ প্রথা থাকার দরুণ সেই রসিকতা অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু মনিপুরে Flirtation রসিকতার সহিত এবং রসের কথায় অনুবাদনে খুব বেশী রকমে প্রচলিত আছে। Flirtation বিবাহ ও Divorce অনেক ক্ষেত্রে আনয়ন করিতে দেখা যায়। মনিপুরেও বাদ পরে নাই। তবে রসিক দেশের রসিকতা দেখিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তিগণই সরস হইয়া উঠে সেই বিষয় সন্দেহ নাই। মনিপুরী পুরুষগণ মাথায় উকীয় পড়িয়া থাকে এবং নিজহাতে রংকরা কাপড়ে উকীয় বাঁধিয়া থাকে। ঈষৎ গোলাপী অথবা কুম্ভুমে রংয়ের উকীয় আদরের সহিত বাঁধিয়া থাকে। রাত্তার শুনিতে পাইলাম যুবতী যুবককে ফরমাইস্ করিতেছে, “তোমার পাগড়ীর ন্যায় আমার সাড়ী রঙ্গাইয়া দাও না?” তখন স্ত্রীমহলে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। অবার তখন যুবক উত্তর করিল “আমার গোলাপীরং নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কারণ, অন্তর চাদর তাহা দিয়া রঙ্গাইয়া ফেলিয়া ছ।” তখন যুবক-মহলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। এই প্রকারে রসিকতা ও রসের কথায় মনিপুর সদা মুখরিত, ওদেশ আনন্দে দেশ নিঃখল রস-মন্দাকিনী অন্তরে অন্তরে তথায় প্রবাহিত। মনিপুরের Political Agent ১৮৭৪ সালে Major General Sir James Johnstone, K. C. S. I., তাহার প্রণীত “My Experiences in Manipur” এ লিখিয়াছেন ;—

Close to the gateway is the place where the grand-stand is erected, from which the Rajah and his relations view the boat races on the Palace moat. I say ‘view,’ as in old age a Rajah sits there all the time; but in the prime of life he takes part in these races, steering one of the boats himself. These boat-races generally take place in September when the moat is full, and are the great event of the year. Everyone turns out to see them, the Rances and other female relations being on the opposite side of the moat, for in Manipur there is no concealment of women, while the side next to the road is thronged with spectators. The boatmen have a handsome dress peculiar to the occasion, and the whole scene is highly

interesting. The boats are canoes hewn out of single trees of great size, and are decorated with colour and carving”.

Page 108.

ভাবার্থ—রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার-সন্নিকটেই রম্যমঞ্চ, তথা হইতে রাজা ও রাজপরিবারবর্গ চূর্ণপরিখায় নৌকা-বাইজ দেখিতেন, সেপ্টেম্বর মাসে পরিখা পূর্ণনলিলা—তখন বাইজের ধুম পড়িয়া বাইত। নৌকাগুলি ডোলা, বড় বড় বৃক্ষ খোদিতা প্রস্তুত; বিবিধ চিত্র-বিচিত্রে শোভিত। রাজা স্বয়ং নৌবিহারে মত্ত হইতেন, পরিবার উভয় পার্শ্বে জনতা, জীপুরুষের সমাবেশে সে এক অপূর্ণ দৃশ্য!

হার, মণিপুত্রের এই চমৎকার দৃশ্য এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি!

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

## পাগলী।

—:~:—

আমাদেরি এই আঙ্গিনা-কোণে

সঙ্গোপনে

নাচে যেথায় নিমের ছায়াখানি,

নেবু ফুলের গন্ধটুকু বাতাসে দেয় আনি

ছোটবেলার মধুর স্মৃতিসম,

বাঁশের বেড়া ঢেকে আছে বুম্বক লতায় নিরুপম;

ইহারই এক কোণে

ছুই নয়নে

বাকুল দিঠি তার

দাঁড়াল সে যেদিন এসে, আকাশ-ভরা মেঘের অন্ধকার।

ব্যস্ত ছিলাম কাজে

তাহার মাঝে

কোন মতে দেখি নয়ন তুলি'

সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে তাহার গ্রন্থি বাঁধা কাপড়গুলি

লুটিয়ে আছে ধুলার 'পরে;

অবতনের স্তরে

মুখখানিকে ঘিরে আছে বহু দিনের ঘন জটা-রাশি,  
 চোখে তবু কি এক মৃদু হাসি !  
 উষার শশীকলা যদি বিবর্ণও হয় !  
 তবু দিয়ে যায় সে পরিচয় !

তার পরেতে অবাক হয়ে দেখি  
 বুকের মাঝে এ কি !

শীর্ণ শিশু ঘুমিয়ে আছে মাতার আলিঙ্গনে,  
 ভাবনাহারা শাস্ত মনে !

অস্থিগুলি অনাহারে  
 দৈত্যসম শিশুটিকে গিলতে যেন পারে !  
 মৃত্যু-ঘেরা ফ্যাকাসে মুখখানি,  
 পাজর-ঢাকা বুকের মাঝে থামে নি' ক প্রাণের ধুকধুকানি !  
 মাতার চোখে দারুণ ব্যাকুলতা ;—  
 অকথিত দুঃখের ব্যথা  
 কাঁপে গভীর শ্বাসের ধারায়  
 অশ্রু যেন কঠিন হয়ে জমে গেছে হাসির কারায় !

এক পলকে পড়ল বাধা কাছে  
 হাতের মাঝে  
 হাতের সেলাই রইল শুধু থেমে  
 আঁখিজলের পর্দা আমার চক্ষে এল নেমে !  
 কাছে ডেকে বসাই তারে  
 সহবাতার গভীর অশ্রুধারে  
 শুনি তাহার জীবনকথা  
 —কত গভীর দীর্ঘশ্বাসে কত গভীর ব্যথা  
 উঠল হুলে হুলে  
 গৃহহারার দুঃখে যেন প্রাণের কূলে কূলে !

দারিদ্র্য কি জানত না সে  
 বড় স্নেহে ছিল স্বামীর পাশে,

—ধনীঘরের বধু

পেয়েছিল সুখৈশ্বর্য মধু ;

খাটতে কড়ু হয় নি এতটুকু

পদ্মাটাকা আক্ৰ মাকে সূর্য্য-শশী দেখে নি তার মুখ !

কপালে তার সইল না রে,—

নূতন প্রেমে স্বামীর হিয়া মজ্জল একেবারে ;

সতীন এসে তাদের ঘরে নিল এবার বাসা,

চিরদিনের সুখসাধের অশা

চূর্ণ হয়ে পড়ল ধূলি-লীন ;

তার পরে এক দিন

স্বামী তাদের তাড়িয়ে দিল পথে ।

একটি ছুটি গয়না যাহা বাঁচিয়েছিল কোনমতে

অঙ্গ হ'তে খুলে তাহা মাটির দরে বেচে,

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা যেচে

কোন মতে বাঁচিয়েছে এই কচি শিশুর প্রাণ,

—বাঁচিয়েছে তার নিজের দেহখান্ !

দিন চলে না আর

দু'দিন হ'তে অন্ন মেলা ভার ;

দুগ্ধ শিশুর লাগি ? সে ত স্বপ্নাতীত আশ ;

—সুচিয়ে দেহ-বাস

বল্লৈ কেঁদে পেটে যাহার নাইক কণা ক্ষুদ্

স্তনে তাহার নামবে কেন দুধ ?

আমার চোখে বহা এল নেমে

মাতৃপ্রেমে

মুগ্ধ হ'ল হিয়া,

তৃপ্ত করি তৃপ্তি লাভি সাধ্যমত দিয়া ।

এমনি করে যেদিন হতে ভাঙ্গল তাহার ভয়

ইচ্ছামত এসে হাজির হয়,

ছুখে স্নেহে কেঁদে হেসে বলে মনের কথা

শিশুর লাগি জানায় ব্যাকুলতা

আদর করে সোহাগ করে নারী ;

চোখে আমার নামে নয়ন-বারি

ওরে অবুঝ মাতৃস্নেহ, ওরে মুঢ় মুগ্ধমতি !

বুঝিস্ নাকি আসছে নিভে জ্যোতি

তৈলহারা দীপাধারে ?

বুঝিস্ নাকি একেবারে

বড় প্রথর সূর্য্যতাপে বড় কোমল কলি

মৃত্যু-কোলে পড়ল বুঝি ঢলি ?

অন্ধ স্নেহে মাতা

কোন মতে বুঝল না তা, বুঝল না তা !

বর্ষা গেল নিয়ে তাহার নিবিড় ঘনঘটা

মেঘাস্তীর্ণ জটা,

এল শরৎ গেল শরৎ ফিরে

স্বচ্ছ নীলাকাশের পরে ছায়ালোকের পথটি চিরে চিরে !

পাকা ধানের গন্ধ মেখে গায়ে

হেমস্তেরই স্বর্ণদ্যুতি অস্ত গেল চপল লঘু পায়ে ;

শীতের হাওয়া বইল বনে

শুক পাতা পড়ল করে ; আবার সন্মোপনে

সূর্য হ'ল নবরসের কেলি,

নবীন কচি পল্লবেরই দারুণ ঠেলাঠেলি !

আমাদের ঐ উঠানটিতে

কোথায় ছায়া কোথায় আদোঁ বিছিয়ে ছিল চারিভিতে

চন্দনেরই প্রলেপ সম স্বর্ণরবিকরে,

নিমের ছায়া কাঁপতেছিল চপল লীলা ভরে !

হাতে কোন ছিল না কাজ আর

স্তব্ধ চারিধার

ছুটে এল নারী তাহার শিশুটিকে বক্ষে নিয়ে  
 সযতনে ঢেকে আঁচল দিয়ে,  
 বল্লেন হেসে “বাছা আমার ঘুমিয়েছে আজ এতদিনে  
 দুধ বিনে  
 কাঁদত শুধু দিনে রাতে  
 থামাতে যে পারিনি তায় হাজার সান্ত্বনাতে !”  
 এবার নারী হাসল হা হা করি’  
 পরম স্নেহে মুখের কাছে মুখটি তুলে ধরি  
 চুমার পরে কেবল দিল চুমা  
 বল্লেন “বাছা ঘুমা ঘুমা !”  
 আমি এবার অবাক হয়ে চেয়ে দেখি  
 কি ভয়ানক, কি অপরূপ কাণ্ড একি !  
 কাঠের মত কঠিন এষে শিশুর দেহটুকু,  
 —রক্ত হারা মুখ ;  
 মৃত শিশুর মুখে মুখে একি সোহাগ তার,  
 দিনের আলো ঠেকল অন্ধকার  
 মুদে এল আপনি ছনয়ন,  
 অস্থিগুল কাঁপিয়ে দিল কি যে ভীষণ দারুণ শিহরণ !  
 পায়ের তলে ধরণী মোর উঠল ঘুরে ছলে  
 দেখি নয়ন তুলে  
 নারী এবার মহানন্দে ছুটছে পথের ‘পরে  
 হাসির ধ্বনি কাঁপছে শুধু হাওয়ার স্তরে স্তরে ।

## প্রাচীন ভারতে সমাধি প্রথার অকাটা প্রমাণ ।\*

একটা তুচ্ছ Aeroplane গড়ের মাঠে কাৎ হইয়া পড়িল, আর তাহার চারিদিকে অগণ্য লোকের ভিড়  
 জমিয়া গেল। পুলিশ পাহাড়া, বেত, বাত, ও রসারসির কন্সর ছিল না। তথাপি দর্শকের অভাব হইল না।

\*ঐতিবাদ সাদরে গৃহীত হইবে। লেখক।

বেন উহা একটা অপূর্ণ বস্তু! কেন হে বাপু, এত আগ্রহ কিসের? আমাদের দেশে কি Aeroplane ছিল না? ছিল না ত পুস্পক-রথটা কি? ‘মেঘনাদ মেঘের ভিতর হইতে অন্তানিক্ষেপ করিতে লাগিলেন’ ইহা কি একটা গাঁজাখুরি? মেঘনাদ অশ্বারোহী ছিলেন না বলিয়াই কি এ কথা অবিশ্বাস করিতে হইবে? শুনিতে পাই দেবগণ বিমানপথে বিহার করিতেন। মাধ্যাকর্ষণ যাহাদের আবিষ্কার, সেই আর্থশ্বিগণের কি একটুকু ধারণা ছিল না যে বিমানে নিরলস হইয়া বিহার করা অসম্ভব? তবে তাঁহারা এমন কথা বলিলেন কেন? নিশ্চয়ই বিমানযানারোহী দেবগণের সম্বন্ধে একথা বলিয়াছেন। সেকালে বিমানযানের এত বেশী প্রচলন ছিল যে বিমান-বিহার বলিতে যাহ্নের উল্লেখ করিতে হইত না। আমরা যখন বলি ‘তিনি জলপথে যাত্রা করিলেন।’ তখন কি কেহ মনে করেন ‘তিনি জলের উপর’ দিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন? এও সেইরূপ। অতএব দেখা গেল Aeroplane একটা নূতন কিছু নহে। আমাদের দেশে একালের অপেক্ষা ভাল ভাল Aeroplane ছিল, অজস্র। শুধু Aeroplane কেন, সেকালে এদেশে সবই ছিল। এপর্যন্ত নূতন কিছুই হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না।

ইহাই যখন স্থির হইল, তখন বুঝা যাইতেছে সেকালে গোর দিবার ব্যবস্থাও ছিল। মৃতদেহ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ উপায় যে গোর দেওয়া, বা ইহাই যে সভ্যতার একটা লক্ষণ, সে আলোচনা নিম্নাঙ্গোক্ত। যখন দেখিতেছি বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার উক্ত প্রথা প্রচলিত তখন তাহা নিশ্চয় ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।

সকলই জানেন মৃত দেহের অগ্নি সংস্কারের বিধি বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। আমরা শবদাহ করিয়া তাহার অগ্নিসংস্কার করি, এবং এইরূপে শ্বিগণের আদেশ পালন করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিত হই। এরূপ ভাবিব’র কারণ আমরা অগ্নি বলিতে আগুনকেই বুঝি। একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, আমাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। শ্বিগণ কখনও আগুনের প্রাতিশব্দরূপে অগ্নিশব্দ ব্যবহার করেন নাই। প্রথমতঃ আমরা জানি রাম লক্ষণ ও তদীয় ভক্তবৃন্দের সমক্ষে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন—আপনার নিষ্কলুষতা প্রমাণ করবার জন্য! ইহারা কি উদ্ভাদ ছিলেন যে তাঁহাকে আগুনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট রহিলেন? অগ্নি যদি আগুন হইত তাহা হইলে সীতা কি অক্ষত শরীরে বাহির হইবার আশা করিতে পারিতেন? কখনই না। দ্বিতীয়তঃ—শ্বিগণ অগ্নির পূজা করিতেন। আগুনের পূজা অসম্ভব, কারণ আগুন জড়। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাগণ জড়ের উপাসনা করিতেন একথা অশ্রদ্ধের। আগুন শ্বিদিগের মনে ভক্তির উদ্ভেক করিবে কিরূপে? যাহা হইতে অপকারের সম্ভাবনা আছে তাঁহাকেই আমরা ভক্তি করি, তাঁহার কাছেই আমাদের যত নতিস্তুতি। আগুন শ্বিদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারিত না, কারণ তাঁহাদের আটচালাও ছিল না, পাটের গোলাও ছিল না। তাঁহারা ছিলেন হিংস্রশ্বাপদসমূহ নির্জন্ম বনবাসী! আগুন ইহাদের অনেক উপকারেই আসিত! যিনি উপকার করেন, তাঁহাকে আমরা আশীর্বাদ করি, যদি উপকার আশাহীন হয়, আর না হইলে গালি দিয়া থাকি; কিন্তু পূজা করি না, একমাত্র যিনি অপকার করিতে পারেন তাহারই পূজা করিয়া থাকি। আমরা শীতলার পূজা করি, ঈশ্বরের পূজা করি না। আমরা কালীর পূজায় যত আগ্রহ, ভদ্রকালীর পূজায় তত নহি। হরিচাঁড়ের পায়ে মাথা লুটাইয়া দিই কারণ ইনি রুষ্ট হইলে আমার বংশলোপের সম্ভাবনা, কৃষ্ণদাস পালকে কিন্তু বসিতে আসন দিই না। সাতদিনের অন্ন তিনদিনে আয়োগ্য করিতে না পারিলে চিকিৎসকের বাপাস্ত করি, কিন্তু পূজা করি না।



ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় অগ্নি ও আগুন এক পদার্থ নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করিবেন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন নহে আরসুলা। আরসুলা আগুনের মতই রক্তবর্ণ কিন্তু আগুনের মত জড় নহেন। ইনি চেতন। ইহার পূজার মহাহোমের মানহানি হয় না। ইনি শিখী, ইহার মস্তকে নিয়ত চঞ্চল দুই দুইটা শিখা কখনও দক্ষিণাবর্তে, কখনও বামাবর্তে ঘুরিতেছে। ইনি হর্কিই,—স্বর্ষিধা পাইলে হবিঃ বহন করিতে ইনি কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। ইনি সর্বভুক,—ইহার অখাদ্য ত কিছু দেখিলাম না; উৎকৃষ্ট মোহনভোগ হইতে নিকৃষ্ট জুতার কালাও পর্য্যন্ত সর্বত্র ইহার সমান রুচি; বইএর মলাটই বল আর সাটের প্লেটই বল, ইহার দস্তখত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ইনি দেবতা, কারণ ইনি দীঘাতি; এমন দীপ্তি ত কাহারও দেখি নাই। ইনি বায়ুসখ,—বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণে ক্ষণে শূন্যমার্গে বিহার করিতে থাকেন। কথায় কথায় উর্দ্ধে উঠিয়া ফুৎ ফুৎ করেন বলিয়া ইনি উর্দ্ধফুৎ। শুধু উর্দ্ধে কেন? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র ইহার অবাধ গতি; চৌবাচ্চার জলে ইনি, চায়ের কেটলিতে ইনি, গরম মসলার ভাণ্ডে ইনি, পালং শাক চড়চড়িতে ইনি, পেটকনিবন্ধ শালের স্তরে স্তরে ইহার অস্তিত্বের অক্ষয়নিদর্শন মুদ্রিত দেখিতে পাই। দেবতা না হইলে এত শক্তি ইনি কোথা হইতে পাইলেন?

একদিন উনপঞ্চাশৎ পবনধ্বনিত চন্দ্রস্বর্ষাগ্রহনক্ষত্রাবলী সাগরগর্ভে বারিবিষয়ৎ অনন্তে বিলীন ছিল। সেই মহাপ্রলয়ের মহাশূন্যতার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল এক বিরাট সমুদ্র, একটা শেব সর্প, তদুপরি চিরশয়ান নারায়ণ, তাঁহার নাতিপদ্মনিষঙ্গ ব্রহ্মা, তদ্রচিত বেদ ও সেই বেদের মধ্যে এই আরসুলা। ব্রহ্মা প্রফ সংশোধনমানসে পুঁথি খুলিতেই ইহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। পরম বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিলেন ‘এ অপূর্ব পক্ষী কোথা হইতে আসিল?’ ইহা ত আমার সৃষ্ট নহে, সৃজ্যমান বিশ্বের কল্পনা ছবি এখনও আমার মনোবিন্দুতে মুদ্রিত হয় নাই। ইহা নিশ্চয় বেদ হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। তখন আনন্দে আত্মহার্য হইয়া তিনি চীৎকার করিলেন “অয়ং জাতো বেদাং।” উদাস্ত, অমুদাস্ত ও স্বরিতসংযোগে সমুচ্চারিত সেই মহাবাকী অনন্ত বায়ুসমূহ মথিত করিয়া, দিগ্দিগন্তে প্রবাহিত হইতে হইতে একদিন মর্ত্যবাসী ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দেশকালের বিপুল ব্যবধানবশতঃ একটু বিকৃত হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। শিষ্যেরা শুনিলেন “অয়ং জাতবেদা।” সেই অবধি আরসুলার নাম হইল জাতবেদা। সেই অবধি দেশে দেশে, দিকে দিকে, আরসুলার পূজা প্রবর্তিত হইল। পাষণ্ড প্রাসাদ হইতে জীর্ণ পর্ণশালা পর্য্যন্ত বিবিধোপচারতুষ্ট আরসুলায় ভরিয়া গেল। আরসুলার প্রভাব সমস্ত ভারতের মানচিত্র রক্তাভ হইয়া উঠিল।

“পুরাকালে অগ্নি সংযোগে মৃত দেহের সংস্কার করা হইত” বলিলে বুঝিতে হইবে “মৃত দেহকে আরসুলা সহযোগে সংস্কৃত করা হইত।” এই আরসুলা সহযোগ ঘটিত কিরূপে! সকলেই জানেন আরসুলার প্রিয় বাসস্থান বাক্স, সিঁদুক প্রভৃতি। শবকে বাক্সে বন্ধ করিয়াই যে তাহার অগ্নি সংযোগ বা আরসুলা সংযোগ করা হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বাক্স অবশ্য Coffinএর রূপান্তর। Coffinএ বন্ধ করা হইত এটাই যখন মানিলাম তখন সেই Coffinকে ভূগর্ভে নিহিত করা হইত এ টুকুই বা মানিব না কেন? ভূগর্ভে নিহিত না হইলে সে সকল Coffin গেল কোথায়? পৃথিবীর উপরে রক্ষিত হইলে ত হিঙ্গু স্থান এতদিনে Coffin এই ভরিয়া উঠিত। অতএব স্থির হইল প্রাচীন ভারতে মৃত দেহকে Coffinএ বন্ধ করিয়া ইউরোপীয় প্রথার গোর দেওয়া হইত।

এত গেল মৃত দেহের কথা। সে কালে অনেকে জীবদ্দশায় আরম্ভলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মসংসার করিতেন। তন্মধ্যে জানকীর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যিনি আরম্ভলাকুলিত কক্ষে, অনারত দেহে এক রাত্রিও বাপন করিয়াছেন তিনিই বুঝতে পারিবেন জানকীর এ অগ্নি-পরীক্ষা কি কঠোর !

## তীর্থ সলিল।

—:~:—

কবে শুনেছিছু গান করুণ মধুর  
ভাষা তার মনে নাই, শুধু সেই সুর  
বাঞ্ছিতেছে চিত্ত মাঝে; একটা চরণ  
হৃদয়ের তালে তালে করিছে নর্তন;  
সতত শুনি কে গায় আকাশে অনিলে  
‘ভরিয়া এনেছি কুন্ত নয়ন সলিলে’

\* \* \* \*

হে দেবতা, এসেছিছু এ ভূবন পবে  
তব অভিষেক বারি সংগ্রহের তরে।  
জানি যে গো এ হৃদয় সিংহাসনে মগ্ন  
বরিয়া লইতে হবে, শুগো অনুপম,  
তোমারি মুরতি খানি; জানি তারি লাগি  
ফিরিতেছি শত তীর্থে পুত করি মাগি;  
“ভরে নিতে হবে মোর হৃদি কুন্ত খানি  
রূপ-রস-গন্ধ-গীত বারি ধারা আনি।  
তুমি জান হৃদি কুন্ত ভরিবার তরে  
ফিরিয়াছি কিনা শত লোক লোকান্তরে;

দিবস নিশীথ, আলো ছায়া, হৃদয় ভর  
 সুখ দুঃখ, হানি অশ্রু শত রূপময়  
 চঞ্চল সুন্দর তব ধরণীর মাঝে  
 তুমি জান ফিরিতেছি সদা কোন কাজে ।

অন্তর নয়ন মেলি প্রথম যে দিন  
 চেয়েছিলাম ধরা পানে মধুর নবীন,  
 পরিপূর্ণ প্রাণখানি অসীম আশ্বাসে  
 উথলি উঠিল মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ।  
 সে শৈশব তীর্থে প্রভু মনে পড়ে আজ  
 দেখেছিলাম সে কি রূপ তব রাজ রাজ  
 পরিপূর্ণ বিশ্বখানি আলোকে সৌরভে,  
 পরিপূর্ণ চিত্তাকাশ কি সম্মীত হবে !  
 মনে হত সুখ অতি সহজ সুলভ,  
 পেয়েছি যে এ ভুবনে কি মহা গৌরব !  
 এ বিপুল বিশ্ব তব ছিল মোর প্রভু  
 সাধের খেলার ঘর ; কাবো কাছে কভু  
 ছিল না সন্দোহ ভয়, সবাই আমার  
 নিতান্ত প্রাণের ধন ; আমি সবাকার ।  
 আকাশ বাতাস আলো স্নেহে সখা সম  
 গিরে রেখেছিল মুগ্ধ দেহমন মম ।  
 অযাচিত এত সুখা ত'রেছিল মন  
 চাহিতে বাসনা তাই হয়নি কখন ।  
 ভরুণ জীবনখানি লুপ্ত পদ তলে  
 বুদ্ধ করি, 'রিক্ত করি,' রেখেছিলাম মেলে ।

সৃজন গঙ্গোত্রী হ'তে আনন্দ তরল  
 ত্রীচরণ ধৌত করি ঝরে অবিরল,—  
 তারি বিন্দু গিন্দু দিয়ে দিতেছিলে ভ'রে  
 এ জীবন-পাত্রখানি নিজ হাতে ধ'রে।  
 তরুণ সে আনন্দের কোল হল হ'তে  
 অসীম অতৃপ্তি ভরি' ল'য়ে হৃদয়েতে,  
 সম্মোর উদাস প্রাণ দাঁড়াইলু আমি  
 এ কোথায়! চারিধারে একি মৌন হাসি!  
 মনে হয় ফিরে ফাই পরিচিত ঘরে,  
 কিন্তু কে ডাকিছে কোথা অসীমের পায়ের!  
 কি ভাষা উঠিছে ফুটি নয়ন উপরে,  
 কি সঙ্গীত অজানিত বরিছে অশ্রবে।  
 সৃষ্টি শতদলে বসি' কে হাসিছে হাসি,  
 বিধ অস্তুরাল হ'তে কে বাজায় বাঁশী।  
 সে হাসি, সে বাঁশী মিলি সৃজন লহরী  
 অসীম চ'লেছে রচি। নিশি দিন কিরি  
 যেন তারি পাছে আমি; কে বলিবে হায়  
 সে হাসি সে বাঁশীখানি কোথা দেখা যায়!  
 জানি না কি চাই আমি, খুঁজে ফিরি কারে  
 শ্রদ্ধাহীন, অগতের বাহিরে, মাঝারে।  
 বিশাল সংসার তটে, বিজনে গোপনে  
 ব'সে থাকি একা; মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে  
 কি দুঃখা, কি পিপাসা, দেখেছিল প্রভু,  
 সে রহস্য সমাধান করিবে কে কভু?  
 সে কৈশোর তীর্থ মাঝে দাঁড়ায়ে না জানি  
 কি রহস্য রসপূর্ণ যদি কুন্তখানি।

তার পরে আনিলে এ মোরে কোন লোকে,  
 ডুবে গেল সব চিন্তা স্বপ্নীয় পুলকে ।  
 কুহিলিকা নয়নের ছিন্ন করি' মম  
 কে আগিল প্রভাতের নব বরি সম  
 অসাম রহস্য মাঝে পথ করি' ধীরে  
 লয়ে চলে মোরে কোন অমৃতের তীরে ।  
 স্তম্ভুর স্তম্ভুর সে রহস্য মাঝে  
 স্তম্ভুরে ডুবিব প্রাণ । কি যে গীত বাজে  
 আনন্দ মুচ্ছনাময় এই বিশ্ব তারে,  
 হৃদি তন্ত্রী সেই সাথে নিয়ত বন্ধারে ।  
 কি আনন্দ বেদনা সে । ধরি হাতে হাতে  
 চলিতে এ জগতের সীমাহীন পথে !  
 নবীন মাধুরী দেখি চারিধারে কিনা  
 বর্ণগন্ধগীতময় । কি মন্দির ভিত্তি  
 কুটে ওঠে ধরে ধরে অন্তর নধনে,  
 দৌহার হৃদয় দিয়ে বুঝি দুই জনে  
 কি আনন্দ বেদনা সে শুনি থেকে থেকে  
 দৌহার হৃদয় ভাষা বুক বুক রেখে ।  
 আর,—দুই জীবনের তুমি ক'ধার  
 একই তরঙ্গী পরে ; এই পারাবার  
 প্রশান্ত চরণ স্পর্শে । দুটা হৃদি তারে  
 একই সুর বাজে ওব অঙ্গুলি বন্ধারে ।  
 সেই সে যৌবন তীর্থে জীবন আমার  
 প্রেমানন্দ রস পূর্ণ সম্পূর্ণ আবার

\* \* \* \* \*  
 একি লীলা পুনঃ ভস ! সংসারে তোমার  
 জীবনান্ত ঘটিব কি একাকী আবার ?  
 এ ভুবন যাত্রা মোর অবসান হ'লে,  
 বরণ সজ্জিত ওব গারিবীর কালে

না যদি বন্ধারে প্রভু আনন্দের তার  
দাসীরে কমিয়ো তবে ; জীবন আমার  
চূর্ণ যে ক'রেছ প্রভু আপনাব হাতে  
আনন্দের তারখানি ছিল সেই সাথে ।  
ভল লাগিল না নাথ এক হাসি গান,  
এ হৃদয় অনলে তাই দহিল পুরাণ ?  
কত সাধে ভরা গোর হৃদি কুন্তখানি  
নিমেষে শুপায়ে গেল কখন না জানি !  
আবার ঘূর্ণিতে হবে যুগ যুগান্তর,  
ভরিয়া তুলিতে হবে শূন্য এ অন্তর ?

আমায় কমিয়ো তবে, আগ্নেয় যখন  
অভিসেক বারি তব কবিত্তে গ্রহণ,  
শত বর্ণে ঝলসিত উচ্ছলিত বারি—  
পাদমলে প্রভু যদি না ঢালিতে পারি,  
ছিল হৃদি গাহে যদি নমি পদতলে  
“ভরিয়া এনেছি কুম্ব নয়নের জলে” ।

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী।

## বিচিত্র-সংগ্রহ।

—:~:—

কাপ্তেন ওয়েবার যখন ভারতবর্ষে সৈন্ত বিভাগে কাজ করতেন তখনই তাঁর দুইটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। সেই অবধি তিনি বিলাতে গিয়ে মুরগীর বাবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি গিয়ে পর্যাশ্রয় পর্ণেশ্বর বড় আশ্চর্য্য রকম প্রথর হয়ে উঠেছে। এই শক্তির সাহায্যে তিনি কোনও একটি মুরগীর গা ছুঁয়ে বলতে পারেন সেটি কোন জাত, কত বয়সের, কেমন তার ডিম হবে, সে ডিমগুলিই বা কত বড় হবে। আবার ডিমের উপর ওষ্ঠ ছুঁয়ে তিনি বলে দিতে পারেন ডিমটি কত দিনের। এখন আবার তাঁর এ শক্তিও হয়েছে যে তিনি কোন জায়গায় গিয়েই বলে দিতে পারেন সে জায়গায় মুরগী পোষা যাবে কি না। শক্তির সাধনাই শক্তিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেক লোকের মনে অনেক রকম বাতিল দেখা যায়, কেউ বা পুরাণ মুদ্রা, কেউ বা নানা দেশের ছবি আবার কেউ বা নানা দেশের ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করে। পরলোকগত ট্যাপলিং সাহেব বিলাতের “ব্রিটিশ মিউজিয়ামে” এমন একটি ষ্ট্যাম্পের বই উপহার দিয়াছেন, এরকম দামী সংগ্রহের বই পৃথিবীতে বোধ হয় আরই আছে। বইখানির নাম পনেরো লক্ষ টাকা!

প্যারী সহরে যতগুলি সমিতি আছে তার মাঝে একটির নাম “মেটার আড্ডা।” বোকা শুটকে লোকেরা এ সমিতির সভা হতে পায় না, এখানে সুকলেই মোটা। এ মোটাদের আবার ছাড়িয়ে উঠেছে একজন সেবা মোটা, তার ওজন কত জানেন? চার মণ আট সের! মোটা বটে!!

এ পৃথিবীটা একটা চিড়িয়াখানা, এখানে যেমন নানা রকম জীব জানোয়ার আছে তেমন আবার হরেক রকম মানুষ; আবার রকম বেরকম রীতিনীতি! আমাদের যেমন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা গলে নমস্কার করে বলি “কেমন আছেন?” তেমন আবার আরব দেশের লোকদের সাফাং হলে তারা পরস্পরের গালে গালে ঘেসে নমস্কারের অভাব মেটায়। মগেরা আবহাওয়া শুকে বলে “বাঃ কাঃ থামা গন্ধ ত!” আর ইক্সর আবার কক্ষাঙ্গ লোকেরা জ্বিতে জ্বিতে চোকার। জাপানীরা তার চেয়ে কিছু সস্তা তারা জুতা পুতে বৃক্কের উপরে জুশের মত হাত রেখে বলেন “দাগকে দয়া করবেন!” সাউথ সি হীপপঞ্জের অভিগাদনের নিয়ম কিন্তু সব েরে ভাল, তারা অভিগতদের মাথার জল ঢেলে দেয়!

আমরা অনেক বোড়ার কথা শুনেছি খুব দামী কিন্তু গরুর দাঙ্গ খুব বেশী শুনি নি। একটি বড় আশ্চর্য্য খবর পাওয়া গেছে যে বিপাতে কার্ডিকের একটি প্রদর্শনীতে নিঃ এ ছে মাণাল নামে একজন গাভী ব্যবসায়ী একটি গরু বিক্রী করেছেন—এক লক্ষ সাতায় হাজার পাঁচ শো টাকার, অবাক কাণ্ড!

রেশমের ব্যবসায় জাপানী কারিগররা প্রায় রোজ সাতের পাঁচ আনা থেকে এগারো আনা পর্যন্ত মজুদী পায়। ইংলণ্ডে ঐ সব কারিগররা ঘণ্টার এক টাকা দুই আনা থেকে এক টাকা পাঁচ আনা পর্যন্ত উপার্জন করে আবার তারা সংখ্যায়ও বড় কম নয়। ইংলণ্ডে শুধু রেশম-ব্যবসায়ী লোক আছে ব্রিটিশ হাজার!

কোন নতুন ভাল বই লেখা হলই দেখা যায় ২০টি ভাষায় তার তর্জমা হয় কিন্তু বাইবেলের মতন কোন বইই নয়। ‘দি ব্রুটিশ অ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি’ থেকে ৩৭০ রকম ভাষায় বাইবেলের কিম্বা তার কোন কোন অংশের তর্জমা প্রকাশ করা হয়েছে! আর গত কয় বৎসর বৃক্কের সময়ে কত বাইবেল প্রচারিত হয়েছে জানেন? ৯০০০০০!!

অনেক ভাল লেখকের কথা শোনা যায় তাঁরা অনেক বই লিখে তার আয়ে স্বচ্ছল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু একটি বড় আশ্চর্য্য খবর পাওয়া গেছে, মিস হেলেন মাদার্স তাঁর বাইশ বছর বয়সে একটি উদ্ভাস লিখেছিলেন তার নাম “Com’in thro, the Rye” তখন তিনি এই বই বিক্রীর অর্থ থেকে কমিশন না নিয়ে ৪৫০ টাকার ঋণ-স্বত্ব ছেড়ে দেন। তারপর এই চল্লিশ বৎসর কেটে গেছে এখন পর্যন্ত বইটির কাটুতি সমান চলেছে। এই চল্লিশ বছরে বইখানির ৫৩ সংস্করণ বাহির হয়েছে আব এখন তিনি সিঁদাব করে দেখেছেন ঐ ৪৫০ টাকার পোড সামলাতে পারলে আজ তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকার মালিক হতেন! ‘সবুয়ে শেওয়া ফল’ কথাটি মিথ্যা নয়!

যখন বাচ্চাদের সব জিনিষ উচিত মূল্যে পাওয়া যেত সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেও আমেরিকায় কনের পোষাকের দাম খুব কম করেও ৪৫০ টাকা লাগত। সে সময়েও একটি কনের পোষাকে পঁচিশ হাজার একশো চল্লিশ টাকা লেগেছিল; পোষাকটি নাকি খুব সুন্দর রেশম তৈরী আর খুব দামী মণি-মুক্তায় খচিত ছিল। বাগ্গাটি বুটদার, লেসও চমৎকার। এই পোষাকেই দাম পড়েছিল সাড়ে সতেরো হাজার টাকা, হাতে বোনা রেশমী মোজার লেগেছিল এর শো পাঁচ টাকা, জুতার লেগেছিল ত্রিশ পঁচিশ টাকা, আংরাপায় সাড়ে সাত শো টাকা আর হাতের কম্বলে দেড়শো টাকা! চুন বঁ দা, নখ কাট, ইত্যাদির খরচ তবু ঐ সঙ্গে ধরা হয় নি!

সিনেটার কথা বারম্বারের পারপারীদের কাঁদতে দেখে অনেক সময় দর্শকদের কাঁদতে দেখা যায় কিন্তু সকলেই জানেন এই সব অভিনেত্রীরা সত্যি কাঁদে না, অভিনয় করে মাত্র! কিন্তু বারম্বারের বিখ্যাত অভিনেত্রী মে মারে একবার একটি নাট্য চিত্রে এক নরপোয়ুথ স্বামীর সহধর্মিণী সৈক্য শোকাভিভূত হয়ে কঁদেছিলেন কিন্তু তাঁর এই শোকের অভিনয়টা এমনই মতি হয়ে উঠেছিল যে অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পরও আধঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর অশ্রু কান্নাকে কিছুতে থামাতে পারেন নি! তিনি নিজে অববাহিতা আর স্বামীকে তিনি স্বপ্নেও দেখেন নি তবু তাঁর অভিনয়টা এমনই বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

## অনুভূতি।

( বাইবেলের ছায়া )

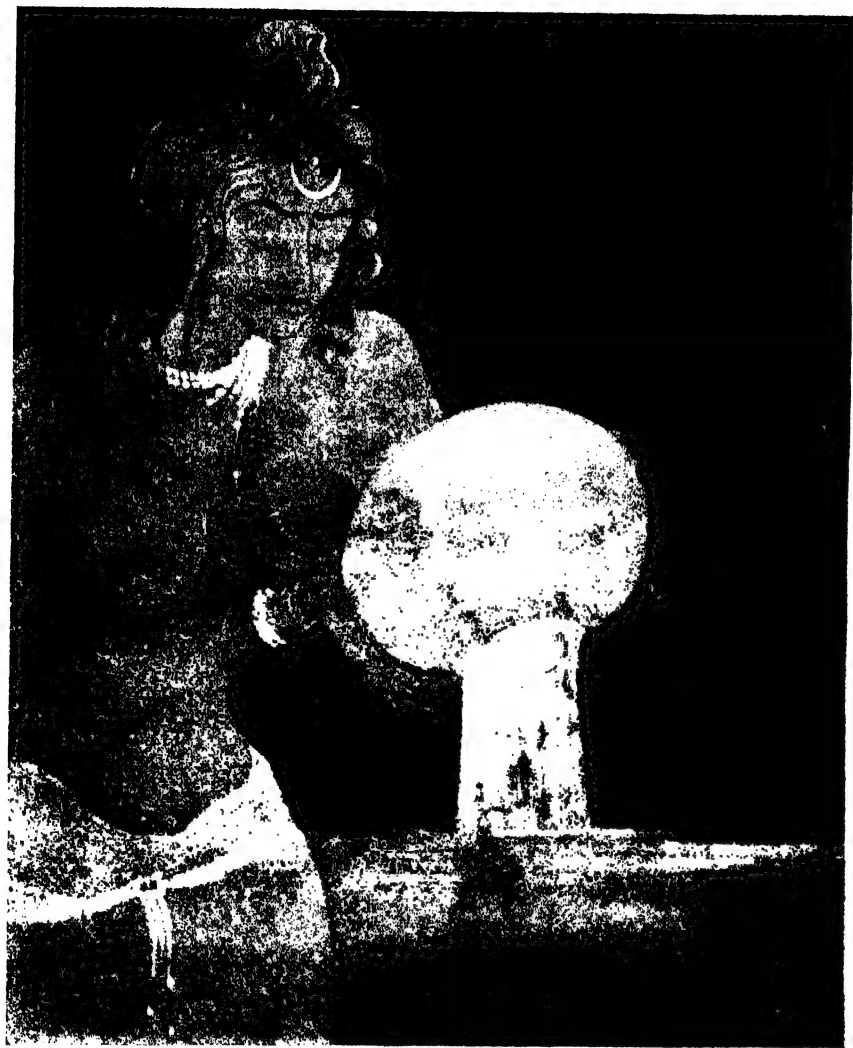
আমি অজানি জাগিনী কেন ?  
তাই তো ছুনের ভাষিনী কেন !  
হৃদয় আমার আঁড়ল ঢাগি,  
সারাজী রক্তনী কিসের লাগি !  
গভীর নিশীথে জাগিলে বৃষ্টি  
ডাকিল—“উঠ গো প্রেমসী বধু !  
ভাগ্যে হগো প্রিয়া ও কণ্ঠাভিনী,  
পুত পবিত্রা তুমার জিনি,  
তুমার আসারে তিতিয়া মরি,  
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছয়ার ধরি,  
খোলো গো ছয়ার—খালি এ গা,  
মাতিয়া আ গছে তীখিন ব—”  
ছায় মে বঁধুর কাতর বাণী  
—ধিক্ এ ভীবনে—কিছু না জানি!  
আছিহু কি কাল-অপনে ভোর !  
শুনছিল সব হৃদয় মোর ।  
বঁধু সে বখন গিয়াছে চল  
চির ছুখিনীরে কেন যে ছলি,  
হা হত হৃদয়। তখন তুই  
উঠিলি কাঁপিয়া—নিষেব ছই  
আগে কেন মোরে দিলি না সাড়া—  
ছুকের মাঝারে দিলি না নাড়া!—

উঠিলি কাঁপিয়া—আনিও কাঁপি  
উঠিহু—বঁধু—দাঁড়াহু—কাঁপি  
শিখিল বখন বুকের পরে !  
আঁধারে কেই নাহিক ঘরে ;  
কেবল সবার কথার রেশ  
কাঁপিয়া কাঁপিয়া হইয়া শেষ  
মিলাল আকুল বাধুর মনে !  
কোথায় সে কোন গঠন বনে  
মিলাল বঁধুয়া আকুল মনে !  
কোথা গেলে পাব হৃদয়-ধনে ?  
এই যে মামের অন্তর চুয়া,  
এই মুগমদ সুরতি গুয়া !  
এই যে এখনো রয়েছে হাতে !  
ছায় রে বজর পড়ুক মাথে !  
ছারাহু হাতের পদমলি,  
কোথা পাব সেই গুণের ধনি !  
তখন আসিহু বাহিরে ছুট,  
নিখিড় আঁধারে নয়ন তুটী  
পাইবে কাছারে ? আঁধার স্তূপ  
কি ঘন কি ধোর ! হৃদয় ভূপ  
কোথারে কোথারে ! ডাকিহু কত  
বুকফাটা ডাক—বঁধু যত



শাখার বসিয়া আছিল মধু  
 উড়িয়া পলাল গুলি সে রব ।  
 হৃদয়-বঁধু তো এলো না আর !  
 কোথা গেল কোন পাতা-পার ?  
 পুণে পুণে কত পাতা-বঁধু ;  
 পাইলু কি হৃথ কহিব কি তা !  
 পাহাড়া দেয় সে নিষ্ঠুর-মতি,  
 রেখিল তাহারা আমার গতি,  
 কত অপমান হৃদয়-হীন;  
 অঙ্গে অঙ্গে শোণিত-চিন্তা ।  
 অবগুণ্ঠন লইল খুলি,—  
 বঁধুর লাগিয়া সকলি তুলি ।  
 বঁধুর বিরহ শেলের বার  
 জ্বলিছে হৃদয়—আঘাত গায়  
 তুচ্ছ গণিয়া চলিছে খাই'  
 কাহারে পুছিব—কাহারে পাই ?  
 পল্লী-রমণী জাগিয়া যারা  
 কহিলু ত দেব—নয়নে ধারা—  
 "তোরা কি জানিস্—তোরা কি বোন্,  
 দেখেছিস্ তারে—এ পোড়া মন  
 জুড়া জুড়া দিদি, সখার কথা  
 বল্ বল্ স্বরা—সে মোর কোথা ?"  
 কহিল না তারা—কহিল শুধু  
 "কিবা সে এমন তোমার বঁধু !  
 তেমন কি আর নাটিক কার ?  
 তুমি তো রূপসী—মধুর চাক্ষু  
 মুখানি তোমার—তোমার পিয়া  
 কি আর এমন ?—পাগল তিহা  
 তাঁরি তরে ছি ছি !"—কহিলু আমি  
 আমার সে সখা—হৃদয়-স্বামী,  
 কোথা পাব হার ! তুলনা তার ?  
 তুল' না তুল' না সে কথা আর !—

হিন্দুল উপমা অধর-পুট ;  
 বরণ স্বদূর গিরির কূট ;  
 বকের বলাক গারি মালা ;  
 বসন অরুণ কিরণ—জালা ;  
 নট খঞ্জন ময়ন ছোর,—  
 রসের আবেশে অবশ ভোর ;  
 গোছে গোছে গোছে অলকাবলি,—  
 সারি সারি সারি লুটিছে অলি ।  
 কুসুমের গঠিত কপোল-বর,  
 সৌরভে তারা পাঞ্চল হয় ।  
 শুক্ল—রক্ত সে করতল,  
 কোমল যেন সে কুসুম-দল ;—  
 অশেষ অসীম সুধমা ভার,  
 জগতে আঁক উপমা তার !  
 কেমনে তোদের বুঝাব দিদি,  
 সে যে লো সাগর তলের নিধি !  
 যাই—যাই—দিদি, সময় যায়,  
 বনে বনে আজি খুঁজিব তার ।  
 পাহাড়ে পাহাড়ে, হৃদের ধারে,  
 করণার তটে তটিনী পারে ।  
 যতদিন তার না পাই দেখা,  
 দিবানিশি তারে খুঁজিব একা ।  
 অই যে এখনো রজনী আছে !  
 আছে কি বঁধুয়া কোথাও কাছে ?  
 উছ রে পরাণ ফাটিয়া যায় !  
 বেদনার বুক ফাটিয়া যায় !  
 অস্তর যে রে যাইছে ছিঁড়ি—  
 অপমানে বঁধু গিয়াছে দিরি !  
 এ ঘোর আধার শীতের রাত্রি,  
 হার রে কেহ তো ছিল না সখী !  
 হার রে আর কি মিলাবে বিধি ?—  
 আর কি জুড়াবে দগধ যদি ?





# পরিচারিকা

(নব পৰ্য্যায়)

“তে প্রাপ্তবন্তি নামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ।”

৩য় বর্ষ।

কার্তিক, ১৩২৬ সাল।

১২শ সংখ্যা।

দিন যায়, যাক্ দিন চলে।

দিন যায়, যাক্ দিন চলে’

সে কি নিয়ে যেতে পারে আমার আঁচলে

যে ফুল ঘুমায়,

যার সুরভিতে মৌর চারিভিতে

নন্দন রচিত হয় নব সুধমায়।

দিন যায়, যাক্ দিন চলে’

সে কি নিয়ে যেতে পারে, কভু কোন চলে

আমার স্বপনে,

যে আলোক জাগে,

যার অনুরাগে

হ’বেলা অতিথি কত আসে দায় মনে।

ঐশ্বর্যদা দেবী।

## রামমোহন-স্মৃতিসভা ।

স্থান,—রাঁচি প্রকমনির ।

সংগীত—অভিভাষণ ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

যে মহাত্মার স্মরণার্থে আমরা অন্য এখানে সমবেত হয়েছি তিনি এই দিবস নানাদিক অসীতি বঙ্গের পূর্বে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বুটেনগার দেহভাগ করেন । ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম—১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু । জিলা কলকাতার বাধানগর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—আর বুটেন নগরে ইংল্যান্ডে গিয়ে অসম্মত হন । এ দেশ দেশ, বিশেষে মৃত্যু—এথেকে কি প্রমাণ হচ্ছে এ যে তিনি শুধু এদেশের নন পূর্ব পশ্চিম দেশের মানুষ । প্রকৃত পক্ষে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যের বন্ধনী । বাঙ্গলা দেশ তাঁর জন্মভূমি মনে করে' যেমন আমরা তাঁকে আপনায় বলে' গ্রহণ করি, তেমনি ইংল্যান্ডে তাঁর দেহ প্রোথিত—তাঁর সমাধি মন্দির স্থাপিত হয়েছে, এই কারণে ইংলণ্ডবাসীও তাঁকে আপন অন্তরঙ্গরূপে বরণ করতে পারেন—এই তাত্ত্বিক করেও উচিত । কারণ তাঁর শেষ বয়স যে কতিপয় মাস তিনি যুরোপ প্রবাসে যাপন করেছিলেন তাঁর বিবরণ পাঠ করলে মনে হয় যেন তিনি বিদেশীয়দের মধ্যে নর কিংবদন্তি, নিঃশূন্য আত্মীয়জন বন্ধুসঙ্কে পরিবেষ্টিত হয়ে আপনাকে গোবের মতোই বাস করেছেন । বস্তুতঃ রামমোহন রায় শুধু এদেশের নন—বঙ্গভূবনবাসী অগণন্য মহাপুরুষ । তিনি বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগ উপাস্য দেবতার মতোই আত্মত্যাগে তাঁর একদেশের সত্তার মধ্যে আত্মকরীক হইয়াছেন । তিনি শুধু বঙ্গদেশের নন, ভারতবর্ষের নন কিন্তু বিশ্বজগতের অন্তরঙ্গ । আমাদের শরণে এ যে মহাত্মা তা প্রচারিত হয়েছে—

অরুণ নিমঃ পদোদ্যোতগণনা লঘুচেতসাং ।

উদ্যানং ব্রহ্মলোকং বসুধৈব কুটুম্বকং ॥

রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই বাণী বিশ্বরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

মহাত্মা বাজা রামমোহন রায় আমাদের দেশের জন্য কি কি কাজ করে গিয়াছেন—আমাদের জাতীর কী কী কৌশল কৌশল বাধাগে তিনি স্বনাম অঙ্কিত করেছেন আজ তাঁর বিদ্যুত আলোচনায় প্রায়শঃ নাই । তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আগম্যাত্ম প্রবিস্তার সকলই অবগত আছেন ; কি শিক্ষা, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজসংস্কার কি ধর্ম সংস্কার—ভারতের সকল উন্নতির মূলক কাজের হস্ত কাঁচা কামি আছে । অবিখ্যাত স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নব্য ভারতের অনুদায়কে রামমোহন রায় যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—দেবগণ বর্ষা । তিনি যেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের বন্ধনী তেমনি সেকাল আর একাত্তর সাক্ষর ।

এই মহাপুরুষের স্মৃতিসভার আজ আমরা সমবেত হয়েছি—কিভাবে আমরা তাঁর স্মৃতি রক্ষা করিতে পারি ? মহাপুরুষের মৃত্যু নহে । তাঁদের স্মৃতিসভার জন্য তৈলাচত্র বা মধ্যযুগি স্থাপন আবশ্যক করে না । তাঁদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তর অনুসরণেই তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষিত হয় । বুদ্ধদেব তাঁর পরিনির্বাণ কালে তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে যে তরঙ্গটি অলঙ্কৃত করার উপদেশ দিয়েছিলেন এই অঙ্গকে তা আমাদের আনন্দবোধে বুদ্ধদেবের

মৃত্যুশয্যায় তাঁর পিঠশিষ্য আনন্দ শোকবিহ্বল হইয়া প্রশ্ন করিলেন—“গুরুদেব আপনি আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন আমাদের গতি কি হইবে ?”

গুরুদেব বলিলেন —

“তাই আনন্দ আমার জীবনের অশীতি বৎসর অভীত হইয়াছে—দিন কুলাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। অ ‘ম চলিয়া’ বাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না। দেব আমি আত্মনির্ভরে চলিয়া বাইতেছি—তোমরা দৃঢ়প্রজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার গুণের উপর নির্ভর কবিয়া চলিতে শেখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপন নির্ভরবটী। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা তিন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিও না।”

এই সকল মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তে আমরাও যেন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি। তাঁরা কালের সাগর তটে বে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন সেই সকল চিহ্ন ভীমবার্ষ্য ভগ্নতরি জনের একমাত্র অবলম্বন। আমরা যদি সংসারের অশেষ ঝলোড়নে ধ্বংসপথ হতে ব্রষ্ট হই—লোকভয়ে কর্তব্যসাধনে পরাশ্রয় হই—সেই পদাঙ্ক দেখে আমরা নূতন বল লাভ করব—নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হব—আমাদের সুমুখু জনের নবজীবন প্রকার হবে।

আমি আর অধিক সময় নষ্ট করতে চাই না—অন্যান্য অনেক সুবক্তা উপস্থিত আছেন—এই প্রসঙ্গে কবি Longfellowর জীবনসঙ্গীতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠরণ আবৃত্তি করে এইখানে শেষ করি—

“Lives of great men all remind us  
We can make our lives sublime,  
And, departing, leave behind us  
Footprints on the sands of time;”

“Footprints, that perhaps another,  
Sailing o’er life’s solemn main  
A forlorn and shipwrecked brother,  
Seeing, shall take heart again.”

“Let us, then, be up and doing,  
With a heart for any fate,  
Still achieving, Still pursuing,  
Learn to labour and to wait.”

## রাজা রামমোহন রায় ।

—: ❀ ❀ :—

বক্তা—ডাক্তার ত্রিচূণীলাল বসু ।

৮৭ বৎসর পূর্বে আমাদের স্বদেশবাসী যে মহাপুরুষ স্বদেশের হিতব্রতে প্রবাসে গমন করিয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সাধ্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজার জন্য আমাদের হৃদয়ের আত্ম-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আমরা এই সভাগৃহে সমাগত হইয়াছি ।

সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের পূজা প্রচলিত আছে । যাহারা ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের কার্যকলাপ আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ মানসচক্র সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহারা যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য, আমরা মহাপুরুষদিগের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি । যখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-তরী এর-মূল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া উদ্ভ্রম প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে দিশাহারা হইয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়, তখন মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন ব্রিঙ্কজ্যোতিঃ প্রবতীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সেই পথভ্রান্ত তরণীকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করিয়া থাকে । আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বনীয় । সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Longfellow লিখিয়াছেন :—

“Lives of great men all remind ...

We can make our lives sublime.”

অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের আদর্শ-জীবন আমাদের জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার প্রধান সহায় । মহাপুরুষেরা জগতের গুরু—তাঁহাদের আগমনে জগতে সত্যের আলোক প্রকাশিত হয় । সেই আলোকের সাহায্যে কর্তব্যভ্রষ্ট বিপথগামী মানব, সত্যের পথ, কর্তব্যের পথ দেখিয়া লইয়া সেই দিকে জীবনের গতি ফিরাইতে সমর্থ হয় । সুতরাং কেবল যে মহাপুরুষদিগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহা নহে; আমাদের আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগের স্মৃতি-পূজার আয়োজন আবশ্য কর্তব্য ।

রাজা রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশ ধন্য হইয়াছে; যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি ধন্য হইয়াছে । কিন্তু তাঁহাকে এই বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে । তিনি আজীবন সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন । কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কৰ্ম্মক্ষেত্রে, তিনি যেসকল বিশ্বজনীন উদারমত্তের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণপ্রদ । জগতের যে কোন মনুষ্য তাহার সুশীতল ছায়ার বসিয়া, জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে, চিরদিন শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে । এই জন্য তিনি বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী হইলেও, সমগ্র বিশ্ববাসীর আপন-লোক ছিলেন—বঙ্গদেশ তাঁহার জন্মভূমি হইলেও আসমুদ্র পৃথিবীই তাঁহার

প্রকৃত জন্মভূমি। তাঁহার ধর্মমত এমনট উদার ছিল যে তাঁহার দেহ-ভাগের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা লইয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল; অথচ তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাণ্ডিতদিগের সচিত্র নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মের ক্রটি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত—একেশ্বরবাদ—অঙ্গুলি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় জগৎপ্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। জগতে অতি অল্পলোকই এরূপ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই প্রতিভাবলেই তিনি সকল ধর্মশাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। তিনি মূল ভাষায় রচিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের বিবিধ ধর্মশাস্ত্র পুস্তকাদির অর্থসম্বোধন করিয়াছিলেন। হিন্দু ভাষায় রচিত বাইবেলে বীতভেদ ঈশ্বরের কল্পিত চরিত্র নাই, ঈশ্বরের বাদের (Doctrine of Trinity) উল্লেখ তদ্ব্যতীত নাই এবং খ্রীষ্টের রক্তে মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইবে, এরূপ মতের প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের এই সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য মার্সম্যান প্রমুখ তৎকালীন মিসনরীদিগের সহিত তাঁহার বহু তর্ক ও বিচার হইয়াছিল। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম যে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মিসনরীদিগের সহিত বিচার করিয়া অত্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে দুই একজন মিসনরী ত্রয়ীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ (Unitarianism) গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তথ্য মহম্মদের পরগণ্ডার কোথাও উল্লেখ নাই—কেবল একমাত্র একেশ্বরবাদই কোরাণে সমর্থিত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে সেই সকল গ্রন্থে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা যে উপাসনার নিকৃষ্ট পদ্ধতি, ইহা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এক অসংখ্য ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না; তিনি বাস্তবিক মূল্যবোধ ও আবর্জনা দূর করিয়া হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে সার পদার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমি নিজে হিন্দু এবং আমার বিশ্বাস যে হিন্দুধর্মের মত সাক্ষরজনীন ধর্ম জগতে আর নাই। যিনি যেমতেই ভগবানের আরাধনা করুন না কেন, হিন্দুধর্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় হিন্দুধর্ম, অপর, কুপিত উভয়কেই তাঁহার কোলে আশ্রয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম, অধিকারভেদে, পূজার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একেশ্বরবাদ যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্মগণ সন্ত প্রথমে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা ও তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ঋষি-উচ্চারিত সেই প্রাচীন মহাবাক্য তাঁহার দেশের লোককে নুতন করিয়া শুনাইবার জন্য এই পরামর্শে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কোন নুতন ধর্মের প্রচারক ছিলেন না; তাঁহাকে ধর্ম প্রবর্তক না বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধর্মসংস্কারক বলিব।

তাঁহার ভাষা-জ্ঞান তাঁহার প্রতিভার অপূর্ণ পরিচয়। নয় বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি পারস্য ভাষায় ব্যাপ্তি লাভ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনা নগরে গমন করেন। তিন বৎসরে তথায় আরবী ভাষা মৌলবীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মূল কোরাণ গ্রন্থ আয়ত্ত করেন এবং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই একেশ্বর-বাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য



কানীশদামে গমন করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ হিন্দু পাণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম-শাস্ত্রাদি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনাবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করেন। বোল বৎসর বয়সে তিনি তখনকার ভাষার পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং দুইটা ধর্মের মূল গ্রন্থ সংগ্রহ পাঠ কাবরা গৃহে প্রভ্যাগমন করেন। একেবারে হিন্দুধর্মের যে মূল ভিত্তি, তাহা এই বয়সেই তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় এবং প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় গদ্যে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিবার জন্য গুরুপিতার বিষম বিরোধভাজন হন এবং ইহার ফলে তিনি সেই কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা তাঁহার অসীম সাহস, দুর্জয় মানসিক বল ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া একাকী নিঃস্বপ্ন অবস্থায়, আত্মশক্তি ও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, হিমালয় পর্বত উল্লঙ্ঘন পূর্বক অপর প্রান্তে অবস্থিত তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তখন যানাদির সুবিধা ছিল না, পথ অপরিচিত ও হিংস্রপ্রাণীময় ছিল, তাঁহার পূর্বে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তিব্বত-অভিযান কোন বাঙ্গালীর করনার মধ্যেও আসে নাই। এই নির্ভীক বাঙ্গালী বালক বৌদ্ধধর্ম, লামাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার জন্য, সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া একাকী সেই দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। একরূপ সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার পরিচয় জগতের ইতিহাসে নিতান্ত মূল্যবান নহে। তিনি সেখানে বাইয়া লামা-পূজার প্রতিবাদ করিলে লামাগণ তাঁহার প্রাণ বিনাশের সংকল্প করেন কিন্তু সেহীলা তিব্বত-রমণীগণ সেই সুকুমারমতি বালককে গোপনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বত রমণীগণের নিকট হইতে এই বিপদের সময় তিনি যে স্নেহ ও দয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যাবজ্জীবন বিস্মৃত হন নাই। দ্বী জাতির প্রতি তাঁহার যে অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল, এই ঘটনা তাঁহার মূলে বর্তমান।

তিনি ২৮ বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি তিব্বত ভাষা যন্ত্রের সহিত শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থ ও পাঠ্যগ্রন্থ উত্তর দিকের খ্রীষ্টবিশ্বাবলম্বীদিগের সহিত ধর্মমত বিচার সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

যুগ্ম বয়স দেশের কার্যে বিলাত যাত্রা তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তখন বিলাত গমন এখনকার মত সহজ ও সুসাদা ছিল না। তাঁহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী বিলাতে গমন করেন নাই। তখন বিলাত যাত্রাতে ভয়ানক সময় লাগিত এবং ধর্ম ও দেশাচার উভয়ই ইহার প্রবল বিরোধী ছিল। তিনি সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কতবার অসুস্থতায় ৬৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের জন্যে হিন্দু জাতির প্রাপ্ত ইয়ুরোপীয় সুনামশ্রীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশকে এক অছেদ্য সোহাদী-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ণ সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি আদর্শ-জ্ঞানী, আদর্শ-কর্মী এবং আদর্শ-ভক্ত ছিলেন। এই তিনের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন এক, দুই, সড় হোর, লাট বা দণ্ড কলার সমষ্টি মাত্র, তাঁহার জীবন বোল কলার পূর্ণ ছিল। তিনি একজন

পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন এবং আমাদের দেশে ধর্ম ও কর্মক্ষেত্রে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্তক। দেশপুণ্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই নব যুগকে “রামমোহন যুগ” বলিয়া গিয়াছেন। এই যুগের কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। অনেক অস্বাভাগ, অনেক স্বার্থবিসর্জনের প্রয়োজন হইবে, অনেক বিপদ অনেক ক্লেশ মাণা-পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে, তবে এই যুগের সাধনা সম্পূর্ণ হইবে। রামমোহন রায়ের অদেশবাণী আমরা তাঁহার সেই প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধ-লাভের আশুকুলো কার্য্য করিতে কি পশ্চাৎপদ হইব ?

ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তাঁহার সংস্কার কার্য্যের জাম্জনা প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্মসম্বন্ধে সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা প্রচারের জন্য গভর্ণমেন্ট-বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন এবং তজ্জনা অর্থের ব্যবস্থা করেন, তখন রাজা রামমোহন রায় সেই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন সে শুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষায় দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচারিত না হইলে দেশের লোকের মনের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা ঘুটিবে না, শাসন কার্য্যে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার উচ্চ অধিকার কখনই পাইতে পারিবে না। জীবন-সংগ্রামে তাহার চিরদিনই পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে। সুতরাং তিনি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধে লর্ড আম্‌হাষ্টকে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহার বহুদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির স বিশেষ পরিচায়ক। হিন্দু কলেজ-স্থাপনে তিনি ডেভিড্‌ হেরারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, অথচ তাঁহার সংযোগ হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাগণের বাহনীর নহে বলিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ইহার সঙ্গিত যোগদান করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের বায়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন ডাক্তার ডক্‌ এদেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতার প্রথম মিসনরী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বিধিমতে তাঁহার সাহায্য করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা বাড়াতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচার কার্য্য সমাধান হইবার ব্যবস্থা তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন পরে বিলাতের গভর্ণমেন্ট-কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার চিরদিনের আশা ফলবতী হইয়া ছিল। যদিও তিনি ইহা দেখিয়া বাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার উদ্যম এ চেষ্টা যে এই ব্যবস্থার আদি কারণ, সে বিষয়ে অনুমান সন্দেহ নাই। আজ যে উচ্চ শিক্ষার ফলে দেশ উন্নতির দিকে এত অগ্রগত হইয়াছে, তাহার সূলে রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। ভারতবাসীমাত্রেই ইহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকটে অপরিশোধ্য গুণে আবদ্ধ থাকিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক বেক্সর উর্বর ছিল, তাঁহার জন্মের সেইরূপ কোমল ও উদার ছিল। হৃদয়ের এই উদারতা ও কোমলতাই তাঁহাকে বিবিধ সমাজ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ ইহার প্রকট উদাহরণে স্থল ! তাঁহার পূর্বে সময়ে সময়ে কোন কোন সম্ভব ব্যক্তি এই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচলিত ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া কেহই আইনানুসারে ইহা নিবারণ করিতে সাহস করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় বেবানে সতীদাহের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা কর্ণে শুনিতে, তিনি ভৎসনাৎ সেইখানে বাইল নানা উপদেশ ও ঘেহপূর্ণ বাক্যে সতীর সংস্কার পরিবর্তন করাইবার চেষ্টা করিতেন।

অবশ্য কোন কোন স্থলে সত্যী স্বামী বিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বৈচ্ছায় এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় এবং সামাজিক অপঘণের ভয়ে অনেকাধিক বিধবা স্বামীর সহগমন করিতেন। সহগমনের সময় ভয় পাওয়া পশ্চাৎপদ হইলে অনেক স্থলে জোর করিয়া তাহাকে চিতার প্রবেশ করান হইত এবং যদিও সে যত্নবান অস্তির হইয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার নিশ্বাস আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে বগ পুষক চিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া তাহার শ্রাণ বিনাশ করিত। স্বীজাতির প্রতি এই গৈশ্যাতিক সামাজিক অত্যাচার অনেকাদিন পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের কোমল হৃদয়ে বিধম আঘাত করিতে ছিল। লর্ড উইলিয়ম্ বেটিক-ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এবং তাঁহার ফলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রচলিত হইয়া ভারতবাসী হিন্দুকে ধর্মের নামে স্বীকৃত্যের পাতক হইতে রক্ষা করে। এই সংস্কার সংগ্রামের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে অশেষবিধ সামাজিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া ছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার জীবন পয়াস্ত নিরাপদ ছিল না। তাঁহার দুর্জয় মানসিক শক্তি ও অদৃঢ় বিবেক ব্যতীত তিনি সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কঠোর পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে “হরকরা” নামক ইংরাজী প্রচলিত একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কোন কারণে গভর্ণমেন্ট এই পত্রিকার সম্পাদককে আটক করিয়া বিনাশে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রচলিত “আকবর” নামক পারস্য ভাষার লিখিত সংবাদ পত্রের প্রচারও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য তিনি কুমল আন্দোলন উপস্থাপ্ত করেন। এখানকার আন্দোলনে কোল ফল হইল না দেখিয়া তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ ভিক্টোর নিকট সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বন্ধে এক স্মৃতিস্তম্ভ ও একাটা যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনের শেষ ফল দেখিয়া বাইবার সোভাগ্যে তাঁহার হয় নাট, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের দুই বৎসর পরেই সুপ্রায় স্বর স্বাধীনতা রক্ষার আর্টন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেন্টের একটি কমিটী নিকট সাক্ষা দিবার সময় এদেশের কৃষক-দিগের হীনাবস্থার বিষয় বিশেষ ভাবে বিলাতের মন্ত্রীসভার গোচর করিয়া তাঁহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া ছিলেন। অধিক সংখ্যক এদেশবাসী লোক যাহাতে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার জন্যও তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে স্থানী। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলা গদ্যে লিখিত। ইহার পূর্বে বাঙ্গলাভাষায় যে দুই একখানি গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি অনেকগুলি উপনিষদ্ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভাষার উন্নতি ও সৌন্দর্য সাধন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রনিহিত ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সমূহ সংস্কৃতানুভিজ্ঞ জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশে জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে “সংবাদ কোমুদী” নামক একখানি সংবাদপত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করেন। তৎপূর্বে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জীরাম-পুরের মিসনারিগণ কর্তৃক “সমাচার দর্পণ” নামক একখানি সংবাদ পত্র বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হিব্রুভাষায় বাইবেল হইতে এবং আরবীভাষায় লিখিত কোরান হইতে অনেকাধিক স্থান অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; অনেকাধিক ইংরাজী গ্রন্থ ও সমরোপযোগী পুস্তিকা লিখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজ গৃহে “আত্মীয় সভা” স্থাপন করেন। “একেশ্বরবাদ” প্রচারই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার পরিণত হয় এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মাঘ তারিখে বর্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এই সভার স্থায়ী ভবন রূপে প্রতিষ্ঠা হইয়া সাধারণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা কলিকাতায় প্রচলিত হয়। এই উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ইহার উপাসনা কাণ্ড আরম্ভ হইবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ১৮৩০ সালে বিলাত গমন করেন এবং ওথার চীন বন্দর স্বদেশের কল্যাণে কার্যা করিবার পর সাংস্কাতিক জর রোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টল্ নগরে দেহরক্ষা করেন।

যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণ কামনায় জন্য সেই মহাপুরুষের অনুষ্ঠিত কার্যা অনুসরণ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পার, তবেই আমাদের অদ্যকার এই স্মৃতিপূজার আয়োজন সার্থক হইবে।

## রাজা রামমোহন রায় \*

—:~:—

হে তাপস, হে সাধক, হে পূজারী, বীর  
তোমা লাগি কেন আজ করে আখনার  
একবার ভাবি মনে,  
একবার পূজা-খালি সাজাই যতনে  
বহাদর পরে,  
বড় বলে একবার স্বাকার করিব আজ আপন অন্তরে,  
কি তুমি চাহিলে দিতে  
— কোন্ শাস্তি, কোন্ ধর্ম, এই পৃথিবীতে  
কোন্ জ্ঞান,  
আপনি ডুবির তুমি শিখাইলে কোন্ মহাধ্যান  
কর্মযোগে জ্ঞানযোগে  
মিলাইয়া দিলে তুমি জীবনের ভোগে ;  
সুখা পাত্র ভরি  
জনে জনে বেঁটে দিলে অহা মরি মরি !

কোন ধর্ম ভাঙ্গিলে না কিছু,  
 কোন ধর্ম মতে তুমি কর নাই নাচু,  
 সঞ্জীবনী সুধা দিয়া  
 সত্য পথ দেখাইলে—বাঁচাইলে পিপাসিত হিয়া  
 ফেলিলে না কারে দূরে,—  
 এক মহা বিশ্বপ্রেম হুরে  
 প্রাণ মন মাতালে সবার,  
 দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু আর !  
 বিধবার অনির্বাক্য চিতার অনল  
 নিভাইলে মহাঋষি ঢালিয়া তোমার শান্তিজল !  
 ওগো কস্মী কোন্ গুণে  
 সমাজ করিলে শুদ্ধ, শক্তির আগুনে,  
 জ্বলাইলে মহাভাব,  
 দুদিনের রবি তুমি ছড়াইলে পুণ্যের প্রভাব,  
 ভোগের পালঙ্ক রাখি  
 নেমে এলে ধরণীতে বিশ্বব্যথা নিলে বুকে ডাকি  
 দুটি বাহু প্রসারিয়া,  
 মানব কল্যাণ লাগি কত ধন দিলে বিতরিয়া ।  
 ভারত ডুবিতেছিল মহা সর্বনাশে  
 অত্যাচার পীড়নের গ্রাসে ;  
 ধর্মের মুখোস্ পরা সে কোন্ রাক্ষসী  
 অন্ধকারে বসি  
 মেলেছিল যবে তার করাল বদন  
 ভারতের রক্তধারা করিতে শোষণ ;  
 কে তুমি উদিলে বীর  
 কোন ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়ে এই পৃথিবীর  
 ছিন্ন করি জড়তার পাশ ;  
 এক মহা ব্রহ্ম জ্যোতি করিলে প্রকাশ ।

কে তুমি বাঁচালে তবে  
ভগবৎ প্রেমের বিভবে ?  
শুনাইলে হরিনাম মধু পারাবার  
জ্ঞানের সম্ভান বল সকলেরে দিলে অধিকার !  
ধীর পদে গেলে চলি জয়ের পতাকাটিরে বাহি  
এত নিন্দা অপবাদ এত জ্বালা সহি ?  
কমলার বরপুত্র জগতের হিতে  
এসেছিল বিলাহিতে  
সর্ববি ধন মান  
মহাপ্রাণ জাগাইলে দিয়ে নিজ প্রাণ !  
তাই আজ কাঁদি ফিরে ;  
ভাসাটিয়া সুখে অশ্রু নীরে  
জাগিতেছে এ বেদনা  
বাহা গেছে ফিরিবে না ফিরিবে না  
এ জীবনে আর  
রাজা তুমি, ঋষি তুমি, ত্যাগী তুমি, আরাধ্য সবার !

## মণিপুর চিত্র

( ৩ )

দাসত্ব-প্রথা ।

আমি দেশীয় রাজ্যবাসী বিশেষ আজকাল বাহাকে Backward State ( অগ্রস্ত রাজ্য ) মধ্যে গণ্য করিতে চার। কেন জানি না। সেই রাজ্য আমার—জম্মভূমি। মণিপুর রাজ্যের সহিত আমাদের রাজ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে কেবল কুটুম্বিতা মাত্র নহে, রাজ্যের অবস্থা দৃষ্টে এককে অন্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মণিপুর রাজ্যে ‘লালুপ’ বা বাহিরের লোকে বাহাকে দাসত্বপ্রথা বলে, সেই প্রথা বর্তমান ছিল এবং ইহা আমাদের জিপুয়া রাজ্যেও ছিল। “দাসত্বপ্রথা” নাম্য এত জঘন্য প্রথাও কি এখনও বৃটীস শাসিত ভারত

ভিতরে বর্তমান থাকিতে পারে? কখনই না। এই 'লালুপ' প্রথার অর্থ কি এবং ইহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইত তাহা বাতারা জানেন তাঁহারা ইহাকে কখনও দাসত্বপ্রথা বলিতে পারেন না। ইংরেজ Political Agent সহনয়তার সহিত দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি যখন দেখিতে পান তখন তিনি দেবতার মত কাণ্য করিতে পারেন।

মণিপুরের একজন Political Agent লিখিয়াছেন ;—

"The Manipur paid very little revenue in money, and none in direct taxes. The land all belonged to the Rajah, and every holding paid a small quantity of rice each year. The chief payment was in personal service. This system known by the name of "Lalloop," and by so often miscalled, "forced labour," was much the same as formerly existed in Assam under its "Ahom Rajahs".—[ *My experience in Manipur P. 113 by Colonel Johnstone.* ]

মণিপুরে খাজানা টাকা খুব কমই আদায় হইত ; ট্যাক্স হ ছিলই না। ভূমি সমস্তই রাজার অধীনে,—প্রত্যেক রা প্রতিবৎসর সামান্য কিছু শস্য বিনিময়ে তাহা ভোগ দখল করিত। অধিকাংশ স্থলেই প্রজারা খাজানা না দিয়া শরীর খাসিইয়া মালেকের পাওনা পরিশোধ করিত, মণিপুরে এই প্রথার নাম "লালুপ।" লালুপকে কিছুতেই দাসত্বপ্রথা বলা যায় না। আর রাজার রাজত্বকালে আসামেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

কুণিত দাসত্বপ্রথা বলিতে যাহা,—নামান্তরে হইলেও তাহার বিধে বৎ আসাম জর্জরিত হইয়াছে এই সভ্য যুগেই—দেশীয় রাজার হাতে নহে,—স্বার্থপর বৈদেশিক চাকরের নির্দম পীড়নে ; অন্যত্রও এ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না,—আফ্রিকা, ফিজি আফ্রিক দাসত্বের জঘন্য অত্যাচারের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই। আমেরিকার কিউবা দ্বীপের দাসত্বপ্রথা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রহিত হইয়াছিল।

"The system of slavery was finally abolished from Cuba Island in 1887."—(*America through Hindu eyes, by I. B. De. Majumdar.*)

এই লোকগণান লোমহর্ষণ প্রথার উল্লেখ না করাটী ভাল। আমাদের দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি ইউরোপীয় দেশের প্রথার তুলনা হইতে পারে না। দাসত্বপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথার নাম শুনলেই আমরা চমকিয়া উঠি। এখনও কি হংগেরিজ আমলে এ সব বর্কীর প্রথা দেশীয় রাজ্যে চলিতে পারে? এ কথা মনে আসে। অথচ, 'মেহলতার' কেরোসিনে ঘুত্বা আন্দ্রা সতীদাহ বলিয়া গরী করিতে পারি। এক দেশের প্রথার সহিত অপর দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং এক নহে। আমাদের ত্রিপুররাজ্যে দাসত্বপ্রথা ছিল এবং বলিতে গেলে এখনও প্রকারান্তরে আছে। কিন্তু, তাহাকে Slavery বলা যায় না। ১৮৭৮ সালে Mr Botton আমাদের রাজ্যের (পলিটিক্যাল এজেন্ট) Political Agent ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি এই দাসত্বপ্রথা লইয়া একটা তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। "ইংরেজরাজ্যে দাসত্বপ্রথা থাকিতে পারে না।" এই নীতিতে তিনি 'বর্কীর প্রথার' বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের দেশের দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মণিকাকে ধরিয়া পড়েন। তাই Slavery (?) দাসত্ব (!) বীরচন্দ্র মণিকায় উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার কলে কি হইয়াছিল এবং কি হইতেছে? সে কথা বলিতে আমার চুঃখ হয়। যদি Colonel

John Stone এর মত সহৃদয় Political Agent থাকিত তাহা হইলে তিনি এই প্রথাকে বর্বরোচিত (Barbarous) প্রথা কখনই বলিতে পারিবেন না এবং যোরতর প্রতিবাদ করিতেন এবং এ প্রথা রক্ষা করিতেন ! এই 'লালুপ' প্রথা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"I hear that "Lalloop" has been abolished in Manipur since we took the State in charge. We may live to regret it; the unfortunate Puppet Rajah certainly will. Why cannot we leave well alone, and attack the real evils of India that remain unredressed, evils that the native system has much good in it, much to recommend it, and that it is in many cases the natural out-growth of the requirements of the people."—(*My experiences in Manipur*) P. 115.

এই লালুপ প্রথাকে যদি Slavery বলা যায় তাহা হইলে চাকুরী প্রথাকেও দাসত্বপ্রথা বলা যাইতে পারে। তবে কেন, এ প্রথা লইয়া ইংরেজ কর্মচারীগণ হাস্যামা করেন? তাহার কারণ, Col. John Stone বলিতেছেন;

"Unfortunately, our so called Statesman are carried away by false ideas of humanitarianism, and a desire to pass in every way as the exponents of civilisation, that is the last fad that is uppermost, and the experience of ages and the real good of primitive people are often sacrificed to *ignis fatuus*"—(*My experience in Manipur* by Col. John Stone.) P. 115.

Col. John Stone এর মত সহৃদয় Political Agent (পলিটিক্যাল এজেন্ট) প্রায় দেখা যায় না এবং তিনি যথার্থ মণিপুরের বন্ধু ছিলেন, একথা মণিপুরবাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে এবং তাহার নাম স্মরণ করিলে অশ্রুপাত করেন। এই যথার্থ বন্ধুর সম্বন্ধে আমি পরে বিশেষভাবে বলিতে ইচ্ছা করি। যদি "লালুপ" প্রথাকে দাসত্বপ্রথা বলা যায় তাহা হইলে ত্রিপুররাজ্যে দাসত্বপ্রথা রহিত করার একই অর্থ হইয়া থাকে। যদি স্বাধীন ত্রিপুররাজ্যে এ প্রথা না থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ এবং বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকাগুলি কখনও 'সাগর' নামে পরিচিত হইত না, উহারা প্রজাবর্গকে জলদান করিয়া অন্য পণ্যসম্বলিত হইয়া থাকিত না। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে, ত্রিপুরার ধর্মমাণিকা কুমিল্লা নগরীতে 'ধর্মসাগর' নামে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছিল, এবং সেই উপলক্ষে এই দীর্ঘির চারি পারের ২৯/০ স্রোণ জমি দ্রাবীড় দেশীয় ব্রাহ্মণকে দান করেন; এ রাজ্যে বসতি করিবার জন্য। সেই তাম্রশাসনে লিখা আছে, "যদি আমার বংশ বাতীত অস্ত্র কোন বংশ এই রাজ্যের অধিপতি হন, আমি তাহার দাসাসুদাস হইব যদি আমার ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।" ৫১২ বৎসর পূর্বের হিন্দুরাজ্য এই হিন্দুভাবে যিনি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অন্য পর্যন্ত এই দীর্ঘিকামাত্র কুমিল্লা সহরের পানীয় জল সরবরাহ করিতেছে।

এই দীর্ঘিকা খনন করিবার দুটি কারণ ছিল, দ্রাবীড় দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসতি করাইবার এবং চট্টগ্রাম প্রদেশে যখন আরাকান নৃপতি জয় করিয়া লন, তখন কতকগুলি মাছটাল অর্থাৎ মাটিখননকারী প্রজা আসিয়া ধর্মমাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই আশ্রিতবংশল ধর্মমাণিকা তাহাদের উভয়ের উপকারার্থে এই হিন্দুর কাক্তি সাগর খনন করিয়াছিলেন।

Col. Jhon Stone লিখিয়াছেন—

"High embanked roads were made throughout the country, and large tanks, lakes, appropriately termed "seas", were excavated under former ages in other parts of India are due to something of the same kind." (*My experience in Manipur*) P. 114.



আসাম, কোচবিহার, মণিপুর এবং ত্রিপুরারাজ্যে প্রাচীন প্রথাগুলি একই রকম ছিল একই কারণে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, উঠাইয়া দিবার দরুন যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ইষ্টের তুলনা করিলে আমাকে Col. John Stone-এর মত বাণীই স্বরণ করাইয়া দেয়।

এই “লালুপ প্রথা” মণিপুর হইতে চিরন্তরে আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট। তাহারায় ত বখিয়াছিলেন একটা আপদ গিয়াছে—কিন্তু, আপদ রাখিয়া গিয়াছে বংশানুক্রমে; ভূস্বামীর ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ইহা জলিয়া উঠে। তখন দোষ পড়ে বেচারী রাজার ঘাড়ে। লালুপ প্রথার রাজা প্রজার মধ্যে যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহা নিজ চাক্ষু না দেখিল কল্পনার বৃত্তিবার নয়। লালুপ প্রজা যেন ছিল পারিবারিক ব্যক্তি—পারিবারিক উৎসবদিতে তাহার উৎসাহ কত, মনিবের ভাগমূল তাহাকে আভিজাত্য করিত; অথচ সেই স্নেহবন্ধন কাঁট, দাসত্বের মত, মনিবের সহিত তার আর কি বন্ধন ছিল?—সে ইচ্ছা করিলে ম্যাদ জন্মে জমীর দখল ত্যাগ করিলেই স্বাধীন, বর্তমানে প্রজাস্বত্বের সর্ব্বও কি তাহা হইলোভিত?

তা ছাড়া—রাজার দিক হইতে ভবিষ্যৎ আর,—তাঁহার ত আর আমাদের মত নয়,—রাজার আরাম আরোগ্যে অমোদ প্রমোদে একটা রাজনৈতিক ভাব থাকিবেই; তার স্বার্থকে রাজাকে প্রজার উপর এক আধটু আধিপত্য বিস্তার করিতে হয়—ধরুন শিকার সম্বন্ধে নিটাইতে হইবে,—মালপত্র হইতে শত গোয়াড়ীর প্রয়োজন; টাকা পরস্ নিয়াও এত গোড়া একমালে একদিনে সংগ্রহ হয় কি? একটু রাজআধিপত্য, —কমতাপ্রকাশে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়,—সর্ব্বত্র এই কথা। কিন্তু, রাজার কমতা কাড়িয়া লইবার দরুন প্রজাগণ মাঝে মাঝে অসহ্য হইয়া পড়ে। রাজা শিকারের সম্বন্ধে—সেটা সভ্য জগতের তত্ত্বমোদিত—‘লালুপ’ প্রথা পন্থন করিতে চান, তখন প্রবাসাধারণ আপত্তি করে। আপত্তি করিবার পেশান কারণ, নগদ টাকার খাজানা প্রথা প্রবর্তন রাজা প্রজার মধ্যে এখন কেবলমাত্র প্রজা ভূনাশিকারী সম্বন্ধ বর্তমান। রাজা প্রজা সম্বন্ধ আর নাই। ইহা দেখিয়া রাজার পক্ষে বিপরীত ভাব আনয়ন করিয়া ফেলে; আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছে, কেবল মাত্র ইংরেজ গবর্ণমেন্টের খাতিরে নহে কিন্তু বাহরের শিক্ষিত কর্মচারীবৃন্দের অত্যাচারিক ইচ্ছার এবং অভিপ্রায়ে সে সব প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারায় মনে করেন আপদ গিয়াছে এবং চিরকাল এ আপদ থাকিবে। আমাদের রাজ্যে ‘ঐশ্বর্য’ প্রথা ছিল অর্থাৎ পার্শ্বতা পদোচ্চ গতিবিধির সৌকর্য্যার্থ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রজাগণ ভ্রমণকারী লটবতর লওয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘাইত এবং উক্তস্থানে পৌঁছিয়া দিয়া তথায় একবেলা অহার করিয়া লইত। দেশের অবস্থা দৃষ্টে এ প্রথা উত্তম ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা হইয়াছে এই, প্রজারা নগদ পরস্ লইয়া মোট বহিঃ নারাজ এবং হুঁটাগিরী করিতে অত্যন্ত আপত্তি করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভিমানী কর্মচারীবৃন্দ রাজ্যের অভ্যন্তরে গতিবিধি করিতে নারাজ কারণ, গতিবিধি করিবার সুবিধা নো নাই—কিন্তু কল্যাণের বাহা আছে তাহা এ শিক্ষিত কর্মচারীবৃন্দ স্বপ্নেও দেখে নাই। রেলের রাস্তা থাকে দূরের কথা পারদল রাস্তা পর্য্যন্ত নাই। ব্রিটিশ System-এ travelling allowance (ভ্রমণের জন্য ভাতা) প্রথম ২য় শ্রেণীতে গতিবিধি করিয়া মজুরী পোষায় না কাজেই ডেস্কে বসিয়া থাকিয়া কয়েক শ্রেণী মনে করেন; তাকিন্ত মুখ প্রজাগণ কখনও দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। ইহা কি, পার্শ্বতা ত্রিপুরার হর্তাগের বিধি নহে?

পূর্বে 'আলং' নামে আর একটা প্রথা ছিল। এ প্রথার রাজ্যের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইত। ইহা ধরিতে গেলে Irregular force ( অবিধিবদ্ধ সাধারণ ফৌজ ) বলা যাইতে পারে। আমি তখন শিশু ছিলাম, তখন 'আলং' প্রথা বস্তুদান ছিল। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র ঠাকুর সে 'আলং' এর আলা-আঙ্গারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি এই Force এর Chief-Commandant ছিলেন। তখন তিনশত লোকবল ছিল। এক্ষণে এই প্রথা মিলিটারী ( Military ) এবং পুলিশ সিস্টেমে ( Police-System ) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিজে Military Dept-এ Chief-Commanding Officer এর ( সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্মচারীর ) কাজ করিতাম, তখন নব্য শিক্ষিত এবং নব্য প্রথার 'Colonel' ( করনেল ) পদাধিকারকে আমি উৎকৃষ্ট মনে করিতাম। এখন যদিচ অধসর নিরাহি কিস্ত পদবাচ্য নাম আমাকে আঁতার মত আঁকড়াইয়া আছে—কখন ভাগ্য কবিত্তে চাই কিন্তু কখনই কখনও এখনও ভোগাইতেছে। কিয়ৎ অল্পটা হইয়াছে এই বিনোদনপ্রিয় প্রজাসাধারণের সহিত এক জাতির মিশ্রিত ছিল এবং পরস্পরের সহায়তা ছিল—কারণ এই প্রজাপুত্র হইতেই বিনোদনপ্রিয়গণকে সরবরাহ করা হইত। কাকের, তাহার যে কামো যাইত সেও কামোর দরুন Travelling-allowance ( ভাতা ) পাইত না এবং Bill ( বিল ) লখ চড়াও হইত না। কিন্তু কাজ সহজ হইতর সহিত স্বাধীনতা বা স্বদেশীভাবে সম্পন্ন হইত। সেভাবে একগণে অভাব হইয়াছে—একগণে সম্ভ্রান্ত চাকুরীর বাজারের দানাজি, মুখাজি, ঘোষ, বোস এবং সেন বংশগণ পূর্ণনে চাকুরী জাতাভিমান জনের আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং পাকত্যাগপূরাবাসী পাকত্যা জাতের প্রতি সহায়তা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটা প্রথা যাহা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্ভবশ্রেণে উদ্ভূত হইয়াছিল সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার দরুন—এক অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা উদ্ভবশ্রেণগণ অস্থিরের সহিত অনুভব করি। 'পিছারা সেবক' বংশীয় আমাদের প্রত্যেক বাড়ীতে এক একটা ( প্রজার বসতি ) Only লি বাড়ীর পিছনে থাকিত বলিয়া ভাড়াদিগকে পিছারার সেবক বলা হইত। তাহদের কায়া ছিল, মনিব অথবা অন্নদাতার বাড়ীতে সেবা করিয়া এবং আবশ্যক স্থলে চাকুরী করিয়া জীবন যাপনিকার করত। হইয়াই আমাদের লোকবল ছিল এবং তাহাদের অভাবে আমরা লোকবল শূন্য হইয়া পড়িল—হইয়াছে। তাহারা!

"গড়ন ভাঙ্গিতে পারে যেই কোনজন,

ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সেই মহাজন"

প্রাচীন রাজ্যের প্রাচীনতম অতি সংজ্ঞে ভাষায় ফেলা যায়, কিন্তু গড়ন কখনও সম্ভব হইয়া উঠে না। সেক লোবন মন না ছিলেন, তিনি তাহাদের Panyare ছিলেন। পাকত্যা অঞ্চলের প্রকাগণ হইতেই সেবক শ্রেণীর লোক আমদানী হইত। যাহারা "জুম" করিয়া হয়রান হইত তাহারা সেবকী করিয়া—আমান পাইত। আশংক্য লোকই আত্মবিক্রয় কি—পাওয়ারের লোকাদর্শকে বিক্রয় করত না। যদি বা মাঝে মাঝে কেউ করিত তাহার অর্থ ছিল—বাধ-বসা - অর্থাৎ উক্ত জনের নিকট অর্থ লগ্ন হইয়া হুদ না দেয়া চাকুরী করিয়া অন্ন জন্মায় করিত। যখন লগ্ন পারশেধিত হইত তখন তাহার খালাস পাইত। আশংক্য লোকই স্বচ্ছার আদৌন ভাবে আসিয়া রাজ্য পরিবার বা চাকুর পাওয়ারে সেবকশ্রেণীভুক্ত হইত এবং তাহারাও এসব সেবক দ্রিগিক আপন পরিবারের লোকদের ন্যায় দোষাতন। অমন ভুলন যোগাইতেন এবং সময় সময় অলঙ্কারাদি দেওয়ার প্রথা কেবলমাত্র—মণিদের মধ্যাদা রক্ষার্থ পাইত তাহা না হইলে মনিবের ইচ্ছা পাকে না। এক্ষণে, সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার দরুন ত্রিপুরার প্রজাগণকে সুসাদাভাবে হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্বের অধোগাত্যে স্থান

পাইতে হইয়াছে। এক্ষণে তাহা নিজারা সেবক নর সত্য কিন্তু দাসের অধীন, নিত্য উত্তমর্গের তাড়নে নিপীড়িত,—অর বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী—এ দরিদ্র দেশে কি ও-স্বাধীন দেশের প্রথায় চলে,—তাহাতে কি ফল, তাহা প্রাচীন প্রথার পরিবর্তনে স্পষ্ট আঞ্জল্যমান,—মাতৃশ্রমে উপযুক্ত শিক্ষার,—কর্ম্য করিয়া তোল; তাহাদিগকে বুঝিতে নাও তাহারা মানুষ—তখন তাহার নিঃস্বার্থে নিতে চিনিয়া লইবে তাহাদের উন্নতির পথে তখন আর কে বাধা দিবে—আমরা তাই চাই—কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিলে—তাহা কেবল তাহাদের দুঃখের কারণ নয় কি ?

হঠাৎ একদিন (বাল্যকালে) পিতা মাতার নিকট শুনিলাম,—আমাদের পিটারার লোকদিগকে চাড়িয়া দিতে হইবে—এবং আমাদের বাড়ীর আত্মারেরা নিজ হাতে কাষা করিয়া লইবেন। এই প্রথা গবর্ণমেন্টের উপদেশে বাধ্য হইয়া রাজা ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের (১৮৭৮ খৃঃ) ১৭ই আশ্বিন তারিখে বিধি করিয়া উঠাইয়া দিতে ঘোষণাপত্র জারী করিয়াছেন। আইন হইয়াছে বন্ধকীপ্রথা—বন্ধর-স্বাধীনতা, এ-রীতি কুনীতি বলিয়া সা-স্তু হইয়াছে। সেই হইয়া-স্বাধীন বাড়ীর পরিচায়িকাগণ আইনতঃ মুক্তিলাভ করিয়া মহাশ্রমদ গণিল; তাহার কি সহজে আমাদের আশ্রয় হাঁড়িতে চায়—কিন্তু পড়িয়া গেল,—আজও তাহারা স্বাধীন হইয়াও স্বচ্ছন্দ তাহাদের সেই স্বাধীনতার জন্ত লাগতিত,—সেই আমাদের দ্বারেই তেমনি কাজ করিয়া থাকিতেছে; তার জন্ত যে মজুরী পায় তা পূর্বের সুবিধার তুলনার সামান্য,—তাহাদের সংসার পালনের পক্ষে অপূরণ্য। তাহাদের হৃদিশা আজ এই ৫৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত দেখিয়া মর্মান্বিত হইতেছি। বলিতে কি ইহাদের মধ্যে অনেকে বেগুনীও অবলম্বন করিয়াও দেশের একটা Moral atmosphere দূর করিয়া দিয়াছে।

আমাদিগকে বাহারা মাতৃবৎ লালন-পালন করিত এবং মা হইতেও অধিক শাসন করিত, অতঃ তাহার কলিকাতা কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপের নানাস্থানে প্রথমে বক্ষিতাবস্থায় পরে যাত্রা হয়—বাজারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে। একদিন এই শ্রেণীর আমাদের 'খাই মা' সম্পর্কীয় একজন নবদ্বীপের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম কিন্তু আমাকে চেনা তাহার অসাধ্য ছিল। আমি নিজ হইতে পরিচয় দিলে সে বেচারী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন আমার ডাকনাম তাহার নিকট কলিলাম তখন বাধা রাস্তার উপর উপর হইয়া পড়িয়া উঠে—যেরো রোদন করিতে লাগিল এবং দেশের সেই মুক্তির আইনকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক! আমি যত দিন নবদ্বীপে ছিলাম তত দিন তথাকার এক ভদ্র পরিবারে বাস করিতাম, এই বুদ্ধাকে আমি আনিয়া পরিচয় দিলে তখন বাড়ীর গৃহিণী-মহলে তাহার স্থান হইয়া গেল এবং এক বৎসরের মধ্যে তাহার মানবণীলা সঞ্চার হইয়াছিল। বেচারী ভেক লইয়াছিল এতজন্ম আমি খরচ করিয়া তাহার ঔর্জ্বেহিক ক্রিয়ায় একটা মহোৎসব দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি বলিতে পারি, যাহা Barberons labouring বলিয়া তাহার প্রতি পাশবিক ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার দরকার ছিল না বরং অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়াছিল এবং আমরা তাহার ভুক্তভোগী। মণিপুরের পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে ভুক্তভোগ করিতেছে তাহা বর্ণনা করা অপর লোকের নিকট সম্ভবপর নহে। এই 'লালুপ' প্রথা উত্তীর্ণ হইবার দরুন মণিপুরে নৈতিক-জগত তমসাক্ত হইয়াছে। এই Happy-valleyতে Happiness উত্তীর্ণ গিয়াছে এবং কতকগুলি Meanness বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্বাধীন দেশ মণিপুরে স্বাধীনতার থাকা দরুন যে সব মহোৎসবকার হইয়াছিল বর্তমান সময়ে, তাহা সেই নৈতিক-জগতে হৃদিশা আনয়ন করিয়াছে। মণিপুর সমাজে সর্বত্রই সুমান ছিল, উচ্চ নীচ ভেদ ছিল না রাজা হইতে প্রজা পর্যন্ত এক সমাজ ভুক্ত ছিল, তদরূপ সমাজ শরীরে একতা প্রবেশ করিয়াছিল। অহারা যুগে

ছিল। এক্ষণে সে সুখ-সাগর শুকাইয়া গিয়াছে। সাগরের পক্ষ দেখা দিয়াছে এবং সময়ে পক্ষোদ্ধার কে করিবে আমি জানি না। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলে বোধেট হইবে। মণিপুরে মণিপুরী জীলোক স্নেহের রক্ষিতা হইয়া এবং প্রকান্তভাবে বাস করার প্রথা চলিতেছে।

ফুরেশিয়ান টেলিগ্রাফ মাষ্টার চমৎকার মণিপুরী ভাষা বলিতে পারেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে ভাষা শিক্ষার দিশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তর দিলেন—“I have got a living dictionary. “আমার একখানি জীবন্ত অভিধান আছে।”

চুঃখের বিষয় আমি এই জীবন্ত-অভিধানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং এই সূত্রে মণিপুরের নৈতিক-জগতের যে চিত্র দেখিতে পাষ্টয়াছি তাহা চিত্রিত করিতে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হয়! বিস্তী চিত্র দেখাইতে হয় কাজেই এখানে প্রবন্ধ বন্ধ করিলাম। মণিপুরে মহিলাগণ ধর্মের নামে নৃত্যগীত করিত এক্ষণে বাইজি ও খেমটা নাচ করিয়া খাস মণিপুরের মধ্যেই বাত্‌সতার অভিনয় করে এবং এই নাচ লইয়া এক্ষণে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বাবসা করা হইতেছে! ইহা হইতে অধোগতির আর বাকী রহিল কি? Tea-Plantersগণ এই সমাজ হইতে রক্ষিতা জীলোক সংগ্রহ করিতেছে, ইহা এক্ষণে প্রথাক্রমে দীপাইয়া-বিপথগামী হইবার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নরকের পথ দেখাইতেছে। মণিপুরে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেছেন এবং হারী বাসিন্দা হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাণারও কাহারও সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম, ঈষৎ হাসি ব্যতীত অঙ্গরূপ উত্তর পাইলাম না। বাঙ্গালী ক্লাবে একটা Theatre-party আছে তাহাতে মণিপুরী জীলোক অভিনয় করিয়া থাকে এবং বেশ অভিনয় করিতে পারে দেখিলাম—কিন্তু আমি ইহাদের নৈতিক-চরিত্র সম্বন্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে না পারায় সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

## দীপালী।

—:~:~:~—

আয় মা করানি কাপি আয় মা আবার  
মণীর বুকে,  
আমরা মানব দীন হইব এ দীপ ক'টী  
ভক্তির সূত্রে।  
জানি ইহা অতি দীনু তুচ্ছ হৈম আরোজন  
জানি তাহা জানি  
জানি তুমি আস নিতি মর মরতের বুকে  
জননি শিবানি।

জানি যবে নিভে যায় দিবসের শেষ আলো

—রবি ডুবে যায়

গভীর আঁধার-রূপে আস তুমি অগ্নি দেবী

নীরব ধরায় !

আকাশে উজলি ওঠে কোটা কোটা কোটা তারা

অগ্নি মহাকালী

বরিতে তোমারে দেবী ফোটে আকাশের কোলে

তারার দীপালী

তারকার ভাতি হতে প্রদীপের এই আলো

জানি বহু ক্ষীণ

তবু মা বরিতে তোরে ভকতের আজ এই

আয়োজন দীন ।

“বনফুল”

## আমাদের শ্রবণ ও তাহার যন্ত্র-কৌশল ।

শ্রবণশক্তি মানুষের সীমাবদ্ধ ইহা সকলেরই জানা আছে ; আমরা দেখিবার সময় যেমন সাত রঙের অধিক বর্ণ দেখিতে পাই না, শুনিবার সময়ও তেমনি সাত শ্রবের অধিক ধ্বনি শুনিতে অক্ষম । এই সাত শ্রবের নানা লীলায় শুণী লোকের কণ্ঠ ধ্বনিত । ‘ধ্বনি’ বা ‘শব্দ’ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা বায়ুর কম্পন বাতীত আর কিছুই নহে । কিন্তু এই বায়ুকম্পনের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল শব্দের উৎপত্তি । এই সুনির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার উপরে উঠিলে অথবা নিম্নে নামিলে বায়ু-কম্পন শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে কি না তাহা জানা যায় নাই কারণ সে শব্দ শুনিবার ক্ষমতা আমাদের কর্ণের নাই সুতরাং তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাও আমাদের ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত ; ঐশ্বরের কম্পন যেমন আলোক-তরঙ্গ উৎপন্ন করে, বায়ু-কম্পন তদ্রূপ শব্দ-তরঙ্গের স্রোত । কম্পন বলিলে ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, বায়ু কণিকাগুলি বিশৃঙ্খল বিপণ্যসুতাবে কাঁপিয়া উঠে । এই কম্পনের ভিতর একরূপ কৌশল এবং সুনিয়ম আছে, যদ্বারা একস্থানের বায়ু-কণিকাগুলি, কম্পন হেতু অধিক ঘন হইয়া পরস্পর ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান করে এবং তাহার পার্শ্ববর্তী বায়ু কণিকাগুলি দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনেকটা অন্তরায় রাখিয়া অবস্থান করে । এই ঘন সন্নিবেশিত বায়ু-কণিকা ও তৎপার্শ্ববর্তী লঘু-সন্নিবেশিত বায়ুকণিকা মিলিয়া বাতাসে যে পরিবর্তন ঘটায় তাহাই শব্দ-তরঙ্গ বা Sound wave. এই তরঙ্গ

একস্থানে উৎপন্ন হইলে ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বায়ুর এই পরিবর্তন অথবা “শব্দ-তরঙ্গ” পর্যায়ক্রমে চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হইয়া যায়। শব্দের উচ্চতার উপরই ঐ শব্দের তরঙ্গ-বেগ ও তাহার ব্যাপ্তপথের সীমানির্দেশ নির্ভর করে।

কেমন করিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই তাহার আলোচনা করিতে যাইলে, শ্রবণযন্ত্রের (EAR) সহিত আমাদের মোটামুটি একটা পরিচয় থাকা একান্ত দরকার।

আমরা সাধারণতঃ বাংলায় কান (Ear) বলিতে যাহা বুঝি তাহা অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। বাহিরের এই অর্ধচক্রাকার মাংসল অংশকেই আমরা কান বা কর্ণ বলিয়া থাকি, অথচ বিজ্ঞানের ভাষায় তাহার নাম Auricular. Auricula কর্ণের যে বায়ু-পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তাহা external Acoustic meatus বা কর্ণকুহর। কর্ণ বা earকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বহিঃকর্ণ বা External-car; পূর্ণোক্ত Auricula ও External Acoustic meatus ইহার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যকর্ণ বা Middle Ear ও অন্তঃকর্ণ বা Internal Ear. কর্ণকুহর কিছুদূর গিয়াই বক্রভাবে স্থাপিত “কর্ণপট” বা Tympanic Membrane শেষ হইয়া গিয়াছে। “কর্ণপট”টি পর্দার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম চর্মাবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃদ্ধাকারে ইহা কর্ণকুহরে তিষ্ঠাক্রমে অবস্থিত। এই পর্দাটির ভিতর দিকে উহার গাভসংলগ্ন একটি খুব ছোট অস্থি আছে। বায়ুর শব্দ-তরঙ্গ সর্বদাই এই কর্ণপটকে কম্পিত করিতেছে; কর্ণপট যাহাতে অত্যধিক কম্পন নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, অতীত শব্দ হইলে এই অস্থি কর্ণপটকে টানিয়া ধরিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্পধ কম্পিত রাখে। কাজেই পর্দার বাহিরের অতীত শব্দ তরঙ্গ প্রাতিহত হইলেও তাহা অনিষ্টকর হইতে পারে না। পট-সংলগ্ন অস্থির সহিত পর্যায়ক্রমে যুক্ত হইয়া আরও দুইখানি ক্ষুদ্রতম অস্থি আছে। শেষ অস্থিটি অস্থ-সরঞ্জামের রেকাব বা Stirrup এর ন্যায় দেখিতে বলিয়া ইহার নাম স্টেপিস্ (Stapes)

বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ কদাপি একইভাবে পরিচালিত হয় না। বহিঃকর্ণের (External Ear) সীমা কর্ণকুহরের কর্ণপট পর্যন্ত সুতরাং বহিঃকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ বায়ু বাহিত হইয়াই কর্ণপটে আঘাত করে। ফলে, পটটি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া তৎসংলগ্ন অস্থিভয়ে এই কম্পনকে গতিক movements রূপে পরিবর্তিত করিয়া পাঠাইয়া দেয়। Middle Ear বা মধ্যকর্ণে শব্দ-তরঙ্গ পরিবর্তিত হইয়া অস্থির নড়াচড়ায় পরিণত হয়।

অন্তঃকর্ণে আবার এই অস্থির গতি বা movement পরিবর্তিত হইয়া চাপ বা Pressure আকারে তথাকার (Perilymph) পেরিলিম্প্ নামক তরল পদার্থে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং আমরা কর্ণকে তিনভাগে ভাগ করিবার ভাৎপর্ধ্য এখন বুঝিতে পারিলাম। প্রথমভাগে, শব্দ-তরঙ্গ, বায়ু-পথে রাহিত; দ্বিতীয়ভাগে শব্দ-তরঙ্গ রূপান্তরিত হইয়া অস্থিভয়ের Movement বা নড়াচড়ায় প্রকাশিত এবং তৃতীয়ভাগে এই অস্থির নড়া-চড়া রূপান্তরিত হইয়া Pressure বা “চাপ” আকার ধারণ করিয়া থাকে।

মধ্যকর্ণের রেকাবাস্থি বা Stapes. একটি পর্দার উপর স্থাপিত। এই পর্দাটি অন্তঃকর্ণের (Internal Ear,) “ওভালিস্” নামক একটি ছোট ছিদ্রকে আবৃত করিয়া থাকে বলিয়া, ইহা (Membrane of the fenestra ovalis) “ওভালিসের চর্মাবরণ” বলিয় কথিত হয়। ওভালিসের চর্মাবরণের দ্বারাই মধ্য-কর্ণের অস্থির

গতি (movement.) অঙ্গকর্ণের তরলাংশে বাহিত হয়। এই চর্মাঘরণটি অস্থি ও তরলাংশকে পৃথক্ করিয়া রাখে।

অন্তঃকর্ণ বা Internal Ear কতকটা শামুকের খোলার মত (Labyrinth) ও অস্থিময়। অস্থিময় এই শামুকের খোলার আকৃতি যন্ত্রটি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। এই অস্থিগঠিত (Osseous) শামুকের খোলা ফাঁপা এবং ইহার ভিতর ঠিক ইহারই আকারের আর একটি চর্ম্মনির্ম্মিত (Membranous) শামুকের খোল বা Labyrinth আছে। অস্থিময় (Osseous) ও Membranous বা চর্ম্মময় শামুকের খোল সদৃশ যন্ত্রের (Labyrinth) মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অন্তর্লক্ষ্যী থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা স্থান থাকে; এইস্থান পেরিলিম্প্ (Perilymph) নামক তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। উপমা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জল পূর্ণ একটি লোহার নলের (Pipe) ভিতর যদি একটি ইণ্ডিয়া রবার নল (India Rubber tube) রাখা যায় তবে লোহার নলের জল Perilymph ও রবারের নলটি চর্ম্মময় শামুকের খোলার (Membranous Labyrinth) তুলনা মনে করিয়া দেয়।

কুটুবলের ছেঁড়া রবারের ব্লাডারের (Bladder) কতকটা যদি খুব গোঁরে টান করিয়া পূর্ণোক্ত জলপূর্ণ লোহার নলের মুখটাকে ঢাকিয়া বাঁধা যায়, তবে ঐ বিস্তৃত রবারের উপর একটু চাপ দিলেই সেই চাপ লোহার নলের জলে সঞ্চারিত হইবে। এই নলের অপর প্রান্তটী যে বন্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। Internal Ear বা মধ্যকর্ণে অস্থিময় শামুকের খোলার মুখে ঠিক এইরূপই একটি অতি পাংলা চামড়া দিয়া ঢাকা। সেই চামড়ার উপর মধ্যকর্ণের 'রেকাবাস্টি' অবস্থিত কাজেই উহা একটু নড়িলেই ঐ চামড়ায় চাপ পড়ে ও সেই চাপ ভিতরের পেরিলিম্প্ (Perilymph) সঞ্চারিত হইয়া, পেরিলিম্প্-পরিবেষ্টিত চর্ম্মময় শামুকের খোলার (Membranous Labyrinth) দেহে চাপ দিয়া থাকে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বায়ু-তরঙ্গ রেকাবাস্টি দিয়া গতিরূপে অস্থিময় শামুকের খোলার মুখের স্থল চর্মাঘরণে আসিয়া ধাক্কা দেয়, সেই ধাক্কা উহার চর্মাঘরণ (Membrane of the fenestra ovalis) হইতে ভিতরের পেরিলিম্প্ নামক তরল পদার্থে সঞ্চারিত হয়। তাহার পর এই চাপ পেরিলিম্প্ পরিবেষ্টিত চর্ম্মময় শামুকের খোলার সহজেই বাহিত হইতে পারে। এই চাপ বা Pressure এক অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে বায়ু-জালে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিকে যায়। সুতরাং শব্দ-তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত পথ দিয়া পরিবর্তিত হইয়া মস্তিকে বাইতে হয় :—

- ১ম। বাহিরের বায়ুপথ।
- ২য়। কর্ণকুহর (External Acoustic meatus)
- ৩য়। কর্ণপট (Tympanic membrane)
- ৪র্থ। কর্ণপট সংলগ্ন অস্থিময়।
- ৫ম। "ওভালিস" ছিদ্রের স্থল চর্মাঘরণ।
- ৬ষ্ঠ। অস্থিময় শামুকের খোলাকৃতি যন্ত্রের (Osseous Labyrinth) মধ্যবর্তী "পেরিলিম্প্" (Perilymph)
- ৭ম। "পেরিলিম্প্-আবৃত চর্ম্মময় শামুকের খোলাকৃতি (Membranous Labyrinth) যন্ত্র।
- ৮ম। অষ্টম স্নায়ুর স্নায়ুজাল।
- ৯ম। মস্তিষ্ক।

Membranous Labyrinth বা চর্মময় শামুকের খোলাকৃতির যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ চাপ বা Pressure-এ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দিব্যর পর যে কৌশলে সেই শব্দ তরঙ্গ বায়ুর পক্ষে সাহায্য করে তাহা অত্যাস্চর্য্য কৌশল পূর্ণ। এই কৌশলটি পিয়ানোর (Piano) তারের ন্যায় বলিয়া এই কৌশলময় চর্ম্মাবরণহিত যন্ত্রকে, ইহার আবিষ্কারকর্টাই (Corti) সাহেবের নামানুসারে, Organ of Corti বা “কর্টাই যন্ত্র” নাম দেওয়া হইয়াছে। চর্ম্মময় শামুকাকৃতি যন্ত্রের (Membranous Labyrinth) নিম্নভাগ অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য তন্তু (string) দ্বারা গঠিত। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই কোটি কোটি তন্তুগঠিত চর্ম্মময় নলটির চতুর্দিক পেরিলিম্প দ্বারা পারবেষ্টিত। তন্তুগুলি এত সূক্ষ্ম যে খুব তেজালো অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহাদের দেখা যায় না। এই অতি সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে পিয়ানোর তারের সহিত তুলনা করা বাইতে পারে। পিয়ানোর এক একটি তার যেমন এক একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিকে প্রকাশ করে, Internal Ear-এর এই যন্ত্রের প্রত্যেক তন্তুই এক একটি পৃথক ধ্বনিকে সৃষ্টি করে।

এই অসংখ্য তন্তুগুলি এক বোলে Membranous Labyrinth-এর একাংশ মাত্র গঠিত করিয়াছে। কেমন করিয়া পেরিলিম্পের চাপ (Pressure) এই তন্তুকে কাঁপায় তাহা বুঝিতে হইলে শব্দবিজ্ঞানের Resonance বা Sympathetic Vibration অথবা “সহানুভূতিতে অনুরণন” নামক ব্যাপারটি বুঝা আবশ্যিক। পাঠকপাঠিকাগণ অবগত হইবেন যে, একই সুরে “বাঁধা” দুইটো অশ্রাজের মধ্যে যদি একটিকে বাজানো যায় তবে অল্প অশ্রাজী আপনা হইতে বাজিয়া উঠে। একটা যন্ত্রের ঝড়ত শব্দতরঙ্গ বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া অপর যন্ত্রটির তারগুলিতে আসিয়া শব্দ দেয় এবং তাহার একই সুরে বাঁধা আছে বলিয়া দুইটা যন্ত্রের তার একই সুরে ধ্বনিত হইয়া “সমধ্বনি” বা “সহানুভূতিতে অনুরণন”-এর সৃষ্টি করে।

“Organ of Corti” নামক শ্রবণ যন্ত্রটি অনেকটা সুরে বাঁধা অসংখ্য অশ্রাজ বা পিয়ানোর তারের সমষ্টি বলিলে ভুল বলা হয় না। বাহিরের অসংখ্য শব্দতরঙ্গ, চাপ বা Pressure রূপে পরিবর্তিত হইয়া পেরিলিম্প (Perilymph)-দিয়া এই “Organ of Corti”-এর চারিদিকে অনবরত আঘাত করিতেছে। ইহার অসংখ্য তন্তু রাজি এই Pressure দ্বারা কল্লিত হইতেছে। তন্তুগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা আছে সুতরাং বাহিরের সেই সেই সুর বাজিলে তাহারও নিজে কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পন “Sympathetic Vibration” বা “সহানুভূতিতে অনুরণন”—প্রসূত। বাহিরে অসংখ্য শব্দধ্বনিত হইলেও কর্ণের ভিতর এই যন্ত্রে আদিয়া শব্দ তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাহিরে পিয়ানো বাজাইলে যে শব্দতরঙ্গ উৎখিত হয়, কানের ভিতর সে শব্দতরঙ্গগুলি একত্রে একই সমন্বয় শব্দ দিলেও, কানের ভিতর পুনর্বার পিয়ানো যন্ত্রের কৌশলেই সেই শব্দতরঙ্গমালা পুনর্বার বিস্তৃত হইয়া এক একটি পৃথক পৃথক ধ্বনিরূপে মস্তিষ্কে পৌছায়। এই যন্ত্রটিকে একটি পিয়ানো যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। ইহার শব্দবিভ্রবণের নিপুণক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বাইতে হয়।

“শব্দ” বলিতে আমরা প্রত্যেক কথার পৃথক পৃথক বর্ণের পৃথক পৃথক উচ্চারণ বুঝি না পরন্তু প্রত্যেক বাক্যের এককালীন শব্দানুভূতিতেই “শ্রবণ” বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাক্য বিস্তৃত হইতে এত অল্প সময় লয়, যাহাতে পরবর্তী বাক্যের বিশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এ বিশ্লেষণ ব্যাপার অতিক্রান্ত ও আশ্চর্য্য দ্রাব্যহীন। যদি একটি বাক্য এই যন্ত্রে বিস্তৃত হইবার পূর্বেই পুনরায় আর একটি বাক্য আদিয়া কর্ণকূহরে প্রবেশ করে তবে সে শব্দ অতি কদর্য্যভাবে আমাদের কর্ণে বোধ হয়; তাহা কোলাহল (Noise) রূপেই আমরা শুনিয়া থাকি।



এই সূক্ষ্ম তত্ত্বগুচ্ছ যে কোনো শব্দকে বিশ্লিষ্ট বা Analyse করিতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বের কম্পন মস্তিষ্কে বাহিত হইয়া শ্রবণশক্তির উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহা আলোচ্য বিষয়-ভূক্ত। প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত অতি সূক্ষ্ম এক একটি স্নায়ু তন্ত্রী সংযুক্ত আছে কাজেই প্রত্যেকের আন্দোলন জনিত উত্তেজনা (Impulse) পৃথকভাবে মস্তিষ্কে যাইতে পারে। এই পৃথক পৃথক উত্তেজনা অতিক্রান্তগামী বলিয়া কোন একটি শব্দে তাহাদের পৃথক অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায় না।

অপর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, পেরিলিম্প দ্বারা শব্দতরঙ্গ বাহিত হইয়া Membranous Labyrinth নামক দেয় কিন্তু তথায় বিশ্লিষ্ট না হইয়া শব্দতরঙ্গ একইভাবে ও একটি উত্তেজনা রূপে ঐ চর্ম্মের শামুকের খোলাকৃতি বস্তুতে আঘাত করে এবং সেই আঘাত স্নায়ু দ্বারা একটি মাত্র অমুভূতিরূপে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। কিন্তু আলকাল এই সিদ্ধান্ত কেহই মানিতে চাহেন না। কারণ অমুভূতগণ যজ্ঞযোগে পূরোক্ত Organ of Corti সূক্ষ্মরূপে দেখা গিয়াছে ও তাহার পিয়ানোর তারের অনুরূপ অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বগুচ্ছের অস্তিত্বও ধরা পড়িয়াছে সুতরাং প্রথম সিদ্ধান্তকে ভুল বলিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি যে ভ্রান্ত তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক আমরা প্রথম সিদ্ধান্তকেই মানিতে বাধ্য। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই আশ্চর্য্য পিয়ানো যন্ত্রের কথা ও তাহার আশ্চর্য্য শব্দবিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অবাক হইয়াছেন। এত সূক্ষ্ম ও ভ্রান্তিহীন যন্ত্র মানুষ ত রচনা করিতে পারেই না, শরীরের অপর কোন স্থানে এইরূপ যন্ত্রের ন্যায় জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বিতীয় আর একটি আছে কি না সন্দেহ।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

## রিক্ত।

—\*—

ও রে দীন ও রে রিক্ত অন্তর আমার !

নিশিদিন ফেনোচ্ছল তরঙ্গ মাঝার

লীলায়িত গতি-ভঙ্গে একি সঞ্চরণ—

শূন্য-গর্ভ বুদ্ধদের হিলোল-নর্তন !

কোথায় দিগন্ত-রেখা ? কোন্ অজানায়

ক্ষান্ত হবে অন্ধ-খেয়া ফেন-হিন্দোলায় ?

হা ভিখারি ! বন্ধে লয়ে বাসনা বিপুল

পূর্ণতার কল্পনায় আনন্দ-আকুল

আপনা চলিছ নিত্য মিথ্যা প্রবন্ধনে,  
রঙীন স্বপনে রচা শতেক চলনে;  
ওরে অন্ধ অসহায় ! ওরে নিঃস্ব দীন !  
শাস্ত কর চিত্ত তব, গতি ক্লান্তিহীন ;  
টুটে যাক্ স্বপ্নাবেশ তীব্র পিপাসায়,  
ঘুচে যাক্ মোহঘোর মৌন বুভুক্ষায়।

শ্রীপরিগলকুমার ঘোষ।

## ক্যামেরার সামনে রাজন্যবর্গ।

আমার বিশ্বাস জগতে স্পেনের রাজাই সব চেয়ে বড় সিগার ব্যবহার করে থাকেন। ১৯০২ খৃঃ তিনি মিনিচিটে আসার ষ্টিওশ ফটে তুংতে এসে তাঁর পকেট থেকে এক সিগার বের করলেন, বহুদূর প্রায় চান্দ হাঁক, মাঝখানে দেড় ছাইক পুষ। রাজা এলফনসোর মুখখানা ছোট; তিনি ক্ষুধি ও আরামের সঙ্গে দেয়ালে টাঙ্গান রাজ রাজরা ও আদ্যীয় স্বজনদের দোটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। বোঝ হয় আমার মুখে অন্তরের বিশ্বাস ফুটে উঠেছিল—আমি এত বড় সিগার এত পূর্বে আঃ কখনো দেখি নি। রাজা লম্বা, ছিপছিপে, চলন ফেরন নমনীয় একেবারে নারীর মত, অগচ এমন বিপরীত রঙ্গ ! যা হোক রাজা তার সহচরের দিকে চেয়ে বললেন “আমার কেসে আর সিগার নেই, তোমার থেকে আমার একটি স্পেশাল সিগার হার বোঁদানকে দেবে কি ?”

রাজা আমার পানে ফিরে বললেন “এ শুধি আমার খুব প্রিয়, হাতেনাং তৈরী, খেয়ে আরাম পাবে।” ভয়ভয় উপরোধে আমি সেই বৃহৎ সিগারটি হাতে নিয়ে ধরালুম, জীবনে অনেক কড়া সিগার খেয়েছি কিন্তু এমনটি কখনো খাতি নাই। অবশ্য খুব ভাল তামাকের তৈরী, কিন্তু এমন কড়া যে মাত্র ছ’টার টান দিতে পেরেছিলাম—সেও সভ্যতার খণ্ডি, সিগার আমার প্রায় ঘুরয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি !

আমার বিশ্বাস রাজা এলফনসোর আহত অবস্থার কটো একনাত্র আমিই তুলেছি। রাজা, কাইজার উলহেলমের সঙ্গে দেখা করে ব্যাভেরিয়ার কোর্টে এসেছিলেন, সমস্ত দিন শিকার করে বন্দুকের নাল টানবার সময় আঙ্গুলে লেগে যায়। রাজা তাঁর হাত উঁচু করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙ্গুল গর্বের চিহ্ন স্বরূপ বের করেছিলেন। তিনি বললেন “হার বোঁদান আমার আহত অবস্থা দেখাবার জন্যই এ ফটো তুলছি, দেখো এ একখানা ঐতিহাসিক ফটো হবে। ফটো নেওয়া হয়ে গেলে পকেট থেকে কি বের করে আমার বললেন “হার বোঁদান তোমার কাজ দেখে আমি দস্তক্ট হয়েছি, আশা করি আমার নিজের ফটোও আর য সব ফটো বেখসুম সে গুলোর মত ভাল হবে, এই মেডেলটি তোমার উপহার।” এর পূর্বে রাজার আদেশ তার মা ঠাকুমা এবং আরো অনেক রাজ বংশীরদের কটো আমি নিয়েছিলাম, যে মেডেলটি তান আমার হাতে দিলেন

সেটি স্পেনের 'জর্ডান অব ইলাবেলা ডি কেটোলিকা'। রাজার নির হাতে তুলে এই উপহার দানে তাঁর বখেট সনাক্ত্য প্রকাশ হচ্ছিল। কটোগ্রাফার সেই প্রথম অবস্থার অন্ত্যস্ত অখ্যাত নিবন্ধে যখন রাজা আমার সম্মুখে উপস্থিত সে দিনের অন্তরের ভাব আমি কখনো বিস্মৃত হতে পারবো না। তেলের বলা খেতেই আমি কগেট্রাকো শিখেছি, ইওরোপের প্রায় বড় বড় সহরেই টুডিওতে কাজ করেছি। ১৮৮৩ খৃঃ চকিশ বৎসর বয়সে উত্তর সাগর জীয়ে নর্ডার্ন নামক গ্রীষ্মাবাস স্থানে আমি একটি টুডিও খুলি, একদিন জুলাই মাসে প্রিন্সেস উল-হেলমের (এখন কইজারিন জার্মেন) সেরিমোনিয়াল মাষ্টার কাউন্ট মারগ্যাচ্ হোটেল ভিক্টোরিয়া থেকে আমার ডাকলেন, তিনি আমার বল্লেন প্রিন্সেস একখানা ফটো নেবেন ইচ্ছা করেছেন, গেই অনুসারে আমার টুডিওতে কখন যাবেন সময় স্থির করে দিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সময়ের সাগ্রহ প্রতীকার আমি নির্দ্ধারিত সময়ে টুডিওতে অপেক্ষা কর্তে লাগলাম, একখানা একঘোড়ার গাড়ী এসে আমার দোরে লাগল আমি এগিয়ে গেলাম, একজন মহিলা ও খাজীর কোলে একটি শিশু প্রবেশ করল, ইনিই প্রিন্সেস জার্মেনীর ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী, নারীটিকে আমি দেখলুম, নমনীয় মাঝারি গোছের, উচ্চ মাধ্যম সুন্দর কেশদাম, চোখ দুটি গাঢ় নীল বর্ণ। একটি অতি সাধারণ গোছের সাদা লেসে আবৃত পরিচ্ছদ, হাতে একখানা মাত্র ব্রেসলেট, পর অতি মধুর কোমল,—মধুর ভাবে আমার বল্লেন "হার বৌমান আমি আমার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" তিনি খাজীর ক্রোড়স্থিত শিশুটির পানে চেয়ে হাসলেন—সেই শিশুই বর্তমান ক্রাউন প্রিন্স, "আমরা ফটো নেব ইচ্ছা করেছি, আর আশা আছে সে বেশ ভালই হবে, আমি স্বামীকে আমার অবাক করে দিতে চাই।"

তাকে দেখে প্রিন্সেসের মত মোটেই বোধ হচ্ছিল না, এমন সাধারণ ধরণ চাল চলন,—আমার সহকারী আরোজন উদ্যোগ শেষ করলে তখন 'বগা' আরম্ভ হোল। প্রথমে আমরা ভবিষ্যৎ ক্রাউন প্রিন্সের ক'খানি ছবি নিলুম, ছোট্ট জীবন্ত শিশু—চেয়ারে লাফান ও চীৎকার শুরু করে' কত রকমারী আমোদ কর্তে লাগলেন, আমি তাঁর গা চাপড়িয়ে বলতে লাগলুম ওই ক্যামেরা থেকে পাখী বের হবে, ওই দিকে চেয়ে থাকলে দেখা যাবে।

প্রিন্সেস বসলে পর সহচরী তাঁর কেশ ও পরিচ্ছদের ভাঁজগুলি ঠিক করে দিলেন, প্রিন্সেস বল্লেন "আমার সুখখানা বেশ আনন্দ ভরা দেখছেন তো? দেখবেন খুব বেশী হাসিও কিংবা থাকবে না মুখে।" মোটের উপর পঁচিশবার আমি ফটো নিলুম, প্রিন্সেস হোটলে আমার প্রকৃ নিয়ে যেতে বল্লেন—পরে আমি সেবার গেলে প্রিন্সেস প্রকৃগুলো দেখে চোদ্দখানি পছন্দ করলেন, যে ফটোগুলোর বেশ হাসিভরা মুখ উঠেছে সেগুলো শুধু পরিবারস্থ লোকদের উপহার দেওয়া হ'বে, সাধারণ সেগুলোতেও দেখবে, বেশ তারিকিক গভীরভাব থাকা আবশ্যক—এই আমার বল্লেন। ওর মধ্যে তিনখানা ফটো আমার দেখিয়ে বল্লেন এগুলো ইচ্ছা করলে আমি সাধারণে বিক্রীও কর্তে পারি, সে ছবিগুলোতে তাঁকে খুব গভীর ভাবে দেখাচ্ছিল, পরে আমি জানতে পেরেছিলুম যে কইজারের একটা নিয়ম যে-ছবি বাইরে যাবে সেগুলোতে তিনি গভীর কঠোর রাজোন্নয়ন চাল যুখে, তলীতে আনেন; তাঁর মত মুখের হাসি বাইরের লোকে দেখলে তাঁর মান এবং কন্যতার লক্ষ্য হয়।

যখন রাজ রাজাসের একজন কন্যা ছবি নেবার ভাগা আমার হয়েছে তখন সৈন্যদের ও বড় ঘরের ছবি যে আমি পাব সে নিশ্চিত। নেক্টেবর মাসে নর্ডার্নীর মরণম ফুরিয়ে গেলে আমি বার্লিনে গিয়ে টুডিও খুলে

বললেন। ডিসেম্বর মাসে কাউন্ট মারবাচ্ পটস্‌ডামের রাজপ্রাসাদে আমার ঘেঁষে লিখলেন। নির্ধারিত দিনে সকাল ১১টার সময় আমি রাজকীয় একটি কক্ষের বাহিরে অপেক্ষা করছিলাম, আমি ও আমার সহকারী একেবারে ঠিক হয়েই এসেছিলাম, প্রিন্সেসকে দেখে আমরা অভিবাদন করলাম। তিনি বললেন প্রস্তুত, হার বোঁমান।

“হাঁ মহাহুভব রাজ্ঞী!”

“আমুন আমরা অপর একটি কক্ষে যাই, সেখানে যথেষ্ট আলো পাওয়া যাবে।”

জানালায় পূর্ণ আলোর সমুখে একখানি সোফা পাতা, তার উপর নর ক্রাউন প্রিন্স শুয়ে আছেন। প্রিন্সেস আমার বললেন এই ছেলের ফটোই তিনি উঠাতে চান।—এগুলো স্বামীকে আমার বড় দিনের উপহার দেওয়া হবে, বড় দিনের আগে শেষ হবে না?

বালকের বসার ভঙ্গী ও ক্যামরা ঠিক করার সময় প্রিন্সেস আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, বালিন্সে এডিলিনা প্যাটির মুজরার কথা উল্লেখে তার যথেষ্ট সূখ্যাতি করে আমি সঙ্গীত রাণীর মুজরা দেখেছি কি না জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললাম—“আমি প্যাটির একখানা ফটো নেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, তিনি আমার একখানা মুজরার টিকিট উপহার দিয়াছিলেন, সে দিন অভিনয়ে স্থান পাওয়া দুর্ঘটক ঐ টিকিটের জন্য তিন শত মার্ক (১৫ পাউণ্ড) অনেকে আমার দিতে চেয়েছিলেন, আমি তা বিক্রী না করে নিজেই মুজরা দেখতে গিয়েছিলাম।”

প্রিন্সেস বললেন “ঠিক করেছিলেন হার বোঁমান, আর্ট টাকার অনেক উপরে, আর প্যাটিও আশ্চর্য—খুব ভাল করেছিলেন আপনি, টাকা তো আরো অনেক উপায়ে করতে পারেন।”

আটবার ফটো নেওয়া হলে রাজ্ঞী বললেন “হার বোঁমান আপনাকে এখানেই খেতে হবে।” আমি দেখলুম আমার ও সহকারীর জন্য একজন কর্মচারীর কক্ষে খাবার বন্দোবস্ত পূর্বে থেকেই করা হয়ে গেছে। রাজ্ঞী ফোটোগুলো দেখে এত খুসী যে তিনি বারো ডজনের অর্ডার দিলেন, এবং আমার দোকানেও বিক্রয় করতে অমুমতি দিলেন, ব্যবসার হিসাবে এ আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ।

রাজ রাজরার ফটো তোলা ব্যাপারে সাধারণ চার্জ আমি চির দিন করেছি, দর দস্তুরের কোন কথা কোন দিন হয় নাই। ১৮৮৫ খ্রীঃ আমি ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হলেম, এর মানে রাজবংশ ও রাজ অভিযোদিতদের সকলের ফটো নেবার ভার আমার উপর, স্থানটি বেশ দর্শনীয় বলে প্রায়ই অনেক রাজরাজ্ঞীরা মিউনিচ্ দেখতে আসতেন।

বর্তমান জার্মান সম্রাজ্ঞী সিংহাসনে বসতে ১৮৮৭ খ্রীঃ আমি জার্মানীর কোর্ট ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হলেম তারপর দশ বৎসরের মধ্যে আমি স্পেনের রাজা ও রাণী, ব্যাভেরিয়ার রাজা লিয়োপোল্ড, বুলগেরিয়ার জার ফার্ডিনান্ড এবং আরোও বহু স্থানে কোর্ট ফোটোগ্রাফার নিযুক্ত হয়েছি।

ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের ওয়েগনারের উপর বড় বিদ্বেষ, তার নাম পর্যন্ত কারো সমুখে উচ্চারণ করবার অমুমতি নাই, তাঁরা বলেন লুডউইগের খেয়ালের জন্যই ওয়েগনারেব এই প্রতিপত্তি, এই কোর্ট এক দিন ওয়েগনারের—কতখ্যাতি আর আদর এখন ওয়েগনারের খ্যাতি বিধ্বংসাত্মক তখন তার উপর এত বিদ্বেষ! তবে ক্রমেনৌয়ার রাণী ক্রম্পেন সিলভারের এভাবে আমি দেখি নাই—আমি এই রাণীর বহু ফটো নিয়েছি, ইয়োরোপের রাণীদের মধ্যে ইনি এক জন সেরা বুদ্ধিমতী, মনে পড়ে এক দিন তিনি এসেছিলেন আমার কাছে টান হাঁসারের বাছো

অভিতুত হয়ে—পূর্ব রজনীতেই তিনি এর গান-বজানা শুনে এসেছিলেন—রাণী বলিলেন, “এর যেমন বাজনা শুনেম এমন আর কোথাও শুনি নি, অদ্ভুত প্রতিভা অধূর্ব—আশ্চর্য্য!”

অনেকে অনেক সময়ে আমার জিজ্ঞাসা করেন আর্টিষ্টের চোখে ইওরোপের কোন রাজ ঘরের নারী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আমার বোধ হয় শারীরিক সৌন্দর্য্য হিসাবে ধরতে গেলে স্পেনের রাণী ইনফ্যান্টা ইওশেলিয়া সেরা সুন্দরী, আমি তাঁর এবং তাঁর বোন ইনফেন্টা ইসাবেলার অনেক ফোটা নিয়েছি।

ইটালির রাণী হেলেনা সঙ্গীত বিশেষ গান্ধীর্থের সঙ্গে মাধুরী এবং হাসির আশ্চর্য্য সমাবেশ। ইনি জগতের সব রাণীর চেয়ে সুপরিচ্ছদ-ভূষিতা। রাজ্ঞী হেলেনা প্রায়ই হালকা রঙের জমকালো লেসওয়ারা একেবারে নূতন ধরণের প্যারী ফ্যানানের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কোন রূপ হীরা জহরত কখনো পরতে দেখি নি। দেখতে বেশ লম্বা, ফিট্‌ফিটে মধুর রং,—স্বর মৃদু, সঙ্গীতে ভরা তরঙ্গায়িত। নমস্কার করে আমি রাণীকে ক্যামেরার সম্মুখে কোথায় বসতে হবে দেখিয়ে দিলে তিনি রূপো বাঁধা আয়নাখানি হাতে ধরে—কখনো তেঁসে মুখভঙ্গী বদলে কি ভাবে ভাল দেখাবে, নিজেই পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন—“আমার কেশ ঠিক আছে তো?” তারপর তিনি সেই কুন্তলগুচ্ছের ওপর হাত দিয়ে, ক্রম্বোরা অঙুল দিয়ে একটু টেনে—পরিচ্ছদের তাঁজ ঠিক করে, ফোটো উঠাতে বসলেন।

আমি রাজ বংশাণেব সঙ্গে তাঁদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয় প্রথমে কখনো কোনও কথা বলতে যাই নি। কেহ কেহ মনে করেন তাঁদের সম্মুখে অতি বিনীত ভাব দেখাতে হবে, আমি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে শেখছি, কোনরূপ অতি শ্রদ্ধা কিম্বা দাঁদের মত ব্যবহার তারা অপছন্দ করেন। রাজা রাজ্ঞী সাধারণ বস্তু ভাবে বাবহার পেতে চান খোঁচা চান চমকের গম্ভীর কাটিয়ে ছবি ওঠাবার সময় তাঁরা যেন অনেকট গণতন্ত্রবানী হবার সুবিধা পান।

রাণী হেলেনা বললেন “দেখুন দেখি আমার হাত ঠিক রাপা হয়েছে কি না, আর কি রকম ক’তে হবে বলুন।” রাণী ফোটোতে বেশ ভাল দেখতে চান এবং সে কথা সরল ভাবে বলেন।

রাণী হেলেনার পর জর্জিয়ার রাজ্ঞী বারভেরিয়ার প্রিন্স লিওপল্ডের পত্নী হিসেবা অতি সৌন্দর্য্যময়ী নারী। রাজ বংশীদের মধ্যে বড় দিনের সময় নিজ নিজ ফোটো উপহার দেওয়ার প্রথা বেশ চলিত, এ উদ্দেশ্যেই প্রিন্সেস প্রথম আমার কাছে ফোটো তোলাতে আসেন। অগতি তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, লম্বা কোমল নমনীয় মুক্তি—সুন্দর; একেবারে নূতন প্যারী মডেলের পরিচ্ছদ পরিহিতা। মুখখানা খুব সুন্দর না হলেও তার মেহের গঠন অপূর্ব্ব, কোমর ছ’হাতের আঙ্গুল দিগ্ন মাথা যায়, প্রিন্সেস হিসেবার কটিদেশ ইওরোপের সব রাণী, রাজবধু ও রাজকন্যার চেয়ে সরু সন্দেহ নাই।

রাজা আলফ্রেনসোর মা রাণী ক্রিশ্চিনা অধিকাংশ সময়েই মিউনখে কাটান, সব রাণীর মধ্যে তাঁকেই দেখেছি খুব স্তুতি-বাক্স আনন্দময়ী। তিনি সব সময়ই অপেরা, থিয়েটার—কোন না কোন আমোদে যোগ দিয়ে আছেন।

ব্যক্তিগতরূপে রাণী মেরিয়া থেরেসা ইওরোপের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে দানশীল রাণী, দরিদ্রের প্রতি তাঁর গভীর সমানুভূতি—এই মহৎ গার্বে তিনি সদাই অগ্রগণ্য, ইওরোপের রেড্‌ক্রস সোসাইটির নেতৃত্বপূর্ণ তিনি সর্বদাই ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, মনে পড়ে একদিন ফোটো তুলতে এসে বলছিলেন—“হার বোমান আমার রেড্‌ক্রসের জন্য খুব বড় একটা মেলা দিচ্ছি—এ যাকে বেশ ভাল ভাবে উৎসর্গে যার আমারও খুব ইচ্ছা—তিনি সেই বৈপাথ ছবি তুলে আমাদের সাহায্য করবে না?”

তিন দিন আমার এই মহৎ কার্যের জন্য বিনি পরসার কাজ করতে হবে,—যদি তাৎক্ষণিক কাজ আমার বললেন—“বেশ কাজ করেছ তুমি, মহৎ কার্যে আমাদের সঙ্গীতা করেছ, অপূর্ণকে পরিচালনা করা আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ কার্য। মানসিকতার এ একটি মহৎ কার্য—এ কাণ্ডও আমরা পুরস্কার ছাড়া কর না, আপাততঃ আর্থিক ক্ষতি কিছু হলেও—এ সব তোমার পুষ্টি হবে।”

স্পেনের রাজার এক খুড়ো প্রিন্স ডাক্তার লুডউইগ ফার্ডিনান্ড মিউনিচের নিউ থ্যাটার এক প্রকাণ্ড ইন্দু-পাতাল চালিয়ে থাকেন, একদিন ক্ষেত্রী তুলতে এসে তিনি বললেন চিকিৎসা বিদ্যাই সব চেয়ে তাঁর ভাল লেগেছে।

“রাজবংশে জন্মেছি এই শূন্য সম্মানে কোন তৃপ্তি নেই—তৃপ্তি হচ্ছে কার্যে।”

প্রিন্স ফার্ডিনান্ড আজীবন চিকিৎসা-শাস্ত্র চর্চা করেছেন, বোধহয় এখন ইনি ইওরোপের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, ইনি লন্ডা জোরান, চোখে বিশ্ব-ভালবাসার জ্যোতিঃ কতকটা কবি-ধরনের। শত সহস্র দরিদ্রের চিকিৎসা করছেন—ঔষধ এবং নিজেকে বিন-খরচার সকলের কাছে সহজপ্রাপ্য করেছেন, নিজের আমাদের জন্য ইনি ভাগ্যলিন ব্যক্তিরে থাকেন।

রাজাদের দোঁটোগ্রাফার হিসাবে অতিজ্ঞতা মাঝে মাঝে আমার মন আমোদজনক হয় নি, মনে পড়ে এক দিন বিকেলে গ্রাণ্ড ডিউক লুডউইগ ঠাণ্ডা অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছে উপস্থিত। সদা ভ্রমের কোন আদব-কায়দার ধারণা বড় বেশী ধারেন না, হাস্তে হাস্তে বললেন “ভার বোমান, ধূম পান করতে না পেয়ে মারা গেলাম—হবে কি এখানে?” ইওরোপে রাজারা কেউ রাস্তায় ধূম পান করেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন এতে তাঁদের মানের ধ্বংস হয়।

আমি বলিলাম “নিশ্চয় খান না” তখন তিনি সিগার ধরিয়ে বেশ করে ধূম পান করে বেরিয়ে গেলেন।

একবার প্রিন্স লিওপোল্ড তাঁর ছেলে চারি বৎসরের বালক রিউপার্টকে (এখন ব্যাভেরিয়ার ক্রাউন প্রিন্স) নিয়ে আমার টুডিওতে আসেন, আমার ছেলে তখন একখানা সাজান বেত হাতে নিয়ে খেলছিল, বেতখানার উপর রাজপুত্রের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল, দৌড়ে গিয়ে তিনি বেতখানা ধরলেন, দুই শিশুও অবশ্যস্বার্থী চানটানি শুরু হোল, কিন্তু রাজপুত্র ছিলেন আমার পুত্রের চেয়ে বলবান—আমার ছেলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, রাজপুত্র বেতখানা তৎক্ষণাৎ অধিকার করেছেন। তাঁর বাবা বললেন—

“ওটা কিরিয় দিতে হবে একুণি”—ছেলেটি মুখখানা বিকৃত করলে—“বন প্রাণ কেনে কেনে। তখন তাঁর বাপ বললেন—“যাহোক এ নিয়ে আর কোনো নষ্ট করা যায় না”—আমি আমার ছেলেকে কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে কোণে নিলুম, তখন তাঁরা উঠবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাঁর বাপ বেতখানা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সেখানা বালকের মনে ধরেছে, সে কান্নাতে লাগল! আমি বললুম—নাও তুমি বেত।” আমার থোকাও ঘোর অনিচ্ছার দানে সর্বাতি দিল। এর ক’দিন পরেই সুলতান একখানা বেত এসে উপস্থিত—প্রিন্স আমার ছেলেকে উপহার পাঠিয়েছেন।

বহুদিন আমেরিকা ঘুরে আসার পর প্রিন্সেস পের্সি কোটো ভোলাতে এলেন, ইনি ব্যাভেরিয়ার রাজার বোন, ইউরোপীয় প্রিন্সেসদের মধ্যে একজন অতি বুদ্ধিমতী, এর মন উদার,—অগতের রাজনীতি, শিল্পকলা সবছে প্রগতি জান। ক’খানা বইও লেখেছেন আমার কাছে এসে বেশ আলাপ করেন, তাঁর ভ্রমণকাহিনী আমি

আমাদের সঙ্গে তান, বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ইনি। বলেন “হার বোমান আমেরিকার সংরক্ষণের মধ্যে সেরা নিউইয়র্ক আমি বড় ভালবাসি, এ যেন সৌন্দর্য্যসজ্জার প্রার্থ্য একবার ভেঙ্গে পড়েছে। এ আমেরিকার শিল্প এর মধ্যে ইউরোপের সর্বস্থানের চিহ্ন পাবে। সমগ্র ইউরোপের আঁনের দ্বারা এখানে শিল্পিত হয়েছে। এখানে এলে বন কল্লনার একটি নতুন সুবৃহৎ দোর খুলে যায়, এই ইউনাইটেড স্টেটস্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ; সব চেয়ে ক্ষমতালী দেশ হতে যাচ্ছে। বাণিজ্য এরই ইঙ্গিতে চলবে, এ আমেরিকার সকলকার আগে চলবে। হার বোমান আমি আমেরিকার নারীদের বড় পছন্দ করি, নানারূপ নিয়মের শৃঙ্খলা এঁরা শৃঙ্খলিত নয়, আমাদের মত শও বাধা এদের পার পাও নেই, তাদের মাথা আছে এবং সে কাঙ্ক্ষণের উন্নত করার ক্ষেত্রও তাদের আছে—আরো তাদের চেহারা খুব ভাল না হলেও তারা জানে কেমন করে ভাল দেখাতে হয়। হেঁসে বলেন ‘হার বোমান আমার ইচ্ছা হয় আমেরিকায় বাস করি।’

ফেরন একটা ভীতি নতুন ভাব আসতো প্রথম প্রথম রাজাদের সম্মুখে যেতে—তারপর রাজা রাণী রাজপুত্র রাণী রাজকন্যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একটি সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। রাজাদের সাধারণে যেখানে মনে নেন গিয়ে রাখে তার অসংখ্য কাল্পনিক—এরাও সাধারণ মানুষের মতই মানুষ, কোটের নানারূপ সিন্ধুগাহনে বদ্ধ থেকে—একটি সাধারণ মানুষের সহজ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ব্যগ্র, আমার বিশ্বাস রাণীদের যদি গৃহস্থালীর কাজ করতে হয়, তো মাংসের দাম নিয়ে এদেরও মাথা ঘামাতে হবে। জাতীয় কোন বড় নীতি আর্থিক বা সামাজিক কোন প্রশ্ন এসব সম্বন্ধে তাঁরা সাধারণে ক’ত কোন মত ব্যক্ত করে থাকেন। সত্যি কথা এসব রাজনিস তাঁদের মস্তা অনাত্যরই ভেবে রাখেন, রাজার নতুন মত কিছু দেওয়া হয় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে, পার্যী থেকে কি ধরনের নতুন পোষাক এস রাজকন্যা সেই নিয়েই মগ্ন আছেন, রাজপুত্র আছেন তাঁর নতুন ব্রাণ্ডের সিগার নিয়ে, সকলেই ক্যামেরার সামনে খুব ভাল দেখাতে ইচ্ছুক এবং সাধারণে কিন্তু বে কোটোখান নেবে—সে বিষয়ে সকলের চিন্তিত সজাগ।

এই সব রাজাদের এবং তাদের ব্যক্তিত্বের কথা মনে উঠলে কাইজারের স্থিতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার অনেক রাজা হক্কেলদের সম্বন্ধে আঁনার ধারণা রান হয়ে এসেছে, কিন্তু কাইজার উলহেলনের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি কথাও বিস্তৃতিতে ডুবে যায় নাই। কাইজারের প্রবল নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব নিজেকেও চালার, অপরকেও চালিত করে, ক্যামেরার সামনেও নিজ ভঙ্গী নিজেই টিক করে নেন, এমন কি ফটোগ্রাফারকে পর্যন্ত কোন রূপ ইঙ্গিত করবার সুযোগ দেন না, ইনি সব সময়ই যোদ্ধা, প্রভু ও শাসক। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কেউ ফটোগ্রাফার রূপে প্রায়ই বার্লিন হতে আমার ফটো তোলাবার ডাক আসতো, সব বারই কাইজার আমার ও আমার সহকারীদের হোটেল বিল জোর করে দিয়ে দিতেন।

তার এই উদ্দাম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাইজারিণের অপূর্ণ মধুর সৌন্দর্যের বিচিত্র মিলন হয়েছে। কাইজার কর্তৃক সৈনিকের স্বরে কথা বলেন, সম্রাজ্ঞী কোমল সূক্ষ্মধ্বনি স্বরে কথা বলেন। কাইজার তাঁর বিছাৎশক্তিতে বলসে দিবে বান, কাইজারিণ অমায়িক সুন্দরী, নেহাৎ ঘরোয়া রমণীর মত। একবার মনে পড়ে রাজপ্রাসাদে গিরেহিলার কাইজারিণ ও গ্রিন্সর ভিক্টোরিয়া লাইসার কটো নিতে, কাইজারিণকে সব সময়ই দেখেছি সাধারণ পোষাক পরতে—এবার দেখলুম শাদা সিল্কের পোষাক, কাল লেসে আবৃত—কোনরূপ গহনার আড়ম্বর ঘোটে নেই, তার পর এক দিন কাইজার ইউনিফর্ম নিয়ে এক কটো ফুললেন। হাতে তাঁর অসাধারণ বৃহৎ এক আঙঠি—জার হীরে

কত একাণ্ড ! কাইজারিং তাঁর কটো তুলিয়েছেন পেছনটা একেবারে ফুলে মণ্ডিত করে। তিনি বলছিলেন ফুল বড় ভালবাসেন, ফটোতেও তাই ফুল দিয়ে ওঠার ইচ্ছা—ফুলের পাশে ফটো তুলতে দাঁড়ালেন অজ্ঞাতসারে, হাতখানি কেশদাম সংযত করে দিল, এ ছাড়া নিজ বেশবিজ্ঞাসে তাঁকে কোন দিন বড় মনোযোগী দেখি নি। কিন্তু যখন রাজকন্ডার ফটো নেওয়া হোত তখন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তিনি বলতেন—“হার বোমান খুব সুন্দর ফটো চাই—খুব সুন্দর।”

মেয়েকে তাঁর নানা ভাবে দাঁড় করাতেন, এক জন কেশবিজ্ঞাসকারিণী কেশদাম ঠিক করে দিত, রাজ্ঞী হাঁটু গেড়ে বসে পোষাকের ভাঁজ ঠিক করে দিতেন।

শেষ বার যখন কাইজারের ফটো তুলি, সে কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে। বার্লিন থেকে ডাক পড়লো,—কাইজার কতকগুলি ফটো নেবেন, তিন জন সহকারী নিয়ে আমি প্রাসাদে গেলাম, মিনিট পাচেক পাশের কক্ষে অপেক্ষা করার পর সামনের কক্ষের দ্বার খুলে গেল, কাইজার ‘হজ্জেরিয়ার দৈনিকের’ পরিচ্ছদে বোরয়ে এলেন মাথা সোজা করে মিলিটারী কায়দার পা ফেলে কক্ষে ঢুকলেন, ব্যক্তিগত তাঁর বিজ্ঞাৎ-বর্ষী, সমস্ত কক্ষ তাতে উদ্ভাসিত হ’ল—বাতাস পর্যন্ত যেন শুক !

“নমস্কার ভদ্রমণ্ডলী”

স্বর প্রভুত্ববাজক—প্রতিধ্বনি উৎপাদনকারী, প্রতিটি ভঙ্গিতে সামরিকরীতির সম্পূর্ণতা দেখাচ্ছিলেন, দৃষ্টি যেন তাঁর আম দের গ্রাস করছিল, কাইজার যখন কথা বলেন তখন তিনি চোখের পানে স্থির গভীর দৃষ্টি রেখে কথা বলেন। তোমার মনে হবে তিনি যেন তোমার অন্তর পড়ে নিচ্ছেন। বললেন—

“ফটোগ্রাফার কোথায় ?”

আমি এগিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“কোথায় আমি দাঁড়াব—আলো বেশ ভাল কোথায় ?” এ যেন তিন মিলিটারী অর্ডার দিচ্ছেন, আমি স্থান দেখিয়ে দিলাম, কাইজার গিয়ে দাঁড়ালেন, এক একবার কটো তোলা হলে তিনি ইচ্ছামত ভঙ্গী বদলিয়ে আবার তুলতে বলেন—বসে ফটো তোলেন না, এতে মর্যাদার লান্ঘ হয় মনে করেন।

এই রকম ফটো পছন্দ করেন যাতে, তাকে খুব কঠোর প্রভুত্ববাজক ভাবে দেখা যায়। ফটো ওঠাবার সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য আমি দেখেছি যাতে ফটো সেনাদলের প্রিয় হয় তারপর সাধারণের। আমি ফটো নিতে আরম্ভ করলুম সহকারীরা প্রেট এগিয়ে দিচ্ছিল। কাইজার একের পর এক ভঙ্গী বদলাচ্ছিলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা,—কি ভাবে কোন ফটোখানি তুলতে হবে সে ঠিক করাই আছে। ক্যামেরার সামনে সুদক্ষ অভিনেতার মত ভঙ্গীর পর ভঙ্গী বদলাচ্ছিলেন। গৌফ জোরার উপর তার প্রখর দৃষ্টি—এক একবার ফটো নিতেই আঙ্গুল দিয়ে গৌফ জোরা মুচড়ে দিচ্ছিলেন। দাঁড়ানোর সব ভঙ্গীই সব মিলিটারী অঙ্গুত। ক্ষপ্রতার সঙ্গে তিনি ভঙ্গী পরিবর্তন করছিলেন।

“বেশ নাও এইবার বোমান,” এবেন চলন্ত ফটো নেওয়া, প্রেটগুলো আমার ও সহকারীদের মধ্যে অনবরত ফিরছিল। কাইজার বললেন ‘চের হয়েছে,’ চল্লিশ মিনিটের ভেতরে পঞ্চত্রিংশখানি ফটো নেওয়া হয়েছিল। সবগুলিই বিভিন্ন ভঙ্গিতে। বললেন—“আমি যেমন পছন্দ করি আশা করি ফটোগুলো তেমনি হবে—পরে জড়ার যাবে।”



যখন প্রকৃতি পেলাম—দেখলাম ‘রি-টাচ’ করবার মত অতি আবশ্যকীয় করে কটি স্থান তিনি দেখিয়েছেন।  
শোষকে একটিও ভাঁজের দাগ না থাকে এ বিষয়ে তিনি ভারি সতর্ক, অধিকাংশ ফটোতেই খুব গভীর—ফটো  
পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন। সেবার ফটোতে তিনশত পাউণ্ড পরিমাণ আয়ত্ত্ব দেন। যনন্তবে কাইজার যে অতি  
নিপুণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।\*

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

## স্বরলিপি।

মেঘমল্লার—তেতালা।

এল বাদল মেঘ-ডমুরু বাজারে  
মধুর মধুর ধ্বনি বাজিল পায়ে!  
দামিনী বলকে ওড়না উড়ায়ে!  
ঝননন ঝননন, ঝননন বোলে,  
আকুলি বিকুলি ঘন, ঘন ঘন রোলে  
প্রলয় পবনে সঘনে তরসায়ে।

গান ও সুর :—শ্রীউম্মৌচাঁদ গুপ্ত।

স্বরলিপি :—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

II

II রা-গা রা গমপা | মা গা রসণা সা | -১ রগা রা গা | মপধা পমপা মা-গমা I

এ • ল বা দ ল মে ঘ • ডম রু বা জা • রে •

I -রা ররা মা মা | পা পা মা পা | ধনা-সাঁ ধা পা I মপা-ধপা মা-গা I

• মধু র ম ধু র ধ্ব নি বা • জি ল পা • রে •

I গনা- ১- না না | সাঁ সঁনা সঁসা-পা | পা র রা গা | মপধা-পমপা মা-গমা II

দা • মি নী ঝ ল কে • ওড় • না উ ডা • রে •

II -১ মপা পা পনা | না না নধা না | -১ সঁসা সঁ সঁরা | গনা-সাঁ সঁ-১ I

• ঝন ন ন ঝন ন ন • ঝন ন ন বো • লে •

I পা পনা না না | সাঁ সাঁ সঁনা সাঁ | -১ নসাঁ না সঁরা | সঁগা-ধা পা -১ I

আ কু লি বি কু লি ঘন • ঘন ঘ ন রো • লে •

I -রা ররা মা মা | পা পা গমা পা | গসাঁ-১ ধা পা | মপা-ধপা মা গমা II

• প্রলয় প ব নে ল ঘ নে • ত র সা • রে •

\* জার্মেন সম্রাটসম্রাজ্ঞী, ইটালির রাজা ও রাণী, স্পেনের রাজা ও রাণী, বুলগেরিয়ার আর ও আরিগা,  
সার্ডিনিয়ার রাজা প্রভৃতির কোর্ট কোটোগ্রাফার এ্যাডলফ বৌমানের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

## বোকা ।

—\*—

চিরদিনের তরে এষে  
 বোকা নিলেম মাথে  
 রাখবো আমি এরে সদা  
 আপন সাথে সাথে ।  
 দুঃখে সুখে হাস্য মুখে  
 আগুণ যখন ছলবে বুকে  
 এই তো আমার তুষবে জ্বালি  
 তুলবে আপন হাতে  
 পিছল পথে ধরবে আমার  
 জ্বালবে আলো রাতে ।  
 সারাদিনের কাজের শেষে  
 ফিরবো যখন ঘরে এসে  
 দেহ যখন ভরবে অলস  
 ক্লান্তি আপনাতে  
 শান্তি আমার দূরে যাবে  
 তারি নয়ন পাতে

শ্রীউমিটার গুণ্ড ।

## থিয়েটার-দেখা ।

—:—

( চিত্র )

( ১ )

রাজি আটটা বাজিয়া গিয়াছে ।

বিতলের বাঁহেরগার গলিটার উপর বসিয়া উজ্জ্বল আলোর লামনে মাথা হেঁট করিয়া ‘নক’ বখশ্বের জুতার বেশেরে ফুল তুলিতেছিল । । নতর বরষ বছর এগারো, পাংলা ছিপছিপে গড়ন, সুখী অতি সরলতার ও কেসলতার কমাঁবেশে ঘনোন্ন সুন্দর, ধং কর্ণী । নতর ডান পাশে বড় দিদি, বিহুলা বসিয়া একখান বাঁহা

উপন্যাস পরিত্যক্তলেন। আলোর অপর পাশে বড় জামাইবাবু অর্থাৎ বিমলার স্বামী বিপিনবাবু একটা ভাকিয়া হেলান দিয়া শুইয়া, শুড়গুড়ির নল মুখে করিয়া, খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। বারেরতার অনাপাশে দোলনার শুইয়া বিমলার তিন মাসের খোকাটি অগাধে ঘুমাইতেছিল। সকলেই নীবর, শুধু শুড়গুড়ির মুহু-গম্ভীর অলস-আর্তনাদ এক-বাই ধ্বনিত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে খবরের কাগজখানা শেষ করিয়া বিপিনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বড় দিদি বই হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন “খাবার দিতে?”

বিপিনবাবু বলিলেন “আঃ, এর মধ্যে! ন-টা বাজুক-ই না। হার্শোনিরামটা নিয়ে আসি, নত জুতো সেলাই রেখে সোজা হয়ে বস—”

নত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষিপ্ত-কৌশলে হুঁচ চালাইতে চালাইতে সবিস্ময়ে বলিল “তা বলে জুতো সেলাই ছেড়ে আমি এখন চণ্ডীপাঠ করতে পারব না জামাইবাবু, লক্ষ্মীটী, এখন বলবেন না।—”

টেবিলের উপর হইতে হার্শোনিরাম পড়িয়া চাবি টিপিয়া ধরিয়া বিপিনবাবু বলিলেন “লক্ষ্মীটীই বল, আর হুঁচটীই বল; আমি ছাড়ছি নে। গাও ‘প্রলয় পরোধি জলে—”

বাড় নাড়িয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে নত বলিল “ওমা! প্রলয় না হলে বুঝি ‘প্রলয়-পরোধি-জলে’ গান করা হয়!—”

বিপিনবাবু বলিলেন “দেখবে, প্রলয় হওয়ার? ঐ হুঁচ জুতো কেনে নিলেই এখনি—”

সতরে নত বলিল “না জামাইবাবু, আপনার পায়ে পড়ি,—”

বড় দিদি বইখানা মুড়িয়া গালিচার উপর শুইয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন “গা’ না বাপু, ক’দিন-ত পাস্ নি,—হাফ্ ইয়ার্লি একজামিন হয়ে গেলে গান শোনারি বলেছিলি মনে আছে?”

অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নত বলিল “এই! দিদি স্বদ্ধ জামাইবাবুর দিক হয়ে দাঁড়ালে! তোমাদের আলার, সত্যি আমার আর কিছু হবে না, কিছুটী—না!—”

বিপিনবাবু একটা স্বর আরম্ভ করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বলিলেন “এত বিদ্যার পরও ‘কিছুটী না?’ সে কি? আরস্থলের বাচ্চা ছারপোকা বিছানার থাকে কেন? না—পাখা নেই, ছেলে মানুষ, উড়তে পারে না বলে!—কুমীরের বাচ্চা টিক্‌টিকি দেয়ালে বেড়ায় কেন? না—কচি ছেলে, জলে নামলে সর্দি করবে বলে। পায়রাগুলো বক্-বকম্ বক্‌তে বক্‌তে টবে মাথা ডুবিয়ে চান্ করে কেন? না, কুস্তলীন তেল মাখিয়ে দেওয়া হয় নি, সেই হুঁধে!—এমন অগাধ বিদ্যার পরও কিছু না!—একি আশ্চর্য্য কথা!”

বলা বাহুল্য উক্ত অগাধ বিদ্যাগুলো,—নব্ব্বর শৈশব জীবনের স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল! লজ্জার অস্থির হইয়া সে বলিল “হ্যাঁ তা বই কি! বান্ আমি কিছুতেই গান গাইব না, কিছুতেই না! আপনি হুঁচই কাড়ুন আমি কিছুতেই না! এইখানে গুয়ে চুপ্‌টী করে ঘুমিয়ে পড়ব সেও ভালো,—তবুও, না!”

টপাটপ্‌ চাবির উপর আঙ্গুল চালাইয়া বিপিনবাবু—সঙ্গীত কলার নির্দিষ্ট স্বর তালের সাক্ষাৎ আদ্যপ্রাচ্য স্বরূপ অসহনীর বেঙ্গরা চীৎকারে গান ধরিলেন “ও বাবা, কি কালো!”

নত হাসিয়া ফেলিল! সেলাই হইতে চোখ তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া কৌতুক-কোমল কণ্ঠে বলিল “দেখ্ ছ ভাই দিদি! সাথে বলি, পুরুষ মানুষদের গান শুনলে আমার বড় হাসি পায়! চ্যাচ্যান’র দোড় দেখ দেখি!— “ও বাবা!” উঃ, কি চিৎকার! বেন কেউটে সাপ বেধে লাঞ্ছিত উঠলেন! ওমা একি? এর নাম গান?—”

“তবে রে পাঞ্জি!—” বলিয়া বিপিনবাবু হারমোনিয়াম ছাড়িয়া নস্তুর দিকে অগ্রসর হইলেন, নস্তুর চক্ষের নিম্নে সেলাই কেলিয়া, লম্বু লম্বে ছুটিয়া বারেণ্ডার ছয়রের দিকে দৌড়িল! ঠিক সেই মুহূর্তে, অলঙ্কার ও সুরবসনে সসজ্জতা এক ঘোড়শী সুন্দরী হাসিমুখে বাস্তভাবে বারেণ্ডায় ঢুকিয়াই—সহসা নস্তুরকে সামনে দেখিয়া, সবিস্ময়ে বলিল “এ কিরে! এমন করে ছুট্‌ছিস্ কেন?”

ঘোড়শীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার আড়ালে নিজেকে উত্তমরূপে নিরাপদ করিয়া, নস্তুর অহুযোগ পূর্ণ স্বরে বলিল “দ্যাখো না ভাই মেজ দি, জামাইবাবু আমার ধ্বংসে আসছেন—”

পিছনে হুহাত ঘুরাইয়া, ছোট বোনটিকে সাদরে বেঁধেন করিয়া, মেজদি হাস্যোজ্জল মুখে তর্জন করিয়া বলিয়া “বটে! এত অত্যাচার! এমন অরাজকতা! আপনি কি রকম ভদ্রলোক বলুন ত?—”

বিপিনবাবু যারপর নাই বিস্ময়ের সহিত পিছু হটিয়া গিয়া বলিলেন “ও বাবা! এ কি! আচম্বিতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ্‌ পুলিশ!—”

মেজদি স্মিতমুখে বলিল “সেটা অত্যাচারীর চোখে! অত্যাচার-পীড়িতের চোখ নিয়ে যদি দেখতে পারেন, তবে এ অধমের চেহারাটা অন্য রকমই দেখতে পাবেন, না হয়—দয়া করে মাইক্রোশ কোপ্টাচোখে আঁটুন—”

সহসা অপরিচীত উৎসাহের সহিত বিপিন বাবু বলিলেন “গুড্‌ ইভনিং মেমসাহেব! কামিং, কামিং, বহুন এই ইজি চেয়ারটায়। কইরে সিগার কেস্টা কোথায় গেল—”

মেজদির উপর এতটা আবিচার নস্তুর মোটেই সহ্য হইল না! সে তাড়াতাড়ি মেজদির বাঁ দিক হইতে মুখ বাড়াইয়া সক্রোমে বলিল “আহা, নিজেকেই যেমন রিডো! রাতদিন ঐ সব অসভ্য অসভ্য নেশা নিয়ে পড়ে আছেন, আবার মেজদির নাম করা হচ্ছে! মেজদি কেন সিগারেট খাবে, আপনি খানগে!—”

নস্তুরকে টানিয়া লইয়া গালিচার দিকে মেজদি অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বিপিন বাবু শশব্যস্তে বলিলেন “আহা ওদিকে কোথা যেম সাহেব? এই বে চেয়ার”—

মাথা নাড়িয়া সুকোমল কণ্ঠে মেজদি বলিল “আমি মেমও নই, সাহেবও নই, খাঁটি বাঙালী! আমার পক্ষে বাংলা গাল্‌টেই ভাল, বিশেষ আমার দিদি ওখানে বসে রয়েছেন। তা ছাড়া গুরুজনের সামনে উচ্চ আসনে বসটাও অবিধেয়!—”

নস্তুর মাঝখান হইতে টিপ্সনী কাটিয়া বলিল “সে বুদ্ধি কি ঠুর আছে? তা হলে কি আর আমাদের সামনে ভুড়ুক্‌ ভুড়ুক্‌ করে অসভ্যের মত তামাক টানতে পারেন! মাগো ছিঃ!—” কথাটা বলিতে বলিতেই সাগ্রহে মেজদির মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল “হ্যাঁ ভাই মেজদি, মেজ্‌ জামাইবাবু এসেছেন?”

বিপিনবাবু বিজ্ঞপের স্বরে বলিলেন “কেন? এতক্ষণ মেজ্‌ জামাইবাবুর জুতো সেলাই হোল, এবার গৌকে ভা লাগাতে হবে বুঝি?”

অসহিষ্ণু হইয়া নস্তুর বলিল “কেনই বা হবে না? মেজ্‌ জামাইবাবু তো আপনার মত অসভ্য নন, সেই জন্যই তো তাঁকে ভালবাসি—”

বিপিনবাবু সপক্ষে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া ছই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া মহা আশ্চর্যভাবে বলিলেন “এ্যা! একেবারে কবুল প্রবাব! প্রাণনা দেবী সাবধান, সাবধান, আর রক্ষা নাই—”

প্রতিমা,—অর্থাৎ মেজদি বিজ্ঞ-হাস্যে বলিল “প্রতিমা দেবী, সাবধান ছেড়ে, বেশ মেজাজে দানপত্র লিখে দিতে রাজী আছে, আপনি ত এ্যাটর্নি মাহুষ জামাইবাবু, আপনি ঘটকালীটা—”

বাঁতিবাস্ত হঠাৎ মেজদির মুখ চাপিয়া ধরিল, সঙ্কল্প অমুনয়ের স্বরে নব্ব বলিল “না ভাই চিঃ, ও কি ভাই মেজদি ! আমি কি ভাই ভাই বলছি,—আমি বলছি ভাই,—এই আমি কিনা মেজ্ জামাইবাবুকে, ভাই,—বেশ আন্তরিক ভালবাসি—”

হাতের উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া উল্লসিত চীৎকারে বিপিনবাবু বলিলেন “এ্যা—এই ! কবুলের ওপর কবুল,—ডবল কবুল ! শুধু ভালবাসা নয় বেশ আন্তরিক ভালবাসা ! বাপ্, জন্মানক ঘোরালো ব্যাপার !”

লজ্জায়, হুঃখে অস্থির হঠাৎ, অধৈর্য্য ভাবে বিপিনবাবুর পাঁচের পাতার উপর এক চড় বসাইয়া দিয়া, নব্ব কাদ-কাদ হইয়া বলিল “হ্যাঁ আমি ভাই বলছি না কি ! হ্যাঁ, যান, আমি আপনার সামনে আর আঁসিব না—যান !”

সে ছুটিয়া নীচে চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনবাবু ধরিল ফেলিলেন ! পাশ্চাইবার পথেও বাধা পাইয়া, ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া, গাশিচার উপর লুটাইয়া পড়িল, সে হুঃধাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া কুলিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল ! বিপিনবাবু তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া,—ক্রন্দন-স্বর অশ্রু করণের বার্থ-চেষ্টায়, হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে গলার স্বর কাঁপাইয়া সাহসনাঙ্কনে, সহানুভূতি জ্ঞাপন আরম্ভ করিলেন “আহ মরে যাই, মরে যাই, সত্যযুগ থেকেই এই এক ব্যাপারই চলে আসছে,—ভালবাসার পরিণাম—কান্না, কান্না, শুধুই হৃদয়-বিদারক কান্না ! আহা, কি অহুতাপ ! ক্রমাগত কই,—থাক এই কোঁচার কাপড়েই চোঁকগুলো মুছিয়ে দিই—এস—” সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্কল্প অমুনয়ার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন । নব্ব তাহার হাতের উপর আর এক চড় বসাইয়া দিয়া, কোঁচার কাপড়টা মুখে চাপিয়া ধরিল, হুঃসহ শোকাবল কান্নার মাঝেই, অকস্মাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ! বিপিনবাবু ক্রন্দনগাৎ হাস্যোনিয়মটার উপর বুঁকিয়া পড়িয়া চাবি টিপিয়া গান আরম্ভ করিলেন “ছি, ছি, ছি কবুলি কিসো সর্বনাশি !”

বড়দিদি এতক্ষণ অবাক হইয়া ইহাদের কীষ্টি কারখানা গুলি দেখিয়া যাইতেছিলেন, এইবার উঠিয়া বসিয়া বসিলেন “তানদেন মশাই স্বর থামাও,—মা গো না, কি ছড়োছড়িই জুড়েছে । মামুষটা বাড়ী এল, তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার সময় নাই, ও কি বিটকেলে কাণ্ড ! থাম এবার একটু—”

বিপিনবাবু হাস্যোনিয়ম ছাড়িয়া হাত পা গুটাইয়া সহসা নিরীহ ভাল মানুষের মত নিরুত্তর হইয়া বসিলেন । নব্ব, মুক্তি পাইয়া মাথার খোপাটা ঠিক করিয়া লইতে লইতে, বিপিনবাবুর দিকে চাহিয়া ভনাত্তিকে অশ্রুট স্বরে বলিল “দিদির কাছেই ঠিক জন্ম ! কেমন শাসন ? বেশ হয়েছে, এইবার আমার মনে যা স্থখ হচ্ছে !—”

বিপিনবাবু অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন ।

নব্ব মেজদির গা ঘেঁসিয়া, কথোপকথন ভনিতে বসিল ।

( ২ )

বড়দিদি বলিলেন “হ্যারে মনসা; তুই কার সঙ্গে এলি ?”

প্রতিমাকে ছেলেবেলা হইতে তিনি আদর করিয়া মনসা বলিয়া ডাকিতেন । দিদির প্রশ্ন শুনিয়া, মম্বর পরিচয় দিতে গিয়া সে হাসিমুখে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, বিপিনবাবু—অতীত-কোমল স্বরে বলিলেন “সুখিও সঙ্গে এসেছেন, সে বিষয়ে নাস্তি সংশয়ঃ !—”

নব্ব মপ্রসন্ন ভাবে বলিল “আহা, তিনি সুখি হবেন কেন ? তিনি ত দালাল, গা—”

মেজদি তাহার পিঠে একটা ছোট চড় বসাইয়া দিয়া সম্মিত মুখে বলিল “তুই থাম-না, নহু,—এক তরকাই ডিক্রি হয়ে যাক-না—”

দিদির উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করিয়া, নহু তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সাহসে ভর দিয়া বিপিনবাবুর দিকে একটা অবজ্ঞার কটাক্ষ হানিয়া বলিল “তাই বটে ! মিছে কি ? সাথে, লোকে বলে, বোকা উকীল না চলে কেউ মুন্সেফীও করে না, এ্যাটর্নীও হয় না, হুঁ !” কথাটা শেষ করিয়াই সে মেজদিকে খুব শক্ত হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া বলিল। অবশ্য সেই সঙ্গে বিপিনবাবুর দিকে সন্ধিগ্ন-নগর রাখিতেও তুলিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ চক্ষু বুঁজিয়া, নীরবে রহিলেন।—

ক্ষণপরে বিপিনবাবু উঠিয়া জুতা পায়ে দিতেছেন দেখিয়া প্রতিমা বলিল “কোথা যাচ্ছেন ?”

বিপিনবাবু বলিলেন “সুখিয়াস্ট্রীটের বাড়ীর দরওয়ানকে ধরে আনতে, আহা বেচারী একলা নীচে বসে আছে।”

প্রতিমা বলিল “বেচারীর জন্যে অত আচা উহ করতে হবে না, তিনি মাসীমার কাছে বেশ বসে আছেন। আপনি খেয়ে দেয়ে, কাপড় পরে নিনু, থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।”

বিপিনবাবু বলিলেন “থিয়েটার !”

প্রতিমা তাহার বিষয় ভাবে দুঃপাতন করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিল “গাড়ী পাড়িয়ে আছে দিদি, তুমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নাও—”

দিদি সময়ে বাললেন “ও বাবা, এই কচি ছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়া, সে আমি পারব না। তাপ-  
রাত জেগে কল আমার অন্তর হলোই, ছেলে স্কন্ধ ভুগবে।”

বিপিনবাবু বলিলেন, “এবং ডাক্তারের ফি, ও—ঔষধের মূল্যের জন্য নিরপরাধ ছেলের—”

দিদি বাস্তবাস্ত চট্টয়া বলিলেন “আঃ, কি বে বল তুমি !—মন্সী, না ভাই, থিয়েটার কিয়েটারের হুঁস-  
তুলিস্ নি, এসেছিস. বেশ করেছিস. বোস গল্প কর হু দণ্ড—”

মন্সী সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল “সে হবে না দিদি, আজ ‘—’ থিয়েটারে ‘—’ প্লে হচ্ছে। আজ যেতেই হবে, আমি বলে কত কষ্টে মত করিয়ে তবে এসেছি—”

বিপিনবাবু বিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন “একে ছত্ৰাশন, বিশ্বদাহক্ষম, তাহাতে ইকন, তাহাতে বাতাস ! দাঁড়াও দেখাচ্ছ থিয়েটার ! দালালীর কাঁচা পয়সার খাল কেড়ে নিচ্ছি—”

তিনি দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন।

অসম্ভব দিদির সম্মতি আদায়ের জন্য মন্সী তুমুল বাক্য বুদ্ধ আরম্ভ করিল। আজিকার মত অভিনয় বহুদিন হয় নাই, বহুদিন হইবার সম্ভাবনাও নাই,—এই অজুহাতে দিদিকে সে দৃঢ় ভাবেই চাপিয়া ধরিল,—বাইতে ছইবেই ! দিদি অবশ্য পূর্বে এ সব বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহীণীলা ছিলেন, কিন্তু আজকাল একেবারে নিস্তক হইয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রতিমার পক্ষে, হয় দিদি, নয় তাহার স্নেহময়ী নন্দিনী ছাড়া, অন্য কাহাকেও মজিনী করিয়া এ সব ব্যাপারে কোথাও বাহির হইতে ইচ্ছা করে না, তাহার মতে এককল ক্ষেত্রে,—দিদি ও নন্দিনী ছাড়া আর সকলেই আনাড়ী ! শুদিকে তাহার দুইজনে এখন সম্মানের স্বা হইয়া সংঘ-বৈরাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে কুসিয়াছেন, অনাবশ্যক হুঙ্কার আর যোগ দিবেন না ! প্রতিমা চট্টয়া গিয়া বলিত “এ তুলো নিতাস্তই আল্পে কুঁড়োমির চিহ্ন, আর ধিনী হয়ে পড়ার লক্ষণ !”

উহার উত্তরে উত্তর পক্ষট সন্তোষ কমার সহিত তাকে ভবিষ্যত জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করিবার উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই।

প্রতিমার পীড়াপীড়িতে বাধা হইয়া দি'দ অবশেষে যখন 'অগত্যা আজকের মত' নিমরাজী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন বিপিন বাবু প্রতিমার স্বামী নবীনকে লইয়া বাবেরগুয় ঢুকিয়া একেবারে প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন—“দেখ্, স্বয়ং মনসা ঠাকুরাণী,—তার ওপর আবার ভক্তিরূপে তুমি অর্থা দিতে শুরু করেছ কি না, ধনের ধোঁয়া! নিরীক্ষণ যুবক, এর পরিণামটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? এঁদের অত্যাচার এবং অসম্মানের চোটে, বাঙালী সমাজের সামাজিক বিশেষত্ব ধ্বংস প্রায় হতে বসেছে,—স্পষ্টই দেখ্ এঁরা এক একজন,—এক-একটি আস্ত সফ্রিজেন্ট হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছেন—”

প্রতিমা ঘোমটার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ-হাস্যে অশ্রুট-স্ববে বলিল “তা মুন্সো চুঁটো সফ্রিজেন্ট হওয়ার চেয়ে আস্ত সফ্রিজেন্ট হওয়াই ভাল জামাইবাবু, গৃহস্থালীর কাজগুলোও তো করতে হবে!”

সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া—যেন শুনিতেই পান নাই এমন ভাবে বিপিন বাবু বলিলেন “এঁদের ভবিষ্যত ভেবে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে!”

নবু মাঝখান হইতে থপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—“তা, স্মেলিং সন্টটা একবার শুঁকে নি-না, ঝাঁ করে ঝিন্ ঝিনী ছেড়ে যাবে খন!”

“অপারগ!” বলিয়া বিপিন বাবু হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন “বস নবীন,—যাক্ ওসব ভাবনা বুথা! অসংগীয়া হে নবীন, এখন তুমি কাকেও—বেশ আন্তরিক ভাল বেসেছ কি? বল দেখি?” সঙ্গে সঙ্গে, নবুর অলক্ষ্যে একটা গোপন ইঙ্গিত!

নবীন একক্ষণ নিঃশব্দেই মুহু মুহু হাসিতে ছিল! প্রিয়তম ফুটবল-গ্রাউণ্ড এবং বাবসার ক্ষেত্র ছাড়া, অন্য সবত্রই সে অতি-নিরীহ-চালে চলে, ঠাট্টা-তামাসার দিকে মোটেই ভিড়ে না। সেই শুণেই নবু তাহার ভক্ত-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু আজ বিপিন বাবুর প্রশ্ন শুনিবামাত্র, নবু অবাচ হঠরা দেখিল—নবীন বাবু তাহার সনাতন-অভ্যাস, সলজ্জ-নীরবতা ছাড়িয়া, সোজা নবুর দিকে চাহিয়া চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “বেসেছি বই কি! এই নবুকে—”

নবুর গারে যেন কে আগুনের ফুল্কি ছিটাইয়া দিল! লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাট্খিয়া বলিল “এ্যা, মেজ জামাইবাবু! ও মাগো! আপনি স্কন্ধ আবার এসব অসভ্যতা শিখলেন! যান, আপনাদের কারুর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না, কারুর সঙ্গেই না—! এই চলুন এখান থেকে—”

নবীন ফুটবল খেলিয়া খেলিয়া শরীরটা বেশ মজবুত করিয়া তুলিয়াছিল, পলারন-তৎপর নবুকে টপ্ করিয়া তুলিয়া ইঞ্জি-চেনারের চওড়া হাতার উপর বসাইয়া দিয়া, মুহু হাস্যে কি একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতে করিতে, বিপিন বাবু ততক্ষণে উচ্চ কণ্ঠে বাক্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন “তবে আর কি! উত্তর পক্ষেই যখন বেশ আন্তরিক ভালবাসা জমে গেছে, তখন আর কি-ই-বা দেখতে হবে! কালই বহরমপুরে খণ্ডর মশাইকে লিখছি যে নবুর গতিমুক্তির ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে, নবীনকেই সে বিয়ে করবে!”

ক্ষোভে, লজ্জায়, হৃৎখে অস্থির হইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে নবু বলিল “দেখুন, এবার সত্যিই আমার ভগ্নানক কামা পাচ্ছে—”

বিপিন বাবু আবার সেই কামার কার্যাকারণতত্ত্ব লইয়া, যুগযুগান্তরের কাহিনী আওড়াইয়া বিশদ ব্যাখ্যায় রক্ততা আরম্ভ করিলেন। বেচারী নন্দ এবার সতাই কাঁদিয়া ফেলল!—নবীন করুণা-প্রণোদিত চিত্তে, মেহময় স্বরে তাড়াতাড়ি সাঙ্ঘনা দিয়া বলিল “আহা চট্‌ছ কেন? উনি ঠাট্টা করছেন বুঝ্‌ছ না? তুমি বোকা হচ্ছ কেন?”

উচ্ছ্বাসিত ক্রন্দনের সুরে,—নন্দ সজোরে প্রতিবাদ করিল, “নাঃ, বোকা হবে না! এর নাম ঠাট্টা!—আপনি কিসের জন্যে আমার ভালবাসবেন—খবদার ভালবাসতে পাবেন না, কক্‌খোনো না—” কথা বলিতে বলিতেই দারুণ ক্ষোভে অধীর হইয়া হুঁহাতে মুখ ঢাকিয়া, সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আবার কান্না জুড়িল!

বাণীয়ার গুরুতর দেখিয়া বিপিন বাবু একটু থামিলেন। নবীন সুগভীর মেহের সহিত নন্দর পিঠ চাপড়াইয়া হাসিমুখে বলিল “ঐ! ভালবাসব না? তুমি খুব ভাল থাক, তাহ ত ভালবাসি! আমার ছোট বোন অমুকে আমি ভালবাসি না? তোমাকেও তেম্ন ভালবাস, তাতে কি দোষ হয়েছে বল দেখি?”

হেঁট হইয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্দ বলল “নাঃ দোষ হয় নি! কত দোষ হচ্ছে, দেখছেন না তো যান, আমাকে আর ভালবাসবেন না,—খবদার না!” শেষের কথাটা রীতিমত ধমকের ভঙ্গিতে উচ্চারিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল!

বিপিন বাবু ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মিষ্ট সুরে বলিলেন “কবিরা ঠিক এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

‘বর্ষা ঋতু ভেল,  
করয়ে নয়নে ডল,  
ছুখ সাগরে ধনি ভাসে—’

নন্দর কান্নার উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল! দিদির দিকে চাহিয়া বাষ্পকর কণ্ঠে বলিল “দেখেছ দিদি নেখেছ?” আচ্ছা এতে কি বলতে ইচ্ছা করে বল দেখি? তুমিই বল?”

দিদি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “তুই-ই বল না। আমি আর কি বলব?”

দিদির এই উবাস্ত শিথিলতা দেখিয়া নন্দ রাগে অন্ধ হইয়া বলিল “তা বলবে কেন? তোমার নিজের বরটি কি না?”

এর চেয়ে বড় গোছের স্বেচ্ছাশ্রমক প্রত্যাশা বা ক্যা আর তাহার মনেই পড়িল না! দিদিরা হাসিয়া ফেলিলেন! বিপিন বাবু টুক টুক করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, গোফে তা দিতে দিতে বলিলেন “নিশ্চয়! নিশ্চয়! তার আর সন্দেহ আছে! পরের বর হলে এখন অমান্য করে অভিসম্পাত করে বৃত্ত অবস্তা, কিন্তু নিজের বর বলে—”

বড় দিদি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি থাম ত! আচ্ছা নন্দ, পাগলামো করে কেঁদে মরছিস কেন বল দেখি? নবীনের সঙ্গে কি সত্যিই তোমার বিয়ে হচ্ছে? না সত্যি-সত্যিই নেকথা বাবাকে লেখা হচ্ছে! তুই মিছে কথাও বুঝতে পারিস না?”

নন্দ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল “কি করে বুঝব? এমন সত্যি সত্যি করে মিথো বললে কেউ না কি বুঝতে পারে? বাবা! আমি ঢের ঢের মাহুঁষ দেখেছি, কিন্তু বড়-জামাই বাবুর মত এমন সত্যিকার-মিথোবাদী কোথাও দেখি নি।”

বড় দিদি হাসিয়া বলিলেন “এইবার লাখ কথার এক কথা বলছিস ‘সত্যিকার মিথোবাদী!’ তোমার বড় জামাই বাবুকে মিছে করে মিথো বলতে কখনো শুকলুম না, যা বলেন—তা সত্যিকার মিথোই বটে! আমিই এক এক সময় এমন ভ্রাতাচ্যাকা খেয়ে যাই যে—”



প্রতিমা চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া অশ্রুটস্বরে বলিল “অ-দিদি থাম ভাই, অতটা স্পষ্ট করে আর বোল না, আমার গোঁড়া হিন্দু জামাই বাবু, এখনি—আগাশাস্ত্র আর পতিভক্তির মাহাত্ম্যাহানির নরক বর্ণনা নিয়ে হয় ত এমন বক্তৃতাভিত্তিট বাধিয়ে ফেলবেন যে আজ আর থিয়েটার দেখার দৃকাই নিকেশ হয়ে যাবে! চল ভাই ওাপড় পড়বে—”

নিম্নদিকে এসে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল।

নবীন এই সব বহুভাষীদের মাঝে পড়িয়া বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এই রকম একটু কথা বলিবার ক্ষমতা পাইয়া—মস্তুর কাছে হাও চাপড়াইয়া বলিল “বাও তুমি ও কাপড় পরে এস,—জুতো পায়ে দিও, আমি তোমার নিয়ে ফ্রন্ট টেলে বসব—”

বিপিন বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আর আমি ছদ্ম পেছন থেকে গিয়ে শুদ্ধবনি করব!”

তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রকুটি-কুটিল লম্বাটে চোঁট মুখ কঁকক ইয়া নত্ব সরোরে বলিল “বয়ে গেল! অসম্মত কোথাকার! নিজের যেন বিদ্যা, খালি অসভ্যের মত বিয়ার কথা! ছি, ছি,—একটু গজ্ঞাও করে না! আহা আবার ভাঙখোরের নত গোঁফে তা দিচ্ছেন ছাখো না!—ছিঃ, ঐ গাঁফ চটো দেবলে অমর এত রাগ হয়!—”

সম্মুখে বুক চিতাইয়া, সঙ্কোরে গোঁফে তা দিতে দিতে বিপিন বাবু বলিলেন “শুধু হচ্ছে, রাজপুতদের গোরবের চিহ্ন! বড় সাধারণ কিনিংস নয়! বুঝলে—”

প্রতিমা নত্ব দিকে চাহিয়া কি একটা কথা বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নত্ব বলিল “ওঃ!—তবে আর কি! তা হলে বড় বড় গোঁফওয়ালা চিৎড়ি মাছগুলোও মজা লেব, নয়?”

বিপিন বাবু হঠাৎ সে কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “সত্যি প্রতিমা, অনেক দিন চিৎড়ি মাছের কাটলেট খাওয়া হয় নি, কাল শ্রহস্তে রন্ধন করে একবার খাইয়ে দাও, তুমি বেশ কাটলেট তৈরি কর সত্যি!”

প্রতিমা সে কথার উত্তর দিবার পূর্বেই নত্ব দারুণ অপ্রসন্নতা সহকারে বলিয়া উঠিল “ছি ছি, কি পেটুকুরে-পলা বাপু! চিৎড়ি মাছের গোকের নাম শুনে অগ্নি, কাটলেট খাবার ইচ্ছে! ওমা এ কি!—”

প্রতিমা বলিল “এই রে! আবার এই সাপে-নেউলে বেধে যায়! না, না, নত্ব তুমি থাম ভাই, লক্ষ্মিটি আমার! জামাই বাবু,—একটু সদয় হোন, আপনার গোঁফ কোড়াটির উত্তমোত্তর জীবদ্ধি হোক, আমি সর্বাস্থঃ-করণে ওর উন্নতি-কামনা করছি, কিন্তু মাপ করুন, আজকের মত থিয়েটার দেখাটা সার্থক হোতে দেন, দোহাই দিচ্ছি—”

নত্ব প্রশমন-কক্ষের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিল “খবদার মেস দি, ওর দোহাই দিয়ে পা বাড়িও না, চৌকাঠের কাছেই হোঁচট খেয়ে পড়বে! উনি যে কি ভয়ানক লোক তাহা জান না!—” সে অশ্রুত হইয়া গেল!

বিপিন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন “যেন সে তবুটা ও নিজে আগাগোড়াই ভেদে ফেলেছে!—”

প্রতিমা বলিল “ওকে আর রাগিয়ে দেবেন না, জামাই বাবু,—একটু ঠাণ্ডা হতে দেন।”

বিপিন বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন “কিন্তু তুমি সত্যিই থিয়েটারে চলবে? ও ছরতিসঙ্কিটা ছাড় না!—”

ଅନ୍ତିମା ସବିନୟେ ବଲିଲ “ନା, ଓ କଥାଟି ବଳବେନ ନା” ।

বিশিষ্ট বাবু গালিচার উপর দেহ এলাইরা দিগা, মুগ্ধতার পতিতাপ বাজক নিখাস ফোঁসিয়া বলিলেন "হার !  
বহৎ গোকেরা ঠিকই বলেছেন "Swine, women, and bees, cannot be turned."

প্রতিমা বলিল "তা শূয়ার বলুন, গাধা বলুন, থিয়েটার দেখার পরে পড়ে এখন সব মনে নিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখবেন কাল যদি কাটাটেট খাবার হচ্ছে থাকে -"

বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বিপিনবাবু বলিলেন “আগা সাধু! সাধু! সাধে মুনি-ঋষিরা অন্নপূর্ণার পূজা করেন! বাস্তবিক বলছি মনসা, তোমাদের কোন বিদোহী আমি দৃষ্টিচক্রে দেখতে পারি না সেটা ঠিক - কিন্তু ঐ রান্নাঘরের বিদোটা, পেটের জ্বালায় বড় ভক্তি করি! এবং তোমাদের বুদ্ধি হুজ্জি খুলা যদিচ শূয়ারের গোঁ বস্তুটির সঙ্গে Compare করছি বটে, তব্বাচ--”

প্রতিমা বলিল “পন্যবাদ, ধন্যবাদ! আর তব্ধাচ’র কাজ নাই! তা হলে ঘোর সত্যিকার মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়াবেন।”

1. 9 )

দ্বিদি ও নতুন বেশ পরিবর্তন, করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিশিষ্টবাবু চাহিয়া দেখিয়া, নিখাস ফেলিয়া বলিলেন “খনার বচনে আছে ‘অল্লেশা মবা, এড়াবি ক ঘা?’—”

নন্দব ভিতরে সঞ্চিত উচ্চ বাষ্পের গোলমালটা তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। সে কুঙ্গার “হুঁ” এইবার ইটি, টিকটিকি, গিরগটি, মপ বাগ, টিচিঙ্গে, গোবো-কাঁড়া, সব আবস্ত শোক! দেখচো মেলুদি—”

বিপিন বাবু বলিলেন "যেজিদি আর এখন কি দেখাবে? কাল সকালে ডাক্তারের বাড়ী যাবার সময়, যখন বোন আর বোনপোপ অস্ত্রের সেবার জন্তে ধরে আন্ব তখন মনসা দেবী মজা টের পাবেন।"

বড়দাদি উত্তত-চরণ সম্বরণ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন “আজ্ঞা তোমি যদি গুলি কবে আমাদের ভর দেখাও।  
তাহলে আমি বাপু যেতে পারব না। সত্যি, নিজের অস্থখের জন্তে ভর করি না, কিন্তু ছেলে যদি অস্থখে  
পড়ে।”

ঐযথ ধরিয়াছে দেখিয়া বিপিন বাবু উৎসাহিত হইয়া ছেলের দোলনার দিকে চাওয়া সুগভীর পরিতাপের উচ্চ্বাসে বলিয়া উঠিলেন “হায় ভগবানের রাক্ষসের নিরীহ জীব ! — কেনই যে এই সব দুরাচার মা’র কাছে এসেছিলে বাবা! অনাচার অত্যাচারের পূর্ব—”

অধৈর্য্য হইয়া প্রথম বলিল “খামুন, খামুন !—নিভেরো যেমন ! বিশ্ববিদ্যালয় দেবতার পাদপদ্মে আস্থার স্বরূপে তাল্লাক দিয়া ছেড়ে এসে, এখন হাড়গোড় ভাঙা ‘দ’টী সেজে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন,—কোন কাজে এতটুকু ক্ষমতা নাই,—একটু হাঁটতে হলে কি পাটতে হলে, অগ্নি পেটে ! থলু ধরে, বুকে ঝাঁকি লাগে,—মাথা ভেঁা ভেঁা করে, সকলকে তাই মনে করেছেন, না ? আমরা অমন আপনাদের মত ফুলের ধারে মুছাঁ বাই না,—হুঁ ! চল দিদি চল, বাড়ীতে ঝির কাছে থোকা থাকবে, অশুখ-ই বা করবে কেন ? আর তোমার অশুখ ? ছেলের মা হয়েই তো রাত জাগা অভ্যাস ঠিক করে নিয়েছ ভাই, কুম্ভাই বাবুর মিথো ভয় দেখান’র কান দিচ্ছ কেন ? চল”—দিদিকে সে টানিয়া তুলিল !

নত দুই দিদির মাঝখানে আপনাকে সম্পূর্ণ স্তরক্ষিত করিয়া বাহু করে বলিল "জামাই বাবুর না কিছু কমতা  
সে শুধু পড়ে পড়ে লাঞ্ছনা দায়! খালি বচনের বুড়ি! কিন্তু একটি কাজ করতে বল দেখি -

দিয়ে এলিয়ে পড়বেন অক্ষর সর্দার ! একদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে আনতে বলুন, তা যদি ক্ষমতায় হোল ! উনি আবার পরকে উপদেশ দেন !—

বিপিন বাবু ষাড় হেঁট করিয়া, ঠোট মুখ কুঁচাইয়া কি-যেন একটা উত্তর ভাবিবার চেষ্টায় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, তাহার বিপর্যয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, স্বল্পভাবী নবীন কৃষ্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রসন্ন-স্মিত-মুখে মুহুর্তে বলিল “One tongue is enough for a woman জানেন ত, আর কত শুনবেন, দাদা, এবার উঠুন-না গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুক্ষণ থেকে ।”

নবীন বলিল “আপনি খেপেছেন ? উনি থিয়েটার দেখতে যাবেন ? তা হলে যে অগাধ আলস্যের অপব্যবহার হবে ! সে পাত্রই উনি নন !”

বিপিন বাবু সামনে তাকিয়াটার উপর সম্মুখে এক মুঠাঘাত বর্ষণ করিয়া বলিলেন “রে দুর্ভিক্ষীতে ! জানো গুরু নিন্দা হযোগতি !”

নবীন হাসিয়া বলিল “তা গুরুজনরা যদি অধোগমনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান, তা-হলে একটু-আধটু নিন্দে করে তাঁদের গতি ফেরানর চেষ্টাটা এমনই বা মন্দ কি ? কিন্তু ভাগ্যিস আমি আপনার তাকিয়া হয়ে জন্মাই নি জামাই বাবু, তা হলে ঐ ঘুণীটা এখনি ঘেঁষে পড়েছিল আর কি !—বাবা !—চলুন মেজ জামাই বাবু, আর মিথো দেহী করা কেন ?” সে নবীনের হাত ধরিয়া টানিল ।

বিপিন বাবু তৎক্ষণেই সুর ধরিলেন “আহা কি বা মানিয়েছে রে !—”

রাগিয়া উঠিয়া নবীন বলিল “বেশ চমৎকার মানিয়েছে রে ! চলুন মেজ জামাই বাবু—”

নবীন উঠিতে উঠিতে বলিল “দাদা সত্যিই যাবেন না ? আজকের মত চলুন-না, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য দেবার জন্যই আজ বহুদিন পরে এই প্লে-টা হচ্ছে, আজকে যাওয়া উচিত ।”

বিপিন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন “উচিত বটে, কিন্তু, কি জানো নবীন, দুর্ভিক্ষ যেখানে যত কিছু অনিষ্ট ঘটে, তার মূলে থাকেন দ্বৈতবাদ ! সুতরাং এদের সঙ্গে পথে বেকনো সর্বতোভাবে ধর্ম বিগর্হিত কাজ !—”

বড় দিদি বলিলেন “একান্ত ! তুমি ঘরেই থাক, যখন খিদে পাবে, ঠাকুরকে বোলা খাবার দেবে ।”

থিয়েটার মাস্টারীরা নাচে নামিয়া গেলেন । কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের গাড়ী বাহির হইয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইয়া বিপিন বাবু উপর হেঁটে তাকিয়া বলিলেন “ঠাকুর আমার খাবার দাও ; আর মধুসূদন, আমার সাইকেলে হাওয়া পূরে গ্যাসের আলোটা জ্বলে ঠিক করে রাখো, এখনি পেরুবা ।”

( ৪ )

থিয়েটার গাড়ীতে গাড়ী পৌঁছিলে, নবীন নামিয়া টিকিট ঘরের দিকে যাইতেছিল, সহসা সামনেই, বাইক হাতে করিয়া দণ্ডায়মান বিপিন বাবুকে এক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিপিন বাবু তাহাকে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া নিতান্ত সহজভাবেই বলিলেন “হ্যাঁ, আমি টিকিট কিনে ঠিক করেই রেখেছি ; এস ।” তারপর ভদ্রলোকটির দ্বিধায় বাইক গচ্ছিত রাখিয়া, নবীনকে লইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন ।

মহা গাড়ীর দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া বিপিন বাবুকে দেখিয়া ত্রস্তে জুতা মোজা খুলিয়া ক্রমালে জড়াইয়া বগলে পুরিল । প্রতিনার দিকে চাহিয়া বলিল “আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বসব, বুঝলে মেজদি, আজ আর বাইরে বসব না”

নন্দর এই আকস্মিক মতি পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করিলেন না পারিয়া বড়দি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “এই নাও! সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়! কেন? বাইরের নীনের কাছে বেশ দেখতে পাবি ত।”

নন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল “আর আমার বেশ দেখায় কাজ নাই বাপু, ওই গাধা-না, কে এসেছেন! বাবা, আবার!”

কথা শেষ হইতে না হইতে বিপিন বাবু গাড়ীর ডায়েরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বড়দিদি ও প্রতিমা এক যোগে বিষয়ে প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, এ কি কাণ্ড! এ কি অলভ্যাপিত ব্যাপার! বিপিন বাবুর চিরাভ্যন্ত অগাধ আলস্যপ্রিয়তার এক শোচনীয় অপব্যবহার!

নন্দ ততক্ষণে তাড়াতাড়ি গাড়ীর শব্দিকের ডায়েরটা খুলিয়া ফেলিয়া নামিয়া পড়িল। বাস্তব হইয়া বলিল “মেক জামাই বাবু, শুধু কানে কানে একটা কথা বলি—”

কথাটা স্বস্বকর্ণ দিগিন বাবুর কর্ণগোচর হইল—তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন “এই রে! এখানে এসেও কানে কানে কথা! নাঃ কেলেঙ্কারী আর বাকী রাখলে না।”

নন্দ একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—নিকটে কেহ আছে কি না? তারপর অক্ষুটস্বরে পূর্ব সংক্ষেপেই বলিল “বেশ করব।

নবীনকে একপাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সে কানে কানে কি বলিল কে জানে নবীন হেঁট হইয়া কপাটা গুলিল, তারপর হাসি মুখে গাড়ীর দিকে চাহতে চাহিতে নন্দর নিকট হইতে সংগ পনে কি একটা জিনিস লইয়া চটপট পকেটস্থ করিয়া ফেলিল। নন্দ বাস্তব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “দেখুন, কাউকে বলবেন না যেন।”

নবীন হাসি মুখে সজ্ঞেরে ঘাড় নাড়িল, কিভাবে না।

বড়দিদি গাড়ী হইতে নামিতে না-তে স্বাভাবিক উদ্দেশ্যে বলিলেন ইয়া গা, তুমি বাড়ী থেকে খয়ে এসেছ ত?”

আকাশের দিকে ছুই চক্ষু তুলিয়া ফৌল করিয়া নিখাস তেলিয়া বিপিন বাবু বলিলেন “ওঃ! আইপুটে! মূল জালিকার স্তূতিস্থ বাধ্যবাধে আকর্ষণ পরিপূর্ণ করে,—ওর নাম কি—তারপর কি হয় উচিত? নীঃকর্ষণ বোধ হয়, নয়?”

প্রতিমা হাসিয়া বলিল “অজ্ঞার বলছেন।—বাক্যবাণ গলায় ফোটে না, কানেই ফোটা উচিত, নীঃকর্ষণ হয়েছে বলুন বরং। দিদি তুমি ভাবছ কে ভাই, মাসীমা বাড়ীতে আছেন না-খইয়ে তিনি ওই আঙুরে ছেলেকে অগ্নি ছেড়ে দিয়েছেন কি না? চল চল ভেতরে যওয়া যাক।”

নন্দ চট্ করিয়া গাড়ীর পাশ ঘুরিয়া, দিদিদের আগেই ক্ষত ভিতর দিকে ছুটিল। বিপিন বাবু বাস্তব হইয়া বলিলেন, “আরে আরে, এ তড়বড়ে চণ্ডী পালায় কোথা? এস এস, তুমি আমাদের কাছে বসবে”—

নন্দ এক লাফে সিঁড়িতে পৌঁছিয়া বলিল “না গে, খড়্‌ফড়ে সন্নিপাত মশাই, আপনাকে অত অগ্রগ্রহ কর্তৃত্ব হবে না, আপনি বান্!”

ঠিক সেই সময় একখানা জানানা-গাড়ী আসিয়া পড়িল, অগত্যা বিপিন বাবু আর বাক্য বায় করিলেন না, নবীনকে লইয়া সরিয়া গেলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বড়দিদি বলিলেন “দ্যাখ্ নন্দ চুপ চাপ বসে থাকবি। ‘এটা কি’ ‘ওটা কি’ করে চোঁচিয়ে পাশের স্নেহদের যে বিরক্ত করব, সে হবে না”—

প্রতিমা একটু হাসিয়া বলিল “হ্যাঁ, যা, না বুঝতে পারবি, তা বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেসা করিস্। ওইখানে বসে বেন সেবারের মত, কে কার মাস্তুতো বর, কে কার খুড়তুতো কনে, তা জানবার জন্যে অসভ্যর মত চেঁচামেচি করিস্ নি, তা হলে গলা টিপে বিদেয় করে দেব বাইরে।”

নন্দ সমস্ত হইয়া বলিল “না ভাই, আজ আমি কিছুটা করব না, আমার বাটরে পাঠিও না। আজ বলে বড় কামাই বাবু এসেছেন, বাবা! আজ আবার বাইরে যায়!”

উপরে উঠিয়া দেখা গেল, বসিবার স্থানের সকল আসনট প্রায় পূর্ণ। তখনও যবনিকা উঠে নাই, মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প গুজব করিতেছেন। বড়দিদি আসন গ্রহণ করিয়া চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া, জীবৎ বিশ্বয়ের সহিত বলিলেন “এই রে মনসা!—পুলিন বাবুর মা আজ যে এখানে!”

পাশের আসন হইতে একটি সুন্দরী তরুণী বলিল “আপনারাও চেনেন ঠিক! উনি একটি বিশ্ব-বিখ্যাত জীব!”

নন্দ যদিও কিছুটা করিবে না বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু এই ‘বিশ্ববিখ্যাত জীবটির’ পরিচয় জানিবার জন্যে এক মুহূর্তই তাহার কোতুলক অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল!—তৎক্ষণাতঃ তরুণীর দিকে চাহিয়া সুকোমল অঙ্গনয়ের ধরে প্রশ্ন করিল “কেন, উনি কি করেছেন, বলুন না।”—

প্রতিমা অক্ষুট ভাবে তর্জ্জন করিয়া বলিল “হাতী, আর ঘোড়া! চুপ্ বলাচি শীগ্গীর!”

নন্দ দমিয়া গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। তাহার বিপর্যয় অবস্থা দেখিয়া, অপরিচিতা তরুণীর মন করুণার আর্জ হইয়া গেল। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নন্দর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল “কিছু করেন-নি, কিন্তু উনি—এই তোমার মত বয়েস থেকে থিয়েটার দেখার নেশার এম্মি মশ্গল হয়েছেন, যে থিয়েটার দেখে দেখে, ভিটেমাটা উজ্জর করেছেন, নিজের গয়নাগাটি ত গেছেই, এখন পুত্রবধূদের গয়না বাঁধা দিয়ে থিয়েটার দেখার আশা মেটাচ্ছেন। বুড়ো হয়েছেন তবু প্রতি হপ্তার থিয়েটার না দেখলে ঠর চলেই না। আজ নান্দীর গলা থেকে তার খুলে বাঁধা দিয়ে এসেছেন, বড় ভেলে থিয়েটার বাড়ী পর্যন্ত এসে কত বকাবকি ঝগড়া ঝাটি করে গেল, ছিঃ, কি ঠিকুরে কাণ্ড বল দেখি! বিশ্ববিখ্যাত জীব বলব না ভাই?”

নন্দ সন্মুখে বলিল “বাবা!”—তারপর সে এক দৃষ্টে ওপাশে উপবিষ্টা, সেই সুস্থল গঠনের প্রোঢ়া রমণীর দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার মত বয়স হইতে এই প্রোঢ়াকে থিয়েটারের নেশা এমন ভীষণভাবে ধরিয়াছে! উঃ, যদি নন্দকেও তেমনই ভয়ানক নেশা ধরে! ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

তরুণী উক্ত প্রোঢ়ার নেশার উগ্রতা সবারে চুপি চুপি আরও এমন কতকগুলি ইতিহাস নন্দকে শোনাইল যাহার পর নন্দর বাক্য স্মরণের ক্ষমতাও লোপ হইল!—যতক্ষণ না রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু হইল, ততক্ষণ তরুণী এক-বাট বলিয়া গেল, আর নন্দ অবাক হইয়া শুনিল।

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হইল, এবং অপ্রতিহত বেগে চলিতেও লাগিল। চারিদিকে অন্য শব্দ সংবৃত্ত হইয়া গেল, সকলেই একান্ত আগ্রহে অভিনয় দেখিতে লাগিল, কিন্তু নন্দর মাথার মধ্যে কি যে গোলমালের জট পাকিয়াই গেল কে জানে, অভিনয় দেখিতে তাহার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ টের পাওয়া গেল না! সন্ধ্যাবেলায় বিপিন বাবুর বেহুলা চীৎকারে—“ও বাবা কি কালো!”—তিনিয়া নন্দর বড় না হাসি পাইয়াছিল, এখন অভিনয় দেখিতে তার চেয়েও বেশী অবস্থি বোধ হইতে লাগিল! কণ্ঠে স্রষ্টে সংবৃত্ত হইয়া সে পাঁচ মিনিট যদি অভিনয়

দেখিতে চোখ ফিরাই, তবে পনের মিনিট কাল ঘাড় বাঁকাইয়া নিষ্পন্দ হইয়া চাহিয়া থাকে,—সেই প্রোচা রমণীর দিকে! প্রোচা অভিনয় দেখিতে দেখিতে ক্ষণে ক্ষণে চকল হইয়া উঠিতেছিলেন,—আশে পাশে খুঁকিয়া, এই অভিনয় করিতে কোন সালের কোন মাসের কোন তারিখের কোন কোন অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, কি কি অভিনব রঙ্গ কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পার্শ্ববর্তিনীদের শুনাইতেছিলেন। নন্দ সে সব অমূল্য তথ্য শুনিতে পাইল না, শুধু দেখিতে লাগিল দূর হইতে—প্রোচার নথ নাড়ার ঘট! থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে এবং অস্বস্তিতে তাহার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল—তাহার মত বয়স হইতে ঐ প্রোচা ভদ্রমহিলা থিয়েটার দেখার নেশায় গড়িয়াছিলেন! উঃ, নন্দকেও যদি এমনই উৎকট নেশা ধরে! নন্দ ঘামিয়া উঠিল!

একজামিন পাশ করিবার ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনাই নন্দ কখনিকালে ভাবে নাই কিন্তু আজ হঠাৎ অতর্কিতে বিপুল গর্ভাবনার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল নিজের বয়সটার জন্য! নন্দ প্রাণটা এতই অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, যে যদি ক্ষমতায় অকুলান না হইত তবে বোধ হয় তদুপেই সে এক ধাক্কায় নিজের বয়সটাকে বিশ পঁচিশ বৎসর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়া, তবে নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত! কিন্তু সে সুযোগটা কোনমতেই হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আপাদমস্তক পূর্ণ অশান্তির মাঝে সে আড়ষ্ট হইয়া বসল।

গর্ভাক্রমের পর গর্ভাক্ষ শেষ হইয়া অভিনয়ের প্রথমাক্ষ শেষ হইল। মেয়েরা আত্মীয় অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, বড়দিদ, মেমদিদিও গেলেন, কিন্তু নন্দ ঘাইতে রাজ্য হইল না, প্রতিমা আন্দাজেই বলিল,—সেটা শুধু বিপিনবাবুর ভয়ে!

যাহাই হউক নীচে হইতে ফিরায়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, পুলিনবাবুর মা তখন গুটিকতক মেয়েকে ভুড় করিয়া—এধারে বসিয়া পরমোৎসাহে অভিনয় সমালোচনা শুনাইতেছেন, আর নন্দ দূরে বসিয়া দুই হাতের উপর মুখখান রাখিয়া, ঘাড় কাং করিয়া নিষ্পন্দ মেহে, নিষ্পলক নয়নে,—তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রতিমা অশ্রুট স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল “কিরে নন্দ, তুই যে একেবারে মোহিত হয়ে গেছিস!—”

নন্দ চমকিয়া, সভয়ে চুপি চুপি বলিল “না ভাই মেজদি, কিযে বাপু তোমাদের এই সব থিয়েটার দ্যাখার বাই! বড় খারাপ, বড় খারাপ! বড় জামাইবাবু সাথে চিপ্টেন্ কাটেন্, ছিঃ, আর এ সব থিয়েটার—থিয়েটার দেখতে এসো না বাপু, ভারী বিস্ত্রী জিনিস!—”

মেজদি হাসিয়া বলিলেন “আরে! তুই যে একেবারে পরমহংস হয়ে গেছি!—রকমটা কি?”

নন্দ বিরক্ত হইয়া বলিল “না ভাই, সকল তাতে ঠাট্টা কোর না। আমি আর সন্ত জন্মেও থিয়েটার দেখতে আসছি নে! ছি ছি, এ সব মানুষে দেখে না কি!”—তারপর মেজদির পিঠের উপর ঠেস দিয়া, বেশ একটু নিদ্রার আয়োজন করিতে করিতে বলিল “কাল বাপু আমার পুণ আছে, বাজে কাজে রাত জাগলে চলবে না, একটু ঘুমুই।”

বড়দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন “তাই বল না বাপু, যে আমার ঘুম পেয়েছে! তা নয়, যত দোষ থিয়েটার দ্যাখার ঘাড়ে!”

নন্দ দারুণ অসন্তোষের সহিত বলিল “হঁ!” তারপর আড় চোখে পুলিন বাবুর মাতার দিকে একবার চাহিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুদিল। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের নাকখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সুমাইয়া সুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, যেন থিয়েটার দেখার নেশাটা, একটা বিকটাকার দৈত্যের মূর্তি ধরিয়া,—  
পিছন হইতে নস্তর ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া মুখ পানে চাহিয়া অসন্তোষের মত কিংকি করিয়া হাসিতেছে! তাহার  
হাসি দেখিয়া নস্তর পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু চেহারার ভীষণতার চিত্র এমন চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে যে  
তত্ত্ব বা কান্দুরণ হইতেছে না! নস্ত্র আড়ষ্ট, নির্বাক, নিষ্পন্দ!

হঠাৎ দৈত্যটার প্রচণ্ড হাস্য কলরবের ধাক্কা খাইয়া নস্তর নিদ্রা ছুটিয়া গেল! চমকিয়া বিস্ফারিত চোখে  
চাহিয়া দেখিল, মেয়েরা হুড়-মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেছে! স্বপ্নের সঙ্গে, বাহ্য দৃশ্যের বিসদৃশ্য—অসামঞ্জস্য  
দেখিয়া নস্ত্র হতভম্ব হইয়া গেল!—ভীতি বিহ্বল নেত্রে চারিদিক চাহিল, দৈত্যটা কোথা?

মেজদি বলিল “থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে নস্ত্র, ওঠ—”

পূর্ব পরিচিতা তরুণী পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে বাইতে নস্তর মুখ পানে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া গেল,  
“লম্বা ঘুমের মাঝে বেশ পরিষ্কার থিয়েটার দেখলে ভাই!”

নস্ত্র কোন উত্তর দিতে পারিল না, শুধু মেজদিকে শব্দ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, কোন রকমে কণ্ঠে সৃষ্টে নীচে  
নামিয়া আসিল। পুলীন বাবুর মা’র সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিল, কিন্তু ভিত্তে দেখিতে পাইল না। থিয়েটার বাড়ীর  
জগারের বিশৃঙ্খল—কোলাহল-বন্যার ভিত্তি এড়াইয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলেন, বিপিন বাবু বাইক লইয়া গাড়ীর  
সঙ্গে চলিলেন। গাড়ীতে মেজদি, বড়দি ও নবীনকুমার থিয়েটারের দৃশ্যপট, আলোক-সমাবেশ, এবং অভিনয়  
সৌন্দর্যের অজস্র প্রশংসা সমালোচনায় যখন গাড়ী ভরাইয়া তুলিলেন, নস্ত্র তখন শুন্ম হইয়া ভবিত লাগিল,  
পুলীন বাবুর মাতার কথা!

বাড়ীতে গাড়ী পৌঁছিলে, নস্ত্র নামিয়া সকলের আগেই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, নবীন  
উদ্ভিগ্না বলিল “নস্ত্র তোমার সেই জিনিসটা ফেরৎ নাও—”

জুতা জোড়াটা যে নবীনের কাছে দিয়াছিল, সে কথা নস্ত্র ভুলিয়া-ই গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি  
হাত বাড়াইয়া বলিল “দেন।”—

নবীন দিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বিপিনবাবু পিছন হইতে বাজ পাখীর মত ছো মাঝিয়া বমাল স্রুজ নস্ত্র  
জাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া,—হতা বিস্ময়ে, দারুণ আক্ষেপ চ্ছেদে বলিলেন “এ্যা! বিনামা বহনের সৌভাগ্যটা  
পর্গাস্ত্র নবীনের! আর আমি অভাগা বুঝি সকল তাতেই বঞ্চিত!—”

নস্ত্র রাগ কবিয়া বিপিনবাবুর হাতে জুতা জোড়াটা মাগ কুমাল স্রুজ ছাড়িয়া দিয়া—টক্ টক্ করিয়া উপরে  
চলিয়া গেল! থিয়েটার দেখিয়া আজ তাহার এতই মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে বিপিনবাবুর এই অসহ  
পরিহাস-পারিপাট্যের উত্তরে প্রতিবাদ করিবার মত আধখানা কথাও খুঁজিয়া পাইল না!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

## অন্ধ ।

—\*—

দুটি চোখের অন্ধ আত্মীবন  
 কখন সে দেখলে নাক কেমন এ ভুবন,  
 কেমন আকাশ, কেমন মাটি;  
 পাতায় ফুলে বনের শোভা কেমন পরিপাটি !  
 কেমন নদী জল,  
 প্রিয়জনের মধুর দিঠি কেমন সুকোমল ।  
 নাপিত তারা জাতে ;  
 বিধবা তার মায়ের হাতে  
 মানুষ করা শেষ জীবনের একটি মেয়ে একটি মাত্র ছেলে  
 মেয়ে গিয়েছে স্বামীর ঘরে মাতৃস্নেহ ফেলে !  
 মা খেটে খায় পরের বাড়ী  
 অন্ধ ছেলে ছাড়ি,  
 অন্ধ থাকে মায়ের গৃহ কোণে  
 গানের পরে গান গেয়ে তার প্রহরগুলি গোণে ।  
 সকাল বেলা রাঁধে ছেলের রুটি ;  
 একটু করে সারাদিনে খায় সে খুঁটি খুঁটি !  
 সেদিন ঘরে ছিল না চালচুলো  
 দৈত্যসম চেয়েছিল ভগ্নকানা শূন্য হাঁড়িগুল ;  
 মা গিয়েছে কাজে,  
 ক্ষুধা ক্রমে প্রবল হ'ল হারফর পেটের মাঝে,  
 — তবু সহ্যে না একটুখানি  
 চিরদিনের পরিচিত বাসনগুলি আনি  
 নাড়ে চাড়ে,  
 পেটের মাঝে ক্ষুধা আরো বাড়ে কেবল বাড়ে !  
 সহ্য সীমা পেরিয়ে গেল যবে  
 মনে মনে ঠিক করিল ভিক্ষা চেয়ে লবে ।



মুচির ছেলে ছুঁচে পরায় স্মৃত  
 জড় ক'রে বসেছিল হাজার লোকের জুতো,  
 অন্ধ এল তাহার দ্বারে  
 মুচির গিয়া ভিজি গেল দয়ার স্নানধারে !  
 ঘরে বাহা ছিল তাহা এনে দিল তাহার হাতে ;  
 —কৃতজ্ঞতার অশ্রু পাতে  
 ভিজিয়ে দিল অন্ধ আঁখিকোণ ;  
 মৃদু মৃদু আশীর্বচন গুঞ্জরিল হারুর মন !  
 তার পরেতে ফিরল যখন বাধল মহাগোল  
 নাপিত পাড়া করল উতরোল,  
 মুচির অঙ্গে তুলে গ্রাস  
 কেমন করে করবে আবার বিধবা সে মায়ের সাথে বাস  
 'ঐ ছেলেকে রাখে যদি আপন ঘরে  
 মৃত দেহ তুলবে না কেউ মায়ের মৃত্যু-গরে ।

তাই ত একি দায়,—  
 মায়ের হিয়া ছেলেকে তার আলিঙ্গিতে চায়  
 বুকের মাঝে টানি,  
 মুখে তবু বলতে হবে নিষ্ঠুরতম বাণী ;  
 নইলে শেষে বন্ধ হবে জাতের মাঝে ওঠা বসা,  
 ধরলে মরণ দশা  
 মুখের পানে চাইবে না কেউ আর,  
 হবে নাক শেষের গতি, হবে না সংকার !

\* \* \*

মায়ের ঘরে ঠাই পেলে না ছেলে  
 গ্রীষ্ম এল রুজ্র তেজে, বর্ষা এল বৃষ্টিধারা ঢেলে  
 আড়াল কিছু নাই,  
 গাছের তলা ভিন্ন তাহার নাইক অন্য ঠাই !  
 দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে অন্ধ ফিরে একা,  
 ছেলের সাথে মায়ের কভু হয় না চোখের দেখা ।

এমনি করে কাটল কতদিন,  
দিনে দিনে অনাহারে হারুর দেহ হতেছে বলহীন ।

মৃত্যুছায়া পড়েছে তার মুখে,  
জগৎ শুধু চেয়ে আছে নিষ্ঠুর কৌতুকে  
উপহাসের দৃষ্টি মেলে ;  
অন্ধ দুটি চোখের কোলে ফে দিয়েছে ঢেলে  
এমন কালো কালো,—

বস্ত্রখানি হয়েছে তার শত হাজার ফালি ।

দেহ অস্থিসার,—

চিরদিনের অন্ধ অন্ধকার  
আরো গভীর আরো কালো ;  
নাইক সেথা একটু আশা নাইক সেথা একটুখানি আলো

এমনি করে হারু যেদিন শেষে  
মায়ের প্রভুর বাড়ীর মাঝে এসে  
ভিক্ষা চাওয়া করলে শুরু,  
বললে সবাই পাকিয়ে রুস্ট ভুরু,

“কে বলেছে আসতে হেথা বল ?”

প্রভুর ছোট মেয়ের চোখে অশ্রুধারা ঝরল অবিরল  
বাক্স হতে এ’ন আপন সাড়ী

গুঁজে দিল তাহার হাতে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি !

যখন কেহ স্পর্শ নাহি করে

মেথর সেও রইল সরে প্রবল ঘৃণা ভরে,

মাতা তাহার পুত্রে ছুঁতে করলে অসীকার

ছোট মেয়ের মনে তখন রইল নাক কোনই দ্বিধা তার ।

আপন হাতে কেটে দিল মাথার জটা,

পড়ে গেল তেল মাখান ঘটা !

নানা রকম চক্রে পাকে

আপন পাতের অমটুকু লুকিয়ে তুলে রাখে ।

এমনি করে চলল সেবা রোজ,  
—নিত্য করে গৌজ;  
এ যেখানে তেঁতুল গাছে অঁধার হস্বে আছে  
এ যে হোথা চৌমাথাটির কাছে,  
আসে যেপায় পূব আকাশের প্রথম আলো ছটা,  
সন্ধ্যাকাশের রক্ত রাজা ঘটা;  
এখানে তার আস্তানাটি ফেলেছে জুই এনে  
শক্তিহারা দেহটাকে পারে না আর চলতে টেনে টো  
ওযুধ দিয়ে পথ্য দিয়ে নিত্বি  
মনের প্রীতি  
পাঠায় ছোট মেয়ে।  
অন্ধ বুঝি পেয়েছিল গভীরতর প্রীতি ইহার চেয়ে।  
তাইত তাহার দেহ ক্রমে হ'ল শক্তিহারা;  
প্রাণ ছাড়িল ভয় দেহ-কারাগার  
পক্ষভূক্তে নিল-এবার বরণ করি ভারে,  
অনন্তরই ধরে  
দড়ল ময় জয়ধ্বনি;  
প্রহর গণি গণি  
মাতা শুধু রইল এসে কঠিন শুদ্ধ মতি,  
জ্ঞাতের ক্রিয়াক্ষেত্রে তাহার রইল অবাধ গতি।

## বঙ্গলা ঘাসিক পত্রিকার আঠে নারীচিত্র ।\*

মাননীয় ভূটপণ । আপনাদের নিকট সাধনয় নিবেদন ;—বংলা ঘাসিক পত্রিকার প্রকাশিত চিত্র ও কালে সম্বন্ধে আমার কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য । তাগতে যদি আমার কোন দৃষ্টতা প্রকাশ পায়, আশা,—আপনারা অমুগ্রহ করিয়া নিজগুণে মার্জনা করিনে ।

আজকাল ঘাসিক পত্রিকার, অ টিষ্ট মতোদয়গণ আপনাদের শিল্পক্ষতা নারীঅঙ্গে নিখুঁতভাবে দেখাইতেছেন এবং তাহা প্রকৃষ্টভাবে দেখাইবার চত্ৰ নারীর লজ্জানিবারক বস্ত্রধানি সরাসরি লইয়াছেন ; কোথাও বা বসনের

\* বিগত ২৪শে শ্রাবণ, কলিকাতা "মহিলা-পার্ক" পত্রিত।

নাগরাজ অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাহা এমনই স্বচ্ছ যে সে অস্তিত্বের কোনই সূচনা নাই—সকল অজ-প্রত্যক্ষই তাহার সন্ধান দিয়া প্রত্যক্ষীভূত। এইরূপ চিত্রের পসারি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; নানান মতের ও নানান নৃসংস্কৃতির চিত্র মাসিক পত্রিকায় দিন দিন যেভাবে প্রীত্ব করি তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে “গোপীকায় বজ্র বণ” চিত্রটিও যে নিখুঁতভাবে চৌদ্র মাসিক পত্রিকায় প্রীত্ব করি তাহা বর্জন করি বলা যে আশা করা যায় নাই।

তখনই উচ্চ হইয় আপনাদের নিকট প্রবেশ করিবে কেনন মনে হয়? ইহাতে কি আপনাদের নিজস্বের খুব গোপনীয়তা নষ্ট করেন? হায় লক্ষ্য করি নারীচিত্রের সমীচীন ভূষণ! আর্টে মনে হয় যে নারীর সেই লজ্জা কোন্ নীতি বলে—নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃদয় চোখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লগিয়া আপনাদের স্বভাব দেখাইবার জন্য নয় ও অঙ্গ মন নারীমূর্তি অঙ্কিত করিয়া সমস্ত নারীজাতির অবমাননা করিতেছেন? অঙ্কিত প্রাচীন কালের যে দ্রোণী স্বীয় কঙ্ক মন বনের মধ্যে মৃগ হইয়া উভয় নন্দে জাকির ছিলেন; আর আজ সমস্তাতিমানী নারীজাতি মিলিত মিলিত হইয়া বিনা প্রতিবাদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্মুখে আপনাদের এই বিবর্তন মন চিত্র আপনাদের কিনা উপভোগ করিয়া কতক্ষণ হইতেছেন!

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে যখন আমাদের বাংলা দেশেও চতুর্দিকে চ্যাকোট-সমিতির উড্ডাহতি—আমাদের দেশের নারীসমাজ কি হইতেছেন? তাহাদের কি উচিত নয়, এত সকল অসংযত-বাগনা-বলীভূত চিত্র-শিল্পীদের লজ্জাপাতরা হাত হাতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম লজ্জা বক্ষা করিবার জন্য সকলে মিলিয়া প্রীতগণন করি ডাকা? তিনি যে অসংযত সংগে। সেই বর্ণগামী ভগবান বাণীত আমাদের আর্টে সমস্তারকে হুমতি আর কে দিবে? আমাদের কণ্টুক শক্তি—আমাদের হৃদয় আরব্যো মোদ উদার!

কল্প হাতে পড়ে—ইতিমধ্যে কোন নারীবিষয়ে নয়, কিন্তু একজি যে সমস্ত নারীজাতিব। যদি কাম বিশেষ-নারীমেধ, চিত্র নৈপুণ্য অবস্থার চর্চন করি হইত তাহা হইলে সেই নারী অখানে মুগ্ধকলা হইতেন সত্তা, কিন্তু তাহাতেও তা সমস্ত নারীজাতির অমান—ভগিনী! অমান নিহিত নাই? এইরূপ চিত্র, নারীমাত্রেয়ই অপমানজনক; সুতরাং আমাদেও সকলেই ইহা তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত।

বিগত ৪৮ আষাঢ় এই প্রমুখে সমাজ কিছু আপনাদের জানাইয়া ছিল ন। সেদিন একজন “—” লেখক “সব-প্রী” চিত্রটির উপর কথি বসিলেন “এই চিত্রটি কি পবিত্রতাপূর্ণ, এতে কি কমনী ভাব। এতে কি দেয়?” আনি কিছু দাঁড়ান উল কেট মন ক্রম হীমুর্ষি, সাধারণ নারীর যে প্রাকার উগত সেইরূপ, তাই তাই কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আজ্ঞা আপনাদের কিজাস করি, প্রীতি যদি পুরুষমুখি হইত তাহা হইলে কি আপনারা লজ্জা-ভগিনী একজি মিলিত হইয়া তাহা দেখিতে পারিতেন? কি লজ্জাজনক! অসুখ্য এত যে এখন মেয়েরা আপনাদের শরীর উলস দ্বারা পুরুষের লজ্জা বোঝ করিতেছেন না। পুরুষের যে লজ্জা আছে মেয়েদের তাহাও কি নাই? এবেলীর আধুনিক আর্টের মন কণ্টুক কথি বসিলেন গেলো বলিতে কর, তাহাও মেয়েদের এবেলীর লজ্জাহীনা কবিতো চান। বিগত ৩৫ আষাঢ় এবেলী অদিয়াছিলাম সেদিন এক জন বলিলেন “প্রকৃতভাবে গম্যমানে কি লজ্জা নাই?” তাহা লজ্জাজনক খুবই কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া উপযুক্তভাবে লজ্জারক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গম্যমানে অসম্ভব নয়; নানাদিগের কটিন উপর তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর করে। পুত হইতেই লোকের গম্যমানে,—হৃদয়-মনে পবিত্রতা,—তাকে সংযত,—মেয়েকে আবৃত্ত করিয়া গম্যমানে কি এমন কটিন। মন যেখানে পবিত্র—ইচ্ছা যেখানে সংযত—মেয়েকে সকল ব্যবস্থাই সম্ভব। আর যদি মনে থাকে লজ্জা,

কিছুতেই কিছু নয়—লজ্জা,—লজ্জা হ'ল না—ধর্মকাব্য এসকল নারীর স্বত্তে। আর মাসিক পত্রিকার যে সকল চিত্র প্রকাশিত হয় তাহার নিলজ্জতা পরিহারকরে শিল্পী ও পত্রিকার কাণ্ডারা সম্পাদক ব্যতীত নারীর তাহাতে কোন হাত আছে? সে সকল চিত্রের উদ্দেশ্যই বা কি? তাহা কি কেবল পুরুষদের অম্মা ক্রোধ-তৃষ্ণা পরিভূতির জন্য নয়? বহাতে বিশ্রামকালে স্ত্রীকপের নয়-মাথুরা দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের রূপলালসা তৃপ্ত হয়—সেই জন্যই এত! ছি—হি! শিল্পী! কেন নীতিতে কেমন করিয়া তুমি তোমার মাতা ভগিনী স্ত্রীর নয়মূর্তি শত সহস্র পুরুষের সত্যক মননের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছ!—নিজ গৃহের কথা কি একবারও স্মরণে আসে না তোমার!

বস্ত্রাবৃত চিত্রগুলিও আমার চোখে ভাল লাগে না। আপনারা অনেকে বলিবেন কেন? বস্ত্রাবৃত চিত্রগুলি দিতে আর দারাকি? দোষ কি তাহা আমি বলিতে অক্ষম; কিন্তু আটটি মহোদয়গণ কিছু দিন সুলন্দী বুবাভীদের চিত্রের বদলে সুলন্দী বুবা পুরুষদের চিত্র মাসিক পত্রিকার প্রকাশ করিলেন যদি তখন সকলেই অমুত্ব করিতে পারিবেন।

যদি “সুলন্দী” চিত্র দওয়ার দোষ না হয় তাহা হইলে “সুলন্দী” চিত্র দিতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর ত স্ত্রী ও পুরুষ দুইই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু চিত্রশিল্পী মহোদয়গণ একঘেয়ে ভাবে স্ত্রীচিত্রই অঙ্কিত করিয়া যাইতেছেন কি উদ্দেশ্যে? আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা যে কোন মাসিক পত্রিকা এক বৎসরের এক সঙ্গে দেখুন তাহাতে করুণী বা সুলন্দী স্ত্রী ও করুণী বা সুলন্দী পুরুষ-চিত্র আছে! তাহা হইলে আমার বক্তব্যটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবেন আটটি মহোদয়গণের সুলন্দী সুলন্দী নারীচিত্রগুলি সকলই হয় বিধবা নয় কুমারী! এই কাণ্ডারীহানা তরুণীদের চিত্র পুরুষের সম্মুখে না ধরিলে কি করুণ রস ফুটিয়া উঠে—সিক্ত বস্ত্র না হইলে অট্টের পবিত্রতা কুণে না—কেন? পুরুষের মনন তৃপ্তির সৌন্দর্য্য সম্ভারের পথ্যাপ্ত পরিমাণ উহাতে ফুটিয়া উঠে বলিয়া? ভাল, পবিত্রতা এতই যদি, স্বামী দৈবতার সহিতও নারীচিত্র সম্পর্কহীন কেন? নারী না সহস্রশিখী—সে-কি কথা! পুরুষেরা কামন্যের বশবর্তী হওয়া আপনাদের স্বার্থের জন্য প্রবন্ধনা করিয়া বলিতে চান যে, নারী সুলন্দী, তাই সুলন্দী চিত্র আঁকরা উগদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু তাহারা নারীদের রূপকেই বড় মনে করিয়া, নিজেদের মনকে কত ছোট করিতেছেন তাহা একবার ধীর, অপ্রমত্তভাবে ভাবিয়া দেখুন। বাধ্য নিত্যান্ত নিশ্চরোজন!

আজ্ঞা, সুলন্দী পুরুষচিত্র না দিয়া মাসিক পত্রিকাতে বৃত্ত, কুংসিং পুরুষচিত্র প্রকাশ করা হয় কেন? শিল্পীদের মনে এই আশঙ্কা খুব সম্ভবতঃ জাগতেহে যে সুলন্দী পুরুষচিত্রগুলি ক্রমাশয়ে দেখিয়া দেখিয়া পাছে মেয়েদের সুলন্দী স্বামিলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে—এই নয় কি? অন্ততঃ তাঁহাদের সদাসর্বদাই নারীচিত্র অঙ্কন দেখিয়া আমার ত তাই মনে হয়।

আর নারীদের ক্রমাগতই সুলন্দী করিয়া অঙ্কন করাতে নারীরা এই কথায় বিশেষভাবে সন্দেহ করিতেছেন যে তাঁহাদের রূপই সর্বস্ব, তাহার তুল্য তাঁহাদের আর কিছুই নাই; রূপ দিয়া পুরুষদের তৃপ্ত করিতে পারিলেই নারী নারীকে সার্থক হইলেন! নারী পুরুষদের সম্পত্তি মাত্র আর সেই সম্পত্তির ভারিফ তাঁহার রূপ! তাঁকে হাতের পাশা বলিতেও পারা যায়—যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকেই ফিরিতে হইবে।

হায়, আমরা কি মৃত? আমরা কি চিঃশিল্পী মহোদয়দিগকে বলিতে পারি না যে, আপনারা কেবলমাত্র শ্রী-চিঃ (হউক না কেন বস্ত্রাবৃত ও স্বকৃতি-সঙ্গত) দিতে পারিবেন না, তাহাতে করিরা আমাদের নারীধাতিকে অপমান করা চইতেছে।

আনন্দ দান যেখানে উদ্দেশ্য—পবিত্রতা সেখানে মূল্যধার,—আনন্দময়ের রাজ্যে কামনা লইয়া কে কবে আনন্দকে লাভ করিয়াছে!—সমস্ত মানব স্ববি নয়,—সমস্ত সৌন্দর্য্য সকলের উপভোগ করিবার অধিকার নাই,—নরসৌন্দর্য্য বুঝিয়াছেন কয় জন? আশ্চর্য্য করিয়াছেন যিনি—কেবল তিনিই! নতুবা আর্টের নামে এ নিলজ্ঞতার প্রেরণ দিয়া জালগার পথে,—নরকের দ্বারে দ্রুত অগ্নিসর হইয়া বাহাছুরী কি আছে শিল্পি!

ভক্তিভাজন মাতাগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ, বিদ্যায়ের পূর্বে আর একটি কথা বলিতে চাই,—আপনাদের চিঃ-দর্শনের আনন্দে বাধ্যত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, “গোপাকে গৌতমের অশোকভাণ্ড দানের” মত যে চিঃ জীপুরুষ উভয়েই আছেন তাহাতে কি আনন্দ পাইবেন না? মাসিক পত্রিকার আর্টিষ্ট মহোদয়গণ কি এইরূপ চিঃ অঙ্কন করিরা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন না?

শ্রীনীরজবালা প্রকচাচারীজায়া।

## হিরার টান।

—:~:—

রূপের আলোকে কানন উজলি

গোলাপ যখন ফুটে—

সে আলোর পানে প্রকৃতির টানে

হিয়া সে আমার ছুটে।

এ যদি আমার দোষ হয়ে থাকে

সে দোষ কি মোর ভাই,

গোলাপ যে মোরে টেনে নিয়ে যায়

আমি কি সেথায় যাই!

প্রেমিক প্রেমিকা মিলে গো সেথায়

গভীর পুলক ভরে,

একের হৃদয় অপরের সাথে

সেথা বিনিময় করে;—

স্বর্গ বলিয়া প্রণামি সে ভূমি

এ যদি দোষের হয়,

প্রকৃতির তবে দুঃখও বন্ধু,—

সে দোষ আমার নয়।

শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

## বিচিত্র সংগ্রহ ।

( জন্তু জানোয়ার )

সমুদ্রের গভীর জলের মাছদের মাঝে অনেকের চোখ থাকে না, কাকারও বা দেহের উপরের চোখ দেহের ভিতরে ফুটে ওঠে ! আবার কাকবা মাখার খুলির গর্ত থেকে আলো বাহির হয়, কাকবা গা থেকে আবার কাকবা ল্যাজ থেকে !

মাকড়সার জাল দিয়ে বায়ুমান যন্ত্রেরকাল বেশ চলে । ঝড় বৃষ্টির সম্মুখীন হলেই তারা জালের খুঁটা টেনে বাঁধে আবার ঝড় বৃষ্টি আসবার হুঁচনা স্বরূপ সেগুলি আগের মত আলগা করে দেয় ।

বাঘ ও সিংহের ফুসফুস এত ছরীল যে তারা বেশী দূর জোরে দৌড়াতে পারে না । প্রথমটা তারা ভেমন ছোটে যে ঘোড়াও হেরে যায় কিন্তু তারপর এক পোয়া পথ গিয়ে ক্ষতগামী ঘোড়াও দুই কণা মাহুও দৌড়ে তাদের হারিয়ে দিতে পারে ।

গাছ পালার যে প্রাণ আছে তা আমরা আজ কাল জানতে পেরেছি কিন্তু এমন কথা কেউ শুনেছেন ? সাউথ আমেরিকার একরকম উদ্ভিদ আছে তারা তৃণার্ঘ্য হলেই জলের মাঝে একটি চোঙা নামিয়ে জল খায় । আবার তার পরেই চোঙাটি গুটিয়ে ছোট করে মাখার উপরে তুলে রাখে । মধ্যভারতে একরকম গাছ আছে তার পাতার স্পর্শে আবার মাহুকে বিছাতাহত করে দেয় ।

যেয়ে কুকুর প্রায়ই পাগল হয় না, মন্ডা কুকুরই সচরাচর পাগল হয় ।

নুন লোমের জন্য বছরে সাত কোটি করে জন্তু মারা হয় ।

চড়াই পাখীর ঘন্টার বাহান্তর মাইল বেগে ওড়ে ।

হয় মাসের মাঝে একটি মাছির কত বংশ বৃদ্ধি হয় জানেন ? ৬.....!! সাগর লজ্জন করে মাহুও বাহবা পেয়েছেই, ত্রেতাযুগের হনুমানও পেয়েছিল কিন্তু বছরে বছরে কত প্রজাপতি যে সাগর লজ্জন করছে তাদের কথা কেউ জানেও না । সাগর পারে যেমন বসন্তের উদয় হয় অমনি অন্য পার থেকে প্রজাতির দল উড়ে যেতে আরম্ভ করে, কয়েকটি হয় ত হাঁপিয়ে জলে ডুবে মরে কিন্তু অধিকাংশই নির্ঝিল্লি বসন্তের রাজ্যে পৌছায় ।

(যন্ত্র সংস্কারের কার্যাবলী)

আলুমিনিয়ামের জিনিষ পরিষ্কার করতে কখন সোডা কিম্বা সাবান ব্যবহার করতে নেই, এনামেলের জিনিষেও না, তাহলেই ক্ষেটে যাবে। ক্লোরিনের কাপড় প্যারাক্সিনে ডুবিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

চাল সিদ্ধ করবার জলে লেবুর রস দিলে ভাতের রং যেমন সাদা হয় ভাতগুলি তেমনি স্বচ্ছ হয়ে হয়।

হাতের আলকাতরার দাগ লেবুর খোসা ঘসে মুছে ফেললেই উঠে যাবে।

অনেকদিনের ময়লা বোতল পরিষ্কার করতে হলে পাঁচ মিনিট সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে পরিষ্কার জলে ধুয়েই সব ময়লা উঠে যাবে।

পুরাণে ময়লা পিতলের জিনিষ আমোনিয়াম ডিক্রিয়ার কাপড় কিম্বা ত্রাশ দিয়ে মাজলেই একেবারে নূতনের মত উজ্জ্বল হবে। পরে জলে ধুয়ে শুখিয়ে রাখতে হবে।

জলে একটি লেবুর রস দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করলে কাপড়ের ময়লা কিম্বা কোনরকম দাগ থাকলে সব উঠে গিয়ে স্বচ্ছ হবে সাদা হবে।

কালো কাঠের জিনিষের উপর আঁচড়ের দাগ ওঠাতে হলে প্যারাক্সিনের তেলে কাপড় ডুবিয়ে বসতে হবে, তাতে পুরাণে পালিসও ফিরবে।

নতুন জুতার তলায় Copal বার্নিস মাখিয়ে নিলে জুতার তলা খুব মজবুত হবে আর মাসে দু'একবার মাখিয়ে নিলে অনেক দিন টক্বে।

বেশী লোন্ডা জিনিষে একটু চিনি ও ভিনিগার মিশিয়ে দিলে লোনা স্বাদ একেবারে কমে যাবে।

পরমে কিম্বা অন্য কারণে ভাল চুখ ছিঁড়ে গেলে সে চুখ আমরা নষ্ট হয়েচে বলে ফেলে দিই। অজীর্ণরোগীর পক্ষে টাটকা চুখের চেয়ে ছেঁড়া চুখ বেশী উপকারী। সুগিদের এই চুখ খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য ও ভিটামিন আরো উন্নতি করে। চামড়ার জিনিষ পরিষ্কার করতে বিশেষ করে পেটেন্ট লেদার জুতার পক্ষে এ একেবারে অমূল্য। এই চুখ গায়ে মাখলে যেমন রং পরিষ্কার হয় তেমনি হাত মুখ গলার সব দাগ উঠে যায়। গায়ের চামড়াও এ চুখ মসৃণ করে।

শীতের রাতে শীত নিবারণ করবার অমূল্য উপায় গায়ের জামা কিম্বা লেপের তলার একখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে।

গায়ের চামড়ার উপরেই মণিসূত্র পরা উচিত; তাতে মণিসূত্রের জোলা বেড়ে দাম বেশী হয়।



( পাঁচ রকম )

মাহুঘের বেহে সবুজ ২০০ খানা হাড় আছে আর সে গুলির ওজন প্রায় সাত সের।

আখ গাছ ছাড়া প্রায় ১২০টি ভিন্ন ভিন্ন গাছ থেকে চিনি উৎপন্ন করা যায়।

খাঁটি দুধও দেখি জলেরই সামিল। একশো ভাগ দুধে সাতাশী ভাগ জল থাকে। গরুদের ঘোষ নেই, তারা জলেই জল ঢালে!

সুইডেনে প্রথম Safety match তৈরী হয়।

আধুনিক মত হচ্ছে সমস্ত লোকের গায়ের রং আগে লাল ছিল পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম বদলে গেছে।

ইংলণ্ডে বাহাত্তরটি জায়গার নাম নিউটন! এত বেশী জায়গা এক নামের শোনা যায় না কোথাও।

অনেক রকম ফলের ছালের পোষাক তৈরী হতে শোনা গেছে কিন্তু কেগনের ছালের পোষাক কেউ শুনেছেন কি? লগুনের একটি প্রদর্শনীতে তাও বাকি থাকে নি।

পৃথিবীতে বত রকম কাশড় বোনা হয় তার মাঝে কান্দীরী শাল তৈরী হতেই সব চেয়ে বেশী সময় লাগে। এক জোড়া ভাল শাল তৈরী করতে প্রায় তিন বছর লাগে।

ম্যাক্সটারের ট্রাম গাড়ীতে বছরে প্রায় পঁচিশ কোটি লোক চড়ে।

প্ৰত বছর আমেরিকায় আঁশ থেকে তৈরী রেশমে বাট লক্ষ জোড়া মোজা বোনা হয়েছে।

মোটাবুট হিসাবে জানা যায় পৃথিবীতে ৬০০০০ হাজার দৈনিক আর সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, তার মাঝে অর্ধেকের বেশী ইংরাজী।

ইংরাজদের বিশ্বাস ডান হাতে আঘাত লাগলে মজলের লক্ষণ কিন্তু বাঁ হাত আঁচড়ে গেলেই বিপদ।

আমেরিকার কোলোম্বাডো অ্রিসের মিঃ স্যালিবার্ডস নামে এক ভ্রমলোকের বেহে পাশাপাশি দুইটি যৎশিও পাওয়া গেছে; ডাক্তারী ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম!

ভাবি সারারে একটা চূণ পাথর পাওয়া গেছে ওজন তার ৩০০ টন ( ২৮ মনে এক টন ) এত ভারি চূণ পাথর এই প্রথম পাওয়া গেল।

৫' হাজার বছর আগের মিশরের এক রাজকন্যার 'মামি' বা রক্ষিত শব পাওয়া গেছে, তার দেহেও 'কসেট' পরা, তা হলে প্রাচীন কালেও এ উপসর্গ ছিল।

জাপান সাম্রাজ্যে চার হাজার দ্বীপ আছে, কিন্তু সমস্ত ইংরাজ রাজ্যে তা নেই

## ভালবাসি।

( রাগিনী—খান্ধাল )

তোমারে ভালবেসেছি বলে'

আমারে সবে ভালবাসে—

আপন ভেবে আমারে সবে

আমারি কাছে কিরে আসে।

উপরে নীল উদার নভ

নিম্নে শ্যাম লপ্প নব

ভুবন জুড়ি পবন তব

ঘুরিছে মম পাশে পাশে।

কোমল কর-পরশ সম

সন্ধ্যা আনে স্থপ্তি মম

তোমার স্নেহ সোহাগ কম

ছুরারে আগে উষা হাসে।

মধুর তুমি বঁধুর প্রীতি,

করুণ-মা'র হৃদয়ে নিতি,

বচনাভীত রচনারীতি

হে প্রিয়, প্রিয়া মধুভাষে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

## সর্প দংশন ।

—:~:—

সর্প দংশন করিলে পাশাপাশি চারিটা শ্রেণীতে কয়েকটা দস্তুর দাগ পড়ে । যদি বিষধর সর্প দংশন করে তবে দুই পার্শ্বে বিষ দস্তুর মোটা দাগ দেখা যায় । নির্বিষ সর্পের দংশনে এইরূপ দাগ পড়ে না । বিষ দস্তুর মৈথ্যাত্মক দংশন গভীর ও অগভীর হয় । বোড়া সর্পের বিষদস্ত বড় দীর্ঘ, গোখুরা ও কেউটে সর্পের বিষদস্ত তদপেক্ষা ক্ষুদ্র । সামুদ্রিক সর্পের দস্ত খুব ক্ষুদ্র । সামুদ্রিক সর্পের প্রায়ই বিষ থাকে না ।

বিষাক্ত সর্পের দংশন মাত্রেরই ফুলিয়া উঠে । দষ্ট স্থান অল্পক্ষণ মধ্যে ক্ষীণ হইয়া উঠে, লালবর্ণ ও বেদনাত্মক হয় । বিষাক্ত সর্পদষ্ট স্থান হইতে পাতলা জলের মত রস গড়াইয়া থাকে । এইরূপ জল গড়ান অবস্থা দংশন করিবার বহু পরেও বিদ্যমান থাকে, তৎপরে রোগী মাদক দ্রব্যাদি সেবীর ভ্রান্ত আবিলাগ্রস্ত হয় । কখনও কখনও গা বমি বমি করে, ক্রমশঃ সর্ব শরীরে পক্ষাবাতাবস্থা প্রাপ্ত হয় । চক্ষু পাতা খুলিবার সামর্থ্য লুপ্ত হয়, ওষ্ঠ ফুলিয়া পড়ে, মুখ দিয়া লাল গড়ায়, গলায় স্লেয়া আসে ও বড় বড় শব্দ হইতে থাকে । ভাড়া ভাড়ি নিশ্বাস বহে, রোগী অচেতন হয়, ও চক্ষু হারদ্রাবর্ণ ধারণ করে ।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে অবিলম্বে রক্তের দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে । অনেক সময়ে রক্ত পায়ের দ্বারা পরিধান বস্ত্র দ্বারা খুব দৃঢ় বন্ধন চলিতে পারে । দষ্ট স্থান ফালাফালি করিয়া চিড়িয়া প্যার মালানেট অফ্ পটাস্ নামক পদার্থের দানা লইয়া তাহার মধ্যে উত্তমরূপে দিতে হয় । রোগীকে মত্ত পান করিতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে । প্রয়োজন বোধ হইলে মৃগনাভি, হরিতালভস্ম প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে । রোগীকে ওইতে দেওয়া উচিত নহে । রোগী হিমাক্ত হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া কোমেন্ট দেওয়া যাইতে পারে ।

পঞ্জাবে কসোলি সহরে প্রধান অণুসন্ধান সমিতি ( Central Research Institute-Kasuali ) হইতে এন্টিভেনিম ( Antivenim ) নামক এক প্রকার ঔষধ দেয় । ইহাই সর্পাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ । পত্র লিখিয়া পূর্ন হইতে সংগ্রহ করিলে ভাল হয় ।

কার্বলিক এসিড সাপের পক্ষে ভয়ানক বিষ, উচার গন্ধে সাপ কদাপিই আসে না । সর্পের গর্ভে কার্বলিক এসিড দিলে সর্প মরিয়া যায় । জল মিশ্রিত কার্বলিক এসিড মেঝের ছড়াইলে সর্প শীতি মোটেই থাকে না ।

তেলাকুচা পাতার রস মাথায় ও দষ্ট স্থানে মালিস করিতে হয় । \*

কাল মরিচ দিয়া মুক্তাবুরির শিকড় বাটিয়া খাইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য হয় । †

শ্বেত করবী ফুলের শিকড় সর্পের পক্ষে বিষ । সেই কারণে সাপুড়িয়া এই শিকড় লইয়া সাপ খেলা করে । এই শিকড় চিবাইয়া খাইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় আরোগ্য হয় । কার্পাস তুলার পাতার রসও মন্দ নহে । এই এই জগৎ বেহার ও মধ্যপ্রদেশে কার্পাস তুলার গাছ আছে । “কাজের লোক” প্রকাশ যে, মেদিনীপুরান্তর্গত কান্দিতে যে সকল বাদাম গাছ আছে তাহা নাকি সর্পদংশনের পক্ষে বড় উপকারী ।

\* † “Vegetable poison is an antidote for animal poison. So Kuchila ( Nux. Vomica ) & opium can be administered to a snake bitten person”—S. A.

এমেরিকান সায়েন্সটিক নামক পত্রিকার প্রকাশ বে, কুচিলা ও আফিং মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইলে সেই ব্যক্তি নিরাময় হয় । \* লান্সেট নামক ( Lancet ) পত্রিকায়ও এই ঔষধ ব্যবহারে সফলতা প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

## বিশ্বাসে ।

—:~:—

ভীবনের ধন মরণ রতন

হে চিরসুহৃদ মোর ।

ভব করুণায় হয়েছে আমার

বুকের তমসা ভোর,

কাল যবনিকা গিয়াছে সরিয়া—

অমর আঁধার রাত্তি,

চক্ষে আমার ভাতিছে পুলক—

লক্ষ অরুণ ভাতি ।

সুন্দর হতে সুন্দরতর

অমর জ্যোছনী ভরা

চন্দন মাখা নন্দন ফুল

মন্দারময় ধরা !

মঙ্গল-স্নীরে হেরি যে আজিকে

বিশ্ব করিছে স্নান ;

পদ্ম চরণে দেখিছি তোমার

রয়েছে আমারো স্নান !

শ্রীপ্রভাবতী দেবী ।

## দেবেন্দ্র সঙ্গমে ।

—: \* ❖ \* :—

আমি গত বৎসর পূজার বন্ধে হরিদ্বার দর্শন করিতে বাই। হরিদ্বার দ্ব্যিকেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কনখ্যে শ্রেষ্ঠ পুরমল বাহাহরের স্থলর ধর্মশালার একটি কক্ষ অধিকার করিয়া কয়েকদিন অবস্থান করি। একদিন বৈকাল বেলায় হঠাৎ কর্ণাটী স্থলর ফুটফুটে বাঙ্গালী যুবক ঐ ধর্মশালাতেই অতিথি হইলেন। পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার কলিকাতার অধিবাসী সম্প্রতি দেৱাছন হইতে হরিদ্বার দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঐ ধর্মশালাটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া এই খানেই দুই দিন থাকিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র এম-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র এবং হিন্দু কালেক্টর (বেনারস) অধ্যাপক। যে তিনটি ভাই আসিয়াছেন তাহার বড়টির নাম সোমনাথ, দ্বিতীয়টির নাম শিশির এবং তৃতীয়টির নাম বিজয়। সঙ্গে তাঁহাদের ভাগিনের অজিতকুমারও আসিয়াছে, সেটি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। দুই দিন ব্যবহারেই জানিলাম যুবক কর্ণাটীর বহিঃসৌন্দর্য্য অপেক্ষাও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অধিক মনোরম। আমাকে একেবারে নিতান্ত আপনায় করিয়া ফেলিলেন তাঁহাদের সঙ্গে চাকর ও স্নানক্ষণ ছিল এজন্য আমাকে তাঁহাদের কাছে আহার করিতে অহুরোধ করিলেন আমিও সে অহুরোধ এড়াইবার চেষ্টা করিলাম না। তাঁদের ঘেহ ও ভালবাসার বশীভূত হইয়া আরও কয়েকদিন অধিক রহিয়াছিলাম। ইহাঁদের সহিত কথা প্রসঙ্গে একদিন কবির দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা উঠিল। শুনিলাম তাঁহার বাসা তাঁহাদের বাসার নিকটেই এবং দেৱাছনের বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত লোক। শুনিলাম তিনি তথায় ওকালতি করিতেছেন এবং পসারও বেশ হইয়াছে। তাঁহার নাম শুনিয়াই হঠাৎ মনে হইল এতদূর আসিয়া একবার ভক্ত কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া না গেলে তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফল পাইব না।

আমার দেৱাছন যাওয়ার প্রস্তাবে সোমনাথ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতারা বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বাহাতে তাঁহাদের বাসাতেই থাকি তজ্জন্য অহুরোধ করিলেন। দ্ব্যিকেশ হইয়া দেৱাছন যাওয়ার স্থির হইল। সোমনাথ বাবু তাঁহার সাত-ভাই চম্পার বোন পাকলটির মত টুকটুকে ছোট বালিকা ভগ্নীকে, হরিদ্বারে নান করাইয়াই দেৱাছনে অগ্রগামী হইলেন। আমি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা দ্ব্যিকেশ দর্শন করিয়া দেৱাছন রওনা হইব স্থির করিলাম। আমি পূর্বে দ্ব্যিকেশে গিয়া চারপাঁচ দিন থাকিয়া আসিয়াছি, আবার তাঁহাদের সঙ্গে বাইতে হইল।

আমরা দ্ব্যিকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম প্রাতে দেখিয়া রামাশ্রমে এক সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রসাদ পাইয়া, বৈকালে দ্ব্যিকেশ রোড ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিলাম এবং দেৱাছনগামী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। বাইতে পথেই রাত্রি হইল। দেৱাছন ঢুকিবার পূর্বে গাড়ী হইতে ভীষণ জ্বলে ব্যাঙ্গের ডাক শ্রুত হইল। তখন দূরে মুশৌরী শৈলে সহরের আলোকমালা জলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী হইতে পাহাড়ের গায়ে ঠিক ছাদাপথের ন্যায় লাগিতেছিল। একটা নগর বলিয়া মোটেই ধারণা হইতেছিল না। দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

রাত্রি ৮।০টার সময় আমরা দেবদ্রুনে সোমনাথ বাবুদের বাসায় পহুছিলাম যেখানে দুইদিন কি-স্থখেই অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বলিতে পারেন। সে স্নেহ সে যত্ন আচার এখনো প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে।\* এই বাসায় থাকিয়া একদিন প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকুমার সাম্রাণ বিএ মহাশয়ের সহিত দেবেন্দ্র দর্শনে গেলাম। আমি দেবেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় একবার শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা দেখিয়াছিলাম, তখন আমি এফ-এ পড়ি তাঁহার জামতা রাধিকা আমার সহপাঠী। সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের উপর আমি একটা কবিতা লিখি তাহা অবগোণ্য হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

হে দেবেন্দ্র কৃষ্ণ সখা হে সৌম্য সুন্দর,  
প্রবেশিয়া তব কাব্য নন্দন কাননে  
সাতগৌ চোরের মত, হে মৌলিনন্দার,  
হস্তচূত করিয়াছি কত পারিজাত  
কল্পদ্রুম শিশির। স্নিগ্ধ ফলবাণি!  
ডুলেছি অঞ্চল ভরি। ছিঁড়েছি কতই  
পুরুষ নথরে মোর সুবর্ণ সেকাল।  
রঙোরুণ কর ছুঁই আছে সাক্ষী তার!  
পড়িছে সম্মুখে ধরা, হে বিশাল অঁখি  
পলাবার শক্তি নাই বাহ্য নাই হৃদে,  
আপনি দিতেছি ধরা। কমিও না দেব  
কৃত অপরাধে। রাখ দৃঢ় বন্ধ করি  
নিশিতে পরাগ-অঙ্ক ভ্রমরের মত  
তব পদ কোকনদ রম্য কারাগারে।

দেবেন্দ্রনাথ আমায় যে এত শীঘ্র চিনিতে পারিবেন তাহা ভাবি নাই। প্রভাত সাতটার সময় তাঁহার কবিকুলে উপস্থিত হইলাম, সুন্দর বাড়ীটি, সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি পরে ধু ধু মাঠ, দূরে মুশোরর উচ্চ পাহাড় মধো কোন ব্যাবধান নাই। মুশোরির বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য গৃহগুলি এক একখানি সাদা পাথরের টালির ন্যায় মনে হয়। রাত্রে তেমন ছায়াপথের মাধুরী অনুকরণ করে। দেবেন্দ্রনাথের গৃহের টিনের চাদে আইভি লতা বেড়িয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে প্রাকাস্ত প্রাঙ্গণ। ‘আনার’ ও ‘আপেল’ নামে তাঁর দুটি ছোট ছেলে মেয়ে তাহাতে খেলা করিয়া বেড়ায়।

দুইবার ডাকিতেই দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া “ও কুমুদ তুমি এসেছ, এসো এসো ভিতরে এসো”

“এসো হে স্বদেশী বন্ধু চির বিদেশীর

বুকে ধরি করি আলিঙ্গন”

• বড়ই ছুঃখের বিষয় নিখিলনাথ বাবু অকালে দেহত্যাগ করিয়া সুখের সংসারটী একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছেন, পরে জানিলাম তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যদি দেবদ্রুনে তাঁহার বাসায় উঠিয়াছিলাম জানিয়া রোগ-শয্যাতেই বলিয়াছিলেন “কুমুদ কি জানে না যে সে আমার সহপাঠী, সে আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিত।” এই-আতিথের পরিবারকে ভগবান শান্তি দিন, ইহা প্রার্থনা করিতেছি। প্রঃ লেঃ।

বলিয়া একেবারে বন্ধে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁর কবিতার মায়া তাঁর দেহও একেবারে সারা বুক অধিকার করিয়া বসে। বহুদিন পর পুত্র গৃহে ফিরিলে পিতা যেমন ভাবে আলস্র করেন এ আহার অনেকটা সেই ধরণের। আমি বলিলাম এতদূর আসিয়া আপনার শিক্ত হইয়া আপনাকে না কর্শন করিয়া গেলে-যে পূজ্য পূজ্য ব্যতিক্রম হইবে তাই দর্শন করিতে আসিয়াছি, আশ্রয় তা আপনাদের শিক্ত বই আর কিছুই নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন “জানো হিন্দীতে একটা কথা আছে;—গুরু ত চোটে গুড়ই রন্ধিয়া গেলেন, শিষ্য যে চিমি হয়ে গেল।” তোমরাও তাই আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তার পরে বলিলেন “হাক্, ছুমি নিখিল বাবুদের ওখানে উঠেছ ত্রাশুই করেছ, তিনি অতি মহৎ লোক ও আমার বন্ধুই বলিতে হইবে, কিন্তু প্রথম তোমাকে আমার বাড়ীতে থাকিতে হইবেই। আমি তাহাতে অস্বীকৃত হইতে পারিলাম না। সোমনাথ বাবু প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া এই-খানেই আসিলাম।

কবির বাড়ীর গুরুজন তাঁহার খুড়িমার নিকট ডাকিয়া আমার আহ্বান করিতে দিলেন, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের-লোক হইয়া গেলাম। মাতৃকল্পা কবিপত্নীকে প্রণাম করিলাম। খুড়িমার নিকট গুলিলাম তিনি এখানে ‘কপে বউ’এর মতই থাকেন সর্বদা গৃহকাজ লইয়া বাস্তব।

আমি কবিরের সহিত তাঁহার কাবা সন্ধকে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়া ও স্বচ্ছন্দতার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার এক্ষণে বস্ত্র ও আহার হইতে লাগিল যে আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। শেষে বলিলাম এত অধিক মাত্রার বস্ত্র ও আহার পাইলে আমাকে অল্প রাত্রিতেই রওনা হইতে হইবে।

পথে আসিবার সময় লক্ষ্মী স্টেশনে আতা বিক্রয় করিতেছিল, আতা দেখিয়া কবিরের ‘লক্ষ্মী আতা’ নামক সুন্দর কবিতাটা মনে পড়িল, যেরূপ মনে আছে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

চাহি নে আনার ঘেন অভিমানে ক্রুর  
আরক্তিম গুণ ওষ্ঠ ব্রহ্মলুপ্তরীর।  
চাহি নাক কেউ ঘেন বিরহ-বিধুর  
জানকীর চির পাখু বদন রুচির।  
একটুকু রসে ভরা চাহি নে আনুর  
সলজ্জ চুখন ঘেন নব বধূটির।  
দাও মোরে ওই জাতি স্মৃতি আতা  
রহিত যা নবাবের উজানে বুলিয়া  
রূপসী বেগম কোনো হয়ে উল্লসিতা  
পাড়িত। সে গর্কে বর্ষে আনন্দে গুমরি  
মিশে যেত রসিকার রসনা উপরি।

অধিক মূল্য দিয়া দুইটা আতা কিনিলাম এবং তাহাতে অপূর্ণ নূতন আশ্রয় পাইলাম। আমার সেবাসেবি আরও দুই তিন জন সহযোগী কিনিলেন কিন্তু তাহাতে সাধারণ আতা অপেক্ষা কোন নূতন আশ্রয় পাইলেন না। আপনার কবিতা লক্ষ্মী আতাতে আমার পক্ষে একটা নূতন আশ্রয় দিয়াছিল কি না?

The beauty that near was on sea or land

The consecration of a poets dream.

ভনিয়া দেবেন্দ্রনাথ হে হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন “তুমি যে আভা কিনেছ সে আভার কথা ত লিখি নাই লক্ষ্যে  
এর আভা খুব ভাল বটে কিন্তু সে বৃৎ আভা হেঁশনে বিক্রী হয় না।”

তার পর তাঁর ‘কদম্ব সুলভা’র কথা উঠিল-‘কদম্ব সুলভা’র মত সুলভর কাব্য আমি খুব কমই পড়েছি, যেমন  
মধুর তেমনি সরস সুলভ। তার মধ্যে কেন ছ একটা হালকা কথা দিচ্ছেন কবিবরকে তাগা দিজ্ঞাসা করিয়া  
বলিলেন “তার কারণ ত তাতেই দেওয়া আছে।” বলিয়া আবার হাসিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী ঠিক জায়ে  
সাহানো ও বাছা না হওয়ার তাঁর কবিতার রস সাধারণে সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, বলার তিনি  
বলিলেন “উহা এত তাড়াতাড়িতে মুদ্রিত হয় যে তাহার অবকাশ ছিল না। কবিতাগুলো যেখানে-সেখানে হইয়া  
গিয়াছে।”

তাঁর ‘অশোকগুচ্ছে’ তবু অনেকটা বাছিয়া সুবিস্তৃত করিয়া কবিতা প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু অগ্রগলিতে  
তার একান্ত অভাব। তার পর বর্তমান কবিতায় তাঁর পূর্বের সে অগূরু মাদকতা নাই বলার তিনি বলিলেন  
“তা ঠিক বটে একজন সাহিত্যিক ত বলিয়াছেন “আমার কবিতার ক্রম প্রাপ্তি হইয়াছে। তবে জানো আমার  
ক্রম থেকে বতুঁকু মাদকতা থাকে থাকুক, ক্রমগত মাদকতা চাই নে। সত্যি দেখিলাম কবিবর অর্দ্ধ সমাসী  
অর্দ্ধ গৃহীত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি কেবল লিখিয়া নয় জীবনেও দেখাইতেছেন; --

“হরি বিনা গান মিছে হরি বিনা জ্ঞান মিছে

হরি বিনা প্রাণ সে ত জীবনে মরণ।”

তাঁহার গৃহে প্রতিদিন প্রত্যহে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া গীতা পাঠ করেন এবং কবিবর সর্বদাই হরি প্রেমে ভেঁর।  
তাঁহার ভবনটা বঙ্গবাণীর শৈলাবাস, এখানে আসিলে সে বঙ্গ সাহিত্যের আবহাওয়া যেন পাওয়া যায়। সে ভবন  
“যেন অশোকে, আবীশে লালে লাল।” “তাঁর বকের কুলে কুলে, প্রাণেব অর্থ মূলে” যেন তেমনি জাহ্নবী  
বহিতেছে” তিনি বুক জুরিয়া বাঙ্গলার ছবি রঞ্জিতেছেন। ওই বৈলাবাসে ‘বাঙ্গলার কবি’ যেন বাঙ্গলার সাহিত্য-  
সম্পদ লইয়া আপন মহিমার বলিয়া আছেন, তাহাতে ইহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের তীর্থভূমি করিয়া তুলিয়াছে।  
কবির কাব্যের সরলতা তাঁর প্রাণ হইতে পারিয়াছে, সে প্রাণ কত গভীর কত স্বচ্ছ তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম  
করা যায় না।

কবিবরের সঞ্চিত তাঁর ‘ছাত্রকা’ দর্শনের কথা ও দেশপরিচয়ের কথা হইল। তাঁহার যে বালিকা কন্ঠার  
উদ্দেশে ‘হুহিতা মঙ্গলশ্রী’ লিখা তাঁকে দেখিলাম। অল্প দিন পূর্বে এখানে বিখ্যাত মহিলা-কবি কামিনী রায়  
আসিয়াছিলেন এবং কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ নিলীপ ও কন্যা মায়াদেবীও দেবেন্দ্র সম্ভাষণে আসিয়া  
ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতেই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শালীপতি-ভাই ব্যারিষ্টার Mr. Chatterjee  
সঙ্গে আলাপ হয়। অতি মধুর চরিত্রের লোক, বঙ্গভাষার ইহার প্রগাঢ় অহুয়াগ।



দুই দিন থাকিয়া আমি কবিরের নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার Rikhshtaw খানিতে দুই জনের স্থানে তিন জন চার জন চাকর দিয়া আমার ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন, বিদায় দিতে যেন কত ব্যস্ত। “বাড়ী গিরে পত্র দিবে, পথে সাবধানে যাইবে” প্রভৃতি কথা যেন বলিয়া ফুৎকার না। এত সরল সহজ স্ত্রীর ব্যবহার কোথাও দেখি নাই। এ যেন একেবারে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার স্ত্রীর উদার উন্মুক্ত, কোথাও এক বিশুদ্ধি মালিন্য নাই। মনটা দেহাছনের ইউক্যালিপটাস Avenue-এর চেয়েও সরল স্ত্রীর।

শ্রীকুমারজ্ঞান মল্লিক।

## উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র।

—:~:—

### সাধ্বী পূর্ণিমা দেবী।

কার্য্যব্যাপদেশে রঙ্গপুরের অদ্রবতী-ভূতছাড়া গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ভূতছাড়া অন্যতম ভূস্বামী শ্রীযুক্ত বেলীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসেই আমরা গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সৌজন্য বিনয় ও অমায়িকতা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

বাহাকে আবাস বলিলাম উহাকে আবাস না বলিয়া দেবালয় বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। নাতিপ্রশস্ত নাতিদীর্ঘ চত্বরের পুরোভাগে মাতা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বিরাজিতা। মাতা দশভূজারূপে অবস্থান করিতেছেন। মতে মন্দির সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইলে পূর্বপার্শ্বে রামেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, জয়কালী ভৈরবেশ্বর ও দুর্গাবল্লভ মহাদেবের মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণ ভূস্বামী লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২১৫ সালে অকর তৃতীয়া দিবসে মাতা রাজরাজেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ১২১৩ সালে অনন্তধামে প্রস্থান করেন। তদবধি প্রতিদ্বিগত মাতৃ-মন্দিরে নিত্য দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ লক্ষ্মণচন্দ্রের স্ত্রীযোগ্য পুত্র লক্ষ্মীকান্ত জননী রামমণির নামে রামেশ্বর, জনক লক্ষ্মণচন্দ্রের নামে লক্ষ্মণেশ্বর ও তিন পিতৃব্য কালিকা প্রসাদ, ভৈরবনাথ ও জয়দেবের নামে জয়কালী ভৈরবেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মীকান্তের পুত্রবধূ রাজকুমারী স্বামী দুর্গাকান্তের নামে দুর্গাবল্লভ শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়দেবের স্ত্রীযোগ্য সহধর্ম্মিণী পূর্ণিমা দেবীর অলৌকিক পতিভক্তি এবং জয়দেবের শরণাগতরূপে এই ভূস্বামী বংশকে “সাবজজ্ঞ দিবাকরো” ইতিহাস প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিবে। সে অপূর্ণ গুণকাহিনী পরে আলোচনা করিব আপাততঃ এই ভূস্বামীবংশের পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

অষ্টাদশকালের মধ্যে এই ধর্মপ্রাণ ভূস্বামী বংশের কুলপরিচয় যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা হইতে ইহাষ্ট প্রতীয়মান হয়, এই বংশের আদিপুরুষ হরিদেব চুঁচুড়া হইতে ৬ মাইল দূরে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। হরিদেবের পুত্র রামকান্ত সর্বপ্রথম ব্রাহ্মদেশ হইতে বারেন্দ্রভূমিতে আগমন করেন। তখন প্রজারাজ্য সুশাসক নবাব আলীবর্দী খাঁর অধীনে বঙ্গদেশের নানারূপ আবর্তন বিবর্তন হইতেছিল। দেশবাসিগণই তৎকালে কার্য্যতঃ দেশ শাসন করিতেন। নামসর্বস্ব মোগলসম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে বাঙ্গালার নবাব ও তাঁহার অস্থচর ফৌজদার সুবেদার প্রভৃতিস্বার্থসাধন ও রাজস্ব সংগ্রহই লিপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালীই তখন দেশ শাসন করিত, প্রয়োজন হইলে শাসক সম্প্রদায়ের অমুকূলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে লাঠি ধরিত, আবার সম্ভব হইলে রাজ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে ক্রটি করিত না।

হরিদেবের পুত্র রামকান্ত নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালের শেষভাগে কোন রাজকার্য্য গ্রহণ পূর্বক উত্তর বঙ্গে আগমন করেন। ইহার পুত্র দর্পনারায়ণ সর্বপ্রথমে রঙ্গপুরের অদূরবর্তী ঘড়িয়ালডাঙ্গা গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র লক্ষণ নারায়ণ ও জয়দেব, পিতা দর্পনারায়ণের ন্যায় উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার সাধারণতঃ লক্ষণ বকসী ও জয়দেব বকসী নামে পরিচিত ছিলেন। জয়দেবের পুত্র বাদশেহ রঙ্গপুরে খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন। তৎকালে দেশের শাসনতত্ত্ব বিশৃঙ্খল থাকায় দস্তা ওস্তরের উপদ্রব প্রবল ছিল। লক্ষণ বকসী প্রথমে ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে পাশগুজা পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ বন্দা নির্মাণ করেন। এই রাস্তার পার্শ্বে দেবালয় ও অতিথিশালা নির্মিত এবং পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। অধুনা এই বন্দা ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে রঙ্গপুর আগমনের জন্য কিল্লীটো বোর্ডের রাস্তার অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। লক্ষণবকসীর নির্মিত রাস্তা ও পুষ্করিণী বর্তমান কালেও লক্ষণ বকসীর মারী (Road) ও লক্ষণ বকসীর তাগাও (Tank) নামে পরিচিত হইয়া জনসাধারণের চিত্তে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া থাকে।

লক্ষণবকসীর প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও অতিথিশালা বর্তমানে ভূতছাড়া গ্রামের জমিদার বাবুদিগের আবাস বাটীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার মাতা রাজরাজেশ্বরীর সেবাইতমাত্র। ইহাদিগের সমস্ত ভূসম্পত্তি মাতা রাজরাজেশ্বরীর নামে উৎসর্গীকৃত।

তৎকালে পরগণে উজ্জ্বল প্রবল প্রতাপাবিত ভূস্বামীবর্ষ ভূছাড়া অদূরবর্তী কুর্শাগ্রামে বাস করিতেন। এখনও ইহাদিগের বংশধরগণের কেহ কেহ কুর্শাতে অবস্থান করিতেছেন। এই বংশের ঈশান চৌধুরী মহাশয়ের এক পুত্র এবং ঈশর চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা ও দৌহিত্রী ইত্যাদি কানীতে অবস্থান করিতেছেন। দর্পনারায়ণের চারিপুত্র লক্ষণবকসী, তৈরবনাথ, কালিকাপ্রসাদ ও জয়দেবের মধ্যে কালিকাপ্রসাদ ও তৈরবনাথের কোন বংশধর বিদ্যমান নাই। লক্ষণ বকসীর বংশধরদিগের মধ্যে বকসী মহাশয়ের পৌত্রের দৌহিত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায় অল্প কাল পূর্বে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। দৌহিত্র প্রাণ্ডুর বৌমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমানে ভূছাড়ার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

জয়দেবের প্রপৌত্রদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বৌমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধুনা ৮ বারাসী ধামে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র বকসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। অন্যতম শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র কানীতে বহুমুখ্য অলঙ্কার ও জহরত ইত্যাদির কারবার করিতেছেন। নীরদচন্দ্র হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গীত ও কবিতা

রচনার বিশেষ দক্ষ। নিজের সুগায়ক। এসিদ্ধ জহরী বলিয়া ইহার সুপ্রতিষ্ঠা আছে। ইনি কবিতাকারে স্ববংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন! ইহারই সাহায্যে আমি পূর্বোক্ত বংশপরিচয় বহুলভাবে অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভূতছাড়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া এক সময়ে খরসলিলা মনাস প্রবাহিত হইত। বহুপণাবাহী তরণী এই পথে যাতায়াত করিত, মনাসের উভয় প্রান্ত খরসোতা পর্যন্তদৃষ্টিতে তিস্রোত্তর্য সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অধুনা বিগত সলিলা মনাসের খাতমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পূর্বে মনাসের এইরূপ ছরবহা হয় নাই। তৎকালেও ইহার বক্ষে বহু পণাবাহী তরণী যাতায়াত করিত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্যে এক ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। সলিল বহুল নদনদীসমূহ সুবিস্তৃত চরভূমিতে পরিণত হয় পরন্তু বহু উচ্চভূমি সলিল সমাকর্ষণ হইয়া যায়। মনাসের নাতিগভীর সলিলগর্ভ এই সময়ে উন্নত হওয়ার ক্রমে ক্রমে সমস্ত নদীগর্ভ মজিয়া যায়। সম্ভবতঃ আর কয়েক বৎসর পরে মনাসের শেষ রেখাটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

দ্বিপ্রহর—বাসু বহে না। পাতা নড়ে না, বিশ্বজগৎ নিস্তব্ধতার কোড়ে বিরাজিত। প্রথর রৌদ্র দশদিক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই রূপ অসময়ে পরগণে উদাসীর জমিদার পুণ্যকীর্তি জয়দেব বক্সীর শরণাপন্ন হইলেন। জয়দেবের তখন স্নানাহার হয় নাই। নিধমিত রূপে দেবতাদি পূজা সমাপন করিয়া জয়দেব গৃহের বাহির হইতেছিলেন। এমন সময়ে উদাসীর জমিদার ধর্মপ্রাণ জয়দেবের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। আজ ভ্রাতা, ভ্রাতাকর্তৃক বিভাঙিত ন্যায্য ভূসম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত। কে তাহাকে সাহায্য করে? তৎকালে ধর্মপ্রাণ শরণাগতরক্ষক প্রবল পরাক্রান্ত জয়দেব বক্সীর নাম সর্বত্র লোকমুখে প্রচারিত ছিল। জয়দেব আশ্রয় বটেন। স্তত্রাং বঞ্চিত-বিভব ভূস্বামী অনন্যভাবে জয়দেবের শরণ প্রার্থী হইলেন। জয়দেব তাঁহাকে স্নানাহারের জন্য পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করিয়া বৃত্তিতে পারিলেন তাঁহার অপছন্দ বিভব উদ্ধারের সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান না করিলে তিনি স্নানাহার করিবেন না। অংশেষে ঠিক হইল, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার পক্ষ সমর্থনের জন্য জয়দেব কলিকাতায় গমন পূর্বক সুপ্রমোকেটে অভিযোগ উত্থাপন করিবেন। সম্পত্তির উদ্ধার সাধিত হইলে পরগণে উদাসীর দুই স্নান সম্পত্তি জয়দেব ও তাহার বংশধরগণ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। ধর্মপ্রাণ জয়দেবের নিকট উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্বক বঞ্চিতবিভব ভূস্বামী স্নানাহার করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে জয়দেব প্রতিশ্রুতি বক্ষার্থ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

তখন ভারতের ভূতপূর্ব রাজধানী কলিকাতা গমন সহজ সাধ্য ছিল না। নৌকা ও স্থলপথে হিংস্রজন্তু সমাকর্ষণ অরণ্যানি অতিক্রম করিয়া লোকে ভয়ে ভয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিত। দম্ভাতঙ্কের উপদ্রবে প্রাণ হাতে করিয়া পথের বাহির হইতে হইত। আমরা গভর্নমেন্টের প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে অবগত হইতে পারি এক সময়ে এই জেলার জনৈক ভূস্বামীকে কলিকাতায় গমন করিতে হওয়ার তাহার পথের বার এক সহস্র মুজা নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহা অমুমান দেড়শত বৎসরের কথা। জয়দেবও অমুমান দেড়শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতিক্রিয়া প্রতিপালনের জন্য জয়দেব বধাকালে কলিকাতার পৌছিলেন।

শাসনের পর মাস চলিয়া গেল, জয়দেবের সংবাদ নাই। অনাহারে অনিদ্রায় অনন্য-কর্ম জয়দেব শরণাগতের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগলেন। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীমাত্রেই তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ন্যায় ও ধর্মের সমর্থনের জন্যই তিনি হুদ্র রঙ্গপুর হইতে ভারতের-রাজধানী কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। সুশীমকোটের বিচারপতিগণ ত্রাহার প্রবল বৃত্তিতর্কের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। জয়দেব জয়লাভ করিলেন।

কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধ্যা প্রচারিত চল জয়দেব মোক্ষদয়ার জয়লাভ করিয়াছেন। চরিত্রকে অনন্দে কোলাহল পড়িয়া গেল। ইহারই কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল অনাহার, অনিদ্রা, উদ্বেগ অনিয়মিত পরিগ্রহ এবং তদানীন্তন কলিকাতার দূষিত বায়ুর ফলে জয়দেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। জয়দেব স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্বেগ হইয়াছেন। সোদর প্রাণ লক্ষণ, কালিকা প্রসাদ, ও ভৈরবনাথ সকলেই ভ্রাতার পীড়ার সংবাদে উদ্বেগ হইলেন। পতিব্রতা পূর্ণিমা দেবী ছদ্মবেশে চিত্তানল পোষণ করিয়া অবিচলিতভাবে সংসারের সমস্ত কার্য নিরীক্ষা করিয়া যাঠিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কে যেন তাহাকে বলিয়া দিত তাহার দেবতুল্য স্বামী জয়দেবের ইচ্ছালোকের কর্তব্যাকর্ম সমাপ্ত হইয়াছে সমস্তই তিনি অনন্তলোকের স্বামী হইবেন।

দিন বাইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গের চিন্তা ও উদ্বেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন বর্তমান কালের ন্যায় সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা ছিল না, তাড়িৎবার্তা ও রেলপথ অনেকের পক্ষে কল্পনার সামগ্রী ছিল। সুতরাং আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের উদ্বেগ ও উৎকর্ষা বহুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক না কেন কাঁহরও বিশেষ কিছু প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে পতিব্রতা পূর্ণিমা দেবী পরিচারিকার সাহায্যে লক্ষণ বক্সীকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাতাকে এখনই রঙ্গপুরে যাত্রা করিতে হইবে। তিনি অবিলম্বে যেন উপযুক্ত-সংখ্যক দাসদাসী পাঠক পাড়ী বেহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

লক্ষণ বক্সী একটু বিচ্যুত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি অন্যরে বলিয়া পাঠাইলেন বধূ ভাতা অকস্মাৎ রঙ্গপুরে বাহিব্যর জন্য বাস্ত হইয়াছেন কেন? ঘড়িগালডাঙ্গা হইতে রঙ্গপুরে গমনাগমন তখন সহজ সাধ্য ছিল না। লক্ষণ বক্সী বধুমাতার উদ্বেগের কারণ জানিতে চাহিলেন।

পতিপরায়ণ পূর্ণিমাদেবী ভাষার অমুখিত গ্রহণের জন্য অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পার্শ্ব স্ত্রী একটি পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে বল তিনি সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইয়া রঙ্গপুরে পৌঁছিয়াছেন এই মুহূর্তেই আমাকে রঙ্গপুরে যাত্রা করিতে হইবে নচেৎ তাহার সচিৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

লক্ষণ বক্সী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। জয়দেবের রঙ্গপুরে পৌঁছিব্যর সংবাদ ত তিনি প্রাপ্ত হন নাই! তবে বধুমাতা কি করিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন?

লক্ষণ বক্সী জানিতেন না পতিব্রতার হৃদয়-মুকুরে স্বামীর পতিব্রতা সঙ্গদা প্রতিকলিত থাকে। এই হৃদয় মুকুরের সাহায্যেই পতিব্রতা পূর্ণিমাদেবী স্বামী জয়দেবের রঙ্গপুরে আগমনবার্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অবিলম্বে পাড়ী বেহারা দাস দাসী পাইক বরকন্দাজ সমস্ত সজ্জিত হইল। ঘড়িগালডাঙ্গার পরিবারবর্গের মধ্যে একজনও বাটিতে রহিলেন না। জয়দেবের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? রজনীর সূচীতেই মন্দির তেদ করিয়া সুবহু পরিবার রঙ্গপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে জয়দেবও রঙ্গপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি জানিয়াছিলেন তাঁহার কালপূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং যথাসম্ভব উপযুক্তসংখ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া তিনিও বাড়িয়ালা ডাক্তার অভিমুখে বাত্মা করিয়াছিলেন।

পথিমধ্যে উভয়ে দলের সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতার ভ্রাতার স্বামী স্ত্রীতে মিলন হইল। জয়দেব পূর্ণিমা দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ‘আমার কালপূর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।’ পত্নিত্বতা পত্নীও অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, ‘আমিও তাহা পূর্বে অবগত হইয়াছিলাম। তাই যথাকালে প্রভুর অনুগমন করিবার জন্য স্বৈচ্ছায়গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি।’

উভার অশ্রুটালোক ধরাশয়ল স্রবদালোকিত করিবার পূর্বেই ধর্মপ্রাণ জয়দেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। স্বরসলিলা মনাসের পবিত্রবক্ষে স্বামী স্ত্রী উভয়ের শেষ চিহ্ন মিলিত হইয়া যায়।

পত্নিত্বতা পূর্ণিমা দেবী সম্ভবতঃ ১২০১ হইতে ১২১০ সালের মধ্যে স্বামীর সহিত চিতারোহণ করেন। ১২১২ সনের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার মাতা রাজরাজেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১২১৩ সালে ভ্রাতৃগতপ্রাণ লক্ষণ বকসী ভ্রাতার অনুগমন করেন।

পত্নিত্বতা পূর্ণিমাদেবী যে স্থানে চিতারোহণ করেন, ঐ স্থানে কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জয়দেবের উপযুক্ত বংশধর শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন মাতা রাজরাজেশ্বরীর ইচ্ছা হইলে বর্ষেক মধ্যে তিনি এই স্তম্ভ সঙ্কলন কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইবেন।

মাতা রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরগাত্রস্থিত ইষ্টকের উপর দেবদেবীর খোদিত মূর্তিগুলি বিশেষ দৃষ্টব্য পদার্থ। এই সমস্ত মূর্তির একটিও কুরুচি ও অশ্লীল ভাবসম্পন্ন নহে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে গৃহীত দেবলীলা সমূহের বিবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র ভাস্করের চিত্রকলকে সুন্দরভাবে উৎকর্ষ হইয়াছে। এক স্থানে দেখিলাম, গোলন্দাজ সৈন্যগণ বিচক্রযানের সাহায্যে কামানসমূহ স্থানান্তরিত করিতেছেন। এই চিত্রাংশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পলাশীযুদ্ধের স্মৃতি তখন নিরক্ষর ভাস্করের হৃদয়-কলকে কিরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরটি একশত বর্ষের অধিক কাল নিশ্চিন্ত হইলেও কাগ্যাতঃ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। ১৩০৪ সালের তীর্থা ভূমিকম্পে ইহার একপার্শ্ব সামান্য বসিয়া গিয়াছে মাত্র।

শ্রীকেশবলাল বসু।















